ঋভু

ঋভু

চার পর্ব একত্রে

বুদ্ধদেব গুহ

দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

RIBHU (PART I-IV)
A Bengali Novel by BUDDHADEB GUHA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com

ISBN : 81-295-0490-1

প্রচ্ছদ . রঞ্জন দত্ত

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

তাপসী বড়ো ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তুলসীমঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কী মনে করে পাশ ফিরলেন। আর ফিরতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন উপরের দিকে চেয়ে।

চৈত্রশেষের সন্ধ্যা নামতে সামান্যই দেরি আছে আর। বার-বাড়ির লাল-রঙা টিনের চালের মাথা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে জলপাই আর কালোজাম গাছের সটান মাথা দুটি। ঋজু! তারই মাঝখান দিয়ে পশ্চিমাকাশে চেয়ে, তাপসীর মনে হলো, দিনের শেষ আলোতে এক অপার্থিব স্বর্ণদেউল এঁকে দিয়েছেন যেন কোনো নিভৃত প্রাণের দেবতা।

কয়েক মুহূর্ত সেদিকে বিহ্বল চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এক হাতে শাঁখ আর অন্য হাতে পেতলের পিলসুজ থেকে তুলে-আনা প্রদীপখানি ধরে তুলসীমঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন তাপসী।

কিছুক্ষণ আগেই প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-ক্ প্যাঁ-অ্যাঁ-ক্ করে হাঁসা-হাঁসিরা বাড়ি ফিরেছে হরিসভার পুকুরে সারাটা দিন কাটিয়ে। উঠোনের একপাশে কাঠের ঘরের মধ্যে বদ্ধ অবস্থাতে হিস-হাস-ফিশ-ফাশ শব্দ করছে এখন তারা। তাদের গায়ের পালকের আঁশটে গন্ধের সঙ্গে পুকুরের জলের পানার গন্ধ আর পাঁচমিশেলি শাকের গন্ধ মিশে গিয়ে উঠোনময় একধরনের জলজ গন্ধ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে অদৃশ্য জোনাকির মতো।

কুয়োতলায় সিঁদুরে-আম গাছটাতে মুকুল এসেছে রাশ রাশ। এবারে বসন্ত যেতে না যেতেই। বড়ো তাড়াতাড়িই এসেছে। অন্য বছরে বৈশাখের প্রথমে আসে। সন্ধ্যামালতী, দোপাটি, রক্তকরবী আর শ্বেতকরবী, কাঠটগর, হাসনুহানা, যুঁই, বেল এই সব ফুল-ফোটা এবং না-ফোটা গাছেদের গায়ের সম্মিলিত গন্ধে ভরে আছে উঠোন। ফুল না-ফোটা গাছের গায়েরও আলাদা গন্ধ আছে একরকম। যে-গন্ধ ফুল ফোটার সময়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। তাপসী সে কথা জানেন। মা না-হওয়া নারী আর মা-হওয়া নারীর গায়ের গন্ধের পার্থক্যেরই মতো।

প্রদীপখানি তুলসীমঞ্চে নামিয়ে চৈতি-হাওয়া আঁচলে আড়াল করে তাতে আগুন দিলেন, তার পর লালপেড়ে শাড়ির আঁচলটি গলায় জড়িয়ে তাপসী শাখে ফুঁ দিলেন।

পুঁ-উঁ-উঁ-উঁ আওয়াজে সান্ধ্য, গ্রাম্য-প্রকৃতি অনুরণিত হয়ে উঠলো। গাছ-পালা, বার-বাড়ির মাঠের ঘাস, ঘোঘোট নদীর ক্যানালের জলও যেন নড়েচড়ে উঠল সেই শাঁখের আওয়াজে। পাতায় পাতায়, ঘাসে ঘাসে দোলাদুলি কানাকানি হলো। সোনালি জল দৌড়ে গেল খিলখিল শব্দ করে ঢেউয়ের ঘাড়ে মাথায় পা দিয়ে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে গৃহবধূ আর গৃহকন্যাদের বাজানো শাঁখের পুঁ-উঁ-উঁ-উঁ আওয়াজ ঝিম ধরে রইল কিছুক্ষণ উত্তরবাংলার রংপুর শহরের শেষপ্রান্তের এই পাড়াতে। প্রতি ঘরের মঙ্গলশঙ্খের পুলক-ভরা আওয়াজে মঙ্গলময় এক আবহাওয়ার সুর আস্তে আস্তে উঠে সন্ধ্যাকাশের সন্ধ্যাতারার দ্যুতির স্তরে মিশে যেতে লাগল।

বড়ো প্রত্যাশা জাগে প্রতিটি মানুষের মনে এইক্ষণে। তাপসীরও জাগল। এবং জেগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বড়ো ঘরের শান-বাঁধানো দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে তাপসীর শ্বশ্রুমাতা প্রমীলাবালা হাতে জপের মালা নিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি যেন এই মুহূর্তের জন্য স্থির নিষ্কম্প হয়ে থাকা সন্ধেকেই বললেন : এবারে পুজোটা শুরু করো।

তাপসী উত্তর দিলেন না কোনো। তবে কথাটা যে শুনলেন তা চোখের স্পন্দনে বোঝালেন।

আজ যে বৃহস্পতিবার সে কথাটা মনে ছিলো তাপসীর। শসা, কলা, বাতাসা, পদা ঘোষ ময়রার বানানো সন্দেশ, সবই বেকাবিতে সাজিয়ে রেখে এসেছেন। ধূপদানিতে ধূপ। ফুলদানিতে ও ঠাকুরের পায়ের কাছে ফুল। এবারে গিয়ে পুজোতে বসবেন।

কিন্তু ঠাকুরঘরটি বিবাগী ঠাকুরপোর ঘরেরই লাগোয়া। তাঁর ঘরের মধ্য দিয়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। আর তিনি তো ঘরে ছেড়ে নড়েনই না একমুহূর্তও। জেগে থাকলে, শুয়ে শুয়েই পা দুটি যতিহীন ভাবে নাড়াতে থাকেন এক পায়ের উপরে অন্য পা তুলে। আর জেগে না-থাকলে কোনো দেবশিশুরই মতো নিথর-পবিত্র ভঙ্গিমায় শুয়ে থাকেন পাশ ফিরে। দুটি হাতের পাতা জড়ো করে। যেন তাঁর আরাধ্য অগণ্য দেবদেবীর কাছে তাঁর ক্ষমা, ভক্ত-হৃদয়ের নীরব আকুতির সঙ্গে ভিক্ষা করছেন। কিন্তু সে ক্ষমা কোন্ অপরাধের জন্যে? এবং কার কাছে? তা জানার কোনো উপায়ই নেই। অত্যন্ত সুদর্শন, গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ মেয়েলি, ছিপছিপে মানুষটির মনের কথা খুব কম মানুষই জানেন। তিনি নিজেও জানেন বলে মনে হয় না কারোই। আগুনের মতো গায়ের রঙ তাঁর। এক মাথা চুল। পরনে ফিনফিনে মিলের ধুতি আর হাতাওয়ালা সাদা গেঞ্জি।

তাবৎ জাগতিকার্থে দারুণই অলস।

কোনো কাজেই তাঁর মন নেই। মাঝে মাঝে চণ্ডীমন্ত্র আওড়ান। কখনও গীতার শ্লোক। কখনও বা গলা ছেড়ে গান করেন একা ঘরে বসে। সর্বক্ষণ খাটে একটি হকিস্টিক শোয়ানো থাকে। হকি আর ক্রিকেট খেলার খুব ঝোঁক ছিল প্রথম যৌবনে বিবাগীর, তাপসীর দেওরের। তাপসী শুনেছেন, খেলতেনও নাকি ভালোই!

কোনো নারীর প্রতিই তাঁর বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য ছিল না। এমন "পবিত্র" আত্মার "অপদার্থ" মানুষ আর দুটি হয় না যে, সকলেই একথা বলতেন। কিন্তু তাপসীর কোনো উপকারে না আসলেও মানুষটির স্বার্থহীন আত্মমগ্নতা, লোভহীনতা, কামহীনতা তাপসীকে চিরদিনই বিস্মিত যেমন করেছে, তেমন প্রসন্নও করেছে। একদিনের জন্যেও, এক মুহূর্তের জন্যেও, প্রোষিতভর্তৃকা যুবতী সুন্দরী তাপসী বৌদিদির দিকে কুচোখে তাকাননি বিবাগী। সব মেয়েরাই পুরুষের চোখ পড়তে পারেন। তাপসীও তো ব্যতিক্রম নন! গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, সুকণ্ঠ, আলস্যপরায়ণ এবং এমন উদাসীন কোনো পুরুষ মানুষের কাছাকাছি দিনের বারো প্রহরের প্রতিটি ক্ষণ এর আগে আর কখনওই কাটাননি। নিসর্গর মধ্যে, নিঃসঙ্গ একটি পরমা সুন্দরী নারী ও একটি সুন্দর পুরুষের ওই গতিহীন স্তব্ধ সম্পর্কের মধ্যে যে এক গভীর বাঙ্ময় এবং নিশ্চিত গন্তব্যহীন যাত্রা নিহিত ছিল সেকথা তাপসীর মতো আর কেউই জানতেন না।

কখনও সখনও একটু অভিমানও যে হতো না এমন নয়! নিজের এতো রূপের পূর্ণিমার রাতের মতো নারী, বিবাগী—সাগরের জলে এক চিলতে তরঙ্গও যে তুলতে পারেননি কখনও তা তাপসী বিলক্ষণই জানতেন। প্রত্যেক পুরুষের চোখই প্রত্যেক নারীর আয়না। আবার অধিকাংশ মেয়েরই সবটুকু আনন্দ পুরুষকে ভেঙে ফেলারই মধ্যে। কেউ কেউ আবার গড়ার সাধনা নিয়েও আসেন। সে বড়ো কঠিন সাধনা। ভেঙে ফেলার পর আর কোনো উৎসাহই থাকে না তাদের। কিন্তু ভাঙা তো দূরস্থান! এই পুরুষের কাছে নারী আর জড়পদার্থ প্রায় সমার্থকই। একথা ভেবেই তাপসী নিজের অহমিকাকে বোঝান। পুরুষের মধ্যে এমন উদাসীনতা; নারীর পছন্দর নয়। একজনেরও নয়।

বিবাগী যথার্থই বিবাগী। তাঁর সঙ্গে জাগতিক কোনোরকম আলোচনাই করা যেত না। কোনো কাজের কথা বলা যেত না। বললে, যা করতেন, সে কু-কাজের হ্যাপা সামলাতে বাড়ির সকলে প্রাণান্ত হতো। বিবাগীর মনে হঠাৎ পুলক উঠলেই—

"অস্তি গোদাবরী তীরে। বিশাল শাল্মলী তরু...। গোদারে-এ-এ-এ" বলে গান ধরতেন।

তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে তাপসী দক্ষিণদিকে গিয়ে বিবাগীর ঘরে ঢুকে তারপর পুজোর ঘরে গেলেন।

বিবাগী বললেন, বউদি!

উঁ। তাপসী বললেন,

পুরুষের স্বরের নানা রকম হয়। যে-কোনো একটি শব্দ বিভিন্ন পুরুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হলে কোনো নারীর অন্তর পাথর-চাপা পড়ে। আবার সে-ডাকেই অন্য কোনো নারীর অন্তরে আনন্দের উৎসার ঘটে। নারীমাত্রই জানেন একথা।

বিবাগীর নিরর্থক ডাকে নিরর্থক সাড়া দিয়েই তাপসী পুজোর আসনে এসে লক্ষ্মীর পাঁচালি খুলে জোড়াসনে বসলেন। এই পুজোর ঘরে বসলেই মিশ্র ধূপ, মিশ্র ফুল আর নিজের চান করে ওঠা যুবতী শরীরের গন্ধে কেমন যেন ঘোর লাগে তাপসীর। সেই ঘোরে কখনও নিজেরই বিবশ লাগে। অন্য কারো তো কথাই নেই। কিন্তু দেবরের যে কেন কখনওই ঘোর লাগে না একথা ভেবে অবাক হয়ে যেতেন উনি। প্রকৃতই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিবাগী। অবশ্য তাপসীর প্রত্যেক দেবরই জিতেন্দ্রিয়। প্রত্যেকেই তাঁকে প্রায় মাতৃজ্ঞানে দেখেন অথচ বয়সে ছোটো দেবর ভোপাল ছাড়া সকলেই তাপসীর চেয়ে বয়সে বড়ো।

এই সুন্দর সম্পর্কর কথা ভেবেও এক ধরনের গর্ব বোধ করেন তিনি। সীতার মতো সম্মানের আসনে ক'জন বউদি বসতে পারেন? ছল-করা সন্ন্যাসীও একদিন সন্ন্যাসের মাহাত্ম্যে প্রকৃত সন্ন্যাসী হয়ে ওঠেন নিজের অজানিতে। একাকী, প্রোষিতভর্তৃকা তাপসীও মনে প্রাণে তপস্বিনী হয়ে গেছেন। ভালো হওয়ার এবং ভালো থাকার মধ্যে যে কী গভীর আনন্দ তা যাঁরা সত্যিই ভালো না হতে পেরেছেন তা তাঁরা জানবেনই বা কী করে!

হঠাৎ প্রমীলাবালা বললেন, ঋভু আসে নাই এখনো? ও তাপু?

তাপসী নরম, নিচু গলায় বললেন, না!

ছ্যামরাটার তো বড়ই বাড় বাড়ছে দেহি। বড়ই স্বাধীন হইয়া গেছে গিয়া। আইজ আসুকানে। মজাটা ট্যার পাওয়াইমু।

তাপসী নিঃশব্দে হাসলেন। ভাবলেন, মজা আর কী টের পাওয়াবেন! আসলের চেয়ে সুদ অনেকই দামী, অনেক বেশি কদরের। ঋভু হলো তাঁর বড়ো ছেলের বড়ো ছেলে। ছেলের ঘরের প্রথম নাতি। তার উপরে, ঈশ্বরের কৃপায়, ঋভু তাপসীর কাঁচাসোনা গায়ের রঙটি পেয়েছে, তার স্বামী হৃষীকেশের সুপুরুষ দীর্ঘাঙ্গ গড়নও। তার ঠাকুমার সে নয়ণ-মণি। প্রবাসী বাঙালি, পরবর্তী জীবনে কলকাতা-নিবাসী এবং বর্তমানে যুদ্ধের ডামাডোলে এই উত্তরবঙ্গের রংপুরের শ্বশুরবাড়িতে সাময়িকভাবে অবস্থানকারী তাপসী ভাবেন, অশিক্ষিতদের আদরে-গোবরে এবং অসময়ে গুচ্ছের খেয়ে খেয়ে ছেলেটার চরিত্র এবং স্বাস্থ্য দুইই গোল্লায় গেল। বিহারে গিরিডির প্রায়-ব্রাহ্ম পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা তাপসীর চোখে তাঁর শ্বশুরবাড়ির মানুষদের কথা-বার্তা, হাব-ভাব, আলাপ-আলোচনার জগৎ প্রায় অশিক্ষিতদের মতোই ঠেকত প্রথমে। ধীরে ধীরে এখন সইয়ে নিচ্ছেন। বুঝতে পারছেন যে, ভাষা অথবা জীবনযাত্রার সঙ্গে মনুষ্যত্বর কোনো সাযুজ্য নেই (বাইরের পালিশ থেকেও মানুষের মধ্যে গ্রাম্যতার চরম থাকতে পারে আবার সাদামাঠা গ্রামীণ মানুষের মধ্যেই থাকতে পারে প্রকৃত শিক্ষা অথবা প্রকৃত আধুনিকতা।)

অবশ্য প্রমীলাবালা নাতিকে সবসময়ে কাছে তো আর পান না। যুদ্ধের দাপটে কলকাতা থেকে নারী শিশুদের সবাই দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বলেই না হৃষীকেশের পৈতৃক বাসভূমি এই রংপুর শহরের এক প্রান্তে ঋভু আর তার মায়ের এসে থাকা। কবে আবার কলকাতায় চলে যাবে কে জানে তা! হৃষীকেশের সরকারি চাকরি। ইংরেজ-সাহেব উপরওয়ালারাই বলে দিয়েছিলেন যে, সম্ভব হলে, "ফ্যামিলি কলকাতা থেকে সরিয়ে দাও।"

তাপসী সবে লক্ষ্মীর পাঁচালী খুলে মন্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করেছেন এমন সময় বিবাগী এসে দরজায় দাঁড়ালেন।

কী বিবাগীদা?

আচ্ছা বউদি, দেবী লক্ষ্মী, ছাড়া আপনার অন্য কোনো উপাস্য দেবী কি আর নেই?

থাকবে না কেন? আপনার মাতৃআজ্ঞা। তার উপর আজ আবার বৃহস্পতিবার।

মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করা কি খুবই কঠিন?

না। তবে শাশুড়ির আজ্ঞা লঙ্ঘন করা প্রায় অসাধ্য। এটি মার্চ মাস, উনিশশো তেতাল্লিশের। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে উনিশশো বিরানব্বুই-এ হয়তো অবস্থা অনেকই পালটাবে, কিন্তু ততদিন কি আমি বাঁচবো? উনিশশো বিরানব্বুই-এর বেনিফিসারি আমার হওয়া হবে না। আপনি যদি বিয়ে করেন তবে আপনার স্ত্রী হলেও পারে। করে ফেলুন না, বিয়ে একটা?

করলেই হয়।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বিবাগী বললেন। বাঙালির ছেলের পক্ষে একটা বিয়ে করার মতো সহজ কাজ তো আর দ্বিতীয় নেই। তায় আমরা কুলীন। কিন্তু আমার কেন যেন ভালো লাগে না।

কেন?

মহিলারা পরদার হিসেবেই ভালো। তাঁদের সঙ্গে দ্বার-রুদ্ধ জীবনের কথা আমার পক্ষে অভাবনীয়। এইতো চমৎকার বেঁচে আছি।

বিয়ে একটা করে ফেলতে পারলে আমি দেখে যেতে পারতাম। কে ক'দিন বাঁচে কে বলতে পারে!

যুবতীদের বিলাসিতার মধ্যে এও একটি। রোজই মরে-যাওয়ার ভয় দেখানো। এরই মধ্যে মরতে যাবেন কেন? বাঁচবেন বাঁচবেন। নারী আর কচ্ছপের আয়ু বিধাতা অত্যন্তই দীর্ঘ করেছেন। কেন যে, সেও এক রহস্য আমার কাছে।

তাপসীর ঠোঁটের কোণে এই রসিক, অসীম-অবকাশের দেওরটির রসিকতায় এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

ঠিক সেই সময়েই প্রমীলাবালা হাঁক ছাড়লেন, ও বউমা! তাপু! কী হইল! পূজা শুরু কর্‌লা, না কর্‌লা না? ঠাকুরঘরে তোমরা কী কাইজ্যা বাধাইলা?

আমি কলা খাইনি।

গলা নামিয়ে, বিবাগী বললেন হাসতে হাসতে।

বলেই, জলদগম্ভীর কণ্ঠে সরস্বতীর শতনাম স্তব করতে লাগলেন সরস্বতীর মূর্তির দিকে চেয়ে।

"সরস্বতী দেবী নামে ত্রিলোক পূজিতা।
বাণীরূপে বিদ্বানের সমাজে অর্চিতা॥
বাকশক্তিদায়িনী মা বাগীশ্বরী নাম।
ভারতী নামেতে পূজা পান দেবদান॥
বেদের জননী তাই বেদ প্রসবিনী।
ব্রহ্মাণী রাখিল নাম বাঙ্ময়রূপিণী ॥
বিশ্ববন্দ্যা নামে ডাকে ব্রহ্মা চতুর্মুখে।
প্রণব-রূপিণী জপে সনক মহাসুখে॥"

দেবী সরস্বতী নয়, সাক্ষাৎ প্রমীলাবালা পুজোর ঘরে এসে ঢুকলেন।

মেমসাহেবের মতো তাঁর গাঁয়ের রঙ। পুরোনো দিনের বিধবা, তাই মাথার চুল ছোটো করে, ছেলেদের মতো করে কাটা। পরনে সাদা থান। তীক্ষ্ণ নাসা, দীঘল চোখ, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না এবং কিঞ্চিৎ অস্থির স্বভাবা এবং রাগী এই নারী। পড়াশুনা, স্কুলের নিচু ক্লাস অবধি কিন্তু যা বুদ্ধি ধরেন তাতে সহজেই জমিদারি চালাতে পারতেন। তবে গ্রামে থাকলে কিছু গ্রাম্যতা দোষে মানুষমাত্র দুষ্ট হনই। প্রমীলাবালাও হয়েছিলেন।

শুধু এই বাবদেই তাপসীর সঙ্গে শাশুড়ির একটু অবনিবনা ছিল। কারণ তাপসী কোনোদিনও গ্রামে থাকেননি। কোনোরকম গ্রাম্যতা-দোষই তাঁর ছিল না।

ঘরে ঢুকেই প্রমীলাবালা বললেন, বউমা, তুমি ওঠো। বিবাগীর সাথে বারান্দায় যাইয়া বস্যো।

সেখানে বইস্যাই তোমাগো আধুনিকতার চর্চা করোগা। বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত নামল এহনও পূজার কিছুমাত্রই হইল না। ওঠো বলতাছি।

তাপসী লজ্জিত হয়ে গড়িমসি করছিলেন। তা লক্ষ করে বিবাগী বললেন, যান।

প্রমীলাবালা রেগে গেলে তাপসীকে "বউমা" বলে সম্বোধন করেন। নইলে, তাপু।

তাপসীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। বাইরে আসতে আসতে ফিশফিশ করে দেবরকে বললেন, দেখলেন তো! আপনার জন্যে বকুনি খেতে হলো।

বিবাগী হেসে বললেন, ভালোই হয়েছে। পুজোটা মা-ই করুন। লক্ষ্মী যদি ঘোঘোটের ক্যানালের জলের মতো তোড়ে কোনোদিন বাড়িতে ঢুকতেন, ঘরে-উঠোন সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন, তাহলেও না হয় কথা ছিল। এ বাড়িতে লক্ষ্মীওতো বাঁধা। সাদামাঠা। ফুলমণি গাই যেমন গোয়ালঘরে। এ লক্ষ্মী ম্যাড়ম্যাড়ে, জোয়ার-ভাঁটা নেই। ইনি মায়ের পুজোতেই সুখী। চকমকিয়া ঝকঝকিয়া লক্ষ্মী যদি আসতো এবং আমি জানতাম, হরেন পালের ঘরের মতো; তাহলে আপনাকেই বলতাম পুজো করতে।

তিনি কে?

হরেন পাল? ও গাইবান্দার ব্যবসায়ী। তেল কল, ময়দা কল, ঠিকাদারি ব্যাবসা, তার নেই কী?

খুব সুখ তার?

সে কথা বলা মুশকিল। লক্ষ্মী আরাম-বিরামের দেবী। সুখের দেবী কি? জানি না। হয়ত লক্ষ্মী যতদিন "সুখদা" ততদিনই ভালো। কিন্তু লক্ষ্মীর বাড়-বাড়ন্ত সুখ দেয় না। অনেকটা মদেরই মতো। অল্প খেলে ওষুধ, বেশি খেলেই মদ।

তাপসী আর বিবাগী এসে সেই ঘরেরই শান বাঁধানো বারান্দায় বসলেন। বিবাগী তার আরাম কেদারাতে। আর তাপসী পাশে রাখা মোড়াতে।

একটু আগেই অন্ধকার হয়ে গেল। তাপসী চেয়ে ছিলেন বাইরে। এখন কৃষ্ণপক্ষ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। চাঁদ উঠবে শেষরাতে। লিচুগাছে আর কাঁঠাল গাছে বীজ আর মুচি এসেছে। হাওয়াতে তার গন্ধ ভাসছে। রঘুসিং প্রতি ঘরে ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়েছে প্রতিদিনেরই মতো, ছাই দিয়ে কাচ ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে, নতুন করে কেরোসিন তেল ভরে। হ্যাজাক আছে চারটে। তবে রোজ জ্বলে না। বার-বাড়ির বসবার ঘরেও ঝাড় লণ্ঠন আছে। ক্রিয়া-কর্মর দিনে জ্বলে। অতিথি এলে বার-বাড়ির বসার ঘরেই থাকার ব্যবস্থা। ওই মস্ত ঘরেরই একপাশে বিবাগীর বন্ধু নিমুদাও থাকেন। তিনি ক'দিনের জন্যে কলকাতায় গেছেন তাঁর দাদার কাছে। ঘরের এক পাশে আড়াল দেওয়া আছে। সে ঘরের সামনেই মস্ত গোলাপ বাগান।

এই সব শখ প্রমীলাবালার সেজপুত্র মাস্টারের। তার ভালো নাম সুমন। এই বাড়ির গোলাপ বাগান দেখতে দূর দূর থেকে লোক আসে। বার-বাড়ির পাশে অনেকখানি ফাঁকা-জমি। তার একপাশে মস্ত বাগান। নানা ফলের গাছ। আনারস বন। বাগান চলে গেছে সেই ঘোঘোটের ক্যানাল অবধি। ফলের বাগানের পাশে মস্ত বড়ো আলু খেত। তার পাশে পুকুর। তারপরে বাঁশঝাড়। তারপর ...

তাপসী সত্যিই জানেন না, আরও কী কী আছে। আজ অবধি কোনোদিনও সময় পাননি পুরোটা পায়ে-হেঁটে ঘোরার।

তাপসী আবারও বললেন, দেখলেন তো। আপনার জন্যে মায়ের কাছে কীরকম বকুনি খেলাম।

মাঝে-মধ্যে বকুনি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। দেখি, জল এসেছে নাকি চোখে? মুখটা ঘোরান তো এদিকে।

তাপসী মুখটি বিপরীতে ঘুরিয়ে নিলেন।

আচ্ছা বউদি, বলতে পারেন, এই যে প্রত্যেক নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘরে প্রতি বৃহস্পতিবারে মহাসমারোহে বাতাসা-কলা-শসা-সন্দেশ-প্রসাদ সহযোগে লক্ষ্মীপুজো হয় তা পয়সা আসার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায় কেন?

তাই?

অবাক গলায় তাপসী বললেন।

তাই নয়তো কী? আপনি মিলিয়ে দেখবেন আমার কথা। যতদিন লক্ষ্মী থাকে না বা লক্ষ্মীর যে-প্রকার থিতু হওয়াতে আমরা বিশ্বাস করি সুখ-স্বাছন্দ্যের কারণে, যতদিন তা না হয়, ঠিক ততদিনই লক্ষ্মীপুজোর ধুম-ধাড়াক্কা থাকে। আর লক্ষ্মী যেই এসে ভালোমতো থিতু হলেন অমনি লক্ষ্মীপুজো বন্ধ হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা মধ্যবিত্ত চরিত্রের বিশেষ এক অকৃতজ্ঞতারই দিক নয় কি?

লক্ষ্মী আসার পর লক্ষ্মীপুজো বন্ধ করে তখন তাহলে কি সরস্বতী পুজো হয়? পয়সার অভাব মিটলেই কি মানুষে দেবী সরস্বতীর পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন? তাপসী শুধোলেন।

ছ্যাঃ! তাহলে আর কথা ছিল কি? লক্ষ্মী যে-বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢোকেন সরস্বতী যদি বা সে-বাড়িতে থেকেও থাকেন কখনও তিনি তৎক্ষণাৎ পেছনের দরজা দিয়ে উধাও হয়ে যান! লক্ষ্মীর পূজারীর বাড়ি সরস্বতীর ঠাঁই হয় না। হাজারে একজনের বাড়িতেও নয়!

তাহলে তারা তখন কোন্ দেবীর পুজো করেন?

কেন? অনেকই পুজো। অনেকেই দুর্গাপুজোও করেন। আমার মতো একাঘরের নিত্যপুজো নয়; লোকের চোখ-ধাঁধানোর পুজো, লক্ষ্মীর কৃপা যে বিলক্ষণ তাঁর বা তাঁদের উপর বর্ষিত হয়েছে তা ষোড়শোপচারে প্রমাণ করার পুজো। জমিদার বাড়ির পুজো দেখেননি বুঝি কখনও? এবারে পুজো অবধি যদি থাকেন তো নিয়ে যাব। মোষ বলি হয়, সার সার পাঁঠা বলি হয়, কাঙালি ভোজন করানো হয়। যতভাবে নিজেকে বড়ো প্রতিপন্ন করে অন্যকে ছোটো করা যায়, তার সব রকম আয়োজনই থাকে। একে পুজো বলে না, আত্মপ্রচার বলে। একধরনের নোংরা জাঁক বলে। পুজো হলো নিভৃত ব্যাপার।

তাপসী বললেন, একথা মানতে পারলাম না। বহু বিনয়ী, শিক্ষিত অথচ বিত্তবানের বাড়িতেও দুর্গাপুজো হয়।

জানি না। হয়তো হয়। এক্সসেপশন প্রুভস দ্যা রুল্।

এবারে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। ঋভুটা তো এখনও এল না। কোনোদিন তো এতো দেরি করে না।

অল্পবয়সী মুসলমান ছেলেরা নানা রঙের চেক-চেক লুঙি পরে রংপুর শহরে দুধ বিক্রি করা সেরে দুধ নিয়ে-যাওয়া কালো চকচকে মাটির হাঁড়িতে হাঁড়িতে পয়সা দিয়ে বাজাতে বাজাতে তাদের চিকন সুরেলা গলায় উত্তর বাংলার গান গাইতে অন্ধকার পথ বেয়ে তাদের দূর গাঁয়ের গন্তব্যে হেঁটে যাচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে, যেদিকে খোঁয়াড়; যেদিকে শংকামারীর শ্মশান। ওই অবশ-করা দেশজ-যৌবনের অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত গান শুনতে শুনতে ভালো লাগাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তাপসী। এই "স্বদেশ" সম্বন্ধে কোনো ধারণা করাই কলকাতায় বসে সম্ভব ছিল না।

বিবাগী বললেন, চিন্তা করবেন না বউদি। ঋভুর সঙ্গে ছানু তো আছে।

চিন্তাটা তো সেই জন্যেই। যা মারকুটে সে। খেলার শেষে কোথায় মারামারি লাগিয়ে বসে আছে দেখুন! ঋভুটা বড়ো নরম প্রকৃতির ছেলে হয়েছে। কেমন মেয়েলি মেয়েলি। বড় হয়ে ও কী যে হবে কে জানে!

ওকে যে দাদা বা আপনার মতোই হতে হবে তার কি মানে আছে? ঋভু হবে পুরোপুরি ওরই মতো। মানুষ হয়ে জন্মানোর এই তো সবচেয়ে বড়ো সুবিধে। আমি বলব; মজা। বলদ-সন্তান বলদই হয় নয় গোরু, পাঁঠার সন্তান পাঁঠা-ছাগল, গাধার সন্তান গাধা। হুবহু একই স্বভাব-চরিত্রের। কিন্তু একজন মানুষের ছেলে একেবারেই অন্য একজন্য মানুষ হয়। অন্তত হওয়া উচিত। একেবারে পুরোপুরিই তার নিজের মতন। সেই কারণেই তো সে মানুষ! প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র।

তাপসী চাপা হাসি হেসে উঠে বললেন, আপনার কথার ধরন-ধারণই আলাদা। আরও একটা কথা কী জানেন? চোখের সামনে তো সব সময়ই আপনার পরের ভাই মাস্টারদার দৃষ্টান্ত দেখছে ঋভু। সেই তো ঋভুর "হিরো"। তীর-ধনুক, ডিনামাইট, রিভলবার। রাতে পুলিশ এল, মাস্টারদার খোঁজে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে একই সঙ্গে, কলকাতার বাসা-বাড়ি; এখানের বাড়ি। এ সবের একটা প্রভাব, এই বয়সে তো হবেই!

তারপর অন্ধকারে একটু চেয়ে থেকে বললেন, আসলে এই বয়সটা তো সাংঘাতিক! হিরো-ওরশিপিং-এর বয়স। এই বয়সের ছেলের পক্ষে এই সব দেখে এতে মেতে ওঠাটাই তো স্বাভাবিক।

ঋভুর এখন যা বয়স সে বয়সটা শুধু দেখারই বয়স। ও কী হবে না হবে তা ঠিক হবে তেরো থেকে সতেরোর মধ্যে। আরও যদি মাস্টারদার মতোই হয়, যদি তদ্দিনেও ভারতবর্ষ স্বাধীন না হয়; তবে তাই-ই হোক না কেন! মাস্টারদা তো আর ভাইপোর সামনে কোনো কু-দৃষ্টান্ত রাখেননি। মাস্টারদার জন্যে তো আপনার এবং আমাদের সকলেরই গর্বিত হওয়ারই কথা বউদি!

কে জানে! আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন। তাই হয়তো হবে। গর্বই হবে। তবে মায়ের মন তো। কী খেয়ে থাকবে? কোথায় থাকবে? কবে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। এই সব ভাবনা তো হয়ই। তারপর দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে, সব উন্মাদনা নিভে গেলে, যে-দেশের জন্যে মাস্টারদা নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে দিলেন সেই দেশ কি ওঁকে, ওঁদের মনে রাখবে? চরিত্রে এখনও কি আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির যোগ্য হয়েছি? স্বাধীনতা, ভালবাসারই মতো, পাওয়া হয়তো সহজ। তাকে যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখাটা ভারি কঠিন। আজকের এতো মানুষের এতো ত্যাগ, এত রক্ত, সব পরে বৃথা বলে প্রতীয়মান না হয়।

জানি না বউদি। তুমি অনেক জানো ও পড়ো, তুমি ভালো বুঝবে। তবে আমার ওই ভাইটিকে আমি যতদূর জানি, তাতে বলব, দেশ ওকে মনে রাখবে কি না, দেশ ওর জন্যে কিছু করবে কি না সে কথা ও নিজে একবারও ভাবে না। যদি ভাবতই তাহলে ওর সঙ্গে মুদির তফাতটা থাকত কোথায়? দেশের জন্যে ওর যা করা কর্তব্য বলে ও মনে করে, ও তাই করছে, করবে। ও তো আমারই ভাই।

বলেই হেসে উঠে বললো, অথচ দেখুন আমাকে। সবচেয়ে ছোটোভাই ভোপালকেও দেখুন। কলকাতায় বড়দার আর আপনার কাছে থেকে পড়াশুনো করে কী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার সে হয় তা আপনিই দেখবেন! দাদা নয়, আমি নই, ভোপাল নয়, আমাদের গুষ্ঠির মুখ যদি কেউ রাখে তো দেখবেন ওই মাস্টারই রাখবে বউদি। ও অশিক্ষিত দেশসেবক নয়। ইকনমিক্সে-এ এম.এ করে তার পরে 'ল' পাশ করেছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে। ও যেমন বলিয়ে-কইয়ে ছিল তাতে কলকাতা হাইকোর্টেও প্র্যাকটিস করলে আজ মস্ত উকিল হতে পারতো। কত উকিলকেই তো দেখি। রংপুর কোর্টের তো কথাই নেই। পেটে ঘুঁষি মারলেও বাক্যি ফোটে না। "ইওর অনার" ছাড়া আর কিছুই জানে না। মাস্টারের মতো আরো কিছু ছেলে দেশে থাকলে এখন দেশের বড়ো ভালো হতো।

তাপসী চুপ করে বাইরের ছমছম অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসেছিলেন।

বিবাগী একটু চুপ করে থেকে বললেন, শরৎবাবুর পথের দাবির ডাক্তারের কথা ভাবুন বউদি। আমাদের মাস্টারকে চোখের সামনে দেখে আমার বার বার সেই ডাক্তারের কথাই মনে হয়। ঋভু যদি মাস্টারকে দেখে প্রভাবিত হয়, তো হোক না। আপনার পতিদেব আমার বড়দাও করেন তো ইংরেজদেরই চাকরি! গোলামি! আর আমি তো করার মতো কিছু করলামই না।

সংসার প্রতিপালনের জন্যে অনেক অনিচ্ছুক মানুষকেই গোলামি করতে হয়। অন্যে যদি সাংসারিক দায়িত্বটা নিতেন তবে আপনার বড়দাও দেশ-স্বাধীন করাদের দলে নাম লেখাতেন। সংসারকে স্বাধীন-করা ও স্বাধীন-রাখার সংগ্রামটাও সংগ্রাম বই কী।

অস্বীকার করি না সে কথা। বিশেষ করে অপগণ্ড আমি তো অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবে আমিও চাই যে, আমাদের ঋভু একজন মানুষের মতো মানুষই হয়ে উঠুক। ততদিন আমরা বেঁচে থাকব কি না জানি না, কিন্তু বেঁচে থাকলে ঘষা-কাচের চশমার মধ্য দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে গর্বে দুচোখ তখন ঝাপসা হয়ে যাবে। ঋভুকে ঋভুর মতোই হয়ে উঠতে দিন। ঋজু কোনো গাছকে বেশি চাপাচাপি করলে তার কাণ্ড ন্যুব্জ হয়ে যায়, সে তার নিজেরই ডালপালায় জড়াজড়ি করে মরে। তাদের যথার্থ প্রসার বা বিকাশ ঘটে না। চিন দেশের মেয়েদের পায়ের সৌন্দর্য লোহার জুতো পরে থাকলে বাড়লেও বা বাড়তে পারে, কিন্তু ভারতীয় ছেলেদের চরিত্রর বিকাশ যে ওই একই প্রক্রিয়াতে হবে তেমন ভাবাটা হয়ত সাংঘাতিক ভুল।

এমন সময়ে বাইরে হঠাৎ বার-বাড়ির দিক থেকে যেন কাদের গলা শোনা গেলো। গলা তুলে কে যেন বললো, "ছাইন্যা কাকা, আমি এহেন বাড়ি যামু ক্যাম্‌নে?"

ছাইন্যা বললো, এক মিনিট দাঁড়া ছ্যামড়া। তরে আমি বাড়ি পৌঁছাইয়া তবেই ফিরুম। চিন্তার কোনো কারণ নাই তার। সাইকেলটা ধর দেহি এক সেকেন্ড।

কান খাড়া করে শুনলেন বিবাগী।

মনে হলো, ঋভুর বন্ধু পুঁটুর গলা। অন্য বন্ধু বুদুসেরও হতে পারে।

পুঁটু উঠোনে ঢুকেই চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললো, মাসিমা, ঋভুরে চাক্কু মারছে! রক্ত পড়তাছে খুব।

এই কথাতে বিবাগী আর তাপসী দুজনেই আঁতকে উঠলেন। তাপসীকে নিরস্ত করে বিবাগী আগে দৌড়ে গেলেন বার-বাড়ির দিকে। প্রমীলাবালা ততক্ষণে পুজো ছেড়ে বেরিয়ে এসে বারান্দার থাম জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছেন। গোয়াল ঘর থেকে কালি গোরু হাম্বা-আ-আ করে ডেকে উঠলো। যেন কোনো অঘটন ঘটেছে জানতে পেরেই। কালুয়া কুকুর দৃপ্ত ভঙ্গিমায় অদৃশ্য শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে ছুটে গেল বিবাগীর পায়ে পায়ে, নিজের পায়ে খচর খচর শব্দ তুলে, ততক্ষণে ওরা সকলেই উঠোনের ভিতরে চলে এসেছে। ছাইন্যার কান্ধে ঋভু। রক্তে ঋভুর তো বটেই, ছ্যাইনার শার্ট-প্যান্টও ভিজে গেছে।

প্রমীলাবালা বললেন, কে মারছে রে আমার ঋভুরে? পুলিশে?

না। মুনাব্বরের পোলায়, আমাগো মুনসের।

ক্যান? মারলো ক্যান ঋভুরে?

ঋভু অরে বার বার কাটাইয়া পাঁচখান গোল দিছিল তাগো টিমরে। হেই রাগে।

ছানু বলল।

তবে কাল মুনসেররে দেইখ্যা লমুআনে। কুচিকুচি কইর‍্যা কাইট্টা অরে ক্যানালের পারের কচুবনে ফ্যালাইয়া থুমু। আজ দলে বহুতই ভারী ছিল সে। তাই প্রাণ লইয়া পলাইয়া আইছি কোনোক্রমে।

প্রচণ্ড উত্তেজিত পুঁটু বলল।

প্রমীলাবালা দৌড়ে গিয়ে ঋভুকে নিলেন ছানুর কোল থেকে। ঋভুর রক্তে তাঁর পরনের সাদা থানে এক এক করে পদ্মফুল ফুটে উঠতে লাগল।

এলিয়ে আছে ঋভু। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। তবে প্রাণটা আছে। প্রমীলা ঝুঁকে পড়ে বুকে কান রাখলেন।

বিবাগী সাইকেল বের [illegible] [illegible]লেন, আমি আস[illegible] [illegible] এখুনি ভূপতিদাদাকে নিয়ে।

কারে?

ডাক্তারদাদারে।

ডবল-ঘোড়া [illegible] যেন উইড়্যা আইস্যে ভূপতি। [illegible] কইস তার বন্ধু হৃষি এখানে নাই, তার ছাওয়ালের বড়ই বিপদ [illegible]
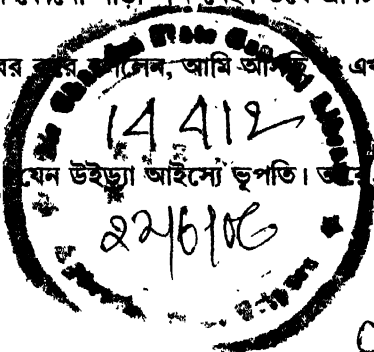
প্রমীলা ঋভুকে নিয়ে ঘরে গেলেন।

তাপসীর মস্তিষ্ক ভারশূন্য হয়ে আসছিল। এমন কখনও হয়নি আগে তাঁর পঁচিশ বছরের জীবনে। সমস্ত পৃথিবী পুরোপুরিই অর্থহীন হয়ে যাচ্ছিলো তাঁর কাছে।

তাপসী যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, শোনো ছানু। বদলা-টদলা নেওয়া চলবে না তোমার। তোমরা কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতে চাও? কী থেকে কী হতে পারে তার ধারণা তোমার আছে? ব্যাপারটা শুধু ঋভুর আর মুনসেরেরই। দুজনের মধ্যের ব্যাপার পুরোপুরিই। ব্যাপারটাকে তাই থাকতে দাও।

একটু থেমে, বড়ো একটি দম নিয়ে, যে ঘরে ঋভুকে প্রমীলা নিয়ে গেছেন সেই বড়ো ঘরের দিকে একবার চেয়ে তাপসী গলা নামিয়ে ছানুকে বললেন, শোনো ছানু, গায়ের জোরই একমাত্র জোর নয়!

ছানু বলল, আপনে ভুল কইতাছেন বউদি। কিছু কিছু মানুষে গায়ের জোররেই একমাত্র জোর বইল্যা চিরদিনই জাইন্যা আইছে। তাই তাগো শিক্ষা ওই গায়ের জোর দিয়াই দেওন লাগব। গায়ের জোরের ভাষা ছাড়া মুনসের অন্য কোনো ভাষাই বোঝে না। ইয়াকুব, জাহাঙ্গির, হরেন আর পটল-পিস্‌সা, যিনি রেফারি আছিলেন মাচের, হক্কলে মিল্যাই আটকাইতে গেছিল মুনসেররে তবু তারই মধ্যে মুনসের চাক্কু মাইর‍্যা দিলো ঋভুরে।

তোমাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি। এ নিয়ে কাল যেন একটি কথাও না হয়! আমি পুলিশ সাহেবকে চিঠি লিখে দেব কিন্তু তাহলে।

তবে তো ভালোই হয়। মুনসেররে এখনই অ্যারেস্ট কইর‍্যা লইয়া আনবোনে পুলিশে। ছানু বললো।

না না। পুলিশ সাহেবকে সে কথা আমি লিখবই না। ঋভুকে যে মুনসের ছোরা মেরেছে সে কথা জানাবও না পর্যন্ত।

অদ্ভুত কথা কয়েন দেহি আপনে বউদি। পোলাডারে চাক্কু মাইর‍্যা দিল ফুটবল খেলার মাঠে, এখন বাঁচে কী মরে তারও ঠিক নাই আর...আর আপনে দেহি কেবলি বিটিছাওয়া মহাত্মা গান্ধির মতো জ্ঞান দিয়া যাইতাছেন। সন্দেহ হয় ঋভু আপনারই পোলা কি না!

ছানু বলল উষ্মার সঙ্গে।

তাপসী ওই সময়েও হেসে ফেললেন। বললেন, প্রতিবাদের প্রতিশোধের অনেকই রকম হয়। যাও ছানু। এই শেষ কথা। এই নিয়ে যদি কাল কিছুমাত্র গোলমাল করো তবে পুলিশ যাতে তোমাকেই অ্যারেস্ট করে তা আমি দেখবো।

ঘরের ভিতর থেকে প্রমীলা অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বললেন, বউমা, তোমার বক্তৃতাডা থামাইয়া দয়া কইর‍্যা যদি একবার আসো তো কৃতার্থ হই। মায়ের বরাত কইর‍্যা আইছিল বটে পোলাডায়। হঃ!

এতোক্ষণ তাপসী যেন কোনো ঘোরের মধ্যেই ছিলেন। তিনি নন, যেন অন্য কেউই তাঁর ভেতর থেকে কথা বলছিলেন। এই সময় মাস্টারদা এখানে থাকলে খুবই ভালো হতো। ভোপাল থাকলে কিন্তু ছানুর তালেই তাল দিত। সেও আরেক মারকুট্টে। মস্তিষ্কের আগে আগে হাত চলে। আর ঋভুর বাবা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে থানা-পুলিশ করতেন। কিন্তু মাস্টার থাকলে কোনো চিন্তাই ছিল না। কিন্তু সে যে কখন কোথায় থাকে সেই জানে।

এখন, ঋভু। একমাত্র ভাবনা ঋভু। তাপসীর মস্তিষ্ক থেকে আর সব কিছু উবে গেল সেই মুহূর্ত থেকে। দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে সিঁড়িগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে ঘরে পৌঁছেই তাপসী দেখলেন ঋভুর শার্ট-প্যান্ট খুলিয়ে ফেলেছেন প্রমীলাবালা। রঘু সিংকে পাঠিয়েছেন কচুপাতা কেটে আনতে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা। মান-কচুর পাতা গ্রামে-গঞ্জে অয়েলক্লথের কাজ দেয়। ঋভুর ডান দিকের বুকে যেখানে লাল টুকটুকে বোঁটাটি তার একটু নীচেই ক্ষতটা। লণ্ঠনের আলোতে কালচে কালচে দেখাচ্ছে। আর তখনও রক্ত বেরোচ্ছে সমানে তা থেকে। সাহেবের মতো ফরসা ছেলে তার টাটকা রক্তে একেবারে নেয়ে উঠেছে। দু-চোখ বন্ধ। ঠোঁট দুটো নীল। তাঁর নগ্ন ছেলে শুয়ে আছে লণ্ঠনের আলোতে দেবশিশুর মতো। কিশোর ঋভু আজকাল নিজেই চান করে, জামাকাপড় পরে। তাপসী সময়

যে পান না তা নয়, ঋভুই আপত্তি করে। অনেকদিন পরে তিনি নিজের ভিন্ন-লিঙ্গের সন্তানকে নগ্নাবস্থায় দেখে এক অন্যধরনের ভালোলাগায় চমকে উঠলেন।

পরক্ষণেই বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না, দৃঢ়চিত্ত তাপসী অন্য এক তাপসী হয়ে প্রমীলাবালার কাঁধের উপরে ভেঙে পড়ে হঠাৎ ফুপিয়ে কেঁদে উঠলেন, কী হবে মা! আমার কী হবে!

প্রমীলাবালা পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসেছিলেন। যেন আত্মবিশ্বাসের পর্বত। অবাক বিস্ময়ে তাপসী চেয়েছিলেন তাঁর দিকে। ক্ষতটি স্পিরিট দিয়ে মুছে তাতে আয়োডিন লাগাচ্ছিলেন প্রমীলাবালা। হাতের পাশে শ্বেত-পাথরের খল-নোড়া। আর কমলালেবুর মধুর শিশি। মকরধ্বজ মেড়ে খাওয়াবেন নাতিকে, যদি নাতির ঠোঁট দিয়ে তা আদৌ গলে।

এত জ্ঞান-বুদ্ধি-সহ্য শক্তির তাপসী সেই মুহূর্তে একজন নিছক পঁচিশ বছরের অনভিজ্ঞ কিংকর্তব্যবিমূঢ়া শহুরে যুবতী হয়ে গিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে আবার বললেন, আমার কী হবে মা!

প্রমীলাবালা তাপসীর পিঠে হাত রেখে, ভিজে গালে হাত বুলিয়ে বললেন, ছাওয়াল ধরছিলা যে গর্ভে তাপু। এতো আর মাইয়া নয়! ঘাম, রক্ত এই সবই তো তাগো জীবন। আমার মাস্টাররে দ্যাখো না। তার মৃতদেহ যেদিন লোকে বাড়িতে বইয়া আনবো সেদিন আমি কান্দনের অবসরটুকুও পাইমু না রে মা! তোমার ছাওয়াল বাঁইচ্যা উঠবোনে। আমি তোমারে কইতাছি তাপু। কাঁইন্দো না। ছাওয়ালের অমঙ্গল হইব কাঁন্দনে। ঋভুর বিশেষ কিছুই হয় নাই। হইলে, আমি ঠিকই বুঝতে পারতাম। কাঁইন্দো না, ছাওয়ালের মাথার কাছে বইস্যা এট্টু মাথায় হাত বুলাও দেহি। আমি যাইয়া রঙ্গলালবাবুর বাড়ির থিক্যা একটু কুকুরশোঁকা পাতা লইয়া আসি। ঋভুর বুকে বাঁইধা দিমু। যদি পাই। আরে ও রঘু, তুই আবার গেলি কই? তুই বউদিরে এট্টু দেখিস।

অন্ধকালে যাবেন মা? টর্চ নিয়ে যান।

আতঙ্কিত গলাতে তাপসী বললেন।

বিবগীতো গেছেন ভূপতিডাক্তারকে ডাকতে।

স্বগতোক্তির মতো তাপসী বললেন।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। টর্চ লইয়াই যামু। যামু আর আমু। পাশের বাড়িই তো! না যাইয়া উপায় কী? কও? ভূপতি আইতে আইতে আধঘন্টা লাগবই কম কইর‍্যা।

রঘুকে পাঠালে হতো না মা?

তাইলে আর দুঃখড়া ছিল কি?

রঘুর বাড়ি ছাপরা জেলায়। সে ফুলমণি আর কালি গাইয়ের দেখাশোনা করে, খেতের কাজেও সাহায্য করে। বড়ো বড়ো গোঁফ তার। অবনত। সন্ধের পরে ভাঙ খায়। তখন চোখ দুটো লাল টকটকে দেখায়। অন্যদিন তাকে দেখে ভয় করে তাপসীর। কিন্তু আজকে ভয় করছে না।

রঘু কাঁপতে কাঁপতে বলল, শালেকো পহচানেসে উস্‌কো খোপরি দো-টুকরো বনা দেতা থা। ঋভু বাবাকো কোই চাক্কু মারনে শক্‌তা? কামিনা!

তাপসী বললেন, রঘু, এক্ষুণি ভূপতি ডাক্তার আসবেন। তোমার বড়োবাবুর বন্ধু। তুমি একটা হ্যাজাক জ্বালানোর বন্দোবস্ত করো। কাঁটা ছেঁড়া করতে হতে পারে। পুলিশও আসবে হয়তো।

পুলিশ? পুলিশ কাহে বা?

হয়তো আসবে! তুমি যাও।

তাপসী, মা হিসেবে বড়োই চাপা। হয়তো স্ত্রী হিসেবেও। তাই প্রায়ই তাঁকে অন্যে ভুল বোঝে। হৃষি যখনই বলেছেন, আমাকে একটা চুমু খাও, তখনই চুঃ শব্দ করে হৃষির গালে আলতো করে চুমু খেয়েছেন উনি। মুখে বলেছেন, আমি পারি না।

অতৃপ্ত, ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থেকেছেন হৃষি।

সব মেয়ের প্রেমের প্রকাশ তো এক রকমের নয়। সব মায়ের অপত্যস্নেহের প্রকাশও এক রকমের নয়। তাপসীর এমন সুন্দর চেহারার সুন্দর স্বভাবের ছেলেকে নিয়েও, কোনোদিন আদিখ্যেতা করেননি

তাপসী। ঘন ঘন চুমু খাননি। কাছে ডাকেননি। তাঁর চরিত্রে বাহুল্য ছিল না। সেটা ভালোই হোক, কী মন্দ। আজ কিন্তু এই মুহূর্তে ফাঁক ঘরে জ্ঞানহীন, রক্তাপ্লুত ছেলের কপালের উপর নিজের দুই ঠোঁট রেখে ছেলেকে খুব করে আদর করে দিলেন তাপসী। মায়ের চোখের জল মিশে গেল ঋভুর বুকের রক্তে। কে জানে! ভালো হলো না খারাপ হলো। পরক্ষণেই লজ্জা পেয়ে মুখ তুলে নিলেন ছেলের কপাল থেকে। ভাবলেন, যদি হঠাৎ জেগে যায় ঋভু? তাহলে ঋভুর চেয়েও অনেক বেশি লজ্জা পাবেন তিনি নিজে। ঋভু তার মাকে কাঁদতে দেখেনি কখনও।

ঠিক সেই সময়েই বাইরের ঝোপ-ঝাড় থেকে তক্কক ডেকে উঠল টাক-টাক-টাক করে। দুটো পেঁচা, লিচুগাছটার কাছে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে ঝগড়া করতে লাগলো। লক্ষ্মীপেঁচা নয়, হুতোম পেঁচা।

ঘোঘোটের ক্যানালের পাশ থেকে শেয়াল ডাকছিল হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া করে কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকারে। তাপসী ভাবছিলেন, ছেলেকে সুস্থ করে তুলেই একেবারে কলকাতায় পালাবেন। এই রকম জায়গাতে তাঁর কোনোদিনও থাকা অভ্যেস নেই। এখান থেকে কলকাতায় পালাতে পারলে বাঁচেন। আর ভালো লাগে না। এই গ্রাম, এই রক্তাক্ততা। অয়েল-ক্লথের বদলে মানকচুর পাতা! কিন্তু, এখন ছেলে ভালো তো হোক আগে।

প্রমীলাবালা গেছেন তো গেছেন। কুকুরশোঁকা পাতা। মানকচুর পাতা। এ কোন গণ্ডগ্রামে এসে পড়লেন তাপসী। গিরিডির হেরম্ব বাবুদের বাড়ি, নীলরতন সরকারের বাড়ি, ইউ রায়দের বাড়ি, উশ্রী নদী, খাণ্ডলি পাহাড়, সিরসিয়া ঝিলের কথা মনে পড়ে যায় তাপসীর। ঘন শালবন। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

মনটা ভারি খারাপ হয়ে যায় তাপসীর রক্তাক্ত ঋভুর মাথার কাছে বসে।

একবার ভয় হলো খুব। রক্তের গন্ধ পেয়ে যদি চ্যাগার পেরিয়ে শেয়ালরা চলে আসে! তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজায় হুড়কো দিলেন তাপসী। শেয়ালগুলো যেন বাড়ির একেবারে পেছনেই চলে এসেছে। মনে হলো যেন খচ্‌খচ্‌ শব্দ পেলেন। তারা এবারে খুব জোরে জোরে ডেকে উঠল খুবই কাছ থেকে, হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া!

লণ্ঠনের আলোটা ঘরের দেওয়ালে নানারকম ভুতুড়ে ছায়া তৈরি করেছিল। সেদিকে চেয়ে, একা বাড়িতে, লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত একটা ঘরে বসে রইলেন নিথর সন্তানের মুখে স্থির চোখে চেয়ে পরম সুন্দরী তাপসী; অনভিজ্ঞা, শহুরে পঁচিশ বছর-বয়সী এক বিস্রস্তা নারী।

বাইরে একটা দাঁড়কাক ডাকছিল, খ্‌-খ্‌ ক্কা করে।

এখন বেলা দশটা। ঋভু শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল। মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে ওর। শরীরের কষ্টর চেয়ে মনের কষ্টটাই অনেক বেশি।

মুনসেরকে এখানে আসার পর থেকেই জানে ঋভু। খোঁয়াড়ের পরেই ওদের বাড়ি। ক্যানালের পাশের মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলে। ঋভু সাধারণত পুটু আর বুদুসের সঙ্গেই খেলে বা দৌড়োয়। ফুটবল যে রোজ খেলে এমনও নয়। বাতাবি লেবু যখন হয় বর্ষায় তখন বাতাবি লেবু (এখানে বলে জাম্বুরা) দিয়ে বাড়ির সামনে নিজেদের মাঠেই খেলে ওরা।

ঋভুর বড়োকাকু (বিবাগী) বলেন, খেলা-ধুলোটা কিছু নয়, খেলাধুলোর মধ্যে দিয়ে যে খেলোয়াড়ি-মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে সেইটেই আসল। কে কেমন খেলে সেটা বড় কথা নয়, কে কত বড় স্পোর্টসম্যান সেইটেই বড় কথা।

অ্যাতো সব কথা ঋভু যে ঠিকঠাক বোঝে এমনও নয়। কিছু মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। তবে বড়দের ভালো-ভালো কথা শুনতে ওর ভালো লাগে।

রংপুরে এসে এখানের মানুষদের সরল খোলামেলা ব্যবহার, হাসা-হাসি, বড় ভালো লেগেছিল ঋভুর। তাছাড়া, এই উন্মুক্ত উদার আদিগন্ত প্রকৃতি। পুকুর, মুথা ঘাস, হরিসভার পুকুরপাড়ে মধুফুলের ঝাড়, ঘন বেতবন; কুঁচফলের গাছ। লাল-কালো ছোটো ছোটো কুঁচফল, স্যাকরারা সোনা ওজন করার সময়ে পেতলের পাতলা নিক্তিতে যা রাখে। লাল-টুকটুক এক নম্বরি ফুটবলের মতো মাকাল ফল, হলুদ-কালো বসন্তবৌরি আর নীলকণ্ঠ পাখি, বিচিত্রবর্ণ ঢোঁড়া সাপ, বাদুড়, চামচিকে, হাঁস, গোরু, ছাগল, বর্ষাকালে রাতভর টিনের চালের উপরে টাপুর-টুপুব বৃষ্টি। ব্যাঙের ডাক, বামধনু, শামুকের চলা; কত কীই যে আবিষ্কার করেছে এখানে এসে কলকাতার সেই ঋভু, তা ঋভুই জানে। পুঁটুর মতো, বুদুসের মতো বন্ধু; বুলবুলি। বুলবুলির ঠাকৃমা বুড়ি। মুদির দোকানের মাটিরঘরের গুড় আর লেড়ো বিস্কুট, শুকনো লংকা আর কেরোসিন আর সর্ষের তেলের মিশ্র গন্ধ, এসব একেবারে আনকারা অভিজ্ঞতা ঋভুর জীবনে। পাঠশালা, পণ্ডিতমশাই, জেলা-স্কুল, ডিমলার রাজবাড়ির ঘোড়াশালের হ্রেষা রব, ঘোড়ার খুরের টগবগানি আওয়াজ, ডিমলার রাজকুমারীর ফর্সা লাল-টুকটুকে পা দুটি—এক ঝলকের জন্যে দেখা—এসব সে কলকাতায় কোথায় পেত?

কিন্তু বড়ো ব্যথা।

মুনসের ঋভুর বুকের যেখানটিতে চাকু চালিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেখানটিতেই মুনসেবের জন্যে অনেকই ভালবাসা ছিল ঋভুর। কেন যে ও অমন করল! তা, মনুসেরই জানে।

ভূপতিকাকু ঋভুর বাবার ছেলেবেলাব বন্ধু। ডাক্তাব। দুজনে কৈলাসরঞ্জন স্কুল আর রংপুব কারমাইকেল কলেজে একসঙ্গেই পডাশুনো কবেছিলেন। তারপব দুজনেই কলকাতায় যান। ঋভুবা বাবা জি ডি এ হন। ভূপতিকাকু ডাক্তার। ভূপতিকাকু, সেই রাতেই ঋভুর জ্ঞান ফেবার পব বলেছিলেন ঠাকুমাকে, নাতি সম্বন্ধে একটু খোঁজখবব তো রাখবেন মাসিমা। হৃষি জানতে পেরে বলবেটা কী? এ তো আমাদের সকলের পক্ষেই লজ্জার কারণ হবে।

প্রমীলাবালা বললেন, সে সব আমাদের কইও না। নাতি ফুটবল খেলার নাম কইর‍্যা চাকু-মারামাবি করতাছে তা আমি জানুম ক্যামনে? বিবাগীটাও হইছে ত্যামনি। খাটে শুইয়া কেবলি ঠ্যাং নাচায়। এমন পুরুষ মানুষ বাড়িতে থাকা-না থাকা সমান। খোঁজ-খবরতো তারই রাখনের কথা।

তারপব বললেন, তুমিও কি খোঁজ-খবর রাখছ্যা তাপু? বৌমা?

ঋভুর মা, ঘোমটা টেনে বসেছিলেন। বললেন, আমি এখানের কীই বা জানি মা!

বড়োকাকু বলে উঠেছিলেন, বউদি জানবে কী করে? বউদি কি বাড়ির বাইবে যান? দোষ হয়েছে আমারই। বুঝলেন, ভূপতিদা।

তাতো হয়েছেই। দাদা এখানে থাকে না। তোমরা তো ছেলেটাকে একটু চোখে চোখে রাখবে। একটুর জন্যে লাংসটা বেঁচে গেছে। কী কাণ্ড হতে পারতো বলো তো? ইটা কী? ঋভু লক্ষ কবল, ভূপতিকাকুর "ইটা কী?" বিরক্ত হলেই ভূপতিকাকু বলতেন "ইটা কী?"

ঋভুর বড়োকাকু (বিবাগী) বলেছিলেন, তা ঠিক।

নানারকম কড়া কড়া ওষুধের গন্ধের মধ্যে শুয়ে ঋভু ভাবছিল, আর কি ও অমন করে সবাইকে ভালবাসতে পারবে? আবারও কোনো বন্ধু যদি এমন করেই তাকে মাবে? তার বুকের ক্ষতটার চেয়ে অনেকই বেশি ক্ষতি হয়ে গেল সরল ঋভুর সহজ বিশ্বাসী মনের। মানুষের প্রতি, সমবয়সীদের প্রতি, খেলার সাথীদের প্রতি তার জীবনে সেই প্রথম সন্দেহ এবং এক মিশ্রবোধের সঞ্চার হলো। ঋভু জানে, বাকি জীবনে ওর সব ভালোবাসাতে, সব বন্ধুত্বে মুনসেরের ছুরিটা বারেবারেই ঝলসে উঠবে। কে যে বন্ধু-মুনসের আর কে যে শত্রু-মুনসের তা চিনতে ও চিরদিনই ভুল করবে। তার বিস্মিত বিপন্নতার সেই শুরু।

ভূপতিকাকা আজও আসবেন বেলা-এগারোটার সময়ে ড্রেসিং করতে। উনি নাকি বলেছিলেন, হাসপাতালে রাখলেই সুবিধা হয়। তাহলে তাঁকে শহরের এই শেষপ্রান্তে বারবার আসতে হয় না। তাহলে ঋভুর যত্ন ও সেবাও অনেক ভালো হতো। ঠাকুমা নাকি এক কথায় সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ছাড়ান দাও তো ভূপতি। হাসপাতালে গ্যালে আর কি বাঁইচ্যা ফ্যারে কেউ? যত্ন নাই কথা।

তাহলে একজন নার্স রেখে দিচ্ছি।

ভূপতিকাকা মিনমিন করে বলেছিলেন।

নার্সের কোন্ কামডা? পোলার মা-ঠাকুমা বাঁইচ্যা থাকতে হাই-হিল জুতা খট্খটাইয়া ফ্যাশানের টুপি-পইর‍্যা নার্স আইস্যা করব কোন্ কম্মোটা?

মাসিমা! ঋভুর তো ম্যালেরিয়া জ্বর বা পেটের অসুখ হয়নি। এমন ক্ষত! ভালো করে পরিচর্যা না করলে, সময়মতো ওষুধপত্র না দিলে, টেম্পারেচার না নিলে ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠতে পারে।

হঃ। তোমাগো সব ব্যাপারই গুরুতর।

তারপর বড়োকাকুই জোর করাতে তবে ঠাকুমা রাজি হয়েছিলেন।

নার্স-এর নাম সুমিতাদি। ঋভুর চেয়ে অনেক বড়। তবে ঋভুর মায়ের চেয়ে বেশ ছোটো। এই আঠারো-উনিশ বছর বয়স হবে। কালোর মধ্যে খুব মিষ্টি মুখ। সুমিতাদি এখন ঋভুর খাটের পাশে একটি চেয়ারে বসে আছেন ঋভুর দিকে পাশ ফিরে। তাঁর মুখটি খোলা দরজার দিকে। উঁচু করে চুল বেঁধে তার উপরে টুপি পরেছেন। ঘাড়ের কাছে কালো মসৃণ উজ্জ্বল চুল কুঁকড়ে শুয়ে আছে। গা দিয়ে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। পাউডারের না সেন্টের তা কে জানে! এই গন্ধটা অচেনা বলেই বেশি ভালো লাগছে ঋভুর। বাইরে মৌটুসী পাখি কিসকিস করে স্বপ্নের বাগানের পাখির মতো নিচু গলায় ডাকছে। কী বলছে ওরা কে জানে!

বড় হলে ঋভু পাখিদের ভাষা শিখবে।

সুমিতাদির ডান হাতটা ঋভুব বাঁ হাতের তালুতে। সুমিতাদির হাতের আঙুলগুলো কাঠি কাঠি। মনে হয় লোহার তার পাকিয়ে তৈরি। কিন্তু হলে কী হয়! মেয়েদের হাতের রকমই আলাদা। মেয়েদের সবকিছুই আলাদা। অতি শিশুকাল থেকেই মেয়েদে প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছে ঋভু। নারীমাত্রও বোধ করেছে ওর প্রতি। ও যে পুরুষ হিসেবে একজন বিশেষ কেউ এ কথা ঋভু এখনই বুঝেছে। এই কথা উপলব্ধি করে ও মনে মনে এক ধরনের চাপা-গর্বও উপলব্ধি করে।

গায়ে জ্বর, বুকে ব্যথা সত্ত্বেও এই সকাল, চৈতি রোদ, উঠোনের ধুলোয় চড়াইপাখিদের উড়ুৎ-ফুড়ুৎ খেলা, ঢেঁকিঘরে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার একেবারে সমান ব্যবধানের শব্দ আর ফুলমণি গোরুর হাম্বা-আ-আ রবে ঋভু খুশি রয়েছে। কালিগাইটা একটু শান্তস্বভাবা। তার গলার স্বর বড়ো একটা শোনাই যায় না। দূরে কোনো বাড়ির পুকুরঘাটে কোনো বউ যেন ধান ছড়াতে ছড়াতে হাঁসেদের ডাক দিচ্ছে চই-চই-চই-চই। চই-ই-ই-ই।... হাঁসেদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে না তবে কল্পনায়

দেখতে পাচ্ছে ঋভু যে, খয়েরি, কালো, বাদামি, সাদা হাঁসেরা হেলতে দুলতে লেজ নাচাতে নাচাতে ছুটে আসছে ভেজা শরীরে পুকুর থেকে উঠে।

সেই বউ কোন্ রঙের শাড়ি পরে আছে কে জানে!

হঠাৎই ভাবনার ভেলায় ভেসে-যাওয়া ঋভুকে চমকে দিয়ে সুমিতাদি বললেন, ঘুমিয়ে পড়ো ঋভু।

মা কোথায় গেলেন?

ঋভু শুধোল।

মা চান করতে গেছেন।

ঠাকুমা?

ঠাকুমা রান্নাঘরে। তুমি সুজির খিচুড়ি খেতে ভালোবাসো তাই তোমার জন্যে সুজির খিচুড়ি রাঁধতে গেছেন।

ও।

কই ঘুমোলে না?

ঘুম আসছে না।

চোখ বন্ধ করে ফ্যালো।

বলেই সুমিতাদি তার কাঠি কাঠি আঙুলগুলো দিয়ে ঋভুর দু' চোখের পাতা বুজিয়ে দিলেন ঝুঁকে পড়ে। সুমিতাদির বুকের ছোঁয়া লাগল ঋভুর কানের কাছে। গা সিরসির করে উঠল। এ এক নতুন অনুভূতি। তার নিজের মা-ঠাকুমা ছাড়াও আর কোনো নারীর বুকের পরশ পায়নি এর আগে কখনওই। এ পরশ অন্যরকম। আর সেই অচেনা গন্ধটা।

এবারে ঘুমিয়ে পড়বে ঋভু।

সুমিতাদি বললেন, ডাক্তার বিধান রায়ের নাম শুনেছ? তুমি তো কলকাতাতেই থাকো।

হুঁ।

ঋভু বলল।

উনি বলেন, চোখ বন্ধ করে থাকলেও আদ্ধেক ঘুমের ফল হয়।

ঋভু কিছু বলল না মুখে। কিন্তু ঋভু জানে যে, তার বেলা ডাক্তার বিধান রায়ের কথা খাটবে না। চোখ বন্ধ করলেই ঋভুর চোখের সামনে দিয়ে কত যে রঙ, কত যে মুখ, কত যে সুখ, কত যে দুঃখ মিছিল করে যেতে থাকে তা বলার নয়। তার আকাশময় ঘুড়ি ওড়ে। চাঁদিয়াল, পেটকাট্টি। লক্কা আর গেরোবাজ পায়রারা নীলাকাশের পটভূমিতে ডিগবাজি খেতে খেতে দূরে চলে যায়। ধনেখালি শান্তিপুরী টাটকা নতুন-গন্ধে ডুরে-শাড়ি-পরা মেয়েরা, কেউ বা ড্রেস দিয়ে; সামনে কোঁচা গুঁজে, কেউ বা পিসিমাদের মতো করে শাড়ি পরে নাচতে নাচতে চলে যায়। প্রজাপতি ওড়ে। বুড়ি ভিখারিনী গান গেয়ে যায় লাঠি হাতে। মধ্যরাতের পোড়াদহ রেলস্টেশনে নিভু-নিভু-আলো গাড়ি-ভরা ঘুমের নিঝুম ইন্টারক্লাস কামরার জানলায় একা জেগে বসে-থাকা ঋভুর সামনের প্লাটফর্মের উপরে "পাগলা মনা, পাগলা মনা, পাগলা মনারে" গান গেয়ে-যাওয়া অন্ধ গায়কের মুখখানি ভেসে ওঠে। যে-মুখ বসন্তের দাগে কুৎসিত অথচ সারল্য আর পবিত্রতায় পরম সুন্দর।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকা; ঋভুর জন্যে নয়। কিন্তু এতো কথা তো সুমিতাদিকে বলা যায় না।

ঘুমিয়েছ?

উঁ?

দেখেছ! মোটে কথা শোনে না তো ছেলে। ঘমোও। ঘুমিয়ে নাও একটু।

ভুপতিকাকা আসবেন তো?

হ্যাঁ। তা তো আসবেনই। ডাক্তার মৈত্র এসে নিজে ড্রেস করে দিয়ে যাবেন। তুমি কি জানো যে তোমাকে চাকু মেরেছিল সেই মুনসেরকে পুলিশে ধরেছে।

তাই?

বলেই, বিছানাতে ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল ঋভু।

করছ কি তুমি ঋভু। এমন করলে স্টিচ ছিঁড়ে যাবে যে।

তারপর? কী হয়েছে মুনসেরের? মুনসেরকে কি মেরেছে পুলিশ?

ধরেছিল। কিন্তু তোমার মায়ের চিঠি নিয়ে তোমার কাকা থানায় যাওয়াতে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। সে তোমাকে দেখতে আসবে আজ।

দেখতে আসবে?

হ্যাঁ।

কখন?

তা তো জানি না। হয়তো বিকেলে।

ঋভু খুবই বিপদে পড়ে গেল। ওর নিজের জন্যে নয়। মুনসেরের জন্যে। বেচারা কোন্ মুখে এসে দাঁড়াবে তার কাছে? পর পর পাঁচটা গোল খেয়ে অপমানিতও তো কম বোধ করেনি সে! তাছাড়া ঠাকুমা? ঠাকুমা যদি অপমান করে তাড়িয়ে দেন ওকে? ঈসস্। কী হবে তোর? মায়ের সঙ্গে ঠাকুমার ঝগড়া লেগে যাবে তাহলে। বড়ই অস্বস্তি হতে লাগল ঋভুর।

ঋভু বলল, মুনসের আসবে আপনি ঠিক জানেন?

জানি।

কার সঙ্গে আসবে?

বোধহয় তোমার কাকাই নিয়ে আসবেন।

বড়োকাকু?

তোমার বড়োকাকার নাম কি বিবাগী? ভারি মজার নাম তো!

কেন? মজার কেন?

না, এমনিই বললাম।

কিছুক্ষণ পরই ভূপতিকাকার ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। বাজারে বা পথে এমনি যে সব ঘোড়া-গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়, তাপসী যাদের বলেন ছ্যাকরা গাড়ি; তেমন গাড়ি নয়। এ গাড়ির নাম ল্যান্ডো না ব্রুহাম কী যেন! কী যেন! ভূপতিকাকুর নিজের গাড়ি। একটা সাদা ঘোড়া আরেকটা কালো ঘোড়া টেনে আনে সে গাড়ি। সহিস না কোচোয়ান বসে থাকে উপরে! খাকি পোশাক পরে আর্দালি একজন বসে থাকে, অন্যজন লাফিয়ে নেমে গাড়ির দরজা খুলে দেয়। ভূপতিকাকুর পেট-মোটা কালো চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে পেছেন পেছন আসে।

ভূপতিকাকুর গায়ের রঙ হলদিবাড়ির পাকা কাঁঠালের কোয়ার মতো। বেঁটে-খাটো মানুষটি। কথা কম বলেন। চোখ দুটি ভারি উজ্জ্বল। দুষ্টুমি-ভরা চোখে ভূপতিকাকু বললেন, কী রে ব্যাটা? ব্যথা কেমন?

ঋভু কী একটা বলল যেন।

এইসব প্রশ্ন আর জবাবের কোনো মানে নেই। ঋভুর অন্তত তাই মনে হয়। ডাক্তারদের যা করার করবেনই। ইনজেকশনের ছুঁচ ফোটাবার সময়ে অন্যমনস্ক করে দেবার জন্যে এটা-সেটা ওঁরা বলবেনই কিন্তু রোগীর মন যে ছুঁচটা কখন প্যাঁট করে ঢুকবে তার আতঙ্কেই সবসময়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকে, সেটা বোধহয় ডাক্তারেরা জানেন না।

ভূপতিকাকু টেম্পারেচার চার্ট দেখে, নিজে হাতে নতুন করে ঋভুর ক্ষত ড্রেস করলেন। বুকের গর্ত থেকে রক্তভেজা গজ বের করার সময় বড়ো লাগলো ঋভুর। যন্ত্রণাতে মুখ বিকৃত হয়ে গেল। ভূপতিকাকু বললেন, লাগে নাকি রে?

তারপরেই জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, তা তো একটু লাগবেই।

রাগে ঋভুর গা জ্বলে যেতে লাগল। কিন্তু বাবার বন্ধু! মুখে হাসি এনে চেয়ে রইল ভূপতিকাকুর মুখে।

একেবারেই ঘুমোচ্ছে না পেশেন্ট স্যার।

ঘুমোচ্ছে না?

না স্যার।
তুমি গান জানো?
স্যার?
সুমিতাদি ঘাবড়ে গিয়ে বললেন।
তুমি কি গান জানো?
কী গান?
আঃ। যে কোনো গান।
না স্যার।
মিথ্যা কথা। একটাও গান জানে না এমন কোন বাঙালি মেয়েই নেই এদেশে। বিয়ের জন্যেও কি শেখোনি। গোটা পাঁচেক?
আমি সত্যিই জানি না স্যার।
তুমি মেয়েই নও।
বলেই, একটি অ্যাম্পুল বের করে আবার সিরিঞ্জ ভরলেন। বললেন, এটা দিয়ে যাচ্ছি। এবারে ঋভু ঘুমোবে।
ও যে খায়নি।
তা না খাক। আধঘণ্টার মধ্যে খাইয়ে দিতে বোলো। ওর মা-ঠাকুমা সব গেল কোথায়?
মা চান করছেন। ঠাকুমা রান্নাঘরে।
ঠিক আছে। ঘুম পাড়াবার ইনজেকশন্ ছিল, দিয়ে দিলাম। কালকে গান গাওয়াবার ইনজেকশন নিয়ে আসব। তোমাকে দেব। তুমি কেমন নার্স হে? তোমাকে কমপ্লিট নার্স হতে হবে। পেশেন্টের উপর টোট্যাল কন্ট্রোল থাকবে নার্সের। বুঝেছ। নার্সিং ইজ আ নোব্ল প্রফেশান। ডাক্তারির চেয়েও বড়ো। কথাটা মনে রাখবে।
আচ্ছা স্যার।
ছাতা!
উঠতে উঠতে ভূপতিকাকা বললেন, তুমি থাকো কোথায়?
আমি নরেশ কম্পাউন্ডারের মেয়ে স্যার।
তাই ক' রে ছেমড়ি। তুই আমাগো নরেশের মাইয়া। তা'হলে তো আমারও মাইয়্যা! সুমিতাদি ভূপতিবাবুকে প্রণাম করলেন।
ছ্যা। ছ্যা। কী রকম নার্স রে তুই! করতাছিস স্ট্যাবিং-পেশেন্টের নার্সিং আর আমার জুতায় হাত দিলি! যা যা! এখুনি লাইজলের জলে হাত ভালো কইর‍্যা ধুইয়া আয় গিয়া। তোগো লইয়া আর পারন যায় না।
সুমিতাদি উঠলেন হাত ধুতে।
ভূপতিকাকু বললেন, নরেশডা আজকাল আছে কেমন?
ভালো।
যোগেশ সেনের চেম্বারে আছিল না?
হ।
তুইই কি বড়ো নাকি?
হ্যাঁ।
তোর পরে?
পরে আরো চার বোন আছে।
তবে তো ফারস্ট ক্লাস। নার্সিং হোম বানাইয়া ফ্যাল দেহি বাড়িতে একখানা। নরেশডার ফোরসাইটই আলাদা।

ভূপতিকাকুর সঙ্গে তাপসী ও প্রমীলার দেখা হলো, কথা হলো, বারান্দাতে। কিছু কথা নিচু গলাতে হলো। এমন সময় বড়োকাকুর গান শোনা গেল। উচ্চস্বরে! "অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু অস্তিগোদা। কোথায় ছিল কে আনিল অস্তি গোদা। ও গোদারে এ-এ-এ-এ-এ-এ-এ ওরে আমার গোদা-আ-আ..........

ভূপতিকাকু ধমকে বললেন, বিবাগী থামা তর বেসুরা গান।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে সত্যি সত্যিই মুনসের এল। তার বাবা মুনাব্বরের সঙ্গে। বড়োকাকুই প্ল্যান করে সেই সময়ে ঠাকুমাকে ঠাকুরঘরে এমার্জেন্সি পুজো করতে পাঠিয়েছিলেন। প্রমীলাবালা স্বল্প-বিদ্যার গোঁড়া হিন্দু। অনুদার, কট্টর।

মুনসের তার বাবা মুনাব্বর চাচার হাত ধরে এসে ঘরে দাঁড়াল। মুনসেরকে দেখেই চোখ বন্ধ করে ফেলল ঋভু। ভয়ে নয়; লজ্জায়।

মুনসের বলল, ঋভু রে!

ঋভু তবুও চোখ খুলল না।

মুনসেরের বাবা বললেন, আল্লা তোমারে তাড়াতাড়ি ভাল কইর‍্যা দ্যান য্যান। আর কী কমু বাজান্? এমন ছাওয়ালই প্যাটে ধরছিল তার মায়ে। এই বয়েসেই চাক্কু চালাইতে শিখছে। হ্যার ভবিষ্যৎ এক্কেরেই ফরসা।

বড়োকাকু বললেন, খেলার মাঠে তুই চাকুটা পেলি কোথায় রে মুনসের?

মুনসের মাথা নিচু করে বলল, মুকবুল মিঞার বাগান থিক্যা এঁচড় কাইট্যা লইয়া যামু মনে কইর‍্যা সঙ্গে আনছিলাম চাকুটাক্। আমার মিজাজ, কী কমু চাচা আপনারে! বলেই, ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল মুনসের। তা শুনে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল ঋভুর।

বড়োকাকু বললেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে। যা হয়ে গেছে, গেছে। ভুলে যাও ওসব কথা।

মুনসের হঠাৎই ঋভুর পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, দ্যাখ রে, এই দুই কান ধরতাছি ঋভু, ক্ষমা কইর‍্যা দে আমারে। আল্লার কসম, ফুটবলই আর কোনোদিন খেলুম না। এই তরে কয়্যা দিলাম মুই।

ঋভুর তখনো ঘুম-ঘুম ভাবটা কাটেনি পুরো।

সে হাত দিয়ে মুনসেরকে কাছে ডাকল। তারপর মুনসেরের দু'গালে দু'হাতের পাতা রেখে বলল, আমি ভালো হয়ে নিই মুনসের, তারপর আবার ফুটবল খেলব আমরা। তোরা তো পেঁয়াজ রসুন খাস বেশি, তাই বোধহয় তোদের রাগটা বেশি।

কথাটা আসলে ঠাকুমার কাছে শুনেছিল। মওকা বুঝে বলে দিল ঋভু।

তারপর বলল, রাগের মাথায় করেছিস, তা আমি জানি। আমি কিছুই মনে করিনি রে...।

মনে করস্ নাই? তুই কইস কি রে ঋভু! বলেই, মুনসের আবারও কেঁদে ফেলল।

হইছে, হইছে। আর ঢঙ কইর‍্যা কাম নাই। এহনে ঘরে চল্ হারামজাদা।

বলেই, মুনসেরের বাব্বা মুনাব্বার চাচা মুনসেরকে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। যাওয়ার সময়ে বড়োকাকুকে বলে গেলেন, আপনাগো কী আর কম্যু? মা-ঠাক্রুনরে আমার সালাম দিবেন। তাঁর দয়ার কথা এ জীবনে ভুলুম না। খোদার দোয়া য্যান্ তার উপরত্ হক্কল সময়ই থাকে।

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে অনেকক্ষণ। কাঁটালের মুচি আর আমের বোলের গন্ধে ম'ম' করছে হাওয়া। সমস্ত সান্ধ্য প্রকৃতিতে যেন কী এক খুশির আমেজ লেগেছে। বাতাসে লিচুগাছের ডালে ডালে ফিশফিশানি উঠছে। একটু পরেই সুমিতাদি চলে যাবেন। রঘু সিংহ পৌঁছে দিয়ে আসবে তাঁকে ঘোড়ার গাড়িতে করে।

ঋভুর মা এসে বসেছেন এবারে ঋভুর পাশে। চান করে এসেছেন মা। মায়ের গায়ের সাবানের আর পাউডারের গন্ধ খুব ভালো লাগে ঋভুর। মা ঋভুর কপালে হাত রাখলেন। আঃ! কী নরম মায়ের হাতের পাতা।

তাপসী বললেন, রাতে কী খাবি? খোকন?

সুমিতাদি বললেন, ওর ঠাকুমা যে ঠিক করেছেন সাগুর খিচুড়ি। আলুপটল দিয়ে। দুপুরে তো সুজির খিচুড়ি খেয়েছো। কি?

মা বললেন। খাওয়া-দাওয়াটা তো ভালোই হচ্ছে। কী বল?

ঋভু হাসল।

সুমিতাদি বললেন, সে তো মুখের খাওয়া। বুক যা খেয়েছে সে খাওয়াটাও ভালোই হয়েছিল। কি বলো ঋভু?

তারপরই বললেন, মুনসের ছেলেটা যে কী কাঁদল, কী বলব বউদি! ভারি শান্ত চেহারা কিন্তু ছেলেটার। ও যে কাউকে চাকু মারতে পারে বিশ্বাসই হয় না।

শুনলাম বিবাগীদার কাছে। যা হলো, খুবই ভালো হলো। এইটাই একটা মস্ত বড়ো কাজ হলো। রাগের বাড়া রিপু নেই সুমিতা। ঋভুর চেহারাও তো শান্ত। যা ঘটেছে তার উলটোটাই ঘটাও বিচিত্র ছিল না। এক মানুষেই বুকের মধ্যে বহু মানুষের বাস যে!

আপনারা সত্যিই খুব উদার বউদি।

ওসব কথা কেন সুমিতা? এতে ঔদার্যের কী আছে বলো? এ তো সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার এটা আমি না করলেই বরং অন্যায় করা হতো।

আমি এবারে যাব বৌদি।

সুমিতা বলল।

একটু বোসো। তুমিও সাগুর খিচুড়ি খেয়ে যাবে একটু খোকনের সঙ্গে। আসলে রঘু সিং তোমার জন্যে গাড়ি আনতে গেছে। গাড়ি তো সেই বাজারের আগে পাবে না। তোমার দেরি না হয়ে যায়!

সুমিতাদি বললেন, না, না।

বাড়ি গিয়ে রান্না করবে না কি?

না। রান্না করে আমার দু বোন। ভাগ করে। দু বেলা।

ওরা কি পড়ে?

পড়ে না আর। একজন ক্লাস সিক্স আর একজন ক্লাস ফাইভ অবধি পড়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। তখনও আমি নার্সিঙের পরীক্ষা পাস করিনি। এখনো বলি পড়তে, ওরা বলে, লজ্জা করে।

ছোটোজন?

ছোটোজন পড়ে ক্লাস থ্রিতে।

তোমাদের মা নেই বুঝি?

না। মা ত' ছোটোবোনের জন্মের সময়েই মারা যান।

বোনেরা সেলাই-টেলাই শিখেছে?

হ্যাঁ।' ভালোই করে। তবে হাতের সেলাই তো। টাকা জমিয়ে একটি সিঙ্গার মেশিন কিনব ইচ্ছা আছে। তা হলে বাড়িতে পাড়ার মেয়েদের ব্লাউজ-শায়া, বাচ্চাদের জামা-প্যান্ট তৈরি করতে পারলে একটু সাশ্রয় হবে।

পা-মেশিন কিনবে?

পা-মেশিন কিনলেই ভাল হতো কিন্তু এখানে মেয়েরা পা-মেশিনে কাজ করলে বদনাম হয়।

সে কি? কেন?

তাপসী অবাক হয়ে বললেন।

অসভ্যতা! লোকে বলে। আমার জানা একজন কিনে তারপর কী বিপদ। না পারে বিক্রি করতে না পারে ব্যবহার করতে।

সত্যি? কী বাজে ব্যাপার!

তাপসী বললেন।

টাকা জমাচ্ছ তা হলে?

চাকরি তো করছি মোটে এই ছ'মাস হল। তাছাড়া পেটের সংখ্যাও ত কম নয়। তেমন জমাতে আর পারি কই? বাবার রোজগারতো আমার চেয়েও কম। খাটনিও সেরকম। শরীরও ভেঙে গেছে। মাসে অতি সামান্যই জমাচ্ছি। দেখি কী হয়!

তবু ভালো। বিন্দু বিন্দু করেই তো সমুদ্র হয়। জমাচ্ছ যে এইটেই মস্ত কথা।

আপনাকে আমার ভালো লাগে বউদি। তিনদিন হল দেখছি আপনাকে। ঋভুর এই অঘটন না ঘটলে তো আপনার সঙ্গে আলাপই হত না। হয়তো দিন তিন-চার আরও আসতে হবে আমাকে। তার চেয়েও কম হতে পারে। তারপরে তো দেখাই হবে না আর।

কেন? দেখা হবে না কেন? যখন ইচ্ছে হয় তখুনি চলে আসবে।

কখন আসব বউদি। বারো ঘণ্টা ডিউটি। সপ্তাহে একদিন ছুটি। সেদিন কাচাকাচি, আরও নানারকম কাজ থাকে। বড়ো বোন আমি। দাদা বা ভাই তো নেই। মাও নেই, বুড়ো বাবা। বোঝেনই তো কত ঝামেলা। কতরকম!

ঠিক আছে। তুমি আসতে না পারলে আমিই না হয় যাব।

সত্যি?

আনন্দে এবং অবিশ্বাসে সুমিতাদির উজ্জ্বল চোখ দুটি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল।

তাপসী হেসে বললেন, সত্যি!

সাগুর খিচুড়ি খুব তৃপ্তি করে খেলেন সুমিতাদি। মুখ দেখে মনে হল এর আগে বোধহয় কখনও খাননি। বেশি করে গাওয়া ঘি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুমা। ফুলমণি গোরুর দুধ থেকে তৈরি ঘি। হলুদ রঙা।

খাওয়া-দাওয়ার পর হাত ধুয়ে ঋভুর গালে একটি আদরে চাপড় দিয়ে সুমিতাদি বললেন, চলি ঋভুবাবু। আজকের রাতটা ভালো করে ঘুমোনো চাই। কাল আসব ঠিক সকাল আটটাতে। গাড়ি কি এসেছে?

আমি দেখছি গিয়ে।

তাপসী বললেন।

তারপর ফিরে এসে বললেন, না গো! রঘু সিং ফিরে এসেছে। গাড়ি পায়নি এত রাতে।

আমি হেঁটেই চলে যাব। আমাকে ও নির্জন পথটুকু একটু পার করে দেয় যদি!

সঙ্গে টর্চ আছে তো তোমার?

হ্যাঁ।

প্রমীলাবালা বললেন, রান্নাঘরের দাওয়া থেকে; তোমাদের বাড়ি এখান থেকে কতদূরে সুমিতা?

তা মাইল দুয়েক তো হবেই।

দু-উ মাইল! কী মুশকিল! কাল থেকে রাত এখানেই থেকে যেও বরং। এতদূর হেঁটে যাবে। তাপসী বললেন।

অনেকই অসুবিধা বউদি থাকার। বোনগুলি পাখির ছানার মতো মুখ চেয়ে থাকে সারাদিন। দিনান্তে বাড়ি না ফিরলেই নয়! তাছাড়া রাতে বাড়িতে না ফিরলে কত কী বলবে লোকে। আমিতো মেয়ে!

ঠিকই বলেছ। মেয়েদের যে কত বিপদ। তবে ধীরে ধীরে দিন পাল্টাচ্ছে। ভবিষ্যতে ছেলে মেয়েতে কোনো তফাত থাকবে না দেশে।

বলছেন বউদি? তবে আমার সন্দেহ আছে। কম করেও আরও একশো বছর লেগে যাবে। আমরা আর দেখে যাবো না।

প্রমীলাবালা বললেন, যত নাই কথা। ছাওয়াল আর মাইয়ারা এক হইতে যাইব কোন্ দুঃখে। বিধাতার সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্য ত ছিল কিছু একটা। ছাওয়াল মাইয়া, মাইয়া ছাওয়াল হইলে বিধাতার প্ল্যানই গন্ডগোল হইয়া যাইবনে।

তাপসী আর সুমিতাদি প্রমীলাবালাকে আড়াল করে হাসলেন একটু। চোখের ঠারে ঠারে। মুখে কথা বললেন না।

ঠিক আছে, বিবাগী ঠাকুরপোকে বলে কাল থেকে একটি গাড়ির বন্দোবস্ত করে রাখব। সকালেই বা তুমি এলে কিসে?

হেঁটে।

হেঁটে? এই ঠা-ঠা রোদ্দুরে!

কোথায় রোদ্দুর? সকালেই তো আসি!

একটু ভেবে তাপসী বললেন, সকালে তুমি রোজ গাড়ি করেই এসো এবং সেই কোচোয়ান কেই বলবে তোমাকে রাতে এসে সময়মতো নিয়ে যাবে। জানাশোনা একটা গাড়ি ঠিক করো সুমিতা। এদিকটা বড়ো নির্জন। সন্ধের পর তো পথে কোনো লোকই থাকে না। তোমার গাড়ি ভাড়া আমি দিয়ে দেব।

রঘু সিং এসে বলল, চলিয়ে মাইজী।

তোমার লাঠিটা নিয়ে নাও রঘু সিং।

নিয়েছি মা। লাঠি-লণ্ঠন দুই-ই আছে।

বার-বাড়িতে কে আছে?

কেউই নেই এখন।

ওরা চলে গেলে, প্রমীলাবালা ঘরে এলেন।

তাপসী প্রমীলাবালাকে বললেন, আমার বড়ো ভয় করে মা। বাড়িতে এখন কেউই থাকল না। কৃষ্ণপক্ষর সময়ে বেশি ভয় করে। চাঁদ থাকলে অত করে না।

প্রমীলাবালা নিজের বুকে হাত ছুঁইয়ে বললেন, আমার নাম প্রমীলাবালা, তাপু। আমি হইলাম গিয়া মাস্টারের মা। কার এমন সাহস আছে যে আমাগো ঘরে আসে?

কোন্ মানুষ যে কখন কী করে মা! ঋভুও তো মাস্টারদারই ভাইপো। দিল তো একজন তাব বুকে ছুরি বসিয়ে। সাহসের কথা কি বলা যায় কিছু।

প্রমীলাবালা চুপ করে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর বললেন, সে মাঠে-ঘাটের ব্যাপার। আমাগো বাড়িতে আসনের সাহস কারোই হইব না। কাব ঘাড়ে দুইডা মাথা?

ঋভু এখন পুরোপুরি সুস্থ। স্কুলেও যাচ্ছে। স্কুল খুলেছে গত সোমবারে গরমের ছুটির পর। এবারে এসেই রংপুর জিলা স্কুলে ভর্তি হয়েছে ও। এই স্কুলে ভর্তি হয়েই ওর কাছে এক নতুন জগৎই খুলে গেছে যেন। স্বাধীনতা। একা যাওয়া, একা আসা।

যখন পাঠশালাতে পড়ত তখন ওর জগৎ ছিল সীমিত। ডিমলার রাজবাড়ি সামনে দিয়ে যে পথ বাঙালপাড়ার দিকে চলে গেছে সেই পথেরই বাঁদিকে ছিল পাঠশালা। ডিমলার রাজবাড়ির প্রায় উলটোদিকেই। পাঠশালাতে যেতো আসতেও বেনুকাকু ছানুকাকুদের কারো সঙ্গে। এখন যখন বইখাতা হাতে স্কুলে যায় একা একা, লাল মিহি মাটির পথ বেয়ে, তখন কত কী ভাবতে ভাবতে যায় ঋভু।

গরমের ছুটির বন্ধের আগে পথের দুপাশের আমগাছগুলো মুকুলে ভরে থাকত। গন্ধে ম' ম' করতো সারা পথ। ঋভুর সারা মন। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁটালে মুচির গন্ধেও ম' ম' করতো

সারা পথ। কত গাছ, কত পাখি; কী নির্জনতা। কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ভাড়া বাড়িতে এই নিসর্গ প্রকৃতির কোনো খোঁজই রাখতো না তো সে। যদিও কলকাতাও ঋভুর খারাপ লাগত না।

'ধাপ' এ ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই পথে পড়ে, ডান দিকে যেতে হতো। বাঁদিকের পথ চলে গেছিলো ধাপ বাজারের দিকে। এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে। আর সে পথে সোজা গেলে খোঁয়াড়, শংকামারীর শ্মশান। আর ডানদিকে এগোলেই ডানহাতে রঙ্গলালবাবুর বাড়ি, তারপর হরিসভার পুকুর আর পেছনের মাঠ। ওই মাঠের পরেই ডানদিকে পথ চলে গেছিল সোজা জমিদার নন্দীদের বাড়ি সামনে দিয়ে বদরগঞ্জে। নন্দীদের জামাই প্রভাস মিত্রই ছিলেন জমিদার। নন্দীদের নাকি ছেলে ছিল না।

রংপুরের পরের রেল স্টেশনই বদরগঞ্জ। বাড়ির সামনের পথের বাঁদিকে পড়তো কেদারবাবুর বাড়ি, তারপই বদুমিঞা, মুনসের মিঞা আর দিলওয়ার হোসেন মিঞা, এই তিন ভায়ের বাড়ি। ডাইনে বদরগঞ্জ আর বাঙালপাড়ার পথের মোড় পেরিয়ে এগিয়ে গেলেই বাঁয়ে পড়ত নর্মাল স্কুল।

নর্মাল স্কুলের বাড়িটা ছিল লাহিড়ীদের। তাঁরাও জমিদার ছিলেন। গোপাল লাহিড়ী, তুলসী লাহিড়ী আর সামু লাহিড়ী তিন ভাই ছিলেন ওঁরা। ঋভু কাউকেই চিনত না। তবে বড়োকাকুর কাছে গল্প শুনেছিল যে, গোপাল লাহিড়ী খুব ভালো বাঁশি বাজাতেন আর বড়ো শিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর খাস চাকর, যাকে তিনিই বন্দুক চালাতে শেখান; একদিন রাগ করে তাঁকেই গুলি করে মেরে ফেলে। সেই দুর্ঘটনার পরেই তাঁরা এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে দেন! ঋভুর বাবার শিকারের হাতেখড়ি দেন গোপাল লাহিড়ী।

অনেকই বছর পরে কলকাতায় তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' দেখতে নিয়ে গেছিলেন ঋভুর বাবা ঋভুকে। লাহিড়ীরা ঋভুর বাবাকে খুব পছন্দ করতেন। প্রমীলাবালার কাছে শুনেছে ঋভু। ছোটো ভাই সামু লাহিড়ী খুব ভালো যন্ত্রী ছিলেন। দিলরুবা বাজাতেন। বাড়িতে কোনো শিশু কাঁদলেই নাকি যন্ত্র কাঁধে দৌড়ে এসে সুর লাগিয়ে বলতেন, আর একটু তোল, আরেকটু গলা তোল দেখি, দেখি; পঞ্চমে তোল। ওঁদের বাড়িটাই ভাড়া নিয়ে নর্মাল স্কুল হলো। ঋভু ওদের কাউকেই তখন দেখেনি, শুধু বাড়িটাকে দেখেছিল। দেশভাগের বেশ কয়েক বছর পরে সামুকাকু ঋভুদের ডোভার রোডের বাড়িতে এসে দিলরুবা বাজিয়ে ঋভুকে গান শেখাতেন। এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন সামুকাকু। নরম, লাজুক; চাপা স্বভাবের। এমন মানুষ খুব বেশি দেখেনি ঋভু। নর্মাল স্কুলের পরেই ছিল এসপি সাহেবের কোয়ার্টার।

অনেকখানি বাগান ঘেরা সুরক্ষিত বাংলো বাড়ি। ফায়ারপ্লেসের ধুঁয়ো যাওয়ার জন্যে চারকোনা টেরাকোটা চিমনি দেখা যেত দূর থেকে। বাগান, কেয়ারী-করা। গেটে সেপাই দাঁড়িয়ে থাকত। রাইফেল কাঁধে। এস পি সাহেবের বাড়ির পরে ছিলো এ এস পি সাহেবের বাংলো। তারপর সার্কিট হাউস। সার্কিট হাউসের পরে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বিরাট বাগানওয়ালা বাংলো বাড়ি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির সামনে দিয়ে যে পথটি গেছিল সেটাই ছিল স্টেশনে যাওয়ার পথ। মাইল তিনেক হবে বোধহয় ওই মোড় থেকে। ওই রাস্তাতেই ছিল রংপুর জেলও।

স্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালের পাশ দিয়ে একটি পথ বেরিয়ে গেছিল মাহিগঞ্জে, তাজহাটের রাজার বাড়ি। রেললাইনকে কেটে দিয়ে একটি পথ চলে গেছিল রংপুর কলেজে। বাংলার লাট কারমাইকেল সাহেব এসে উদ্বোধন করেছিলেন নাকি সেই কলেজের। তাই তাঁর নামেই নাম "কারমাইকেল" কলেজ।

ডি এম-এর বাড়ির সামনে দিয়ে যে রাস্তা স্টেশনে গেছিল তারই মোড়ে ছিল বিরাট কম্পাউওয়ালা জিলা স্কুল। তখন জিলা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন জনাব নূর নওয়াজ খান লোদি সাহেব। তিনি নাকি লোদি বংশের উত্তরসূরী ছিলেন। চেহারাও ছিল নবাবেরই মতো। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। দাড়িও ছিল নবাবসুলভ।

জিলা স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছিলেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি। জিলা স্কুল ছাড়াও নামকরা আরেকটি স্কুল ছিল কৈলাসরঞ্জন স্কুল। ঋভুর বাবা-কাকারা সবাই ওই স্কুলেই পড়েছিলেন।

কৈলাসরঞ্জন স্কুলের পাশেই ছিল ব্রাহ্মসমাজ মন্দির আর রামমোহন লাইব্রেরি। তার সামনে পুকুর। তার পরে পুলিশ লাইন। কালেক্টারির মাঠ। ডি এম-এর অফিস, ট্রেজারি, কোর্ট-কাছারী, রংপুর গার্লস' হাইস্কুল, এই সব।

এতো বড়ো সাম্রাজ্য ছিল ঋভুর। তাছাড়া ছিল খাসমহলও অনেক। নিজেদের বাড়ির সামনে-পেছনের মস্ত মস্ত বাগান। ঘোঘোটের ক্যানালের পার। কত অজানা অচেনা পাখি। তাদের আলুখেতের পেছনের পুকুর। আমলকি গাছ। সেজোকাকু (মাস্টারকাকু) ওই আমলকি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন একবার পুজোর ঠিক আগে;— "এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার 'পরে।" সেই কবিতাতেই ছিলো "আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরুদুরু, পেয়েছে খবর পাতা-খসানোর সময় হয়েছে শুরু।" কবিতার আমলকি গাছ নয়, সত্যিকারের আমলকি গাছ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিল সে। জলপাই গাছও ছিল মস্ত। পেছনের বাগানে। তার গোড়াতে থাকত একটি মস্তবড়ো চিত্রল ঢোঁড়া সাপ। হরিসভার পুকুরেও থাকতো এক বহুরঙা মস্ত জল-ঢোঁড়া। শীতকালে ভাসান-দেওয়া দুর্গাপ্রতিমার ভেসে থাকা বাঁশের চালির উপরে উঠে সে রোদ পোয়াত। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকত কলকাতার ছেলে ঋভু।

গতকাল উঁচু ক্লাসের পার্থ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।" কবিতাটি আবৃত্তি করেছিল স্কুলের এক অনুষ্ঠানে। এমন সুন্দর ছেলে এর আগে আর দেখেছে বলে মনে পড়ে না ঋভুর। ডিমের মতো মুখখানি। আর কী সুন্দর গলার স্বর! সারা রাত ঋভুর কানের মধ্যে অনুরণন উঠেছিল সেই কবিতার; "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা। রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে, আজকে যে যা বলে বলুক তোরে, সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে, পুচ্ছটি তোর উচ্চে তলে নাচা। আয় দুরন্ত, আয় রে, আমার কাঁচা।"

ঋভু স্কুলে যাওয়ার সময়ে একা একাই যায়। ফেরার সময়ে সঙ্গে থাকে ইয়াকুব, পুঁটু, আনোয়ার। কোনোদিন আরো কেউ কেউ। এস পি সাহেবের বাড়ির উলটোদিকে পথের পাশে পাশে। একটা নালা বয়ে গেছে। তার উপরে একটি কাঠের সাঁকো। সেই সাঁকোর উপরে দাঁড়িয়ে ওরা ছোটো মাছেদের খেলা দেখে। স্বচ্ছ জলে মাছের ঝাঁক তিরতির করে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎই ঋভুদের চমকে দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি যায়। 'টগবগ টগবগ' করে ঘোড়া ছোটে। চেক-চেক লুঙি পরে কোচোয়ান ঘোড়াদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাতের চাবুকে সপাং সপাং করে হাওয়া কেটে ধুলো উড়িয়ে বেগে চলে যায়। ধুলোর গন্ধ, পথের পাশের গাছ-গাছালির গন্ধ আর ঘোড়ার গায়ের গন্ধে বাতাস ভরে যায়। ঘুঘু ডাকে। ঘুঘুররর-ঘু-ঘুউউ-ঘুঘুর্‌র্‌র্‌। চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে ঋভু। কলকাতার ঋভু।

ইয়াকুব তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, ওরে ক্যালকেশিয়ান, বাড়িত যাবু কি যাবু না? উপরত্ চাইয়া দ্যাখ্সটা কি তুই? চল্ চল্ পা চালাইয়া চল্। পশ্চিমে মেঘ থম্থম্ করে। দ্যাখস না নাহি?

ঋভু আবার চলা শুরু করে।

বাড়ি ফিরে কোনো কোনোদিন ফুটবল খেলতে যায়। কিন্তু ঋভুর একা থাকতেই বেশি ভালো লাগে। ঠাকুমা কালো পাথরের বাটিতে লাল সর-ফেলা পায়েস বানিয়ে রাখেন ঋভুর জন্যে। ওদের খেতের চাল আর কালি গাইয়ের দুধ দিয়ে। খেতে খেতে ঋভু দেখে, হাঁসা-হাঁসিরা বাড়ি ফিরে হেলতে দুলতে। সাদা, কালো ছাইরঙা, বাদামি সব হাঁস। হাঁসদের গলার কাছে ময়ূরের পাখার মতো রঙ। প্যাঁএক্ প্যাঁএএক্ করে তারা রঘুদার ছড়িয়ে দেওয়া ধান খায়, কাড়াকাড়ি করে। লম্বা লম্বা মখমল-মসৃণ গ্রীবা বাড়িয়ে। তারপর এ ওর গায়ে উঠে তড়িঘড়ি তাদের ঘরে ঢোকে। কালুয়া কুকুর তাদের উপর খবরদারি করে। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে; বলে, ভুভুক্-ভুক্, ভুক-ভুক।

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর ঠাকুমা বললেন, তামাহাট থিকা খুকি চিঠি দিছে তগো যাইবার জন্য।

ঋভুর মা বলেন, এই তো স্কুল সবে খুলল মা। যাবোখন। পরে যাব। আর তো কয়েকমাস মাত্র। তামাহাটে কার না যেতে ইচ্ছে করে! বাদলবাবু আর খুকিদির এতো আদর!

নিমুকাকু গত সপ্তাহে রংপুরে ফিরে এসেছেন। নিমুকাকুও থাকতেন ঋভুদের বাড়িতে। এতোদিন কলকাতাতে ছিলেন। তাঁর দাদার বাড়ি। স্টার না, মিনার্ভা কোন্ থিয়েটারের কাছেই যেন ছিল ওদের বাড়ি। দাদার নাম ছিল নরেশ ঘোষ। ছোটো ভাইয়ের নাম ছিল নিমেষ ঘোষ। দুজনেই চমৎকার মানুষ ছিলেন। অথচ চেহারাতে নিমু কাকুর সঙ্গে দাদা ও ছোটো ভাইয়ের কোনো দিক দিয়েই কোনোরকম মিল ছিল না। ছ' ফুট দু' ইঞ্চি লম্বা। ধবধবে গায়ের রঙ। ইয়া মোটা-মোটা কবজি। হাতের পাতায় ঋভুর দুটি মুখ এঁটে যায়। কিন্তু স্বভাবটি ভারি শান্ত। চোখে নিকেলের চশমা। নর্মাল স্কুলে পড়ান নিমুকাকু। ডিমলার রাজাদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তাও ছিল। থাকতেন আগে ডিমলারই রাজবাড়িতে কিন্তু ওঁদের চলে আসতে হয়েছিল কোনো কারণে। নিমুকাকুর দাদা ঋভুর বাবার বন্ধু ছিলেন। তিন থাকেন কলকাতাতে। সিনেমার ডিস্ট্রিবিউটর তিনি। যেসব ফিল্ম রংপুরের সিনেমাহলে আসে সেই সবের তদারকিও করেন নিমুকাকু তাঁর দাদার তরফে। সন্ধেবেলা সাইকেল নিয়ে সিনেমাহলে যান টিকিট বিক্রির হিসেব দেখতে।

সিনেমা দেখতে পয়সা লাগে না বলে নিমুকাকু প্রায়ই তাপসীকে বলেন, চলুন বউদি, প্রমথেশ বড়ুয়া আর কাননদেবীর ছবি এসেছে। সবাই মিলে দেখে আসি। কিন্তু মায়ের সময় হয় না। ঠাকুমাও পছন্দ করেন না। তবে চোঙা-লাগানো কলের গানে গান শোনেন মা।

"তুফান মেল, তুফান মেল" বলে একটি গানের কথাগুলি খুব ভালো লাগে ঋভুর। কে এল সাইগলের গানও বাজে। আরো সব গান; "এই কি গো শেষ দান, বিরহ দিয়ে গেলে...."। "মোর অনেক দিনের আশা আমি বলব কানে কানে, ফাগুন হাওয়ার মতো আমি বলব তোমার কানে গো বলব গানে গানে।" "দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ওই ছায়া ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ।" পঙ্কজ মল্লিক, রবীন মুজমদার, কাননদেবী, কানা কেষ্টর (কৃষ্ণচন্দ্র দে) গান বাজে। "মুক্তির মন্দির-সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।" "যারা স্বর্গগত তারা এখনও জানে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি।"

গওহরজান বাইজীর রেকর্ড শুনতে ভালোবাসেন নিমুকাকু। "আমি রূপ দেখে সই কুল হারালাম বকুলতলায় এসে।"

সেজকাকু যখন বাড়ি থাকেন তখন মাকে অনেক গান গাইতে বলেন ফসমাশ করে। বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান। "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম আমার তোমায় ভালোবেসে। জানি না মা ধনরতন আছে কি না রানির মতন শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার কোলে এসে, সার্থক জনম আমার তোমায় ভালোবেসে।" কিংবা "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।" "ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

সেজকাকু মায়ের গলায় একটি গান শুনতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। মা যখনই ওই গানটি গান, তখন ঋভুর চোখ জলে ভরে আসে। মানেটা যে ঠিক মতন বোঝে তা নয়, তবে সারা শরীরে শিহরন খেলে যায় ওই গানটি শুনলেই ওর। রবিঠাকুরের গান : "আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না, একি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা? আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।"

আরো কত গান।

ফিকে চাঁদের আলোয় বড়োঘরের বারান্দায় শতরঞ্জি পেতে বসে, হারমোনিয়ম বাজিয়ে মা গান গাইতেন আর সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন। চমৎকার গানের গলা ছিল তাপসীর। মায়ের জন্যে গর্বে বুক ফুলে উঠতো ঋভুর।

সেজকাকু নিজে গাইতেন 'বন্দেমাতরম'। "বন্দে-এ-এ-মা-আ-আ, ত-অ-অ-অ-অ-রম্, বন্দে-এ-এ" গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত ঋভুর। খটমট সংস্কৃত শব্দগুলোর মানে বুঝত না কিন্তু বুঝতো যে সেজকাকুর বুকের ভিতরে তো বটেই নিজের বুকের ভিতরেও অনেক কিছুই যেন ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছে। গানতো শোনে মানুষ আনন্দেরই জন্যে। কিন্তু এই গান শুনলেই বড়ো কষ্ট হতো।

"দেশমাতৃকা" এই কথাটা ঋভু সেজকাকুর মুখেই প্রথম শুনেছিল। তখন জানতো না যে, সারা জীবনই এই শব্দটি তার ঘুমে কেড়ে, বুক জুড়ে বসে থাকবে।

সেজকাকু প্রায়ই কলকাতায় যেতেন। সেখান থেকে আসানসোল, ধানবাদ এ সব কয়লা খনি এলাকাতে ডিনামাইট জোগাড় করতে।

সেজকাকুর কাছেই বর্মা-চুরুটের মতো ডিনামাইট দেখেছিলো ঋভু। বাক্স-বন্দি।

হরিসভার দিকে যেতে, হরিসভার পুকুর-পানে সুধীনকাকুদের বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির পেছনে জঙ্গলের মধ্যে ছিল জাগরণ-সংঘ। সেখানে সেজকাকু বড়ো বড়ো ছেলেদের রিভলবার ছোড়া, তীর ধনুক চালানো, লাঠি লেখা, ছোরা খোলা এই সব শেখাতেন। সেজকাকুর সঙ্গে আরও অনেকেও ছিলেন।

ঋভু এ সবই জানত, শুনত, কিন্তু সেজকাকু চোখ বড়ো বড়ো করে বলতেন, ঋভু! এখন তুমি ছোটো আছ। খুবই ছোটো। এখন পড়াশুনো করাই তোমার কাজ। দেশ স্বাধীন করতে পড়াশুনোও করা দরকার। বিদ্যা হলো রিভলবারের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। কলমের মতো ধার আর কোনো অস্ত্রেই নেই ঋভু। যদি ধারালো কলমের মালিক হয়ে উঠতে পারো কোনোদিন তবে তোমার রিভলবার চালানো না শিখলেও চলবে।

সেজকাকুর সব কথা যে ঋভু বুঝত এমন নয় কিন্তু বুকের মধ্যে রক্তের ছলাৎ-ছলাৎটা বুঝতে পারত। মুঠি শক্ত করে মনে মনে বলত ঋভু, কিছু একটা করতে হবে, করার মতো।

ঋভুর বাবাকে বিজয়া দশমী বা নববর্ষে, বা বাবা দূরের কোনো জায়গাতে গেলে বা সেখান থেকে এলে, যখনই প্রণাম করত, বাবা বলতেন, "আশীর্বাদ করি, মানুষ হও। দশজনের একজন হও।"

ঋভু তো এমনিতেই মানুষ! সকলেই তো মানুষ। মানুষ আবার "মানুষ" কী করে হয় তা ঋভু বুঝত না। কথাটাতে ধাঁধা লাগত তার।

সেজকাকু নানা জায়গাতে যেতেন তাই সেজকাকুর কাছে বসে নানাদেশের গল্প শুনত ঋভু। পুলিশের টিকটিকিদের বোকা বানাবার জন্যে কত কিই না করতে হতো সেজকাকুকে। সেজকাকুর নামে গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা তো ছিলই। সেজকাকু যেখানেই যেতেন সেখানেই পেছনে টিকটিকি লেগে থাকত। সে রংপুরই হোক, কী কলকাতা। সেজকাকু পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে দাঁড়ি গোঁফ রেখেছিলেন। হাতে নাতে ধরবার চেষ্টা করতো পুলিশ। কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন? কোথায় যান? সেই সম্বন্ধে সবসময় খোঁজখবর রাখত। একবার ধানবাদের এক হোটেলে গিয়ে উঠেছেন সেজকাকু। তো, টিকটিকিও গেছে পেছন পেছন। টিকটিকি যখন বাথরুমে ঢুকেছে চান করতে, সেজকাকু তখন বাইরে থেকে তাকে তালা বন্ধ করে সেখান থেকে কী করে পালান সেই গল্পটা খুব প্রিয় ছিল ঋভুর। বারবারই ঋভু বলত, সেজকাকু, আরেকবার বলো, আরেকবার।

শিয়ালদা থেকে ব্রডগেজ লাইনে রানাঘাট হয়ে পোড়াদহ হয়ে ভাগীরথী আর পদ্মার উপরের সারা ব্রিজ (হার্ডিঞ্জ ব্রিজ) পেরিয়ে রেলগাড়ি আসত ঈশ্বরদি জংশনে। সাবাব্রিজের এক পাশের গঙ্গা নদীর নাম ছিল "ভাগীরথী"। সেই নদী "পদ্মা" হয়ে যেত ব্রিজের ওপাশে। পদ্মা গিয়ে যেখানে ব্রহ্মপুত্রে মিশল সেখানে থেকে তার নাম হয়ে গেল মেঘনা।

ঈশ্বরদি থেকে পাবনা চলে গেছিল ছোটো লাইন। আর পোড়াদহ থেকে আরেকটি ছোটো লাইন চলে গেছিল রাজবাড়ি। সেখান থেকে একদিকে পদ্মাপারের গোয়ালন্দ। আর অন্যদিকে ফরিদপুর।

ঠাকুমা বলতেন, বাবারা ছিলেন ফরিদপুরের লক্ষ্মীপুরের জমিদার। পদ্মার ভাঙনে নাকি লক্ষ্মীপুর নদীর গর্ভে চলে যায়। সেই তখন থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ঠাকুর্দারা চলে আসেন রংপুরে। তারও বহুপুরুষ আগে ওঁদের বাস নাকি ছিল বরিশালের কাঁচাবালিয়া গ্রামে। তবে বরিশালের কোনো আত্মীয়স্বজন যদি থেকেও থাকতেন, জ্ঞাতি ইত্যাদি তাঁদের কারো সঙ্গেই কোনো যোগাযোগ ছিল আদৌ ঋভুর ঠাকুর্দা বা বাবা কাকাদের সঙ্গেও।

বরিশালের পাট চুকিয়ে দেবার পর নাকি ফরিদপুরের লক্ষ্মীপুরে এসে গুহ পরিবার থিতু হন। প্রমীলাবালার দেশও ছিল ফরিদপুরে। ঋভুর ঠাকুর্দার বাবা পুকুরঘাট থেকে চান করে উঠে হেঁটে যাওয়া

এক আগুনবরণী দীঘল চোখ এবং তীক্ষ্ণ নাসা কন্যাকে দেখামাত্র পুত্রবধূ করবেন বলে মনস্থ করেন। সেই গল্প প্রমীলাবালা সগর্বে বলতেন তাঁর ছেলের ঘরের ও মেয়ের ঘরের নাতি-নাতনিদের কাছে। তবে প্রমীলাবালা যৌবনকালে যে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন সে কথা তাঁকে তখন দেখেও বোঝা যেত।

লক্ষ্মীপুরে গুহবংশের জমিদারি প্রসঙ্গে, প্রমীলাবালাকে চটিয়ে দেবার জন্যেই তাপসী হেসে বলতেন, পদ্মাতো লক্ষ্মীপুর গিলেই নিয়েছে তাই এখন জমিদার বলে দাবি করলে ঠেকাচ্ছেটা কে? জমিদারিই যখন জলের তলায় তখন তো জমিদার বলে দাবি করা অতি সহজ কাজ। খুবই সহজ।

প্রমীলাবালা মুখ গম্ভীর করতেন এই কথাতে।

ঈশ্বরদির পরের স্টেশন ছিলো নাটোর। তারপর শান্তাহার, হিলি। এই হিলি থেকে বালুরঘাটে চলে গেছিল একটি লাইন হিলির পরই পার্বতীপুর। মস্ত জংশন। পার্বতীপুর হয়ে ব্রডগেজ লাইন চলে গেছিল নীলফামারি, ডিমলা ইত্যাদি হয়ে শিলিগুড়ি। সাহেবরা রাতে ডিনার খেয়ে দার্জিলিং মেলে চাপতেন আর ভোরে শিলিগুড়ি পৌঁছে দার্জিলিঙের ট্রেন ধরে লাঞ্চের আগে পৌঁছতেন দার্জিলিং।

"হোম"।

পার্বতীপুর থেকে মিটার গেজের লাইন চলে গেছিল বদরগঞ্জ, রংপুর, ভূতছাড়া, কাউনিয়া, তিস্তা, গীতালদহ, গোলকগঞ্জ, এবং মোটরঝাড়। পথে পড়তো লালমনিরহাট জংশন।

গীতালদহ থেকে ট্রেন লাইন চলে গেছিল কুচবিহারের লাইন। ছেলেবেলাতে ঋভুর চোখে দূরে চলে-যাওয়া ক্রমশ সরু হয়ে-যাওয়া জোড়া রেল, ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল নীল আলো এবং এই সব অধিকাংশই অদেখা স্টেশনের নামগুলি এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করত। বুঁদ হয়ে থাকত সে সেই স্বপ্নে।

মোটরঝাড়ে নেমেই গোরু গাড়িতে করে ঋভুরা তার পিসেমশায়ের বাড়ি তামারহাটে পৌঁছত। প্রতাপগঞ্জ, পাগলাহাট, কুমারগঞ্জ হয়ে। ব্রহ্মপুত্রের উপরে ধুবড়ি শহর থেকে গৌরীপুর হয়েও তামারহাটে আসা যেত কিন্তু রংপুর থেকে মোটরঝাড় হয়ে যেতেই সুবিধে ছিল।

তামারহাটের পাশ দিয়ে বয়ে গেছিল গদাধর নদী। এই গদাধর ধুবরি শহরের কাছে এসে ব্রহ্মপুত্র মিশেছিল। আর গোলোকগঞ্জের কাছে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছিল গঙ্গাধর নদী।

ঋভুরা যখন রংপুরে আসত তখন শুধু পোড়াদহ আর পার্বতীপুর জংশনে এলেই ঋভু বুঝত যে, রংপুরের কাছাকাছি এল। পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করতে হতো, তাই মনে থাকতো ওই স্টেশনটিই বেশি করে। নইলে তো বেশিটা পথ ঘুমিয়েই আসত।

তখন রেলে ছিল ফার্স্ট-ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস আর থার্ডক্লাস। ঋভুরা বড়োলোক ছিল না। তাই ইন্টার ক্লাসেই যাতায়াত করত। কখনও থার্ড ক্লাসেও।

ত্রিশের দশকের শেষে কি চল্লিশ দশকের একেবারে গোড়াতে ফার্স্ট ক্লাসে শুধু চড়তেন সাহেবরা. আর রাজা-মহারাজারা, বড়ো বড়ো জমিদারেরা। সেকেন্ড ক্লাসেও যাঁরা চড়তেন তাঁরা বড়ো বড়ো সরকারি আমলা। নয়তো ব্যাবসাদার বা পেশাদার পয়সাওয়ালা মানুষেরা। মায়ের পাশে বসে, ভয় আর সম্ভ্রম মেশানো চোখে ফার্স্ট-ক্লাস সেকেন্ড-ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের দিকে চেয়ে থাকত ঋভু। লাল-টুকটুক সাহেব-মেম আর বড়োলোক ভারতীয়দের চিড়িয়াখানার হাতি-বাঘেরই মতো দুর্লভ জীব বলে মনে হতো ওর। তবে বাবার সঙ্গে যখন বাবার কর্মব্যপদেশে ট্রেনে চড়ত তখন সেকেন্ড ক্লাসেই চড়ত। স্টিমারেও তাই। ট্রেনে কী স্টিমারের সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে কোথাওই যাওয়াটা তখন মধ্যবিত্তদের কাছে রীতিমতো বড়লোকি ব্যাপার বলেই গণ্য হতো।

বাবার চিঠি আসত মায়ের কাছে নীল খামে। মা বড়োঘরের বারান্দার পড়ন্ত বেলার রোদের আভায় বসে বাবার চিঠি পড়তেন। চিঠি পড়তে পড়তে তাপসীর মুখখানিও গোধূলির কনে-দেখা আলোয় এক ধরনের হলুদ-মাখা লালিমা পেত।

অনেকদিন পরে, নিজে যৌবনের দুয়ার অতিক্রম করার পরই ও বুঝেছিল এ রঙ ভালোবাসার রঙ। আমাদের দেশের ফরসা মেয়েদের গালে একরকম রঙ লাগে আর যাদের বর্ণ চাপা তাঁদের অন্যরকম। প্রেমের আলো সবসময়েই সুন্দর।

ঋভুর বাবা হৃষীকেশ, তার মা তাপসীকে যে সব চিঠি লিখতেন তার দু একটি পড়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করেছিল। বাবার চিঠিমাত্রই এমনিতে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না, গম্ভীরস্বভাবা তাপসীর মধ্যে এমন বৈকল্য ঘটায় কেন? যে বৈকল্যর লক্ষণ সম্বন্ধে ঠাকুমা থেকে রঘু সিং পর্যন্ত কারোই কোনো সন্দেহ থাকে না। ভাবত, কী এত লম্বা লম্বা চিঠি লেখেন বাবা, মাকে?

বাবা কিন্তু বাংলায় চিঠি লিখতেন না মাকে। এমনকি ঠাকুমাকেও ইংরিজিতেই চিঠি লিখতেন। ঠাকুমা প্রমীলাবালা ইংরিজি ভালো করে পড়তেই পারতেন না। রাগে বিড়বিড় করে বলতেন, এক ছাওয়াল ইংরাজ খেদায় আর এক ছাওয়ালে ইংরাজের চাকরি করে আর ইংলিশে পত্র ল্যাখে। এরেই কয় খিট্‌ক্যাল!

তাপসী মুখ আড়াল করে হাসতেন।

ঠাকুমা বলতেন, "আর ছল্লা না কইর‍্যা দয়া কইর‍্যা পইড়্যা দ্যাও চিঠিখানা বউমা।"

ঋভুর বাবা ইংরিজিতে চিঠি লিখতেন সাহেবিয়ানার জন্যে নয়, তাঁর বাংলা হাতের লেখা বঙ্গভূমের কোনো মুহুরির পক্ষেও পড়া দুঃসাধ্য ছিল বলেই। কিন্তু ইংরিজিটা লিখতেন হৃষীকেশ ইংরেজদের চেয়েও অনেক ভালো। তবে ইংরিজি ভালো বলতে পারতেন না হৃষীকেশ। হয়তো তেমন ইচ্ছেও হয়নি। হৃষীকেশ বলতেন, দাঁড়িয়ে উঠলেই আমার ইংরিজি বন্ধ হয়ে যায়। বিজাতীয় ভাষা তো! সরল ইংরিজি লিখতেন। তবে চমৎকার সব ইডিয়মস আর ফ্রেজ দিয়ে। ইংরেজরা তো ঋভুর বাবা হৃষির মতো মানুষদেরই দিয়ে অতবড়ো সাম্রাজ্যটা চালাতেন, যে—সাম্রাজ্যে সূর্য কখনওই অস্ত যেত না।

বড়োকাকু ঋভুকে ডাকলেন। তখন ঋভু সবে ঘুরে-টুরে ফিরেছে। হাত-মুখ ধুয়ে এবারে পড়তে বসার কথা। কুয়োতলির সিঁদুরে আমের গাছটার আম একটু দেরিতে পাকে। এখন পেকেছে। সে আম খাবে কি? দেখেই অবাক হয়ে যায় ঋভু। এমন সুন্দরও দেখতে হয় আম?

আজকাল সন্ধের আগে থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে আসে। তারপর সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়ে। নকশী-কাঁথা গায়ে দিয়ে মায়ের পাশে শুয়ে থাকে গুড়িসুড়ি মেরে ঋভু। বাবা যখন থাকেন না এখানে তখন ঋভু মায়ের পাশেই শোয়। বড়োঘরের বড়ো খাটে। ঠাকুমা শোন দক্ষিণের দিকের জানালার পাশে তাঁর খাটে। বাবা এলে, বাবা আর মা অন্য ঘরে শোন। ঋভু তখন ঠাকুমারই পাশে। ঠাকুমার সর্দি হলেই মুশকিল হয়। পুরোনো ঘি ঘষেন কপালে তখন। কী বিটকেল গন্ধ। ব্যাব্যাগো!

সুপুরি তুলে, মাটির হাঁড়ি করে মাটির তলায় পুঁতে রাখতেন বড়কাকু বিবাগী। তারপর তা পচে গেলে তুলে পানের সঙ্গে বা এমনিও খেতেন। সেই সুপুরিকে বলে ...। গুয়া অবশ্য আসামে সকলে সুপুরিকেও বলে। কী বদগন্ধ বেরোত সেই পচা সুপুরি থেকে যে, তা বলার নয়।

তাপসী হাসতে হাসতে বলতেন বিবাগীকে : আপনারা সত্যিই গাঁইয়া। আমি গিরিডির পরিবেশে মানুষ হয়েছি, নেহাৎ বাবার অভ্রর ব্যবসাটা ফেল করে গেল তাই, নইলে আপনাদের মতো বাঙালদের হাতে মরতে এসে পড়ি! জীবনে কোনোদিনও টিনের চালের ঘরে থাকিনি, রান্নাও করিনি, বৃষ্টির মধ্যে কাঁচা উঠোন পেরিয়ে এ ঘর-ও ঘর করিনি। কপালের যে এমন লিখন ছিল, কে জানত!

বিবাগী হেসে বলতেন, বাঙাল তো আপনারাও। ঢাকা জেলার মালখানাগরের বোস। এখন বিহারী বনে গেলে কি হয়? বাঙালত্ব সতীত্ব নয়। চিরদিনই অটুট থাকে।

তাপসী হেসে বলতেন, বাঙালে বাঙালে যে তফাত আছে সেটাও বুঝলাম। ঢাকার বাঙাল সবার সেরা বাঙাল। আপনারা যে ভাষায় কথা বলেন তা তো ফরিদপুরের ভাষা কিন্তু এখানের লোকেরা কিন্তু অদ্ভুত ভাষায় কথা বলেন।

সব ভাষাই অদ্ভুত লাগে অন্য ভাষাভাষীদের কাছে। কিন্তু এই রাজবংশী ভাষাই বা খারাপ কি? যেমন ধরুন, সেদিনের যে মুসলমান মুনিষটি এসেছিল আলুখেতে কাজ করতে, তাকে আমি শুধোলাম কি করেন বা হে!

সে বলল, না করি কোনো।

তাপসী হেসে উঠলেন জোরে।

বিবাগী বললেন, আমার তো ভারি সুন্দর লাগে এই উত্তর-বাংলার ভাষা। এ ভাষা নিছক কোনো ভাষামাত্রই নয়; ফিলসফারদের ভাষা বৌদি। "না করি কোনো" বাক্যটির মধ্যে শুধুমাত্র কিছু "করছি নাই" নয়, কিছু "করতে চাইও না", এমন একটি বক্তব্যও সুপ্ত আছে। কি? নেই?

তাপসী হাসতেন।

বিবাগী বলতেন, সব আঞ্চলিক ভাষাই তো সেই অঞ্চলের ফসলেরই মতো; মাটি থেকে জন্মায়। সেই অঞ্চলের আকাশ বাতাস মাটির গন্ধ মাখামাখি হয়ে থাকেই ভাষার মধ্যে।

মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে, ভালোবাসলে, ভালোবেসে সে ভাষাতে কথা বললে সব ভাষাই সমান মধুর হয়।

তাপসী বলতেন, তা হয়তো হবে।

বড়োকাকু আবারও একবার ডাকলেন ঋভুকে। এবারেও না গেলে মুশকিল হবে। ওঁর হকিস্টিক দিয়ে ঋভুর গলা আঁকড়ে টেনে নিয়ে যাবেন ওকে।

কাছে যেতেই, বড়োকাকু গলা খাঁকড়ে বললেন, আজকের চাণক্য শ্লোকের কি হলো ?

ওঃ। ভুলে গেছিলাম।

ভুলে গেলে চলবে না। রোজ একটি করে শিখবে আর পরদিন মুখস্থ বলবে আমার কাছে। কালও শেখোনি, তাই একই সঙ্গে দুটি আজ শেখো।

'ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্র ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপু।

ব্যবহারেন জায়ন্তে মিত্রানি রিপুধ্বস্তা।'

মানে বুঝলে?

ঋভু মাথা নাড়লো দু দিকে।

মানে হলো, জন্ম থেকেই কেউ কারো বন্ধু হয় না, শত্রুও হয় না। নিজের ব্যবহারেই কেউ শত্রু হয়ে ওঠে, কেউ বা মিত্র। শ্লোকটা বলো আবার। বারবার বলো, মুখস্থ হয়ে যাবে।

ঋভু দু-বার বলল। বিবাগী বললেন, এখুনি লিখে রাখো। আর আরেকটা শোনো। তুমি তো মাস্টারকে বলেছ যে বড়ো হয়ে তোমার লেখক হবাব ইচ্ছা, লেখক সম্বন্ধে, তাই চাণক্য কি বলেছেন তা শিখে রেখো।

"সকৃদুক্ত গৃহীতার্থ লঘুহস্তো জিতাক্ষবঃ।

সর্বশাস্ত্র পবিজ্ঞাতা প্রকৃষ্টো লেখকং স্মৃতঃ।"

মানে হলো, কোনো কিছু উচ্চারণমাত্রেই যে মানুষের পক্ষে মানে বুঝে নেওয়া সম্ভব হয়, খুব তাড়াতাড়ি যিনি লিখতে পারেন, সব শক্রই যাঁর নিজের দখলে থাকে তাকেই সকলে সুলেখক বলে জানে। তিনিই প্রকৃত লেখক।

বলো দু-তিনবার বলো শ্লোকটি।

ঋভু দু-তিনবার বলল শ্লোকটি। লেখক হতে এত কষ্ট করতে হয় জানলে সে ভুলেও সেজকাকুকে লেখক হবার কথা বলতো না।

বিবাগীকাকু, মানে বড়োকাকুর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসল। কিন্তু বসামাত্রই ঠাকুমা বললেন, তোর মায়ে লক্ষ্মীপূজায় বসল গিয়া। আজ তো বৃহস্পতিবার। চল্ আমরাও গিয়া বসি।

ঋভু বলল। আমার পড়া...

থো তোর পড়া। আমারে পড়া দেখাইস না। অনেক পন্ডিতরে গর্ভে ধরছি। পড়াশুনা যার হওনের তার এমনিতেই হয়। যার হওনের কথা নয় কিস্যুতেই হয় না।

ঠাকুমার এই যুক্তিতে ঋভু হতভম্ব হয়ে গেল।

ঠাকুমা হাত ধরে নিয়ে গেলেন ঋভুকে পুজোর ঘরে। সে ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। ঝকঝকে তামার ঘটে তিনটি আমপাতা, প্রদীপের আলোয় চান-করে-ওঠা তাপসীকে সোনার মতো গায়ের রঙে, লাল পেড়ে গরদের শাড়িতে সোনার হার দুল আর বালাতে কোনো দেবী প্রতিমার মতো দেখাচ্ছে। ফুলের গন্ধ, আমপাতার গন্ধ, বেলপাতার গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, ধুপের গন্ধ সব মিলেমিশে কেমন ঘোর ঘোর লাগে ঋভুর এই ঘরে ঢুকলেই।

ঋভুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বলে প্রমীলাবালার উপরে একটু বিরক্তই হলেন তাপসী, কিন্তু সেই বিরক্তি নিঃশব্দে প্রকাশ করেন লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে পড়তে ঋভুরই দিকে মুহূর্তের ভ্রূ-ভঙ্গি করে। ঋভু তার ঠাকুমার সঙ্গে নানা-শাড়ির-পাড়-দিয়ে তৈরি বহুরঙা আসনের উপরে বসে পড়ল। তাপসীর কণ্ঠস্বরে জাদু ছিল। গানই করুন, কী পাঁচালি পড়ুন, মন্ত্রমুগ্ধ করে দিতেন সবাইকে। তবে ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া মেয়েরপক্ষে এই উত্তরবঙ্গের আধাশহর আধা-গ্রামের পরিবেশে নিজে হাতে রান্না করা, লক্ষ্মীপুজো করা, ব্যাঙ, সাপ আর আরশোলার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এ সব সহজে হয়নি। সময় লেগেছিল। কিন্তু মানিয়ে নিয়েছিলেন তাপসী পুরোপুরিই।

তাপসী পড়ছিলেন সুললিত কণ্ঠে। ঋভুর বাবা হৃষীকেশ একদিন বলেছিলেন ইংরিজিতে 'সোনারাস ভয়েস' তাপসীর কণ্ঠস্বরকে। "সোনারাস" কথাটার মানে তখনও জানতো না ঋভু। "ওনারাস্" আর "সোনারাস" এর মানে একই দিনে শিখেছিল্যে যেদিন "ওনামাসী ঢং, গুরুজী চিতং, মেরা সারংমে বাজিছে, নয়া নয়া রঙ" শিখেছিল।

তাপসী পড়ছিলেন :

"কেন মাগো নর-প্রতি তব অবিচার।
চঞ্চলা চপলা প্রায় ফেরো দ্বারে দ্বার॥
ক্ষণকাল তরে তব নাহি কোথা স্থিতি।
সেই হেতু নর-নারী ভোগয়ে দুর্গতি।
সতত কুক্রিয়া রত নর-নারীগণ।
অসহ্য যাতনা পায় দেখি অনুক্ষণ॥
অন্নাভাবে শীর্ণকায় বলহীন দেহ।
সেই কষ্টে আত্মহত্যা করিতেছে কেহ॥

চঞ্চলা আমায় বলে কিসের লাগিয়া।
ইহার কারণ তবে শুন মন দিয়া॥
দিবা-নিদ্রা অনাচার ক্রোধ-অহংকার।
আলস্য কলহ মিথ্যা ঘিরিছে সংসার॥
উচ্চ হাসি কটু কথা কহে নারীগণ!
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন॥
রমণী ভূষণ লজ্জা দিয়া বিসর্জন।
যথায় তথায় করে স্বেচ্ছায় গমন॥
নাহি দেয় ধূপ-দীপ প্রতি সন্ধ্যাকালে।
সতীর সিন্দূর শোভা, নাহি পরে ভালে॥
প্রভাতে দেয় না কভু গোময়ের ছড়া॥
ঘৃণা নাহি করে তারা এড়া বস্ত্রপড়া॥
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী নারী করিয়া সৃজন।
পাঠায়েছি মর্ত্যলোকে সুখের কারণ॥
ক্ষণিকের সুখে তারা ভুলিয়া আমায়।
অ-কার্যে কু-কার্যে তবে সংসার মজায়॥
শ্বশুর-শাশুড়ি প্রতি নহে ভক্তিমতী।
কটুবাক্যে কহে সদা তাঁহাদের প্রতি॥
পতির আত্মীয়গণে না করে আদর।
থাকিতে চাহয়ে সদা হ'য়ে স্বতন্তর॥'"

রান্নাঘরেই বড়ো বড়ো কাঠের পিঁড়ি পেতে সকলে খেতে বসতেন। ঋভুর জন্যে একটি ছোটো পিঁড়ি ছিল। ঝকঝকে করে মাজা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিতলের থালাতে ভাত আর বড়ো বড়ো বাটিতে তরকারি ডাল ইত্যাদি সাজিয়ে সকলকে খেতে দেওয়া হতো।

ঠাকুমা যদিও রাঁধতে ভীষণ ভালোবাসতেন এবং নিরামিষ ও আমিষ সব রান্নাই দারুণ রাঁধতেন তিনি, রাতে হেঁসেলে ঢুকতেনই না। দুধ-খই, ক্ষীর, কলা, অন্য ফুলমূল, মুড়ি, দুধ, সাগু ইত্যাদি খেতেন রাতে। ফলার। তাঁর হবিষ্য-ঘর ছিল চালতা তলায়। ছুটির দিনে ঋভু সেই হবিষ্য-ঘরে বসেই নিরামিষ খেত ঠাকুমার সঙ্গে। সেই সব খাবারের স্বাদ-গন্ধ এখনও যেন মুখে লেগে আছে। চমৎকার আতপচালের ভাত। ফুলমণি গাইয়ের ঘি। বেগুন, শিম, ফুলকপি, আলু, বরবটি, উচ্ছে, করলা আরও কত কী সেদ্ধ হতো। কখনও ডাল হতো আলাদা করে, মটর, ছোলা, অড়হড়। কখনও ভাতেরই সঙ্গে একসঙ্গে ফুটোনো হতো। লাল-রঙা সন্ধব লবণ। নিজেদের খেতের সুপুষ্ট কাঁচালংকা। ডাল-ছড়ানো তরকারি।

ঠাকুমা ঋভুর জন্যে খাবার মেখে দলা দলা করে রাখতেন। সেই দলা শুধু রংপুরের দিনগুলিতেই নয়, হৃষিকেশের রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে উনিশো চুয়াত্তরে প্রায় নব্বুই বছর বয়সে প্রমীলাবালার দেহ রাখার দু এক বছর আগে পর্যন্ত ঠাকুমার "দলা" ছিলো ঋভুর অন্যতম প্রিয় খাদ্য। পৃথিবীর প্রায় সব কোণ ঘুরে হাজার দেশের খাবার খেয়েও সেই দলার অভাব আর ঘুচল না; ঘুচবে না।

ঠাকুমার হবিষ্য-ঘরে ঋভুর দলাতে ভাগ বসাতে এসেছিল এক শীতের দুপুরে-হঠাৎ আসা এক বেড়ালনির চারটি বাচ্চা। ঋভু তখন সবসময়েই হাতে একটি ছোটো বাঁশের লাঠি নিয়ে ঘুরত। বনপথে যেতে-আসতে পথপাশের গাছ-পাতায় বাড়ি মারতে মারতে ওই বয়সী অনেক বালকের মতো নিজের পৌরুষ জাহির করত। পৌরুষের একটু আধিক্য ঘটাতে দলা-প্রার্থী নির্দল বেড়াল বাচ্চার মাথায় সেই লাঠির হঠাৎ আঘাত পড়তেই সেই বাচ্চাটি তো চোখ উলটে, উলটে গেল। তারপর ঋভুকে এক গভীর পাপবোধে নিমজ্জিত করে সমস্ত বাড়ির সব বাসিন্দার চোখের জলে ধন্য হয়ে শেষরাতে ধরাধাম ত্যাগ করল।

ঋভু জীবনে সেই প্রথম এবং প্রায়-সচেতন প্রাণী হত্যা। যতদিন ঠাকুমার 'দলা' খেয়েছিল ততদিন সেই সাদা আর খয়েরি বেড়াল ছানাটি ঋভুর থালার পাশে প্রতিবার এসে বসেছিল। তার সঙ্গে ঋভুর অবশ্যই দেখা হবে ঊর্ধ্বলোকে এবং দেখা হলে বেড়াল ছানার সামনের দুটি পা ধরে অনেক ক্ষমা চাইবে ঋভু।

রাত্রে একদিন খেতে বসে বড়কাকুকে মা বললেন, লক্ষ্মীর পাঁচালি তো আপনি রোজই শোনেন শুয়ে শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে, আপনার কি একবারও মনে হয় না যে, এ বাড়িতে লক্ষ্মী যদি কখনও জাঁকিয়ে না এসে বসেন তবে তা আপনারই দিবানিদ্রা আর পা-নাচানোরই কারণে।

বড়োকাকু ফিক করে হাসলেন।

বড়োকাকু জোড়াসনে কখনও বসতে পারতেন না। এক কুদৃশ্য ভঙ্গিমাতে বসতেন পিঁড়ির উপর। তা নিয়ে তাঁর কোনো দ্বিধা বা মাথাব্যথা ছিল না। বলতেন, ছেলেবেলা থেকে বাউন্ডারি-লাইনে ফিল্ডিং করে-করে হাঁটু ভাঁজ করাই ভুলে গেছি।

ভাল ক্রিকেট খেলতেন বিবাগী।

নিমুকাকু বললেন, ব্যাপারটা কি?

বড়কাকু বললেন, আছে। লক্ষ্মীর পাঁচালি মন দিয়ে না শুনলে আপনি এ কথার নিগূঢ়ার্থ বুঝতে পারবেন না নিমুদা।

তারপর তাপসীকে বললেন, এ কথা অস্বীকার করতে পারি না বউদি যে, লক্ষ্মীকে ঘরে আনা এবং টেনেটুনে তাঁকে বসিয়ে রাখা, সকালে গোবরছড়া দেওয়া, শাশুড়িকে মান্য করা, এই আমাদের মতো "স্বামীর আপনজনদের" আদর-যত্ন করা এই সবেরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মেয়েদেরই উপরে। পুরুষদের সত্যি কোনো দায়দায়িত্বই দেওয়া হয়নি লক্ষ্মীর আসন অচঞ্চল করার জন্যে।

তাপসী বললেন, তাহলেই লক্ষ করেছেন! কী সাংঘাতিক জাত বলুন আপনারা! লক্ষ্মীর পাঁচালিও যে কোনো মেল-শভিনিস্টেরই লেখা, সে বিষয়ে আমার অন্তত কোনোই সন্দেহ নেই। যত দায় সবই মেয়েদের, না?

আস্তে, কুলবধূ আস্তে! শ্বশ্রুমাতা এখনও নিদ্রা যাননি। তাঁর কর্ণপটাহে এই সব কু-বাক্য প্রবেশ করলে আর দেখতে হবে না। একেই তো আপনি বেস্বাভাবাপন্না নারী, সে কারণেই মায়ের যথেষ্ট উষ্মা আপনার উপরে, তার ওপর লক্ষ্মীর পাঁচালির সমালোচনা! এতো বড়ো অপরাধ ক্ষমারও অযোগ্য হবে।

নিমুকাকা বললেন, সত্যি। মাঝ মাঝেই মাসিমা যেন প্রায় ফ্যানাটিক এর পর্যায়ে নিয়ে যান নিজেকে। সেদিন যে কি হয়েছে তোকে বলিনি বিবাগী। বউদিও জানেন না। ঋভু জানে, কারণ ও তখন বাড়িতেই ছিল।

কী হয়েছিল? তাপসী শুধোলেন।

সে বড়ো লজ্জার কথা বউদি! মাসিমা এতো বুদ্ধিমতী! ইংরিজি না জানতে পারেন কিন্তু ইংরিজি জানার সঙ্গে কোনো ভারতীয়রই প্রকৃত শিক্ষার সাযুজ্য কোনোদিনই ছিল না। থাকবেও না কোনোদিন। কিন্তু ওঁর এতো শিক্ষা এবং সহবৎ সত্ত্বেও সেদিন যে উনি কি করে অমন করলেন! এখনও ভাবলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, যা করেছিলেন সেটা গর্হিত অপরাধ সে-কথা তাঁর মনে হয়নি। আমরা কেউ ওঁকে বলতে গেলেও তুলকালাম কান্ড বাধবে। বলতে পারত একমাত্র মাস্টার। ভয় যদি মাসিমা কাউকে পান, তবে একমাত্র মাস্টারকেই পান।

ভয় বলবেন না। বলুন, সমীহ করা।

তাপসী বললেন।

ঠিক। ভুল বলেছি।

বিবাগী বললেন, কি হয়েছিল বলো না নিমুদা? সেটাই তো বলছ না।

গোয়ালঘরের চালের খড় ছাইতে একজন 'ঘরামি' এসেছিল। মানুষটাকে তোমরা চেনোও। গিয়াসুদ্দিন বুড়ো। ধাপ বাজারের দিকের পথেই ওর বাড়ি। শ্রাবণ মাসের রোদ্দুরে গরমে অতক্ষণ কাজ করে বেচারা অন্দরবাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল একটু জলের জন্যে। মাসিমা শুধু জলই নয়, জলের সঙ্গে চারটে বড়ো বড়ো বাতাসাও দিয়ে রঘুকে বললেন, ওকে দিতে। জল দিলেন অন্য ঘটিতে। বললেন, রঘু, ওই ঘটি ভালো করে মেজেই যেন তোলা হয়।

গিয়াসুদ্দিন, বাতাসা খেয়ে রান্নাঘরের দাওয়ার কাছে দাঁড়িয়ে ঘটি উপুড় করে ঢকঢকিয়ে জল খাচ্ছিল যখন, তখনই হঠাৎ ওর মাথা ঘুরে গেল। পড়েই যাচ্ছিল বেচারি উঠোনেই। কিন্তু পড়তে পড়তেও সামলে নিল রান্নাঘরের বারান্দার একটা বাঁশের খুঁটি ধরে। খুঁটিটা ধরে ফেলল পড়তে পড়তে এবং খুঁটি ধরেই বসে পড়ল রান্নাঘরের দাওয়ার উপরে।

তারপর?

তাপসী শুধোলেন।

আর যায় কোথায়? মাসিমা তো সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সংহারমূর্তি ধরলেন। বললেন, রঘু, দূর কইর‍্যা দে তো ঘরামিরে। বইসবার দিলে, এগুলান শুইতে চায়! আর মরণের জায়গা পাইল না, শ্যাযে আমারই রান্নাঘরের দাওয়া! ভাগা! ভাগা! অরে এক্ষুণি ভাগা রঘু। তারপর গোবরছড়া দিয়া পুরা বারান্দাখানা ভালো কইর‍্যা ধুইতে হইব অনে। কী খিটক্যাল, কী খিটক্যাল! কও তো দেহি নিমু!

ঋভু খেতে খেতে হাত গুটিয়ে নিল। ঋভুর মনেও ওই ঘটনাটি গভীর দাগ কেটেছিল। বুড়ো গরিব গিয়াসুদ্দিন চাচার জন্যে বড়ই কষ্ট হয়েছিল ওর।

ওদের ওই রান্নাঘরের মাটির বারান্দাতেই শীতের রাতে কালুয়া কুকুর কোনো-কোনোদিন গোবর-লেপা মাটিতে পায়ের নখ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে গর্ত করে ফ্যালে। সেই গর্তেরই মধ্যে গায়ে মাটি-চাপা দিয়ে সে শুয়ে থকে যে, তা ঋভু দেখেছে। কুকুরের চেয়েও একজন মানুষকে ঠাকুমা ছোটো ভাবেন! মানুষটি মাথা ঘুরে রান্নাঘরের দাওয়াতে পড়ে যাওয়ায় গোবর-ছড়া দিয়ে সেই বারান্দা ধুতে বলাতে ঠাকুমার উপরে তীব্র এক রাগ-মিশ্রিত অভিমান হয়েছিল ঋভুর। অথচ ঠাকুমাকে কিছু বলতে পারেনি। তবে, পুরো দু'দিন কথা বলেনি ঠাকুমার সঙ্গে।

তাপসী বললেন, বলেন কি নিমুদা!

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমার গুরুজন, তাই ওঁকে কিছু বলা আমাকে মানায় না কিন্তু এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন আমাদের সকলকেই করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা আছে না?

> "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
> ...মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
> ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
> বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
> ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

এ বড়ো লজ্জার কথা। মাকে কিন্তু আমাদের সকলেরই একদিন বুঝিয়ে বলা দরকার। এ জিনিস চলতে দেওয়া কিন্তু ঠিক নয়।

আস্তে বউদি আস্তে। মা শুনলে, এই রাতেই কুরুক্ষেত্র বাধাবেন। সময় সুযোগ মতো সকলে মিলে বোঝাতে হবে।

তাপসী বললেন, এই ভারটা ঋভুরই উপরে দেওয়া যাক। ঋভু, তুমি তোমার ঠাকুমাকে বুঝিয়ে বলবে। রবীন্দ্রনাথের ওই গানটি ঠাকুমাকে বারবার গেয়ে শোনাবে। আমি শিখিয়ে দেব তোমাকে। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করার শিক্ষা তুমি যদি না পাও তবে তোমার লেখাপড়া শেখাই বৃথা। ঠাকুমা না শুনলে, তুমি উপোস দেবে, খাবে না। ঠাকুমাকে এটা তোমার বোঝাতেই হবে যে, তিনি যা করেছেন সেটা ভুল; সেটা এই পুরো পরিবারের পক্ষেই ভীষণ লজ্জার। ঠাকুমা বুঝলে, নিমুদা, আপনি একদিন গিয়াসুদ্দিন মিঞাকে নিয়ে আসবেন। মায়ের সামনে আমি মায়ের হয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চাইব।

বিবাগী বললেন, মা কি শুনবেন? আর মাকেই বা একা দোষ দিয়ে লাভ কি? বর্ণ-হিন্দুদের অত্যাচারে অমানুষিক ব্যবহারেই না নিম্নবর্ণের বহু হিন্দুরা সব ক্রিশ্চান আর মুসলমান হয়ে গেল। যারা অনেক পুরুষ ধরেই মুসলমান তাদের কথা আলাদা। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের ও ক্রিশ্চানদের একটি বেশ বড়ো অংশই তো আগে হিন্দুই ছিল।

সত্যি! এই লজ্জা আমাদের রাখার জায়গা নেই। মা তো কিছুই নন, কতো বড়ো বড়ো তথাকথিত 'শিক্ষিত' মানুষদের মধ্যেও এইরকম মিথ্যা দম্ভ ও অশিক্ষা আছে দেখেছি। ব্রাহ্মণ্যর গর্ব আর অন্ধত্ব! সত্যিই তাদের শিক্ষা-টিক্ষা সব অসার। তাদের শিক্ষাটা শুধুই EDUCATION OF LETTERS

BUT NOT OF CHARACTER। চরিত্র আর বইপড়া শিক্ষায় যে কত তফাত তা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়।

নিমুকাকু বললেন, অবশ্য একসময়ে বেশ কিছু হিন্দুকে জবরদস্তি করেও অন্য ধর্মাবলম্বী করা হয়েছে।

তা হয়েছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের ধর্মের এই বৈষম্যই একটি বড়ো কারণ। অর্থনৈতিক কারণে এবং নিছক ভয়েও অনেকে অন্য ধর্মাবলম্বী হয়েছে। কিন্তু ভয়টা তো গুণের কথা নয়। ভয় যারা পায় তারা, ভয় যারা পাওয়ায় তাদের হাত চিরদিনই শক্ত করেছে। ভীরুর কোনোই ভবিষ্যৎ থাকে না।

কী একটা পরবের জন্যে স্কুল ছুটি ছিল আজ। সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা করে আছে। মাঝে মাঝে গুড়গুড় করছে মেঘ দিগন্ত থেকে দিগন্তে। ঋভুর পিঠোপিঠি বোন অরা কাল আসছে বগুড়া থেকে। কলকাতা থেকে এ সেই সে মণি জ্যাঠার বাড়িতে থাকতে গেছিল ক'দিন। রংপুর গার্লস হাইস্কুল ঋভুদের ধাপের বাড়ি থেকে অনেকই দূরে। তাই অরা সেখানে ভর্তি হয়নি। তাপসী ওকে বাড়িতেই পড়ান।

এবারে অরা ফিরে এলে মা ও অরা কলকাতায় চলে যাবেন। ঋভু থাকবে এখানে। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার পর আবার তাপসীরা ফিরে আসবেন কলকাতা থেকে। তারপর সকলে মিলে তামাহাটে যাবে বড়ো পিসিমার বাড়ি। অরা গিয়ে ভর্তি হবে মিড-টার্মে "কমলা গার্লস' স্কুলে"। কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ওপরের লেক মার্কেটের উল্টোদিকে যে "জলযোগ" এর দোকান, তারই পাশ দিয়ে যে গলিটা চলে গেছে সেই গলিতেই "কমলা গার্লস' স্কুল"। হেডমিস্ট্রেস তাপসীকে বলেছেন যে, অরাকে নতুন ক্লাসে ভর্তি করে নেবেন। আগে সেই স্কুলেই পড়ত অরা।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঋভু বেরিয়ে পড়ল।

তাপসী বললেন, কোথায় যাচ্ছিস ঋভু?

এই ঘুরে-ঘারে আসব মা। কী সুন্দর মেঘ করেছে আকাশে।

তাপসী বললেন, সন্ধের আগেই ফিরে এসে পড়তে বোসো কিন্তু।

বসব!

তাপসী তাঁর ছেলের এই কবি-স্বভাবকে, একা-থাকতে-ভালোবাসা মনকে যথাযথভাবে বোঝেন। মা হওয়া কী সোজা কথা! সেদিনই কোথায় যেন পড়ছিলেন তাপসী যে, যে মানুষ একা থাকতে ভালোবাসেন না, একাকীত্ব যাঁর কাছে বোঝাস্বরূপ, তাঁর মনুষ্যত্বর পূর্ণ বিকাশই ঘটেনি। তাপসীর চারদিকে সেইরকম মানুষের ভিড়ই বেশি। সেই প্রেক্ষিতে তাঁর ছেলে ঋভু, যে, শৈশব আর কৈশোরের মাঝের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে প্রজাপতি-ওড়া, বহুবর্ণ ফুল ফোটা, লাল-কালো কুঁচফলে-ভরা এক আতরগন্ধী সকালে কৈশোরের গভীর রহস্যময় আবর্তে ঝাঁপ দেবে বলে আনচান করছে তার স্বভাবের অস্থিরতার স্বরূপটি পুরোপুরিই বোঝেন তিনি।

যদিও তিনি মেয়ে, তবু সাঁওতাল পরগনার মাদল-বাজা, হোলির গানে-ভরা বিচিত্রগন্ধী শালবন, লালমাটি, উশ্রীনদী আর খাণ্ডুলি পাহাড়ের মিশ্র-নেশার মধ্যে এক পূর্ণিমার রাতে এক বিশেষ কৈশোরে যে পদার্পণ করেছিলেন, (যাকে বেরসিক পুরুষেরা বলেন ঋতুমতী হওয়া) সে কথা এখনও মনে আছে। ব্রাহ্মণ ছেলেদের পৈতারই মতো মেয়েদেরও অন্য এক পৈতা হয়। দ্বিজ হয় মেয়েরাও। কৈশোরের জগতের তুঙ্গে পৌছনোর পর। অথচ সেই সুন্দর ঘটনাটি গর্হিত অপরাধেরই মতো রাখা-ঢাকা থাকে। উৎসব করা হয় না কোনো। যে-কোনো মেয়েই ঋতুমতী হলে উৎসব, পৃথিবীর সব ঘরে ঘরে পালিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন তাপসী। একদিন হয়তো তা হবেও। নতুন দিন আসছে। সমস্ত পৃথিবীতেই যখন মেয়েরাও পুরোদস্তুর "মানুষ" বলে সত্যি সত্যিই গণ্য হবে, সেদিন হয়তো হবে।

কলকাতার জীবনে তো এমন সম্ভব নয়! প্রকৃতির এত কাছে থাকা! প্রকৃতির বুকের কোরকে নিজেকে খুলে-মেলে দেখা। প্রকৃতিকে আয়না করা, অথবা নিজেকে। এই বয়সটা যে খুবই অনুভূতিপ্রবণ তা তাপসী বোঝেন। এবং তাঁর ছেলে যে তাঁরই মতো স্বভাব পেয়েছে কিছুটা এ কথা জেনে এবং বুঝতে পেরে খুশি হন খুবই।

ঋভুর বাবার পরিবারের সকলেই অন্যরকম। কাজের মানুষ সবাই। একমাত্র বিবাগী ছাড়া। বিবাগীর মধ্যের গভীর অধ্যাত্মবোধ ও আলস্যপরায়ণতাকে এক ধরনের সম্মান করেন তাপসী। ওই মানুষটি এই পরিবারের প্রেক্ষিতে একেবারেই বেমানান। বেমানান বলেই ভালো লাগে। বার্ট্রান্ড রাসেলের "ইন প্রেইজ অফ আয়ডলনেস" বইটির কথা মনে পড়ে গিয়ে মনে মনে হাসেন। বিবাগীকে বলতে পারেন না কিছু। এত রসিক মানুষ কিন্তু নিজে সম্বন্ধে সত্যি রসিকতাও সহ্য করতে পারেন না। নিখাদ ভালো কোনো মানুষ দেখা গেল না এ পর্যন্ত এই বিশাল চিড়িয়াখানায়। মনে হয়, তাপসীর। ভালোতম মানুষেরও দোষ কিছু থাকেই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই পেছনের বাগানে গেল ঋভু। মস্ত বড়ো জলপাই গাছটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রকান্ড চিত্রল ঢোঁড়া-সাপটিকে যদি দেখা যায়। তাকে দেখা গেল না। শীতকালে সে রোদ-পোয়ানোর জন্যে প্রায় রোজই দুপুরে বাইরে আসে। এখন কোথায় আছে, কে জানে। অন্যদিকে ছিল আনারসের বন। সেখানে অনেক বিষাক্ত সাপ থাকত। তার পাশেই আম-কাঁঠালের বন। জলপাই গাছটার নীচে যখন গিয়ে দাঁড়ালো ঋভু তখনই বৃষ্টি নামল ঝুপঝুপিয়ে। মিনিট পনেরো জোর বৃষ্টি হওয়ার পর ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হলো। এবারে বেরিয়ে পড়ল ও গাছের তলার আশ্রয় ছেড়ে। ক্যানালের পাশের বেতবন আর কেয়াবনে বৃষ্টি তার আঙুলের ছাপ রেখে গেছে। তীব্র পাগল-করা গন্ধ উঠছে শ্রাবণের কেয়াবন থেকে। মাকাল ফলের গাছ। মাদার গাছ। কুঁচফলের ঝোপ বৃষ্টিতে ভিজছে, চুপচুপে হয়ে। শীতকালে যখন ফুলের পাতাগুলি শুকিয়ে যায় তখন সেই শুকনো পাতার মধ্যে লাল-কালো কুঁচ-এর খুদে-খুদে বীচিগুলি ছিঁড়ে বের করতে হয়। স্যাকরারা তাঁদের নিক্তির ছোট ছোট পাল্লাতে যখন সোনা ওজন করেন তখন ছোটো ছোটো পেতলের বাটখারার সঙ্গে এই কুঁচফল দিয়েও নিক্তিতে সমান করেন। মা ঠাকুমার পাশে বসে মনোযোগ দিয়ে দেখেছে ঋভু।

একটা বাদামিতে-সাদাতে মেশা বক উড়ে এসে বসল ডানা সপ্সপ্ করে মাদার গাছের ডালে। বৃষ্টিতে ভিজে তার গলার সাদা ফিকে-খয়েরি ফুলে-থাকা পালকগুলো লেপ্টে গেছে। মাথার ঝুঁটি শুয়ে পড়েছে পিঠের উপরে। বকটা ডাকলো কঁক, কঁক।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ঋভু বকটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে গেলে বকেরা ভীষণ দাম্ভিক হয়ে যায়। আর নিজের মনে কথা বলে।

বৃষ্টির সীসে-রঙা ঝালরকে মাঝে মাঝেই দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ঘোঘাটের ক্যানালের ওপারের আদিগন্ত ধানখেত থেকে আসা দামাল হাওয়ার দমক। ধমকেরই মতো। এগিয়ে-পেছিয়ে, ডাইনে-বাঁয়ে হচ্ছে। বৃষ্টির ঝালর যেন শাড়ি। দুলিয়ে, নাচছে কেউ যাত্রার স্টেজে। জল আসছে তোড়ে, তিস্তা থেকে ঘোঘোট, ঘোঘোট থেকে ক্যানালে। ঋভুদের পুকুরটা ক্যানালের পাশে। পুজোর আগে আগেই ক্যানাল উপচে জল চলে আসবে পুকুরে। তার সঙ্গে চলে আসবে নানারকম মাছ—

চিত্তল কখনও মহাশোলও। তারপর চৈত্র মাসে যখন পুকুরটা শুকিয়ে যাবে তখন জল ছাঁকবে পুটু, বুদুস, আনোয়ার, আরও কতজন মিলে। পায়ের পাতা ভেজে এমন জলে মাঝে মাঝে কাদার "আল" বানিয়ে। তারপর কাদার মধ্যে, জলের নীচের কাদালেপা নরম শ্যাওলা-মাখা মাটিতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কই-মাগুর-শিঙি মাছ। কাদার মধ্যে ওরা মাথা-গুঁজে লুকিয়ে থাকবে। তাদের গায়ে ঋভুর হাতের পাতা পড়তেই তড়বড় করে উঠবে তারা পিছল কাদা ঠেলে। সেই সময়ে কায়দা করে কাঁটা বাঁচিয়ে মাথা আর ঘাড় চেপে ধরে টেনে তুলতে হবে তাদের।

জল যখন হাঁটুভর থাকবে তখন বাঁশের তৈরি "পোলো" ফেলে ফেলে, পোলোর মুখের মধ্য দিয়ে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে মাছ তুলবে ওরা। কত রকম মাছ! জল যখন বেশি থাকবে তখন খেপলা জাল ফেলবে ঋভুর পাড়াতুতো দাদারা। মাথার উপরে এক ঘুরান দিয়েই জালটা যখন জলে ফেলবে তখন সূক্ষ্ম জালের প্রায়-স্বচ্ছ ছাতাটা মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি ঢেকে দেবে। জলের কিনারা থেকে বহুবর্ণ মাছরাঙা এমন চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠবে যেন মনে হবে তার বাড়িতে আগুনই লেগেছে! জল থেকে লাফিয়ে উঠবে পুঁটি-খলসে। খররোদে ঝলসে উঠবে রুপোলি জল। হিরে ফুটবে জলের হাজারো ডালে ডালে। মাঠ থেকে শান্তস্বরে গোরু ডেকে উঠবে হাম্বা-আ-আ করে।

একটি কোনো বিশেষ মুহূর্ত, বিশেষ দৃশ্য; যেমন এই লাল-সাদা ভিজে বকটির এই মুহূর্তে উড়ে আসা; ঋভুর চোখের পর্দার মধ্যে দিয়ে তার মস্তিষ্কের অগণ্য মৃদু-রঙা অন্ধকার চেতনাতে লক্ষ লক্ষ দৃশ্যর মিলন ঘটায়। শুধু দৃশ্য নয়, শব্দ এবং গন্ধেরও।

বকটাকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করতে করতে একটা গোরুর আওয়াজ পেল। গন্ধও। গোরুর গায়ের গন্ধ ভারি ভালবাসে ঋভু। বৃষ্টিতে ভিজে গেলে সে গন্ধ অন্য এক মাত্রা পায়। তেলমুড়ি, বেগুনি, কাঁটালের বিচি ও পাঁপর ভাজার গন্ধের সঙ্গে সোঁদা মাটির গন্ধ আর গোরুর গায়ের গন্ধ মিলে মিশে যায়। দারুণ লাগে ঋভুর। ঋভুর মা ঋভুর গন্ধ সম্বন্ধে এমন সচেতনতা দেখে ওর নাম দিয়েছেন ঠাট্টা করে, "গন্ধ-গোকুল"।

এটা কাদের গোরু, জানে না ঋভু। ভিজতে ভিজতে বড়ো বড়ো সবুজ মুথাঘাসে-ভরা মাঠের মধ্যে দিয়ে গোরুটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। খটখটে দুপুরে গোরুর গায়ে একবকম গন্ধ আর এমন বৃষ্টিব দিনে আরেক রকমের। বড় তীব্র গন্ধ গোরুর গায়ের। জঙ্গলের বাঘের গায়ের গন্ধও বোধহয় এমনই তীব্র। তামাহাটের শিকারি আবু ছাত্তার বলেছিল ঋভুকে।

গোরুটা জলে ভিজে-যাওয়া লেজটা আর লেজের ডগার চুলগুলো ছপাৎ ছপাৎ করে নাড়ছে। এই দৃশ্য দেখলেই ঋভুর ইচ্ছে করে মস্ত একটি সাদা কাগজ এনে গোরুর পেছনে, চার-পাঁচজনে ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে আর বড়ো বড়ো দোয়াতে লাল-নীল-কালো-হলুদ-সবুজ কালি এনে গোরুর লেজে ডুবিয়ে ইচ্ছেমতো রঙের হাঙ্গামা বাধায় সেই কাগজে। মনোমতো সঙ্গী পায় না। কোন্ দোকানে অতবড়ো কাগজ আর অমন মনমতো কালি কিনতে পাওয়া যায়, তাও জানে ও।

বৃষ্টির মধ্যে মাঠ, গাছপালা, বাগান, পুকুর, নদী যে সবুজ-মেশা-নীলচে রুপোলি শাড়ি পরে, কোনোদিন তেমন শাড়ির রঙের বৃষ্টির একটি ছবিও আঁকবে ঋভু বড়ো হয়ে। যে-ছবি কথা বলে, যে ছবি থেকে গন্ধ বেরোয়, গান ঝরে; এমন ছবি আঁকবে ঋভু।

অ্যাই ছেলেটা, ভেলভেলেটা! কী করছিস রে?

চমকে উঠে, ঋভু তাকায়।

বুলবুলি। বুলবুলি পাগলি।

কখন যে ভাবতে ভাবতে, ভিজতে ভিজতে ঋভু হরিসভার পুকুরপাড়ে চলে এসেছে তা খেয়ালই ছিল না।

ঋভু হাসল। বলল, তুই কি করছিস?

আমি? আমি শামুক আর গুগলি তুলতে এসেছি। আর শাক। ভাবলাম, ছোটো-খাটো একটা হেলে সাপ পেলে হেসে..খেলে ভেজে খাই। তো সাপই নাই। দেশে সাপেরও আকাল। সব পালিয়েছে। তারাও কি দেশ স্বাধীন করতে লেগেছে নাকি রে?

আমি কি জানি?

তা ঠিক। তুই কীই বা জানিস। খাস-দাস ভুঁড়িতে চাপড় দিয়ে ঘুরে বেড়াস।

তারপর একটু চুপ করে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে চুল নাড়িয়ে বলল, জানিস রিভে, আমাকে তেল দেওয়ার লোক জুটেছে একটা। ধেড়ে মদ্দ। পাজি ভারি। তো হোক। ঠাকুমা বলে, শরীর আমার পাজি হচ্ছে। শরীর পাজি হলে কী হয় কে জানেরে বাবা! ঠাকুমা কত্থই জানে। পেজোমিতো কত্থ ব্যাটাই করে। তেল কি সবাই দ্যায়? বল? তবু তো দিচ্ছে।

ঋভু কিছু না বলে, তাকিয়ে থাকে বুলবুলির দিকে। খালি শরীরে একটি রঙ উঠে-যাওয়া বেগনে-রঙা শাড়ি পরেছে বুলবুলি। প্রথম শীতের মুঠি-ভরা বেগুনের মতো, ভিজে শাড়ির বাইরে বেরিয়ে আছে তার লালচে কালো উজ্জ্বল একটি উদ্বেল বুক। বৃষ্টিতে ভিজে ঔজ্জ্বল্য বেড়েছে আরো। চিকনতা ফুটে আছে।

ঋভু লজ্জাতে চোখ সরিয়ে নিলে। 'লজ্জা' শব্দটি বুলবুলির অজানা। লজ্জা ঋভুর যে কেন তাও জানে না ঋভু। সে নিজে কতসময়েই খালি গায়ে থাকে। তাকে দেখে তো কারোরই লজ্জা করে না। তবে খালি গা হলে ঋভুর নিজের খুবই সুড়সুড়ি লাগে। খালি-গায়ে তাই ও কমই থাকে। হাওয়া লাগলে সুড়সুড়ি লাগে, রোদ লাগলে সুড়সুড়ি লাগে; বৃষ্টি পড়লে সুড়সুড়ি লাগে তাই খালি গা মোটেই হতে পারে না ও।

বুলবুলির বুকের মতো এমন সুন্দর অথচ ছমছমে গা-শিউরানো দৃশ্য আগে কখনই ও দেখেনি কিন্তু শৈশব আর কৈশোরের চৌকাঠে-দাঁড়ানো তার অনাবিল ঔৎসুক্যে ভরা দুটি চোখ বলে, এ দৃশ্য বড়ো রহস্যময়। তার তখনও অপরিস্ফুট মন বলে, রহস্যই বোধহয় রহস্যের সর্বস্ব।

ঋভু বলল, চলিরে বুলবুলি।

চল্লি কোথায়?

কদমতলায়।

কেন? তুই কি কেষ্টঠাকুর?

না। কদম ফুল তুলবো।

দিবি কাকে?

মমতাজকে।

কোন্ মমতাজ?

শাহাজান মিঞার নাতনি।

কেন? তাকেই কেন? তিস্তা অথবা মুনিয়াকে নয় কেন? ওরাও তো তোর বন্ধুদের বোন। ওদের তোর ভালো লাগে না?

লাগে তো। তোকেও তো ভালো লাগে। ভাগ্। ঠ্যাকার-ন্যাকার করিস না। তুইও! বল না, মমতাজকে কেন?

এমনিই। অতশত ভাবিনি।

ভাব ভাব। ভগমান ভাবাভাবির ক্ষেমতা তো শুধু মানুষকেই দিয়েছেন রে রিভে? গোরু কি বিড়াল কি তোর আমার মতো ভাবতে পারে? হেলে সাপ? বল্? মানুষ হয়ে জন্মেছিস, সবসময়ই ভাববি। তোর জিলা ইস্কুলের মাস্টারেরা এতো শিখিয়েছে আর ওটাই শেখায়নি? ফুঃ। এই জন্যেই তো আমি ইস্কুলে পড়িনি কক্কনো।

ঋভু কোনা কথা না বলে, বলল, চললাম রে। তোর ঠাক্মা কেমন আছে?

ওই আছে। সারাদিন খাই-খাই করে মারে। পাঁচীপিসির মেয়েটাকে দেখেছিস তো? দুধের দাঁত সব পড়ে আসল দাঁত উঠেছে দুটো। সবসময় খাই-খাই। ঠাক্মারও তাই। আমার হয়েছে মরণ! জ্বালিয়ে খেল।

ঋভু, বুলবুলির পাশ কাটিয়ে পুকুর পাড় বেয়ে উঠে এল। এবারে সত্যিই যাবে মমতাজদের বাড়ি। কদমগাছের তলা থেকে কদমফুল কুড়িয়ে নিয়ে।

বৃষ্টি ধরে গেছে। তারপর এই একটু আগে, থেমেই গেল একেবারে। বৃষ্টির পরের পৃথিবী বড়ো আশ্চর্য করে ঋভুকে। এতক্ষণ চুপ করে থাকা পাখিরা হঠাৎই ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। ফিকে সবুজ মুথাঘাসের মাঠে বৃষ্টির জল বয়ে-যাওয়া অগণ্য সব নগণ্য নালার মরে-যাওয়া সরু সরু সোঁতার মধ্যে শুকনো পাটকিলে-রঙা ঘাসের টুকরো আর খড়কুটো আটকে থাকে। তারই উপর হলুদ পা ফেলে শালিকেরা এককা-দোককা খেলে। সল্লি হাঁসের দল এ পুকুর থেকে ও পুকুরে উড়ে যায় তাদের সোনালি ডানার আঁশটে গন্ধকে সোঁদা মাটির গন্ধর মধ্যে চারিয়ে দিয়ে। হঠাৎই বাঁশঝাড়ের গভীরের বাদল-অন্ধকার থেকে হাঁড়িচাচা ডেকে ওঠে। জমিদার বাড়ির ছাদের আলসেতে পায়রা বক্‌কুম-বুকু-বুকু-বুকু-বক্‌কম করে ঘুরে ঘুরে পায়ের নানারকম কেরদানি দেখিয়ে ডাকে। পুরুষ-পায়রা ঘাড়ের পালক ফুলিয়েও কেরদানি মারে। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া পালকগুলি ফোলে না ভালো। চড়াইয়ের ঝাঁক লালমাটির পথে-বিনা নোটিসে কোনো জরুরি মিটিং বসিয়ে দেয়। ঘন ঘন ডানা ঝাপটায়, বিস্তর চেঁচামেচি করে। বৃষ্টি ভেজা লাল ধুলোতে কেউ কেউ সিঁদুরে হয়ে ওঠে। হঠাৎ উমেশদাদুর বাড়ির ভেতর থেকে লাল রোগা সিন্টিপিটিং কুকুরী জোরে দৌড়ে এসে ভুক্‌-ভুক্‌-ভুক্‌ করে ডেকে চড়াইদের মিটিঙের মধ্যে হামলে পড়ে লেজ চালায়। ওর সঙ্গে গতজন্মে কোনো ফয়সালা বাকি ছিল বুঝি চড়াইদের। নইলে খামোখা লেজ-চালিয়ে মিটিং ছত্রভঙ্গ করার কোনো কারণই খুঁজে পায় না ঋভু।

জল-ভেজা গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, জীব-জন্তুর গায়ের গন্ধে, মাঠের গন্ধে, মাটির গন্ধে বুঁদ হয়ে ঋভু মমতাজদের বাড়ির দিকে হেঁটে যায়।

শাহাজান মিঞার দাড়িটা ঠিক ইতিহাসের বইয়ের ছবির শাজাহানের মতো। আর তাঁর ছেলে অওঙ্গজেবও ছবির অওরঙ্গজেবেরই মতো দেখতে। শাজাহান যে নিজের নাতনির নাম কেন মমতাজ দিলেন তা কে জানে! অনেকে এ নিয়ে ঠাট্টাও করেন তাঁকে। তিনি বলেন, মমতাজ হিন্দুস্থানের সকলেরই। কোনো মানুষের সঙ্গেই তার কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই। নূরজাহান নাম দিলেও না হয় বলতে পারতে তোমরা। তাজমহল তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে মমতাজ আর শাজাহানের একার নয়। হিন্দুস্তানের হর-ইনসানের।

মমতাজ যখন মাদ্রাসাতে পড়ত, ঋভু পড়ত পাঠশালায়। মমতাজের দাদা কাসিম ছিল ঋভুর খেলার সাথী। মাদ্রাসার নীচের দিকে কিছু দিন পড়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছিলো কাসিম। শাজাহান যখন খেতে হাল লাগাতেন তখন দুপুরবেলা কাসিম তাঁব খাবার নিয়ে যেত লাল-নীল ফুল-তোলা কলাই করা বাটিতে। মোটা কাপড় দিয়ে তা বেঁধে। গরমের ছুটিতে, যখন প্রথম বৃষ্টির পর মাঠে হাল পড়ে তখন একদিন তা দেখতে কাসিমের সঙ্গে গেছিল। খুব কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করেছিল কি খান শাজাহান মিঞা, কাসিমের দাদু? এমন অসুরের মতো চেহারা ছিল শাজাহান মিঞার যে দুটো তাগড়া বলদকে লেজ ধরে টেনে রাখতে পারতেন তিনি, তা তারা যতই ছুটে যেতে চাক না কেন। সেই কলাই করা বাটি থেকে বেরিয়েছিল পান্তাভাত, একটু কুচো মাছের লাল-চচ্চড়ি, কষে পেঁয়াজ রসুন এবং শুকনোলংকা দিয়ে রাঁধা। তার সঙ্গে গোটা-গোটা দুটি বন পেঁযাজ, চারটি কাঁচালঙ্কা।

ঋভু বলেছিল, ইস, গন্ধ হয়ে যায় না গায়ে পেঁয়াজ-রসুনের? অওরঙ্গজেব চাচা বলেছিল, পেঁয়াজ-রসুন লংকাই তো জীবন! মুসলমানদের এই প্রধান খাদ্য। বেশি করে খাবে, গায়ে জোর আসবে। আর টক খেতে নেই কোনোদিনও।

সেদিন হঠাৎই কী মনে হলো ঋভুর ঠিক করল মমতাজদের বাড়ি আজ যাবে না। তাছাড়া আসল কথা কদমতলিতে ফুল ছিলই না বলতে গেলে।

বাড়ির দিকে ফিরে চলল ঋভু। মনে মনে বলল, আরেকদিন আসব।

মমতাজের মতো সুন্দর কিছু ঋভু তার এই ছোটো জীবনে আর দেখেনি। বৃষ্টির পরে মাঠের উপরে ফিনফিনে ডানার হলুদ ফড়িং উড়ছে শয়ে শয়ে। অন্যদিকে বেগনে আর লাল প্রজাপতি। রামধনু উঠেছে বাঁশঝাড়ের পেছনে। আকাশ হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার পাতে-মোড়া চুড়ো দেখা যাচ্ছে স্বপ্নের মতো। এমন সৌন্দর্যে অভিভূত না হয়ে উপায়ই থাকে না! তবু, ঋভু জানে যে, মমতাজ এই সবকিছুর চেয়েও সুন্দর। তার সালোয়ার-কামিজে সুর্মা-টানা-চোখে, তার গায়ের আতরের গন্ধে, জরির রিবন দিয়ে বাঁধা বেণীর হঠাৎ নাচনে, তার এত্‌লাকে আর তমদ্দুন্‌এ, তার গানের বন্দীশে মমতাজ ঋভুর চেনা-জানার জগৎ পেরিয়ে তার কলকাতা-রংপুরের তাবৎ পরিচিতির বাইরের কোনো অপার্থিব দেশ ও জগতের কথাই মনে পড়িয়ে দেয় বার বার ঋভুকে। ঋভুর কেবলি মনে হয়, ওর সঙ্গে কোথাও তার দেখা হয়েছিল। কোথায়, তা জানে না। বুলবুলির মতো মমতাজও ঋভুর চেয়ে বয়সে বড়ো। মেয়েরা যে বড়ো তাড়াতাড়ি রহস্যময়ী হয়ে যায় তা ঋভু এই বয়সেই জেনেছে এবং জেনে অভিভূত হয়ে গেছে। মেয়েদের প্রতি ওর এক বিশেষ দুর্বলতা আছে। কেন, তা সে জানে না, বোঝেও না।

মমতাজ একদিন ঋভুকে হাসতে হাসতে বলেছিল, "ইয়ে দিল হামারা সাম্‌হালকর হাতমে লেনা, নজাকৎ ইসমে ইত্‌নি হ্যায়, যব্ নজারসে গীড়া, টুটা।"

মানে কি?

ঋভু শুধিয়েছিল।

মমতাজ বলেছিল, তুমি ছোটো আছো, মানে এখনও বুঝবে না। বড়ো যখন হবে তখন বুঝবে।

তবু, বলো না কি?

"আমার এই হৃদয় বড়ো সাবধানে হাতে নিও গো, বড়ো সাবধানে হাতে নিয়ো। সাবধানে হাতে নিয়ো, কারণ এ এতোই কোমল, এতোই ভঙ্গুর, এতোই নাজুক যে, হাত থেকে যদি একবার পড়ে যায় তো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে।"

"হৃদয়" কথাটার মানে বোঝেনি ঋভু। কিন্তু উর্দু এই দুটি লাইনের মানে তাকে এক গভীর বিষণ্ণতা দিয়েছিল। অনেক বড়ো হওয়ার পরও তা মন থেকে মোছেনি। আর মোছেনি মমতাজের মুখটি।

শাজাহান মিঞা, কাসিমের দাদু, একটা খোঁড়া গোরুর গলায় দড়ি ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। গোরুটার রঙ ফিকে-লাল। চোখের চাউনিটি বড়ো করুণ। আদর-যত্নও পায় না বোধহয়। গোরুটি ঋভুর চোখে বড়ো করুণ চোখে তাকাল। গোরুর চোখের মতো উজ্জ্বল, সংবেদনশীল এবং ভাষাবাহী চোখ এক কুকুর ছাড়া খুব কম জানোয়ারেরই আছে। অথচ গোরুর চোখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখার অবকাশ হয় না খুব বেশি মানুষের।

মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল ঋভুর। বলল, চাচা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে? এ কি আপনার?

আর কইস্ না রে বাজান্। এইটা যখন একমাসের তখন মমতাজেরে দিছিল তার খালায়। পরথ দিন আইস্যাই ঠ্যাংটা ভাঙল বেটি, মমতাজেরই লইগ্যা। অত্তটুন বাছুরের লইয়া কেউ উথালি-পাথালি করে? ক? এ গোরু গাভীনও হইল না। লইয়া গেছিলাম তারে পাল খাওয়াইতে তিন-তিনবার। এক্কেরে নন্‌সেন্স। তাই ভাবতাছি কসাইরে বেইচ্যাই দিমু। বদরগঞ্জে হাট আছে তো আজ!

আপনি নিজে যাবেন?

না-না। আমি নিজে যাম ক্যান? শাকলুরে পাঠাম।

বলেই, শাজাহান বুড়ো ঋভুর চোখের দিকে চাইলেন।

চমকে উঠলো ঋভু। গোরুটা যেন তাকে কিছু বলতে চায়। শাজাহান চাচা আরেকবার ঋভুর চোখে চাইল।

ওটা মমতাজের? মমতাজ জানে যে....

নারে বাজান। জানলে কি আর...কিন্তু আমি গরিব মানুষির ছাও, গরিব মানষি। আমি অরে ঘরে রাখুম ক্যামনে। না দিবে দুধ, না চইষবে জমিন। তুই যাবি লইয়া? তো, যা। লইয়া যা। মমতাজ বাড়ি ফিরৎ আইস্যা বাড়ি মাথায় করতোআনে আসল ঘটনাটা জাইন্যা তর কাছে থাকলে গোরুতো মমতাজেরই রইবোনে আর তোদের একখান গাই বেশি হইলে এমন কিছুই যাব-আসবো না। গোবরতো দিবে। আর কিছু দিক আর না দিকে। এর নাম কি জনস? গোরুর দড়িটা ঋভুর হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন শাজাহান।

কি?

নাম একটা জবরদস্তই দিছিল মমতাজ।

নাতিনের আমার কাণ্ড-মাণ্ডই আলাদা।

কি?

জারিনা।

বাঃ।

পছন্দ তোর?

দারুণ।

যা, লইয়া যা। ভালোবাইস্যা লইলি তো? কী বাজান। ক' মোরে।

মমতাজের গোরু। খারাপ বেসে নিতে পারে ঋভু?

ঋভু কদমফুলগুলো শাজাহান মিঞাকে দিয়ে সলজ্জে বলল, মমতাজরে দিবেন।

কী করব সে ছেমড়ি? এগুলা লইয়া?

বলেই, নাকের কাছে তুলে বললেন, মহ্‌কতাছেতো দেহি ব্যাশ। হঠাৎ তুই লইয়া আইলি? চাইছিল না কি স্যা?

না, এমনিই। না এলে তো জারিনাকে পেতাম না।

তা ঠিকই কইছস।

মমতাজও নেই। অন্য কোথাও যাওয়ারও নেই। নিরুদ্দেশে ঘুরে ঘুরে দিনের অনেকখানিই শেষ। অবশ্য বড়ো সুন্দর দিন।

জারিনার গলার দড়ি হাতে ঋভু বাড়ির দিকে চলতে লাগল পাটকিলে পথ বেয়ে। অনেকখানি গিয়ে তারপর মাঠে নেমে হরিসভার পাশ দিয়ে পুকুরপাড় দিয়ে অন্য পথ ধরবে।

চলতে চলতে একবার জারিনার গায়ের গন্ধ শুঁকে নিল ঋভু। নাঃ। আতরের গন্ধও নেই। আবার পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধও নেই কাসিম বা শাজাহান বুড়োর গায়ের মতো।

অন্ধকার হয়ে আসছে। মাথার ওপর দিয়ে বাদুড় উড়ে যাচ্ছে সপসপ করে ভারী ডানা আর উটকো গন্ধ ছড়িয়ে। তাদের কালো কালো ডানায়, রাবারের মতো বিকেলের আলো মুছে দিতে দিতে।

ঋভু মাঠে নামল। মাঠের উপরে এখন সবুজ-রঙা ফড়িং উড়ছে। ঘাস-ফড়িং।

হলুদ-ফড়িংগুলো কোথায় গেল কে জানে?

একদল শালিক হামলে পড়ে তাদের কপা-কপ করে গিলতে লাগল।

হঠাৎ ঋভুর চিন্তা হলো, ঠাকুমা "জারিনা" নামটা নিয়ে নিশ্চয়ই হাঙ্গামা করবেন। করলে, ঋভু এর নাম দেবে মোমবাতি। মমতাজের কথা ঠাকুমা জানেন না এবং কোনোদিন জানবেনও না। জানতে পারলে অবশ্য বিষম বিপদ। কেন মোমবাতি নাম রাখল ঋভু, তা নিয়ে সন্দেহও করবেন না। মোমবাতি

নাম না রাখতে দিলে, ঠিক করল, নাম রাখবে তাজ। এ নামের ব্যাখ্যা চাইলে ঋভু বলবে, ওমা তাজহাটের নাম শোনোনি? এই তাজ হলো তাজহাটের তাজ।

ঋভু একবার পরম স্নেহে জারিনার গলকম্বলে আদর করে দিয়ে ওর নাকে চুমু খেল। সঙ্গে সঙ্গে গোরুর থুথুতে ওর মুখ ভরে গেল। অপ্রস্তুত হলো বটে, কিন্তু জারিনার উপর রাগতে পারল না। ও যে মমতাজেরই গোরু! বাড়িতে যখন ফিরলো ঋভু, তখন সন্ধে হবো হবো। বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে এসে পেছনের দরজা দিয়ে চ্যাগারের বেড়ার আড়াল ভেদ করে ঢুকে গোয়ালঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

বিবাগী বললেন, এ কী? কার গোরু এ? ঋভু?

ঋভু জবাব দেওয়ার আগেই তাপসীও এসে বড়োঘরের বারান্দাতে দাঁড়ালেন। প্রমীলবালাও ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে বিবাগীর ঘরের বারান্দাতে এসে দাঁড়ালেন।

বিবাগী আবারও শুধালেন, কার গোরু এ?

ঋভু প্রায়ান্ধকারে একবার প্রমীলাবালার মুখে চাইল। তারপর তার জীবনের প্রথম মিথ্যে কথাটি বলল। চোখের পাতা কাঁপল। গলা শুকিয়ে এল। ঠাকুমার ভয়ে এবং প্রায়ান্ধকারের ভরসায় বলে ফেলল, হারানো গোরু।

তখন ও জানত না যে এ পৃথিবীতে বেড়ে উঠতে হলে, বেঁচে থাকতে হলে; তাকে অনেকই মিথ্যে কথা বলতে হবে পরম অনিচ্ছাতে।

হারানো গোরু? তাহলে তুই বাড়ি বয়ে আনলি কেন? একে তো খোঁয়াড়েই দিতে হয়।

বলেই ডাকলেন, রঘু সিং।

খোঁয়াড়ে তো যে গোরু-ছাগল ক্ষতি করে, তাদেরই দিতে হয়। একে কেন?

ঋভু বলল।

না-দিলে গোরুর মালিক জানবে কি করে? সে তো তাকেই গোরু-চোর বলবে।

বলবে না।

তার মানে?

তাপসী বললেন এবারে। কার গোরু, তাহলে তুই জানিস? এ মা! এ যে খোঁড়া গোরু। বল্ কার গোরু ধরে নিয়ে এলি?

গোরুটা যেন মানুষের কথা বোঝে। বুঝে, ভয় পেয়ে, সে ঋভুর আরো কাছে সরে এল। ঋভু তার গলকম্বলে ডান হাত দিয়ে আদর করে বলল, একে রাখব আমি ঠাকুমা। কালি আর ফুলমণির সঙ্গে থাকবে।

তাপসী বললেন, পরের গোরু গোয়ালে রেখে শেষে কি চোরের দায়ে পড়ব বাড়ি শুদ্ধু মানুষ? এ কেমন অদ্ভুত আবদার?

প্রমীলাবালা বললেন, ছাড়ান্ দাও তো তাপু। হাতে ধইর্যা লইয়া আইছে পোলাডা। শখ হইছে যখন তখন থাকুক এহনে। মালিকে যদি খোঁজ করে তখন ফিরৎ দিয়া দিলেই তো ল্যাঠা চুকবোনে। ভরসন্ধ্যায় এ গোরুরে কোথায় ছাইড়্যা দিবা?

এমন বাজে আবদারে আবদারে ছেলেটার মাথা কিন্তু আপনিই খাচ্ছেন মা। চুরিকে প্রশ্রয় দিতে বলেন আপনি?

চুরি কইও না তাপু। পোলাপানের মন বোঝা না তোমরা, শুদামুদা মেলা কথা কও। জান্‌বা ক্যাম্‌নে যে, মালিকে এ গোরুরে খ্যাদাইয়া দ্যায় নাই? হয়তো এ গোরু দুধই দিব না।

তারপরে বললেন, অ রঘু! অরে গোয়ালে ঢুকাইয়া জাবনা দিয়া দিস। কাইল সকালে ভাইব্যা—চিন্তা কইর্যা দেখা যাইবোনে।

প্রমীলাবালার আদেশই এ বাড়িতে শেষ কথা।

ঋভু হাঁফ ছেড়ে বাচল। যে-ঠাকুমার ভয়ে গোরুর মালিকের নাম সে বলতে পারছিল না সেই ঠাকুমারই জন্যে আপাতত বাঁচল ও। কালকের কথা কালকে।

তাপসী বিরক্তির গলায় বললেন, এবারে হাত-মুখ ধুয়ে, দয়া করে কিছু খেয়ে নিয়ে পড়তে বোসো। মাঠে-ঘাঠে গোরুর ল্যাজ ধরে ঘুরে বেড়ালে তো চলবে না।

প্রমীলাবালা একবার অপাঙ্গে চাইলেন তাপসীর দিকে। তারপর নাতির মালিকানা বউমার হাতে তখনকার মতো তুলে দিয়ে আবার ঠাকুর ঘরে ফিরে গেলেন।

বার-বাড়ির চেয়ার-টেবলে, সামনে লণ্ঠন রেখে পড়তে বসে, ঋভুর কেবলই গোরুটার কথা মনে হচ্ছিল। গোয়ালঘরের গোবর, খড়, খোল, চোনা ইত্যাদির গন্ধ গোরুর গায়ের গন্ধের সঙ্গে মাখামাখি হয়েছিল।

গোরুটার রঙ ঠিক লাল নয়, গোলাপি গোলাপি। ঋভুর ইচ্ছে করছিল, গোয়ালঘরে গিয়ে দেখে আসে মমতাজের গোরু কেমন আছে? খুশি আছে তো?

মমতাজের সঙ্গে কালই দেখা করবে ও। করে, ধন্যবাদ দেবে। কাসিমকে সকালে কোথায় পাওয়া যাবে তা ও জানে। কাসিমকে ধরে, যাবে মমতাজদের বাড়ি। জানে না কেন, মমতাজের জন্যে ওর মন কেমন করে। শাপলা-বিলের শাপলার ডাঁটি থেকে যখন ফিনফিনে পাখনার জল-ফড়িং ওড়ে, মাছরাঙা পাখি দুর্বোধ্য, অতিদ্রুত ভাষায় ডাকতে ডাকতে ব্যস্ততার প্রতীকের মতো দূরে উড়ে যায় তার দ্রুত ডানার বিস্তার ও সংকোচনে; উড্ডীন, তাকে যখন গোলাকৃতি, বহুরঙা, দ্রুত অপস্রিয়মান কোনো জিনিস বলে মনে হয়; যখন বুলবুলি পাগলি মন-উদাস করে গান গাইতে গাইতে কাদা-জলে মাখামাখি হয়ে শাপলার ডাঁটা তোলে, সকালের এক-আকাশ নীল আর সোনালি রোদ্দুর যখন সেই গানের বিষণ্ণতায় নীল-রঙা হয়ে যায় তখন হঠাৎ করে ঋভুর মমতাজের কথাই মনে পড়ে। ঈদের দিনের গাঢ়-নীল রঙা কাজ-করা সালোয়ার-কামিজ পরে, গলা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া মখমলের উড়নি ঝুলিয়ে লাল পায়ে নীল-রঙা চকমকে চটি পরে মমতাজ যখন তার বন্ধুদের সঙ্গে বেলুন ওড়ায়, যখন সুর্মা টানা চোখে আর আতর-গন্ধী বেশে ঋভুকে হাতছানি দিয়ে ডাকে তখন ঋভু সমুদ্র অথবা পাহাড় অথবা মরুভূমি পেরিয়েও দৌড়ে যেতে পারে। ভাগ্যিস মাঠের মধ্যে বা পথে দাঁড়িয়েই ডাকে মমতাজ, যে-মাঠে মধুফুলের ঝাড়, যে পথের পাশে লজ্জাবতীর ঘন সবুজ ফিনফিনে আস্তরণ, নানা-রঙা ব্যাঙের ছাতা, যেখানে কচু গাছের পাতার ছাতার নীচে বসে দার্শনিক নির্বাক ব্যাঙ গম্ভীর চোখে চেয়ে থাকে ওদেরই দিকে, সেই পথে। মমতাজকে মাঝে মাঝে দেখতে না পেলে কী যে হতো জানে না ঋভু।

ঋভু, কিছুদিন হলো একটা কথা বুঝতে শুরু করেছে। কথাটা হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। ঠাকুমা একদিন বলছিলেন মাকে, ঋভু শুনতে পেয়েছিল; ছাওয়ালের বয়স তো কিছুই নয়, এখনই যেন বয়সে ডাক দিছে বইল্যা মনে হয়।

তাপসী বিরক্তি-মেশানো অবাক গলায় বলেছিলেন, "বয়সে ডাক দেওয়াটা" আবার কি ব্যাপার?

ঠাকুমা বলেছিলেন, তাও জানো না! ছাওয়াল কী মাইয়া হক্কলরেই বয়সে ডাক দেয়। শরীরের মধ্যে রিকিঝিকি করে। কী য্যান্ চ্যাই, কী য্যান্ চাই এমন একটা ভাব মনরে উদাস কইর‍্যা ফ্যালায়।

মা হেসে বলেছিলেন, কী যে বলেন মা। কীই বা বয়স ঋভুর। তবে এটা ঠিক যে, রংপুরে এসে এই প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে ও যেন কেমন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যাচ্ছে। এটা ভালো কি মন্দ জানি না আমি। কিন্তু এই বদলে-যাওয়াটা দেখে ওর জন্যে বেশ চিন্তা হয় আমার।

অতো চিন্তার কি আছে তাপু! মানষের একটাই জীবন। সে-জীবনের লইয়া মানষে যা-কিছু তাই করতেই যদি না পারে তো বাঁইচ্যা থাইক্যা লাভ কি কও? আমরা তো এই জীবনে ঠিক জীবনের স্বাদ পাই নাই। অভ্যাস। সকাল থিকা সন্ধ্যা একটা একঘেইয়া অভ্যাস। থোড়-বড়ি-খাড়া। খাড়া-বাড়ি-থোড়। তোমাগো জীবন তাও একটু অন্যরকমের। হের-ফের আছে কিছু। আর ঋভু বা অরাদের জীবনে যদি ওই ছ্যামড়া-ছেমড়িরা জীবনরে লইয়া ছিনিমিনিই না খ্যালেলো, শুদামুদা নিঃশ্বাস ফেইল্যা অর প্রশ্বাস লইয়াই জীবন কাটাইয়া চইল্যা গেল তয় লাভডা কি? কও? অগোর মতোই হইতে দাও। কোনোরকম বাধাই দিও না। ওরা যখন বড়ো হইবোনে তখন এ পৃথিবী দুঃখে-কষ্টে এক্কেরে ভইরা যাইব। সে দুঃখ-কষ্টর কথা তোমরা ভাবনার মধ্যেও আনতে পারবা না। গাছ থাকব না, পাখি

ডাকব না, গোলাভরা ধান, পুকুর-ভরা মাছ কিছুই থাকব না। তুমি দেইখ্যা লইও তাপু। হেই লইগাই কই যে, অগো কোনা কিছুতেই বাধা দিতে যাইও না। অগোর ভবিষ্যৎ বড়োই অন্ধকার।

বলেন কি মা? ওরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হবে। কত সুযোগ-সুবিধা, মাথা-উঁচু-করে বাঁচার কতো আনন্দ, নিজেদের স্বাধীন ভারতবর্ষে ওরাই তো মালিক হবে। ওদের সঙ্গে আমাদের তুলনা!

দেইখ্যোনে! মাস্টারেরা যারে "স্বাধীন হওয়া" কয় আমার স্যা স্বাধীনতায় বিশ্বাস নাই। স্বাধীনতা ভিতরের জিনিস তাপু, লোক-দেখাইন্যা জিনিস না। ব্রিটিশগো তাড়াইলেই আমরা কিছু দশমাথা-ওয়ালা মানুষ হইয়া উঠবো না। যে দ্যাশে লাঠি লইয়া না খাড়াইয়া রইলে কেউ কারো কামই করে না, লাল-পাগড়ির ভয়ে যে দ্যাশে মান্‌ষে তার খেয়াল-খুশি, প্রাণের সুখ, যা-খুশি-তাই করনের ইচ্ছারে প্রাণপণে দমন কইর‍্যা রাহে, তারা স্বাধীনতার মর্ম ঠিক বোঝে না। স্বাধীনতা মানে কি আরে ধেই-ধেই নৃত্য? স্বাধীনতার আরেক নাম নিজের নিজের ইচ্ছায় পরাধীনতা বরণ। লোকে ভাবতাছে ইংরেজরা চইল্যা গ্যালেই আমাগো সব সমস্যা দূর হইয়া যাইবো। দেইখ্যা লইও তুমি, আসল সব সমস্যার শুরু হইবো সেইক্ষণ থিক্যাই। জানি না, মাস্টার নিজেও এ কথা জানে কিনা। তবে সমস্যার ভয়ে ইংরেজগো জুতা-লাথি খাইয়া বাঁচনেরও তো মানে নাই কোনো।

অনেক অনেক কথা ঋভু শোনে, মা, ঠাকুমা, বড়ো কাকু, নিমুকাকুর মুখে। যখন সেজোকাকু থাকে, তার মুখেও। কিন্তু সে-সব কথার মানে পুরোপুরি বোঝে না। না-বুঝলেও শুনতে খুব ভালো লাগে। বড়োদের জগতে যে সেও একদিন প্রবেশ করবে এ কথা ভেবেই ওর মন আনন্দে নেচে ওঠে।

মা অনেক সময় ওকে বলেন, তুমি একটি পাকা ছেলে! ছোটোরা ছোটোদেরই মতো হবে। তোমার স্বভাব যেন কেমন হচ্ছে। ঘর-কুনো, একা-একা। দেখছি, ছেলেদের চেয়ে তোমার মেয়েদের সঙ্গেই মিশতে বেশি ভালো লাগে। ছেলেরা ছেলেদেরই মতো হওয়া উচিত।

ঋভু জানে না, মা কেন এ কথা বলেন! ছেলে বন্ধুও তার কম নেই। ছেলেরাও তো তাকে কম ভালোবাসে না। তবে কেন যে মা এমন বলেন, তিনিই জানেন।

পড়াশোনা শেষ করে যখন খেতে বসেছিল রান্নাঘরে তখন বৃষ্টি নামল ঝুপঝুপিয়ে। মুসুরির ডালের খিচুড়ি, গাওয়া ঘি, কড়কড়ে করে আলু ভাজা, কাঁটালের বীচি ভাজা, শুকনো লংকা ভাজা আর নরম ওমলেট, কাঁচা লংকা পেঁয়াজ-দেওয়া। হাপুস-হুপুস করে ঋভু খায়। রান্নাঘরের খড়ের চালে বৃষ্টি ফিস্‌ফিস করে। কিন্তু যখন বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে বড়ঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাত-পা-মাথা ধুয়ে মুছে শুতে যায় তখন টিনের চালে বৃষ্টির টাপুর টুপুর শব্দ শোনে। ভারী আবেশ ঘুম আসে তখন। চ্যাগারের বেনার ওপাশে বাগানের পেছনে যেখানে আগাছা আর জার্মান-জঙ্গলের ঝাড় সেখানে সাপে ব্যাঙ ধরে। অদ্ভুত শব্দ হয় একটা। বৃষ্টি থেমে গেলেই রাতপাখিরা ডাকতে থাকে। বাদুড়েরা এসে লিচুগাছে যে-ক'টা লিচু তখনও আছে তাদের সাবড়ে দেয় হুটোপাটি করে। এমন রাতেই গোয়ালঘরে জোড়া-গোখরোরা ফুলমণি গাইয়ের পেছনের দুটি পা তাদের শরীর আর লেজ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে, বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খেয়ে যায়। গোয়ালঘরের মধ্যের ইঁদুরের গর্ত দিয়ে তার আলুখেতের মধ্যের গর্তর অন্যমুখে ঢুকে উঠে আসে।

মমতাজের গোরু জারিনার বাঁটে তো দুধ নেই। সে রাগে যদি সাপেরা তাকে কামড়ে দেয়? তাহলে কি হবে তা ভেবেই ঋভুর ভয় করে। আবারও ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির টাপুর-টুপুর নূপুরের শব্দে নকশি-কাঁথা গায়ে জড়িয়ে মায়ের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে ঋভু শুয়ে থাকে। মায়ের গায়ের গন্ধ; বাতাবিলেবুর ফুলের গন্ধর সঙ্গে, গোঁড়ালেবুর গন্ধের সঙ্গে, গোয়ালঘরের আর ঢেঁকি ঘরের গন্ধের সঙ্গে মিশে যায়। বাঁশঝাড়ের গন্ধ ভেসে আসে ভেজা-বকের গায়ের গন্ধর সঙ্গে। হরিসভায় চব্বিশ-প্রহর কীর্তন হয়। নৌকাবিলাস পালা। আরো কত পালা। মূল গায়েনের গলার গান বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে খোলের বোল আর কঠিন তালের লয়ের সঙ্গে ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসে :

"নয় আনা দিব কড়ি পার কর তাড়াতাড়ি।
ন-আনাতে হবে না, ন-আনাতে হবে না।
দশ-আনা দিব কড়ি, পার কর তাড়াতাড়ি!
দশ-আনাতে হবে না, দশ আনাতে হবে না!"

ঋভু ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের দেশের ঋভু স্বপ্নের দেশে গিয়ে পৌঁছয়। শাপলা-বিল, পদ্ম-বিল, বুলবুলি পাগলির বিধুর-করা গান, তারার মতো দেখতে মিনা-করা মমতাজের পেতলের দুল, আর নাকের নথ, স্বপ্নের মধ্যে ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে। দূরে, বহুদূরে চলে যায় ঋভু। যেখানে পড়া নেই, স্কুল নেই, শাসন নেই, পাঠশালার পণ্ডিতমশায়ের বেত নেই, জিলা স্কুলের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা নেই, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো বিরোধ নেই, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের স্বাধীনতায় কোনো তফাত নেই। সেই তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, মধুফুলের ঝোপের মধ্যে দিয়ে, নানারঙা সাপ-জড়ানো কেয়াবনের পাশ দিয়ে ঘোঘোটের ক্যানাল দিয়ে ভেসে অদেখা তিস্তার দিকে মমতাজের হাত ধরে দৌড়ে, দ্রুত দৌড়ে যায় ঋভু। স্বপ্নে।

ঘরের মধ্যে কথা-বলাবলির শব্দে ঋভুর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানাতে উঠে বসে ঋভু দেখল, সেজকাকু এসেছে।

মাস্টারকাকা। মা, ঠাকুমা, বড়োকাকু, নিমুকাকু সকলেই বড় ঘরে। সেজোকাকুর জন্যে খিচুড়ি গরম করে গরম ভাজা-ভুজি, অমলেট করে খেতে দিয়েছেন মা। সকলে কথা বলছেন। সেজকাকুর মুখ ভর্তি দাড়ি। দাড়ি গোঁফ না-কাটাতে জঙ্গলের মতো দেখাচ্ছে মুখটি।

কিরে ঋভু? ঘুম ভেঙে গেল?

সেজোকাকু বললেন।

ঋভু উঠে বসে বলল, কখন এলে?

তুই ঘুমিয়ে পড়ার একটু পরেই। কেমন আছিস?

ভালো।

বাংলা পড়া কেমন হচ্ছে? রাজকাহিনী পড়া হচ্ছে? শিবাজীর উপরে যে বইটা তোকে এনে দিয়েছিলাম বম্বে থেকে 'ছত্রপতি' সেটা পড়া শুরু করেছিস?

স্কুলেরই অ্যাতো পড়া!

ওসব পড়া ত থাকবেই। টাই-ঝুলিয়ে সাহেবের আর মাড়োয়ারি-সিন্ধিদের পা-চাটার চাকরির জন্যেই ওই সব পড়াশুনো। এই সব বই পড়বি। দেশে কোটি কোটি মানুষের চেহারার জীব আছে রে ঋভু, মানুষ নেই। ওই সব বই পড়। মানুষ হয়ে উঠবি তুই।

তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল সেজকাকু, একজন লোক।

কে লোক?

একজন হেকিম।

কোথায় দেখা হলো তোর সঙ্গে?

আমাদের বাড়ির ঠিক সামনের রাস্তার উপরে যে বড়ো কাঠটগরের গাছটা আছে তারই নীচে সে শতরঞ্জি বিছিয়ে জড়ি-বটি নিয়ে বসে থাকতো রোজ দুপুরে। হেকিম।

অন্য কেউ বাড়িতে থাকত না তখন?

না। নিমুকাকু স্কুলে পড়াতে যেতেন। মা বই পড়তেন। ঠাকুমা আচার-বড়ি দিতেন আর বড়কাকু ঘুমোতেন।

আর তুই সেই হেকিমের সঙ্গে আড্ডা মারতি। তাই না?

ওতো প্রায়ই আসে। তিনচার দিন পরে আবার চলে যায়।

ওটা পুলিশের স্পাই। ওর নাম আজিজ্ মিঞা। ঘাগু। ওর সঙ্গে একটাও কথা বলবি না। কবে কথা হয়েছিল? মাস্টার শুধোলেন এবারে।

চার-পাঁচদিন আগে।

বিপিন আর মাধব কবে এসেছিল বি-দাদা?

পরশু।

বিবাগী কাকা বললেন।

সেজকাকু বললেন, ওই হেকিমটা তো একটা টিকটিকি! পুলিশের লোক। সি আই ডি'র। তোমরা কী যে কর। ঋভু দেখতে পায়, আর তুমি ঘুমোও। এই ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই বাঙালি গেল। যাই, রঘুকে জিগেস করতে হবে।

সেজোকাকু, নিমুকাকু যে-ঘরে শোন, বাইরের ঘরে, সেই ঘরেই শোবেন।

সেজোকাকু চলে গেলে, তাপসী বললেন, খবরদার। কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে কোনো কথাই বলবে না তুমি। মনে থাকে যেন! তুমি কি চাও সেজকাকু তোমার জন্যে জেলে পচেন বা তাঁর ফাঁসি হয়ে যায়?

প্রমীলাবালা বললেন, পরিচিত লোকদের সাথেও তোর সেজকাকু সম্বন্ধে একখান কথাও কবা না ঋভু! ছাওয়ালডা এতোদিন পরে বাড়ি আইল এহনে রাতটাও থাকে কি না দ্যাহো। বিপিন আর মাধবেরেও বলিহারী যাই! দ্যাশ স্বাধীন করতাছে অথচ এতটুকু কমোনছেন্স না কী কও তোমরা; তাও নাই। লজ্জা, লজ্জা।

সেজোকাকু চলে গেলে ঋভু আবার কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

ভোরের আলো সবচেয়ে আগে পুব দিকের টিনের দেওয়ালের সূক্ষ্ম ফুটো-ফাটা দিয়ে অগণ্য চিকন সার্চ-লাইটের মতো ঘরে ঢোকে। বাইরে পাখিরা ডাকাডাকি শুরু করে পুলক ভরে। কত যে পাখি! সকলের নামও জানে না ঋভু। হাঁসেদের ঘরে হাঁসেরা মৃদু প্যাঁক-প্যাঁকানি শুরু করে দেয়। ঋভু কখন গিয়ে তাদের ঘরের দরজা খুলে মুক্ত করবে তাদের। সেই অপেক্ষায় থাকে। মুক্ত করে দিতেই প্যাঁ-এক-প্যাঁক করে জোরে ডাকতে ডাকতে হাঁসা-হাঁসিরা হরজাই-রঙা কোমর আর লেজ দুলিয়ে গোলাপি রঙা পায়ের পাতা থপথপিয়ে হরিসভার পুকুরের দিকে দৌড়ে যায়। ঋভুও যায় রোজ তাদের সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে। তারপর প্রতিটি হাঁসা-হাঁসি এক এক করে মাঠ থেকে এক এক উড়োনে গিয়ে ঝপাং ঝপাং করে জলে পড়ে। সকালের পুকুরের নিস্তরঙ্গ জল ছিটকে ছিটকে ওঠে। পুকুরপাড়ের ডানদিকের ঝুঁকে-পড়া নিস্তব্ধ, শান্ত স্নিগ্ধ ভোরের গাছগাছালি চম্‌কে চম্‌কে ওঠে সেই জল-ছল্‌কানিতে। পাখিরা চম্‌কে গিয়ে চুপ করে যায় ডালে ডালে।

প্রতিটি হাঁস জলে গিয়ে না-পড়া পর্যন্ত ঋভু দাঁড়িয়ে থাকে পাড়ে। তারপর বাড়ি ফিরে মুখ-হাত ধোয়।

আজকাল ঋভুকে এক নতুন কিছুতে পেয়েছে। সেটা অসুখ না সুখ তা ঋভু জানে না। কিন্তু সে কথা কাউকে বলতে পর্যন্ত পারে না। যখনই ও একা একা থাকে, কোনো নির্জন পথে দৌড়ে যায়, ওর পা দুটি মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে যায়, পুকুরপাড় থেকে জল এক উড়ানে, উড়ে-যাওয়া হাঁসেদেরই মতো ও উড়তে থাকে। উলটোদিক থেকে কোনো মানুষ এলে ওর পা দুটি আবার আলতো করে মাটি ছোঁয়। ও যে পাখির মতো উড়তে পারে এ কথাটি জেনে, নিজে এক গভীর বিস্ময় ও গোপন আনন্দবোধ করে। অথচ এ কথা কাউকেই ও বলতে পারে না। বললে, কেউ বিশ্বাসই করবে না। তাই বলে না।

নির্জন বনপথে একা হাঁটলে কারা যেন ওর সঙ্গে কথা বলে। ইদানীং একটা স্বপ্ন প্রায়ই দেখে ঋভু। ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে যে পথ চলে গেছে সোজা বাঁ দিকে, খোঁয়াড় আর শংকামারীর শ্মশান

পেরিয়ে সে পথ কোথায় গেছে তা সে জানে না, কিন্তু সেই পথের ধুলোয় দাঁড়িয়ে সে চেয়ে থাকে স্বপ্নের মধ্যে। দু পাশের হরেক গাছ-গাছালি, বাঁশবন, বেতবন, কলাবন, কেয়াবনের মধ্যে দিয়ে ফ্যাকাসে লাল ধুলোর পথটি ক্রমশ সরু হতে হতে হতে অনেক অনেক দূরে গিয়ে একটি আঙুলেরই মতো সরু হয়ে যায়। ঋভু পথে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে থাকে; পথ যেদিকে যায়।

পথ কোথায় যায়? পায়ে পায়ে মানুষ কোথায় গিয়ে পৌঁছয় পথ বেয়ে? পথের শেষে কি আছে? পথ কি মানুষকে কোথাও পৌঁছে দেয়, না কি শুধুই হাঁটায়? একটি গন্তব্যে পৌঁছে যাবার পর, পথ বেয়ে; মানুষের কি কোনও অন্যতর গন্তব্যে যাবার থাকে?

স্বপ্নের মধ্যে এই ভাবনা, এই স্থবির অথচ দ্রুতগতি দৃশ্য আজকাল ও প্রায়ই দেখে।

কে যেন ঋভুকে ফিসফিস করে বলে তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে ঋভু। অনেক পথ মাড়িয়ে, অনেক ধুলো উড়িয়ে।

কেন? বা কোথায়? তা বলে না সেই অদৃশ্য মানুষের স্বর কিন্তু কেবলি বলে, তোমাকে যেতে হবে, পথ চলতে হবে; এক গন্তব্য থেকে অন্যতর গন্তব্যে পৌঁছতে হবে জীবনভর।

স্বপ্নটা যেই ভেঙে যায়, ঋভু আবার ওর নিজের চেনা ঋভু হয়ে যায়। সেই স্বপ্নিল, ক্রমশ দূরে যেতে যেতে সরু হয়ে যাওয়া পথের রহস্যময়তা আর থাকে না। কানের মধ্যে পথ-পাশের গাছপালার পাতার খসস্-খস আর সেই গা-ছম্‌ছম্-করা ফিসফিসানি আর শোনা যায় না।

তখনও আলো ফোটেনি কিন্তু আলোর আভাস ফুটেছে। ঋভু আশ্লেষে পাশ ফিরে শুল। এমন সময় প্রমীলাবালা, ঋভু আর তার মায়ের কাছে এসে চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, তাপু। ঋভু, তোমরা উইঠ্যা পড়ো। পুলিশে বাড়ি ঘিরা্যা ফ্যালাইছে।

তাপসী ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, কী করে জানলেন মা?

অনেকক্ষণ ধইর‍্যাই পায়ের শব্দ পাইতাছিলাম। হবিষ্য-ঘরের দিকের জানালা খুইল্যা এহনে তো দ্যাখলামই। আজ মাস্টারকে ছাড়বোনা নে ওরা। ক্যান যে পোলাডা আইল!

তাপসীর গায় অপরাধবোধ লাগল।

বললেন, কী হবে মা? ঋভুর জন্যেই....

হঠাৎ ঘুম-ভাঙা ঋভুর বুকটা অপরাধবোধে পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠল। নীরবে সে তার মায়ের আর ঠাকুমার মুখে চেয়ে থাকল। প্রমীলাবালা বললেন, পোলাপান ঋভুর কি দোষ? দোষ তো ওই মাধব আর বিপিন ওই দুই দামড়ার। ছাগলেরা দ্যাশ স্বাধীন করে! কী কম্যু আর!

বলেই, ঠাকুমা তাঁর বালিশের তলা থেকে কালো মতো কী একটা জিনিস নিয়ে তাঁর কোমরে গুঁজে ভালো করে শাড়ি দিয়ে ঢেকে নিলেন।

নিয়েই, ঋভুকে বললেন, খবরদার। কাউরে যদি কইছস।

বলেই, দরজা খুললেন ঘরের। মায়ের পিছু পিছু ঋভুও এসে বড়ঘরের বারান্দাতে দাঁড়াল। প্রমীলাবালা উত্তেজিত স্বরে ডাকলেন, বিবাগী। নিমু! রঘু!

রঘু বোধহয় গোয়ালঘরে ছিল। উত্তর দিল না। বড়োকাকুর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল।

নিমুকাকু দরজা খুলে বেরিয়েই ডান হাতের পাতা এবং জোড়া আঙুলগুলি দিয়ে শূন্যে এমন এক দ্রুত তরঙ্গ তুললেন যে তাতে মনে হলো, পাখি উড়ে যাওয়ার কথাই বোঝাচ্ছেন উনি।

ঠাকুমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলো ঋভু, তাঁর কোঁচকানো বিরক্ত ভুরু দুটি আবার টানটান হয়ে গেল। চোয়াল আর চিবুক যেন নরম হয়ে এল।

প্রমীলাবালা বললেন, তাহলে যাইয়া অতিথিগো দরজা খুইল্যা দে নিমু আর তর জমিদার-বন্ধু বিবাগীরে দরজা ধাক্কাইয়া উঠা। ছাওয়াল ধরছিলাম বটে প্যাটে!

বিবাগীকাকুকে উঠিয়ে, নিমুকাকু বললেন, বিবাগী তুই পিছনের দরজা খোল। আমি যাচ্ছি সামনের দরজা খুলতে।

দুজনে দুদিকে গিয়ে দুই দরজা খুলতেই দারোগার সঙ্গে প্রায় জনা-পনেরো পুলিশ উঠোনে দাঁড়াল। খাকি-রঙা শোলার টুপি দারোগার মাথায়। হাঁটুর নিচু অবধি খাকি মোজা। লাল বুট জুতো।

খাকি হাফ-প্যান্ট। লম্বা ঝুলের। ঢল্‌ঝল্‌ করছে। খাকি শার্ট তার ভিতরে গোঁজা। লাল-রঙা, চওড়া চামড়ার বেল্টের সঙ্গে বাঁদিকে চামড়ার "হোলস্টারে" রিভলবার ঝুলছে। গুলি রাখার জন্যে বেল্টের মধ্যেই খাঁজ-খাঁজ কাটা। তার মধ্যে মধ্যে রিভলবারের গুলি। উপরের পেতলের অংশ চকচক করছে সকালের প্রথম রোদে। কনস্টেবলদের মধ্যে একজনের হাতে রাইফেল। আর সকলের হাতেই লাঠি। মাথায় লাল পাগড়ি। যারা মুসলমান, তাদের মাথায় লাল-ফেজ টুপি। পেছন দিকে ঝালর নামানো। প্রত্যেকের পায় কালো বুট ও খাকি মোজা।

এখন সকলেই চুপচাপ। দারোগা, পুলিশেরা, বড়োকাকু; নিমুকাকু।

প্রমীলাবালাই প্রথমে কথা বললেন।

কী চাই? কারে চাই?

মাস্টারবাবুকে।

স্যা তো নাই।

কাল রাতে তো তিনি এসেছেন। আমরা খবর পেয়েছি। বেরিয়ে যে যাননি সে খবরও আমাদের কাছে আছে।

না। আসে নাই।

ঋভু চমকে চাইল ঠাকুমার মুখে। অম্লানবদনে ঠাকুমা এমন মিথ্যে কথাটা বললেন্।

একজন বললেন, আমরা জানি, উনি বাড়িতেই আছেন।

আমরা প্রত্যেক ঘর সার্চ করব।

দারোগা বললেন।

তা করেন। কিন্তু ঠাকুর-ঘরে জুতা না খুইল্যা ঢোকেন না য্যান।

প্রমীলাবালার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা দারোগাবাবুকে একটু থমকে দিল। উনি বললেন, ঠিক আছে। আগে ঠাকুরঘরটাই দেখব।

হাঁসা-হাঁসিরা ফিসফিস হিসহিস প্যাঁ-এক্ করছিল। ঋভু তাদের ঘর থেকে বের করে পুকুরপাড়ের দিকে চলল। কিন্তু বাইরের গেট পেরোতেই দেখল বাড়ির সবদিকে লাল পাগড়ি আর ফেজ মাথায় দিয়ে চার-পাঁচ হাত বাদে বাদে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

তারা ঋভুকে আটকাল। বলল, এখন তো বাইরে যাওয়া চলবে না খোকা। ভিতরে যাও।

হাঁসা-হাঁসি, আমার হাঁসা-হাঁসি। বললো, ঋভু।

না। যাওয়া চলবে না।

ঋভুকে পুলিশেরা আটকাল বটে কিন্তু হাঁসা-হাঁসিরা পুলিশদের নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে পুলিশদের বগল-তলা দিয়ে তাদের বুট পরা দু পায়ের ফাঁক দিয়ে হেলতে-দুলতে লেজ নাড়াতে নাড়াতে দ্রুত চলে যেতে লাগল হরিসভার পুকুরপারের দিকে।

উঠোনে ফিরে আসতে আসতে ঋভু ভাবছিল, সেজকাকু কখন পালিয়ে গেলেন বাড়ি ছেড়ে? পুলিশরা জানতেই যদি পারল যে রাতে উনি বাড়ি ফিরেছেন তাহলে উনি পালিয়েই বা গেলেন কেমন করে? সব ঘরে ঢুকে খাটের তলায়, শুয়ে, বাক্স,-প্যাঁটরা আলমারি খুলে, ঘেঁটে পুলিশেরা সার্চ করল।

কোথাওই সেজকাকুকে খুঁজে না-পেয়ে রঘু সিং এবং ঋভুকে জেরা শুরু করলেন দারোগা। ঠাকুমা চোখের ইশরাতে যা বলার আগেই ওদের বলে দিয়েছিলেন।

ওরা দুজনেই বলল যে, কাল রাতে উনি আসেননি।

বড়ো ঘর থেকে একজন কনস্টেবল সেজকাকুর খিচুড়ির থালা আর বাটি গেলাস এনে দেখিয়ে বলল, এতে খেয়েছিল কে? আর তো কোনো থালা-গেলাস নেই। এ কোন্ জামাই? রাতের অতিথি?

কথাটা শুনেই মা দারোগাকে ইংরিজিতে খুব একটা কঠিন কথা বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে দারোগা সেই পুলিশকে মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন।

প্রমীলাবালা বললেন, ঋভু খাইছিল। মানে, আমার নাতি। ও ঘরেই খায় রোজ।

দারোগা বললেন, এবারে ওকেই বলতে দিন। কি খোকা? কে খেয়েছিল?

আমি। ঋভু বলল, দারোগার চোখে চেয়ে।

সত্যি বলছ? না, থানায় নিয়ে গিয়ে ঠ্যাঙানি দিতে হবে?

ঋভু এবারে মিথ্যাটাকে চড়ের মতো চটাস করে দারোগার মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, সত্যি বলছি।

রঘু সিং বলল, পবননন্দন কি কিরা, হনুমানজীকি কসম, মাস্টার দাদাবাবু আজ দুমাস হলো আসেননি।

ঠিক বলছিস?

দারোগা বললেন।

বিলকুল ঠিক। ঠিক নেহি তো ক্যা ঝুট?

ঋভুর মনে হচ্ছিল, যারা মিথ্যাবাদী তারা যখন মিথ্যা বলে তখন এমনই জোর এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বোধহয় বলে, চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে; যে; সত্যির চেয়েও তা বেশি সত্যি বলে মনে হয়।

প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার পর এমন অনেক অনেক দাগি মিথ্যেবাদীর সঙ্গে যে তার মোকাবিলা করতে হবে, যাদের সততা সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষেরই কোনো সন্দেহই থাকার কথা নয়; তা ঋভু আগে জানত না। নিজের অর্থ, নিজের চেয়ার, নিজের মান ও যশ নিষ্কণ্টক রাখার জন্যে যে নামী-দামি মানুষেরা কত উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা অহরহ বলেন, শত্রুকে নাশ করবার জন্যে যে কী ধরনের চরিত্রহনন করেন আগাগোড়া মিথ্যাচারের দ্বারা; এ সব সম্বন্ধে, পৃথিবীর এই খল, ইতর, জঘন্য রূপ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও ধারণা ওই সারল্যর জগতে বসবাস করা ঋভুর ছিল না।

যে-সব মিথ্যা সে বলেছিল তা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। অনেক বড়ো কারণেরই জন্যে। সে-সব মিথ্যেতে গায়ে পাল লাগে না। বরং পুণ্যই হয়।

হঠাৎ দারোগা বললেন, এটা কি?

বলেই, বড়োঘরের বারান্দার এক পাশে যে ছোটোঘরটি ছিল, যেখানে সেজকাকুর লাইব্রেরি, তার দেওয়ালের কাঠের ফ্রেমের মধ্যে গোঁজা একটি ভোজালি বের করলেন।

এটারে কি কয় তা আপনে জানেন না? উঁচু গলায় প্রমীলাবালা বললেন।

কী বলে তা জানি। আমি দার্জিলিঙে পোস্টেড ছিলাম। কিন্তু এটা এখানে কেন?

ক্যান আবার? চোর বদমাস গুণ্ডাগো লগে তো আপনাগো দোস্তি। তাদের ধরনের জন্যে তো কিসুমাত্রই করেন না আপনারা। তাগো হাত থিক্যা বাঁইচবার জন্যেই এ সব ঘরে রাখনের প্রয়োজন। শুধু ভোজালি ক্যান? রামদা পর্যন্ত আছে। একবার দুই হাতে ধইর‍্যা দাঁড়াইলে অনেক চোর-ডাকাত মায় পুলিশও কচু-কাটা হইয়া যাইবোনে। য্যামন দ্যাশ, য্যামন অবস্থা, ত্যামনই তো ব্যবস্থা লইতে হইব। না, কি কন্ দারোগা মশাই?

দারোগা প্রমীলাবালাকে আর না ঘাঁটিয়ে বললেন, মাস্টারবাবুকে বলবেন, ধরা ওঁকে পড়তেই হবে। নিজে এসেই যেন ধরা দ্যান। তাহলে অনেকই ভালো হবে ওঁর।

বিবাগী এবারে বললেন, কেন? রাজসাক্ষী বানাবেন? মাস্টারকে আপনারা চেনেননি এখনও।

নিমুকাকু বললেন, দারোগাবাবু! দেশ কিন্তু একদিন স্বাধীন হবেই। এ দেশ তো আপনারও। কতদিন আর ইংরেজদের পা চাটবেন? মাস্টার আপনার কাছের লোক, না ইংরেজ উপরওয়ালা?

দারোগা হাসলেন। হাসিটা কান্না বলে মনে হলো।

বললেন, আমাদের কাজটাই এরকম। থ্যাঙ্কলেস জব। দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন আমাদের দেশি-নেতারাও ক্ষমতাতে এসে যারাই তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইবে তাদের পেছনে আমাদেরই আবার লাগাবেন। এই আমি, সি আই ডি'র টিকটিকিরা, এই আমাদের জীবিকা; আপনার যেমন মাস্টারি করা। আমাদের করুণা করবেন। ভুল বুঝবেন না। দেশি নেতারা ক্ষমতাতে এসে হয়তো ইংরেজদের চেয়েও অনেক বেশি অত্যাচারী হবেন, বিবেকরহিত হবেন। ক্ষমতার মতো রোগ আর দুটি নেই। পাওয়ার করাপ্টস্। অ্যান্ড অ্যাবসল্যুট পাওয়ার করাপ্টস্ অ্যাবসল্যুটলি। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই জানে!

তারপর বড়োকাকুর দিকে চেয়ে বললেন, আপনার বড়দাও কলকাতায় ইংরেজেরই চাকরি করেন। তিনি কি প্রতিবাদস্বরূপ তাঁর চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন? পারেননি। কারণ ওটাই তাঁর জীবিকা। মাস্টার বাবা তাঁর কাজ করছেন। আমরা আমাদের। কাজের ক্ষেত্রে ছাড়া তার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র ঝগড়া নেই। ব্যক্তি হিসাবে আমি সেই ব্যক্তিকে কী চোখে দেখি সেটাও এখানে অবান্তর। উনি রাজদ্রোহী আমি কোটাল। এইটাই ফ্যাক্ট। বুঝলেন।

পুলিশেরা এবং দারোগা চলে যেতেই তাপসী বললেন, কখন চইল্যা গ্যালরে, মাস্টার?

নিমুকাকু বললেন, রাতেই। রঘুকে জাগিয়ে সব জিগগেস করতেই ওর সন্দেহ হয়েছিল। বলল, এখনি না বেরোলে মুশকিল হবে। পুলিশ শেষ রাতে নিশ্চয়ই আসবে। মায়ের কাছে একটা রিভলবার দিয়ে গেলাম সেটা পুষিকে পৌঁছে দিতে হবে আজই। পুষি দুপুর তিনটের সময় এস পি-র কোয়ার্টারের উলটোদিকে পথ-পাশের নালার উপরে যে কাঠের সাঁকো আছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

পুষিটা কেডা? আমি তো চিনি না তারে। ঠাকুমা বললেন।

নিমুকাকু বললেন, চিনি না তো আমিও। তবে চিনে নেওয়া যাবে। একজন মেয়ে। বদ্যিপাড়ার ধলু সেনের মেয়ে। নীল-রঙা শাড়ি পরে আসবে সে। এই কাজটা ঋভুকেই করতে হবে। বড়োরা কেউ গেলে সন্দেহ করতে পারে।

ঋভু? কোন্ কাজ? তাপসী চিন্তান্বিত হয়ে স্বগতোক্তি করলেন।

হ্যাঁ ঋভুই। রিভলাবরটা ঋভুকেই পৌঁছে দিতে হবে পুষিকে।

ধরা পড়লে ছেলের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। এতটুকু ছেলে! মুখ কালো করে বললেন তাপসী।

অন্ধকার কেটে যাচ্ছে বউদি। কেটে গিয়ে, ভোর যে হচ্ছে, তা দারোগা নিজেও জানেন। দারোগাও তো তার কর্তব্যই করছেন। মনে মনে তিনি নিজেও জানেন যে এ দেশ চিরদিন পরাধীন থাকবে না।

একটি হাই তুলে তাপসী বললেন, যাই! চা করি গিয়ে। এই টেররিজমই কি একমাত্র পথ দেশ স্বাধীন করার? মহাত্মা গান্ধির পথ তো এই পথ নয়! অন্য পথেও তো দেশ স্বাধীন করা যেত।

অত আমি জানি না বৌদি। তবে একটা কথা বিশ্বাস করি। যে স্বাধীনতা রক্ত না দিয়ে পাওয়া যায়, সে স্বাধীনতা থাকে না বউদি। পৃথিবীর ইতিহাস তাই বলে। স্বাধীনতাকে যথার্থ মূল্য দিয়ে কিনতে না পারলে সেই স্বাধীনতা যথেষ্ট মূল্যবান কখনওই হয় না। এ কথাটা, দেশ যদি সত্যিই কোনো দিন স্বাধীন হয়, তো সেদিনই আমরা চোখের জলে বুঝতে পারব। রক্তের বিনিময়ে না পাওয়া গেলে সেই স্বাধীনতা এক প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে। দেখবেন আপনি। সেই স্বাধীনতা থাকবে না বেশিদিন। জল আর ছাগলের দুধের দামেই বিকিয়ে যাবে।

কি জানি! আমি অত বুঝি না।

সেদিন আমরা সকলেই বুঝবো বউদি। স্বাধীনতা 'পড়ে পাওয়ার' জিনিস নয়। স্বাধীনতার আবর্তর মধ্যে পড়লে কম-বেশি প্রত্যেককেই আবর্তিত, প্রভাবিত হতে হবেই।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর থেকেই তাপসীকে অত্যন্ত চঞ্চল দেখাচ্ছিল। কিন্তু মাস্টারের নির্দেশানুযায়ী ঋভুকে না পাঠালে পরে পরিবারের সকলের চোখেই তাপসী ছোটো হয়ে যাবেন। ওঁর এইটাই একমাত্র ভয় যে, এই বয়সেই এই সন্ত্রাসবাদ ঋভুর ভিতরে যদি ঢুকে যায় তাহলে ঋভুর সমস্ত জীবনই একেবারেই অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। পড়াশুনো ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে একরকমের শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই গড়ে ওঠে, যে-শিক্ষা পরবর্তী জীবনে একজন মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে সাহায্য করে। গোড়াই কাঁচা থাকলে তাদের নানা মানুষের হাতে শুধু ক্রীড়নকই হয়ে থাকতে হয়। পথ সম্বন্ধে তাদের এক ধরনের ধারণা গড়ে ওঠে নিশ্চয়ই কিন্তু জীবনের বা জাতির গন্তব্য সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট যে নিশ্চয়ই হয়ে যায় সে সম্বন্ধে তাপসীর মনে কোনোই সন্দেহ ছিল না।

ঋভুর যে বয়স, সেই বয়সে এইসব উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলে তার সমস্ত জীবনটাই মাটি হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। অথচ....

তাপসী সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

রিভলবারের কুড়িটি গুলি ঋভু প্যান্টের এক পকেটে নিল। আর প্যান্টের বেল্টের সঙ্গে ভারী রিভলবারটা বাঁধতে যাচ্ছিল যখন, তখন বড়োকাকু একটি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ এনে তাকে দিলেন। যে ব্যাগে বই খাতা নিয়ে সে স্কুলে যায়। সেই ব্যাগের নীচে রিভলবারের গুলি ও রিভলবারটা রেখে তার ওপরে বই-খাতা ভরে দিলেন। বললেন, লোকে জিগগ্যেস করলে, যদি কেউ করে; তো বলবি ব্রাহ্মসমাজে যাচ্ছি।

ব্যাগের একেবারে উপরে তাপসী তাঁর নিজের ব্রহ্ম-সঙ্গীতের বইখানা রেখে দিলেন। যাতে সন্দেহ কারো হলেও তার নিরসন হয়। সেদিন সমাজে একটি অনুষ্ঠানও ছিল।

এমন সময় ছানুকাকু সাইকেল করে এসে উঠোনে ঢুকল। বলল, আমি সব জানি। আমি এগিয়ে যাচ্ছি। জেলা স্কুলের গেটের সামনেই সাইকেল নিয়ে থাকব। দূর থেকে নজর রাখবো। কোনো গোলমাল দেখলেই আমি জোরে সাইকেল চালিয়ে তোর কাছে চলে আসবো ঋভু। কোঁনো কথা না বলে তুই আমার সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে পড়বি। তারপর তোকে যেখানে নিয়ে যাবার, আমিই নিয়ে যাব। পুষিকে না দিতে পারলে অন্য এক জায়গায় জিনিসগুলো পৌঁছে দিতে হবে। তখন তোর না গেলেও চলবে। তোকে বদরগঞ্জের রাস্তায় মোড়ে আমি নামিয়ে দেব তাহলে। সেখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসবি।

আমার বই-খাতা?

ঋভু শুধোল।

তার জন্য চিন্তা নেই। পুষিকে দিয়ে ওগুলো দিদির কাছে পাঠাতে হবে তাহলে। দিদি জানে।

দিদি মানে? রাঙা পিসি?

হ্যাঁ।

তাপসী বললেন, তাহলে রাঙাই তো ওগুলো নিয়ে গেলে পারে।

পারে বউদি। কিন্তু পুষিদির বাড়ির ওপরেও পুলিশের নজর থাকতে পারে। মাধবদা নাকি টাকা পেয়ে পুলিশের চর হয়ে গেছে। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে ভালো চাকরিও পাচ্ছে। এখন মাস্টারদার দলের মধ্যেই যে কে শত্রু আর কে মিত্র তা বোঝার উপায় নেই। তাই সবসময়েই সাবধানে থাকতে হবে।

সে কী!

উদ্বেগের গলাতে বললেন বিবাগী।

হ্যাঁ তাই।

মাধবকে...।

হ্যাঁ মাধবদাকে যা শেখাবার তা শেখানো হবে দু-একদিনের মধ্যেই যাতে এ জীবনে আর কারো সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পারে। তার দায় আমাদের উপরে ছেড়ে দিন।

বলেই বলল, আমি তাহলে এগোলাম রে ঋভু। ভয় নেই কোনো। "বলো বীর—বল উন্নত মম শির, বল নেহারি আমারি নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির—"

নজরুল ইসলামের কবিতা। ঋভু জানে। ওই একটি লাইন শুনেই ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ওর উপরে যে সেজকাকু এমন একটি বিপজ্জনক কাজের ভার দিয়ে গেছেন তা মনে করেই ওর গর্ব হতে লাগল খুবই।

মা আর ঠাকুমা ঋভুর থুতনি ছুঁয়ে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

ঋভু বেরিয়ে পড়ল।

পথে এখন কোনো লোকজন নেই। ডিমলার রাজবাড়ি আর বদরগঞ্জের পথের মোড়ের মুদির দোকানে দু-একজন লোক ছিল। তারা কেউই ঋভুর চেনা নয়। ঋভুকে তারা কেউ লক্ষও করল না। কাঁধে ঝোলাটা নিয়ে আস্তে আস্তে ইতি-উতি চাইতে চাইতে, হেঁটে যেতে লাগল ঋভু। পথের পাশের গাছ-গাছালি, বনতুলসী, জার্মান জঙ্গলের সুস্পষ্ট পাতায়, নিমগাছে ঘন সবুজ রঙ। পাতা-ভরা মস্ত মস্ত ডালে ডালে, কণ্টিকারির আর লজ্জাবতী লতাদের ফিনফিনে গায়ে গায়ে দুপুরের রোদ পড়ে পিছলে যাচ্ছে। এদিকে পথটা আরো নির্জন।

এমন সময় হঠাৎই দেখল সাইকেলে চড়ে দুজন লাল-পাগড়ি পুলিশ আসছে উলটোদিক থেকে। ভয়ে ঋভুর হৃৎপিণ্ড প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎই ও গান ধরে দিলো তাদের দূর থেকে দেখতে পেয়েই। "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ, কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন? কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?"

ওর কাছে এসে পুলিশেরা সাইকেলের প্যাড্‌ল-করা বন্ধ করল। কিন্তু সাইকেল থেকে নামল না। ও গানের তেজ আরও বাড়িয়ে দিল।

পুলিশদের একজনকে দেখে ও চিনতেও পারল। আজ ভোরেই সে তাদের বাড়িতে এসেছিল। দুজনে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করল ঋভুকে নিয়ে। একজন বললো, বিচ্ছু! অন্যজন বলল, চোত্‌রা-পাতা!

ঋভু হাসলো ওদের কথা শুনে, গান থামিয়ে এবং দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন তার কোনোই তাড়াহুড়োই নেই।

পুলিশদের বরং তাড়া ছিল। তারা ঋভুর দিকে তাকাতে তাকাতে আবার সাইকেলের প্যাড্‌ল চালিয়ে চলে যেতে লাগল। ঋভুর দিকে তাকিয়ে থাকাতে তাদের সাইকেলের সামনের চাকা পথের উলটোদিকে গড়িয়ে যেতে লাগল। একজন তো পথ-পাশের নালাতে গিয়েই পড়ত একটু হলে। সময়মতো হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে নিল সে।

অন্যজন চলে যেতে যেতে বলল, ক্যারে চ্যাংড়া? যাস কই?

ঋভু গান থামিয়ে হাসতে হাসতে বলল, এস পি সাহেবের বাংলোয়।

অন্যজন বললো, ফাইজলামর রকম দ্যাখ। মাস্টারের ভাই-ব্যাটা যে। চোত্‌রার-ঝাড়।

এই "চোত্‌রা" শব্দটা কলকাতায় কখনই শোনেনি ঋভু। রংপুরে এসেই শুনেছে প্রথম এবং চোত্‌রা পাতার ঝাড়ও দেখেছে। সাংঘাতিক একরকমের বিছুটি। গায়ে যদি লাগে তো আর রক্ষে নেই। বাবাগো! মাগো! করে মরতে হবে। গোরু-ছাগলেও এই ঝাড়ের ধারে কাছে যায় না। কোনোক্রমে গায়ে চোত্‌রা-পাতা লেগে গেলে লাফাতে হয় জ্বালা-যন্ত্রণায়। টাটকা-গোবর লাগালে কিছু উপশম হয় বটে কিন্তু সহজে জ্বালা যায় না।

জোড়া-বুলবুলি ডাকছে সজনে গাছের ডালে বসে। চালতা গাছের চকচকে পাতার উপরে রোদ পড়ে তা পিছলে পড়েছে লাল-টুকটুক-পেছনের বুলবুলিদের গায়ে আর মাথার ঝুঁটিতে। ঋভু প্রায় পৌঁছেই গেছে তার গন্তব্যে। কিন্তু নালার উপরের কাঠের সাকোতে পুষিপিসি নেই। পুষিপিসি নামের কোনো মেয়েকেই জায়গা মতো দেখতে না পেয়ে হঠাৎই ভীষণ ভয় লাগল ঋভুর। এদিকে পুলিশ সাহেবের বাংলোর গেটে দুজন রাইফেলধারী পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিকে চেয়ে ঋভুর পা-দুটো যেন পথের ধুলোতে আটকে গেল এবং ঠিক সেই সময়েই পথের ডানদিকের নালার উপরের কাঠের সাঁকো পেরিয়ে যে পায়ে-চলা পথটি চলে গেছে দুপাশের অন্ধকার করা গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে, সেই পথ দিয়ে নীলশাড়ি আর সাদা ব্লাউজ পরে লম্বা, ছিপছিপে, ব্যক্তিত্বসম্পন্না পুষিপিসিকে আসতে দেখল ঋভু।

পুষিপিসীকে আগে কখনও দেখিনি ও। মাজা মাজা গায়ের রঙ। টিকোলো নাক। লম্বা এক-বিনুনী বেঁধেছে একটা। পুষিপিসি কি সেজকাকুর কেউ হয়? হলে, বেশ হতো! ঋভু বলল, মনে মনে। ওর এতো জন কাকা। কিন্তু একজনও কাকিমা নেই।

পুষিপিসি চেঁচিয়ে ডাকল, ঋভু-উ-উ-উ।

যেন, কতদিনের চেনা মানুষ!

পুলিশদের শুনিয়ে।

পুলিশরা এদিকে তাকাল দুজনেই।

পুষিপিসি গলা তুলেই বলল, বউদি কেমন আছে রে? তাপসী বউদি—

অচেনা মানুষের কাছ থেকে এমন সপ্রতিভ ব্যবহারে ঋভু নিজেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল একটু।

বলল, ভালো।

বইগুলো পাঠিয়েছেন তো?

কী বলবে ভেবে না পেয়ে ঋভু বলল, হ্যাঁ।

আয়। আয়। এদিকে আয়।

ঋভু ওদিকে এগিয়ে যেতে যেতে সোজা একবার চেয়ে দেখলো যে দূরে জেলা স্কুলেব গেটের সামনে সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছানুকাকু নস্যি দিচ্ছে। কী বিচ্ছিরি অভ্যেস! কিন্তু সেই মুহূর্তে ছানুকাকুর নস্যি নেওয়ার দৃশ্যটিকে ভারি সুন্দর বলে মনে হলো। লক্ষ করল যে, ছানুকাকু তার দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। কিন্তু আসলে তাকেই দেখছে। এস পি সাহেবের বাংলোর পুলিশেরা অবশ্য ছানুকাকুকে দেখতে পাচ্ছে না কারণ মস্ত একটি ঝাঁকড়া আমগাছ আছে পথে পাশের ওই দিকেই। আর পথটি সামান্য বেঁকেও গেছে ঠিক ওইখানটিতে।

পুষিপিসি সাঁকোর উপরে দাঁড়িয়ে কুচো-মাছেদের খেলা দেখছিল জলের মধ্যে। যেন, তার হাতে অঢেল সময়। স্বচ্ছ জলের মধ্যে দুপুরের রোদ সোনালি পাতের মতো কী করে পরতে পরতে নেমে গিয়ে কালো আর রুপোলি মাছেদের জলের বিভিন্ন স্তরে কী করে যে সোনালি করে দেয়! এক কোনা থেকে অন্য কোনাতে আলো প্রথমে প্রতিফলিত হয়ে পরে প্রতিসরিত হয়, জলের নীচের মাছেদের মৃদু কিন্তু চকিত চঞ্চল আনাগোনায়, জলের মধ্যে আলোর আয়নার নির্মাণ কী করে যে ভেঙে যেতে যেতে আবারও অবলীলায় জুড়ে যায় তা দেখতে ভারি ভালো লাগে ঋভুর। যখন এই আলো-ছায়ার আশ্চর্য খেলা দেখে তখন তার চারপাশের সবকিছুর কথা ভুলে যায় ও।

পুষিপিসিরও যেন কোনোই কাজ নেই। পুষিপিসিও তন্ময় হয়ে মাছেদের দিকেই চেয়ে আছে।

ঋভু পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই, ফিসফিস করে বলল, এনেছিস?

হুঁ।

ঋভু বলল, চাপা গলায়।

হঠাৎ পুষিপিসি ঋভুর মুখটি দুহাতের মধ্যে নিয়ে ঋভুর দুঠোঁটে 'চুঃ' শব্দ করে চুমু খেল। পুষিপিসির ঘেমে-যাওয়া মুখ আর বগলতলিতে হঠাৎ কাঠটগরের গন্ধ পেলো ঋভু। গন্ধ নেই; কিন্তু আছে। যারা বলে যে, টগরের গন্ধ নেই তারা ভুল জানে। সেই চকিত এবং একেবারেই অপ্রত্যাশিত চুমুতে শিহরন খেলে গেলো ঋভুর সারা শরীরে। এমন করে কেউ কখনওই চুমু খায়নি ঋভুকে। পুষিপিসির নিঃশ্বাস পড়ছিল বড়ো বড়ো। অস্ফুটে বলল, লাল ছেলে!

বলেই বলল, আয়। আমার পেছন পেছন।

ওই সাঁকো পেরিয়ে যে ছায়াছন্ন পথটি চলে গেছে সেই পথের শেষে যে আদৌ কোনো বাড়ি আছে এবং সেখানে কেউ যে থাকে বা থাকতে পারে তা ঋভু জানত না। কদিনই তো পুটু, বুদুস, আনোয়ারদের সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে মাছেদের খেলা দেখে! কিছু কিছু পথ থাকে, কিছু কিছু স্বপ্নিল ছায়া; গাঢ়-রঙা চিত্রল সাপের গায়ের মতোই ডোরাকাটা, তা পায়ে মাড়াবার জন্যে আদৌ নয় বলেই বিশ্বাস করত ঋভু। কিছু কিছু এলাকা শুধুই স্বপ্নের এবং কল্পনারই দখলে থাকা উচিত এমন একটা প্রত্যয় ঋভুর জন্মেছিল সেই বয়সেই। পরবর্তী জীবনে, বড়ো হয়ে ওঠার পর জেনেছিল যে,

মানুষ-মানুষীর ব্যক্তিগত-সম্পর্কর ক্ষেত্রেও এমন ছায়া-নিবিড়, কখনও উগ্র কখনও স্নিগ্ধ, গন্ধ-স্মিত কিছু পথ, কিছু এলাকা থাকে, যা মাড়াবার বা দলনের জন্যে নয়; শুধুই স্বপ্নেরই জন্যে।

পুষিপিসিদের বাড়িটাও অদ্ভুত। এটা নিশ্চয়ই পুষিপিসির বাড়ি নয়। পুষিপিসির বাড়ি কি? কারণ, পুষিপিসির বাড়ি তো বদ্যিপাড়ায় বলেই শুনেছে।

পুষিপিসি কাকে যেন ডেকে বলল, পিসি, কই গ্যালা?

কাকে যে বলল, বোঝা গেল না।

অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারতর জরাজীর্ণ বাড়ির অন্ধকারতম ঘর থেকে বুলবুলির ঠাকুমারই মতো একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন, বাঁ হাতটি কোমরের উপরে রেখে। বললেন, মাজার ব্যথায়, খাড়াইতে পারিনারে নাতি। তর ঠাক্‌মা আছে ক্যামন?

ঋভু বললো, ভালো। মনে মনে বললো, এই পৃথিবীটা কত বড়। ঠাকুমা কত মানুষকেই না জানেন চেনেন।

পুষিপিসী বলল, কোথায়? ঋভু?

ঋভু বলল, এই! ঝোলার একেবারে নীচে।

আমার সঙ্গে ভিতরে আয়। তাড়াতাড়ি। সময় নাই। পিসি, তুমি নজর রাইখ্যো বারদুয়ারে।

বলেই, ঘরের ভিতরে ঋভুকে নিয়ে ঢুকল পুষিপিসি।

ঋভু বইপত্র-ভরা একটি লেখা-পড়ার টেবিলের উপরে থলেটা উপুড় করে দিল। পুষিপিসি ঋভুর বিস্ফারিত চোখের সামনেই আচম্বিতে বুকের নীল শাড়ি সরিয়ে সাদা ব্লাউজটা খুলল।

মস্ত একটা কনকচাঁপা গাছের ডাল-পালা ভেদ করে শ্রাবণ-দুপুরের রোদের একটি গোপন সরু রেখা এসে পুষিপিসীর বুক দুটিকে উজ্জ্বল করে তুলল। ঋভুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠল।

ঋভুর চোখে চোখ পড়তেই পুষিপিসি বলল, অ্যাই! চড় খাবি তুই! মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকা। পুষিপিসি ব্লাউজের নীচে বড়ো-মেয়েরা কী একটা পরে, খুলে ফেলেছিল সেটাও। তার ভেতরে গুলিগুলো দুভাগ করে রাখলো।

অন্যদিকে তাকাতেই ঋভুর চোখ পড়ল দেওয়ালের আয়নায়। সেখানেও পুষিপিসির রূপ পরিপূর্ণ হয়ে বিস্ফারিত হচ্ছিল পুরো আয়না জুড়ে। বুকের মধ্যেটা দপ্‌দপ্ করছিলো ঋভুর। গলা শুকিয়ে এসেছিল।

ঋভু বলল, জল খাব।

পুষিপিসি বলল, তোকে কিছু খাওয়ানোরই সময় এখন আমার নেই। এই থলেতে তোর জিনিসপত্র তুলে নিয়ে তুই পালা এখন।

আর শোন, ধীরে সুস্থে যাবি। কেউই যেন সন্দেহ না করে। আর এই চিঠিটা তোর ঠাকুমাকে দিস। তোর মাস্টারকাকা কাল রাতে এইখানেই ছিল।

তুমিও ছিলে? তোমার সঙ্গে ছিল?

প্রশ্নটা হঠাৎই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল ঋভুর।

দু-চোখ জ্বলে উঠল পুষিপিসির।

রাগের গলায় বলল, না। আমার কাছে নয়। এই পিসির কাছেই ছিল। আমি এখানে দুপুরে এসেছি। তুই আসবি বলে।

তারপই বলল, কলকাতার ছেলেগুলো বড়ো এঁচড়ে-পাকা হয়। যাঃ।

একটু জল পর্যন্ত খেতে পেল না ঋভু।

যে-কোনো নিষিদ্ধ জিনিসের প্রভাবই অনভ্যস্ত মানুষের মনের উপরে বড়ো তীব্রভাবে পড়ে। তাকে এলোমেলো, উত্তেজিত, ভীত এবং কখনও কখনও ক্রুদ্ধও করে দেয়। ঋভুর পক্ষে সেজকাকুর রিভলবার ও গুলি একজন অচেনা মেয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই নিষেধের পরকাষ্ঠা ছিল। তার সঙ্গে পুষিপিসির হঠাৎ-উন্মুক্ত বুক-দুটির চকিত দৃশ্যর নিষেধ মেলাতে ওর উপর দুটি নিষিদ্ধ ক্রিয়ার মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অতি তীব্র। ঋভু লক্ষ করেছিল অবাক হয়ে যে, পুষিপিসির বুক-দুটির রঙ

তার মুখের রঙের চেয়ে অনেকই ফর্সা আর সিদ্ধ ডিমেরই মতো তা কোমল, নালার জলের মধ্যে মধ্যে চকিতে প্রতিসরিত আলোর মতোই তা মসৃণ। ঋভুর ছোট্ট জীবনে এই প্রথমবার সে এমন ভয়বাহী পরিবেশে এমন তীক্ষ্ণ আনন্দমিশ্রিত ভোঁতা দুঃখের অবশ-করা অনুভূতির শরিক হল।

ওর পা দুটি বিদ্রোহ করেছিল। কোথাও বসতে পারলে ভালো হতো।

কিন্তু এখন চলতেই হবে।

ঋভু তখন জানতো না যে, জীবন এরকমই! পা দুটি চলতে না চাইলেও চলতে হবেই। আজীবন!

চলে যাবার সময় সেই বুড়ি পিসি বললেন, সাবধানে যাইস্ রে ছ্যামড়া।

পুষিপিসি পিছু ডাকল। বলল, দাঁড়া এক সেকেন্ড।

বলেই তার কাছে এসে তাকে জোরে জড়িয়ে ধরে আবার চুমু খেল। এবারে পুষিপিসির বুকের ছোঁয়া লাগলো ঋভুর বুকে। সেই পরশেই ঋভুর কল্পনা তাকে দর্শনের সুখ দিলো। পুষপিসির বুক দুটিব মাঝের পথ এই সাঁকো পেরিয়ে আসা ছায়াছন্ন স্নিগ্ধ, সুগন্ধি বন পথেরই মতো। তা শুধু কল্পনার, নম্র অনুভূতির। কখনওই তা বাস্তবের নয়।

ছোট্ট ঋভু, আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে উঠছিল। মনে এবং শরীরেও, মাঝে মাঝেই শরীরের মধ্যে বড়ো অস্বস্তি বোধ করে ও। কেন, তা জানে না। পুষিপিসি তার মুখ ঋভুর কানে নামিয়ে বলল, আমরা আজ থেকে পার্টনার। এই রিভলবার আর গুলির কথারই মতো আরও অনেক গোপন কথা আমরা দুজনেই শুধু জানব। কাউকে কখনও যদি বলিস! যাঃ। যারে। লাল ছেলে। সাবধানে যাস।

মুখ যতখানি স্বাভাবিকতা, ওই অস্বাভাবিক উত্তেজনা এবং শ্রান্তির মধ্যেও আনা সম্ভব ততখানিই এনে, ঋভু ওই ছায়াচ্ছন্ন পথ পেরিয়ে এসে সাঁকোটি পেরোলো, পথে পড়ল। পেরোতেই দেখল, যে-দুজন পুলিশ তাকে পথে পেরিয়ে উলটোদিকে গেছিল, তারাই আবার উলটোদিক থেকে এদিকেই ফিরে আসছে।

পুলিশদের দিকে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পেছনে ধুলোভরা পথের মধ্যে দ্রুতগতি, প্রায় উড়ে-আসা সাপের শব্দব মতো হিস হিস শব্দ তুলে একটি সাইকেল শঙ্খচূড় সাপের মতো উড়ে আসছে তার শব্দ পেলো ঋভু। বুঝল ছানুকাকু। কিন্তু পেছনে তাকাল না। পুলিশেরা সাইকেল থেকে নেমেই পথজুড়ে দাঁড়িয়ে বলল, গেছিলা কই?

ঠাকুমারে দেখতে।

কে ঠাকুমা?

সে প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই ছানুকাকুর সাইকেল এসে জোর কিরিং-কিরিং ঘন্টা বাজাতে বাজাতে দুজন পুলিশের সাইকেলের উপবই ঝনঝনিয়ে পড়ল। ফলে তিনজনেই একই সঙ্গে ধুলোর মধ্যে পড়ে গেলো চিৎপটাং হয়ে।

পুলিশ দুজন ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়েই বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে? চলো থানায়।

ছানুকাকু ভীষণই রাগের গলায় বলল, পুলিশের নকরি করতাছেন বইল্যা কি মাথা কিনছেন না কি?

দুর থিক্যা বেল দিতাছি বারবার তা শুনতেই পাননা দেহি। রাস্তা জুইড়্যা মিটিং বসাইছেন। রাস্তাটা কি আড্ডা মারনের জাগা?

পুলিশ দুজন প্রচন্ড সংযমের পরিচয় দিয়ে চুপ করে রইল।

প্রথমজন পুলিশ আবার জিজ্ঞেস করল ঋভুকে, কই গেছিলা? কও। কও।

ছানুকাকু কথার মধ্যে কথা কেটে বলল, এই চ্যাংড়া আবার কে? এমনভাবে বললো যে ঋভুকে যেন ছানুকাকু চেনেই না।

মাস্টারদাকে চেনেন আর ওরে চেনেন না? এও চোত্‌রার ঝাড়। তার ভাই-ব্যাটা। একজন পুলিশ বলল।

আর আপনারা তো মিরজাফরের ঝাড়। নির্লজ্জ বেহায়ার দল।

কী হইতাছেব। এ কথাটা কী?

অন্যজন শুধোল।

ধরতো শালারে। চল্ থানায় নিয়া চল্। আজ হের্ মুখের ভূগোলই পালটাইয়া দিমু।

কোন্ অপরাধে?

ছানুকাকু দমকে বলল।

তা থানায় যাইয়াই বলুমানে। বোঝাইয়া বলুম। চল্ থানায় চল্। পোলাডারে ছাইড়্যা দে। জেলা স্কুলে পড়ে জানি আমি। অর বাপে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার। কলকাতায় থাকে।

ছানুকাকু জামার আস্তিন গুটিয়ে বলল, বেশি পুলিশ দেখায়ন না আমারে। মাইর‍্যা আপনাগো বাপের নাম ভুলাইয়া দিমু।

বাপ তুলছে আবার। চল্। এখুনি চল্।

ছানুকাকুকে টেনে এক চড় মারল একজন।

ছানুকাকু বলল, ঠিক আছে। চলো থানায়।

ছানুকাকু তড়পিয়ে বলল, বাবার নাম ভোলাই কি না দেখবানে। রাস্তা বন্ধ কর‍্যা দাঁড়ায়ে থাকবা আর ধাক্কা লাগলে চোটপাট। এই নাকি পুলিশের ব্যবহার?

পুলিশের ব্যবহার দ্যাখামু তোমারে। থানায় তো চল্ বিপ্লবী। মাস্টারদার চ্যালাগিরি ঘুচাম্।

এস পি সাহেবের বাড়ির গেটের ডিউটিতে ছিল দুজন বিহারি পুলিশ। তারা কিন্তু বলল, ক্যা লাফ্‌বা লাগা রহা হো। আস্‌লি কাম তো কুছ করো।

ওরা বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আস্‌লি কাম যতো তো তোমরাই করতাছো। আমাগো বেশি ল্যাকচার ঝাইড়ো না।

ছানুকাকু যেতে যেতে ঋভুর দিকে চোখ টিপল লুকিয়ে। পরক্ষণেই নিজের সাইকেলটা হাত-আলগা করে ছেড়ে দিল একজন পুলিশের হাতে-ধরা সাইকেলের উপর। তাতে তার সাইকেলটা মাটিতে পড়ে গেল। সামনে লাগানো বাতিটা ভেঙে গিয়ে কেরোসিনের তেল গড়াতে লাগলো মাটিতে।

ছানুকাকু বলল, হাতে যা লেগেছে না, পড়ে গিয়ে! সাইকে...।

থানাতে চলো আইজ। লাগালাগির হিসাব কষুম।

ছানুকাকু বাঁ হাতে সাইকেল ধরে ডান হাত নাড়িয়ে গান ধরল, সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুসিতা হামারা হামারা,

সারে জাঁহাসে আচ্ছা।

ম্যায় বুল্‌বুলে হ্যায় উস্‌কি-ই,

ইযে গুল্‌সিতা হামারা হামারা,

সারে জাঁহাসে আচ্ছা।

হিন্দুসিতা হামারা হামারা।

গান থামিয়েই বলল, জানেন কার গান?

ওইসব হিন্দুস্থানি-সংগীত আমাগো জাননেব কোনোই প্রয়োজন নাই। আমরা বাঙালি।

বলেই, এস পি সাহেবের গেটে দাঁড়ানো হাতে-খৈনি মারা পুলিশদের দেখিয়ে বলল, ওই খোট্টারা জানব আনে। আমাগো কোন্ কাম?

ছানুকাকু বলল, আপনারাই হইলেন গিয়া একমাত্র ইন্ডিয়ান। আর হক্কলেই খোট্টা, মাউড়া, বাঁধাকপি, মাড্ডু, এই কইর‍্যাই একদিন উচ্ছন্নে যাইব বাঙালিগুলান।

ঋভু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে যেতে ছানুকাকুর "প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে" "চমৎকৃত" হয়ে যাচ্ছিল।

"গেছিলা কই?" এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে হলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোতে পারত। পুষিপিসি আর ঋভুকে বাঁচানোর জন্যেই যে পুরো ব্যাপারটা ঘটিয়েছিল ছানুকাকু, এবিষয়ে কোনোই সন্দেহ ছিল না ওর। কিছুটা গিয়ে এবারে দৌড়তে লাগল ঋভু। বাড়ি গিয়ে খবর দিতে হবে বড়োকাকু নিমুকাকুদের। ছানুকাকুকে যদি সত্যিই মারধর করে?

ছানুকাকুকে পুলিশেরা থানায় নিয়ে গিয়ে মেরেছিল খুবই। কিন্তু কোনো কথাই বের করতে পারেনি। পাছে ঋভুকে তারা ধরে নিয়ে যায় সেই ভয়েই ছানুকাকু নিজেই ইচ্ছে করে ধরা দিয়েছিল। ঋভু কি পুলিশের মারের মুখেও চুপ করে থাকতে পারত?

ছানুকাকুরা জানে না। কিন্তু ঋভু জানে যে, পারতো। ঋভুর মা তাপসীও জানতেন যে, পারত ও। ঋভুকে নিজের জন্মদাত্রী মা যতটুকু জানেন ততখানি তো আর কেউই জানেন না। ঋভুর ভীষণই জেদ। যা করবে বলে ঠিক করে তা থেকে তাকে নড়ান কারোরই সাধ্য নেই। তাপসীকে ঋভু বলতে শুনেছে অন্যদের আড়াল থেকে : "ঋভুর অসম্ভব জেদ। জেদ থাকা ভালো, যদি সে জেদ ভালো জেদ হয়।"

"ভালো জেদ" মানে যে কি, সে কথাটা ঋভুর বাবা হৃষীকেশ একদিন ঋভুকে বলেছিলেন। বাবা কলকাতার বাড়ির বাইরের ঘরে বসে সাইকেলের চেনে এবং অন্যান্য জায়গায় তেল লাগাচ্ছিলেন তখন। বাবা তখন সাইকেলে করেই অফিসে যেতেন।

অত্যন্ত সুদর্শন, লম্বা, নিচু-স্বরে কথা বলা সাহেবি-ভাবাপন্ন এবং ব্রাহ্ম; ঋভুর বাবার সহকর্মী এবং বন্ধু জ্যোতিকাকুও তাই যেতেন। ছুটির দিনের সকালে কখনও কখনও দুজনেই একসঙ্গে বসে সাইকেল পরিষ্কার করতেন। ইংরেজরা মাত্র আড়াইশো বছর বয়সী কলকাতা শহরের বাঙালিদের ইংরিজি যেমন শিখিয়েছিল তেমন জুতো থেকে বেল্ট, সাইকেল থেকে মোটর গাড়ি সবকিছুরই যত্ন করতেও শিখিয়েছিল। অনেক কিছুই বাঙালিরা ইংরেজদের কাছ থেকে শিখেছিল। তবে তার মধ্যে খারাপটাই বেশি; ভালোটা কম। এই কথাটা ঋভুর বাবা প্রায়ই বলতেন। বাবা বলেছিলেন, "জেদি হওয়া ভালো কিন্তু জেদ জিনিসটা কোনো ভালো কারণের জন্যেই থাকা উচিত। ক্লাসে ফার্স্ট হওয়ার জন্যে, খেলার মাঠে আদর্শ স্পোর্টসম্যান হওয়ার জন্যে, জীবনে দশজনের মধ্যে একজন হয়ে ওঠার জন্যে যে জেদ সে জেদ ভালো। সত্যিকারের ভালোত্ব অর্জন করার জন্যে যে মানুষে জেদ করে, সেই মানুষের জেদ ভালো। কিন্তু যারা গুণ বা প্রকৃত ভালোত্ব ছাড়াই নিজেদের ভালো বা বড়ো বলে প্রমাণ অথবা জাহির করার জেদ করে তাদের জেদটা খুবই লজ্জার, খারাপ। তুমি তেমন জেদি কখনও হয়ো না জীবনে।

ছানুকাকুকে দেখতে যাচ্ছিল ঋভু ছানুকাকুদের বাড়িতে বিকেলবেলা। ডিমলার রাজবাড়ির মোড়ের মাথায় পাঠশালায় পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঋভু যখন পাঠশালাতে পড়ত, অবশ্য খুব অল্পদিনই পড়েছিল; তখন পণ্ডিতমশায়কে খুবই কাছ থেকে দেখেছিল। ব্রাহ্মণী থাকতেন দূরদেশে; পণ্ডিতমহাশয়ের স্বদেশে। একটিমাত্র সন্তান ছিল। একটি ছেলে। সাপের কামড়ে সে মারা যায় বিনা চিকিৎসায়। সেই যুগে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে সর্পাঘাতের চিকিৎসা হতো না তেমন। ওঝাই ছিল ভরসা।

সেই একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে পণ্ডিতমশাই ঋভুদেরই নিজের সন্তান করে নিয়েছিলেন। তাঁর হাতের কানমলা আর বেত খেয়েছিল ওরা, তাঁর মুখের কড়াকিয়া, গন্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া, পড়কিয়া, চৌকিকিয়া, কাঠাকিয়া, সেরকিয়া, দশকিয়া, অসমীয় কাক-কড়াদি লেখবার রকম, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের নামতা এবং তারই সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল থেকে ভবভূতি কালিদাস এসবও শুনেছিল।

মানে বুঝেছিল কমই। কিন্তু এই সব মিশ্র শিক্ষায় তার মনের মধ্যে একধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। চিত্রকর যেমন আসল চিত্র আঁকার আগে তুলি বুলিয়ে পটভূমি এঁকে নেন, পোটো যেমন পটের ওপরে হলুদ বা লাল রঙের আস্তরণ বিছোন, কুমোর যেমন প্রতিমার গায়ে-মুখে মাটি লাগানোর আগে খড়ের মূর্তি গড়ে নেন তেমনই করে পণ্ডিতমশায়ের মিশ্র-শিক্ষা ঋভুর মনে ও মস্তিষ্কে একটি পাতলা আস্তরণ গড়ে তুলেছিল, যা শিক্ষা নয়; কিন্তু শিক্ষার আভায় আভাসিত এক ধরনের বিভা, যা পরবর্তী জীবনে ঋভুর পরিশ্রম ও তীব্র ইচ্ছা থাকলে, নিছক আংশিক হলেও শিক্ষা হয়েও উঠতে পারত।

ঋভু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল পণ্ডিতমশাইকে।

পন্ডিতমশাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে প্রণাম নিলেন। তারপর ঋভুকে তুলে ধরে মাথায় হাত ছুঁইয়ে চিবুকেও হাত ছোঁওয়ালেন। সেই যুগে প্রকৃতই প্রণম্য মানুষের এমন আকাল ছিল না। আর প্রণম্য যাঁরা, তাঁরা পরমান্ন খাওয়ারই মতো প্রগাঢ় পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রণতদের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণও করতেন।

মা জননী কেমন আছেন রে রিভে?

ভালো।

ঋভু বলল।

আম খেয়েছিলেন পণ্ডিতমশাই?

হ্যাঁ। ধন্যবাদ জানাস মা জননীকে।

পরমান্ন?

হ্যাঁ। তাও। ধন্যবাদ জানাস তোর মাকে।

ভালো লেগেছিল? পণ্ডিতমশাই?

কিছু কিছু বস্তু এই সংসারের আছে ঋভু, খাদ্য-বস্তু, ভোগ্য-বস্তু; যা পন্ডিত এবং মূর্খ উভয়েরই সমান ভালো লাগে। স্বাদু আম এবং পরমান্ন তারই মধ্যে গণ্য।

ঋভু চুপ করে থাকল।

পণ্ডিতমশায় শুধোলেন, তোর মাস্টারকাকা কেমন আছেন? কুশলে তো? পুলিশে নাকি আবারও বাড়ি ঘিরেছিল? গতরাত্রে?

ভালো আছেন। হ্যাঁ। তা ঘিরেছিল।

পণ্ডিতমশায় নির্জন পথে শেষ বিকেলের সোনা রোদে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বললেন :

"বন্দেমাতরম্। সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্। বন্দেমাতরম্।"

পণ্ডিতমশাই মুদির দোকানে এসেছিলেন। এখন পাঠশালার দিকে ফিরে চললেন।

ঋভুও এগোল ছানুকাকুদের বাড়ি।

ছানুকাকুরা তিন ভাই। চিনু, বেণু, ছানু।

উমা দাদুর প্রথমপক্ষের তিনছেলে। আর একবোন রাঙা। উমাদাদুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দুই ছেলে। তারা ছোটো। দ্বিতীয়পক্ষ ব্যাপারটা যে কি তা ঋভু ঠিক বুঝত না তবে দ্বিতীয়পক্ষের উমাদিদিমাকে দেখে তার কেমন বন্দিনি মনে হতো। সবসময়েই ঘোমটা দিয়ে থাকতেন তিনি। বয়সে খুবই কম। প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে দেখতে পেত ঋভু তাঁকে প্রায়ই। ঘরের বাইরে থেকে কখনও কখনও উঠোন পেরিয়ে ঘোমটা টেনে অন্যঘরে যেতেও দেখতে পেত। দেওয়ালের আয়না, কুলুঙ্গি, দেব-দেবীর ছবি এই সবই, ঋভুর মনে হতো তাঁর সংসার এবং স্বামীর চেয়েও তাঁর কাছে অনেক বেশি সত্যি ছিল। এ দেশের মেয়েরা যে পুরুষদের মতো স্বাধীন নয়, যে-স্বাধীনতা থেকে পুরুষরাই প্রতিপদে তাদের বঞ্চিত করে এসেছে এমন একটা বোধ প্রায়ান্ধকার ঘরে প্রায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘোরাফেরা করা উমাদিদিমাকে দেখে। জানলার পর্দার উপরে কখনও সখনও ভেসে থাকা তাঁর ঘোমটার সমান্তরাল রেখাতে দেখা তাঁর শান্ত, নির্লোভ, প্রতিবাদহীন দুটি সমর্পণ-ভরা চোখ সন্ধ্যাকাশের ধ্রুবতারারই মতো ঋভুর চোখে জ্বলে জ্বলে উঠত। ও বুঝতে পারত যে, তার মা তাপসী, তৎকালীন বঙ্গীয় নারীদের মধ্যে ব্যতিক্রম। প্রচন্ড ব্যতিক্রম।

ছানুকাকুর এক পায়ে ও এক হাতে প্লাস্টার করা। পা উপরে তুলে লুঙ্গি পরে শুয়েছিল খাটের উপরে। পাশে বন্ধু নীলকাকুও বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। দরজাটা বন্ধ ছিল। ঘরে ঢুকতেই সিগারেটের ধোঁয়ার বোঁটকা গন্ধ পেল ঋভু।

ছানুকাকু ঋভুকে দেখে বলল, আয় ঋভু।

কেমন আছো?

ফাস্‌কেলাস।

রেণুকাকু বলল, কাউকে যেন কিছু বলিস না ঋভু!

না, না।

চিনুকাকু কোথায়?

সে তো সুধীনদাদের বাড়িতে পড়তে গেছে।

ও।

হরিসভার পুকুরপাড়ে চক্রবর্তীদের বাড়ি। তাঁরা চার ভাই। অতুল, অনিল, সুনীল, সুধীন। সতীশ চক্রবর্তীর ছেলেরা সব। ঋভু, ফর্সা ছিপছিপে হাসি-খুশি-সুধীনকাকুকেই বেশি চিনত। তাদের বাড়ির সামনে হাতির শুঁড়ের মতো দুই শুঁড়ের মধ্যে দিয়ে সিমেন্টের সিঁড়ি উঠে গেছিল ধাপে ধাপে। চিনুকাকু তাঁদেরই বাড়ির একটি শূন্য ঘরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পড়া করত। কৈলাশরঞ্জন স্কুলে পড়ত চিনুকাকু।

বেণুকাকু ছিল ধবধবে ফরসা। পরবর্তী জীবনে তার সঙ্গেই সম্পর্ক বেশি গাঢ় হয়েছিল ঋভুর।

উমাদাদু ঋভুকে খুব ভালোবাসতেন। ভাল নাম ছিল উমেশচন্দ্র বসু। ঋভু তার নিজের ঠাকুদারকে কখনও ফোটোতে ছাড়া দেখেনি। ঋভুর জন্মের আগেই তিনি চলে গেছিলেন। উমাদাদু ছিলেন প্রমীলাবালার ছোটো ভাই। আরও এক ভাই যোগীদাদু থাকতেন দিনাজপুরের বালুরঘাটে। অনেক জমিজমা পুকুর ছিল তাঁর। চকমাঝিনাতে ছিল খামা।

অনেক বছর পরে, ঋভু তখন কলেজে পড়ে, কলকাতাতে এবং দেশভাগের পরে উমাদাদুরা সব তখন বালুরঘাটেই এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। চৈত্র মাসে একবার বেড়াতে গেছিল ঋভু নদী পেরিয়ে গরুর গাড়িতে করে মাঝিনা। উদোম টাঁড়ের মধ্যে মধ্যে একা একা তালগাছেরা দাঁড়িয়ে থাকত। সেই আদিগন্ত উষর রুক্ষতার মধ্যে স্নিগ্ধতা প্রতিমূর্তির মতো সাঁওতাল মেয়ে-মরদ খেত-মজুর হেঁটে যেত। রৌদ্রদগ্ধ চৈত্রের আদিগন্ত মাঠে হু-হু হাওয়া-বওয়া দিনে উমাদাদুর বড়ো ভাই যোগীদাদুর (ভালো নাম ছিল যোগেশ) খামারের পুকুর থেকে ঋভুকে বিশেষ খাতিরদারি করার জন্যে জাল ফেলে একমণ ওজনের পাকা রুই তোলা হয়েছিল একটি। সত্যিই একমণ। মাছ-ভাজা, মাছের-তরকারি, মুড়িঘন্ট, মাছের ঝোল, মাছের তেল, মাছের টক খেয়ে একমাস গা-বমি করেছিল ঋভুর। মাছের নাম পর্যন্ত শুনতে পারত না তখন।

ছানুকাকুদের বাড়িতে পৌঁছে হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঋভুর সেজকাকুর দলের বিশ্বাসঘাতক মাধবকাকুকে কী করবে ছানুকাকুরা?

মাধবকাকুকে কি করবে?

ঋভু শুধোলো ছানুকাকুকে।

ঝিকার গাছ দেখছস?

ছানুকাকু বলল, চোখ নাচিয়ে।

হ্যাঁ। হরিসভার পুকুরপাড়েই তো আছে একটা।

তবে তো দেখছসই। ঝিকার গাছের ডাল রাবারের মতো। তা দিয়া কাউরে যদি মারস তবে তার যা লাগব তেমন আর কিছুতেই লাগে না। মাধবদাকে ওষুধ দেওয়া হইয়া গ্যাছে গিয়া। এ জীবনের মতো সে আর বিশ্বাসঘাতকতা কইরতে আইবনা কারো সঙ্গেই।

কেন? কী করেছ তোমরা তাকে?

নীলুকাকু বললো, বেঁটেখাটো মাধবদাকে একটা সরষের খোল চালানের বস্তাতে তালগোল পাকিয়ে ভরে, বস্তার মুখে বেঁধে চারজনে মিলে ঝিকার ডাল দিয়ে একঘণ্টা পেটানো হয়েছিল।

চারজন কারা?

তা তোকে বলব না। তোর জানার দরকার নাই।

তারপর?

তারপর তাকে শংকামারীর শ্মশানের পথে বস্তাবন্দি অবস্থাতেই মস্ত একটা বাঁশঝাড়ের মধ্যের গভীর অন্ধকারে ফেলে রাখা হয়েছিল। দু হাতে ভুঁড়ো শেয়ালেরা এসে কামড়াকামড়ি করে খাওয়ার পর একজন রাজবংশী মানুষ বাঁশ কাটতে গিয়ে সেই বস্তা দেখতে পায়। মাধবদা এখন হাসপাতালে। পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।

মাধবদা যদি নাম বলে দেয়। মরে তো আর যায়নি!

না। মরে তো যায়নি। কিন্তু মরে গেলেও যারা মেরেছিল তাদের নাম বলবে না।

কেন?

বলবে না, কারণ মাধবদা ভালো করেই জানে যে রংপুর শহর ছেড়ে উনি পালিয়ে স্বর্গ বা নরক যেখানেই যান না কেন সেখানেই নতুন চারজন, তারপরে আরো চারজন, তারপরে আরো অসংখ্য

চারজনের দল তার ওপরে হামলে পড়বে। যদি নাম কখনও বলে তবে তখন সেবারে তার প্রাণটাই সত্যিই যাবে।

পুষিপিসির কথা কি জানে মাধবকাকু?

জানে। সেইটাই আমাদের একমাত্র চিন্তা।

পুষিপিসিকে যদি কিছু করে পুলিশে?

তবে তাদের অবস্থাও মাধবদার মতো হবে। মাধবদাও কিছু করতে চেয়েছিল।

কিন্তু তাতে তো পুষিপিসির কিছু সুরাহা হবে না।

না। তা হবে না।

তবে?

তবে আর কী? একটা দেশ স্বাধীনতা চাইবে আর তার জন্যে ন্যায্যমূল্য দেবে না তা তো হয় না রে ঋভু। যে-কোনো জিনিসই ন্যায্য মূল্যে না কিনলে তা কখনওই মূল্যবান হয় না। থাকে না সে প্রাপ্তি। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই। ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারিনি বটে রে তবে জীবন থেকে শিখেছি কিছু কিছু। ভালো ছাত্র না হলেও চোখ-কান খোলা রাখলে জীবন থেকেও অনেক কিছুই শেখা যায়। এতবড়ো একটা পাওয়ার জন্যে কিছু দাম তো দিতে হবেই! কী করা যাবে বল্? ঋভু চুপ করে রইল। ভাবছিল, কথাগুলো।

ছানুকাকু বলল, তুই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পড়েছিস?

হ্যাঁ। পড়েছি।

তবে তো জানিসই। প্রাণও অতি তুচ্ছ জিনিস। প্রাণ অতি সহজেই দেওয়া যায়। পড়িসনি? কী রে?

'একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধমামায় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

এইরূপ তিনি বার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল "তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

ঋভুর গা-ছমছম করে উঠল শুনতে শুনতে। ভয়ে নয়। অন্য কোনো অনুভূতিতে।

ছানুকাকু থামলে, ঋভু বলল, তোমার এতোখানি মুখস্থ আছে? কী করে করলে?

যা ভালোবেসে পড়া যায় তাই মুখস্থ হয়ে যায়। কারো একবার পড়লেই হয় আর আমার মতো মাথা-মোটাদেরও বারবার পড়লে হয়। পড়াশোনার কিছুই মুখস্থ হয় না আর দ্যাখ এগুলো পটাপট হয়ে যায়। প্রাণের চেয়েও অনেক বড়ো, ভক্তি! বুঝলি ঋভু। দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি। শিকল ভাঙার এতোবড়ো মন্ত্র আর নেই রে। সে, যে-কোনো শিকলই হোক না কেন!

ঋভুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আবারও কথাগুলো শুনে। পণ্ডিতমশাই যেমন তার মনে এবং মস্তিষ্কে বিশেষ একরকম প্রভাব বিছিয়েছেন পটভূমির মতো, তার সেজকাকু (মাস্টারকাকু), সেজকাকুর বন্ধুরা, ছানুকাকুরাও অন্য একরকমের প্রভাব বিছিয়েছেন। এই সব প্রভাব তার পরবর্তী জীবনে যে কতখানি স্থায়ী হবে তা ঋভু জানত না। তখন সত্যিই জানত না। তবে সেই সব প্রভাব স্থায়ী হয়েছে। চিরস্থায়ী।

চলি।

ঋভু বলল।

আয়। আবার আসিস।

ছানুকাকু বলল।

উমাদাদুকে বলে, ঋভু ফিরে চলল বাড়ির দিকে। চিনুকাকুর বোন এবং বেণুকাকুর দিদি রাঙাপিসির সঙ্গে দেখা হলো না ঋভুর। কালো পাথরের মতো কালো রঙে অমন কাটা-কাটা নাক-মুখ-চিবুক, অমন পলাশফুলের মতো হাসি আর দেখেনি ঋভু। যিনি নাম রেখেছিলেন ওই পিসির রাঙা, সে মানুষটি রসিক অবশ্যই বটেন।

রাঙাপিসি পাশের বাড়িতে গেছিল। গিরিনকাকুদের বাড়ি।

এদিকে সন্ধে হয়ে আসছিল। তাই পা জোরে চালাল ঋভু। বাঁশঝাড়ের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। মস্ত বড়ো কনকচাঁপা গাছটি অন্ধকারকে যেন হাত ধরে নিয়ে আসছে এই বহুরঙা আলোর দুনিয়াতে। বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বস্তা-বন্দি ঝিকার ডালের প্রহারে প্রহারে জর্জরিত মাধবকাকুর মুখটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঋভুর। মাধবকাকু তো কত ভালো ছিল। এমন ভালো মানুষ হঠাৎ খারাপ কেন হয়ে গেল? খারাপ হয়ে গেলে মানুষের ভালোত্ব কি একেবারেই মুছে যায়? তার অতীতের জমা-অঙ্ক কি কোনো কাজেই লাগে না আর? এই কথাটার যুক্তিতে ঋভু বিশ্বাস করতে পারল না।

ভালো মানুষ কেন খারাপ হয়?

শাস্তি দেবার আগে সেই মানুষের জায়গাতে নিজেকে ফেলে তবেই বোধহয় তাকে বিচার করা উচিত। তবে ছানুকাকুরা যা করেছে তার পেছনেও বোধহয় কোনো যুক্তি কাজ করেছে। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই করেছে।

বাঁশঝাড়টা পেরিয়েই ঋভু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পশ্চিমের আকাশে তখনও হালকা আলোর আভা আছে। আর সেই আভারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক, ঋজু, সটান শরীরের শিমূল। দু ধারে সমান্তরাল রেখায় ছড়িয়ে দেওয়া তার অগণ্য হাত সমেত। সিলুয়েট। কালো।

বড়ো হলে, ঋভু ঋজু হবে। এই শিমূলেরই মতো।

বলল ঋভু। মনে মনে।

বাড়ি পৌঁছতেই প্রমীলাবালা চেঁচিয়ে উঠলেন। অ্যাই তো ঋভু! কোথায় গেছিলি ছ্যামড়া?

ছানুকাকুদের বাড়িতে।

পড়া নেই, শোনা নেই, কেবল ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ কইর‍্যা ঘুইরা বেড়ান্ কাম তোমার।

ঠাকুমার কাছ থেকে এমন রূঢ় ব্যবহার কখনও পায়নি ঋভু। বিশেষ করে পড়াশুনার ব্যাপারে। হতভম্ব হয়ে গেল ও।

নিমুকাকা আর মা নিমুকাকার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। বিবাগী তখন বাড়িতে ছিলেন না।

ঠাকুমা বললেন, পুষি আইছিল। পুলিশে আইস্যা তারে আমাগো বাড়ি থিক্যাই-ধইর‍্যা লইয়া গেল। তর খোঁজও করতাছিল।

তাপসী স্থির দৃষ্টিতে ঋভুর দিকে চেয়েছিলেন। তাঁর মুখে ভয়, গর্ব এবং দুশ্চিন্তা মাখামাখি হয়েছিল। ঋভু গিয়ে মায়ের কোলের কাছে দাঁড়াল। তাপসী ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর দু চোখ জলে ভরে এল। অবাক হয়ে গেল ঋভু। তাপসীকে ও কখনও ভাবাপ্লুত হতে দেখেনি।

প্রমীলাবালা অবাক চোখে চেয়ে রইলেন ওদের দিকে এক মুহূর্ত। তারপরই ধমক দিয়ে বললেন, চোখের জল ফ্যালাও ক্যান্ তাপু? ছাওয়াল কি তোমার চুরি কইর‍্যা থানায় যাইতাছে? না, ডাকাতি কইর‍্যা। আমারও একখান ছাওয়াল আছে যে তা ভুইল্যা যাও ক্যান? আমারে কি কখনও চোখের জল ফ্যালাইতে দ্যাখছো? চোখের জল মুইছ্যা ফ্যালাও। ছাওয়ালের অকল্যাণ ডাইক্যা আইন্যো না।

ঋভু মায়ের বুকের কাছে দাঁড়িয়ে ঠাকুমার কাটা-কাটা চোখ-চিবুকের লাল টুকটুকে মুখে চেয়ে রইল। সত্যিই ঠাকুমার চোখে একদিনের জন্যেও জল দেখেনি ঋভু।

ও ভাবছিল, পুষিপিসির কি হবে? পুষিপিসির?

গিয়াসুদ্দিন নানাকে ইতিমধ্যে একদিন ডেকে তাপসী ভালো করে খাইয়ে দিলেন। সেদিন নিমুকাকা বিবাগীকাকা সকলেই ছিলেন। প্রমীলাবালা তিনদিনের জন্যে বগুড়া যাওয়াতেই তা সম্ভব হয়েছিল।

গিয়াসুদ্দিন চাচা বড়ো ভালো মানুষ। কিছু মানুষ সংসারে থাকেন যাঁদের ভাগ্যের কাছে কোনোরকম অনুযোগ অভিযোগ থাকে না। তাঁদের 'নিয়তিই এরকম' এমন কিছু একটা বিশ্বাস তাঁরা গড়ে তোলেন "খুদাতাল্লার এই রকমই ইচ্ছা" এই বিশ্বাস গড়ে তোলার পর তাঁরা সেই বিশ্বাসের কাছে পুরোপুরিই আত্মসমর্পণ করেন। নানা গিয়াসুদ্দিন সেই রকম একজন মানুষ।

মোটা মোটা কবজি তাঁর দুই হাতের। মোটা পায়ের গোড়ালির হাড়, ইয়া চওড়া বুকের ছাতি। কাটা কাটা চোখমুখ। কাঁচাপাকা চুল। উদ্ধত থুতনির মানুষটাকে ভীষণই শক্ত এবং জবরদস্ত চরিত্রের বলে মনে হয়। কিন্তু শুধু চেহারা দিয়ে যে মানুষের চরিত্র বোঝা যায় না গিয়াসুদ্দিন নানার চরিত্রই তা প্রমাণ করে।

ঋভুর বাবা হৃষীকেশ প্রায়ই বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান মুনিষ ও চাষিরা সমানই গরিব। তাদের খাওয়া দাওয়াও প্রায় একইরকম। মূল তফাত এই যে মুসলমানেরা পেঁয়াজ রসুন এবং লংকা পর্যাপ্ত পরিমাণে খায় এবং সেই কারণেই তারা শক্ত-পোক্ত অনেকই বেশি। খাটতেও পারে হিন্দুদের চেয়ে বেশি। কায়িক পরিশ্রমের যত কাজ আছে, ডকের মজদুর, স্টিমার ও জাহাজের খালাসি, পাটকলের মজুর, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই গিয়াসুদ্দিন চাচাদের মতোই মুসলমান। যাঁরা মাথার কাজ করেন তাঁদের মধ্যেও এই উৎসাহ উদ্দীপনা ও খাটনির গুণ দেখা যায়।

ঋভু বলল, সে কথা, গিয়াসুদ্দিন নানাকে।

নানা হেসে বলল, তা হয়ত ঠিক। কিন্তু বাজান্ একথাও ঠিক যে এসব জিনিস বেশি খেলে রাগ এবং আরও অনেক কিছুও বেশি হয়।

তোমরা রাগই যদি থাকবে তবে তুমি সেদিন ঠাকুমাকে সে রাগ দেখালে না কেন নানা?

ঋভু বলেছিলো।

গিয়াসুদ্দিন নানা সরল হাসি হেসে বলেছিল, সবার উপরে রাগ কি দেখানো যায় বাজান্? না, দেখানো উচিত? কর্তামা, কর্তামাই। কর্তামা যদি একটা ভুল করেও থাকেন সেই ভুলের বিচার করা কি আমাকে মানায়? আর যদি রাগ সেদিন করতামও তাহলে কি আর আজ তোমরা সকলে মিলে আমাকে ওই রান্নাঘরেই বসিয়ে এত আদর করে সাতপদ দিয়ে খাওয়াতে? সব জিনিসেরই, ভালোমন্দ দিক থাকে। তোমরাও তো কর্তামার পরিবারের লোক, না কি? তোমার মা ঠাকরুণ কি আমার কাছে ক্ষমা চাইতেন? সব জিনিসেরই সব ঘটনারই বিচার সঙ্গে সঙ্গে করা যায় না। করা উচিতও নয় বাজান্। এ পিঠে ভালো ও পিঠে মন্দ এই নিয়েই তো সংসার। খুদাতাল্লার এই দুনিয়াদারি।

যাবার সময় গিয়াসুদ্দিন নানা ঋভুকে অনেক 'দোয়া' দিয়ে গেল। ঋভুর মাথায় হাত দিয়ে বলল, হিন্দুদের মধ্যে যেমন গোঁড়ামি আছে, মুসলমানদের মধ্যেও আছে। কিন্তু সেইটাই সবটুকু নয়। মানুষ যেদিন সত্যিই অমানুষ হয়ে ওঠে তখনই হয় খুদাতাল্লার মুশকিল। আমার মন বলছে, কর্তামা অমানুষ নন। ছেলেবেলা থেকেই কিছু অন্ধসংস্কার তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল, যেমন আমাদের অনেকের মধ্যেও ওঠে। তবে তোমার জীবদ্দশাতেই তুমিই হয়তো দেখতে পাবে যে কর্তামা যেটাকে আলো বলে জানেন আর যেটাকে অন্ধকার, সেই আলো-অন্ধকারের দেওয়াল নিজে হাতেই ভেঙে ফেলবেন

তিনি। জানবেন এবং তোমাদেরও জানাবেন যে, অন্ধকারটাই আলো এবং আলোটাই অন্ধকার। দেখো তুমি বাজান্।

বাঃ!

ঋভু বলল, কী সুন্দর করে কথা বলো তুমি নানা। এখন তোমার রাগ নেই তো আর আমাদের ওপরে?

গিয়াসুদ্দিন নানা হেসে বলল, নারে বাজান্। কোনো রাগ নেই। তোর জন্যে তোর নানির রান্না করা খল্‌সে মাছের চচ্চড়ি নিয়ে আসব একদিন। কষে পেঁয়াজ-রসুন-শুকনো লংকা দিয়ে রাঁধা। চেহারা ছবি এমন হবে, দেখাবে যেন বম্বে-ডাক।

বম্বে-ডাক্‌টা কী ব্যাপার নানা?

বম্বে-ডাক্‌ই জানিস না? শুঁটকি মাছ রে! এক ধরনের শুঁটকি। অনেক ধরনের মধ্যে আমি যখন চট্টগ্রামের ডকে কাজ করতে গেছিলাম তখনই খেতে শিখেছিলাম। এখানের মান্‌ষিরা গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। কিন্তু অমন একটা খাওয়ারই হয় না। ভালো করে রান্না করার পর কোনো গন্ধই থাকে না। এক থালা ভাত খাওয়া যায় আদর করে শুধু এক দলা শুঁটকি দিয়ে। আর পুষ্টিই বা কী!

চট্টগ্রাম জায়গাটা কী রকম? নানা?

আরে! অমন জায়গা আর হয় নাকি! এই সমুদ্র, এই পাহাড়। একবার যাস, যদি পারিস।

নিমুকাকু বললেন, ঋভু তোকে একটা বই দেব পড়তে। পদ্মানদীর মাঝি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। আহা! কী বই!

চট্টগ্রাম নিয়ে লেখা?

না। তা নয়।

পদ্মাপারের এক গ্রামের জীবন নিয়ে লেখা। তাতে "হুসেন মিঞা" বলে একটি চরিত্র আছে। "গ্রোথ অফ দ্য সয়েল" এর সেই চরিত্রটির মতো। আঃ। কী যেন নাম ছেলেটির মনে পড়ছে না। পরে বলব তোকে। বইটাও পড়াব তোকে। নেহাৎ মানিকবাবু বাংলাভাষার লেখক তাই নোবেল প্রাইজ পেলেন না। নইলে ওঁর "পুতুল নাচের ইতিকথা" আর "পদ্মানদীর মাঝি" এই দুই বইয়ের জন্যেই তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত ছিল।

"গ্রোথ অফ দ্য সয়েল" কার লেখা? মা?

ন্যুট হামস্যুন-এর লেখা। নরওয়ের লেখক। উনি যদিও ওঁর 'হাঙ্গার' বইটির জন্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন কিন্তু আমার মতে ওঁর সবচেয়ে ভালো বই "গ্রোথ অফ দ্য সয়েল"। নিমুকাকা বললেন।

তাপসী বললেন, দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে, একদিন তো হবেই তখন সব বাঙালা ভাষাভাষিরা মিলে হয়তো কোনো পুরস্কারের প্রবর্তন করবেন, যার সম্মান এদেশের সব পুরস্কারের চেয়ে বেশি হবে। কবে যে দেশ সত্যিই স্বাধীন হবে। এই স্বপ্ন সত্যি হবে আমার!

হবে বউদি। হবে তো বটেই। তবে সেদিন বাঙলার মানুষ যারা পাঞ্জাবের মানুষদের সঙ্গে সমান মূল্য দিয়েছেন স্বাধীনতার জন্যে তাঁদের কেমন সুদিন আসে, তাই দেখার অপেক্ষাতেই আছি আমি।

বাঙলাকে তো অনেকবার কেটে-ছেঁটে ছোটো করা হয়েছে। যেটুকু আছে, দেশ স্বাধীন হবার সেটুকু অন্তত অটুট থাকবে, বাংলার সব মানুষ মিলেমিশে এই প্রদেশকে ভারতের সবচেয়ে বেশি মান্য প্রদেশ করে গড়ে তুলবে এই প্রার্থনাই করি আমি সবসময়।

আপনের প্রার্থনা, খুদাতাল্লার কাছে আমাদেরও দোয়া মাঙ্গা মা-ঠাকুরন। "আ মরি বাঙলা ভাষা! মোদের গরব মোদের আশা।"

তাপসী অবাক হয়ে বললেন, আপনিও জানেন এই গান?

জানব না কেন? আমি কি বাঙালি নই নাকি?

একশোব্বার!

নিমুকা বললেন, গিয়াসুদ্দিন চাচাকে।

বড়োকাকু বললেন : "বাংলার ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান!"

আজ চলি।

বলেই, হেসে গিয়াসুদ্দিন নানা সেলাম করলেন তাপসীকে।

তাপসী বললেন, ভাদ্রর তালপাকা রোদ্দুর। ছাতা নিয়ে যাবেন নাকি? নাকি বসে যাবেন কিছুক্ষণ।

গিয়াসুদ্দিন নানা হাসল। বলল, আমরা তালেরও বাড়া। আমাদের পাকায় এমন কিছু নেই। ঘরামির আবার রোদের ভয়। চলি। এখুনি গিয়ে কাজে লাগতে হবে। অসময়ে এমন ভোজ খেয়ে কি করে কাজ করব জানি না আজ।

নিমুকা আর বিবাগী কাকা গিয়াসুদ্দিন নানাকে বাইরের মাঠে বার-বাড়িতে ঢোকার পথ অবধি এগিয়ে দিয়ে এলেন বার-বাড়ির প্রবেশ পথের দুদিকে দুটি কাঠ টগরের গাছ। ডানপাশে গোলাপ বাগান।

মা বললেন, খুবই ভালো হলো। জানিস ঋভু। তোর বাবা তো সবসময় এই কথাই বলেন।

কি কথা?

মানুষের মোটে দুটি জাত?

কি? কি?

ভালো আর খারাপ। এর বাইরে যত জাত সে সব জোর করে তৈরি করা। বলেন, পৃথিবীতে এই এত এত জাতি যে, এই ব্যাপারটাই একধরনের বজ্জাতি। ঈশ্বরই বলো, খোদাই বলো, যীশুখ্রিস্টই বলো, সবই এক। ইংরিজিতে একটা কথা আছে না?

কি কথা মা?

All Roads Lead to Rome!

ব্যাপারটা তাইই। পথ বিভিন্ন, 'পুজো-আর্চা', 'নামাজ', 'প্রেয়ারের' রীতিও তাই। আসলে সব ধর্মের গন্তব্যই কিন্তু এক।

ধর্ম-টর্ম ওসব ব্যাপারের বোঝে না কিছুই ঋভু। তবে এটা দেখেছে যে ঋভুদের কলকাতার ভাড়া-বাড়িতে কোনোদিন পুরুতঠাকুর ডেকে পুজো হয়নি আজ অবধি। তাপসী নিজে, হৃষীকেশের ইচ্ছেতে, মন্ত্রোচ্চারণ করেন বই দেখে। ওরা সকলেই লক্ষ্মীপ্রতিমা, বা সরস্বতী প্রতিমার সামনে মাদুর বা আসন পেতে বসে। তাপসীর সুললিত গলাতে উচ্চারিত সেই সব মন্ত্রকে গানেরই মতো শোনায়।

বেলা একটু পরেই পড়ে যাবে। মাঝেমাঝেই শরৎ-শরৎ ভাব করে আকাশ। কে যেন নীল বড়ি ডোবানো তুলি বুলিয়ে দেয় আকাশে। আর কিছু পোষা মেঘ ছেড়ে দেয় তাতে, ধুনুরির পেঁজা তুলোরই মতো! শরৎ-শরৎ ভাব করেই আকাশ ও প্রকৃতি আবারও ভাদ্র হয়ে যায়। শেষ বর্ষাতে।

গতকাল বিকেলে তুমুল বৃষ্টি হয়েছিল। টিনের চালে বৃষ্টির নূপুরের টাপুর-টুপুর বাজে। মা হারমনিয়াম টেনে নিয়ে গান গান, "এ মাহ ভাদর, এ ভরা বাদর শূন্য মন্দির মোর—"

নিমুকা হেসে বলেন, "শূন্য" বলাটা কি ঠিক হলো বউদি?

বড়োকাকুও হাসেন।

বলেন, রবিঠাকুর যা বলেন বলুন, আপনি বড়ো জোর "সম্পূর্ণ পূর্ণ নয়" এমন কিছু বলতে পারেন। 'শূন্য" বলে আমাদের অপমান করবেন না।

ঠাকুমা নেই এই তিনদিন। ভারত যেন পুরোপুরি স্বাধীনই হয়ে গেছে। কত কিছুই যে করা হচ্ছে এই তিনদিনে। সকলে মিলে!

তাপসী সে কথার উত্তরে বিবাগীকে হেসে বলেছিলেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেখেছিলাম ভিখিরিকে ডেকে পেটভরে খাইয়ে দিলেই তারপর সে বমি-বাথরুম করে মারাই যায়।

নিমুকাকা আর বিবাগীকাকা একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন, আপনি ডেঞ্জারাস মানুষ।

তাপসী প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন, কীরে ঋভু? মনে নেই? সেই "কাঙালি" বলে একটি ছেলেকে বাড়িতে কাজ দিয়ে রাখা হলো না? তোর বাবা তাকে প্রথম দিন দু চামচ, তারপর দিন চার-চামচ এমনি করে ভাত দিতে বলতেন? নইলে বেচারি মরেই যেত। বহুদিন উপবাসী থেকে অমন হঠাৎ খেয়ে বহু মানুষ মরে গেছে বলে আমি জানি।

মা, ওর নাম তো কাঙালি আমরাই দিয়েছিলাম। আসল নাম যেন কী ছিল?

জানি না। মনেও নেই তার আসল নাম কি ছিলো। তবে ছেলেটাকে খুবই মনে আছে। বাঙালি জাতের প্রতিনিধি যেন! আহা!

তাপসী গম্ভীর হয়ে গেলেন, কথাটা বলতে বলতে।

কাঙালিকে বাঁচিয়েছিল বটে ওরা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে কিন্তু কাঙালি মরে গেল একদিন রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়ির সামনেই অ্যামেরিকান নিগ্রো ড্রাইভারের বত্রিশ চাকার ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে। যে পেটের মধ্যে অনেক আকাঙ্ক্ষার এবং সামান্য ভালোবাসায় মাখায় কিছু ডালভাত ছিল, সেই পেটটাই পাঁচনম্বর ফুটবলের ব্লাডারের মতো ফাটিয়ে দিয়ে গেছিল ট্রাকের চাকাগুলো।

দৃশ্যটা মনে করেই ঋভুর গা গুলিয়ে উঠল।

ঋভু শুধু হলুদ-বসন্ত পাখিই দেখেনি, দেখেনি কাচ-পোকা, চিত্রল ঢোড়া সাপ, শীতের সকালের শিশির ভেজা ঘাসে ধোঁয়া-উঠিয়ে শামুকের মন্থর চলা অথবা গুটি কেটে শুঁয়োপোকার জন্ম হওয়া। এই সব আদিম প্রাকৃতিক, নির্জন, সুন্দর এবং শান্ত দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বয়সেই ও অনেক অন্যরকম দৃশ্য ও শব্দরও শরিক হয়েছিল। সেটা ওর পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু মানুষ হিসেবে তাকে পূর্ণ এবং বাস্তব করার সহায়ক হয়ে ছিলো সব অভিজ্ঞতাই।

হঠাৎ তাপসী বললেন, কাঙালির আসল নামের কথা ওঠায়, মানুষের নামের কোনো আসল নকল নেই বোধ হয়। প্রত্যেক মানুষই একটি নামেই তার চেনাশোনার জগতে পরিচিত হয়, মৃত্যুর পরও পরিচিত থাকে। তোরই তো কত নাম! বল? ঋভু, খোকন, গাডলু, লালা এবং চোর। তোর দিদিমা নন্দলালা নাম দিলেন তা থেকে তুই হয়ে গেলি লালা। যেন মুদির দোকানদার। মাস্টারকাকা আদর করে তোর নাম দিলেন চোর। তোর জন্মের পরেই যখন আমার জ্ঞান হলো, সেদিন ছিল শনিবার, পূর্ণিমার রাত, আষাঢ়ের পূর্ণিমা। চোখ মেলেই আমি দেখলাম আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বুদ্ধদেব। তাই তুই যখন তোর বাবার সঙ্গে গিয়ে পাখি মারিস আমার ভারি খারাপ লাগে। কোন্ নামে যে পৃথিবীর কাছে তুই পরিচিত হবি তা বিধাতাই জানেন। আসলে নামের কোনোই মাহাত্ম্য নেই, মাহাত্ম্য, নামধারী মানুষেরই! মানুষ তার নিজের মাহাত্ম্যে নামকে মর্যাদা দেয়।

কাঙালি খেতে পেত না তাই আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম কাঙালি। ওর পনেরোটা বছরের জীবনে খেতে-না পাওয়ার মতো সত্য, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো বড়ো সত্য আর কিছুই ছিল না। তাই তা মা-বাবার দেওয়া নাম যাই থাক না কেন ও ওর কাঙালি নামের মধ্যে দিয়েই ওর পনেরো বছরের জীবনে সবচেয়ে বেশি করে পরিচিত ছিল। বেঁচে ছিল। ওর নাম 'বিমল' অথবা 'সত্যব্রত' অথবা 'রাজা' হলেও কিছুই যেত আসত না। 'কাঙালি' নামটাই ওকে দেওয়া আমাদের খাটো-গেঞ্জি আর ঢোলা-প্যান্টেরই মতো বড়ো স্বাভাবিকভাবেই ওকে মানিয়ে গেছিল।

ঋভু মায়ের দিকে চেয়েছিল। এই ব্যাপারটা বড়ো ভালো লাগে ওর। ওর মা অথবা বাবা ওর শিশুকাল থেকেই ওকে একজন মান্য-গণ্য মানুষ বলেই মেনে নিয়েছেন। ও যে একজন আলাদা মানুষ, ও ছোটো বলেই যে ও হেলাফেলার, এমনটি ওর নিজের বাবা-মা কখনওই ওকে বুঝতে দেননি। পুষিপিসী যে সেদিন "কলকাতার ছেলেগুলো সব এঁচড়ে পাকা" বলেছিলো তাতে ঋভু রাগ করেনি একটুও। ও জানে যে, ওর সমবয়সী ছেলেমেয়েদের তুলনাতে মনের বয়সে ও অনেকই বড়ো। এ কথা জেনে ও শ্লাঘাবোধ করে না কোনো, কিন্তু ও যে ওরই মতো, অন্য কারো মতোই নয়; একথাটা জেনে খুবই ভালো লাগে ওর। ও নিজেও ওর নিজেরই মতো হতে চায় জীবনে, পুরোপুরিই ওর মতো ওরিজিনাল। অন্য কারোই প্রোটোটাইপ নয়। প্রোটোটাইপ, ভণ্ড, মেকি মানুষমাত্রই প্রতি ওই বয়সেই তার এক গভীর ঘৃণা জন্মেছিল।

তবে ঋভুর বাবা "ঘৃণা" কথাটাকেই ঘৃণা করেন। কিশোর ঋভুকে পরে একদিন হৃষীকেশ কলকাতায় বলেছিলেন, "নেভার হেইট এনিওয়ান। হেট্রেড ইজ অ্যান ইনডিগনিটি ট্যু ইওর ওন সেল্‌ফ। হেট্রেড ইজ আনবিকামিং অফ আ ম্যান। ইফ হি ইজ ট্রু টু হিজ ক্রিড।"

মাঝে মাঝেই এমন মা এবং বাবা পেয়েছিল বলে ঋভুর বড়ো কৃতজ্ঞ লাগে।

কার প্রতি? গিয়াসুদ্দিন চাচার খোদা? না প্রমীলাবালার ভগবান? না বাবার বন্ধু কলকাতার ম্যাক-আইভর-সাহেবের জেসাস? জানে না ঋভু।

মা তাপসী একটি গান প্রায়ই গান। রবিঠাকুরের গান। "ওদের কথায় ধাঁধা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি/তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি।"

গানটি ভারি ভালোবাসে ঋভু।

গিয়াসুদ্দিন চাচা চলে গেলে, একটু ঘুমিয়ে নিয়েই ঋভু বেরিয়ে পড়ল। আজ সকাল থেকেই ঠিক করেছিল যে শাজাহান মিঞার বাড়ি যাবে।

মমতাজের সঙ্গে দেখা হয়নি সেদিন অথবা তার পরেও। খোঁড়া, গোরুটা, যার নাম রেখেছে ঋভু তাজ; তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাবারও আছে।

জাহাঙ্গির নানা বলেছিলেন বটে যে গোরুটা 'বিয়োবে' না কিন্তু সে কথা তো ঋভু ঠাকুমাকে বলেনি। রঘুদাকে দিয়ে ঠাকুমা কোথায় যেন তাকে পাঠিয়েছিলেন, "পাল খাওয়াতে।"

"পাল-খাওয়ানো" ব্যাপারটা যে ঠিক কী তা ঋভু জানে না। তবে এটুকু জেনেছে যে গোরুদের "গাভিন" করার জনেই পাল খাওয়াতে পাঠানো হয়। তারপরই গোরুদের পেটগুলো বড়ো হয়ে যেতে থাকে আস্তে আস্তে। মাস কয়েক পরে গোরুটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তারপরে একদিন খুব ডাকাডাকি করতে থাকে। তখন গোয়ালঘরের মধ্যেই তাকে "চিকিৎসা" করতে হয়। তারপরই সাদা বা কালো বা লাল বা একাধিক রঙে-মেশা বাচ্চা বেরোয়। বাচ্চার গা-ময় ভেজা ভেজা ল্যাত-লেতে কী সব লেগে থাকে। তা পরিষ্কার করে দিলেই কাঁপা কাঁপা ছোট্ট মিষ্টি বাছুরটা উঠে পড়ে টালমাটাল পদক্ষেপে ছুটোছুটি করতে থাকে। হালকা কিন্তু স্পষ্ট গলায় ডাকে : হাম্বা-আ-আ-আ...

অবাক কান্ড! প্রমীলাবালা বলছিলেন, তোর তাজ তো বাচ্চা দেবে রে ঋভু। কি নাম রাখবি সে বাচ্চার?

ঋভু বলেছিল, তাই? তাজের বাছুর হলে তার নাম তাজা। তাজের বাচ্চা তাজা।

বাঃ! তাই রাখিস।

এই কথাটাও বলতে হবে জাহাঙ্গির নানাকে। একটা খবরের মতো খবর। গোরুটার বাচ্চা হয় না বলেই তো তাকে দূর ছাই করে কসাইখানাতে পাঠাচ্ছিলেন নানা!

ঋভুদের বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে, যে দরজাকে কলকাতায় বলে 'খিড়কি'; বেরিয়ে এল ঋভু। সামনের দরজাকে এখানে বলে "সদর"। 'সদর দরওয়াজা'। পেছনের দরজা দিয়ে বেরোলেই চোখ ও মন স্নিগ্ধ হয়ে যায় ঋভুর। এ দিকটাতে গাছগাছালি এতোই যে বছরের দুটি মাসের কয়েকদিন ছাড়া দিনমানেও অন্ধকার হয়ে থাকে এই বনপথ। এই বন ঋভুদের বাড়িরই মধ্যে। এই বনপথেই দাঁড়িয়ে এক বাসন্তী-ভোরে ঋভু এই সুন্দর পৃথিবীর বিভিন্ন শব্দর মহিমা আবিষ্কার করেছিলো প্রথমবার।

কান তো তার ছিলই। 'কানকাটা' কেউ কেউ হলেও শরীরে দুটি কান সব মানুষেরই থাকে। কিন্তু সেই কান দুটির শ্রবণশক্তির অসাধারণ ক্ষমতা এই রংপুরশহরের একপ্রান্তে অবস্থিত এই 'ধাপ' এর বাড়ির পালিত-লালিত বনের মধ্যে দাঁড়িয়েই জীবনে প্রথমবার সে আবিষ্কার করেছিল। তারপর থেকেই ঋভু এই শতাব্দির তাবৎ শব্দসমষ্টির ঝুমঝুমির দিকে কান পেতে থাকে। পাতার খস্‌স্‌-খসস্‌! মেয়েদের নতুন শাড়ির খসখসানিরই মতো নবজাত শিশুর মুঠিভর মৌটুসকি পাখির চকিত চিকন গলার ডাক, মেঘের গুড়গুড় জলের উপরে বয়ে-যাওয়া ত্রস্ত হাওয়ার জলজ পদশব্দ, পরিপূর্ণ নিটোল নিস্তব্ধতার পটভূমিতে পোকা-মাকড়, পাখি, হাওয়া, লতাপাতা, ফুল, ঘাস, নানারকম গতিতে জমি এবং গাছপালার ওপরে হাঁটা, চলা, দৌড়ে যাওয়া হাওয়ার শব্দ, নানারকম বৃষ্টির বিড়বিড়ানি, চিট্‌পিটানি এ সব তার কান যেন সত্যিই নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিল সেই সকালের পর থেকে।

পৃথিবীর গোড়ার দিন থেকেই নানারকম শব্দ তো ছিলই। মানুষ এসেছিল এখানে তার অনেকই পরে। কিন্তু সেই শব্দের মহিমা শেষ শৈশবের চৌকাঠে দাঁড়ানো আর প্রথম কৈশোরের চৌকাঠে পা-দেওয়া ঋভু যেমন করে আবিষ্কার করেছে তেমন করে তার চেনা জানা আর কেউই করেনি। করেনি যে, তা ঋভু জানে। শুদ্ধ স্বরের সঙ্গে কোমল স্বরের তফাত কি এবং কতখানি? রেখাব গান্ধারের শুদ্ধতা ও কোমলতা কাকে বলে, কোমল 'নি' বুকের ঠিক কোন্ তারে ব্যথা তোলে এইসব ঋভু শিখেছে। প্রকৃতির উদাত্ত আদিগন্ত নিষ্কলুষ অপার শান্তির পটভূমিতে দুই কানের মধ্যে দিয়ে আসা মৃদুতম শব্দর ভূমিকাকে তার অন্তরের অন্তরতম স্থানে অনুরণিত করে সে চিনেছে, তাদের স্ব-স্ব মহিমাতে।

শুধু শব্দই নয়, শব্দরই সঙ্গে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শকেও সে ক্রমশ চিনছে। যতই শব্দকে শিরশিরানির সঙ্গে চিনছে সে ততই-উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এই মানুষ—জীবনে তার মস্ত বড়ো জীবনের বাকি অংশটুকুর সম্ভাবনা সম্বন্ধে। ঋভুর আজকাল প্রায়ই মনে হয়, সব মানুষের কানেরই মতো চোখ নাকও তো থাকেই কিন্তু কম মানুষই বুঝি তাদের প্রকৃত ব্যবহার জানেন। যে-দৃশ্য ফুটে ওঠে চোখের মণিতে, যে গন্ধ ভেসে আসে হাওয়ায় বা স্থির থাকে পরিবেশে, যে-শব্দ উঠে আসে মাটি থেকে বা নেমে আসে আকাশ থেকে বা ভেসে আসে জলে তাদের তো সবাই জানে, সবাই-ই চেনে। কিন্তু ফুলের মধ্যে যে থাকে পরাগ, পাখির রঙিন ধুকপুকোনো বুকের গায়ে যে থাকে আঁশটে-গন্ধ উষ্ণতা, জলের উপরের শব্দর ভিতরেও যে থাকে জলের গভীরের নানারকম শব্দ, বৃষ্টির শব্দর মধ্যেও যে থাকে অনাগত রোদের পায়ের শব্দ এসব কী সবাই জানে? রোদের বা চাঁদের বা তারাদেরও শব্দ যে থাকে সে কথাও কি মানবে কেউ প্রতিসরিত আলোরই মতো নৈঃশব্দ্যের বুকের মধ্যে থেকেও গুমরে-ওঠা প্রতিধ্বনিত শব্দ নদীর মধ্যে থেকে যে লাফিয়ে-ওঠা রুপোলি চিতল মাছের মতো হঠাৎ উঠে চমকে দেয় তাও কি সবাই জানে?

না।

ঋভুর জানাশোনা কেউই এই সব দৃশ্য ও শব্দর খোঁজ রাখে বলে জানে না ঋভু। তারা কেউই কখনো লজ্জাবতী লতার গায়ে ভালোবাসার আঙুল ছুঁইয়ে দেখেনি লতার হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ও কেমন করে কাঁপে। "বেবিজ" টিয়ারস ফার্ন'-এর গোলগোল অশ্রুবিন্দুর মতো পাতার দুঃখ যে ঠিক কোথায় তা জানার চেষ্টাও করেনি তার জানাশোনা কেউই। তার চারধারের প্রকৃতি যে কী সজীব, কী প্রাণবন্ত, কতখানি অফুরন্ত যে তাদের প্রাণের উৎসাহ এ কথা ভেবেই ঋভুর গায়ে কাঁটা দেয়।

সেজকাকু একদিন বলেছিলেন যে, মানুষের চেয়ে বেশি হিংস্র আর খারাপ জানোয়ার এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। একদিন এই মানুষই পৃথিবীর অন্য সব প্রাণী, গাছপালা, পশু-পাখি, লতাপাতা, মেঘ নদীকে নিজে হাতে নষ্ট করে দেবে তাদের গর্বে এবং অহংকারে, তাদের মিথ্যে শক্তির দম্ভে; মিথ্যে জ্ঞানের দেমাকে। সেদিন বড়ো দুর্দিন হবে।

সেদিন কবে আসবে এবং আদৌ আসবে কি না জানে না ঋভু কিন্তু সেদিনের কথা ভাবলেও ভয় করে ওর।

বিলের জলের মধ্যে হাঁসের পালকের গায়ের মতো মসৃণ কিন্তু শুঁয়োপোকার রোমের মতো রোমশ অনুভূতি জাগানো পদ্মপাতার গায়ে যখন জলবিন্দু টলটল করে, যখন পদ্মফুলের মধু খেয়ে গাঢ়, লাল প্রজাপতি ওড়ে, যখন শাপ্‌লার ডাঁটি হঠাৎ নাড়িয়ে দিয়ে ফিনফিনে স্বচ্ছ হলুদ বা সবুজ ডানা মেলে জলফড়িং ওড়ে, টিয়ার ঝাঁক যখন দুর্বোধ্য কী সব কথা বলতে বলতে ঝাঁক ঝাঁক সবুজ তীরেরই মতো নীল আকাশকে বিদ্ধ করবে বলে দ্রুতগতিতে উড়ে যায়, বাঁশঝাড়ের গভীর গোপন নিভৃত সবুজ অন্ধকারের বুকের মধ্যে থেকে যখন সেই গাঢ় ও হালকা বাদামি রঙের বড়ো এবং গম্ভীর লেজঝোলানো নাম-না-জানা পাখিটা হঠাৎ ডেকে ওঠে তখন ঋভুর বুকের মধ্যে ভালো লাগা, আনন্দ, বিস্ময় এবং অজানা ভয়ও যেন সাদা শরষে দিয়ে রাঁধা ইলিশমাছের রসারই মতো মাখামাখি হয়ে যায়। এই সব অনুভূতির ঘূর্ণনে-চূর্ণনে বুকের মধ্যে থেকে যা মথিত হয়ে ওঠে তাকে কী বলে ডাকবে তা জানে না ঋভু।

শুধু জানে যে, এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মেছে বলেই ও ধন্য। ধন্য! ধন্য! ধন্য!

মমতাজের সঙ্গে দেখা হলো না আর। কতবার গেল।

মা ঋভুকে কবি জসীমউদ্দিনের একটি "নক্সীকাথার মাঠ" কিনে দিয়েছিলেন। বড়ো ঘরের বারান্দায় সিঁড়িতে বসে বারবার পড়ে ঋভু। মমতাজ পড়েছে কী না জানে না। মমতাজকে পড়ে শোনাবে একদিন। সাজুব গল্প।

আবাসউদ্দিনের গান গায় ছানুকাকু। 'বগা কান্দেরে'। আব্বাসউদ্দিনের গান শুনতে শুনতে মন চলে যায় ধুধু মাঠে, নদীর ধারে যেখানে "ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে"।

বুলবুলি পাগলির জ্বর হয়েছে তাই দেখতে গেছিল ঋভু সেদিন। বুলবুলিকে যতদিন হলো দেখছে তাতে তাকে কখনওই অসুস্থ দেখেনি। সারাদিন রোদে-জলে কাদাতে বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় ছেঁড়া শাড়ি গায়ে। জ্বর যে কেন হয় না, সেটাই আশ্চর্য।

বুলবুলিদের বাড়িটা পাড়ার একেবারে একপ্রান্তে। পাকা বাড়িই ছিল একসময়। যখন ছিল, তখন এ অঞ্চলের খুব কম বাড়িই পাকা ছিল। পুরো উত্তরবঙ্গে এবং আসামেও পাকা বাড়ির চল ছিলই না বলতে গেলে। মেঝে পাকা এবং খুব উঁচু ভিতের। কিন্তু দেওয়াল ও ছাদ অধিকাংশ বাড়িরই ইটের নয়।

বুলবুলিদের পাকা বাড়িটার পলেস্তারা খসে গেছে সব জায়গা থেকে। ছাদের একটা দিক ধসে গেছে। অশ্বত্থ আর বটের শিকড় ও ডালপালা বেরিয়ে বৃষ্টিতে শেওলা পড়ে-যাওয়া লাল ইটের মধ্যে মধ্যে সতেজ সবুজের ছোপ লাগিয়েছে। ভাঙা-আলসেতে সারি দিয়ে দার্শনিক সাদা-কালো কবুতর বসে থাকে। বক্‌বকুম করে। বার-বাড়ির দরজাতে একটা ঝাঁকড়া লট্‌কা গাছ আছে। যেমন আছে হরিসভার পুকুরপাড়ে সুধীনকাকুদের বাড়িতে ঢোকার পথের ঠিক ডান পাশে।

একতলার একটি ঘরের মধ্যে কাঁথা-ন্যাতা দিয়ে বুলবুলি আর তার ঠাক্‌মা বড়ো কষ্টের দিন যাপন করে। বড়ো কষ্টের! এমন কষ্টের কথা ঋভু ভাবতেও পারে না। অথচ বুলবুলি এক মেয়ে, তার মুখে কখনও হাসি ছাড়া কিছু দেখেনি। সবসময়ই হাসি। লেগেই আছে, চব্বিশ প্রহর।

শেষ বিকেলে গিয়ে পৌঁছেছিল ঋভু।

বুলবুলির ঠাক্‌মা বললেন, কে রে? দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছস্ ক্যান? নাম ক' না ছ্যামড়া?

আমি।

আমিডা কেডা?

আমি ঋভু।

অ! তুই ঋভু! তাই ক'! আমি ভাবি বুঝি মুদির দোকানির পোলাডায় পয়সার তাগাদায় আইছে! ভয়ে বুকডা কাঁপে। আয়! আয়!

ঋভু এক এক পা করে উঠোনের মধ্যে দিয়ে বুলবুলিদের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। ঠিক সেই সময়ে, বুলবুলির ঘরের ভিতর থেকে পুষিপিসি বেরিয়ে এসে বলল, ঋভু?

মজা করে বলল।

ঋভু হাসতেই যাচ্ছিল। পরক্ষণেই সেদিনের অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় থতমত হয়ে গেল।

তুমি? কোত্থেকে? কখন ?

আমি কোনো বিশেষ জায়গাতে থাকি না। সব জায়গাতেই থাকি। আর যখন খুশি যাই, যখন খুশি আসি।

তোমাকে কিছু করেনি তো পুলিশেরা?

করেছিল।

কি?

তা তোকে বলা যাবে না।

মেরেছিল খুব?

হ্যাঁ। তা বলতে পারিস। মার তো বটেই।

ছানুকাকুর মতো তোমার হাত পা ভাঙেনি তো? পায়ের হাড়।

না। সব মারেই যে হাড় ভাঙবে এমন কোনো কথা নেই।

তুমি বলোনি ছানুকাকুদের?

নাঃ।

কেন? না কেন?

কারণ আছে।

আমি বলে দেব।

দ্যাখ ঋভু! তুই যে আমাকে এখানে দেখেছিস তাও কাউকে বললে খারাপ হবে।

বলব কাকে? আর কি খারাপ হবে?

সেই খারাপটা কেমন তুই ভাবতে পর্যন্ত পারিস না।

কিন্তু তুমি বলতে মানা করছ কেন পুষিপিসি।

বললাম তো! কারণ আছে। আমি ওদের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছি। ওরা মাস্টারদাকে ছ'মাস ছেড়ে রাখবে। ছাইন্যা বা ওদের দলের অন্য কেউই যেন ঘূণাক্ষরে না জানে। আমারে যে তগো বাড়ি থিক্যা পুলিশে ধইর‍্যা নিয়া গেছিল তাও তুই জানস?

হ্যাঁ। তা তো জানি।

ব্যস। ওইটুকুই জানস্। তারও পর যদি একটাও কথা কস্ তো...

কেন? সেজকাকুকে ছেড়ে রাখবে কেন?

আমি লক্ষ্মী মাইয়া যদি হই, তাইলে। তবেই ছেড়ে রাখবে। মানে, ধরার চেষ্টা করব না।

তুমি তো লক্ষ্মী মেয়েই!

লক্ষ্মী মেয়ের অনেক রকম থাকে। তুই আর কতরকমের লক্ষ্মীর কথা জানিস।

পুষিপিসির মুখে এক নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল।

সেজকাকুর বদলে তোমাকে কি আটকে রাখবে ওরা?

না। আটকাবে না, ছেড়েই রাখবে, তবে সপ্তাহে একদিন করে ওদের কাছে যেতে হবে।

কোথায়? থানায়?

থানা কি আর থানাতেই থাকেরে ঋভু? কিংবা হাজতে? থানা-হাজতের অনেকই রকম হয়। বড়ো হলে বুঝবি।

থানায়, থুড়ি; থানার বদলে অন্য জায়গায় গিয়ে গিয়ে তোমাকে ডিউটি দিতে হবে সেজকাকুর জন্যে?

ডিউটিই বটে। ডিউটিরও নানারকম হয়। এও তুই বড়ো হলেই বুঝবি।

মাকে গিয়ে বলব আজই তোমার কথা, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে কথা।

শুধু তাপসীবউদিকেই বলবি। আর কাউকেই কিন্তু না।

ঠাকুমাকে?

হ্যাঁ। মাসিমাকে বলতে পারিস। তাঁকে তো বলতে পারিসই! তবে সামনে তোর কাকারা বা অন্য আর কেউ যেন না থাকে। আর কেউই না। বুঝঝস্ ছ্যামড়া!

আচ্ছা।

তোর মাকে বলিস যে, আমি যাব একদিন এর মধ্যে। বুঝছস! দুপুরে।

হ্যাঁ।

আমি এবারে এগোই।

তুমি আগের থেকে মোটা হয়ে গেছ। পুষিপিসি।

জানি। আর তুই রোগা। কেনরে ঋভু?

কী জানি।

অন্যরা নিজেরা রোগা হয়ে আমাকে মোটা করে দিচ্ছে।

বলেই, হিঃ হিঃ, করে হেসে উঠল পুষিপিসি।

তারপরই বলল তুই রোগা হয়ে গেলেও দেখতে ভালোই দেখাচ্ছে তোকে।

দেখতে ভালো হয়ে কী হবে! আমি রাঙামুলো হতে চাই না।

বাঃ বাঃ। কথাতো শিখেছিস বেশ। কার কাছে শিখলি?

সকলের কাছে। প্রত্যেকের কাছেই তো শেখার কত কিছু আছে। সকলের কাছ থেকেই শিখি। রোজ রোজ। একটু একটু করে। মা বলেন, হাঁসেরা যেমন জল-মেশানো দুধে ঠোঁট ডুবিয়ে দুধটুকু খেয়ে নেয়, জলটুকু ফেলে দিয়ে; তেমন করেই সব মানুষের খারাপটুকু ফেলে দিয়ে ভালোটুকু শিখে নিতে হয়।

পুষিপিসি বলল, তুই মুশকিলে পড়বি! এর চেয়ে বোধহয় রাঙামুলো বা মাকালফল হওয়াও ভালো ছিল। যেরকম জ্ঞান তোর মধ্যে এই বয়সেই ঢোকবার বন্দোবস্ত হয়েছে তাতে আধারটাই না ফেটে চৌচির হয়ে যায় রে ছোঁড়া। যেখানে যতটুকু আঁটে, আস্তে আস্তে তা আঁটিয়ে নিতে হয়। অন্য অনেক কিছুর বেলাতেও যেমন, জ্ঞানবুদ্ধির বেলাতেও এমন জোরাজুরি বা বাড়াবাড়ির ফল ভালো হয় না। বলেছিলাম না, তুই এঁচড়ে-পাকা! এঁচড়ে পাকাই! তুই একটা জ্যাঠা ছেলে। দু'চোখে দেখতে পারি না এমন জ্যাঠা ছেলেকে। যে বয়সের যা!

বুলবুলির ঠাক্‌মা বললেন ক্যান সুদামুদা গাল পারিস ছ্যামড়াটারে ভর সন্ধ্যায়?

ঋভু তো আমাগো সোনার ছাওয়াল।

হতো। কিন্তু সোনার প্রতিমাও কি ঠিকমতো মাজা-ঘষা না হলে সোনার প্রতিমা থাকে মাসিমা? ওর সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অনেক বেশি করে মেশা উচিত। বাড়িতে সব দামড়া-দামড়া আধবুড়ো পণ্ডিত কাকারা, ব্রাহ্মভাবাপন্ন গিরিডিতে মানুষ-হওয়া মা, আর প্রবল-প্রতাপান্বিত খাণ্ডার ঠাক্‌মা মিলে জ্ঞানে-জ্ঞানেই ছেলেটাকে অজ্ঞান করে দেবে একদিন।

বলেই, পুষিপিসি বলল, জানেন তো মাসিমা, উদরী শুধু মদ খেয়েই হয় না। শুধু আতপ চাল খেয়েও বিধবাদের হয়, শুধু ফল খেয়েও সাত্ত্বিক অবিবাহিত পুরুষের হয়। কারণ, আতপ চাল বা ফল পেটে গিয়ে গেঁজে গিয়ে মদ হয়ে যায়। তাই বলছি, বাড়াবাড়ি কোনো কিছুরই ভালো নয়।

ঋভু বলল, একটা নতুন জিনিস শিখলাম। কিন্তু উদরী মানে কি পুষিপিসি?

উদরী মানেই জানিস না? কথায় বলে না? "উদরী, ভাদুড়ি, যক্ষ্মা এই তিনরোগে নাহি রক্ষা।" উদরীতে পেট ফুলে যায় জালার মতো। ইংরিজিতে বলে, "সিরোহ্সিস অফ লিভার"। আর যক্ষ্মা তো জানিসই!

হ্যাঁ। টি বি!

টি বি মানে কি?

থাইসিস।

সেতো টি হলো। আর বি?

ঋভু মাথা চুলকে বললো, অ্যাইরে! জানি না তো।

জানবি। না জেনে, পুরোপুরি না জেনে কোনো শব্দ ব্যবহার করবি না।

ওক্কে। ঋভু বলল।

এটা আবার কি শব্দ?

ইংরিজি। কলকাতায় টমিরা, আমেরিকান সাদা-কালো সৈন্যরা বলে।

মানে কি?

মানে, "ঠিক আছে"।

বানান কি?

O.K.

O- এর মানে কি? আর K-এর মানে কি? OK- এর পুরো মানে কি? দুটি অক্ষরের?

জানি না। সবাই তো বলে আজকাল।

সবাই যা করে তার অনুকরণ করে ছাগলরা। OK-এর মানে জেনে রাখবি। পরদিন দেখা হলে জিগেস করব কিন্তু।

ওক্কে! ঋভু বলল।

আবারও?

চোখ বড়ো বড়ো করে পুষিপিসি বললো, রেগে।

কোনো কোনো মানুষকে রাগলে অনেক বেশি সুন্দর দেখায়। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল ঋভু। একটা খড়কে-ডুরে টাঙ্গাইল-শাড়ি পরেছে। ফরসা আর ফিকে লাল রঙের ডোরা। মনে হচ্ছে ধোঁয়া-ধোঁয়া, প্রথম ভোরে মাদার গাছের ডালের ফোকর থেকে কাঠবিড়ালি নামছে যেন।

চলি রে ঋভু, দেখা হবে। ভালো থাকিস। যা বললাম, মনে থাকে যেন।

হুঁ।

ঋভু, একদৃষ্টিতে পুষিপিসির চলে-যাওয়া দেখল।

বেঁটে মোটা নারকোলগাছেদের পাতার চিরুনি-চিরুনি ছায়া পড়েছে উঠোনে। সাদা-আলো, কালো-সাদা খড়কে ডুরে শাড়ির মতন।

পুষিপিসি মাথায় কী তেল মাখে কে জানে! গন্ধে ভুরভুর করছে তখনও উঠোন। বাড়ির পেছনের গুড়িগুড়ি কচিকলাপাতা-রঙা পানা-পড়া পুকুরের ধারে ধারে ডাহুক ডাকছে। বাঁশঝাড়ের গভীর অন্ধকার থেকেই সেই নাম-না-জানা পাখিটা ডাকছে গুব্-গুব্-গুব্-গুব্।

বুকের মধ্যেটা ছমছম করে ওঠে। এই সব ছায়া, আলো, এই পুষিপিসি, বুলবুলিরা, এই পাখিরা, এই রাত ও দিন কলকাতায় কেন যে চলে যায় না! ভাবে ঋভু।

এখান থেকে চলে তো যেতেই হবে তাকে। আজ আর কাল। ও যে 'ক্যালকেশিয়ান"।

পুঁটুরা বলে। বুলবুলি কেমন আছে ঠাক্‌মা?

ওইরকমই আছে। আর কইও না। এদিকে আমি মাজার ব্যথায় খাড়াইতে পারি না। ওই ছেমড়িই তো সব! সারাদিন শাক কুড়াইয়া, গুগলি ধইর‍্যা আমারে বাঁচাইয়া রাহে, এহনে সেই নিজেই শয্যাশায়ী। আমার কপাল।

এতক্ষণে সন্ধে হয়ে এসেছে। ঋভু গিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরটির চেহারা দেখলে মন বড়োই খারাপ হয়ে যায়। দেওয়ালের ইট সরে গিয়ে অনেক জায়গাতে ফোকর হয়ে গেছে। তালপাতা সেখানে গুঁজেগুঁজে দিয়ে বৃষ্টি ও রোদ, গরম ও শীত আটকাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ঘরের একপাশে ইঁট সাজিয়ে 'আখা' করা আছে। মানে উনুন। রান্নাবান্নার জন্যে।

কাঠের ধুঁয়োর কালো হয়ে যাওয়া দু একটি হাঁড়ি-কুঁড়ি। দু তিনটি চিনেমাটির যেমন। ঠাক্‌মার পাথরবাটি আর গেলাস।

ঘরের একটি কোনাতে দাঁতে-বের-করা ইট খসে যাওয়া দেওয়ালের গায়ে মাটিতে ছেঁড়া মাদুরের ওপর একটি ছেঁড়া-তোশকে নকশিকাঁথা গায়ে দিয়ে তেলচিটে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে বুলবুলি। বালিশের উপর শুকনো চুলের মধ্যে কালো ডিমের মতো তার ক্ষীণ মুখটি। তার মধ্যে ফিঙের মতো উজ্জ্বল কালো-কালো চোখ দুটি ঝকঝক করছে। ওর দুর্বল শরীরে চোখদুটিই যেন সব।

বুলবুলি হাসল। বলল, কীরে! এসেছিস।

কেমন আছিস? বুলবুলি?

খুব ভালো।

ঋভু কপালে হাত দিয়ে দেখল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

এ কীরে! তোর যে খুব জ্বর!

বুলবুলি হাসল। বলল, খুব আবার কী! জ্বর তো সবসময়ই থাকে। একটু বেড়েছে এই যা। কী খাবি বল? কীই বা আছে যে তোকে দেব।

বলেই মিনমিনে গলায় বলল, ঠাক্‌মা, কদ্‌মা আছে নাকি দ্যাখো তো।

কদ্‌মা? সে তো কবেই শ্যাষ!

টিনের কৌটোতে রেখেছিলাম যে চার পাঁচটা।

সে তো আমি খাইয়া ফ্যালাইছি।

বুলবুলি হাসল। বললো, জল খাবি ঋভু? আমাদের কুয়োর জল খুব মিষ্টি। যাই খা না কেন, সঙ্গে সঙ্গে হজম। পাথর খেলেও পাথর হজম। হিঃ হিঃ।

ঋভু ভাবছিল যাদের ঘরে খাওয়ার কিছুই নেই তাদের বাড়ির কুয়োর জলে পাথর তো হজম হবেই।

রাতে তুই কি খাবি?

কি খাব? ভাবছি, পাতলা করে মসুর ডালের খিচুড়ি খাবো একটু, সঙ্গে কড়কড়ে করে আলুভাজা, আর, আর বেগুনি। আর যদি দুটো শুকনো লংকাভাজা সঙ্গে থাকে তো আরও চমৎকার। ওপরে একটু গাওয়া ঘি ছড়িয়ে দেব। ভালো হবে না? হি হি।

ঋভুর চোখ ফেটে জল আসছিল।

ওর কথা শুনে ঋভুও হাসল। কিন্তু সেটা হাসি নয়; কান্না।

বুলবুলির হাসিতে কোনো ভেজাল নেই। বুকের মধ্যে থেকে সে হাসি উঠে আসে, অনাবিল। ওর চোখের মতোই উজ্জ্বল তা।

দুপুরে কি খেয়েছিলি?

দুপুরে? হিঃ হিঃ। খুব ভালো খাবার।

কি?

সাগুর খিচুড়ি। সঙ্গে আলু সেদ্ধ। আস্ত আস্ত। খিচুড়ির মধ্যেই ছিল।

ঠাক্‌মা বলে উঠলেন, পারিসও তুই ছেমড়ি। দুপুরে এক পয়সার বার্লি লইয়া আইছিলাম ধারে। সেই বার্লিই জ্বাল দিয়া দিছিলাম। কত্ত কীই বানাইয়া বানাইয়া কয় এ ছেমড়ি! আর হাসিরও শ্যাষ নাই। কোন্ আনন্দময়ী যে মরতে আমার ঘরে আইছিল ভগবানেই জানেন। আমি তো তিনকাল পারাইয়া এক কালে আইস্যা ঠেকছি কিন্তু এইটুন মাইয়্যার এত কষ্ট চোহে দ্যাহন যায় না আর।

বুলবুলি ঠাক্‌মাকে ক্ষীণ কণ্ঠে বকে বলল, কেন বাজে কথা বলো ঠাক্‌মা। আমার কোনো কষ্ট নেই। ঋভুটা দেখতে এসেছে আমাকে আর তুমি তোমার প্যাঁচাল পাড়ার সময় পেলে না। আমি চমৎকার আছি রে ঋভু। আমার কোনো কষ্ট নেই। হি হি।

বাইরে চাঁদের আলোটা আস্তে আস্তে জোর হচ্ছিল। উঠোন, বারান্দা, পানাপুকুর সব রুপোলি পাতের মতো ঝকঝক করছিল। নারকোলগাছেদের পাতাগুলো সব রুপোঝুরি হয়ে উঠেছিল। এমন সময় লট্‌কা গাছে কী একটা পাখি ডানা-ঝটপট করে বসল এসে।

বুলবুলি হঠাৎ কান খাড়া করে উঠে বসার চেষ্টা করেই আবার শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়েই উত্তেজিত গলায় বলল, ঠাক্‌মা! দ্যাখোতো আইসলো নাকি?

যাই! যাই! বলে, বুলবুলির ঠাক্‌মা কোমরে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অনেক কষ্টে। বললেন, মাজাটারে লইয়া আর পারি না। মাজায় লাঠি খাইলে সাপের যা অবস্থা হয় আমারো তাই হইছে।

ঋভুও ঠাক্‌মার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় এল। কী দেখতে যে ঠাক্‌মা এলেন তা না-বুঝেই। বুলবুলিরও যে কোন্ আগন্তুকের জন্যে এত উৎসাহ তা ও না বুঝতে পেরেই।

ঠাক্‌মা বিড়বিড় করে বললেন, আইছে রে! আইছে! এত্তদিনে তর সময় হইছে রে!

বলেই, গলা তুলে বললেন, আইছে রে! বুলবুলি আইছে স্যা।

ঋভু বিস্ময়ে চেয়ে রইল লটকা গাছের ডালে মস্তবড় লক্ষ্মীপেঁচাটার দিকে। মনে হচ্ছে যেন একটা রুপোর লক্ষ্মীপ্যাঁচা।

আয়লো ছেমড়ি! দেইখ্যা যা। লক্ষ্মী আইছে। আমাগো অমানিশা কাইট্যা যাইবো এইবারে। এতদিনের দুঃখকষ্ট সব দূর অইব।

ধুঁকতে ধুঁকতে কাঁথা সরিয়ে উঠল বুলবুলি। বুকের কাছে শাড়ি সরে গেছিল। শাড়ি ঠিক করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই পড়ে গেলো মেঝেতে। ঋভু দৌড়ে গিয়ে ধরলো ওকে। তারপর ধরে ধরে বাইরের বারান্দার দিকে নিয়ে আসতে লাগল। প্রায় দরজার কাছে এসে গেছে এমন সময়ে ঝপ্‌ঝপ্ শব্দ হলো একটা। লক্ষ্মীপ্যাঁচাটা উড়ে চলে গেল। বুলবুলি যখন বারান্দাতে এসে দাঁড়াল তখন লটকাগাছের পাতারা রুপোলি রঙ মাখাচ্ছে এ ওর গায়ে।

হা কপাল! বুলবুলির ঠাক্‌মা বললেন।

বুলবুলি ওই জ্বরের মধ্যেও হি-হি করে হেসে উঠল।

ছাগলির মতো হাসস্ ক্যারে তুই?

হাসব না? লক্ষ্মীপ্যাঁচা কি এখানে থাকে? না এখানে তার বসবার মতো সময় আছে? দ্যাখো গিয়ে জমিদারবাড়ির বা ডিমলার রাজবাড়ির দিকে উড়ে গেছে।

বলেই, ওই ধুম জ্বরের মধ্যেই কাঁপা কাঁপা দুর্বল গলায় বুলবুলি গান ধরল :

'পাখি তুই! ঠিক বসে থাক্, ঠিক্ বসে থাক, ঠিক বসে থাক, আমার মনের মাস্তুলে.....'

ঋভু বললো, কথাটা ভুল বললি।

বুলবুলি হাসতে হাসতে বলল, আমি যা বলি তাই ঠিক। পাখি কি বসে রইল যে গানের কথা ঠিক বলব! হি হি।

ঋভু বলল, এইটা তুই রাখ।

কীরে।

এই যে!

চল, চল, শুই গিয়ে। ভীষণ শীত করছে আমার।

বুলবুলি শুয়ে পড়ে কাঁথা টেনে নিয়ে বললো, কী ওটা?

ঋভু দশটাকার নোটটা এগিয়ে দিল।

হি হি করে হেসে উঠল বুলবুলি। বলল, এ কীরে! দশটাকা। জন্মে অবধি দেখিনি। কী করব এ নিয়ে? তুই পাগল একটা। তুই পেলি কোথায় এত টাকা?

ঠাকুমা দিয়েছিলেন আমার জন্মদিনে।

বড়োলোকদের মতো তোরও বুঝি জন্মদিন হয়? মহাত্মা গান্ধি, সুভাষ বোস, রবিঠাকুর....

না। তা হয় না। আমাদের বাড়িতে ওসবের পাটই নেই। মায়ের মনে তাই খুব দুঃখ। মা বলেন, এঁরা এসব জানেনই না। জন্মদিন পালন করা কী সুন্দর একটা ব্যাপার।

আর ঠাকুমা বলেন, আমাগো ওইসব 'আইস্যা' নাই।

তবে ঠাকুমা যে টাকা দিলেন তোকে?

সে জন্মদিনের অনেক পরে। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় বললেন, একদিন, তোর মায়ের খুব শখ। তা তর জন্মদিন করলে তো পুরা গুষ্ঠিরই জন্মদিন করতে হইব। এই ল! সাবধানে রাইখ্যা দিস।

আমি বলেছিলাম, রেখেই দেব, তো খরচা করব কখন?

আরে সব টাকাই কি খরচের লইগ্যা। শিশুকাল থিক্যা জমান্ অভ্যাস করন লাগে। তবে আবার তর ঠাকুরদার মতো জমান্ অভ্যাস করিস না য্যান।

কেন? ঠাকুরদা কি করেছিলেন?

আরে কেপ্পন। কী কেপ্পন। হাড়কেপ্পন আছিলেন মানুষডা। ফলে, যা হইবার হইলোও।

"অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ" কইর‍্যা প্যাটে কিল দিয়া পইড়্যা থাইক্যা সব টাকা ব্যাঙ্কে জমাইছিলেন। আর ব্যাংকই গেল ফেইল মাইর‍্যা।

তবে? তুই যে এ টাকা আমাকে দিচ্ছিস?

এত ভালো কাজে আমার জন্মদিনের টাকা কি আর লাগত। সব টাকাই একদিন না একদিন খরচেরই জন্যে। যারা টাকা চেনে অথচ খরচ করতে জানে না তারা যখ। তাদের টাকা থাকা না-থাকা সমান।

না, না। এ তুই নিয়ে যা। আমি নেবো না।

ওদের কথার মধ্যে ঠাকুমা কথা বলে উঠলেন। বললেন, এ লক্ষ্মীর দান রে ছেমড়ি। সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠ্যালন ভালো না। লইয়া ল। ঋভু তুই এক কাম কর বরং। এই টাকাটা মুদির দোকানে জমা দিয়া যাস আমাগো নামে। যা যখন প্রয়োজন হইব, লইয়া অনুমনে। তুই ছাওয়াল ভগবান। তরে ভগবান অনেক দিবেন। দেইখ্যা লইস্। মান্‌ষি হয় মনে। তরে এই আশীর্বাদ দিলাম আমি। গরিব আমরা; আর কীই দিতে পারি ক'?

ঋভু বুলবুলির দিকে চাইল। বুলবুলির দুচোখের কোনায় জল চিক্‌চিক্ করছিল। হি হি করে হেসে উঠল বুলবুলি। বলল, তুই কীরে রিভে। বদলে তোকে কিছু যে দেব এমন কিছুই তো নেই আমার। হাসতে হাসতে বলল, বড়ো লজ্জায় ফেললি রে তুই।

ঋভু বলল, আমি টাকাটা মুদিখানাতে জমা দিয়ে মাকে বলে তোর জন্যে মসুরডালের খিচুড়ি করে পাঠাচ্ছি। ঘুমিয়ে পড়িস না যেন। আর বিবাগীকাকুকে বলে কাল ভূপতিকাকুকে তোকে দেখে যেতে বলব। আমিও আসবো ওই সময়ে।

হি হি করে হাসল বুলবুলি।

বলল, বলিস কি করে? ভূপতি ডাক্তার তো মস্ত ডাক্তার। তার তো মেলা টাকা ফিস্ শুনেছি। অত দামি ডাক্তার।

তুইও তো দামি!

ঋভু বলল।

আমি দামি?

বলেই, হাসতে হাসতেই বুলবুলি কেঁদে ফেলল।

ঘুমিয়ে পড়িস না যেন। চললাম।

বুলবুলির ঠাকুমা স্বগতোক্তির মতো বললেন, প্যাটে যাগো ক্ষুধা, তাগো চক্ষে ঘুম নাই বাবা। ভয় নাই কোনো। ঘুম আসে না এ বাড়ির চৌহদ্দিতে।

অরার আর বগুড়া থেকে আসা হলো না। ও বগুড়াতে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কী অসুখ তা ডাক্তারে ধরতে পারেন না। ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বর বা টাইফয়েড এই তিনটির একটা।

ঋভুর ভোপালকাকু (ছোটোকাকু) কলকাতা থেকে এসে অরাকে বগুড়া থেকে কলকাতায় নিয়ে গেছেন। ঋভুর বাবাও লোক পাঠিয়েছেন রংপুরে তাপসীকে এবং ঋভুকে নিয়ে যেতে। কিন্তু প্রমীলাবালা তখুনি ঋভুকে কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, পুজোর ছুটির বন্ধ হয়ে গেলে তখনই যাবে। পুজোর ছুটির পর আবার ফিরে এসে পরীক্ষাটা দিয়ে তারপরই কলকাতায় গিয়ে আগামী বছর জানুয়ারিতে কলকাতার স্কুলে ভর্তি হবে। তাতে বছর নষ্টও হবে না ঋভুর আর কিছুদিন রংপুরে থাকাও হবে।

তাপসীর আদৌ ইচ্ছে ছিল না ছেলেকে ছেড়ে কলকাতায় যাওয়ার। কিন্তু এই সময়ে ট্রান্সফার নিয়ে গেলে সত্যি সত্যিই একটি বছর নষ্ট হতে পারে। না হলেও, ঋভুর পক্ষে পরীক্ষাতে ভালো ফল নাও করা সম্ভব হতে পারে ভেবেই রেখে গেলেন। তাপসীহীন রংপুরে ঋভুকে একা রেখে যাওয়ার মতো আপস করার মানসিকতা তাপসীর ছিল না। ঋভু জানত যে, তার মার মনে প্রমীলাবালার কিছু কিছু গ্রাম্যতা দোষ বিশেষ অপছন্দের ছিলো। অসময়ে খাওয়া-দাওয়া, বেহিসেবি•খাওয়া-দাওয়া, বড়োদের কথা বলার সময়ে সামনে বসে থাকা, পড়াশোনা সময়মতো ও নিয়মিত না-করা নিয়ে তাপসীর নিত্যই অনুযোগ ছিল। কিন্তু রংপুরে প্রমীলাবালার কথাই শেষ কথা। কলকাতায় এলে প্রমীলাবালা খাঁচার বাঘিনী হয়ে থাকতেন তখন।

তাপসীও, বাঘিনি ছিলেন। যদিও অন্য জাতের। নিজ নিজ এলাকা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন দুজনেই। দুজনের কেউই কারো এলাকায় ঢুকে জোর জাহির করার চেষ্টাও করতেন না কখনও।

নিমুকাকু এবং বিবাগীকাকুর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে মালপত্র, চাল-ডাল, ঘি-টি নিয়ে মাকে তুলে দিতে গেল ঋভু স্টেশনে। চিনুকাকু, ছানুকাকুও সঙ্গে গেল। অবশ্য কাকারা সকলেই সাইকেলে। ঘোড়ার গাড়ির পাশে পাশে সাইকেল চালিয়ে। সেজকাকুর বন্ধু প্রভাতকাকুও ছিলেন। কাটা কাটা চোখ নাক আর ভারী গলার স্বর ছিল প্রভাতকাকুর। "তাপসী বউদি" প্রত্যেক দেওরের বন্ধুদের কাছেই খুব প্রিয় ছিলেন।

আজ অনেক অনেকই বছর পেছনে ফিরে যখন চেয়ে দেখে ঋভু তখন প্রভাতকাকু, সুধীনকাকুদের মতো কিছু কিছু মানুষের স্পষ্ট স্মৃতি তাকে খুব অবাক করে দেয়। হাজার হাজার নারী পুরুষ তার জীবনে এসেছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বয়সে, নৈকট্যের বিভিন্নতায় কিন্তু তার মধ্যে বেশিরভাগ মানুষের মুখই এখন আর চেষ্টা করেও মনে আনতে পারে না সে। তাদের নামগুলো স্মৃতির মণিকোঠায় চাবির গোছের ঝুমঝুমির মতো বেজে উঠেই থেমে যায়, মিলিয়ে যায়, অথচ প্রভাতকাকু, সুধীনকাকু, বুলবুলি বা পুষিপিসিকে, মমতাজকে, তাকে নার্সিং-করা সুমিতাদিদিকেও যেন সামনেই দাঁড়ানো দেখতে পায়।

স্মৃতি কাকে যে রাখে আর কাকে ফেলে, তা শুধু স্মৃতিই জানে!

ট্রেনটা ছেড়ে দিল একসময়। ইন্টার ক্লাসের জানালার পাশে মা বসেছিলেন একটি হালকা-নীলরঙা শাল কোলের উপর ফেলে। বিবাগীকাকু সঙ্গে গেলেন তাপসীকে পার্বতীপুর জংশন অবধি এগিয়ে দেবেন বলে। হৃষীকেশের পাঠানো, অফিসের একজন লোক তো ছিলই।

প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনের সবগুলো কামরা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অবধি ঋভু তার মায়ের সোনার চুড়ি-পরা ধবধবে ফরসা নিটোল হাতটি যেখানে শেষ দেখা গেছিল সেইদিকেই চেয়ে হাত নেড়ে যেতে লাগল। শোরগোল, লোহার চাকার ঘড়ঘড়ানি আওয়াজ সব হঠাৎই থেমে গেলো। প্ল্যাটফর্মের পাশের রেল লাইনটাও হঠাৎই ফাঁকা হয়ে গেল। ঋভুর বুকের মধ্যেটাও। তার ছোট্ট জীবনে তার প্রিয়তম জনকে ছেড়ে থাকার, তাঁকে চলে যেতে দেওয়ার কষ্টটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে-যাওয়া রেললাইনেরই মতো তার বুককে শূন্য করে দিল। ঋভু সেই প্রথমবার জানল যে পেটে ছুরি খাওয়ার কষ্টর চেয়ে, ভীষণ খিদে পাওয়ার কষ্টর চেয়েও আরো অনেক অনেক বড়ো কষ্ট মানুষের জীবনে থাকে। এই শেষ কষ্টটি যে অন্য সব কষ্টর চেয়ে অনেকই বড়ো তা পরে যতই সে বয়সে বড়ো হয়েছিল ততই বেশি করে বুঝতে পেরেছিল।

ঘোড়ারগাড়ি আর সাইকেলের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে স্টেশনের চৌহদ্দি থেকে বাইরে আসতে আসতে নিমুকাকু বললেন, কী রে! মন খারাপ লাগছে?

উঁহু।

নিমুকাকু, প্রভাতকাকু, চিনুকাকু, ছানুকাকুরা চোখে চোখে কী সব ইশারা করলেন।

পরমুহূর্তেই নিমুকাকু বললেন, চল তোকে রসগোল্লা খাওয়াব।

ঠিক সেই সময়েই ওদের প্রায় ঘাড়ের উপর দিয়ে একটি ঘোড়ার গাড়ি, ওদের প্রায় চাপা দিয়েই জোরে বেরিয়ে গেল। একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক সামনে সামনে যাচ্ছিলেন, তাঁর কোমরে সেই দ্রুত চলে-যাওয়া ছ্যাকরা গাড়ির বাঁদিকের চাকাটা একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। ভদ্রলোক রেগে চিৎকার করে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, বললেন, হারামজাদা!

তাঁর ভদ্রলোকি আর বজায় রইল না।

কখনও শোনেনি ঋভু এই কথাটা!

হারামজাদা!

মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঋভু ছানুকাকুকে শুধোলো, ছানুকাকু, হারামজাদা মানে কি?

চিনুকাকু, নিমুকাকু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। প্রভাতকাকুও।

চিনুকাকু ফিক করে হেসে দিল।

কীরে। হাসছিস কেন?

নিমুকাকু বললেন।

চিনুকাকু বলল, আমি তো পড়াশুনায় লাড্ডুমার্কা। তাই মানে জানি না।

এসব কথার মানে তো আর স্কুল কলেজে শেখায় না। লোকের সঙ্গে মিশেই শিখতে হয়। প্রভাতকাকু বললেন।

নিমুকাকু বললেন, আশ্চর্য! শব্দটা আমরা সকলেই জানি। এটা যে একটা গালাগলি তাও। কিন্তু শব্দটার মানে যে কি তা কখনও জানার ইচ্ছে হয়নি।

ঋভু বলে উঠল, যেমন টি বি। যেমন ও কে। মানে কি?

পুষিপিসির কথা মনে পড়ে গেল ঋভুর।

দাঁড়া! দাঁড়া! ঋভু! একসঙ্গে এত কোশ্চেন করলে আমরা কেউই পারব না। একটা একটা করে। বল চিনু। হারামজাদা শব্দর মানে বল?

নিমুকাকু বললেন।

চিনুকাকু বলল, "হাবাম" মানে জানো না? হারাম হচ্ছে শুয়োর। হারাম হচ্ছে একটা নেতিবাচক গুবলেট করা ব্যাপার। নমক্হারাম; সুরতহারাম। শোনেননি এসব শব্দ?

আর হারামজাদা?

বাঃ! বাদশাজাদা শুনেছেন, নব্বাবজাদার মানে জানেন, আর হারামজাদার মানে জানেন না? "জাদা" মানে বাচ্চা, ছেলে; আওলাদ। অতএব হারামজাদা মানে হলো, শুয়োরের বাচ্চা।

আরে! তাই তো! প্রভাতকাকু বললেন।

সকলেই হেসে ফেললেন। বললেন, তাইতো। চিনুর ব্যাপারই আলাদা!

চিনুকাকু বলল, তাহলে গাড়লুর সঙ্গে আমাকেও রসগোল্লা খাওয়াও।

ঋভুকে চিনুকাকু গাড়লু বলে ডাকতো। কলকাতার ছোটোমামাও তাই ডাকতেন। আসলে গাড়লু নামটি দিয়েছিলেন ছোটোমামাই।

খাওয়াব। আর ছানু? তুই?

নাঃ। আমাকে খাওয়ালে গরম গরম কচুরি খাওয়াও। নোন্‌তাই হচ্ছে জীবন। নুন, ঝাল, লংকা। মিষ্টি, নিমুদা আপনাদের কলকাতার মানুষদের প্রিয়। তাই চেহারাও কেমন লবঙ্গলতা লবঙ্গলতা হয় আপনাদের! হয় না?

নিমুকাকু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। রাগে নয়। স্মৃতিচারণে।

বললেন, হবে হয়তো। কলকাতা তো ছেড়েই এসেছি কবে। মিছিমিছি কলকাতার কথা মনে করিয়ে কষ্ট দিস কেন?

রসগোল্লা আর গরম গরম কচুরি খেয়ে সাইকেলে করেই সকলে ধাপ এর দিকে ফিরে চলল। প্রভাতকাকু অতদূর যাবেন না। সেনপাড়াতে যাবেন। স্টেশনে থেকে বেশি দূরের পথ নয়। ঋভু বসেছে নিমুকাকুর সাইকেলের "বার"এ। কারো সাইকেলেই আলো নেই। আলোর দরকারও নেই। গতকাল বুলবুলিদের বাড়ি থেকে ফেরবার পথেই চাঁদের আলোর মহিমা দেখেছিল। অমল-মহিমা। জেলাস্কুলের কাছাকাছি আসতেই রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল এবং পথের দুপাশ ছমছম করতে লাগল। পুলিশ সাহেবের বাড়ি পেরিয়ে এসে চাঁদের আলোয় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল ঋভু। পথপাশের নালাতে চাঁদ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে রুপোলি আর কালোয় মোড়া হাজার সাপ হয়ে নালায় কিলবিল করছিল। গাছগাছালির তলার ঝুপড়ি-কালো অন্ধকারের বৃত্তকে ঘিরে রুপোর চাদর বিছিয়ে দিয়েছিল কে যেন। আর গাছপালার উপরে রুপোলি চাঁদোয়া।

ঋভু বলল, হঠাৎ একটু দাঁড়াব এখানে।

কেন? কি হলো?

না। ভীষণ ভালো লাগছে।

চিনুকাকু বললো, বাঃ বাঃ। কাব্যে পেয়েছে ছেলেকে।

ছানুকাকু বললো, পাবেই বা না কেন? কথায় বলে, "নরানাং মাতুলক্রমঃ"। ঋভুর বড়োমামা কবি তাই ভাগ্নের দোষ নেই তো কোনো।

নিমুকাকু প্যাডল করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সাইকেলগুলোর গতি কমে এলে দুধারে পা নামিয়ে থামালেন সাইকেল। তারপর সাইকেলের সঙ্গে সাইকেল ব্যালান্স করে ঠেকিয়ে রেখে নালার উপরের কালভার্টের উপরে বসলেন সকলে। সকলে নিঃশব্দে বসতেই পথ-পাশের নালার জলের শব্দ জোর হলো। নিজেরা না-চুপ করে থাকলে প্রকৃতির বা নির্জনতার ভাষা যে শোনা যায় না, তা অনুভব করলো ঋভু।

এমন সময়ে জেলা স্কুলের দিক থেকে সাদা আলোতে উদ্ভাসিত পথ জুড়ে আড়াআড়িভাবে টানা কালো রেখার মতো কী দেখা গেল দূরে। আস্তে আস্তে সেই কালো রেখাটি আয়তনে বাড়ছিল। এবার গলা শোনা গেল। কয়েকজন মানুষ আসছে। একটু পরেই বোঝা গেল যে, তারা গান গাইতে গাইতেই আসছে।

"বিদেশেতে রইলা মোর বন্ধুরে।
বিধি যদি দিত্ত পাখা,
উইড়া যায়া দিতাম দেখা
আমি উইড়া পড়তাম সোনার বন্ধুর দেশেরে।
আমরা তো অবলা নারী
তরুতলে বাসা বান্ধিরে;
আমার বদন চুয়ায়া পড়ে ঘামরে।

বন্ধুর বাড়ি তোরসার পার
গেলা না আসিবা আর;
আমারে না জান বন্ধু, না জানে সাঁতাররে।
বন্ধু যদি আমার হও।
উইড়া আইস্যা দেখা দাও
তুমি দাও দেখা জুড়াক পরাণ রে...”

লুঙি আর হাফ-শার্ট পরা পাঁচটি ছেলে, ছোটো ছোটো, বড়োমুখের মাটির, কলসি বাজাতে বাজাতে আর গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে। তাদের কালো মূর্তিগুলো আস্তে আস্তে বড়ো হতে হতে পূর্ণাবয়ব হয়ে গেল।

ঋভুদের সামনে দিয়ে ওরা যাবার সময়ে ছানুকাকু বলল, ব্যাটাছাওয়ালগুলান বিটিছাওয়ার গান গাইস ক্যানে রে?

ওই!

ওদের মধ্যে একজন চলতে চলতেই হেসে বলল।

ওই কি?

ওই, ওই।

বলেই, ছেলেগুলো এ ওর গায়ে হেসে ঢলে পড়লো। বয়সে ওরা ঋভুরই সমবয়সী হবে। বাজারে, নয়তো কোনো হাটে-টাটে দুধ বিক্রি করতে গেছিল।

যে-পথের দিকে চেয়ে ঋভু অবাক চোখে চেয়ে থাকে দিনশেষেরই রাঙা আলোতে, যে-পথটি চলতে চলতে সরু হয়ে গিয়ে দুধারের গাছগাছালি আর বাঁশঝাড়ের মধ্যে সিঁথির মতো মিশে গেছে, সেই রহস্যময় অজানা গন্তব্যের পথেই ওরা এমন চন্দ্রালোকিত রাতে রাখালি গান গাইতে গাইতে চলে যাবে যে, একথা ভেবেই ঋভুর খুব ঈর্ষা হলো। পড়াশুনো করে কি হবে? ঋভুও যদি এই বয়সেই ওদের মতো স্বাধীন হতে পারত!

ওরা দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল আবারও একটি অন্য গান ধরে। ওদের দ্রুত অপস্রিয়মান কালো রেখার মতো একীভূত শরীরটা আলোছায়ার ডোরাকাটা গালচে বিছানো পথ বেয়ে এগিয়ে যেতে লাগল পথপাশের কোরা-শাড়ি পরা কলা-বউয়ের মতো কলাগাছদের হাতছানি ও বাঁশবনেদের কানাকানি না শুনে।

চিনুকাকু বলল, ভূতের ভয় ভাঙাবার জন্যে গান ধরেছে চ্যাংড়াগুলান।

বাড়ি কোথায় ওদের?

ঋভু শুধোলো।

কে জানে? হয় বাঙালপাড়া নয় ধাপ বাজারের কাছেই কোথাও হবে।

শংকামারির শ্মশানের কাছেও হতে পারে।

নিমুকাকু বললেন।

ছানুকাকু বলল, না রে দাদা! ওদের বাড়ি খোঁয়াড়ের কাছে।

হবে। কে জানে, ওদের বাড়ি কোথায়? ঋভুর কানে তখন বাজছিল কবি জসীমউদ্দীনের “নক্সীকাঁথার মাঠের” আবৃত্তি, মায়ের সুললিত কণ্ঠে।

“কানের কাছেতে মুখ করে মাতা ডাক ছাড়ি কেঁদে কয়,
সাজু সাজু! তুই মোরে ছেড়ে যাবি এই তোর মনে লয়?
“আল্লা রসুল! আল্লা রসুল!” বুড়ি বলে হাত তুলে,
দীনদুঃখীর শেষ কান্না, এ, আজিকে যেয়োনা ভুলে।”
দুই হাতে বুড়ি জড়াইতে চায় আঁধার রাতের কালি,
উতলা বাতাস ধীরে ধীরে কয় সব খালি! সব খালি!
“সোনার সাজুরে, মুখ তুলে চাও, বলে যাও আজ মোরে,
তোমারে ছাড়িয়া কী করে যে দিন কাটিবে একেলা ঘরে।”

দুখিনী মায়ের কান্নায় আজি খোদার আরশ কাঁপে
রাতের আঁধার জড়াজড়ি করে উতলা হাওয়ার দাপে।"

কী ভাবছিস রে গাড়লু? মায়ের জন্য মন খারাপ?

চিনুকাকু বলল।

না। নাঃ।

ঋভু প্রতিবাদ করে বলল।

ভাগ্যিস ছায়াকালো চাঁদের আলোয় কেউই দেখতে পেল না যে তার দুটি চোখই ছলছল করছিল। মাকে যে ও খুব ভালোবাসে এ কথা হৃদয়ঙ্গম করেই ওর খুব লজ্জা হলো। এই প্রথম, মায়ের কাছ ছাড়া হলো ঋভু, তাই বোধহয় বুঝতে পেল যে, মা কী!

আজ মুসলমানদের কোনো তেওহার ছিল। ইদ্‌গাতে নামাজ পড়তে গেছিল সকলে। এই নামাজ পড়া দেখতে খুব ভালো লাগে ঋভুর।

ঋভুর বাবা হৃষীকেশ বলেন যে, মুসলমানদের ধর্মের সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে "বিরাদরী"। এই ধর্মে সকলেই সমান। বড়লোক-গরিবলোক শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না এই ধর্ম; করে না ব্রাহ্মণ, কায়স্থ হরিজনদের মধ্যে। সকলেই পাশাপাশি পরম নিয়মানুবর্তিতায় হাঁটু গেড়ে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে নামাজ পড়ে। এই নামাজ ব্যাপারটাও হিন্দুদেব পুজোর মতো দীর্ঘ সময় নিয়ে হয় না। সামান্য সময়ের জন্য এই নামাজ পড়া হয়। "খুটবা"। তারপরই আল্লা রসুলের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা বা "দোয়া" মাঙ্গা হয়। ব্যস্ তারপরই নামাজ শেষ। সকলে উঠে পড়ে কোলাকুলি করেন। বাড়িতে বাড়িতে ভালো রান্না হয়। যে গরিবস্য গরিব তার বাড়িতেও সেদিন বিরিয়ানি অথবা মোরগা-আণ্ডা হবেই হবে।

ঋভুর যাতায়াত ছিল অনেক মুসলমান বন্ধুদের বাড়িতে। তাই তেওহারের দিনে তার নেমন্তন্ন থাকে প্রায়ই। সবচেয়ে যা ভালো লাগত ঋভুর, তা হয়তো নিজে পেটুক বলেই, মুসলমানেরা খাওয়া ব্যাপারটাকে একটা আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। সাধারণ হিন্দুদের মতো শুধুমাত্র "পেট ভরাবার" জন্যেই খায় না ওরা। ভালো একটি পদ রান্না করার আগে যে কতদিনের মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি থাকে তা বলার নয়। যে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান, সেও একদিন মোরগা খাবে বলে তিনদিন উপোস করে থাকতে রাজি থাকে। কিন্তু মোরগা যেদিন খাবে, সেদিন খাঁটি ঘি, গরম মশলা, কাঁচা পেপে, সুপুরি এবং তারমধ্যে ভাঙা চিনেমাটির ভাঙা বাসনের টুকরো ইস্তেমাল করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না। বিরিয়ানি রাঁধলে জাফরান যেন খাঁটি হয় এবং তা যেন কাশ্মীর থেকেই আসে সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে নেয়। যেটা করে, তা কাজই হোক, কী খেলাই হোক, কী খাওয়াই হোক ভালোভাবে করাটা মুসলমানদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রান্না করার মধ্যেও যে "হুনরমন্দি" বা "আরমাঁর" ছেড়-ছাড় ছড়িয়ে থাকতে পারে, এ কথা মুসলমানেরা যেমন জানে, হিন্দুরা জানে না।

মমতাজদের বাড়ির বাইরের ঘরে বসেছিলো ঋভু। দুপুরের খাওয়া হবে একটু পরে। মমতাজরা তো বড়োলোক নয়। বড়োলোকদের বাড়িও নেমন্তন্ন খেয়েছে। তার রকম আলাদা। সকাল দশটাতে

দাওয়াত শুরু হবে আর আখরি পদ আসবে বেলা চারটেতে। মেহমান এসে বসলেই প্রথমে নানারকম ইয়াদগারি চলবে। বুঝদিল মনমৌজি, মস্ত-আদমীদের মধ্যে খাল-খরিয়াত এর পুছ-পাছ্ চলবে। আর সঙ্গে চলবে ইত্বরদানির মধ্যে বসানো অগণ্য বেলজিয়ান কাট-গ্লাসের ইত্বরদানের মধ্যে থেকে সরু কাঠির মাথায় তুলো পেঁচিয়ে সেই তুলোর মাথায় ইত্বর লাগিয়ে তা মেহমানদের কনুই থেকে হাতের পাতায় ঘষে দেওয়া এবং তার পর সেই তুলোটিকে কানের ছিদ্রে গুঁজে দেওয়া।

আর ইত্বরই বা কি এক রকমের? গরমের দিনে খস্‌স। রুহ্-খস্‌স। রাত-কি-রানি, গুলাব, অথবা ফিরদৌস। শীতকালে অম্বর, হিম্বা, আরও কত কী! বদরু মিঞা সাহেবের বাড়িতে একদিন বদরু চাচার বাবা জাফফ্র নানা ঋভুকে একরকম ইত্বর দেখিয়েছিলেন মৃত ছাগলের যকৃতের মধ্যে রাখা। সেই ইত্বরের নাম "ইত্বরই খ্বিল"। নবাবেরা যখন বাঘ শিকারের জন্যে মাচায় বসতেন তখন এই ইত্বর ইস্তেমাল করতেন। ইত্বরই খ্বিল মানে, মৃত্তিকাগন্ধী ইত্বর। মাটির মতো গন্ধ থাকতো বলে বাঘ নাকি নবাবদের গায়ের গন্ধ পেত না।

মমতাজদের বাড়িতে "রইসী" না থাকলেও বিরাদরীর কোনো "কম্মী" ছিল না। বসবার ঘরের কাঠের মস্ত তক্তপোশের ওপরে সাদা ফরাস পাতা হয়েছে। তারই উপরে আসন করে সকলে বসে গল্পগুজব করছেন। পেতলের মিনা করা রেকাবির উপরে পান রয়েছে। গড়গড়া। হুঁকো ফিরছে মুখে মুখে।

একসময় খাবার এল, লাল নীল ফুল তোলা কলাই করা মস্ত বাসনে মোরগার ঝোল। অন্য একটি বারকোশের মতো বাসনে কাঁচা-পেঁয়াজ, কাঁচা লংকা রাখা আছে। গোটা গোটা, সদ্য-ছাড়ানো পেঁয়াজ। পাশে মস্ত দুটি রেকাবিতে থাকথাক করে সাজানো বাখরখানি রোটি। কে বলল, ঢাকা থাকে কে যেন নিয়ে এসেছে। এ রুটি বড়ো উপাদেয়। সকলে একসঙ্গে হাত লাগিয়ে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে এবং যে পাত্রে মোরগার ঝোল রয়েছে সে পাত্রেই কবজি ডুবিয়ে রুটি ভিজিয়ে নিয়ে মহানন্দে খাচ্ছে।

এই প্রক্রিয়াটা স্বাস্থ্যসম্মত যে, তা বলা যায় না। তবে ঠাকুমার ছোঁয়া-ছুঁয়ি, এঁটো-কাটা, ক্ষণে ক্ষণে "জাত চলে যাওয়ার" দুশ্চিন্তায় কাতর পরিবেশে বসবাসকারী ঋভুর মমতাজদের বাড়ির এই ব্যাপারটা ভারি ভালো লাগত। হিন্দুদের ছোঁয়া-ছুঁয়ির প্রেক্ষিতে ও রীতিমত "এনজয়" করত মুসলমানদের এই খোলামেলা বিরাদরীর ব্যাপারটা।

গতরাতে শেখ মুনোয়ারেব বাড়ির সামনের মস্ত মাঠে সিরাজদ্দৌলা পালা হয়েছিল। সকলেরই মুখে মুখে সেই কথা। একজন অভিনেতা হাতে পিস্তল নিয়ে প্রতিপক্ষকে ঝলমলে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "অ্যাই দ্যাখ! মোর হাতে পিস্তল চকোচকো করতিছে, ড্যাম্ বসায়া।"

সেই কথা মনে করে সকলে হাসাহাসি করে উঠলেন।

যে অভিনেতার পিস্তল ছিল তিনি কোনো দিন পিস্তল দেখেননি বা পিস্তলের ব্যবহারও জানতেন না। তাই ভেবেছিলেন, পিস্তলও এক ধরনের বিশেষ ছুরি বা চাকু, যা প্রতিপক্ষর বুকেই বসিয়ে দিতে হয়। সেই কারণেই বলেছিলেন, "অ্যাই দ্যাখ, মোর হাতে পিস্তল চকোচকো করতিছে, ড্যাম বসায়া।"

মহিউদ্দিন চাচা বললেন, হিন্দুরাই সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে মাতামাতি, রোম্যান্টিজম করে বেশি। করবে না কেন? বাংলার শেষ নবাব যে তিনি সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। মিরজাফর যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করতেন তবে তো বাংলার ইতিহাসই অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু সে কথা নয়। সিরাজউদ্‌দৌলা মানুষ মোটেই সুবিধার ছিলেন না।

সে কি!

তাজ্জু, সিরাজউদ্‌দৌলা তো সব বাঙালিরই চোখের মণি!

তা ঠিক। তবে সিরাজউদ্‌দৌলার গল্প বলি শোন।

ইন্তাহারুল। চাচা বলল, বলো বলো মহিউদ্দিন। খেতে খেতেই শোনা যাক।

মহিউদ্দিন চাচা গল্প শুরু করেছে সবে এমন সময়ে ভট্‌চাজদের বাড়ির সতীশ ভট্‌চাজকে রাস্তা দিয়ে খড়ম পায়ে যেতে দেখা গেলো। ওই বড়োদের দঙ্গলের মধ্যে ঋভুর কচি গলা সতীশ জ্যোঠ্যা শুনে থাকবেন। শুনতেই, দাঁড়িয়ে পড়লেন রাস্তার মাঝখানে।

তারপর গলা খাঁকরে ডাকলেন, শাজাহান মিঞা। অওরঙজেব।

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

শাজাহান চাচা বাইরে বেরিয়ে বলল, বাবু!

আরে মাস্টারের ভাই-ব্যাটা ঋভু ছোকরা এইখানে করে কি? কী করে?

শাজাহান চাচা একটু চুপ করে থেকে বলল, ঋভু? ঋভু তো নাই এখানে। আমাগো তেওহারের দাওয়াত এ মেলা লোক আসছে তো!

ঋভু নাই?

নাই।

গলা পাইলাম য্যান্।

ভুল পাইছেন। মানে, ভুল শুনছেন।

আমার ভুল?

বলে, সতীশ ভট্চাজ তীক্ষ্ণ নাক আকাশের দিকে তুলে অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো হাওয়া শুঁকলেন। কিন্তু মুসলমানদের বাড়িতে তো উনি ঢুকতে পারবেন না! হিন্দু ব্রাহ্মণের জাতই চলে যাবে তাহলে। তাই কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে খড়মে খটাস খটাস আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেলেন।

শাজাহান চাচা ভিতরে আসার পর সকলে খাওয়া থামিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

মহিউদ্দিন চাচা বললেন, তুই আসস ক্যানরে, ঋভু? কেউই যখন পছন্দ করে না তবু তুই আসস ক্যান?

ঋভু বলল, আমি পছন্দ করি। আমার ভালো লাগে। আমার বাবা মায়ের কোনো স্মরণ নেই। বাবা আমাকে বলেছেন, মুসলমানের মেয়ে পছন্দ হলে তার সঙ্গেই আমার বিয়ে দেবেন। পৃথিবীতে মানুষের শুধু দুটো জাত। ভালো আর খারাপ। এ ছাড়া আর কোনো জাত নেই। এই মিথ্যে জাত-পাত যারা মানে, তারা অমানুষ।

মৃদু গুঞ্জন উঠল ঘরে।

ইজাহারুল চাচা হেসে বললেন। তাই ক'রে ছ্যাম্‌রা। শাজাহানের বাড়ি এতো ঘুর-ঘুর করন তো ভালো বুঝতাছি না। মমতাজরে মনে ধরছে বুঝি তর?

দু-একজন হেসে উঠলেন। কিন্তু অধিকাংশই ইজাহারুলকে ধমক দিলেন। বললেন, ছাওয়ালডা ভালো মনে আসে আমাগো বাড়ি অর মনে পাপ ঢুকাইস না।

পিরিত বুঝি পাপ? তাতো কবাই। নিজেগো ঘর নিজেরাই অন্ধকার কইর‍্যা থুইল্যে আর সুরজই বা করতে পারে কি? ঋভুর বুক দুরদুর করতে লাগল। মমতাজ!

শাজাহান চাচা বললেন, সতীশ ভট্চাজ যদি তোর ঠাকুমারে কইয়া দ্যায় গিয়া?

বললে, বলুন গিয়ে। আমি ভয় পাই না।

বলেই বলল, সিরাজউদ্‌দৌলার গল্পটা শোনা হবে না?

মহিউদ্দিন মিঞা, আরেক টুকরো বাখরখানি রুটি মেরাগার ঝোলে ভিজিয়ে তুলে বলল, শোন্ তবে।

বলো, বলো, সকলেই সমস্বরে বলে উঠল।

মহিউদ্দিন চাচার গল্প শুরু হবার আগেই ঋভুর মনে মমতাজের কথা এল। মুসলমানদের ভালো অনেক কিছুই আছে কিন্তু মেয়েরাও যে মানুষ এ কথা যে কেন এই শাজাহান চাচারা মানতে চান না, কে জানে! মেয়েরা, মমতাজ, যেন, অন্য জগতের বাসিন্দা। কালো বোরখার আড়াল দিয়ে যতটুকু দূরের পৃথিবী দেখা যায় সেইটুকু পৃথিবীই তাদের দখলে। মমতাজও বড়ো হলে এ রকম দূরের হয়ে যাবে? তার কালো জোড়া ভুরু, ধবধবে নাকের একটুখানি, পায়ের পাতা; ব্যসস্, এর বাইরে মমতাজ-এর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না কি ঋভুর কাছে?

মহিউদ্দিন চাচা শুরু করলেন। বললেন, কথা তো আমার নয়। পরশুই আমার হাতে একটাই বই এসেছে। বইটির নাম "সেকালের দারোগার কাহিনি।" লেখক শ্রী গিরিশচন্দ্র বসু। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো আঠারশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দে। গিরিশবাবু মুর্শিদাবাদের নবাবি সেরেস্তায় কিছুদিন কাজে করেছিলেন, ইংরেজদের দারোগাগিরি থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার পর। মুর্শিদাবাদের সিরাজউদ্‌দৌলা সম্বন্ধে এত কথা অনেকেরই অজানা। তোমাদের এবং আমার তো বটেই। বলেই, কাঁধের ঝোলা থেকে একটি ছেঁড়াখোঁড়া বই বের করে পাশে রাখলেন।

ঋভু বলল, এই বইতো আমার মায়ের বাবার লেখা। মানে আম্মীর দাদা। বাবা।

তাই? কস কিরে পোলা? ইটা ত একটা খবরের মতো খবর!

ঘরের কোনা থেকে বদনা তুলে নিয়ে মহিউদ্দিন চাচা বাইরে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসে বইটি তুলে নিয়ে বললেন, শোনো সকলে তবে।

কিতাবটা থিক্যাই সরাসরি পড়তাছি।

"অতি সঙ্কট-সময়ে সিরাজউদ্‌দৌলা তাঁহার মাতামহ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন। দিল্লির দিকে যেমন মারহাট্টা, পিন্ডারী এবং শিখদিগের অস্ত্রবলে মোগল সাম্রাজ্য টলমল প্রায় তেমনি বঙ্গদেশে সমুদ্রের ও মেঘনা নদীর উপকূলস্থ জনপদ সমস্ত পোর্টুগিজ এবং মগ-দস্যুদিগের আক্রমণে অস্থির। পক্ষান্তরে আবার ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনেমারেরা বাণিজ্যের ভাণ করিয়া স্থানে স্থানে ভূমি অধিকার করিয়া দুর্গ নির্মাণ করিতেছিল। এমন সময়ে বঙ্গদেশে রাজ্য-রক্ষার জন্য একজন অসাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন কান্ডারীর আবশ্যক ছিল; কিন্তু তৎপরিবর্তে হিতাহিত জ্ঞানহীন এক যথেচ্ছাচারী যুবক বাঙ্গালা বিহার, উড়িষ্যার রাজাসনে আসীন হইলেন!"

"আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহার অন্যান্য দৌহিত্রকে উপেক্ষা করিয়া এই সিরাজউদ্‌দৌলাকে পোষ্যপুত্র রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আপনার পদে অধিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া স্থিরও করিয়াছিলেন। নবাব ও তাঁহার অধীনস্থ সকলেই সিরাজউদ্‌দৌলার প্রতি সেইরূপ ব্যবহারও করিতেন, তথাপি আলীবর্দ্দীর শীঘ্র মৃত্যু হইতেছে না দেখিয়া সিরাজউদ্দৌলার আর বিলম্ব সহ্য হইল না; তিনি তাঁহার এমন বৎসল মাতামহকে পদচ্যুত করিয়া শীঘ্র নবাব হইবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।"

"নবাবী-বুদ্ধিই সৃষ্টি-ছাড়া। সুবুদ্ধি-লোকে সিরাজউদ্‌দৌলার এমন গর্হিত কার্য্যের পর আর তাহার মুখ-দর্শন করিত না, কিন্তু আলীবর্দ্দী বুঝিলেন অন্যরূপ। তিনি বলিলেন, যে, "ইয়হ লেড়কা বড়া জবরদস্ত আদমি হোগা।" এবং বিবেচনা করিলেন যে, যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে রাজ্য-শাসনের জন্য সিরাজউদ্‌দৌলাই উপযুক্ত ব্যক্তি হইবে। সেই বিশ্বাসে তিনি তাহাকে মার্জনা করিয়া নবাবী দিতে আদেশ করিয়া পরলোকগমন করিলেন।

"এমন অবস্থার কু-ফল অচিরাৎ ফলিল এবং বঙ্গদেশের শাসনভার দেখিতে দেখিতে অন্যের হস্তে চিরকালের জন্য ন্যস্ত হইল। সে সকল কথা ইতিহাসেই বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে, আমার আর তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমি যে দুইটি কাহিনি বিবৃত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা করিতেই আমি এক্ষণে প্রবৃত্ত হইলাম।"

"আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইল। নবাব সরকারের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে মুর্শিদাবাদে চল্লিশ দিবস পর্যন্ত "গম্মী" পালন হইল অর্থাৎ নজ্বর-সরকারের অথবা নবাব-সরকারের অধীনস্থ কোনও আমীর ওমরাহের কিংবা রাজ-রাজড়ার নহবত বাজিল না, মুর্শিদাবাদ শহরে কাহারো বিবাহ-সাদী হইল না এবং কেহ কোনরূপ আনন্দ-উৎসবও করিতে পারিল না।"

"নবাবী আমলে এইরূপে গম্মী অর্থাৎ শোকপ্রকাশ করা হইত।"

"এমন দীর্ঘ গম্মীর পরে নূতন-নবাব, নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার মস্‌নদ্ আরোহণের জন্যে একটি শুভদিন (?) শুভক্ষণ (?) নির্দ্দিষ্ট হইল। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরাও দিনক্ষণের হিতাহিত মানিয়া থাকেন। এই সকল কার্য্য এবং উৎসব উপলক্ষে "আম্‌দরবার" হওয়ার রীতি আছে। সে আম্‌দরবার বড়ো সমারোহ বাপার। তখনকার মুর্শিদাবাদের নবাবের ক্ষমতাও যেমন; ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদও তদ্রূপ ছিল; বহুলোকের সমাগম হইবে বলিয়া এক বিস্তৃত স্থান নির্দিষ্ট হয় এবং তাহা নানা রঙে-রঞ্জিত কাশ্মীরি শালের এক চন্দ্রাতপের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। এখন যেমন সভাগৃহ,—উজ্জ্বল,

লতা-পাতা এবং সামান্য পতাকারাজি দ্বারা সজ্জিত হইয়া থাকে, সিরাজউদ্‌দৌলার সময় সে ব্যবহার ছিল না; ছিল,—স্বর্ণরৌপ্যদ্রব্য এবং পশিনা ও রেশমি যবনিকা দ্বারা সুশোভন করার প্রথা।

"মণিকাঞ্চনে মণ্ডিত, আশাসাঁটো আড়ানী, ছত্র, দণ্ড, চামর, পঞ্জা, মাহি, মোরাতব এবং আর কত যে বহুপ্রকার নবাবী সল্‌তনতের চিহ্ন ছিল, তাহা আমি বলিয়া উঠিতে পারি না। এক একটা হস্তীপৃষ্ঠের ঝুল কিংবা এক একটা অশ্বের জিন বর্তমান কালের এক একজন জমিদারের সম্পত্তি। এই সকল দ্রব্যই তখন ছিল—নবাব সুবাদিগের ঐশ্বর্যের পরিচয় এবং পদমর্যাদার আবশ্যকীয় চিহ্ন।"—

"ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী শেষ নবাব নাজিম মনসুর আলী খাঁ বাহাদুরের পিলখানায় যত হস্তী, অশ্বশালায় যত ঘোটক ও জহরৎখানায় যে হীরা, মাণিক, মুক্তা ও শাল-দোশালা দেখিয়াছি তাহা দেখিয়া অক্ষুণ্ণ পুরা নবাবী আমলের ঐশ্বর্য্যের হিসাব করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য। বোধহয় পাঠক স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। প্রকৃত যোদ্ধা পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজী সৈনিক পুরুষ যাহারা সেই দিবস মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিল, তাহারও আসিয়া দরবারের চতুর্দ্দিকে সুন্দর বেশভূষা গ্রহণপূর্ব্বক সভার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। হস্তীপৃষ্ঠে রৌপ্য-ডঙ্কা, অশ্বপৃষ্ঠে নাগারা, নহবতে রৌশনচৌকা, তূরী, ভেরী ও নানাবিধ চিত্তোৎসাহী রণবাদ্য, দর্শকবৃন্দের মন উল্লসিত করিতেছিল এবং সভাস্থলে নবাবের 'আকোরবা'রা, অতি উচ্চ হইতে ক্ষুদ্র কর্মচারি পর্যন্ত পররাষ্ট্র সকলে দূত, এল্‌চিগণ, নেজামতের অধীনস্থ জমিদার, কিংবা তাহাদের প্রতিনিধিগণ, নবাবের আগমন অপেক্ষায় স্ব স্ব স্থানে সমবেত ছিল।

"বাহিরে অগণ্য ফকীর-ফক্‌রা, ভিক্ষুক এবং তমাসবীন দর্শক দ্বারা একটি মনুষ্য-সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। রাজ্যের নূতন শাসনকর্তা শাসনভার গ্রহণ করিবেন, সকলে তাঁহাকে দেখিবে; তিনি কি বলেন, তাহা শুনিবে,—সকলের মনে উল্লাস, সকলে মনে উৎসাহ এবং সকলের মুখেই আনন্দের হাসি।"

"পুরাতন কর্মচারিরা ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহারা নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর অধীনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, অতএব সিরাজউদ্‌দৌলাও তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা বিতরণ করিতে ক্রটি করিবেন না। পক্ষান্তরে তাঁহার বাল্যবন্ধুরা, বিশেষত আলীবর্দ্দীর বিরুদ্ধে যখন সিরাজউদ্‌দৌলা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল, তখন যে সকল লোকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, বিদ্রোহিতায় তাঁহাকে সাহায্য ও তাঁহার পোষকতা করিয়াছিল, তাহাদের আশাভরসার ত সীমা-পরিসীমা ছিল না।"

"কেহ ভাবিতেছিলেন যে, আমি দেওয়ান হইব। কেহ, সেন্যধ্যক্ষ। কেহ, নাজীর। কেহ উজীর হইবার লুব্ধ আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া বসিয়াছিলেন।"

"বাহিরে ভিক্ষুকেরা ভাবিতেছিল যে, আজ নূতন নবাব কোন্ লক্ষ টাকা দরিদ্র দীনহীনদিগকে বিতরণ না করিবেন। এইরূপে সকলেই কোনও না কোনও লাভের প্রত্যাশায় পথের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

"এমন সময়ে গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া তোপধ্বনি হইতে লাগিল "জোনাবালী আসিতেছেন।" বলিয়া শব্দের একটা রোল উঠিল। অমনি গভীর রবে ডঙ্কা সকল বাজিয়া উঠিল। নাগারা সকল গুড় গুড় করিয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। নহবতখানায় রৌশনচৌকী ও তূরী, ভেরী বাজিল। নবাবের চতুর্দ্দোলা দেখামাত্রে বাহিরের সকল লোকে "জয় নবাবসাহেব কী জয়", "জয় সিরাজউদ্‌দৌলা কী জয়", "জয় জোনাব আলী কী জয়" শব্দ করিয়া ডাকিয়া উঠিল।"

"ধীরে ধীরে নবাবের যান আসিয়া দরবার-স্থানে উপস্থিত হইল। দরবারস্থিত সকল ব্যক্তি, সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সিরাজউদ্‌দৌলা আসন গ্রহণ করিবামাত্রই সকলে মস্তক নত করিয়া সেলামের উপর সেলাম, কুর্নিসের উপর কুর্নিস করিয়া নবাবকে অভিবাদন করিলেন।

"তদনন্তর চারিজন নকীব সভাস্থলের চারি কোণে দাঁড়াইয়া সিরাজউদ্‌দৌলার নাম ও তাঁহার নবাবী উপাধি সকল উচ্চস্বরে ফুকারিয়া ব্যক্ত করিতে লাগিল। তাহার পরে প্রধান মোল্লা একখানা কোরান হস্তে করিয়া তাহার একাংশ পাঠকরণান্তে সিরাজউদ্‌দৌলাকে "দোয়া" অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ করিলেন। মোল্লা সাহেব প্রস্থান করিলে পর সকলে নজর-প্রদানপূর্ব্বক নবাবের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল।"

"প্রথমে নবাবের "আকোরবা" অর্থাৎ জ্ঞাতি-কুটুম্ব প্রভৃত সম্পর্কীয় ব্যক্তি, তৎপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ব্যক্তিরা নজর দিলেন। ইহার পরেই যে-সকল ব্যক্তিকে সম্মানিত করার আবশ্যক ছিল, তাহাদিগকে খেলাৎ দেওয়ার কথা; কিন্তু তাহা হওয়ার পূর্ব্বেই সিরাজউদ্‌দৌলা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এইক্ষণে আমি নবাব হইয়াছি কি না?"

"নবাবের প্রশ্ন শুনিয়া প্রধান কর্মচারি দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ উত্তর করিলেন যে, "অবশ্য হইয়াছেন এবং তাহা কেবল এখন নহে, আপনার মাতামহের জীবদ্দশাতেই আমরা সকলেই আপনাকে নবাব বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছি।"

"নবাব কহিলেন, আচ্ছা!

তবে আমি এখন হুকুম প্রচার করিতে পারি?

"দেওয়ান কহিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। আপনি যা ইচ্ছা হুকুম প্রচার করিতে পারেন।"

"নবাব কহিলেন, তবে আমার সম্মুখে আমার "আতালিক (শিক্ষক) কুলী খাঁকে হাজির করো।"

"ইহার পূর্ব্বে সিরাজউদ্দৌলার যখন আলীবর্দ্দী খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, সেই পর্যন্ত তাঁহার প্রতি অধিকাংশ লোকে বীতশ্রদ্ধ ছিল। অনেকের বিবেচনা "এই পাষণ্ডের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত হইলে বঙ্গের আর মঙ্গল হইবে না।" তাই তাহারা সিরাজউদ্‌দৌলা মস্‌নদে আরোহণ করিয়া কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক ছিল। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল যে, তকত্‌-এ বসিবামাত্র, সকল কার্য্যের পূর্ব্বে সিরাজউদ্‌দৌলা তাহার বাল্যকালের "শিক্ষককে" স্মরণ করিয়াছে "তখন ইঁহার প্রতি তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত কুসংস্কারগুলি দ্রবীভূত হইয়া দ্বিগুণভাবে ভক্তির উদয় হইল। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানদিগের মধ্যেও গুরুভক্তি অতি প্রশংসনীয়। অতএব দরবারের সকল লোকের বিবেচনায় সিরাজউদ্‌দৌলা উত্তম ভক্ত এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সুস্থির হইল। নেজামতের পুরাতন কর্মচারিদিগের মনেও সাহস হইল যে, এমন ধার্ম্মিক নবাবের হস্তে তাহাদের কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট হইবে না।"

"যখন কুলী খাঁ শুনিল যে, তাহার শাকরেদ তাহাকে ডাকিয়াছেন, তখন সে আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িল। ভাবিল যে, এতদিনে তাহার দুঃখ দূর হইল। দরিদ্রের আশা সমুদ্রস্বরূপ। প্রধানমন্ত্রীর কিংবা প্রধান কাজীর পদ না হইলেও সে তৎতুল্য উচ্চ একটা পদ পাইবে, কুলী খাঁ এইরূপ আশালুব্ধ হইয়া হৃষ্টচিত্তে সিরাজউদ্‌দৌলার সম্মুখে উপস্থিত হইল।"

"মিঞাজীর কিংবা গুরু মহাশয়কে কে কবে খাতির করিয়া থাকে? কিন্তু অদ্য কুলী খাঁ, নবাবের নিকট চিহ্নিত হইয়াছে দেখিয়া, উভয় পার্শ্বস্থ লোক সসম্ভ্রমে এবং আনন্দের সহিত তাহাকে রাস্তা ছাড়িয়া দিল। ফকীরেরা তাহাকে দেখিয়া "ভালা হোয়" বলিয়া দোয়া করিতে লাগিল।"

"কুলী খাঁ আসিয়া তক্তের সম্মুখে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র সিরাজউদ্দৌলা চক্ষু লাল করিয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, "কেঁও হারামজাদা। তব্ তুঝে ইয়াদ নেহি থা কি হাম এক রোজ ইয়ে তক্‌তপর বৈঠেঙ্গে?"

"সকলে অবাক হইল। কেহ কিছুই বুঝিল না।"

"কেবল কুলী খাঁ সব বুঝিলেন। তাঁহার আশা নির্ম্মূল হইল। অন্তর কাঁপিতে লাগিল।"

"ফল কথা এই যে, আমাদের দেশের গুরুমহাশয়েরা, বিশেষতঃ মুসলমান মিঞাজীরা, অত্যন্ত উগ্রস্বভাবের ব্যক্তি হইয়া থাকেন। ছাত্রদিগকে বেত্রাঘাত করিতে তাঁহারা প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। পাত্রাপাত্রের ভেদাভেদ করেন না। কুলী খাঁ সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। সিরাজউদ্‌দৌলাকে পড়াইবার সময় তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি ব্যাঘ্রশাবক লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। যে-বালক নবাবের দৌহিত্র এবং যাঁহার একদিন নবাব হওয়ার সম্ভাবনা, তাঁহার প্রতিও তিনি অন্য বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন এবং বেত্রাঘাত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। অন্য বালকে গুরুর বেত্রাঘাত শীঘ্র ভুলিয়া যায়, কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র ভিন্নরূপ গঠিত। বেত্রাঘাতের যন্ত্রণা তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক লাগিত। ক্ষমতা থাকিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিশোধ লইতে ত্রুটি করিতেন না; কিন্তু সে ক্ষমতা তখন তাঁহার

ছিল না। অতএব প্রত্যেক আঘাতের কথা তিনি যত্নে মনের মধ্যে শক্ত গ্রন্থিবন্ধন করিয়া রাখিয়া স্বাবকাশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেই স্বাবকাশ এতদিনে উপস্থিত।"

"কুলী খাঁ এখনও স্বীয় বিপদ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে নাই, তথাপি নবাবের লক্ষণ যে ভালো নয়, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। অতএব নবাবের প্রশ্নে সে কোনো উত্তর না দিয়া নিস্তব্ধে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিল।"

"নবাব পুনরায় বলিয়া উঠিলেন যে, "কেঁও কাহে জবাব নেহি দেতা হারাম্ কা জনা?"

"বলেই বল্লেন, জল্লাদ। সামনা আও।"

"জল্লাদকে ডাকাতে সকলে প্রমাদ গণিল।"

"তথাপি নবাবের মনে যে কু-অভিপ্রায় সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সাধারণে বুঝিতে নাই। তাহারা অনুভব করিল যে, "কুলী খাঁ যেমন নবাবকে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধের জন্য নবাব জল্লাদকে দিয়া বুঝি কুলী খাঁকে বেত্রাঘাত করাইবেন অথবা অন্যরূপে অবমানিত করিবেন।"

"এই সময়ে দরবার যেন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইল। সমবেত চারি পাঁচ সহস্র মানুষ্যের মধ্যে কাহারও মুখে কোন বাক্য, কিংবা শব্দ নাই, সকলেই চুপ। কেবল তাহারা গলা বাড়াইয়া নবাব ও কুলী খাঁর দিকে স্থিরচিত্তে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। বাহিরের হাতী, ঘোড়া, উট, বলদগুলোও যেন কোন বিপদাশঙ্কায় নীরবে স্ব-স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।"

"জল্লাদ তকত্-এর সম্মুখে উপস্থিত হইল। অমনি সিরাজউদ্দৌলা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে, "ইস্ বজ্জাৎ কো কতল করো।"

"এই শব্দ যদিও মানব-কণ্ঠ হইতেই নিঃসৃত হইল, তথাপি কুলী খাঁর কর্ণকুহরে তাহা যেন বজ্রাঘাতের ন্যায় প্রবেশ করিল। এতক্ষণ এই বৃদ্ধের শরীর দরদরিত ঘর্ম্মে সিক্ত-বিষিক্ত হইতেছিল, কিন্তু "কতলের" নাম শুনিবামাত্র সেই ঘর্ম্ম মুহূর্ত্তমধ্যে এককালে শুকাইয়া গেল, তাহার রক্তের স্পন্দন ক্ষান্ত হইল, কণ্ঠের রস কোথা উড়িয়া গেল, মুখে ধূলা উড়িতে লাগিল, বাক্য উচ্চারণের ক্ষমতা রহিত হইয়া গেল, চক্ষুর উপর যেন একটা পর্দ্দা পড়িয়া সকলই অন্ধকারবৎ করিয়া দিল। বলশূন্য হওয়াতে শরীর থর থর কাঁপিতে আরম্ভ করিল এবং দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে অতি কঠিন হইয়া উঠিল; তথাপি সে বহুকষ্টে একবার "আল্লার" নাম উচ্চারণ করিল।"

"কুলী খাঁর মুখে আল্লার নাম শুনিয়া দুরাত্মা সিরাজউদ্দৌলা "হিঁয়া আল্লা, তেরা ক্যা ফায়গা করেগা? 'ইহাকে আল্লা হাম' বলিয়া আপন বুকে হাত দিয়ে দেখাইয়া দিল।

"বেগতিক দেখিয়া, মীরাজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তক্ত-এর নিকট অগ্রসর হইলেন এবং হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বিনীতভাবে নবাবকে বুঝাইতে লাগিলেন। যাহাতে তিনি কতলের হুকুম উঠিয়া লহেন, এ বিষয়ে তাঁহারা বিধিমত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সিরাজ, তাহা শুনিলেন না।"

"তাঁহাদের অনুরোধের উত্তরে নবাব যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম এই যে, "তোমরা এখন কুলী খাঁর নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছে, কিন্তু এ যখন আমাকে বেত্রাঘাত করিত, তখন তোমরা কোথায় ছিলে? তখন তো আমাকে উহার বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিতে তোমরা আইস নাই। পৃথিবীর ধর্ম্মই এই যে, যাহার যখন যে এক্তিয়ার থাকে, তখন সে তাহা যথাশক্তি নির্দ্দয়ভাবে পরিচালনা করে। কুলী খাঁ যখন আমাকে তাহার এক্তিয়ারে পাইয়াছিল, তখন সে আমাকে ছাড়ে নাই; এখন আমি তাহাকে আমার এক্তিয়ারে পাইয়াছি, আমি তাহাকে ছাড়িব কেন? কখনই ছাড়িব না।"

"তথাপি তাঁহারা ক্ষান্ত হইতেছেন না দেখিয়া সিরাজউদ্দৌলা ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এখানে নবাব কে? আমি না তোমরা? যদি আমি হই, তাহা হইলে তোমরা চলিয়া যাও। নচেৎ, তোমাদের মঙ্গল হইবে না।"

"তাঁহারা অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া আসিলেন।"

"জল্লাদও এতক্ষণ ইতস্ততঃ করিতেছিল। কারণ জল্লাদ হইলে কি হয়, সেও ত মানুষ। তাহারও ত মায়া-দয়া আছে। কোনও কৌশলে "কতলের" হুকুমটা ফিরে কিনা, সে তাহার জন্য অপেক্ষা

করিতেছিল। সিরাজউদ্‌দৌলা তাহা বুঝিতে পারিয়া জল্লাদকে আরক্ত নয়নে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন যে, "আগর চে তু হামারা হুকুম তামিল নেহি করেগা তো হাম অপ্‌না হাতসে উস্কা, আওর তেরা দোনোকা শির দো টুক্‌রা করেঙ্গে।"

"জল্লাদ উপায়ন্তর না দেখিয়া কুলী খাঁর হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। অভিপ্রায় এই যে, দরবারের বাহিরে লইয়া গিয়া রীতিমত "কতলের" কার্য্য সমাধা করিবে, কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা তাহাও তাহাকে করিতে দিলেন না। বলিলেন যে, "বাহার মৎ লে যাও। ইঁহা হামারা সামনে "কতল" করো।"

"তাহাই হইল। কুলী খাঁর স্কন্ধে কোপ পড়িল। সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাসও কেহ ফেলিতে পারিলেন না, পাছে নবাব তাহা শুনিয়া বিরক্ত হন। মস্তকের উপরে যেন দশমণ ভার আসিয়া উপস্থিত হইল, সকলের এইরূপ বোধ হইতে লাগিল।"

"মুণ্ডটা মাটিতে কয়েকবার উলট-পালট খাইয়া কি একটা দ্রব্যে আটকাইয়া উর্ধ্বমুখে দুই চক্ষু মেলিয়া স্থির হইয়া রহিল। কায়াটা কতক্ষণ ছটফট করিয়া রক্ত উদগীরণ-পূর্ব্বক একপার্শ্বে পড়িয়া রহিল।

"দর্শকমণ্ডলী স্তম্ভিত, ভয়ে আকাট; কাহারও মুখে কোন বাক্য সরে না। মৃত্তিকাপানে সকলের দৃষ্টি, নবাবের দিকে তাকাইতে কাহারও সাহস হয় না; পাছে তাহারও প্রতিকূলে নবাব কোন্ শক্ত হুকুম প্রচার করেন। স্বীয়-স্বীয় প্রাণ লইয়া কিসে গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন, তাহার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যস্ত হইলেন। দরবারে আসিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া যাইয়া, যেন কোন নৃশংস নরঘাতী পশুর পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, এইরূপ সকলের মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কিসে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, তজ্জন্য সকলেই মনে মনে "ত্রাহি মাং মধুসূদন" বলিয়া জপ করিতে লাগিলেন। পরে যখন সিরাজউদ্‌দৌলা "দরবার বরখাস্ত" বলিয়া উঠিয়া গেলেন, তখন যেন সকলের ধড়ে প্রাণ আসিল। যে যেমন করিয়া পারিলেন প্রস্থান করিলেন। বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িলেন, এবং ম্লান বদনে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন।"

"কুলী খাঁর শিরশ্ছেদ হওয়ার পরে তাঁহার দেহ এবং মুণ্ডটা একটা থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া, মুখ বন্ধ করা হইল। পরে পূর্ব্ব-প্রথানুসারে এই থলিয়াটা একটা হস্তীর পৃষ্ঠে গোরস্থানে প্রেরিত হইল।"

"কথিত আছে যে, মুর্শিদাবাদের চকের মধ্য দিয়া যখন হস্তীটা যাইতেছিল তখন একস্থানে সে হঠাৎ থামিয়া খাড়া হইল। মাহুত ইহার কারণ জানিবার জন্য মাটির দিকে তাকাইয়া দেখিল যে, থলিয়া হইতে কতক রক্ত হাতীর গা বাহিয়া মৃত্তিকায় ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে এবং হস্তীটা শুণ্ড দ্বারা তাহার ঘ্রাণ লইতেছে।

"অনেক প্রহারের পর হস্তী পুনরায় যাইতে আরম্ভ করিল।

"ইহার পরে যখন সিরাজউদ্দৌলার অদৃষ্টেও এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ মীরজাফরের পুত্র মীরণের হস্তে তাঁহার শিরচ্ছেদ হইয়াছিল, তখনও সেই একই হস্তীর পৃষ্ঠে তাঁহার মৃতদেহ গোরস্থানে প্রেরিত হওয়ার সময় ঠিক এইস্থানে আসিয়া হস্তীটা থামিয়েছিল। মাহুত নাকি দেখিয়াছিল যে, হস্তী দাঁড়াইবামাত্র সিরাজউদ্‌দৌলার দেহ হইতে কয়েক ফোঁটা রক্ত কুলী খাঁর রক্তের স্থানের উপরে পড়িতে আরম্ভ করিল।"

"লোকে বলে যে, কুলী খাঁর হত্যার এইরূপে প্রতিশোধ হইয়াছিল।"*

মহিউদ্দিন চাচা থামলে, ঘরের মধ্যে সকলেই, সিরাজের রাজ-দরবারে শামিল হওয়া সেই সকালের মানুষদেরই মতো নিঃস্তব্ধ হয়ে মাথা নীচু করে রইল।

* কৃতজ্ঞতা : 'সেকালের দারোগার কাহিনি' গিরিশচন্দ্র বসু, পুস্তক বিপণি, ২৭বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা-৯

সকলের জীবনেই বোধহয় হঠাৎ-ঘটা ঘটনার এক বিশেষ তাৎপর্য থাকে। সবসময় যে তার প্রতিক্রিয়া ভালো অথবা খারাপ যে হবেই এরকমও নয়। প্রতিক্রিয়া পরে জানা যায়। এবং সেই দূরত্বর মধ্যেই ঘটে-যাওয়া ঘটনার সবটুকু মাহাত্ম্য যুক্ত থাকে। রংপুরের এই উদার, উন্মুক্ত, গোলাপি কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি-আঁকা নীল, নীষ্কলুষ আকাশের আর লাল মাটির বুক-ঢাকা চাপ চাপ সবুজের ঘেরাটোপের মধ্যে নিমুকাকু, বিবাগীকাকু, প্রমীলাবালা, চিনুকাকু, ছানুকাকু, রাঙাপিসি, পুষিপিসি, বুলবুলি, মমতাজ, পুঁটু, এবং সুমিতাদিদির মতো আরও কত সরল সুন্দর হাসিখুশি ছোটো-বড়ো মানুষের সঙ্গ থেকে আপতত বঞ্চিত হতে হবে ঋভুকে।

এখানে মানুষ সকাল থেকে রাত অবধি কাজের জন্যে (নাকি টাকা, আরও টাকা রোজগারের জন্যে?) হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় না। এখানের সব মানুষেরাই যেন জানেন যে, খাওয়া-পরা, বাবুগিরির আনন্দর চেয়েও অনেক বড়ো বড়ো আনন্দ আছে। যেমন অবকাশের আনন্দ। এখানে বুলবুলির মতো পরম গরিবের মুখেও হাসি লেগে থাকে সবসময়। মমতাজের বাড়ির ওঁরাও কিছু বড়োলোক নন তবু সবসময় কত হাসি, মজা, রসিকতা। কত্ত সময় আছে এখানের সববয়সী প্রত্যেকটি মানুষের হাতে।

ঋভুর মা বলেন, সময়ের চেয়ে দামি এ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। সে কথাটি এঁদের সকলকে দেখেই বোঝে ঋভু। সময়ের দাম দুরকম করে বুঝেছে ও। সময়, কখনও চলে গিয়ে (যেমন পরীক্ষার আগে) প্রমাণ করে দিয়ে যায় যে সে দামি, আবার কখনও পুকুরপারের ফিনফিনে নতুন পাতা-আসা সজনে গাছের ডালে বৈশাখের মিষ্টি ভোরের হাওয়ার মধ্যে বসে থাকা নিশ্চল, বড়ো মাছরাঙা পাখিটির নিথর স্তবদ্ধতার মধ্যে সময় পুরোপুরি অনড় হয়ে থেকেও সময়ের যে কতখানি দাম তা বুঝিয়ে দিয়ে যায়। বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে, টাকা-পয়সা, মান-জ্ঞান, যশ-পুরস্কার এ সব বাহ্য, সম্পূর্ণই মূল্যহীন। আসল হলো সময়। সময়কে যে থামিয়ে দিতে পেরেছে তার মতো কৃতবিদ্য ধনী আর কেউই নেই; কেউ নেই অত পণ্ডিত। এ মাছরাঙা নবীন নিশ্চল নয়, প্রবীণ নিশ্চল।

পরবর্তী জীবনে এ কথা আরও ভালো করে বুঝেছিল ঋভু। কিছু কিছু বোঝাবুঝি থাকে যা অল্পবয়সে পুরোপুরি বোঝা হয়ে ওঠে না। সময়কে দাঁড় করিয়ে রেখে যে—মানুষকে সময়কে পথ দেখিয়ে তার পেছন পেছন হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারে বিকট-দর্শন অথচ অ-বিপজ্জনক, শান্ত, বাধ্য গ্রেট-ডেন কুকুরেরই মতো; সেই মানুষেরই হাতে থাকে জীবনের চাবিকাঠি।

গতকাল বাবার টেলিগ্রাম এসেছে যে সেনপাড়ার প্রফুল্লদার সঙ্গে ঋভুকে আগামীকালই কলকাতা যেতে হবে। হৃষীকেশের প্রফুল্লদা।

অরার অসুখ ওই রকমই আছে। তবে যেতে হবে সে জন্যে নয়, কলকাতার স্কুলে ঋভুর জায়গা হবে জানিয়েছেন নাকি হেডমাস্টার মশাই। "স্পেশাল অ্যাটেনশন" দেবার জন্যে কয়েকমাসের জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটরও ঠিক করে দেবেন। ঋভুকে যেন অবশ্যই পাঠানো হয়।

প্রফুল্লবাবু ঋভুর বাবার সহকর্মী। তবে বয়সে বড়ো। শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন পৌছবে রাতে। রাতটা ওঁদের বাড়িতেই থাকবে ঋভু, হৃষীকেশ সকালে এসে নিয়ে যাবেন ওকে। অতএব......

কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা কারো জীবনে এক ঘণ্টার জন্যে এলেও সারাজীবনের জন্যে স্মৃতির কম্পিউটরে সামান্যতম হলেও স্থায়ী জায়গা করে নেন, কাকাদের বন্ধু সেনপাড়ার প্রভাতকাকু যেমন,

তেমন প্রফুল্ল জেঠুও। বড়ো যত্ন আদর করে তিনি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রবৎ ঋভুকে ঘোড়ার গাড়ি করে ওঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন শিয়ালদা স্টেশন থেকে। জেঠিমা ও বাড়ির সকলেই খুবই আদর করেছিলেন। সেই একটি রাতের সুখস্মৃতি আজও মনে আছে।

জেঠিমার ছোটোবোনের মেয়ে ছিল সেখানে, তার নাম সেঁজুতি। ডাকনাম হয়ে গেছিলো "সেঁ"। মেয়েটির মধ্যে "নোনতাভাব" খুব বেশি ছিলো। এখন হিন্দিতে যাকে বলে নমকিন। মিষ্টত্বরই মতো নোনতাও সমান স্বাদু। মিষ্টি ছাড়া জীবন চললেও চলতে পারে কিন্তু নুন ছাড়া তো চলে না। তাই এতোদিন পরেও উজ্জ্বল-চোখের ডানা-ঝটপট-করা পাখিরই মতো তাকে এখনও মনে আছে ঋভুর। স্পষ্টই মনে আছে। তাদের বাড়ি ছিল বহরমপুরে। সেই দিন থেকেই বহরমপুর নামক অদেখা জায়গার সব মেয়েদের প্রতিই যেন এক ধরনের দুর্বলতা বোধ করে এসেছে ঋভু।

নারীরা, ঋভুর জীবনে শিশুকাল থেকেই এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সববয়সী নারীরাই। এবং সেই প্রভাব ঋভুর পরবর্তী জীবনে তাকে বিশেষভাবে চালিত করেছে, অসংখ্য বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব করেছে; অনেকেই দুঃখের শরিক করেছে। এবং অবশ্যই অসীম গভীর সুখেরও! মেয়েদের সান্নিধ্য এবং প্রভাবের জন্যে ঋভুর কোনো অপরাধবোধ বা কোনোরকম বিশেষ "মণ্যতা" নেই। ওই নৈকট্যের কারণে ও মেয়েদের যতখানি বুঝেছে ততখানি হয়তো ছেলেদের বোঝেনি। যে কোনো কারণেই হোক, মেয়েরা তাকে অনেক কিছুই দিয়েছে, অনেক রকমের দেওয়া; অন্য একচোখে দেখেছে, যা পাওয়ার বা যে নজরের যোগ্যতা হয়তো খুব কম পুরুষের জীবনেই ঘটে। এই জন্যে ঈশ্বরের কাছে ঋভুর কৃতজ্ঞতারও শেষ নেই। যারাই এই জীবনে তাকে সুখ অথবা দুঃখ দিয়েছে তাদের প্রত্যেককেই ঋভু মনে রেখেছে। তাদের প্রত্যেকেরই সে ভালো চায়, তাদের প্রত্যেকেই সুখে যেন থাকে, সমৃদ্ধি হয় যেন তাদের প্রত্যেকেরই; ঋভু এই প্রার্থনাই অনুক্ষণ করে।

প্রফুল্ল জেঠুদের বাড়িটা কোন্ পাড়ায় তা ঋভু জানত না। আজও জানে না। দক্ষিণ কলকাতার এলগিন রোড থেকে যাদবপুর এবং ওদিকে টালিগঞ্জ এবং কসবা এবং ওল্ড বালিগঞ্জ রোড এই ছিল ঋভুর কলকাতা। এবং হয়তো এখনও তাইই আছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে চৌরঙ্গি বা ধর্মতলা শুধু।

বিশেষ বিশেষ পাড়ার ভোরের বিশেষ বিশেষ ধর্ম আছে। ভোরের শব্দ ও গন্ধ দিয়েই চিহ্নিত করা যায় প্রত্যেক পাড়াকে, দেশ-বিদেশের; এবং সেই চিহ্ন প্রত্যেক পাড়াতে আলাদা আলাদা। নতুন জায়গা বলে ঘুম হয়নি ভালো, তক্তপোশের উপরে শতরঞ্জি পাতা, তার উপরে নরম তোশক। তারও ওপরে ধোপাবাড়ি থেকে কাচা চাদর বালিশ পেতে শুতে দেওয়া হয়েছিল ঋভুকে বাইরের ঘরে। সেই ফাজিল সেঁজুতি রাতের বেলা তিনবার তার ঘর পেরিয়ে কলঘরে যাওয়ার সময় ঋভুর মাথায় একটি করে উড়নচাঁটি মেরে গেছে।

ঋভু চোখ খুলতেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে বলেছে। আবার ফেরার সময় ঋভুর কপালে একটি 'চুঃ' শব্দ করা চুমুও খেয়ে গেছে। আবারও ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে।

যদি বা ঘুম হতো অচেনা বাড়িতে প্রথম রাতে, ওই বহরমপুরের সেঁজুতির জন্যে সারারাত তার শরীর মনে আলো জ্বলেছে। চাপা আলো। তার তাপ অনুভব করা যায় কিন্তু রোশনি চোখে দেখা যায় না।

অন্ধকার থাকতে থাকতেই করপোরেশনের ধাঙরেরা কলকাতার রাস্তার পাশের গঙ্গাজলের কলের সঙ্গে হোস-পাইপ লাগিয়ে পথ ধুতো সেই সময়ে। তখন করপোরেশনের কোনো কায়দাবাজি আর করের সন্ত্রাস ছিল না। চোখ তো কেউ রাঙতই না বরং বুঝিয়ে দিত কলকাতা করপোরেশন যে, শহর পরিষ্কার রাখা এবং অন্যান্য নানা জনহিতকর কাজ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য; দয়া-ধর্ম নয়। কলকাতা শহরের আজকের শ্রীহীনতার সঙ্গে ঋভুদের ছেলেবেলার কলকাতার শান্ত সৌন্দর্যের কোনো তুলনাই চলে না।

ব্রিটিশ আমলে একজন লাল-পাগড়ির পেছনে যে "অথরিটি" ছিল আজকে তা মুখ্যমন্ত্রীর পেছনেও নেই। নীতি ছিল, চক্ষুলজ্জা ছিল; বিবেক ছিল। তখন পরাধীনতা ছিল ঠিকই কিন্তু আইন ছিল, বিচার ছিল, বিচার ছিলো, ন্যায়-অন্যায় বোধ, বিবেক ইত্যাদি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান ছিল।

ঘুম ভাঙল করপোরেশনের লোকেদের হোস-পাইপের জলের তোড়ের ফটাফট শব্দে। তারপরই কাক্ক ডাকলো কর্কশ স্বরে। প্রথমে একটা তারপর দুটো, তিনটে, পাঁচটা; অগণ্য। তারপরই গায়ে গায়ে নানা সাপের মতো হিলহিলে অলিগলি দিয়ে ঘেরা বাড়িগুলোর কলঘরে কলঘরে দাঁত-মাজা, জিভ-ঘসা, গলা খাঁকরানোর নানারকম বিচ্ছিরি শব্দে এবং সরষের তেলের মতো রঙা আলোর আভাসে এ পাড়ার কলকাতার ভোর হলো। ঘুঁটে, গুল এবং কয়লা দিয়ে ধরানো উনুনে ধুঁয়োর বুনন লাগল এখানে ওখানে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে হলো ঋভুর। রংপুরের ভোরের কথা মনে হলো।

ওদের রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ভোরও এর চেয়ে অনেক অন্যরকম।

সেঁজুতি এসে বলল, এই যে চা। খোকাবাবু খেয়ে নাও। বেড-টি।

আমি চা খাই না।

সেঁ বলল, সে কি? কি খাও তবে?

এই! দুধ।

ছাগীর?

কেন? গোরুর।

এ বাড়িতে সব পেটরোগা লোক। রামছাগলের দুধ খায়। আসবে একটু পরেই দুধওয়ালা। বড়ো বড়ো কানওয়ালা রামছাগল। গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে আসবে। শব্দ শুনলে ডেকে দিও। তার আগে হাত-মুখ ধুয়ে নাও খোকা। তোমার বাবা আসবেন। মাসি বলল।

বলেই বলল, দাঁড়াও। আসি।

একটু পরই সেঁজুতি একটি রেকাবিতে করে একটু সরষের তেল আর নুন নিয়ে এল। বললো, দাঁত মেজে নাও। পেঁচি তোমার জন্যে এখুনি শিঙাড়া জিলিপি আনতে যাবে। ভালোবাসো?

যা-কিছু হলেই হল।

যারা সবকিছুই খায় তাদের ছাগল বলে।

ঋভু কথা না বলে তাকিয়ে থাকল সেঁজুতির মুখে।

সেঁজুতি বলল, কাতলা মাছের মতো হাঁ করে থেকো না। মুখে মাছি ঢুকে যাবে। যাও, মুখ ধোও গিয়ে। কি খাবে বলে যাও।

কিছু খাব না। বাবা আসবে।

বোকা বোকা কথা বোলো না। বাবা আসার সঙ্গে খাওয়ার কী সম্পর্ক?

কথা না বাড়িয়ে, ঋভু কলঘরের দিকে গেল।

কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও। গামছা আনি।

ওঃ।

ঋভুর মা তাপসী, ছেলেমেয়েরা রাতে অন্য কোথা থাকুক তা একেবারেই পছন্দ করেন না। গাড়িটা রাতে দেরি করে আসে। তাছাড়া শহর ভর্তি এখন মিলিটারি। সাদা-কালো সোলজারে ভর্তি। দৈত্যর মতো নিগ্রো, সাদা আমেরিকান, ব্রিটিশ-টমি, অস্ট্রেলিয়ান, কানাডিয়ান সব সোলজার। এখন রাতে চলা ফেরা করাই মুশকিল। ট্রাম বাসও বেশি রাত অবধি চলে না। ব্ল্যাক-আউট। এ আর পি-দের অত্যাচার। এ আর পি মানে এয়ার রেইড-এর রক্ষক। সাইরেন বাজলে যা না ভয় পায় মানুষে, এ অর পি-দের বাঁশির পিঁপিঁ আর বুটের খচমচ আর মুখের চিৎকারে তার চেয়ে অনেকই বেশি ভয় পায়।

গরম গরম লুচি বেগুনভাজা আর উত্তর কলকাতার স্বাদু সন্দেশ দিয়ে যখন জলখাবার সারছিল ঋভু তখন হৃষীকেশ এলেন। একতলায় সাইকেলের ঘণ্টা শুনল ঋভু। সাইকেল করেই এলেন কি?

তাই।

প্রফুল্ল জেঠু ও জেঠিমা বাবাকে ডেকে আদর করে বসালেন। খেতে দিলেন। রংপুরের অনেক স্মৃতির ও মানুষজনের কথা হলো ওঁদের মধ্যে। যেসব সম্বন্ধে ঋভু কিছুই জানে না। সে চুপ করে খেতে লাগল।

সেঁজুতি বলল, ফিসফিস করে, চলো ছাদে যাই।

ঋভুদের রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর একতলার ভাড়াবাড়িতে ছাও সোমবার থেকে যাবে। রংপুরের বাড়িতে ছিল। কলকাতার মানুষদের কাছে ছাদ ব্যাপারটা যে একটা ই ছোট্ট ভাড়া বাড়িটাতে থাকতে পুকুরেরই মতো তা ঋভুর জানা ছিল না। সেঁজুতির সঙ্গে ছাদে এসে দাঁড়া পেছনের দিকে। পৌঁছতে ছাদের কলকাতা সম্বন্ধে এই প্রথম একরকম ধারণা হলো ঋভুর। দক্ষিণ কলক গলি। সে গলিতে দুজন ছাড়া। সেখানকার ছাতে উঠলে এই রকম গায়ে-গা-ঠেকিয়ে জনতায় শামিল হওয়া একটি বারান্দা দিয়ে কখওই। গা শিরশির করে উঠল ওর। লা। তার পাশে য যায় জলে।

বীর

সেঁজুতি বলল, ভালো না?

দারুণ।

তুমি বহরমপুরে যাওনি কখনও?

না।

যাবে?

হ্যাঁ।

আমাদের বাড়ি এসো। মস্ত ছাদ আছে। মামার বাড়ি। আমি মামার বাড়িতে থাকি। আমার মা বাবা বেঁচে নেই। মামিমারা আমাকে খুব ভালোবাসে। বলে, আহা! মা-বাবা-মরা মেয়ে! খরগোশ আছে সেখানে। ধানের গোলা। ঘাটবাঁধানো পুকুর। গোয়ালঘর। কার্তিকমাসের আকাশপ্রদীপ। মেঠো-ইঁদুর, সাদা সাদা; নরম। গায়ে তাদের চালের গন্ধ, যাবে?

যাব।

কথা দিচ্ছ তো?

হুঁ।

না এলে খারাপ হবে। কক্‌খনো কথা বলব না আর।

যাব।

যখনই ডাকব?

হ্যাঁ?

দেখব।

দেখো।

সেঁজুতি আবারও ঋভুর মাথায় এক উড়নচাঁটি মেরে দিল। বলল, চল এবারে। যেতে হবে না?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সেঁজুতি বলল, তুমি তো আমাকে যেতে বললে না? তোমাদের বাড়িতে। তোমার সহবৎ নেই।

ঋভু ভাবল, কলকাতার শ্রীহীন ছোট্ট বাড়িতে যেতে বলবে না কাউকেই।

মুখ বলল, তুমি রংপুরে এসো।

সে তো মাসিদের বাড়িতেই যেতে পারি।

তাহলে তামাহাটে এসো। আমার বড়োপিসির বাড়ি।

তুমি যাবে যখন?

হ্যাঁ। আমি যখন যাব।

আচ্ছা আগে থাকতে জানিয়ো। ভেবে দেখব।

তুমি কী পড়ো?

তিন ক্লাস।

এখন স্কুল ছুটি?

না।

তবে?

তবে কি? পড়াশুনার জন্যে কি পড়াশুনা? স্কুলে না পড়লে বিয়ে হবে না তাই।

তোমার খুব বিয়ে করার ইচ্ছে বুঝি।

দুর দুর। বোগাস। আমার ইচ্ছা নেই। তবে সব মেয়েকেই অভিভাবকেরা একসময়ে ঘাড় থেকে ফেলে দিতে চান তো। মেয়েদের আসল ঘর তো শ্বশুর-ঘরই!

সেঁজুতির হাসতে হাসতে বলা কথার মধ্যে এক গভীর বিষণ্ণতা ছিল।

মন খারাপ হয়ে গেল ঋভুর।

বাবা বললেন, চললাম প্রফুল্লদা। চলি বউদি।

একদিন এমনি এসো হৃষি। তাপসীকে নিয়ে এসো।

আসব।

ঋভু জানে, বাবা কখনও আসবেন না। মাকে নিয়ে বাবা প্রায় কোথাওই যান না। মিছে কথা এটা। কথার কথা। যেতে পারেন না। বাবা নিজের নানারকম কাজ ও কর্মে ব্যস্ত থাকেন। মা নিজের কাজ নিয়ে। বাবার একটি শখও মায়ের শখ নয়। তাই ধীরে ধীরে দুজনের অবকাশের জীবনে ব্যবধান রচিত ক্রমশই হয়ে গেছে।

বড়ো হয়ে ওঠার পর ঋভু বুঝেছিল যে, সারা দিনে রাতে প্রাপ্তবয়স্করা যেসব কথা বলেন তার বেশির ভাগই এমন কথারই কথা। যা, না বললে এবং না শুনলে কারোও কোনো ক্ষতি বা বৃদ্ধি হতো না।

অরা চোখ বুজে বিছানাতে শুয়েছিল। ঋভু যখন বাবার সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ভাড়া বাড়িতে এসে পৌঁছোল।

ঋভু ডাকল, অরা।

অরা কোনো উত্তর দিল না।

গত দুদিন থেকে নাকি অরার জ্ঞান নেই। মানে, ঘোরের মধ্যে আছে। একেবারে অজ্ঞান যে তা নয়, মাঝে মাঝে জ্ঞান আসে। আবার চলে যায়। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের কুট্টি কাকু, ড. জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি বাবার বন্ধু; অরাকে দেখছেন। টাইফয়েড হয়েছে অরার। যমে-মানুষ টানাটানি চলছে। বাড়ি নিঝুম। পাড়ার লোকে দুবেলা খোঁজ নিচ্ছেন। ঋভুর কিছু করার নেই। তাপসী যা বলেন তাই করছে ঋভু আর বাকি সময়ে অরার কাছে বসে তার মুখ চেয়ে থাকছে। পিঠোপিঠি ভাই-বোন ওরা। ঝগড়া, খুনসুটি যেমন আছে, তেমন ভাবও কম নয়। অরার এমন ভয়ানক অসুখ করাতেই ঋভু বুঝতে পারছে যে, অরাকে ও খুব ভালোবাসে। মাকে ছেড়ে রংপুরে অল্প ক'দিন থাকার সময়ে যেমন বুঝতে পেরেছিল যে, মাকেও খুব ভালোবাসে।

কলকাতা এখন আমেরিকান, ব্রিটিশ, সাদা আর কালো সৈন্যে ভরে গেছে। বিরাট বিরাট ট্রাক ছুটে যায় গোঁ-গোঁ শব্দ করে। সন্ধের পর ঘরে-ঘরে আলো ঢেকে রাখতে হয়। আলো কোনোক্রমে বাইরে একটু গেলেই পিঁপিঁপিঁ করে বাঁশি বাজিয়ে এ আর পি-রা ছুটে আসে। অ্যারেস্ট করবে বলে ভয় দেখায়।

সারা শহর জুড়ে ভয়। নানারকমের ভয়। মেয়েরা সন্ধের পর পথে বেরোন না। পুরুষেরাও তেমন বিশেষ কাজ ছাড়া বেরোন না।

অরার অসুখের জন্যে ঋভু এ-সপ্তাহটা স্কুলে যাচ্ছে না। সোমবার থেকে যাবে। রংপুরের খোলামেলা বাড়ি, গাছগাছালি, আকাশ ও মাঠের পরে কলকাতার এই ছোট্ট ভাড়া বাড়িটাতে থাকতে দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। এ বাড়িটা রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপরেই যদিও কিন্তু পেছনের দিকে। পৌঁছতে হয় রাসবিহারী অ্যাভিন্যু থেকে একটি সামান্য দৈর্ঘের এক সরু গলি দিয়ে গলি। সে গলিতে দুজন মানুষের পাশাপাশি যেতে কষ্ট হয়। একতলায় তিনটি ঘর। ভেতরের দিকের একটি বারান্দা দিয়ে জোড়া। পেছনের দিকে একচিলতে বাগান। টিনের চালের বাথরুম। চৌব্বাচ্চাওয়ালা। তার পাশে কয়লা আর ঘুঁটে রাখার ঘর। তারও পাশে রান্নাঘর। বৃষ্টির দিনে রান্নাঘরের মেঝে ভেসে যায় জলে। হাঁড়িকুড়ি জলে ভাসে। বাগানটুকু নামেই বাগান।

সেজকাকু অনেকদিন আগে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর মোড়ের রথের মেলা থেকে একটি রক্তকরবীর গাছ এনে ঠিক বাগানের দরজার পাশে পুঁতেছিলেন। সেই গাছটি মস্ত বড়ো হয়েছে। একটু তুলসীমঞ্চ, হাসনুহানা একটি, এই। সেই বাগানের পাঁচিলের পেছনে মস্ত একটি মাঠ। সেই মাঠের চারধারেই বাড়ি। মাঠে ঢোকার রাস্তা একটি আছে ঘোষেদের প্রাসাদোপম বাড়ির উলটোদিক দিয়ে। সেই একটিই পথ। শীতকালে ভেড়াওয়ালারা অগণ্য ভেড়া নিয়ে এসে মিষ্টি রোদ্দুরে ভেড়ার লোম কাটে সেই মাঠে। গ্রীষ্মকালে ফুটবল ও শীতকালে ক্রিকেট খেলে চারপাশের বাড়ির ছোটো ছেলেরা। ঋভুও খেলে মাঝে মাঝে। ঘোর বর্ষাতে রাতভর বৃষ্টির পরে সেই মাঠ ভেসে যায় জলে। বড়ো বড়ো হলুদ ব্যাঙ ডাকে শয়ে শয়ে। ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করে। জলের উপরে ভেসে ভেসে। সে ব্যাঙগুলো সারা বছর কোথায় যে থাকে! অত বড়ো হয়েই বা ওঠে কি করে চোখের আড়ালে আড়ালে, বুঝতে পারে না ঋভু!

গ্রীষ্মের বিকেলে সেই মাঠের কোণের মস্ত মহানিম গাছটার পত্রশূন্য ডালেদের চারধারে ঘুরে ঘুরে ছোটো ছোটো চাতক পাখিরা চমকে চমকে উড়ে উড়ে ডাকে। কী বলে, কে জানে ওরা! মা একদিন বলেছিলেন :

ওরা বলে, "ফটিক জল! ফটিক জল!"

ঋভুর বাবা কাজের দিনে সকালে খাওয়া দাওয়ার পর পনেরো মিনিট শুয়ে বিশ্রাম করতেন। তারপর অফিসে যেতেন ট্রামে করে। সাইকেলেও যেতেন। তবে খুবই কম। এখন কলকাতার পথে ভিড় বেড়ে গেছে খুব। বিশেষ করে মিলিটারি ট্রাকের ভিড়। তারা যে দিনে-রাতে কত মানুষকে চাপা দিতো তার গোনাগুনতি নেই।

ঋভু যেদিন কলকাতায় এল তার পরদিনই নবনীপিসির বাবা চাপা পড়লেন রসারোড-রাসবিহারী অ্যাভিন্যুরই মোড়ে একটা বত্রিশ চাকার লরির নীচে। বুড়ো মানুষ, বেঁটেখাটো। কয়েৎবেল খেতে খুব ভালোবাসতেন। ছাতা-হাতে দাঁড়িয়েছিলেন ভরদুপুরে পথ পেরুবার জন্যে। ছাতাটা আটকে যায় লরির একটি হুকে। ছাতা উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে যেতেই নিজেই পড়ে যান চাকার নীচে। বত্রিশ চাকার ষোলো চাকা তখন তাঁকে পেরিয়ে গেছিল। আটটি চাকা গড়িয়ে যায় মাথাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে।

নবনীপিসির মা ছিলেন না। তাঁর শিশুকালেই গত হয়েছিলেন। নবনীপিসির ম্লান পাণ্ডুর রক্তশূন্য মুখটি এখনও পরিষ্কার মনে আছে ঋভুর। নরম মানুষ নবনীপিসির চাপাস্বরে বিলাপ দিনে রাতে ঋভুদের বাড়ি থেকে শোনা যেত। বেড়াল কাঁদত তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে। ভারি মন খারাপ লাগত ঋভুর। বুঝতে পারত ও সেই বয়সেই যে, সংসারে অনেক এবং অনেকরকম দুঃখ কষ্টই থাকে, অপরের দুঃখ কষ্ট; যা নিজেকে বড়ো বেদনার্ত, মথিত করে অথচ যে-সব কষ্ট লাঘব করার কোনোরকম ক্ষমতাই তার নিজের হাতে থাকে না। আর থাকে না বলেই, বড়ো অসহায় লাগে তখন নিজেকে।

শিশুকাল থেকে অন্যের দুঃখকে কেন যে চিরদিনই অমন নিজের করে নিত ঋভু তা ও জানে না কিন্তু সেই অভ্যাস আজও ছাড়তে পারেনি।

নবনীপিসির স্বামীর নামটি আজ আর মনে নেই কিন্তু মোটা-সোটা, ধুতি আর ফুলশার্ট পরা লাজুক মানুষটিকে আজও স্পষ্ট মনে আছে। কিছু মানুষকে দেখেই বোঝা যায় যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী এবং ভালো

মানুষ। নবনীপিসির স্বামীও সেরকম ছিলেন। লেখক এবং সাধক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেহারার সঙ্গে ওঁর চেহারার বেশ সাদৃশ্য ছিল।

পরবর্তী জীবনে জেনেছিলো ঋভু।

সাতাশ দিনের মাথায় জ্বর ছাড়ল অরার। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বাড়ির সবাই। দাদু দেখতে এলেন অরাকে। তাপসীর বাবা পশুপতি। শীর্ণ, মাঝারি মাপের মানুষ ছিলেন তিনি। তীক্ষ্ণ চোখ এবং নাক; মুখময় দাঁড়িগোঁফ। হেঁটে আসতেন হাজরা লেনের ভাড়া বাড়ি থেকে। খালি হাতে কখনও আসতেন না। ঋভু আর অরার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসতেনই। দাদু এসেছেন জানতে পারলে ঋভু আর অরা গান গাইতে গাইতে দরজা খুলত। যে কোনো গান। লাঠি আর থলে হাতে দাদু হাসতে হাসতে ভেতরে ঢুকতেন।

তাপসীর বাবা ছিলেন সাধক প্রকৃতির মানুষ। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার একমাত্র জামাতা, প্রথম জীবনে স্কুল শিক্ষক এবং পরবর্তী জীবনে অভ্রখনির মালিক হয়ে যথেষ্ট বিত্তবান হয়েছিলেন। কবি ভাবাপন্ন এবং কবি গায়ক বাদক জাগতিকার্থে "অপদার্থ" চার পুত্র নিয়ে জীবনে তাঁকে কম বেগ পেতে হয়নি। অভ্রর বিশ্ববাজারে হঠাৎ মন্দা পড়ায় রাজার ঐশ্বর্য থেকে প্রায় পথের ভিখারির অবস্থাতে নেমে এলেন তিনি। তার উপর শয্যাশায়ী স্ত্রীর দুরারোগ্য অসুখ। কিছুতেই মানসিক স্থৈর্য হারাননি। কারো প্রতি স্নেহেই বিন্দুমাত্র ঘাটতি পড়েনি চরম দুর্দশার দিনেও।

বড়ো ছেলেকে বিদেশ থেকে গোরু ও ষাঁড় আমদানি করে গিরিডিতে ডেয়ারি ফার্মের পত্তন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যে ছেলে "সুনির্মল বসু" হবেন, কবিতা লিখবেন, ছবি আঁকবেন, গান গাইবেন তাঁকে বলদ-গাভীরা আটকে রাখবে তা তাদের সাধ্য কী ছিল?

আজকের এই অর্থসবস্ব, অর্থ-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে অর্থকরী বিদ্যার প্রতি যে ঋভুর চারমামার মধ্যে তিনমামাই আকৃষ্ট হননি তা বুঝে ঋভুর খুব ভালো লাগে। তার মামারা নিপাট ভালোমানুষ ছিলেন। এবং শিশুলসুলভ। একটু প্রশংসাতেই গলে যেতেন। জীবন যতই দুঃখের হোক না কেন তাঁরা প্রত্যেকেই এক নির্মল আলোকোজ্জ্বল স্বপ্নলোকে বাস করতেন। "আবেগপ্রণ", "অপদার্থ", "এ জগতে অচল" হলেও, হয়ত নরাণাং মাতুলক্রমঃ বলেই মামাদের প্রতি ঋভুর এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল। বিশেষ করে বড়োমামা সুনির্মল এবং ছোটোমামা সুশীতলের প্রতি।

পৃথিবী যখন বড়োলোক ছেয়ে গেছে, চোর, জোচ্চোর, চোরা-চালানকারী, সর্বার্থে অসৎ অনেক মানুষই বড়োলোক। "বুদ্ধিজীবীদের" মধ্যেও তো বড়োলোক বিস্তর দেখা যায় আজকে কিন্তু বড়োমানুষ বা ভালো মানুষের বড়োই অভাব ঘটেছে। এই প্রেক্ষিতে ঋভুর মামাদের কথা ঋভু বিশেষ করেই মনে রেখেছে।

দিদিমাকে যতটুকু মনে পড়ে ঋভুর, সেই দিদিমা সুস্থ দিদিমা ছিলেন না। প্যারালিসিস্ হয়ে গেছিল তাঁর শরীর, সেরিব্রাল স্ট্রোকের পর। তখনকার দিনে চিকিৎসাশাস্ত্র এমন অগ্রসর হয়নি। অনেকখানিই ঈশ্বরের হাতে ছিল।

আগে দাদু-দিদিমা ও মামারা থাকতেন রাসবিহারী অ্যাভিন্যু আর রসা রোডের মোড়ের কাছেই একটি মস্তবড়ো ভাড়া বাড়িতে। তখন মায়ের সঙ্গে দিদিমার কাছে গেলেই সবসময়েই ঋভু দেখতো যে, দিদিমা বিছানাতে শুয়ে আছেন। কথা বলতেন, জড়িয়ে জড়িয়ে। সে-কথাই মায়েরাই বুঝতে পারতেন, ঋভু বুঝতে পারত না। ঋভুর বড়মামিমা খুব সেবা করতেন দিদিমার এবং ঋভুকে দুধ-ভাত খেতে দিতেন। মামাবাড়ির ভাইবোনেদের প্রাত্যহিক বৈকালিক খাওয়া ছিলো দুধ-ভাত। ওই রসারোডের বাড়িতেই দেহ রাখেন দিদিমা। মনোরমা দেবীর কন্যা ছিলেন তিনি। "মনোরমা জীবন চরিত" হয়তো অনেকেরই পড়া। দিদিমার মৃত্যুর পরে দাদু ও মামারা হাজরা লেনের ভাড়া বাড়িতে চলে আসেন।

ঋভুর বড়মাসিমার বাড়ি ছিল ল্যান্সডাউন-রাসবিহারীর মোড়ের কাছের পার্কসাইড রোডে। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত চেহারা ছিল বড়মাসিমার। বড়মেসোমশাইকে দেখেনি ঋভু। দেখলেও মনে পড়ে না,

এতো শিশুকালে দেখেছিল। ওটি মেসোমশাইয়ের নিজের বাড়ি ছিল। দেশপ্রিয় পার্ক-এর কাছে। সে বাড়িতে গেলেই বড়মাসিমা আর দিদিদের আদরের বন্যা বয়ে যেত। যৌথ পরিবার ছিলেন ওঁরা। কত মানুষ যে থাকতেন সে বাড়িতে। বাড়িসুদ্ধ সকলেই আনন্দময়ী মার ভক্ত ছিলেন খুব। আনন্দময়ী মা কলকাতায় এলে বড়মাসিমাদের বাড়িতে আসতেনই। উঠতেনও কখনও কখনও।

পরে ওই বাড়িরই একতলায় ভাড়াটে হয়ে আসেন শিল্পী হেমেন মজুমদার। তাঁর আঁকা স্নান- সারা নারীদের বড়ো বড়ো তৈলচিত্রগুলি ঋভুর গায়ে শিরশিরানি তুলত। অসাধারণ শিল্পী ছিলেন উনি।

দিদিমা ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। মায়ের মুখে তাঁর কথা অনেক শুনেছে ঋভু। গিরিডির দিনের কথা। বারগাণ্ডা, খান্ডুলি পাহাড়, উশ্রী নদী, সিরসিয়া ঝিল। শুনেছে গিরিডির স্কুলের সুপণ্ডিত, রবীন্দ্রভক্ত, বাংলার মাস্টারমশাই হিমাংশুবাবুর কথা। হিমাংশু রায়। দুগ্ধফেননিভ শারদ রাতে বিজয়া-সম্মিলনীর কথাও।

ঋভু মাত্র একবারই গিরিডিতে গেছিল। বারগাণ্ডাতে মায়েদের বাড়ির কথা মনে আছে ওর অস্পষ্ট। এখন সে বাড়ির মালিক হয়ে গেছেন অন্যলোক। মায়ের দাদামশাই মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার উঁচু সিঁড়িওয়ালা বাড়ির কথাও মনে আছে।

তাপসীর কাছে গিরিডির স্মৃতিচারণই ছিল সবচেয়ে মনোরম এবং হর্ষদ পাস্টটাইম। একটু অবকাশ পেলেই তিনি স্বগতোক্তির মতো ছেলেমেয়েদের শোনাতেন সেই সব সুদিনের, সুখস্মৃতির কথা। ড. নীলরতন সরকারের বাড়ি, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রর বাড়ি, অমৃতনাথ মিত্রর, কমলদাস মজুমদারের, গগনচন্দ্র হোমের এবং আরও অনেকের বাড়ির কথা, সেই সব বাড়ির মানুষদের কথাও। হেমেন্দ্রমোহন বসুর বাড়ির নাম "রোজ-ভিলা"। বারগাণ্ডার দ্বারিকানাথ ঘোষের "ডোয়ারকিন-লজ", "পাহাড়ি কুটির", হরকুমার গুহর "আনন্দধাম"-এর কথাও বলতেন মা। মকৎপুরের রাস্তা, উশ্রী নদীর বালিতে বসন্তে ও গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নারাতের গানের গল্প এসবই ছিল তাপসীর প্রিয়তম স্মৃতি। অমৃতলাল ঘোষের প্রতিষ্ঠিত নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের কথাও উঠত বারবার। সমাজের উপাসনার কথা। তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের মানুষদের কথা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৃতী ছিলেন। গিরিডির দিনের সুস্পষ্ট ব্রাহ্মভাব প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুর উপরেও পড়েছিল। নীল মেঘপুঞ্জর মতো পরেশনাথ পাহাড়ের গল্পও করতেন তাপসী, দূরের গুঞ্জিয়াডিহির রাজার বাড়ির। মহেশমণ্ডা রেল-স্টেশন, যেখান থেকে বাড়ি থেকে পালিয়ে-যাওয়া প্রচণ্ড আবেগ-প্রবণ ছোটমামাকে একবার পাকড়াও করে ফিরিযে নিয়ে আসা হয়েছিল। লাল-মাটি, শাল্‌বনের অবিরাম রোম্যান্টিক গল্প শুনতে শুনতে ঋভুর শিশুমনের উপরও গিরিডির অজানিত গাঢ়ভাবে পড়ে গেছিলো।

ঋভুর ছোটোমাসী থাকতেন চেতলাতে। পরমহংসদেব রোডে। নিজস্ব বাড়ি ছিলো তাঁরও। ছোটোমাসির বাড়িতে গেলেও যত্ন আত্তির কম হতো না। উলটোদিকে ছিল 'জীবনের' দোকান। সেখান থেকে অফুরন্ত যোগান আসত যৌবনের উৎসাহের মতো, কচুরি, শিঙাড়া, রসগোল্লা এবং মণ্ডার। ভেজিটেবল ঘির চল তখনও হয়নি। যেমন স্বাদ ছিল সেই সব খাবারের, তেমনই গন্ধ।

ঋভুদের ভাড়া বাড়ির লাগোয়াই ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের পত্রিকা "জয়শ্রীর" অফিস। সৌম্য ও সুদর্শন অনিল রায় এবং তাঁর স্ত্রী লীলা রায় থাকতেনও তখন ওই বাড়িতেই। খদ্দর পরতেন তাঁরা। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শা নওয়াজ খান এসেছিলেন একবার সে বাড়িতে।

ঋভুদের বাড়িওয়ালারা ছিলেন দুই ভাই। বড়োজন ইংল্যান্ডের চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর ছোটোজন সলিসিটর। বড়োজনের স্ত্রী ছিলেন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বিমল মিত্র মশায়ের সহোদরা আর ছোটোজনের স্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক দেবকী বসুর কন্যা। ওঁদের দুই অবিবাহিত ননদও ছিলেন। ঋভুর বাবু পিসি আর দখনি পিসি। দেখতে তাঁরা যে খুব সুশ্রী ছিলেন এমন নন তবে মানুষ বড়ো ভালো ছিলেন। আর তেমনই ওঁদের মা-ও।

বাড়ি ভাড়ার টাকা প্রতি মাসে ঋভুই দিয়ে আসত বাবুপিসি বা দখনি পিসির হাতে, তাপসীর নির্দেশে। ঋভু যখন যেত তখন বাবুপিসি আর দখনিপিসি অনেক গল্প করতেন ওর সঙ্গে। কেন জানে না, রংপুরের চিনুকাকু আর কলকাতার ছোটোমামারই মতো ওঁরাও ঋভুকে ডাকতেন "গাড্‌লু" বলে।

কলকাতা শহর তখনও এরকম কসমোপলিটান হয়ে যায়নি। "ভারতবর্ষ" দেশটার বৈচিত্র্য ও মানুষদের বিভিন্নতা সম্বন্ধে কলকাতাবাসীদের তেমন স্পষ্ট ধারণাও ছিল না। নবনী পিসিদের বাড়িতে এক পাঞ্জাবি মুসলমান দম্পতি ভাড়া এলেন। তাঁদের রূপ দেখে তো পাড়াসুদ্ধ লোকে অজ্ঞান।

নবনীপিসি বললেন, জানিস্‌রে গাডলু! ওরা বাঙালি নয়; মোচলমান।

বাঙালিরাও মুসলমান হতে যে কোনো অসুবিধে নেই এবং বাঙালিতে বাঙালিতে কোনো পার্থক্য নেই তাও তখনকার কলকাতার আদি-বাসিন্দারা অনেকেই জানতেন না। আজকেও অনেকে জানেন না। কলকাতার বাঙালির মতো কূপমণ্ডুক প্রজাতি আর বোধহয় সত্যিই বেশি নেই এই বিশ্বে। সেই পাঞ্জাবিদম্পতির পোশাক-আশাক, তাদের খাওয়া-দাওয়া, তাদের বুলি এ সবই পাড়ার তাবৎ মহিলাদের কাছে প্রচণ্ড ঔৎসুক্যর কারণ হয়ে উঠেছিল।

'বেহার' জায়গাটা অবশ্য পেট-রোগা বাঙালির কাছে স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিরুপায় কারণে চেনা ছিল। তাও দক্ষিণ বিহার। হয়তো চেনা ছিল বেনারস; এমনকি চুনারও। কিন্তু কলকাতাবাসী, গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির পৃথিবী বিস্তৃত ছিল ওই অবধিই। তার উত্তরে বা পশ্চিমে যাদেরই বাস ছিল তাঁরাই সাধারণ বাঙালির কাছে "আপ-কান্ট্রির" লোক বলে পরিচিত ছিলেন।

কলকাতাবাসী চিরদিনই নিজ-বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে অতি সচেতন এবং চিরদিনই তা নিয়ে শ্লাঘাতে বেঁকে থাকতেন। আজও আছেন। তাই কলকাতার তিনশো বছর পূর্তির কারণে গর্ব ও উৎসবের দোষ নেই অথচ ওড়িশার কটক শহরের বয়স যে হাজার আর গুয়াহাটির দু হাজার সে খবর রাখার প্রয়োজনও কখনওই হয়নি এই আত্মমগ্ন জাতির।

ঋভুদের ভিতরের বারান্দার পরে একটি ছোট্ট উঠোনমতো ছিল। তারপরেই বাড়িওয়ালা চ্যাটার্জিদের দেওয়াল। তারই ওপাশে আরেক ভাড়াটের স্নানঘর ছিল। সেখান একা থাকতেন জগুবাবু। অবিবাহিত। তিনি যে কী করতেন তা ঋভু জানত না। কারণ ঋভুদের বাড়ির কারো সঙ্গেই তাঁর আলাপ ছিল না। মেলামেশাও নয়। ঋভুরা "বাঙাল" বলে অনেকেই তাদের একটু খাটো চোখে দেখতেন।

চান করতে করতে জগুবাবু যখন গান গাইতেন তখন মুগ্ধবিস্ময়ে ঋভু চুপ করে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থাকত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওপর দখল ছিল জগুদার। জীবিকা হিসেবে উনি যে কী করতেন তাও ঋভু জানত না। হয়তো গানই শেখাতেন। জগুবাবুর গান শুনে ঋভু যখন চন্দ্রাহতর মতো দাঁড়িয়ে থাকত তখন ভোপালকাকু ঋভুকে দেখতে পেলেই তাড়া লাগাতেন। কারণ, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত বা রাগাশ্রিত গান ছোটোকাকুর (ভোপাল) আদৌ ভালো লাগত না। রেডিয়োতে কখনও উচ্চাঙ্গসঙ্গীত হলেই ছোটোকাকু মাকে বলতেন, বন্ধ করুন! বন্ধ করুন বউদি! কেন যে কুকুরের কান্না শোনে লোকে!

ঋভুদের বাড়িতে আগে রেডিয়ো ছিল না। অরা ভালো হয়ে ওঠার পর অনেক দিনই অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং তাকে বাড়িতে থাকতে হবে বলে হৃষীকেশ রেডিয়ো কিনে আনলেন একটি। সে দিনটি ছিল বড়োই উত্তেজনার দিন। সেদিনই সকালে সামনের বাড়ির সমবয়সী মেয়ে দীপালির সঙ্গে ঝগড়া হওয়াতে ঋভু বলেছিল, তোকে আমাদের রেডিয়ো শুনতে দেব না। দেখিস।

দীপালি হেসে বলেছিল, গাধা কোথাকার! তোদের বাড়ি রেডিয়ো বাজলে আমি তো আমাদের ঘরে বসেই শুনতে পাব।

কথাটা ঠিক। ঋভু নিজের বোকামি বুঝতে পেরেছিল। সারাজীবনেই বারবার বুঝেছে ওই কথাটা পরে। মানে, নিজে যে গাধা; সেই কথাটা। রেডিয়ো যখন ছিল না সেই সব দিনে মাঠের ওপ্রান্তের বাড়ি থেকে রেডিয়ো বাজত যখন, তখন জানালার তাকে বসে গান শুনত ঋভু। "হারা-মরা নদী শ্রান্ত দিনের পাখি।" কার গান? কাননবালার? মহালয়ার ভোরেও ওরা পরের বাড়ির রেডিয়োই শুনত। সেইসব দিনে কলকাতা শহরে অনেক শান্তি ছিল। অনেক নিস্তব্ধ ছিল সব পাড়া। শুয়োরের মতো সংখ্যায় বাড়েনি মানুষ। দৈত্যকায় ডিজেল বাস আর মিনিবাস ছিল না। এক বাড়িতে রেডিয়ো বাজলে তখন দশ বাড়ি থেকে তা আরামে শোনা যেত। এমনি করে করেই বোধহয় আপন-পরের দেওয়াল ঋভুর ভেতরে গড়ে ওঠার অবকাশই পায়নি।

পায়নি যে, এ জন্যে ঈশ্বরের কাছে খুব কৃতজ্ঞ বোধ করে ও।

ঋভুদের ভাড়া বাড়িতে দুজন কাজের লোক ছিল। একজনের নাম রত্না। তার বাড়ি ছিল ওড়িশার ঢেন্‌কানলে। আর অন্যজনের নাম ক্রুষ্ণ। তার বাড়ি ছিল ওড়িশার অংগুল সাব-ডিভিশনের কোনো গ্রামে। ক্রুষ্ণ অথবা কৃষ্ণ অথবা সমীকরণ করে দাঁড়ানো "কেষ্ট" রান্না করত। চোখে দেখত না ভালো তাই কখনও সখনও সে আলুভাজার সঙ্গে তেলাপোকাও ভেজে দিত।

কেষ্ট ঋভুদের বাড়ি প্রায় তিরিশ বছর কাজ করেছিল তারপর হৃষিকেশের রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে একদিন সে দেহ রাখে। কৃশ কৃষ্ণ দুটি হাতকে তার পায়ের সঙ্গে হাঁটুর কাছে বেড় দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় বেঁধে নিয়ে বসে বসেই ঘুমতো দু চোখ বন্ধ করে। ওকে তখন কেউ চমকে দিলে রেগে যেত খুব। বলত, জগন্নাথের নাম করছি। এমনি করে ঠাকুরের নাম করতে করতেই রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়ির ছাদে এক উথাল-পাথাল হাওয়া-বওয়া চৈত্রের সন্ধেতে কেষ্ট অমৃতধামে চলে গেছিল।

রত্নার মুখের গুন্ডি-পানের গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে ঋভুর। ঋভু ঘুমোত রত্না ছোটোকাকু এবং অন্যদের সঙ্গে বাইরের ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে। রত্না ঋভুর প্রায় সবসময়ের সঙ্গী ছিল। তাই হৃষীকেশ যেদিন রত্নাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং রত্না এককাপড়ে চলেও গেছিল (অবশ্য রত্নাদের কারোই প্রায় দ্বিতীয় বস্ত্র থাকত না, শীতেও যা গরম কাপড় পেত তাও দেশেই রেখে পরের বছর প্রায় বিনাবস্ত্রে দেশ থেকে ফিরে আসত) সেদিন ঋভু খুবই দুঃখ পেয়েছিল।

রত্নাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন হৃষীকেশ রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ভাড়া বাড়িতে থাকাকালীনই। এবং সেই দুঃখের বোঝা বয়েছিল ঋভু ততদিন, যতদিন না সে বুঝতে পেরেছিল যে, কিছু কিছু সিদ্ধান্ত আপাত-দুঃখের হলেও বৃহত্তর কারণে যা প্রত্যেক মানুষকেই নিতে হয়ত হয়ই! হৃষীকেশের সেই রূঢ় সিদ্ধান্তে দোষ ছিল না কোনোই।

ঋভুদের ভাড়াবাড়ির সামনের গলি বেয়ে এসে যেখানে রাসবিহারীর মোড় সেখানে একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান ছিল। ডাক্তারবাবু ছিলেন ভারি ভালোমানুষ। ফরসা, মোটাসোটা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। গরমে আদ্দির পাঞ্জাবি আর শীতে গরম, এক-রঙা কাপড়ের। শীতকালে পাকা ডুমুরের রঙের আলোয়ান জড়াতেন পাঞ্জাবির উপরে। তাঁর নাম ভুলে গেছে ঋভু। ঋভুর শৈশব জীবনের মস্ত বড়ো বিনোদন ছিল সেই ডাক্তারখানার রকে বসে রাসবিহারী অ্যাভিন্যু দিয়ে বয়ে-যাওয়া জীবনের ছবি দেখা।

কোনো উত্তেজনাকর ব্যাপার থাকলে ডাক্তারখানার পাশেই গলির মোড়ে যে মোটা পিলারটি ছিল তার উপরে উঠে বসে থাকত ঋভু "বেটার ভিউ"-এর জন্যে। তাপসী জানতে পেলেই বকতেন। বলতেন, ছিঃ! এরকম অসভ্যতা কোরো না।

দীপালি বলত, তুই একটা ছোটোলোক।

বাবা শুনলে বলতেন ভদ্রলোক ছোটোলোক বলে কোনো কথা নেই। সব মানুষই এক।

ডাক্তারখানার দু-একটি দোকানের পরই ছিল একটি বইয়ের দোকান। নামটি আজ এতদিন পরে আর মনে নেই। সম্ভবত "গ্রন্থালয়" বা "গ্রন্থনিলয়" ওরকম কিছু ছিল। সেই দোকানে যিনি বসতেন তাঁর নামও আজ মনে নেই। কিন্তু তিনি দয়া করে ঋভুকে বই নিয়ে যেতে দিতেন বাড়িতে। মলাট লাগিয়ে, পড়ে, ফেরত দেওয়ার জন্যে। ঋভুর কবি-বড়োমামা সুনির্মল বসুর অনুরোধেই ঋভু এই সুবিধাটুকু পেত। এবং অনেক কারণের সঙ্গে এই কারণেও বড়োমামার কাছে ঋভু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছে আজও। সেই বইয়ের দোকানির কৃপাতেই ঋভু গল্পের বই পড়তে পেত। তবে সে দোকানে দামি বই বা ক্লাসিকস্ বলতে যা বোঝায় সেরকম বই বা ইংরিজি কোনো বইই ছিল না। তবু, ও যাই পেত তাই গোগ্রাসে গিলত। তখন তো ঋভুরা বড়োলোক ছিল না! তবে অনেক গরিবের বাড়িতে পেটের ভাতের সঙ্গে চিরদিনই মনের ভাতেরও জোগান ছিল। কিন্তু ঋভুদের বাড়িতে ছিল না। অল্প কয়েকবছর পরই ঋভুর বাবা যখন চাকরি ছেড়ে স্বাধীন পেশায় নামেন এবং বড়োলোক হয়ে ওঠেন আস্তে আস্তে, তখনও ঋভুদের বাড়িতে বই বা রেকর্ড বা ছবির আমদানি বিশেষ ছিল না। মায়ের তো

কোনোই নিজস্ব রোজগার ছিল না। "হাত-খরচ" বলেও আলাদা করে মাকে বাবা কিছু দিতেন না। দিলে হয়ত মা বই ও রেকর্ড ইত্যাদি কিনতেন। শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের একেবারে প্রথম দিকেও প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও ঋভুর বই পড়ার বা গান শোনার বা ছবি আঁকার আকাঙ্ক্ষা পূরিত যে হয়নি একথা শ্রুতিকটু হলেও সত্যি। দারিদ্র্যের কারণে কোনোরকম লজ্জা বা হীনমন্যতা কারোই থাকা উচিত নয়। কিন্তু অশিক্ষা বা অবিদ্যা বা সুরুচিহীনতার কারণে, ঋভুর মনে হয়, প্রত্যেক মানুষেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। সেই সময়ের, এই বাবদের ঘাটতি, পরবর্তী কালের সারা জীবনের প্রাপ্তি দিয়েও পূরিত হয় না।

হয়ত ঋভুর জীবনেও হয়নি।

দেশপ্রিয় পার্কের সামনে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপরে ছিল তীর্থপতি ইনস্টিট্যুশন। নিন্দুকেরা বলতেন : "যার নেই কোনো গতি, সে যায় তীর্থপতি"। ঋভু ছিল সেই স্কুলেরই ছাত্র। নিচু ক্লাসের মাইনে ছিল তিনটাকা। পড়াশুনো যে সে স্কুলে তেমন একটা হতো তা নয় কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের সে সময়ে তীর্থপতি, কালিধন, জগবন্ধু, সত্যভামা, কমলা গার্লস' স্কুল, লেক গার্লস' স্কুল, মুরলীধর গার্লস' স্কুল, ইত্যাদিতে পড়াশুনা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল এবং মিত্র ইনস্টিট্যুশন ভালো স্কুল ছিল। এই সবগুলিই ছিল বাংলা-মিডিয়াম স্কুল।

সেই সময়ে বাংলা-মিডিয়াম স্কুলে পড়াটা বাঙালিদের কাছে 'ঘৃণার" অথবা "লজ্জার" ব্যাপার বলে গণ্য হতো না। বাঙালি নিজেদের বাঙালিত্ব নিয়ে লজ্জাকরভাবে লজ্জিত ছিল না তখনও। ব্যাঙের ছাতার মতো প্রকৃত-শিক্ষার গন্ধ-বিবর্জিত, মূল্যবোধহীন, ন্যায়নীতিবোধ-বিসর্জিত ইংরিজি-মিডিয়াম স্কুল তখনও গজিয়ে ওঠেনি পাড়ায় পাড়ায়। ইংরিজি জানা বা বলা, আর "শিক্ষা" সমার্থক ছিল না সেই সব দিনে।

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট, মিত্র ইনস্টিট্যুশন অথবা তীর্থপতি, জগবন্ধু, কালিধনের ছেলেরাই পরবর্তী কালে সেন্ট জেভিয়ার্স', লা-মার্টস'-এর অনেক ছেলেদেরই জীবনের পরীক্ষাতে অনেকই পেছনে ফেলে এগিয়ে যেত। এবং যেত যে, এই কথাটা জেনে সবচেয়ে চমৎকৃত হতো সেই সব "বাজে" স্কুলের "বাজে" ছেলেরা নিজেরাই।

হেঁটে যেত, হেঁটে আসত স্কুল থেকে ঋভু। কোনো-কোনো দিন, বাড়ি থেকে বেরোতে খুবই দেরি হয়ে গেলে ট্রামে চড়েও যেত। বিনাটিকিটে ট্রামে চড়াটা যে বে-আইনি এবং অন্যায় সে কথা জানতো ও। কিন্তু ট্রামে চড়ে যাওয়ার পয়সা ছিল না তার। সেকেন্ড ক্লাসে চড়ার পয়সাও নয়। যে-ক্লাসের কনডাক্টর ভেতর দিকে থাকতেন সেই ক্লাসের ফুটবোর্ডে উঠে পড়ত ঋভু এবং কনডাক্টর ফুটবোর্ডের কাছাকাছি এলেই নেমে পড়ে দৌড়ে অন্য ক্লাসে চলে যেত পরের স্টপেজে ট্রাম দাঁড়ালেই।

ততক্ষণে সেই ক্লাসের কনডাক্টর অনেকই ভিতরে চলে গেছেন।

নিরুপায় মানুষ যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক অন্যায় এবং ছলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় সে কথা ওই বয়সেই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ও জেনেছিল। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার যে নিশ্চয়ই আপেক্ষিক

তাও বুঝেছিল। অসহায়, অসচ্ছল কিন্তু সচেষ্ট মানুষদের প্রতি এক গভীর সহানুভূতি তাই শিকড় গেড়েছিল ঋভুর সুকুমার মনে।

বাড়ি থেকে টিফিন বাবদ পেতো দুটি পয়সা কিন্তু ওর ক্লাসের ছেলেদের গড়পড়তা আর্থিক অবস্থার তুলনাতে ঋভুদের অবস্থাও ছিল সচ্ছল। ক্লাসের অনেক ছেলেই না-খেয়ে স্কুলে আসত। ছেঁড়া জামা পরে। খালি পায়ে। তাদের মা-বাবারা ওই তিনটাকা মাইনেও না দিতে পারায় এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফিস জমা করতে না পারাতে প্রতিবছরই বহু ছেলে পড়াশুনো ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো।

আজকের দিনেও হয়তো তেমন দুঃখী ছেলেদের অভাব নেই। ঋভুর স্মৃতিতে সেই সব মেধাবী, উৎসুক, জিগীষা-সম্পন্ন উজ্জ্বল সহপাঠীদের ঝকঝকে কিন্তু অসহায় চোখগুলি আজও জ্বলজ্বল করে। তারা যেন সারে সারে ঋভুর পথের দুপাশে নির্বাক চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঋভু বোঝে যে, যারা জীবনে সফল হয় তাদের সংখ্যা, যারা সফল হয়নি তাদের সংখ্যার তুলনাতে চিরদিনই নগণ্য ছিল। যারা সফল হয়নি তাদের মধ্যে অযোগ্য জনের চেয়েও অনেক বেশি সংখ্যায় আছেন সুযোগহীনেরা। প্রত্যেক মানুষের যে বেঁচে থাকার, বিদ্যার্জনের এবং চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ অবশ্যই থাকা উচিত তা সে তীব্রভাবে অনুভব করত। আজ পরিণত বয়সে এসেও আরও তীব্রভাবে করে।

রাজনীতিকদের বুকনি এবং একাধিক ইজমের জ্বালাময়ী বক্তৃতা যে স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষের বাসিন্দাদের মূল এবং আদি প্রয়োজন-পূরণের ক্ষেত্রে কিছুমাত্র তফাৎও রচনা করতে পারেনি তা জেনে একজন ভারতীয় হিসেবে গভীর লজ্জা বোধ করে এই পরিণত বয়স্ক ঋভু। এ দেশীয় রাজনীতিকেরাই বোধহয় এই দেশটির সম্পূর্ণ সর্বনাশ সম্পাদন করবেন তাঁদের সমবেত চেষ্টায়!

টিফিনের দুপয়সা দিয়ে টিফিনের সময়ে আলুকাবলি বা ফুচকা বা ঘুগনি কিনে বা তার অভুক্ত-থাকা এবং এক পয়সাও সঙ্গে আনতে না-পারা বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়ে ও গভীর তৃপ্তি পেতো। তব ঋভুর সব সহপাঠীই যে গরিব ছিল এমন নয়। কেউ কেউ গাড়ি চড়েও আসত। কেউ বা ভোজপুরী দারোয়ানের সঙ্গে।

টিফিনের সময়ে কারো কারো বাড়ি থেকে আয়া বা চাকর হটকেস ও থার্মোস-এ করে খাবার ও পানীয় এনে চড়াই পাখির ছানার মতো পুতুপুতু করে তাদের খাইয়ে যেত। ঋভুরা যখন বাড়িতে-কাচা অতি-সাধারণ পোশাকে স্কুলে আসত সেই সব বড়লোক সহপাঠীরা আসত ইস্ত্রিকরা জামাকাপড় পরে। কেউ কেউ একেকদিন একেকটি গাড়ি চড়ে আসত। এই ব্যাপারটা, মানে একই ক্লাসের ছাত্রদের পোশাকআশাক টিফিন ইত্যাদির ব্যাপারে যে পার্থক্য তা নিয়ে সচ্ছল ছাত্রদের বা তাদের অভিভাবকদের অথবা স্কুল কর্তৃপক্ষর কারোর কোনো লজ্জা বা মাথাব্যথাই ছিল না। বরং স্কুলের অধিকাংশ মাস্টারমশাইরা বড়োলোকদের ছেলেদেরই তোয়াজ করতেন।

শিক্ষিত মানুষমাত্ররই যে আত্মসম্মান ও শুভাশুভ জ্ঞান থাকবেই এ কথাটা প্রত্যাশা করাটা যে ভুল তা অল্পবয়স থেকেই মেনে নিয়েছিল ঋভু। বরং এই বুলি-সর্বস্ব, ইজম-সর্বস্ব বড়োলোক-চাটা আর তেলামাথায় তেল দেওয়াদের দেশে এমনটি হওয়াই যে স্বাভাবিক তা যেন বুঝে ফেলেছিল ঋভু ওই স্বল্পবয়সেই।

মাস্টারমশাইরা গড়পড়তা ছাত্রদের থেকে কিছু বড়োলোক ছিলেন না। প্রাইভেট টিউশানে ক্লান্ত-শ্রান্ত তাঁদের শিরদাঁড়া আর কণ্ঠার হাড়-জাগানো শরীর আর কোটরগত চোখগুলির দিকে তাকিয়ে তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষার মতো উচ্চমার্গের কোনো ব্যাপার প্রত্যাশা করতেও খারাপ লাগত। তবু, ছাত্রদেরই মতো শিক্ষকদের মধ্যেও অবস্থার ও মানসিকতার তারতম্য ছিল। বড়োলোকের ছেলেদের প্রাইভেট টিউশান দিয়ে, পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দিয়ে, খাতায় বেশি নাম্বার দিয়ে দিয়ে কিছু শিক্ষক সেই সব ছাত্রদের ফার্স্ট-সেকেন্ড করাবার চেষ্টাও যেমন করতেন, তেমন ম্যাট্রিকুলেশনের চৌকাঠ অবধিও অনেক খারাপ ছাত্রকে পৌঁছে দিতেন নিজেদের অক্লান্ত ও স্বার্থহীন পরিশ্রমে অন্যরা।

কিছু অশ্বেতর ছাত্রকে বৈতরণী পার করানো অবশ্য তাঁদের সাধ্যাতীত ছিল। তবে সুখের কথা এই যে, ঋভুদের ছেলেবেলায় শিক্ষাজগতের দুর্নীতি ওইরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্কুলের গন্ডিতেই বোধহয় সীমাবদ্ধ ছিল। আজকের মতো তা উচ্চতম পর্যায়েরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে গিয়ে পৌঁছয়নি। সেই যুগে লজ্জাহীন মানুষদেরও লজ্জার ছিঁটেফোঁটা অবশিষ্ট ছিল। সমস্ত বাঙালি জাতিটিই এমন গন্ডারের মতো মোটা গাত্র-চর্মপরিহিত রোমহীন অক্ষিপল্লবের গা-ঘিনঘিনে জীবের সমষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়নি।

মাস্টারমশাইদের প্রায় কারো নামই আজ ঋভুর মনে নেই। বাংলা মিডিয়াম স্কুলে "অঙ্ক-স্যার", "হিস্ট্রি-স্যার", "ইংরিজি-স্যার" এই রকম নামেই পরিচিত থাকতেন মাস্টারমশাইরা। কেউ কেউ বা "অমুক বাবু", "তমুক বাবু" বলে। হেডস্যার ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। অমূল্যবাবু ছিলেন অঙ্কের মাস্টার। নিচু ক্লাসে পাকড়াশিবাবু আর অমূল্যবাবু বিচিত্র বীভৎস প্রক্রিয়ায় ছাত্রদের নাক কান হাতের আঙুল ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর উপরে প্রচণ্ড অত্যাচার চালাতেন। কোনো বিদেশি সেনাবাহিনীর ইন্টারোগেশান উইং থেকে তাঁরা শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন কিনা ঋভু জানে না। সেই অত্যাচারের সঙ্গে অযোগ্যতার কোনো সাযুজ্য যে সবসময়ই থাকত এমনও নয়। বোধ হয় দুর্ভাগ্য অসচ্ছল মাস্টার-মশাইদের নানাবিধ হতাশাই স্ফুরিত হতো এরকম বিকৃত ব্যবহারে। আজকে বহু বছর পিছনে ফিরে চেয়ে প্রায় ধূসর হয়ে-যাওয়া ছেলেবেলার স্মৃতির দিগন্তে যখন শুভঙ্করীর আর্যার অথবা কোনো গোত্রহীন বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশে ওঠার গভীর এবং অপ্রয়োজনীয় চক্রান্তর অঙ্ক অথবা কোনো অ-দেখা চৌবাচ্চার অফুরান জল কোনও অদৃশ্য অবাস্তব ছিদ্র দিয়ে অবিরত শূন্য হওয়ার কষ্ট-কল্পনার অঙ্ক এবং তা নির্ভুলভাবে না করতে পারার কারণে যে বাস্তব শাস্তি ঋভুদের পেতে হতো তার আদৌ কোনো যুক্তি ছিল বলে ঋভুর মনে হয় না।

এই সব বাংলা স্কুলগুলির অধিকাংশরই ছাত্রদের দেবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। দোষটা অবশ্য স্কুলের নয়। মাস্টারমশাইদের হাস্যকর এবং লজ্জাকর মাইনে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্যতার মান, বই, লাইব্রেরি, স্নেহ-মমতার অভাব, ছাত্রর পারিবারিক পরিবেশের বা মনের খবর আদৌ না-রাখা, এইসবই ছিল এই অ-ফলপ্রসূতার প্রধানতম কারণ। সরকারি অর্থ বা স্কুলের মালিকদের জোগান দেওয়ার অর্থর পরিমাণও ছিল সামান্য। তাও মফঃস্বল শহরে শহরে রাজা মহারাজা জমিদারেরা কিছু ভালো ভালো স্কুল কলেজ চালিয়ে যেতেন সেই সময়। কলকাতায় ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে সব স্কুল ছিলো এবং মফঃস্বলের জেলা স্কুলগুলি, সেগুলিতে বেশ ভালো পড়াশোনা হতো। স্বাধীনতার পরে সেই সব স্কুলের হালও ক্রমে ক্রমে শোচনীয় হয়ে উঠেছে। রাজনীতিই এখন বঙ্গভূমের পিরানহা মাছ। কাজ করার কোনই দরকার নেই কারোর, শুধুই রাজনীতি করো। অচিরেই যে এই জাত নিজেদেরই খেয়ে তাদের সরকারি অস্থি ফেলে রেখে চলে যাবে সে বিষয়ে ঋভু প্রায় নিঃসংশয়। এই অবিসংবাদী সর্বনাশ থেকে ফেরার রাস্তা আর খোলা আছে বলেও মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার এখন যেখানেই হাত দেন সেখানেই উই ধরে। পিঁজরাপোলে আর সরকারি স্কুলে আর কবরখানায় আর হাসপাতালে আজকাল তফাত নেই কোনো। তা, সে সরকারের রঙ যাই হোক না কেন। এই "স্বাধীন হওয়া" দেশের গিনিপিগদের আমার সাধারণ মানুষদের নিয়ে যে নিষ্ঠুর নির্লজ্জ খেলা চলেছে স্বাধীনতার পর দিন থেকে যুগের পর যুগ ধরে, তা একমাত্র গিনিপিগদের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব। তবে দুঃখের বিষয় এই যে দেশবাসীও গিনিপিগদেরই মতো নিজেদের ছোটো ছোটো ঘরে, ছোটো ছোটো সুখকে, খুদে খুদে দাঁতে কুরে খেয়ে, গিনিপিগদেরই মতো নিরন্তর বংশবৃদ্ধি করে; অতি সুখেই দিন কাটাচ্ছেন। তাঁরা এখনও জানেন না যে, এই সুখ, আয়নার একটি পিঠ। অন্য পিঠের পারা অতি দ্রুত খসে যাচ্ছে। পুরোপুরিই খসে যাবে আর কিছুদিনের মধ্যেই। কী করে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বা নাতি-পুতিদের কাছে তাঁরা মুখ দেখাবেন তা বোধহয় তাঁরা ভাবেনও না।

ঋভুর সহপাঠীদের মধ্যেও নানারকম সহপাঠী ছিল ছিলেন যেমন মাস্টারমশাইদের মধ্যে। "হুলো" বলে একটি ছেলে ছিল, ঋভুদের ক্লাসে, তার নাম ও পদবি আজ আর মনে পড়ে না। সে বয়সে ঋভুদের চেয়ে পাঁচ-সাত বছরের বড় ছিল। খাটো হাফ প্যান্ট, লম্বা শার্ট এবং চটি পরত। নস্যি নিত।

হুলো নাকি রেগুলার রেস-এ যেতো এবং আরও নানা কুজায়গায়। হুলো ছিল ক্লাসের ছেলেদের "বিগ ব্রাদার", "লোকাল গার্জেন।"

কখনও মিলিটারি সার্জেন্ট কোনো দশাসই অ্যামেরিকান সোলজারকে তাদের জীপে ধাওয়া করে রাসবিহারী অ্যাভিন্যু দিয়ে নিয়ে যেতো এবং মিলিটারি পুলিশের হাতের নির্মম-ঠ্যাঙানির হাত থেকে বাঁচতে, সৈন্যদের কেউ কেউ তীর্থপতি স্কুলের একতলার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ত। যখন পড়ত তখন আতঙ্কে ঋভুদের মুখ শুকিয়ে যেত তো বটেই, মাস্টারমশাইদেরও যেত।

কিন্তু হুলোই সেই সময়ে এগিয়ে এসে নিজস্ব ইংরিজিতে সেই সব মারাত্মক মুহূর্তের সামাল দিত। হুলোর ইংরিজি শুনে যে-কোনো ইংরেজ বা অ্যামেরিকান বৃহস্পতি বা শুক্র গ্রহর মানুষই কথা বলছে ভাবতে পারত। কারণ ইংরিজি ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে হুলোর উচ্চারণের কোনোরকম মিলই ছিল না। স্কুলের দারোয়ানেরা কাঁচুমাঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত একপাশে আর হুলো তখন কোনোক্রমে ওই যমদূতদের ঠেকিয়ে রাখত।

সে কারণে হেডমাস্টারমশাই থেকে শুরু করে অন্য মাস্টারমশাইরাও ওকে রীতিমত সমীহ করে চলতেন। হুলো ক্লাস নাইনেই আটকে ছিল সম্ভবত পাঁচ বছর। ও নিজেই বলত "ম্যাড্‌ডিক" দিতে হিতে চুল পেকে যাবে শালা। আমি তীত্বপতি ছাড়লে তোদের গতি কি হবে? স্কুলের গতি কি হবে? আমি একাই তীত্বপতির ঝান্ডা বয়ে যাব বাকি জীবন।"

হুলো 'ম্যাড্‌ডিক' দিক আর নাই দিক হুলোর কারণে ঋভুদের কোনো কোনো মাস্টারমশাইয়ের কারও কারও যে অশেষ দুর্গতি হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একজন মাস্টারমশাই ছিলেন গোবেচারা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসতেন। তখন বাঙালিরা 'জিন্‌স'-এর কালচারে শামিল হননি। বাঙালি পুরুষমাত্রই পোশাক ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি। যাঁরা সাহেবিভাবাপন্ন, সাহেব-চাটা বা সাহেবদের সঙ্গে কাজ-কারবার করতেন অথবা তাঁদেরই চাকরি, তাঁদের কথা আলাদা ছিল। উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়া অন্য কিছু পরার কথা ভাবতেই পারতেন না।

বীজগণিতের সেই মাস্টারমশায়ের নাম আজ আর মনে নেই ঋভুর। তবে তিনি খুবই ফরসা ছিলেন। তাঁর কানে কখনও পেছন থেকে রোদ পড়লে তাঁর কান দুটো বাঘের কানের মতো লাল দেখত। বিড়ি খেতেন। এবং তাঁর গোঁফ ছিল ছুঁচোল মতো। "শ্যামবাবুদের গয়লার" মতো নয়। সরু অথচ সামনে ঝাঁপ-দেওয়া। হুলো, বীজগণিতের মাস্টারমশায়ের নামকরণ করেছিলো "ছুঁচো"। হয়তো ছুঁচোল গোঁফেরই কারণে। ক্লাসের সাদা দেওয়ালময় পেন্সিল দিয়ে হুলো নিজেই "ছুঁচো" কথাটি লিখে রাখতো সর্বত্র। তারপর অ্যালজেবরা স্যার ক্লাসে এসে, পড়ানো শুরু করার পর ফরমুলা শুরু করতেই, শুরু হতো হুলোর নিজস্ব অ্যালজেবরা। এ প্লাস বি স্কোয়ার ইজইকুয়ালটু...এর বেশি জ্ঞান অ্যালজেবরা সম্বন্ধে ওর ছিল না। ও বলত "হাব্‌রা-জাব্‌রা", অ্যালজেবরাকে।

একদিন ক্লাসে, পড়া চলছে, যারা মনোযোগী এবং ভালো ছাত্র তারা ওই পরিবেশেও যতটুকু শিখতে পারে তা শেখার চেষ্টা করছে এমন সময় হুলো বেঞ্চ ছেড়ে উঠে সোজা স্যারের কাছে পৌঁছে গেল। মাস্টারমশাইরা হুলোকে দেখলেই ভয় পেতেন।

বীজগণিতের স্যার বললেন, কী হলো! হলোটা কী? কী হয়েছে? হুলো?

হুলো অমায়িক হেসে বলল, কিছুই হয়নি স্যার। তবে, হতে পারে।

মানে? হতে পারে, মানে কী?

নস্যির কৌটোটা ভুলে ফেলে এসেছি স্যার। নস্যির ডিপেটা একটু দেবেন?

অ্যাঁ? ইটা কি? ই কুন ধরনের অসইভ্যতা। না। না। নস্যি তো আমি নিই না। উ বড়ই খারাপ নেশা। নেত্রনালিতে ঘা হইয়ে যায়। কর্কট রোগ। তুমিও নিও না।

সে, আমি কি নেব না নেব আমিই বুঝব। তা ছাড়া আমার মা-বাবা তো এখনও টেঁসে যায়নি। আপনি স্যার এই সব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে আপনার মাথায় সাকুল্যে যে চৌত্রিশটি চুল আছে তাও খসিয়ে বসবেন না আবার। তাহলে হুলোর বড়ই দুঃকু হবে।

মাস্টারমশাই টাকে হাত দিলেন। বললেন, না না।

তাহলে আপাতত একটা বিড়িই খাওয়ান। হুলো বলল।

বিড়ি?

হ্যাঁ স্যার। নইলে আবার নরেশের কাছে গিয়ে নস্যি চাইতে হয়। এখন তো ক্লাস চলছে এখানে এবং ওখানেও।

নরেশ। কোন্ নরেশ?

আহা, আপনার বন্ধু নরেশ। ভূগোলের মাস্টার। ভূগোলের তো "ভূও" জানে না কিন্তু নস্যি নিয়ে নিজের নাকটাকে একেবারে গোল করে দিয়েছে। যাব স্যার?

অ্যালজেবরা স্যারের সম্মানহৃত আত্মসম্মানরিক্ত বুকের মধ্যে হঠাৎ পৌরুষের এবং লজ্জার ঝলকানি খেলে গেল। উনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, না। যাও, বিঞ্চে গিয়ে বসো। উসভ্যতা কোরো না। অন্য ছেলেদের সামনে হুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে যে সমস্ত স্কুলের অথরিটি এবং মাস্টারমশাইদের প্রতি সব ভয় ভক্তি জাহান্নামে দেওয়া সে কথা উনি বুঝতেন। তাই অত্যন্ত সাহস করে হুলোকে ওকথাটি বলে ফেললেন।

অসভ্যতা তো স্যার ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে করে।

হুলো বলল।

সারা ক্লাসে হাসির রোল উঠল।

হুলো ভালো ছেলের মতো ফিরে আসছিল। কয়েকপা হেঁটে এসেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একটুকরো কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে দেওয়ালে ঘষে ঘষে চুন ওঠাতে লাগল।

ওকি? ওকি? ওকি করছ হুলো?

অ্যালজেবরার মাস্টারমশাই চিৎকার করে উঠলেন।

হুলো মাস্টারমশায়ের দিকে পিরে ন্যাকান্যাকা মুখ করে বললো, অসব্য কথা লিখেছে স্যার দেওয়ালে।

কী কথা! তা, তুমি কী করছো?

আমি মুছে দিচ্ছি স্যার। কাগজ দিয়ে মুছে দিচ্ছি।

আহা। কথাটা কি তা তো বলবে?

ছুঁচো স্যার।

ছুঁচো?

তার মানে কি?

শুধু ছুঁচোই জানে স্যার।

ইতিহাসের স্যারের ক্লাসে ছিল আবার অন্য ছবি। তাঁর ঘাড়টি একটু ছোটো ছিল তাই ছাত্রদের কে বা কারা তাঁর নামকরণ করেছিল 'ঘাড়-ছোটো' স্যার। উনি ক্লাসে এসে পড়া দিতেন। বলতেন এতো পাতা থেকে অতো পাতা মুখস্থ করে আসবে পরদিন সকলে। পরদিন ক্লাসে এসে বলতেন, করেছ? মুখস্থ? সমস্বরে ছেলেরা বলত, হ্যাঁ স্যার।

ঠিক আছে। আরো ভালো করে মুখস্থ করা দরকার। প্রত্যেকে একটি একটি করে প্যারাগ্রাফ পড়ো।

দরজার সামনে প্ল্যাটফর্ম আর টেবলের পাশে যারা বসত তাদের দিক থেকে পড়া শুরু হতো। মাস্টারমশায় মুহূর্তের জন্যেও চেয়ারে বসতেন না। ওঁর ডায়াবেটিস ছিল তাই ক্লাসের পুরো সময়টুকু দু'সারি বেঞ্চের মধ্যবর্তী জায়গাটুকুতে পায়চারি করতেন। তাঁর ঘাড়টি নোয়ানো থাকত একদিকে। চোখ দুটিও কোনো বিশেষ ছাত্রর ওপরে বিদ্ধ থাকত না। তা ছড়ানো থাকত দূরে, তাও কোনো কোনো বিশেষ বস্তুর উপরে নয়, সাধারণভাবে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে নস্যি নিতেন ঘাড়-ছোটো স্যার শব্দ করে। সেই শব্দ আর তাঁর মুখনিঃসৃত "NEXT" শব্দটিই শুধু ছাত্রদের একঘেয়ে রিডিং পড়ার শব্দকে ছিদ্রিত করত।

একজনের পড়া শেষ হলেই তিনি বলতেন "NEXT"।

এমনি করেই ক্লাসের সময়টুকু শেষ হয়ে আসত। ঘণ্টা পড়ার আগে তিনি বলতেন, দেখি, বইটা। বলেই, যে-কোনো একজনের হাত থেকে বইটা নিয়ে পেনসিল দিয়ে বইয়ে দাগ দিয়ে বলতেন, পরদিন এত পাতা থেকে এত পাতা অবধি মুখস্থ করে আসবে।

যারা ভালো ছেলে, তারা সত্যিই মুখস্থ করত হয়তো, কিন্তু ভালো ছেলে আর ক'জন ছিল? ওইরকম বিরূপ এবং নৈরাজ্যের পরিবেশেও যারা ভালো ছিল, কনক, চুনী, প্রীতি শংকর আরো কারো কারো মতো; তাদের খারাপ করার সাধ্য কারোই ছিল না বলেই তারা ভালো ছিল।

ঋভু আদৌ ভালো ছেলে ছিল না। সে না ভালো ছিল পড়াশুনায়, না খেলাধুলো বা স্পোর্টস-এ, না গান-বাজনা বা অন্য কিছুতে। ও ছিল অগণ্য, সাধারণ উদ্দেশ্যহীন ছাত্রদের মধ্যে একজন। কোনও কিছুই মুখস্থ করার প্রতিই ঋভুর তীব্র অসূয়া ছিল। ও চাইত, বুঝে নিতে। প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই ওর মনে এক ধরনের চিত্রকল্প তৈরি হত এবং তা তৈরি হলেই তার চোখের মধ্যে দিয়ে মাথার মধ্যে সেই বিষয়টি জীবন্ত হয়ে প্রবেশ করে স্থায়ী হয়ে থাকত। কিন্তু অনেকই বিষয় ছিল পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে, যা মুখস্থ না করলে কবজা করা যেত না। এই কারণে বহু বিষয়েই ঋভু "ভালো" বলতে যা বোঝায় তা একেবারেই ছিল না।

স্বদেশের শিক্ষার পদ্ধতি, পরীক্ষার পদ্ধতি এসবের কোনোটাই যে মেধা বিচারের যোগ্য পদ্ধতি ছিল না সে সম্বন্ধে তার এক ধরনের প্রত্যয়ও গড়ে উঠেছিল। যে প্রত্যয়, তার পরিণত বয়সে পৌঁছে অনেকেই দৃঢ় হয়েছে।

আজকের দিনে শিশু ও কিশোর এবং যুবকেরা ঋভুদের চেয়েও আরও অনেকই বেশি অসহায়। যে পড়াশুনোর শেষ গন্তব্য ডিগ্রি, সেই হাস্যকর পড়াশুনা শেখারও বন্দোবস্তও আজ সেদিনের চেয়ে অনেকই কম। বড়োলোক বা গরিব সব বাবা-মায়েরা এবং তাঁদের ছেলেমেয়রাই যে শিক্ষা নামক প্রহসনের নীরব দর্শক এবং ডিগ্রির সঙ্গে জ্ঞানের যে কোনোই সাযুজ্য আজও আমাদের দেশের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচক ও শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকরা স্থাপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেননি তা উপলব্ধি করে বড়োই হতাশ ও বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধও হয় ও। কিন্তু ঋভুর মতো ক্ষমতাহীন মানুষদের মতামতের দাম আর কতটুকু? এবং কেই বা তা দেয়!

তীর্থপতি স্কুলের অনেক স্যারেরাই কিন্তু নিছক মাস্টারমশাই ছিলেন না। তার চেয়ে অনেক বড়ো কিছু ছিলেন। তাঁদের সীমিত জ্ঞান ও সাধ্যর সবটাই তাঁরা ঋভুদের মতো অপগণ্ডদের জন্যে উজাড় করে দিতেন। বাংলা এবং ইংরিজির স্যারেদের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। যাঁরা আর্টস-এর ছাত্র ছিলেন তাঁরা আমাদের দেশে অনেক সময়েই কোনো বিশেষ আদর্শ বা প্রেরণা-তাড়িত হয়ে আর্টস পড়তেন। হয়তো এখনও তাই পড়ান। বিজ্ঞানের জয়জয়কারের জগতে এবং কমার্সেরও; আর্টস যাঁরা পড়তে আসেন তাঁরা ভালোবাসার জন্যেই আসেন। বড়লোক হবার জন্যে তাঁদের মধ্যে খুব কম মানুষই ঐ দিকে ভিড় করেন। ফলে, আর্টসের মাস্টারমশাই এবং অধ্যাপকদের মধ্যেও এই আদর্শ বা প্রেরণা নিশ্চয়ই কাজ করে, এখনও হয়তো করে। এর মানে অবশ্যই এ নয় যে, বিজ্ঞান বা কমার্সে উদ্দীপ্ত, আদর্শবান বা মেধাবী ছাত্র, মাস্টারমশাই বা অধ্যাপক ছিলেন না বা নেই।

বিকেলে বেলা পড়ে আসত যখন, স্কুলের মাঠে ছায়ারা দীর্ঘতর হত, কাক ডাকত ডাবর কোম্পানির ওষুধের শিশির লেবেল-ছাপানোর প্রেসের ছাদে বসে, তাদের নাচানাচিতে খচরমচর শব্দ হতো কাকেদের নখের টিনের চালে, আর ইংরিজির মাস্টারমশাই "জিম করবেট"-এর বই পড়াতেন অথবা বাংলায় "পথের পাঁচালী" পড়াতেন।

সেই সব সময়ে ঋভু এক অন্যালোকে চলে যেত। ওর খুব ইচ্ছা হতো ও বড়ো হয়ে লেখক হবে। লেখক হয়ে, অগণ্য মানুষের কথা, যে-কথা সেই সব মানুষেরা নিজেরা ব্যক্ত করতে পারেন না অথবা মনোমতো করে ব্যক্ত করতে পারেন না তাঁদেরই প্রতিভূ হবে। তার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভাষা পাবে, চোখ পাবে; কান পাবে।

তীর্থপতি স্কুলের কোনো মাস্টারমশাইয়ের প্রতিই ঋভুর বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা বা অসূয়া ছিল না। এবং আজও নেই। বরং এক গভীর সমবেদনা আছে। যেমন আছে ওই স্কুলের অগণ্য ছাত্রদের জন্যেও। মাস্টারমশাইয়েরা যেটুকু জানতেন বা শেখাতে চাইতেন তার কণামাত্রও গ্রহণ করার মত আধার ছিল না ঋভুর মধ্যে। যার শেখার ইচ্ছা থাকে সে ঠিকই শেখে। ঋভু খারাপ ছেলে ছিল তাই কিছুই শেখেনি।

মামাদের হাজরা লেনের বাড়িতে গেলে ঋভুকে সবচেয়ে বেশি টানত বড়োমামার লেখাপড়ার টেবলটি। কতরকমের কলম, পেনসিল, তুলি, রঙ, রাবার, কালি, কাগজকাটা ছুরি, কাঁচি, আঠার শিশি, পাকানো প্রুফ থাকত সেখানে যে—তা বলার নয়। বড়োমামা চমৎকার ছবিও আঁকতেন। ভালো গানও গাইতেন বলে শুনেছে মায়ের মুখে। তবে সে নিজকানে কখনও শোনেনি। বড়োমামা যখন ঘরে থাকতেন না তখন ঋভু বড়োমামার টেবলের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। রংপুরে ঠাকুমার পুজোর ঘরে ঢুকলেই যেমন ফুল-ফুল ধূপ-ধূপ, পুজো-পুজো গন্ধে সম্ভ্রম জাগত সে সম্ভ্রম কার প্রতি তা সে জানত না, মাথা নুয়ে আসত; বড়োমামার লেখার টেবলের সামনে এলেও ঠিক তেমনই এক অনুভূতি হতো মনে।

ঋভু বুঝত, এই লেখা-লেখি ছবি-আঁকাও একরকমের পুজো। এ ঘরও পুজোর ঘর।

গিরিডির দিনের সেই প্রাচুর্যের শিখর থেকে দারিদ্রর ঢালে দাদু ও মামাদের যে গড়িয়ে যাওয়া শুরু হয়েছিল তার গতিবেগ বোধ হয় অব্যাহত ছিল বহুদিনই। উত্থান ও পতন, পতন এবং উত্থান যে এক অদৃশ্য শক্তির হাত ধরে অবধারিত হয়েই আসে সে সম্বন্ধে এক অস্পষ্ট ধারণা কিশোর ঋভুর মনে গড়ে উঠেছিল। বিরামহীন দারিদ্র অথবা বিরামহীন সুখদিন বলে কিছুই নেই। সবকিছুরই শেষ হয়। শেষের মধ্যেই সুপ্ত থাকে আরম্ভর অঙ্কুর। দারিদ্রর মধ্যে যেমন কোনোদিনও ঋভু লজ্জার কালিমা দেখেনি, প্রাচুর্যের মধ্যেও দেখেনি কোনো গর্বর ছটা। প্রত্যেক মানুষের লজ্জা ও গর্বের প্রকৃত কারণ চিরদিনই বোধহয় ছিল অন্যত্রই। যাঁরা সত্যিই মানুষ তাঁরা কোনোদিনও প্রাচুর্যে গর্বিত অথবা দারিদ্রে লজ্জিত বোধ করেন না।

হাজরা লেনের বাড়িটিতে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। মামাতো দাদারা মেধাবী ছিলেন এবং তাঁরা মধ্যরাতের নিস্তব্ধ অবকাশে কেরোসিনের লম্ফ জ্বালিয়ে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় ভালো ফল করতেন। বড়োমামার বড়ো দুই ছেলে হাতে লিখে একটি দেওয়াল পত্রিকা বের করতেন। মুখে মুখে ছড়া বানাতেন তাঁরাও। আর্থিক অবস্থার সমতার জন্যেই বোধহয় মামাবাড়ির ভাইবোনেদের সঙ্গে ঋভুর যথেষ্ট সখ্য ছিল।

দারিদ্র থেকে প্রাচুর্যে পৌঁছোলে, যাঁরা সেখানে পৌঁছোন তাঁদের যেমন আনন্দিত হবার কারণ থাকে, তেমনই দুঃখিত হবারও অঢেল কারণ থাকে। চারপাশ থেকে হঠাৎই জল সরে যাওয়ার অনুভূতি। আর্থিক অসাম্য, জাতির জীবনে যেমন, ব্যক্তির জীবনেও অনেকই অদৃশ্য দেওয়াল গড়ে তোলে। তা সে হতভাগা অথবা ভাগ্যবান চাক আর নাই চাক। তবে এই দেওয়াল চাপা পড়ে না-মরাকেই মনুষ্যত্ব বলে। অর্থ বা প্রাচুর্য যে-মানুষকে মানুষ হিসেবে বদলাতে পারে না তার বুকেই সবচেয়ে বেশি আঘাত বাজে। মাঝে মাঝে তার এমনও হয়ত মনে হয় যে, খারাপ থাকাই বোধহয় ছিল ভালো।

ঋভুর চার মামার মধ্যে কেউই কোনও চাকরি-বাকরি করতেন না। কোন স্থায়ী বা স্থির আয় ছিল না কারোরই। বড়োমামার আয় ছিল লেখার মাধ্যমে। তাঁর আয়ই সম্ভবত বেশি ছিল। তবে তাঁর যেরকম আয় থাকার কথা ছিল তা তাঁর ঘরে কোনোদিনও পৌঁছত না। অসংখ্য বইয়ের কপিরাইট তিনি বিক্রি করে দিতেন সামান্য টাকায়। অতবড়ো পরিবারের ভার তাঁর উপরেই ছিল।

মেজমামা ছিলেন হোমিওপ্যাথির ডাক্তার। রাশভারী। আলগা।

একসময়ে নাকি খুব ভালো ম্যাজিক দেখাতেন। মেজমামা হোমিওপ্যাথি পরীক্ষা পাশ করেছিলেন কি না তাও জানে না ঋভু। তবে ডাক্তারি করতেন এবং পসার বেশ ভালোই ছিল। চিরদিনই আলাদা থাকতেন এবং খুব বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন। মানুষটির নানারকম বাতিক ছিল। সুরুচি তার মধ্যে একটি। সুরুচি বা পরিচ্ছন্নতা বা উচ্চমন্যতা বাতিকের পর্যায়ে পৌঁছোলে তা বড়োই মারাত্মক হয়। গিরিডির ব্রাহ্ম-প্রভাব কলকাতার ধোপে এবং প্রাচুর্যের অভাবে অন্য মামাদের মধ্যে তেমন টেকসই হয়নি কিন্তু মেজমামা সেই ধারাটি দাঁতে দাঁত চেপে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। মেপে কথা বলতেন; চেপে হাসতেন। হাসবার সময় দাঁত দেখাতেন না। ঋভুর মনে হতো মেজমামা হয়ত একটু স্বার্থপরও ছিলেন। অবশ্য "স্বার্থপর" শব্দটা প্রয়োগ করা চলে শুধু সেই সময়ের প্রেক্ষিতেই। আজকে তো অধিকাংশ পরিবারই আর যৌথ নেই। যৌথ থাকলেও আছে কেবল বাইরে চেহারাতে, ইমারতেই। যে-সব ফাটল দেখা যায় না, যে-সব সিমেন্টে চিড়-ধরানো অশ্বত্থ গাছ চোখের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান হয় না; সেই সব ফাটল আর বিধ্বংসী গাছে এজমালি জীবনের সবকিছুই কন্টকিত হয়ে গেছে এখন। আজকে স্বার্থপরতাই নিয়ম। ঔদার্যই ব্যতিক্রম।

কিন্তু সে যুগে তা ছিল না।

মেজমামার কাছে কিন্তু ঋভুরা উপকৃত ছিল নানা ভাবে। খুব বড়ো কোনো অসুখ-বিসুখ না হলে তাপসী তাঁর "মেজদার" কাছেই পাঠাতেন ঋভুকে পরিবারের যে-কেউ অসুস্থ হলেই ওষুধের জন্যে।

বিনি পয়সাতে মেজমামা ঋভুর এবং ভাইবোনেদের অনেকই চিকিৎসা করেছেন এবং ওষুধও দিয়েছেন বিনা দামে। এই ঋণ স্বীকার না করলে কৃতঘ্নতা হবে। কৃতঘ্নতার মতো জঘন্য অপরাধ যে আর নেই।

ধবধবে-সাদা ছাড়া অন্য কোনো রঙের পোশাক তিনি পরতেন না। এমনকি তাঁর জুতো এবং ঘড়ির ব্যান্ড পর্যন্তও ছিল সাদা। নিয়মানুবর্তিতা কাকে বলে তা শেখার ছিল মেজমামার কাছে। ঘড়ির কাঁটা ভুল করলেও করতে পারত, কিন্তু মেজমামার গতিবিধি দেখে সময় নিরূপণ করতে কারোই অসুবিধে হতো না। সকালে এবং বিকেলে চেম্বারে আসতেন তিনি। তবে তাঁর খাওয়া-দাওয়া পোশাক-আশাক সবকিছু সম্বন্ধেই মেন বাড়াবাড়ি বাতিক ছিল যে তা মাঝেমধ্যে পাগলামির পর্যায়ে চলে যেত।

বড়োমামার মৃত্যুর পরে তাঁর অবিবাহিতা বড়ো মেয়ে খুকুর বিবাহ-পূর্ব আশীর্বাদে বরপক্ষের বাবা মেজমামাকে "আর একটি রসগোল্লা" খাওয়ার অনুরোধ করাতে মেজমামা কঠোর কন্ঠে 'না' করেন। তারপর বেয়াইমশাই যখন "ভালোবেসে" মেজমামার পাতে জোর করে একটি রসগোল্লা দিয়ে দেন তখন সেই অপরাধে মেজমামা ভাইঝির বিয়ে প্রায় ভেঙে দিয়েই অত লোকের সামনে ভাবী বেয়াইমশাইকে চূড়ান্ত অপ্রতিভ করে বলে উঠেছিলেন : "ইডিয়ট!"

গলার ডাক্তার হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত অথবা রবীন্দ্রসঙ্গীত অথবা যে কোনো সংগীতের সাধকেরা, অধ্যাপকেরা, উকিলেরা, যাঁদেরই গলা ভাঙিয়ে খেতে হয় তাঁরাই ছিলেন মেজমামার রোগীদের এক বড়ো অংশ। চেম্বারটি ছিল রাসবিহারী অ্যাভিন্যু ল্যান্সডাউনের মোড়ে। তার কিছু দূরেই ছিল ঋভুর বড়মাসিমার বাড়ি। পার্ক সাইড রোডে।

সেজমামা সুকোমল ছিলেন স্বপ্ন-দেখা পুরুষ। যাঁদের জীবনের প্রায় কোনো স্বপ্নই সফল হয় না তাঁদের দেখে ঋভুর বিষণ্ণতা যেমন চিরদিনই বেড়েছে, তেমন তাঁদের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধাও সে বোধ করে এসেছে চিরদিন। যাঁদের জীবন নিয়মমতো চলে, যাঁরা সফল, হিসেবি, যাঁদের জীবনে ওবেলা হাঁড়ি চড়বে কি চড়বে না এবং চড়লেও কী করে চড়বে তা জানা নেই; তাঁদের মধ্যে সেজমামার মতো স্বপ্ন-দেখা মানুষ বড়ো কমই দেখেছে ঋভু। পেটে খিদে নিয়েও স্বপ্নের বাগানে বাস করা বড়ো সহজ কথা নয়। বড়োমামা ছাড়া, ঋভুর তিন মামাই ওর কাছে এক একটি বিস্ময়। তবে মামাদের মধ্যে বড়মামা ছিলেন প্রায়-স্বাভাবিক। অন্য মামাদের সকলকেই কম বেশি ভারসাম্যহীন বলা চলত। সেজমামা গদ্য ও পদ্য দুই-ই লিখতেন। খুব ভালো বেহালা বাজাতেন। সুর গুলে না খেলে বেহালাবাদক হওয়া যায় না। "কালি-কলম" পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন এক সময়ে। তাঁর কবিতার

সুখ্যাতি করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন। কবিতার বইটি বা কবিতাটির নাম সম্ভবত ছিল "ইস্টিশান"। সেই সযত্ন-রক্ষিত চিঠিখানি ঋভু দেখেছে সেজমামার কাছে।

সেজমামির মতো একজন ভালো এবং সহনশীল মহিলা ঋভু বেশি দেখেনি আজ পর্যন্ত। পান-খাওয়া-ঠোঁটে হাসিটি তাঁর সদাই লেগে থাকত। দারিদ্র্যকে, দারিদ্র্যজনিত সব জ্বালা, অপমান ও অসম্মানকে আত্মসম্মানের সঙ্গে হাসির ফুৎকারে কী করে যে উড়িয়ে দিতে হয় তা সেজমামিকে দেখে শিখতে পারত যে কেউই! এই সংসারের প্রতি কোনোরকম অনুযোগ অভিযোগই ছিল না তাঁর। জাগতিক কোনো দুঃখ-কষ্টই ছুঁতে পারত না সেজমামিমাকে।

অন্য মামাদের যদি ভারসাম্যহীন বলা যেত তবে ছোটোমামাকে বলা যেত উন্মাদ। কিন্তু এরকম উন্মাদেরা সংসারে কারোই ক্ষতি করেন না, পোষণ করেন না কারো প্রতিই বিন্দুমাত্র বিরূপতা। তাঁরা তাঁদের চারপাশে নানারকম স্বপ্নের জাল বুনে নিয়ে উর্ণনাভের মতো সেই জালের বিস্তৃতির মধ্যে নড়াচড়া করে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেন। ছোটোমামাও ছিলেন গিরিডি-প্রেমিক। গিরিডি-প্রীতি ছোটমামার Fixation ছিল। আর ভাগ্যিস ছিল! নইলে এই নিষ্ঠুর, ক্রূর, নীচ, খল পৃথিবীতে ওরকম শিশুসুলভ সরল মানুষের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো। তখনকার দিনে দুরারোগ্য টাইফয়েড থেকে বেঁচে উঠলেও কাব্যি-রোগের হাতে শিকার হয়েছিলেন তিনি সারাটা জীবন। Hunting-bug এর মতোই Poetry-bug একবার কামড়ালে আর রক্ষা নেই কারোরই। তবে এই রোগাক্রান্ত হবার পর যাঁরা লাগাতার কবিতা-গল্প লিখে লিখে অস্তাচলের সূর্যের মতো একসময় অস্তমিত হন তাঁদের রোগটা তাঁর পাঠকদের যতটা কাবু করে তাঁদের নিজেদের হয়তো ততটা করতে পারে না। কিন্তু এই রোগের বীজ চামড়ার নীচে অপ্রস্ফুটিত থাকা আসল বসন্তরই মতো যাদের মস্তিষ্কের মধ্যে জমে থাকে, তাঁদের বড়োই কষ্ট। হাঁপানির উপশমের জন্যে কড়া ওষুধ খেয়ে যেমন রোগীর শরীরে কখনও কখনও এগজিমার প্রকোপ দেখা দেয় এই কাব্যরোগের প্রতিকারের চেষ্টা করলে তেমনই মারাত্মক অন্য সব উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ছোটোমামার ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল। কবিতা না-লিখে ছোটোমামা বিজ্ঞানী হবার সাধনাতে নিমগ্ন হয়েছিলেন। এবং তাঁর সাংঘাতিক বিজ্ঞান-সাধনার ধকলটুকু পুরোপুরিই সইতে হয়েছে ছোটোমামীকে।

ছোটোমামা সবসময়েই নিজের আনন্দে নিজে মশগুল থাকতেন। একটি বিড়ি ধরিয়ে বলতেন, বুঝলি গাড্‌লু; প্রায় মেরে এনেছি। আর মাত্র আরেকটি টেস্ট। অত্যন্ত ভাইটাল টেস্ট। বুঝলি। তারপরই হোল ওয়ার্লড জানবে জগদীশ বোসের পরেই সুশীতল বোসের নাম। কথায় কথায় ছোটোমামা "ওয়ার্লড" কথাটা ব্যবহার করতেন।

কচুরিপানা, বাংলার জলাশয়, মজানদী, বিল ইত্যাদির সমূহ ক্ষতি করে, সহজে নৌকো চলাচল করতে দেয় না, মাছ—চাষের সুবন্দোবস্ত ব্যাহত করে, তাই কচুরিপানার গুষ্টিনাশ করার সাধনাতেই সারাজীবন ছোটোমামা নিয়োজিত ছিলেন। পাঞ্জাবির পকেটে করে কচুরিপানা-বিধ্বংসী ওষুধ নিয়ে লোকাল ট্রেনে চড়ে কলকাতার চারদিকের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে টাটকা সতেজ কচুরিপানার উপরে তাঁর ওষুধের প্রতিক্রিয়া দেখতেন। কলকাতার মধ্যে তখন কচুরিপানা-কবলিত পুকুরের অভাব ছিল না। তাদের মধ্যেও কিছু কিছু ছিলো ছোটোমামার টেস্ট-টিউব। বিনা স্বার্থে, বিনা অনুরোধে; বিনা প্ররোচনায় দেশের জন্যে এমন কাজ করার লোক সেই যুগেও খুবই কম ছিল।

সেজকাকু যেমন ব্রিটিশ-তাড়াবার সাধনায় জীবনপণ করেছিলেন ছোটমামা করেছিলেন দেশ থেকে কচুরিপানা তাড়াবার সাধনায়। বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও ছোটমামার এই বৈজ্ঞানিক সাধনাতে অনুপ্রাণিত হয়ে, অথবা না-হয়েই, বড়োমামা এক বৈজ্ঞানিকের গল্প লিখেছিলেন। সে গল্পের বৈজ্ঞানিক নিয়োজিত ছিলেন কচুরিপানা নয়, ছারপোকা ধ্বংসের সাধনাতে। ছোটো ছোটো হোমিওপ্যাথির শিশিতে লাল-নীল রঙের স্ব-আবিষ্কৃত ছারপোকা-বিধ্বংসী ওষুধ বিক্রি করতেন তিনি। প্রতি শিশির সঙ্গে ব্যবহারবিধিও ছাপা থাকত। তাতে লেখা থাকত "সাবধানে ছারপোকা ধরিয়া মুখ হাঁ করাইয়া এক ফোঁটা গিলাইয়া দিবেন। মৃত্যু অনিবার্য।"

বড়োমামার মতো দিলখোলা সরল ও শিশুসুলভ মানুষ এ সংসারে দেখা যেত না। সেই কারণেই তাঁর আত্মীয়স্বজন, সমসাময়িক কবি-লেখক ইত্যাদি সকলের কাছ থেকেই নির্লোভ তিনি, হৃদয়ের ঔদার্য, রসবোধ, এবং আরও নানা গুনের কারণে সম্মান পেয়ে গেছেন এবং আজও পান। তবে তাঁর সারল্য, অনেকের কাছে মর্যাদা পায়ওনি।

ঋভুকে সঙ্গে নিয়ে বড়োমামা একদিন প্রকাশকদের পাড়ায় গেছিলেন। প্রকাশকের কাছে গিয়ে যখন উপস্থিত হলেন, যতদূর মনে আছে, সম্ভবত কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের দোতলার কোনো প্রকাশকের ঘরে, তখন প্রকাশক উদ্বাহু হয়ে বড়োমামাকে আপ্যায়ন করে বসালেন। বললেন, কী বলব সুনির্মলবাবু, আপনার লেখা আমার স্ত্রীর যে কী ভালো লাগে! আমারও কম ভালো লাগে না। আপনার সত্যিই জয়জয়কার!

প্রকাশকের ঘরে অন্য আরো অনেকে বসে ছিলেন। বড়োমামা লাজুক মুখে বললেন আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। এক মিনিট বাইরে আসবেন কি?

প্রকাশক বাইরে এসে ছাদমতো জায়গাটুকুতে দাঁড়ালেন। বড়োমামা বললেন, গলা নামিয়ে, লজ্জার সঙ্গে; যেন ভিক্ষাই চাইছেন, কিছু টাকার দরকার ছিল।

কত? টাকার অভাব কি? আপনার তো বহু টাকা পাওনা আমার কাছে।

বড়োমামা বললেন, পঞ্চাশটা টাকা কি হবে? বড়ই ঠেকে গেছি।

প্রকাশক বললেন, প-ঞ্চা-শ টাকা! আমিও যে বড়ো ঠেকে আছি সুনির্মলবাবু। গোটা কুড়িতে আপাতত চালিয়ে নিন। তারপর তো পয়লা বৈশাখ আসছেই। তখন আবার দেবোখন।

বড়মামা প্রকাশকের প্রশস্তিতে ভুলে আর কোনো কথা না বলে মাত্র কুড়িটাকাই নিয়ে ঋভুকে বলেছিলেন, চল্ ঋভু।

পরে আরেকবার ঋভুকে নিয়ে বড়োমামা এসে দেবসাহিত্য কুটিরের শ্রী সুবোধ মজুমদার মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। 'শিশুসাথী' ও 'শুকতারা'র জন্যে লেখা দিয়ে গেছিল ঋভু। বড়োমামার সুপারিশে সে লেখা ছাপাও হয়েছিল। কালো চশমা পরা মজুমদার মশাই সস্নেহে ঋভুকে বলেছিলেন, আরো লেখা দিয়ো। নরানাং মাতুলক্রমঃ। বুঝলে খোকা। মামার মতো লিখতে পারবে?

বড়োমামা হেসে বলেছিলেন, ভাগ্নে মামার মতো লিখতে যাবে কোন্ দুঃখে। ও ভাগ্নের মতোই লিখবে। এখনও তো স্কুলে ছাত্র। ওর দিন তো পড়ে আছে।

পরে ঋভু জেনেছিল যে মজুমদারমশাই কালো চশমা পরেন চোখে দেখতে পান না বলে। শুনে, ভারি দুঃখ হয়েছিল।

ঋভুর বাবা হৃষীকেশ ছিলেন অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। ছেলেবেলাতেই ঋভুর লেখালেখি,গান, ছবি আঁকা এই সব ব্যাপারে উৎসাহ দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাপসীকে হয় তো হৃষীকেশ কিছু বলতেনও এ ব্যাপারে।

তাপসী, বিরক্ত, ক্লান্ত গলায় বলতেন, খোকন! ভালো করে পড়াশুনো করো। বড়দার অনেক নাম। এক ডাকে লোকে চেনে তাঁকে। কিন্তু প্রায়ই বড়দা ফুলের মালা নিয়ে ফেরেন সভাসমিতি থেকে। কিন্তু রোজও যদি ফিরতেন তাতেও কি সংসার চলত? বড়ো বউদি বড়ো দুঃখের সঙ্গে সেদিন বড়দাকে বলছিলেন : 'টাকার মালা যদি একদিনও আনতে পারতে তো বুঝতাম। ফুল তো খাওয়া যায় না।" লিখে কী গান গেয়ে আমাদের দেশে এখনও ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয় না। বেঁচে থাকতে হলে তো পেটে না খেয়ে থাকলে চলে না। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজের ভরণ-পোষণের একটা ব্যবস্থা করে তারপর যা কিছুই করো না কেন কেউই মানা করবে না। এখন পড়াশোনা করার সময়। এখন অন্য কিছু নিয়ে মাতলে পরে জীবনটাই নষ্ট হবে।

ঋভু চুপ করে তাপসীর মুখের দিকে চেয়েছিল অনেকক্ষণ।

তারপর বলেছিল, এ কি তোমার মনের কথা মা?

তাপসী আরও বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ। এ আমারই কথা।

ঋভু হেসে বলেছিল, না। এ তোমার মনের কথা নয়। হতেই পারে না।

তাপসী হঠাৎ মুখ থামিয়ে নিয়েছিলেন। তারপরই হঠাৎ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, এ তোমার বাবার কথা। কিন্তু বাবা যা বলেন তা তোর ভালোর জন্যই বলেন।

আর তুমি?

আমার কথা ছেড়ে দে। আমি কি তোর বাবার মতো অত বুঝি?

স্কুল থেকে ফেরার পথে একদিন হাজরা লেনের মামার-বাড়িতে গেছে ঋভু। স্কুলে যাবার সময়ে তাপসী বলেছিলেন, বড়োবৌদির নাকি জ্বর হয়েছে শুনলাম, ছোড়দার কাছে। একবার খোঁজ নিয়ে আসিস তো!

মামাবাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকলেই একটুখানি খোলা জায়গা ছিল। তাতে ছোটোরা খেলাধুলো করত। কোনো গাছগাছালি হতো না। করার শখ বা সামর্থ্য বা সময়ও হয়ত কারো ছিল না। সম্ভবত মাত্র একটি টগর এবং একটি হাসনুহানার ঝোপ ছিল। ঠিক মনে নেই আজ। বাঁ দিকে ছিল রান্নাঘর ও খাবার ঘর। একতলা। টিনের চাল দেওয়া। তার পাশে ছিল ওই রকমই চালাঘর। তারও পরে অন্য ঘর। দুইয়ের মাঝে ছিল একটি মস্ত বিলিতি আমড়ার গাছ। সে গাছের অকৃপণ দাক্ষিণ্য যে কত বর্ষিত হয়েছে সকলের উপরে। বড়ো মিষ্টি ছিল সেই আমড়ার স্বাদ।

বড়োমামার ঘরে ঢুকে দেখল ঋভু যে বড়োমামিমা শুয়ে আছেন আর বড়োমামা লেখার টেবলে বসে ছবি আঁকছেন। বড়োমামা নিজের লেখা ইলাসট্রেট করতেন না। "শৈল চক্রবর্তী" মশাই করতেন। আহা কী সব ছবি! আরও করতেন "লসন উড।" তাঁর রঙিন ছবি আর সুনির্মলের কবিতা মিলে যে চিত্রকল্প পাঠকের মনের চোখে ফুটে উঠত তার কোনো তুলনা ছিল না।

বড়মামিমা, আপনি কেমন আছেন? মা জানতে পাঠিয়েছেন।

ভালো হয়ে গেছি। আয়, কাছে এসে বোস। কি খাবি বল?

বাড়ি গিয়েই খাব। আজ পিসেমশাই আসবেন আমাদের বাড়িতে।

কোন্ পিসেমশাই।

ও বাদলবাবু? তামাহাট থেকে?

হ্যাঁ।

বড়োমামা বললেন, তোর মামিমা খুব খুশিরে ঋভু। ফ্যান ছিলো না বলে ঘ্যান ঘ্যান করতো সবসময়ে। তা, দিলাম লাগিয়ে ফ্যান।

ফ্যান? অবাক হলো ঋভু। হাজরা লেনের এ বাড়িতে তো ইলেকট্রিসিটিই আনা হয়নি, তাহলে ফ্যান কি করে এল? পাড়ার অন্য সব বাড়িতেই বিজলি আলো ছিল। ছিল না শুধুই এ বাড়িতে। পরে বোধহয় এসেছিল। ঠিক মনে নেই ঋভুর।

ঋভু আবারও বলল, অবাক হয়েই; বড়োমামার দিকে চেয়ে, ফ্যান?

হ্যাঁরে। চেয়ে দ্যাখ না উপরে। ঋভু উপরে চেয়ে দেখেছিল ফ্যান ঝোলাবার লোহার আংটা থেকে তিনটি বড়ো বড়ো তালপাতার হাত-পাখা আড়াআড়িভাবে ফ্যানের ব্লেডের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

বড়োমামা হাসতে হাসতে বললেন, তোর মামিমার অনেকদিনের একটা শখ মেটাতে পেরে বড়ো খুশি হয়েছি। বুঝলি ঋভু!

তখন কলকাতার আকাশ নীল ছিল। অনেক দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও কলকাতার জীবন বড়ো সুন্দর ছিল। শান্তি ছিল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা, আইন শৃঙ্খলা। সারা ভারতবর্ষের লোক এসে তখনও বাঙালিদের এমন করে উচ্ছেদ করে দেয়নি। সেদিনের কলকাতা বাঙালিদের কলকাতা ছিল। বড়ো অল্পে মানুষ খুশি ছিল। শুয়োরের মতো গিসগিস করতো না মানুষ। ঘাড়ে পড়ত না, পা মাড়াত না; ধুঁয়োয় আর ধুলোয় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত না।

পথে বকুল ফুলের গন্ধ ছিল। কোকিলের ডাক, কৃষ্ণচূড়া।

বড়মামিমা কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিলেন। উদাস চোখে। তাঁর মুখে হাসি ছিল না। কিন্তু বড়োমামা শিশুর মতো হাসছিলেন হাঃ হাঃ করে। কিংবা কে জানে! সেই হাসির মধ্যে যে কান্না মেশানো ছিল তা বোধহয় সে বয়সে বোঝার ক্ষমতাই ছিল না ঋভুর।

বড়োমামিমা খুব লম্বা ছিলেন না কিন্তু অতি সুন্দরী ছিলেন। দুধে-আলতা মেশালে যেমন রঙ হয় তেমন রঙ। ছোট্ট-খাট্ট সুন্দর মানুষটি কিন্তু অতবড়ো যৌথ পরিবারের দায়িত্ব যাঁর ঘাড়ে আর অর্থ যেখানে অকুলান সেখানে সুন্দরতম ফুলের গায়েও তাপ লাগে, ভাপ লাগে। বড়মামিকে তাই সবসময়ই উৎকণ্ঠিত, চিন্তিত দেখাতো অথচ মুখের হাসিটি সবসময়ই ছিলো অম্লান। ঐ একদিনই এক মুহূর্তের জন্যে বড়মামিমাকে বিষণ্ণ, উদাসীন দেখেছিল ঋভু।

ওই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ওঁরা চলে যাবার আগেই সম্ভবত বিয়ে হয়েছিল ছোটোমামার।

ছোটোমামার গিরিডির বন্ধু ছিলেন মনুমামা। তাঁকে একবার দেখেছিল ঋভু গিরিডিতে। ধুতি ও নীল টুইলের শার্ট-পরা অত্যন্ত সুদর্শন মানুষ। শার্টের হাতা গোটানো থাকত। অভ্র খাদের কাজ দেখতে যেতেন ছোটোমামা আর মনুমামা, উত্তিন্ন-যৌবনা, অরমিতা; সাঁওতাল পরগনার বনের মধ্যে মধ্যে। তখন বনে-পাহাড়ে টিকায়েতদের অত্যাচার গরিব মানুষদের উপরে যেরকম ছিল, সহায়সম্বলহীন গ্রামীণ সাধারণে তাদের যতখানি ভয় পেত; তেমন ভয় বাঘ-ভাল্লুককেও পেত না। সেই টিকায়েত ও বাঘ-ভাল্লুকে ভরা বন-পাহাড়ে ছোটোমামা আর মনুমামার হু-হু শীতে অথবা হা-হা গরমে অভিযানের রুদ্ধশ্বাস গল্প শুনত ঋভু এবং মামাতো-মাসতুতো ভাইবোনেরা মিলে ছুটির দিনে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর।

ছোটোমামা লেখা ছিলেন না। তবে কথক ছিলেন খুবই উঁচুদরের। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গির মধ্যে এমনই এক আকর্ষণ ও অভিজ্ঞতার খুশবু ছিল, নিজের অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্যবোধ এবং প্রকৃতিপ্রেমে, সাধারণ মানুষের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসাকে তিনি তাঁর গল্পের মধ্যে এমন ভাবেই সঞ্জীবিত করতে পারতেন যে, তাঁর গল্প শোনার সময়ে চোখ বন্ধ করে থাকলেও ছায়াছবির মতোই একের পর এক রঙিন দৃশ্য চোখের সামনে যেন পর্দাতে ভেসে উঠত। সেই সব ছবি রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শর স্নিগ্ধ অথবা উগ্র আলোতে আভাসিত ছিল।

জুতো ছিল ছোটোমামার বাতিক। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। দিনে রাতের যে কোনো সময়েই বাড়িতে কী বাইরে জুতো তাঁর চকচকে থাকতই থাকত। তাঁর দাদামশাই মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এবং মামারা, চিত্তরঞ্জন, চিররঞ্জন ইত্যাদির প্রভাব পড়েছিল ছোটোমামার উপরেও। ওঁরা সকলেই স্বদেশ-প্রেমী ছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে কমবেশি যুক্ত ছিলেন। বরিশাল শহরে 'বন্দেমাতরম্' বলে পুলিশের লাঠিতে রক্তাপ্লুত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছিলেন চিত্তরঞ্জন।

মায়ের মামারা প্রত্যেকেই খদ্দর পরতেন। ও বাড়ির ট্র্যাডিশান ছিল! বাবার বাড়িতে যেমন পরতেন সেজকাকু। মাস্টারকাকা। আজও পরেন। তাপসীর ছোটোমামা ছিলেন দীর্ঘ, মুখাবয়ব এবং দাড়ি গোঁফেও একেবারে রবীন্দ্রনাথ। ব্রাহ্ম সংস্কৃতির প্রভাব তাদের পরিবারের উপরে সারা জীবনের মতো পড়েছিল। সভ্য, ভব্য, নিচু-স্বরে কথা বলা, কোনোরকম আবেগেই অভিভূত না-হওয়া; এসবই ছিল ওঁদের পরিবারের প্রত্যেকের এবং ছেলেমেয়েদেরও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

বড়োমামার সঙ্গে প্রকাশক পাড়াতে বেড়াতে যাওয়ার কথাতে একটি গল্পর কথা প্রায়ই মনে পড়ে। বড়োমামার নিজেরই মুখে শোনা। অনেকই বছর পেরিয়ে গেছে তাই প্রকাশকের নামটি আর মনে নেই। অগণ্য বইয়ের পাণ্ডুলিপি যে কী সামান্য টাকার বিনিময়ে সে যুগের লেখক ও কবিরা বিক্রি করে দিতেন তা বলবার নয়। অধিকাংশ লেখক ও কবিই তখন আক্ষরিকভাবেই "হাঁড়ি চড়িয়ে" লিখতে বসতেন। অথবা প্রকাশকদের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার মতো ভিক্ষা চাইতে হতো তাঁদের। অত্যন্ত অপমানকর ছিল সেদিনের লেখক-কবিদের অর্থ উপার্জনের ইতিহাস। সুখের বিষয় এইটুকুই যে, পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তাঁদের সম্মান ছিল আজকের কবি ও লেখকদের চেয়ে অনেকই বেশি। সেই সম্মানটুকু খেয়েই, বলতে গেলে তখন তাঁরা বেঁচে থাকতেন।

একজন প্রকাশকের কাছে কবিতার একটি সংকলন নিয়ে গেছেন বড়োমামা। তখন "কবিতাই" বলত। এখন অবশ্য অন্ত্যমিলের কবিতাকে আধুনিক অনেক কবি কবিতা বলে স্বীকারই করেন না। অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে ঋভু অন্তত জানে না। মিলের কবিতাও কবিতা, গদ্য কবিতাও কবিতা। মিলের কবিতা যাঁরা লিখতে পারেন, ইচ্ছে করলে হয়তো তাঁরা সকলেই গদ্য কবিতাও লিখতে পারেন। কিন্তু যাঁরা গদ্য কবিতা লেখেন অথবা নিছকই জোলো-গদ্যকেই কবিতা বলে চালাবার চেষ্টা করেন কবিতার কোনও গুণ ব্যতিরেকেই এবং তা করে অনেকাংশে সফলও হন; তাঁরা অনেক ঘণ্টা কলম কামড়েও

হয়তো একটি অন্ত্যমিলের "কবিতা" অথবা "ছড়া" বলতে সত্যিই যা বোঝায় তেমন ছড়া লিখতে পারবেন না। এখন শ্রদ্ধেয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় যেমন কবিতাকে ঠাট্টা করে বলেন 'পদ্য', তখনও হয়তো অন্ত্যমিলে জবরদস্ত অধিকারী কবিরা গদ্য কবিতাকে বলতেন 'গদ্য'।

প্রসঙ্গান্তরে এসে গেল ঋভু। কবিতার খাতাটা হাতে নিয়ে প্রকাশক বড়োমামাকে বললেন, একশো টাকা।

বড়োমামা বললেন, মাত্র একশো?

একশো কি কম হলো?

হলো না?

না। কী আছে এতে? খরচ পড়েছে কত? একটি এক্সসারসাইজ বুক, এক বড়ি কালি (তখন নানারঙা কালির বড়ি জলে গুলে তরল করে নিয়ে সেই কালিতেই লিখতে হতো। ফাউনস্টেন পেনের চেয়ে কালির পাত্রে চোবানো কলমেই বেশি লেখা হতো) আর না হয় একটি নিবেরই দাম ধরা গেল। আর আপনার বড়ো জোর দু ঘণ্টা সময় (কলমে দাঁত কামড়ানোর সময় টময়ও ধরে), কী বলেন?

বড়োমামা একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, তা বলতে পারেন। তবে এই যে ধরুন আপনি, মস্ত একজন প্রকাশক, গায়ে-গতরে ঘাড়ে-গর্দানে প্রায় রাশিয়ান উসুরি-টাইগারের সমান, তবু আপনার মাংসের দাম যদি হগ-মার্কেটের মাটনের দরেও ধরা যায়, তবেও আপনার দাম হবে শ-আড়াই টাকা। হাড়গোড় তো শকুনে আর কুকুরেই খাবে। আর রক্ত? যারা আঙুর-টাঙুরের চাষ করে, তারা খোঁজ পেলে চার-আট আনা দামে কিনলেও কিনতে পারে প্রতি সের।

আমার পাণ্ডুলিপির দাম তো একশো। কিন্তু আপনার দামটি এখন দাঁড়াচ্ছে কত?

এই কথোপকথনের পরে প্রকাশক নাকি বিনা বাক্যব্যয়ে বড়োমামাকে তিনশো টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। চল্লিশের শতকের গোড়ার দিকে সেই টাকার ক্রয়-ক্ষমতা অবশ্য খুব কমণ্ছিল না।

বড়ো-পিসেমশাই এলে কলকাতার বাড়িতে উৎসব লেগে যেত। খুব কমই আসতেন উনি যদিও তামারহাট থেকে।

গোলগাল, কুচকুচে কালো চেহারা। মাঝারি উচ্চতার মানুষ। চোখে সোনার ফ্রেমের গোল কাচের চশমা। পরনে ধুতি। গরমের দিনে ফুটো-ফুটো গেঞ্জির উপরে ফিনফিনে-আদ্দির সাদা পাঞ্জাবি। গরমে হালকা-রঙা ফ্ল্যানেলের-পাঞ্জাবি। তার উপরে নস্যি-রঙা মোটা আলোয়ান। বড় পিসেমশাইয়ের সবসময়েই হাসি মুখ। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া তাঁকে কখনও চিন্তান্বিত বা বিরক্ত দেখা যেত না।

ছেলেবেলা থেকেই ঋভু জেনে এসেছে যে ডায়াবেটিস নামক এক সাংঘাতিক রোগে বড়োপিসেমশাই আক্রান্ত। সে রোগে মানুষের শরীরের কী কী ক্ষতি হতো তা ঋভু জানে না কিন্তু পিসেমশাইয়ের ভাত, মিষ্টি, আলু এসব খাওয়া বন্ধ ছিল। অথচ ভাত ছাড়া আদৌ যে বাঙালির খাওয়া হয় এমন কথা বড়ো পিসেমশাই বিশ্বাসই করতেন না। যে-ক'দিন থাকতেন কলকাতার ওই ভাড়া বাড়িতে, অনেক অসুবিধের মধ্যে, ততদিনই বাড়িতে খাওয়াদাওয়া আনন্দ উৎসবের বন্যা বয়ে যেত। লেক মার্কেটে বড়ো পিসেমশাই নিজে গিয়ে বাজার করে আনতেন। জলযোগ থেকে আসত শিঙাড়া, অমৃতি, কচুরি, সোনপাপড়ি ইত্যাদি। জলযোগের ফুলকপির শিঙাড়ার তুলনা ছিল না কোনো। জলযোগের সাইনবোর্ড ছিল মস্ত। তাতে জোব্বা-পরা—রবীন্দ্রনাথের এক ছবি। রবীন্দ্রনাথের

সার্টিফিকেট লেখা থাকত সাইনবোর্ডে। এখনও আছে কি না লক্ষ করে দেখিনি আর। 'জলযোগ'-এর পয়োধি খেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন এইরকম কিছু কথা লেখা ছিল তাতে। ঋভু আর ঋভুর বন্ধু শিবু যখন স্কুল থেকে হেঁটে হেঁটে আসত, জলযোগের সামনে দিয়ে তখন নানারকম মিষ্টির দিকে চেয়ে ওরা কল্পনা করত কখনও লটারিতে অনেক টাকা পেলে কে কোন্ মিষ্টি ক'টা করে খাবে।

টাকা যখন থাকে না মানুষের, সে শিশুই হোক, কী বৃদ্ধ; তখন সমস্ত পৃথিবীকেই মাপতে হয় টাকা দিয়ে। কাগজের টাকাই তখন জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছুর মানদণ্ড হয়ে সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করলেও প্রভাবিত অবশ্যই করে।

শিবু ছিল তীর্থপতি স্কুলের সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাইয়ের ছেলে। ওরা থাকতো কালীঘাটের দিকে। তাই ঋভুর সঙ্গে রাসবিহারী অ্যাভিন্যু দিয়ে বাড়ি যেত। শিবু প্রায়ই স্বগতোক্তি করত ওইরকম গোঁফদাড়ি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পয়োধি খান কী করে? বলা বাহুল্য : শিবুর সমস্যার সমাধান হতো না কোনোদিনও।

যে-ক'দিন বড়ো পিসেমশাই থাকতেন, ঝড়ের মতো উড়ে যেত সে কটি দিন। অমন অনুযোগহীন, অভিযোগহীন, পরদুঃখহারী, হাসিখুশি মানুষ বড়ো কম দেখা যায়। তবে বড়ো পিসেমশাই ভয় পেতেন বড়ো পিসিমাকে। বড়ো পিসিমা ছিলেন অত্যন্ত জাঁদরেল মানুষ। তাঁকে বড়ো পিসেমশাই তো বটেই, তাপসীও ভয় পেতেন। প্রমীলাবালাও বড়ো মেয়েকে সমীহ করে কথা বলতেন। বড়ো পিসিমা কাউকে খাতির করে কথা বলতেন না। তামারহাটে গোলাভরা ধান, গুদামের পর গুদামভরা পাট, খুব বড়ো পাটের ব্যবসা। অত্যন্ত সচ্ছল অবস্থা ছিল বড়ো পিসেমশায়ের। তৎকালীন আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বড়ো পিসেমশাইয়ের অবস্থাই সবচেয়ে ভালো ছিল। ওই বয়সেই ঋভু বুঝত যে, আজকে না হলেও তখনকার দিনে, মেয়েদের আসল জোরটা ছিলো স্বামীর জোর। সে জোর অর্থেরই হোক, কী যশেরই হোক। নিজে যতবড়ো স্বাবলম্বী ও কৃতীই হোন না, কেন আজ থেকে আরও পঁচিশ বছর এ দেশের মেয়েরা তাঁদের সব জোরের উৎস হিসেবে স্বামীকেই জানবেন। এবং এই জানার মধ্যে কোনোরকম লজ্জা নেই। হার তো নেই-ই। এদেশের মেয়েদের মনের গড়নটাই এমন। এই ভারতীয়ত্ব।

তবে বড়ো পিসীমা স্বামীজনিত জোরের কখনও অপব্যবহার করেননি। বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুর্বলের বিরুদ্ধে প্রবলের অত্যাচার দমনেই সেই জোর চিরদিন ব্যবহার করেছেন।

বড়ো পিসেমশাই কখনও বড়ো পিসিমার সঙ্গে ঝগড়া করেননি। হাঃ হাঃ করে হেসে বড়ো পিসিমার বাক্যবাণকে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তাতেও রেহাই ছিল না। বড়ো পিসিমা বলেছেন : "বোকার মতো হেসো না তো!"

কিছু লোক সংসারে চিরদিনই ছিলেন এবং আছেন যাঁদের সংসার প্রবলভাবে আকর্ষণ করে জাপটে ধরলেও তাঁরা পাঁকাল মাছের মতো বাঁধন এড়িয়ে যান। তাঁরাও একধরনের সাধক। সংসারের প্রতি কর্তব্যকর্মে কোনোরকম ত্রুটিই ছিল না পিসেমশাইয়ের। কিন্তু ওই দূর থেকে, আলগা-আলগা। সকালে উঠেই একটু কিছু খেয়ে 'গদি'তে চলে যেতেন। তারপর তামারহাটের চারপাশে যে অসংখ্য পাটের গুদামঘর সংলগ্ন 'গদিঘর' ছিল তারই একটাতে। শীতকালে গদিঘরের সামনের মাটির বারান্দাতে বেঞ্চ বা চেয়ার পেতে বসে মাড়োয়ারি ব্যবসাদারদের সঙ্গে মাড়োয়ারিতে অনর্গল কথা বলতেন। নিম্ন আসামের ধুবড়ি-গৌরীপুর-তামারহাট অঞ্চলে যেসব মাড়োয়ারী স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন তাঁরা যেমন অনর্গল বাংলা বলতেন পারতেন তেমন সেখানকার অনেক বাঙালি ব্যবসাদাররাও অনর্গল রাজস্থানি ভাষা বলতে পারতেন।

তিস্তা নদ হয়ে যে নদীটি গিয়ে ধুবড়ির ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে, সেই নদী গঙ্গাধরের তীরেই ছিলো তামারহাট গ্রাম। তখনও তো দেশভাগ হয়নি! পুব-বাংলা ও আসাম থেকে পাট আসা-যাওয়ার একটি প্রধান জলপথ ছিলো ঐ নদী। মস্তমস্ত মহাজনী নেকোতে চক্রবাক-এর গায়ের রঙের মতো সোনালি, সাইবেরিয়ার রাজহাঁসের গলার রঙের মতো নরম রুপোলি-রঙা পাট আসত-যেত নদী বেয়ে। গুণ টেনে নিয়ে যেত মাল্লারা। মাঝি বসে থাকত হুঁকো হাতে, হালে। নদীর গন্ধ, বালির গন্ধ, নদীপারের প্রকৃতির গন্ধ আর পাটের গন্ধভরা সেইসব প্রভাতী স্নিগ্ধ স্মৃতির সঙ্গে, সেই সব ছবির সঙ্গে, ঋভুর বড়ো পিসেমশাইয়ের ছবি একাকার হয়ে আছে ঋভুর স্মৃতিভাণ্ডারে।

ঋভুর দুই পিসি। ছোটো পিসি ছিলেন মোটাসোটা গোলগাল। চির-আমুদে। দারুণ রসিক। ছোটো পিসি আর ছোটো মাসি একত্রিত না হলে ওদের কলকাতার বাড়ির কোনো অনুষ্ঠানকেই অনুষ্ঠান বলে মনে হতো না। দুজনে যেমন কারণে অকারণে হাসতেন ফুলে ফুলে, তেমন অন্যদেরও হাসাতেন। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। কিছু মানুষ কৈশোরের চাপল্যকে সঙ্গে নিয়ে চিতায় ওঠেন, সারা জীবন সেই অসীম ধনকে কাছছাড়া করেন না।

এঁরা দুজনেই ছিলেন সেই জাতের মানুষ।

তখনকার দিনে বড়োলোকের ছেলেরাই ইংল্যান্ডের গ্লাসগো বা এডিনবরা বা শেফিল্ডে গিয়ে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন। দিশি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে শিবপুর, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এবং রুর্‌কির খুব নাম ছিলো। ছোটো পিসেমশাই ছিলেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার। ছোট্টখাট্ট মিতভাষী ধার্মিক মানুষ ছিলেন তিনি। গুরু ছিলেন তাঁদের পরিবারে। পরম গুরুভক্ত আর মাতৃভক্ত ছিলেন। একটা সময়ে প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টে পড়েছিলেন ছোটো পিসেমশাই। দুবেলা বড়ো পরিবারের সকলের খাওয়া জুটত না। অথচ তখনও বাড়ি ফেরার সময়ে "ঠাকুর" আর নিজের মায়ের জন্যে এক প্যাকেট সন্দেশ হাতে করে নিতে ভুল হয়নি একটি দিনও।

ছোটো পিসিমার উচ্ছ্বাস আর রসের প্রাবল্যে ভেসে যেতে যেতে কোনোক্রমে ঠাকুর আর মাকে আঁকড়ে ধরে এ ভবধামে ছোটো পিসেমশাই আটকে ছিলেন। বড়ো পিসেমশাইয়েরই মতো ঋভুর প্রতি প্রবল স্নেহ ছিল তাঁর। এঁদের স্নেহের ঋণ বিন্দুমাত্রও শোধ করা হলো না এ জীবনে। ঋভু প্রকৃত স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার আগেই এঁরা দুজনেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছিলেন। ছোটো পিসেমশাই অবশ্য পরে গেছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্যেও করার মতো কিছুই করতে পারেনি ঋভু। তাই সেসব পুরোনো কথা মনে হলে বড়ো কৃতঘ্ন লাগে। এই স্বার্থহীন করাকরির ব্যাপারটা বাল্যাবস্থা থেকেই বোধহয় শিখতে হয়। যেখানে নিজস্বার্থ নেই সেখানে কারো জন্যে করাটা, কৃতজ্ঞ নামক বোধকে হৃদয়ে বাঁচিয়ে রাখাটা; এই জগতে মূর্খামি বলেই গণ্য হয়। ঋভু বুদ্ধিমান যে হতে পারেনি সেজন্যে দুঃখিত নয় এতোটুকুও!

ছোটো পিসেমশাই, ছোটো-পিসিমণির মতন আবেগপ্রবণ ছিলেন। এমনিতে কখনওই খালি হাতে ঋভুদের বাড়িতে আসতেন না। যেদিন মিষ্টি বা লজেন্স আনতেন না, সেদিন একটি ড্রয়িং-পেনসিল নিয়ে আসতেন। নিজে এঞ্জিনিয়ার ছিলেন বলে ওই পেনসিলের দরকার তাঁর নিত্যই ছিল। কখনও বা একগুচ্ছ রঙিন ফোলানো-বেলুন নিয়ে আসতেন। তখন দেশে স্বদেশী শিল্প বলে প্রায় কিছুই ছিল না। ভালো পেনসিল বা ভালো বেলুনও বিদেশ থেকেই আসত। একদিন ছোটো পিসেমশাই অফিস-ফেরতা এসে বললেন, চলো খোকন।

পিসিমণি বললেন, খোকন! তোমার পিসেমশাই গাড়ি কিনেছেন! সবাই মিলে গঙ্গার ধারে গিয়ে হাওয়া আর কুলফিমালাই খেয়ে আসি।

বউদি কোথায়?

সে কী মজা! আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ছোটো পিসেমশাই প্রথম গাড়ি কিনলেন। বড়ো মেসোমশাইয়ের গাড়ি ছিল। তাঁর বড়ো জামাই খুব বড় মিলিটারি ঠিকাদার। জামাইবাবুরও গাড়ি ছিল অবশ্য। বড়ো মেসোমশাইকে ঋভুর মনে নেই। ওঁর গাড়িকেও নয়। জামাইবাবুর গাড়ির কথা মনে আছে। তবে চড়েনি কখনও।

ছোটো পিসেমশাইয়ের গাড়িটি প্যাকার্ড। হুডখোলা। একেবারে নতুন ঝকঝকে গাড়ি। তার শরীরে, সিটে, স্টিয়ারিঙে সদ্য বিলেতের গন্ধ মাখামাখি হয়ে আছে।

বেলুনের সুতো ধরে তো সকলের মিলে গাদাগাদি করে সেই হুডখোলা নতুন গাড়িতে চড়া হল। গাড়ি চলতেই ঋভুর হাতের বেলুনটা সুতো-ফস্‌কে উড়ে গেল।

পিসিমণি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, গঙ্গার ধারে গিয়ে তোকে আরও কিনে দেব।

হু-হু করে হাওয়া লাগছে চোখে-মুখে। কী মজা! আর মাঝে মাঝে ড্রাইভারবাবু হর্ন বাজাচ্ছেন কঁরর-র-র করে। সে-যুগে ড্রাইভার বাবুদের সম্মান পাইলটবাবুদের চেয়েও বেশি ছিল।

দেখতে দেখতে বড়ো পিসেমশায়ের চলে যাবার দিন এসে গেল। শীতকালে আমরা যেন অবশ্যই তামারহাটে বেড়াতে যাই এই নিমন্ত্রণ জানিয়ে বড়ো পিসেমশাই চলে গেলেন। ছোটোকাকু ঘোড়ার গাড়ি করে পিসেমশাইকে হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে এলেন।

দক্ষিণ কলকাতার কেওড়াতলার কাছেই থাকতেন তুলিপিসি। বাবার মাসতুতো বোন। তাঁর স্বামী জিতেন পিসেমশাই পোস্ট-অফিসে সামান্য চাকরি করতেন। কিন্তু অর্থ নয়, সম্পদ নয়; মানুষের হৃদয়ের ঔদার্য ও প্রফুল্লতা যে কী ছোঁয়াচে জিনিস তা এই দম্পতিকে দেখে ঋভু শিখেছিল। দুটি কামরার একতলার ভাড়াবাড়িতে থাকতেন ওঁরা কিন্তু সবসময়ে যে কী হাসিমুখের অভ্যর্থনা, কত আদর যত্ন তাঁদের বাড়ি গেলে যে-কেউই পেত, তা বলার নয়!

প্রমীলাবালা যখন কলকাতায় আসতেন তখন গ্রীষ্ম বা শীতের স্কুল ছুটির অবকাশে ঋভুই ছিল ঠাকুমার সঙ্গী। তখন টলির নালা এরকম কলুষিত ছিল না। কালীঘাটের গঙ্গা বলেই তা পরিচিত ছিল এবং প্রমীলাবালার মতো ধর্মপ্রাণা অনেক মহিলা ও পুরুষ সেই গঙ্গাতে স্নান করতেন। ঠাকুমাকে হাত ধরে ঋভু নিয়ে যেত গ্রীষ্ম বা শীতের দুপুরে ওদের রাসবিহারীর বাড়ি থেকে সেই অনেকখানি পথ। তেতে-ওঠা নিজের মুখতো সে দেখতে পেত না কিন্তু টকটকে লালরঙা ঠাকুমার মুখটি অতখানি পথ রোদে হেঁটে আবিরের মতো লাল হয়ে উঠত।

গঙ্গায় চান করে নেবার আগে কিছুক্ষণ তুলিপিসির বাড়িতে ঠাকুমা জিরিয়ে নিতেন। তুলিপিসির বাড়ি থেকে দিনরাতের কোনোসময়েই কিছু খাদ্য বা পানীয়র স্বাদ না নিয়ে ঋভু এসেছে বলে মনে পড়ে না। কিছুই না থাকলে দুটি বাতাসা এবং কাঁসার গ্লাসে একগ্লাস জল অথবা লেবুচিনির শরবত। সেই পিসেমশাই-পিসিমা ঋভুর অন্তরে চিরকালীন আসন পেতে বসে আছেন তাঁদের সহাস্য আশ্চর্য ব্যবহারের গুণে।

ঋভুদের কলকাতার বাড়ির কাছেই লেকমার্কেট থেকে কিছুটা লেকের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা শান্ত নিরিবিলি গলিতে থাকতেন শান্তি জেঠুরা। শান্তি-জেঠু হৃষীকেশের অফিসেই কাজ করতেন। তবে সিনিয়ার ছিলেন হৃষীকেশের চেয়ে। ওঁদের দেশ ছিল পূর্ববঙ্গের কোথাও। সম্ভবত, ঢাকাতে। শান্তি জেঠু বড়ো হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। ভালোমানুষও। কখনও কেউ তাঁকে রাগতে দেখেনি। সবসময় "বাবা বাছা" বলে কথা বলতেন। তাঁর এক ছেলে আর এক মেয়ে ছিল। দুজনেই পড়াশুনোয় খুবই ভালো ছিল। সে কারণে ঋভুদের সবসময়েই শুনতে হতো—"শান্তিদার ছেলেমেয়েদের মতো হতে পারো না"?

অরা বলতো, আমরা আমরা; ওরা ওরা। আমরা ওদের মতো হই কী করে?

অরার ওই বয়সেই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ছিল। তার গায়ের রঙ মাজা কিন্তু চোখমুখ ছিলো প্রতিমার মতো। মনে হতো, ছেনি দিয়ে পাথর কুঁদে গড়া হয়েছে। বয়স অনুপাতে তার গড়ন ছিলো খুবই বাড়ন্ত। তাই ওই বয়সেই অরার অনেকই অনুরাগী ছিল। কিন্তু দূরে দূরেই থাকত। গানের গলাও ছিল খুব ভালো। একজন অন্ধগায়ক এসে অরাকে গান শেখাতেন। অরাকে সমীহ করে চলত ওর ব্যক্তিত্বের কারণে।

অরা যখন গান শিখত তখন ঋভু চৌকাঠের কাছে বসে সেই সব গান শিখে নিত। "নূপুর বেজে যায় রিনিঝিনি আমার মন কয় চিনিচিনি।" অথবা "মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে। যারা স্বর্গগত তারা এখনও জানে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি..."। অথবা "কেন রে ওই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয়।" ইত্যাদি আরো অনেক গান। গানের কোনো বিশেষ ধারা ছিল না। মাস্টারমশায় যে গান জানতেন সেই গানই শেখাতেন। মনে হয়, যে-গান নিজে যখন তুলতেন সেই গানই শিখিয়ে দিতেন ছাত্রীকে। ঋভু বসে বসে শুনত। গান নিজের সুর, লয়, তাল এবং ভাব নিয়ে একীভূত হয়ে তার মনে এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করতো। সুরের মূর্ছার মধ্যে লয় তাল সব তাদের আলাদা অস্তিত্ব হারিয়ে শুধুমাত্র গান হয়েই তার কানের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ে পৌঁছোত। গান যে তার "একীলিসেস হিল" একথা সে পরবর্তী জীবনে বুঝেছিল।

পথ চলতে চলতে কোনো বাড়ির রেডিয়োতে বা ঘরে কারো সুরেলা গান শুনলে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়তো। পা দুটি আটকে যেতো সেখানে। সেখান থেকে নড়তে পারতো না। অথচ যদি কেউ, বেসুর তো দূরের কথা, কম সুর লাগিয়ে গান গাইত তাতেই ভীষণ যন্ত্রণা এবং রাগ হতো ঋভুর। কত মানুষই তো গান করেন কিন্তু সুরে বাজে কজনের গলা!

সেই সময়ে অনেক পরিবারে গান গাওয়াটাকে অভদ্রজনোচিত কাজ বলে গণ্য করা হতো। তাছাড়া ছেলেরা গান করুক এ ব্যাপারটা অনেকেরই অপছন্দ ছিল। তবে সুখের বিষয় ঋভুদের বাড়িতে তা ছিল না। গান সকলে না জানলেও ভালোবাসতেন সকলেই। তবে বাবা এবং কাকারা কেউই ওস্তাদি গান বিশেষ পছন্দ করতেন না।

তাপসী কখনও কখনও ঋভু ও অরাকে নিয়ে অবসর সময়ে বসে ডোয়ার্কিনের হারমনিয়মে ব্রহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন। ঋভুর বাবা সচ্ছল হবার পর তাপসী একটি অর্গান কিনে দিয়েছিলেন। 'গিরিডির দিনের' মতো অর্গান বাজিয়ে তাদের ডোভার রোডের বাড়িতে তাপসী গান গাইতেন। অর্গানের সেই মিষ্টি আওয়াজ এখনও কানে লেগে আছে ঋভুর, মায়ের মিষ্টি গলার আওয়াজের সঙ্গে মিশে।

ঋভুর ছোটোকাকু (ভোপাল) একটু রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একাধিক বারের চেষ্টাতেও তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করতে পারেননি। কিন্তু এইসব সামান্য বিফলতা একজন মানুষের সমগ্র পরিচয়ে একেবারেই নগণ্য। ছোটোকাকুর মতো "দাদাভক্ত ভাই" খুব কমই দেখা গেছে হয়তো বাঙালি পরিবারে। "সেই সব ভায়েরা" সেই যুগেই জন্মাতেন। এ যুগে তাঁদের দেখা যায় না। কোনো অনামী মড়কে তাঁরা অবলুপ্ত। কথায় বলে, লক্ষ্মণের মতো ভাই, তাই। কোনোদিনও হৃষীকেশের চোখে তাকিয়ে কথা বলেননি ছোটোকাকু। চোখের দিকে মুখ তুলেও চোখ, মাটিতেই নিবদ্ধ থাকত। মাথা নিচু করেই কথা বলেছেন। দাদা যা বলেছেন যখন, তাই করেছেন। দাদার সিদ্ধান্ত নিয়ে, সেই সিদ্ধান্ত ভুল বা অন্যায় হলেও কখনও আলোচনা করার স্পর্ধা দেখাননি। বেদবাক্য বলেই মেনে নিয়েছেন।

ছোটোকাকু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে "কুকুরের কান্না" বলতেন বটে, কিন্তু তাঁর নিজের গানের গলা ছিলো ভারি ভালো। যেমন সুর তেমন ভাব। তিনি খুব ভাব দিয়ে তখনকার দিনের সিনেমার গান গাইতেন। "মোর অনেকদিনের আশা আমি বলব গানে গানে ফাগুন হাওয়ার মতো আমি, বলবো কানে কানে, আমি বলব কানে কানে।" অথবা "দিয়ে গেনু বসন্তেরি গান, গানখানি।" অথবা "দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ওই ছায়া, গেয়ে গেল কাজ ভাঙানো গান, ওরে আয়, আমায় নিয়ে যাবি কেরে দিনের শেষে শেষ খেয়ায়, ওরে আয়।" ইত্যাদি অসংখ্য গান।

তখন পঙ্কজ মল্লিকমশাই, কানন দেবী, সাইগলদের যুগ। রবিন মজুমদার মশাইয়েরা বোধহয় সবে এসেছেন।

ছোটোকাকুর গানে যে কী করে এতো ভাব ফুটত তা কিছুদিন পরে আবিষ্কার করেছিল ঋভু। যে-কোনো আবিষ্কারই আবিষ্কারককে সম্মানিত, পুরস্কৃত করে। তা না করলেও আবিষ্কারককে আনন্দ তো দেয় নিদেনপক্ষে! কিন্তু এই আবিষ্কার ঋভুর পক্ষে বড়োই বেদনাদায়ক হয়েছিল। বেদনাদায়ক ঘটনাটা ঘটে বেশ কিছুদিন বাদে।

তাপসীর মামারাও গিরিডির প্রাচুর্যের দিন শেষ করে কলকাতায় আসতে বাধ্য হন। বাবা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার মৃত্যুর পর।

তাপসীর সেজমামা এবং ছোটোমামা তখন থাকতেন হাজরা লেন এবং পণ্ডিতিয়া রোডের মধ্যে সেবক বৈদ্য স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে। দোতলা কী তেতলা—ছোট্ট ছিল বাড়িটি। মায়ের নির্দেশে ঋভু মাঝে মাঝেই খবর নিতে যেত মায়ের মামাবাড়ির। ঋভুর মামাবাড়ি থেকে কাছেই ছিল সে বাড়ি। মায়ের মামাতো ভাইবোনেদের ব্যবহার ছিল আদর্শ। 'খানদান' নামক শব্দটি উর্দুভাষাভাষীদের মধ্যে যখন তখন ব্যবহৃত হয়। "ঐতিহ্য" শব্দটি "খানদান"—এর পুরোপুরি সমার্থক না হলেও কাছাকাছি। ওই বাড়ির "খানদান" ছিল অনুকরণীয়। যেমন সুন্দর চেহারা ভাইবোনদের, দাদাদের, তেমন তাঁদের ব্যবহার। মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকত, সবসময়ে আপ্যায়ন, আদর, যত্ন।

কাদের বাড়ির হাঁড়িতে কতখানি চাল থাকে তা দিয়ে আপ্যায়নের তীব্রতা কোনোদিনও নির্ধারিত হয়নি কোনও যুগে, আমাদের দেশে; তা নির্ধারিত হয়েছিল অন্তরের উষ্ণতায়, আন্তরিকতায় এবং অভ্যর্থনায়। যদিও দিন বদলাচ্ছে দ্রুত। ও বাড়িতে গেলেই এই সত্যটি ঋভু বুঝতে পারত।

তনুমাসি ছিলেন সেই বাড়ির এক মেয়ে। বিদূষী ছিলেন না। কিন্তু কাঁচাসোনা গায়ের রঙ, কাটা-কাটা চোখমুখ এবং চমৎকার ব্যবহার ছিল। ওই বাড়ির পরিবেশ গোঁড়া ছিল না। এবং ব্রাহ্ম-ঘেঁষা ছিল। প্রেম তাঁদের কাছে দুরারোগ্য রোগ বলে পরিচিত ছিল না। অবাধ, সভ্য, মেলামেশাও খারাপ বলে গণ্য হতো না। ঋভু যেদিনই ও বাড়িতে যেত সেদিনই দেখত ছোটোকাকু ও বাড়িতে গেছেন। ছাদে উঠে তনুমাসির সঙ্গে গল্প করত। সেবক বৈদ্য স্ট্রিটে ছোটোকাকুকে যত খুশি দেখত, অত খুশি তাঁকে আর কখনওই দেখেনি ঋভু। যে-ছোটোকাকুকে নিজেদের বাড়িতে দেখত সেই ছোটোকাকুর সঙ্গে এই ছোটকাকুর আসমান-জমিন ফারাক ছিল। ওই ছোটোকাকুকে দেখে ঋভুর খুব ভালো লাগত। যে কোনো মানুষকেই যথাযথ খুশি দেখলেই যে কোনো ভালো মানুষের নিজেরও খুশি হওয়ারই কথা।

সেবক বৈদ্য স্ট্রিট থেকে বাড়িতে ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে তাপসীকে এ খবরও দিত যে, ও ছোটোকাকুকে ও বাড়িতে দেখেছিল।

শুনেই তাপসীর ভুরু কুঁচকে উঠত। কেন যে, তা ঋভু জানে না।

হয় তো যাঁদের নিজেদের জীবনে বিবাহ-পূর্ব প্রেম ঘটেনি, অথবা বিয়েটাকে যাঁদেরই নিজ-ইচ্ছা বা রুচির প্রশ্ন সরিয়ে রেখে নিছক জীবনের ও পরিবারেব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছিল, তাঁদেরই মধ্যে একধরনের ঈর্ষা বা জ্বালা বা গাত্রদাহ দেখা যায়, অন্য কেউ প্রেমে পড়লে বা ভালোবাসলে। জিনিসটার স্বাদ যে কীরকম তা ঠিক জানা না-থাকাতেই সেই জিনিসটাকেই কেউ ললিপপের মতো চুষে খেতে দেখলে তাঁদের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হতে পারে। ঋভুর মা তাপসীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাছাড়া পরবর্তী জীবনে বহু ক্ষেত্রেই ঋভু লক্ষ করেছে যে, প্রত্যেক মেয়েরই তার শ্বশুরবাড়ির ব্যাপারে যা-কিছুই উচ্চমন্যতা অথবা হীনমন্যতাও থাকুক না কিন্তু সেই নিজস্ব ব্যাপারটা স্বীয় পরিবারের অন্য কোনো নারী শ্বশুরবাড়ির পরিবারে বিবাহসূত্রে এসে উঠলে সম্পূর্ণই বিক্ষিপ্ত হবে এই আশঙ্কাতে নিরানব্বুই ভাগ নারীরাই তেমন আন্তঃপারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপিত হোক তা আদৌ চান না। এ ছাড়াও, এই অদ্ভুত মানসিকতার পেছনে অন্য কারণও হয়তো থাকতে পারে যে-সব সম্বন্ধে ঋভু অবহিত নয়।

ফলে, একদিন যা হবার তাই হলো।

ঋভুদের রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ভাড়াবাড়ির বাইরের ঘরে বাগানের দিকের জানালার পাশে একটি তক্তপোশ ছিলো। অতিথি এলে, হয় অন্য কোনার টেবল চেয়ার, নয় সেই তক্তপোশেই বসতেন। রাতে, ছোটোকাকু সেখানেই শুতেন। সেজকাকু থাকলে সেজকাকু। আর ঋভুরা মানে, ঋভু প্রমীলাবালা, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যাঁরা ট্রানজিট-প্যাসেঞ্জার বা কলকাতা দর্শনার্থী, বা ব্যবসা বা

চাকরির সূত্রে কলকাতাতে আসতেন তাঁরা সকলেই মেঝেতে বিছানা করে শুতেন। রত্নাও বা ক্রষ্ণও শুত সেই ঘরেরই একপাশে। মা-বাবা শুতেন অরাকে নিয়ে ভিতরের ঘরে। তার পরের ঘরটিতে ভাঁড়ার ঘর, লফট, খাওয়ার ঘর, ঠাকুমার হবিষ্যি রান্নার ঘর, ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ও ঘরে কেউই শুত না।

একদিন ঋভু স্কুল থেকে ফিরে বাইরের ঘরের সেই তক্তপোশটির উপরে ছোটোকাকুকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখল। ঋভুর মা তাপসী বাইরের ঘরে এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, গোপাল, লক্ষ্মী, ওরকম করে না।

সে কথা বলতেই সদ্য-কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগলেন ছোটোকাকু সেই তক্তপোশের উপরে। আর সে কী কান্না! ফুলে ফুলে কান্না! ফাঁসির হুকুম হওয়া আসামীও বোধহয় এমন কান্না কাঁদে না।

ব্যাপারটা যে বড়োদের, তা অনুমান করেই বইখাতা রেখে ঋভু বাগানে চলে গেছিল. কিন্তু ছোটোকাকুর সেই কান্না তাকে তাড়া করে পেছনে পেছনে সেখানেও গেল। আজকে ছোটোকাকু পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, অবিবাহিত-ছোটোকাকু, ওই তনুমাসির প্রেমে পড়ে থাকা ছোটোকাকু; তবু আজও সেই বুকফাটা কান্নার কথা মনে হলেই ঋভুকে একলা মুহূর্তে বড় দুঃখী করে তোলে।

এই গোলমেলে সংসারে এক মানুষের দুঃখ অন্য মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও লাঘব করা সম্ভব হয় না। কিন্তু লাঘব করা অসম্ভব হলেও সেই দুঃখীর সমব্যথী হতে তো কোনোই অসুবিধে নেই। ছোটোকাকুর দুঃখে আজও ঋভু সত্যিই বড়ো অস্থির বোধ করে।

বিয়েটা হওয়ার অনেকই বাধা ছিল। যে-সব ভালবাসা, বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত গড়ায় সেক্ষেত্রে বাধাহীন বিয়ে বড়ো একটা দেখা যায় না এবং এই যুদ্ধ করে বিয়ে করার মধ্যেই ভালোবাসার বিয়ের সবটুকু মজাই হয়তো নিহিত থাকে।

ছোটোকাকুকে বলা হয়েছিল যে, তুমি রোজগার করো না, অতএব বিয়ে করতে পারো না।

এ যুক্তি ঋভুদের পরিবারে অচল ছিল কারণ তার অনেকদিন পরে হৃষীকেশই প্রায় জোর করেই বেকার এবং বয়স্ক বড়োকাকুকে (বিবাগীকাকুকে) রংপুরে বিয়ে করতে রাজি করান। সে এক অন্য ইতিহাস।

দ্বিতীয় যুক্তি ছিল "গুহর" সঙ্গে "গুহঠাকুরতার" বিয়ে হতে পারে না। কারণ গোত্র এক। মামার সঙ্গে ভাগ্নির বিয়ে হতে পারে, পিসতুতো বোনের সঙ্গে মামাতো ভাইয়ের অথচ "গুহর" সঙ্গে "গুহঠাকুরতার" বিয়ে হতে পারে না এ যুক্তিও সে যুগে অচল ছিল। সবচেয়ে বড়ো পারিবারিক লজ্জার কথা ঋভু নিজেই পরবর্তী জীবনে "গুহঠাকুরতা" পরিবারেই বিয়ে করেছিল। অবশ্যই অনেকই যুদ্ধ করে বাড়ির সঙ্গে। সেদিন ছোটোকাকুর মুখে এক অদ্ভুত হাসি দেখেছিল ঋভু। পরাজয় এবং জয় মিশে গিয়েছিল সে হাসিতে।

ততদিনে জীবন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ছোটোকাকুর জীবন। তনুমাসির জীবনও।

আকাশ দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে ছুটে যাওয়া কোনো প্লেনের দিকে চেয়ে তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরে নির্বাক হয়ে যেতেন ছোটোকাকু। চোখের মণি দুটি স্থির হয়ে যেত। প্লেন দিগন্তে মিলিয়ে গেলে আবার কথা শুরু হতো।

তনুমাসির বিয়ে হয়েছিল একজন পাইলটের সঙ্গে। আজ তিনিও নেই। প্রেমিকেরা চলে গেছেন। শুধু তাঁদের প্রেমিকা রয়ে গেছেন। সংসারের ভারে ন্যুব্জ, ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি পরিবৃত তনুমাসিদের সঙ্গে প্রায় তিরিশ বছর কোনো যোগাযোগ নেই ঋভুর। তবে ভাবে যে, আজকে নিশ্চয়ই তনুমাসির একেবারের জন্যে মনেও পড়ে না ছোটোকাকুকে। কিন্তু ঋভুর পড়ে। এবং ঋভু জানে যে, প্রেমকে প্রেমিকারা বড়ো সহজে ভুলে যায় প্রেমিকরা তা ভুলতে পারে না।

নিজের মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ছোটোকাকুর জীবনে তাঁর সেই প্রথম এবং শেষ প্রেমের এক মস্ত ভূমিকা ছিল। যে-প্রেম জ্বলন্ত সিগারেটের ফুৎকারে অথবা দিগন্তে বিলীন হওয়া অন্ধকার দিনের শ্লথগতি অ্যারোপ্লেনের মুছে-যাওয়া শব্দের সঙ্গেই মুছে যায় না। দিনশেষের সন্ধ্যাতারার মতো, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, শান্ত দ্যুতিতে দেদীপ্যমান হয়ে প্রমাণ করে যে, সে ছিল, সে আছে এবং সে থাকবে। চিরদিন।

"চেঞ্জে" যাওয়া বলতে ঋভুরা তখন হয় রংপুর নয় তামারহাট নয়তো বিন্ধ্যাচলে যেত। বিন্ধ্যাচলের জলের গুণ ছিল অসামান্য। পেটের যে-কোনও রোগ ভালো হয়ে যেতো সেখানে গেলে। তবে থাকার উপযোগী ভালো বাড়ি অতি সামান্যই ছিল। ঋভুর বাবার অবস্থার উন্নতি হবার পরে সেই একটি বাড়িতে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল ওদের একবার। তার আগে যতবারই গেছে ততবারই পান্ডাদের পাথরের বাড়িতে, আসবাবহীন, বিজলি-আলোহীন ঘরে, অত্যন্ত সরু সিঁড়ি বেয়ে-ওঠা দোতলাতে থাকতে হয়েছে। অবশ্য বিন্ধ্যাচলে নয়, তার থেকে একটু দূরে। শিউপুরায়।

আবাসস্থল যাই হোক না কেন, শিউপুরার বহির্দৃশ্য মন্ত্রমুগ্ধ করে দিত ঋভুকে। রংপুরের কী তামারহাটের প্রকৃতি একরকম আর এই প্রকৃতি আরেক রকম। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, পাহাড়ের উপরের কালিকুঁয়োর জল, বহতা, চওড়া, নানা প্যাস্টেল-রঙের চর ফেলা শারদীয়া গঙ্গা। বিন্ধ্যপাহাড়ের উপরে খেলে বেড়ানো চিঙ্কারা হরিণের দল। অগণ্য ময়ূর। পাহাড়ের মধ্যের উপত্যকাতে শরতের ভোরের কুয়াশার ঝালর নাড়িয়ে দিয়ে দৌড়ে-যাওয়া নীলগাইয়ে ঝুণ্ড এই সব কিশোর ঋভুর মনে বড়ো দাগ কেটে বসে গেছিল। প্রকৃতির উপরে যে বড়োলোক এবং গরিব কিশোর এবং বৃদ্ধর অধিকার সমান, প্রকৃতি যে সর্বজনভোগ্যা, প্রকৃতি যে সমান আনন্দময়ী, প্রকৃতির মধ্যে যে কোনোরকম অসাম্য বা অন্যায় নেই সেই সরল কথাটা কিশোর ঋভু অনুভব করতে পারত।

তুলিপিসীর ছোটোবোনের নাম ছিল পটি। পটিপিসিমণি বেশ সুন্দরী ছিলেন এবং ফরসা। তুলিপিসিমণিও সুন্দরী, কিন্তু কালো ছিলেন। এই পটিপিসিমণির বিয়ে হয়েছিল কুচবিহারের এক দেদীপ্যমান ভদ্রলোকের সঙ্গে। হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। মানুষের চোখ যদি তার মেধার দ্যোতক হয় তবে বারীন পিসেমশাইয়ের চোখদুটি দেখে তাঁকে মেধাবী না মেনে নিয়ে জো ছিল না কোনো। অমন চকচকে ফরসা চেহারার টগবগে উদ্দীপ্ত যুবক খুব কমই হয়।

এই পিসেমশাই সারাজীবনই দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের হাসির ঘাটতি হয়নি কখনওই। চরম দারিদ্রতেও তাঁকে ভাঙতে দেখেনি ঋভু। আর কোনোরকম অনুযোগ বা অভিযোগ দেখেনি পটিপিসির মুখে। তাঁর দিদিরই মতো সবসময়ই হাসিমুখে বলতেন তিনি, ঋভু কেমন আছো? নিজের কুশল কেউ শুধাত কি না তা জানা ছিল না, কিন্তু বিশ্বর কুশল শুধাবার আগ্রহে কখনও ঘাটতি পড়েনি তাঁর।

ঋভুর বাবার দিকের মায়ের দিকেরও অধিকাংশ আত্মীয়ই গরিব ছিলেন কিন্তু আজ বহুযুগ পরে পিছন ফিরে যখন তাদের মুখগুলি মনে করে ঋভু, সারসার মুখগুলি; তখন তার বুক গর্বে ফুলে ওঠে। ঋভুরা নিজেরাও কিছু বড়োলোক ছিল না তাঁদের অধিকাংশরই চেয়ে, তাই ঋভু জেনেছিল যে, বৈভব আর শালীনতা এক নয়, অর্থ আর শান্তি এক নয়। তাঁদেরই একজন যে ছিল ঋভু, তাঁদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার ছিল, হৃদয় দিয়ে তাঁদের সে সেদিন কিশোরবয়সে ছুঁতে পারার ক্ষমতা অর্জন করেছিল বলেই হয়তো একদিন সে লেখক হয়ে উঠতে পেরেছে। অন্যর সুখ ও দুঃখকে নিজের করে নেবার সহজ প্রকৃতি সে ঈশ্বরের অশীর্বাদে করায়ত্ত করেছিল। নিজেদের সেই সব অশান্তির দিনে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের অভাব অনটন, আশাভঙ্গতার শরিক হয়েছিল বলেই পরবর্তী জীবনের অশেষ সাচ্ছল্য তাকে কণামাত্র ছুঁতে পারেনি। ঠাকুমার হাত ধরে জ্যৈষ্ঠের তপ্ত পথে খালি-পায়ে পথচলা যে

কিশোরটি ছিল, সেই সব দিনের তীক্ষ্ণ অনুভূতি তার হৃদয়ে সাচ্ছল্যের দিনে তীক্ষ্ণতর হয়েছে; পরবর্তী জীবনের আর্থিক পরিকাঠামো তাকে একটুও বদলাতে পারেনি। পারেনি যে, তার সামান্যতম কৃতিত্ব যদি তার নিজের হয় তবে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব তার পরিবেশের, তার খেলার সাথীদের; তার আত্মীয়স্বজনের।

এই তুলিপিসি আর পটিপিসির মা ছিলেন প্রমীলাবালার চেয়ে ছোটো। ঋভুরা তাঁকে ছোটোঠাকুমা বলে ডাকত। অল্পবয়সেই বিধবা হয়েছিলেন। ঢাকার নারায়ণগঞ্জের কোনো এক অঞ্চলের ছোটোখাটো জোতদারি ছিল তাঁর স্বামীর। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর দুঃখের জীবনের শুরু। তবে তার স্বামী যে কৌলিন্যে বড়ো ছিলেন তা তাঁর এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের ব্যবহারেই প্রমাণিত হতো।

ছোটোঠাকুমার একমাত্র ছেলের নাম ছিল কীর্তেন্দু। প্রচণ্ড কীর্তন পাগল ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে নারায়ণগঞ্জ থেকে কলকাতায় আসতেন। টাঙ্গাইলের ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি ছিল তাঁর পোশাক। আর কথায় কথায় কীর্তন ধরতেন। তালের উপরে যে কী অপরিসীম দখল ছিল তাঁর, তা যাঁরাই তাঁর কীর্তন শুনেছেন তাঁরাই জানেন। দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর একা শ্মশান-জাগিয়ে-থাকা তাঁকেও ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে এই নিষ্ঠুর কলকাতায় চলে আসতে হয়।

কীর্তনকাকুর ডাক নামে ছিল খোকা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, মিতভাষী।

দেশভাগের পর নিজের জোতদারির স্বর্গ থেকে এক বস্ত্রে নির্বাসিত হয়ে খোকাকাকু হৃষীকেশের নিজস্ব অফিসে এসে টাইপিস্টের চাকরিতে বহাল হন। যে-আঙুলে খোলের উপর কীর্তনের বোল উঠত সেই আঙুলেই টাইপ-মেশিনের চাবি টিপে টিপে নিজের এবং স্ত্রী ও সন্তানদের গ্রাসাচ্ছাদনের সামান্য বন্দোবস্ত করেন তিনি। সে সব অনেক কথা। পরে আসব।

খোকাকাকু দেশভাগের পর হাসতে হাসতে বলতেন, জোতদার ছিলাম, তাই ভুঁড়িটারে "অ্যালাও" করছিলাম। এখন জোতদারি গেল, জিন্নায় আর নেহরু মিল্যা আমাগো উদ্বাস্তু কইর‍্যা দিল কিন্তু প্রশ্রয়-পাওয়া ভুঁড়িখান রইয়া গেল গিয়া। লাভের মধ্যে বাসে-ট্রামে ওঠন দায়।

হাসতে হাসতে বলতেন কথাগুলি কিন্তু যারা কান্না চেনে তারা সেই হাসিতে নিঃশব্দে কান্নার শব্দ শুনতে পেত।

হৃষীকেশের আরেক মেসোমশাই ছিলেন কনট্রাক্টর। শিবভক্ত, উদার, রসিক বৃদ্ধ। তাঁর দুই মেয়ে আর দুই ছেলে। বড়ো মেয়ে বিভা থাকতেন ঢাকুরিয়ার মহারাজকুমার রোডে। নিজস্ব বাড়িতে। বিভাপিসিমণির স্বামী রেলে কাজ করতেন। তাঁর ছোটোবোনের নাম ছিল নিশা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। সেজকাকু আর নিশাপিসিমণিই ছিলেন প্রায় ডিগ্রিরহিত গুহ-পরিবারের একূল ওকূলের মধ্যে দুই স্তম্ভ। নিশাপিসিমণিরও বিয়ে হয়েছিল একজন এঞ্জিনিয়ার কনট্রাক্টরের সঙ্গে। তবে তাঁরা কলকাতার বাইরে-বাইরেই থাকতেন। বিভাপিসিমণির বাড়িতে ঠাকুমাকে নিয়ে আসতে হতো ঋভুর প্রায় প্রতিটি ছুটির দিনে। সেখান থেকে দাদুর বাড়ি। দাদুর দুই ছেলে গোপালকাকু আর সন্তুকাকু দুই ভাই তাঁদের বাবাকে দেবজ্ঞানে দেখতেন।

ঋভু গেলেই, ঋভুর অনুরোধে একচক্কর সাইকেলে চড়িয়ে আনতেন ঋভুকে গোপালকাকু। আজকে সেসব দিনের কথা মনে করলে আনন্দে মন ভরে ওঠে। কৃতজ্ঞতাতেও। কত মানুষের যে ভালোবাসা পেয়েছিল এজীবনে ঋভু, তা বলার নয়। তাঁদের কাছে যা ঋণ তার এককণাও শোধ করে উঠতে পারেনি আজ অবধি। হয়তো পারবেও না। ঋভুর নিজের বেলাও তো প্রায় পড়েই এল। তবে ঋণ পরিশোধ না করতে পারলেও স্বীকার করবে চিরদিনই, উচ্চগ্রামে; হৃদয়ের সব তন্ত্রী বাজিয়ে। যাঁর হাতে একগ্লাস জলও খেয়েছে ঋভু তাঁর ঋণও স্বীকার করে এবং চিরদিন করবে।

বিভাপিসিমণির শ্বশুরমশাই এবং শাশুড়িও তখন বেঁচেছিলেন। তখনকার ঢাকুরিয়া আজকের ঢাকুরিয়া ছিল না। ওভারব্রিজ ছিল না। লেভেল-ক্রসিং-এর পরেই বালিগঞ্জ থেকে গেলে ডানদিকে ছিল মস্ত ধোবিখানা। তারপরই যোধপুর গল্ফ ক্লাব। সেই গল্ফ ক্লাবের জায়গা নিয়েই গড়ে উঠেছে যোধপুর পার্ক এখন। উনিশশো উনষাট-ষাট সালেও ওই যোধপুর ক্লাবের হৃতগৌরব-বাড়িতে একটি বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছিল। তারপরই যোধপুর গল্ফ-ক্লাব উঠে যায়। যোধপুর পার্কের পত্তন হয়।

বিভাপিসিমণির বাড়িতে যাওয়ার বিশেষ একটি লোভ ছিল ঋভুর। ঠাকুমার সঙ্গী হিসেবেই যেতে হতো যদিও, কিন্তু ঋভুর জন্যে, সে কিশোর হলেও অ্যাপ্যায়নের বন্দোবস্ত ছিল প্রাপ্তবয়স্কদেরই মতো। বিভাপিসিমণির অবসরপ্রাপ্ত শ্বশুরমশায় এবং শাশুড়ি ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন। তাঁদের দেখে খুব ভালো লাগত। বয়স হয়ে গেলে দাম্পত্য এক অন্য জ্যোতি পায়। যে-জ্যোতির কাছে যৌবনের সব ঔজ্জ্বল্য ম্লান বলে মনে হতো ঋভুর চোখে।

বিভাপিসিমণি অত্যন্ত যত্ন করতেন ঋভু আর তার ঠাকুমাকে। ঋভু গেলেই চমৎকার লুচি বানাতেন বিভাপিসিমণি স্টোভে, রান্নাঘরের লাগোয়া দোতলার বারান্দাতে বসে। ঘি-ভরা কড়াইয়ে ফুলে ফুলে উঠত ফুলকো-লুচি। বসে বসে দেখত ঋভু। তারপর বিভাপিসিমণি ভাজতেন বেগুন। তারওপর বেগুনভাজা আর চিনি দিয়ে গরম গরম ফুলকো লুচি কাঁসার মস্ত থালাতে সাজিয়ে খেতে দিতেন ঋভুকে। সেই লুচি-চিনি-বেগুনভাজার স্বাদ আজও যেন জিভে লেগে আছে। সেইদিনের চিনির ওজনে আজকে সোনা দিয়ে ভরিয়ে দিলেও মূল্যমান সেই মূল্যবানের সমান হবে না। কৃতজ্ঞতা বড়ো ভারীবোধ। যারাই তা হৃদয়ে বয়ে বেড়ায় তারাই তার ভার জানে।

ঋভুদের বাড়ির গলির মোড়ে একটি পিলার ছিল। হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারির পাশে।

সেই পিলারটির উপরটা সমতল ছিল। তার উপরে ছোট্ট ঋভুর উঠে বসতে কোনো অসুবিধাই হতো না। গুরুজনদের চোখে পড়ার ভয় না থাকলে সেই পিলারের উপরে বসে ঋভু বিশ্বরূপ দর্শন করত। এ কথা হয়তো আগেই বলেছি।

একদিন বিকেলে অমনি বসে আছে, একটু পরই ঘন্টুদের বাড়িতে, মানে ছাদে যাবে, দেখল, পথের পাশের টিউবওয়েল থেকে পাশের বাড়ির রোগা-দুবলা বাংলার অধ্যাপক জল নিতে গেলেন। উনি অধ্যাপনা করতেন কাছেই একটি কলেজে। এবং পিএইচডি করেছিলেন মাত্র বছরখানেক আগে। কোনো কারণে করপোরেশনের কলের জলের সেদিন কোনো গোলমাল হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম ছিল অবিনাশবাবু।

রোগা, ফরসা, মেয়েলি চেহারা। মিহি স্বরে রবীন্দ্রনাথের এবং নিজেরও কবিতা আবৃত্তি করতেন তিনি; প্রায় রোজই তাঁর বাইরের ঘরে রজনীগন্ধা ফুল বা বেলফুলের মালা সাজিয়ে ফুলদানিতে; ধূপকাঠি জ্বেলে সন্ধের পরে বসে থাকতেন। একজন সুন্দরী মেয়ে আসত তাঁর কাছে পড়তে। তা নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মনকষাকষি ছিল। ঋভু পাড়ার মহিলাদের মুখে এই কথা আলোচিত হতে শুনেছিল আড়াল থেকে।

ভদ্রলোককে ভারি ভালো লাগত ঋভুর মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলেই উনি বলতেন, ভালো?

ঋভু বলত হেসে, মাথা ঝাঁকিয়ে পরম পাকার মতো, ভালো।

এমন ইম্পর্ট্যান্স এ পর্যন্ত ঋভুবাবুকে কেউই দেয়নি এ জীবনে।

ওঁর 'সঞ্চয়িতা' আর 'য়ুরোপ যাত্রীর পত্র' ধার দিয়েছিলেন ঋভুকে। বলেছিলেন, পড়া হলে ফেরত দিয়ো। 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' এবং 'আফ্রিকা' এই দুটি কবিতা ছিল ওঁর খুব প্রিয়। ঋভুর ভালো লাগতো 'হঠাৎ দেখা', 'ক্যামেলিয়া' এই সব।

সেজকাকুরও খুব প্রিয় কবিতা ছিল 'আফ্রিকা'।

হঠাৎ টিউবওয়েলের কাছে গোলমাল শুনে ঋভু চমকে দেখল একজন দেশাসই বিহারী যাদব গোয়ালা এবং আরেকজন বিহারী মুসলমান ধুনুরি একই সঙ্গে লাথি মেরে অবিনাশবাবুর জলের বালতিটা দূরে ফেলে দিয়ে নিজেদের বালতি দুটো টিউবওয়েলের কাছে এনে রাখল।

অবিনাশবাবু শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। নিচু গলাতে মিনমিন করে বললেন, বর্বর! ইতর!

ওঁর বালতিটাই সবচেয়ে সামনে ছিলো। অত্যন্ত অন্যায় করে ওরা ওঁর বালতিতে লাথি মেরেছিল।

"চোপ্ রও শালা বাঙালি! জাদা বাতেঁ করেঙ্গা তো তেরা মু তোড় দুংগা"।

ধুনুরি লাল চোখ করে বলল।

অবিনাশবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অধ্যাপকদের হাত তো লিখতেই পারে, খাতা দেখতে পারে মুখ, বক্তৃতাই করতে পারে কিন্তু সে হাতে মারামারি বা গালিগালাজ করতে তো তিনি শেখেননি!

ঠিক সেই সময়ে ধুতি আর লম্বা সাদা-নীল ডোরা কাটা পপলিনের শার্ট পরে ছোটোকাকু কোথা থেকে যেন ফিরছিলেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, কী হয়েছে অবিনাশদা?

অবিনাশবাবুর তখন দু চোখে জল।

কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, দেখো ভাই ভোপাল। কী অন্যায়! আধঘণ্টা হলো লাইনে দাঁড়িয়ে আছি এঁরা জোর করে লাথি মেরে আমায়...

ছোটোকাকু শার্টের দুহাতের আস্তিন গোটাতে গোটাতে বললেন, অন্যায়টাই তো নিয়ম। ন্যায় আর ঘটছে কোথায়?

বলেই, ধুনুরিকে বললেন, ক্যারে! হুয়া ক্যা?

ধুনুরি বলল, আভিতক হুয়া কুছ নেহি, তব হোনে শকতা।

হাঃ, হাঃ, করে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠল বিরাট পালোয়ান গোয়ালা। ধুনুরি তার সঙ্গে তাল দিল।

ছোটোকাকু দু কোমরে দু-হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শুধোল, "ক্যা রে?"

ছোটকাকুর পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি, পায়ে নাখুদা মসজিদের পশমের লাল ফুল লাগানো মজবুত কাবুলি জুতো।

ছোটোকাকুর সেই দৃপ্ত চেহারা দেখে ভারি গর্ববোধ করল ঋভু।

গোয়ালা, ধুনুরির দিকে তাকিয়ে বললো, হিরো আয়া রে। হিরো! রে মকবুল! হিরো আয়া। কাঁহাসে আয়া হ্যায় হো? চল্ হটো হিয়াঁসে বুরবক। বলল, ছোটোকাকুকে।

তোরা হট। হট এক্ষুনি। নইলে বিপদ আছে।

ওরা দুজনে অবাক হয়ে গেল বাঙালি ছোকরার আস্পর্ধা দেখে।

বলল জবান সামহালকে বাতেঁ করনা ডরপোক বাঙালি.

ছোটোকাকু বললেন, দিখোগে জবান?

দিখলাও না শালা! বাঙালি।

'বাঙালি' শব্দটার মধ্যে বড়ো কদর্য ঘৃণা ভরে দিল সে।

বলতেই, ছোটোকাকু উড়ন্ত বাজপাখির মতো ওদের দুজনের উপরে গিয়ে পড়ে দুজনকে দুহাতে ধরল এমন করে যেন মনে হলো বেড়াল দু থাবাতে দুটি ইঁদুর ধরেছে। দশাসই লোকগুলো প্রথমে ঘাবড়ে গেলো। পরমুহূর্তেই তারা ছোটোকাকুর উপরে একসঙ্গে এসে পড়ল। কিন্তু হলে কী হয়! নিয়মিত কুস্তি ও বক্সিং-করা ছোটোকাকু দু হাতে ওদের মুখে একইসঙ্গে এমন ঘুঁষি মারতে লাগল যে তারা তাজ্জব বনে গেল। কিন্তু একটু পরই তারা ছোটোকাকুকে কবজা করে ফেলল।

বরেন্দ্রভূমির মানুষেরা যাকে বলেন "পাইড়্যা ফ্যালোন", তাই আর কী!

ঋভু তার উচ্চাসন থেকে এবারে লাফিয়ে নামলো। এবং তার পিছন থেকে তার সাকরেদ পাশের বাড়ির শেফালির ভাই বেঁটে দিলীপ। উচ্চতায় সে চারফুট। ওজনে বারো কেজি। চিঁচি গলায় বলল, ঋভুদা চলো! ভোপালকাকুকে ওরা মেরে ফেলল।

ঋভুর মা তাপসী চিরদিনই বলতেন, ছোটোলোকের ছেলেরা মারামারি করে। খবদার। কখনও যেন না শুনি যে রাস্তাঘাটে মারামারি করেছ কারো সঙ্গে।

তাপসীর এই অনুশাসন নিয়ে যখন মনে মনে একটু ব্যস্ত ঋভু, হঠাৎ ও শুনল, দিলীপ বলছে, লে হালুয়া! দেখছটা কি দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে? ভোপালকাকা কি তোমার আপন কাকা নয়?

বলেই, দিলীপ দৌড়ে গিয়ে এক ধাক্কায় ধুনুরিকে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চড়ে বসল। কিন্তু ধুনুরি মুহূর্তের মধ্যে দিলীপকে এতো জোরেই ছুড়ে দিল দূরে যে সে প্রায় ট্রাম লাইনে গিয়ে পড়ল। একটা ট্রাম জোরে ব্রেক কষাতে, ও নীচে যেতে যেতেও গেল না।

ঋভুর খুব রাগ এবং দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু ঋভু কিছুই করতে পারল না। লজ্জায় লাল হওয়া অবিনাশবাবুর পাশে সেও স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার ভিতরে কিন্তু প্রচণ্ড আলোড়ন চলছিল। কিন্তু কানদুটি গরম হয়ে লাল হয়ে যাওয়া ছাড়া সে আলোড়নের অন্য কোনো বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল না।

এদিকে ছোটোকাকুকে ওরা দুজনে শুইয়ে ফেলে বেদম মার মারছিল।

দিলীপ অধঃপতিত অবস্থা থেকে নিজেকে উত্থিত করে টেনে দৌড়ে এল আবার। দাঁতে দাঁত চেপে ঋভুকে বলল, অবিনাশবাবুর জলটাও তো ভরতে পারতে, না কি?

বলেই, গোয়ালার বালতিটাকে তুলে নিয়ে ছোটোকাকুর বুকের উপরে চেপে বসে থাকা ধুনুরির মাথায় কষালো এক জব্বর ঘা। লোহার বালতির আচমকা আঘাতে সে "ইয়া আল্লা" বলে ধরাশায়ী হলো।

দিলীপ চেঁচিয়ে উঠল, ঋভুদা, ভোপালকাকু রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

বলেই, স্বগতোক্তি করল, তবে রে! তোদের দুটোকেই আমি "যমালয়ে" পাঠাব। এই "যমালয়ে পাঠাব" আর "লে হালুয়া" ছিল এই অদম্য প্রাণশক্তিসম্পন্ন কিশোরের প্রিয় শব্দ। তারপরই বারো কেজি এবং চারফুটি দিলীপ বালতি হাতে যে প্রলয়ংকারী ভূমিকাতে অবতীর্ণ হলো তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না কারোরই।

ওদিকে ঋভু অবিনাশবাবুর জলের বালতি টিউবওয়েলের নীচে পেতে নিজেই জল ভরতে লাগল।

অবিনাশবাবু তখনও স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিড়বিড় করে কী যেন বলছিলেন নিজের মনে।

দিলীপ দুহাতে বালতিটা ধরে প্রচণ্ড বেগে ঘুরোতে ঘুরোতে ওই দুজন ষণ্ডা গুণ্ডাকে মেরে একেবারে ধরাশায়ী করে দিল আর সমানে চিৎকার করতে লাগল "আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে? আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?"

কোথা থেকে এই ডায়ালগ শুনেছিল তা ওই জানে। কিন্তু ওই একরত্তি ছেলের হিম্মৎ দেখে ঋভু ও অবিনাশবাবু তো বটেই, রাস্তার দুপাশের বাড়ির জানালা ও বারান্দায় দাঁড়ানো কিন্তু গোলমালের কাছে না-আসা বাঙালি বীর হিন্দুরা সকলেই আহা! আহা! বাহা। বাহা। করতে লাগল।

অবিনাশবাবুর বালতি ভরে গেলে ঋভু বালতিটা তাঁর হাতে তুলে দিল।

দিলীপ বলল, অবিনাশকাকা, রবীন্দ্রনাথ আর শেকসপিয়র যেমন পড়া ভালো, তেমন ডন-বৈঠক মারাও ভালো। আপনার পাণ্ডিত্য তো আপনাকে আজ বাঁচায়নি। মান-সম্মান প্রাণ সবই যেতে বসেছিল আপনার, ভোপালকাকা না থাকলে। শান্তিনিকেতনের স্মৃতি উইয়ে খেত, আর ডিগ্রির কাগজগুলো, তেলাপোকায়।

ঠিক।

লাল-মুখ নীচু করে গলার নীল শিরা বের করা ফরসা অবিনাশবাবু বললেন।

তারপর বললেন, তুমি বড়ো দুঃসাহস দেখালে ভাই। উচিত হয়নি এতোটা। তোমাকে ওরা মেরে ফেলতে পারত।

দিলীপ বললে, ইজ্জৎই মরে গেলে প্রাণে ধুকপুক করে বেঁচে থেকে কী লাভ হতো? আমাকে ওরা মেরে ফেলতে পারত সহজে অবিনাশকাকা, কিন্তু হারাতে পারত না। শরীর মরতে পারে, কিন্তু মন কখনও মরে না। আর মন আছে বলেই তো আমরা মানুষ। কি?

অবিনাশবাবু বললেন, ঠিক। ঠিক। ঋভু মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়েছিল দিলীপের দিকে।

দিলীপ বলল, হাঁ করে তাকিয়ে আছো কি? চলো ভোপালকাকুকে তুলে বাড়ি নিয়ে যাই। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে যে!

চল্।

ঋভু বলল।

ততক্ষণে আরো অনেকে এসেছেন এ বাড়ি সে বাড়ি থেকে। ছোটোকাকুর মাথায় দিলীপ এক বালতি জল ঢেলে দিল। দিতেই, ছোটোকাকু চোখ মেলল।

দিলীপ বলল, ভোপালকাকু! ওই দেখুন ব্যাটারদের শুইয়ে দিয়েছি।

তোরা এর মধ্যে এলি কেন? যা হবার তা হতো আমার।

দিলীপ হেসে বলল, রাসবিহারীর মোড়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে আমাদের "ম্যাঙ্গো শরবত" খাওয়াবে তো!

খাওয়াব।

বলেই, ছোটোকাকু উঠে বসলেন।

অনেকেই বললেন, ওরা তোমাদের ছেড়ে দেবে না কিন্তু। কাজটা ভালো হলো না বস্তিশুদ্ধ গুণ্ডা বাড়ি চড়াও হলো বলে।

দিলীপ বলল, ওরা বাড়ি চড়াও করবে না। আমাকে আর ভোপালকাকুকে চোরাগোপ্তা খুন করবার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু অন্ধকারের জীব ওরা, আলোয় আসবে না। সামনে আসতে হলে সৎসাহস লাগে।

আজকে ঋভু জানে যে, তখনও সাহসের মধ্যে সৎ এবং অসৎ এর তফাত ছিল। আজ সে তফাত আর অবশিষ্ট নেই। আজকের দিন হলে ছোটোকাকু এবং দিলীপের বাঁচাই হতো না। হয়তো অবিনাশকাকুরও নয়। সেদিন বাঁচা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য অনেক খেসারত দিয়ে।

নিজের জন্যে বড় লজ্জা করছিল ঋভুর। দিলীপ, ওই রোগা-পটকা দিলীপ, তার চেয়ে নিচু ক্লাসে পড়া তীর্থপতির দিলীপ নায়কোচিত কাজ করে সকলের কাছে মুহূর্তের মধ্যে নায়ক হয়ে গেল অথচ ও না-ভালো পড়াশুনোতে না-ভালো খেলাধুলায়, না-ভালো মারামারিতেও। ঋভু একটা যাচ্ছেতাই!

ছোটোকাকুকে ওরা ধরে ধরে বাড়িতে নিয়ে যেতেই তাপসী অত্যন্ত বিচলিত হলেন। বললেন, তুমি কি চিরদিনই এসব করবে ভোপাল?

ছোটোকাকু বললেন, যতদিন না করলে চলবে না, ততদিন তো করতেই হবে বউদি।

দিলীপ বললো, মাসিমা ভোপালকাকু তো নিজের জন্যে করেননি। অবিনাশকাকাকে বাঁচাবার জন্যেই...

তাই?

আর কিছু বললেন না তাপসী।

এ পাড়ার প্রত্যেক মহিলা অবিনাশবাবুর বিশেষ ভক্ত। অথচ প্রায় কারো সঙ্গেই অবিনাশবাবুর আলাপ নেই। ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না ঋভু। তবে মহিলামাত্রই সাহিত্য, কাব্য, গান, ছবি, ভব্যতা এসব যাঁদের মধ্যে বা কাছ থেকে পান, তাঁদের চিরদিনেরই ভক্ত এই সত্যটি লক্ষ করেছে ঋভু।

তাপসী, ছোটোকাকুর ক্ষত পরিষ্কার করে আয়োডিন ও বেঞ্জিন লাগিয়ে তুলো দিয়ে ভালো করে মুছে দিলেন। জামাকাপড় বদলে নিতে বললেন। সব রক্তে মাখামাখি হয়েছিল। তারপর গরম চা করে খাইয়ে বললেন, এবারে শুয়ে পড়ো। টেপিড-ওয়াটারে ক্যালিফস সিক্স-এক্স গুলিয়ে এনে দিচ্ছি। ঘুমিয়ে পড়বে। রাতে খিচুড়ি হবে। তোমাকে উঠিয়ে খাওয়াব। তখন ব্যথা কমার ওষুধও দেব।

দিলীপ আর ঋভু যখন বাইরে এল তখন বেলা পড়ে আসছে। তাপসী বললেন, একটু পরই তোর বাবা আসবেন। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেই পড়তে বোসো।

ঋভু ভাবছিল, কী পড়বে। না, বইগুলোর মধ্যে ইন্টারেস্টিং কিছু পায় না, মাস্টারমশাইদের পড়ানোর মধ্যেও। একমাত্র ইংরিজি ও বাংলা ছাড়া। তাছাড়া, বইয়ে তো সব ভালো ভালো কথা লেখা

থাকে। তাতে তো তৈলাক্ত বাঁশে চড়ার অঙ্ক থাকে অথবা চৌবাচ্চার জল ফুরোনোর। অবিনাশবাবুকে যখন লাথি খেতে হয়, সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে ম্যাটট্রিক ফেল-করা ছোটোকাকুকে যখন রক্তাপ্লুত হয়ে ফুটপাথে শুয়ে থাকতে হয়; তখন কোনও পদ্ধতি আর ফর্মুলাতে সেই অংকের সমাধান হতে পারে তার হদিস তো পড়ার বইয়ে থাকে না। বেশি পড়ে-টড়ে হবে কি ছাই!

ঋভু বলল, তোর জন্যে খুব গর্ব হচ্ছে রে দিলীপ আমার। আর আমার জন্যে লজ্জা হচ্ছে। গভীর লজ্জা।

গলির ও পাশের বাড়িতে থাকত ঘণ্টুরা। অরুণ এবং বরুণ। না, কিরণমালা ছিল না। ওদের নিজেদের বাড়ি ছিল সাদার্ন অ্যাভিন্যুয়ের একেবারে উপরে। সম্ভবত কোনো লেখিকার বাড়ির পাশে। লেখিকার নামটি আর মনে নেই এতদিন পরে। যুদ্ধের জন্যে ওদের বাড়িটি আর্মি রিকুইজিশান্ করে নেওয়াতে ওরা সকলে এই বড়ো বাড়িতে এসে বসবাস করছিলেন। রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে অরুণ-বরুণদের বাড়ির পরেই ছিল কোকোদের বাড়ি।

ঘণ্টু বললো, তুই যা করলি ভাই দিলীপ তার কোনো প্যারালাল নেই। আর তোর রোলটা, বুঝলি ঋভু; বড়ই লজ্জার।

ঋভু মাথা নাড়িয়ে সায় দিল।

ঘণ্টু দেখতে ছিল ধবধবে ফরসা। রোগা। মেয়েলি মেয়েলি ছিল একটু। ঘরকুনো। পড়াশুনা করত। বেঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে এক হাত পেছনে নিয়ে অন্য হাতের সঙ্গে বেঁধে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে কথা বলত। ওর খুড়তুতো ভাইয়েরা, অরুণ, বরুণ ইত্যাদিরা ওর তুলনায় অনেক খোলামেলা ছিল। পুরুষ-পুরুষ।

ঘণ্টুর এই কথাতে দিলীপ বলল, ঋভুদা যা পারে তা আমি পারি না আর আমি যা পারি তা ঋভুদা পারে না। আসলে ঋভুদা কবিতা লিখতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, গান গাইতে পারে। আমি তো শুধু মারামারিই করতে পারি।

দিলীপ যাই বলুক না কেন, ঋভু তার হৃদয়ে গভীরভাবে অনুভব করল যে কবিতা লিখলে বা ছবি আঁকলেই যে ললিতলবঙ্গলতা হতে হবে তার কোনোই যুক্তি নেই। শুধু যুক্তি নেই যে, তাই নয়, সেটা অভিপ্রেতও নয় আদৌ। যে জগত "শক্তর ভক্ত নরমের যম" সে জগতে শক্ত না হওয়াটাই পরম মুর্খামির। ওই মারকুট্টে গোয়ালা আর গুণ্ডা ধুনুরি আজ বেচারী অধ্যাপক অবিনাশবাবুকে যা বে-ইজ্জতি করল তা পরদিন কলেজের ছেলেদের কাছে প্রবল বাগ্মীতার সঙ্গে বক্তৃতা দিয়েও মোছা যাবে না। যারা সূক্ষ্মতা জানে না, নম্রতা বোঝে না, বাঙালি জাতের স্বভাব ও চরিত্রকে দুর্বলতারই অন্যরূপ বলে চিরদিন যারা জেনে এসেছে তাদের কাছে সংহারমূর্তিই হচ্ছে একমাত্র প্রণিধানযোগ্য মূর্তি। দরকার পড়লে, যে—হাতে তুলি ধরে বা কলম ধরে সেই হাতেই পিস্তল বা ছুরি ধরতে হবে। না ধরতে পারলে, বাঙালি ভীতু, বাঙালি গোবেচারা, বাঙালি ওয়ার্থলেস এই অপবাদ কিছুতেই ঘোচানো যাবে না।

ঋভুর মধ্যেও একজন দিলীপের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, একজন ছোটোকাকুকে; যে অন্যায় দেখলেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বিপদের মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে।

ছোটোকাকু পড়াশুনোয় ভালো কী মন্দ, সে বিচার ঋভু কোনোদিনও করেনি। ছোটোকাকু যে নিজের জীবনের "পরোয়া করে না" এইটাই বারবারই দেখেছে ঋভু। এবং দেখেছে বলেই, ছোটোকাকুকে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রেখেছে নিজের হৃদয়ে। জীবন তো কোটি কোটি মানুষের আছে! মানুষ হয়ে জন্মালেই তো সে জীবন্তই; আমৃত্যু। কিন্তু কোন মানুষ তার জীবনটাকে নিয়ে কী করল এই সংসারে তার উপরেই তো জীবনের মূল্য! এতো দুরন্ত মানুষ আবার কত শান্ত। তনুমাসির সঙ্গে বিয়েতে ঋভুর মা-বাবা রাজি না-হওয়াতে নিজে কত না কেঁদেছিলেন কিন্তু দাদা বউদির বিরুদ্ধতা করেননি। কোনো সমালোচনা করেননি তাঁদের সিদ্ধান্তর। অথচ...

ঘণ্টু বলল, আজ যা গেল। কালই বিকেলে আমাদের বাড়িতে আসিস।

দিলীপ বলল, যা গেল, তা তো আমাদের! তোর কি হল। চল্ চল্ আজই চল্। আড্ডা মারি।

ঘণ্টুদের বাড়িতে আসা মানে, ওদের ছাদে আসা। বিকেলে প্রথম পর্বে ওদের কাজিনদের মধ্যে যারা মেয়ে তাদের এক্কা-দোক্কা এবং "এই কুমির তোর জলে নেমেছি" খেলা যে হয়ে গেলে ঘণ্টুর নেতৃত্বে শুধু ছেলেরাই থাকত। পড়তে যেতে হবে একটু পরে সকলকেই তাই তড়িঘড়ি নানা বিষয়ে এবং কখনও কখনও রসের বা নিষিদ্ধ বিষয়ের আলোচনাও হতো। নানা বিষয়ের আলোচনা হতো। ঘণ্টু উঁচু ক্লাসে পড়তো এবং ঋভুদের তুলনায় অনেক বেশি জানত। অনেকেই জানত শুনত। একটু কুনো ছিল বলেই পড়াশুনোও করতো নানারকম।

ঘণ্টুদের ছাদে ঘুরে ঘুরে গল্প হচ্ছে। কোকো, অরুণ, বরুণ দিলীপ (যে একটু ছোটো হলেও তার বাহাদুরিতে সে অন্যদের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে)। এবং আরও অনেকে।

ঘণ্টু যখন কথা বলত তখনই মুখভঙ্গী করত। মুখের ভাব এমনই করত যেন ও ঋভুদের বন্ধু নয়, জ্যাঠা।

ঘণ্টু বলল, যা জানলাম, তা তোমাদের ভাই না বলেও পারছি না, অথচ কী করে যে বলব তা ভেবেও পাচ্ছি না। কথাটা মনে করেই আমার গা-বমি বমি করছে হে! কথায় কথায় জ্যাঠাদের মতো হে! হে! করত ঘণ্টু। আর কোনো কথাই সোজা করে বলা তার স্বভাব ছিল না। কথার মধ্যে মধ্যে থেমে তার কমলালেবুর কোয়ার মতো লাল ঠোঁটদুটি জিভ দিয়ে চাটত, তারপর আবার শুরু করত।

দিলীপ বলল, অতো ভূমিকা না করে ছাদের কোণে গিয়ে বমি করেই এসো না।

রিয়্যাল জ্যাঠার মতো ঘণ্টু বলল, না হে। তোমরা বুঝবে না আমি কী বলতে চাইছি। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেও আমার বমি পাচ্ছে।

কোকো বলল, আহা বলেই ফ্যালো না দয়া করে। কতবার আর বমির কথা বলবে?

বলব? বলি?

আর মেয়েলিপনা না করে বলো।

দিলীপ বলল।

ঋভু তখন ক্লাস থ্রীর ছাত্র। মন্টু ক্লাস ফাইভের। কোকো ঋভুর সহপাঠী। দিলীপ সম্ভবত ক্লাস টুর। শের-ই-কলকাত্তা!

ঘণ্টু বলল, কথাটা শোনার পর থেকেই রাতে আমার ঘুম হচ্ছে না। আমরা কী করে পৃথিবীতে এলাম, তোমরা কেউ কি জানো?

ঘণ্টুরা কালিধন ইনস্টিট্যুশনের ছাত্র। আর ঋভু আর দিলীপ তীর্থপতি ইনস্টিট্যুশনের। যেন ইংল্যান্ডের "হ্যারো" আর "ইটন"। যেখানে ভারতের ত্রাণকর্তা বা বড়োকর্তারা লেখাপড়া করেছিলেন। যেমন, মিস্টার জবাহরলাল নেহরু।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে থাকল। ঋভুও।

ঋভু বলল, কেন? মা, গঙ্গায় চান করছিলেন একদিন, ঠাকুমার সঙ্গে। তখন দেখেন মেটে-রঙা একটি হাঁড়ি ভেসে যাচ্ছে আর তার ভিতর থেকে ওঁয়াও-ওঁয়াও করে শিশুর কান্না ভেসে আসছে। তাই দেখে মা হাত বাড়িয়ে হাঁড়িটাকে কাছে টেনে দেখেন মূর্তিমান আমি!

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, শিশুমঙ্গলে তুমি জন্মেছিলে! আর মাসিমার জ্ঞান ফেরার পর মাসিমা দেখেছিলেন সাদা ধবধবে বুদ্ধদেব মাসিমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঋভু ধন্দে পড়ে বলল, তাই তো! অথচ মা দুটি গল্পই বলেছেন আমাকে। সেটাও ঠিক।

দিলীপ বলল, ধ্যাৎ! তুমি জানো না, আমাদের এখানে নিয়ে আসে সারসেরা। বিদেশি সারস। সাদা ধবধবে, লম্বা গলার। আমাকে এক বেঁটে কালো সারসে এনেছিল তাই আমি বাঁটকুলে এবং কালো।

দিলীপের কথাতে সকলে হেসে উঠল।

ঘণ্টু মুখটা বেঁকিয়ে বলল, কিন্তু জন্মটা হয় কী করে?

অরুণ বলল, জন্ম হয়। আবার কী করে কি? দাদা, তোর কথার রকমই আলাদা।

ঘণ্টু তার ফরসা দুবলা মুখে অশেষ গাম্ভীর্য এনে বলল, আমি তোর থেকে আলাদা তাই।

নিজের জুলপির কাছে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে দেখিয়ে বলল, এখানে কিছু অন্য জিনিস আছে, বুঝলি।

বলেই বলল, তোমরা কি জান যে, আমাদের বাবারা এবং মায়েরা দুজনে মিলে আমাদের প্রত্যেককে এই পৃথিবীতে এনেছেন।

ঘণ্টু ঘোষণার মতো বলল।

তার মানে? বাবাদের আবার কি করার অছে এর মধ্যে। জন্ম তো দেন মায়েরাই, মায়েরাই...

আছে।

ঘণ্টু বলল মুখ বেঁকিয়ে।

ঘণ্টুর মধ্যে জ্ঞান যত ঘনীভূত হতো ওর মুখবিকৃতি ততই বাড়ত। মুখটা বাংলার পাঁচের মতো করে ও বলল, ব্যাপার আছে বলেই না বলছি হে তোমাদের!

কী ব্যাপার তা বললে বলো, নয়তো চেপেই যাও।

আহা! আমি তো বিলক্ষণই জানি। কিন্তু সব কথা প্রকাশ করা ভারি মুশকিল। ভাষার উপরে আমার এমন দখল নেই যে আমি যে কথাটা জেনেছি তা তোমাদের সোজাসুজি বলতে পারি। বললে, হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তা বিশ্বাস করবে না আর দিলীপের মতো মাথামোটা মারকুটে ছেলে হয়তো শুনে আমাকে মেরেই বসবে। কী দরকার আমার বলার! তবে একটা কথা শুনে যাও। আমাদের জন্মের পেছনে শুধু মায়েরা একাই নন, বাবারাও আছেন। সে এক গভীর চক্রান্ত। তোমরা যদি তা শোনো তাহলে লজ্জায় ঘেন্নায় মা-বাবার চোখের দিকে চাইতে পর্যন্ত পারবে না। বড়ো নোংরা ব্যাপার হে! বাবা আর মা মিলে কী করে যে আমাদের পৃথিবীতে আনলেন তা শুনলে ঘেন্নায় গা-রিরি করবে হে।

ধুত্তেরি! তখন থেকে খালি পাঁচালি গাইছে, খালি ধুয়ো; গান নেই। মারো গুলি। বলতে হবে না তোমার।

দিলীপ বলে উঠল।

কে কী বুঝল বা অনুমান করল ওদের মধ্যে ঘণ্টুর কথা শুনে, তা ঋভু জানে না কিন্তু ওর নিজের নির্মল মনে মানুষের জন্মরহস্য সম্বন্ধে আবিল হলো ধারণা। তেমন ধারণা হোক তা ঋভু কখনওই চায়নি। অস্পষ্ট একটা ব্যাপার তার মনে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছিল। স্নিগ্ধ দখিনা বাতাসে সেই ধোঁয়াশা একবার উড়ে যাচ্ছিল, পরক্ষণেই আবার ঘন হচ্ছিল।

ঘণ্টু এসব অস্পষ্ট কথা তো না বললেই পারত! পৃথিবী, মা, বাবা, ভাইবোন নিয়ে ঋভুদের সকলেরই জীবন কী সুন্দর! কলকাতার বাসা-বাড়ির পেছনের মাঠ, যেখানে শীতকালে ভেড়াদের লোম কাটা হয়, গরমে যেখানে ফিনফিনে পাখনায় কাশ্মীরি বাদাম রঙা ফড়িং ওড়ে দলে দলে, বর্ষায় যেখানে নিমফুল উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে আলতো পায়ে মাটি পায়; সেই সুন্দর স্পষ্ট পৃথিবীতে কোনো কিছু অসুন্দর অস্পষ্টতার ভূমিকা কেউই আনুক এ ঋভুর পছন্দ নয়।

রোদ পড়ে গেছিল। পথে পথে কাঁধের উপরে মই নিয়ে করপোরেশনের লোকেরা বেরিয়ে পড়েছে। গ্যাসের বাতি জ্বলে উঠবে এখুনি। একজন মইটা ধরে নীচে দাঁড়াবে অন্যজন মই বেয়ে উঠে গিয়ে বাতি জ্বালবে।

এই গ্যাসে বাতি-জ্বলার সময়টুকু ছিল ঋভুর "আউটার লিমিটস্"। বাবার কঠিন আদেশ ছিল, গ্যাসের বাতি জ্বলার আগে বাড়ি ফেরবার। যেখানেই থাকে না কেন।

ঋভু বলল. ভারাক্রান্ত মনে; চলি আমি।

দিলীপ বলল, চলো, আমিও যাই।

ঘণ্টুদের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ অরুণ-বরুণের মা, কাকিমার সঙ্গে দেখা হলো।

কাকিমা বললেন, কেমন আছিস রে ঋভু?

ঋভু কাকিমার চোখে না চেয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, ভালো ভালো। ভালো কাকিমা।

তোর ছোটোকাকা ভালো আছেন তো?

ভালোই। ব্যথা আছে খুব। থাকবে দু একদিন।

এই যে বিচ্ছু ছেলে দিলীপ। তুই কেমন আছিস?

দিলীপের গলার স্বরটা একটু নাকিনাকি ছিল। বলল, ফাঁসক্লাস কাঁকিমা।

ঋভু ভাবছিল, অনেক কথাই এ সংসারে থাকে, যা না জানাই হয়তো ভালো। অনেক অস্পষ্টতা থাকে; যা স্পষ্ট না হলেই তার সৌন্দর্য অটুট থাকে, রংপুরের শীতের সকালের মতো, বর্ষার কালো হয়ে-আসা ছায়া আর হাওয়ায়-দোলা সুগন্ধি দুপুরের মতো।

ঘণ্টুকে এড়িয়ে যাবে ও এবার থেকে। বড়ো অশান্তি আনে মনে, ঘণ্টুর সব জ্ঞানই! মনে মনে বলল, ঋভু।

হৃষীকেশ, ছোটোকাকু আবারও মারামারি করেছেন জেনে খুবই বিরক্ত হলেন। উনি মুখে কাউকেই প্রায় কিছুই বলতেন না। যা বলতেন তা তাপসীকে এবং আড়ালে। তাপসীই ছিলেন হৃষীকেশের শক-অ্যাবজর্বার। অন্যদেরও হৃষীকেশের সব বক্তব্যকে মধু মাখিয়ে তাপসীকেই পৌঁছে দিতো হতো জনে জনে। তার মধ্যে অনেকই কঠিন ও রূঢ় ব্যক্তব্যও থাকত।

রাতে খেতে বসে ভালো করে খেতেই পারল না সেদিন ঋভু। বাবা-মায়ের মুখের দিকে সত্যিই চাইতে পর্যন্ত পারছিল না। কোনোরকমে ঘাড় গুঁজে খেয়ে উঠে বাইরে গিয়ে উঠোনের পাশের চানঘরের চৌবাচ্চার জমানো জল মগে করে তুলে মুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে এল। ছোটোকাকুকে মা এসে খিচুড়ি খাইয়ে গেছিলেন। ওরা খেতে বসার আগেই অরা খাওয়াদাওয়ার পর বাইরের ঘরে এসেছিল ছোটোকাকুকে ওষুধ খাওয়াতে। হোমিওপ্যাথিক বা বায়োকেমিক ওষুধ। নাম ভুলে গেছে ঋভু। কিন্তু তাপসীর কাছে একটি কাঠের বাক্স ছিল খোপ-খোপ করা। তার মধ্যে ওই সব ওষুধের খুদে খুদে ফাইলগুলি থাকতো।

অরা সেদিন একটি হালকা ছাইরঙা-ফ্রক পরেছিল। ফ্রকটার ঝুল এসেছিল হাঁটুর একটু উপর পর্যন্ত। জামার নীচে ওর সাদা নিমা দেখা যাচ্ছিল। অরা বলল, ছোটোকাকুর কপালে হাত দিয়ে; জ্বর ছোটোকাকুর। দাদা বড়ো লাইটটা নিবিয়ে দে। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তুই ছোটোকাকুর পা টিপে দে।

ছোটোকাকু নাকি নাকি গলায় বললো, নাঁ নাঁ। ব্যাঁথা। সঁব জাঁয়গাতে ব্যাঁথা।

তবুও অরা ছোটোকাকুর খাটের এক পাশে আসন পিঁড়ি হয়ে বসল। আব ওর কাঁচা কাগজি-লেবু রঙা পায়ের পাতা, গোড়ালি, কাফ -মাসল এবং স্বল্পালোকিত ছাইরঙা ফ্রকের আভাস ওকে ঋভুর ছোট বোন বলে মনেই হচ্ছিল না।

ঘন্টুটা একটা থার্ডক্লাস লোক।

অরা চলে গেলে, ছোটোকাকু বলল, আমার শার্টের পকেট থেকে পয়সা নিয়ে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট নিয়ে আয় তো!

দেশলাই?

না। দেশলাই আছে।

সিগারেট এনে ছোটোকাকুকে দিলে ছোটোকাকু বলল, আমাকে একটু ধর, উঠিয়ে বসাতো একটু। আরাম করে সিগারেট খাই একটা।

ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে ছোটোকাকু?

ঋভু উদ্বিগ্ন গলায় শুধোল।

না। ছাড়বে না।

তুমি কী করবে?

কী করব? মারলে, মার খেতে হয়। মার খাওয়ার ভয় করলে কাউকেই মারা যায় না।

তোমাকে যদি মেরে ফেলে?

দূর! মেরে ফেললে অনেক ফ্যাচাং। আর যে মরল সে তো বেঁচেই গেল রে ঋভু। আমি মরলে কার কী যাবে আসবে? আমি আবার একটা মানুষ, কেই বা চোখের জল ফেলবে এমন একজন মানুষের শোকে? বল্। হ্যাঁ। মা আর বউদি একটু ফেলবে। তাতে আর কি? কাকের ছানা মরে গেলেও তো কাক কাঁদে। দেখিসনি?

না তো!

কোনোদিন লক্ষ্য করিসনি তাই দেখিসনি। দেখবি নজর করে। আনন্দটা সহজেই চোখে পড়ে। দুঃখকে দেখার চোখ তৈরি করে নিতে হয়। কাক-বগের দুঃখও। যাদের দুঃখর খোঁজ কেউই রাখে না তাদের দুঃখের খোঁজ না রাখলে তুই মানুষ কিসের?

অবিনাশবাবু বড়ো ক্যাবলা। না?

ক্যাবলা বলিস না। কত পণ্ডিত উনি। শুনেছি অবিনাশদার ক্লাস করতে অন্য কলেজ থেকে ছেলেমেয়েরাও না কি আসে।

তুমিও গেছিলে না কি?

দূর। আমার তো বেড়া-ডিঙোনোই হলো না। হবেও না। অবিনাশদারাই বাঙালিদের আদর্শ ছেলে, আদর্শ জামাই; আদর্শ বাবা। এমন স্বামী পাবার জন্যেই বাঙালি মেয়ে-মায়েরা শিবের মাথায় ঘড়া-ঘড়া জল ঢালে চিরদিন। কিন্তু বাঙালিরা তাদের লালটু চেহারা আর মাথাটাকেই শুধু দাম দেয় এবং মনে করে একমাত্র মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্ব তাতেই! ওই ভাগলপুরের ভঁয়ষা-লোটন জঙ্গলের মোষের মতো গোয়ালা আর হাজারীবাগের ঝুমরীতিলাইয়ার ধুনুরি যে অবিনাশদার মানসম্মানের বিনাশ ঘটাল অত লোকের সামনে তাতে কি ভালো হলো? ভালো লাগলো? কোনো বাঙালিরই ভালো লাগে?

অবিনাশবাবুর মান অত সহজেই চলে গেলে তা মান কিসের?

ঋভু বলল।

বাঃ। ভালো বলেছিস তুই। কিন্তু মানের দুরকম থাকে। এক, তোর ভিতরের মান অভিমান বল; অত্মসম্মান বল, যাই বল; সেই মান। আর তোর বাইরের মান। তোকে যদি কেউ পথের মধ্যে বিনা কারণে অন্যায়ভাবে লাথি মারে আর তুই অনেক ইংরিজি বা অঙ্ক জানিস বলে যদি সেই লাথি হজম করে চলে আসিস মাথা নিচু করে, তবে তোর বাইরের মান দশজনের সামনে খোয়া যে গেল না এ কথা তো বলতে পারবি না। আসলে কী জানিস, এই পৃথিবীতে নানারকম মানুষ আছে। তাদের নানারকম মানসিক স্তর। যে স্তরের মানুষের সঙ্গে যখন কারবার করতে হবে, নিজেকে ঠিক সেই স্তরেই নামিয়ে আনতে হবে। তা না হলে, তুই তাদের সঙ্গে মিশতে যেমন পারবি না, তাদের শিক্ষাও দিতে পারবি না। সবাই সব ভাষা বোঝে না। যে, যে-ভাষা বোঝে, তার সঙ্গে সেই ভাষাতেই কথা বলতে হয়। এই হচ্ছে, মোদ্দা কথা। যেমন করে দামি রুমালে নিজের নাকের সিকনি মুড়ে নিয়ে কেউ কেউ বাড়ি যায় ভদ্রতা বাঁচিয়ে, তেমনিই কেউ কেউ মাথা নিচু করে ইজ্জৎ বাঁচিয়ে বাড়ি যায়। তাতে ইজ্জৎ আসলে বাঁচে না। বাঁচা-মরার কথা ইজ্জৎ ঠিকই জানে।

তোমাকে ওরা কবে মারবে? আরও মারবে?

হ্যাঁ। মারার মতো মারবে। হয়তো মেরেই ফেলবে। তবে কবে মারবে সে ওরাই ঠিক করবে। আচমকা, একা পেয়ে ধরে নিয়ে যাবে।

তারপর?

তারপর আর কি? ভালো হয়ে উঠে আমিও আবারও মারব ওদের। একা পেয়ে। আচমকা।

এমনিই চলবে? কতদিন?

যতদিন চলে। কোনো মারামারিরই শেষ নেই। তা তোদের লেখাপড়ার মারমারিই হোক, কী আমার মারামারিই হোক।

ঠাকুমা বললেন, আজকে মাতির বাড়ি যাবো। চল ঋভু।

মাতি মানে, ছোটোপিসিমা। তখন ছোটোপিসিমারা বেহালাতে থাকতেন। আজ শনিবার। ছোটোপিসিমার বাড়ি গেলে রাতটা ওখানেই থেকে আসবে। রবিবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ফেরা হবে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ট্রামে চড়ে মোমিনপুরের মোড়ে এল ঋভু, ঠাকুমাকে নিয়ে।

প্রমীলাবালা পুরানো দিনের বিধবা। মাথার চুল সন্ন্যাসিনীদের মতো করে কাটা। পরনে থান শাড়ি। জুতোও পরতেন না। খালি পা। কিন্তু তাতেও তাঁর গোলাপফুলের মতো রঙ আর কাটাকাটা মুখশ্রী আড়াল করা যেত না। একটু রোদ লাগলেই সেই গোলাপি মুখ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠত।

মোমিনপুরের মোড় থেকে ট্রাম ধরে বেহালা। বেহালা ট্রাম ডিপোতে ট্রাম ঢোকবার আগে ঋভু ঠাকুমাকে সঙ্গে নিয়ে কাঁচাপথে হাঁটা দিত। আঁকাবাঁকা পথ। আম, জাম, কাঁঠাল, নিম, ফলসা, লিচু, কনকচাঁপার গাছ ঝুঁকে থাকত পথের দুধারে। মাঝে মাঝে ডোবা। কচুরিপানার উপরে উঁপরে ডাহুক নেচে বেড়াতো। বউ-কথা-কও পাখি ডাকত গাছের আড়াল থেকে। ছাতারে আর হাঁড়িচাচাচারা দেখা দিত। তাছাড়া ছিল আরো হরেকরকম পাখি। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পথে হাঁটত ঋভু। ঠাকুমার সঙ্গর কথাও ভুলে যেত। এ এক অন্য জগৎ। যে-জগৎ তাদের রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ভাড়া-বাড়িতে অকল্পনীয় ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে ঋভু চলে যেত অন্য এক জগতে, প্রকৃতির বুকের কোরকে। যে জগতের রূপ-রস-স্বাদ-রঙ-স্পর্শ দৃশ্য তাকে অভিভূত করে ফেলত। মাঝে মাঝেই থেমে পড়ে সে কোনো বড়ো গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতো।

ঠাকুমা তাড়া দিতেন। বলতেন, কীরে ঋভু! হইল কি তর?

কিছু না। কিছু না।

বলত, ঋভু।

ছোটো পিসিমণির তখন এক মেয়ে আব দুই ছেলে। লুনা, সাগর আর সমর। তারা ভারি ন্যাওটা ছিলো ঋভুর। সবসময়ই ঋভুদা! ঋভুদা! করত। ভালোবাসতে জানত তারা। ওদের কাছে ঋভু ছিল আদর্শ। ঋভুর সবকিছুই ভালো দেখত ওরা। যদিও ঋভু জানত যে তার মধ্যে ভালো বলতে কিছুই ছিল না। শৈশবের ভুলের ঘোরেই তার পিসতুতো ভাইবোনেরা অমন করত। ঠিক ওমনি ন্যাওটা ছিলো ঋভুর বড়োপিসিমার দুই ছেলে, যারা ঋভুর অনুজ ছিল, ঝন্টু আর বাপ্পু। তারা অবশ্য থাকত আসামের গোয়ালপাড়া জেলার তামারহাটে এবং গৌরীপুর বা কুচবিহারের হোস্টেলে।

দরজায় কড়া নাড়তেই দরজা খুলে যেত এক হাট আনন্দর একেবারে মধ্যিখানে। সাগর-সমরের জন্যে সুন্দর ছোট্ট সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন পিসেমশাই। ওদের বাড়ির সামনের মাঠে সাইকেল চড়ত ঋভু। নয়ত ফুটবল খেলত গরমের দিনে। এবং শীতে ক্রিকেট। ছোটো পিসিমণিদের প্রতিবেশী এস এন মুখার্জি সাহেবও ছুটির দিন হলে ওদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতেন। কোনো কোনো মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হলেও শিশুদের সঙ্গে সমানে মিশবার ক্ষমতা রাখেন এবং তাঁরা সাধারণত ভালো মানুষও হন। মুখার্জি সাহেব এই রকম মানুষ ছিলেন। উনি ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন।

শনিবারও ছোটোপিসেমশাইর সন্ধে হয়ে যেতো কারখানা থেকে ফিরতে ফিরতে। কম কথা-বলা, অন্তর্মুখী, ঈশ্বরভক্ত মানুষ, ছোটো পিসিমার নানান আবদার ও আহ্লাদ তিনি পূরণ করতেন এবং তখনকার দিনের যৌথ-পরিবারের পরিবেশে নিজের মাকে সম্মান দিয়ে গৃহদেবতার পুজো করে নিজের স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না।

ছোটো পিসেমশাই বাড়ি ফিরতেই হেসে বলতেন, ঋভু এসেছো!

তারপরই চা খেয়ে নিয়ে নিজেই থলে হাতে করে বাজার করতে বেরুতেন।

যাবার আগে বলতেন, ঋভু, তুমি কি মাছ খাবে?

আজকের দিনের খুব কম মানুষের এবং পিসেমশাইদের তো বটেই, সেই সময়, সাচ্ছল্য এবং মানসিকতা আছে। নেই বলে আজ পেছন ফিরে চেয়ে সেই সব দুর্লভ বৎসল মানুষদের কথা মনে পড়ে। খাওয়া ব্যাপারটা তখনকার দিনে একটা আনন্দ বলে গণ্য হতো। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র তখনও ক্লোরোস্টাল, ব্লাডসুগার, ব্লাড-প্রেসার ইত্যাদি নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি রকম সচেতন ছিল না। সব অবস্থার মানুষদেরই স্বাভাবিক জীবন-যাপনে কোনো বাধা ছিল না। পরিণত বয়স্ক মানুষের মৃত্যু হলে অন্যরা সেই ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতেন। খবরের কাগজে খবর বেরুত যে তিনি "সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।" জীবদ্দশাতেই নানা রোগের প্রকোপ মৃত্যুভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আজকালকার মানুষদের মতো পুতুপুতু করে বাঁচার মতো মূর্খামি তাঁদের ছিল না।

ঋভুর ছোটো পিসেমশাইয়ের জীবনে প্রাচুর্য-অপ্রাচুর্যর ওঠানামা অত্যন্ত তীব্র এবং পৌনঃপুনিক ছিল। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ছোটো পিসেমশায়কে সে বিরক্ত বা আশাহত বা নিরানন্দ দেখেনি। পরম সুখের দিনেও যেমন, তেমন পরম দুঃখের দিনেও তাঁর গৃহদেবতার এবং জন্মদাত্রী মায়ের প্রতি সম্মান ও কর্তব্যজ্ঞান ছিলো প্রবলতম। ঋভুর মতো ছোটোদের প্রতিও তাঁর আচরণ ছিল খুবই কোমল। মুখে হাসি লেগে থাকত সব সময়ই। এই বাবদে ঋভুর দুই পিসেমশইয়ের স্মৃতিই বড়ো অম্লান, উজ্জ্বল এবং স্নেহরসস্নিগ্ধ হয়ে আছে। অমন পিসেমশাই ঋভু নিজে হতে পারলে খুবই খুশি হতো। কিন্তু আজকের জীবনে অনেক কিছু হতে ইচ্ছে করলেও হতে পারা যায় না। পরিবেশ বাদ সাধে, বাধা থাকে হাজার রকমের। বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ। সেই প্রেক্ষিতে ঋভুর দুই পিসেমইশায়ের কথা বার বার মনে পড়ে এবং মনে পড়ে, কৃতজ্ঞতায় বুক টনটন করে।

ছোটো পিসেমশাইরা পরে একটি সময় বেহালা ট্রাম ডিপোর খুব কাছে অন্য একটি ছোটো বাড়িতে চলে আসেন। তারও অনেক পরে যখন ঋভুর বাবার অবস্থা ফেরে স্বাধীন পেশায় যোগদানের পর, তখন হৃষীকেশের পাতিপুকুরের বাগান বাড়িতে গিয়ে থাকতেন পিসেমশাইরা। তখন আর্থিক কারণে সুখ ছিল না তাঁদের মনে কিন্তু তবুও মুখেব হাসিটি ম্লান হয়নি পিসেমশাইয়ের একটা দিনের জন্যেও।

এক বর্ষার দিনে ঋভু একা ফিরে আসছিল রবিবারের বিকেলে পিসেমশাইয়ের বাড়ি থেকে। কাঁচা পথ বেয়ে।

বৃষ্টি সবে থেমেছে। হাওয়াতে বাতাবি ফুলের গন্ধ ভাসছে। বাঁশঝোপ, লটকা গাছের, আমগাছের এবং আরো নানা গাছের পাতা থেকে জল ঝরছে টুপটুপ করে। পথের নানা পাখির স্বর বর্ষণসিক্ত স্নিগ্ধ সুগন্ধি নির্জন বিকেলে বহুদূর অবধি ছড়িয়ে যাচ্ছিল। মাকাল গাছে আশ্চর্য সুন্দর লাল ফল ধরেছে। সেই লালের আভাটিব রকম সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করার মতো ভাষা ঋভুর নেই। "পোস্ট অফিস রেড" বললে কিছুটা হয়তো বলা হয়।

বেহালা জায়গাটি তখন যে কী সুন্দর ছিল, তার সৌন্দর্যের রকম যে ছিল বেহালার ছড়ের আওয়াজেরই মতো, তা যাঁরা দেখেছেন সেই বেহালাকে, তাঁরাই জানবেন।

মাকাল গাছটির সামনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঋভু এমন সময় একটি মোটর গাড়ির এঞ্জিনের মিষ্টি শব্দ বৃষ্টির পরের নিস্তব্ধতার শান্ত শূন্যতার সমস্ত রন্ধ্র পূর্ণ করে এগিয়ে আসতে লাগল পেছন থেকে। এতক্ষণ মাকাল ফলের এবং বৃষ্টিভেজা প্রকৃতির সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়েছিল ঋভু এবার গাড়ির পেট্রোল-এঞ্জিনের মিষ্টি শব্দে মোহিত হয়ে গেল। একটু পরই গাড়িটিকে দেখা গেল। একটি ছোট্ট

সাদা সিঙ্গার গাড়ি। সেডান বডি। ঝকঝকে করে পালিশ করা। তার ওপরে বৃষ্টির জল দু এক ফোঁটা জমে আছে। বাকি জল হাঁসের গায়ে পড়ে জল যেমন পিছলে পড়ে গিয়ে শুধু মসৃণতার ঔজ্জ্বল্য রেখে যায়, তেমনিভাবে পিছলে পড়ে গেছে। ওই আশ্চর্য সবুজ গাছগাছালির পটভূমিতে সাদা গাড়িটি আঁকাবাঁকা কাঁচা-পথ দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল।

গাড়িটি যে কত যত্নে লালিত তা তার সিলভার-প্লেটেড মাডগার্ড, হেডলাইট ইত্যাদির ঝক্‌ঝকানি দেখেও বোঝা যাচ্ছিল। সেই সময়ে, মানুষের বুকে অনেক যত্ন ছিল। এই যত্ন শিখেছিল কলকাতার বাঙালিরা ইংরেজদের কাছ থেকে। গাড়ি, বাড়ি, সাইকেল, ফার্নিচার, কিনলেই হয় না তা যে অশেষ এবং প্রাত্যহিক যত্নে চিরায়ত করে তুলতে হয় সেই শিক্ষা ইংরেজরা আসার আগে বাঙালিদের ছিল না।

হঠাৎ গাড়িটা ঋভুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঁদিকের দরজাটা খুলে দিল একটি ফরসা সুগোল সোনার হাতঘড়ি পরা মেয়েলি হাত।

ঋভু দেখল, চন্দ কাকিমা আর চন্দ-কাকু।

কোথায় এসেছিলিরে ঋভু এখানে? অ্যাডভেঞ্চার করতে?

ছোটিপিসিমার বাড়িতে।

আপনারা?

আমরা এসেছিলাম একটি বাগানবাড়ি দেখতে।

কিনবেন?

ভাবছি।

অনেক গাছ আছে? নানান পাখি আছে তাতে?

আছে রে পাগলা। কী হলো? উঠে পড়!

আবার বললেন, চন্দকাকিমা।

চল্ ওঠ।

ঋভু নিজের পায়ের কাদামাখা নটিবয় শু-এর দিকে একবার তাকাল্ আর সিঙ্গার গাড়িটির অভ্যন্তরের সুদৃশ্য সিট এবং কার্পেটের দিকে। বলতে যাচ্ছিল ও যে, ট্রামে করেই চলে যাবে বরং। ও উঠলে, নষ্ট হয়ে যাবে গাড়ি।

চন্দকাকু বললেন, উঠে পড়ো। উঠে পড়ো।

খুবই সংকোচের সঙ্গে উঠে পড়ল ঋভু। চন্দকাকু আর কাকিমা যত্ন করে ঋভুকে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

পেছন ফিরে দেখল এখন মনে হয় এ পর্যন্ত তো কত লক্ষ মানুষের সঙ্গে দেখা হলো, কথা হলো, ঘনিষ্ঠতা হলো আত্মীয়, অনাত্মীয় কিন্তু স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন বড়ো স্বল্পজন। এই চন্দকাকু আর চন্দকাকিমা ঋভুকে এক বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। চন্দকাকুর দাদা বোধহয় ছিলেন বিখ্যাত চন্দ পেইন্টস কারখানার মালিক। যতদূর মনে পড়ে তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউরোপিয়ান। খুব সম্ভবত জার্মান। চন্দকাকিমা ছিলেন খ্রিস্টান। কোনো মিশনারি স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন তিনি। তাঁদের বিয়ে নিয়ে দু-জনের পরিবারেই অনেক অসুবিধা ছিল। হৃষীকেশের উদ্যোগেই বিয়েটা হয়। এক প্রচণ্ড বর্ষার দিনে—একটা দোতলা বাড়িতে, জল থই-থই করা পথ ভেঙে রজনীগন্ধা ফুলের তীব্র গন্ধর মধ্যে অতি সামান্য ক'জন আমন্ত্রিতদের সাক্ষী রেখে তাঁদের বিয়েটা হয়। ঋভুরা পুরো পরিবার সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিল। সেই থেকে চন্দকাকু এবং চন্দকাকিমা, কাকিমার নাম বোধহয় ছিলো সুনীতি, হৃষীকেশ এবং ঋভুদের সকলকে পরম আপনজন বলে জানতেন। মা, তাপসীর প্রতি ছিল তাঁদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। দেশপ্রিয় পার্কের পাশের পার্কসাইড রোডে ছিল তাঁদের নতুন কেনা ছোট্ট দোতলা বাড়ি। সাদা ইটালিয়ান মার্বেলে মোড়া ছিল। সাদা গাড়ি। সাদা অ্যালসেশিয়ান কুকুর। শৌখিনতার সংজ্ঞা ছিলেন ওঁরা দু'জনে। সভ্য-ভব্যতারও। নিচু স্বরে কথা বলতেন, নরম চোখে তাকাতেন দু'জনেই। বড়ো ভালোবাসা ছিল দু'জনের মধ্যে। এবং শ্রদ্ধা। যে গুণ, ভালোবাসার গোড়ার সিমেন্ট।

ঋভু ভাবতো, এই দম্পতির মধ্যে দাম্পত্যর মাধুর্য সম্বন্ধে যা কিছুই শেখার আছে তার সবই শিখে নেবে।

কিন্তু হয়নি শেখা।

অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের মেলামেশার পরিপন্থী হয় বা হয় মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষেরও মেলামেশায়। বড়োলোকদের বাড়ি গিয়ে কখনও সহজ, স্বাভাবিক বোধ করত না সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ঋভু। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো চন্দকাকুদের বাড়ি। অর্থ যেন স্নেহ-ভালোবাসার সৌধ গড়ে তুলেছিল সেখানে। কোথাও আধিক্য ছিল না এতটুকু। অপূর্ণতাও নয়।

অনেকই অর্থবান বন্ধুবান্ধব ছিল হৃষীকেশের। কিন্তু তাঁদের ব্যবহার ও মানসিকতায় অনেকই তারতম্য ছিল। চন্দকাকু আর কাকিমা যেমন কাদা-মাখা জুতো পায়ের ঋভুকে তাঁদের ঝকঝকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছিলেন তেমন অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রমও আবার ঘটেছিল অন্যর কাছে।

হৃষীকেশেরই এক বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম গোপনই রাখতে হচ্ছে। মনে করা যাক তাঁর নাম সেনকাকু। সেনকাকুর অবস্থা সাদামাঠা ছিল আগে। পরে উনি বড়লোক হন। সেনকাকু এবং সেনকাকিমার মতো সুদর্শন দম্পতি কলকাতাতে কমই ছিল। ওঁরা ছিলেন ব্রাহ্ম। অত্যন্ত মার্জিত রুচির উচ্চশিক্ষিত মানুষ। সেনকাকু পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত উঁচুতলার সরকারি চাকরি করতেন। সরকারি চাকরি ছেড়ে নিজের স্বাধীন পেশায় ব্রতী হয়েছেন। ডোভার রোডে চলে গেছেন বাড়ি কিনে। রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ভাড়া বাড়ি ছেড়ে। গাড়ি তো রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়িতে থাকাকালীনই কিনেছিলেন।

খেলা-মনস্ক এবং খেলোয়াড় হৃষীকেশ তখন ব্যস্ততার জন্যে ফুটবল খেলা দেখতে যেতে পারতেন না। কিন্তু ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচ অবশ্যই দেখতেন। ঋভু এবং অরাকে এবং আরো অনেককে নিয়ে যেতেন। বছরের সেই সময়ে ঋভুদের ডোভার রোডের বাড়িতে পায়েস, পিঠে আর কড়াইশুঁটির চপের মরশুম লেগে থাকত, ক্রিকেটের মরশুমেরই মতো। তাপসীর বানানো পাটিসাপটা আর কড়াইশুঁটির চপের আজ অবধি কোনো তুলনা খুঁজে পায়নি ঋভু। কড়াইশুঁটির পুরটা বানানোর এক বিশেষ প্রক্রিয়া তাপসী তাঁর ছেলেবেলায় গিরিডির দিনের রসদ হিসেবে মস্তিষ্কে জমিয়ে রেখেছিলেন। সেদ্ধ আলুর মোড়কটিও বানানো হতো এক বিশেষ প্রক্রিয়ায়।

খেলার পরই শীতের বেলা শেষ হয়ে যেতো এবং হৃষীকেশ সদলবলে বাড়ি ফিরতেন তাঁর সৈন্যদলকে নানা রকম পিঠে, চিতই, চষি ও পুলি; নারকোলের, ক্ষীরের পাটিসাপটা এবং কড়াইশুঁটির চপের উপর আক্রমণ চালাতে।

বাঙালিমাত্রই প্রথম বড়োলোক হবার পর খাওয়ার উপর হামলে পড়েন। তারপর জামা-কাপড়ের। তারপর সংস্কৃতির ওপর। অন্তত ঋভুর অভিজ্ঞতা সেই রকমই। কিন্তু হৃষীকেশ অর্ধশতাব্দীর উপর অত্যন্ত সচ্ছল অবস্থাতে কাটানো সত্ত্বেও আজ অবধি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ওই হামলে-পড়া ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এবং 'বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া' হিসেবে ঋভুর চরিত্রেও খাদ্যদ্রব্যের প্রতি এক অসীম দুর্বলতা সেঁধিয়ে রয়েছে। তার জন্যে কম গঞ্জনা ও কটূক্তি শুনতে হয় না। তবে জামাকাপড় বা সংস্কৃতির উপরে হৃষীকেশ কখনও হামলে পড়েননি। তথাকথিত "সংস্কৃতিসম্পন্নতা" এবং "জাতে-ওঠার" চেষ্টা থেকে তিনি চিরদিন নিজেকে দূর সরিয়ে রেখেছিলেন। যাকে "সোশ্যাল ক্লাইম্বিং" বলে তাকে হৃষীকেশ ঘৃণা করতেন; পয়সা হলেই শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষে যা করেন। সেই সব মানুষকে হৃষিকেশ অনুকম্পার চোখে দেখতেন। তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে এবং পেশার অমানুষিক পরিশ্রম নিয়েই তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। রাত আটটা ন'টাতে বাড়ি ফিরে চান খাওয়া-দাওয়ার পর রাত একটা দুটো অবধি ওয়েস্টার্ন থ্রিলার পড়তেন। "কাউ-বয় স্টোরিজ।" সাহিত্য-টাহিত্য বা গান-বাজনার ধার মাড়াননি কিন্তু তাঁর মতো উদার ও উচ্চ মানসিকতার মানুষ খুব কম মানুষই ছিলেন। তাঁর এক্সপেন্সিভ নেশা বলতে ছিল শিকার। একমাত্র শখ। মদ খাননি কোনোদিন, সিগারেটও নয়। পানজরদা খেতেন, তাও বার্ধক্যে পৌঁছে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

যাক। প্রসঙ্গান্তরে পৌঁছে যাওয়া হলো।

সেদিনের টেস্ট খেলা শেষ হবার পর পর ঋভুর বাবা হৃষীকেশের অস্টিন গাড়িখানি লোকে ভরে গেল। তখন দিশি গাড়ি না থাকলেও হৃষীকেশ বিড়লাদের ল্যান্ডমাস্টার, অ্যামবাসাডর 'কনসেপ্টে" বিশ্বাসী ছিলেন। "যতজন আঁটানো যায় ততজন ওঠো" এই রকম ভাব। যদিও প্রত্যেক গাড়ির ম্যানুয়ালে ক'জন বসার গাড়ি কোন্‌টি, তা লেখা থাকত। তা, সে গাড়ি অস্টিন, ব্যুইক, ডি-সোটা, মরিস প্যাকার্ড, ওল্ডসমোবিল, রোলস রয়েস বা যাই হোক না কেন। জার্মান গাড়ি ভারতে ইংরেজরা আনতে দিতেন না চল্লিশ-দশকের গোড়ার থেকে, তাই মার্সিডিজ, ভোকস্‌ওয়াগেন ইত্যাদি কোনো গাড়ি অথবা, পূর্ব-ইয়োরোপ ও রাশিয়ার কোনও গাড়ি তখন কমই দেখা যেত!

বাবার অস্টিন, ঝাঁকামুটের ঝাঁকার মতো ভর্তি হয়ে যাওয়াতে, বাবা বললেন, যা ঋভু, তুই সেনের গাড়িতেই চলে যা। বলে, গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন ধুলো উড়িয়ে।

ঋভু দৌড়তে দৌড়তে সেনকাকুর গাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছোল। গিয়ে দেখল সামনে সেনকাকু আর কাকিমা আর পেছনে কাকিমার দুই সুন্দরী যুবতী আত্মীয়া বসে আছেন।

বড়োলোক দেখলেই আড়ষ্ট বোধ করত ঋভু। আর বড়োলোকের লিপিস্টিক-মাখা ফটাফট ইংরিজি-বলা মেয়ে দেখলে তো কথাই নেই। ইংরেজরা সবে দেশ ছেড়েছে। তখনও সারা দেশ উঠে পড়ে সাহেব হওয়ার প্রতিযোগিতাতে শামিল হয়নি। চার্চিল সাহেব তাঁর কবরে তখনও যাননি। ইন্ডিয়া সম্বন্ধে তিনি যা বলে গেছিলেন তা ধ্রুবসত্য বলে প্রমাণিত হবে, তখনও তা জানা যায়নি। আজকালকার মতো-তাবৎ পাতিরাও সাহেব, মেমসাহেব হননি তখন।

সেনকাকু এঞ্জিন স্টার্ট করার আগে ডানহিল পাইপে "এরিনমর" তামাক ঠাসছিলেন।

ঠিক সেই সময়েই ঝোড়োকাকের মতো অতি সাধারণ পোশাকের অতি সাধারণ ঋভু হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছে গাড়ির পেছনের দরজার হ্যান্ডেলে হাত রেখে বলল, সেনকাকু! বাবারই গাড়িতে জায়গা নেই। বাবা বললেন, আপনার সঙ্গে যেতে। আপনারা তো আমাদের বাড়িতেই যাচ্ছেন?

অত্যন্ত সুপুরুষ সেনকাকু একবার দীঘল চোখ তুলে ঋভুর দিকে তাকিয়ে বললেন, এদিকে এসো।

ঋভু ঘুরে, ড্রাইভিং-সিটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সেনকাকু মুখ থেকে পাইপটা বের করে বললেন, কী বলছিলে?

উনি খুব ভরাট গলায়, নিচু স্বরে, স্পষ্ট করে, কেটে কেটে কথা বলতেন। এমনই ব্যক্তিত্ব এবং চেহারা ছিল যে, ডাকসাইটে মানুষেরাও তাঁর কাছে এলে কেঁচো হয়ে যেতেন।

প্রশ্নর উত্তরে যা বলার তা বলল ঋভু।

সেনকাকু পাইপটা এবারে ধরালেন।

সেনকাকিমা শান্তিনিকেতনের মেয়ে। মিশনারি কলেজেও পড়েছিলেন। দারুণ উচ্চারণে ভ্রূভঙ্গি করে ইংরিজি বলতেন।

তিনি বললেন, হৃষি মাস্ট বি ম্যাড।

সেনকাকু বাঁ হাতের দেড়খানা আঙুল নেড়ে কাকিমাকে চুপ করতে বলে বললেন, তোমাদের বাড়ি যে যাচ্ছি, সেটা সত্যি। তবে এটতো গোরুর গাড়ি নয়! এতে চারজনই বসতে পারে, মাত্র। সিঙ্গারগাড়ি। গাড়ির ম্যানুয়ালে লেখা আছে, এবং জাস্ট চারজনই।

বলেই, উনি গাড়ি স্টার্ট করে চলে গেলেন।

ধুলোর মধ্যে ঋভু দাঁড়িয়ে রইল। ডোভার রোড থেকে তীর্থপতি স্কুলে সে যেতো হৃষীকেশের অরার জন্যে কিনে-দেওয়া লেডিজ-সাইকেলে চড়ে, পৃথিবীর তাবৎ লোকের মজার খোরাক হয়ে। ধর্মতলা বা চৌরঙ্গি থেকে কী প্রকারে ডোভার রোডে ফেরা যায় সে সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই তার ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা, পকেটে পয়সাও ছিল না। একটাকা দিয়েছিলেন তাপসী, তার শেষাংশে একটু আগে ম্যাগনোলিয়া আইসক্রিম কিনে খেয়েছে।

অগণ্য গাড়ির হর্ন, চিৎকার চেঁচামেচি, মাউন্টেড পুলিশের গুঁতো খেতে খেতে দূরের ডোভার রোডের দিকে সে ধুলোর মধ্যে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল এই সেনকাকুই

দাসকাকুদের সঙ্গে, ঋভুর বাবার সঙ্গে, সাইকেলে করে অফিসে যেতেন। পয়সা মানুষকে বড়ো ছোটো করে দেয়। অধিকাংশ মানুষকেই।

অনেকক্ষণ পরে গভীর অন্ধকারে বাড়ি যখন পৌঁছোল ঋভু তখন দেখল সেনকাকু আর কাকিমা দুই সফিসটিকেটেড ইংলিশ-মিডিয়াম-স্কুলে পড়া বোনের সঙ্গে তৃপ্তি করে পিঠে ও কড়াইশুঁটির চপ খেয়ে ওদের বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন।

সেইদিন থেকেই, একে সুন্দরী, তায় ফটফট করে ইংরিজি-বলা মেয়েদের দেখলেই ঋভুর খুব রাগ হয়।

হৃষীকেশ বললেন, কী হলো? তোকে না বললাম যে, সেনের গাড়িতে আয়!

ঋভু বলল, সেনকাকু নিলেন না।

কেন?

বললেন, এটাতো গোরুর গাড়ি নয়!

হৃষীকেশ হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, তা ঠিক। সেন সাহেব মানুষ। এই জন্যেই ওকে ভালো লাগে। জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই ওর অ্যাপ্রোচটা "কপি-বুক" অ্যাপ্রোচ। ভালো। যারা করতে পারে, তাদের প্রশংসা করতেই হয়।

ঋভু স্তম্ভিত হয়ে তার ইনকনসিডারেট বাবার মুখে চেয়ে, নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

হৃষীকেশ তাঁর আনকনভেনশানাল এবং সময়ে সময়ে কোনো কোনো ব্যাপারে খুবই রিজিড এমনকি প্রি-হিস্টরিক মনোভাব অবলম্বন করলেও প্রকৃতার্থেই একজন উদার মানুষ ছিলেন। আধুনিক ছিলেন সর্বার্থেই।

মোহনবাগানের গোলকিপার ছিলেন তিনি। সব খেলা বুঝতেন, খেলতেন। ফুটবল, টেনিস, হকি এবং ক্রিকেট, আম্পায়ারও ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার ছিলেন। বাবার সঙ্গে ঋভু উত্তর কলকাতায় চাইনিজ-ওয়াল গোষ্ঠ পালের বাড়িতে যেত। করুণা ভট্টাচার্য বাবার বন্ধু ছিলেন। তিনি ঋভুর মা তাপসীকে বিশেষ পছন্দ করতেন এবং রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়িতে এলেই মায়ের কাছে মোড়া টেনে বসে গল্প করতেন। করুণাকাকার চোখ নরম হয়ে আসত। তাপসী কথা বলতেন ঠিকই। তবে ঋভুর সামনে খুবই কুণ্ঠিত বোধ করতেন। মুখ নিচু করে থাকতেন। হৃষীকেশ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। বি এসসি পাশ করে তারপর বি কম করে, গভর্নমেন্ট ডিপ্লোমা ইন অ্যাকাউন্টান্সির পরীক্ষা দেন। এবং রেজিস্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হন।

তখনকার দিনে বড়লোকের ছেলে অথবা জামাই ছাড়া কেউই বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি বা এঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারি বা অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়তে পারতেন না। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রদের কথা হয়ত স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু "অত্যন্ত মেধাবী" আর ক'জন হন।

ধর্মে-বিশ্বাস ছিল না হৃষীকেশের। "গুরু বা "মায়েদের" যাঁরা মানতেন তাঁদের প্রতি শুধু সমর্থনেরই অভাব নয়; তীব্র অসূয়াও ছিল। সেটা বাড়াবাড়ি মনে হতো ঋভুর। নিজে অবিশ্বাসী হলেই যে, অন্যের বিশ্বাসকেও আঘাত করতে হবে, এটা ঋভু বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে মানতো না। এখনও মানে না।

হৃষীকেশের এই দোষ ছাড়া ঔদার্ষর ব্যাপারে অন্য কোনো দোষ ছিল না। জাত-পাতের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। সব মানুষ যে সমান একথা তিনি শুধু বলতেনই না, নিজের ব্যবহারে তা প্রমাণ করে দিতেন। প্রমাণ করার জন্যে নয়, স্বাভাবিকতায়। তিনি বারবার বলতেন যে, বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচারেই নিম্নবর্ণ হিন্দুরা মুসলমান হতে বাধ্য হলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতেই হবে।

সেদিন দেশপ্রিয় পার্কে ফুটবল খেলতে গেছিল ঋভু। মাসে চার আনা চাঁদা। জুতো চুরি হয়ে যেত মাঠ থেকে, তাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে জুতো খুলে রেখে খালি পায়েই খেলতে যেত। স্কুলের সহপাঠীরাও অনেকে খেলতে আসত, যাদের কাছাকাছি বাড়ি। যারা জুতো পরে আসত, তাদের জুতো বা চটি দিয়ে গোলপোস্ট হতো। অনেকে খেলবার সময়ে জামা খুলে রেখে খালিগায়ে বা গেঞ্জি পরেই খেলত।

পাখি ছিল একজন সহপাঠী। খুব সুন্দর কথা বলত। বড়ো বড়ো চোখ, বড়ো বড়ো চুল কবির মতো চোখ এবং কাটা নাক চিবুক। পাখির পারিবারিক পেশা সম্ভবত ছিল পুরুতগিরি। স্কুলের সংস্কৃত-শিক্ষক ভটাচার্যি মশায়ের পার্ট-টাইম পেশার মতো। অনেক যজমান ছিল ওদের। পাখি খুব ভালো হেড করতো গোলের সামনে বল এলে অথবা কর্নার বা পেনাল্টি কিক পেলে। পাখি হেড করতে ভালোবাসত বলে, বল উপরে না থাকলেও অনেক সময় হেড করত। পায়ে মারার বলকেও মাথা দিয়ে ঘায়েল করত। এবং এই অভ্যাসের ফলে অনেক সময়েই অন্যর পদাঘাত খেত মুখে-মাথায়। তাতে পাখির মুখের হাসির কোনো তারতম্য ঘটত না। সবসময়েই হাসত পাখি।

বছর পনেরো কুড়ি আগেও পাখির সঙ্গে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে হঠাৎ কখনও দেখা হয়ে যেত। ঋভুর পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর আর দেখা যায় না। পাখির পুরো পোশাকি নামও আজ আর মনে নেই।

স্কুলেরই সহপাঠীদের কথা মনে হলে মন বড়ো খারাপ লাগে।

ঋভুর প্রত্যেক সহপাঠীই যে জীবনে বিরাট কিছু হয়েছেন এমন নয়। অনেকেই হননি। না অর্থে; না নামে-যশে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়! তারা যে সহপাঠীই! আজ প্রৌঢ়ত্বেরও শেষবেলাতে পৌঁছে সেই সব কিশোরদের কচি-মুখগুলি মনে পড়ে ঋভুর। এবং মনে পড়ে মন বড়োই খারাপ হয়ে যায়। কত সুখস্মৃতি, কত মজার মজার ঘটনা। খেলার শেষে ঘর্মাক্ত হয়ে ডাবুর কোম্পানির ছাপাখানার পাশে যে উঁচু টিউবওয়েল ছিল (তীর্থপতি স্কুলের ঠিক পাশে) সেখানে টিউবওয়েল থেকে জল খাওয়া!

বড়মামার মেজো ছেলে, মুনদাদা, ওদের সঙ্গেই খেলতেন। হাজরা লেন থেকে দেশপ্রিয় পার্কে আসাও অসুবিধের ছিল না। বয়সে বছর দুয়ের বড়ো ছিলেন ঋভুর চেয়ে। ভালো নাম ছিল অলোক। তাঁর বড়ো দাদা আশিস, বয়সে ঋভুর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়ো ছিলেন। তাই ঋভুর সঙ্গে খেলতেন না। এই দুই ভাইয়েরই ছবি আঁকা ও কবিতা লেখার হাত খুব ভালো ছিল। পড়াশুনোতেও দুজনেই ভালোই ছিলেন।

এক দিন ঋভুর পায়ে বল, দু তিনজনকে কাটিয়ে সে দ্রুত অপরপক্ষের গোলের কাছে পৌঁছে গেছে এমন সময় মুনাদাদার সঙ্গে টক্কর। মুনাদাদা প্রতিপক্ষর টিমের 'ব্যাকে খেলছিলেন। ঋভুকে আটকাতে না পেয়ে মুনাদাদা পা বাড়িয়ে দিলেন। ঋভু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পরমুহূর্তেই উঠে পড়ে বলল, তুমি ফাউল করলে কেন?

মুনাদাদা বললেন, খবরদার। তোর বাবা পাঁচশো টাকা মাইনে পান বলে কি ভেবেছিস তোকে ভয় করব?

কথাটা শুনে সে দিন ঋভু স্তব্ধ হয়ে গেছিল। কিন্তু আজ সেই বাক্যটি মনে পড়ে গেলে খুব হাসে। হয়ত মুনাদাও হাসেন। পাঁচশো টাকার তখন কী দাম!

ঋভু খেলত খুব একটা খারাপ নয়। তবে ওরা যখন ক্লাস-থ্রি-তে তখন একটি ছেলে এসে ভর্তি হলো ওদেরই সেকশানে। তার নাম সুবিমল। সুবিমল গোস্বামী, তার দাদাও ভর্তি হলেন। এক ক্লাস বা দু ক্লাস ওপরে। সুবিমলের তীক্ষ্ণ নাক, বরেন্দ্রভূমের মানুষদের যেমন হয়; অঙ্কে খুব ভালো, অন্য বিষয়েও ভালো। ওরা থাকতো রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ত্রিকোণ পার্কের দিক থেকে পন্ডিতিয়া রোডে কিছুদূর গিয়ে ঢুকে ডান দিকে গেলেই যে গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারগুলি ছিল, সেখানে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুবিমল গোস্বামী যার ডাক নাম চুনী, তার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল ঋভুর।

অন্যান্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিল প্রণবকুমার সেনগুপ্ত, কনককান্তি দাশগুপ্ত, প্রীতিভূষণ ঘোষদস্তিদার, শংকর সেন; কুমার ভট্টাচার্যি। পন্ডিতমশায়ের ছেলে ছিল কুমার, প্রভাতকুমার বোস বা খোকন। সমীর বসু, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে থাকত, বেদম মারকুট্টে ছিল। সমুদ্র গুপ্ত, ইতিহাসের নয়, ডি গুপ্ত কোম্পানির মালিকদের বংশধরদের একজন। রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে যাদের লাল-রঙা বাড়ি।

চুনীর সঙ্গে খেলার মাঠে যে দিন প্রথম দেখা হলো সেদিনই ঋভু বুঝে গেল যে তার পক্ষে ফুটবল আর না খেলাই ভালো। যদিও খেলেছিল ক্লাস সেভেন-এইট অবধি। চুনীর পা ছিল ধ্যানচাঁদের হকিস্টিকের মতো। ফুটবল খেলা যে নিছক বলে পা দিয়ে লাথি মারা নয় বা মাথা দিয়ে বল ঢুঁসোনো নয়; তা যে অত্যন্তই এক উঁচুদরের শিল্প তা চুনীর ফুটবল খেলা দেখে ঋভু সেদিন বুঝেছিল। ও যেভাবে একের পর এক খেলোয়াড়কে বোকা বানিয়ে ড্রিবল করে বল নিয়ে গোলের কাছে পৌঁছোত তা দেখলে বড়ো আনন্দ হতো। চুনীর বাবা কিন্তু ছেলের এই খেলাধুলো করা পড়াশুনোর ব্যাঘাত ঘটিয়ে, একেবারেই পছন্দ করতেন না। রেগে বলতেন, "খেলে কি পেট ভরবে?"

তীর্থপতি স্কুলের গেমস-টিচার শিববাবু তাঁকে গিয়ে বলতেন, আপনার ছেলে যে কী তা আপনি জানেন না।

চুনীর বাবা বলতেন, আমার ছেলে, আর আপনি আমার চেয়ে তার সম্বন্ধে বেশি জানেন? তাই না।

চুনী যখন "ফোর ফিট টেন ইঞ্চেস" এই বিভাগে খেলত তখনই ওর নাম হয়ে গেছিল দিক দিগন্তে। চুনিকে ভাড়া নিয়ে যেত কত না টিম! জনশ্রুতি ছিল, যে চুনী প্রথমে যেখানে খেলত সেখানে দশ মিনিটে দশ গোল দিয়ে তার দলকে এগিয়ে দিয়ে অন্য মাঠে চলে যেত। অথবা তাকে "বডিলি" নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে গিয়ে চুনী হয়তো দেখলো দু গোল খেয়ে বসে আছে, যে টিমে তার খেলার কথা, সেই টিম। অতএব নেমেই গোটা আটেক গোল দিয়ে চুনী অন্যত্র আবার খেলতে গেল। সেখানে হয়ত 'ড্র' চলছিল। চুনী নেমেই গোটা পাঁচেক গোল পুরে দিয়ে আবার প্রথমে যেখানে খেলতে এসেছিল সেখানে এসে আরো দু গোল দিয়ে "টুয়েলভ টু সেভেন"-এ সে টিমকে সসম্মানে জেতাল।

চুনীর সঙ্গে কারো ঝগড়া হলে ও কখনও রাগত না। সবসময়ই হাসি মুখ ছিল। কিন্তু কেউ যদি ওকে বলত "এক কাপ চা আর একটা লেড়ে বিস্কুট" অমনি চুনী দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে মারতে যেত তাকে। ওই কথাটির অর্থ অন্তত চুনির কাছে খুব অপমানকর ছিল। চুনী এক কাপ চা আর একটি লেড়ে বিস্কুট পেলেই ভাড়া খেলে, এমন এক কল্পনাশ্রিত, তির্যক মন্তব্য-মিশ্রিত ছিল বলেই চুনী রেগে যেত।

চুনীর জন্যে ঋভুর এবং তার সহপাঠীরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত গর্বিত ছিল। অন্য কারোরই তখন পরিচয় বলতে কিছুই ছিল না। চুনীর গরবেই তারা প্রত্যেকে গর্বিত ছিল।

কুমার মিত্রদত্ত পড়ত অন্য সেকশানে। কিন্তু সে ছিলো স্কুলের কিংবদন্তি। ছোট্টখাট্ট ছেলেটি কোনো দিনও নিজের প্রাইজ নিজে বয়ে নিয়ে বাড়ি যেতে পারত না। অনেকের সাহায্য লাগত। কুমারের বাবা ও মা ছিলেন সাধক প্রকৃতির মানুষ। তা না হলে কুমারের মতো সন্তান তাঁরা পেতেন না। কুমার শুধু খেলাধুলায় কমজোর ছিল কিন্তু পড়াশুনোয়, সহবতে, ব্যবহারে তার কোনো জুড়ি ছিল না। তাকে ভালোবাসত না এমন ছাত্র ছিল না স্কুলে, ভালোবাসতেন না এমন মাস্টারমশাইও ছিলেন।

স্কুলের যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন শ্রদ্ধেয় সি পি মুখার্জি, বিখ্যাত চাটার্ড অ্যাকউন্ট্যান্ট; তিনিও কুমারকে তার গুণের জন্যে খুবই স্নেহ করতেন।

কুমারদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না কিন্তু দারিদ্র কখনও কুমার, কুমারের বাবা মা এবং ভাইবোনদের কাউকেই স্পর্শ করতে পারেনি। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলতেন, "It does not matter where do you come form socialy; it all matters where do you go." কুমার তার জীবনে এই কথার যথার্থ্য প্রমাণ করেছে।

স্কুলে পড়ার সময় চুনী ও কুমারের জন্যে যতখানি গর্বিত ছিল ঋভু আজ জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তেমনই গর্বিত বোধ করে তাদের নিয়ে।

প্রণবকুমার সেনগুপ্ত বি কম পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। পেয়েছিলো এ. ভিজি আয়েঙ্গার বা ভিজি, ওদের স্কুলের সহপাঠী। ওরা অনেকেই স্কুলের পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ঋভুও। সেইসব কলেজের দিনের কথা সময়ে বলা যাবে। প্রীতি, চুনী এবং আরো অনেকে আশুতোষ কলেজে গেছিল। কনক সেন্ট জেভিয়ার্সেই গেছিল। কনক অ্যাটমিক কমিশনে ছিল তারপর অক্সফোর্ড না কেমব্রিজ কোথায় অনেক দিন পড়াল। তারপর শিবপুরের অধ্যাপক হয়েছিল।

বন্ধুরা সকলেই ঋভুর খোঁজ করে কিন্তু ঋভুর জীবনে সময়ের বড়োই অকুলান তাই বন্ধুদের প্রায় সকলকেই ছেড়ে দিতে হয়েছে। কেউ দূরে সরে গেছে অভিমানে, কেউ মিথ্যা অনুযোগ দিয়ে, কেউ ভালোবেসে; ঠিক বুঝে। বন্ধুদের কোনো দোষ নেই, সব দোষ ঋভুরই। জীবনে, যে মানুষেরই কোনো কিছু ব্রত থাকে; তাদের সকলকেই একটি সময়ে এসে একা হয়ে যেতে হয়ই। সে-একাকিত্ব যতই বেদনাবাহী হোক না কেন, তাকে বইতে শেখার শিক্ষাও একটি মস্ত শিক্ষা। একাকিত্ব নিয়ে দুঃখ করলে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই মানুষ সফল হতে পারে না হয়তো।

প্রীতিভূষণ এখন বাটা কোম্পানির রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশানের বড়োসাহেব। অনেক দিন বিদেশে থেকে "জুতো আবিষ্কারের" সারতত্ত্ব জেনে এসেছে। স্বভাবটা এখনও তেমনই মিষ্টি এবং আনঅ্যাসুমিং আছে। সেদিনও ঋভুর সঙ্গে দেখা হলো দমদম এয়ারপোর্টে। ঋভু যাচ্ছিল দিল্লি আর প্রীতি মাদ্রাজে। বাটা কোম্পানির কাজে।

প্রণব পোর্ট কমিশানে ঢুকে গেছিল বি কম পাশ করেই। এখনও সম্ভবত সেখানেই আছে এবং নিশ্চয়ই বিশিষ্ট পদে। ভি.জি. মানে এ ভিজি আয়েঙ্গার, যে অনর্গল বাঙালিদের মতোই বাংলা বলত; প্রণবের সঙ্গে কলকাতায় নতুন-আসা প্রত্যেকটা দোতলা লেল্যান্ড বাসে চেপে তীর্থপতি স্কুল থেকে রসা রোডের মোড় অবধি প্রত্যহ যেত এবং কোন্ বাসটি কেমন তার বিচার করত। এই ছিলো তার আর প্রণবের কমন ইন্টারেস্ট। আরও একটি ছিল কমন ইন্টারেস্ট তাদের, সেটি টেবল টেনিস। ভিজি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি এবং আরো অনেক পরীক্ষা পাশ করে বিশ্ববিখ্যাত ওষুধ কোম্পানি অর্গানন অ্যান্ড কোম্পানির (এখন ইনফার ইন্ডিয়া লিঃ) ফিনান্স ডিরেক্টর। কুমারও অনেক দিন ইংল্যান্ডে ছিল এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি ছাড়াও অনেক কিছু ডিগ্রি নিয়ে এসেছিল।

কৃতী বন্ধুদের কথা যেমন মনে পড়ে তেমন যারা সাধারণ এবং যাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জীবনের করাল স্রোতে ভেসে গেছে তাদের কথাও খুবই মনে পড়ে। জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্যে ব্যক্তির যেমন গুণ ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়, তেমন সামাজিক এবং পারিবারিক সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশেরও দরকার হয়। যারা আশীর্বাদ ধন্য নয়, যারা অন্যদের মতো সুযোগ সুবিধা পেল না এ জীবনে এবং না পেয়ে জনারণ্যে হারিয়ে গেল তাদের কথা সত্যিই ঋভুর মনে পড়ে বারবার।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিতা ছিলা না একটি?

"বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠ তলে
চলে যায় তারা কলরবে
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।"

সেই কবিতাটির কথা মনে পড়ে ঋভুর, স্কুলের সহপাঠীদের কথা মনে পড়লেই।

সমুদ্র গুপ্তরা ছিলো কোটিপতি। গাড়িতে করে ও স্কুলে আসত। টিফিনের সময় চাকরে এসে টিফিন খাইয়ে যেত। ছুটি হলে গাড়ি এসে নিয়ে যেত।

স্কুলে কোনো একটি ব্যাপারে সমুদ্রের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল ঋভুর। একদিন ঋভু দেশপ্রিয় পার্কে ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরছিল হেঁটে হেঁটে। অন্য অনেক সহপাঠীর মতো ওর তখন নতুন শখ হয়েছিল নানা সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে শিকল বানানোর। সমুদ্রদের বাড়ির মস্ত ফটকের সামনে একটি সিগারেটের প্যাকেট কুড়োবার সময় দুজন ইয়া-গোঁফ আর ইয়া-ভুঁড়ির ভোজপুরী দারোয়ান তাকে হাতধরে হিড়হিড় করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল।

বলল, কেয়া খোকা! তুম চোর হ্যায়?

ঋভুর গলা শুকিয়ে গেল। যতটা না ভয়ে, তার চেয়ে অনেকই বেশি অপমানে।

চোর?

তাকে চোর অপবাদ দিচ্ছে এরা?

ও আরও বেশি অপমানিত হয়েছিল সমুদ্রদের বাড়িটির প্রতি কিছু বিশেষ দুর্বলতা ছিল বলে। সেই প্রাসাদোপম বাড়ির বন্ধ-ফটকের নীচে বেশ কিছুটা ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যেত সিমেন্ট-বাঁধানো চত্বরে রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে। আর দেখা যেতো ফরসা লাল টুকটুকে পায়ের সোনার পায়জোর-পরা পদ্মফুলের মতো রাঙা পা ফেলে ফেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে একটি ছোটো মেয়ে সেই মস্ত বাঁধানো চত্বরে।

ঋভুকে যখন দারোয়ানেরা ধরে নিয়ে ভিতরে গেল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ল্যান্সডাউন আর রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর মোড়ের পি. মজুমদারের দোকান আর তার পাশের ওষুধের দোকানের আলো জ্বলে উঠেছে। তখন রাসবিহারী অ্যাভিন্যু বড়ো সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পথ ছিল। দু দিকের ফুটপাথের দু পাশেই হকারদের দোকান অমনভাবে দমবন্ধ করে ফেলেনি পথকে। পথটিকে কদর্য করে তোলেনি। সেই কমলারঙা পায়ের মেয়েটিকে দেখতে পেল না ঋভু। দেখল, সমুদ্র বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসছে। বিদ্রূপের হাসি।

সমুদ্র বলল, আর কোনোদিন আমার পেছনে লাগবি?

ঋভু বলল, তুই ভুল করছিস। আমি কিন্তু তোর পকেটে পেনসিলটা গুঁজে দিইনি।

কে দিয়েছিল?

তা আমি বলব না। তবে আমি দিইনি।

তাহলে থাক এখানে রাতের মতো বন্ধ হয়ে। শিক্ষা হোক।

আমি কোন দোষ করিনি।

আমাকে অপমান করেছিলি।

আমি করিনি সমুদ্র।

সমুদ্র বলল, ঠিক আছে ঋভু, তোকে আজ ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু যারা ক্লাসে আমার পেছনে লাগে তাদের বলে দিস যে যদি ধরতে পারি একবার তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে!

ঋভু, সমুদ্রর দিকে বিস্ময়াভিভূত চোখে চেয়েছিল। সমুদ্র যেন সত্যিই সমুদ্র। এতো ক্ষমতা, এতো বৈভব, এতো ক্রোধ, এতো বিড়বিড়ানি। সমুদ্র যে তীর্থপতি স্কুলের, তারই ক্লাসের তারই সেকশানের সহপাঠী এ কথা ঋভুর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এই সমুদ্রকে ওই কালোকালো ক্ষতবিক্ষত টেবল—বেঞ্চে একেবারেই মানায় না। সে যে কেন ওদের স্কুলে পড়তে যায় ভেবেই পেল না ঋভু।

বড়ো গেট খুলে যখন সমুদ্রর দারোয়ানেরা ওকে বাইরে বের করে দিল, প্রায় গলাধাক্কা দিয়েই তখন আবারও বড়ো অপমানিত বোধ করছিল ও। ও বড়লোক নয়, সমুদ্ররা বড়োলোক, শুধু এই জন্যেই বিনা কারণে অপমানিত হলো ও। সারা জীবন বড়োলোকদের উপর একটা চাপা রাগ পুষে রেখেছে ও অনেক কারণের মধ্যে এই কারণেও। নিজে বড়োলোক হবার পরেও বড়োলোকদের অধিকাংশকেই ও ভালো চেখে দেখেনি।

তপন ঘোষদস্তিদার ছিল ঋভুদের ক্লাসে। তপন বয়সে ঋভুদের চেয়ে একটু বড়োই ছিল। প্রায় প্রতিদিনই ক্লাস পালিয়ে ও দেশপ্রিয় পার্কের বেঞ্চের উপরে বসে থাকত বেঞ্চে বসত না, হেলান দেওয়ার কাঠটাতে বসতো। হুলোর মতো নস্যি নিত তপন, আর বলত, দূর্ শালা। কিসসু ভালো লাগে না।

ঋভু শুধোত, কেন?

তপন বলত, বাবার সিন্দুক ভেঙে বম্বে চলে গিয়ে কামিনী কৌশলকে একবার পেতে চাই।

পেতে চাই মানে?

মানে, শুতে চাই ওর সঙ্গে। যত টাকা লাগে লাগুক। বাবার সিন্দুক খালি করে নিয়ে যাব।

তারপর?

তারপর আর কি! মরলেও সুখ। তার পরে আর কিছু যে থাকতে পারে সে কথা আমি মনেও আনি না। স্বর্গসুখের পর আর সবকিছুই নরক।

তপন এখন কোথায় বা কি করছে কিছুই জানা নেই ঋভুর।

অনেকদিন আগে হঠাৎ সমীরের সঙ্গে দেখা এসপ্লানেডের ফুটপাথে, ধর্মতলায়, একটা পেনের দোকানে। সেইরকমই আছে। বিশেষ বদলায়নি। বলল, বিয়ে করেছে। একটি ছেলে। অনেক দেরিতে। কোনো ওষুধ কোম্পানির সেলস্ম্যান ও। হাসিটি একেবারে সেরকমই আছে।

অমর মুখার্জিও পড়তো ওদের সঙ্গে। সেও প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে থাকত। তার দাদা বাংলা ছায়াছবিতে অভিনয় করতেন। সুদর্শন, ভদ্র, সভ্য, শোভেন মুখার্জি। অমরের সঙ্গে বছর পাঁচেক আগে হঠাৎই দেখা হয়েছিল ঋভুর বম্বে এয়ারপোর্টে। ঋভু ডেকেছিল, অমর না?

অমর কাছে এসে গলা নামিয়ে বলেছিল, আস্তে বল রে বুদ্ধু। আমার নাম অমর নয়।

তবে তোর নাম কি? ঋভু অবাক হয়ে শুধিয়েছিল।

বম্বেতে অনাথদের কদর নেই। বাঙলা নাম চলে না। তাই শক্তি সামন্ত, শক্তি সামান্ত্, জগন্ময় মিত্র, জগমোহন, হেমন্ত মুখার্জি, হেমন্তকুমার, আর আমি অমর, হচ্ছি অমরনাথ। হিন্দি ছবিতে অভিনয় করি। দেখিসনি?

প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে অমরদের বাড়িরই একতলাতে ভাড়া থাকত বুলারা। বুলা আর পুতু দুই ভাই। বুলা ফরসা, লম্বা, রোগা, সুদর্শন, মিতভাষী। আর পুতুর ছিল সদাচঞ্চল দুষ্টু স্বভাব। মুখে বসন্তের দাগ। বুলা ছিলো ঋভুদেরই সমবয়সী। তীর্থপতিতে বা কালিধনে পড়ত। মনে নেই। পুতু ছোটো ছিল। গুপী গায়েন বাঘা বায়েন দেখতে গিয়ে ঋভু সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল গুপীর চরিত্রে পুতুকে। তপেন চ্যাটার্জি অভিনয় করছে। সত্যজিৎ রায়ের কল্যাণে পুতু বিশ্ববিখ্যাত মানুষ এখন।

অজিত ছিল লম্বা, কালো। একসারসাইজ করতো হেভি-ইনস্ট্রুমেন্টস নিয়ে। একদিন অজিতের জন্যে হৃষীকেশের কাছে মার খেতে হয়েছিল ঋভুর। অজিত থাকত মনোহরপুকুর রোডে। অজিত বলত চল্ চল্ আমাকে পৌঁছে দিয়ে তোরা বাড়ি ফিরবি। এই বলে স্কুল থেকে ফেরার পথে, ঘোরা হলেও ওদের বাড়ি হয়ে বাড়ি ফিরত কুমার ভট্টাচার্যি ও ঋভু।

অজিত বলত আঙুল দিয়ে দেখিয়ে; ওই দ্যাখ, লকার—মাঠ।

সেটা কি জিনিস?

ঋভু শুধোত।

ওমা! তাও জানিসনি। ওখানে সব মেয়েরা থাকে। বেবুশ্যে মেয়েরা। কার্তিক পুজো করে রে। দেখিসনি কখনও?

ঋভু সত্যিই খুব কমই জানত। ও বলল, না তো!

সে কী করে! গানও শুনিসনি?

কি গান?

"দিদিগো ঘাগরা তোলো, রাত বারোটা বেজে গেল।"

এ আবার কি গান?

ঋভু বলল।

অজিত বলল, ন্যাকা-খোকা। দেব একদিন সুকুমার গুন্ডাকে লেলিয়ে তোর পেছনে। হোমো-হোমো নোমো-নোমো করে দেবে।

সে আবার কি?

বাড়ি যাও, ন্যাকা-খোকা।

অজিতের মুখভঙ্গি ঋভুর ভালো লাগেনি। ঠিক করেছিল আর কোনো দিনও অজিতকে পৌঁছে দিতে অতখানি ঘুরে যাবে না ঘোরা-পথে। কিন্তু সেই দিনই হৃষীকেশ বাড়ি ফেরার পর তাপসী নালিশ করে দিলেন তাঁর কাছে। ঋভু দেরি করে বাড়ি ফেরে স্কুল থেকে!

হৃষীকেশ শুধোলেন, দেরি হয় কেন?

ঋভু বলল, অজিতকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরি।

কে অজিত?

আমাদের বন্ধু।

তার বাড়ি কোথায়?

লকার মাঠের কাছে।

লকার মাঠ?

ঋভু বললো, 'হ্যাঁ'।

এত দূর চলে গেছ তুমি!

বলেই, ফটাস করে এক চড় মারলেন হৃষীকেশ ঋভুকে।

অজিতের কথায় ও বিচ্ছিরি গানে ঋভুরি মনে কোনো একটি খারাপ দৃশ্যর ছবির আভাস জেগেছিল। তখন হৃষীকেশের চড়ে তার চেহারাটা স্পষ্ট হলো। ঋভুর খুব জেদ হলো যে লকার-মাঠ জায়গাটা ঠিক কী রকম তা একবার একা একা গিয়ে ভালো করে জেনে আসবে। কিন্তু আজ অবধিও যাওয়া হয়নি। প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল।

সমুদ্রর সঙ্গে বছর পাঁচেক আগেও দেখা হয়েছে। দেশপ্রিয় পার্কের আশেপাশের রাস্তাতে। মতিলাল নেহরু রোড, কী মনোহরপুকুর রোড, কী হাজরা লেনে। ও হাত তোলাতে ঋভু গাড়ি দাঁড় করিয়েছে। ড্রাইভিং সিটের পাশে এসে ব'লছে সমুদ্র, কেমন আছিস রে ঋভু?

ভালো। তুই কেমন?

চলে যাচ্ছে।

তুই তো এখন লেখক হয়েছিস। তোর লেখা আমরা সবাই পড়ি। আমাদের সেই ছেলেবেলার ঋভু কেউ-কেটা হয়েছে তাতে আমাদের যে কী গর্ব হয় কী বলব তোকে!

ঋভু হেসে বলেছে, কেউ-কেটা না ছাই! তোরা ভালোবাসিস, তাই!

নারে! সত্যিই খুব আনন্দ হয়।

ভালো থাকিস!

বলে, ঋভু তার গন্তব্যে চলে গেছে।

মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে। একটা সময় অবধি সমুদ্রর উপরে খুব রাগ এবং অভিমান পুষে রেখেছিলো। কিন্তু ছেলেবেলার ঝগড়া, মনোমালিন্য, ভুল-বোঝাবুঝি সব ছেলেবেলাতেই ফেলে আসে মানুষ। ফেলে আসা উচিত অন্তত। ছেলেবেলার তিক্ত সব স্মৃতিও তো পরিণত বয়সে মধুরতম স্মৃতি বলে মনে হয়। মাস্টারমশাইদের আশীর্বাদ আর হাসিটুকুর কথাই মনে থাকে; তাঁদের কানমলা আর বেতের কষ্টটা পুরোপুরিই মুছে যায় মন থেকে।

ঋভুদের স্কুলের মাইনে ছিল তিনটাকা। নিন্দুকে বলতো বটে "যার নেই কোনো গতি সে যায় তীর্থপতি" কিন্তু তীর্থপতি থেকেও অগণ্য মেধাবী কৃতী ছাত্র বেরিয়েছে। ঋভুদের স্কুলের ছাত্রদের

ব্যবহারও ভালো ছিল। নইলে, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ডাকসাইটে প্রিফেক্ট ফাদার স্কেফার্স, ঋভুর কলেজে ভর্তির দিনে অমন উচ্ছ্বসিত হয়ে তীর্থপতি স্কুলের প্রশংসা করতেন না। বলতেন না, "সো মেনি গুড স্টুডেন্টস কেম ফ্রম দ্যাট স্কুল।"

এক বিদ্যায়তনের সঙ্গে অন্য বিদ্যায়তনের যেমন দেওয়ার ব্যাপারে তফাত চিরদিনই ছিল, ছাত্রের সঙ্গে ছাত্রের তেমনই ছিল নেওয়ার ব্যাপারে। কার কতটুকু নেবার আগ্রহ বা ক্ষমতা তার উপরেই তার পরবর্তী জীবনের গতিপ্রকৃতি চিরদিনই নির্ভর করেছে।

সীতেশ লাহিড়ীরা যদি একরকম হয়ে থাকতে পারেন তবে ঋভুদেরও অন্যরকম হবার কথা ছিল না। তবে একথাও ঠিক যে ঋভুরা শুনেছে যে, ঋভুদের সময়ই উঁচু ক্লাসের কিছু ছেলে রেসের মাঠে যেত, খারাপ পাড়াতে যেত; বিড়ি-সিগারেট খেত। অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি করত কিন্তু তাতে তো ঋভুদের মতো মাঝারি, অতি সাধারণ ছেলেদের চরিত্র বিকৃতি হয়নি। তারা পড়াশুনোতে সীতেশ লাহিড়ীর মতো না হয়ে থাকতে পারে, ব্যবহারে, সহবতে কিছু খারাপ হয়েছে বলে তো কেউই বলেননি!

বকে-যাওয়া ছেলেদের অনেক ভালো দিকও থাকে। তারা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক মনোভাব ভালোর দিকে ফিরিয়ে নিলে-ন্যাকা-খোকাদের চেয়ে অনেকেই বেশি উন্নতি করতে পারে জীবনে। ময়লা মাড়ালেই ময়লা কিছু লেগে থাকে না আজীবন কারো গায়েই।

বকে-যাওয়া ছেলেরা যেমন তীর্থপতিতে ছিল তেমনই ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স, লা মার্টিনীয়ার, হয়তো বা হিন্দু স্কুলেও। বকামির অনেকই রকম হয়। তার কিছু রকমের বহিঃপ্রকাশ বড়ো প্রকট হয় আর কিছু প্রকারের বকামি ভিতরে ভিতরে ছেলেদের ঝাঁঝরা করে দেয়। তারা সমাজের ক্যানসার হয়ে দাঁড়ায় পরে। তীর্থপতিতে তেমন ভয়াবহ, সুদূর-প্রসারী সমাজের ক্ষতসৃষ্টিকারী বকা ছেলে বিশেষ ছিল না বলেই মনে হয় ঋভুর।

আজকে ইংরিজি মিডিয়ম স্কুলগুলির তুমুল হই-হল্লায় শিক্ষার প্রকৃত প্রকৃতি আর ফটাফট ইংরিজি-বলা, ফটাফট মাস-স্কেলে তৈরি করা, টাকা-রোজগারের মানুষ-মেশিনের মধ্যে আর আসল মানুষের মধ্যে তফাত হয়ে গেছে অনেকই। মানুষের চেহারার জীবে ভরে গেছে দেশ কিন্তু মানুষের মতো মানুষ নেই। শিক্ষা-টিক্ষা নিয়ে কেউই আর আদৌ মাথা ঘামান না। এখনকার অধিকাংশ শিক্ষক এবং ছাত্ররাই ছাঁচে-ঢালা। প্রোটোটাইপ বাড়ির এবং মা-বাবার প্রভাব বোধহয় আর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে না। করলে, বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙলা গান, বাঙালি ঐতিহ্য এমনভাবে নষ্ট হয়ে যেত না।

আজ ঋভুর জন্মদিন। সে কথা বাড়ির কারোই মনে নেই। মনে থাকে না কোনো কোনো বছরে। মা সকালবেলা মনে করিয়ে দেন। কোনো কোনো বছর পায়েস করে রাখেন। এই জন্মদিনের, মানে জন্মদিন পালনের সংস্কৃতি ঋভুদের পরিবারে ছিল না। তখনকার দিনে অনেক পরিবারেই ছিল না। তা নিয়ে ঋভুর কোনো ক্ষোভও ছিল না। তখনও ছিল না। ঘরে ঘরে জন্মদিনের উৎসবের ঘটা দেখে, এখন হয়।

এখন ঋভুর মনে হয় যে, প্রত্যেক মানুষেরই রোজ ভোরবেলা তার নিজের মুখখানিকে আয়নাতে দেখা উচিত। নিজেকে ভালোবাসা উচিত। charity begins at home এরই মতো, compassion and love begin at home as well, নিজেকে ভালো না বাসতে পারলে, নিজের প্রতি মমত্ব না থাকলে সেই মানুষের পক্ষে অপরের দুঃখ-কষ্টর প্রতি কোনো সমব্যথা রাখাও বোধহয় সম্ভব হয় না।

এই অগণ্য জনরাশির মধ্যে ঋভু যে আলাদা, সে নগণ্য হলেও সে যে সেই! এই জানাটাও একটি মস্ত জানা। এই জানা, একজন মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে, যে স্তরে অন্যর মনের, নিজ দেশের, নিজ কালের প্রতিসরিত, প্রতিফলিত আলো ও শব্দমঞ্জরী তরঙ্গ তোলে, যার মাধ্যমে একজন মানুষ অন্য অথবা অন্যতর অথবা বহুর মধ্যে চারিত, বিকীরিত হতে পারে। এবং হতে পেরে, মানুষ হিসেবে সার্থক হয়।

জন্মদিনের সকালে ছোটো পিসি এলেন। ঋভুর নিজেই ছোটো পিসিমণিকে প্রণাম করে হেসে বলল, পিসিমণি! আজ আমার জন্মদিন।

ওমা! তাই! বউদি যে কী। আগে তো বলবে! দাঁড়া! এই নে তোকে দিলাম। তোর যা খুশি তাই কিনিস।

একটি চকচকে চাঁদির ষোলো আনার ভারী টাকা তখনকার দিনে অনেক কিছুই কেনবার ক্ষমতা রাখত। ঋভুর মতো ছোট ছেলের পক্ষে তো বটেই। ও টাকা দিয়ে অনেক কিছু খেতেও পারত ঋভু। রাসবিহারী আর রসা রোডের মোড়ের দোকানের বরফ আর খুব মিষ্টি লস্যি দেওয়া ঘোর সবুজ সুপের মতো ম্যাঙ্গো সিরাপের শরবত। আঃ। খেতে খেতে ঋভুর মনে হতো, স্বর্গে চলে যাচ্ছে। ঋভুর কাছে তপনের কামিনী কৌশলের সঙ্গে শোবার কল্পনারই মতো স্বর্গসুখ বলতে ছিলে ওই সবুজ শরবত। ফেরবার সময়ে ট্রাম লাইনের পাশের পিলারে পিলারে কান লাগিয়ে গোঁ-গোঁ-গোঁ শব্দ শুনত এবং ভাবতো স্বর্গের গাড়ির শব্দও বুঝি ওরকমই হয়। কিন্তু না। শরবতও খেল না ঋভু। স্বর্গসুখও প্রত্যাখ্যান করল। না খেয়ে ওদের বাড়ির কাছেই রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপর 'গ্রন্থালয়', না 'গ্রন্থনিলয়', না 'গ্রন্থগৃহ' দোকানটি ছিল বইয়ের, যে-দোকানের মালিক অথবা সেলসম্যান এর সঙ্গে বড়োমামা আলাপ করিয়ে দিয়ে ছিলেন, সেখানে গিয়ে একটি বই কিনল নিজের পছন্দমতো। দোকানি ভদ্রলোক, যাঁর একটি চোখ ছিল পাথরের, ফুল হাতা শার্ট আর ধুতি পরতেন, নস্যি নিতেন, শার্টের হাতাতে বোতাম লাগাতেন না, কালো কারে বাঁধা ট্যাঁকঘড়ি থাকত যাঁর বুক পকেটে এবং যিনি, সারা বছর ঋভুকে বই পড়তে দিতেন বিনি পয়সাতে; একটু খুশিই হলেন।

ওঁর দোকান থেকে ঋভু এই প্রথম বই কিনল।

বাড়ি ফিরে, বাইরের ঘর যখন ফাঁকা, বৃষ্টি নামার পরে আলসেতে আলসেতে যখন পায়রাগুলো বক-বকম করছিল তখন দু হাতে বইটি ধরে গন্ধ নিল তার। তার পর এফ এন গুপ্ত কোম্পানির কাঠের কলম ডুবিয়ে বই-এর মলাট তুলে, প্রথম পাতাতেই লিখল।

আমার জন্মদিনে আমাকে দিলাম। ইতি—ঋভু, ২৯শে জুন ১৯...

ঋভুর জন্মদিনের রাতেই, তখন অবশ্য ঊনত্রিশ জুন পেরিয়ে তিরিশে পৌঁছে গেছে, ঠাকুমা বললেন, ঋভু ওঠ্। পুলিশ আইছে। কলকাতার বাড়িতেও!

সেজকাকু সত্যিই এসেছিলেন পুলিশ আসার একটু আগে। কিন্তু গন্ধ পেয়েই পেছনের দেওয়াল টপকে মাঠেব মধ্যে দিয়ে পগার পার।

এই জন্যেই সেজকাকু ঋভুর হিরো· পুলিশ কখনও তাঁর নাগাল পায় না। কী কলকাতায়, কী রংপুরে, কী অন্যখানে! তখনকার দিনে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলরা একজনও বাঙালি হতেন না। সবই ছিলেন বিহারী। প্রকান্ড প্রকান্ড চেহারা। ভোজপুরী ভাষায় কথা বলতেন। আর ঢোলা ঢোলা হাফপ্যান্ট পরতেন। হয়তো গরম কম লাগার জন্যেই পরতেন কিন্তু এতোই ঢোলা ছিল প্যান্টগুলো যে অসভ্যর মতো দেখাত। তাদের হাতে থাকত কোঁতকা লাঠি। মাথায় লাল-পাগড়ি। পায়ে মোষের চামড়ার খুব মোটা মোকাসিনের আর পাম্পশুর মাঝামাঝি একরকমের জুতো। নাগরাই বোধহয়। পুলিশের ছোট অফিসারেরা প্রায় সবই বাঙালি ছিলেন। হিন্দু কী মুসলমান! বড় অফিসারদের বেশির ভাগই ইংরেজ। অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান।

প্রায় ঘন্টাখানেক বাড়ির সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারপর পুলিশেরা চলে গেল।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে চোখ খুলেই দেখল সেজকাকু বাইরের ঘরের বেতের ইজিচেয়ারটাতে বসে আনন্দবাজার পড়ছেন।

ঋভু পেছন থেকে ডাকল, সেজকাকু!

সেজকাকু পড়া থামিয়ে পেছন ফিরে বললেন, কীরে! চোর। কেমন আছিস?

ভালো।

বলেই হাসল ঋভু।

কোনো কিছু চুরি না-করা সত্ত্বেও ঋভুকে সেজকাকু চোর বলে ডাকতেন।

টিকটিকি আছে? বাইরে?
ঋভু উত্তেজিত হয়ে শুধোল।
আছে বইকী। আমি হচ্চি গিয়ে পোকা। ওরা সবসময়ে আমাকে লক্ষ্যও করে। বুঝলি!
দেখে আসি বাইরে গিয়ে?
না। তুই যা বোকা! তোর মুখ দেখেই ওরা বুঝতে পারবে যে আমি ফিরে এসেছি।
তবে?
তবে কি? যাস না বাইরে।
এবারে কি এনেছ? ডিনামাইট?
তুই জানলি কি করে?
জানি।
ঋভু বলল।
ঠিক।
সেজকাকু বলল।
কোথা থেকে আনলে?
ধানবাদ আর ঝরিয়ার কয়লাখনি থেকে।
কারা দিল?

বাঙালিদের অনেক কয়লাখনি আছে তো! তাঁদেরই কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে আনলাম। মনে মনে সকলেই চায় যে দেশ স্বাধীন হোক।

তোমাকে চেনেন ওঁরা?

ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না। তবে ওঁরাও পরীক্ষা নিয়ে বাজিয়ে নেন। কারণ টিকটিকি তো ওঁদের উপরেও নজর রাখে।

ওঁরাও দেশকে ভালোবাসেন?

নিশ্চয়ই। অবাঙালি ব্যবসাদারেরাও দেন। ভয় বেশি বাঙালিদেরই নিয়ে। বড়ো ভীতু এই ব্যবসায়ী বাঙালিরা। এবং বিশ্বাসঘাতকও বটে। ওদেরই আমার বেশি ভয় করে।

বিশ্বাসঘাতক কেন?

কেন, তা কি করে বলব। চিরদিনই পিসিমার কাছে নালিশ করে বালিশ পাওয়ার ধান্দা। সেই শিশুকাল থেকেই।

ঋভু পুরোটা না বুঝেই হাসল।

সেজকাকু যে ক'দিন কলকাতায় থাকতেন সে ক'দিন বাড়িতে শুতেন না। রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপরে মেজমামার চেম্বার যেখানে ছিল, এখন যেখানে ভিক্টর-ক্লিনিক, সেইখানেই দোতলাতে একটি ফাঁকা ঘরে টেবিলের উপরে শুয়ে থাকতেন, বাড়ি থেকে খেয়ে দেয়ে নিয়ে। সেই ঘরে সম্ভবত ঋভুর সেজকাকা ও ছোটোমামা কোনো ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। কিসের ব্যবসা তা মনে নেই। ভোরে উঠে একটু এদিকে ওদিকে ঘুরে তারপর বাড়ি ফিরে আসতেন। মা চা করে দিতেন। থিন-অ্যারারুট বিস্কিট দিয়ে চা খেতে খেতে সেজকাকু আনন্দবাজার পড়তেন। আনন্দবাজার পত্রিকা শুধুমাত্র একটি খবরের কাগজই ছিল না। বাঙালিদের স্বাধীনতার স্বপ্নের সঙ্গী ছিল, আদর্শবাদী, নির্ভীক; সৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রত্যেক বাঙালির গর্ব ছিল।

ঋভু বলল, এইরে! কী দেরি হয়ে গেল উঠতে। স্কুলের দেরি হয়ে যাবে। হোমটাস্কও কিছু হয়নি। পাকড়াশিবাবু অনেক অঙ্ক দিয়েছেন করতে।

কাল কি করছিলি?

কাল যে আমার জন্মদিন ছিল। ছোটো পিসিমণি টাকা দিয়েছিলেন। একটা বই কিনেছিলাম। সেই বইটা পড়লাম।

কি বই? দেখি।

রবিসন ক্রুসো। বাংলা।

বাঃ। ফ্রাইডের গল্প। বেশ! বেশ!

পরক্ষণেই কাগজের দিকে চেয়ে সেজকাকু বললেন, চোর। তোকে আজ ছুটি দিলাম।

কি বলছ?

হ্যাঁরে। আজ তোকে স্কুলে যেতে হবে না।

বাঃ রে। কেন তা বলবে তো!

কাল হিজলির জেলের সামনে গুলি চালিয়েছে পুলিশ। আজ তাই স্কুল-কলেজ সব বন্ধ। মানে, ছাত্ররা স্ট্রাইক করবে বলে ডাক দিয়েছে। কাগজে দেখলাম। আজ স্কুলে যাস না। পুলিশ গুলিটুলি তোদের উপরেও চালিয়ে দিতে পারে।

ঋভু বলল, যারা পুলিশের গুলি খায় তারা তো শহিদ হয়। তাদের ফোটোতে সকলে মালা পরায়। তোমরাও তো যে কোনোদিন গুলি খেতে পারো সেজকাকু!

তা পারি। কিন্তু গুলিখোর না হয়েও দেশের কাজ করা যায়। গুলি না-খেয়েও শহিদ হওয়া যায়। সকলকেই যে গুলি খেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বোকার মতো গুলি খাওয়াতে না দেশের উপকার হয়; না নিজের।

ঋভু ভাবছিল, শহিদ হলেও পরে কখনও হওয়া যাবে। স্ট্রাইকে সে মোটেই স্কুলে যাচ্ছে না। যদি স্ট্রাইকটা শেষমেশ না হয় তবে তো পাকড়াশিবাবুর সামনে পড়তে হবে। হোম-টাস্ক এর কিছুই হয়নি। পাকড়াশিবাবুর কানমলার চেয়ে পুলিশের গুলি অনেকই ভালো খেতে। মনে হয়।

যেদিন এরকম স্ট্রাইক-টাইক হয়ে যায়, স্কুলের সামনে গিয়েও স্কুলে ঢুকতে পারে না সেদিন ভারি আনন্দ হয় ঋভুর। কেন স্ট্রাইক, কিসের স্ট্রাইক, অত না বুঝলেও বোঝে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এসব ব্যাপার জড়ানো। সেটুকু বোঝে। কিন্তু স্কুলে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে যখন সারাদিনের মনে তখন এই পড়ে-পাওয়া ছুটি ও স্বাধীনতা সমর্পণ করতে এক্ষুণি ফিরে গিয়েই বা কি হবে। মা তো আর জানেন না যে, স্কুল হচ্ছে না। তাছাড়া অন্য সকলেরই যেদিন কাজ, বাবার অফিস, অরার স্কুল, সেদিন নিজের ক্লাস না-থাকলে ছুটির মজাটাই একেবারে অন্যরকম হয়। সেদিন নানা দুষ্টুমি করে কিছুটা সময় কাটে। টিফিনের পয়সা দিয়ে সকাল সকালই আলু কাবলি, কী ফুচকা, কী ট্যাপারি কিছু না কিছু খেয়ে নেয়। দেশপ্রিয় পার্কে, গরম বেশি না থাকলে, বন্ধুরা মিলে খেলাধুলো করে।

সেদিন প্রণব বলল, চল টুকলুদের বাড়ি যাই।

প্রণবদের বাড়ির কাছেই টুকলুদের বাড়ি। টুকলু প্রণবের কাজিন। ঋভুদের চেয়ে এক ক্লাস নীচে পড়ত টুকলু। অথবা মনে নেই হয়তো সঙ্গেই পড়ত। ভারি মিষ্টি স্বভাবের ছেলে ছিল। তার ছোটো ভাই বাবলু অনেক নীচে পড়ত। ভালো টেবিল টেনিস খেলত ও। পরে সম্ভবত বেঙ্গলের হয়েও খেলেছিল, যতদূর মনে পড়ে। প্রণবের দাদা ভুট্টাদা ঋভুদের চেয়ে এক ক্লাস উপরে পড়ত, ভুট্টাদা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পাশ করে "প্রাইস ওয়াটার হাউস অ্যান্ড পীট" এ ঢুকেছিলেন। আর এন সেন তখন ছিলেন ওই ফার্মে। এখন ভুট্টাদার সঙ্গে এবং প্রণবের সঙ্গেও আর যোগাযোগ নেই।

টুকলুদের বাড়িতে খুব সুন্দর সব ফার্নিচার দেখেছিল। দারুণ সুন্দর কাজ করা বার্মিজ সেগুনের দরজা। প্রণব বলেছিল, এগুলো ল্যাজারার্স কোম্পানির বানানো।

ল্যাজারার্স সাহেবের ফার্নিচারের দোকান ছিল ভারতবিখ্যাত। পরে জেনেছিল ঋভু। টুকলুর মা. ভালো ল্যাংড়া আম আর সন্দেশ খাইয়েছিলেন ওদের। কিছুক্ষণ পড়াশুনো-পড়াশুনো খেলা করে ওরা চলে এসেছিল।

প্রীতি থাকত রসা মার্কেটের পাশেই একটি রাস্তাতে। ওর মামাবাড়িতে থাকতো প্রীতি, যতদূর মনে আছে ঋভুর। সে পথটির নাম ভুলে গেছে কিন্তু বাড়িটি মনে আছে। তখন কাঁচা ছিল পথটি। মানে, খোয়া-ঢালা। পিচ হবে হবে ভাব। প্রীতিদের বাড়ির কাছেই থাকতেন লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। একদিন ঋভু তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেছিল। সঙ্গে প্রীতি ছিল কি ছিল না আজ আর মনে নেই।

কনক থাকত লেক ভিউ রোড যেখানে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে পড়েছে এসে এবং মনোহরপুকুর রোড বেরিয়ে গেছে হাজরা লেন আর মতিলাল নেহরু রোডের সংযোগস্থল দিয়ে সেই মনোহরপুকুর রোডের প্রায় মোড়েই। রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর দিকে। কনকের বাবা ব্যারিস্টার ছিলেন। খুব রোগা ছোট্টখাট্ট মানুষটি। চোখ খুব পুরু লেন্সের চশমা। সবসময় পড়াশুনো নিয়ে থাকতেন। মাসিমা, মানে কনকের মা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা। সাদা হাস্যময়ী, সবসময়ে ব্যস্ত। কনকের রঙ ছিল সাহেবদের মতো। কনকের এক সুন্দরী বোন এবং ছোট ভাইয়ের কথা স্পষ্ট মনে আছে।

প্রণবের মা, মাসিমা ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী। ফরসা। এবং অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। তাঁর গলার স্বরেও ব্যক্তিত্ব ঝরে পড়ত। প্রণব কৈশোর-শেষে যৌবনে এসে গলা ভাঙার পর মাসিমার কণ্ঠস্বর পেয়েছিল।

সত্যব্রত রায়চৌধুরীও পড়ত ঋভুদের সঙ্গে। কালো চেহারা। ঝকঝকে সাদা দাঁত। সবসময় হাসিমুখ। ভালো ফুটবল খেলত সত্য।

আরো অগণ্য সহপাঠীর কথা মনে আসে ঋভুর ভিড় করে। তাদের মুখগুলি স্পষ্ট ভেসে ওঠে। এক এক ঝলক। কারো নাম মনে পড়ে, কারো পড়ে না, নাম যদি বা মনে পড়ে পদবি পড়ে না।

মাস্টারমশায়দের কথাও মনে পড়ে। যাঁরা নূন্যতম বেতনে কোনোক্রমে দিনাতিপাত করতেন অথচ ছেলেদের প্রতি তাঁদের অধিকাংশেরই যে মমত্ব, স্নেহ ও ভালবাসা ছিল তা ইদানীং বড়ো কমই দেখা যায়।

মাস্টারমশাইদের ইউনিয়ন হয়েছে এখন। কারখানার শ্রমিকদেরই মতো তাঁর যূথবদ্ধ হয়ে নিজেদের জন্যে অনেকই সুযোগ-সুবিধা এখন আদায় করে নিয়েছেন। তাঁরা ষাট বছরে অবসর নেবেন না পঁয়ষট্টিতে তা নিয়ে এখন কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলছে। ঋভুর আশা যে তাঁরা জিতবেন। কিন্তু এও আশা করবে যে নিজেদের দাবি সম্বন্ধে তাঁরা যতখানি সচেতন, ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে ও তার সিকিভাগও অনন্ত সচেতন হবেন।

এ বড়ো দুঃখের যে, আজকে কোনো জীবিকাই আর অন্য থেকে আলাদা নয়; মহৎ নয়। আদর্শ, নিষ্ঠা, বিবেক এ সমস্তই সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। টাকা রোজগার, দলবাজি এবং রাজনীতিই এখন জীবিকা নির্বিশেষে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়; উদ্দেশ্য। এই হীনতা এবং ইতরামোর কবল থেকে কোনো শ্রেণির বুদ্ধিজীবীই নিজেদের বাঁচাতে পারেননি। বাঁচাবার চেষ্টাও করেননি। তাই এই সময়ে, এই রাজ্যে বসে সেদিনের মাস্টারমশাইদের মূল্যায়ন করতে গেলে চোখ জলে ভরে আসে।

জীবনে যেসব মানুষ "সফল" হন, সে, আজকের মূল্যমানেই হন কী সেদিনের মূল্যায়নে; তাঁরা প্রায়শই ভাগ্যকে অস্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের পুরুষকার, অর্থাৎ যেনতেন প্রকারেণ সফল হওয়ার মানসিকতাই তাঁদের সফল করেছে। সকলেই যে চোরা বা বাঁকা পথে বড়ো হন এমন কথা বলব না। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ মানুষই তাই হন। যাঁরা চোরা বা বাঁকা পথে বড়ো হননি তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষকে এখনও দেখে যাঁরা ভাগ্যকে অস্বীকার করেন না। চুনী গোস্বামী এই দলের মানুষ। সে বাংলার গর্ব বলে বা আমার সতীর্থ বলে তাকে যত না ভালোবাসি তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি তার সবটুকু কৃতিত্ব তার স্বোপার্জিত হলেও সেই দাবি যে কখনও করেনি বলে। সাফল্য এবং অশেষ যশ, বঙ্গসন্তান হওয়া সত্ত্বেও তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটায়নি। মানুষ চুনী, সেই ছেলেবেলার চুনীরই মতো সরল, অনাড়ম্বর; উষ্ণতায় ভরপুর আছে।

একজন মানুষ এক জীবনে অনেক কারণেই গর্বিত হতে পারেন। কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুদের গৌরবে যে গৌরব তার চেয়ে বড়ো গৌরব বোধহয় আর কিছুই নেই। চুনী তার অগণ্য সতীর্থকে যে গর্বিত করেছে এ কথা জেনে সে নিজেও নিশ্চয়ই সুখী হয়।

এক সন্ধ্যাতে ঋভু মাঝের ঘরে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে গডরেজের আলমারিতে হেলান দিয়ে বসে তাপসীর কাছে পড়ছিল। অরাও পাশে বসে তার পড়া করেছিল, এমন সময় হৃষীকেশ ফিরলেন অফিস থেকে।

ছ'ফিটের বেশি লম্বা, সুপুরুষ হৃষীকেশকে স্যুট পরলেও যেমন ভালো দেখাত, ধুতি পাঞ্জাবি পরলেও তেমনই। ধুতি ও সাদা আদ্দি বা টুইলের পাঞ্জাবিতে তাঁর কালো চেহারা অশেষ জেল্লা পেত। অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। জুতো-জোড়া সবসময়ই চকচক করত। ধুতির সঙ্গে পাম্পশুই হোক কি স্যুটের সঙ্গে শু; অথবা টেরিটোরিয়াল আর্মির খাকি পোশাকের সঙ্গে বুট।

তখনকার দিনে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে খাকি পোশাকেরই চল ছিল। জার্মান সেনাবাহিনীতেও। "মন্টোগোমারি" বা জেনারেল "রোমেলদের" পোশাকও খাকিই ছিল। সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে খাকি পোশাকের জায়গাতে জলপাই-সবুজ পোশাকের চল হয়েছিল।

ঋভুর বাবা খাটের উপরে একটি ম্যাপ খুলে বললেন, আয় ঋভু, অরা, দেখবি আয়।

তাপসীও উঠে বললেন, কী ব্যাপার? হঠাৎ ভূগোল নিয়ে পড়লে!

আর ঠেকান গেল না!

হৃষীকেশ বললেন।

কি?

ট্রান্সফার।

কোথায়?

বরিশাল। জিলা হেড-কোয়ার্টার্স। চারদিকে জল। বরিশাল শহরের পথের নর্দমাতেও নাকি জোয়ার-ভাঁটা খেলে। বাড়ির পুকুরে নদী থেকে কুমিরের বাচ্চা চলে আসে। হৃষীকেশ টেরিটোরিয়াল আর্মির দোহাই দিয়ে বহুবছর তাঁর চাকরির বদলি আটকে রেখেছিলেন। প্রোমোশন হলে বদলি হয়ই সরকারি চাকরিতে। কথায়ই বলে, "ট্রানফার অন প্রোমোশন"। বহুবার ঠেকিয়ে এসেছেন। এবারে আর ঠেকাতে পারলেন না।

অরা বলল, আমরা যাব?

হৃষীকেশ বললেন, এখন গেলে তো স্কুলের বছর নষ্ট হবে। আমি আগে একা যাই। পরে তোমাদেরও নিয়ে যাবো।

এত বছর পর অত কথা মনে নেই ঋভুর। কবে হৃষীকেশ গেলেন, কবে ওরা গেল। কিন্তু বরিশালে যাওয়ার কথাটা এবং বছরখানেক থাকার স্মৃতি মনে এখনও অম্লান আছে।

সে বছর পুজোর পরেই হৃষীকেশ চলে গেলেন। সে বছরই শীতে ঋভুরা তামারহাটে গেল, বড়োপিসিমার কাছে। পার্বতীপুর পর্যন্ত ছোটোকাকু সঙ্গে এসেছিলেন। ওখান থেকে উনি রংপুরে চলে গেলেন।

পার্বতীপুর জংশন হয়ে যখন রেলগাড়ি মটরঝাড় স্টেশনে এসে পৌঁছোল তখন সন্ধে হয় হয়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট স্টেশনে। তাপসীর সঙ্গে ঋভু ও অরা ট্রেন থেকে নামতে না নামতেই ট্রেনটা একটি অতিকায় খয়েরি সরীসৃপের মতো, জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মাত্র এক মিনিট দাঁড়াত

ট্রেন তখন সেই নির্জন বন-মধ্যের স্টেশনে। কুলিও পাওয়া যেত না। বয়েল-গাড়ির গাড়োয়ানই মাল বয়ে নিয়ে যেত। প্ল্যাটফর্মও ছিল না। ইংরিজিতে বললে বলতে হয়, ইট ওজ্ অ্যান্ অ্যাপলজি ফর আ স্টেশন।

ট্রেন থেকে নেমেই ওরা দেখল, বড়ো পিসেমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর শীতকালের পোশাকে। ধুতি, তার উপরে গরম পাঞ্জাবি। ফলসা-রঙা। তারও উপর হালকা খয়েরি-রঙা গরম মোটা আলোয়ান। খুবই শীত ছাড়া উনি শাল গায়ে দিতেন না। গোরুর গাড়ির বলদরা কাছেই বিচালি খাচ্ছিল। আর গাড়িটা উর্ধ্বমুখ হয়েছিল। গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি বলদ জুতে নিল গাড়িতে। পিসেমশাই বললেন, চলো, চলো। ঋভুরা মোটা করে খড়-পাতা এবং শতরঞ্চি বিছানো নরম গদিতে উঠে বসল গাড়ির ছইয়ের নীচে।

এক ঝুড়ি কমলালেবু এবং ছোটো এক ঝুড়ি ডিমসেদ্ধ রাখা ছিল গাড়ির পেছন দিকে। তাপসী এবং পিসেমশাই গল্প করতে করতে চললেন। ঋভু আর অরা কমলালেবু এবং ডিমের কল্যাণে লাগল। তখনকার দিনের মানুষদের ক্লোরোস্ট্রল, ইসকিমিয়া ইত্যাদির বাতিক ছিল না, জীবদ্দশাতেই ডাক্তারদের কল্যাণে এখনকার মতো অনুক্ষণ মরতেন না। হিঁদুদের বাড়িতে তখন হাঁসই পোষা হতো, মুরগি নয়। ব্রয়লার চিকেন ও মুরগির ডিমের চল হয়নি। এখন মানুষে একটা হাঁসের ডিম খেলেই হার্ট অ্যাটাকে মরে যাবেন বলে মনে করেন। তখন ঋভুরা-ছ'টা-আটটা ডিমসেদ্ধ অথবা ঝোলের ডিম যখন তখন খেয়ে ফেলত। এক-একজনে। একটি হাঁসের ডিমের সাইজ রোড-আইল্যান্ড মুরগির ডিমেরও প্রায় দ্বিগুণ ছিল। হাঁসের ডিমের কমলা-রঙা কুসুমের আঁশটে গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে। ডিমের-ঝোল দিয়ে ভাত খাবার পর ভালো করে সাবান দিয়ে হাত না ধুলে সারাদিন গন্ধ থাকত হাতে।

ফ্যাকাশে ধুলো-ভরা গভীর জঙ্গলের মধ্যের পথে গোরুর গাড়ি একটি বাঁক নিতে না নিতেই শীতের বনের গা ছমছম সন্ধে নেমে এল। গরুর গাড়ির নীচে লণ্ঠন দুলতে লাগল। মধ্যেও একটি লণ্ঠন। গাড়োয়ানের পাশে তার বোনপো, ঋভুদেরই বয়সি একটি ছেলে, ছেঁড়া, শেয়াল-রঙা আলোয়ান গায়ে বসেছিল। গাড়োয়ান তার নিজস্ব ভাষায় বলদদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাদের ল্যাজ মুলতে মুলতে চলেছিল।

আধঘন্টাটাক যাবার পরে পথে একটি নদী পড়ল। নদী না বলে, সোঁতা বলাই ভালো। জল সামান্যই ছিল তাতে। সোঁতাটাকে কেটে গেছিল পথটা এবং সোঁতাটা পেরিয়েই একটা সমকৌণিক বাঁক নিয়েছিল ডানদিকে। গাড়িটা ঢালু পাড় বেয়ে নদীতে নামতেই বলদদুটো ভোঁস্‌স-ভোঁস্‌স করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল আর খুব জোরে জোরে মাথা ঝাঁকতে লাগল। তাদের গলায় পেতলের ঘন্টাগুলো টুংটাং বেজে উঠল শিশির-ঝরা প্রথম রাতের বনের ফিসফিসে নিস্তব্ধতাকে মথিত করে।

পিসেমশাই বললেন, কী হলো রে কলিম?

কলিম গাড়োয়ান উত্তর দেবার আগেই তার বোনপো বলে উঠল, বাঘ বাবু! বাঘ!

পরক্ষণেই বলদদের ঘোরতর দাপাদাপিতে সেই বোনপো আরও উদ্দীপ্ত হয়ে বলল, মেলা বাঘ! বাবু, মেলা বাঘ!

পিসেমশাই তাঁর পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলোর ফালি চালিয়ে দিলেন কলিম আর তার ভাগ্নের মধ্যে দিয়ে। ঋভু দেখল, একজোড়া ভাঁটার মতো লাল চোখ জ্বলছে মাটি থেকে তিনহাত উপরে। দু চোখের মধ্যে প্রায় দেড় ফিট ফাঁক। এই নইলে বাঘ!

পিসেমশাই স্বগতোক্তি করলেন, বাঘ! বড়ো বাঘ! চুপ করে থাকো!

বলদগুলো ভীষণ অস্থির হয়ে গাড়িটাকে প্রায় উলটে দেবার উপক্রম করল।

তাপসী বললেন, কী হবে বাদলবাবু?

কিচ্ছু হবে না বউদি!

কলিম গাড়োয়ান খুব জোরে জোরে তার হাতের লাঠি দিয়ে মারতে লাগল বলদ দুটোকে আর বকতে লাগল। আর তার ভাগ্নে সমানে বলতে লাগল, আহা করেন কী মামা, করেন কী? কইতাছিনা

আপনেরে। মেলা বাঘ। মাতুলেরই মতো, বাঘ দেখা মানুষও একই বাক্য বারে বারে বলে। ভাগনে বাঘ দেখে ওই একই বাক্য বারবার বলে যেতে লাগল। টেপ্ড মেসেজের মতো।

কী হলো, কে জানে! একবার একটু বোঁটকা গন্ধ পেল। তারপরই বলদ দুটো এক দৌড়ে সোঁতা পার হয়ে রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল। এতক্ষণ কলিম গাড়োয়ান বলদদের ভাগাবার জন্যে লাঠি চালাচ্ছিল, এখন তাদের থামাবার জন্যে লাঠি চালাতে লাগল।

শীতের রাতেও উত্তেজনাতে ঘেমে উঠল ঋভু।

অরা বাঘ দেখে রা'টি কাড়েনি। কিন্তু বাঘ চলে যাবার পরেই কেঁদে উঠল।

পিসেমশাই বললেন, বোকা মেয়ে! বাঘ চলে গেছে কখন!

তাপসী বললেন, আপনি কী করে বললেন যে, কিছু হবে না?

পিসেমশাই বললেন, বাদল মিস্তিরের গাড়ির বলদের উপর হামলা করার সাহস কোনো বাঘেরই হবে না। গাড়ি যদি বলদে না টেনে বুদ্ধিমানেও টানত, তাহলেও হবে না।

কেন?

কালই রতনবাবুকে সঙ্গে করে তাঁর গাড়িতে এসে বাঘের পুরো পরিবারের চামড়া খুলে নিয়ে যেতাম না!

তামারহাটে পিসিমা-পিসেমশাইর বিরাট এলাকার বাড়িতে পৌঁছে খাওয়াদাওয়ার ধুম লেগে গেল। বাড়িটার বাইরে ছিল গদি ঘর। একদিকে কোমর-সমান উঁচু মাচার উপরে বিরাট ফরাশ পাতা। তাতে পঞ্চাশজন মানুষ শুতে পারতেন একসঙ্গে। মাড়োয়ারি "গদি"র মতো। অন্যদিকেও ওরকম মাচা। তবে, তাতে ফরাশ ছিল না। নানা জিনিসপত্র থাকত।

গদির উপর কাঠের ক্যাশবাক্স, খেরো খাতা এবং দেওয়ালের দিকে লোহার সিন্দুক ছিল। বাইরে ছিল চওড়া বারান্দা। হাটমুখো। হাটের পুরো চারদিকেই প্রায় হাটমুখো এরকম গদিঘর ছিল। পাটের মস্ত আড়ৎ ছিল তামারহাট। নদী বেয়ে পাট আসত পুব-বাংলা থেকে। তামারহাটের গা-বওয়া নদীর সঙ্গে ধুবড়ির ব্রহ্মপুত্রের যোগ ছিল। অন্যদিকে যোগ ছিল তিস্তার সঙ্গে।

তামারহাটে গেলেই, রংপুরে যাওয়ারই মতো নির্জনতা-প্রিয়, প্রকৃতি-প্রিয় ঋভুর মনের কল্পনার আগল খুলে যেত। রংপুরে যতখানি শাসন ছিল এখানে তার কিছুমাত্র ছিল না। সারা দিনই প্রায়, খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া, বনে, নির্জনে, নদীতীরে ও ঘুরে বেড়াত। তার সঙ্গী হতো কখনও কড়িদা। কখনও ঝণ্টু ও বাপ্পু। কড়িদা ছিল বড়ো পিসেমশাইর এক দাদার ছেলে। পরপর অনেক ছেলে মারা যাওয়ার পর যখন ওই ছেলে হয় তখন তিনকড়ি দিয়ে বড়ো পিসিমা কিনে নেন তাকে। বড়ো পিসিমার নিজের ছেলেরই মতো ছিল কড়িদা। কড়িদাদের বাড়ি ছিল তামারহাট থেকে গৌরীপুরের পথে তামারহাটের পরই যে প্রথম গ্রাম সেই কুমারগঞ্জে। কুমারগঞ্জের উলটোদিকে পথ চলে গেছিল তামারহাটের পাশ দিয়েই। সে পথ গিয়ে পৌঁছেছিল বড়োবাধার জঙ্গলে। "গুমা রেঞ্জ"। ওই পথ দিয়েই কুচগাঁও রাইমানা হয়ে যমদুয়ারে যেতে হত।

সশরীরে যমদুয়ারে শিকার গেছিল অনেকই পরে ঋভু। বড়ো হয়ে। কিন্তু ভূটান পাহাড়ের নীচে, স্বচ্ছ সংকোশ নদী বয়ে-যাওয়া, আসম, ভূটান আর বাংলার সীমান্তের সেই অতীব ভয়ঙ্কর সুন্দর যমদুয়ার নামটি তাকে সেই প্রথম দিন থেকেই হাতছানি দিয়েছে। মাঝে মাঝে ঋভুদের সঙ্গী হতো রানুদাদা এবং এককড়িদাও। এককড়িদা ছিল পিসেমশাইয়ের বাড়ির লাগোয়া বাড়ির প্রতিবেশী রতুজেঠুর বড়ো ছেলে। রতু বিশ্বাস। টি-এইট মডেল ফোর্ড গাড়ির এবং একনলা বন্দুকের মালিক দীর্ঘদেহী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী রতু জেঠুর নামে তখন সে অঞ্চলে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত।

কড়িদা (তিনকড়ি), রানুদা, ঝন্টু, এবং বাপ্পু সকলেই হয় কুচবিহার নয় ধুবড়ির স্কুলে পড়ত। এবং হস্টেলেই থাকত। শীতের সময়ে সকলেই বাড়ি এলে ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া ও মজা হতো নানারকম। বড়পিসিমার মেয়ে ববিদিদি ছিল ঋভুর চেয়ে মাত্র দুমাসের বড়ো। আর ছবিদিদি (বড়দিদি) ছিল আরও বড়ো। এই দুই বোনের সদাহাস্যময় মুখ, সেবা যত্ন ও সাংসারিক গুণের জন্যে এঁরা

দু'জনেই হৃষীকেশ এবং তাপসীর খুব প্রিয় ছিলেন। তামারহাটেই ঋভু সাইকেল চালানো শিখেছিল, যদিও হাতে খড়ি হয়েছিল রংপুরেই। সাইকেল চালিয়ে এবং হেঁটেও চলে যেত ঋভু একা অথবা সসঙ্গী নানা জায়গাতে। সেইসব জায়গার নৈসর্গিক দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে রাখত। পৃথিবীতে যে এত পাখি আছে, এত গাছ, এত ভয় ও আনন্দ সঞ্চারকারী নির্জনতা তা ওর ধারণাও ছিল না।

কুমারগঞ্জের একটু আগে ধূলিধূসরিত পথের পাশে একটি আশশ্যাওড়া গাছের তলায় একটি বড়ো পাথর ছিল। দেবতা। লোকে বলত ঢিল-খাওয়া ঠাকুর। এই দেবতার নৈবেদ্য ছিল নুড়ি। যাওয়া-আসার পথে, পথ থেকে নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে দেবতাকে লক্ষ করে মারতে হতো ছুড়ে। অনেক জমে-থাকা নুড়ির উপরে ছুড়ে-দেওয়া নুড়ি গিয়ে কটাং করে লাগত। সারা হতো দেবতার পুজো। এই ঠাকুরের পুজো করতে খুব মজা পেতো ঋভু।

বলতে গেলে, কুমারগঞ্জের প্রায় উলটোদিকেই ছিল রাঙামাটি পাহাড়। টুঙ-বাগান। সেই বাগান পেরিয়ে পর্বতজুয়ার পাহাড়। নুড়িময় পাহাড়ি নদী। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে-ওঠা লালামাটির ছায়াচ্ছন্ন পথ। পর্বতজুয়ারে ছিল রাভাদের গ্রাম। যে রাভারা, আসামের গোয়ালপাড়া ও গারো পাহাড় জেলার বহু জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আছে গারো পাহাড়ের পায়ে পায়ে বয়ে-যাওয়া জিঞ্জিরাম নদীর দুই পাশে ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকাতে।

পর্বতজুয়ারের পরে জঙ্গল নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে। অতএব আরও বেশি রহস্যময়। "বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে" এই সব বনে-পাহাড়ে সবরকম ভয় সম্বন্ধে অবহিত ঋভু তার প্রায় সমবয়সী পিসতুতো ভাইদের ও দাদাদের সঙ্গে কচি গলায় গান গেয়ে গেয়ে ফিরত। ডানায় জ্যোৎস্না মেখে, ডানা নেড়ে উঠত রাতের পাখি। জ্যোৎস্নার কুচি উড়ে যেতে দিগ্বিদিকে, বনজ্যোৎস্নাকে চারিয়ে দিয়ে; বনতলের অন্ধকারকে নাড়িয়ে দিয়ে।

এই রাঙ্গামাটি পাহাড়ে প্রতিবছরই সাতই বৈশাখ একটি মেলা বসে। "সাতবোশেখির মেলা।" চারধারের বন-পাহাড়ের আর নদীর চতুর্দিক থেকে তেল চকচকে আদিবাসী মেয়েরা মাথার চুলে ফুল গুঁজে প্রতি পদক্ষেপে তরঙ্গ তুলে হাসতে হাসতে গাইতে গাইতে চিকন-কালো সাপের মতো হাতে এ ওর কোমর জড়িয়ে আসে এখানে। সেই সময় পাতা ঝরতে থাকে মনের। পাতা ভরে যায় বনের। লাল, হলুদ, খয়েরি, কালো লক্ষ লক্ষ ঝরা-পাতার উপরে পা ফেলে ফেলে মচমচানি তুলে হেঁটে যায় রাভা আর মেচ মেয়েদের হিংস্র কালো কুকুর। পলাশের সমান্তরাল শুকনো ডালে পলাশ ফুলেরই মতো লালরঙা বন মুরগি ফুটে থাকে। কেউ কাছে এলেই তাদের ডানায় ডানায় ভর্‌র্-ভর্‌র্ ভরা আওয়াজ তুলে উড়ে যায়। পাহাড়ের নীচে যেখানে দেবতার থান, পাথুরে নদীর বুকে, সেখানে কবুতর আর মোরগ আর পাঁঠাবলি হয়। বৈশাখি-বনের তীব্র বহুবর্ণ পটভূমিতে কবুতরের রক্তের লাল, নদীর পাথরের কালো আর আদিবাসী মেয়েদের শরীর-ঘেরা উগ্র সাদা সাদা অথবা কোনো কোমল রঙিন শাড়ি রঙের দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। হলুদ আর কালো বেনে-বউ হলুদ আর লাল বনে বউ-কথা-কও বউ-কথা-কও করে ডেকে ফেরে, চমকে চমকে।

এই "সাতবোশেখির মেলায়" বহুবার উপস্থিত থেকেছে ঋভু পরবর্তী জীবনে। চন্দ্রালোকিত বনে রাতের বেলা একা একা ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যে রোমাঞ্চ তার সঙ্গে তুলনীয় খুব কম রোমাঞ্চেরই শরিক হয়েছে ঋভু।

তামারহাটেরই প্রধান পথের পাশে বাড়ি ছিল বৈদ্যকাকুর। ভালো নাম ছিল শৈলেন্দ্রনাথ। কালো পাথরে কোঁদা ছিল তাঁর চেহারা। বড়ো বড়ো চোখ, তীক্ষ্ণ নাক; সুগঠিত শরীর। বৈদ্যকাকুর পদবি ছিল দত্ত। আর কোনো "বৈদ্য" নামের অবৈদ্য মানুষ দেখেনি ঋভু। অমন মানুষও না।

এই মানুষটির তিনকুলে বোধহয় কেউই ছিল না। বড়ো পিসেমশাই তাঁকে নিজের সহোদরের মতোই দেখতেন। সামান্য ব্যবসা ছিল, পাটেরই। তবে অসামান্য হলেও মানুষটির চরিত্র কিছু অন্যরকম হতো না। সাচ্ছল্য-অসাচ্ছল্য, সুখ-দুঃখ কিছুই তাঁর সদা-আনন্দময় সত্তাকে ছুঁতে পারত না। বৈদ্যকাকুর মুখ সবসময়ই অনাবিল হাসিতে উজ্জ্বল ছিল। চেইন-স্মোকার ছিলেন। সিগারেট টানার

ফাঁকে ফাঁকে বড়ো-ছোটো প্রত্যেকের প্রতিই রসিকতা ছুড়ে দিতেন তিনি। এমন অনুযোগহীন পরহিত-প্রাণ হা-হা হাসির দিল-খোলা মানুষ এই বিপুল সংসারে খুবই কম দেখা যেত। একথা কিশোর ঋভুরও বুঝতে কোনোই অসুবিধে হতো না।

ওই বৈদ্যকাকুর মুখেই ঋভু, হৃষীকেশ, রতুজেঠু এবং হৃষিকেশের টেরিটোরিয়াল আর্মির দুই বন্ধুর যমদুয়ারের বনে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি শুনে হেসে গড়িয়ে যেত। তবে রস অক্ষুণ্ণ রাখতে ঋভুর বৈদ্যকাকুর সেসব কাহিনি বৈদ্যকাকুর জবানিতেই শুনতে হয়। কথার মধ্যে মধ্যে সামান্য তোতলাতে তোতলাতে নিজেও হাসতেন। এবং সেই হাসি সাংঘাতিক সংক্রামক ছিল।

আরেকজন মানুষকেও খুবই মনে পড়ে। তিনি হলেন মানিককাকা। বড়ো পিসেমশাইয়ের কীরকম ভাই হতেন যেন। থাকতেন, পিসেমশাইর এক দাদার বাড়িতে। ধুবড়ি শহরে পিসেমশাইয়ের একাধিক বড়ো ভাইয়ের বাড়ি ছিল। আবার তামারহাটেও ছিল। কুমারগঞ্জে ছিল অন্য দাদার। কড়িদার বাবার। তিনি, কড়িদা যখন ছোট, তখনই চলে গেছিলেন পৃথিবী ছেড়ে।

মানিককাকা নাকি যুদ্ধে আরাকান বর্ডার না কোথায় ছিলেন! সত্যি কি না তা উনিই জানতেন। এয়ারফোর্সে। যুদ্ধের মধ্যেই কেন যে রণাঙ্গন ছেড়ে তিনি ইংরেজ জাতকে সমূহ বিপদের মধ্যে ফেলে তাঁর মহৎ কর্তব্য অর্ধসমাপ্ত রেখে চলে এলেন তাও তিনি নিজেই জানতেন। তিনি এয়ার-ফোর্সে ঠিক কোন পদে ছিলেন তাও ঋভুর জানা ছিল না। কিন্তু খুবই সপ্রতিভ, রসিক, হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল। লম্বা, তীক্ষ্ণ নাক। সরু কোমর, চওড়া বুক।

বৈদ্যকাকুকে ঋভু জিজ্ঞেস করেছিল মানিককাকুর পদের কথা, এয়ার-ফোর্সে। বৈদ্যকাকু চাক্ চাক্ করে হেসে বলেছিলেন, তুইও যেমন। পদ আবার কী। মান্‌কেটা খালাসি-ফালাসি ছিল। পদসেবা ছাড়া আর কোন পদে ওকে নিত!

মানিককাকুর উপদেশ ছিল, বিনা পয়সাতে গোপেন শা'র মনিহারি দোকানে যদি ব্রাসো, আয়োডেক্স, অথবা ঢোল-কোম্পানির দাদের মলমও পাস তবে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলবি।

এই মানিককাকুই সেই বিখ্যাত "কাজিন"-এর গল্পটি বলেছিলেন ঋভুকে, অবশ্য দেশ ভাগের পরে। গল্পটি এইরকম।

বহুবার বহু জায়গাতে বলা সত্ত্বেও সেই গল্পটি আরেকবার বলার লোভ সামলানো ঋভুর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

মানিককাকু কথায় কথায় "মাইরি" বলতেন। মাইরি আর 'শালা' অবশ্য ঋভুদের স্কুলেও অনেক ছেলে বলত। কিন্তু মানিককাকুর শালা বা মাইরি, মানিককাকুরই ভাষায় শব্দের "ট্রাজেকটরি", স্ট্রাইকিং-পাওয়ার", "ভেলোসিটি" এসব অনেকগুণ বাড়িয়ে দিত।

ঋভু জিগেস করেছিল, কীরকম?

মানিককাকু বলেছিলেন, বন্দুক আর রাইফেলের তফাত বুঝিস?

হ্যাঁ।

কি?

রাইফেলের নলের মধ্যে প্যাঁচ কাটা থাকে। গুলি যখন করা হয়, তখন সে গুলি নলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অনেকবার অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘুরে তারপরই নল ছাড়ে বলেই তার গতি অনেকই বেশি হয় বন্দুকের গুলি থেকে।

তা বটে। কিন্তু কাছাকাছি বন্দুকের গুলির যা স্টপিং-পাওয়ার, যা ধাক্কা, তা রাইফেলের গুলির নেই। কোনো গুলিখেকো—বাঘ বা ভাল্লুক তোর কাছে এসে ঘাড়ে ঠ্যাং উঁচিয়ে শুতে চাইলে তাদের ঠাণ্ডা করার জন্যে বেস্ট হচ্ছে বন্দুকের গুলি।

আপনি তো বলেছিলেন ভাষার কথা।

হ্যাঁ। শট-রেঞ্জে বন্দুকের গুলির কাজ রাইফেলে হয় না। কেন রে ঋভু তুই তো এসব জানিসই। বাংলা সাহিত্যে তো অনেক সাহিত্যিকই বন্দুক-রাইফেল পিস্তল-রিভলবার সম্বন্ধে লেখেন। পকেটে 'পিস্তল' নিয়ে বেরুল গোয়েন্দা তারপরই 'রিভলবারের' শব্দে দশদিক সচকিত হয়ে উঠল। পড়িসনি?

বৈদ্যকাকু মানিককাকুর কথা শুনে পুক পুক করে হেসে বললেন, তুই আবার বাংলা সাহিত্য কবে থেকে পড়া ধরলি? তোর পড়ার মধ্যে তো একমাত্র গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা আর বটতলার "মায়া ও সন্নিসী"।

এই বৈদ্য, চুপ কর। যা বলছিলাম, বুঝলি ঋভু। "শালা' আর "মাইরি" শব্দতে ট্যাজেক্টরি বাড়ে। বড়ো পুকুরে পাতলা কিছু ছুঁড়ে দেখেছিস কখনও? সেটা ব্যাঙের মতো জল টপকে টপকে লাফাতে লাফাতে যায়। যতখানি সম্ভব প্যারালালি ছুঁড়তে হবে কিন্তু দেখেছিস?

হ্যাঁ।

শব্দও সেইরকম। "বুঝেছিস!" বললে, যাকে বোঝাবার সে একরকম বুঝবে। আর "বুয়েছিস মাইরি" বললে সে বুঝবে অন্যরকম। মানে, বুঝলি তো? মানে, অনেক দূরতক্ বুঝবে।

আর শালা?

হ্যাঁ, শালা প্রতিটি শব্দের ওজন বাড়িয়ে দেয়। যেমন ধর তিনটি শব্দ বলছি। "দুস্", "ধর", "মার"। তুই যদি বলিস, দুস্স্ ভাল্লাগে না, অথবা ধর চোরকে, অথবা মার গোঁসাইকে তাহলে তার এফেক্ট একরকম হবে। আর যদি বলিস "দুস্স্ শালা, জান কয়লা হয়ে গেল।" অথবা "ধরব শালা চোরকে" কিংবা "মার শালা গোঁসাইকে" তাহলে, শব্দগুলো অনেকই জবরদস্ত হয়ে যায় না?

ঋভু বলেছিল, তা হয়।

তোদের কলকাতার ন্যাকা-বোকা স্কুলে ওসব জিনিস শেখাবে না। এসব আমার জীবন থেকে শেখা। জীবন তোকে যা শেখাবে, কোনো শালার স্কুলেই তা শেখাতে পারবে না। মাইরি বলছি।

মানিককাকু আর বৈদ্যকাকু একসঙ্গে থাকলে তাদের দুজনের কথা, আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণ শুনতে শুনতেই সারা সকাল কেটে যেত। মায়েরা বা পিসির শাসন যে এই অবধিও বিস্তৃত হয়নি তা জেনে ঋভু আশ্বস্ত হতো।

মানিককাকু বলতেন, ঠোঁটটা বেঁকিয়ে, 'লাইফে লাইভলি হবি'। লাইফ মানে জীবন নয়, মানে কী বলব তোকে, লাইফ-স্প্যান নয়, লাইফ মানে, অনেক বড়ো একটা ব্যাপার। বলেই দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে দেখাতেন। মানিককাকুর হাতের গড়ন এবং আঙুলের গড়ন ভারি সুন্দর ছিল। কোনো শিল্পীর হাত ও আঙুলের মতন। বলত, পরিপূর্ণ হবি জীবনে, বুঝলি ঋভু। জাস্ট জীবনটা কাটিয়ে চলে যাস না এই বৈদ্যদের মতো, ইডিয়টদের মতো, পাট কিনে আর পাট বেচে।

হাঃ। বৈদ্যকাকু ফুট গালতেন, আর তুইতো হালায় ড্যাকাটো প্লেনে বস্তা চাপাইয়াই জীবন শ্যাষ কইর‍্যা ফ্যালাইলি।

তোকে কে বলেছে র‍্যা? জীবন তো সবে স্টার্ট করলাম। দেখবি রোলস-রয়েস এঞ্জিনের দৌড় এবারে।

বৈদ্যকাকু বেশি-সময়েই খালি গায়ে থাকতেন। কখনও হাত-কাটা গেঞ্জি পরতেন ধুতির সঙ্গে। কোমরের কাছে ধুতিটা অদ্ভুত কায়দায় পেঁচিয়ে রাখতেন। কোনোদিন নিজেকে ভদ্রলোক করতে হলে, সাদা টুইলের ফুলহাতা শার্ট পরতেন ধুতির উপরে। পায়ে চটি থাকত সবসময়।

মানিককাকুর পরনে হাতকাটা গেঞ্জি এবং লুঙি। কখনও খালি গায়েও থাকতেন। বাচ্চুদার স্ত্রী পাগু বউদি বিকেলবেলা ভাশুরঝির চুল বাঁধতে বাঁধতে শান-বাঁধানো দাওয়ায় বসে গান গাইতেন, "যেন কার অভিশাপ লেগেছে, মোর জীবনে"। গানটা এখনও কানে লেগে আছে ঋভুর।

বৈদ্যকাকু হেসে বললেন, কার অভিশাপ আবার কী রে! তুই বাচ্চুরে বিয়া করছস্, এর চেয়ে বেশি অভিশাপ আর জীবনে আর কী ক'তো, ঠিক আছে বৈদ্যকাকা। তোমারে দেখুম।

বৈদ্যকাকুর মতো নিরভিমান, প্রত্যাশাহীন, প্রকৃত ভালো মানুষ বেশি দেখা যায় না। অপমান অসম্মান তাঁকে কোনোদিনও একটুও ছুঁতে পারেনি। "ছাড়ান দাও" বলে হেসে উঠেছেন চিরদিনই। আজ বৈদ্যকাকু নেই। তবে ঋভুর মনে তাঁর দুষ্টুমিমাখা হাসিমুখখানি অম্লান থাকবে, ঋভু যতদিন বাঁচে।

মানিককাকু বললেন, শোন তবে। পার্টিশান হয়েছে। পিলপিল করে হিন্দুরা চলে আসছে ওদিক থেকে। এদিক থেকেও মুসলমানেরা গেছেন।

একদিন কাক ভোরে উত্তর কলকাতার এক গলির ভিতরে একটি বাড়ির সামনে ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ির ছাদে পেতলের কলসি, লোহার কড়াই, শিল-নোড়া, হামান-দিস্তা, বিরাট বিরাট পাহাড়ের মতো ডোরাকোটা সতরঞ্চী-মোড়া বিছানাপত্তর। তোরা বাঙালরা বড়ো আকাট। বিছানাগুলো হোল্ড-অল-এও তো সুন্দর করে বেঁধে আনা যায়! দেশ ছাড়ছিস তো কি আন্ডারওয়্যার পরে যেতে হবে?

তারপর?

তারপর আর কি? বাড়ির মালিক লুঙ্গি পরে, খালি গায়ে, ডান হাতে চায়ের কাপ আর বাঁ হাতে টাটকা আনন্দবাজার ধরে; জোড়া হাঁটু দিয়ে দরজার খিল খুলে বললেন, কী চাই?

বলব?

ঘোড়ার গাড়ি থেকে অবতীর্ণ হওয়া বাঙাল বললেন।

বলবেন মানে?

এইটিই তো ১০৩/বি-এর ৫-এর সি তো।

আজ্ঞেঁ তাই।

আপনিই কি নয়নচাঁদবাবু। নদের চাঁদ মিত্তিরের বড়ো নাতি। ছেলের ঘরের?

আজ্ঞেঁ তাও তো ঠিকই বলেছেন।

তাহলে চিনতে পারবেন। আগে আমার ওয়াইফ আর পাঁচ ছেলেমেয়েকে একটু নামিয়ে নিন। আপনার ওয়াইফ কি খুব ব্যস্ত? আর ওরা সকালে এখনও কিছু খায়নি। বনগাঁতে শিঙাড়া খেতে পারত কিন্তু তখন শেষ রাত। আমরাও চা খাইনি।

নয়নচাঁদবাবুর নয়ন দুটি বড়ো বড়ো হয়ে গেল। তাঁর কিছু বোঝার আগেই স্বামী-স্ত্রী এবং পাঁচ ছেলেমেয়ে একে একে ভিতরে চলে এলেন। ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানও পয়সা নিয়ে চলে গেল।

নয়নচাঁদবাবু বললেন, পরিচয়টা?

বলছি। একটু বসতে দিন, জিরোতে দিন। সেই ঝালকাটি থেকে খুলনে স্টিমারে, খুলনে থেকে ট্রেনে এই কলকাতা। বর্ডার-ক্রস করার সময় সে কী হয়রানি! সবাইকে অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যে আসতে পেরেছি...

আপনার পরিচয়টা?

হ্যাঁ। আপনি হলেন গিয়ে আমার ফার্স্ট কাজিন।

ফার্স্ট কাজিন? কী রকম? আমি তো আপনাকে চিনিই না।

সব কাজিন সব কাজিনকে চেনে না। কুলীনদের পরিবারে কি হতো? জামাইকেই ভালোমতো চিনত না, তার...

আমরা তো কুলীন নই।

শুনুন, কুলীন হন কী না হন তাতে কিছুমাত্রই যায় আসে না। আপনি আমার ফার্স্ট কাজিন। কারণ, আপনার ঠাকুরদা নদেরচাঁদ মিত্তির আর আমার ঠাকুরদা গদাধর দত্ত দুজনেই বাখরগঞ্জ সাবডিভিশনের এক জমিদার বাড়িতে ডাকাতি করতে গেছিলেন। পথে তাঁরা দুজনেই একই মানুষখেকো বাঘের খাদ্য হন। মানে, ইওর গ্র্যান্ডফাদার অ্যান্ড মাই গ্র্যান্ডফাদার ওয়্যার ইটন বাই দি সেম ম্যান-ইটিং টাইগার।

নয়নচাঁদ গালে আঙুল পুরে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বললেন, বুঝলাম না ঠিক।

কেন? এ তো ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস নয়। বুঝলেন না কেন? একই পেট থেকে বেরোলে যদি ভাই হয়, তবে একই পেটে গেলে কেন ভাই হবে না? এই পরম দুর্দিনে আমি আমার ফার্স্ট-কাজিন ছাড়া কার কাছে গিয়ে উঠব বলো ভাই? কে আমাকে আশ্রয় দেবে আর? ভাইডি! নয়নচাঁদ।

ঋভুরা তামারহাট থেকে কলকাতা ফিরে আসার পর সেই বছর আর বরিশাল যাওয়া হলো না। এবং হলো না বলেই ছেচল্লিশের দাঙ্গা ঋভুকেও দেখতে হলো। তারই কিছুদিন আগে লড়াইও শেষ হলো। মানে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সকলের সে কী আনন্দ।

আলো থেকে ঘেরাটোপ উঠে গেল। জানলার কাচের উপর থেকে আড়াআড়িভাবে লাগানো প্লাস্টার খুলে ফেলা হলো। এআরপিদের পিঁ-পিঁ করে বাঁশি বাজিয়ে বাড়াবাড়ি করা বন্ধ হলো। এআরপিদের চাকরি গেল। সব পাড়ার লোকেই খুশি হলো। সত্যি সত্যি বোমা পড়লে কী হতো না হতো বলা যায় না কিন্তু এআরপি-দের খবরদারিতে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে থাকত সবসময়ই।

অরুণ বরুণ ঘণ্টুরা খুব খুশি হলো। ওরা ঢাকুরিয়া লেকের পাশে সাদার্ন অ্যাভিন্যুর উপরে ওদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে বলে। ওদের চমৎকার বাড়িটা মিলিটারিরা নিয়ে নিয়েছিল যুদ্ধের সময়ে। "রিকুইজিশান" করেছিলো।

ঢাকুরিয়া লেকের পাশে যে সব মিলিটারি ক্যাম্প আর হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল সেগুলোও ধীরে ধীরে ফাঁকা হতে লাগলো।

আমেরিকান সৈন্যদের এতদিন দেখা যেত তারের বেড়ার মধ্যে দিয়ে। তাদের নানারকম বেলেল্লাপনাও।

দিশি মানুষদের ও মেয়েদের আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ব্যবহারও। বাঙালির আত্মসম্মানজ্ঞান খোয়ানোর থেকে কখন শুরু ঋভু জানে না, তবে ঋভু সেই সময়েই সে সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হলো। অবশ্য পেটে ভাত ও পরনে শাড়ি না থাকলে সব কালের সব দেশের মানুষের পক্ষেই আত্মসম্মান জ্ঞান বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। এবং এ কথাও ঠিক বাংলাকে যতরকম অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গত ষাট বছরে যেতে হয়েছে তেমন আর কোনো রাজ্যকেই যেতে হয়নি। সন ছিয়াশির মন্বন্তর, উনিশশো ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশ ভাগ এবং সাম্প্রতিক অতীতের অদূরদর্শী আত্মঘাতী, রাজনৈতিক মতাদর্শ বাংলা এবং অধুনা পশ্চিমবাংলাকে সর্বস্বহৃত করেছে এবং আরো করবে। অন্য সব দিকের কথা ছেড়েই দিলাম। মনোগত দিক দিয়ে তার সম্পূর্ণ সর্বনাশের বাকি আর বিশেষ নেই।

আমেরিকান সেনাবাহিনীর কাছে হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় হয়ে-যাওয়া অগণ্য জিনিস, ওয়েপন ক্যারিয়ার থেকে হাত-কাটা গেঞ্জি, জিপ থেকে মশা-মারার গ্যাস, জুতো থেকে আন্ডারওয়্যার, পথে ঘাটে বিক্রি হতে লাগল আর আদেখলা মানুষ হামলে পড়ল তার উপরে। এই "ডিসপোজালের" জিনিস ষাটের দশক অবধি বিক্রি হয়েছিল দেশের অনেকই জায়গাতে।

পৃথিবীতে বোধহয় আমেরিকান সেনাবাহিনীই একমাত্র সেনাবাহিনী যারা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় নেমে এত এবং এতরকম অপচয়ে মেতেছে। যুদ্ধের তাপ বা আঁচ তেমন গায়ে না লাগিয়েই শুধু আড়ম্বরে এবং আত্মপ্রচারেই মগ্ন থেকেছে। আমেরিকানরা যে কত বড়ো যোদ্ধা তার প্রমাণ পরবর্তীকালে নিজেদের নানাবিধ প্রযুক্তির শেষ পর্যায়ে উন্নীত করার পরও ভিয়েতনাম। ইজরায়েলিরা উগান্ডার এনটেবিতে যেমন দেখিয়ে দিয়েছিল তাদের পারদর্শিকতা কোন্ স্তরের, আমেরিকানরা রাতের

অন্ধকারে মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে গণ্ডা গণ্ডা হেলিকপ্টার নামিয়ে কেলোর-কীর্তি করে যোদ্ধা হিসেবে তাদের চরম অপদার্থতার প্রমাণ এই সেদিনও দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ ভাগে ব্রিটেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েও তারা যে পরিমাণ প্রচারসর্বস্ব "ওয়ার-মুভিজ" তৈরি করেছে তার তুলনা নেই। সেই সব ছবিতে জার্মানদের এমনই বোকা ও অসহায় করে দেখানো হয়েছে যে, মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে জার্মানরাই সবচেয়ে ভিতু ও অপদার্থ। অবশ্য তাদের সাফল্যের মরুভূমিতে একমাত্র মরূদ্যান, ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধ। তাও যা দীর্ঘ সময় লাগল এবং যা অপমান সহ্য করতে হল তা বলার নয়। সাদ্দামকেও শেষ পর্যন্ত গদ্দাম করতে পারল না।

এইবারে দুই জার্মানি এক হচ্ছে। আধখানা জার্মানিই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, দেশের পরিচয় দেশের মানুষদেরই দিয়ে, বিত্ত দিয়ে নয়, 'ইজম'-এর বুলিসর্বস্বতা দিয়েও নয়। হিটলারের আর তার বশংবদদের পাপে, ইহুদিদের উপর অত্যাচারের অপরাধমনস্কতায় এতোদিন জার্মানি মাথা নিচু করেছিল। একীভূত হওয়ার পর তারা যে কী ভেল্‌কি দেখাবে তা কারোরই জানা নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া সরে যেতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ছায়া গ্রাস করল কলকাতাকে।

ঋভু সেদিন সকাল থেকেই শুনছে যে, টালিগঞ্জ থেকে বিরাট প্রসেশান আসছে মুসলমানদের। "তাজিয়া" নিয়ে হাসান-হুসেন করতে করতে আসছে তারা। সেটা নতুন কিছু নয়। শোভাযাত্রা তেওহারের দিনেই আসবে। কিন্তু সুরাবর্দী সাহেবের আমল সেটা। কিছু একটা ঘটবে এমন কথা সকলেরই মনে মনে ছিল। বড়োরা অনেকেই আলোচনা করছিলেন সে বিষয়ে। আশ্চর্য। সেই সব শোভাযাত্রাতে এবং পরবর্তী দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে কিন্তু মুখ্য ভূমিকাতে থাকত অবাঙালি মুসলমানরাই। হিন্দুদের বেলাতেও তাই। শিখেরাও যোগ দিত অবাঙালি হিন্দুদের হয়ে। বাঙালি হিন্দুরা মারামারিতে খুন-খারাপিতে কোনোদিনও বিশেষ দড় ছিল না। মুসলমানদের বেলাও হয়তো সেই কথাই বলা চলে। কথায় কথায় "চাকু বের করার" সংস্কৃতি কোনো বাঙালিরই কোনোদিনও ছিল না।

ঋভুর বাবা-কাকারা ফজলুল হক সাহেবের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই বড়োমাপের মানুষটির স্মৃতির জন্যে ভাবতে তা নয়ই, বাংলাদেশেও আজ অবধি করার মতো কিছুই করা হল না।

চোদ্দই অগাস্টের দুপুরে ঋভু তাদের সরু গলির শেষে হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারির পাশের থামের মাথায় তার "অবসার্ভেশান পোস্টে" বসেছিলো। সিনেমাতে শোনা আওয়াজের মতো জনসমুদ্রর আওয়াজ আসছিলো দূব থেকে। সেই "তাজিয়া", রসা রোড ধরে আসছিলো। সাদার্ন মার্কেটের কাছে আসতেই শোভাযাত্রার শোভা নিভে গেলো। "ক্যামোফ্লেজ" করে রাখা নানারকম অস্ত্রশস্ত্র হঠাৎ বের করে শোভাযাত্রীরা দুধারে আক্রমণ শুরু করলো। অন্তত ঋভু পালিয়ে-আসা মানুষদের মুখে যা শুনেছিলো তা ঐ রকমই। প্রকৃত ঘটনা হয়তো অন্যরকম, এমনকি উল্টোও হতে পারে।

তারপর থেকে যে বিভীষিকা চললো ক'দিন তা ক্লাস-ফাইভের ঋভুর মনে চিরজীবনের মতোই বড় মর্মান্তিক ক্ষতর মতো বসে আছে।

"বন্দেমাতরম" আর "আল্লা-হু-আকবর" চিৎকারে, আতঙ্কে, হৃদয়বিদারক নানা ঘটনা এবং গুজবে হৃষিকেশ-হীন কটি দিন যে কী আতঙ্ক আর বল্গাহীন গুজবের মধ্যে কাটলো ঋভুদের তা ওরাই জানে! বাড়িতে তখন পুরুষমানুষ বলতে একমাত্র ছোটকাকু।

সারারাত পালা করে করে পাহারা দিতো পাড়ার সকলে। নিজের নিজের পাড়া। ডিউটি ভাগ করে দিতেন পাড়ার বড়রা। মেয়েরা দোতলা তিনতলাতে জল ফুটোতেন বড় বড় হাঁড়িতে। সম্ভাব্য শত্রুদের নিবৃত্ত করার জন্যে। কেউ কেউ শুকনো লংকার গুঁড়ো করে হাতের কাছে রাখতেন। সে কী উত্তেজনা, ভয়; নিদ্রাহীন-দিন-রাত।

রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতেই লুঙি-পরা শব পড়ে থাকতে দেখল ঋভু দু-চারদিন পর। ঐ থামের উপরের "অবজার্ভেশান পোস্ট" থেকে।

ছোটোকাকু একদিন শেষসকালে দৌড়ে বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু দু-হাত জখম। কপালে একটু ক্ষত।

তাপসী বললেন, কি হয়েছে?

ছোটোকাকুর হাত-পা থর থর করে কাঁপছিল। ধপ করে নিজের খাটে কাটা-কলাগাছের মতো বসে পড়ে বললেন, মেরে ফেলল বউদি, নইম দর্জিকে মেরে ফেলল ওরা। দু-তিনশো লোক; একজন মানুষকে! বাধা দিতে গেছিলাম, তাই...। একটা জীবন্ত মানুষ, চেনা-মানুষকে; শুধু তার ধর্ম আলাদা বলেই যে এমন করে মারা যায় তা...

ছোটোকাকু, উত্তেজনায়, অসহায়তায়, অন্যের পাপের অনুতাপে থরথর করে কাঁপছিলেন।

কাঁপা গলাতে বললেন, বউদি! মানুষ আর মানুষ নেই। জানোয়ার হয়ে গেছে। একেবারে জানোয়ার!

তাপসী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি একা কি করবে? চেষ্টা তো করেছিলে বাঁচাবার। তাছাড়া, মানুষের তো মাথার ঠিক নেই! মেটিয়াবুরুজ, কলুটোলা স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, টালিগঞ্জ, পার্কসার্কাস থেকে তো কত ছিন্নভিন্ন হিন্দু পরিবার কোনোক্রমে এসেছে এদিকে, তা তো জানো। মায়ের সামনে মেয়ে অত্যাচারিত হয়ে মারা গেছে, মেয়ের সামনে মা; বাবার সামনে ছেলে, ছেলের সামনে বাবা! মানুষ সত্যিই এখন আর মানুষ নেই। কী হিন্দু কী মুসলমান!

ছোটোকাকু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

ঋভু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। যে-মানুষ এক এক ঘুঁষিতে লোকের নাক ফাটান তিনি এরকম মেয়েদের মতো কাঁদেন!

বললেন, বউদি! আমি ম্যাট্রিক ফেল কিন্তু ওই সব মানুষেরা কি শিক্ষিত? ওই ভিড়ের মধ্যে, অবিনাশবাবুও ছিলেন।

কে অবিনাশবাবু? আমাদের অবিনাশবাবু?

হ্যাঁ, প্রফেসর, ভিতু; মেরুদণ্ডহীন!

তাপসী বললেন, ক্ষমা করে দিও ভোপাল। ওদের ক্ষমা করে দিও। যাদের মেরুদণ্ড থাকে তারা কোনোদিনও গড্ডলিকার সদস্য হয় না, ভিড়ে গিয়ে ভেড়ে না। তাদের মাথা উঁচু করে একা দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা থাকে। ভিড়ের মধ্যে তো ওঁরাই থাকবেন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অনেকগুলো করে মানুষ থাকে ভোপাল। তারা কেউ আমাদের গর্বিত করে; কেউ লজ্জিত। নইম না কী নাম বললে মানুষটির, তার আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা কোরো। আমরা সবাই করব।

শিক্ষার তাহলে দাম কি বউদি? কি লাভ অনেক লেখাপড়া করে?

ছোটোকাকু আবারও বললেন, কাঁদতে কাঁদতে।

ঋভুর খুব গর্ব হলো তার ছোটোকাকুর জন্যে। সেজকাকুর জন্যে যেমন প্রায়ই হতো। ছোট্ট ঋভু, যেন সেই প্রথম বুঝতে পারল যে, শিক্ষা আর মনুষ্যত্ব সমার্থক নয়। পরবর্তী জীবনে এই সত্যটা ঋভুকে বারেবারেই বড়ো পীড়িত করেছে। কোনো "শিক্ষিত" মানুষকেই ঋভু শুধুমাত্র তার তথাকথিত শিক্ষা বা কৃতিত্বর কারণেই "শিক্ষিত" বলে তাই আজও মেনে নিতে পারেনি। কত অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক দেখল আজ পর্যন্ত যাঁদের মানুষ বলেই গণ্য করতে পারেনি ও। তাঁরা মেরুদণ্ডহীন, নিজস্বার্থপরায়ণ; কীটসদৃশ। চোখের চামড়াহীন কিছু পদলেহক মানুষ।

ঋভুদের বাড়ির কাছেই একটা মদের দোকান ছিল। দোকানটির মালিক যে অবাঙালি মুসলমান তা বোঝা বা জানা গেল এই প্রথমবার, দোকানের নিয়মিত খদ্দেররা যখন তা ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল। জিপ গাড়ি করে একদল লুঙ্গি-পরা, হাতে-বালা-পরা সর্দারজী হাতে বন্দুক আর তরোয়াল নিয়ে ভবানীপুর থেকে এসে সেই দোকানের কোলপসিবল্ গেট এবং কাঠের পোক্ত দরজা ভাঙার কাজ সম্পূর্ণ করে পেটি-পেটি জন ডেওয়ার্স অ্যান্ড সন্সের হোয়াইট-লেবেল হুইস্কি আর জনি-ওয়াকার ব্ল্যাক-লেবেল হুইস্কি জিপে তুলে নিয়ে চলে গেল।

মালিক পরশুদিন দোকান বন্ধ করে যাওয়ার সময়ে দোকানের কাউন্টারের উপরে তাঁকে লেখা একটি চিঠি রেখে গেছিলেন। খোলা চিঠিটি উর্দুতে লেখা। হয়তো ভেবেছিলেন, পরদিন এসে জবাব লিখবেন। হলো না।

আর সারাজীবনের সঞ্চয়, পুঁজি, পরিশ্রম, সবকিছুই কয়েকজন মানুষের, যাদের সেই দোকানির উপর বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশও ছিল না; দু ঘণ্টার অপচেষ্টায় ধুলোতে লুটিয়ে গেল।

তবু ভালো যে, তাঁর প্রাণটা বেঁচে গেল।

এমনি করে সব পাড়াতেই সংখ্যালঘুদের প্রাণ, তাদের সমস্ত জীবনের পুঁজি, পরিশ্রম, ইজ্জৎ, স্বপ্ন এবং সবচেয়ে বড়ো কথা বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেল। বিশ্বাস নষ্ট হওয়াতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা হয়তো গত অর্ধ শতাব্দীতেও সম্পূর্ণ পূরিত হয়নি।

কোনো কোনো জাতির ইতিহাস বলে যে, থিতু হয়ে বসাটা আদৌ তাদের চরিত্রানুগ নয়। যুদ্ধে জিততে জিততে অথবা হারতে হারতে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে রাজত্ব বিস্তার করতে করতে বা পালিয়ে যেতে যেতেই এ সব জাতির এক একটি প্রজন্ম তাঁদের জীবন শেষ করেছেন। ওই জিততে জিততে বা হারতে হারতেই, ঘোড়ায় সওয়ার হয়েই তাঁরা ভালোবেসেছেন, সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, পথ-পাশের ঘর বেঁধেছেন, ছবি এঁকেছেন, গান গেয়েছেন, চলার পথের দুই পাশ থেকে নিজের নিজের হারেমের জন্য নতুন নতুন নারীও সংগ্রহ করেছেন; পরদিন যে শত্রুর হাতে প্রাণ নিধন হতে পারে তা জেনেও।

এই সব যোদ্ধা বা জীবন নিয়ে জুয়া-খেলাতে বিশ্বাসী জাতিদের টুকরো-হওয়া জীবনকে নতুন করে গড়ে-নেওয়ার ক্ষমতা হয়ত তাঁদের শৈশবের শিক্ষার মধ্যেই পড়ে।

কিন্তু ঋভুর মনে হয়, বাঙালিরা, জাতি হিসেবে এমন কোনোদিনও ছিলেন না। কী হিন্দু কী মুসলমান, তাঁরা অন্য ধাতুতে গড়া ছিলেন। ছিলেন বলেই, আজ অবধি এই দাঙ্গার ব্যথা এবং দেশবিভাগের ক্ষত তাঁদের হৃদয়ে জেগে আছে।

যারাই ক্ষুন্নিবৃত্তির চেয়ে মানবিক গুণ, মানবিক বৃত্তিকে চিরদিনই বড়ো করে দেখে এসেছেন তাঁরাই ক্ষুন্নিবৃত্তির ভারে চাপা পড়ে মরেন সবচেয়ে আগে। তাই বাঙালিরাও মরেছেন এবং আজকের বাঙালিরা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা তাই মৃতর চেয়েও মৃততর।

সেই দাঙ্গার বছরেই পুজোর সময়ে ঋভুরা রংপুরে গেল ছুটি কাটাতে। হৃষীকেশ এসেছিলেন অল্প ক'দিনের জন্যে। সেজকাকুকে ইংরেজরা ধরতে না পেরে তাঁর উপর থেকে "ওয়ারেন্ট" তুলে নিলেন।

"ক্রিকেট" কাকে বলে ইংরেজরা তা জানতেন। সত্যিকারের স্পোর্টসম্যানের জাত। তাঁরা এই দেশকে "দোহন" করতে এসেও আইনের প্রতি সাধারণভাবে যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন, মূল্যবোধ এবং শৃঙ্খলার প্রতি তাঁদের যে প্রত্যয় ছিল, তা স্বাধীন ভারতবর্ষে এত বছরেও বিরল।

চোদ্দ বছর ধরে চেষ্টা করেও সেজকাকুকে গ্রেপ্তার করতে না পেরে তাঁরা নাকি পরোয়ানাই তুলে নিয়েছিলেন। এইরকম আইন সত্যিই ছিল কি না তা ঋভুর মতো কিশোরের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, পুলিশের টিকটিকিরা আর সেজকাকুর পেছনে ঘুরে বেড়াত না। পুলিশ আর কখনওই রংপুরের বা কলকাতার বাড়িতে আসেওনি। পরোয়ানার আয়ু নাকি শুধু চোদ্দ বছরই হতো। তার মধ্যে যার নামে পরোয়ানা, তাকে ধরতে না পারলে, পরোয়ানা নিজেই ফৌত হয়ে যেত।

এই বছরে পুজোর সময় রংপুরের চেহারা একেবারেই অন্যরকম ছিল। তবে কানুঘুষো শুনছিল এইবারে এসে সব জায়গাতেই যে, ভারতবর্ষ নাকি "স্বাধীন" হয়ে যাবে। দেশভাগও হয়ে যেতে পারে। জিন্নাসাহেব পাকিস্তানের দাবি জানাচ্ছেন ক্রমশ জোরের সঙ্গে। নেহরু সাহেবেরও তাতে আপত্তি নেই। গদিতে তো বসতে পাবেন। গদির আকর্ষণ বড়ো আকর্ষণ। তার গরম বড়ো গরম।

গান্ধি মহাত্মা নাকি তেমন জোর করে "না' করছেন না।

ইংরেজরাও ঘুঘুর জাত। তাঁরা স্বাধীনতা দিলেও যাওয়ার সময়ে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসিতে দেশকে টুকরো করে দিয়ে যাবেন। রংপুর জেলা মুসলমান-প্রধান। তাই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বাংলা ভাগ যদি হয় তবে রংপুর পাকিস্তানেই পড়বে। তবে ওই সময়ে পর্যন্ত দেশভাগ নিশ্চিত ছিল না। স্বাধীনতাও নয়। পুরো দেশ গরম তখন নানা গুজবে।

হরিসভাতে তখন কখনও অষ্টপ্রহর, কখনও চব্বিশপ্রহর কীর্তন হতো। কোনো কোনো দিন রামধুন! মহাত্মা গান্ধির নোয়াখালি যাত্রার সঙ্গে সংখ্যালঘু জায়গাগুলিতে "রামধুন"-এর প্রভাব বিশেষ করেই পড়েছিল।

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সিয়া রাম

ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম
সবকো সুম্মতি দে ভগবান।"

রংপুরে এই গান হিন্দুরাই গাইতেন। মনে হয়, অবচেতন মনে ভয়ও ঢুকেছিল। নোয়াখালির মতো জঘন্য দাঙ্গা বরিশালে বা চট্টগ্রামে বা রংপুরে হতেও পারত এবং হলে হিন্দুরাই নিশ্চিহ্ন হতো।

কিন্তু হয়নি।

রংপুরের অনেকেই বলছিলেন যে, দেশভাগ হলে কলকাতায় চলে যাবেন। বা অন্যত্র। কারো ভাই, কারো মামা, করো শালা কলকাতায় থাকেন অতএব ভয় কি? মূর্খর স্বর্গে বাস ছিল তাঁদের।

পূর্ববঙ্গের বা উত্তরবঙ্গের মানুষেরা পদ্মা মেঘনা তিস্তা ব্রহ্মপুত্রর কোলে মানুষ। তাঁদের মন, তাঁদের অতিথি-পরায়ণতা একেবারেই অন্যরকম ছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। তাঁরা জানতেন না যে, তাঁরা তাঁদের অঢেল প্রাচুর্যে, তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের যেমন করে আসন বিছিয়ে বা কোল পেতে দেন, কলকাতার মানুষেরা তা করবেন না। হয় তো চাইলেও পারবেন না। কলকাতার মানুষদের অবকাশ কম। মনও, দীর্ঘদিন চারদেওয়ালে বন্দি থাকতে থাকতে বোধহয় ছোটো হয়ে যায়।

কলকাতায় যাঁরা না-থেকেছেন তাঁদের পক্ষেও আবার কলকাতার মানুষদের কথা বোঝা ভারি মুশকিল। মাপা-রেশনের চাল, চিনি, গম; মাপা-রোজগার, মাপা-ঘর। এখানে আচমকা দু'জন মানুষ এলেও তাঁদের থাকতে দেওয়া বা খেতে দেওয়া যে কত কঠিন তা কলকাতার মানুষই জানেন। তাঁদের মন যদি সত্যি ছোটো নাও হয়, তাঁদের মাপা-আকাশ, মাপা-বাতাস এবং মাপা-আয়, আলাদা থাকার স্বাধীনতা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদের মানসিকতাতেই বদলে দেয় কিছুদিন বাদে। নিজেদের অজানিতেই। সেই সময়ে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষেরও এমন সচ্ছলতা ছিল যে,থাকা এবং খাওয়াটা কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু কলকাতাতে থাকা-খাওয়াটাই একটি মস্ত ব্যাপার!

রংপুরের মানুষদের মধ্যে সেজকাকুই ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। উনি পালিয়ে বেড়াবার সময় ছদ্মবেশ ধারণের জন্যে দাড়িগোঁফ রেখেছিলেন। উনি বললেন, দেশ যদি ভাগই হয়ে যায় তা স্বাধীনতা কী হলো! দেশ স্বাধীন হলে দাড়ি কাটব ভেবেছিলাম কিন্তু এই খণ্ডিত স্বাধীনতায় তো দাড়ি কাটা যাবে না। দুই বাংলা এই যেদিন হবে সেইদিনই দাড়ি কাটব। বিয়ে করব।

তাছাড়া নিজের জন্মভূমি ছেড়েই যদি পালিয়ে যেতে হবে কুকুরের মতো, তাহলে এই দেশ স্বাধীন করার জন্যে এত কষ্ট কেন করলাম! এতদিনে কলকাতা হাইকোর্টে চোগা-চাপকান পরা ডাকসাইটে উকিলই হতে পারতাম। সকলের জীবনের গন্তব্য বা উচ্চাশা তো এক নয়! টাকা রোজগার করব, ভালো থাকব, ভালো খাব, গাড়ি চড়ব, এইসব সাধারণ উচ্চাশাকে একদিনও মূল্যবান বলে মনে করিনি। আমার পালিয়ে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সেজকাকুর দাড়ি আজও কাটা হয়নি। সে-দাড়ি ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। বয়স প্রায় আশি হতে চলল। আছেন একইরকম। খদ্দর পরেন। নিজের জামা কাপড় নিজেই কাচেন। নিরামিষ খান। অকৃতদার। কোনো বাহুল্য নেই। লোভ নেই কোনো কিছুর। এক "আদর্শ" মানুষ। যে-আদর্শ গ্রহণ করার মতো "মানুষ" ঋভু হয়ে উঠতে পারেনি বলে লজ্জিত।

সেজকাকুই একমাত্র মানুষ ঋভুদের পরিবারে, যিনি রংপুরের "ধাপ"-এর বাড়ি ছেড়ে সত্যিই আসেননি। দেশভাগ হয়ে যাবার পরও। আর সবাই-ই একে একে রংপুরের মায়া ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন। রংপুর শেষবারের মতো ছেড়েছিলেন সেজকাকু বাংলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধের সময়ে। খান-সেনাদের জন্যে। "সরিফুন" নামের একটি কালো ছিপছিপে সপ্রতিভ যুবতী মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে কলকাতায় হৃষীকেশের রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই আবারও সীমান্তে চলে গেছিলেন সেজকাকু। লড়াই করতে।

কলকাতাতে "সরিফুন" কিন্তু থাকতো প্রমীলাবালারই সঙ্গে। প্রমীলাবালার ঘরে। যে সংস্কারাবদ্ধ গোঁড়া হিন্দু বিধবা প্রমীলাবালা একদিন রান্নাঘরের দাওয়াতে গ্রীষ্মদুপুরের অসহ্য গরমে বিজাতীয় ঘরামির মাথা-ঘুরে পড়ে-যাওয়ার পাপ গোবরজল দিয়ে দাওয়া নিকিয়ে স্খালন করেছিলেন সেই প্রমীলাবালারই কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে "সরিফুন" গল্প করত।

ঋভু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখত। আনন্দে বুক ভরে যেতো।

তাপসীও হাসতেন। আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। তাঁর জয়ের হাসি। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, জীবনের আঁক-বাঁক, সময়; মানুষের সংস্কারবদ্ধতা অনেক ক্ষেত্রেই কাটিয়ে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেয়ও না। শিক্ষা, সেখানে পুঁথির জ্ঞান হয়েই আটকে থাকে। বিদ্যা এবং ঔদার্য হয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু জীবন থেকে মানুষে যা শেখে তা পুঁথি পড়ে কখনওই শেখা যায় না। এই সত্যর যথার্থ্য, জীবনকে গভীর ভাবে ছুঁয়ে, নিবিষ্টমনে লক্ষ করেই ঋভু নিশ্চিত জেনেছে।

রংপুরের বাড়ি, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা-যাওয়া উঠোন, বাগান, খেত, খামার, পুকুর, সব ছেড়ে চলে এসে কলকাতার বদ্ধজীবনে নির্বাসিত হয়ে, দেশভাগজনিত নিজদোষহীন অসহ্য কষ্টে-ক্লিষ্ট অনেকানেক মানুষকে অতি কাছ থেকে দেখে, দেশের চেয়ে; ধর্মর চেয়ে মানুষ যে অনেকই বড়ো, এ কথা প্রমীলাবালা শিখেছিলেন। শেষ জীবনে প্রমীলাবালার এই Emancipation, এই 'উত্তরণ' ঋভুকে বিস্ময়ে, ভালো লাগায় মুগ্ধ করে দিত। "সরিফুনকে" খাইয়েও দিতেন আদর করে কখনও কখনও ঋভুর ঠাকুমা; প্রমীলাবালা।

বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরে অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পরে সরিফুন আবার ফিরে গেছিল বাংলাদেশে। ঋভু জানে না, সরিফুন এখন কোথায় আছে। তার মনে আছে কি না প্রমীলাবালা এবং তাপসীকে?

প্রমীলাবালার কাছ থেকে সমস্ত মৌলবাদী হিন্দু ও মুসলমানের, শিখ এবং ইহুদিদের, হিটলারের জার্মানদের অনেক কিছুই শেখার ছিল এবং আছে। সমস্ত ধর্মের অনেক মৌলবাদীই মহান ঔদার্যর এবং সাম্প্রতিককালের ফ্যাশান "সেকুলার" মুখোশ পরে থাকেন। অনেকের ঔদার্যই স্বার্থজনিত। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের। বাংলা ভাষা ভারতবর্ষে বেঁচে থাকবে কি না তা জোর করে আজ বলা যায় না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ কারণে অশেষ ধন্যবাদ দিতে হয়। কিন্তু বাংলা ভাষা, বাংলাদেশে জাতীয় ভাষা হিসেবে বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে চিরদিনই। ওঁরা যে বুকের রক্ত আর নারীর সম্মানের মূল্যে ভাষাকে বুকে করে রেখেছেন। ওঁদের বুক থেকে সে ভাষা ছিনিয়ে নেয় এমন সাধ্য কার?

ওঁদের দেখে পশ্চিমবঙ্গর নতশির সর্বংসহ বাঙালিরা যদি কিছুমাত্রও শিখতে পারতেন!

উত্তরবঙ্গে শরতের মতো ঋতু আর দুটি নেই। পূর্ববঙ্গে হয়তো বর্ষার রূপ অনন্য। তিস্তার অববাহিকাতেও বর্ষার রূপ নয়নভোলানো। শুধু তিস্তাই বা কেন? রায়ডাক, তোরসা, জলঢাকা ইত্যাদি নদীর অববাহিকার রূপও কম সুন্দর নয় বর্ষার। তবে রংপুরের শরত, শিশিরের আর শিউলির গন্ধে, পুজোর ঢাকের আওয়াজে, মেয়েদের কোরা শাড়ি আর পিঠ-ময় ছড়ানো ভিজে চুলের ফুলেল তেলের ম'ম'-করা গন্ধে ঋভুর স্মৃতিতে যে—আসনে আসীন আছে, সে আসন আর কাউকেই দিতে পারবে না।

নদী-নালা-পুকুর সব টইটম্বুর। কাশ্ ফুটেছে ক্যানালের পাশে পাশে। ঘন সবুজ আঁচলের ঘেরে। বেতবনের রূপ খুলে গেছে। পাখিদের গলায় পুলক লেগেছে। বর্ষাশেষের বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির শব্দগ্রহণ ও শব্দপ্রেরণের ক্ষমতা বেড়ে গেছে যেন বহুগুণ। বহুদূরের ছোটো, মৌ-টুসকি পাখির ডাক শুনেও চমকে তাকাতে হয়। সেই বড়ো বড়ো বাদামি শরীরের আর কালচে লেজের ব্রেন-ফেজন্ট পাখিগুলো

চলতাতলায় মনের সুখে এক্কা-দোক্কা খেলছে। লাল-নীল-হলুদ-রঙা মাছরাঙারা শান্ত, রুপোলি, জলের চাদরকে, জলকে-ছোঁ মেরে মেরে চলকে দিয়ে কাঁসা-রঙা-রোদ্দুরে ঝকমকানো-হিরের হাজার ফুল ফুটোচ্ছে।

কদমতলায় কদমফুল পড়ে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে অনেকদিনই। তবে ঝকঝকে দুপুরে শারদীয় ঘাসের গায়ের গন্ধ মাখামাখি হয়ে গেছে গোরুর গায়ের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে।

শালিকেরা বৃষ্টির পরে আরো নানা পাখির সঙ্গে উড়ে উড়ে কপাকপ করে পোকা ধরে ধরে খাচ্ছে। সন্ধের মুখে মুখে পানকৌড়ি আর বাদুড়েরা ঘরে ফেরার আর ঘর ছাড়ার তাড়াহুড়োতে নদীপারের গাছ আর ভাঙা মন্দিরের মধ্যে ঝুপঝাপানি আওয়াজ তুলে আসন্ন রাতের রহস্যময়তা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পুজোর একটা আলাদা গন্ধ আছে। পুজো-পুজো গন্ধ। ইদেরও আছে। যে গন্ধ, প্রকৃতি আর নারী আর শিশুর গায়ে মাখামাখি হয়ে থাকে হয়ে থাকে, পাখির গায়ে, ঘাসের গায়ে, শামুকের গায়ে। যে জানে, সেই জানে সে গন্ধের কথা। সরু-মোটা-বেঁটে-লম্বা নাক থাকলেই সকলেই যে সব-কিছুর গন্ধ পায় এমন তো নয়! "খুদাহ্‌র সেইরকমই মরজি"।

এবারে এসে অবধি দেখাই হয়নি। কিন্তু ষষ্ঠীর দিনই সকালবেলা মমতাজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শাজাহান চাচাদের বাড়ির পিছন দিকে একটি ছোট্ট পুকুর ছিল। সেই পুকুর পারের লাগোয়া ছিলো গিরীনকাকুদের বাড়ির পুকুর। যে পুকুরে দু'বছর আগে চোত-বোশেখ মাসে হাত দিয়ে বা পোলো দিয়ে ঋভুরা কই-মাগুর-সিঙি মাছ ধরেছিল। সেই পুকুর পাড়ের মস্ত কালোজাম গাছের তলাটি ছিল ঋভুর অতি প্রিয় জায়গা।

অনেকই দিন একা একা সেই গাছতলাতে বসে থাকত ঋভু। সেদিনও ঋভু বসে বসে ডাহুকের নাচ দেখছিল আর দেখছিল বুলবুলিকে। বুলবুলি, শাপলা তুলছিল সেই পুকুরে। শাপলার ডাঁটি বেসন দিয়ে ভেজে খাবে এবং খাওয়াবে। পুকুরের মধ্যে পদ্মও ছিল কয়েকটা। ফড়িং উড়ছিল গুনগুন করে ফিনফিনে ডানা নাড়িয়ে। বুলবুলি, আদুড়-গায়ে পেঁচিয়ে-পরা তার বেগনে-সাদা ডুরে-শাড়িটা হাঁটুর উপরে তুলে কোমর থেকে শরীরটাকে ভেঙে প্রায় দু পায়ের কাছে মুখটি নামিয়ে এনে শাপলা তুলছিল। দারুণ এক ছবির সৃষ্টি হয়েছিলো, শাজাহান চাচাদের লাল-টালির ছাদের বাড়ি, রুপোলি টিনের চালের রসুই ঘর, পুকুরের সাদা-জল, সাদা-শাপলা, লাল-পদ্ম, হলুদ-ফড়িং আর বুলবুলির বেগনে-সাদা-ডুরে শাড়ির ফ্রেমে বাঁধানো।

গুনগুন করে গান গাইছিল বুলবুলি।

"আদরিণীরে!
তোর জনম গেল আদরের জনরে খুঁজতে,
খুঁজতে খুঁজতে দিন পোহাইল.
রাতি আইল
বাতিগুলান নিভ্যা গেল একে একে
আদরিণীরে!
আদরের কপাল লইয়া আসিস নাইরে তুই। ....
ওরে আদরিণীরে, পোড়াকপালিরে..."

বুলবুলি এসব গান কার কাছ থেকে শিখত জানে না ঋভু। হয়তো নিজেই বানিয়ে বানিয়ে মুখে মুখে গেঁথে নিয়ে নিয়ে গাইত বিনিসুতোর মালার মতো। কিন্তু গান ছিল তার হাঁটায়-চলায়, কথা-বলায়, গান ছিল তার চোখের-তারায়; তার অসীম দারিদ্র গানে গানে ঐশ্বর্যময় হয়ে থাকত। বুলবুলির ঠাক্‌মাও গান গাইতে ভালো।

গান গাইতে গাইতে গ্রীবা তুলে তুলে সল্লি-হাঁসের মতো চাইত বুলবুলি ঋভুর দিকে। ঘাড়ের উপর আচমকা তার এলো খোঁপা ভেঙে পড়ত। চুল ঝাঁপাত জলে। গাইতে গাইতে গানের লয় কমিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠত বুলবুলি। গাইতে গাইতে হাসত, হাসতে হাসতে কাঁদত, আবার কাঁদতে কাঁদতে গাইত। বড়ো অদ্ভুত মেয়ে ছিল বুলবুলি।

হঠাৎই বুলবুলি গলা তুলে বলল, বন্ধুরে! ঋভুরে! আমি আগাইলাম। আসিস কিন্তু। তরে শাপলা ভাজা খাওয়াইমু। ভুইল্যা যাইস না আবার, বাড়ি গিয়া ভালো খাবার দেইখ্যা।

ঋভু বলল, যাব।

বুলবুলি শাপলার লতি নিয়ে বাড়ির দিকে এগোল।

ঋভুও বুলবুলির সঙ্গেই পুকুরপাড় ছেড়ে চলে যেতে পারত কিন্তু ওর মন বলছিল, না-যেতে। কেন, তা জানে না।

বুলবুলি চলে যেতেই ডাহুকগুলো নিঃশব্দ হলো। জামগাছের মাথা ছেড়ে দুটো গো-বক তাদের শ্লথ ডানায় সাট-পাট-পাট-সাট আওয়াজ তুলে রোদ্দুরকে চারিয়ে দিয়ে চলে গেল। তাদের ডানার আঁশটে গন্ধে আকাশ ভরে গেল। ঠিক অমনি সময়ে পুকুরের ওই পাড়ে এসে দাঁড়াল মমতাজ। মমতাজমহল!

শচীন কর্তার গাওয়া গানটি যেন কানের মধ্যে বেজে উঠল।

"তাজমহলের মর্মের গাঁথা কবির অশ্রুজল

তাজমহল! তাজমহল! তাজমহল!"

তুমি কবে আইল্যা?

মমতাজ বিস্ময়ের সঙ্গে রিনরিনে গলাতে বলল ঋভুকে দেখে।

ঋভু কথা বলতে পারল না। মাত্র দেড়বছরেই কতবড়ো, কত অন্যরকম হয়ে গেছে মমতাজ। তার সুরমাটানা দুটি চোখে চাইলে বুক ধড়ফড় করে। চোখে চোখ রাখা যায় না বেশিক্ষণ। ঋভুদের বাড়ির বাইরের গেটের পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটি যেমন বেড়েছে এক বর্ষার জল পেয়ে, মমতাজও বেড়েছে তেমনই। তফাত এই যে, সেই গাছের মমতাজের মতো চোখ নেই।

ঋভুকে নিরুত্তর দেখে মমতাজ বলল, ই আবার কী ঢং! কথা কও না ক্যান?

ঋভু বলল, তুমি কত্ত বদলে গেছ!

বদলটা ভালো না খারাপ, তাই কও শুনি।

জানি না তা। কিন্তু বদলে গেছ।

তাই?

হাসল মমতাজ।

তুমি খুব সুন্দর হয়ে গেছ।

তাই? আগে বুঝি কুচ্ছিত আছিলাম!

নাঃ। তা নয়।

গিরিনকাকাদের বাড়িতে কেউ নেই?

ঋভু আবার শুধোল।

নাঃ।

কোথায় গেল?

চাচা গেছেন, শুনতাছি কুচবিহার না বালুরঘাট কই য্যান্; চাচিরা তো কইলকাতায়।

কেন?

শুনতাছি, প্রোপার্টি ইকসচেঞ্জ করবার লইগ্যা গ্যাছেন।

প্রোপার্টি ইকস্‌চেঞ্জ! সিটা কি?

ক্যান্? তুমি শোনো নাই? ইংরেজরা চইলা গ্যালে তো দ্যাশ ভাগ কইর‍্যা দিবে।

হিন্দুস্থান-পাকিস্তান। কাইট্যা দু টুকুর‍্যা কইর‍্যা দিবে দ্যাশ।

সারা দেশ? বলো কি তুমি?

সারা দেশ বইল্যা তো শুনি নাই। আব্বাজান কইতাছিল পাঞ্জাব আর বাংলা ভাগ অইবো।

ঋভু রেগে বলল, বাংলা আর পাঞ্জাব বুঝি ভারতবর্ষের বাইরে পড়ে?

আমি অত-শত ক্যামনে জানুম? আব্বাজান কইতাছিল, নেহরু সাহেব আর জিন্না সাহেবের গদিতে বসনের লালচ হইছে খুব। রাজা হইব তানারা।

বাঃ। তাহলে তো ভালোই। আমাকে, তোমাকে গিরিনকাকু, শাজাহান চাচাকে, জিগ্যেস করার দরকার নেই? দেশটা কি শুধু নেহরু সাহেব আর জিন্না সাহেবদের পৈত্রিক সম্পত্তি? রংপুর বুঝি পাকিস্তানে পড়বে? আমাদের তাড়িয়ে দেবে বুঝি তোমরা মমতাজ? আর আসতে দেবে না?

মমতাজ চুপ করে রইল। ওর বড়ো বড়ো চোখের পাতা পটপট করে ফেলল দু' তিনবার। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সকলের ভালো দিয়া আমি করুম কি? আমি ক্যাবল আমার ভালোডা বুঝি।

তোমার ভালো কি?

ভালো না ছাই! তুমি আর আইবানা রংপুরে? থাকবা না?

এদিকে এসো।

ঋভু বলল।

না। কেউ দেইখ্যা ফ্যালাইলে পাইড়্যা ফ্যালাইবে আমারে।

কেউ দেখবে না।

কও কি তুমি? গাছের, ঘাসের, হাঁসের, ফড়িংয়ের সকলেরই চোখ আছে যে।

থাকুক না। আমরা কি করেছি? কী, অন্যায়?

তুমি হেই বকরটাই রইয়া গ্যালা গিয়া। আমি যে বড়ো হইয়া গেছি। তা বুঝি জানো না? হেইটাই তো মস্ত বড়ো অন্যায়। মানে, বড়ো হওন।

বড়ো হয়ে গেছ তো, কি মমতাজ? তুমি কি অন্যমানুষ হয়ে গেছ।

হ, তাই তো হইছি। সে তুমি বুঝবা না। আমি বড়ো হইয়া গেছি। আমি যে মাইয়া। মরদগো লগ্যে আমার এহনে মেলামেশা এক্কেরেই বারণ!

ক্যান?

সে অনেক বিপদ। তুমি বুঝবা না। আম্মি কইছে।

কী যে বলো। বুঝি না কিছু। পুজোর পরেই চলে যাব আমরা। তোমার সঙ্গে দেখা হবে না আর? হঠাৎ এমন কী বিপদ হলো তোমার? বুঝি না।

একদিন আইও। বোঝলা?

কোথায়?

ফলের বাগানে।

কোন্ বাড়ির ফলের বাগানে?

আমাগো বাড়ির ফলের বাগানে।

একদিন মানে কি হল? কবে?

কাল তো তোমাগো সপ্তমী-পূজা। সকলেই ওই লইয়া ব্যস্ত থাকবোনে। তুমি চইলা আইস্যো।

কখন?

সন্ধ্যা লাগনের সঙ্গে সঙ্গেই।

উত্তেজনায় ঋভুর গায়ের সব রোম খাড়া হয়ে উঠল। কেন হলো, জানে না। এমন কখনও হয়নি আগে। এমন করে সন্ধেবেলায় আর কেউই বিশেষ আমন্ত্রণ জানায়নি ওকে। বলল, আসব। তুমি থেকো কিন্তু।

থাকুম। আইস্যো তুমি। এহনে যাই আমি।

আচ্ছা।

মমতাজ চলে গেলে, ঋভুও উঠল।

ভাবছিল, নির্জনে লুকিয়ে দেখা হলে কী বলবে ও মমতাজকে? কখনওই কোনো মেয়ের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করেনি সে। লুকোচুরি কি যে আছে, তাও জানে না। অথচ লুকিয়ে না দেখা করলে, দেখাই হবে না।

বাড়ি যখন ফিরছে মমতাজের সঙ্গে কথা সেরে তখন পথে পুটুর সঙ্গে দেখা।

পুটু বললো, কি রে ক্যালকেশিয়ান। আছিস কেমন?

ভালো। তুই?

আর কী! আমাগোওতো ক্যালকেশিয়ান হইতে হইব। আর কী!

কেন?

তুই শুনিস নাই? দ্যাশ যে ভাগ হইব।

তাই?

স্তম্ভিত হয়ে বলল, ঋভু। ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল তার যে রংপুর আর তার কাছে আর সেই রংপুর থাকবে না।

চেতলা জায়গাটা চিনিস? তোদের ক্যালকাটার?

হ্যাঁ। ঋভু বলল। আর ছোটোমাসিমার বাড়ি তো চেতলায়ই! কেওড়াতলার পাশ দিয়ে টলির নালার উপরের সরু কাঠের সাঁকো পেরিয়ে যেতে হয় চেতলাতে।

কেওড়াতলাটা আবার তগো কোন্ বস্তু?

আরে, শ্মশান! এখানের শংকামারীরই মতো।

কেওড়া বস্তুটা কি? কোনো গাছ-টাছ না কি?

হ্যাঁ। কেওড়া গাছ হয় সুন্দরবনে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেশে। শুনিসনি?

তা, তগো ক্যালকাটায় কেওড়াগাছ ক্যান্?

ক্যালকাটা তো আর আমাগো রংপুরের মতো একটুখান শহর না, সিখানের ব্যাপার স্যাপারই তো আলাদা। ঋভু বাঙাল ভাষায় এক্সপেরিমেন্ট করে ফেলল একটি। কথায় বলে "মাদার টাং"। গিরিডির মেয়ে বাঙালভাষা বলতে পারতেন না। ঋভুও পারে না। তবে ভারি ভাল লাগে ওই ভাষা। বড়ো আন্তরিকতাপূর্ণ। সহজেই কাছে টেনে নেয় মানুষকে ঐ ভাষা। পূর্ববঙ্গীয়, উত্তরবঙ্গীয় সব ভাষা। হয়ত দক্ষিণবঙ্গীয় ভাষাও তাই টানে। তবে ঋভুর তা বিশেষ শোনা নেই।

তারপরে বলল, শহরটা তো বিরাটই। তবে বন-বাদাড় আগে হয়তো ছিল কিছু কিছু। সব জায়গাতো একই সঙ্গে শহর হয় না, মানে শহরের সব অঞ্চল। কেওড়া গাছ ছিল নালার পাশে। আগে তো নালাও নালা ছিল না। গঙ্গাই ছিল। এখন হেজে-মজে গেছে। তবুও জোয়ার-ভাঁটা খেলে। কেওড়া গাছেরই নীচে মড়া পোড়াতো মানুষে। আজ আর গাছ নেই। কিন্তু নামটা রয়েই গেছে কেওড়তলা।

চেতলা কেওড়াতলার পাশে? দিনে ক'টা মড়া পোড়ে রে সেখানে?

ক'টা তাকি আর গোনা যায়। মড়ার লাইন পড়ে যায়। গাঁজা খেয়ে লাল চোখ করে কিছু লোক বসে থাকে। কিছু লোক খঞ্জনি বাজিয়ে কীর্তন গায়। একজন সাধু আছে। সে বলে, "আগুন পোড়ায় শরীরকে, আর চিন্তা পোড়ায় মনকে।" বুঝেছ। আর আছে ভিখিরি, কুকুর। মানুষের মাংস পোড়ার চিমসে গন্ধে বমি আসে। মানুষের ছাই ওড়ে বাতাসে।

কইস কি রে ঋভু! আর সেইখানেই মানুষ থাকে! শ্মশানে তো হয় লোকালয় থিক্যা বহু দূরে।

কলকাতায় নয়।

ভাবতেই তো গা গুলাইয়া ওঠে রে! ই কেমন শহর তোদের? মনটাই খারাপ হইয়া গেল গিয়া।

শহর তো ওইরকমই হয়। সেখানে ট্রাম আছে, পিচ-বাঁধানো রাস্তা আছে, কিন্তু এই আকাশ, নদী, পুকুর, গাছগাছালি, এই ফুলের গন্ধ, কাঞ্চনজঙ্ঘার ঝলক তুই কোথায় পাবি কলকাতায়? রংপুর তো রংপুরই!

তবে আমি যামু না রংপুর ছাইড়্যা। পুট্টি ডিক্লেয়ার করল।

যাস না পুট্টি। মরে যাবি। কলকাতা একটা খাঁচা। সেখানকার লোকেদের মন সব এতোটুকুটুকু। এতোটুকুটুকু বাটিতে করে তরকারি পরিবেশন করে তারা। তেলমাখার তেলের বাটিতে মাছের "কালিয়া" খায়, এই এতোটুকুটুকু লুচি খায়। লুচি কে বলে নুচি, লেবুকে বলে নেবু; লংকাকে বলে নংকা। বিচ্ছিরি।

তাই?

তাই।

সপ্তমীর বিকেলে বাড়িশুদ্ধ সকলে হরিসভায় গেলেন। সন্ধ্যারতি দেখতে। বড়ো বড়ো ধুনুচি হাতে নিয়ে, মাথায় নিয়ে, দাঁতে-কামড়ে আরতির প্রতিযোগিতা হবে এক'দিন প্রায় রোজই। ধূপ ধুনোর গন্ধ, প্রসাদের কাটা-ফলের আর সন্দেশের গন্ধের সঙ্গে কোরা-শাড়ি, আর সিঁদুর আর আলতার রং আর গন্ধ মিশে যাবে।

আরতি দেখতে দেখতে কেমন যেন ঘোর লাগে। প্রত্যেক ধর্মেরই নানা অনুষ্ঠান আর নিয়ম মানার মধ্যে দিয়ে এইরকম ঘোরের মধ্যে পৌঁছনোই বোধহয় মূল লক্ষ্য। এই ঘোরটা প্রার্থিত কিংবা অপ্রার্থিত সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। ধর্মর মাধ্যমে এক জায়গায় অনেকে সমবেত হতে পারেন। কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানই বোধহয় একা একা অনুসৃত হবার নয়। একক সাধু-সন্নিসীরা, ফকিরেরা তেমন সাধনা চিরদিনই করে এসেছেন কিন্তু যে-কোনো ধর্মই মূলত একাধিক মানুষের মিলনের সেতু। ধর্ম কথাটার মূল অর্থ হলো "যাহা ধারণ করে" অথবা ইংরিজিতে বলতে গেলে "Which binds together" একের সঙ্গে অন্যর অথবা বহুর এই মেলবন্ধনই হয়ত ধর্মের সাধারণ ও মোটা উদ্দেশ্য। ধর্ম মানা ভালো না খারাপ, ধর্ম হৃদয়গ্রাহ্য না বুদ্ধিগ্রাহ্য সে কথাও এখানে অবান্তর। যুগে যুগে সমস্ত ধর্মমতে বিশ্বাসী জনগণ ধর্মের দ্বারা বেষ্টিত, পরিচালিত এবং হয়তো অন্ধও হয়েছে। সে ধর্ম কোনো ঈশ্বর বা পয়গম্বরের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা যেমন হতে পারে তেমনই কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বা জাতীয় মতবাদও হতে পারে। যেমন মার্ক্স বা লেনিনবাদ বা হিটলারের জার্মানির বা ইরানের বা ইজরায়েলের ধর্মবাদ। ঈশ্বর-ভাবনা বা ঈশ্বর-বোধের স্তর এক একজন মানুষের একেক রকম। ব্যক্তিগত মানসিক স্তরের উচ্চতার উপরেই পুরোপুরি নির্ভরশীল ব্যক্তির এই বোধ। স্বামী বিবেকানন্দ বড়ো সুন্দর করে এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দুরা মূর্তিপূজা করে, তারা পৌত্তলিক বলেই যে পাশ্চাত্যের মানুষ তাদের হেয় করবেন এটা ঠিক নয়। যাঁরা সেই মানসিক উচ্চতাতে পৌঁছেছেন, তাঁদের গির্জায় বা মন্দিরে বা মসজিদেও যেতে হয় না ঈশ্বরের খোঁজে। কিন্তু সব মানুষের মানসিক স্তর তো ওইরকম উচ্চমানের হতে পারে না। হবে যে, তেমন আশা করাটাই অন্যায়। তাই সাধারণ মানুষের মনে বিনয়, ভালোত্ব, শুভবোধ জাগিয়ে তুলতে, তাঁরা নিজেরাই যে শেষ কথা নয়, তাঁদের জাগতিক প্রাপ্তিই যে পরম প্রাপ্তি নয়, তা বোঝাতে, তাঁদের দূর-দুর্গম পাহাড় অরণ্য-পথে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো ধর্মস্থানে ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁদের মনে ঈশ্বরবোধ জাগরুক করতে হয়।

তাপসী বললেন, চল ঋভু। আরতি দেখতে যাবি না?

ঋভু বলল, আমি আগে জমিদার বাড়িতে যাব মা। তারপরে হরিসভাতে আসব। ওখানে পুটুরা আসবে।

ঠিক আছে। তবে দেরি করবে না।

না, মা।

মিথ্যা কথা বলল ঋভু। জীবনের দ্বিতীয় মিথ্যা কথা। কিন্তু নির্দোষ মিথ্যা।

পরবর্তী জীবনে মিথ্যাচার করতে হয়েছে অনেকই কিন্তু তার নব্বুইভাগই অন্যর জন্যে, অনেক সময়ে অন্যর ভালোর জন্যে। অন্যকে বাঁচাবার জন্যেই। নিজের স্বার্থর কারণে একটাও মিথ্যা বলেনি যে, সে কথা সে কলমা পড়ে হলপ করেই বলতে পারে।

সপ্তমীর চাঁদ দেরি করে ওঠে। কিন্তু আকাশ তারায় ভরা। সেই অগণ্য তারাদের আলোতেও চিকচিক করছে শরতের গাছগাছালি। ফলসা গাছের পাতা, চালতা গাছ, সুপুরি গাছের চিরুনি চিরুনি পাতারা। কিন্তু ঔজ্জ্বল্য শুধু উপর পানেই। নীচে ঝুপড়ি-ঝুপড়ি অন্ধকার।

পরে, ঋভু বুঝেছিল যে, নীচের দিকে চিরদিনই অন্ধকার; চিরদিনের অন্ধকার।

মমতাজকে খুঁজে পাচ্ছিল না ঋভু শারদ অন্ধকারে ঊর্ধ্ববাহু গাছগাছালির নীচে দাঁড়িয়ে। হরিসভা আর জমিদারবাড়ি থেকে ঢাকের আর কাঁসরের শব্দ ভেসে আসছিল। আকাশে বাতাসে, শিশির পড়তে-থাকা জমিতে, তখন পুজো পুজো গন্ধ লেগে গেছে যদিও তবু এবারের ঢাকের শব্দের মধ্যে কেমন যেন একটা চঞ্চলতা, ভয়ার্ত ভাব, অস্থির-চিত্ততা চমকে চমকে উঠছে।

এই কি শেষ পুজো? দেশের মাটিতে? এখানের মানুষের নিজের নিজের জন্মভূমিতে, পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহর দেশে এই কি শেষবারের মতো আনন্দ? নেহরুসাহেব আর

জিন্নাসাহেবের হাতেই কি পুরো বাঙালি জাতটার ভবিষ্যৎ ন্যস্ত হয়েছে? কে তাঁদের এই অধিকার দিল? লক্ষ লক্ষ মানুষকে ছিন্নমূল করবার? কোটি কোটি মানুষের সামাজিক, আর্থিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক সমস্ত ভারসাম্য সেই দুই নেতার সিগারেট-পোড়া আঙুলে খণ্ডিত করার অধিকারের প্রতিবাদ করার কি কেউই ছিল না? ঋভুর সেজকাকুদের আত্মত্যাগ কি পুরোপুরি বৃথাই হলো? এই খণ্ড-স্বাধীনতা কিসের স্বাধীনতা?

মাথার মধ্যে নানা চিন্তা জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। তারই মধ্যে ঢাকের বাদ্যির সুষম ছন্দ।

মমতাজকে খুঁজে পাচ্ছিল না ঋভু। চারদিকে খুঁজতে লাগল তাকে সে। নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচের সবুজ অন্ধকারে অনেকক্ষণ পরে পেল, যখন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। গন্ধরাজ লেবুর ঘন-সবুজ সতেজ গাছের গায়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি ঘনসবুজ শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে ছিল মমতাজ। তার হাত দুটি কোঁচড়ের কাছে জড়ো করা ছিল।

আইছ?

মমতাজ বলল। ফিসফিস করে।

তোমার হাতে কি?

ঋভু শুধোলো।

তোমার লাইগ্যা আনছি।

কী এনেছ?

দ্যাখতেই তো পাবা। অতো অধৈর্য ক্যান?

ঋভু চুপ করে মমতাজের দিকে চেয়ে রইল।

শারদ-রাতের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মমতাজের পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া ঠোঁটের গন্ধ আর কানের-লতিতে মাখা আতরের গন্ধ মাখামাখি হয়েছিল। ঋভুর মনে হলো, মমতাজ বুঝি মা দুর্গার আরেক মূর্তি! কুমারী পুজোর কুমারীই যেন!

কী দ্যাখো, চায়্যা চায়্যা?

মমতাজ বলল।

তোমাকে।

ঢং। আমারে ডাকছিলা কি এরই লইগ্যা?

না।

তবে?

কেন ডেকেছিলাম জানি না। সত্যিই কি দেশ ভাগ হয়ে যাবে মমতাজ? কী সব শুনছি চারধারে।

হায়। আমি বিটিছাওয়া, আমি কি তোমার থিক্যা বেশি জানুম? শুনতাছি তো! হক্কলেই কইতাছে।

আমিও তো শুনছি।

দ্যাশ ভাগ হইলে তোমার কি যাইতে-আইতাছে? তুমি তো ক্যালকেশিয়ান।

তা বলতে পারো। আমার নিজের হয়তো সত্যিই বিশেষ যাবে আসবে না। তবে রংপুরই যে আমার দেশ। আমার শিকড়। আমার বাবা এখানে কৈলাশরঞ্জন স্কুলে কারমাইকেল কলেজে পড়েছেন। এখানেরই মুথা ঘাসে-ভরা মাঠে মাঠে, ঘাম গায়ে ফুটবল খেলেছেন। এখানের মাটি যে আমার পরমআত্মীয়দের জন্ম দিয়েছে, মমতাজ। তুমিও তো রংপুরের মেয়ে। রংপুর থেকে তোমরা আমাদের তাড়িয়ে দেবে? কেন তাড়িয়ে দেবে?

অমন কইর‍্যা কও ক্যান্? আমার বুঝি কষ্ট লাগে না?

লাগে?

বোঝো তো সবই! কষ্ট না হইলে এই সন্ধ্যাবেলায় তোমার কথা শুইন্যা আসি? কত্ত বিপদ যে হইতে পারে আমাগো দুইজনেরই তার কোন্ ধারণাটা তোমার আছে শুনি? কই নাই তোমারে যে, আমি এহন বড়ো হইয়া গেছি গিয়া। তোমার সঙ্গে এই অন্ধকারে এই বাগানে আমারে দ্যাখলে পর পিঠের ছালচামড়া তুইল্যা লইব না!

কে? শাজাহান চাচা? না ঔরঙ্গজেব নানা? কে ছালিচামড়া তুলবে?

আরে না, না। আজকাল আন্‌সার-টান্‌সার কত কী হইছে। আমাগো তাগো কথা শুইন্যাই চইলবার লাগে। হঃ! মুসলমানের মাইয়ারে যদি হিঁদুর পোলা সঙ্গে এই অন্ধকারে দেহে ত এক্কেরে কাইজট্যা বাধাইয়া থুইবনে।

তাই?

না তো কী! কইতাছি কী তোমারে!

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মমতাজ বলল, তুমি আর আইবা না? রংপুরে কি এই শ্যাষ আসোন?

কী করে বলব! বলো মমতাজ?

তুমি আমারে বিয়া করবা? ঋভু? বড়ো হইয়া? আমি তো বড়ো হইয়া গ্যেছি। তুমি কবে বড়ো হইবা?

আমি? কী জানি।

ঋভু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেল। ওতো জানে না যে, ও কবে বড়ো হবে! মমতাজ কেমন নিশ্চিত যে ও বড়ো হয়ে গেছে। কী করে এমন নিশ্চিত হলো কে জানে!

কখন বড়ো হইবা তা তুমি নিজেই জানো না? হায় আল্লা!

মমতাজ স্বগতোক্তির মতো বলল।

ঋভু কী বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল।

মমতাজ বলল, তোমারে বাছুরটা দিছিল নানায়, তারে পেয়ার-দুলহার কইর‍্যা রাখছো তো!

হ্যাঁ। সে বাছুরটা তো কবেই গাভিন হয়ে বাচ্চা দিয়েছে। তুমি নেবে একটা বাচ্চা আবার যখন হবে?

কও কি তুমি? স্যাও বিয়ানি হইল? খবরডাত সকলরে দিবার লাগে। না, না। দিলেই, সকলেই জিগাইবে আমি জাইনলাম কোথ্বনে?

ঠিক বলেছ মমতাজ? তোমার বুদ্ধিই আলাদা। কাউকেই বলার দরকার নাই।

এই লও, তোমার লইগ্যা আনছি।

কি?

কোঁচড়ের ভিতর থেকে মমতাজ একটি ছোট্ট নরম তুলতুলে খরগোশের বাচ্চা বের করল।

এমন খরগোশ কখনও দেখেনি ঋভু আগে। পাটকিলে-পাটকিলে গায়ের রঙ। খুদের আর মাটির গন্ধ তার গায়ে। মেঠো ইঁদুরের মতো।

মমতাজ বলল, ইব্রাহিম, আমাগো মুনিষ; মাঠের গর্তে অ্যারে পাইছিলো। আমারে আইন্যা দিছে। তোমারে আর কি দিমু? আমার তো কিছুই নাই। অ্যারে যত্ন কইর‍্যা রাইখো। এর গায়ে আত্তর মাখাইয়ো। অ্যারেও কলকাতায় লইয়া গিয়া তোমার মতো ক্যালকেশিয়ান কইর‍্যা তুইলো।

খাবে কি এ?

তুমি যা খাওয়াইবা, ভালোবাইস্যা তাই খাইবনে।

ঋভু ভাবছিল, হৃষীকেশ বলতেন, বারে বারে, "আমি জাত মানি না, পাত মানি না। আমার ছেলে যাকে ভালোবাসবে তারই সঙ্গে তার বিয়ে দেব। সে মেয়ে মুসলমানই হোক, খ্রিস্টানই হোক আর শিখই হোক"।

মনে মনে ভারি লোভ হলো ঋভুর মমতাজকে বিয়ে করার, বড়ো হয়ে। কিন্তু এও ভাবল, বিয়ে করে কেন মানুষে?

পরক্ষণেই ঘন্টুর কথাটা মনে পড়ে গেল। শরীরটা ঘিনঘিন করে উঠল। ছিঃ। ঘন্টু যা বলেছিল সেই বিচ্ছিরি ভাবনার সঙ্গে এই শরতকালের সন্ধেবেলার বনে, আকাশভরা তারার নীচে দাঁড়িয়ে, ঘনসবুজ শাড়িপরা, আতরগন্ধী, খরগোশ-কোলে দাঁড়িয়ে—থাকা মমতাজকে মোটেই মেলানো যায় না। ঘন্টু নিশ্চয়ই ভুল বলেছিল। বিয়ে করলেই যে ওইসব অসভ্যতা করতে হবেই তার নিশ্চয়ই কোনো মানে নেই।

এমন সময়ে হঠাৎই মমতাজ বলে উঠল, অ্যাই ঋভু। আমারে একটা চুমা দিবা?

চুমু?

ভয়ে, উত্তেজনায়, অপরাধবোধে ঋভুর হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। ঠোঁট শুকিয়ে এল। কানের লতি ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল গরমে।

মমতাজ, ঋভুর বুকের কাছে ঘেঁষে এল।

তাদের দু'জনের বুকের মাঝে নরম, পাটকিলে-রঙা নবান্নর খুদের গন্ধমাখা খরগোশ। মিশ্র গন্ধে ঘোর লাগল ঋভুর। তার চারপাশে মহাসপ্তমীর আরতির শব্দ। ধুঁয়ো, ঢাকের আর কাঁসরের শব্দ যেন হঠাৎ জোর হয়ে উঠল। মমতাজ চোখ বুজে ফেলল তার মুখটা ঋভুর বুকে ঠেকিয়ে। ঋভু মুখ নামিয়ে মমতাজের মুখে মুখ রাখলো। হঠাৎই গায়ে জ্বর এল ঋভুর। থরথর করে ওর পা দুটি কাঁপতে লাগল।

এমন সময় ভিতর-বাড়ি থেকে কোনো নারীকণ্ঠ ডেকে উঠল উদ্বিগ্নস্বরে : মমতাজ। মমতাজটা কই গেল দ্যাখো দেহি। ছেমরিটারে লইয়া আর পারন যায় না।

মমতাজ তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বলল, চাচী ডাকে। তুমি পালাও। দৌড়াইও না য্যান্। আস্তে আস্তে হাঁইট্যা যাও। কেউ দ্যাখতে পাইলেও সন্দেহ করব না। আমার পেয়ারীরে ভালোবাইস্যো। বুঝলা?

এর নাম বুঝি পেয়ারী?

হ্যাঁ। আমি যাই। ভালো থাইক্যো। পারলে আরেকদিন আইস্যো গিরিনচাচার পুকুরধারে।

ঋভু বলল, আচ্ছা। ফিসফিস করে।

মমতাজকে আরেকবার চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল খুব। কিন্তু সবুজ অন্ধকারে সবুজ শাড়ি-পরা মমতাজ ততক্ষণে মিশে গেছে।

জমিদার বাড়িতে আগমনী গান গাইলেন সেনপাড়ার হরিহর সেন। কানে লেগে গেল ঋভুর। গান অবশ্য ষষ্ঠীর রাত থেকেই হচ্ছে।

"দ্যাখো না, নয়নে গিরি।
গৌরী আমার সেজে এল
দ্বিভুজা ছিল যে উমা
দশভুজা কবে হলো?
দ্যাখো না নয়নে গিরি!
গৌরী আমার ফিরে এল।"

গত রাতে ঘুম হলো না ভালো ঋভুর। মমতাজের পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া ঠোঁটের গন্ধ আতরের গন্ধের সঙ্গে মিশে তার নাকে লেগেছিল। এপাশ ওপাশ করেছিল সারারাত। পেয়ারীকে ঋভু খুবই যত্ন করে একটি কাঠের-বাক্সে রেখে, তার নিঃশ্বাস নেওয়ার ফাঁক-ফোকর করে, পাতা-টাতা, বেগুন-আলুর টুকরো-টাকরা খাবার জন্যে তাতে ভরে দিয়ে, শোবার ঘরে একটি উঁচু টুলের উপরের বাক্সটি রেখে দিয়েছিল রাতে। ঘুমুবার আগে।

পরদিন ভোরে ঢাকের বাদ্যির মধ্যে গতরাতের মুগ্ধতা নিয়ে জেগে-ওঠা-ঋভু স্তম্ভিত আতঙ্কিত হয়ে দেখল যে, তাদের কালো কুকুরটা পেয়ারীকে খেয়ে ফেলেছে।

রক্তের ছোপ লেগে আছে এখানে ওখানে।

হিন্দুর কুকুর যখন যবনীর ভালোবাসার খরগোশকে খেল তখনই ঋভুর মন বলল যে, দেশ ভাগ হবেই। হিন্দু-মুসলমান দু পক্ষেরই বোধহয় পাপ এবং লোভ জমেছিল বিস্তর, যে সম্বন্ধে দু পক্ষের কোনো পক্ষই সচেতন ছিল না। ওই বেগবতী, আশু-ঘটিতব্য ঘটনার গতিরোধ করে ইতিহাসকে পেয়ারীর মতো কাঠের বাক্সে রেখে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা, ঋভু অথবা মমতাজের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

দুঃখ এইজন্যেই ঋভুর যে, কুকুরটা তো খরগোশের বাচ্চাটাকেই শুধু খেল না, তারার আলোয় চিকচিক করা শারদ-রাতে তার প্রথম প্রেমকেও জান্তব দাঁতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল। এ কথা সে কেমন করে জানাবে মমতাজকে।

ঋভুর জীবনের তৃতীয় মিথ্যা বলার সময় ঘনিয়ে এল।

ঘোঘাট, করতোয়া আর ব্রহ্মপুত্রর অববাহিকায় এই রংপুরের পুরো এলাকা ঘুরে বেড়াবার সময় ও সুযোগ হয়নি ঋভুর। কিন্তু কাকিমা, ডিমনা, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, চিলমারি ইত্যাদি নামগুলি কিশোর ঋভুর মনে নানা রহস্যের সৃষ্টি করত। লাল মাটির, বৃষ্টি-ধোওয়া পথগুলি সতেজ সবুজ বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে, গৃহস্থ বাড়ির বাগানের নানা গাছগাছালির পাশে পাশে; সটান সুদূরে চলে গেছিল। প্রতিটি পথের দিকে চেয়েই ঋভুর ইচ্ছা করত, সেই পথ বেয়ে চলে যায়। কটুগন্ধ গাছ-গাছালির মধ্যে-বওয়া শারদ-হাওয়ায়। পথের হাতছানি সেই বয়স থেকেই তাকে উদাস করে দিত।

পথের শেষে কী থাকে তা জানতে ইচ্ছে করত খুবই।

পৃথিবীর, আর এই দেশের পথে পথে অনেকই ঘুরে এখন জেনেছে ঋভু যে, পথ মিশে যায় পথেই! কোনো গন্তব্যে গিয়েই পথ ফুরোয় না, জিরোয় মাত্র; নদীর সাগরে গিয়ে মেশারই মতো। পথের নাম বদলায়, গন্তব্যর নাম বদলায়; পথ, কিন্তু পথই থাকে। চলতে-চাওয়া পথিকের পথ চলা তাই কোনোদিনও শেষ হয় না।

মন অত্যন্তই খারাপ ছিল ঋভুর পেয়ারীর কারণে। তবু মা-ঠাকুমার পীড়াপীড়িতে নবমী পুজোর দিন সকালে নতুন ধুতি, পাঞ্জাবি আর বিদ্যাসাগর চটি পরে দাঁড়িয়েছিল ঋভু ওদের বাড়ির সামনের পথে, পুটুর অপেক্ষায়। পুটু এলে জমিদারবাড়ি যাবে ওরা। জমিদারবাড়িতে আজ মোষ বলি হবে। গদাই সরদার, জমিদারের লেঠেল, এক কোপে রাম-দা দিয়ে মোষের মাথা নামাবে। গদাই-সর্দারের জবাফুলের মতো লাল লাল চোখ। সাড়ে ছ-ফিট লম্বা শরীর।

একশো আটটা পাঁঠাও বলি হবে আজ।

রক্ত দেখলেই ঋভুর বুকের মধ্যেটা যেন কেমন কেমন করে। তবু রক্তর মধ্যে কী যেন এক উত্তেজনা আছে; উন্মাদনা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোলে ওর বুকের মধ্যেও কোথাও কী যেন ফিনকি দিয়ে ফোটে, লাল-রঙা সূক্ষ্ম তির তাৎক্ষণিক উৎসারে মাথার মধ্যে জোটে।

কী করে মমতজাকে মুখ দেখাবে ও ভেবেই পাচ্ছিল না। ঠিক করল, মিথ্যে বলবে মমতাজকে। বলবে, খরগোশ-বাচ্চা বহাল-তবিয়তেই আছে। আবারও মিথ্যে বলতে হবে ঋভুকে।

একটি কদর্য সত্যকে যদি সুন্দর মিথ্যে দিয়ে ঢাকা সম্ভব হয় তবে হয়তো মিথ্যে বলাই উচিত।

মোড়ের দিক থেকে শংকরী পাগলি হেঁটে আসছিল এদিকে। ও বুলবুলির চেয়েও সরেস। তবে মুখ বড়ো খারাপ। সবসময়ই সে অপ্রিয়-সত্য বলে। তাই, প্রয় সব মানুষই ওকে এড়িয়ে চলে। ওকে দেখলে মুখ লুকোয়। পালিয়ে বেড়ায়। তাই আজ নবমীর সকালেও ওর পরনে ছেঁড়া শাড়ি। খোলা রুক্ষ চুল পাগলির। আঁচল গড়াচ্ছে পথের ধুলোয়। একদিকের বুক খোলা। অস্বস্তি হতে লাগল ঋভুর সেদিকে চোখ পড়ায়।

গান গাইতে গাইতে আসছে শংকরী পাগলি।

ঋভু বলে, শংকরী পিসি।

"নবমীর নিশিগো তুমি
আজ যেন পোহায়ো না
দুখিনী মায়ের বুকে
আর ব্যথা দিও না।

সপ্তমী অষ্টমীতে
ছিলেম সুখে দিনে রাতে
এ নিশি পোহাইলে
উমা মা যে ঘরে রবে না।"

শংকরী পিসির গলাতে সুর ছিল। সেই সুর রিনরিন করে অনুরণন তুলছিল পথ-পাশের গাছ-গাছালিতে, পুকুরের, ডোবার জলে। ডাহুক পাখিরা তার গানের বিধুর সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন নড়ছিল চড়ছিল।

পুঁটুর দেরি দেখে ঋভু হাঁটা দিল। কলকাতার কলেজ স্ট্রিট না কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের 'রাদু' কোম্পানিতে গিয়ে ছোটোকাকু ঋভুর জন্যে এই লাল চটি কিনে এনেছিলেন। ঠাকুমার প্রেজেন্ট।

তাপসী বলেছিলেন, এতটুকু ছেলেকে বিদ্যাসাগরী চটি পরলে জেঠা জেঠা লাগে।

প্রমীলাবালা বলেছিলেন, লাল ঋভুরে লাল জুতায় দেখায় ভালো।

ঠাকুমার "ভেটো' প্রয়োগের পর এ নিয়ে আর কারো কোনো কথাই চলেনি।

জুতোটা দেখতে ভালো কিন্তু ডান পায়ের কড়ে আঙুলের কাছে লাগছিল ভীষণ। গতকাল বাটার "নটিবয় শু" পরেছিলো। তা পরেই, গোড়ালির কাছে ফোসকামতো হয়েছে। কিন্তু কী করা যাবে? পুজোর সময়েওও পায়ে ফোসকা পড়ে না এমন ছেলেমেয়ে তখনকার দিনে ছিল না বললেই চলে।

শংকরী পাগলি শংকামারীর শ্মশানের দিকে যাচ্ছিল। ঋভুর মুখোমুখি আসতেই বলল, চললি কই রে, ছ্যামড়া?

জমিদারবাড়ি যাব।

তরে নিমন্ত্রণ দিছে কি?

নাঃ। খেতে তো যাব না। এমনি পুজো দেখতে যাব।

আমারেও নিমন্ত্রণ দেয় নাই। মেলা লোকে আর্জ খিচুড়ি খাইতে যাইব। পাত পাইড়্যা খাওয়াইব আজ। খিচুড়ি, বেসন দিয়া বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, বোঁদে, আরও কত কী!

তাও তুমি যাবে না?

হঃ। আমি যাম্যু ক্যান? আমি কি ভিখারি? নিমন্ত্রণ ছাড়া কোথাওই যামু না; যাই না।

তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তোর লগ্যে না আমাগো বুলবুলির দোস্তি? মাইয়াটা মরতে বসছে, তা কি জানস?

বুলবুলির কি হয়েছে?

অবাক হয়ে বলল ঋভু।

সেদিনই তো দেখা হলো।

কী হয় নাই তাই ক।

তুমি সত্যি বলছো শংকরী পিসি?

শংকরী তার জম্মে কখনও মিথ্যা কয় নাই।

তুমি কোথায় যাচ্ছো?

শংকামারী।

কেন? শ্মশানে কেন?

মাইয়াটার চিতা কোথায় জ্বলব তাই দ্যাখতে যাইতাছি। ওর আর আছেডা কে সংসারে! এক ঠাক্‌মা। সেও তো মাজার ব্যথায় নড়বারই পারে না। যা করনের, তা আমারই করতে হইব।

শংকরী চলে গেল। ঋভু দাঁড়িয়ে পড়ল পথের উপরেই। ষষ্ঠীর দিনই শেষ বিকেলে বুলবুলিদের বাড়ি গিয়ে নতুন শাড়ি জামা দিয়ে এসেছিল ঋভু। বুলবুলির ঠাক্‌মার জন্যেও একটি থান।

শংকরী পিসি!

ঋভু পেছন থেকে ডাকলো শংকরীকে।

পিছ্ ডাকস্ ক্যান রে ছ্যামড়া?

বুলবুলির সঙ্গে তোমার কখন দেখা হয়েছিল?

এইতো আইতাছি। তাগো বাড়ি থিক্যাইতো আইতাছি।

ও। ঋভু বলল।

জমিদারবাড়ি আর যাওয়া হলো না ঋভুর। মনটা ভীষণই খারাপ হয়ে গেল। মহানবমীর দিন বাড়িতে পোলাও আর মাংস রান্না হচ্ছে আজ। কিশমিশ দেওয়া আনারসের চাটনি। পোলাওয়ের বাদাম পেস্তা কিশমিশ সব আলাদা করে ধুয়ে কুলোতে শুকুতে দেওয়া হয়েছে। মাংসের জন্যে গরম মশলা। বাড়ির গাইদের দুধের ঘি। তার গন্ধ-স্বাদই আলাদা। চারদিকে এতো আনন্দ তার মধ্যে এ কী খারাপ খবর শুনিয়ে গেল শংকরী পিসি।

ছানুকাকু বলে, পাগলে কি না বলে, ছাগলে কী না খায়!

তাই হলেই ভালো। শংকরী পাগলির কথা যেন মিথ্যেই হয়। তবু কথাটা শোনার পরে একবার না-গিয়ে তো স্বস্তি পাবে না ঋভু! পুটুটা এসে পড়লে বেশ হতো। পুটু খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। মানে, যাকে বলে, কাজের ছেলে! ওর মাথাও খুব ঠাণ্ডা। বড়োদের মতো ভেবেচিন্তে কথা বলে, কোথায় কী বলতে হবে, কখন কী করতে হবে সব জানে পুটু। কিন্তু কী আর করা যাবে! অপেক্ষা করার সময় তো আর নেই।

বুলবুলিদের বাড়িটা একটা বিচ্ছিরি জায়গায়। ধারে কাছে আর বাড়ি নেই। ওদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা তো খুবই ভালো ছিল। তবে ওর ঠাকুরদা নাকি ভাইদের ঠকিয়ে বিধবা মাকে ঠকিয়ে সব সম্পত্তি নিজের করে নিয়েছিলেন। সেই তাঁর পাপে আজ বুলবুলির এই দশা। বুলবুলির ঠাকুরদার জীবদ্দশায়ই তাঁর সব ছেলে-মেয়েই মারা যান। আর নিজেও কপর্দকশূন্য অবস্থাতে জরাগ্রস্ত হয়ে মারা যান। বুলবুলির ঠাক্‌মার কাছেই গল্প শুনেছিল ঋভু।

ঠাক্‌মা বলেছিলেন, জরার মতো শাস্তি আর নাইরে ঋভু! তার বাড়া কষ্ট নাই। তিনি তো গেছেন গিয়া সেই কবে! আমার থিক্যা বাইশ বছরের বড়ো ছিলেন তো! তৃতীয় পক্ষ। এখন আমার সেই ভয়েই পরানডা কাঁপে। আমারেও যদি জরায় ধরে তবে দ্যাখবোটা কে? ক?

একসময়কার বিরাট বাড়ির ইট খসে গেছে, পাঁচিল ধসে গেছে। খিলান, কড়ি, বরগা সব খুলে পড়ে গেছে। বট-অশ্বত্থের ঘন সবুজ আঙুল গলে গেছে যেখানে সেখানে। ধ্বংস নিশ্চিত করে। আলসেতে পায়রা, ইটের স্তূপে সাপ, পেছনের বাঁশবনে শেয়াল, এদেরই রাজত্ব এখন। বাড়িটা দেখলে মনে হয় না যে, কোনো মানুষ থাকতে পারে ওখানে। কিন্তু বুলবুলিরা থাকে। তার পূর্বপুরুষের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে নিষ্পাপ সেই মেয়ে কোনোক্রমে বেঁচে থাকে। যদিও তাকে বেঁচে থাকা বলে না!

মাঝে মাঝে ঋভুর মনে হয়, চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকে, ডেকে বলে; দ্যাখো, দ্যাখো তোমরা; পাপ করলে, প্রায়শ্চিত্ত কী করে করতে হয়!

শরতের রোদ নারকোল গাছের পাতায় ঝিকঝিক করছিল। রঙ-বেরঙা পাতাবাহার।

ঋভু যেই ঢুকল গিয়ে বুলবুলিদের বাড়িতে অমনি একটা বেড়াল কেঁদে উঠল। তারপর কেঁদেই চলল।

ঠাক্‌মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কোনোক্রমে। বাঁ হাত কোমরে রেখে ককিয়ে ককিয়ে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য বেড়ালটিকে উদ্দেশ করে বললেন, মর্, মর্। তুই মর্। নিমকহারাম মাইয়া, ভাগ্। ভাগ্। দূর হইয়া যা এইখান থিক্যা।

পরক্ষণেই ঋভুর দিকে চোখ পড়তেই ঠাক্‌মা কেঁদে উঠলেন। বললেন, আইছো! বড্ড দেরি কইর‍্যা আইলা তুমি ধন!

ঋভুর গলার মধ্যে কী যেন দলা পাকিয়ে উঠল। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। বুকের মধ্যে ভীষণই কষ্ট হতে লাগল।

অনেক চেষ্টা করে, ঋভু বলল, ডাক্তার নিয়ে আসব?

বলল বটে! কিন্তু এতো কলকাতা নয়! ডাক্তার বললেই, ডাক্তার পাওয়া যায় না। বহুদূর হেঁটে বা সাইকেলে গিয়ে কোনো ডাক্তারবাবুকে খবর দিলেও তাঁর আসতে আসতে আরও বেলা হয়ে যাবে। রোগীদের ভিড় থাকে খুবই। বহু দূর-দূর গাঁ-গঞ্জ থেকে রোগীরা আসে। কেউ হেঁটে, কেউ সাইকেলের

কেরিয়ার বা রডে বসে। কেউ বা গোরুর গাড়িতে করে। "একুনি আসুন" বললে কোনো ডা আসতে পারবেন না মফস্সলে। ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে গিয়ে আনতে হবে। আবার গাড়ি করে পৌঁছেও দিয়ে আসতে হবে তাঁকে। ভূপতিকাকুর মতো কিছু বড়ো ডাক্তারের অবশ্য নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ি ছিল। কিন্তু ঋভু কাকে ডাকবে? তার কাছে পয়সাও নেই। তার উপর কী কুক্ষণে যে আজ ধুতি আর বিদ্যাসাগরী চটি পরতে গেল! দৌড়াদৌড়ি করবে যে, সে উপায়ও নেই!

ঠাক্মা ততক্ষণে আবার ককিয়ে কেঁদে ভিতরে যাচ্ছিলেন।

ঋভু তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে বারান্দায় উঠল।

ঠাক্মা বললেন, পির্থিবির কোনো ডাক্তারেরই আর করনের কিছু নাই বাবা। আমার হাতে আজ অবধি বাইশ জন গেছে। বোঝ্লা না? বাইশ জনরে কানে হরিনাম শুনাইয়া পার করছি। হক্কলেই আমার ছোটো। তোমার ঠাকুরদারে ধইর্যা তেইশ জন। আমি জানি, কারে কখন লইতে আইতাছে যম। যমদূতগো আমি দেখি যে। জানালার পাশে, উঠো, চ্যাগারের ধারে খাড়াইয়া আছে মাইয়াটারে লইয়া যাইব বইল্যা। এর আগেও বহুবার দেখছি ওদের। একেক বার একেকরকম ড্রেস পইর্যা আসে, য্যান সং সব! কী খিটক্যাল। কী খিটক্যাল। রাধা মাধব! রাধা মাধব!

ঠাক্মার এই সব কথাতে নবমীর সকালের ঢাকের বাদ্যি আর কাঁসরের ঝনঝনানি—মাখা মিষ্টি, উষ্ণ রোদ্দুরটা হঠাৎই ঠাণ্ডা মেরে গেল। শীত করতে লাগল ঋভুর। ঠাকুমার পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকল ঋভু।

ঘরে ঢুকেই চমকে গেল।

বুলবুলি আধশোয়া হয়ে মাথার পেছনে আর পিঠে তেলচিটে তিন-চারটে বালিশ ভর দিয়ে বসে আছে। চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। দু-বিনুনি করে চুল বেঁধেছে লাল রিবন দিয়ে। আর পরে আছে, যে শাড়িটা, তাপসী ঋভুকে দিয়ে ষষ্ঠীর রাতে পাঠিয়েছিলেন সেটি একটি খড়কে-ডুরে টাঙাইল শাড়ি। খয়েরি-লাল-আর কালো ডোরাকাটা।

ছিঃ। বুলবুলি জ্ঞান আছে পুরো আর ঠাক্মা ওর সামনেই ওই সব বললেন! কী ভাবছে বুলবুলি? ওই সব কথা শুনে ঋভুর বুকের মধ্যেই কেমন করছে, মনে হচ্ছে ও এখুনি মরে যাবে। আর বুলবুলি বুকের মধ্যে কে জানে কী হচ্ছে! মরে যাওয়া কি এতই সহজ? কী করে মরে মানুষ? চলে যাবে বুলবুলি তাকে ফেলে, শাপলার বিল; ভাবরার মাঠ ফেলে? হতে পারে তা?

ঠাক্মা কি পাগল হয়ে গেছেন?

হঠাৎ মনে হলো, বুলবুলি যেন তার ডান হাতটি তোলবার চেষ্টা করল ঋভুকে ডাকবার জন্যে। কিন্তু হাতটি নাড়াতে পর্যন্ত পারল না। জ্বলজ্বল চোখ দুটি হাতের বদলে হাতছানি দিয়ে ডাকল ঋভুকে।

ঋভু ওর পাশে গিয়ে বসে বুলবুলির ডান হাতটি তুলে নিতেই চমকে গেল। বর্ষার ব্যাঙের গায়ে হাত ছোঁয়ালে যেমন ঠাণ্ডা লাগে, বুলবুলির হাতের পাতা ঠিক তেমনই ঠাণ্ডা। পরক্ষণেই কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বাইরে বেড়ালটা তখনও সমানে কেঁদে যাচ্ছিল।

ঋভু ছিটকে উঠে বলল, ঠাক্মা! আমি মাকে খবর দিই। ডাক্তার ডেকে আনি।

ঠাক্মা খল-নোড়াতে মকরধ্বজ মারছিলেন, মধু দিয়ে। বললেন, যাইয়ো না। ডাক্তারের কাম নেই। পূজার দিনে খামকা হক্কলরে বিব্রত করবা ক্যান শুদামুদা? ভালো হইলে মা দুর্গার দয়াতেই ভালো হইয়া উঠবোনে। তুমিও এট্টুক্ষণ বইস্যা তাপ্পর যাইয়া প্রতিমা দ্যাখো গিয়া। বছছরকার দিন!

কী রে? কী কষ্ট? বুলবুলি?

বুলবুলি বালিশের দুপাশে মাথা নাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

ফিসফিস করে বলল, কোনোই কষ্ট নাই।

ওর হাতের পাতাটা নিজের হাতে নিয়ে ভালো করে ঘষে-ঘষে গরম করে দিতে লাগল ঋভু।

বুলবুলির ঠোঁটে আর চোখে আশ্চর্য এক হাসি ফুটে উঠল। তাতে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আর গাঢ় ভালোবাসা মাখামাখি হয়ে ছিল।

ঠাক্‌মা বললেন, মাইয়ার রাগ হইছে খুব। তুমি শাপলা ভাজা না খাইয়াই চইল্যা গেল্যা সেদিন। বুলবুলি কইছিল, বড়লোকি দ্যাখাইবার লগ্যেই আইছিল। আমাগো শাড়ি-থান দিয়া গ্যেল আর পাঁচমিনিট বইস্যা দু'গা শাপলা-ভাজা খাইয়া যাইতে পারল না। ঢং যত্ত!

ঋভুর ভালো লাগছিল না এসব কথা।

বলল, ঠাক্‌মা শংকরী পিসি কি এসেছিল?

শংকরী? কোন্ শংকরী?

শংকরী পাগলি।

নাঃ। সে তো আসে নাই।

কবে এসেছিল?

মাসখানেক আগে একবার আইছিল।

আপনি ঠিক জানেন?

জানুম না ক্যান? আমি তো সারাটা দিনই এই ঘর আর উঠানই করি। আজ দ্যাড় বছর হইয়া গেল গিয়া, বাড়ির বার হই নাই। এই ছেমরিই কুড়াইয়া-বাড়াইয়া যা হয় লইয়া আনে। তাই খাইয়া বাঁচি। এমন বাঁচনে বড়ো লজ্জা। বড়োই লজ্জা।

শংকরী পিসি আজ আসেনি?

আইজ? না তো।

ঠাক্‌মা অবাক হয়ে বললেন। তারপর বললেন, ক্যান জিগাও?

বুলবুলি ফিসফিস করে বলল, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম পিসিকে।

কখন?

একটু আগে।

কী বলল?

বলবো না।

বুলবুলি বলল, অপার রহস্যে দু চোখ ভরে।

ঠাক্‌মা প্রসঙ্গ বদলে বললেন, সকলেই তো শুনি রংপুর ছাইড়্যা যাইব্যো। আমরা যামু কই?

সকলেই কেন যাবে ঠাক্‌মা? সেজকাকু তো বলেছেন, যদি কেউ জমি-বাড়ি বিক্রি করে দেয়, তা তিনিই কিনে নেবেন। থাকছেন এখানে, যদি...।

এমন সময়ে বুলবুলি কী যেন বলে উঠল অস্ফুটে। বলেই, পাশ ফিরে শুল। ঋভুর দিকে পিছন ফিরে।

লজ্জা পেল ঋভু। মেয়েটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, কত না কষ্ট শরীরের আর তার পাশে বসে ঋভু ঠাক্‌মার সঙ্গে যাত্রার নায়কের মতো বুলি কপচাচ্ছে।

নে! খাইয়া ল' ছেমরি।

বলে, ঠাক্‌মা মকরধ্বজ নিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে কাছে এলেন। কাছে আসতেই ঋভু বুলবুলির ঠাক্‌মার গায়ে পুরানো-ঘি-এর গন্ধ পেল। গা গুলিয়ে এল ওর। ঘি পচিয়ে রেখে সেই ঘি মাথায় মাখলে মাথার যন্ত্রণার উপশম হয় নাকি।

কিন্তু সেই পুরোনো ঘিয়ের গন্ধে জার্মান পালায়!

বুলবুলি উঠতে পারল না। ঋভু খলটা হাতে করে, বুলবুলির মাথাটা সোজা করে নিয়ে ঝিনুকের মতো করে খাইয়ে দিল বুলবুলিকে।

বুলবুলি বলল, আঃ।

সেটা যন্ত্রণার, না আরামের, না ঋভু পাশে বসে থাকা-জনিত ভালো লাগার তা বুঝল না ঋভু।

শংকরী পিসি যে মিথ্যে বলেছিল সে কথাটা মনে করেই খুব খুশি ঋভু। কী ভয়ই না পেয়েছিল! কিন্তু বুলবুলি স্বপ্ন দেখল কেন শংকরী পাগলিকে, আজ সকালেই? বুলবুলির ঠাক্‌মাও ওইসব বাজে কথা কেন বলছেন? তাও আবার বুলবুলির সামনেই?

বেড়ালটা কেঁদেই চলেছে ক্রমাগত। কোনো ক্ষতি নেই। এই সব কুসংস্কারে ঋভুর নিজের একটুও বিশ্বাস নেই। কিন্তু বেড়াল কাঁদলেই প্রমীলাবালাও লোক লাগিয়ে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেন। বুলবুলির ঠাক্‌মাও তাই করছেন। এতরকম কুসংস্কার পারিবারিক পরিবেশ বা সঙ্গী-সাথীদের কারণেই গড়ে ওঠে। ঋভু যতই শুনবে না মনে করছে, ততই বেড়ালটার কান্নায় তার দু-কান ভরে যাচ্ছে। আর ভয়ও করছে খুব।

তুই আর আসবি না রংপুরে?

ফিসফিস করে বলল বুলবুলি।

জানি না।

বলল ঋভু।

তারপরই বলল, আসব না কেন? আসব নিশ্চয়ই। সেজকাকু তো যাবেন না। সেজকাকুর কাছে আসব।

বুলবুলি হাসল। মানে, হাসবার চেষ্টা করল।

তারপর বলল, আমার সঙ্গে দেখা হবে না আর।

ধক করে উঠল ঋভুর বুক। বলল, কেন? এ কথা বলছিস কেন?

এমনিই।

রুক্ষ চুলে দু-বিনুনি করা, কাটা-কাটা নাক-চিবুকের, অভিমানী-ঠোঁটের আর উজ্জ্বল চোখের বুলবুলিকে হঠাৎ চুমু খেতে ইচ্ছে করল ঋভুর।

কাল সন্ধেবেলাতে জীবনের প্রথম চুমু খেয়েছিল কোনো মেয়েকে। এমন কিছু আগে কখনও খায়নি। ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে সারা শরীর যে কীভাবে শিহরিত হয় তা, চুমু যে কখনও খায়নি, তাকে তো বোঝানো যাবে না! একটি চুমু খেয়ে চুমু খাবার লোভ বেড়ে গেছে। পুষিদি তাকে চুমু খেয়েছিল। ঋভু খায়নি তাকে।

বুলবুলি ঋভুর হাতটা হাতে নিল। মকরধ্বজ খেয়ে বোধহয় একটু ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগল ঋভুর। বুলবুলির হাতের পাতার উপরে নিজের হাতের পাতাটি মেলে ধরল ঋভু। কী ভালো যে লাগল! ঋভু ভাবছিল, এও আরেক রকমের চুমু। যারা জানে, তারাই জানে। এই দুটি নরম হাতে কত কষ্টই না করে!

ঠাক্‌মা বললেন, তুই পাঁচ মিনিট বস্‌ আমি একটু আইতাছি। আমি আইলেই তুই চইল্যা যা ঋভু! পোলাপান। বছ্‌ছরকার দিনে কি বইস্যা থাকবি আনে রুগীর শিয়রে?

ঠাক্‌মা চলে গেলে, বুলবুলি একবার হাসল ঋভুর দিকে চেয়ে। অমন জ্যোতির্ময়ী হাসি আর কখনও দেখেনি ঋভু জীবনে। গর্জন-তেল মাখা চকচকে মুখের মা-দুর্গার চোখ যেমন জ্বলজ্বল করে তেমনই জ্বলজ্বল করছিল বুলবুলির চোখ দুটি।

হাসছিস কেন? এখন ভালো লাগছে তো আগের থেকে?

বাইরে ঠাক্‌মার বেড়াল-তাড়ানোর আওয়াজ শোনা গেলো। ওই বাতগ্রস্ত কোমর নিয়েও ঠাক্‌মা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন আগাছা-ভর্তি বাগানময়।

ঋভু বলল, ঠাক্‌মা না, মিছিমিছি!

বলেই বলল, তুই হাসলি কেন?

তুই মমতাজকে ভালোবাসিস, না রে ঋভু?

ভ্যাট্‌।

ঋভু বলল, হঠাৎ অপ্রস্তুত মুখে।

মিথ্যে কথা বলিস না। আমি স্বপ্ন দেখেছি। যেমন দেখেছি, শংকরী মাসিকে।

কখন? কখন দেখেছিস স্বপ্ন?

আজ সকালে। যখন জ্বর খুব ছিল।

কী দেখেছিস?

তুই মমতাজকে; একটা গন্ধরাজ লেবুর গাছের পাশে...

এই কথা ক'টি বলতে বলতেই বাড়িময় আলো হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেলে যেমন হয়, বুলবুলির মুখও তেমন হঠাৎই অন্ধকার হয়ে গেল।

ঋভুর বুকের মধ্যেটা যেন কীরকম করে উঠল। কোনো অদৃশ্য অজানা শক্তি ওর মুখটাকে বুলবুলির মুখের কাছে নামিয়ে আনল। মমতাজকে যেমন করে চুমু খেয়েছিলো, বুলবুলিকে তার চেয়েও ভালো করে চুমু খেল ও।

বুলবুলির চোখ বুজে এল আবেশে।

ঋভু মাথা ওঠালে, ও বলল, আঃ এখন মরে গেলেও সুখ। আমি আসছি শংকরী মাসি। তুমি সব বন্দোবস্ত করো।

আবারও ধক করে উঠলো ঋভুর বুক। এসব হেঁয়ালির কোনো মানে বুঝছিল না ঋভু। কিন্তু ওর ভীষণই ভয় করতে লাগল। এমন সময় ঠাক্‌মার গলা পেল পেছনে।

ঠাকুমা বললেন, যারে ছ্যামড়া। যা তুই।

একজন ডাক্তারকে নিয়ে আসব ঠাকুমা?

বেড়ালটা আবারও কাঁদতে লাগল ঘুরে ঘুরে। ঘন সবুজ গাছ আর আগাছার দিনমানের সবুজ অন্ধকারের উঠোনে। অথচ চারদিকে তখনি সকাল ঝলমল করছে শরতের আলোয়।

ঠাকুমা বললে, কোন্ কাম? কাম বাই। লাগব না ডাক্তার।

বুলবুলি বলল, যারে ঋভু! ভালো থাকিস। রংপুরে আর না এলেও আমাকে ভুলিস না কিন্তু।

ঋভু বলল, তুই আগে বল যে, ভালো লাগছে এখন। ভালো হয়ে উঠবি তাড়াতাড়ি।

হাসল বুলবুলি।

বলল, ঠিক আছে। তুই যখন বলছিস, উঠব। তাপসী কাকিমাকে আমার প্রণাম দিস বিজয়ার। তোর ঠাকুমাকেও। সব বড়োদের।

তুই নিজে গিয়েই প্রণাম করবি। জানিস বুলবুলি, এবারে চমচম আর কুচো নিমকি; বিজয়াতে গেলেই।

তাই?

এবারে চমচম? তবে তো যেতে হবেই। কিন্তু তুই এবারে যা অঞ্জলি দিবি তো?

দেব।

আমারটাও দিয়ে দিস।

তোর হয়ে কী চাইব মায়ের কাছে?

চাস, সকলে যেন খেতে পায়, কারো পেটেই যেন খিদে না থাকে; সকলেরই যেন পরনের শাড়ি থাকে, আর তোর মতো বন্ধু থকে অন্তত একজন।

বলতে বলতে, বুলবুলির দুচোখের কোনা বেয়ে, গাল বেয়ে দু'বিন্দু জল গড়িয়ে গেল।

ধুতির খুঁট দিয়ে মুছিয়ে দিল সে জল ঋভু।

ঠাকুমা বললেন, এ আবার কোন্ ঢঙ। ছেম্‌রি কান্দে ক্যান? বচ্ছরকার দিনে? কী খিটক্যাল? কী খিটক্যাল্।

ঋভুর মনে হলো, বুলবুলি ঠাকুমার মাথার গোলমাল হয়েছে।

ঋভু বলল, চলি রে! কাল সকালে আসবো আবার।

বলেই, ঠাকুমাকে বলল, কিছু আনতে হবে ঠাকুমা? রুগীর পথ্য? আপনার জন্যে কিছু?

এক ছোটো-কৌটা রবিনসন বার্লি আর সের পাঁচেক চাল যদি দিতা পারতা ধন।

নিশ্চয়ই ঠাকুমা। বারোটার মধ্যে আসব; হয় আমি নিজে আসব, নয়ত কেউ পৌছে দেবে।

বাইরে বেরিয়ে যখন এল, বেড়ালটা তখনও কাঁদছিল।

মোড়ের পঞ্চাজেঠার দোকানে বার্লির কথা বলে গেল। চালটাল বিক্রি হয় না এখানের মুদিখানাতেও। এক বাসমতী, দেরাদুন চাল ছাড়া। বাড়ি থেকে চাল পাঠিয়ে দেবে।

ঋভু বলল, বিকেলে পয়সা দিয়ে যাব জেঠা। বার্লির পয়সা।

আরে তোমার দিবার লাগব না। তোমাদের বাড়ির হিসাবে লিইখ্যা থুল্যাম।

বার্লিটা কি এখুনি কোনোভাবে পাঠানো যাবে? নইলে, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। মেয়েটার খুব জ্বর।

এখনি পাঠাইতাছি। হাঁদু! কই গেলিরে ছ্যামড়া। জলদি পা চালাইয়া যা দেহি! এই কৌটাখান দিয়া আয় বুড়িরে। যাবি আর আইবি।

কোন্ বুড়ি?

হাঁদু বলল।

আ মরণ! বুলবুলির ঠাক্‌মারে। বুড়ি য্যান গিসগিস করে!

এবারে জমিদার বাড়ির দিকে মোড় নিল ঋভু। হরিসভার পাশ দিয়ে যেতে হবে।

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডাকল, ঋভু! এই ঋভু! মেয়েলি গলায়।

দাঁড়িয়ে পড়ে, পিছন ফিরেই দেখ সুমিতাদি!

মুনসের তাকে পেটে ছুরি মারার পর এই সুমিতাদিই বাড়িতে এসে ঋভুর সেবা করেছিলেন। ওঁকে নার্সের সাদা পোশাকে দেখেই অভ্যস্ত ছিল ঋভু। তা ছাড়া অনেকদিন হয়েও গেছে। তাই প্রথমে চিনতেই পারেনি ফিকে-হলুদ রঙা ধনেখালি শাড়িতে। ফিকে বেগনে-রঙা পাড়। শাড়ির মতো একই রঙের ব্লাউজ। চান করে চুল মেলে দিয়েছেন পিঠে। ভারি ভালো দেখাচ্ছে। যেন হলুদ বসন্ত-পাখিটি!

সব মেয়েদেরই খুব ভালো-লাগে ঋভুর। ওর সৌভাগ্য যে, সমবয়সী মেয়েদেরও ভালো লাগে ওকেও। ভালো যে লাগে, সে কথাটা ভেবেই ও ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করে।

আপনি! এদিকে সুমিতাদি?

ঋভু হেসে বলল।

বাঃ বাঃ! ধুতি পাঞ্জাবি লাল-চটি। কোন্ বাড়ির জামাই এল?

আপনি! এদিকে?

জমিদার বাড়ির পুজোতে অঞ্জলি দিতে এলাম। বউদি কেমন আছেন? ঋভু?

ভালো। ওখানে মাও হয়তো যাবেন একবার। নইলে হরিসভাতে পাবেনই।

তোমরাও কি রংপুর ছেড়ে চলে যাবে?

আমরা তো কলকাতাতেই থাকি।

ও হ্যাঁ। তোমরা থাকো। কিন্তু তোমাদের বাড়ির অন্যেরা?

এখনও ঠিক নেই। আগে দেশ স্বাধীনই হোক।

আমরা যে কোথায় যাই? বুড়ো বাবা আর তিন তিনটি বোনকে নিয়ে। বাবা আর বেশিদিন বাঁচবেনও না। ওই দিকে কোথাওই কেউ নেই। কী যে হবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াব তা ভাবতেও বড়ো ভয় করে। রোজই প্রার্থনা করি, যেন দেশ ভাগ না হয়! গান্ধি মহাত্মা যেন এই দেশভাগ স্বীকার করে নিয়ে স্বাধীনতা না নেন।

ঋভু বলল, আপনি এগোন, আমি দৌড়ে বাড়ি থেকে আসছি।

ঠিক আছে। বলে, সুমিতাদি এগিয়ে গেলেন।

একটু অপ্রতিভও হলেন ঋভুর হঠাৎ চলে যাওয়ায়। ভাবলেন, ছেলেমানুষকে এত সব না বললেও চলত!

বাড়িতে প্রায় কেউই ছিলেন না। শুধু বিবাগী কাকা ঠাকুরঘরে দশভুজার ছবির সামনে বসে পুজো করছিলেন। চান করে সিল্কের একটি ধুতি পরে তারই খুঁট গায়ে জড়িয়ে ধবধবে ফরসা বিবাগী কাকা যখন পুজো করতেন তখন তাঁকে অন্য জগতের মানুষ বলে মনে হতো। তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনোযোগ নষ্ট করার সাহস প্রচন্ড ব্যক্তিত্বময়ী প্রমীলাবালারও ছিল না।

ঋভুকে দেখেও বিবাগী কাকা দেখলেন না।

ঋভু উঠোনে নেমে এসে দেখল, রঘুদা।

রঘুদাকেই বলল, পাঁচ সের চাল বুলবুলিদের বাড়ি পৌঁছে দিতে। বিবাগী কাকা পুজোর ঘর থেকে বেরোলেই তাঁকে জিগ্যেস করে। আরও বলে দিল, যেন সাইকেল করেই যায় এবং বুলবুলি কেমন আছে তাও জিগ্যেস করে আসে।

রঘুদা বলল, সের আবার কি? দুই ধামা দিয়া আসব?

বড়োমা কিছু বলবে না তো?

ঋভু বলল।

সেরফের-এর মাপ আমাগো জানা নেই। ধামা কইর‍্যাই দিয়া আসব। দশ বারো সের হইব। কড়ায় কি হইব? কইব না।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে শর্টকাটে গেল ঋভু গাছগাছালির মধ্যের পথে। পেছনের দরজাকে পেছনের দরজাই বলত ওরা। খিড়কি বলত না। কলকাতায়ই ওই শব্দটি প্রচলিত ছিল তখন।

প্রথমে জমিদার বাড়িতেই গেল কিন্তু থাকতে ভালো লাগল না। তখন মোষবলি, পাঁঠাবলি সব শেষও হয়ে গেছে। অত রক্ত আর রক্তাক্ত ধড়গুলি দেখে ঋভুর বুকের মধ্যে কীরকম যেন করে উঠল।

বিবাগী কাকু বলেছিলেন, আমরা শাক্ত। রক্ত দেখে ভয় পেলে চলবে কেন? বৈষ্ণব তো নই; মহাষ্টমীর দিনে মাংস খেতে হয়, মহাষ্টমীর আরেক নাম বীরাষ্টমী। শত্রুদমন করার দিন। মা দুর্গা মহিষাসুরের বুকে ত্রিশূল দিয়ে মারেন না? মোষবলি তো খাওয়ার জন্যে নয়, মহিষাসুরের বিনাশ ঘটাবারই জন্যে।

হয়তো তাই। কিন্তু তবু অত রক্ত দেখে মাথা ঘোরে ঋভুর।

পুঁটুকেও দেখতে পেল না সেখানে। তাই ফিরে এল হরিসভাতেই। সেখানেও পুঁটু ছিল না।

তাপসী ঋভুকে দেখে বললেন, কোথায় ছিলে? আমি খুঁজে মরি; যাকেই জিগ্যেস করি, সকলেই বলে, আমরা দেখিনি। অঞ্জলি দিয়েছ? শেষ অঞ্জলি তো হয়ে গেল।

মিথ্যে কথা বলল, ঋভু, মাথা হেলিয়ে।

কোথায় দিলি? জমিদার বাড়িতে?

আবার মাথা হেলাল ও।

মা বললেন, যা, প্রসাদ খা।

খিদেও পেয়েছিল খুব। ওদিকে প্রসাদ খেতে ভয়ও করছিল। মায়ের সামনে মিথ্যা কথা বলল নিজের জন্মদাত্রী মায়ের কাছে। পাপ হবে ওর। কিন্তু বুলবুলি যে মরে যাচ্ছিল। তার কাছে যাওয়া, থাকা, তার জন্যে রবিনসন বার্লি ও চাল যোগাড় করে দেওয়াটাও কি একরকমের অঞ্জলি নয়? মনে মনে মায়ের কাছে তার নিজের আর বুলবুলির অঞ্জলিও দিয়ে দিয়েছে ও। ওর প্রার্থনা ছিলো, বুলবুলি যেন ভালো হয়ে ওঠে। বড়ো হয়ে ঋভু জেনেছিল যে, সত্যিই অঞ্জলি নানারকমেরই হয়।

দুই করে পূত বিল্বপত্র ও পুষ্প নিয়ে সুস্নাত, পট্টবস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, দেব-দেবীর পায়ে যেমন অঞ্জলি দেওয়া যায় তেমন অঞ্জলি দেওয়া যায় হৃদয়, সময়, যৌবন, জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও। নিভৃতে, কোনো মন্ত্রোচ্চারণ না করে; অন্যের চোখের আড়ালে। সেজকাকু তো দেশমাতৃকার পায়ে নিজের যৌবন অঞ্জলি দিয়েছেন। হয়তো সারা জীবনটাই দেবেন। বড়োকাকু বিবাগীও তো মা কালী আর দুর্গাকে সঁপে দিয়েছেন তাঁর সমস্ত জীবনের সাধ-আহ্লাদ। অনেকেই অঞ্জলি জলাঞ্জলিও হয়।

সুমিতাদি তাপসীর পাশে বসেছিলেন। সুন্দর দেখাচ্ছিলো এই পোশাকে ওঁকে। নার্সের পোশাকেও সুন্দর দেখায়। তবে সেটা অন্যরকম সুন্দর। সৌন্দর্যর যে কত্ত রকম হয়!

তোমার ব্যবসা কেমন চলছে সুমিতা? আরও মেশিন কি কিনলে? সেলাই কল?

সুমিতাদি হেসে বললেন, হ্যাঁ বউদি! এবারে আপনার কথামতো পা-মেশিনই কিনে নিলাম একটা। পুজোর আগে আমরা তিন বোনে অনেক টাকা রোজগার করেছি এ বছরে। শায়া, ব্লাউজ, আর ছোটোদের ফ্রক বানিয়ে।

বাঃ বাঃ! খুব ভালো।

তাপসী বললেন।

কলকাতায় গেলে চিনতে পারবেন তো বউদি?

তাপসী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, চিনতে নিশ্চয়ই পারব। তবে কিছু করতে হয়তো পারব না সুমিতা। তোমাকে বলে রাখাই ভালো। আর যদি না-গিয়ে পারো, তবে কলকাতায় যেয়ো না। অন্য যেখানে যাও যেতে পারো, কলকাতায় নয়।

যদি দেশ ভাগই হয়ে যায় তবে না-গিয়ে যে উপায়ও নেই বউদি। আমাকে আর আমার ছোট তিন বোনকে যে কত অপমান সয়ে এমনিতেই বাঁচতে হয় তা যদি জানতেন; ধামাচাপা দেওয়া কবুতরের মতো বেঁচে আছি আমরা। চারপাশে নানা জাতের নানা রঙা হুলো বেড়ালরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কোনো সময়েই ধামা উলটে পালক ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

তাপসী বললেন, না জানলেও, বুঝতে পারি সুমিতা। তবুও বলব, এখানেই তোমাদের জন্ম। শিশুকাল থেকে তোমাদের এখানে সকলেই চেনে। লুকিয়ে থাকার মতো, চাপা দেবার মতো ধামা আড়ালটুকুও অন্তত আছে এখানে। কিন্তু কলকাতায় যেয়ো না। যদি না গিয়ে পারো তো যেয়ো না; সেখানে নিজেদের ঢাকবার জন্যে সামান্য ধামাও পাবে না। এখানের মানুষদের তবু চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে। কলকাতার মানুষদের সে সবের বালাই নেই। নিতান্ত অপরাগ না হলে এখানেই মাটি-কামড়ে পড়ে থেকো।

তাপসী একটু চুপ করে থেকে বললেন, জানো সুমিতা, জাতিভেদ হিন্দু-মুসলমানের নয়। ভালো ও খারাপ মানুষের। পৃথিবীতে মানুষের দুটিই জাত। খারাপ আর ভালো। ভালো মানুষ বাছতে কলকাতা শহর উজাড় হয়ে যাবে। বুদ্ধিজীবীদের শহর বলে জানে লোকে কলকাতাকে। কিন্তু জানে না যে এ শহর কুবুদ্ধিজীবীদের শহর। সুবুদ্ধিজীবীরা আপাঙক্তেয় সে শহরে। রংপুরের এই মাটিতে তোমরা জন্মেছ, বড়ো হয়ে উঠেছ; অন্যের জবরদস্তিতে চাপিয়ে দেওয়া এই ভাগাভাগি কি মানা উচিত?

সুমিতাদি অসহায়, অধৈর্য গলাতে ডান হাতে একরকম ভঙ্গী করে বললেন, আপনার ধারণাও নেই বউদি। এখন থেকেই, কী হয়, কী হয় আতঙ্ক!

মায়ের উপর রাগ হয়ে গেল ঋভুর! ঋভুর মনে হল, বিহারের মেয়ে, অধুনা কলকাতার বাসিন্দা তাপসী বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছেন না বুলবুলিদের, সুমিতাদিদের, গিরীনকাকাদের, পুঁটুদের; এমনকি মমতাজদের অসহায়তার কথা। মমতাজের নরম ছোটো পাটকিলে রঙা খরগোশটাকে কুকুরে খাওয়াটা কোনো একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। ঋভুর মন বলছিলো ওই বীভৎস ঘটনাটা আগন্তুক সময়ের দূত। ঘটনাটা প্রতীকী। এ এক অন্য অগামনী গান। বড়ো ভয়াবহ! বুলবুলিদের আগাছাভর্তি উঠোনের মধ্যে সরে সরে যাওয়া নড়েচড়ে ওঠা বেড়াল কান্নাটা যেন কানের মধ্যে প্রচণ্ড জোর লাগল। বারে বারে। অমঙ্গলের সূচক। দারুণ অমঙ্গলের ছায়া চারদিকে।

বাড়ি ফেরার সময়ে ঋভু তাপসীকে বলল বুলবুলির অসুখের কথা। কিন্তু বলতে পারল না বেড়াল কান্নার কথাটা বা শংকরী-পিসির কথাটাও।

বলতে গিয়েও থেমে গেল।

তাপসী বললেন, খুব ভালো করেছ। তবে আমাকে বা ঠাকুমাকে না বলে দোকানে ধারে কোনো জিনিস নিয়ো না। তারপর বললেন, ও তো প্রায়ই অসুস্থ থাকে। এমন হয়, তো ডাক্তার দেখায় না কেন? ভালো করে?

পয়সা কোথায় পাবে মা!

কেন? সদরের হাসপাতালে গেলেই পারে। এই তো সুমিতাই বন্দোবস্ত করে দিতে পারে। যদি ডাক্তার দেখাতেই চায়। সকলেই কি আর ভিজিট দিয়ে বাড়িতে ডাক্তার আনতে পারে? না, আনে? যাদের পয়সা নেই তারা সকলেই কি বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে?

সুমিতাদি বললেন, বেশ তো। তুমি নিয়ে এসো ঋভু ওকে যে কোনোদিন। সকাল আটটা থেকে বারোটা অবধি আউটডোরে। আমি বলে রাখব তখন। কী নাম বললে, বুলবুলি?

বুলবুলি কি? বয়স কতো? বউদিদের মতো?

ঋভুর ইচ্ছে হলো বলে, বুলবুলি পাখি। কিন্তু বলল, বুলবুলি ঘোষ। আমার চেয়ে ছোটো। কিন্তু ও এতোই দুর্বল, ও যে নড়তেই পারে না। বিছানাতেই নড়তে পারে না। এতোই দুর্বল!

রাঙাপিসি বললেন, মায়ের কাছে কাছেই থাকে সবসময়।

তাপসী বললেন, রাঙা! তুমি পারলে দেখে এসোতো একবার মেয়েটাকে। ঋভু কত্ব বোঝে যেন! একবারও যেও।

আজই যাবো? বউদি?

রাঙাপিসি বলল।

রাঙাপিসি খুবই হাসিখুশি এখন। তামারহাটের বৈদ্যকাকার সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। হয়তো শিগিরই হবে বিয়ে।

তাপসী বললেন, না, আজই যেতে হবে যে, তার কোনো মানে নেই। মহাষ্টমীর আরতি দেখবে, না রোগী দেখতে যাবে? বছরে তো একটিই দিন। তার উপরে রংপুরে আর কতদিন থাকা না থাকা তোমাদের।

ঋভুর ভীষণই দুঃখ হলো। শংকরী পিসির গাওয়া গানটার কথা মনে পড়ে গেল। মা, বুলবুলির অসুখটাকে পাত্তাই দিলেন না অথচ ঋভু জানে যে, এই অসুখটা সাধারণ অসুখ নয়। সকলেরই মহাষ্টমী, শুধু বুলবুলিরই নয়! ঋভু ঠিক করল, কেউ না যাক ও একাই যাবে আজ সন্ধেতে বুলবুলিকে দেখতে। মহাষ্টমীর রাতে যাবে না হরিসভাতে, দেখবে না থিয়েটারও। আজ "শাজাহান" নাটক হবে। বড়োরা করবেন।

কিছুদিন হলো মাঝে মধ্যেই ঋভুর মনে তাপসী ও হৃষীকেশ সম্বন্ধে একটু ঝিনুক ঝিনুক বিদ্রোহ ঝিলিক মেরে যাচ্ছে। এতোদিন মা-বাবার প্রতি তার অন্ধভক্তি ছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ওর নিজস্ব বোধ, যুক্তি ও অনুভূতি, ন্যায়-অনায় বোধ তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও বুঝতে পারছে যে এ প্রকার অন্ধত্বটা আদৌ কোনোরকম গুণের মধ্যেই গণ্যই নয়। মা ও বাবা যাই বলেন অথবা করেন তার সমস্তটুকুই যে মেনে নিতে পারছে ঋভু এমন নয়। তার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা-নির্ভর একধরনের ন্যায়-অন্যায় বোধ গড়ে উঠছে তার ভেতরে ভেতরে। তার চারপাশের প্রেক্ষিতে সব ঘটনারই স্বাধীন মূল্যায়ন করে আজকাল তার মন। করে, সেই ঘটনার ন্যায়-অন্যায় স্থিরীকৃত করে। জন্মদাতা বলেই যে মা-বাবার সবকিছুই অন্ধের মতো মেনে নিতে হবেই এ কথাতেও আর বিশ্বাস করে না বারো বছরের ঋভু। ও যে একটি আলাদা মানুষ, ওর ব্যক্তিগত ভালোমন্দ, বিচারবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ যে বাবা-মায়ের ন্যায়-অন্যায় বা ভালোমন্দ বোধের সঙ্গে মিলবেই এ কথাটাতেও বিশ্বাস হারিয়ে গেছে ওর। ঋভু একজন স্বতন্ত্রসত্তার মানুষ। সে বিষয়ে এ বয়সেই পুরোপুরি নিশ্চিত। কিন্তু আর্থিক স্বাবলম্বন ছাড়া নিজের মতামত প্রকাশ করা তো সম্ভব নয়! তাই ঋভুও ওর মতামত এখনও পুরোপুরি প্রকাশ করে না তাই নিজের বুকের ভিতর সেই সব মতামত গুঁতোগুঁতি করে নিজের হৃদয়কেই রক্তাক্ত করে।

সেই কারণেই তাপসীকে বলতে পারল না ঋভু যে, বুলবুলির অসুস্থতাটা, তারা গরিব অসহায় বলেই, এমন হেলাফেলায় উড়িয়ে দেওয়াটা অন্যায় হলো। অথচ এমনিতে তাপসী ভারি দয়াবতী। তাপসীর কাছে থেকেই ঋভুর মধ্যে সহমর্মিতা ও দরদ এসেছে জন্মসূত্রে। অথচ আজ তাপসী অন্যরকম ব্যবহার করলেন। ঋভু যদি রোজগারই করত, তার নিজের আয়ই যদি থাকত তবে তাপসী বা অন্য কারো দয়ার উপরেই নির্ভর করে থাকত না সে।

সন্তানের জন্ম দিয়ে তাদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করে, তাদের সুশিক্ষা বা কুশিক্ষার বন্দোবস্ত করেই মা-বাবা সন্তানের আজীবন শ্রদ্ধার প্রাপক হবেনই যে, এমন আশা তাঁরা করতে পারেন না। কথায়ই বলে "Respect is to be commanded and not to be begged for"। সম্মানের যোগ্য কাজ করলে সম্মান তাঁরা পাবেনই। কিন্তু শুধু জন্মদাতা-জন্মদাত্রী বলেই যে সম্মান দাবি করবেন তাঁরা অন্য অনেক মা-বাবার মতো, সেটা ঠিক নয়। অন্তত ঋভু তাই মনে করে। সময় পালটে গেছে, যুগ পালটে গেছে।

হয়তো ঋভু খারাপ, বাজে স্কুলে পড়া; বখা ছেলে। ঋভু যাই হোক, তার নিজস্বতা সে কোনো-মূল্যেই কারো কাছে বিকোতে রাজি নয়। যে মানুষ নিজের মা-বাবার কাছেও নিজেকে বিকোতে রাজি থাকে না, সে যে অন্যের কাছে ভয়ে বা লোভে কখনও নতজানু হবে এ দুর্ঘটনা কোনোদিনও ঘটবে না। এই নিজস্বতার জন্যে, স্বতন্ত্র বিশ্বাসের জন্যে যা কিছু মূল্য দেওয়া প্রয়োজন তা সে দেবেই।

ভেবেছিল বটে, কিন্তু যাওয়া হলো না কিছুতেই সে রাতে বুলবুলির কাছে। পুঁটু, বুদুস, ওরা সব দল বেঁধে এল। এসে বলল, পরের বছর আমরা কে কোথায় থাকি তারই ঠিক নেই। এবার সকলে বড়োদের "শাজাহান" দেখবই একসঙ্গে বসে।

বুদুসের মা রাতে লুচি-মাংস-রাবড়ি খাবার নেমন্তন্ন করেছিলেন সকলকে। সন্ধ্যারতি দেখে বুদুসদের বাড়ি খাওয়া দাওয়া করে ভোর রাত অবধি থিয়েটার দেখল সকলে মিলে। থিয়েটার দেখতে দেখতে বুলবুলির কথা একেবারেই ভুলে গেছিল ঋভু। বাড়ি যখন পৌঁছল তখন ঘুমে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

বেশ বেলাতে ঠাকুমা ওকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিলেন। বললেন, বিজয়ার দিন! একী! তাড়াতাড়ি চান কইর‍্যা প্রতিমার কাছে যা। ঋভু যখন চান করছে তখনই পঞ্চজেঠার দোকানের হাঁদু এসে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে চিক্কুড় পাড়ল। ও রিবু দাদা! ও রিবুদা। বুলবুলি মইর‍্যা গেছে। তোমারে ঠাকুমায় ডাকে। শিগগির আসো।

প্রমীলাবালা বাক্যটা শুনে হাঁদুর কাছ থেকে সব জেরা করে বার করলেন। বললেন, হায়। হায় অতটুকু মাইয়ারে এই বচ্ছরকার দিনে মা ক্যান্ লইয়া গ্যালেন কও দেহি?

তারপরই বললেন, হাঁদু তুমি আগাইয়া যাও গিয়া, আমি ঋভুরে পাঠাইতাছি। বাড়িতে যে আর কেউই নাই। বিবাগীও আইজ হরিসভায় গ্যাছে গিয়া। যায় না কোনোদিনও। আইজই গ্যাছে।

চান করতে করতেই ঋভুও বাক্যটা শুনেছিল। কিন্তু শুনে তার শোক হলো না। প্রচন্ড রাগ হলো, ঘৃণা হলো, তার নিজের উপর এবং তার মায়ের উপরও।

চান করে বেরোলে, ঠাকুমা বললেন, পায়েস করছিলাম, পায়েস খাইয়া যা ঋভু।

ঋভু এই প্রথমবার ঠাকুমার কথার কোনো উত্তর দিল না। পুজোর দিনে নতুন জামা কাপড় না পরে এমনি পোশাকে, খালি পায়েই বেরিয়ে গেল, ভিজে চুলে নিয়ে। চুলে চিরুনি বোলাবারও সময় পেল না। বা, ইচ্ছা করেই বোলাল না।

ঋভু আস্তে আস্তে হাঁটছিলও।

আর তাড়া করে লাভ কি? যখন তাড়া করার ছিল তখন করেনি। ওর মনে পড়ল কাল যখন ভোরভোর বাড়ি ফিরে বাইরের ঘরের চওড়া তক্তপোশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শোয় তখনও ওদের মস্ত গোলাপবাগানে বেড়াল কাঁদছিল। কিন্তু এতোই ঘুম পেয়েছিল যে মনোযোগী হবার আগেই ঘুমে এলিয়ে পড়েছিল ও।

মানুষ জন্মালেই যে মরে এ কথাটা জানত ঋভু, কিন্তু মৃত্যু ব্যাপারটা সম্বন্ধে তেমন কোনো বোধ ছিল না। বুলবুলির মৃত্যু তাকে মৃত্যু সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন যেমন করে গেলো; জীবনের প্রকৃত স্বরূপ। জীবন ও মৃত্যুর পরস্পরবিরোধী বিপরীতমুখী ধর্ম সম্বন্ধেও ওকে এই প্রথম সজাগ করে গেল। জীবন যে একটাই এবং এই জীবনটার প্রতিটি ক্ষণই যে পরম তীব্রতার সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে, আশ্লেষের সঙ্গে, উষ্ণতার সঙ্গে বাঁচা উচিত এ কথাটা বুলবুলি হঠাৎ চলে গিয়েই ঋভুকে শিখিয়ে দিয়ে গেল।

জলে স্নান সেরে, শংকামারী থেকে ওরা যখন ফেরার পথ ধরল তখন বেলা পড়ে গেছে। শংকরীপিসি চিতা জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতে গাইতে পথের ধুলোতে আঁচল লুটোতে-লুটোতে একা একাই ফিরে গেছিল। এখন বেলা পড়ে এসেছে। পশ্চিমাকাশে শরতের নরম আলো মাখামাখি হয়ে আছে। কাশের দুধসাদা স্তবকে সেই রঙ প্রতিফলিত হয়ে তাদের নানা রঙে ভরিয়ে দিচ্ছে। পাখি ডাকছে নানারকম। চিনুকাকু, ছানকাকু, বিবাগীকাকুর সঙ্গে ঋভু পথ চলছে।

বিশুমাতাল মাঝে-মাঝেই একটি গানের দুটি কলি গেয়ে উঠছেন। কার গান জানে না, ঋভু, কিন্তু তাঁর গলা সুরে ভরপুর।

"এসেছিলি এই ধরাতে অনেক আশা নিয়ে,
কোনো আশাই মিটল না তোর চলে গেলি টিয়ে।"

কেউই কোনো কথা বলছে না। ছায়ার দীর্ঘ হয়েছে। পাটকিলে-রঙা ধুলো ভরা পথে পথ চলতে চলতে বিশু মাতালের সেই গানের অনুরণন শুনতে পাচ্ছে ঋভু দু পাশের গাছপালার মধ্যে। শংকরীপিসির গলায় সুর নেই, কিন্তু ভাব আছে। বিশু মাতালের গলা একেবারে সুরে বাঁধা। দু-কান রিনরিন করে ওঠে। এবং ভাবেও ভরপুর।

গত রাতে দু চোখের পাতা এক করেনি। সকালেও একটুও শুতে পারার প্রশ্নই ওঠেনি। দুচোখ একেবারে বুজে আসছে।

বুলবুলি ছাই হয়ে যাবার পর মাটির কলসি করে জল এনে এনে সেই চিতাকে শান্ত করা হলো। আগুন যাতে একটুও আর না থাকে, তাই জল ঢালা। প্রত্যেকে একবার করে জল ঢালল। একে নাকি চিতাশান্তি করা বলে। তারপর হাঁদু সেই হাঁড়িটাকে পাথর মেরে ফাটিয়ে দিতেই সবাই পেছনে ফিরল।

হাঁদু বলল, এই ঋভু, পেছনে চাইবি না।

বুলবুলি যেন ঋভুর দিকেই চেয়েছিল। ওই শকুন-ভরা উদোম উদলা শ্মশান আসন্ন রাতের ঠিক আগে ওকে একা ফেলে চলে আসাতে ওর নিশ্চয়ই ভয় করছিল। পাছে পিছন ফিরে তাকালে সে আসতে চায় ওদের কারো সঙ্গেই, তাই বোধহয় পেছনে ফিরতে মানা করল হাঁদু।

ছানুকাকু বলছিল যে, রাতের বেলা শ্মশানে এলে বাচ্চা ছেলের কান্না শোনা যায়। আসলে শকুনের বাচ্চা কাঁদে অবিকল মানুষের বাচ্চার মতো। সে কথা শুনে ঋভুর গা শিরশির করে উঠল। গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল।

মানুষেরা মরে কোথায় যায়? প্রায় স্বগতোক্তির মতোই বললে ঋভু, বাক্যটি।

বিশু মাতাল বললেন, মানুষের শরীরটাই ছাই হয়ে যায় কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। গীতার শ্লোক পড়িসনি কি? বিবাগীকাকু বললেন, তোকে আমি শোনাব রে ঋভু। বিশু মাতাল বললেন, মৃতদেহ কবর দেবার সময় ক্রিশ্চানরা কি বলে জানিস? বলে,

"We therefore commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust in sure eternal hope of resurrection to eternal life."

মানে বুঝলি?

হ্যাঁ।

ঋভু বলল।

বিবাগীকাকু বললেন, মুসলমানেরা কি বলে জানিস? আশ্চর্য! প্রায় একই কথা। জিশুখ্রিস্টের জন্মও তো মুসলমানদেরই দেশে। তাই বোধ হয় এমন মিল।

বিশু মাতাল বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে গাঁজা-মোড়া সিগারেটটি ধরে একটান দিয়ে বিবাগীকাকাকে বললেন, কী বলে, বল তো বিবাগী? বলেই বললেন—

ওঁরা বলেন,

"মীনহ্ খালেক নকুম,
ওফিদা নায়িদোকুম
বহ নোখরে জুখুম তাহরতন্ উখরা"

মানে কি?

মানে হল, তোমাকে এই মাটি থেকেই পয়দা করা হয়েছিল, এই মাটিতেই তোমাকে সঁপে দিলাম। সেই আখ্‌রতের বিচারের সময়ে এই মাটি থেকেই তোমাকে তোলা হবে।

আরো আছে ...

বাঃ।

ঋভু স্বগতোক্তি করল।

বাঃ কেন?

বিশু মাতাল শুধোল।

মানে কবর দিলে তাও স্মৃতি থাকে, গাছের নীচে শুয়ে থাকে প্রিয়জন, দিনে ফুল, ধূপকাঠি, রাতে প্রদীপ দিয়ে তাকে মনে করা যায়। আর বুলবুলি তো ছাই হয়ে গেল। কী রইল মনে করার?

বিশু মাতাল বললেন, বলিস কি রে ছোঁড়া? রবিবাবুর কবিতা পড়িসনি?

"সবকিছুরই একটা কোথাও করতে হয়রে শেষ
গান থামিলে তাইতো কানে থাকে গানের রেশ
জীবন অস্তে যায় চলি তার রঙটি থাকে লেগে
প্রিয়জনের মনের কোণে শরৎসন্ধ্যা মেঘে।"

কল্পনাতে থাকা, স্মৃতিতে থাকাও থাকা। যার মস্তিষ্কই নেই, কল্পনাই নেই সে গোরস্থান দিয়ে কি করবে?

পুজো শেষ হয়ে গেলো। বুলবুলির সঙ্গে মাদুর্গাকেও ভাসান দেওয়া হলো। লক্ষ্মীপুজোর পরদিনই ঋভুরা কলকাতায় ফিরে গেল। এবারের আসাটার স্মৃতি বড়ো বেদনাময় হয়ে থাকল ঋভুর মনে।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে—রংপুরের সব মানুষই ভীষণ চিন্তাক্লিষ্ট। কী হবে, কী হবে একটা ভাব। ছিন্নমূল হতে কারই বা ভালো লাগে! এ তো শুধু শারীরিক ভাবে অন্য কোথাও যাওয়ার ব্যাপারই নয়! নিজের নিজের রুচি, সংস্কৃতি, অভ্যেস, পরিবেশ, স্মৃতি সব কিছুকে গোড়াশুদ্ধ উপড়ে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়াটা বড়ো সোজা কাজ নয়। নিজেদের আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক অতীতটাকেই পুরোপরি মুছে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করার চেষ্টা করতে হবে। এই ভাবনাটার মধ্যেই বড়ো গভীর এক বিষণ্ণতা ছিল।

ট্রেনের কামরায় জানলার ধারে বসে ঋভুর লক্ষ্মী-পূর্ণিমার শিশিরভেজা রাতের কথা মনে পড়ছিল। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়া হচ্ছে, শাঁখের আওয়াজ দই-খই—কদমা-বাতাসার গন্ধ, রাতের ভুনি-খিচুড়ির সঙ্গে নানারকম নিরামিষ ভাজাভুজি।

একটা লক্ষ্মীপেঁচা এসে বসেছিল, গতরাতে, ঋভুদের বাড়ির বড়োঘরের ছাদে লক্ষ্মীপুজো চলার

সময়ে। ঠাকুমা খুব খুশি হয়েছিলেন। যে-লক্ষ্মীপেঁচা বসেই উড়ে যাওয়ায় অনেকদিন আগে মর্মাহত হয়েছিলেন বুলবুলির ঠাকুমা। ঋভু ভাবছিল কী করছেন এখন বুলবুলির ঠাকুমা। কী করে চলছে তাঁর? একা ঘরে, সহায়-সম্বলহীন, অর্থহীন, চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধার? বুলবুলির ঠাকুমার কি হবে? এই সংসারে বুলবুলির ঠাকুমার মতো কত মানুষই যে আছে আমাদের জানোশোনারই মধ্যে। দরজায় চাপা-পড়া টিকটিকি যেমন দেওয়ালের গায়ে একটু একটু করে শুকিয়ে মরে গিয়ে একদিন থপ শব্দ করে দেওয়াল থেকে খসে যায়, বুলবুলির ঠাকুমার মৃত্যুও তেমনি হবে। অথচ একটি টিকটিকি দেওয়াল থেকে পড়লেও যতটুকু শব্দ হয় ততটুকু শব্দও হবে না।

তাপসী, প্রমীলাবালা, বিবাগীকাকুরা কি ওই একটা মানুষের বাকি জীবনের দায়িত্ব নিতে পারতেন না? নিতে তো পারতেন অগণ্য মানুষই। কিন্তু নিল না তো কেউই। এই সমাজ বড়ো নিষ্ঠুর। ভাবছিল ঋভু। চোখ ছলছল করছিল তার।

মমতাজের সঙ্গে কি আবারও দেখা হবে ঋভুর এই জন্মে? পুটুদের, বুদুসদের, চিনুকাকু-রাঙাপিসিদের; গিরিনকাকুদেরই সঙ্গেই বা কি হবে? বিবাগীকাকুর? এঁরা কি পারবেন রংপুরের মায়া ছেড়ে, সাদামাঠা, কিন্তু পরম শান্তির জীবন ছেড়ে অজানা গন্তব্যে চলে যেতে?

খুলনা পর্যন্ত ওরা ট্রেনেই এল।

শেয়ালদা থেকে ট্রেন ছেড়েছিল। বনগাঁ হয়ে, সারারাত চলে কাল সকাল বেলা যশোর হয়ে বেলা আটটা-ন'টা নাগাদ খুলনা স্টেশনে এসে ট্রেনে দাঁড়াল।

ট্রেনের নাম মনে নেই ঋভুর। তবে বরিশাল এক্সপ্রেস টেক্সপ্রেস এ রকম কোনো নাম ছিল বোধহয়।

তাপসী বললেন, যশোরের কি কি জিনিস বিখ্যাত তা জানিস?

কি কি?

যশুরে কই আর মুসুরির ডাল।

তাই?

হ্যাঁ।

অরা সকালে ঘুম থেকে উঠে ফিটফাট হয়ে জানলার পাশে বসেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের সেকেন্ড ক্লাস কামরা। কত বড়ো বড়ো যে ছিল কামরাগুলো। তাতে কী সুন্দর হ্যাট-স্ট্যান্ড, ঝকঝকে আয়না আর কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, তা বলার নয়। বাথরুমগুলি ছিলো দেখার মতো। প্রত্যেক বড়ো স্টেশনে উর্দিপরা তামার তকমা-আঁটা ঝাড়ুদারেরা এসে কামরা পরিষ্কার করে যেত। ট্রেন এগজামিনারের লোকেরা টং-টং করে হাতুড়ি মেরে মেরে চাকা পরীক্ষা করত। প্লাটফর্মগুলি ছিল ঝকঝকে তকতকে। তখন কেলনার কোম্পানি ছিল ইস্টার্ন রেলের "কেটারার"। তাদের সাদা উর্দিপরা বেয়ারারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা পোর্সেলিনের কাপ-ডিশে, প্লেটে যেখানে কাঁটা চামচের দরকার, কাঁটা চামচে, যেমন ভালো খাবার দিত তা আজকাল ভাবা পর্যন্ত যায় না।

দেশ স্বাধীন হবার পরে প্রথমের দিকে বল্লভ দাস ছিল "কেটারার"। তারাও ভালো ছিল। কারণ তখনও ভারতবর্ষ সর্বক্ষেত্রে অনিয়মানুবর্তিতা, এবং শাসকদের আর রাজনৈতিক নেতাদের গন্ডারের চামড়াজনিত চক্ষুলজ্জাহীনতার এমন লজ্জাকর উদাহরণ হয়ে ওঠেনি। তখনও ইংরেজদের গুণের কিছু কিছু প্রভাব বয়ে গেছিল ঋভুর দেশবাসীদের মধ্যে। এমন নৈরাজ্য গ্রাস করেনি সবকিছুকে। দেশ-চালন, দেশের প্রতিপালন এমন নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠেনি। জনসংখ্যাও এমন করে হাঙরের মতো খেয়ে ফেলেনি যাবতীয় সৌন্দর্যবোধ, শালীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য, ভদ্র-সভ্যভাবে মানুষের মতো বেঁচে থাকার সুস্থ সাধকে।

পিছন ফিরে তাকিয়ে আজ সেই দিনকে দেখে তখন দেশের আজকের চক্ষুলজ্জাহীন, নিজস্বার্থ পরায়ণ, বড়ো বড়ো মিথ্যে বুলি-আওড়ানো, ট্যাক্স না-দেওয়া ভণ্ড গণ্ডারের মতো, নেতা দেখে দেখে মনে সন্দেহ জাগে যে, ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়ানো সেজকাকুর বোধহয় আদৌ উচিত হয়নি। স্বাধীনতা পাবার আগে স্বাধীনতা নিয়ে কী করা উচিত সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা না-তৈরি হলে কুমারী মায়ের গর্ভজাত সন্তানের মতোই স্বাধীনতা বড়োই অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার মর্যাদা দেওয়ার যোগ্যতা যে জাতের নেই, স্বাধীনতার বীজকে ফুল-ফলন্ত করে তোলার মতো যত্ন ও আন্তরিকতা যাদের একটুও নেই; তাদের পক্ষে বোধহয় পরাধীন হয়ে থাকাই ভালো ছিল।

ইংরেজদের দোষ ছিল অনেকই। কিন্তু গুণও কিছু কম ছিল না। তাদের দোষগুলি স্বাধীনতার পরে, ঋভুরা, এই হতভাগ্য স্বাধীন দেশের নাগরিকেরা নিঃশেষে নিয়ে নিয়েছিল কিন্তু গুণগুলির প্রায় সবটুকুই সযত্নে বর্জন করেছিল। সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব তাঁর "দেশে বিদেশে" বইয়ে "স্বাধীন" আফগানিস্থানের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছিলেন। কাবুল শহরে ঘোড়ার গাড়িকে পথচারীদের সাবধানে এড়িয়ে এঁকে বেঁকে পথ চলতে দেখে আলী সাহেব যখন সঙ্গীকে জিগ্যেস করেছিলেন, এ আবার কী প্রক্রিয়া?

তখন সঙ্গী তাঁকে বলেছিলেন, আমরা তো স্বাধীন!

আজকের ভারতবর্ষর স্বাধীনতার রকম দেখে সেদিনের স্বাধীন আফগানিস্থানের আজকের অবস্থারই মতো অবস্থা যে ভারতবর্ষরও হবে না এ কথা জোর করে বলতে পারে না আর।

'দ্য পিপল গেটস দ্যা গভর্নমেন্ট ইট ডিজার্ভস" এই প্রবাদ বাক্যর নগ্নতম উদাহরণ আজকের ভারতবর্ষ। এখানে মানুষের মতো বাঁচা আর আদৌ যাবে কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। নির্লজ্জ যে, তারও কিছু লজ্জাবোধ থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় নেতাদের শুভবোধ এবং লজ্জাবোধ আর একটুও অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না।

ইংরেজ আমলের রেলগাড়ির সেকেন্ড ক্লাস কামরার কথা ছেড়ে দিলেও "ইন্টার ক্লাস" কামরাগুলিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। থার্ড ক্লাস কামরাতে আরাম কম ছিল বটে তবে ন্যূনতম পরিচ্ছন্নতার ব্যত্যয় ছিল না। "লেডিজ কম্পার্টমেন্টে" মেয়েরা আরামে এবং নিরাপদে যেতে পারতেন। কিছু কামরা ছিল "মিলিটারি" এবং "ইউরোপিয়নদের' জন্যে। তখন ইউরোপিয়ানদের জন্যে আলাদা কামরা দেখে রাগে ঋভুদের গা জ্বলত যদিও কিন্তু আজকে স্পষ্টই বুঝতে পারে যে, স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির বাবদে ইউরোপিয়ানদের থেকে স্বদেশী নারী পুরুষের অনেকই শেখার ছিল এবং সে কারণেই তাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকাটা আদৌ বিভেদমূলক ছিল না।

আজকের ভারতবর্ষের বড়লোক গরিব নির্বিশেষে সবাই যে কী চরিত্রর মালিক হয়েছেন তা পাঁচ মিনিটের ট্রাফিক-পুলিশহীন পথের মোড় অথবা ট্রেনের যে-কোনো শ্রেণির বাথরুম দেখলেই বোঝা যায়। বেশি দূরে তাকাবার প্রয়োজন নেই।

গায়ের রঙ ছাড়াও মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য অনেক রকমেরই হতে পারে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বোধ, সহবৎ, শিষ্টতা, ভদ্রতা ও সবের ভিত্তিতেও মানুষ বিভিন্ন শ্রেণির অবশ্যই হতে পারে। ঋভুরা যে অপরিষ্কার, অনিয়মানুবর্তী, অসভ্য, অভব্য, অশিষ্ট অসহিষ্ণু এ কথা আজ আর অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই।

অনেক কষ্টে—পাওয়া স্বাধীনতাকে যে-পর্যায়ে ঋভু এবং তার দেশবাসীরা নামিয়ে এনেছে, সেই প্রেক্ষিতে আজ ইংরেজদের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। টাই-কোট পরাটাই শিখেছিল ঋভুরা, কমোড

ব্যবহার করা; মদ খাওয়া, ইংরিজি বলতে-লিখতেও, কিন্তু ইংরেজদের চরিত্রের কোনো গুণের ছিঁটেফোঁটাও গ্রহণ করার যোগ্যতা অথবা মানসিকতা তাদের হয়নি।

তখনকার দিনের রেলগাড়ির ফার্স্ট ক্লাসে রাজা-মহারাজা, অত্যন্ত বিত্তবান অথবা উচ্চপদস্থ ভারতীয় অথবা ইংরেজরা ছাড়া কেউই চড়তেন না। ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াত করাটা এক ধরনের বিলাসিতা বলেই গণ্য হতো। স্ট্যাটাস সিম্বলও।

তখনকার দিনের সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্যেও কামরার লাগোয়া ছোটো কামরা থাকত "খিদমদগারদের" জন্যে। "সার্ভেন্টস কম্পার্টমেন্ট"। আর ফার্স্ট ক্লাসের তো কথাই ছিল না।

আজকে বিষাদগ্রস্ত ঋভুর মনে হয় যে, সোসালিজমের নানা ধরন আছে। একটি প্রান্তরে যদি কিছু বড়ো গাছ এবং প্রচুর ছোটো ঝোপঝাড় থাকে এবং সোসালিজম যদি ভঙ্গী বা ভানমাত্র না হয় তবে দীর্ঘদিনের যত্নে ও চেষ্টায় ছোটোগাছ এবং ঝোপঝাড়গুলিকেও বড়ো গাছেদেরই মতো উঁচু ও স্পষ্ট করে তুলতে পারত ঋভুরা, যদি ঐকান্তিকতার সঙ্গে সততার সঙ্গে এবং দূরদৃষ্টির সঙ্গে সেই চেষ্টা করত। তা না করে, শুয়োরের মতো, গিনিপিগির মতো, নির্বিচারে মানুষের বংশবৃদ্ধি করতে দিয়ে সমস্ত প্রান্তরকেই অশেষ-অযত্ন ও অবহেলায় হেলাফেলা করে, ভোটের সংখ্যা যেনতেনপ্রকারে বাড়িয়ে এবং সেই ভোট যেনতেনপ্রকারে পাওয়ার বন্দোবস্ত পাকা করে বড়োছোটো প্রায় সব গাছকেই অপুষ্টি, সেচহীনতা, সারহীনতা এবং নিড়ানির অভাবে লিলিপুটের দেশের গাছেরই মতো করে তুলেছে তারা। এই দগ্ধ, হতশ্রী, রুক্ষ-প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে মাথা উঁচিয়ে জেগে আছে কিছু বিকট দর্শন, অন্যের রসশোষণকারী মহীরুহ, যাদের ওতপ্রোত নিয়মিত এবং গোপন সাহায্য এই মহান ভারতীয় গণতন্ত্রের নাট্যমঞ্চের অভিনেতাদের প্রতিনিয়তই প্রয়োজন।

যদি এই অবস্থাতে কোনোদিনও পরিবর্তন আসে তবে ঋভুর মতো খুশি আর কেউই হবে না।

খুলনা স্টেশনে ট্রেন এসে লাগতেই বিজয়কাকা এগিয়ে এলেন। পরনে জিন-এর শার্ট। এই জিন আজকের Jeans নয়। তখনকার দিনের প্রায় সব সরকারি কর্মচারী, মার্কেন্টাইল ফার্মের বড়বাবুরা, সবাই এই পোশাকই পরতেন। তবে সরকারি কর্মচারীদের পরনে থাকতো স্যুট, তার নীচে সাদা টুইল-এর শার্ট। মাথায় খাকি রঙা শোলার টুপি। বড়োবাবুরা ধুতির উপরে ওই কোট পরতেন।

বিজয়াকাকু ছিলেন খুলনা জেলায় হৃষীকেশের সমান পদাধিকারী। ফরসা মিষ্টি চেহারা। মিতভাষী। ওঁর পদবি ছিল সম্ভবত সরকার। বিজয় মিত্র নন। বিজয় মিত্র, হৃষীকেশের আরেক সহকর্মী; কলকাতাতেই ছিলেন। বিজয়কাকু, তাপসী, ঋভু ও অরাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে স্টিমারে তুলে দিলেন। স্টেশনের পাশেই স্টিমার ঘাট। স্টিমারের নাম "ফ্লোরিকান"। অন্য একটি স্টিমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার নাম "বাদা"।

ফ্লোরিকান একটি পাখির নাম। তখন জানতো না ঋভু। পরে জেনেছিল। প্রথমবার এই পাখি দেখে আসামের "কাজিরাঙ্গাতে"।

স্টিমারের দোতলায় একেবারে সামনের ডেকটি এবং সামনের অংশে ছিল ফার্স্ট ক্লাস। তার পেছনের অংশ এবং দু পাশের ডেকে ছিল সেকেন্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের জন্যে। দোতলার পেছনের অংশ সম্ভবত ছিল ইন্টার ক্লাসের জন্যে। আর একতলায় থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের জায়গা।

স্টিমারময় স্টিম-স্টিম গন্ধ। বাষ্পের গন্ধময় পুরো জলযান। দোতলার ডেকে রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে ঋভু চেয়েছিলো জেটির দিকে। লোকজন, মালপত্র, কুলিরা, স্টিমারবাবু সবাই গোগ্রাসে কবজি-ডুবিয়ে ভাত খাচ্ছেন। ইলিশমাছ বা চিতলমাছ দিয়ে।

পাশের স্টিমার ভোঁ দিয়ে উঠল। ঋভুর মনে হলো তাদের স্টিমারই বুঝি ছেড়ে গেল। পরে জেনেছিল যে, বাঙাল মাত্রই ওরকম হয়। ভোঁ শুনলেই মনে হয় যে, তার স্টিমারই বুঝি ছেড়ে যাচ্ছে।

সারাদিন রেলিঙয়ের পাশে চেয়ার নিয়ে স্টিমারে ডেকে বসে কী করে যে দিনটা কেটে গেল তা বোঝাই গেল না। এমন দৃশ্য এর আগে কখনও দেখেনি। নদীপথে নৌকো করে গেছে অনেক জায়গাতে কিন্তু স্টিমারে করে কোথাওই যায়নি।

স্টিমারের ডেক উঁচু বলে বাংলার গ্রামের, গ্রামের গাছপালা, গ্রামের জীবনের, নদীরও চর-চরিত্রর একেবারে মধ্যিখানে অবলীলায় সেঁধিয়ে যাওয়া যায়। কোথাও বা ছোটো ছোটো ছেলেরা জলের মধ্যে বর্ষার উচ্চিংড়ের মতো লাফালাফি করছে। কোথাও মেয়ে-বউয়েরা চান করছে। মেয়েদের চানের ঘাট আলাদা।

যেখানে ঘাট আলাদা নয়, সেখানে সময় আলাদা আলাদা, পুরুষ ও মেয়েদের চানের জন্যে। কোথাও বা ঘনসবুজ চাপ-চাপ ঘাসে-ঢাকা প্রান্তর যেমন সবুজ, শুধু পূর্বভারতেই দেখা যায়।

নয়নাভিরাম।

উজ্জ্বল রোদে সাদাকালো মেটে-রঙা গৃহপালিত পায়রার ঝাঁক ঘুরে ঘুরে উড়ছে গ্রামের উজ্জ্বল লাল বা সবুজ বা কালো রঙকরা টিনের চালের উপরে। তাদের আঁটসাঁট ডানার পাখসাটে দুপুরবেলার উড়াল আলো উছলে উঠছে। চল্‌কে যাচ্ছে। কালো ও সাদারঙা ছাগল চরছে পাড়ে। মস্ত কুমির পোড়া কাঠের মতো নাকটি আর ড্যাবাড্যাবা চোখদুটি জলে জাগিয়ে রেখে সেই ছাগল ধরার জন্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ডাঙার দিকে। কোমরে কালো কারের ঘুন্‌সি বাঁধা ন্যাংটো ছেলে উঁচু ডাঙায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখে শীৎকারের সঙ্গে চিৎকার করছে। বলছে, "ও বাবা! ও জেঠা! মস্ত কুমিরে ছাগল লইয়া গেল গিয়া। পা চালাইয়া আস্‌সো।"

গ্রামের মধ্যে মধ্যে মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। মসজিদের মিনার। কোথাও আজানের শব্দ। কোথাও মন্দিরের ঘন্টা। বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনোদিনও সম্প্রীতির অভাব ছিল না। পশ্চিমের ও উত্তরের মানুষেরা তাদের ইতিহাস-সাক্ষী রাখা বহু শতাব্দীর বর্বরতার আর বহিরাগতদের আক্রমণের ফসল হিসাবে বিদ্বেষের বীজ এই নরম সবুজ ঘাসে ঘাসেও বপন করেছে। নইলে রূপসী বাংলা, গোলাভরা ধান আর পুজো আর মহবমের বাংলা একইরকম থাকত। আজকেও।

কোথাও আমবাগান। নিথর সবুজাভায়। নিমগ্ন দুপুরে চড়াই পাখিরা মুঠো-মুঠো ধুলোরই মতো আলো আর ছায়াকে নাড়িয়ে দিয়ে ওড়াওড়ি করছে। ঘুঘু ডাকছে শান্তির দূতীর মতো; যেমন করে চিরদিন বাংলার বুকের কোরকে তারা ডেকেছে।

দুপুরবেলা স্টিমারের বাবুর্চিদের রাঁধা মুরগির ঝোল, ভাত, মুসুরির ডাল, আলুভাজা, রুই মাছ ভাজা ইত্যাদি দিয়ে খাওয়া হয়েছিল। আহা! কী স্বাদ।

তাপসী বলেছিলেন, বাংলার নৌকোর মাঝি আর স্টিমারের বাবুর্চিদের রান্নার হাতের কোনো তুলনা নেই, এ কথা শুনেছেন তিনি অনেকেরই মুখে।

এখন বিকেল হয়ে আসছে। এই বিকেলের সঙ্গে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ভাড়াবাড়ির একতলার জানালা দিয়ে দেখা, ভো-কাট্টা হওয়া পেটকাট্টি ঘুড়ির প্রসাধনে প্রসাধিত চিকন নিমগাছটার সবুজ পাতার আড়ালে-আড়ালে দেখা আসন্ন বিকেলে কোনোরকম মিলই নেই। সিমেন্ট-কংক্রিটের বাড়িঘরের ফাঁকে-ফাঁকে, সে বিকেল, চিলতে-বিকেল। আর স্টিমারের ডেকে বসে নদীর উপরে, নদীর দুইপারের যে বিকেলকে দেখা যায় তা আদিগন্ত বিকেল। তার আভাস অন্তরের অন্তস্তলেও এসে পৌঁছোয়। সেঁধিয়ে যায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পরিযায়ী পাখির ঝাঁকের ডানায় শনশন শব্দ ওঠে। পেলব, কোমল, দুধলি, গেরুয়া, পাটকিলে অথবা মেটে কী কালো রঙা। বালির চর ছেড়ে তারা অন্য চরের দিকে উড়ে

যায় সূর্যমুখী হয়ে। জলের উপরে নানা রঙের ছায়া পড়ে। সেইসব রঙ পৃথিবীর কোনো শিল্পীর প্যালেটেই কখনও গোলা হয়নি। হবেও না। সে সব রঙ যাঁদের চোখ দিয়েছেন ঈশ্বর বা আল্লা তাঁদেরই দেখার জন্য। শুধুমাত্র তাঁদেরই জন্যে, আর মস্তিষ্কের ডার্করুমে রেখে পরে যখন খুশি তা ডেভোলাপ করার জন্যে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে। আঁশটে গন্ধ উড়ছে হাওয়ায়। স্টিমারের গায়ের গন্ধর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সেই গন্ধ। জলের সাদা স্লেটের উপর বিচিত্র সব নাম-না-জানা রঙের ছবি মুছে গিয়ে এখন গাঢ়তর কালোর ছায়া পড়তে শুরু করেছে। ভোরের আলোর যেমন বিভিন্ন স্তর থাকে সন্ধের আলোরও থাকে। সন্ধে যে কী করে আসে, তার মোহন পায়ের নিঃশব্দ শব্দ সম্বন্ধেও খুব কম সময়ে সচেতন থাকি আমরা।

প্রায়ান্ধকার তীরের দিকে চেয়েছিল ঋভু। তাপসী কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, রবীন্দ্রনাথ পদ্মা নদীতে বোটের উপর থাকতেন। শিলাইদহতে জমিদারি ছিল তো। পদ্মার যে কতরকম বর্ণনাই আছে রবীন্দ্রনাথের লেখাতে। তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা, রবীন্দ্রনাথের ভিতরের অধ্যাত্মবোধকে জাগরূক করেছে, চারিয়ে দিয়েছে নদী, চর। এই প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য।

এ নদী তো পদ্মা নয়।

না, এ নদী পদ্মা নয়।

অধ্যাত্মবোধ কি মা?

অরা শুধিয়েছিল।

সে অনেক বড়ো ব্যাপার মা। আবার ব্যাপ্ত ব্যাপারও। এ বয়সে তোমার তা বোঝার সময় আসেনি। ঋভুরও নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের সেই একটি গান আছে না? বড়ো ভাল গান। সেই গানটা যদি ভালোবাসো তোমরা তবে সময়মতো অধ্যাত্মবোধও আসবে তোমাদের মধ্যে।

কী গান মা?

"ওদের কথায় ধাঁধা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি
তোমার আকাশ তোমার বাতাস।
এইতো সবই সোজাসুজি"। এ গানতো আমার কাছে শুনেছ অনেকবাব।

অরা ও ঋভু চুপ করে ছিল।

তাপসী বললেন, একজন কবি ভারি ভালো লিখছেন। তাঁর নাম এখনও অনেকেই জানেন না। তবে একটি সময় আসবে যখন এমন একজনও শিক্ষিত বাঙালি থাকবেন না দেশে যিনি সেই কবির কবিতা না পড়বেন।

তুমি কোথায় পড়েছ মা?

পড়েছি রে। পড়েছি। দেশপ্রিয় পার্কের লাইব্রেরি থেকে বই যে এনে দিস তাতো তুই-ই এনে দিস।

তা, আমি তো পড়ি না। তুমিই তো পড়তে মানা করেছ। বলেছ, বড়োদের বই।

তাপসী হাসলেন। বললেন, তাই?

তারপর বললেন, ঠিক আছে। এবার থেকে যে সব বই তুই পড়তে পারিস সে সব তোকে পড়তে দেব। তবে বই পড়ে কেউ কখনও খারাপ হয়ে গেছে এ কথা আমার জানা নেই। এবার থেকে তুই সব বই-ই পড়তে পারিস।

বাঃ।

ভীষণ খুশির গলায় বলল ঋভু।

অরা শুধোল, সেই কবির নাম কি মা?

জীবনানন্দ দাশ।

ওঁর কোনো কবিতা কি মনে আছে তোমার?

অনেক কবিতাই আছে। প্রথমে তোদের বড়োমামা ওঁর কবিতার কথা আমাকে বলেছিলেন। বলেছিলেন, পড়ে দেখিস বুবু।

একটি কবিতা বলো না মা!

ঋভু বলল।

তাপসী বলল।

তাপসী ওঁর সুন্দর সুললিত গায়িকাসুলভ গলায় আবৃত্তি করলেন। নদীর বুক থেকে উঠে-আসা উথালপাথাল হাওয়া শব্দগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল ক্রমাগত।

তাপসী তাঁর মুখের কোণ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন : "তোমার যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে/রয়ে যাব; দেখিব কাঁটালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে; দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে/ ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে/নেচে চলে—একবার—দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে; দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ সাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে/শঙ্খের মতো কাঁদে; সন্ধ্যায় দাঁড়ালে সে পুকুরের ধারে।"

"খইরাঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনীর দেশে—/'পরাণ কথার' গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,/ কলমীদামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই পুকুরের নীড়ে/নীরবে পা ধোয় জলে একবার—তারপর দূরে নিরুদ্দেশে/চলে যায় কুয়াশায়, তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে/ হারাব না তারে আমি—সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে/বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে/চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েলপাখি—চারদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ জাম-বট-কাঁঠালের হিজলের-অশথের করে আছে চুপ;"....

শুনতে শুনতে মোহাবিষ্ট হয়ে গেছিল ঋভু। একে এই নদীর উপরের সন্ধে তায় এই কবিতা আর ....

আরো অনেকই বড়ো। এই কবিতা আবহমান বাংলার বহমান প্রশস্তি। আজ এইটুকুই থাক।

কবিতাটির নাম কি মা?

অরা শুধোল।

'রূপসী বাংলা'। এই বই তিনি উৎসর্গ করেছেন : "আবহমান বাংলা, বাঙালির" প্রতি।

বাঃ।

ঋভু বলল।

কেন জানে না, ঋভুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তাপসী বললেন, এই বইটি নিয়ে আসিস লাইব্রেরি থেকে। আর রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়।'

"চার অধ্যায়" কী নিয়ে লেখা?

আগে পড়ে ফ্যাল, তারপরে আলোচনা করব।

নায়কের নাম অন্তু আর নায়িকার এলা। চার অধ্যায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এই স্টিমারে চড়ার পর থেকেই। আমিও তো তাদেরই মতো চড়িনি কখনও স্টিমারে এর আগে। বিহারে মানুষ। জল দেখলেই আমার ভয় করে। তবে স্টিমারে চড়ে ভারি ভালো লাগছে। ফার্স্ট ক্লাস কী সেকেন্ড ক্লাসে চড়লে বেশ মজা।

'চার অধ্যায়'-এর কথা মনে পড়ল কেন?

মনে পড়ল এই ভেবে যে, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই স্টিমারের ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে অনেক জায়গাতেই গেছেন। খবরের কাগজ ফার্স্ট ক্লাসের ডেকের উপরে হই হই করা হাওয়াতে ফরফরাচ্ছে। আর বলছে এলাকে :

> "প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
> সেদিন চৈত্রমাস
> তোমার চোখে দেখেছিলেম
> আমার সর্বনাশ।"

সর্বনাশ কেন মা? চৈত্রমাসের সঙ্গে মিল দেওয়ার জন্যে লিখেছিলেন?

তাপসী হেসে উঠলেন।

বললেন, না, ঠিক তা নয়। নানারকমের সর্বনাশ হয়। বড়ো হলে নিজেই বুঝতে পাবে।

রাতে ইংরেজি খানা ছিল। স্যুপ, ফিশবেক, চিকেন মেয়োনিজ, আর পুডিং। তারপর কফিও ছিল।

কফি ঋভুরা কেউই খেল না। ঘুম যখন ভাঙল তখন খুব জোর শোরগোল কানে এল ঋভুর। শোরগোলেই ঘুম ভাঙল, না, ঘুম ভাঙার পরই শোরগোল শুনল তা বুঝল না।

কেবিনের মধ্যেই বাথরুম, বেসিন। মুখ চোখ ধুয়ে ডেকে আসতেই দেখে স্টিমারের গতি কমে গেছে। পারের কাছে চলে এসেছে স্টিমার। সামনেই একটি গঞ্জ মতো জায়গা। দোকান বাজার। তায়, শ' খানেক ছোটো বড়ো নৌকো ঘাটের পাশে বাঁধা আছে। তার মধ্যে বড়ো বড়ো মহাজনী নৌকো থেকে ছোটো ছোটো ডিঙি নৌকোও আছে। লম্বা ছিপছিপে দু'টি নৌকো দেখল ঋভু।

তাপসীকে শুধোল, এগুলো কী নৌকো মা?

তাপসী বললেন, ঠিক জানি না। সম্ভবত এগুলোকেই 'ছিপ' নৌকো বলে। খুব তাড়াতাড়ি চলে এগুলো। একসঙ্গে অনেকজন দাঁড়ি বসতে পারে। এই নৌকো করে ডাকাতেরাও জলে ডাকাতি করে।

কী করে ডাকাতি করে?

ও বাবাঃ, সে কত্তরকম করে করে। সব কি আমিই জানি!

জায়গার নাম 'ঝালকাঠি'।

স্টিমারটা স্টেশন-ঘাটার সমান্তরালে এসে দাঁড়াল। তারপর অদ্ভুত কায়দাতে পাশে সরে এল। এসে ঘাটার জেটির সঙ্গে প্রায় ঘেঁষে গেল। মস্ত লোহার চেনের সঙ্গে বাঁধা লোহার তৈরি প্রকাণ্ড নোঙর নামল ঘড়ঘড় শব্দ করে। নোঙর নামলে, সিঁড়ি নামল। তারপর যাত্রীরা নামতে লাগলেন। কোনো কোনো যাত্রী মালপত্রসমেত নামতে-থাকা যাত্রীদের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করে উঠতে লাগলেন।

অরা বলল, কাঠি আবার ঝাল হয় নাকি?

ঋভু হাসল। বলল, যা বলেছিস।

অনেক যাত্রী ডাঙায় নেমে চলে গেলেন হেঁটে, বাড়ির কাজের লোক বা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে। আত্মীয়-স্বজনেরাও এসেছিলেন অনেককে নিতে। কেউ বা নেমে ঘাটে-বাঁধা কোনো ভাড়া-নৌকোতে চড়লেন জলে জলে নিজের গ্রামে পৌঁছোবেন বলে। কারো জন্যে বা বাড়ি থেকে নৌকো নিয়ে এসেছে মাঝি। শহরে যেমন প্রাইভেট গাড়ি, এদিকে তেমনই প্রাইভেট নৌকো। বড়োলোক গরিবলোক সকলেরই নৌকো আছে এখানে। নৌকো ছাড়া বাঁচাই মুশকিল।

যাত্রী ওঠা-নামা শেষ হলে মাল খালাস হলো। কিছু মাল উঠলেও আবার। তারপর ভোঁ-বাজিয়ে স্টিমারটা নোঙর তুলে আবার পাশে সরে এল কিছুটা। তারপরে সোজা চলল বরিশালের দিকে।

ঋভু পেছনে চেয়ে দেখল যে, স্টিমারের মস্ত মস্ত কাঠের চাকার ঘর্ষণে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ উঠছিল জলে তা বেঁধে রাখা নৌকাগুলোর তলপেটে গিয়ে ঢুঁ মারতেই ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হতে লাগল। ছোটো নৌকোগুলো দুলতে লাগল মোচার খোলার মতো।

ঋভু, তাপসীর অনুমতি নিয়ে একতলার ডেকে নেমে এল।

এক জায়গাতে কী যেন হচ্ছে। শতরঞ্চি বিছিয়ে বসে ট্রাংক, কী পাকানো বিছানাকে বালিশ করে ঘুমোচ্ছে অনেক মানুষ। যেখানে ভিড়, সেখানে উঁকি মেরে দেখল দুজন ধুতি পাঞ্জাবি পরা মানুষ খুব মনোযোগ দিয়ে তাস খেলছেন।

দুজনের পেছনেই অনেক সমর্থক; পৃষ্ঠপোষক। বাজি ধরে খেলা হচ্ছে বোধহয়।

ঋভু যখন দুজন মানুষের পায়ের মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে কাছ থেকে দেখল তখন বুঝল, খেলা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। একজন তাস ছেড়ে পাশে-রাখা হুঁকো তুলে নিয়ে বেদম টান লাগালেন একটা। অন্যজন তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে কাঁচি সিগারেট ধরে লম্বা টান লাগালেন। তাঁর কোলের উপর লালরঙা-কাঁচি আঁকা সিগারেটের প্যাকেট ছিল।

বোঝা গেলো, দুজনের মধ্যে দান চালাচালি নিয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। হুঁকো খেতে খেতে হুঁকো-খাওয়া ভদ্রলোক হঠাৎই শুয়ে পড়লেন।

দুপক্ষের সমর্থকেরাই হট্টগোল করছিলেন।

হুঁকো-হাতে নিয়ে উনি বললেন, কাঁচি-সিগারেট খাওয়া ভদ্রলোককে, মশাইয়ের নিবাস?

নিবাস?

হ্যাঁ। নাম আর নিবাস?

আমি হল্যাম গিয়া দি ইন্দ্রপতন ঘোষ অব দি পসরা গ্রাম অফ ফরিদপুর জিলা অব বিঙ্গল। আর আপনের? আপনের পরিচয়টা?

বরিশালের লোকেরা হার মানা মোটেই পছন্দ করেন না জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই। প্রচণ্ড জেদি, পরিশ্রমী এবং একগুঁয়ে হন তাঁরা। এবং অনেক সফল এবং কৃতী বাঙালির বাড়িই বরিশাল।

কাঁচি-সিগারেট খাওয়া ভদ্রলোক হঠাৎ বিকট এক অট্টহাসি হেসে উঠলেন, যাত্রাদলের খলচরিত্রের মতো।

তারপর বললেন, নিবাস? নাম? হাঃ। গবর্নরের গাড়িতে কি নম্বর থাকে? হাঃ হাঃ। শুইন্যা লও। তুমার দুডি কান খুইল্যা। বোঝলা মণি! আই অ্যাম দি, দি, দি, হবা সেন অফ ফাহিলাড়া ভিলেজ অফ বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট অফ বিঙ্গল। হবা সেন। টাইগার অ্যান্ড কাউ ড্রিঙ্ক ওয়াটার ফ্রম সেম ঘাট। হাঃ। হাঃ!

ঋভুর খুব হাসি পেল বলে সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল। এমনটি কোথাও শোনেনি আগে। পড়েওনি। শুধুমাত্র একটি THE এর মালিক ইন্দ্রপতন ঘোষকে "THE, THE, THE (ত্রিগুণান্বিত) হবা স্যান অফ ফাহিলারা" যে সহজেই হারিয়ে দিলেন তাতে সমবেত জনমণ্ডলীর তিলেকমাত্র সন্দেহ রইল না।

ঠিক কটায় বরিশালের স্টিমার ঘাটে স্টিমার গিয়ে ভিড়েছিল মনে নেই ঋভুর! কীর্তনখোলা নদীর পারে বরিশাল শহর। উদ্বেল জলে প্রতিসরিত এক আকাশ আলোর মধ্যে ঋভু স্টিমারের দোতলার ডেক থেকে দেখল যে, জেটিতে হৃষীকেশ দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রাউজার ও ফুলহাতা শার্ট পরে। মাথায় খাকি-রঙা শোলার টুপি।

তখনকার দিনে অসামরিক ও অ-পুলিশি সরকারি আমলারা প্রায় সকলেই ফুলহাতা শার্ট পরতেন এবং এরকম শোলার টুপি। খাকি-রঙা শোলার টুপি, সাদা কিংবা ছাই-রঙা কিংবা হালকা খয়েরি-রঙা বিলিতি জিন-এর স্যুট, সাদা টুইলের শার্ট, টুটাল-এর টাই এবং মোজা ও শু ছিলো তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাঝারি কর্মচারীদের তকমা, প্রায় পৃথিবীময়ই।

স্টিমারের গায়ে নিজস্ব সোঁদা সোঁদা গন্ধময় জগৎ ছেড়ে এসে দুটি ঘোড়ার গাড়িতে সকলে মিলে মালপত্র-সমেত চড়া হলো।

মালপত্রর জিম্মাদারি নিয়ে ঋভু একটি গাড়িতে উঠল। অন্য গাড়িতে বাবার সঙ্গে মা ও অরা। বাবার সঙ্গে আরও কেউ কেউ ছিলেন। আজ আর মনে নেই।

স্টিমার-ঘাটার দিকটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। জর্ডন কোয়ার্টারের, ছবির মতো, পর পর কয়েকখানা বাড়ি। উলটোদিকে বরিশাল জেলা স্কুল। কীর্তনখোলা নদী ঘুরে গেছে ওপাশ দিয়ে। শহরকে বেড় দিয়ে গেছে যেন!

গাড়ি আস্তে আস্তে ঢুকল শহরে। "ব্যারনের" শরবত-এর দোকান। সাইকেলে চড়ে, মুখে চোঙা লাগিয়ে একজন কালো, লম্বা-চওড়া মানুষ "ব্যারনের শরবত"-এর প্রশস্তি গেয়ে চলেছেন এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া। সিনেমার বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে সাইকেল-রিকশা থেকে। মাইকে একজন সমানে নতুন-আসা ছবির প্রশস্তি করে যাচ্ছেন আর সাইকেল-রিকশা চলেছে এ-পাড়া থেকে সে-পাড়ায়।

তামারহাটে হাটের দিনে হিন্দুস্থান লিভার কোম্পানি বা এভারেডি ব্যাটারি কোম্পানি হলুদ বা লাল-রঙা ভ্যানে করে হাটে এসে অ্যামপ্লিফায়ারে নানারকম জনপ্রিয় গান বাজিয়ে নিজেদের পণ্যর প্রচার করতেন। ভারতীয় বিজ্ঞাপন শিল্পের ইতিহাস যদি কখনও লেখা হয় তবে শহরের পদাতিক "ছিট-কাপড়ওয়ালা" "বিক্‌কিরি-ওয়ালা", "চাবিওয়ালা", "বাসনওয়ালিদের", "বেলফুল" আর "কুলপি-মালাই" ওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাম-গঞ্জের এই সাইকেল ও সাইকেল-রিকশা এবং ঘোড়ার গাড়িতে বিচরণ-রত-অ্যাড-এজেন্টদের কথা অবশ্যই লেখা থাকবে। এবং হিন্দুস্থান লিভার, আই টি সি এবং ইউনিয়ন কারবাইডের মতো বহুজাতিক অনেক সংস্থার বিশিষ্ট ভূমিকা থাকবে সেই ইতিহাসে অবশ্যই।

কত পাড়াই যে ছিল বরিশাল শহরে। এখন সব নাম আর মনে নেই। কাউনিয়া, জর্ডন কোয়ার্টার, কাঠপাট্টি, আমানতগঞ্জ ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘোড়ার গাড়ি ধীরে ধীরে শহরের ঘিঞ্জি ছাড়িয়ে এবারে ফাঁকাতে এসে পড়ল। এখন দু পাশে ছাড়া ছাড়া বাড়ি। তবে এখনও পাকা বাড়ি। তারও পরে পাকা বাড়ির সংখ্যা কমে আসতে লাগল। কাঠের দোতলা বাড়ি অথবা রংপুরের বা তামারহাটের মতো রঙিন টিনের-চালের একতলা বাড়ি।

বাঁ দিকে হোগল-বাদা। জলের মধ্যে হোগলার বন। কতরকম যে গায়ের রঙ তাদের। গরিবেরা এই হোগলা দিয়েই বেড়া করেন বাড়ির। আব্রু-রক্ষার পরদা হয়। হোগলা পাটিও হয় মাদুরের মতো।

হোগল-বাদার উপরে ঝকঝকে নীল আকাশ। ফড়িং উড়ছে। পানকৌড়ি, কামপাখি, ডোমকল এবং ডাহুক পাখি হুড়ুক-ভুড়ুক করে হোগলের মাথা-পা আন্দোলিত করে পুরো বাদার মধ্যে নিশিদিন প্রাণচাঞ্চল্যর অস্ফুট স্ফুটন ঘটিয়ে চলেছে। হলুদ ফড়িং উড়ছে। এখন জোয়ার। তাই পথের পাশের নর্দমার মধ্যে জোয়ারের জল ঢুকছে হু হু করে। এমনটি আর কোথাওই দেখেনি ঋভু। শহরের প্রতিটি নালা ও নর্দমায়, নদীপারের সব পুকুরে-দিঘিতে নদীর জোয়ার-ভাঁটা খেলে এখানে। এমন চন্দ্রাহত শহর; চাঁদের বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে—থাকা শহর বোধহয় পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

চার দিকে নারকোল-সুপারির ছড়াছড়ি। মাছরাঙা পাখিরা বিলম্বিত এই সকালবেলার হোগল-বাদার, পান-সুপারির, জলের মধ্যে বুড়বুড়ি-তোলা কুচো মাছের ও ব্যাঙাচিদের গায়ের-গন্ধ-ভরা আবহাওয়াকে রামধনুর রঙে চকিতে রাঙিয়ে দিয়ে তাদের বহুরঙা ডানার চক্রাকার আন্দোলনে আন্দোলিত করে চলে যাচ্ছে।

মোহাবিষ্ট হয়ে গেল ঋভু। এই জন্যেই বোধহয় বরিশাল পৌঁছতে এবং এখানে থেকে ফিরতে এতো কষ্ট; "আইতে শাল যাইতে শাল, তার নাম বরিশাল"। একটু কষ্ট না করলে কী এই জলজ রাজ্যের স্বর্গে পৌঁছোনো যায়? এমন জায়গায় না জন্মালে কি জীবনানন্দর মতো কবি হওয়া যায়? "রূপসী বাংলা" বা "ধূসর পাণ্ডুলিপির" মতো কবিতা লেখা যায়?

ঋভুদেরও আদিবাস যে বরিশালে কাঁচাবালিয়া নামক কোনো গ্রামে ছিল একথা মনে করে মনে মনে খুশি হয় ঋভু। যদিও কাঁচবালিয়ার কোনো মানুষের সঙ্গেই ঋভুর তো দূরস্থান, হৃষীকেশেরও যোগাযোগ ছিল না কোনোই।

মগ্নমুগ্ধ চোখে দু পাশে চেয়ে রইল ঋভু ঘোড়ার গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে। বাবা যে ওকে মালপত্রর জিম্মাদারি দিয়ে একা ওই গাড়িতে যেতে দিয়েছেন সেই কারণে বাবার প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করল খুবই। একটা কথা আগেও বহুবার মনে এসেছিল ওর, এবারে সেই সম্বন্ধে ও নিঃসন্দেহ হলো। একা থাকতে ওর খুব ভালো লাগে। একা থাকলে কত কী ভাবা যায়, মনে মনে কত কী করা যায়, কত জায়গাতে যাওয়া যায়, যেসব জায়গাতে মানুষের স্থূল শরীর এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কখনও যাওয়ার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারে না।

ডানদিকে, পরে জেনেছিল ঋভু যে, ডানদিকে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলেই পড়বে বরিশাল ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি। ওই কোম্পানিতেই নারায়ণ মেসোমশাই কাজ করেন। শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায়। সাধারণ একটি কাজ। নারায়ণ মেসোমশাই রেণুমাসিমার স্বামী। রেণুমাসিমা তাপসীর দিদি। মেজদিদি। গিরিডির অভ্রখনি ছেড়ে এসে, ওখানের নির্মল, শিক্ষিত, ব্রাহ্ম পরিবেশে শৈশবে ও কৈশোরে বড়ো হয়ে উঠে বরিশাল শহরের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে এসে সম্পূর্ণ অন্যরকম জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটা রেণুমাসিমার পক্ষে বড়ো সোজা ছিল না। দুই বাংলার অর্থনৈতিক স্বাধীনতাহীন মেয়েরা এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল বাবা-মায়ের মেয়েরা যুগে-যুগে স্বামীর ঘর করতে এসে যে অ্যাডভেঞ্চার ও ঝুঁকি নিয়েছেন তার সঙ্গে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটিতে উল্লিখিত, উচ্চকিত, তুঙ্গ-প্রচারিত কোনো এক্সপ্লোরারেরও কোনো তুলনা চলে না। দুই বাংলার মেয়েদের এই নীরব, প্রচারহীন অ্যাডভেঞ্চার আরো অনেক বড়ো মাপের অ্যাডভেঞ্চার। কারণ এ অ্যাডভেঞ্চার আরোপিত। নিরুপায়। আর এক্সপ্লোরারদের অ্যাডভেঞ্চার আনন্দ ও তীব্র স্পৃহানির্ভর-উন্মাদনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। অনেক সময়ে বাহাদুরি-প্রবণতারও দ্বারা।

ঋভুরা আপাতত রেণুমাসিদের নদীমুখো বিশাল সুন্দর কাঠের বাড়ির দোতলাতে কিছুদিন থাকবে। হৃষীকেশ যতদিন না অন্তত চলনসই একটা বাড়ি ভাড়া করতে পারছেন।

প্রবাদ এরকম যে, বরিশালের মানুষ খুব রাগী।

মেজাজের একটু হেরফের হলেই বড়ো বড়ো দাও দিয়ে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল তখনও বরিশালে। ডাকাতেরাও কুখ্যাত ছিল। নদীমাতৃক জায়গামাত্রতেই জলের ডাকাতেরা মারাত্মক হতো সেই সময়ে। ঘনবসতিপূর্ণ যেসব এলাকা নয় সেখানে রাতে দরজা খুলে বাইরে যাওয়া একেবারেই অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। তাই অমন সুন্দর ঝকঝকে কাঠের বাড়ির দোতলার মস্ত মস্ত ঘরে একটি করে ঝকঝকে-করে মাজা পেতলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাবর দেখে তাদের প্রয়োজনীয়তা যে কি হতে পারে তা ভেবে ঋভু অস্থির হয়ে গেছিল।

প্রায় ঋভুরই সমবয়সী মাসতুতো ভাই মিহির, যার বরিশালিয়া নাম ছিলো, "মিহিরডা", ঋভুকে বলল, এমা! তাও জানিসনা রে তুই! কলকাতার পোলাডা?

না।

বোকার মতো ঋভু বলেছিল।

মিহির বলেছিল, রাতের বেলা ওই ডাবরেই আমাগো মুইত্যা থুইত্যা হয়। বোঝলা মণি। বাইরে গ্যালে তো একেরেই গ্যালা। ব্যাটাছেলে হইলে তো তৎক্ষণাৎই মইর‍্যা বাঁইচ্যা গ্যালা গিয়া। কিন্তু মাইয়া হইলে তৎক্ষণাৎ মরব না। কাঁধে ফ্যালাইয়া লইয়া যাবো অনে, তারে নদীর চরে কী বাদার ধারে। আস্তে আস্তে মরবার লাগব।

অল্প ক'দিনের মধ্যেই সমবয়সী ঋভুর দারুণ ভাব হয়ে গেল মিহিরের সঙ্গে। এর আগে রেণুমাসিমা নারান মেসোমশাই বা মিহির বা মিহিরের দিদি এবং বোনেদের সঙ্গে আলাপ ছিল না। কারণ বরিশাল থেকে তাঁরা কোনোদিনও কলকাতা আসেননি এবং ওরাও কখনও বরিশালে যায়নি।

মিহির পড়ত টাউন স্কুলে। ঋভু ভর্তি হলো জেলা স্কুলে। আমানতগঞ্জের মাসির বাড়ি থেকে জেলা স্কুল বোধহয় মাইল চারেক বা পাঁচেকের পথ ছিল। ঋভুকে হেঁটেই যেতে হতো এবং আসতেও হতো। ভোরবেলা ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ত। স্কুল ছুটি হলে বাড়ি ফেরার পথে হৃষীকেশের অফিসে এসে

একটু কিছু খেয়ে নিত। বাবার অফিসের ছাদেই সে বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে রাহাকাকু থাকতেন। বাবার সহকর্মী। কিরণময় রাহা। তিনি খুবই সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। গান-বাজনা-অভিনয় নাটক ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই খুব মনোযোগ ও ভালোবাসা ছিল তাঁর। ঋভুর খুব ভালো লাগত রাহাকাকুকে।

রাহাকাকু, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনতে ভালোবাসতেন। ওঁর সংস্কৃতি ছিল শান্তিনিকেতন-ঘেঁষা। তাই ওঁর পক্ষে বরিশালে থাকাটা তখনকার দিনে এক ধরনের শাস্তি-বিশেষ ছিল। যদিও বরিশালের মানুষেরা শান্তিনিকেতনেও কম ছিলেন না। রাহাকাকু কেবলি বলতেন ঋভুর বাবাকে, বুঝলেন দাদা, যেদিন এখান থেকে বদলি হয়ে যাব সেদিন ফার্স্ট ক্লাসে করে ফিরব কলকাতা। ফিরে-যাওয়াটা সেলিব্রেট করতে।

হৃষীকেশ হাসতেন।

রাহাকাকু বোধহয় জানতেন না যে, হৃষীকেশের আদি নিবাসও ছিল বরিশাল। 'গুহ' পদবি সম্ভবত ঢাকা জেলা আর বরিশাল জেলা ছাড়া হতো না।

ঋভুর দাদু, মানে তাপসীর বাবা পশুপতিনাথ বসুর কপাল বোধহয় নিতান্তই মন্দ ছিলো। আর্থিক দুর্দৈব তো ঘটেই ছিল অভ্র ব্যবসায়ে পৃথিবীব্যাপী মন্দা থাকায়, তাঁর নিজস্ব ভাগ্যেও বোধহয় আদৌ ভালো ছিল না। নইলে চার কন্যাকেই পাত্রস্থ করতেন না হয়তো বরিশালেই। বড়োজামাইও গুহ। তবে ঢাকার। ঢাকার বাঙালরা অবশ্য সর্বোৎকৃষ্ট বাঙাল। মেজো জামাই, নারান মেসোমশাই, বরিশালের "নরোত্তমপুরের" রায়। পরের জামাই হৃষীকেশেরও আদি নিবাস বরিশালের "কাঁচাবালিয়া"। ছোটো জামাইয়ের আদি নিবাসও ছিল বরিশালেরই "গাভা"। চার জামাই-ই বিলক্ষণ কুলীন ঘরের। "মন্দিভাগ্য" এই জন্যে বলা যে, একটি প্রবচন ছিল যে, বরিশালে মেয়ে দিতে নেই। বরিশাল থেকে মেয়ে আনতে হয়। আরও একটি প্রবচন ছিল, প্রমীলাবালা প্রায়ই বলতেন :

"গুহ বংশ বড় বংশ
বসু বংশ দাতা
মিত্র বংশ কুটিল অতি
আর দত্ত হারামজাদা।"

"দত্তরা", গ্রাম্য, অর্বাচীন। হয়ত উদ্দেশ্যপ্রসূতও এই প্রবচন নিজগুণে মার্জনা করবেন আশা করি। আগেও ছিল, এবং ঋভুর আজও ঘোর সন্দেহ আছে যে, এই প্রবচনটির পেছনে কোনো গুহ বা বসুর; অথবা দুজনেরই নিগূঢ় ষড়যন্ত্র ছিল।

একদিন বিকেলে 'মিহিরডা'র সঙ্গে ঋভু হেঁটে আসছিল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে। প্রায় মাসিমার বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা, এমন সময় ঋভুদের থেকে তিন-চার বছরের বড়ো একটি মেয়ে, যে পথের উলটোদিক থেকে আসছিল; মিহিরডাকে বলল, "মিহিরডা, শোবাবের খুব অসুখ। তরে সে দেখতে চাইতেছে বার বার। শুধু তরেই। তুই যত তাড়াতাড়ি পারস একবার আসস আমাগো বাড়িতে।"

শোরাব খোন্দকার মিহিরডার সঙ্গে টাউন স্কুলেই পড়ত।

মিহির বলল, চলেন দিদি এখনই যাইতিছি।

শোরাবদের বাড়ি, মিহিরডাদের বাড়ির কাছেই। ঋভুকে সঙ্গে করেই গেল মিহির।

মিহিরডা যেতেই শোরাবের বাবা আদর করে ওকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেল। ঋভুও সঙ্গে গেল।

শোরাব মাটিতে শুয়েছিল বিছানার উপরে। ঋভু আগে তাকে কখনও দেখেনি। কিন্তু প্রথমবার দেখেই মনে হলো যেন খুবই কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটি। শীর্ণ, পাণ্ডুর মুখে, শেষ বিকেলের রোদের মতো হাসি মাখিয়ে শোরাব শালিকের পায়ের মতো হলুদ ক্লিষ্ট হাত নাড়িয়ে হাতছানি দিল মিহিরডাকে।

কি হলো আবার তোর? শোরাব? স্কুলে আসিস নাই চার-পাঁচ দিন। তাই ভাবতাছিলাম হইলোডা কি তর?

মিহিরডা শুধোল।

শোরাব বলল, তুই আমাকে ক্ষমা কররে মিহিরডা। তার ক্ষমা না পাইলে দোজখে যাইয়াও নিস্তার নাই আমার।

সে কি রে! ক্ষমা তো আমি তখনই করে দিয়েছি তোকে। নতুন করে ক্ষমা করার কি আছে? পাগল না কি তুই?

না রে! মিহিরডা। তুই জানস না হেই শাস্তির রকম। কোনোদিনও, ভুলেও কোনোদিন তোদের দেব-দেবতাকে নিয়া ঠাট্টা করিস না য্যানে তুই। আমি আর বাঁচুম না। আমি জানি। যদি বাঁইচতাম, তবে আল্লা রসুলকে নিয়া কোনোদিনও এমন ঠাট্টা আর কখনওই করতে যাইতাম না।

মিহির ওর পাশে হাঁটু গেড়ে, কপালে হাত রেখে বলল, তুই ভালো হয়ে উঠবি শোরাব। দেখিস, তুই ভালো হয়ে উঠবি।

শোরাব বালিশের উপরে দুবার এদিক-ওদিক করল তার মাথাটা। দু চোখের কোনা দিয়ে জল গড়িয়ে গেল।

বলল, বাঁচা হইব না রে আর মণি। আল্লার ফরমান! বড়োই গুনাহ হইছিল আমার। তুই ক্ষমা করবি তো আমাকে মিহিরডা! ক! ক' আমারে!

আরে! কী পাগলের মতো কথা বলে বারবার! মিহির বিব্রত হয়ে আবার বলল।

তারপর বলল, চলিরে। আবারও আসমানে শোরাব। তাড়াতাড়ি ভালো হইয়া ওঠ।

ঘরের বাইরে শোাবের বাবা মা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা ছিলেন। দু একজন মিহিরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই ছাওয়ালডা। ওই যে!

একজন এগিয়ে এসে মিহিরের দু হাত ধরে বললেন, দরগার পীর বলে গেছেন ভাইডি যে ক্যাবল তুমি ক্ষমা করলেই হইব, নইলে...।

মিহির খুব লজ্জিত হয়ে বলল...। কী যে করেন ফুফা আপনে। শোরাব আমার বন্ধু। ক্ষমা তো আমি ওই মুহূর্তেই কইর্‌য়া দিছি। তা ছাড়া, আমি তো অমৃতই খাইছিলাম। সত্যই কইতাছি। অমৃতই খাইছিলাম।

ক্ষমা করিও অরে মিহিরডা। অরে য্যান্ ক্ষমা করিয়া দিয়ো তুমি।

হাত ধরে বললেন, শোরাবের ফুফা মিহিরকে।

পথে বেরিয়ে মিহিরকে ঋভু শুধোল, কি হয়েছিল রে?

মিহির চুপ করে ছিল। তখন সন্ধে প্রায় নেমে এসেছে। রাতের পাখিরা ডাকাডাকি শুরু করেছে। হোগল বাদার মধ্যের বহুরঙা অন্ধকারের মধ্যে নানান জলজ পাখি, যেন আড়কাঠিতে ধরা পড়ে নড়াচড়া করছে। আসলে ওরা নড়েচড়ে বসে রাতের জন্যে তৈরি হচ্ছে।

মিহির বলল, কী বলব তোকে ঋভু, এমনও যে হতে পারে তা নিজের জীবনে না ঘটলে বিশ্বাসই করতাম না। মুসলমানদের আল্লা আমাদের দেবদেবীরই মতো ভীষণই জাগ্রত। এ কথা আমার আর শোরাবের মতো কেউই বোঝেনি এই মুহূর্তে।

ব্যাপারটা কি, তা বলবি তো!

দ্যাখ্ এই শোরাব খোন্দকার আমার সঙ্গেই পড়ে একই ক্লাসে। আমি তো বোকা একটু। তাই, হিন্দু-মুসলমান সব ছেলেই আমাকে নিয়ে হাসি-মস্করা করে। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি। শোরাব আর দু-তিনজন আমার সামনে সামনে যাচ্ছে। বোকা হলেও বুঝলাম যে ওরা যেন কী একটা ষড়যন্ত্র করেছে আজকে একটা আমার বিরুদ্ধে। কোনোভাবে আমাকে আবারও বোকা বানাবে। সন্দেহ হতেই বোকা আমি, বোকারই মতো ওদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, কী রে। কী পুটুর পুটুর করতাছস তোরা?

শোরাব বলল, কাল রহিমদের বাড়ির পাশের মাঠে দৌড় হবে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময়ে। যে সেই দৌড়ে ফার্স্ট হবে সে আল্লার অমৃত খেতে পাবে।

মিহির বলল, আমি সত্যনারায়ণ পুজোর শিন্নির কথাটা জানতাম। আল্লার অমৃতটা কি জিনিস তা জানা ছিল না। দেখতেই তো পাইতাছস যে আমার এই বগের মতো ঠ্যাং। আমার লগে দৌড়াইয়া

কেউই যে পারব না শোরাব তায় ভাল কইরাই জানত। আমার চোখদুগা বড়ো বড়ো তাই এরা ঠাট্টা কইর্য়া আমারে ডাকে "গোরুর চোক।"

বলেই, মিহির নিজেই হেসে ফেলল।

মিহির ভারি সরল ছেলে ছিল। আজও আছে। এবং রসিক। নিজেদের বিন্দুমাত্র দোষ-ব্যতিরেকে যে দেশ-বিভাগের বলি ওরা হয়েছিল। নদীপারের অশেষ আরাম ও সাচ্ছল্যার দোতলা কাঠের বাড়িব সুখ, নারকোল-সুপুরি বনের আলোছায়া, ঘুঘু আর ডাহুক-ডাকা দুপুরের শান্তি এসব কিছু থেকে রাতারাতি গুলতিতে-ছোড়া-নুড়িরই মতো নিক্ষেপিত হয়েছিল কলকাতা নামক নরকে এতো কিছুতেও, দীর্ঘদিনের নানাবিধ ক্লেশ, অশেষ অপমান, দুঃখ-দারিদ্রেও মিহিরের রসজ্ঞান আজও একটুও কমেনি। এই ধরনের মানুষেরাই জীবনের টাকে চাঁটি মেরে বেড়ায় সেই বহরমপুরে সেঁজুতির মতো, জীবন ওদের কখনওই কবজা করতে পারে না গলা টিপে ধরেও।

মিহির বলছিল, বুঝলি ঋভু, পরদিন স্কুল থেকে ফিরছি। আমার সঙ্গে যোগেন আর অহিমুদ্দি। শোরাব, যতীন, অচিন্ত্য ওরা সব আগেই চলে গেছে, মানে এগিয়ে গেছে।

রহিমদের বাড়ির কাছের মাঠে পৌঁছে দেখি সেখানে অনেকেই আছে, সহপাঠীরা। তবে সকলের চোখে-মুখেই চাপা-উত্তেজনা। খুব একটা মজার ব্যাপার যে ঘটতে যাচ্ছে তাতে কারোই যেন সন্দেহ নেই কোনো।

দ্যাখ, আমি চিরদিনেরই বোকা।

মিহির বলল।

সারাজীবন মানুষে আমাকে ঠকিয়েই গেছে। কিন্তু যাবা চিরদিন ঠকাল তারা কেউই জানে না যে, ওরা প্রতিবারই ঠকানোর আগেই আমি জানতে পারি যে, ওরা আমাকে ঠকাচ্ছে। আমি যে জেনেশুনেই ঠকি, এ কথাটা যারা ঠকায় তারা জানে না বলেই ঠকে আমি একটুও দুঃখ পাই না। কিন্তু ওদের ঠকানোর সুখে কোনো বিঘ্ন ঘটাই না।

তারপর কি হলো বল্?

ঋভু বলল।

হ্যাঁ। তারপর দেখি, মাঠের যে-দিকে দৌড় শেষ হবে, সেদিকে মাটির মধ্যে একসার ছোটো ছোটো গর্ত খুঁড়ে রেখেছে ওরা। মধ্যের একটি গর্ত কচুপাতা দিয়ে ঢাকা। তার মধ্যিখানে একটি ফুটো আর, সেই ফুটোর মধ্যে একটি পাটকাঠি গোঁজা।

শোরাব বললো মাঠের ওই দিক থেকে দৌড় শুরু হবে। যে প্রথমে পৌঁছোবে, মানে ফার্স্ট হবে; তারই কপালে আছে আল্লার অমৃত। প্রথম যে হবে, সে ওই পাটকাঠি দিয়ে চুমুক দিলেই অমৃত উঠে আসবে তার মুখে।

তারপর?

ঋভু শুধিয়েছিল।

মিহির বলছিল, আমার মন বলতাছিল যে, শোরাব আমারে ঠকাইয়া হক্কলেরে বইল্যা বেড়াইব। কী কইর্য়া তারে "না" করি এর জন্যেই আসা আমার তো এ পিরথিবীতে ঠইকতেই আসা।

তারপর?

তারপর—দৌড় তো শুধু হইল। আমরা সবসুদ্ধ আটজন ছিলাম। রহিম, অহিমুদ্দি, শোরাব, যোগেন, অচিন্ত্য, যতীন, আসরাফ আর আমি। আমিই সবচেয়ে আগে বড়ো বড়ো ঠ্যাং লইয়া দৌড়াইয়া ফার্স্ট হইলাম। সেদিন আমার অ্যাও মনে হইল অরা কেউই য্যান ইচ্ছা কইর্য়াই জোরে দৌড়াইল না।

তারপর?

তারপর কচুপাতায়—ঢাকা পাটকাঠি-গোঁজা সেই ফুটাতে পৌঁছাইয়া শুইয়া পইড়্যা পাটকাঠিতে মুখ না লাগাইয়া চোঁ চোঁ করিয়া টানতে লাগলাম। আহা! সত্যিই য্যান্ অমৃত। কী মিষ্টি শরবত। আল্লার অমৃত!

শরবত শেষ হলে, মুখে কী কাদা কাদা চিনির মতো লাগল। থুথু করে সেটা ফেলে দিলাম। আল্লার অমৃত খেয়ে আমি উঠে দাঁড়াতেই শোরাব এবং অন্য সকলেই হো হো করে হাততালি, দিয়ে হেসে উঠল। বলল, মিহিরডা। ঠকিয়া গ্যাছেরে, ঠকিয়া গ্যাছে!

আমি বললাম, ক্যান?

ওরা বললো, মিহিরডা আমাগো মুত খাইছে।

ওই গর্তে আমার চারজন মুইতো থুইছিলাম। হাঃ। হাঃ।

মিহির বলল ঋভুকে, কিন্তু বিশ্বাস কর ঋভু, আমি কিন্তু অমৃতই খেয়েছিলাম। কী মিষ্টি যেন শরবত খাচ্ছি।

আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে ওরা আমাকে মিথ্যামিথ্যি ঠকাচ্ছে। কিন্তু যখন ওরা চারজনই বলল যে, না ওরা সত্যি সত্যিই মুতেছিল আমি স্কুল থেকে ওখানে পৌঁছোনোর আগের মুহূর্তেই তখন আমার বিশ্বাস হলো। কিন্তু হলোও না। আমি আবারও বললাম, নারে শোরাব। আমি তো অমৃতই খেলাম। বিশ্বাস কর। আমি তো অমৃতই খেলাম। এমন সুন্দর পানীয় আগে খাইনি কখনওই।

পরদিন সকাল থেকেই শোরাবের নাকি প্রবল জ্বল এসেছিল। ক'দিন পরে রহিমের মুখে শুনে আমি ভেবেছিলাম, জ্বর তো কত লোকেরই হয়। ভালো হয়ে যাবে। ভেবেছিলাম, ওকে একদিন দেখেও আসব। .

এরই মধ্যে দেখলি তো ওর দিদির সঙ্গে দেখা হলো।

শোরাবের দিদির নাম কি রে? ভারি ভালো দেখতে কিন্তু। হিন্দুদের মতো তো শাড়ি পরেছেন। হিন্দু না মুসলমান বোঝাই যায় না।

মিহির হাসল।

বলল, আমার দিদি গীতাদিও মেয়ে, শোরাবের দিদি জাহানারও মেয়ে। হিন্দু আর মুসলমানের মেয়ে কি আলাদা আলাদা হয়? লালন ফকিরের গান শুনিস নাই?

নাতো! কোন্ গান?

ঋভু শুধোলো।

> "যদি সুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
> নারীর তবে কি হয় বিধান?"

শুনিস নাই সে গান?

মিহিরকে ঋভু কিছু বলল না বটে কিন্তু ঋভুদের কলকাতার স্কুলের ভূগোলের স্যার বলেছিলেন যে, আফ্রিকার মাসাই উপজাতিদের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে দুইয়েরই সুন্নৎ-এর প্রচলন আছে।

রেণু মাসিমাদের বাড়ির পেছনে ও সামনে ছিল মস্ত বাগান। ডোবা এবং পুকুব। দোতলার চওড়া বারান্দায় বসে কীর্তনখোলা নদী ও নদীর চর দেখা যেত। সেই নদীর পাশে ছিল একটি খাল। সেইখালের সঙ্গে যোগ ছিল মাসিমাদের বাড়ির পুকুরের একটি 'জান' এর মাধ্যমে। জোয়ারের সময়ে জল ঢুকত সেই খাল থেকে এসে পুকুরে [illegible] করে। পুকুর আর খালের সংযোগস্থলে একটি খাঁচা থাকত। বাঁশের চাঁচ-এর মোটা পাটি দিয়ে বোনা। জোয়ারের সময় তা তুলে দেওয়া হতো। জলের সঙ্গে নানারকম মাছ ঢুকতো নদী থেকে পুকুরে। জল ঢুকে গেলে সেই খাঁচা বা ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়া হতো। মাছ আর বেরুতে পারত না।

মিহিরডা মনের সুখে ওই "জান"-এর উপরে বসে মাছ ধরত। তার বঁড়শি আর কেঁচো রাখা থাকত "জান"-এর উপরেই। পটাপট বড়ো বড়ো বাগদা চিংড়ি ধরতো মিহির আর কলকাতার ঋভু. মিহিরের ওই আশ্চর্য কর্মনৈপুণ্যে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত।

এক একদিন বিকেলে পঁচিশ-তিরিশটা বাগদা চিংড়ি ধরত মিহির। ঋভুরা আমানতগঞ্জের মিহিরদের বাড়িতে থাকতে থাকতেই একদিন এক কুমিরের বাচ্চা ঢুকে পড়েছিল জোয়ারের সময়ে ওই 'জান' দিয়ে পুকুরের মধ্যে। মেছো কুমির নয়, আসল কুমির। [illegible] এক চাচাতো ভাই তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কষে পেঁয়াজ রসুন লংকা দিয়ে রান্না করে [illegible]; আহা। যা খাইলাম! ফাস্টোকেলাস!

একদিন ওই 'জান'-এ বসে মিহিরডা মাছ ধরছিল বঁড়শি ফেলে আর তার নতুন সাগরেদ ঋভু তার পাশে বসে মশার কামড় খেতে খেতে মাছ ধরা দেখছিল মনোযোগ সহকারে, এমন সময়ে মিহিরের বড় দিদি গীতাদি দৌড়ে এসে বলল, মিহির। মিহির! দৌড়াইয়া যা। শোরাব মরিয়া গেছে গিয়া।

বঁড়শি ফেলে তো মিহির বকের মতো লম্বা লম্বা ঠ্যাং নিয়ে দৌড়োল শোরাবদের বাড়ির দিকে। পেছন পেছন ঋভুও।

ওদের বাড়িতে পৌঁছোতেই শোরাবের বাবা মিহিরকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ঋভু মিহিরের পাশে দাঁড়িয়ে দেখল যে শোরাবের মুখ দিয়ে কীরকম জ্যোতি বেরুচ্ছে। আরো অনেক রোগা হয়ে গিয়ে ও যেন মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। কিন্তু ভারি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওকে। শোরাবের আম্মীজান মিহিরকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন।

অনেকক্ষণ পর ওরা যখন বেরিয়ে এল শোরাবের বাড়ি থেকে, তখন মিহির বলল, যেদিন জাহানারাদি খবর দিল তারপর থেকে রোজই এসেছি একবার করে স্কুল থেকে ফিরে। দেখেছি, শোরাব ক্রমশই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। শোরাব শেষের দিকে এতোই দুর্বল হয়ে গেছিল যে ওর কানে কান রেখে কথা বললে তবেই ও শুনতে পেত। ফ্যাকাশে, ভীত, বিবর্ণ হয়ে গেছিল ওর মুখ। ও বলেছিল, মিহিরডারে! তুই ক্ষমা কইর‍্যা দিস আমারে। আল্লার দোয়া আমি পামুনারে। তরে আমি ঠকাইতে চাইছিলাম। কিন্তু উলটাবেলায় আমিই ঠইক্যা গ্যালাম গিয়া। তুই কিন্তু সত্য সত্যই সেদিন অমৃতই খাইছিলি। তোর উপর আল্লার অশেষ দোয়া ছিল। আর আল্লার নামে ওই হীন কাজ করনের পাপে আইজ আমার এই দশা। মরিয়া যাইলে আমার স্থান দোজখেও হইব না রে মিহিরডা। তুই আমারে ক্ষমা কইর‍্যা দিস।

আমি বলেছিলাম, শোরাব। আমি কি তরে খারাপ বাসি? ক্ষমাতো কবেই কইর‍্যা দিছি রে।

মিহিরডা বলল, স্বগতোক্তির মতো, বুঝলি ঋভু, আমি সত্যই অমৃত খাইছিলাম রে। তরা মুইত্যা থুইলে হইব কি? আল্লার দোয়ায় ওদের মুত অমৃত হইয়া গেছিল গিয়া।

তারপর বলল, আমাগো বাড়ির গ্যাটের পাশে যে শিউলি গাছটা আছে সেটা দেখছস কি?

হ্যাঁ।

ঋভু বলল।

শিউলি গাছটা বারোমাস্যা। বারো মাস ফুল ফোটে তাতে। কে জানে! তাও হয়তো আল্লারই দোয়ায়। তুই ঘুম থিক্যা ওঠার অনেক আগেই উইঠ্যা আমি রোজ সকালবেলা ওই শিউলি ফুল কুড়াইয়া লইয়া শোরাবরে দিয়া আসতাম। আর আল্লার কাছে কইতাম: আমার বন্ধুরে য্যান্ ভালো কইর‍্যা দ্যান তিনি।

শোরাবকে যখন গোর দেওয়া হবে তখন সকলে যাবে বলে মিহির বলল, তুই বাড়ি যা ঋভু। আমি সকলডিরে খবর দিয়া আসি।

আমাকে নিয়ে যাস মিহির। গোরস্থানে, মানে জানাজার শোভাযাত্রার সঙ্গে।

যামু।

যাওয়ার সময়ে মিহির বলল, শোরাবদের আল্লা ভারি জাগ্রত। বোঝলা ঋভু।

আমানতগঞ্জেই, কিন্তু মাসিমাদের বাড়ি থেকে অনেকখানি গিয়ে শহরের দিকে, ঘনবসতিপূর্ণ জায়গাতেই একটি বাড়ি, মোটামুটি পছন্দ হলো ঋভুর বাবা-মায়ের।

বাড়িটি দোতলা। বড়ো বাড়ি। তার একতলার একটি অংশ ছেড়ে দিলেন বাড়িঅলা। তিনটি ঘর। একটি বসার, অন্য দুটি শোবার। মস্ত উঠোন। আলাদা। উঠোনের একপাশে রান্নাঘর। বর্ষার দিনে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে রান্নঘার আর ঘর করতে হবে। সে তো সব গ্রামাঞ্চলের বাড়িতেই করতে হয়। তবে রান্নাঘরটি বেশ বড়ো। রান্না এবং খাওয়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা চলে।

বাড়িওয়ালার নাম [illegible] ঘোষ। ভারি হাসিখুশি, পান-খাওয়া, ধুতি-পরা, খালি গায়ের খাঁটি বাঙালি দিলদার [illegible] তাঁর মেয়ে পদ্ম, কলকাতার ছায়াছবির নায়িকা। যে কারণে তাঁর অশেষ গর্ব ছিল। তবে সে যুগে পদ্মর মতো ভদ্রঘরের মেয়েরা কমই ছিল ওই জগতে সেই কারণে

বরিশালের গ্রাম্য পরিবেশে নানা লোকে নানা কথা বলত তাঁকে। কিন্তু তাঁর সেই অস্বস্তি তিনি গর্ব দিয়ে সব সময়েই ঢেকে রাখতেন। 'পতু'র ভালো নাম বোধ হয় ছিল প্রণতি বা ওইরকমই কিছু। প্রণতি ঘোষ।

ভারি ভালো লেগে গেছিল ঋভুর দক্ষিণাবাবুকে।

বাড়ির পেছনেই বলতে গেলে, ছিল প্রকাণ্ড একটি দিঘি। সেটি পাড়ার সকলের। বরিশাল শহরের মধ্যেই যে কত বড়ো দিঘি ও পুকুর ছিল তা বলার নয়। আর বাইরে তো ছিলোই। যেমন, মাধবপাশার দিঘি। সে দিঘির কথাতে পরে আসা যাবে।

হৃষীকেশ, কেন্দ্রীয় সরকারের একটি দপ্তরের জেলার বিভাগীয় বড়োসাহেব। তা ছাড়া বরিশাল এমনই একটি জায়গা যে কারও উপরওয়ালা বড়োসাহেব যে অন্যত্র থেকে হুট করে চলে আসবেন তেমনও উপায় ছিল না কোনও। তাই সব বিভাগেরই বিভাগীয় প্রধানদের পক্ষেই বরিশাল ছিল অতি উত্তম জায়গা। "আই দ্যাম দ্যান মনার্ক অফ অল আই সার্ভে"-র এলাকা।

হৃষীকেশ সকালে চা-জলখাবার খেয়ে আটটা নাগাদ একবার অফিসে যেতেন। তারপর বাড়ি ফিরতেন বারোটা-সাড়ে বারোটাতে খেতে। খেয়ে, একটু জিরিয়ে, নদীপারের অফিসার্স ক্লাবে এক হাত টেনিস খেলে, আবার অফিসে গিয়ে বসতেন।

এমনিতে, তৎকালীন বাংলার বেশির ভাগ মফস্বল শহরেই দুপুরবেলা খাওয়ার ও বিশ্রামের জন্যে ঘন্টা দুয়েক অফিস এবং দোকানপাট বন্ধই থাকত। কাজ-পাগল হিসেবে সাধারণ বাঙালির কখনওই তেমন সুনাম ছিল না। দু-একজন থাকতেন কাজ-পাগল। কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম। এবং সকলেই জানেন যে, "Exception proves the general rule."

হৃষীকেশ একদিন সকালবেলা বসে দাড়ি কামাচ্ছিলেন বাইরের ঘরে। এমন সময় জমিদার মনোরঞ্জন বর্মন তাঁর জিপ নিয়ে এসে হাজির। বললেন, দাদা এক্ষুনি খবর পাইছি যে এক গ্রামে হাজার হাজার সন্নি হাঁস পড়ছে। মেয়েরা ঘাটে বাসন পর্যন্ত মাজতে পারছে না, চান করতে পারছে না, দু হাতে হাঁস সরিয়ে কোনওক্রমে তড়িঘড়ি একটি ডুব দিয়ে চান সারছে। এই বেলা চলেন যাই। যামু, আর হাঁস মারিয়া, বস্তা ভরিয়া ফিরিয়া আমু।

হৃষীকেশ বললেন, আজ কি ছুটির দিন? তুমি একটি পাগল মনোরঞ্জন।

আরে যামু আর আমু। আজ না হয় এগারোটার সময়েই পৌঁছাইলেন অফিস। বড়ো সাহেব তো আপনেই।

শিকারের গন্ধ পেলে ঋভুর বাবা সব ভুলে যেতেন।

গতরাতে খিচুড়ি রান্না হয়েছিল। প্রাতরাশে বাসি-খিচুড়ির মতো সুখাদ্য ঋভুর ভীষণই প্রিয়। কী একটি কারণে ঋভুর স্কুল ছুটিও ছিলো সেদিন। আর জমিদারদের তো রোজই ছুটি।

তখনও প্রাতরাশ খাওয়া হয়নি। তবু হৃষীকেশ যেই বললেন, যাবি না কি?

অমনি ঋভু নেচে উঠল।

বর্মনকাকু বললেন, আমার লোক থাকবে নদীপারে, গাইড। জিপ এ-পারে রেখে, নৌকাতে নদী পারাইয়া দুই পা যাইয়াই ফায়ার করিয়া হাতে ব্যথা ধইর‍্যা যাইবনে। দেইখ্যেন দাদা। দারোগাও আইবনে। তারেও কইছি।

এই ঘটনার অল্প কিছু দিন আগেই বরিশালের ইংরেজ জজসাহেব বিলেত চলে গেলেন রিটায়ার করে। তাঁর স্ত্রীর একটি টুয়েন্টি-বোর ডাবল-ব্যারেল শট্‌গান ছিল। সেই বন্দুকটি হৃষীকেশ শস্তায় পেয়ে নিয়ে নিয়েছিলেন। ওই বন্দুকটিই এখন ঋভুর ব্যবহারের।

পাটকিলে, লাল, নীল, হলুদ, নানারঙা গুলি। বিলিতি। ইলি-কীনক। পঞ্চাশটা গুলি থাকত এক-একটি বাক্সে। ওই বন্দুক দিয়ে পাখি মারা যেত। খরগোশ। ছোটো হরিণ। ভালো জায়গায় লাগাতে পারলে ছোটো বাঘও। হৃষীকেশের তো টুয়েলভ বোর ডাবল ব্যারেল শটগান ছিলই। তা ছাড়া ওয়েবিলি স্কট-এর রিভলবারও ছিল। থ্রি-এইট বোর-এর।

পরবর্তী জীবনে ঋভু ভারতের এবং পৃথিবীরও নানা বনে গেছে কিন্তু বড়ো দুঃখ রয়ে গেছে মনে আজও যে বাখরগঞ্জ সাবডিভিশনের আসল সুন্দরবনই দেখা হলো না। সেই সুন্দরবনে নাকি খুলনা থেকে যেতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে তো অনেকই শিকার করেছে, বেড়িয়েছে। এবং সেই সুন্দরবন, ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের লঞ্চে করে দেখা বা বুড়ি-ছোঁওয়া সুন্দরবন নয়। বঙ্গোপসাগরের সীমানা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গীয় সুন্দরবনের শেষপ্রান্ত অবধি বিস্তৃত ভয়াল অপরূপ সুন্দর ছিল ঋভুর দেখা সেই সুন্দরবন। ছোটোবালি, বড়োবালি, মায়াদ্বীপ, লোথিয়ান, দ্বীপ, ভাঙ্গাডুনি দ্বীপ, চামটা, বড়ো ও ছোটো। মাতলা, হেড়োভাঙ্গা, গোসাবা, বিদ্যা ইত্যাদি বহু নদ-নদীতে ভোরের সূর্যকে উঠতে এবং দিগন্তবেলার সূর্যকে ডুবতে দেখেছে। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে বোট নোঙর-করে রাত কাটিয়েছে। কাটিয়েছে গাছের ওপরেও তবুও আসল সুন্দরবন না-দেখার দুঃখ কখনওই যায়নি। এ জন্মে সেই সাধ পূরণ আর হবে বলে মনেও হয় না। শিকার তো বহু বছর হলো পুরোপুরিই ছেড়েই দিয়েছে ঋভু। যদি দেখতেও পারত ওই আসল সুন্দরবন তা হলেও তার স্বপ্ন সার্থক হতো। কিন্তু কে নিয়ে যাবে? কে বন্দোবস্ত করবে?

পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে তো সেই স্বপ্নের নদীর কাছে পৌঁছে জিপগাড়ি রেখে সকলে নেমে নৌকোতে নদী পেরিয়ে হাঁটা আরম্ভ করা হলো। নদীপারে, বরিশালেরই একজন দারোগাও ছিলেন। তাঁকেও বর্মনকাকু চাগিয়ে দিয়ে আগাম রওয়ানা করে দিয়েছিলেন। তাঁর সাইকেল ঠেসান-দেওয়া ছিল নদীপারের শিমুল গাছে। আর তিনি শিমুলের মোটা শিকড়ের উপরে বসে ছিলেন। দারোগারই পোশাকে। ঢোলা খাকি হাফ-প্যান্ট, মেরুন জুতো মেরুন মোজা, খাকি ফুলশার্ট কোমরের চামড়ার বেল্টে রিভলবার। হাতে বন্দুক। সঙ্গে একজন প্যায়দা। গুলির ব্যাগ নিয়ে।

আর ঋভু হলো ঋভুর বাবার প্যায়দা।

বর্মনকাকু, মানে মনোরঞ্জন বর্মনকে গত আটচল্লিশ বছর কোনও দ্বিতীয় পোশাকে দেখেনি ঋভু। মিলের ধুতি, হাতওয়ালা গেঞ্জির উপরে কখনও হাফ হাতা সাদা শার্ট আবার কখনও আদ্দির ফুলহাতা পাঞ্জাবি। হাফহাতা শার্টও বেশির ভাগ সময়ে পরতেন আদ্দিরই। পায়ে কাবলি জুতো। অথবা চটি।

সুদর্শন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সদাহাস্যময়, কালীভক্ত সুপুরুষ।

ভোরে উঠে চান করে, পুজো সেরে মাথায় বড়ো সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে কানে একটি রাঙাজবা গুঁজে যখন খোলা জিপ চালিয়ে জমিদার মনোরঞ্জন বর্মন বরিশালের পথ দিয়ে যেতেন তখন কাউকেই বলে দিতে হতো না যে জমিদারের রকম কেমন হওয়া উচিত!

বরিশালের বাজারেই একপাশে ছিল ওঁদের বাড়ি। কাকিমা, একমাত্র পুত্র বিল্লু, মেয়ে নীলিমা এবং নীলিমার দিদি অনিমা অনর্গল বরিশালিয়া বাংলা বলতেন। পাঞ্জাবি সংস্কৃতির কিছুমাত্রই অবশিষ্ট ছিল না তখন তাঁদের মধ্যে। দেশভাগের পরে তাঁরাও উদ্বাস্তু হয়ে বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। তালতলায় মোটর রিপেয়ারিংয়ের বিরাট গ্যারেজ খোলেন। রয়েড স্ট্রিটে প্রাসাদোপম বাড়ি লিজে নিয়ে জমিদারেরই মতো নতুন জীবন আরম্ভ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের জীবন।

ঋভুর ওকে এবং অন্য অনেককে দেখে মনে হয়েছে যে, কাজের এবং কৃতী পুরুষ মাত্রই ওভার-সেক্সড হন। লোক মাত্রই জানেন যে, কাজের চেয়ে বড়ো প্রেম পুরুষের জীবনে আর কিছুমাত্র নেই।

নদী তো পেরুনো হলো। স্বপ্নেব নদী। তার পর একাধিক দুঃস্বপ্নের নদী। বর্মনকাকুর গাইড যে কত "ডাল-ভাঙা ক্রোশ' হাঁটিয়ে নিয়ে সেই "সল্লিহাঁসের স্বপ্নরাজ্যর" দিকে ঋভুদের নিয়ে চলল তা সেই জানে। এগারোটা বাজল, বারোটা বাজাল; একটাও বাজল। সঙ্গে একটু খাওয়ার জল পর্যন্ত নেই। খিদে-তেষ্টায় প্রাণ বেরুনোর মতো অবস্থা। তা ছাড়া ঋভু তখনও ছেলেমানুষ। শিকারযাত্রার এত ও এতরকম কষ্টে অনভ্যস্ত।

এমন সময় সত্যিই সেই পথপ্রদর্শক ঋভুদের একটি ছোট্ট গ্রামে নিয়ে পৌঁছে দিল। বর্মনকাকুর বিবরণও সত্যি। এত হাঁস যে পরিবেশ হাঁসের গন্ধে ভরে গেছে।

দারোগাসাহেব বসা-হাঁসেদেরই উপর গুলি চালাতে যাচ্ছিলেন।

হৃষীকেশ বললেন, একটা চান্স দিন হাঁসেদের। একটু স্পোর্টিং হওয়া দরকার।

বর্মনকাকু এইট-এইট্টি মিটার রেসের স্টার্টারের পিস্তলের মতো, তাগড়া দুই হাতে হাততালি দিলেন দু-দুবার। ফটাফট শব্দ হলো। হতেই, সন্নিহাঁসেরা শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে দুপায়ে জলছড়া দিয়ে সে-পুকুর, এ পুকুর, আর-পুকুর সব ছেড়ে উপরে উড়ল। অগণ্য ডানায় ঝড়ের শব্দের মতো ফরফরানি ভরভরানি উঠল।

বর্মনকাকু সমানে হাততালি দিয়ে যেতে লাগলেন। এমন ভাব যে, যেন এরা বরিশালের সন্নিহাঁস নয়, কলকাতার গেরোবাজ পায়রা।

ঋভুর বাবা এবং দারোগা বাবু যুগপৎ গুলি করলেন। ঋভু ভেবেছিল, তার মাথার উপরে সোনালিরঙা পাখির মেঘই বুঝি ভেঙে পড়বে। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হলে দেখা গেলো মাত্র একটি হাঁস পড়ে আছে পুকুরের মধ্যে। ঘাড় মটকে। ডানা ভাসিয়ে।

বর্মনকাকু "হত্যাই সেলুকাস!" এর মতো অভিব্যক্তিতে বললেন, হায়। হায়। এ কী হইল দাদা? হইলোডা কি?

পুত্রশোকেও মানুষ এতো কাতর হন না।

কিন্তু সব চেয়ে বেশি বিরক্ত হলো পথপ্রদর্শক। এতদূর গরমে হেঁটে ঘর্মাক্ত হয়ে সে পুকুরের ঘাটে বসে মাথায় জল দিচ্ছিল থেবড়ে থেবড়ে। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সে বর্মনকাকুকে বলল, কী করিয়া এমনি করিয়া বিলাইতি বন্দুক মারিয়াও একখান্ পাখি ফ্যালাইতে হয় তায় এনাগো দুজনের বরিশাল শহরের সকলডিরে ইস্কুল খুইল্যা শিকাইতে কন। অনেক শিকারিই দ্যাগলাম ভাইডি কিন্তু এমন তরিবতের শিকারি জন্মে দেখি নাই।

দারোগাবাবু যেন জেল থেকে খুনির আসামি ভেগেছে এমন ভাবে হায়! হায়! করে উঠলেন।

হৃষীকেশ চিরদিনের স্পোর্টসম্যান। তবে তাঁর মুখ দেখে মনে হলো যে ঋভুকে সঙ্গে না আনলেই ভালো হতো। ব্যাটা সাক্ষী রয়ে গেল। বাড়ি ফিরে তাপসীকে এই রোমহর্ষক শিকারের গল্প সে বিলক্ষণই বলবে। চাইকি তার উপরে ব্যাটা আবার কবির ভাগনে, নরানাং মাতুলক্রমঃ, কিছু রং চড়িয়েই বলবে অবশ্যই।

দারোগাবাবুকে হৃষীকেশ শুধোলেন, কি হলো নগেনবাবু? এইম করে মারেননি?

এইম করিয়াই তো ফুটাইলাম। কিন্তুক হইলডা কি তায় কয়েন দেখি?

কোথায় এইম করেছিলেন?

উনি টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, মেলা পাখি দেইখ্যা পার্টিকুলার কাউকেই এইম করি নাই। আই এইমড্ অ্যাট দ্যা জেনারাল ডিরেকশান।

বর্মনকাকু হেসে বললেন, ছাড়ান দ্যান। মায়েব জীবের মরণক্ষণ না আসিলে শুদামুদা আপনেই ক্যান, কেউই...।

সেদিন থেকেই ঋভুর দারোগা আর পুলিশের এইমের উপর ভরসা নেই। রাস্তার ক্রিমিনালকে এইম করে ওঁরা চিরদিনই দোতলায় দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের মারেন।

ঋভু বলল, বর্মনকাকু, বড্ড খিদে পেয়েছে।

তা তো পাবেই বাবা। এখন ভাবছি, সঙ্গে কালাভাইকে নিয়ে এলে ভালো হতো।

কোন্ কালাভাই?

দারোগা বললেন।

আরে বরিশাল কংগ্রেসের কালাভাই। চৌধুরী ব্রাদার্সের কালাভাই। মিটিং অর্গানাইজ করার যার অভ্যেস তার পক্ষে একটু খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করা...

দারোগা বললেন, না আইন্যা ভালোই করছেন। আমার চাকরিডা যাইত আনে। দ্যাশ এখনও তো স্বাধীন হয় নাইরে বাবা! তারপর বললেন, হৃষীকেশ সাহেব, আপনে...হোয়াই নট? ড্যি? আই মিন খাওয়া-দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টে!

বরিশালের মানুষ ইংরিজি বলতে খুব ভালোবাসেন। এবং স্ত্রীকে ওয়াইফ বলবেই।

হৃষীকেশ বললেন, গ্রামে-গঞ্জে ইনকাম ট্যাক্স কমিশনারেরও কোনও দাম নেই।

এগ্রিকালচার-ইনকামের উপর তো ট্যাক্স নেই। গ্রাম হলো গিয়ে দারোগা-পুলিশের এক্তিয়ারে।

বর্মনকাকু বললেন, নগেনদা। বেশি কিছু চাই না। দুগ্গা ভাত আর ডাইল হইলেই অইবনে।

অন্যদের কাউকে দিয়ে কিছু হলো না। ব্যবস্থা করলো শেষে ওই গাইডই। একজন গরিব মুসলমান চাষীর বাড়িতে বিকেল চারটেতে মাটির মেঝেতে, কাঁটাল কাঠের পিঁড়িতে বসে লাল-চালের মিষ্টি ভাত, কালোজিরা-কাঁচালংকা রসুন ফোড়ন-দেওয়া মুসুরির ডাল, আর খেতের আলুভাজা যে খেয়েছিল ঋভু তা আজও মনে আছে। মুসুরির ডালের গন্ধটা আর আলুভাজার গন্ধটাও এখনও নাকে ভাসে। ভাতে একটু খাঁটি গাওয়া ঘি। আঃ।

সেই চাষি বউয়ের মুখ দেখতে পায়নি। আড়াল থেকে তার চুড়ির শাঁখার রিনঝিন শুনেছিল শুধু। তারা এতোই গরিব যে ডিমও দিতে পারেনি ওদের একটি করে। কিন্তু আজ সেই ডাল-ভাতের ঋণ শোধ করার কোনও উপায় নেই বলেই তা প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে শুধুমাত্র স্বীকার করেই নিজেকে একটু হালকা করতে চায় ঋভু।

সারা দেশ, পৃথিবীতে, অনেক কিছুই খেল এ পর্যন্ত, কিন্তু অমন স্বাদু আর কিছু খেয়েছে বলে সত্যিই মনে পড়ে না।

আমানতগঞ্জের ওই দক্ষিণা ঘোষের বাড়িতে যত দিন ছিল তত দিন রোজই মিহিরডার সঙ্গে দেখা হতো। টাউন স্কুল, যে-স্কুলে মিহির পড়ত, তা ছিল ঋভুদের বাড়ির কাছেই।

কিছুদিন পরেই কাঠপট্টিতে একটি বাড়ি পেয়ে সেখানে উঠে গেল ঋভুরা। আমানত গঞ্জ থেকে ঋভুর স্কুল, হৃষীকেশের অফিস, সবই বড়ো দূর হতো। ঋভুর তো দিনের অর্ধেকটা হেঁটে হেঁটেই চলে যেত।

কাঠপট্টির বাড়ির মালিক ছিলেন দত্তরা। ভূপেশ দত্ত। নতুন বাড়ি করেছিলেন ভাড়া দেওয়ারই জন্যে। দোতলাটি ভাড়া নিয়েছিলেন হৃষীকেশ। ওই বাড়ির কাছেই ছিল ভূপেশবাবুর নিজেরও বাড়ি।

দেশভাগের পর ভূপেশবাবু ল্যান্সডাউন রোডে (রাসবিহারীর মোড়ের কাছে) মস্ত পেট্রল পাম্প করে (Car-fill) নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। খুবই পরিশ্রমী এবং নিয়মানুবর্তিতাতে বিশ্বাসী ভদ্রলোক ছিলেন। সাদা ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি আর পামশু পরে ঘড়ির কাঁটা ধরে পাম্পে আসতেন এবং কাঁটা ধরে যেতেন।

ছেলেরা, জামাইরাও সব কৃতী।

কাঠপট্টির বাড়ির ঠিক উলটোদিকে ছিল কালাভাইদের চৌধুরী ব্রাদার্সের একটি স্টেশনারি দোকান। ওঁদের কর্মচারী, নরেনবাবু, নরেন্দ্রনাথ চন্দ, রোজ সকালে বিকেলে একটি রিকশা করে এসে নামতেন, থলেতে চাবি নিয়ে।

কত যে চাবি খুলতেন তিনি এক এক করে। ঋভু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখত। দুপুরে আবার চাবিবন্ধ করে খেতে যেতেন তিনি। বিকেলে এসে দোকান খুলে রাত অবধি থাকতেন। বছরের মধ্যে প্রতিদিন, এক রবিবার ছাড়া নরেনবাবু আসতেন। একটি দিনও কামাই করতেন না। ঋভুর মনে আছে যে সে ওই দোকানে কিছু কিনতে গেলেই নরেনবাবু একটি মাত্র টেবল ফ্যান ওর দিকে ঘুরিয়ে দিতেন।

কালাভাই প্রায়ই আসতেন হৃষীকেশের কাছে। কালাভাইয়ের বাড়িতেও ঋভুদের খাবার নেমন্তন্ন থাকত কখনও কখনও। বাড়িতে গিয়েও লক্ষ করতো ঋভু যে নরেনবাবু ওঁদের বাড়িতেই থাকেন। কালাভাইও অবিবাহিত ছিলেন। নরেনবাবুও তাই।

কালাভাই কথা বলতে ভালোবাসতেন। অধিকাংশ অবিবাহিত মানুষেরাই কিন্তু বেশ রাশভারী হন। কিন্তু নরেনবাবুর মতো মিতভাষী মানুষ এ জীবনে খুব কমই দেখেছে ঋভু।

দেশ যখন ভাগ হয়ে গেল তখন কালাভাইয়েরা এসে চৌরঙ্গিতে, চৌরঙ্গি আর ধর্মতলা স্ট্রিটের মোড়ে "চৌধুরী ব্রাদার্স" নামক রেস্তোরাঁ করেছিলেন। তা এখনও আছে। তবে আগের জেল্লা নেই। বরিশালের যে সব মানুষ কলকাতায় আছেন এখন তাঁদের অনেকেই হয়তো জানেন না যে দোকানটি কালাভাইদের।

মিতভাষী অবিবাহিত নরেনবাবুও বরিশালের মায়া ত্যাগ করে চলে আসেন। উনি একটু একটু টাইপ জানতেন। হৃষীকেশ দেশভাগের পর পরই বীতশ্রদ্ধ হয়ে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। নিজের অফিস করেন। সেই অফিসে নরেনবাবু টাইপিস্ট হিসেবে ঢুকে পড়ে হৃষীকেশের অন্যতম পারদর্শী এবং একজন নির্ভরযোগ্য সহকারী হিসেবে কয়েকবছরেরই মধ্যে বিবেচিত হন।

উন্নতি করার ইচ্ছা থাকলে এবং উন্নতি করার বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলে, যে মানুষের মধ্যে সততা এবং উদ্যম আছে তাঁর পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয় এই নরেনবাবু তাঁর জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। মিতভাষী, প্রচণ্ড পরিশ্রমী, অকৃতদার এই মানুষটি কাঠপট্টির মনিহারি দোকানের বিক্রেতা থেকে এসে একটি আইন ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তা মানুষের এবং বিশেষ করে বাঙালি উদ্বাস্তুদের ইতিহাসে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ ও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

আজকে ঋভুর সঙ্গে নরেনবাবুর কোনও যোগাযোগ নেই। কালাভাইয়ের সঙ্গেও নেই। তবে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তাঁরা যেন ভালো থাকেন, সুখে থাকেন। পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর যেন তাঁদের মঙ্গল করেন।

বরিশাল জেলা স্কুলে ঋভুর অনেক বন্ধু হলো। ক্লাস সিক্সে পড়ত সে। মঞ্জুরুল করিম বলে তার এক সহপাঠী ছিলো। সুদর্শন ছিপছিপে। লাল ঠোঁট। মেধাবী। প্রাণবন্ত। সব সময় হাসিমুখ। উচ্ছ্বাসে ভরপুর। ঋভুর পাশেই বসত সে। ঋভু তার মুখ দিয়ে রসুনের গন্ধ পেত। মঞ্জুর, মহম্মদ ইকবালের গাওয়া "সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ (গানে উচ্চারণ হিন্দুসিতা), হামারা হামারা, সারে জাঁহাসে আচ্ছা। ম্যায় বুলবুলে হ্যায় উসকি ইয়ে গুলিস্তা (গানে উচ্চারিত গুল্‌সিতা) হামারা হামারা সারে জাঁহাসে আচ্ছা।" গানটিকে গাইতো "সারে জাঁহাসে আচ্ছা পাকিস্তাঁ হামারা হামারা, সারে জাঁহাসে আচ্ছা।"

এই ভাবে।

দেশভাগ হবে, মুসলমানেরা জিন্নাসাহেবের ইচ্ছা মতো পাকিস্তান পাবে এই স্বপ্নে মশগুল ছিলেন তখন মুসলমান-গরিষ্ঠ এলাকার সকলেই। ঋভুর সুন্দর মেধাবী বন্ধু মঞ্জুরও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এ কথা ঠিক যে, বঙ্গভূমে মুসলমাননেরা বহুযুগ বহুকাল হিন্দুদের শুধু গোলামিই করেনি তাদের নানা অত্যাচারও সহ্য করে এসেছেন। অথচ বাঙালি মুসলমানেরাই বাঙালি হিন্দুদের সব চেয়ে কাছের মানুষ। ভাষার বাবদে, আমোদ অনুষ্ঠানের বাবদে, সংস্কৃতির বাবদে। আজ পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালি হিন্দু-মুসলমানও যেমন উত্তর ভারতের মাতব্বরি পদে পদে মেনে নিয়ে নিজস্বতার মর্যাদা ভুলতে বসেছে তার চেয়েও তীব্রতর সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের খানসেনাদের আমলে। তবে তাঁরা বুকের রক্তে আর নারীর সম্মান দিয়ে তাঁদের নিজস্বতা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

সম্মানের সঙ্গে বাঁচার জন্যে যা কিছু করা যায়, করা উচিত, তা করেছিলেন।

মঞ্জুরুল শুধু একজন কৃতী অফিসার নন বাংলাদেশের, উনি একজন কবিও। মঞ্জুর ১৯৫২ সনের পাকিস্তানি ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে প্রথম হয়েছিল। তারপর লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস্‌-এ গিয়ে পড়াশুনো করে পাকিস্তানি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে যোগ দেয়। কবিতা লেখে "ইমরান নূর" নামে। মঞ্জুর জানিয়েছে যে ও মনযূর-উল্‌-করিম।

ছেলেবেলার কোনো বন্ধু বড়ো হয়েছে জানলে যা আনন্দ হয় তেমন আনন্দ অন্য কিছুতেই হয় না। যদি কোনওদিন ঋভুর যাওয়া হয়ে ওঠে বাংলাদেশে তবে মনযূরের সঙ্গে দেখা যে হবে, এই ভাবনাটিই খুব উত্তেজনাকর।

ঋভুর আরেক সহপাঠীর কথাও খুব মনে আছে এবং মাত্র একবছর আগে তার সঙ্গে কলকাতাতে হঠাৎ দেখা হল। সেও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। তার নাম দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ডাকনাম পাহাড়ি। পাহাড়ির বাবা বরিশাল বি.এম. কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

মনযূর এবং পাহাড়ীরা প্রকৃতার্থে ভালো ছেলে ছিল। ঋভু ছিল অতি সাধারণ। নিজেকে মাঝে মাঝে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করে এই ভেবে যে, এতো সব মেধাবী ও জ্ঞানী ছাত্ররা ঋভুকে ভালোবাসত কারণ যাই থাক, সেটা ছিল তাদেরই মহত্ত্ব।

পাহাড়ী এখন ব্যাঙ্গালোরের ইনস্টিট্যুট অফ সায়ান্সে ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান।

ঋভু লিখত মঞ্জুরুল্ল। মঞ্জুর শুধরে দিয়েছিল। লিখেছিল মনযূর-উল্।

আলমকাকু ছিলেন হৃষীকেশের সহকর্মী। যদিও অধস্তন পদে ছিলেন। ছিপছিপে, ফরসা, অতি সুদর্শন অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন আলমকাকু। তাপসীকে "বউদি" "বউদি" করতেন সব সময় এবং তাপসীও "আলম" বলতে অজ্ঞান ছিলেন।

ঋভুর এক মাসতুতো দিদি বরিশালে বেড়াতে এলে আলম সাহেব তাঁর প্রেমে পড়ে যান। সেই দিদির গায়ের রঙ যদিও কালো ছিল কিন্তু অমন সুন্দর গড়নের সপ্রতিভ তরুণী তখনকার দিনে দক্ষিণ কলকাতাতেও খুব কমই ছিল। আলমকাকুর দোষ ছিল না। হৃষীকেশের ঔদার্যে কোনওদিনই খামতি ছিল না কিন্তু বড়ো মাসিমাদের পরিবার রীতিমত রক্ষণশীল ছিল। রক্ষণশীলতাও কোনো দোষ নয়। মতামতের ব্যাপার। প্রত্যেকেরই অধিকার আছে নিজের মতামত নিয়ে চলবার। কিন্তু "প্রেম" ব্যাপারটাকে রীতিমত ভয়ানক ব্যাধি বলে মনে করতেন তাঁরা। হয়তো আজও করেন। এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিয়ের কথা তো অচিন্ত্যনীয়ই ছিলো তাঁদের পক্ষে।

আলমকাকু, ওঁরা কলকাতাতে ফিরে গেলে, হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন।

ঋভুর মনে সেই ছেলেবেলাতেই, ছোটোকাকু ভোপালকে দেখে, আলমকাকুকে দেখে; এই ধারণাই জাঁকিয়ে বসেছিল যে মেয়েরা এক কারণে কী অন্য কারণে ছেলেদের চিরদিন কাঁদিয়েই এসেছে।

আলমকাকু একদিন পায়জামা-পাঞ্জাবি-পরা ছিপছিপে, সপ্রতিভ এক ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন তাপসীর কাছে, আলাপ করবার জন্যে। ভদ্রলোকের নাম, আবুল কালাম সামসুদ্দিন। তাঁর কাঁধের ঝোলা থেকে একটি বই বের করে স্বাক্ষর করে তাপসীর হাতে তুলে দিলেন তিনি। প্রথম পাতাতে লিখলেন, বউদি, শ্রদ্ধাভাজনীয়াসু।

তাঁর স্বরচিত বইটির নাম আজ আমার মনে নেই।

কবি বড়োমামা সুনির্মল বসু ছাড়া এই একজন গদ্যলেখককে, সাহিত্যিককে প্রথম সামনাসামনি দেখে চর্মচক্ষু সার্থক করল ঋভু। কলকাতায় অবশ্য বড়োমামার মাধ্যমে প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, অখিল নিয়োগী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মনোজ বসু, ইত্যাদি অনেক নামী কবি লেখকদের দেখেছিল। তবু তাঁরা সকলেই বয়স্ক। এমন একজন ঝকঝকে তরুণ যে সাহিত্যিক, তাঁর নিজের লেখা বই যে প্রকাশক প্রকাশ করেছেন এবং সেই বই যে যখন তখন, যাকে তাকে, ইচ্ছে হলেই ঝোলা থেকে বের করে দিয়ে দিতে পারেন এ এক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা ছিল।

ঋভু স্বপ্ন দেখল যে, বড়ো হয়ে সেও সাহিত্যিক হয়েছে।

বরিশাল জিলা স্কুলের বর্তমানের প্রধান শিক্ষক রাজিয়া বেগম। ঋভুরা যখন পড়ত স্কুলে, তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিঃ বি কে বিশ্বাস। জাতে তিনি ছিলেন, যতদূর মনে পড়ে ঋভুর, ক্রিশ্চান। চমৎকার মানুষ ছিলেন। শীতকালে একটি মেরুন-রঙা স্যুট পরে আসতেন। গোঁফ ছিল। একদিকে ছিলেন রাশভারী অন্যদিকে ছিলেন খুব রসিক ও প্রাণবন্ত, স্কুলের বাইরে। ঋভুর বাবার সঙ্গে এ. ডি. এম. অতীন্দ্র মজুমদার, ইরিগেশান এঞ্জিনিয়ার গোস্বামী সাহেব ইত্যাদিদের সঙ্গে পিকনিকে ও শিকারেও যেতেন। শিকারপুর, মাধবপাশা ইত্যাদি জায়গাতে বাস ভাড়া করে যাওয়া হতো। ধনধ্যান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা এবং আরও অনেক গান সম্মিলিতভাবে গাইতে গাইতে।

অনিশ্চিত ছিলো হিন্দু মুসলমান সকলের মনেই, কিন্তু স্বাধীনতা যে আসছে সে ব্যাপারে প্রত্যেকের মনেই এক উদ্দীপনাও ছিল।

এম. এ. হামিদ সাহেব ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার। সম্ভবত বাংলা-শিক্ষক ছিলেন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। তিনি একদিন একটি বাঁধানো পুজো সংখ্যা এনে সুনির্মল বসুর একটি গল্প বের করে তা পড়বার আগে সুনির্মল বসুর ফোটো দেখিয়ে বলেছিলেন, বলো তো, এটি কার ছবি?

ঋভু নাম বলতে উনি শুধিয়েছিলেন, কী করে চিনলে তুমি?

ঋভু খুব গর্বভরে বলেছিল, উনি আমার বড়োমামা।

সেই সময়ে সুনির্মল বসুকে চিনতেন না বা তাঁর কবিতা-গল্প-ছড়া পড়েননি এমন মানুষ কমই ছিলেন বঙ্গভূমে।

ইংরিজি শিক্ষকদের নাম সম্ভবত ছিল শ্রী রমেশচন্দ্র কর্মকার, শ্রী সুধীর রায়চৌধুরী এবং শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেন। তাঁদের কথা তেমন স্পষ্ট মনে নেই।

কাঠপট্টিতে চলে আসায় এখন আর রোজ আমানতগঞ্জে যেতে পারে না ঋভু। ছুটির দিনে তাপসীই জোর করে পাঠান। বলেন, যা ঋভু, মেজদির খোঁজ নিয়ে আয়।

সেখানে গেলেই কত যে আদর করেন রেণুমাসিমা ও মেসোমশাই! ওঁদের রান্নাঘর থেকে কীর্তনখোলা নদী দেখা যায়, নদীর চর। কতরকম নৌকো চলে যায়, গুণ টেনে, পাল তুলে; দাঁড় বেয়ে, মহাজনী নৌকো, গয়নার নৌকো, ছোটো ছই তোলা ডিঙি, লকলকে দ্রুতগতি ছিপ নৌকো।

ঘোষের দোকান থেকে আনিয়ে গরম রসগোল্লা খাওয়ান মাসিমা।

মিহিরডার সঙ্গে বনে-বাদাড়ে, হোগলবাদার পাশে পাশে, নদীর পাড়ে, পুকুর পাড়ে, মাছরাঙা আর পানকৌড়ি আর সল্লিহাঁস আর ডাহুকের দেশে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগে ঋভুর। তামারহাটের মতো, রংপুরের মতো, বরিশালেরও এই প্রকৃতি তাকে মোহাবিষ্ট করে। কত নাম-না জানা ফল, কত পাখি, কত ফুল, অবাক হয়ে যায় ঋভু।

কলকাতায় আর কখনওই ফিরবে না বলে ঠিক করে।

ঋভুর দেখা সেই উনিশশো ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের বরিশাল আজ কেমন রূপ নিয়েছে কে জানে! কিছুদিন বাদেই পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যাবে সেদিন থেকে। অথচ মনে হয়, হাফ-প্যান্টপরা ঋভু এই সেদিনই গেছিলো বরিশালে।

কলকাতাও তো ওই সময়ে আজকের মতো ছিল না। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষ, খিদে, ধুলো, ধুঁয়ো, আওয়াজ, নোংরা আবর্জনা এসব কি বরিশালের মতো শহরকেও গ্রাস করেছে? করে থাকলে, বলতে হবে, এ বড়ই দুর্দৈব। সমস্ত পৃথিবীই আজ নষ্ট ভ্রষ্ট হতে বসেছে তা হলে! পালিয়ে যাবার জায়গা বুঝি আর রইল না!

সন্ধে হয়ে আসছিল। মিহিরডা "জান" এর উপরে বসে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিল। পাশে একটা মোড়া পেতে বসে ঋভু নদীর দিকে চেয়েছিল। নদীর মধ্যে চর না থাকলে নদীর চরিত্র খোলে না। তবে ভরা বর্ষায় চর প্রায় ডুবে গেছিল। দিনশেষের সন্ধের জলজ সৌন্দর্যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে যেতো ও। মুখ দিয়ে কথা সরত না।

একটু পরেই অন্ধকার নেমে আসবে। এই সব সময়ে, ওর জীবনানন্দর কবিতা কথা মনে পড়ে যায়। বইটি বারবার পড়ে আজকাল ঋভু। তাপসী, এখানের বইয়ের দোকান থেকে কিনে দিয়েছেন বইটি ঋভুকে। 'রূপসী বাংলা'। সব কিছু যে বোঝে এমন নয় কিন্তু তার কিশোর মনে রূপসী বাংলা এক স্থায়ী আসন করে নিয়েছে এরই মধ্যে। ভাত-ডালের চেয়েও বড়ো প্রয়োজন যে কিছু আছে মানুষের, তা এই কবিতা পড়েই যেন প্রথমে উপলব্ধি করে ঋভু।

> "আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
> হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
> হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
> কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁটাল ছায়ায়—
> হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়..."

নীচু স্বরে আবৃত্তি করে ঋভু, স্বগতোক্তির মতো।

মিহিরডা বললো, ভাবতাছিস কি? বিড়বিড়াইয়া কইস কি তুই?

ঋভু একটি লাইন শোনাল মিহিরডাকে :

"হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে";

মিহিরডা বলল, সুদর্শন? সুদর্শনডা আবার কেডা? সুদর্শন সাহা নাকি? পাটের কারবারি? কাউনিয়ায় যার বাড়ি? ডান কানটা বাঁ কান থিক্যা ছোটো? আরে! তারে তুই চিনলি ক্যামনে? হুঃ। শুনতাছিলাম বটে, সে ব্যাটা তড়কাছে আইজকাল।

ঋভু বলল, না, সে নয়।

তবে? এই সুদর্শনডা আবার কোন্ সুদর্শন? যাউকগা। যা পড়তাছিলি পড় শুনি।

"হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়, রাঙা মেঘ সাঁতরায় অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে..."

চল্ চল্। বাড়ি চল্। তিরিশটা ইচা মাছ হইল। বোঝলা মণি।

মিহিরডা বলল।

তারপর বলল, তর কেসডা খারাপ রে ঋভু! ক্রমশই খারাপ হইতাছে। মেসোমশাইরে কইতে লাগব। চল্, কালই তরে হাকিমসাহেবের কাছে লইয়া যাম্যু। তর্ দেখি মাথার গোলমাল হইছে।

ঋভুরও আজকাল মাঝে মাঝে তেমনই মনে হয়। জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ এঁরা সব ধীরে ধীরে ওকে পুরোপুরিই পেয়ে বসছে।

কী যে হবে তা ও নিজেই জানে না! ওর ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার।

এখন বরিশালে বেশ গুছিয়ে বসেছে ঋভুরা। কাঠপট্টির বাড়িতে বরিশালের বিখ্যাত মানুষ শ্রী সরল দত্ত একদিন এসেছিলেন। বিখ্যাত উচ্চাঙ্গসঙ্গীত-শিল্পী তারাপদ চক্রবর্তীও এসেছিলেন কলকাতা থেকে। উঠেছিলেন অন্যত্র এবং এসেছিলেনও অন্যদের আমন্ত্রণে কিন্তু ঋভুদের বাড়িতে একদিন আসর বসল। কেন যে বসল তা ঋভু ঠিক বুঝল না।

ঋভুর ছোটোকাকু, রেডিয়োতে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত হলেই রেডিয়ো বন্ধ করে দিয়ে বলতেন, "দূর ছাই। মানুষে যে কেন এই ঘাউ ঘাউ শোনে!"

ঋভুর বাবা হৃষীকেশও যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন তাও আদৌ নয়। তাপসী নিজে খুব ভালো গাইতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত, কী অতুলপ্রসাদ। নজরুলও। কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ছাত্রী বা সমঝদার বলতে যা বোঝায় তা তিনিও ছিলেন না।

তবু ঋভুদের বাড়িতেই গান হয়েছিল। হয়তো জায়গা বেশি ছিল বলে বা ঋভুর অজ্ঞাত কোনো কারণে। অনেক মানুষ এসেছিলেন।

শ্রদ্ধেয় তারাপদবাবুর গানের স্থান বা পরিবেশটি আদৌ ভালো লেগে ছিল কি না তা জানা যায়নি। আজ আর জানার উপায়ও নেই।

ভারতীয় সমাজে কিছু ধনবান এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তি থাকেন তাঁদের অর্থবলে এবং কুরসি বা ক্ষমতাবলেই তাঁরা সবকিছুরই সমঝদারির সার্টিফিকেট পেয়ে যান। তাঁরা গুণগ্রাহিতা না করলে আর কেই বা করবেন! এমনই একটা ভাব আর কী! সেই কারণেই বোধহয় হৃষীকেশের বাড়িতে অনুষ্ঠান করানো হয়েছিল। হৃষীকেশের কোনো রকম চেষ্টা বা ইচ্ছে ব্যতিরেকেই হৃষীকেশকে সমঝদার বনতে হয়েছিল। 'না' করারও উপায় ছিল না। তাতেও নিন্দে হতো। "হ্যাঁ" করেও হতো; এখন যেমন হচ্ছে।

কিশোর ঋভুরও সে গান মোটেই ভালো লাগেনি। সে, রাত বাড়তেই আসরের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল যে, এটুকু মনে আছে। যেমন ঘুমিয়ে পড়েছিল, বড়োকাকুর বিয়েতে। ফরিদপুরের পসরা গ্রামে, বরযাত্রী গিয়ে।

ঋভুর কাছে কাকার বিয়ে যেমন একটা আনন্দোৎসব ছিল তার কাছে তারাপদ চক্রবর্তীর গানও তেমনই একটি আনন্দোৎসবই ছিল। বিয়ে ব্যাপারটার মতোই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ব্যাপারটাও যে ঠিক কি তা না বুঝেও এতো লোকের আনন্দ ও স্ফূর্তি দেখে তার মনেও তার কিছুটা সংক্রামিত অবশ্যই হয়েছিল।

তবে "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি" পাড়েনি বলেই, শুধুমাত্র "তাল"-এর বেড়াতেই আটকে থাকেনি। ঘনঘন মাথা নাড়া ও হাততালি দিয়ে যাঁরা ঝালা বা তারানাকেই সংগীতের একমাত্র গন্তব্য বলে মনে করেন তাঁদের দল ভারী করেনি পরবর্তী জীবনে আন্‌পড় হয়ে থেকেও। সুরের খোঁজেই ফিরেছে।

পরবর্তী জীবনে সে শুধু উচ্চাঙ্গ বা কেন সব সংগীত সম্বন্ধেই অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠেছিল। জেনেছিল, সংগীতরস যাকে আপ্লুত না করেছে তার মনুষ্যত্বও সম্পূর্ণতা পায়নি। সেটা ঘটেছিল রুচিশীল বন্ধুবান্ধবদের সান্নিধ্যে। বহু নারীর সান্নিধ্যে। যে-কোনো সৃজনশীলতারই, নারীদের মতো এতো বড়ো ধারক ও বাহক পৃথিবীর কোনো কালে, কোনো দেশেই ছিল না। হয়তো হবেও না। এ কারণেই যখন একধরনের সর্বজ্ঞ মানুষ, কাউকে মেয়েদের নায়ক, মেয়েদের লেখক, মেয়েদের গায়ক বলে তাচ্ছিল্য করেন তখন ঋভুর হাসি পায়। এই সব ক্ষেত্রে মেয়েদের বিচারটাই দেখা যায় ধোপে টিঁকে যায়। যুগ-যুগান্ত ধরে। শরৎচন্দ্র, উত্তমকুমার এবং আরও অনেকেই যেমন টিঁকে গেছেন। কায়দা-কেরদানি, ফাঁকা-আঁতেলগিরি, মেডেলের মালা জীবনের সব ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় না।

ফুচকা বা দহিবড়াও ঋভুদের ছেলেবেলায় কলকাতার বাঙালিরা কেউই খেতেন না। ঋভুর মনে আছে, প্রথম দিন দহিবড়া খেয়ে সে বমি করে ফেলেছিল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বা সুরাতে আসক্তিও একদিনে আসে না, নারীতেও নয়। যা-কিছুই তীব্র স্বাদের, তিক্ত, কটু-লবণাক্ত-কষায়-সুমিষ্ট তার কোনো কিছুতেই আসক্তি একদিনে আসে না। একদিন যা কিছু দূরে ঠেলে, মুখবিকৃতি ঘটায়; কিছুদিন পরে তাই মনে হয় অমৃত। সেটা অমৃতই কি না, তা বিচার করার স্পৃহা বা শক্তিও তখন আর থাকে না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বেলাতেও তাই ছোটোকাকু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পছন্দ করতেন না বলেই যে তিনি মানুষ হিসেবে অসংস্কৃত ছিলেন এ কথাও বলা যায় না। কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-বাদ্যকার-শিল্পীদের মধ্যে অনেককেই একটি আলগা উচ্চমন্যতায় ভুগতে দেখা যায়। সেটা কিন্তু, প্রকৃত সৃজনক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁদের মধ্যে প্রত্যাশার নয়। গান গাইতে পারলে বা কবিতা লিখতে পারলেই মানুষ কিছু সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়ে যান না। বরং পরবর্তী জীবনে ঋভুর যা অভিজ্ঞতা, তাতে উলটোটাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। যেখানেই তথাকথিত গাইয়ে-বাজিয়ে-লিখিয়ে সেখানেই নোংরা দলাদলির পীঠস্থান। সেখানেই অসংস্কৃতির আসন পাকা-পোক্ত। "সংস্কৃতি" একটা মানসিক মার্গ-বিশেষ। কসাই অথবা যে-মানুষ ফাঁসিতে ঝোলান অন্যকে (Hangman) তিনিও অনেক গাইয়ে-বাজিয়ে-লিখিয়ের চেয়ে বেশি সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে পারেন্।

বরিশালের জেলা স্কুলটি ছিল শহরের এক প্রান্তে। নদীর কাছেই। স্টিমার ঘাটার সামনে দিয়ে যে পথ চেলে গেছে তা থেকে বাঁয়ে এলেই সুন্দর লাল-কাঁকুরে পথ ছিল একটি। সেই পথেই ছিলো জর্ডন

কোয়ার্টার্স। কেন ওই কোয়ার্টারের নাম অমন হয়েছিল তা ঋভু জানে না, তবে উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরেরাই থাকতেন ওখানে।

কাঠপট্টিতে কিছুদিন থাকার পর ঋভুরা জর্ডন কোয়ার্টারেই উঠে এসেছিল। দোতলা বাড়ি। সম্ভবত লাল-রঙা। পরপর কয়েকখানি। তারই একটিতে থাকত ঋভুরা। সে বাড়িরই একতলার একটি ঘরে থাকতেন ব্যাচেলার রাহাকাকু।

শ্যামানন্দ জালান এর সলিসিটর ফার্মে, অবসর নেবার পর রাহাকাকু কাজও করতেন। এখনও করেন কিনা জানা নেই। শ্যামানন্দ জালান নিজেও নাটক-পাগল মানুষ। সে কারণেই রাহাকাকুর সঙ্গে তাঁর অন্য ধরনের বন্ধুতা থাকার কথা। এবং নিশ্চয়ই ছিল। আইনের ব্যাপারেও দুজনেরই দক্ষতা ছিল।

রাহাকাকু ছিলেন উত্তর মেরু, তো ঋভুর বাবা ছিলেন দক্ষিণ মেরু। ব্রাহ্মভাবাপন্ন, হয়তো ব্রাহ্মও, বঙ্গ-সমাজে আদর্শ সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতিবান অবিবাহিত পুরুষ বলতে যা বোঝাত তিনি তাই ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গোরার 'গোরা' বলে চালিয়ে দিতেও কোনো অসুবিধে ছিল না তাঁকে। তৎকালীন শান্তিনিকেতনের সুন্দরী গায়িকা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। রেডিয়োতে তাঁর গান থাকলেই রাহাকাকু চোখ বন্ধ করে রেডিয়োর সামনে বসে থাকতেন।

হৃষীকেশ ছিলেন ঠিক উলটো। একে তো 'বাঙাল', তায় প্রচণ্ড 'লাউড'। হাহা করে হাসতেন। জোরে কথা বলতেন। যেন, নদীর এপারে দাঁড়িয়ে ওপারে কথা বলছেন। নিজের দুর্দম প্রাণশক্তি নিয়ে কী যে করবেন ভেবে পেতেন না। খেতেন, খাওয়াতেন, হাসতেন, হাসাতেন কিন্তু তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গীয়-সম্ভ্রান্তরা তাঁকে চরিত্রর এই আদিমতা ও বৈকল্যর কারণে হয়তো 'ভদ্রলোক' বলেই মানতে রাজি ছিলেন না। যে কারণে, তাঁরা তাঁকে "বাঙাল" বলতেন হয়তো ঠিক সেই কারণেই রাহাকাকুকে পরম-সম্ভ্রান্ততার শিরোপা দিতেন।

আজকে ঋভু বিশ্বাস করে যে, কোনো মানুষেরই বহিরঙ্গ রূপটা কোনো ব্যাপার নয়। মুখ হাঁ করে কথা বললে বা খেলে (ভারতীয়রা তেমন করেই চিরদিন খান) বা মুখ না হাঁ করে কথা বললে বা না-খেলে একজন মানুষের আত্মিক চরিত্রের কোনোই অবনতি-উন্নতি হয় না। এসব বাহ্য ব্যাপার। ধর্মের রিচুয়ালসের মতো। নইলে, রাহাকাকুর মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ কেন হৃষীকেশকে নিজের দাদার মতোই দেখবেন?

নদীতে ইলিশ মাছের নৌকো এসে লাগত। দু আনা সের। তখনও জালের মধ্যে ছটফট করত ইলিশ। একটাকায় চারটি মস্ত মস্ত ইলিশ হতো।

বড়ো নদী যে মানুষের "মনের প্রসারতা ঘটায়" এই বাক্যটি সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মেছিল ঋভুর, বরিশালে থেকে। যদিও গৌর নদী তিস্তা বা ব্রহ্মপুত্র বা পদ্মা মেঘনার মতো বড়ো আদৌ ছিল না। আদিগন্ত নীল আকাশ, নারকেল সুপুরির বন, বরিশালের মানুষের সারল্য, মনের হাসি, রূপসী বর্ষা, বর্ষার ইলিশ এসব মিলে বরিশালকে ঋভুর বড়ো ভালো লেগেছিল।

স্কুলের হারুণ, মনযুর-উল এবং আরও কত বন্ধুদের কথা মনে হলে আজও মন খুশিতে ভরে ওঠে। হারুণের কথা বলতে ভুলে গেছিল। কোনো যোগাযোগই নেই আর। কে জানে কেমন আছে? কী করছে?

সহপাঠী পাহাড়ী সেনগুপ্ত দেশভাগের পর চিঠি লিখেছিল বরিশাল থেকে যে, কলকাতায় এসে স্কুলে ভর্তি হতে চায়। তা, ঋভু যে স্কুলে পড়ে, সেই স্কুলটি কেমন?

এমন Leading Question কেউই কলে তার উত্তর একটাই হতে পারে। যদি কেউ শুধোন, তোমার মা-বাবা কেমন? বা, যে স্কুলে পড়ো সেই স্কুলটি কেমন? বা তোমার মাস্টারমশাইরা কেমন? তাহলে কোন্ কৃতঘ্ন মানুষ সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন, একথাটা বলতে পারে যে, "না হে তেমন সুবিধের নয়।"

অতএব ভদ্রলোক, কৃতজ্ঞ, ঋভুর উত্তর পেয়ে বরিশাল থেকে কলকাতায় এসে পাহাড়ী তীর্থপতিতেই ভর্তি হলো।

স্কুলটি যে খারাপ এ কথা ঋভু বলতেই বা যাবে কেন? যারা ভালো ছেলে তারা তো ভালোই হয়। স্কুলের পুরো মদত পেলে নিঃসন্দেহে আরো ভালো হতে পারত কিন্তু যারা ছেলেই খারাপ, ঋভুরই মতো, তাদের 'হ্যারো' বা 'ইটন'ও হয়তো কিছুই করতে পারে না। তবে এটাও আবার ঠিক যে, স্কুল-কলেজের বিদ্যাটাই শেষ কথা নয়।

উইনস্টন চার্চিলকে ওই স্কুল থেকেই অতি জঘন্য ফল করায় বিতাড়িত করা হয়েছিল।

তখনকার দিনে প্রত্যেক জেলার জেলা-স্কুলগুলি ছিল অন্য জাতের। ঋভুর আশ্বাসে কলকাতাতে এসে পাহাড়ী তীর্থপতিতে ভর্তি হয়ে গেল। কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই স্কুলের বাথরুমের দেওয়ালের 'বাণী' পড়ে সে আঁতকে উঠে ঋভুকে বলল, 'তুমি ভাই আমাকে সত্যি বললে না কেন?'

ঋভু বলেছিল, আমি তো ভাই ভালো ছেলে নই তোমার মতো। তাই আমার কাছে যেটা ভালো, তোমার কাছে সেটা ভালো ঠেকল না।

আর কীই বা বলতে পারত!

পাহাড়ী অচিরেই অন্য 'ভালো' স্কুলে চলে গেল।

তারপরও ঋভুর সঙ্গে দয়া করে কিছুদিন সে যোগাযোগ রেখেছিল। তবে ক্ষীণ। বালিগঞ্জ লেকের কাছে তাদের বাড়িতেও ঋভু গেছিল বার দুয়েক। তার দাদারাও সব কৃতী। বউদিরাও সুন্দরী এবং কৃতী। মনে আছে মা খুব গান ভালবাসতেন।

বছর কয়েক আগে রবিবারে ক্যালকাটা ক্লাবে এক ছোট্টখাট্ট ভদ্রলোক অন্যদের সঙ্গে দোতলা থেকে নেমে বেরিয়ে যেতে যেতে এসে হঠাৎ ঋভুকে বললেন, এক্সকিউজ সি। আপনার নামটা কি?

নামটা বলতেই, পাহাড়ী জড়িয়ে ধরে বলল, ঋভু! তুই! দ্যাখ তোকে কেমন চিনলাম!

ওর এখন "সল্ট অ্যান্ড পেপার" দাড়ি। মাথায় টাক উঁকি দিচ্ছে।

বলল, ব্যাঙ্গালোর চলে আয় একবার।

তোর ঠিকানা? ব্যাঙ্গালোরে গেছিতো অনেকবারই কিন্তু ...।

ইনস্টুট্যুট অব সায়েন্সে সেনগুপ্তর খোঁজ করবি। আমার ঠিকানা লাগবে না।

সেনগুপ্ত বাছা! পাহাড়ী, শ্রী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, তুমি যদি 'ঋভু' পড়ো (তুমি নিশ্চয়ই এসব জোলো-সাহিত্য পড়ো না) তবে দয়া করে তোমার পুরো ঠিকানাটা একটু পাঠিয়ো।

জর্ডন-কোয়ার্টারের দিনগুলির স্মৃতি ভারি উজ্জ্বল হয়ে আছে। স্টিমার ঘাটের কাছে বলে, রাতের অন্ধকারে দূরের স্টিমারের সার্চলাইট হঠাৎ নিঃশব্দে এসে সবকিছু আলো-ঝলমল করে দিত। সেই নিঃশব্দ আলোর ঝলকানি এখনও পরিণত ঋভুর গভীর ঘুমের মধ্যে তার বুকের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কী যেন খোঁজে।

বড়ো স্টিমারের সার্চলাইট এক আশ্চর্য দৃশ্য। বর্ষার রাতে, ঘনঘোর বর্ষার মধ্যে সে আলো একরকম দেখায়, শীতের কুয়াশায় আরেক রকম; আবার গ্রীষ্মের পরিষ্কার নদীবক্ষে এবং নদী-তীরে সম্পূর্ণই অন্য রকম। বরিশালে গিয়েই নদীর যে আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে, দিনভেদে, রাতভেদে, ঋভুভেদে আছে আলাদা গন্ধ; তা ঋভু প্রথম জেনেছিল।

কীর্তনখোলা নদী বেয়ে শীতের দিনে কখনও কখনও হাটখোলার সেনবাবুদের লঞ্চে করে হৃষীকেশ এবং অন্য অনেকে 'ভোলার' দিকে যেতেন পাখি আর কুমির শিকারে। ঋভুকেও সঙ্গে নিতেন হৃষীকেশ। তাপসী আপত্তি করলে বলতেন, জীবনে সমস্ত কিছুই শিক্ষার মধ্যে পড়ে। স্কুলে আর মানুষ কতটুকু শেখে!

তবে পরম অকৃতজ্ঞ পুত্র হিসেবে ঋভু একথা বলবে যে, শিকারি হিসেবে হৃষীকেশ এবং তাঁর বন্ধুরা, অন্তত সেই সময়ে; আদৌ ভালো ছিলেন না।

চারদিকে আদিগন্ত জল। ভোলার কাছের পদ্মা সমুদ্রেরই মতো, তারই মাঝে শীতের দিনে হয়তো ছোট্ট একফালি চর জেগে আছে। এবং সেই চর পাখিতে একেবারে ঢাকা। বালিই দেখা যায় না। নানারঙা, নানাদেশি জলচর পাখি। সবই পরিযায়ী পাখি। বিদেশি।

লণ্ঠবাহিত শিকারিরা সকলেই বন্দুক উঁচোলেন এবং একজন ওয়ান-টু-থ্রি-বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের ফায়ারিং-রেঞ্জে যেমন চাঁদমারি হয় তেমনই চাঁদমারি হলো।

উত্তেজনার বশে ঋভু নিজে টুয়েন্টি-বোর দোনলা "টলি" বন্দুকটি ছুড়তে পর্যন্ত ভুলে গেল। আদিগন্ত জল এবং ভোরের কুয়াশার উপর সে প্রতিধ্বনি থামলে দেখা গেল কয়েকটা বিভিন্নরঙা পালক পড়ে আছে।

না, কোনো শিকারির বন্দুকেরই গুলি-নিঃসৃত ছররার হর্‌রাতে তারা নিপাতিত বা উৎপাটিত হয়নি। শান্তিকালে হাঁসেরা নিজেরাই ঠোঁট দিয়ে পালক পরিষ্কার করার সময় সেগুলি উপড়ে দিয়েছিল।

বেচারা পাখিরা অদৃশ্য কোনো স্থলভাগের দিকে উড়ে চলে যাওয়ার পরে বেচারা শিকারিরা চোখ কচলে, বন্দুকসমূহের নলের ধুঁয়ো ফুঁ দিয়ে সরিয়ে, যখন আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন তখন এ ওকে দুষে বলতে লাগলেন : "অত তাড়ার কি ছিল?"

"কত নম্বর গুলি ভরেছিলেন বন্দুকে।"

"হুড়বড় করার কোনও মানে হয়? লাইন দেখে নিয়ে তো ট্রিগার টানবেন!"

"এতোই কাছে ছিল যে, হাত দিয়েই গলা-পাকড়ানো যেতো।"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

গরম কফি খেয়ে যখন শীতের কষ্ট এবং বিফলতার দুঃখের তীব্রতা একটু কমল তখন অন্য কেউ প্রশ্ন করলেন : এইমটা করেছিলেন কোথায়?

কোথায়?

কোথায়?

কোথায়?

সকলেই উত্তর দিলেন, বিশেষ কোথাওই নয়!

তবে পাখিদের মরতে বয়েই গেছে!

কেউ বললেন।

অন্য কেউ বললেন, একটা কোথাও তো এইম করেছিলেন, না কি? এমনি এমনি এতোগুলো বন্দুকের গুলি কেউ ফুটোয়? এ কি রাজস্থানি ব্যবসাদারের মেয়ের বিয়ে!

তখন কে একজন বললেন, হুম্। মনে পড়েছে। আমি নিশানা নিয়েছিলাম "অ্যাট দা জেনারাল ডিরেকশান"।

তৎক্ষণাৎ সকলেই হই হই করে উঠলেন, রাইট। রাইট, ঠিক। একদম ঠিক।

মানে সকলেই জেনারেল ডিরেকশানে নিশানা নিয়েছিলেন সেই সল্লিহাঁস শিকারে গিয়ে বর্মনকাকুর নগেন দারোগা আর হৃষীকেশেরই মতো। পাখিদের চেহারার সঙ্গে বন্দুকসমূহের নলপ্রান্তের মাছির কোনো যোগাযোগই ছিল না। অতএব...

হৃষীকেশ এবং তাঁর শিকারি অথবা যাত্রাদলের বন্ধুরা, সারা জীবনই বলতে গেলে ওই "শুটিং অ্যাট দ্যা জেনারাল ডিরেকশান ফ্যাকাল্টি" হয়েই ছিলেন।

গুলি-ফসকানোও একটা মস্ত বড়ো আর্ট।

ঋভু তার পোড়া চোখে এমন হতচ্ছাড়া শিকারিও বহু দেখেছে পরবর্তী জীবনে যাঁরা চেষ্টা করেও গুলি ফসকাতে পারেন না।

হৃষীকেশ মুখভরা পান-জরদা নিয়ে সেই রকম সফল শিকারিদের উদ্দেশে বলতেন, "আরে ও তো স্পোর্টসম্যানই নয়। ও তো একটা কসাই। শিকারকে বাঁচার চান্স দিতে হয় বলেই তো শিকার একটা স্পোর্টস। এ কথা কে বোঝে?"

সেটা ঠিক। হৃষীকেশের নজরটাই, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটাই ছিল অরিজিনাল এবং অকৃত্রিম। বিফলতার সিমেন্ট দিয়েই যে সাফল্যর ভিত গাঁথতে হয় একথা কিশোর এবং শিশু ঋভুকে তিনি

উপদেশ দিয়ে নয়, জীবন দিয়েই শিখিয়েছিলেন। ঋভু শিখেছিল : "Failures are the pillars of success."

কুমির শিকারের বেলাতেও তেমন বিশেষ ব্যতিক্রম হতো না। হৃষীকেশ এবং তাঁর বন্ধুদের মতো শিকারিদের মস্ত সুবিধা ছিল এই যে, কুমিরের গায়ে গুলি বিঁধলেও তাকে না পাওয়ার এবং নিজেদের পৌনঃপুনিক বিফলতায় দড়কচ্চা-মারা বিবেককে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যাখ্যা ছিল মুখ্যত এই রকম। কুমির বড়ই ইন-কনসিডারেট প্রাণী!

১। গুলি খেয়েই কুমির জলের তলায় চলে যায়। আহত হলে জলে জলে নিজের ডেরায় পৌঁছে যায়। নদীর কাদার পাড়ে জলের গভীরে, গুহার মতো বানিয়ে ছানাপোনা নিয়ে থাকে কুমিরেরা। যদিও ডিম পাড়ে চরে বা ডাঙাতেই। উষ্ণতা ছাড়া, প্রাণের উন্মেষ হয় না। সে কুমিরের বা কাদাখোঁচা বা মানুষের প্রাণই হোক। অতএব, এরকম "কমপ্লিকেটেড কোয়ারিকে" খুঁজে পাওয়া অসুবিধের।

২। অব্যর্থ গুলি খেয়ে মরে গেলেও, গাঁজার গুলি খেয়েও যদি মরে; তবেও তার শরীর নির্ভার হতে সময় নেয় অনেক। তারপর যখন তার মৃত শরীর জলের উপরে ভাসমান হবার অবস্থাতে আসে ততক্ষণে সে জলের তলায় তলায় জীবিত, বা জীবোন্মৃত অথবা মৃত অবস্থাতে জোয়ার ভাঁটার লীলাখেলাতে অনেকই দূরে চলে যায়। বহু বহু মাইল। ইনকনসিডারেট কোয়ারি, যে কোথায় ভেসে উঠবে, তাকে কোন্ যশ-আত্মসাৎকারী-শিকারি তার "নিজেরই মারা" বলে চালিয়ে দেবে, তাই বা কে জানে!

৩। কুমিরকে পেতে হলে, তাকে চরের উপরে অথবা ডাঙাতেই মারা উচিত। কিন্তু যদি কোনো হতভাগা, ব্যর্থ-প্রেমিক, আত্মহত্যা-কামী গুলি-খাই-খাই-কুমির তার ধুমসো শরীরখানা স্থলভূমে এগজিবিট করে অনড় অবস্থাতে থাকেও তখনও তো "শুটিং অ্যাট দ্য জেনারাল ডিরেশনই"।

হিঃ। হিঃ।

অতএব হৃষীকেশদের "বৈষ্ণব-কাল্টের" নিরামিষ শিকারিদের "শিকার-শিকার খেলা"— ও "কুমির-কুমির" খেলা হতো বটে কিন্তু কোনো পশু-পাখিই হত হতো না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পদ্মার চরে এমন শিকারিদের যদি কখনও তাঁর জীবদ্দশাতে সাক্ষাৎ হতো তবে তিনি তাঁর পদ্মা বোটে এঁদের তুলে, ভালোবেসে, নির্ঘাৎ নিমপাতার রস খাইয়ে দিতেন।

সব শিকারি সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজখবর না নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রোম্যান্টিসিজম অথবা "অ্যান্টি-শিকার, প্রো-কনসার্ভেটিজম স্ট্যান্সকে" সাপোর্ট করাটা কোনো র‍্যাশানাল মানুষের পক্ষেই উচিত নয়। এই ধরাধামে যা-কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে অথবা যে-ঘটনা ঘটিতব্য ছিল তাদের প্রত্যেকেরই চাঁদের দু পিঠেরই মতো দুটি পিঠ থাকেই। দুটির বেশিও থাকতে পারে। "The other man's point of view" অথবা সাহেব এবং ব্যারিস্টার পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভাষায় "To See it form the other way round" এই দুটি মূল এবং মূল-উৎপাটনকারী বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকাটা প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই উচিত। 'Apparent is not real'।

তাই ঋভুর এই করজোড়ের নিবেদন প্রত্যেক তালেবর ব্যক্তিরই কাছে যে, একগাছা বন্দুক হাতে শিকারি দেখলেই আপনাদের পুঁথি-পড়া, ইজিচেয়ারে-বসা, সংরক্ষণের জ্বালাময়ী জ্ঞান দিয়ে তাকে নিধন করবেন না। জ্বালা বেশি হলে, তার চেয়ে বরং ইজিচেয়ারে ফুটন্ত জল ঢেলে ছারপোকা মারুন।

মিহিরডাদের প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েরা সকলেই খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারত। ফুলের মতো মেয়েরা জলপরীর মতো বিনা আয়াসে জলের মধ্যে জলের সুতো দিয়ে, জলের ছুঁচ দিয়ে, জলের ফুল দিয়ে মালা গাঁথত। গ্রাম-বাংলার সেই সব সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সহজ সরল হাসি, তাদের অতি সহজে আনন্দিত হবার ঐশ্বরিক ক্ষমতা এবং তাদের জীবনীশক্তি মুখ্যত কলকাতাতেই বড়ো-হয়ে-ওঠা, কিশোর ঋভুকে মুগ্ধ করত। সেই মৎস্যগন্ধা, যোজনগন্ধা, মসৃণত্বকের উচ্ছল জল-ভেজা কিশোরীদের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত সাঁতার-না-জানা ঋভু পুকুর ঘাটে বসে, আর নিজেকে অভিসম্পাত দিত কিছুমাত্রও গুণ তার নেই বলে।

না ছিল সে পড়াশুনোতে ভালো, না ছিল খেলাধুলোয়, না গান-বাজনায়, না অন্য কিছুঁতেই। তার সাধারণ্য তাকে আজও সাধারণেরই একজন করে রেখেছে। তবে সাধারণের একজন হয়ে থাকার সুখ এবং দুঃখ শুধু সাধারণেরাই জানেন। সেই সুখ এবং দুঃখ তাকে একাত্ম করেছে লক্ষ মানুষের সুখ-দুঃখরই সঙ্গে। পরের জীবনে সেই একাত্মতা তাকে যেমন এক বিশেষ জোর দিয়েছে, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, তাকে তেমনই বিযুক্তও করেছে, যাঁরা জনতার মধ্যে পড়েন না, তাঁদের থেকে। তার এই মানসিকতা চিরদিনই, যাঁরা জনতার মানুষ বা যাঁরা নন; তাঁদের দু দলের কাছেই তাকে দূরের মানুষই করে রেখেছে। দূরের মিছিলে, কাছের মিছিলে, অন্যবাহিত পতাকার নীচে যেমন শামিল হতে পারেনি সে; কাছের এবং সমাজের মানুষদের কাছেও আপনজন বলে গণ্য হতে পারেনি। সে চিরদিনেরই একলা মানুষ। তাকে সকলেই ভুল বুঝেছে। মিথ্যা কারণে গালমন্দ করেছে, অন্যায় অবিচারে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে, ঋভুর মনের প্রকৃত-প্রকৃতিকে বুঝতে পর্যন্ত না-পারার অপার অক্ষমতায়, নিজেদের মানসিক রিক্ততায়, ক্ষুদ্রতায়, বক্রতায় তারা আজীবনই তাকে ব্যথিত করেছে।

এই সব বেদনার কথা না বলাই ভালো। কারণ, বললেও, কারোরই বোঝার মতো সময় বা সহমর্মিতা নেই। জীবনের পাড়ে বসে থাকা চল্লিশ দশকের সেই বিস্ময়-বিভোর কিশোরটি আজও তাই সাঁতার-না-জানা অসহায়তায় জীবনের স্রোত, আবর্ত, কুটিলতা, জটিলতার দিকে চেয়ে তেমনই বসেই আছে। কলরোলে জীবন বয়ে গেছে তার সামনে দিয়ে। বয়ে যাচ্ছে। অবগাহন স্নান তার কখনওই করা হয়নি।

বর্ষা চলে গেছে। পচা পাটের গন্ধে আর পাট-কাচার শব্দের মধ্যে, শাপলার সাদা আর পদ্মর লালিমার রঙে বিভাসিত হয়ে শরৎ এসেছে। মিহিরডাদের বাড়ির 'বারোমাস্যা' শিউলি গাছটির কথা আলাদা, মৌসুমি শিউলিরা হাঁসের ঠোঁটের রঙের বোঁটা আর হাঁসের পালকের মতো শুভ্রতা নিয়ে শরৎকে পৌঁছে দিয়ে শুকনো পাতার প্রথম ঝরা-খসার মধ্যে দিয়ে হেমন্তকে হাত ধরে এনেছে। তারপরেই এসেছে শীত। গ্রাম বাংলার আর্দ্র-শীত। হোগল-বাদার শীত। আশ্চর্য সবুজ আর লালে-মেশা কামপাখির জল-ভেজা ডানার গন্ধে আর কাদাখোঁচার দলের ক্ষণে ক্ষণে উৎসারিত চঞ্চলতার তিরতিরানির মধ্যে দিয়ে শীত এসেছে।

তারপর কোকিলের গান আর কিশলয়ের কচি কলাপাতা সবুজের নিশান হাতে বসন্ত এসেছে। আসতে না আসতে অপগতও হয়েছে। কখন যে বসন্ত গেল, বোঝাই যায়নি।

তারপরই আমের বোলের আর কাঁটালের মুচির গন্ধে ম'ম' করা দুপুর আর রাত নিয়ে গ্রীষ্মের দূত এসেছে।

মনোরঞ্জন কাকুর জিপে করে প্রায়ই এদিকে ওদিকে যেত ঋভুরা। বিশেষ করে ছুটির দিনে। সঙ্গে অন্যান্য গাড়িও যেত। নানা মানুষ। স্ত্রী-পুরুষ। মাধবপাশা দিঘির পারে পিকনিক হতো। কী বিশাল সে দিঘি। এ পার থেকে ওপার সাঁতরে পেরোনো মুশকিল। এতোই বড়ো তা যে, তার মধ্যে স্টিমার চলতে পারত। ঘন কালোজল—তাতে নাকি জিন পরীদের বাস ছিল। শুক্লা চতুর্দশী এবং পঞ্চমীর ফুটফুটে রাতে না কি নগ্না তারা, দিঘির দেদীপ্যমান উজল জলে জলকেলি করত। তখন দিঘির কাছে কোনো মানুষ ভুল করে এলেও, তারা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারত। অনেকই সৌন্দর্যহত মুগ্ধ পুরুষের লাশই-নাকি জলে ভাসতে দেখা গেছে আলো-ফোটা সকালে।

হৃষীকেশ খুব রসিক মানুষ ছিলেন। তিনি যেখানেই থাকতেন তাঁর চারপাশে আনন্দর একটি পরিমন্ডল তৈরি হয়ে যেত। যেখানেই উপস্থিত হতেন সেই জায়গাই সেই মুহূর্তে প্রাণিত হতো; উজ্জীবিত হতো। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই অতি প্রিয় ছিলেন হৃষীকেশ।

ঋভু ও অরা দলের অন্যান্য ছোটোদের সঙ্গে দূরে দূরেই থাকত। তবু হৃষীকেশের রসিকতার টুকরো-টাকরা এবং মহিলা এবং পুরুষদের সমবেত হাসির হররা ভেসে আসত দূর থেকে। সব রসিকতা যে ঋভুরা বুঝত তা নয়, এবং বুঝত না বলেই সেই সব আধসেদ্ধ কথাতে একধরনের নিষিদ্ধ আনন্দ উপভোগ করত।

কবে নাকি মাধবপাশার জমিদারের মাকে জমিদার বলেন যে, তুমি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি যতখানি পথ পরিক্রম করতে পারবে আমি ততখানি দৈর্ঘ্যের এবং তার মানানসই প্রস্থের দিঘি কাটিয়ে দেব তোমার স্মৃতির উদ্দেশে। সেই দিঘিই এই দিঘি। মাধবপাশার পথ দিয়ে আরো অনেকদূর গেলে নদী নালা পেরিয়ে বানরীপাড়া গ্রামে পৌছোনো যেতো। তাপসীর মাতামহ ছিলেন বানরীপাড়ার গুহঠাকুরতা বংশের। তাই একদিন তাপসীরই ইচ্ছাতে হৃষীকেশ ওঁদের সকলকে নিয়ে গেলেন সেখানে, মনোরঞ্জন কাকুরই জিপে করে।

তখনকার দিনে বরিশালে ঠিক ওই রকম গ্রাম আব ছিল কি না সন্দেহ। ইট দিয়ে বাঁধানো রাস্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বহু শিক্ষিত মানুষের বাস। এক নজরেই ঋভুর মনে হয়েছিল যে, এই গ্রামটি পুরোপুরিই অন্যরকম।

তাপসীরই কোনো আত্মীয়ার বাড়িতে গিয়ে সকাল দশটা-এগারোটায় পৌঁছোনো হয়েছিল। না-বলে কয়েই। কী আপ্যায়নই যে পেয়েছিল! এখনও স্পষ্ট মনে আছে। পুকুরের মধ্যে পায়ে-দড়ি-বাঁধা কাউঠ্যা বা ছোটো কাছিম রাখা থাকত, মুসলমানের বাড়ির মুরগির মতো, হঠাৎ এসে-পড়া অতিথি সৎকারের জন্যে। সেই দড়ি ধরে, কাউঠ্যা তুলে, তাকে চিত কবে ফেলে, কেটে, স্বাদু ঝোল রান্না হতো। হলুদ গোল গোল মার্বেলের মতো কাউঠ্যার ডিম। রাবারের মতো কাউঠ্যার পিঠ। কচ্‌কচ্‌ করে খেতে হয়। কী ভালোই না লাগত!

নারকোল সুপুরি আম কাঁটাল লিচু জাম টগর চাঁপা সজনে নিম ঘেরা গ্রামটির অথবা কী কী দিয়ে ভাত খেয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আজ ঋভু দিতে পারবে না। কিন্তু মনের চোখে যা সত্য হয়ে আছে আজও তা সেই গ্রামের একটি ছোট্ট গৃহকোণের মানুষদের আতিথেয়তার পবিত্র আনন্দে উজ্জ্বল, ভুলে-যাওয়া নামের অস্পষ্ট মুখগুলি।

বরিশালের বহু গ্রামেই কিছু কিছু পদবিধারী মানুষদের বিখ্যাত আবাস বলে তখন সকলেরই জানা ছিল। গাভার ঘোষ, বানরীপাড়ার গুহঠাকুরতা, নরোত্তমপুরের রায়, জলাবাড়ির দত্ত, পিরোজপুরের বসু (ঝালকাটি স্টিমার স্টেশনে নেমে যেতে হতো পিরোজপুরে) ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে একদিন আবার বর্ষা ঘুরে এল। জর্ডন কোয়ার্টারে লাল-রঙা দোতলা বাড়িগুলোকে কালো আকাশের পটভূমিতে সুন্দরতর দেখতে লাগল। কীর্তনখোলার জলে আবারও ইলিশের বন্যা

এল। স্টিমারের রাতের সার্চলাইট বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলিকে ইলিশের বড়ো বড়ো রুপোলি আঁশেরই মতো রুপোলি করে দিয়ে চমকে চমকে ছড়াতে লাগলো।

"গারো", "বাদা", "ফ্লোরিকান" "পদ্মা", "মেঘনা" ইত্যাদি স্টিমার। ভরা-নদীতে জেটিতে নোঙর করা থাকলে মনে হতো যেন নদী ছেড়ে পথ বেয়েই এগিয়ে আসবে তারা।

উনিশশো সাতচল্লিশের বারোই আগস্ট, বরিশালের সুন্দর বহুবর্ণ জল-রঙা সব স্মৃতি, মিহিরডা, মিহিরডাদের সুন্দর দোতলা কাঠের বাড়ি, মিহিরডাদের পুকুর, প্রতিবেশী, সাঁতারকাটা সুন্দরী কিশোরীর দুধে-আলতা-রঙা পদযুগলের ত্রস্ত, ব্যস্ত আন্দোলন, আধ-ফোটা গন্ধরাজ ফুলের মতো আঁটসাঁট, সুগন্ধি, সদ্য-বিকশিত সিক্তা শ্বেতা স্তনের অনিচ্ছাকৃত চকিত পরশের দেবদুর্লভ অনুভূতি শীতের দুপুরের হোগল-বাদার গন্ধ, উঁচু দিয়ে উড়ে-যাওয়া কাঁক পাখির তীক্ষ্ণ সরু স্বর, সন্ধ্যার প্রাক-মুহূর্তে কামপাখিদের বিষণ্ণ, নিচু গ্রামের স্বগতোক্তি, রেণুমাসিমার সদা-প্রসন্ন, অপত্য স্নেহ-মাখা হাসি, এই সব ছেড়ে, জিলা স্কুলের বন্ধুদের আর বন্ধুদেরই মতো চমৎকার মাস্টারমশাইদের সঙ্গ ছেড়ে বাংলা ভাগ হওয়ার আনন্দ ও আতঙ্কমিশ্রিত লগ্নে ঋভু স্টিমারের দোতলার রেলিং ধরে শহরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

রাহাকাকুও ছিলেন। প্রতিজ্ঞামতো। ফার্স্ট-ক্লাসের ডেকে। বরিশালকে তিনি চিরকালের মতো ছেড়ে যাচ্ছে এই আনন্দেই তিনি বিভোর ছিলেন। বরিশালকে তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও সহ্য করতে পারেননি। যেদিন থেকে বদলি হয়ে সেখানে যান, সেদিন থেকেই।

বাদা স্টিমার ছেড়ে দিল। ভোঁ দিল। বার বার তিনবার। স্টিমার ঘাটে অনেকগুলি পরিচিত মুখ। হাত-নাড়া। রুমাল নাড়া। তারপর আস্তে আস্তে স্টিমার ঘাট থেকে জলের গভীরে পাশাপাশি সরে এলো স্টিমার। তারপর চলা শুরু করল।

পরদিন সকালে খুলনাতে পৌঁছোবে স্টিমার। তারপর ট্রেনে করে যশোর, বনগাঁ হয়ে কলকাতা।

কিশোর ঋভু জানত না যে, চোদ্দই আগস্ট ১৯৪৭-এ, তার স্টিমারই শুধু ছেড়ে গেল না, সেই মুহূর্তে খুলনামুখী সেই স্টিমারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি জাতিই তাদের বহু যুগের বসত-বাটী, ঐতিহ্য, আবাল্য অনুষঙ্গ, শান্তি, সংস্কৃতি, বহুযুগের সঞ্চিত সুখস্মৃতি মূলশুদ্ধু উপড়ে নিয়ে এক অজানা, সাংঘাতিক ঘূর্ণির দিকে ভাসমান হলো।

এই অন্যায়, যেবা যারাই ঘটান; তাঁদের বিচার কখনও কি কেউ করবেন?

ভবিষ্যতের কোনো ন্যায়-নিষ্ঠ, সৎ ঐতিহাসিক?

ঋভু

দ্বিতীয় পর্ব

পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে

তিরিশ বছর লেখালেখি করার পরে, অনেকই সাহিত্যিক, সমালোচক, সম্পাদক, পুরস্কারদাতা ও প্রাপক; বেস্ট-সেলার লিস্টের "লীলা-খেলা" দেখে দেখে এখন নির্ভার, দায়হীন এবং হয়তো উদাসীনও এক মানসিকতাতে এসে পৌঁছেছি। অনেক অন্যায় নিন্দামন্দ এবং উদ্দেশ্যপ্রসূত ও বিদ্বেষমূলক সমালোচনার শিকার হয়েছি। একটা সময় পর্যন্ত এসব নিয়ে স্বভাবতই বিচলিতও হতাম। কিন্তু আদিত্য ওহদেদার সাহেবের "রবীন্দ্র বিদূষণ ইতিবৃত্ত"তে পড়েছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গাতে বলেছেন :

"যুক্তিতর্কের বাইরে গিয়ে আঘাতটা যেখানে অভিসন্ধিময় উসকানিমূলক এবং কলহপন্থী সেখানে প্রতি-আক্রমণের কোনো মানে নেই।

আলোড়িত হওয়া থেকে তো আমি নিবৃত্ত হতে পারি না, তবে সেই আলোড়নের থেকেও আমাকে বুঝতে হবে আমারই মধ্যে কোথাও ভুল ছিলো কি না, কোনো ফাঁকি, যে আক্রমণ করেছে সে হয়তো অন্যায় ভঙ্গিতেই করেছে, কিন্তু সে আমার কাছে এনে দিচ্ছে নিজেকে নিয়ে—নিজের শক্তি ও প্রত্যাশাকে নিয়ে—পুনর্বিবেচনার একটা সম্ভাবনা, এইটুকুই লাভ।"

ঋষি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বারেবারে পড়ি। তাতে মনের জোর বাড়ে।

বইটির দাম প্রায় একশ টাকা হয়ে যাচ্ছিল। তাই নিষ্ঠুরভাবে পরিমার্জন করতে হলো। প্রকাশকেরও ইচ্ছা তাই ছিলো। বইয়ের দাম আজকাল নানা কারণে খুবই বেড়ে গেছে। যাতে দাম সকলেরই সাধ্যের মধ্যে থাকে সেইজন্যেই এই পরিমার্জন।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলতেন, কোন লেখক কত নির্দয়ভাবে নিজের লেখার উপর কাঁচি-চালাতে পারেন তার উপরেই নাকি তাঁর "বড়ত্বর" মাপ নির্ভর করে যদিও তিনি অবশ্যই দাম-কমানোর জন্যে আয়তন-সংকোচনের কথা ভেবে একথা বলেননি।

লিখে তো বড় হতে পারিনি এখনও।

কাঁচি-চালিয়ে যদি হওয়া যায়।

বিনত লেখক

পয়লা জানুয়ারি,

উনিশশ পঁচানব্বই

কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর তীর্থপতি
স্কুলের আবাল্য-বন্ধু, আমাদের প্রত্যেক
সহপাঠীর গর্ব; চুনী গোস্বামীকে

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৫, মাঘ ১৪০১

2,00,000
1,50,000
25,000
15,000
15,000
50,000
40,000

3,95,000
25,000

4,20,000

6,500
1,500
750
600
600
200

11,950
- 1,500

10,450

রক্তসূত্রে আমরা যে আত্মীয়তাপ্রাপ্ত হই, তার জন্য আমাদের লজ্জিত বা গর্বিত হবারও কিছু নেই। কিন্তু ব্যবহারিক সূত্রে, জীবনের পথে চলতে চলতে চলিতার্থে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে যে আত্মীয়তা গড়ে তুলি, সেই সব সম্পর্কই, আত্মীয়তাই "আত্মার আত্মীয়তা"।

রক্তসূত্রে আত্মীয়দের কারও কারও সঙ্গে যে আত্মার আত্মীয়তা স্থাপিত হয় না এমন নয় কিন্তু আমি যেহেতু পরিবারের বিদ্রোহী ছেলে, অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের ঐতিহ্যকে মান্য না করে নিজ মতে ও নিজ পথে, প্রথমদিক থেকেই চলেছি, তাই আমার ক্ষেত্রে তেমন যোগাযোগ কমই ঘটেছে। রুচি, মানসিকতা, শিক্ষা, জীবনবোধ, জীবনদর্শন, ঈশ্বরবোধ ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্যের প্রাবল্য এতই বেশি ঘটেছে যে রক্তসূত্রের আত্মীয়দের অধিকাংশের সঙ্গেই আত্মীয়তা বজায় রাখতে পরিনি। পারিনি যে, সেই দোষ পুরোপুরিই আমার।

আশাকরি, সহৃদয় পাঠকেরা এবং আত্মীয়রাও আমার বক্তব্যকে ভুল বুঝবেন না। এটাই সংসারে এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনেও সত্য। সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে কোনও লজ্জা বা দ্বিধা থাকাটা কোনও শিক্ষিত মানুষের কাছ থেকেই প্রত্যাশার নয়। অশিক্ষিত মানুষের কাছ থেকেও নয়।

নানারকম ঘটনাতে এইরকম অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে যে, আত্মীয়দের সুখী করা বড়ো দুরূহ কাজ। তাছাড়া আমি এমন কেউকেটা নই যে, পাঠক-পাঠিকারা আমার পরিবারের বংশলতিকা নিয়ে আদৌ উৎসুক হবেন।

ভালো ভেবেই এবং খুশি করারও জন্য 'ঋভু'-র প্রথম পর্বে কোনো কোনো আত্মীয়র সম্বন্ধে ভালো এবং উদাসীনও যা কিছুই লিখেছি, তা নিয়ে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তাতে মরমে মরে রয়েছি।

গরিবকে গরিব বলা দোষের। বড়োলোককে বড়োলোক বলাও দোষের। দিনকে দিন, রাতকে রাত বলাও দোষের।

প্রথম পর্বে যেসব নিকট আত্মীয়দের কথা উল্লেখ করিনি তাঁদেরও অনেকেই রেগে আছেন। কিন্তু করিনি এই ভেবেই যে, পাঠক আমার "কুলজি-ঠিকুজি" জানতে চান না। আমার চারপাশের পৃথিবী সম্বন্ধেই জানতে চান। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার প্রবল কামনা একটি দুরারোগ্য রোগ এবং এই রোগে ভোগেন না এমন মানুষ খুব কমই দেখেছি।

আশা করি, আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ অগণ্য আত্মীয়-বন্ধুরা নিজগুণে মার্জনা করবেন।

সাহিত্য জগতে আমার আসাটা আদৌ দুর্ঘটনা-প্রসূত বা ধাক্কাটাক্কাজনিত কারণে নয়।

শিশুকাল থেকেই ছবি আঁকতে, লেখালেখি করতে এবং গান গাইতে ভাল লাগত। আমার মায়ের বড়দাদা, মানে আমার বড়োমামা ছিলেন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু। মায়ের ঠাকুরদা গিরিশচন্দ্র বসু প্রায় একশো বছর আগে তাঁর গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন 'দারোগার আত্মকাহিনী' নামে।

দারোগার চাকরি কিছুদিন করার পর, ভালো না-লাগায় মুরশিদাবাদের নবাবের অধীনে চাকরি নেন। তাঁর আত্মকাহিনীতে প্রকৃত অশিক্ষিত ও নিষ্ঠুর নবাব সিরাজউদ্‌দৌল্লার জীবনের প্রায় অবিশ্বাস্য এক কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে।

আমার মায়ের মাতামহ ছিলেন গিরিডির বিখ্যাত অভ্র ব্যবসায়ী এবং দেশপ্রেমী শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। সাহিত্যিকও ছিলেন। "পাহাড়ীয়া পাখি" ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর গিরিডির বাড়িতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং আরও বহু প্রথমশ্রেণির নেতাদের যাওয়া-আসা ছিল। জাতীয় কংগ্রেসকে, শুনেছি প্রচুর অর্থসাহায্যও করতেন তিনি। তাঁর স্ত্রী মনোরমা দেবীও তাঁরই মতো গুণী ছিলেন। বাংলা জীবনী-সাহিত্যে 'মনোরমা জীবন চরিত'-ও একটি উল্লেখযোগ্য বই।

বড়োমামা ছাড়াও অন্য মামারাও প্রত্যেকে অতি-রোমান্টিক এবং কম-বেশি 'কাব্যরোগাক্রান্ত' ছিলেন। সেজমামা সুবিমল ছিলেন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এবং কণ্ঠ-বিশারদ। সেই সময়ের এমন গায়ক-গায়িকা প্রায় ছিলেন না যিনি ওঁর কাছে যেতেন না। তার পরের মামা সুকোমলও সাহিত্যিক ছিলেন। কিছুদিন একটি বিখ্যাত পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। ওঁর বিখ্যাত কবিতা সংকলন ছিল 'ইস্টিশন'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিতার প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন।

ছোটোমামা ছিলেন সুশীতল। তিনি এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। সদা হাস্যময়। জমি-বাড়ির দালালি থেকে কচুরিপানা-ধ্বংসর ওষুধ আবিষ্কারের পাগলামি সবই করেছেন।

কবি, মানুষে শুধু কবিতা লিখলেই হন না। অনেকে আবার কবিতা লেখা সত্ত্বেও হন না। মানসিকভাবে, সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও কবি থাকার সাধনা তাঁর মতো কাউকেই আমি করতে দেখিনি। অথচ জীবনে যৌবনপ্রাপ্তির পরদিন থেকে এক লাইনও কবিতা লেখেননি। এমন 'কবিস্বভাবের' মানুষ সত্যিই বড়ো কম দেখেছি।

'ঋভু'-র প্রথম খণ্ডে আমাদের ৪৯এ রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর, একতলা তিনকামরার ভাড়াবাড়িব কথা আছে। তারপর সেখান থেকে ১৯৪৯-এ কো-অপারেটিভের ছোট্ট বাড়ি কিনে, ৩৪এ ডোভার রোডে চলে এসেছিলেন বাবা, একথাও আছে।

যে সময়ের এবং যে মানুষদের কথা আপনাদের বলতে বসেছি, সেই প্রেক্ষিতে এবং সেই সুবাদে বহু আত্মীয়-পরিজনদের কথাও স্বাভাবিকভাবেই আসবে এবং তাঁদের কথা অবশ্যই বলব।

যাঁদের কথা আসবে না তাঁরা যেন নিজগুণে আমাকে মার্জনা করেন।

যে-কোনও মানুষের পক্ষেই আত্মজৈবনিক লেখা লেখাবার অনেকই অসুবিধে আছে। যদিও একজন লেখকের অনেকই লেখাতে, নিজের জীবনের ছাপ পড়তে বাধ্য, কিন্তু তা পড়ে অপ্রত্যক্ষভাবে। প্রত্যক্ষ আত্মজৈবনিক লেখা লিখতে যাওয়া সত্যিই বিপদের। কে যে কেন, এবং কখন ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হয়ে যাবেন বিনা কারণে তা বলা ভারি মুশকিল। তাছাড়া, সকলের রসবোধও সমান নয়। কারও প্রশংসা করলে, তিনি বা তাঁর বংশধরেরা নিন্দা ভেবেছেন, এমনও হয়েছে। তাছাড়া লিটারারি ক্রিটিসিজমে একটা কথা আছে, "NEGATIVE CAPABILITY"। যে লেখক, তাঁর লেখার মধ্যে নিজেকে যত negate করতে পারেন, তিনি তত বড়ো লেখক। কিন্তু আত্মজৈনিক লেখার বেলাতে সেই গুণ তো প্রত্যাশার নয়!

মানুষের জীবনে, সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, প্রশংসা-নিন্দা, মান-অপমান, গঞ্জনা-বঞ্চনা থাকেই। প্রত্যেকের জীবনেই থাকে। জীবনের দুঃখের দিক, নোংরা দিক; লজ্জার দিক, গ্লানির দিক থেকে চোখ পরোপুরি ফিরিয়েই এ লেখা লিখতে চেয়েছি।

যাঁরা আমাকে এই জীবনে ঠকিয়েছেন, নানাভাবে অপমান-অসম্মান করেছেন, হেয় করেছেন, গভীর ও সুপরিকল্পিত চক্রান্তের শিকার করেছেন, অকৃতজ্ঞতার চরম করেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই ক্ষমা করে দিলাম। সেই মানুষদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে আমি জেনেশুনেই ঠকেছি। ঠকব না বলে শক্ত হয়ে দাঁড়ালে, আমাকে ঠকানো আদৌ সম্ভব হত না।

অমি ধর্মাচারী নই। কিন্তু গভীর ভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী। কারণ, আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে মানুষের শুভাশুভ বোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ, এসব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে

থাকেই। তাই ঈশ্বর-অবিশ্বাসী মানুষের পক্ষে প্রকৃত আত্মিক উৎকর্ষ অর্জন করা সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অভ্রান্ত নাও হতে পারে।

ঋভুর দ্বিতীয় পর্ব স্বাধীনোত্তর সময় নিয়ে লেখা। দেশ-ভাগকেই ঋভুর প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বর বিভাজক করলাম।

স্বাধীনোত্তর ভারতের কথা ভাবলে বড়োই উত্তেজিত বোধ করি। কপালের শিরা দপদপ করে। তাই সেইসব অপ্রিয় ভাবনা-চিন্তা থেকে নিজেকে যতদূরে রাখতে পারা যায় তাই রাখি।

স্বাধীনতা নিয়ে যে কী করতে হয়, করতে হতো, তাই জানলাম না আমরা এবং জানা যে উচিত ছিল আদৌ সেটুকুও শিখলাম না দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে। তাই আমাদের স্বাধীনতা না-দিতে চেয়ে ইংরেজরা যে মহাপাপ করেছিল, আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে; মাঝে মাঝে তেমন মনে করার বিশেষ কারণ দেখি না।

বহুমূল্য কাচের বাসন আপরিণত মস্তিষ্ক শিশুর হাতে তুলে না দেওয়াই বোধ হয় ছিল ভালো। সাবালক না হলে, পৃথিবীর কোনও দেশের আইনই তার হাতে পৈতৃক সম্পত্তির মতো বিনা-পরিশ্রমের পরার্জিত ধনও তুলে দেয় না।

তবে পরাধীন হয়ে কারাই বা থাকতে চায়। কিন্তু আমার মনে হয় যে সব অনগ্রসর জাতির বেলাতেই এই দুর্যোগ ঘটে। আফ্রিকার দেশগুলিতে আমরা যা রোজই ঘটতে দেখছি। 'জোর যার মুলুক তার'! গণতন্ত্র ফনতন্ত্র সব বোগাস!

নেলসন ম্যান্ডেলার দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎও যে খুব কিছু অন্যরকম হবে তা আমার মনে হয় না। হলে, খুবই খুশি হব। তাঁদের অনেক দুঃখের সাধন কয়েক বছরের মধ্যেই কণ্টকশয্যা হয়ে উঠবে। মন বলছে।

মন যা বলছে তা মিথ্যে হলে আমিই খুশি হব সব থেকে বেশি।

শুধুমাত্র আবেগসর্বস্ব হলেই স্বাধীনতার যোগ্যতা আসে না। অত্যাচারিত হলেও IPSO FACTO কোনও জাতি স্বাধীনতার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে না।

শুধু নেতাদের চরিত্র থাকলেও সব হয় না, দেশের সাধারণ মানুষের চরিত্র তার চেয়েও বেশি দরকার জাতি গড়তে। আবার দেশের প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতার যোগ্যতা থাকলেও মুষ্টিমেয়, চরিত্রহীন, মিথ্যাবাদী, গদিসর্বস্ব নেতারা একটা দেশকে নিয়ে জুয়া খেলতে পারেন, যেমন আমাদের দেশে খেলছেন।

পঞ্চাশ বছরেও আমাদের একটি জাতীয়চরিত্র গড়ে উঠল না, 'ভারতীয়ত্ব'ই জন্মাল না। এখনও আমরা শুধুমাত্র বাঙালি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, গুজরাতি, মাড়োয়ারিই রয়ে গেলাম।

জনসংখ্যার সমস্যার, যে সমস্যাই দেশের প্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রলয়ংকরী সমস্যা, তার সমধান তো দূরের কথা, কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলাম না "গদি" চলে যাবে বলে।

প্রতিটি দিন যাচ্ছে, আর এই সমস্যা আমাদের ভবিষ্যৎকে সার্বিকভাবে গ্রাস করছে। শুয়োরের অথবা গিনিপিগেরই মতো বংশবৃদ্ধি করতে পরোক্ষে প্ররোচিত করলাম আমরা দেশবাসীকে। আমাদের ভোট বাড়বে বলে। বিধানসভার এবং লোকসভার সদস্যপদের সংখ্যা বাড়বে বলে, ভোটদাতাদের বয়স একুশ থেকে কমিয়ে আঠারোতে নিয়ে এলাম ভোট আরও বাড়ানোর জন্যে।

এই আমরাই ইংরেজ রাজা-রানিকে তাড়িয়ে আরও সমারোহে নেহরু-রাজন্যকে কায়েম করলাম নির্লজ্জ আত্মসম্মানজ্ঞানহীন, মনুষ্যেতর জীবেদের মতো।

সোনিয়া গান্ধি উনিশশো চুরানব্বইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হলে শাখামৃগদের মতো উল্লম্ফন শুরু করেন "গণতান্ত্রিক" কংগ্রেসেরই অনেকে। এবং এই দেশের মহান গণতন্ত্রের মহতী প্রহরী সংবাদপত্রদের অধিকাংশই সেই সংবাদ শীৎকারের সঙ্গে ছবিসহ প্রথম প্যাতায় ছাপলেন। এতবড়ো একটা দেশের নেতা বা নেত্রী যেন নেহরু-পরিবার ছাড়া অন্য কারো পারিবারিক "কোল্ড-স্টোরেজ" থেকে আসাটা সম্ভবই নয়!

লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা!

এখানে প্রত্যেকটি সংবাদপত্রেরই একমাত্র চিন্তা, পাঠক কী খাবে? খবরের কাগজের কাজ এখানে সেই "FODDER"-এর জোগান দেওয়া। বিবেকহীন, আদর্শহীন, দেশাত্মবোধহীন, লজ্জাহীন পরোপুরি এক অর্থকরী ব্যবসা ছাড়া এখানে অধিকাংশ মিডিয়াই আর কিছুই নয়। তাঁরা প্রায় সকলেই কর্তব্যজ্ঞানহীন অর্থ ও ক্ষমতালোভী; নির্লজ্জ।

এই দেশ, স্বাধীন কি পরাধীন অন্যান্য শিক্ষিত, প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশের মানুষমাত্রই জানেন। আমরা সৎ কি অসৎ, তাও। শুধু আমাদের নিজেদের ঘরেই কোনও আয়না নেই। মূর্খের স্বর্গে আমরা বাস করি। আমরা নিজেদের অজ্ঞতায়, অদূরদর্শিতায়, অসততাতে, নিশ্চিত আত্মহননকারী পথ থেকে নিজেদের এই পঞ্চাশ বছরেও ফেরাতে পারলাম না।

নিজস্ব সব ঐতিহ্য তো অনেক আগেই নষ্ট করেছি। তারপরও ঐতিহ্যের মধ্যেও যা কিছু ভালো ঐতিহ্য ইংরেজরা আমাদের গিয়ে গেছিলেন তারও তো কিছুমাত্রই ধরে রাখতে পারলাম না আমরা। এই নেহরু-রাজন্য-শাসিত 'স্বাধীনতার'ই বেদিতে আমার সেজকাকুর মতো কত মহান মানুষের সারাজীবনের আত্মত্যাগ যে বিলীন হয়ে গেল, তা ভাবলেও চোখে জল আসে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই অগস্ট বলেছিলেন যে, প্রত্যেক কালোবাজারি আর অন্যায়কারী আর দুর্নীতিগ্রস্তকে "ল্যাম্পপোস্টে ল্যাম্পপোস্টে টাঙাবেন।"

বাতেল্লা! ভণ্ডামির সংজ্ঞা।

পঞ্চাশ বছর পরেও কী হল আজ?

আমরা আজ অযোধ্যার গুণ্ডামিকে সমর্থন করছি, চিরকালীন এবং বিশ্বকুখ্যাত গোঁড়া, অন্ধ, অন্যধর্মের মৌলবাদীদের সমতলেই নামিয়ে আনছি আমাদের। দাউদ ইব্রাহিম আর রশিদ খাঁ-দের দয়াতে বেঁচে আছি স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও। সত্যি কথা বলা মানা। সকলেরই চোখে ঠুলি, মুখে কুলুপ আঁটা। দেখেও আমরা দেখি না, বুঝেও বুঝি না। কিন্তু যখন বুঝব সব, তখন সময় আর বাকি থাকবে না।

স্বাধীনতা মানে তো শুধু ভোট দেওয়ার অধিকার নয়! সেশন সাহেব যদি স্বাধীনতার গোড়া থেকেই থাকতেন বা তাঁর মতো অন্য কেউও, তাবৎ ভারতের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে বা পুলিশ সার্ভিসে; মেরুদণ্ডসম্পন্ন কয়েকজন মানুষও তবেও অন্য কথা ছিল। যদি এমন অল্পসংখ্যক আমলারাও থাকতেন, যাঁরা মিথ্যা দোহাই পেড়ে নিজেদের বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন না এ কথা বলে যে, "পোলিটিক্যাল ইন্টারফিয়ারেন্সের জন্যে কাজ করতে পারি না।"

কাজ করার ইচ্ছা থাকলে এবং নিজের দুটি হাত পরিচ্ছন্ন থাকলে এবং অবশ্যই মেরুদণ্ড থাকলে কাজ যে অনেক সময়েই করা যায়, তা সেশন সাহেব দেখিয়ে দিয়েছেন।

জুডিসিয়ারিতেও সেশন সাহেবের মতো মানুষ তো এযাবৎ বেশি দেখিনি।

আর বিস্তারিত বলতে চাই না।

যাঁরা রিটায়ারমেন্টের পরে রাষ্ট্রদূত বা নানা এনকোয়ারি কমিশনের সদস্য হওয়ার কথা ভেবে নিজেদের 'আদর্শচ্যুত' করেন না, এমন সদস্যও কি এই মহান গণতন্ত্রের জুডিসিয়ারিতে বেশি আছেন? যে জুডিসিয়ারি 'গার্জিয়ান অফ ডেমোক্র্যাসি? যদি থাকতেন, তবে না-হয় এই গালভরা গণতন্ত্রকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলে মানতে পারতাম! প্রকৃত গণতন্ত্র অন্য কোথায় কোথায় আছে তা জানি না, তবে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, ব্রিটেনে, কানাডাতে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে এবং অ্যামেরিকাতেও অবশ্যই আছে।

তবে সব গণতন্ত্রেরই সর্বপ্রধান দোষ হচ্ছে, সেখানে প্রায় সবসময়েই 'Government of quantity' ক্ষমতাতে আসে, 'and not of quality' ডেমোক্র্যাসির এই দোষ। জনগণেরই অথবা প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় বলতে গেলে "গণগণের"ই রাজত্ব গণতন্ত্রে। অথবা "গণবাঁশ"-হাতে "গণচ্যাংড়াদের"।

অজ্ঞ, অন্ধ, স্বার্থপরায়ণ, লোভতাড়িত, অন্যচালিত ভারতীয় জনগণেরও অবশ্যই অধিকার আছে এই সুন্দর দেশটিকে চিরদিনের মতো অসৌন্দর্যের লজ্জাহীনতার, সবরকম লোলুপতার, আত্মহত্যার "গণপথে" চালিত করার।

তাঁদের শুভবুদ্ধি জোগাবার মতো মানুষ নেই। সেই পরিবেশই নষ্ট হয়ে গেছে অপরিণত মস্তিষ্কের শিশুই যদি জানত তার পক্ষে কী ভালো আর কী ভালো নয়, তবে তার অভিভাবকের প্রয়োজন হতো না। এখানে শিশুরাই নিজেদের অভিভাবক। সে কারণেই দেশও খেলনার মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; ধূলিমলিন, পদদলিত হয়ে।

পাঠক! দিনান্তে আপনারা কি একবারও ভাবেন? একজনও কি ভাবেন? আপনারা নিজেদের, নিজেদের আগত এবং অনাগত সন্তানদের কোন্ রৌরবে নিক্ষেপ করেছেন? এবং করে যাবেন?

গণতন্ত্রে বাস করেও আপনি কি মনে করেন না যে, কিছুমাত্র করণীয় ছিল আপনার? আপনার দেশ, আপনার রাজ্য, আপনার স্ত্রী বা স্বামী, আপনার আদরের সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্যে, তাঁদের সম্মিলিত এবং সার্বিক, আর্থিক এবং আত্মিক সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে, কিছুমাত্র করা?

উচিত ছিল না কি?

ভেবে দেখবেন পাঠক!

এই দেশ রাজীব গান্ধির বা অর্জুন সিং-এর বা লালকৃষ্ণ আদবানির, শৈলেন দাশগুপ্তর বা সোমেন মিত্র বা জ্যোতিবাবুর যতটুকু, আপনারও ঠিক ততটুকুই! ঠিক ততটুকু। একটুও বেশি নয়, কমও ন্যয়। সোনিয়া গান্ধি অথবা প্রিয়াংকা গান্ধিরাই কি অনাদিকাল চোর বা চাকর মনোবৃত্তির আমাদের মালিক এবং মালকিন বনে থাকবেন? চিরটাকাল?

ভেবেছেন কি কখনও?

তাঁদের কারোরই পৈতৃক সম্পত্তি নয় এই দেশ, যদি-না অবশ্য আপনি সেই পাট্টা তাঁদের নিজ হাতেই তুলে দেন। এ দেশ কারোই বা কোনো বিশেষ পরিবারের নিজস্ব জমিদারি নয়।

এ দেশের প্রকৃত মালিক আপনিই। যদি আপনার বয়স আঠারো বছর হয়ে থাকে তবে নিজের সম্পত্তি, নিজের ভবিষ্যৎ, নিজের বৃদ্ধ-মা বাবার ভবিষ্যৎ, নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎ এখনও সুরক্ষিত করতে পারেন আপনি।

শুধুমাত্র আপনিই!

যাঁদের ভোট দিয়ে পাঠান আপনারা বিধানসভাতে এবং লোকসভাতে তাঁরা প্রত্যেকেই আপনার সেবক। হ্যাঁ, আপনারই সেবক। আপনি বা আমি তাঁদের তাঁবেদার নই। বেচারি পুলিশকে, বেচারি ডাক্তারকে, বেচারি অফিসারকে দোষরোপ না করে, যাঁরা এই দেশকে এমন নৈরাজ্যে পৌঁছে দিয়েছেন গত সাতচল্লিশ বছরে তাঁদের সামনে গিয়ে মাথা উঁচু করে মেরুদণ্ড টানটান করে দাঁড়ান। নিজের পাড়ার, নিজের কেন্দ্রের বিধানসভা এবং লোকসভার সদস্যকে নিজেদের অভিযোগ ও অসুবিধার কথা সংঘবদ্ধ হয়ে জানান। আপনার সঙ্গে অন্যে না যেতে চাইলে একাই যান। আপনিই নেতৃত্ব দিন, প্রতিকার চান।

প্রতিকার না পেলে, তাঁরা আপনাদের যা শিখিয়েছেন তাই তাঁদের উপরে প্রয়োগ করুন। ঘেরাও করুন তাঁদের। অবশ্যই জনসাধারণের বা যানবাহন চলাচলের একটুও অসুবিধা না করে। নেতাদের দায়িত্ববান করে তুলুন। ওঁদের কর্তব্যের এলাকা চিহ্নিত করুন। "গায়ে হাওয়া" দিয়ে ওঁদের মধ্যে অধিকাংশই বহু বছর কাটিয়েছেন।

আমি জানি, আপনাকে মেরেও ফেলতে পারেন ওঁরা। কিন্তু এইভাবে বেঁচেই বা কী হবে? মরতে তো একদিন প্রত্যেককেই হবে। অ্যাকিলেসের সেই বিখ্যাত কথা আছে না? কোন্ মানুষ কতদিন বাঁচল তা দিয়ে মানুষের জীবনের মূল্যায়ন কোনও দিনই হয়নি, কে জীবনে কী করে গেল তাই দিয়েই সেই মূল্য নিরূপিত হয়।

এমন করে বাঁচার চেয়ে মরাও ভালো। মৃত্যু যদি ত্বরান্বিত হয় তবে তা অমরত্বের হাত ধরেই আসবে। কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মতো বেঁচে কী হবে? অসাধারণ হন। মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কী আছে? যে মুহূর্তে জন্মেছেন; সেই মুহূর্তেই মৃত্যুও নিশ্চিত হয়ে গেছে। মৃত্যুই তো প্রত্যেক মানুষের অমোঘ গন্তব্য।

পাঠক। এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যাবেন না যে, 'অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

আপনি যা চাইবেন তাই হবে।

শুধুমাত্র নিজের কথাই ভাববেন না। সকলের কথাই ভাবুন।

সারা দেশের গ্রামে যান, গ্রামের ভিতরে, দেশের গভীরে গিয়ে দেখে আসুন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও ভারতবাসী কেমন করে বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকেন। গ্রামীণ ভারতই আসল ভারত! জনসংখ্যা হ্রাস করতে বাধ্য করুন। এই সমস্যা এখন সত্যিই হাতের বাইরে চলে গেছে। নেতারাও হয়তো তাই চেয়েছিলেন। কারোরই আর শিক্ষা-দীক্ষা, গভীরতা, মতাদর্শ কিছুই থাকবে না ভবিষ্যতে, কিছুই নয়।

শুধুই ভাত দাও! ফ্যান দাও! বলে আপনাদেরও পথে পথে ঘুরতে হবে। 'মানবিক' ক্রিয়াকাণ্ড, এই ভিখিরি-পরিবেশে; গাছহীন, ছায়াহীন, অরণ্যহীন, সুখহীন, শান্তিহীন, নারকীয় ভবিষ্যতে নিছক "কথারই কথা" হয়ে উঠবে। দু-মুঠো খেয়ে পরে শুধুমাত্র বেঁচে থাকাটাকেই, প্রশ্বাস-নেওয়া আর নিশ্বাস-ফেলাটাকেই আমরা 'বেঁচে থাকা' বলে মেনে নেব। তেমন করে বেঁচে থাকাই তখন আপনার ও আমার মতো মানুষের একমাত্র 'বিলাস' হবে। কেউই সাহিত্য পড়বে না, সঙ্গীত শুনবে না, ছবি আঁকবে না বা দেখবে না। চারিদিকে শুধুই 'নাই নাই!' 'খাই খাই!' রব উঠবে। অথবা ভিডিয়ো চাই। গাড়ি চাই। বাড়ি চাই। চাই চাই রব।

রাজনীতি করাটাও তখন আরও সহজ হবে। দেশে, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো মানুষ আর একজনও থাকবে না। রাজনৈতিক দলেরা খুশি হবে, অধিকাংশ খবরেব কাগজের মালিকও দারুণ খুশি হবেন। তাঁদের সেই অফুরান খুশির মধ্যে বসে তাঁরা জানবেনও না যে আমি এবং আপনি না থাকলে সততা এবং সৎসাহস এবং ন্যায়-অন্যায় বোধ না থাকলে তাঁরা নিজেরাও ভবিষ্যতে বেশিদিন থাকবেন না।

ওঁরা মূর্খ, অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলেই ওই সরল সত্যটি তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বুঝতে পারেন না। অর্থ আর গুমোরের কাচের স্বর্গেই তাঁদের বাস। ক্ষমতার পাইক-বরকন্দাজেরাও চিরকালীন নয় কারও। মোসাহেবরাও নয়।

এই ছবি অত্যন্তই অস্বস্তিকর জানি। সুখ-শান্তিবিঘ্নকারী, তাও জানি। কিন্তু পাঠক! এই রূঢ় বাস্তব। ভবিষ্যতের এই ছবি! যদি আপনার ভবিষ্যৎকে একটুও অন্যরকম করতে চান তবে এখনও নড়েচড়ে উঠুন। নিজেকে চিমটি কেটে দেখুন, বেঁচে আছেন কি না। কিছু করুন! ভাবুন! আপনিই এদেশের মালিক। আপনার চোখের সামনে সব তছনছ হয়ে যেতে দেবেন না।

PLATO-র "THE REPUBLIC"-এ আছে : THRASYMACHUS-এর সঙ্গে কথোপকথন। খুবই প্রণিধানযোগ্য কথোপকথন।

সত্যর মধ্যেও অধিকাংশ সত্যই STATIC TRUTH নয়; CHANGING TRUTHS । কিন্তু কিছু কিছু সত্য থাকে, যা যুগযুগান্ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে এসেও অবিচল থাকে। সেই সব সত্যই স্থায়ী সত্য!

থ্রাসিম্যাকাসের ওই উক্তির সত্য তেমনই সত্য। সে সত্য নড়েনি একচুলও। অথচ নড়লে, অত্যন্তই সুখের ব্যাপার হতো।

PLATO-From REPUBLIC

"Come, then Thrasymachus, said I, let us start afresh with our questions.

You say that injustice pays better than justice, when both are carried to the fathest point?

I do, he replied; and I have told you why.

And how could you describe them? I suppose you would call one of them an excellence, and the other a defect?

Of course.

Justice is excellence, and injustice a defect?

Now, is that likely, when I am telling you injustice pays and justice does not?

Then what do you say?

The opposite.

That justice is a defect?

No, rather the mark of a good-natured simpletion.

Injustice, then, implies being ill-natured?

No : I should call it good policy.

Do you think that unjust are positively superior in character and intelligence, Thrasymachus?

Yes, if they are the sort then carry injustice to perfection and make themselves masters of whole cities and nations."

হ্যাঁ।

বড়োই দুঃখের বিষয়, Thrasymachus যা বলেছিলেন তাই সত্যি।

আমরা দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু ধাউড়ের খপ্পরেই পড়েছি, নিজেরা পরোপুরি নিশ্চেষ্ট থেকে।

পাঠক! সব শিক্ষারই তো শেষ গন্তব্য তো এখন অর্থোপার্জন। আসুন, পড়াশোনা এবং অন্য পেশা ছেড়ে কোনো রাজনৈতিক দলে নাম লেখাই। আমরা তো আর প্রমোদ দাশগুপ্ত বা মমতা ব্যানার্জি বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মতো মূর্খ নই!

আখের কিছু গুছিয়েই নেব!

বরিশালে শীতের সকালে, লজ্‌ঝড়ে বাসে করে, (তখন সব বাসই অবশ্য লজ্‌ঝড়েই ছিল); পাখি বা কুমির শিকার করতে অথবা, সৎভাবে বললে বলতে হয়, তেমন কোনও "অ্যালিবাই" নিয়ে; কোনও দূর গন্তব্যে যাওয়া বা আসার সময়ে, সমবেত সঙ্গীত হত। কমিউনিস্টরা যাকে বলেন "গণ-সঙ্গীত"। সেই গণসঙ্গীতে যোগ দিতেন বাবা এবং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বরিশাল জিলা স্কুলের তৎকালীন হেডমাস্টার বিশ্বাস সাহেব। কখনও বা বাঙালি এ ডি এম অতিক্রম মজুমদার স্যাহেবও।

দেশ স্বাধীন হবার প্রাক্কালে, দেশাত্মবোধক গান, এপার বাংলা-ওপার বাংলাতে, প্রায় মহামারীর চেহারা নিয়েছিল। এবং সেই মহামারির প্রকোপে স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র আমাকেও পিতৃদেব এবং তাঁর বন্ধুবর্গের সঙ্গে গলা মেলাতে হত। "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা", "হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর", "সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামারা", ইত্যাদি গান গাওয়া হত।

ইকবাল মহম্মদের সেই শেষোক্ত, গানটিকেই আমার মেধাবী সহপাঠী, মঞ্জুর-উল্‌-করিম, বাংলাদেশ সরকারের সদ্য অবসর-নেওয়া স্বরাষ্ট্র-সচিব এবং ছদ্মনামের কবি ইমরান নূর; গাইত কথা বদলে, "সারে জাঁহাসে আচ্ছা, পাকিস্তাঁ হামারা" বলে।

ঋভুর প্রথম পর্ব মঞ্জুর-উলকেই উৎসর্গ করেছি।

একে ওই প্রকার বাসের ঝাঁকুনি, তদুপরি, ওই প্রকার অ-গায়কদের সমবেত সঙ্গীত! পথ পাশের গাছে-বসা কত পাখি যে মরে পড়ে থাকত, তা আমাদের অজানা ছিল। পথপাশে কোনও ইংরেজ বা ইংরেজের গুপ্তচর থাকলেও সেও নির্ঘাৎ মারা পড়ত। যাই হোক, এই সব ক্রিয়া-কাণ্ডতে বাবার এমত ভ্রান্ত-ধারণা জন্মে গেছিল যে তাঁর পুত্রও সুকণ্ঠের অধিকারী।

দেশ ভাগের কিছুদিন পরই, রংপুরের অধিকাংশ পরিচিত মানুষই বরিশালের মানুষদেরই মতো, "ওদিকে মান-সম্মান নিয়ে থাকা যাবে না আর" এইকথা ঠিক বুঝেই বা ভুল বুঝেই হোক, সীমান্ত পার হয়ে চলে আসতে শুরু করেন।

ঋভুর প্রথম পর্ব যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে; আমাদের শেষ নিবাস ছিল রংপুরই। বরিশালে বাবা সরকারি চাকরিতে বদলি হয়েই গেছিলেন মাত্র বছর দেড়েকের জন্য। দেশভাগের আগে আগে।

রংপুরের বিখ্যাত তুলসী লাহিড়ীর উদ্বাস্তু পরিবারও এসেছিলেন। সেই জমিদার পরিবারের গোপাল লাহিড়ী, রংপুরে বাবার শিকারের গুরু ছিলেন। তিনি ছিলেন তুলসী লাহিড়ীর দাদা। অত্যন্ত ভালো বাঁশি বাজাতেন নাকি গোপালবাবু। অন্যান্য বহুগুণও ছিল। তাঁকে, তাঁর প্রিয় চাকর, রাগের বশে, তাঁরই বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে।

সামু লাহিড়ী ছিলেন, তুলসী লাহিড়ী মশায়ের অনুজ। দেশভাগের পরে বাবা সামুকাকাকে ভার দিলেন আমাকে গান শেখাবার। তখন আমরা থাকি, ৩৪এ ডোভার রোডের ছোট্ট দোতলা বাড়িতে।

সামুকাকা, সপ্তাহে দিন দুই আসতেন। সন্ধেবেলা।

আমার ছোটো বোন মালা, যাকে ঋভুর প্রথম পর্বে নাম দিয়েছিলাম অরা, ভালো গান গাইত। তার নিজস্ব হারমোনিয়ামও ছিল। আমাকে হাত দিতে দিত না।

ডোভার রোডের বাড়িতে এসে বাবা, মায়ের জন্য একটি কটেজ-অর্গানও কিনে দিয়েছিলেন। মা কখনো-সখনো, সন্ধেবেলায় চান করে উঠে, পাট-ভাঙা, কস্তা পেড়ে তাঁতের শাড়ি পরে, বড়ো করে সিঁদুরের টিপ পরে, চা খাওয়ার পর অর্গানে বসে নানারকম ব্রহ্ম-সঙ্গীত অথবা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন।

আমার মা চিরদিন "লাক্স" সাবান মাখতেন। এবং "কিউটিকুরা" পাউডার। সবে চান করে ওঠা মায়ের পাশে মোড়া পেতে বসে যে সুগন্ধ পেতাম, তেমন সুগন্ধ পরবর্তীকালে দেশ-বিদেশের অগণ্য বিভিন্ন-বয়সী মহিলার খুব ঘনিষ্ঠ হয়েও কখনও পাইনি। কারণ, হয়তো প্রত্যেকেরই কাছে নিজের মায়ের গায়ের সুগন্ধ, মায়েরই সুগন্ধ। তার তুলনীয় তো পৃথিবীর আর কোনও সুগন্ধই হতে পারে না।

সামুকাকা আসতেন, তাঁর দিলরুবাটি মখমলের একটা খয়েরি-রঙা ঢিলে-ঢালা খাপে ভরে, বগলদাবা করে। কোথায় থাকতেন উনি তখন ঠিক মনে নেই। সম্ভবত, নতুন-হওয়া বা হবহব ধর্মতলার দিকের সি আই টি রোডের কোথাও।

উনি বলতেন, হারমোনিয়াম, যাদের গলায় সুর আছে, তাদের ব্যবহারের যন্ত্র নয়। অবশ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বেলায় সে নিয়ম খাটে না।

কেন খাটে না?

তা আমার মতো অর্বাচীনকে ব্যাখ্যা করে বলেননি অবশ্য উনি কখনও। তবে, সামুকাকা যে অত্যন্ত উচ্চ ধরনের রসবোধ এবং সারকাসিজমের উৎসারী ছিলেন, তার প্রমাণ জলজ্যান্ত আমি। মানে, আমার প্রতি বর্ষিত তাঁর দ্বিমুখী-ত্রিমুখী মন্তব্যসমূহ।

সামুকাকার রক্তে গান ছিল। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু কালো। উত্তরবঙ্গে প্রবচন আছে "কালা বামুন ডেঙ্গারাস"। সেই প্রবচন সামুকাকার বেলায় প্রযোজ্য ছিল না। তীক্ষ্ণ নাসা হলেও, তাঁর ললাট তেমন প্রশস্ত ছিল না বারেন্দ্রদের তুলনাতে। তুলনা করে বলতে গেলে বলতে হয়, সুপুরুষ এবং নানা বিষয়ে পণ্ডিত ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মশাইয়ের রোগা-সোগা সংস্করণ ছিলেন সামুকাকা। তবে ধৃতিকান্তবাবু গৌরবর্ণ, সবলদেহী। সামুকাকা ছিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্বলদেহী।

রংপুরের লাহিড়ী বাড়িতে কোনও শিশু চিৎকার করে কেঁদে উঠলে, শ্রদ্ধেয় তুলসীবাবু বা গোপালবাবু নাকি তৎক্ষণাৎ "ব্যায়লা" কাঁধে নিয়ে সুর লাগিয়ে বলতেন, আর একটু তোল বাবা, আর

একটু তোল মা। কড়িমার কোলে ওঠ। কড়িমা যে কাঁদছে। কখনও বা বলতেন, চড়ার সা লাগল না যে রে।

এহেন রহিস জমিদার পরিবারের সামুকাকা আমা-হেন ছাত্রকে দিলরুবা সহযোগে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবার প্রয়াসে যে-প্রকার মানসিক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন তেমন বোধহয় দেশভাগের কারণেও করেননি। দেশভাগ যে কত মানুষকে কত রকমের কষ্টের শরিক করেছিল তা আজও কেউ খতিয়ে দেখেননি। নেহাৎ দৈব-দুর্বিপাকে না পড়লে আমা-হেন ছাত্রকে গান শেখাতে তিনি আদৌ রাজি হতেন বলেও আমার মনে হয় না।

তবে, সুখের বিষয় এই যে শিক্ষক আর ছাত্র দু'জনের কেউই গানটাকে শিক্ষণীয় বা শিক্ষা-প্রদেয় ব্যাপার বলে মান্য না করে বন্ধুভাবে গল্প-গুজব করেই নির্ধারিত সময়ের বেশিটুকু কাটাতাম। রসগোল্লা-অমলেট খেতাম। তবে, তারের যন্ত্র, এবং বিশেষ করে দিলরুবা যন্ত্রটির প্রতি এক বিশেষ ঔৎসুক্য এবং আকর্ষণ আমার ওই বয়সেই জন্মেছিল। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি।

বলতে ভুলে গেছি, আমার একটি নিজস্ব তানপুরা ছিল। মাঝে-মাঝেই পথ-ভোলা মাছি বা কাঁচপোকা তার তারে আছড়ে পড়ে মূর্ছনা তুলত। হয়তো সুরলোক থেকে অপ্সরারা সুরের যন্ত্রের এমন অপমানের প্রতিবাদ এমনি করেই করতেন। একথাও মিথ্যে নয় যে, সব সময়েই বাঁধা-তানপুরার সুরে আর আমার গলার সুরের মিলন ঘটত না।

মা সামুকাকাকে শুধোতেন, ঠাকুরপো, আপনার ছাত্র কেমন শিখছে?

সামুকাকা, পাহাড়ী সান্যাল মশাই যেমন করে গানের মজলিশে মাথা ও হাত নেড়ে কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! বলতেন, ঠিক তেমন করেই বলতেন, ভালো। ভালো।

তারপরই যোগ করতেন, এই বয়সে যতখানি ভালো হওয়া যায় আর কী।

সৌভাগ্যের কথা, আমি যখন সঙ্গীত-সাধনা করতাম, তখন মা অন্যত্র অত্যন্তই ব্যস্ত থাকতেন। বাবা তো দিনে ছ'ঘন্টা বাড়ি থাকতেন। তখন তাঁর পেশা 'গড়ে তোলার' সময়। দিনরাত অবিশ্বাস্য পরিশ্রম করতেন।

আমাদের পিতৃপুরুষের পরিবারের অধিকাংশ মানুষের সঙ্গেই সঙ্গীতের কোনওরকম সংযোগ ছিল না বললেই চলে। "সুন্দর সহাবস্থানের" কথা ছেড়েই দিলাম, সম্পর্কটা সতীনের মতোও ছিল না। তাই আমি আমার "অগ্রগতিতে" আমার শিক্ষাগুরুর মিথ্যে স্তোকবাক্যে মাঝে মাঝে বিশ্বাস করে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠতাম।

আমার ছোটোকাকা, রেডিয়োতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হলেই বলতেন, কে রে? কে খুলল রেডিয়ো? কার আবার কুকুরের কান্না শোনার এমন শখ হল? বন্ধ কর! বন্ধ কর! নইলে এক্ষুনি হকিস্টিক দিয়ে রেডিয়োর দফারফা করে দিচ্ছি।

তখনকার দিনে আবার ভাল রেডিয়োকে শুধু রেডিয়ো বলত না, বলতে হত "রেডিয়োগ্রাম"। সেই রেডিয়োগ্রাম, 'মারকুইট্টা' ছোটোকাকুর হাতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে এমন ঝুঁকি নেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব হত না। তাই মরমে মরে গিয়ে নেহাত শান্তিরক্ষার কারণেই রেডিয়ো বন্ধ করে দিতাম।

একটা অঘটন ঘটল। সেটাকে সাংঘাতিকই বলা চলে।

ইংল্যান্ডের "হ্যারো" বা "ইটন" বা ভারতের "ডুন স্কুল"—বা যেসব স্কুলে পড়লে, এদেশের প্রধানমন্ত্রী অথবা নামী-দামি শূন্যকুম্ভ-চালিয়াত বা চোর হওয়া যায় একটু ইচ্ছে করলেই, আমি তেমন কোনও "সম্ভ্রান্ত" স্কুলে পড়তাম না। আমার অতি সাদামাঠা বাংলা মাধ্যমের স্কুলের নাম ছিল "তীর্থপতি ইনস্টিট্যুশন"। তবে পাঠক যেন না ভাবেন যে আমি মন্দ বলে, সেই স্কুলের অন্য ছাত্ররাও সকলেই মন্দ ছিল। যদিও নিন্দুকেরা বলতেন, "যার নেই কোনও গতি, সে যায় তীর্থপতি", সেই স্কুলই অমূল্য সব রত্ন প্রসব করেছে আজ অবধি এবং করে চলেছে। সেদিক দিয়ে আমাদের স্কুলকে বলতে হয় রত্নগর্ভা। যে-কোনও খনিগর্ভেই যেমন রত্নের সঙ্গেও কিছু পাথর-মাতর, ভুসিমাল থাকেই; আমিও তাই।

আমাকে দিয়ে স্কুলের বিচার করাটা ন্যায্য হবে না।

হঠাৎ একদিন লেডিজ সাইকেলে চড়ে স্কুলে পৌঁছে একটি খবর শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। কেন হতবাক হয়েছিলাম সে সম্পর্কে বলার আগে, লেডিজ-সাইকেলের পটভূমি সম্পর্কে কিছু বলে আপনাদের একটু হতবাক করি।

পিতৃদেব তাঁর প্রথমা কন্যার জন্য একটি লেডিজ-সাইকেল এবং পিয়ানো কিনে দেন। এমন পরিবারও ভারতে অগণ্য ছিল এবং আজও আছে, যেখানে ছেলেরাই নিপীড়িত এবং মেয়েরা আটারলি প্যামপারড।

মানুষের অবস্থা ফিরলেই প্রথম প্রথম সব মানুষই টাকা নিয়ে কী করবেন তা ভেবেই দিশেহারা হয়ে পড়েন। ছেলেমেয়েদের রাতারাতি সর্বগুণান্বিত করার চেষ্টা করেন। তবে, সেই সময়ে মেয়েদের সাইকেল-চালনাটা বিশেষ গুণ বলে মান্য না হলেও, আমার অ্যাডভেঞ্চারাস পিতৃদেব সাইকেল-চালনা থেকে রাইফেল-চালনা ইস্তক সমস্ত কিছু চালনাকেই গুণ বলে মনে করতেন। কিন্তু মানবসন্তানের উন্নতি আর জবরদখল জমির ওপরে রাতারাতি দেওয়াল গেঁথে তুলে কংক্রিটের ছাদ ঢালাই করা যে একইরকম কর্ম নয় এবং এই দুই প্রক্রিয়াও যে ভিন্ন এ-কথা অনেক স্নেহপ্রবণ পিতামাতাই সেযুগেই বুঝতেন না। এখন তো বোঝেনই না!

যাই হোক, যার জন্য সাইকেল কেনা, আমার সেই পিঠোপিঠি এবং প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না সহোদরা মালা 'ঋভু'-র প্রথম খণ্ডে যাকে কল্পিত নাম দিয়েছিলাম অরা; বেণী দুলিয়ে বলল, সাইকেল শিখতে লন লাগে। এই বস্তির পাশের পাথুরে গলিতে সাইকেল শেখা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

বাবা অবশ্য কথা রেখেছিলেন। কয়েক বছর পরে বানানো তাঁর নতুন বাড়িতে চমৎকার লনও করেছিলেন। কিন্তু ততদিনে মালা লানডানের রাস্তায় পাকা ড্রাইভার হয়ে নিজের গাড়ি চালাচ্ছে। সাইকেলে তার মতি ছিল না।

মালা যেহেতু চড়ল না, সেই বেঁটে লেডিজ-সাইকেলটাকে অভাবী-আমি জবরদখল করলাম। সাইকেল চালানোটা দেশভাগের পরপরই শেষবার যখন রংপুরে যাই তখনই শিখে নিয়েছিলাম। রংপুরের নরম চাপ-চাপ মুথাঘাসে ভরা মাঠে অথবা নরম, মিষ্টি-গন্ধর মিহি ধুলোর পথে ধাঁইধাঁই আছাড় খেলেও লাগত না।

বাবার চোখে আমি ছিলাম বাবার নিকৃষ্টতম সন্তান। বাবা আমাকে ভালোবেসে ডাকতেন "হোঁদলকুতকুত"।

বাবার দোষ ছিল না। চেহারাটা আমার সেরকমই ছিল। ওই সাইকেল চড়েই গোদা-গোদা ফরসা-ফরসা একজোড়া পা নিয়ে, সর্বক্ষণ পেছনে-তাড়া-করা বেপাড়ার একপাল হাড়বজ্জাত নেড়িকুত্তার দ্রুতগামী শোভাযাত্রা নিয়ে, মায়ের নির্দেশে সমুদয় আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গিয়ে কুশল সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার জনহিতৈষীর কাজ করতাম। কখনও বা সাইকেল চড়েই তৎকালীন ঘুমন্ত-গ্রাম যাদবপুর থেকে চাল কিনে নিয়ে আসতে হত। কারণ, র‍্যাশনের চালে বিভক্ত বাংলার অতবড়ো গণপরিবারের কুলোত না। এতদ্ব্যতীতও যে কত জনহিতৈষী থুড়ি, "গণহিতৈষী" কর্মই না আমাকে করতে হত!

এই "গণ" শব্দটি বারংবার ব্যবহারেরও একটি ভূমিকা আছে।

চীন যখন ভারত আক্রমণ করল তখন অত্যন্ত গুণী মানুষ প্রয়াত উৎপল দত্ত তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোথাও লিখেছিলেন যে চীন অত্যন্তই ভালো কাজ করেছে। সে জন্যে, ন্যায্যতই দেশদ্রোহিতার দায়ে তিনি গ্রেপ্তার হন।

সেই প্রসঙ্গে এবং প্রেক্ষিতে প্রয়াত প্রমথনাথ বিশী মশাই আনন্দবাজারে যা লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ। সবিনয়ে স্বীকার করছি যে এই উদ্ধৃতিটি আমার নিজের স্মৃতি থেকে দেওয়া নয়, মেধাবী এবং জাজ্বল্যমানভাবে জীবিত এবং উৎপল দত্তরই মতো আরেকজন কট্টর কমিউনিস্ট আজিজুল হক সাহেবর একটি সদ্য-প্রকাশিত লেখা থেকেই উদ্ধৃত। আমাদের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হয় এখন এখানে-ওখানে এবং আমাদের দুজনের কারও বিরুদ্ধেই কোনও ব্যক্তিগত বিরূপতা নেই। যদিও তিনি

কমিউনিস্টদের গালমন্দ করার অপরাধে একটি দৈনিকের পাতাতে আমাকে 'খুন করা উচিত' বলে ফতোয়া জারি করেছিলেন।

হক সাহবের উদ্ধৃত, উৎপল দত্তর গ্রেপ্তারের পরে, প্রমথনাথ বিশীর আনন্দবাজারে প্রাথমিক উক্তিটি নিম্নরূপ;—

"কমিউনিস্টরা যাহা করিয়া থাকেন তাহার পূর্বে একটি গণ থাকে। এইরকম এক গণশিল্পীর গ্রেফতারকে কেন্দ্র করিয়া, গণরাস্তার মোড়ে, কিছু গণচ্যাংড়া, গণটেবিল পাতিয়া গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছেন, ওই সময়, কিছু সত্যিকার গণ, গণবাঁশ লইয়া তাহাদের তাড়া করিলে, তাহারা গণগলি দিয়া গণদৌড় মারে।"

এই প্রেক্ষিতেই জনহিতৈষী না বলে "গণহিতৈষী" বলা।

আমার থুড়ি, মালার লেডিজ-সাইকেল "হাঁকিয়ে" একদিন স্কুলে গিয়েই শুনলাম তাতে শিরে বজ্রপাতই হল। তীর্থপতি স্কুলের "অ্যাফিলিয়েশনই" নাকি বোর্ড অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন বাতিল করে দিয়েছেন।

কী চক্কর! এখন কিংকর্তব্যম্?

তালেবর বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে হাঙরে তাড়া-করা মাছের ঝাঁকের মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে আমরা যে, যে-স্কুলে পারি গিয়ে ভরতি হয়ে গেলাম। অগতির-গতি তীর্থপতির ছাত্রদের যে, সব স্কুলই বাছা-বাছা করে কোলে তুলে নিলেন তা নয়। তবে অঙ্গুলিহেলন ব্যতিরেকেই অ্যাডমিশন ফি-টা উইন্ডফলের মতো পাওয়া যাচ্ছে দেখে অনেক স্কুলই বিশেষ ওজর-আপত্তি না করে আমাদের নিয়ে নিল। তীর্থপতির উপরের ক্লাসের শূন্য ক্লাসরুমগুলোতে পাতিকাকেরা সারা দুপুর এক্কা-দোক্কা খেলতে লাগল মুখ হাঁ-করে লাল টাগরা দেখিয়ে। আর চড়ুইরা ফুরুত-ফুরুত করে উড়ে বেড়াতে লাগল।

তবে তখনকার দিনে প্রত্যেক ছেলেমেয়েই এমন বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী ছিল না। বিদ্যার্জন আর কুস্তিলড়ার মধ্যে বিস্তর তফাত ছিল। সব স্কুলেই জায়গা পাওয়া যেত এবং ছেলে-মেয়েরা নিজেরা গিয়েই হেলাফেলাতে ভর্তি হত। বাবা-মায়ের নাভিশ্বাস উঠত না ছেলে-মেয়ে ভর্তি করাতে। তাছাড়া, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে না-পড়লেই যে ছেলেমেয়ে বাঁদর-বাঁদরী হবেই এমন উদ্ভট বিশ্বাস কলকাতার মাড়োয়ারি-সেবক "উচ্চশিক্ষিত" বাঙালিদের মস্তিষ্কে এমনভাবে সেঁধিয়ে যায়নি।

"গণচ্যাংড়াদের" মধ্যে আমার মহাচ্যাংড়া একজন বন্ধু পরেশ বলল, আমি সত্যভামা ইনস্টিট্যুশনে ভরতি হচ্ছি। চ বুদ্ধ, তুইও চ। নইলে, বড়ো একা একা লাগবে মাইরি!

অধিকাংশই গেল জগবন্ধু ইনস্টিট্যুশনে। কেউ কেউ গেল কালীধন ইনস্টিট্যুশনে। গণচ্যাংড়ারা বলত, "কেলেধন"।

যাই হোক, "সত্যভামাতে" ভরতি হওয়ার পরদিনই নোটিশ-বোর্ডে নোটিশ দেখা দিল যে, সেই স্কুলে, সামনেই কী এক উৎসব। সম্ভবত প্রাইজ ডিস্ট্রিব্যুশন। তাই, যারা যারা গান গাইতে পারো বা আবৃত্তি করতে পারো তারা তারা নাম দাও।

চিরদিনই "গণ ব্যাপার" এড়িয়ে চলেছি, আজও চলি। সেই কারণেই যাঁরা ঘনঘন গণগণের "সংবর্ধনা" ইত্যাদি নিতে ভালবাসেন আলোকিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে, টিভি-র ক্যামেরার সামনে; তাঁদের কাছে 'গণশত্রু' বলে চিহ্নিত হয়ে আছি। এবং থাকবও। বরিশাল জেলা স্কুলে হেডমাস্টার মশাইয়ের পীড়াপীড়িতে একবার সেই স্কুলে গান গাইতে গিয়ে ভয়ে আধখানা গান গেয়ে থেমে গিয়ে প্রচণ্ড ঘেমে গিয়ে, যা বেইজ্জত হয়েছিলাম তার স্মৃতি মনে তখনও স্পষ্ট ছিল। কিন্তু আমি বাড়িতে দিলরুবা-সহকারে "মাস্টের" রেখে গান শিখি এবং "চিত্তে সুখ" হলে অথবা খুব শীত অথবা গরম লাগলে অথবা সাইকেলের টায়ার বেজায়গাতে পাংচার হলে গান গেয়ে থাকি নিজের মনে, একথা জানত বলেই গণচ্যাংড়া পরেশ নিজে হাতে আমার নামটা লিখে স্কুলের ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়েছিল।

আমি বিন্দুবিসর্গও জানতাম না।

কয়েকদিন পরেই ডাক পড়ল সত্যভামার হেড মাস্টারমশাইয়ের ঘরে।

ফরসা, সুদর্শন ভদ্রলোক। মুখ দেখলেই মনে হয়, গণ-ছাত্র-গত-প্রাণ। ভালোমানুষ।

তিনি সত্যভামা স্কুলের দোতলার বারান্দাতে আমাকে ডেকে বললেন, তুমি যদিও তীর্থপতি থেকে এসেছ কিন্তু এখন তো তুমি আমাদেরই ছাত্র। কবিশেখর কালিদাস রায়মশাই এসে সভাপতিত্ব করবেন পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানে। তুমি যখন গায়ক তখন তোমার গানই গাইতে হবে। অন্য ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে অনেক কিছু করবে। তা তুমি তো আগে এখানে গাওনি, একখানা গান শোনাও তো দেখি বাবা।

অত্যন্ত কুণ্ঠা এবং লজ্জার সঙ্গে বললাম, আমি গান যাকে "জানা" বলে তা জানি না।

উনি তখন আদেশের সুরে বললেন, সেটা আমি বুঝব। গাইতে বলছি, গাও।

খালি গলাতে ধরে দিলাম আমি, একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত, "মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুনদিনের স্রোতে, এসে হেসেই বলে যাই। যাই। যাই।"

ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করেই গাইছিলাম। গান যখন শেষ হল, তখন দেখলাম, হেড মাস্টারমশাইয়ের দুচোখ তখনও বন্ধ। এবং অঝোর ধারায় দুই বন্ধ চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কী যে হল, প্রথমে বুঝলাম না। মনে হল, হার্ট-ফেল করব! তারপর মনে হল, একে তো পুরনো স্কুলের অ্যাফিলিয়েশন বাতিল হয়েছে এবারের ওই স্কুল থেকেও যদি তাড়িয়ে দেয় তাহলে বাবাও তো তাঁর অনাদরের হোঁদলকুতকুতকে বাড়ি থেকেই বের করে দেবেন।

এই স্কুল-পরিবর্তনের ব্যাপারটাও গোপনে মার স্তরেই 'ম্যানেজ' করেছিলাম। আবারও অঘটন ঘটলে মা-ও আমার জন্যে বিপদে পড়বেন। অবশ্য তখন বাবা তাঁর প্রফেশনাল এম্পায়ার বিস্তৃত করতে এমনই ব্যস্ত যে হোঁদলকুতকুতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার তাঁর কোনও সময়ই ছিল না।

বাবাকে না-জানিয়ে অন্য স্কুলে গেছি, 'গণভয়' সেই কারণেই।

সব দুর্যোগের রাতই প্রভাত হয়। হঠাৎ হেড মাস্টারমশাইয়ের দুটি বন্ধ-চোখ খুলে গেল। একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ শোনা গেল তস্য মুখ-নিঃসৃত। বাঃ।

তারপর বললেন, বাবা বুদ্ধ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি অনুষ্ঠানের দিন ওই গানটিই গাইবে। সঙ্গে তবলা বা হারমোনিয়াম কি নেবে?

সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করে বললাম, না, না।

উনি বললেন, কোনওই দরকার নেই। তোমার গলা সাধকের গলা। শ্রোতারা এমনিতেই মুগ্ধ হবেন।

তবলা নেব না বলেছিলাম, তাল কেটে যাবে বলে। কখনওই তো তবলার সঙ্গে রেওয়াজ করিনি, গাইনি। শুধু তারের বাজনার সঙ্গেই গেয়েছি। নিজের তানপুরা নয় তো সামুকাকার দিলরুবার সঙ্গে। তাল নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা 'গণগণের' মনঃপূত ছিল বলেই আমার কোনদিনও ছিল না। যদিও তাল, গানের এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও বিশিষ্ট অঙ্গ, তবুও তাল ছাড়া গান এখনও আমি গাইতে বেশি ভালবাসি। আসলে, তাল ছাড়া তো গান হয় না। বিলম্বিতর পরেও তাল থাকেই গানের মধ্যে সুপ্ত হয়ে।

আমি যে অতবড়ো গায়ক হয়ে গেছি, মানে সাধক; সে সম্বন্ধে আমার নিজের কোনও ধারণাই ছিল না। গান শুনে অগণ্য ছাত্রসম্পন্ন একটি স্কুলের হেডমাস্টার মশাই যখন অঝোরধারে কাঁদেন তখন তো 'দিয়া জ্বালাও' গেয়ে মিঞা তানসেনের মতো আগুনও লাগিয়ে দিতে পারব যে-কোনও শত্রুর লেজে, আমার 'গণ-শত্রু'দের লেজে! আবার চাইলে, ছোটকাকুর সিগারেটের আগুনও নিভিয়ে দিতে পারব "মেঘমল্লার" গেয়ে। এসব কথা ভেবে মিঞা তানসেন বা বৈজু বাওরার মানসিকতার স্তরেই পৌঁছে গেলাম মনে মনে। সেদিন থেকে মাটিতে পা পড়ছিল না আর আমার।

"সাধক" হয়ে ওঠার কথাটা কাউকে বলতে না পেরে পেটও ফুলে রইল। বড়োই অস্বস্তিতে দিন কাটছিল।

পরেশ বলল, তোর কিন্তু রেডিয়োতে গান গাওয়া উচিত মাইরি! এমন "ট্যালেন্ট" নষ্ট করিসনি।

বললাম, পুরো তৈরি না হয়ে ওসব করতে নেই। সামুকাকা বলেন, সাধনাটাই আসল। আজকালকার ছেলেরা 'সা' ও ভালো করে না বলতে শিখে পাড়ার ফাংশনে মাইকের সামনে বসে পড়ে। মাইকের সামনে বসার আগে নিজেকে তৈরি করতে হয়।

পরেশের কাছে আর বললাম না যে, সত্যভামার হেডমাস্টার মশাই আমাকে "সাধকই" বলেছেন। সাধনা পর্ব আমার শেষ।

পরেশ বলল, এসব পেসিমিস্টিক কথা ছাড়। অপ্টিমিস্ট হতে হবে। নিজের ওপর বিশ্বাস আনতে হবে। আমিই ফর্ম এনে দিচ্ছি তোকে। ভরতি করে পাঠিয়ে দে। টাকাও সামান্যই লাগবে। তোর বাবার সঙ্গে কোডারমাতে বাঘ শিকারে যেতে পারিস আর অডিশান দিতে পারিস না? সাহসটাই হচ্ছে আসল। "আমি পারি" এ-কথাটা মন থেকে বিশ্বাস করতে হবে। তারপর যেদিন অডিশানে পাশ করে তুই প্রথম দিন গাইবি, সারা পাড়ার রেডিয়ো "গমগমিয়ে" অ্যানাউন্সার বলবে যে, "এবারে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাচ্ছেন বুদ্ধুদেব গুহ" তখন গাটা কেমন শিরশির করে উঠবে? বল? এই দ্যাখ মাইরি! আমারই গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। আর সেদিন তোদের পাড়ার নন্দা, গাতু, বুড়ু আর তার যেন কী নাম, যার প্রতি তোর একটু উইকনেস...।

আমি বললাম বুদ্ধুদেব নয়, বুদ্ধদেব।

ওই হলো। বুদ্ধ বললেই কি আর বুদ্ধ বুদ্ধু হয়ে যায়? বুদ্ধ শব্দের মানে জানিস? যার বোধিলাভ হয়েছে। যিনি জ্ঞানী।

ওর কথার উত্তর না দিয়ে আমি চুপ করে রইলাম।

ইতিমধ্যে তীর্থপতির হৃতগৌরব ফিরে এল। অ্যাফিলিয়েশন পেয়ে গেল স্কুল। অতএব পুনর্মূষিক ভব। আমরা আবার ফিরে এলাম নিজের স্কুলে, অন্য স্কুল থেকে। প্রায় সকলেই।

ভাবলাম, বাঁচা গেল। গান গাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেলাম!

একদিন দুপুরে বাংলার ক্লাস চলেছে, তীর্থপতির হেডমাস্টারমশাই নিজে ক্লাসে এসে বললেন, তুমি যে এত বড়ো গায়ক হয়েছে তা তো জানতাম না। তোমাকে সত্যভামা ইনস্টিট্যুশনের হেডমাস্টার মশায় ধার চেয়েছেন আমার কাছে। একদিন রিহার্সাল দেবে, পরের দিনই অনুষ্ঠান।

তারপরই বললেন, কবিশেখরকে দেখেছ কখনও?

মাথা নাড়লাম। না, দেখিনি।

এই নাও আমাকে লেখা চিঠির একটা কপি। এতে তারিখগুলো আছে। সময়ও। আমি যেতাম তোমার গান শুনতে কিন্তু আমার...একটা...।

লজ্জায় মরে যাই।

ছেলেরা সব বলল, ছুপা রুস্তম।

চুনী বলল, আমাকে গোল দেবার জন্যে অন্য টিম ডেকে নিয়ে গেলে পেছনে লাগতিস, আর তোকে যে গান গাইতে অন্য স্কুল নিয়ে যাচ্ছে রে। এখন?

উৎসবের দিন কবিশেখর কালিদাস রায়কে দেখে মুগ্ধ হলাম। বাহ্যিক রূপ তাঁর ছিল না। কালো, কুদর্শন, কিন্তু অত্যন্ত নির্মল অন্তরের মানুষ যে তিনি, তা প্রথম দর্শনেই বুঝলাম। ওঁর অনেক কবিতাই আমাদের মুখস্থ ছিল। তার মধ্যে "বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে চলে যায় তারা কলরবে/কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয় যৌবনের শ্যামল গৌরবে" আমাদের মুখে মুখে ঘুরত।

এমন কবিতা, মর্মস্থল বিদ্ধ করার মতন, আজকাল আর পড়তে পাই না বলে খুবই দুঃখ হয়। আধুনিক বাংলা গদ্য, আধুনিক কবিতা, আধুনিক ছবি এই সবই যেন কেমন সুপারফিসিয়াল, ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি হয়ে গেছে; উদ্দেশ্যহীন, যুক্তিহীন, হৃদয় ছোঁওয়া তো দূরস্থান, হৃদয়ের কাছাকাছিও পৌঁছোয় না। অথবা জানি না, আমি হয়তো বুদ্ধু বলেই এই সব কবিতা গদ্য বা গান বা ছবির বিন্দুমাত্রই বুঝি না। আজকাল "জীবনমুখী" কাব্য, "জীবনমুখী" গান, "জীবনমুখী" ছবির দিন এসেছে। আমরা যে "মৃত্যুমুখী" কাব্য-সংগীত-চিত্রর যুগে বাস করে এসেছি একথা মনে করে নিজেদের উপরে বড়োই ঘৃণা হয়।

আমার গানের সময় এল। গাইলাম।

ভেবেছিলাম, গণছাত্ররা হাউহাউ করে কান্নাকাটি লাগিয়ে দেবে, হেড মাস্টারমশাইয়ের কান্না দেখে। কিন্তু তা হল না। কেউই কাঁদল না। আবার কেউ হাততালিও দিল না। পেছনের দিক থেকে একটি মাত্র চটাপট আওয়াজ হল।

তাকিয়ে দেখলাম, পরেশ। একমাত্র পরেশই! ব্যাপারটা খোলসা হল ফাংশনের পরেই। হেডমাস্টার মশাই আমাকে তাঁর ঘরে একান্তে ডেকে বললেন, বাবা বুদ্ধ, তোমাকে কী বলব আর! একদিন তুমি আমার বাড়ি এসে আমার স্ত্রীকে তোমার এই গানটি কি শোনাবে?

কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বললেন, আমার অত্যন্ত প্রিয় কন্যা মাধবী চলে গেল অল্প ক'দিন আগে "মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন দিনের স্রোতে/এসে হেসেই বলে যাই যাই যাই/পাতারা ঘিরে দলে দলে তার কানে কানে বলে, না, না, না। নাচে তাই তাই তাই।"

আহা!

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নেহাত নিজের পেছনে নিজে লাথি মারা যায় না, তাই। নইলে নিজেই নিজের পেছনে লাথি মারতাম।

পরেশের মতো-চ্যাংড়াদের সঙ্গে আর মিশব না ঠিক করলাম।

ইতিমধ্যে ঘটল আরেক বিপদ। যে বিপদের বীজও পরেশই পুঁতেছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে চিঠি এসে হাজির। কাউকে বলতেও পারি না, সইতেও পারি না। সেই নিদারুণ উত্তেজনা এবং ভয়।

শুধু পরেশকেই বললাম। বললাম, ও চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি।

পরেশ বলল, "মা-অ-ন-তু-উ-উ আমার" ইল্লি আর কী! ছিঁড়ব বললেই হল আর কী! কত কাঠখড় পুড়িয়ে লোকে অডিশন পায় আর তোর মেঘ না চাইতেই জল! ওরা কত এক্সপিরিয়েন্সড। হাতের লেখা দেখেই ওরা বুঝতে পারে, কে কেমন গায়। নইলে তোকে ডাকবে কেন?

গণ চ্যাংড়ার কথাতে আবারও 'গ্যাস' খেয়ে গেলাম।

নির্ধারিত দিনে, যাতে 'নির্ধারিত শিল্পী' অনুপস্থিত না হয়, তাই নির্ধারিত সময়ে গারস্টিন প্লেসে গিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর সামনে দাঁড়ালাম। ইডেন গার্ডেনসের আকাশবাণী ভবন তো হল মাত্র সেদিন! পঞ্চাশের দশকে।

লেডিজ-সাইকেলের পেছনে পরেশকে ডবল-ক্যারি করে নিয়ে গেছিলাম।

সামুকাকা জানেন না, মা জানেন না, কেউই জানে না পৃথিবীতে আমি আর পবেশ ছাড়া। কী চাপা উত্তেজনা।

গারস্টিন প্লেসের অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর বাড়ির সামনে পৌঁছোতেই দেখি বিরাট লাল টুকটুকে এক ভদ্রলোক বিরাট একটা জোড়া-তুম্বি বসানো তারের যন্ত্র নিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

একজন দ্বাররক্ষী ফিশফিশ করে বলল, রাজা বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

আমি হাঁ করে রাজা এবং রাজকীয় বাদ্যযন্ত্রটি দিকে চেয়ে রইলাম।

সরস্বতী বন্দনাতে যে "বীণাপাণি" আমরা বলি এই সেই বীণা, বুঝলি।

সর্বজ্ঞ পরেশ বলল, কানে কানে।

তারপর বলল, তোকে ফেল করায় কোন্ শালা! ঢোকার মুখে একে বীণাপাণির বীণার দর্শন হল। তার উপরে রাজ-দর্শন। এ-সবই "প্রি-কন্ডিশনড"। জানিস তো? আমার বড়োপিসে এই কথাটা খুবই ব্যবহার করেন। "প্রি-কন্ডিশনড।" তুই রেডিয়োতে গান গাইবি এটা ওপরওয়ালা ঠিকই করে রেখেছেন। তোর-আমার করার কিছুই নেই।

নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত শিল্পীর ডাক পড়ল। পরেশ বাইরে রয়ে গেল। একটি বন্ধ ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বলির পাঠার মতো কাঁপতে লাগলাম ভয়ে। গলা দিয়ে আওয়াজ কী বেরোবে?

ইয়াব্বড়ো মাইক। অতবড়ো মাইক কখনও দেখিনি। অন্য ঘরের কেনো লোককে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ভৌতিক কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

একজন বললেন, জলদমন্দ্রিত স্বরে, কোন্ স্কেলে গাইবেন?

স্কেল? তাই তো? কোন স্কেলে গাইব?

ভাবলাম, আমি।

তারপর বললাম, ন্যাচারাল বি।

ঠিক আছে।

কী গান গাইবেন? তবলা নেবেন না?

না। তবলা নেব না। আর গান?

"মম মন উপবনে চলে অভিসারে আঁধাররাতে বিরহিনী"।

ও প্রান্ত থেকে জলদগম্ভীর কণ্ঠে আদেশ এল, শুরু করুন। লাল আলো জ্বলে উঠলে থেমে যাবেন।

না কী বলেছিলেন, লাল আলো নিভে গেলে থেমে যাবেন, এতদিন পরে ঠিক মনে নেই।

কিন্তু গানের আস্থায়ী শেষ হতে না হতেই আমার লীলাখেলাও সাঙ্গ হয়ে গেল। ও প্রান্তের গলা বলল, থামুন।

লাল আলো জ্বলে উঠল। অথবা নিভে গেল।

আমি ভাবলাম, একেই বলে, "লাল বাতি জ্বলে যাওয়া।" অথবা "নিভে যাওয়া "।

পরেশ বলল, ফাটিয়ে দিয়েছিস। ফাটাফাটি টু দ্য পাওয়ার এন।

তুই কী করে জানলি?

আরে বুদ্ধু, তুই যদি খারাপই গাইতি তবে তো পুরোটাই শুনত। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শুনত। ওঁরা সব এক্সপার্ট। এক লাইন শুনেই যা বোঝার বুঝে গেছেন। কেল্লা ফতে করেছিস। বসুশ্রী কফি হাউসে কিন্তু কফি আর পকৌড়া খাওয়াতে হবে একদিন। আর জলযোগের দই আর শন-পাপড়ি।

আমর লেডিজ-সাইকেলে পরেশকে যখন ডবলক্যারি করে নিয়ে আনন্দে প্রায় উড়তে উড়তে ফিরছি তখনই এক বেরসিক ট্রাফিক পুলিশ ধরে দু'জনকে দু থাপ্পড় মেরে ছেড়ে দিল।

তখনও কলকাতায় আইনের শাসন ছিল। কলকাতা আর সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের "দেশে বিদেশে" তে বর্ণিত স্বাধীন দেশের শহর এক হয়ে যায়নি তখনও অরাজকতাতে।

পরেশ বলল, তুই এগো। আমি বাসে যাচ্ছি।

ভাড়া আছে তো?

আছে। তোর জন্যে ডোভার রোডের মোড়ে গুহ ফার্মেসির ডাক্তারখানার সামনে অপেক্ষা করব।

ঠিক আছে।

দু'দিন পরে রেডিয়োতে গান গাইব, তখন আর আমাকে পায় কে? এমন জোরে সাইকেল চালালাম যে পরেশের আট নম্বর বাস পৌঁছোবার আগেই আমি গুহ ফার্মেসির সামনে পৌঁছে গিয়ে সাইকেল থেকে নেমে ওরই জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এমন সময়ে দেখি ছোটোকাকু আসছেন।

কি রে? স্কুল নেই?

আছে।

তবে? এখন এখানে কী করছিস?

কী আর বলব জবাবে?

যে-মানুষ রেডিয়োতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হলে "কুকুরের কান্না" বলে রেডিয়ো বন্ধ করে দেন তাঁকে কী করে বোঝাব আজকের উন্মাদনার কথা! যেদিন সারা পাড়া ক্যান্টার করে প্রতি বাড়ির রেডিয়োতে ঘোষিত হবে গমগম করে, এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাচ্ছেন শ্রীবুদ্ধদেব গুহ। তখন?

নাঃ। অনুকম্পা। স্রেফ অনুকম্পা ছাড়া করার আর কিছুই নেই।

খাবি গাঁট্টা?

ছোটোকাকু আবার বললেন।

আমি মাথা পেতে দিলাম।

কী মনে হওয়াতে, ছোটোকাকু অর্থাৎ গোপালকাকু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গাঁট্টাটা না মেরে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দিকে চলে গেলেন।

এমন সময়ে পরেশ এসে নামল আট নম্বর বাস থেকে।

তবে খুব বেশিদিন আমাদের অমন গণ-আনন্দে কাটল না। একদিন বিকেলে চিঠি এল "অল ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টস সার্ভিস" ছাপ মারা। ডিরেক্টর, অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো জানাচ্ছেন যে.....। রিগ্রেট লেটার।

আকাশবাণীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের অডিশন-বোর্ডের সদস্য হিসেবে কাজ করতে হয়েছিল কয়েকবছর। স্বল্পদিন আগেই। আমি কিন্তু ওঁদের কাছে গোপন করিনি কোনও কথাই। বলেছিলাম যে, আমি গান জানি না। এবং ১৯৪৮-৪৯-এ অডিশন-টেস্টে গারস্টিন প্লেসে ফেল করেছিলাম। এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতেই।

ওঁরা বললেন, বাজে কথা বলবেন না। আপনি গান বোঝেন কি বোঝেন না, গান জানেন কি জানেন না সে আমরা বুঝব!

কী আর বলব!

পরেশটা বেঁচে থাকলে, আজ বড়োই খুশি হত। গণ-চ্যাংড়াদের মধ্যে পরেশের মতো পরের ভালোতে এত খুশি হওয়া মানুষ আজকাল খুঁজে পাওয়া ভার। সে অবশ্যই এখন স্বর্গের মন্দাকিনী নদীর পাশে স্বর্গীয় গণ-চ্যাংড়াদের সঙ্গে মনের সুখে চ্যাংড়ামি করছে। তাকে কোনওক্রমে খবরটা পৌঁছোনো গেলে ভালো হত। ভাবছি, আমি নিজেমুখেই বলব স্বল্প দিনের মধ্যে।

আমাদের ডোভার রোডের বাড়ির পেছনেই ছিল বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রির মস্ত কারখানা। সাদা ধবধবে ধুতি অথবা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি মালিকেরা প্রায়ই আসতেন দেখাশোনা করতে। আমি জানালা দিয়ে দেখতাম। খাটে বসেই দেখতাম। খাট নয়, বলা উচিত, বাঙালি উঁচু তক্তপোশ ও মাড়োয়ারি গদি মেলানো একটা ব্যাপার। এবং সেই ছোট্ট ঘরের মাঝ বরাবর শুরু হয়ে জানালা অবধি সেই খাট বিস্তৃত ছিল। ঘরের মধ্যে একটা নিকৃষ্ট ধরনের কেঠো টেবিল এবং দুটি চেয়ার ছিল। সম্ভবত ৪৯এ রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বসবার ঘর থেকে আনা। ঠিক মনে নেই। তাতে অধ্যয়ন এবং লিখন চলত বড়দাদার। আমার বড়পিসির বড়ো পুত্র।

বড়দাদাকে আমার সকলেই বড়দাদা বলতাম, কারণ পরিবারের প্রত্যেকেরই মধ্যে বড়ো ছিলেন উনি আমাদের প্রজন্মে। যখন বড়দাদা পড়তেন না, আমারই মতো পড়াশুনো তাঁরও বিশেষ পছন্দর ব্যাপার ছিল না; তখন সেই চেয়ারটির মালিক হতাম আমি।

পড়াশুনোয়, স্কুলের জীবনে, আমার সত্যিই একটুও মন ছিল না। চৌবাচ্চার এক ফুটো দিয়ে জল ছেড়ে অন্য ফুটো দিয়ে সেই জল ক্যারদানি করে বের করার সময়ের হিসেব রাখার অথবা তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের উত্থান-পতনের ইতিহাস জানার যে কী প্রযোজন তা ভেবে পেতাম না। তাছাড়াও, ওই

সব তাবৎ গভীর রহস্য সম্বন্ধে অবহিত না থাকলে মানব সন্তানের জীবন বৃথা যে কেন হবে, তা সেদিন যেমন, তেমন আজকেও আমার মাথাতে আদৌ আসে না। হয়তো মাথা নেই বলে।

বলতে গেলে, মন পাঠ্য বিষয়ের কোনও বিষয়েই ছিল না, বাংলা ছাড়া।

অঙ্ক বিষয়টি ছিল আমার দু'চোখের বিষ। অ্যালজেবরা ও জিয়োমেট্রি। অথচ বাবাকে কে যেন বলেছিলেন 'আপনার ব্রিলিয়ান্ট ছেলে মশাই। অ্যাডিশন্যাল ম্যাথস নিতে বলুন। স্ট্যান্ড করবে।'

'একে মায় রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা।'

স্ট্যান্ড করার ব্যাপারে আমাদের ওই সময়ের গুরুজন- লঘুজনদের ইতিহাসে স্কুলের বেঞ্চে কান ধরে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য কোনওরকম দাঁড়াদাঁড়ির ঘটনা আমার অন্তত জানা ছিল না। অগ্রজেরা কেউ জানলে, দয়া করে ভুল শুধরে দেবেন।

অনেক পরিবারে সব পিতৃপুরুষেই চিরদিনই প্রথম হয়ে এসেছেন। বন্ধু-বান্ধবদের মুখে যা শুনেছি, আমাদের পরিবার ছাড়া প্রত্যেক পরিবারই সেইরকম ছিল। কিন্তু জোর গলাতেই বলব যে, আমাদের পরিবার আদৌ সেরকম মেধাবী ছিল না। এখনও ভাবি, সেকেন্ড-থার্ড কারা যে হয়ে এসেছেন যুগে যুগে! প্রত্যেক ছেলের বাবাই যদি প্রথম হয়ে থাকেন তো সেকেন্ড-থার্ডেরা গেলেন কোথায়? বড়ো তাজ্জব ব্যাপার!

বাড়ির পেছনেই ছিল বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রির বিরাট কারখানা। আর সামনে ছিল চীনাদের লিয়ং কোম্পানির ট্রাকের বডি-বিল্ডিংয়ের কারখানা। সরদারজিরা তখনও সুদূর পাঞ্জাব থেকে এসে ওই ব্যবসাতে জাঁকিয়ে বসেননি।

লন্ড্রির মালিকদের চিনেছিলাম, পরে, দক্ষিণীতে ভর্তি হবার পরে। শুভদা (গুহঠাকুরতা) এবং বউদির (মঞ্জুলা গুহঠাকুরতা) মাধ্যমে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থেকে বেরুনো ১, লাভলক প্লেসের চ্যাটার্জিদের দারুণ লনওয়ালা চমৎকার বাড়ির প্রায় সকলের সঙ্গেই ধীরে পরিচিত হয়েছিলাম। সে পরিচয় এখনও সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়নি।

ওঁদের কথাতে যথাসময়ে আসা যাবে।

ওঁরা বউদির, মানে শুভদার স্ত্রীর ফার্স্ট কাজিনস ছিলেন। আমার বিয়ের পরে জেনেছিলাম যে, ওঁরা আমার বড়ো সম্বন্ধীর স্ত্রী রুমা গুহঠাকুরতারও ফার্স্ট-কাজিনস।

বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রির কথাতে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। সে গল্প শ্রীসুধীর মৈত্র মহাশয়ের মুখে শোনা এবং পত্রোপন্যাস 'সবিনয় নিবেদন'-এ তার রকমফের উল্লেখও করেছি। কিন্তু বহু-গুণান্বিত তারাপদ রায় স্টাইলে আগে বললেও আরেকবার বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

যাঁরা আগে শুনেছেন তাঁরা নিজ গুণে মার্জনা করে নেবেন।

পাড়ার রোমিওকে, পাড়ার জুলিয়েট খুব ভালবেসে, (সোয়েটার মাত্রতেই ভালোবাসা থাকে, যেমন চালে কাঁকর) একটি সোয়েটার বুনে দিয়েছিল। এখনকার মতো মনে করা যাক রোমিওর নাম ছিল কাল্টু। সেই সোয়েটারটা বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রির মালটিপল শপের একটিতে, সম্ভবত লেক মার্কেটের উলটোদিকের দোকানটিতে কাচতে দেওয়ার পরে যখন ফেরত নিতে গেল কাল্টু মাস্তান তখন দেখা গেল যে, সোয়েটারটি হারিয়ে গেছে। তখন কাল্টু দোকানে বেজায় চোটপাট করে বলল, 'হারিয়ে গেছে' বললে তো চলবে না মহায়। ওটির দারুণ সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু আছে। ভালো করে খুঁজে দেখুন। তার ভেতর দিকে অন্যরঙা উল দিয়ে লেখা আছে 'তোমারই মিনু'।

বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রির কর্মচারী প্রথমত ধমক খেয়ে, দ্বিতীয়ত 'তোমারই মিনু'। শুনে বললেন, আপনি তিনদিন পরে ঘুরে আসুন। ভালো করে খুঁজে দেখব।

প্রসঙ্গত বলে রাখি যে, বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রি কিন্তু তখন কলকাতার আধুনিকতম লন্ড্রি ছিল এবং জনপ্রিয়ও। আজকেও কলকাতাতেও জনগণ বা গণগণের জন্যে অমন বড়ো, ভালো এবং এফিসিয়েন্ট "মালটিপল-শপ" লন্ড্রি আর একটিও নেই। শহরের মধ্যেই বিভিন্ন পাড়াতে একাধিক দোকান ছিল ওঁদের। বাটার জুতো-দোকানের মতো। তাই সোয়েটার হারিয়ে যাওয়াটা কাল্পনিক ব্যাপারও হতে

পারে। হয়তো মিনু এবং কাল্টুও কাল্পনিক। সত্য প্রায়ই রসভঙ্গ করে অতএব তা থেকে দূরেই যাওয়া যাক।

যাই হোক, তিনদিন পরে পাড়ার রোমিও কাল্টুদা যখন দোকানে আবার গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন মুখ্য কর্মী গলা নামিয়ে বললেন, দাদা, এট্টু কতা ছেল। কতা? কতা কিসের মহায়? না, না সোয়েটার আমার চাইই। টাকা দিয়ে এই লস মেক-আপ হবে না।

ছোট্ট এট্টু কতা!

বিরক্ত হয়ে কাল্টুদা বললেন, কী কতা?

কর্মচারী ভদ্রলোক গলা আরও নামিয়ে বললেন, যতগুলো ছেল দোকানে কাচতে আসা সব সোয়েটারের ভিতর দিকে ভাল করে উলটে পালটে দেকে...

তাও পেলেন না? আপনারা মহায়...

পেলাম পেলাম। কাচতে দিলেন, আর সোয়েটার কি ডানা গজিয়ে উড়ে যাবে, পেয়েচি, নিশ্চয়ই পেয়েচি।

পেলেনই তো আবার কতা কিসের?

মানে, তেরোটা সোয়েটার পেয়েচি। বিভিন্ন-রঙা। তার মধ্যে আপনারটাও নিশ্চয়ই আচে। কিন্তু....

এসব কী হেঁয়ালি করছেন?

হেঁয়ালি নয়। আর ওই তেরোটা সোয়েটারের প্রত্যেকটার পেচনেই লেখা আচে 'তোমারই মিনু'। অর্থাৎ মিনু যিনিই হোন, বোঝা যাচ্ছে তিনি এ-পাড়ারই মেয়ে। এখন এই তেরোটির মধ্যে কোন্‌টি আপনার মিনুর তা আপনিই দেখে নিয়ে যান।

ডোভার রোডের দোতলার পেছনদিকের যে ছোট্ট কামরাটিতে আমার অবস্থান ছিল সেখানে আরও থাকতেন আমার ছোটোকাকু, গোপালকাকু, ('ঋভু'-র প্রথম পর্বে ভোপাল বলা হয়েছে) রংপুর থেকে উদ্বাস্তু হয়ে-আসা বাবার মামাতো ভাই বেনুকাকু, আমার পিসতুতো দাদা, কলেজের ছাত্র বড়দাদা, এবং মাঝে মাঝে যখন রংপুর থেকে এখানে আসতেন তখন সেজোকাকুও, সুনীলকাকু।

তারও উপরে প্রাইভেট টিউশনি করে খরচ চালানো, ছোটোকাকুর এক বন্ধু, স্থানাভাব হওয়াতে এক রাত্রে হঠাৎ চলে আসেন এবং থিতু হয়ে যান। তাঁর নামটি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

বড়োমামার বড়ো ছেলে দুলুদাদাকেও (আশিস) আমার মা, অত্যন্ত দুবলা-পাতলা তাকে মোটা করবেনই, এমন জেদ করে, হাজরা লেন থেকে জোর করে ধরে এনে রেখেছিলেন বেশ কয়েক মাস। সকলেরই ডেরা ছিল সেই ঘরটা। দুলুদাদা অবশ্য গুহ পরিবারের বদনাম করে যেমন রোগা ছিল তেমন রোগা অবস্থাতেই ফিরে গেছিল মামাবাড়িতে। হাজরা লেনে। তবে, মোটা হওয়ার কোনও কারণ তার ছিল না। কারণ, হাত দিয়ে খেত না দুলুদাদা। চিরদিনই আঙুল দিয়ে খেত। তাকে খাওয়া বলে না। নাক সিঁটকে আঙুল দিয়ে খাবার নাড়চাড়া করত। আজও তাই খায় তাই এখনও মোটা হয়নি।

যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে হীরেন দত্ত মশায়ের 'তিন বন্ধু' সবে বেরিয়েছে। রেমার্ক-এর উপন্যাস 'থ্রি-কমরেডস'-এর বঙ্গানুবাদ। রেমার্ক-এর 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' বেশি বিখ্যাত হলেও 'থ্রি কমরেডস', আমার নিজের মতে অতুলনীয়। আর কী অনুবাদ! ইংরেজি এবং বাংলা দুটি ভাষাই কত ভালো জানলে যে অমন অনুবাদ সম্ভব তা দুটি ভাষার একটিও আমার ভালো করে করে শেখা হল না বলেই জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

'থ্রি কমরেডস' বইটি ছোটোকাকু পড়ে ফেলেছিলেন। রেমার্ক এবং হীরেন দত্ত মশায় দুজনেরই অশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে। পড়ে ফেলে, তিন বন্ধুর এক বন্ধু 'লেৎস্তস' কে মনে করেই দুলুদাদাকে ছোটোকাকু ডাকতেন 'লেনতুস' বলে।

বলতেন, "ঘুমিয়ে পড়ো লেনতুস, ঘুমিয়ে পড়ো। যতক্ষণ পারো ঘুমোও। ঈশ্বরের আশীর্বাদ। বিনা পয়সায় ওই একটি জিনিসই পাওয়া যায়।"

ছোটোকাকুর মধ্যে একজন পরিহাসপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তাঁর বুকের দুঃখ, নিঃসঙ্গতা, অর্থনৈতিক অসাফল্যকে তিনি আমল দেননি কক্ষনো। আশ্চর্য চাপা ধরনের চরিত্র ছিল তাঁর। চমৎকার মানুষ, অনুযোগ অভিযোগহীন; দাদাগতপ্রাণ।

ছোটোকাকু প্রচন্ড ভক্ত ছিলেন শরৎবাবুর। অন্য কারও বই আদৌ পড়লে তবেই ভক্তির আসল নকল যাচাই করতে পারতাম। আমার যতদূর ধারণা, ছোটোকাকু শরৎবাবু ছাড়া অন্য কোনও লেখকের বই বিশেষ পড়েননি। এটা শরৎচন্দ্রের কম বড়ো কৃতিত্ব নয়।

যেসব আঁতেল ও লেখকেরা শরৎবাবুকে লেখক বলেই মানেন না তাঁদের সকলকেই ছোটোকাকুর উদাহরণ দিতে পারি।

শরৎবাবুর লেখার কপিরাইট চলে যাওয়ার আগে আগে একটি মাত্র প্রকাশকই তাঁর উত্তরসুরিদের মাত্র এক কোটি টাকা রয়্যালটি দিয়েছেন বলে শুনেছি দুটি বা তিনটি কিস্তিতে।

যাঁদেব বই, মানুষে পড়লই না, তাঁরা বড়ো লেখক কী ছোটো লেখক তা নিয়ে আলোচনা করারও কোনও প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না। কমলকুমার মজুমদারদের মতো বহু-সম্মানিত অনেক লেখকের চেয়েও শরৎবাবুকে আমি একদিক দিয়ে অনেক সার্থক লেখক বলে মনে করি এবং করব।

পরে যখন আমরা ডোভার রোড ছেড়ে রাজা বসন্ত রায় রোডের 'কনীনিকাতে' চলে আসি তখন ব্যাচেলর ছোটোকাকু নিজের আলাদা ঘরের দেওয়ালে একটি মাত্র ফোটো রেখেছিলেন। সেটি, শরৎবাবুর।

কোথায় যেন একটি কোটেশন পড়েছিলাম মনে নেই 'আ ব্যচেলর ইজ আ স্যুভেনি্যর অফ আ উওম্যান, হু হ্যাড ফাউন্ড আ বেটার ওয়ান অ্যাট দ্য লাস্ট মোমেন্ট;' ওই মত মনে হয় ভ্রান্ত। পশ্চিমি দুনিয়াতে এই প্রবচন সত্যি হলেও বা হতে পারে। আমাদের দেশে একজন পুরুষ অথবা নারী যে কত বিভিন্ন কারণে অবিবাহিত থাকতে পারেন, তা হয়তো ওঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। 'এনক আর্ডেন'-এর সেই অন্তর্মুখী চরিত্রের মতো মানসিকতার মানুষ আর কি পশ্চিমী দুনিয়াতে আজকে আছেন? মনে হয় না। আমাদের দেশে অবশ্যই আছেন। আমাদের চোখে 'প্রেম' একটি অন্য ব্যাপার। এখনও। একেবারেই অন্য। এই কলুষিত যুগেও। এই প্রেমের গভীরতা অথবা মূর্খামি পশ্চিমিদের পক্ষে অনুধাবন করাও অসম্ভব।

বই পড়ার ব্যাপারে ছোটোকাকুকেও টেক্কা মারার লোক ওই ঘরেই মজুত ছিলেন। তিনি বেনুকাকু। নিতান্ত পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য কোনও একটি বইও প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অবধি জীবনে কখনওই না-পড়ার কৃতিত্বে যদি কারও নাম গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে ওঠার যোগ্য হয় তো তা, একমাত্র বেনুকাকুরই। এখন উনি বহরমপুরের বাসিন্দা। ওরিজিনালি ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে ডিপ্লোমা হোল্ডার। কিন্তু বাবা বহরমপুরে ব্রাঞ্চ অফিস করার পর থেকেই বেনুকাকু বহরমপুর অফিসের ম্যানেজার।

বাবা শখের মিলিটারি করতেন (টেরিটরিয়াল আর্মি!) সেখানে অনেক ভালো ভালো কথা শিখেছিলেন, কুচকাওয়াজ, রাইফেল-শ্যুটিং ও ফিল্ড ক্র্যাফ্টসের সঙ্গে। শুধু শেখেনইনি, জীবনে প্রয়োগও করতেন। বাবা বলতেন, "গিভন দ্য বেস্ট মেন ইট ইজ ভেরি ইজি টু বিকাম আ গুড জেনারেল। বাট আ গুড জেনারেল ইজ ওয়ান হু নোজ হাউ বেস্ট টু ইউজ দ্য মেন গিভন টু হিম, টু হিজ ওন বেস্ট অ্যাডভান্টেজ।"

কাকে দিয়ে কোন্ কাজ হবে এ-ব্যাপারে বাবার এক ধরনের সিক্সথ-সেন্স ছিল। বেনুকাকু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের ডিপ্লোমা হোল্ডার। হয়েছেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট কাম উকিল।

ক্লাস-নাইনের ছাত্রী, মালার বিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাইকে বাবা বিলেতে পাঠালেন। ডি ও এম এস, এবং এফ আর সি এস করতে জামাইকে। মালাকেও পড়াশোনা করাতে, যা ওর খুশি।

তখনকার দিনে বাঙালিদের কাছে 'বিলেত' বলতে ইংল্যান্ডই ছিল মোক্ষ। 'স্টেটসে' যেতেন অতি স্বল্প মানুষই। তৎকালীন "আমেরিকা ফেরত" দুজন মানুষকে আমি জানি। একজন হলেন জ্যোতি বসুর দাদা কিরণ বসু। আমেরিকা থেকে দাঁতের ডাক্তারি পাস করে এসে জলপাইগুড়ির রায়কত রাজের

একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজকুমারী প্রতিভা দেবীকে বিয়ে করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আর স্কচ হুইস্কির সঙ্গে আনন্দে সহবাস করে গেলেন। কোনওদিনও প্র্যাকটিস করেননি। যেমন, জ্যোতিবাবুও লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পড়ে এসে প্র্যাকটিস বলতে যা বোঝায়, তা করেননি।

দ্বিতীয়জন, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড আর লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে যে পেট্রল পাম্পটি আছে, সেই পাম্পের মালিক বোস সাহেব। তাঁকে সবাই 'ইয়াংকি বোস' বলেই ডাকতেন। ড. কিরণ বোস এবং ইয়াংকি বোস দুজনেই বিভিন্ন সময়ে আমাদের ফার্মের মক্কেল ছিলেন।

মালা চলে গেল, ফরসা বরের সঙ্গে পি অ্যান্ড ও লাইনসের শেফের রান্না খেতে খেতে লানডানে যা, এ-জন্মে আমার খাওয়া হয়নি। আর হবেও না। সেই "রহিসিই" তো অন্তর্হিত হয়েছে পৃথিবী থেকে।

এ পৃথিবীর প্রায় সব ক'টি মহাদেশেই গেছি। কিন্তু সে তো প্লেনে! পি অ্যান্ড ও-র জাহাজের চড়া হল না তো বিদেশ গিয়ে লাভ কী হল!

মালা চলে গেল আর আমি দক্ষিণ কলকাতা দাপিয়ে বেড়াতে লাগলাম! হোঁদলকুতকুত। মনের সুখে, তারই রেখে-যাওয়া লেডিজ-সাইকেলে চেপে!

মাঝে মাঝেই ইচ্ছে হয় যে, তসলিমা নাসরিনকে বলি, দেখো বোন, কোনও জিনিসই এক চোখে দেখতে হয় না। তুমি যেমন মনে করো যে, তুমি মেয়ে বলেই ছেলেবেলা থেকে বঞ্চিত হয়েছে আমিও তেমনই ছেলেবেলা থেকে, ছেলে বলেই বঞ্চিত হয়েছি। পরিবারে, সংসারে, সমাজে, দেশে, কাটাকুটি খেলা হয়ই। মেয়ে বলেই সে যে অভাগী আর ছেলেমাত্রই ভাগ্যবান এমন কথা নেই কোনও।

যে সময়ের কথা বলছি, মানে 'তিন বন্ধুর' সময়ের কথা, সেই সময়ে বাংলা সাহিত্য আমাদের মতো ম্যাদামারা 'রান অফ দ্য মিলস' সাহিত্যিকদের কবলিত ছিল না। সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের 'দেশে বিদেশে' বেরিয়েছে, যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত', কিছুদিন বাদে রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা'। এক একটি বই বেরিয়েছে আর সমস্ত বাংলাতে হইচই পড়ে গেছে। কী বিপুল উত্তেজনা, উন্মাদনা! ঘরে ঘরে! আরও কিছুদিন আগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী'। আর কিছুদিন পরে সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' ছবি করে বিশ্বজয় করলেন।

পরম্পরা বোধহয় ঠিক রইল না। আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। তাছাড়া স্মৃতির ব্যাপারে আমাব কোনওদিনই দুর্বলতা ছিল না। আমার মনে হয় যে, সৃষ্টিশীল মানুষদের স্মৃতিশক্তি প্রবল হলে তাঁদের ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়া অন্য কোনওরকম সৃজনধর্মী লেখা বা কাজ করা মুশকিল হয়। আমার এই 'মনে হওয়া' ভ্রান্তও হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়।

তারও বেশ কিছুদিন আগে থেকে সিগনেট প্রেস-এর বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদের জগতে সত্যজিৎ রায় সর্বপ্রথম সুরুচির পত্তন করেছেন।

সিগনেটের একটি দোকান ছিল তীর্থপতি স্কুলের একতলায়। সুন্দর কাচের শো কেস। তাতেও নতুনত্ব ছিল। কবি বিষ্ণু দের 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', আমার মেজোমামা সুবিমল বসুর লেখা 'রূপচিন্তা' এবং আরও নানা বইয়ের প্রচ্ছদ দেখতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কুল ছুটির পরে।

সিগনেটের 'টুকরো কথা' কবে বেরুবে সেজন্যে অপেক্ষা করে থাকতাম। সেই "টুকরো-কথা" আনন্দবাজারি টুকরো-কথার মতো ফাঁকা-পান্ডিত্যে ক্লিষ্ট ছিল না। পড়েছিলাম—'সুখ নেইকো মনে/নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে।'

কার যে লেখা, মনে করতে পারছি না। পারছি না, প্রায় তিরিশ বছর চেষ্টা করেও। আমার প্রথম উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'হলুদ বসন্ত'র প্রথমে এই পংক্তি ক'টি আছে।

সেই সময়ের কলকাতা সত্যিই তিলোত্তমা ছিল। কল্লোলিনী তো বটেই! কলকাতার এখন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। এই কলকাতার কোনও ভবিষ্যৎ আছে কি না আমি জানি না। অতীতে ফেরা তো অসম্ভবই!

বাড়িতে একমাত্র সেজোকাকু, যখন তিনি কলকাতাতে থাকতেন, নানা ভালো বইয়ের খবর দিতেন। ইংরেজি এবং বাংলা। কিনে এনেও দিতেন, যদিও তাঁর নিজস্ব রোজগার, রংপুরের

কৃষি-জমির আয়ের অংশটুকু ছাড়া আর কিছু ছিল বলে আমার মনে হয় না। আমাদের পরিবারে পাঠ্যবই ছাড়া অন্য বই কেনা বা পড়া গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য হত। ফলে, আমার সমবয়সীরা যেসব সাহিত্য পত্রিকা পড়তে পেয়েছেন আমি তা পাইনি। 'ভারতবর্ষ' আসত মনে আছে। তাও অনিয়মিত।

রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়িতে ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় একবার "মায়ের দয়াতে" 'চিকেন পক্স' হওয়াতে বেশ কিছুদিন গৃহবন্দি ছিলাম এবং কেন জানি না, বসবার ঘরে একটি বইয়ের আলমারির আগমন ঘটে ছিল। কোথায় ছিল? কে আনিল? 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু' র মতো রাতারাতি তার আগমন আমাকে চমকে দিয়েছিল। সেটা, বসন্তর-রোগীর সঙ্গে অন্যাদের মধ্যে ব্যবধান রচনার জন্যে কারও ব্রিলিয়ান্ট ভাবনা-প্রসূত কি না তা বলতে পারব না। কী জন্যে আনা হয়েছিল এবং কে এনেছিলেন তাও জানি না। কার কাছ থেকে আনা হয়েছিল তাও মনে নেই। তবে তার মধ্যে যেসব বই ছিল, কনভ্যালেসেন্সের সময়ে তার সব ক'টিই পড়ে ফেলেছিলাম। উত্তরবঙ্গীয় ভাষায় যাকে বলে 'পাইড়্যা ফ্যালাই ছিলাম' তেমনই করে আর কী!

সেই আলমারিতে ছিল না এমন বইয়ের কথা ভাবা যায় না। আন অ্যাব্রিজড লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার-এর পাশে অ্যাব্রিজড 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'উপনিষদ', কিরীটি রায়ের অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ের পাশে সুকুমার রায়ের জিনিয়াস পাগল 'পাগলা দাশু' অথবা 'আবোল তাবোল'।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পরই 'বাবার দয়াতে' বাবার অফিসে সবুজ পেনসিলে কাটিং-পেস্টিং চেক করার চাকরি পাই। মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনে। তখনকার দিনের, মানে—বাহান্ন সালের পঞ্চাশ টাকার ক্রয়ক্ষমতা কম ছিল না। তখন থেকে নিয়মিত 'দেশ' রাখা শুরু করি। আমার রোজগারের প্রায় সবটুকুই বইপত্তর, কলম, ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম কিনেই খরচ করতাম। নিজের উপার্জন হওয়ার পর থেকে, সতেরো বছর বয়সের পর থেকে, নিজের জামাকাপড় জুতো এবং সব শখের খরচ নিজেই জুগিয়েছি।

উনিশশো পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে বাবার ছ'নম্বর গাড়ি যেদিন এল সেদিন আমার ডাইরিতে লিখেছিলাম, 'আজ তোমার বাবার ছ'নম্বর গাড়ি এল। তোমার বকে যাবার সম্ভাবনা ক্রমশই প্রবলতর হচ্ছে। নিজের পরিচয়ে পরিচিত হবার চেষ্টা কোরো জীবনে। বাবার পরিচয়ে নয়।'

এই শিক্ষা, বাবার কাছ থেকেই পাওয়া অথচ পরিণত জীবনে আমার এই স্বনির্ভরতার জেদের কারণে বাবার সঙ্গেই মনোমালিন্য হয়েছিল। বাবা ভুল বুঝেছিলেন।

তখন বুঝেছিলাম যে জীবনে স্ট্যাটিক ট্রুথ বলে কিছু নেই। এই মুহূর্তে পাঠক, আপনি বা আমি বা যে-কোনও মানুষই যা কিছুকেই 'ধ্রুব সত্য' বলে মানছি, ক'দিন পরে সেই আমরাই সেই সত্যকে মডিফাই করে নিতে বাধ্য হই। তেমনই, মানুষের জীবনে তার নিজস্ব সত্য ছাড়াও, তার চাওয়া-পাওয়া, ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞাও হয়তো বদলে যায়।

বদলে যে যায়, তাতে দোষও নেই, কারণ বদলের আরেক নামই জীবন।

সত্য, ও ন্যায়-অন্যায়ের বাইরের চেহারা বদলালে ক্ষতি নেই, তার অন্তরের চেহারাটা বদলালেই ক্ষতি!

মানুষ নিজেই যে বদলাচ্ছে প্রতি মুহূর্ত। তার পারপার্শ্বিক বদলাচ্ছে, তার বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ বদলে যাচ্ছে অনুক্ষণ। এই ক্রমান্বয়ে ঘূর্ণায়মান আবর্তনের মধ্যে 'ধ্রুব সত্য' বলে কোনও কিছুকেই চিরদিনের জন্যে আঁকড়ে থাকা বোধহয় সম্ভব নয়। হয়তো উচিতও নয়। তবে এও ঠিক যে, এরই মধ্যে কিছু কিছু বেসিক ট্রুথ বা স্থায়ী সত্য বেঁচে থাকে, বেঁচে এসেছে আবহমানকাল ধরে, নানা ঝড়ঝঞ্ঝা, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে।

সেই সব সত্যের কথা স্বতন্ত্র।

সম্ভবত তখন স্কুল ছুটি ছিল, অথবা পরীক্ষার পড়া পড়া খেলা করেছিলাম।

বাড়িতে শুধুই মা, আমি আর ছোটোকাকু ছিলাম। বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রিতে আগুন লাগল। আগুনের অভিজ্ঞতা আগে কখনও ছিল না। ঈশ্বর করুন, ভবিষ্যতেও যেন কখনও না হয়।

বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রির এলাকা ছিল কয়েক একর জুড়ে। বয়লার, মোটা মোটা পাইপ। তা দিয়ে ফুটন্ত জল বয়ে নানা আকারের বড়ো বড়ো চৌবাচ্চাতে গিয়ে পড়ত (আবার চৌবাচ্চা! আবার জল! মুক্তি নেই।) নানারকম ক্ষার জাতীয় গন্ধ বেরুত। উঁচু চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুত। বহু লোক কাজ করত। সব সময়ই হইহই-রইরই ব্যপার। বড়ো বড়ো শেড ছিল টিনের এবং খুব উঁচু উঁচু। এবং রেল স্টেশনে যেমন এক ধরনের গন্ধ পাওয়া যায় মিষ্টি মিষ্টি, বাষ্পের, তেমন গন্ধে ভরে থাকত পুরো কারখানাটি।

আগুনের সে কী আস্ফালন! বৈশ্বানরের লীলাখেলা সেদিন দিনমানেই দেখেছিলাম। রাতের বেলা ঘটলে তার রূপ যে ঠিক কতখানি প্রলয়ংকরী তা বোঝা যেত আরও ভয়ের সঙ্গে।

কারখানার দেওয়াল যদিও আমাদের বাড়ির লাগোয়াই ছিল কিন্তু কারখানার শেডগুলি ছিল অনেকই দূরে। কিন্তু তবুও আমার চোখের সামনেই হাজার হাজার শাড়ি-ধুতি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শেডের তলাতে মেশিনপত্র, যা কিছু ছিল, বিরাট বিরাট ওয়াশিং মেশিন, তাও পুড়ে গেল। শাড়ি ধুতি ছাড়া, দামি শাল, জামদানি, আলোয়ান, গরম জামা, নানারকম। তার সঙ্গে 'তোমারই মিনু' পুড়ে গেল কত হাজার কে জানে! পায়জামার কথা পরে বলছি।

পুড়ে যাওয়া জিনিসের মিশ্র গন্ধে নাক ভরে গেল।

একটা নিমগাছ ছিল এক কোনাতে। তরুণী নিম। বয়স হয়তো আমারই মতো হয়েছিল তার। সেও পুড়ে ঝলসে গেল। মানুষ হলে 'থার্ড ডিগ্রি বার্ন' হয়েছে বলে দামি নার্সিংহোমে নিয়ে যেত কেউ কিন্তু বেচারি গাছ বলে তার জন্যে একমাত্র আমি আর ক'টি পাতিকাক আর একটি কাঠবিড়ালি ছাড়া দুঃখ করার কেউ রইল না। পদ্ম যে পঙ্কে জন্মায় তা সকলেরই জানা কিন্তু কাঠবিড়ালির মতো নরম কোমল রোমশ লাজুক প্রাণী যে একটি সিঁ-সাঁ-হুড়ুম-দুড়ুম শব্দ-করা স্টিম লন্ড্রির মধ্যে বাস করবে, তা অভাবনীয় ছিল।

কলকাতাতে পায়জামার তখন তেমন চল ছিল না। কলকাতার গণগণ 'যাতায়াতের সুবিধের' 'খঞ্জ ওজর' (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত উবাচ) দিয়ে তখনও ঘেন্নার সঙ্গে ধুতি-বর্জন করেননি। তখন পায়জামা পরতেন মুসলমানেরা আর কমিউনিস্টরা। অন্য প্রদেশীয়রাও পরত। আর পরতেন বড়োলোকেরা। বৃদ্ধদের মধ্যেও কেউ কেউ। তাঁরা কোনওকালেই জনগণের মধ্যে পড়তেন না, তাই তাদের সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

বিপদটা ঘটল, যখন হাওয়াটা হঠাৎ ঘুরল।

পাঠক! যাঁরাই নদী বা হ্রদে বর্ষাকালে বহুবার যাতায়াত করেছেন তাঁরা হাওয়ার স্থিতিকারী ও প্রলয়ংকরী, সৃষ্টিকারী ও বিনাশকারী ভূমিকার কথা ভালো করেই জানেন। যেমনই ঘুরলো হাওয়া, আর আগুন ছুটে এল হাওয়ার তোড়ে আমাদের ছোট্ট বাড়ির দিকে। এতক্ষণ, জানলার সামনে বসে, অ্যাট

দি এক্সপেন্স অফ বুড়োদা, গানুদা, অ্যান্ড বগিদা, (বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রির মালিকেরা) কোম্পানির অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করছিলাম পর্যবেক্ষকদের মতো। ইতিমধ্যে, হঠাৎই হাওয়া এসে আগুনের গালে মারল এক বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়।

আমাদের বাড়ির কাজের লোকেদের ঘর ছিল ছাদে। রান্নাঘরের লাগোয়া একটি শেডের নীচেই খেতাম। চার-পাঁচজন কাজের লোক তাদের দ্বিপ্রাহরিক ঘুম ও আড্ডা থামিয়ে ছাদের পাঁচিলের ধার ঘেঁষে বিনা পয়সাতে মজা দেখছিল। তাদের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই বাঙালি। বাঙালি মাত্রই, পরের সর্বনাশ দেখে যে গভীর, নিখরচার রোমহর্ষক আনন্দ বোধ করে থাকেন, তেমন পৃথিবীতে বোধহয় আর কেউই করেন না।

হাওয়া ঘুরতেই, তারাও সম্বিত ফিরে পেয়ে পাম্প খুলে দিয়ে ছাদের হাতির শুঁড়ের মতো মোটা নলের উৎসারিত জল বালতি বালতি নিয়ে বেঙ্গল স্টিল লন্ড্রির চত্বরে প্রদক্ষিণরত হঠাৎ-ক্রুদ্ধ অগ্নিদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে যে সুতীব্র তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতেই হইহই করে ধুতি, কাপড়, শাল, জামদানি, 'তোমারই মিনু' পোড়া, মিহি ও মোটা সাদা ও কালো উড়ন্ত ছাই সমেত যে নিক্ষিপ্ত বারিবিন্দুর সবটুকুই সুন্দরীর করকমল-উৎসারিত সুগন্ধি ফুলের অঞ্জলি যেমন প্রতিমার পাদস্পর্শ না করে মধ্যপথে, তাঁর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে-থাকা বিরল-কেশ পুরোহিতের কৃষ্ণবর্ণ টাকে গিয়ে নিঃশব্দে আঘাত করে গন্তব্যে পৌঁছোতে অপারগ হয়, বারেবার তেমনই হচ্ছিল। তবে, তফাত এইটুকুই যে, গন্তব্যচ্যুত পুষ্পাঞ্জলি পতিত হইলে কোমল শব্দ হয়, এখানে ক্ষিপ্ত হুতাশন তাঁর আস্ফালনময় বিভিন্ন স্বরগ্রামের বিভিন্ন তীব্রতার সঙ্গে উচ্চারিত হুঁস-হাস, ফোঁস-ফোঁস শব্দে সমবেত ভদ্র ও অভদ্রমণ্ডলীকে যুগপৎ বিস্মিত ও ভীত করিয়া তুলিতেছিল। ভীত ও উত্তেজিত দুর্বল ভৃত্যসকলের দুর্বল শরীরের পুঞ্জীভূত সমুদয় বল, এবং বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার নানা মোক্ষম অশ্লীল শব্দ ফুৎকারের সহিত বাষ্পে পরিণত হইয়া অগণ্য 'তোমারই মিনু'র শোকে বিলীন হইতেছিল।

হঠাৎ শুনি, ঘরের মধ্যে চিটপিটানি শব্দ। কালীপুজোর রাতে সাপবাজিতে আগুন ধরালে বা চটপটিতে, যেমন শব্দ হয়, তেমন শব্দ।

পোড়া গন্ধ তো ছিলই!

কী ব্যাপার? ভালো করে ইনভেস্টিগেট করার আগেই ছোটোকাকু-সার্জেন্ট মেজরের অর্ডারের মতো সংক্ষিপ্ত কিন্তু সেন্ট বার্নার্ড শেফার্ড ডগের ডাকের মতো উদ্দীপ্ত স্বরে বললেন, জল। দেখছিস কী হাঁদা? জল আন। জানালার কাঠে আগুন ধরে যাচ্ছে।

ছোটোকাকুর হাঁদা সম্বোধনে রাগ করিনি, কারণ দিন রাত তস্য অগ্রজ 'হোঁদলকুতকুত' বলেই তো ডাকতেন। কিন্তু আগুন তো ধারেকাছেও নেই।

ভালো করে চোখ চেয়ে দেখলাম যে, আগুন তো অনেকই দূরে জ্বলছে তাতে আমাদের বাড়ির দোতলার জানালাতে এবং বিছানা-খাট-পালঙ্কেও আগুন লাগতে পারে কীভাবে তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

তখনও তো বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রির মালিক বগিদাদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না এবং তাঁদের কারও সঙ্গে কোনও মতানৈক্যও ছিল না, আজও নেই; তাই কোন্ অভিশাপে আমাদের বাড়িও দগ্ধ হতে চলেছে তার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া ন্যায্য কারণেই সেদিন সম্ভব ছিল না।

দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে বালতি করে জল এনে প্রথমে জানালা, পরে বিছানা দেওয়াল—সব ভেজাতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ঘরের দেওয়ালে হাত ছোঁওয়ানো যাচ্ছিল না এমনই গরম হয়ে উঠল তা।

আবারও বুঝি পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে-আসা পরিবারকে নতুন করে উদ্বাস্তু হতে হয়। আমি যদিও জন্মাবধি কলকাতাতেই, কিন্তু একটি স্পর্শকাতর মন ছিল বলেই অগণিত আত্মীয়স্বজনের অপমান, অসম্মান ও দুরবস্থা, তাঁদের বহু যুগের দেশ, 'আমাগো দ্যাশ' এবং অধিকাংশেরই যথাসর্বস্ব ছেড়ে হঠাৎ চলে আসার মানসিক ধাক্কার অবর্ণনীয়তায় তখনও বিমূঢ় ছিলাম।

তাই আমার বড়োই ভয় করতে লাগল।

সবে একটা সচিত্র বই লেখা শুরু করেছিলাম। 'চাঁপগাঁওয়ের মানুষখেকো'। শিকারে, বাবার সঙ্গে কোডারমাতে প্রথমবার যাওয়ার পরেই সাঁওতাল পরগনার নিসর্গতে এতখানিই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে একটা এক্সারসাইজ বুকের মধ্যে তেলরঙা ছবি এঁকে (উলটোদিক, স্বাভাবিক কারণে, তেলের ছাপে ভরা ছিল) ইলাস্ট্রেট করে শিকার কাহিনী শুরু করেছিলাম। নিজের সিউডোনেম দিয়েছিলাম, 'ঝোড়োকাক'। 'যাযাবর' ও 'রঞ্জনের' টাটকা প্রভাব কাজ করেছিল ওই ছদ্মনামের পেছনে। এবং বারবার পড়া জিম করবেটের গরম শ্বাস, ঘনঘন ঘাড়ের কাছে পড়ছিল।

'বই'-এর প্রথমেই ভূমিকা লেখা হয়েছিল এবং অবশ্যই লেখকের একটি 'ফোটোও' ছিল। পিয়ানোর সামনের টুলে বসে, মুখে ব্রণ-ওঠা, চোয়াড়ে-আমি। মুখ একপাশে ঘুরিয়ে তোলা ছবি। কে তুলেছিল, মনে নেই।

তখন এক আঙুলে হারমনিয়ামের মতো চাবি টিপে টিপে পিয়ানোতে একটিমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতই বাজিয়ে গাইতে পারতাম 'হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে/হেমন্তিকা করল গোপন/আঁচল ঘিরে, ঘিরে, ঘিরে'।

মনে হল, বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রির আগুনে আমার জীবনের প্রথম অসমাপ্ত সাহিত্য কর্মটিও অন্য সব কিছুর সঙ্গেই পুড়ে যাবে। বড়ো সাধের ওয়াটারম্যান কলমটি? ছবি আঁকার রঙ-তুলি, সব?

ঠিক এমন সময়ে মা এসে ঘরে ঢুকলেন।

মা, মাঝে মাঝেই এ ঘরে এসে দেখে যাচ্ছিলেন কী ঘটছে না ঘটছে।

এবার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফিরে এলেন।

পরে জেনেছিলাম, বাবাকে ফোনে চেষ্টা করছিলেন অনেকক্ষণ ধরে। বাবা অফিসে ছিলেন না।

মা এসে ডাকলেন আমাকে আর ছোটোকাকুকে। তারপর ও ঘরের লাগোয়া যে ছোটো বসবার ঘরটি ছিল, সে ঘরে রাখা একটি লোহার সিন্দুক খুললেন।

হাজার টাকার নোট আগে দেখিনি। তখনকার দিনেব একশো টাকার নোটই মস্ত বড়ো বড়ো ছিল এবং মোটা কাগজের। মা গোছা-গোছা নোট, কম্পমান, উত্তেজিত আঙুলে করে বের করে হাজার টাকার ও একশো টাকার; আমাকে ও ছোটোকাকুকে রাখতে দিলেন। কোনও থলে টলে থাকলেও হত। আমার হাফ প্যান্টের দু'পকেটে এবং শার্টের বুক পকেটে যতগুলি আঁটে তা নিয়ে সব পকেট আঁটসাঁট করে ফেললাম। সেই প্রথম জানলাম 'পকেট গরম' কাকে বলে।

ছোটোকাকু কোথা থেকে একটা আমেরিকান আর্মি-ডিসপোজালের হ্যাভারস্যাক জোগাড় করে নিয়ে এসে তাতে গুচ্ছের নোট ভরল। তাছাড়া, নিজের হাফহাতা শার্টের সব পকেটেও। যখন এই 'ফ্রন্ট' সামলানো গেল ততক্ষণে অগ্নিদেবী আমাদের ও ফায়ার ব্রিগেডের যুগ্ম চেষ্টায় নয়, সম্পূর্ণ নিজেরই খেয়ালে; হাওয়ার হাতে হাত রেখে মুখ ঘোরালেন অন্যদিকে।

ভাবখানা যেন, হাওয়ার সঙ্গে ইলোপ করবেন।

ফায়ার ব্রিগেড অবশ্য, বলতে গেলে, নিষ্ফল চেষ্টাই করেছিল। জলের প্রেসার ছিল না।

চল্লিশের দশকের শেষের দিকের কথা। তার মানে পঞ্চাশ বছর আগের কথা। তখনও কলকাতার পথপাশে ওইরকম এমার্জেন্সির সময়ে ব্যবহার্য কলে সাধারণত জলের প্রেসার থাকত। সেদিন গঙ্গায় ভাটা ছিল তখন। এখন তো কোনো সময়েই থাকে না। এরপরেও যদি কেউ আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলেন যে আমারা ফ্যাটালিস্ট, ভাগ্যে বিশ্বাসী; তবে তার বদলে কী আর বলা যায়! ভাগ্যের জোরেই তো বেঁচেছিলাম এবং আমরা কলকাতাবাসীরা বেঁচে আছি আজও।

আসলে, আশ্চর্য হবার ক্ষমতাই আমাদের লোপ পেয়ে গেছে, সর্বংসহ জীব হয়ে গেছি আমরা। আমাদের দেখে অন্যে আশ্চর্য হয় অথচ আমরা মনুষ্যেতর এই জীবন নিয়েও কলকাতাকে 'তিলোত্তমা' বলে গর্ব করি। এমন মুর্খের স্বর্গে আর কোনো প্রজাতি কোনওদিন বাস করেছে কি করেনি তা নিয়ে গবেষণার সময় এসেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মরুযুদ্ধের দুই বিখ্যাত বিশারদ, জেনারেল মন্টোগোমারি অথবা জেনারেল রোমেলও হয়তো এই নতুন ফ্রন্টের সামনে পড়লে আঁকুপাঁকু করতেন। আগুনের শিখাদের মতো দ্রুতগতি, অস্থিরমতি সৈন্যদল আর বোধহয় হয় না!

দু'ফ্রন্টেই অবস্থা যখন সামলানো গেল তখন সমস্যা দেখা দিল তৃতীয় ফ্রন্টে। বাইরে থেকে অফিসে ফিরেই বাবা অফিসে মায়ের ঘন ঘন টেলিফোন এবং বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রিতে আগুন লাগার কথা জেনে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরলেন। বাবা যখন আমাদের ঘরে ঢুকলেন, ছোট্ট বসার ঘর পেরিয়ে, তখন দেখলেন দু'ঘরেই মেঝেতে একশ টাকার নোট জলের মধ্যে মরা প্রজাপতির মতো নেতিয়ে পড়ে আছে। পাঁচ-পয়সা দামি এই আমার স্ফীত পকেট থেকেও উপচে পড়ছে একশো টাকার নোট।

বাবার মুখের অবস্থা শোচনীয় হল।

মায়ের মুখের অবস্থা তো কহতব্য নয়।

অত টাকা বাবা ক্যাশে রেখেছেন কেন?

পরে, ঠাকুমার কাছে জেনেছিলাম, আমার ঠাকুরদা, যিনি আমার জন্মের আগেই গত হয়েছিলেন, বারংবার ব্যাংক ফেল পড়ায় তাঁর সব সঞ্চয় হারিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়াতে নাকি ব্যাংকে আদৌ বিশ্বাস করতেন না। আমরাও কেউই করি না, যারা ব্যাংকের কেরানি এবং হর্ষদ মেহতাদের জানি। কিন্তু নিরুপায় হয়েই ব্যাংকে টাকা রাখতে হয়!

পরে, বড়ো হয়ে আরও বুঝেছিলাম যে, পেশা আরম্ভ করার দিন থেকে সপ্তাহে ছ'দিন বাবা আঠারো ঘন্টা পরিশ্রম করতেন। আর রবিবারে আট ঘন্টা। অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ছাড়া জীবনে কিছুই অর্জনের মতো অর্জিত হয় না। বাবার অগণ্য বন্ধুও বাবার পেশার সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। তখনকার দিনে তা অসম্ভবও ছিল না। বাবা প্রচণ্ড জনপ্রিয়ও ছিলেন। ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের তিনি ফাউন্ডার সেক্রেটারিও ছিলেন।

বাবার আর কোনও গুণ পাইনি হয়তো কিন্তু খাটনির গুণটি পুরোমাত্রায় পেয়েছি। এবং জেদ। ভালো জেদ। সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতাও। এই আমার পৈতৃক সম্পত্তি। পরম পাওয়া।

সব টাকা এক এক করে মাকে ফেরত দিলাম আমি আর ছোটোকাকু। শেষ নোটটি পর্যন্ত।

অর্থ যে অত্যন্তই বাজে জিনিস তা সেদিনই প্রথম বুঝি। নিজের বাবার উপার্জিত টাকাও নিঃশেষে মাকে ফেরত দিতে গিয়েও খুব ইচ্ছে করেছিল যে, একটা কি দুটি বড়ো নোট রেখে দিই। ছাত্র আমি, নিজস্ব রোজগার বলতে তো কিছুমাত্র ছিল না। হাতখরচ বা পকেট মানিও কিছু পেতাম না। তবুও পরার্জিত, একটি টাকাও যে রেখে দিইনি সেদিন সেকথা ভেবে আজও শ্লাঘা বোধ করি।

প্রত্যেক গুরুতর অপরাধেরই জন্ম হয় সামান্য ও লঘু একটি ঘটনা দিয়েই।

রামকৃষ্ণদেব না হয়েও বলব যে টাকাগুলো যতক্ষণ পকেটে ছিল, এক ধরনের গা-জ্বালা করছিল আমার। সেদিন মনে হয়েছিল, টাকা বোধহয় রাখার জিনিসও নয়। টাকা হাতে যদি এসেও পড়ে তবে তার জিম্মাদারি করা উচিত পোস্টমাস্টারেরই মতো। টাকা নিজের পকেটে আসামাত্র যা নিতান্ত না রাখলেই নয়, তা রেখে, যোগ্য জনে, যোগ্য কাজে, বিলিয়ে দেওয়া উচিত। টাকা মানুষকে, বিশেষ করে যথার্থ শিক্ষা যেসব মানুষের না থাকে; তাদের যেভাবে নষ্ট করে সবদিক দিয়ে, ভ্রষ্ট করে সেই মানুষের উত্তরাধিকারীদের; তার কোনও তুলনা নেই।

এই সত্য বহু-পরীক্ষিত।

আজ থেকে মাস তিনেক আগে বুকে ব্যথা বোধ করাতে ড. সুনীল সেনের কাছে গেছিলাম উডবার্ন পার্কে। খুব যত্ন করে দেখলেন। দেখে টেখে, ই সি জি করে একটিমাত্র ওষুধ দিনে তিনবার খেতে বলে, সময়ে খাওয়া দাওয়া, ভোরে উঠে খালি পেটে হাঁটা এবং ওজন কমানোর নির্দেশ দিলেন।

বললেন, এটা ওয়ার্নিং। মেটিওরলজিকাল ডিপার্টমেন্ট পতাকা উড়িয়ে সাবধান করছে। না মানলে, সাইক্লোনের মধ্যে পড়ে তলিয়ে যাবেন।

যখন ফিস দিতে গেলাম, বিনয়ের সঙ্গে বললেন, গুহ সাহেব, জীবনে টাকা অনেক রোজগার করেছি। আর টাকার দরকার নেই আমার। তাছাড়া, প্রয়োজনের তুলনাতে বেশি টাকা মানুষের 'প্রোজেনি' নষ্ট করে দেয়।

অবাক হয়ে, শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে রইলাম পৃথিবীর বহু জায়গার ডিগ্রিধারী ওই পণ্ডিত এবং মহৎ মানুষ, ডাক্তারের মুখে। কলকাতা শহরে আজও এমন ডাক্তার আছেন? নিজে চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না যেন।

শ্রদ্ধা করা যায়, এমন ডাক্তারের সংখ্যা কলকাতা শহরে ক্রমশই কমে আসছে যে!

গাড়িতে উঠে, প্রেসক্রিপশনটা দেখলাম। দেখলাম, ওপরে লিখেছেন, মা কালী। ওঁর স্বল্পালোকিত চেম্বারেও মা কালীর ছবি দেখেছিলাম, দেওয়ালে ঝোলানো।

আবার ফিরে যাই নিজ নিকেতনে।

যেদিন আগুন লাগল তার পরদিন এগারোটা নাগাদ হঠাৎ সামুকাকু এলেন। মা, চানঘরে ছিলেন। বাড়িতে আমি আর কাজের লোকজন ছাড়া আর কেউই ছিল না। সেদিন কোনো কারণে আমার স্কুল ছুটি ছিল।

আমি সামুকাকুকে বললাম, এমন অসময়ে?

সামুকাকু হাসি-হাসি মুখে, নিচু স্বরে কথা বলতেন।

বললেন, বউদি আছেন কি? একটু দরকার ছিল।

মা তো চানঘরে।

ওঃ।

আপনি একটু বসুন। চা খাবেন?

না। মানে, দেরি হবে কি বউদির?

এখুনি ঢুকেছেন তো! জরুরি কোনও দরকার? মাকে বলব কি? দরজাতে ধাক্কা দিয়ে?

না, না, তেমন জরুরি কিছু নয়।

তবে একটু বসুন। আমি একটা ফোন করেই আসছি।

বলেই, বাবার ঘরে গেলাম। ফোন থাকত বাবার ঘরে। ফিরে এসে দেখি, সামুকাকু চলে গেছেন। কাজের লোকেরাও কিছু বলতে পারল না। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম।

নাঃ। যেন, অদৃশ্যই হয়ে গেছেন।

মা চানঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে খুব বকলেন। বললেন, বললি না কেন, আমি তো আর চানঘরে গান গাইছিলাম না। নিশ্চয়ই কোনও জরুরি দরকার ছিল। নইলে এমন অসময়ে কেউ আসেন? সামু ঠাকুরপো তো কোনওদিনও এই সময়ে আসেননি। তোর আজ গান শেখার দিনও তো নয়!

না, না, আজ কেন হবে!

আমি বললাম। একটু টেলিফোন করেতে গেছিলাম বাবার ঘরে, ফিরেই দেখি, নেই।

পরের সপ্তাহে সামুকাকু যখন গান শেখাতে এলেন তখন বললাম যে, খুব বকুনি খেয়েছি মায়ের কাছে। আমি ফেরা অবধি আপনি অপেক্ষা করলেন না কেন?

ও কিছু না। ঠিক আছে।

উনি বললেন।

কিছু না, তো এসেছিলেন কেন? নিশ্চয়ই দরকার কিছু ছিল।

ইতিমধ্যে মা এসে উপস্থিত হলেন।

বললেন, সেদিন না বলে চলে গেলেন কেন? আর খোকনটাও এত বোকা, দরজা ধাক্কালেই বা ডাকলেই আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতাম। নইলে, দরকারটা কী তাও তো ওকেই বলতে পারতেন।

সামুকাকু মুখ নিচু করে রইলেন।

আজকেও, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরে তাঁর সেই দ্বিধাগ্রস্ত মলিন অথচ মিষ্টি হাসিটা স্পষ্ট যেন দেখতে পাই।

সামুকাকু, মায়ের বারবারের অনুরোধে বললেন, না, ও এমন হঠাৎ করে চলে গেল যে কী বলব! দাহ যে করি, বাড়িতে তেমন টাকাও ছিল না।

ও কে?

মা স্তম্ভিত হয়ে বললেন।

আমার স্ত্রী। আপনার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল ওর... আর হল না।

মা আর্তনাদ করে বললেন, এই দরকারটা জরুরি হল না?

এমন কী আর জরুরি যে, চেঁচিয়ে বলতে হবে চানঘরের দরজার আড়াল থেকে? মা স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়লেন।

বললেন, কী হয়েছিল?

সেই তো কথা। কিছু হলে তো কিছু একটা করার চেষ্টা করতাম। সান্ত্বনার কিছুমাত্রও থাকত। আসলে, ওই রংপুর ছেড়ে আসা.......

বলেই, কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, আপনি তো গিরিডিতে মানুষ বউদি। ঋভুও তো জন্মেছে কলকাতাতেই। আমরা তো ছোটোখাটো জমিদার ছিলাম রংপুরে। দাদা সবই জানেন। ভিটেমাটি ছেড়ে, নিজের রান্নাঘর, ঠাকুরঘর, নিজের অধিকার, কর্তৃত্ব, দাস-দাসী সব ছেড়ে মাথা নিচু করে অপমানের অসম্মানের মধ্যে দিয়ে যেদিন সত্যি সত্যিই চলে আসতে হলই, আসলে সেদিনই ওর 'হয়্যা' গেছিল। ডাক্তারেরা যাকে বলেন 'ক্লিনিকালি ডেড'। বলেই, কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, অথচ কলকাতার দু'কামরার অন্ধকার ভাড়াবাড়িতে রান্না করত, খেতে দিত, কড়া নাড়লে দরজা খুলে দিত, মাথা নিচু করে। যেন এই দুরবস্থার সব দোষ তারই একার। স্ত্রীর যা কিছু কর্তব্য স্বামীর প্রতি, সবই করত। কিন্তু হাসত না। ও ওর মুখের হাসিটি চিরদিনের মতো রেখেই এসেছিল রংপুরের 'ধাপে'। যেদিন চলে গেলে, কী বলব বউদি; আশ্চর্য! সেই হাসিটিই নিয়ে গেল মুখে মাখিয়ে। কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছিল এত দিন! ভেবেই পাই না, কী করে এমন মিরাকল ঘটালো যাক, সব চুকে-বুকে গেল। এবার হালকা হয়ে গেলাম। একেবারেই হালকা।

মৃত্যুর অনেক বর্ণনা পড়েছি কাব্যে-সাহিত্যে, মৃত্যু অভিনীত হতে দেখেছি নাটকে, সিনেমাতে কিন্তু সামুকাকু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কথা যেমন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বলেছিলেন তা আমার কিশোর মনে চিরদিনের জন্যে গেঁথে গেছিল।

পাঠক! ভেবেছিলাম, সত্যি কথাটা আপনাদের বলব না। কোনও গল্পে বা উপন্যাসে এই মৃত্যুকে খুব নাটকীয়তার সঙ্গে উপস্থাপিত করব। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, তা করা উচিত নয়। যে মৃত্যু, সামুকাকুর কাছে বিশেষ ব্যক্তিগত; তাকে চুরি করে, নাম কেনার কোনও নীচ বাহাদুরির প্রবৃত্তি থাকাটা আমার উচিত নয়।

নিজের চরম শোক, বিপদের কথা এমন কুণ্ঠার সঙ্গে, দ্বিধাগ্রস্ত ক্যাজুয়ালনেসের সঙ্গে বলতে, আমি এ পর্যন্ত কাউকেই দেখিনি। পায়ে কাঁটা ফুটলেও কত আতুকি মানুষ পাড়া মাথায় করেন। আনন্দে ও শোকে বিচলিত না-হওয়া, চিৎকার চেঁচামেচি না-করাটা শিক্ষার একটা অঙ্গ। পরবর্তী জীবনে অনেক মানুষকেই কাছ থেকে দেখে এটা লক্ষ্য করেছি। এমন করাটাই গ্রাম্যতা। দেখেছি, শেখবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখনও শিখতে পারিনি। পারিনি কারণ, এক পুরুষে দু'পুরুষে গ্রাম্যতা দোষ কাটে না। সময় লাগে। কাটতে পারে, যদি প্রচণ্ড জ্ঞান ও অধ্যয়নের দ্বারা কেউ মানসিকতায় গোপনে গোপনে এবং অন্যের চোখের আড়ালে অনেকখানি এগিয়ে যান। তেমন সাধ্য তো আমার নেই! তাছাড়াও গ্রাম্যতা যে সবসময়েই দূষণীয় এমনও আমার মনে হয় না। শহুরে ভণ্ড শিক্ষিতর চেয়ে গ্রামীণ সরল অশিক্ষিত মানুষ অনেক বেশি প্রিয় আমার কাছে।

আমার ইচ্ছা, আমার মৃত্যুর পরে, আমার আত্মার আত্মীয় যাঁরা, আমার পাঠক-পাঠিকা, অগণ্য সম-মানসিকতার মানুষ এবং রক্ত সূত্রের ও বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়রা (যদি তাঁদের অমত না থাকে)

যেন একটি উপাসনা করেন। হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করার অনেক কষ্ট। তাছাড়া আমার পুত্রই নেই, শ্রাদ্ধ করবেই বা কে?

উপাসনার পরে স্মৃতিচারণ করারও রেওয়াজ আছে। আমাকে যাঁরা "হারামজাদা" বলে জেনে এসেছেন, যাঁরা প্রতি প্রশ্বাসে আমার মৃত্যুকামনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যেন কেউ আমার সম্বন্ধে সেদিন একটিও ভালো কথা না বলেন। বললে, আমি পালামৌর 'দারহা' ভূত হয়ে মৃত্যুর পরে তাঁর সঙ্গে পথে-প্রান্তরে কুস্তি লড়ে যাব। জীবদ্দশায় অথবা পরপারে, ভণ্ডদের সঙ্গে সহাবস্থানে আমার গভীর অনীহা আছে। এবং থাকবে।

বাবা যখন আয়কর বিভাগ থেকে পদত্যাগ করেন, তখন তাঁর উপরওয়ালা ছিলেন শ্রী পি মুখার্জি। প্রিয়নাথ মুখার্জি।

বাবাকে পদত্যাগ করতে অনেকই বারণ করেছিলেন মুখার্জি জেঠু। কিন্তু তখন ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রবল প্রতাপ। বাবা অন্যায়ভাবে সুপারসিডেড হন এবং দেশভাগের কারণে দিশেহারা ছিলেন বলেই পদত্যাগ করেন। সিদ্ধান্ত নেবার আগের রাতে রাতারাতি তাঁর সব চুল পেকে সাদা হয়ে যায়। চিন্তার কারণ ছিল। পরিবারে তখন রোজগেরে আর কেউই ছিলেন না। আমি বড়ো ছেলে। ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন। আমার পরে দুই বোন। তারপর দুই ভাই। অনেকই ছোটো।

রাতারাতি যে কারও চুল পেকে অমন সাদা হতে পারে তা আগে জানিনি। পরেও দেখিনি আর।

তৎকালীন কলকাতার ইনকাম ট্যাক্সের অত্যন্ত নামী এবং সম্মানিত উকিল ওসমান সাহেব বাবাকে মনের জোর জোগান। তাঁর মস্ত অফিস ছিল ওয়াটারলু স্ট্রিটে, বারো নম্বর বাড়ির দোতলাতে। তিনি বলেন, গুহ তুমি প্রথমে আমার অফিসে বসে শুরু করো, আলাদা চেয়ার টেবিলে। দেখবে, কিছুদিন পর থেকে মাসে যা মাইনে পাও সেই মাইনে তুমি একদিনেই রোজগার করবে। আর ভালো করে যদি কাজ করো যদি খাটো; কবে তবে দু-এক বছরের মধ্যেই সেই মাসিক বেতন তুমি এক ঘন্টাতে রোজগার করবে। তোমার প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনও আছে। ভয় কিসের? বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। ওসমান সাহেবের কথা অক্ষরে অক্ষরেই ফলেছিল। তাছাড়া পঞ্চাশ বছর আগে পরিশ্রমী ও কৃতবিদ্য মানুষের পক্ষে সফল হওয়াটা আজকের দিনের মতো এত তীব্র হাড্ডাহাড্ডি এবং প্রতিযোগিতারও ছিল না। তাছাড়া, আজকে সফল হতে শুধু কৃতবিদ্য ও পরিশ্রমী হলেই হয় না।

সাফল্যর পথ ও সংজ্ঞা আমাদের সময়ে যেমন ছিল আজ আর তেমন নেই। কয়েক বছর পরেই ওসমান সাহেব ঢাকাতে চলে যান এখানের প্র্যাকটিস গুটিয়ে নিয়ে। এখান থেকে পাট-গুটিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি এখানের চেয়েও ভালো পসার করেন। 'উদ্বাস্তু' না হলেও, চলে যাবার নিশ্চয়ই করণ ছিল। দুই বাংলাতেই তখন অনেকেই নিরাপত্তার অভাবের আশঙ্কা করেছিলেন।

কারও আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছিল, কারও হয়নি।

ওঁকে দু-একবারই দেখেছি যখন আদালতের পোশাকে না-থাকতেন। ইনকাম ট্যাক্সে প্র্যাকটিস করতে অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল ও হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের সামনে অ্যাপিয়র করার সময় ছাড়া ধড়াচুড়া

পরার পয়োজন ছিল না। অন্য সময়ে সাদা ট্রাউজার ও সাদা হাফশার্ট পরতেন। মোটা-সোটা, ফরসা, সুদর্শন মানুষ ছিলেন। হাসিখুশি। চেইন-স্মোকার। স্কচ-হুইস্কির সমঝদার।

উনি ঢাকা চলে গেলে ওঁর অফিসের একাংশ এবং পাশের এবং উলটোদিকের অফিসগুলি নিয়ে নেন বাবা। যদিও ওঁর জুনিয়রেরা, যেমন আহমেদ সাহেব, চৌধুরি সাহেব, চক্রবর্তী সাহেব আজকেও ওই বারো নম্বর বাড়ির দোতলাতেই, ওসমান সাহেবের পুরোনো চেম্বারের একাংশে প্র্যাকটিস করেন।

বাবার প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্ম, তাঁর নিজের নামে ওই একই বাড়িতে আজও আছে।

ওসমান সাহেব না কি বলেছিলেন; বাবার কাছেই শোনা সে কথা যে, প্রথমে জালে যে মাছই আসে, আসতে দিয়ো। বড়ো-ছোটোর বাছবিচার কোরো না। পরে, পসার জমে গেলে, ছোটো-মাছগুলি বেছে ফেলে দিয়ো। নইলে, মক্কেলদের প্রতি জাস্টিস করতে পারবে না।'

কিন্তু ওঁর এই উপদেশ বাবা নিয়েছিলেন বলে জানা নেই। বরং উলটোটাই করেছিলেন। বাবা বলতেন, বড়ো মক্কেলদের অনেক হ্যাপা। তাদের বড়ো বেশি অ্যাটেনশান দিতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই তাঁরা অসন্তুষ্ট। তাঁদের পেছনে যে সময় দিতে হয় এবং যে ফিস পাওয়া যায় তার বদলে সেই সময়টুকু একাধিক ছোটো মক্কেলকে দিলে অনেকই বেশি ফিস পাওয়া যায় তাঁরা একেকজনে কম ফিস দেন বটে কিন্তু তাঁদের সকলের ফিস যোগ করলে অনেক বড়ো মক্কেলের ফিসের চেয়ে তা অনেকই বেশি হয়।

তবুও আমার মতে, কিছু বড়ো মক্কেল রাখতেই হয়, 'ইমেজের' জন্যে, প্রমাণ করার জন্যে যে; বড়োদের কাজ করার যোগ্যতার কোনও ঘাটতি নেই।

বড়ো মক্কেলদের দোষও থাকে অনেক। তাঁরা একই সঙ্গে একাধিক উকিল বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেন। এই জিনিসটা সম্ভবত বাবার 'ইগোতে' লাগত। লাগাই স্বাভাবিক। প্রত্যেক বিবেকবান ও পরিশ্রমী পেশাদারেরই লাগে। তাছাড়া, তাঁদের নানা বায়নাক্কা থাকে। তাঁদের মর্জিমতো, ট্যাক্স কম লাগবে বলে, একই শেয়ার ট্রানজাকশন বা ফরওয়ার্ড ট্রেডিং-কে একবছর 'ট্রেডিং' আর পরের বছর 'স্পেকুলেশান' বলে মানাবার "অর্ডার" হয়।

এমন করাটা কোনও সম্ভ্রান্ত উকিল বা অ্যাকাউন্ট্যান্টের পক্ষেই সম্ভব নয়। উচিত তো নয়ই!

যে মক্কেল পুরোপুরি তাঁর উকিল বা অ্যাকাউন্ট্যান্টের উপর ভরসা না করেন, সে মক্কেলের কাজ করতে আদৌ উৎসাহ লাগে না এবং দ্বিধাও জন্মায়। এ ছাড়াও ছোটো মক্কেলদের কাজ ভালোভাবে করতে পারলে ফিস ছাড়াও নানাভাবে তাঁরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরিবারের একজন হয়ে যান। ভক্তি শ্রদ্ধারও অবধি থাকে না।

তবে, মক্কেলদের পরিবারভুক্ত করার বিরুদ্ধে ছিলেন বহু নামজাদা এবং কৃতী উকিলই।

বাবা, পসার শুরু করার কিছুদিন পরই বাবার সহকর্মী, বন্ধুস্থানীয়, কিন্তু অনুজ শ্রীকল্যাণকুমার রায়ও ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে পদত্যাগ করেন। তখন তিনি পাটনাতে অ্যাপিলেট অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। চাকরিতে থাকলে তিনি কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকতেন বহুবছর।

কল্যাণকাকু বলতেন, "হাই-ফিস" ছাড়া কাজ করবি না। কাজ খুব কম করবি, তাও ভালো। ভুলে যাবি না যে, এটা তোর জীবিকা, জীবন নয়। জীবিকার ফেরে পড়ে যে মানুষ টাকা বা প্যায়েরভি বা ক্ষমতার লোভে জীবনকে পায়ে মাড়ায়, সে অবশ্যই "মিসডায়রেক্টেড"।

কল্যাণকাকুর মতের সঙ্গে উপরওয়ালার খিটিমিটি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও পদত্যাগপত্র দেন। কিছুদিন বাবার অফিসেই বসেন। পরে ১২ নং চৌরঙ্গি স্কোয়ারের ছোট্ট আলাদা অফিস নিয়ে চলে যান।

কল্যাণকাকু বলতেন, মক্কেলদের দূরে দূরে রাখবি সবসময়ে। তাঁরা কি তোর শালা না ভগ্নীপতি? ভগ্নীপতিকেই বা ঘাড়ে চড়াবার কী আছে? ওসব করেন, যাঁরা রান অফ দ্যা মিলস তাঁরা। যাঁদের জীবনে কিছু করার আছে, তাঁদের জীবনও অন্যরকম হওয়া উচিত।

বাবার মতো সুরসিক "টেবল-টকার" পেশার জীবনে খুব কমই দেখেছি। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং লোকচরিত্র বোঝার অপার ক্ষমতা তাঁর ছিল। এবং মক্কেলের কেসকে কীভাবে 'পেশ' করতে হয়, মানুষ বুঝে, তাঁর বিদ্যেবুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, এক ঝলকে তার সামাজিক পটভূমি বুঝে; তা তাঁর কাছে

শেখার ছিল। ব্যাপারটা তিনি রীতিমতো আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের "বন্দিশ"-এরই মতো। তাঁর এ ব্যাপারে নিজস্ব বিরল "পেশকারী" ছিল যে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সারা ভারতে সমস্রাধিক উকিল, ব্যারিস্টার এবং অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে কাজ করার পরেই একথা বলছি।

অনেকেই হয়তো স্বীকার করবেন না, কিন্তু ওকালতিতে 'কোর্ট-ক্র্যাফট' যে একটি অত্যন্ত উচ্চস্তরের আর্ট, তা তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় উকিল ব্যারিস্টার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সওয়াল করার ধরন খুব কাছ থেকে সযত্নে নজর করলেই প্রাঞ্জলভাবে বোঝা যেত। আজকাল, সেদিনের প্রেক্ষিতে "বেঞ্চ" এবং "বার" দুইয়েরই মানের লজ্জাকর অবনতি হয়েছে সারা দেশে।

কল্যাণকাকুর মতো ভালো ইনকাম ট্যাক্সের উকিল কম দেখেছি। কিন্তু তাঁর "মেজাজ"টি ওই পেশার সঙ্গে মেলেনি একটুও, কোনওদিনই। "হুজুর মাই বাপ" করে তো নয়ই, মক্কেলের স্বার্থে নিজের মাথা কখনও সখনও নিচু করে বা যথেষ্ট বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে সওয়াল করতেও তিনি রাজি হননি কোনওদিনই। মুশকিল ছিল এও যে অন্য প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকেই তিনি তাঁর সমান মেধা, বুদ্ধি ও "পারফেকশান" আশা করতেন। অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অযোগ্যতা এমনকী দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং অনিয়মানুবর্তিতাও তাঁকে পেট্রল-বোমারই মতো দপ করে জ্বালিয়ে দিত। এই দেশে, অতসব গুণ, জজ সাহেবদের বা অন্য সরকারি অফিসারদের মধ্যে, অথবা জুনিয়রদের এবং মক্কেলদের বা তাঁদের অ্যাকাউন্ট্যান্টদের মধ্যেও আদৌ প্রত্যাশার নয়।

এই সব বাবদে এবং হয়তো বয়স হচ্ছে বলেই, আমার নিজের অবস্থাও এখন কল্যাণকাকুর মতোই হয়েছে। রাগে গজগজ করি সবসময়। আজকের পশ্চিমবঙ্গের কাজের সংস্কৃতি ও পরিবেশের মধ্যে ওই সব গুণ যিনি অন্য কারও কাছেই প্রত্যাশা করেন তাঁর মতো মহামূর্খ আর কেউই নেই।

যাই হোক, বছর দুয়েকের মধ্যেই বাবার পসার একেবারে রমরমে হয়ে উঠল। প্রত্যেকটি কেসের একেবারে গভীরে চলে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রম করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। কোনও ব্যাপারেই ফাঁকিবাজি বা গোঁজমিল দেওয়া তাঁর চরিত্রে ছিল না। চমৎকার ইংরেজি লিখতেন। আইনের ইংরেজি যতটা নয়, 'ফ্যাক্ট'-এর ইংরেজি তার চেয়ে ভালো। ওঁর মতো সুন্দর করে গুছিয়ে ইডিয়ম্যাটিক এবং জোরদার ইংরেজি দিয়ে ফ্যাক্টকে উপস্থাপিত করতে খুব কম উকিল বা অ্যাকাউন্ট্যান্টকেই দেখেছি। যদিও ওঁর স্কুলিং রংপুরের কৈলাসরঞ্জন স্কুলে এবং কলেজ, রংপুরেরই ক্যারমাইকেল কলেজে।

পেশা আরম্ভ করার পরপরই বাবার মক্কেল হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানি। যাঁদের মাইনস এবং কারখানা ছিল কোডারমার শিবসাগরে। ঝুমরী তিলাইয়ার উলটোদিকে। এবং হয়েছিলেন, কোলিয়ারি-কিং অর্জুন আগরওয়ালাও। বিহারে তাঁর অগণ্য কোলিয়ারি ছিল। পশ্চিমবঙ্গেও ছিল। রতিবাটি ও মডার্ন সাতগ্রাম কোলিয়ারি। তাঁর পার্টনার অবশ্য ছিলেন জালানরা। অধুনা 'ইনডানা' গ্রুপ যাঁদের। ওঁদের গোধুর কোলিয়ারির পার্টনার ছিলেন একজন বাঙালি, শ্রী রাহা।

আসলে কোলিয়ারির মালিক ছিলেন উনিই।

ক্রিশ্চান মাইকা কোম্পানির মালিকেরা "আগরওয়ালা" হলেও মাড়োয়ারি ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মানুষ। সম্ভবত মীরট্-এর। রামকুমার, রামমনোহর, রামগোপাল এবং বদ্রীপ্রসাদ। চার ভাই ছিলেন।

টিয়াপাখির ডাকের মতো তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে ভক্তিভরে ভালো ভজন গাইতেন রামকুমারবাবু। আমি পার্টনার হবার পরে বিশেষ স্নেহ করতেন তিনি আমাকে। এবং প্রায়ই গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যেতেন ওঁর অফিসে।

বাবার দৌলতে, মানে, বাবার মক্কেলদের দৌলতে, শুধু হিরে ও সোনার খনি ছাড়া প্রায় সব খনিই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল স্কুলে পড়ার সময়েই। বিহারের কোডারমা অঞ্চলের রজৌলির ঘাটে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে, পৃথিবীর গভীরতম অভ্রখনি "খলকতুম্বি", এবং ওড়িশার বড়জামদা বড়বিল এলাকার বিভিন্ন লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের খনি।

বড়বিল-এর মিত্র এস কে প্রাইভেট লিমিটেড-এর দৌলতে বহু লৌহ এবং ম্যাঙ্গানিজের খনি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ওঁরা ইনস্পেকশন এজেন্ট। কোন্ ধাতব আকরে ধাতুর উপস্থিতি কতটা?' তা আকর পরীক্ষা করে তাঁরা সার্টিফাই করেন রপ্তানির জন্যে।

রামকুমারবাবুদেরই একটা কোম্পানি ছিল এবং এখনও আছে, 'ওড়িশা ম্যাঙ্গানিজ'। ওড়িশাতে। তামার খনিও দেখেছি, ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের; মৌভাণ্ডারে, ঘাটশিলাতে।

মাড়োয়ারি অর্জুন আগরওয়ালা যখন "কোলায়ারি-কিং" তখন বিহারে দুটি গুজরাতি পরিবারও ছিলেন তাঁকে টক্কর দেওয়ার মতো। তাঁদের যৌথ কারবারের নাম ছিল "চানচানি অ্যান্ড ওড়া।" ইংরেজি বানান WORAH। তাঁরা বাবার মক্কেল ছিলেন না কিন্তু চানচানিদের এক শরিকের একমাত্র ছেলে দীনুভাই (দীনেশ) আমার সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের দিন থেকেই। এবং এখনও আছে। আমরা একসঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পরীক্ষাও পাশ করি। দীনু, জি বাসু অ্যান্ড কোম্পনিতে আর্টিকেলড ক্লার্ক ছিল। পরে পার্টনারও হয়।

অর্জুনবাবু রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার ছিলেন।

উনিশশো উনপঞ্চাশ অথবা পঞ্চাশের এক ষষ্ঠীর দিনের সকালে, সালটি মনে নেই; সম্ভবত পঞ্চাশ কি একান্ন হবে; কোনও মেল ট্রেনে, একটি অদ্ভুতদর্শন রিজার্ভড বগিতে আমরা ধানবাদ রওনা হলাম। সঙ্গে একজন খিদমতগারও চলল, আমাদের বাড়ির সবচেয়ে চালাক-চতুর কাজের লোক পাঁচু। বাবার সঙ্গে, বাবার অনুজপ্রতিম পূর্বতন সহকর্মীদের কেউ কেউও ছিলেন। তার মধ্যে সুকুমারকাকু, এখন বিখ্যাত কর-সংক্রান্ত আইন বিশেষজ্ঞ, শ্রী সুকুমার ভট্টাচার্যও ছিলেন সস্ত্রীক। এবং আরও অনেকে। তখন সুকুমারকাকু ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার। উনিও আমার বাবারই মতো, পরে ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়ে একটি কোম্পানির ট্যাক্স-অ্যাডভাইসর হন এবং তারও পরে স্বাধীন পেশা আরম্ভ করেন সিং অ্যান্ড ব্যাগার্থে অ্যাডভোকেটস ফার্মে যোগ দিয়ে। এই সিং এবং ব্যাগার্থে দুজনেই ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন এবং রিটায়ার করে এই ফার্মের প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতাতে।

এখন অবশ্য সুকুমারকাকু নিজস্ব ফার্ম করেছেন পুত্রদের নিয়ে।

যে-বগিতে করে ধানবাদ গেছিলাম আমরা, তেমনটি বগি আর দেখিনি। পুরো বগিতে একটিই কম্পার্টমেন্ট। হয়তো রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার বা ভি আই পি -দের সপরিবার দিনের বেলার সফরের জন্যেই ওইরকম বগি তৈরি হয়েছিল। তার দু'দিকে আলাদা আলাদা সোফার মতো লম্বা লম্বা বার্থ মধ্যেটা ফাঁকা। ফুটবল খেলা যায়। ফার্স্ট ক্লাস বগি। উনিশশো উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশে রেলে এয়ারকন্ডিশনড কোচ ছিল না আমাদের দেশে।

আমাদের সঙ্গে যথারীতি, বন্দুক-রাইফেলও আছে। যার যার বক্সবন্দি হয়ে। সেগুলো দেখে, অর্জুনবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী জিনিস? বাজনা বুঝি?

বললাম, না গান।

উনি বুঝতে পেরে, আমার পিঠ চাপড়ে বাবাকে বললেন, ছেলে রসিক আছে আপনার গুহসাহেব।

সেযুগে ভুঁড়িহীন বড়োলোক মাড়োয়ারি খুব কমই দেখা যেত কিন্তু আশ্চর্যর কথা বাঘা মাড়োয়ারিদের প্রায় কারোরই ভুঁড়ি ছিল না। যেমন জি ডি বিড়লা, পি ডি হিম্মতসিংকা এবং আরও অনেকেরই।

কালো গোড়া কাঠের মতো চেহারা ছিল অর্জুনবাবুর। খুব লম্বা ছিপছিপে। অত্যন্ত সপ্রতিভ এবং রসিক। বাংলা ও ইংরেজি অনর্গল বলতে পারতেন। মালভূমি বাংলাও বলতে পারতেন। উনি নিজেও শিকার করতেন, তবে শুধুই বাঘ। শুনেছি, তৃণভোজী জানোয়ার মারতেন না।

ধানবাদ স্টেশনে মহা-সাড়ম্বর অভ্যর্থনার মধ্যে আমরা বগি থেকে অবতরণ করলাম। পাঁচ-ছ'খানা গাড়ি, অর্জুনবাবুর গ্রুপের চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট দুর্গাবাবু, দুর্গাপ্রসাদ আগরওয়ালা রিসেপশান কমিটির চেয়ারম্যান। পাকা তালের মতো কালো, রসগোল্লার মতো চেহারা, চকচকে গোলাকৃতি টাক, মিহি মিলের ধুতির উপরে হলদেটে সিল্কের পাঞ্জাবি—গলায় সোনার হার—পায়ে মোজাবিহীন ফিতেওয়ালা শু এবং মুখে অবিরাম হাসি। দুর্গাবাবুর সঙ্গে আরও বহু খিদমতগার। ডজ, ডিসোটো, পন্টিয়াক, ব্যুইক, স্টুডিবেকার—সব ঢাউস ঢাউস ঝকঝকে গাড়ির লাইন লেগে রয়েছে দেখলাম

স্টেশনের বাইরে। সেখান থেকে পাত্র-মিত্র সমভিব্যাহারে তো গাড়ির শোভাযাত্রা করে গন্তব্যে, ঝরিয়ার "আনন্দভবনে" পৌঁছোনো গেল। "আনন্দভবন', ঝরিয়াতে অর্জুনবাবুর অফিস এবং গেস্ট হাউস। বাড়ি, ঝরিয়ারই অন্যত্র।

"আনন্দভবনের" গ্যারাজে ওইরকম বড়ো গাড়ি, খান কুড়ি-তিরিশ অনায়াসে রাখা যেত। অবশ্য তখন চানচানি অ্যান্ড ওড়া-র অফিসের সামনেও, কাজের দিনে; খান পঞ্চাশেক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। এবং সময়টা আজ থেকে তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বছর আগে—তখন রাম-শ্যাম-যদু-মধু এলেবেলে সকলেরই গাড়ি ছিল না।

ওই "আনন্দভবনেই" সদ্য আই আর এস পাস করা অফিসারেরা, যাঁরা রেভিন্যু সার্ভিসে যোগ দিতেন, তাঁদের ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে গিয়ে অর্জুনবাবুর আতিথেয়তায় কোলিয়ারি বিজনেস-এর "ইনস অ্যান্ড আউটস" বোঝানো হত। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের আয়করের একটা মস্ত অংশ আসত কোলিয়ারি আর চা-বাগান থেকে। আয়কর বিভাগে আলাদা আলাদা কোম্পানিজ ডিস্ট্রিক্টস ছিল, যেখানে শুধু কোলিয়ারির মালিকদেরই অ্যাসেসমেন্ট হত এবং চা বাগানেরও। কোম্পানিজ ডিস্ট্রিক্ট টু অ্যান্ড কোম্পানিজ ডিস্ট্রিক্ট থ্রি।

রাতটা "আনন্দভবনে" থেকে পরদিন সকালে, কোলিয়ারির গভীরে নেমে কোলিয়ারি দেখা হল। নানাভাবে কয়লা, খনি থেকে বের করা হয়। ওপেন কাস্ট মাইনও আছে।

নীচে নামলে গা-ছমছম করে। লিফটে করে নামতে হয়। সেফটি টর্চ আর লণ্ঠন নিয়ে, মাথায় হেলমেট পরে। মধ্যে মধ্যে বড়ো পিলার রেখে দিয়ে, তার চারদিক দিয়ে কয়লা খুঁড়ে বের করা হয়। একটার পর একটা, 'সিম' বা স্তর কেটে কয়লা বের করার পর বাধ্যতামূলকভাবে "ডি-পিলারিং" করতে হয়। কয়লা বের করে নেওয়ার পর কোলিয়ারির সেই অংশ বালি দিয়ে ভরাট করে দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয় যাতে ধস না নামে। নানা নিয়মকানুন আছে এসব, পরে, নানা কোলিয়ারির কেস করতে গিয়ে আরও ভালো করে জানতে হয়েছিল।

কতরকমের যে কয়লা হয়। ব্ল্যাক ডায়মন্ড, নানা গ্রেডের! কয়লা থেকে কোক হয়। ওয়াশারি প্ল্যান্টে কয়লা ধোওয়া হয়। আরও অনেক টেকিনিক্যালিটিজ আছে।

কোলিয়ারি সব ন্যাশনালাইজড হয়ে যাবার পরে ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের এন সি ডি অডিট করার সময়ে পুরোনো বিদ্যে নতুন করে ঝালিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু যখনকার কথা বলছি তা চল্লিশের দশকের শেষের কথা।

সেদিন কোলিয়ারি দেখার পর তোপচাঁচি-লেকে গিয়ে লেক দেখা এবং খাওয়া দাওয়া হল। পরদিন ভোরে গাড়িতে রওনা হয়ে চাস ও পুরুলিয়া হয়ে রাঁচিতে পৌঁছোনো হল।

রাঁচিতে অর্জুনবাবুর একটি বাড়ি ছিল কাঁকে রোডে। বাড়ি নয়, প্রাসাদ। এখন যেখানে ডিভিশনাল কমিশনার, চিফ জাস্টিস ইত্যাদির বাড়ি তারই কাছাকাছি। সে বাড়িতে অবশ্য এখন ইস্টার্ন কোল্ডফিল্ডস বা ওইরকমই কোন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থার অফিস হয়েছে। বাড়ির নামটি ঠিক মনে পড়ছে না। নামটি সম্ভবত গণ্ডোয়ানা হাউস।

বাড়ির ভেতরটা এখন কেমন আছে জানি না। বিহারের সাহেব গভর্নরের মেমসাহেব শাশুড়ির বাড়ি ছিল সেটি। স্বাধীনতার পরে অর্জুনবাবু কিনে নেন। তখন কাঠের মেঝে ছিল। একতলায় ডান্সিং-ফ্লোর ছিল। বিরাট বাগান, টেরাসিং করা। একটি চিড়িয়াখানা। পেছনে একটি টিলা; বাংলোর হাতার মধ্যেই, সেখানে রাইফেলশ্যুটিংয়ের রেঞ্জ ছিল। আমারা পয়েন্ট টু টু রাইফেল ছুড়ে হাত ঠিকও করতাম।

পয়েন্ট টু-টু রাইফেলে হাত পেকেছিল প্রায় শিশুবয়সে সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে। উনিশশো সাতচল্লিশেই। ক্যাপ্টেন বি টি ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে। আমার হাজারিবাগের বন্ধু মিহির সেনও (গোপাল) ওই একই সময়ে এই ক্লাবের সভ্য হয়। তখন অবশ্য ওর সঙ্গে আলাপ ছিল না, আলাপ হয় পঞ্চাশের দশকের শেষে। তার কিছুদিন পরে বরিশালে, টুয়েল্টি বার "টলি" শটগানে হাত পাকিয়েছিলাম। বরিশালের সাহেব জজ ভারত ছেড়ে চলে যাবার সময় বাবা কিনে নিয়েছিলেন

মেমসাহেবের প্রায় নতুন সেই বন্দুক। মেমসাহেবই ব্যবহার করতেন। ক্লাস সিক্সের ছাত্রর পক্ষে সে বন্দুক আদর্শ ছিল। ইলি-কিনক কোম্পানির নানারঙা গুলি আসত ইংল্যান্ড থেকে।

এখনও সেই প্রথম-বন্দুকের ফোটা-কার্তুজের গন্ধ নাকে ভাসে আমার।

এসব কথা বিস্তারিত লিখেছি আত্মজৈবনিক, "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে" উপন্যাসের দু-খন্ডে। তাই, এখানেই থামি।

রাঁচি শহর ছিল তখন ছবির মতো। শান্ত, সুন্দর, নির্জন। বি এন আর হোটেলে (এখন এস ই আর) কলকাতার কত মানুষ যে 'চেঞ্জ' করতে হাওয়া বদলাতে যেতেন প্রতিবছর পুজোর সময় ও শীতে, তার ঠিক নেই।

অষ্টমীতে, সকালে অঞ্জলি দেবার পরে ঠিক হল যে, বিকেলে ডালটনগঞ্জের পথে পালামৌর "টোড়িতে" যাওয়া হবে। টোড়ি অথবা চান্দোয়া-টোরিতে ভালো দুর্গাপুজো হয়। দুটি গাড়ি যাবে। সঙ্গে একটি আর্মি-ডিসপোজালের ওয়েপন-ক্যারিয়ারও।

ওখনে পুজো দেখে, খাওয়া-দাওয়া সেরে মেয়েরা ও শিশুরা আসবেন "গোন্ডা হাউসে", রাঁচিতে। আর পুরুষ, বীরেরা ওই অঞ্চলের গভীর বনে শিকার করার "চেষ্টা" করবেন। আমি ক্লাস সিক্সে যদিও পড়ি কিন্তু তখনই "বীরপুরুষদের" দলভুক্ত হয়ে গেছি।

'বিগ গেম' শিকার আলাদা ব্যাপার। পাখি শিকার নিকৃষ্ট শিকার না-হলেও সব শিকারেই আলাদা আলাদা শিক্ষানবিশি করতে হয়। সেই বিগ গেম-এর শিক্ষানবিশি আমার তো বটেই, বাবারও ছিল না তখন।

দিনের শিকার, রাতের শিকার, খরগোশ শিকার, বাঘ শিকার সবই সমান কঠিন ছিল, আজকের ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে-ওঠা আর্ম-চেয়ার কনসার্ভেটরেরা যাই বলুন না কেন।

তাছাড়া, তাঁরা হয়তো জানেন না যে, এককালের শিকারিরাই পরে সবচেয়ে ভালো কনসার্ভেটর হন। ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের পূর্বাঞ্চলের প্রধান প্রবক্তা শ্রীমতী অ্যানন রাইট ও তাঁর স্বামী বব রাইট পালামৌতে নিয়মিত শিকার করতেন আমাদের সমসময়ে। পৃথিবীখ্যাত পক্ষীবিশারদ ও কনসার্ভেটর সালিম আলি একসময়ে অত্যন্ত উৎসাহী শিকারি ছিলেন।

"শিকারি" বলতে, দলে বাবা আর ওয়াংডিকাকুই মুখ্য। ভুটানি, মিস্টার ডি ওয়াংডি। ওয়াংডিকাকু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এয়ারফোর্সেব পাইলট ছিলেন। যুদ্ধ থেমে যাওয়াতে সেখান থেকে এক ডাইভে ল্যান্ড করে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে।

দেরিতে খাওয়া-দাওয়ার পর রওনা হওয়া হল। আমি তখন না-যুবক, না-বালক। বড়োই করুণ অবস্থা। বড়োরা দূরে দূরে রাখেন আর শিশুদের সঙ্গে মেশা যায় না। আমার আর ছোটোকাকুর স্থান হল ওয়েপন-ক্যারিয়ারে। পেছনে পাঁচু এবং আমি। অন্য পাঁচু। আমাদের খিদমতগার।

সমস্ত গোলাবরুদ আমার জিম্মাতে। আর পাঁচুর জিম্মাতে সমস্ত খাবার-দাবার। ছোটোকাকু সিনিয়রিটির ভারে এবং গুরুজন হবার প্রেরোগেটিভে ওয়েপন-ক্যারিয়ারের সামনে বসলেন, ড্রাইভারের পাশে "ভান্টেজ" পজিশনে।

গুলি-বন্দুক যদিও সব আমারই জিম্মায় কিন্তু আমার অবস্থাটা পশ্চিবঙ্গের আর্মড-পুলিশেরই মতো মর্মান্তিক। গুলি চালালেই এনকোয়ারি বসাবেন রাজনীতিক নেতারা। আমার ক্ষেত্রে গুরুজনেরা।

আমার হাতে একটা পয়েন্ট টু-টু রাইফেল। চেকোস্লোভাকিয়ান। নলের নীচে ভড়কি দেওয়া অন্য নল। সেটিই ম্যাগাজিন; দশটি গুলি যায় সেই ম্যাগাজিনে। "হাত নিয়ে, অর্থাৎ নিশানার অব্যর্থতা নিয়ে আমার কোনওদিনও ম্যাথাব্যথা ছিল না। কারণ, আর্মড পুলিশেরই মতো, আমারও রাইফেলের ট্রিগার বাঁধা দেওয়া অন্যত্র, পিতৃদেবের কাছে। স্বাভাবিক কারণে, সব 'অব্যর্থতাই' ব্যর্থ। বড়োসাহেবের অর্ডার ছাড়া পথপাশের আত্মহত্যাকামী ব্যর্থ প্রেমিক শশককেও যে এ-জন্মের মতো মুক্ত করি, সে অধিকারও এ বালখিল্যের ছিল না।

মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডায়, মিষ্টি মিষ্টি রোদের মধ্যে একখানি ডজ সাদা কিংসওয়ে আর একখানি কালো ফোর্ড মার্কারি; আর তাদের পেছনে আমাদের, অর্থাৎ চাকর-বাকরদের ওয়েপন ক্যারিয়ার তো

"রাঁচি" থেকে বেরুল। আমরা সোজা যাব নেতারহাটের রাস্তা ধরে, কিন্তু ডানদিকে মোড় নেব। তারপরেই বিখ্যাত চাঁদোয়া-টোড়ির পাহাড়ি ঘাট। এগারো মাইল। জঙ্গলে, পাহাড়ে, আঁকাবাঁকা পথ, চাঁদোয়াটোড়ি পর্যন্ত।

কুরুতে এসে আমরা যখন ডানদিকে মোড় নিলাম, তখন বেলা পড়ে এসেছে। আশ্বিনের রোদের ম্লান লালিমাতে বন-পাহাড়ে এক আশ্চর্য বিধুর ছবি। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি কিশোর আমি। কী সুন্দর নিসর্গ। আদিগন্ত নিবিড় বন আর নানা আকৃতির পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়। ওই পথেই তিরানব্বইয়ের, মানে, এবছরেরই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে গেছিলাম। সেই উনপঞ্চাশ পঞ্চাশের অষ্টমীর বিকেলে আর তিরানব্বইয়ের এপ্রিলের সকালের মধ্যবর্তী সময়ে গত তেতাল্লিশ বছরে কম করে দুশো বার পালামৌর জঙ্গলের ওই পথে এসেছি-গেছি আর প্রতিবারই জঙ্গলের বিলীয়মান অবস্থা দেখে বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠেছে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বপ্রদেশের জঙ্গলেরই একই অবস্থা রক্ষকেরাই সবচেয়ে বড়ো ভক্ষক।

গাড়ি ও ওয়েপন ক্যারিয়ারের "কনভয়" এগিয়ে চলেছে কুরুর ঘাটের দিকে। ঘন জঙ্গলাবৃত উপত্যকা, বড়ো বড়ো কালো কোয়ার্টজাইট বা ব্যাসাল্ট পাথরের চ্যাটালো স্ল্যাব মাঝে মধ্যে। নীচে খাদ, বাঁদিকে। পথের পাশে কোনও বেড়া, পাথর বা অন্য কিছুই নেই। গাড়ি পড়লে, পড়বে অতলে। পথ ওরকমই ছিল।

পাঁচু, চাদরটা গায়ে জড়িয়ে আরাম করে বসেছে। সে নাকি "পশ্চিমে" আগে কখনও আসেনি।

পাঠক! পশ্চিম বলতে কেবল ইউরোপ-আমেরিকা বুঝবেন না, বর্ধমান জংশনও কলকাতার পশ্চিমে। কুরু বা চান্দোয়া তাই ঘোর ও ঘোরতর পশ্চিম।

মাঝে মাঝে উৎকট গন্ধ বিড়িতে সুখটান দিচ্ছে পাঁচু। আমাকে মান্য করত না।

কুরুর মোড়েই চা খেতে থামা হয়েছিল। সাহেব-মেমসাহেবরা পথ-পাশের অব্রাহ্মণ দোকানে চা খান না। শুধু আমরাই থেমেছিলাম পাঁচ মিনিটের জন্যে। এমনিতেই তো আমরা রিয়ার-গার্ড। ওয়েপন-ক্যারিয়ারের ড্রাইভারের সঙ্গে সেই স্বল্পক্ষণের বিরতির মধ্যেই পাঁচুর "একচোট" হয়ে গেছে।

পাঁচুর ডান চোখটি ট্যারা। তা নিয়ে ড্রাইভার অসভ্যর মতো ছড়া কেটে কী বলেছিল পাঁচুকে। পাঁচুও কম যায় না। কলকাতার কোনও "স্যাঙ্গুভ্যালি" রেস্তোরাঁতে কাজ করেছে সে আগে। এই "স্যাঙ্গুভ্যালি" ব্যাপারটার মানে, আমি আজও জানি না। কোন পাহাড়ের কোলে সেই উপত্যকা? যদি পাঠকদের মধ্যে কেউ জানেন তো দয়া করে জানালে বাধিত হব।

আমাদের ছেলেবেলাতে ওই "স্যাঙ্গুভ্যালি" চায়ের দোকান অনেকই দেখা যেত। পাঁচু, পরপর ডিশ-কাপের ওপর ডিশ-কাপ সাজিয়ে পাঁচ-ছ'কাপ গরম চা নিয়ে দোতলা-তিনতলা দৌড়োদৌড়ি করত অবলীলায় আর আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে ভাবতাম, জীবনে কিছুই হল না। অন্তত এই ভেলকিটাও যদি শিখতে পারতাম!

কিছু নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। হতেই, ঝরিয়ার ড্রাইভার পাঁচুকে বলেছিল, শালা! আচায়তানা। জাদা বাঁতে মত করনা।

অর্থাৎ তুই শালা ট্যারা, বেশি কথা বলিস না।

সঙ্গে সঙ্গে কলকেতার পাঁচু বলল,

"কঞ্জা কহে পুকার,
আচায়তনাসে রহো হুঁশিয়ার
আচায়তনা কহে পুকার
উসসে রহো হুঁশিয়ার,
যিসকো ছাতিমে নেহি একোবার।"

বলেই, ড্রাইভারের নির্লোম বুকে এক জোর রাম-চিমটি।

মিলিটারি ডিসপোজালের ওয়েপন-ক্যারিয়ারের ড্রাইভার এমন কলকাত্তাইয়া বাঘের পাল্লায় পড়বে এই বাঘের জঙ্গলে, তা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

পাঁচুর বক্তব্য ছিল এইরকম :

"কটা যার চোখ, সে চেঁচিয়ে বলছে, ওরে! সকলে ট্যারা থেকে সাবধান।

তখন ট্যারা চেঁচিয়ে বলল, যার বুকে একটিও চুল নেই তার থেকে সাবধানে থাকিস রে বাবু।"

পাঁচুকে বললাম, এসব শিখলে কোথায়?

ও বলল, হুঁ! আমি সাতঘাটের জল খাওয়া মাল বাবু। ও কোথায় খাপ খুলতে এসেছে জানে না।

প্রথম গাড়িটা চালাচ্ছিল গিরিশ ড্রাইভার। তার ইয়া ইয়া পুরুষ্টু কালো গোঁফ। সে পাকা শিকারিও বটে! মহিলারা ও শিশুরা আছেন তার জিম্মাতে সেই গাড়িতে। তার পরের গাড়িটা স্বয়ং অর্জুনবাবু নিজে চালাচ্ছেন। যদিও রথ চালাবার কথা শ্রীকৃষ্ণেরই। 'বাবারা' ও অন্যেরা সামনে পেছনে ছড়িয়ে বসেছেন সে গাড়িতে। আবারও বলে নেওয়া উচিত যে, আমার মায়ের একই স্বামী। একমাত্র বাবাই হৃষ্টপুষ্ট। অন্যরা সকলেই রোগা। ওয়াংড়িকাকু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

আলো যখন আরও পড়ে এসেছে তখন গাড়িগুলো ঘাটের সর্বোচ্চ জায়গায় এসে পৌঁছোল।

হঠাৎই লক্ষ করলাম, সামনে গিরিশ ড্রাইভারের গাড়ি ওই ভয়ানক বিপজ্জনক রাস্তার একেবারে বাঁদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছে। ব্রেক লাইটের লাল আলো জ্বলছে। তার মানে, গিরিশের পা ব্রেকে। জায়গাটার পরেই পথ উতরাইয়ে নেমে গেছে। ডানদিকে একটি ছোটো টিলা, পুব-আফ্রিকার "কোপজের" মতো, আর ঠিক তারই উপরে দিনশেষের রাঙা আলোয় এবং গাড়ির হেড়লাইটের 'মিক্সিং'-এর মধ্যে একটা ভুঁড়োশেয়াল বসে আছে।

শেয়ালই! কিন্তু আমাদের ওয়েপন-ক্যারিয়ার যতই নিকটবর্তী হতে লাগল ততই শেয়ালটা পালামৌর নামী সব ভূত, দারহা, কিচিংদের দয়ায় বড়ো হতে হতে এক অতিকায়, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক বাঘে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তারপর যা সব ঘটনা ঘটল, বাঘ-বনাম শিকারি, তৃণভুক শিকারি বনাম মাংসভুক শিকারি, স্ব-স্ব স্বামী বনাম স্ব-স্ব স্ত্রী, গুঁফো গিরিশ ড্রাইভার বনাম আমার গর্ভধারিণী, পাঁচু বনাম আমি, ছোটোকাকু বনাম ড্রাইভার; সে সব 'কেচ্ছার' কথা পাঠক, আপনার না শোনাই ভাল।

এরপরও যদি কোনও পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত থাকে, তবে "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে" * পড়ে নিতে পারেন। এখানে এ-বিষয়ে আর কিছু বলা যাবে না।

ডোভার রোডের দো'তলার একচিলতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডানদিকে তাকালে, চৌত্রিশের বি সি ডি এবং 'ই'-ও পেরিয়ে চোখে পড়ত একটি দারুণ লন। প্রকাণ্ডও বটে। অনেক মালির দৈনিক যত্ন ছিল তার পেছনে। নানারকম গাছ-গাছালির ফাঁক-ফোকর দিয়ে একটি সুন্দর বাড়ির একাংশও দেখা যেত। বাড়িটিতে ঢুকতে হত, হাজরা রোড দিয়ে। লম্বা ড্রাইভ পেরিয়ে। বাড়িটির নাম সম্ভবত ছিল 'নিরালা'। বাড়িটি ছিল, শ্রীপেয়ারী মুখুজ্জের।

তিনি কে? বা কী করেন? তা তখন অত জানতাম না, পরে জেনেছিলাম। মাঝেমধ্যেই দেখতে পেতাম তাঁকে। মোটা-সোটা লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক। তাঁর সেই বাড়িতে "পার্টি" লেগেই থাকত। রাতের বেলায় গাছে গাছে টুনি বালব ও ফ্লাডলাইটের বন্যা বয়ে-যাওয়া সেই লনে অগণ্য সুবেশ-সুবেশা দিশি-বিদেশি নারী-পুরুষ হাতে পানীয়র গ্লাস নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। অনেক মহিলা

* "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

সিগারেটও খেতেন। হোঁদলকুতকুত অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখত হাই-সোসাইটির সেই সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর দিকে হেমন্ত বা শীতের রাতে।

উচ্চতম ও নিম্নতম অবস্থার, শহর এবং গ্রামের অনেকেই সমাজে মিশে, জীবনের এতবছর পেরিয়ে এসেও "হাই সোসাইটি" কাকে বলে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আমার মনে হয়েছে যে, মানুষের সমাজকে উঁচু বা নিচু আখ্যা দেওয়া একদল মানুষেরই কারসাজি। তাদের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষার মান, সাজ-পোশাকের তারতম্য যাই থাকুক না কেন, মানুষ সব জায়গাতেই একইরকম ভিতরে ভিতরে। তার নিরাবরণ নিরাভরণ সত্তাতে কোনোই পার্থক্য নেই। মানুষের সমাজ সব জায়গাতেই কম-বেশি একই রকম। হাই সোসাইটির মানুষেরা যে তৎকালীন আমার চেয়েও কিছু উচ্চকোটির জীব, তা মনে হয় না। এবং কোনোদিনও মনে হয়নি।

লনে, টুনি-বালব জ্বালিয়ে, ককটেল-পার্টি যাঁরাই করেন তাঁরাই যে স্বভাবতই উচ্চকোটির জীব হবেন এমন কথাও হলফ করে বলা যায় না। তখনকার দিনের অর্থবানদের সঙ্গে তাও অধিকাংশরই সম্মানের সংশ্রব কিছু না কিছু ছিলই। আজকে ককটেল-পার্টি দিতে পারলে তো কথাই নেই! অর্থের চেয়ে বড়ো গুণপনা আজ আর দ্বিতীয় নেই। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাটের দশকে অমনটি ছিল না।

পেয়ারী মুখুজ্জে সায়েব তৎকালীন কুলীন ক্যালকাটা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বারংবার "কুলীন" শব্দটি ব্যবহার কেন করছি, তা কলকাতার যে-কোনও নামী ক্লাবের পুরোনো সভ্যমাত্রই নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। কলকাতার একাধিক নামী ক্লাব যে ষাট সত্তরের দশকেও পুরোপুরি অন্যরকম ছিল তাও নিশ্চয়ই পুরোনো সভ্যরা একবাক্যেই স্বীকার করবেন। দোষটা, কোনও বিশেষ ক্লাবের আদৌ নয়, দোষটা সময়ের; বর্তমান সমাজের গড়পড়তা মানুষদের সেন্স অফ প্রায়োরিটির, মূল্যবোধের। এ-নিয়ে অনুযোগ অভিযোগের কোনওই অবকাশ নেই। তাছাড়া করা হবেই বা কার কাছে? করলে নিজেদের বিবেকের কাছেই করতে হয়।

ষাটের দশকের শেষে অথবা সত্তরের দশকের গোড়ার দিকেই সেই মুখুজ্জেবাড়ির বড়ো ছেলে শ্রীদেবেশ মুখুজ্জের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় আমার ক্যালকাটা ক্লাবেরই এক পুরোনো সভ্যর মাধ্যমে। তাঁর আয়কর-সংক্রান্ত ব্যাপারের সূত্রে। দেবেশদার মতো খাদ্যবর্জিত-পানীয়তে বিশ্বাসী, দিলদার, অতিথিপরায়ণ, বন্ধুবৎসল মানুষেরা ক্রমেই এ-পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন।

একদিন, একজনের বাড়ির পার্টিতে দেবেশদার সঙ্গে দেখা হল, আলাপিত হবার দিনকয় পরেই। বাগানের সামনের বারান্দার বেতের চেয়ারে বসেছিলাম। দেবেশদা গুটি গুটি এগিয়ে এসে বললেন, অঃ। তুই? মনে হচ্ছিল বটে তুইই! তবে দূর থেকে ঠিক ঠাহর কত্তে পারিনি। তা, তুই খাচ্ছিস কি? তেঁতুল গোলা জল নাকি?

বললাম, কেন? হুইস্কিই খাচ্ছি।

স্কচ?

দেবেশদা শুধোলেন।

হ্যাঁ। সকলেই তো তাইই খাচ্ছেন।

ছ্যাঃ। ছ্যাঃ। ছ্যাঃ। জাত মারলিরে তুই ছেলে। এক্কেবারে জাত মারলি।

কার? তোমার?

আমি বললাম।

দুসস। আমার কেন? সায়েবদের। আর এই স্কটল্যান্ডের এই জলেরও। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

কেন?

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

কেন নয়? চেয়ারে থেবড়ে বসে বসে তুই অমৃত পান কচ্ছিস। ছ্যাঃ ছ্যাঃ! সায়েবরা কী বলে, জানিস না?

বোকার মতো বললাম, কী?

আরে। সায়েবরা কি কখনও বলে, "হাউ মেনি ড্রিংকস ক্যান উ্য সিট?" বলে, "হাউ মেনি ড্রিঙ্কস

ক্যান উ্য স্ট্যান্ড?" তালে। ওঠ। ওঠ। দাঁড়া। দাঁড়া। দাঁইড়ে ওঠ! কক্কনো বসে বসে খাবিনি। মনে থাকবে তো?

আশ্চর্য রসজ্ঞান ছিল দেবেশদার। হয়তো তাঁর বাবারও ছিল।

কয়েক বছর আগেও ওঁদের বাড়িতে যে উমদা-খানা খেয়েছি, বিশিষ্ট পানীয়ের পর, তার কোনও জবাব নেই। দিলেরি মানুষ বটে!

ওঁর কথা উঠলে, দ্বারিকদার কথাও অবশ্যই মনে আসে। শ্রীদ্বারিকানাথ মিত্র। দ্বারিকদা এবং বউদিকে এবং আরও অনেককে নিয়ে, ওঁর যশিডির বাগানবাড়ি, "চিড়িয়াখানা" নিয়ে, "ঝাঁকিদর্শন" উপন্যাসটি লিখেছিলাম।

দেবেশদার বাবার মতো অনেক বাঙালিরই চা বাগান এবং কোলিয়ারি ছিল এক সময়ে। কোলিয়ারি তো জাতীয়করণের পরে সবই এমনিতেই গেছে। বাঙালির চা বাগান এখনও কিছু কিছু আছে। তবে অধিকাংশই গেছে একই কারণে। মালিকেরা কলকাতায় বসে সানন্দে "রইসি" করেছেন আর কর্মচারীরা কর্মক্ষেত্রে থেকে সব ফুঁকে দিয়েছেন। পায়ের তলা থেকে যখন মাটি সরে গেছে, দুর্ভাগ্যের নদী-গর্ভে যখন সব কিছু বিলীন হয়েছে; তখনই হুঁশ হয়েছে তাঁদের।

ধীরে ধীরে, লক্ষ্মীর এবং গণেশের আরাধক, করিৎকর্মা এবং পরিশ্রমী মাড়োয়ারিরা একে একে সবই কবজা করে নিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দোষ, যাঁরা কবজা করেছেন তাঁদেরই। কমিউনিস্টরাও অবশ্যই বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্যের কম অনিষ্ট করেননি। শুধু অনিষ্টই বা কেন বলব, ন্যক্কারজনক এবং ভ্রান্ত ট্রেড-ইউনিয়ানিজমের এমন কুফল বঙ্গভূমের মতো এ-দেশের অন্য কোথাওই দেখা গেছে বলে জানি না। নিজেরাই নিজের জাতের সর্বনাশ যে এমন সুষ্ঠুভাবে এবং অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়, তা জ্যোতিবাবুরা এমন নিপুণ পারদর্শিতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁদের স্মৃতি, বাঙালি জাতির মস্তিষ্কে চিরদিনই অম্লান থাকবে চোখের জল এবং কপাল চাপড়ানির শব্দের সঙ্গে।

হরলালকারা বাবার প্রথম মক্কেল হয়েছিলেন। তাঁদের দেওয়া একটি হাজার টাকা অথবা একশো টাকার নোট, (সঠিক মনে নেই) বাবা, পেশার জীবনের প্রথম দিনে এনে, অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন মাকে দিয়ে বলেছিলেন, এটা সিঁদুর লাগিয়ে সিন্দুকে তুলে রাখো। আমার পেশার প্রথম রোজগার।

পাশের ঘরে তখন জ্বরগ্রস্ত আমি শুয়েছিলাম। তাই, জানি।

গজানন হরলালকা মশাই সেই নোটটি দিয়েছিলেন। তাঁর ভাইপো প্রভু পরে আমার সঙ্গে আইন পড়ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে। তাঁরা বাড়িশুদ্ধু সকলে বাংলা সাহিত্যের গভীর অনুরাগীও ছিলেন।

পুজোর আগে, বাবা হরলালকাদের দোকান থেকে গুচ্ছের রেডিমেড হাফ-শার্ট ও হাফ-প্যান্ট নিয়ে আসতেন বান্ডিল বেঁধে। সবই "প্রমাণ" সাইজের। বাড়ির চাকর-বাকর, কাজিনস, দাদা-ভাই—যাঁরাই সেই সময়ে থাকতেন বাড়িতে, তাঁদের সকলেই এবং অবশ্যই এই হোঁদলকুতকুতও সেগুলো একে একে গায়ে ও পায়ে গলিয়ে দেখে নিতাম কার গায়ে কোন্‌টা হয়। এবং এইভাবেই আমাদের পুজোর পোশাক নির্ধারিত হত। এই 'সোস্যালিজম' শুধু পুরুষদেরই জন্যে। কাকারা এবং মেয়েরা এবং আমার শিশু ভায়েরা এই "প্রমাণ' মাপের সমাজতন্ত্রের আওতায় আসতেন না।

তখন স্ট্যান্ডার্ড বা অ্যাভারেজ সাইজকে কেন 'প্রমাণ সাইজ' বলা হত তা নিয়ে বাংলা ভাষায় যাঁদের পাণ্ডিত্য আছে তাঁরা গবেষণা করলেও করতে পারেন। কাকারাও সেই কাঙালি-পরিধানে শামিল হতেন না। কারণ, আমার সব কাকাই চিরদিনই ধুতি পরেছেন।

শীতকালে, শিকারে গেলে অবশ্য ছোটোকাকু অ্যামেরিকান আর্মি-ডিসপোজালের খাকি গরম ট্রাউজার পরতেন। পরতেন মানে, সেই বিজাতীয় পোশাক তাঁর নেয়াপাতি ভুঁড়ির সংস্পর্শে এসে যে-বোতামে ঠেকে যেত, সেই বোতামে পৌঁছেই তিনি, বোতামের ছুটি করে, তার উপরে বেল্ট বেঁধে নিয়ে শিকার-কর্ম চালিয়ে দিতেন। নীচের সেই ট্রাউজারের ওপরে আর্মি-ডিসপোজালের দুর্ভেদ্য উইন্ডচিটার জার্কিন, মধ্যে গরম লাইনিং দেওয়া। তার মধ্যে, বন্দুকের ছররা থেকে মায় ছোটো চিতাবাঘের থাবা অথবা ডাঁশ বা হর্স ফ্লাইয়ের কামড় কিছুই ঢুকতে পারত না।

আমাদের পিতৃ-পরিবারে জামা-কাপড়ের বাহুল্যকে চিরদিনই অপচয় ও কুরুচি বলেই গণ্য করা হত এবং এই সংস্কৃতিতে নিন্দনীয় কিছু ছিল বলে সেদিনও মনে হত না, আজও হয় না।

যেহেতু কাকারা ধুতি পরতেন, নানারকম ধুতিও আসত মিলের ও তাঁতের ছিটের হাফ ও ফুলহাতা শার্টের সঙ্গে। সেই ধুতি-শার্টেরও কিছু আমার জন্যে বছরে বরাদ্দ হত। পুজোর মধ্যে এবং কোনও বিশেষ বিশেষ দিনে অনেক কসরত করে সেই ধুতি পরতাম।

ধুতি প্রসঙ্গে মনে এল একটি ঘটনার কথা। সেই ঘটনাই চিরজীবনের মতো আমাকে 'ধুতি-শাই' করে দিয়েছিল। ধরাশায়ীও বলা যেতে পারে।

আমার মাসতুতো ভাই বরিশালের মিহিরডা (ঋভুর প্রথম পর্বে যার কথা বিস্তারিত আছে) একদিন হঠাৎ এসে হাজির। তখন তারা সকলেই দেশভাগের পরে উদ্বাস্তু হয়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতাতে এসে ঠাঁই নিয়েছে মামাবাড়িতে। মামাদের জয়েন্ট-রেসিডেন্সে। ৭/২ হাজরা লেনে। এখন সেখানে মস্ত মালটিস্টোরিড বাড়ি উঠেছে।

সেই সময়ে বড়োলোক বাঙালি মাত্রই "সাহেব" হয়ে যাননি। বাঙালিত্ব কিছু তখনও বেঁচে ছিল। "ক্রিসমাস", "দেওয়ালি"র মতোই রথ, পুজো, ভাইফোঁটা এবং নববর্ষও সববয়সী সব অবস্থার বাঙালির জীবনেই বিশেষ বিশেষ দিন বলে গণ্য-হত। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া নব্য যুগের শিশুদের মতো, তখনকার শিশুরা ড্যাডি-মাম্মিদের জিজ্ঞেস করত না "একলা বৈশাখ"টা (১লা বৈশাখ) কী ব্যাপার?

প্রতি নববর্ষে মা-বাবা এবং অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম সেরে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে যাওয়ার রীতি ছিল প্রণাম করবার জন্যে। এবং প্রত্যেক জায়গাতেই ভালো খাওয়া-দাওয়া এবং প্রাপ্তিযোগ ঘটত। কোথাও টাঁকশাল থেকে সদ্য-বেরুনো ঝকঝকে চাঁদির টাকা। কোথাও বা অন্য কিছু।

আমার বড় মাসিমার বাড়ি ছিল পার্ক সাইড রোডে। দেশপ্রিয় পার্কের পাশে। নববর্ষের দিনে গিয়ে প্রণাম করলেই আমার সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত বড়োমাসিমা আমাদের প্রত্যেককে একটি করে চাঁদির টাকা দিতেনই। সেই এক টাকার মূল্য ছিল আজকের একশো টাকা। আর ভাইফোঁটা তো একটা বিশেষ উৎসবের দিন ছিল। মামাতো মাসতুতো ভাইবোনেরা সকলে মিলে এবং মাসতুতো ভাই-বোনেদের খুড়তুতো-পিসতুতো-মাসতুতো ভাই-বোনেদের (শিব্রাম চক্রবর্তীর ভাষায় "কিসতুতো" ভাই-বোনেদের বাদ দিয়ে) ধরলে, প্রায় জনা পঁচিশ-তিরিশ হতাম আমরা।

দারুণ খাওয়াও হতো ফোঁটা দেওয়ার পর্বর পর সে-বাড়িতে।

তখন ডোভার রোডের বাড়ির একতলার একটিমাত্র ঘর আমাদের দখলে ছিল। দোতলা তেতলা ছিল আমাদের। একতলার বাকি ঘরগুলি ভাড়া দেওয়া ছিল একজন তরুণ বাঙালি ব্যবসায়ীকে। তিনি তাঁর ছোট্ট পরিবার নিয়ে সেখানে থাকতেন। ঢাকার নারায়ণগঞ্জ নিবাসী সেই নারানদা, শ্রীনারানচন্দ্র রায় ছিলেন কবিতা-লেখা, সাহিত্যমনস্ক ব্যবসায়ী এবং স্বভাবতই ব্যবসায়ে অসফল। সেই কারণেই, পড়াশুনোতে অসফল অসমবয়সী আমার সঙ্গে তাঁর দারুণ এক সখ্য গড়ে উঠেছিল।

একতলার ওই ঘরটি প্রথম দিকে বাবা তাঁর পেশার কাজের জন্যে ছুটির দিনে ব্যবহার করতেন কিন্তু পরে তার জিম্মাদার হই আমিই। পড়া-পড়া-খেলা, গান-বাজনা, সবই ওই ঘরেই হত। তবে আড্ডা হত না। "আড্ডা" বলতে যা বোঝায় তা বাড়িতে বা "রকে" বা অন্যত্রও কখনওই প্রায় দিইনি। কারণ, আড্ডার বিরুদ্ধে বাবার অনুশাসন ছিল অত্যন্তই কড়া।

অবশ্য ওই একই কারণে বন্ধু-বান্ধব আমার ছেলেবেলা থেকেই কম। বন্ধুত্বের সবচেয়ে বড়ো উপাদান হল সময়। যার দেওয়ার মতো সময় নেই, তার বন্ধু না থাকাটাই স্বাভাবিক। বন্ধু যে নেই, সেজন্যে কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপও নেই।

আজও স্পষ্ট মনে আছে, ওই ঘরের প্রসঙ্গে যে, কলেজে ভরতি হওয়ার পর আমার এক বছরের সিনিয়র, বিজ্ঞানের ছাত্র কিন্তু বন্ধু, অর্ঘ্য সেন ওই ঘরেই বসে একটি গান শুনিয়েছিল—যে গানটি অন্য কারও গলাতেই গত চল্লিশ বছরে আর তেমন ভালো লাগল না। একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। অর্ঘ্য তখন

অতুলপ্রসাদ বা রজনীকান্তর গান গাইত না। শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত। গানটি ছিল "এই সকাল বেলার বাদল আঁধারে, আজ বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে।" আজও যেন কানে বাজে গানটির প্রতিটি কলি। চোখের সামনে দেখতে পাই, হাতা-গোটানো খদ্দরের ছাইরঙা শার্ট ও ধুতি পরে বসে অর্ঘ্য গাইছে, তার সুরেলা ও বিশেষত্বপূর্ণ গলায়।

ভাঁজ-করা কাচের-জানালাটা খুলে দিলে তার একটি ভাঁজের কাচের উপরে পথচলা মানুষের প্রতিসরণ ফুটে উঠত। যদি নন্দাকে একটিবার দেখতে পাই, তার অজানিতে; সেই আশাতে চেয়ে থাকতাম বাইরের দিকে পেছন ফিরে বসে। ওই কাচের ফালিটির উপরে চোখ রাখতাম সব কিছু করার ফাঁকে ফাঁকে।

নন্দাদের দেশ ছিল সিলেটে। ওরাও উদ্বাস্তু। কালোর মধ্যে কাটা-কাটা চোখ মুখ। কথাতে সিলেটি টান ছিল। সিলেটি বদ্যি ছিল ওরা। পড়াশোনাতে খুব ভালো। ও আমাকে পাত্তা দিত না কোনওদিনই। মুখে বা চিঠিতে অবশ্য আমার ভালোলাগা কখনও প্রকাশও করিনি। হয়তো চোখে করতাম। কিন্তু স্কুলে পড়া, লেডিজ-সাইকেলে চড়া, নির্গুণ, নিরূপ হোঁদলকুতকুতকে কেনই বা পাত্তা দেবে ওর মতো শ্রীমতী?

ওকে একটু দেখতে পেলেই সুখী হতাম। তা সামানাসামানিই হোক, কী জানালার কাচের উপরে পথ দিয়ে চলে যাওয়া প্রতিফলনেই হোক।

আমার মধ্যে বোধহয় একজন "ভয়্যার" ছিল।

পরবর্তীকালেও লুকিয়ে দেখার প্রতি আমার এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল বলে মনে হয়েছে আমার। "ভয়্যার" হতেও আর্টিস্ট হতে হয়, আমার মতে। ভয়্যারিজম-এর সঙ্গে পার্ভাসিটির কোনও সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয় না। অত্যন্ত সূক্ষ্ম রুচির মানুষেরাই ভয়্যার হন হয়তো!

সেই সকালে, সম্ভবত কোনও রবিবারের সকালে, একা-ঘরে বসে পড়া-পড়া খেলা করছি, এমন সময়ে, ভেজানো-দরজা ঠেলে রান্নাঘরে-ঢোকা দুপুরের বেড়ালের মতোই "মিহিরডা" প্রবেশ করল। পুজোর পরে ও বিজয়া করতেই এসেছিল সম্ভবত ঠিক মনে নেই। সময়টা ছিল কালীপুজোর আগে আগে।

ও বলল, তরে একখান জিনিস শিখামু্য। ফরডাইস লেনের দাদার কাছ থিক্যা শিখ্যা আইছি। এক্কেরে, যারে কয় হাতে গরম।

কী জিনিস?

পড়াশোনা করার ইচ্ছে থাকলে কী হবে' এই পথ দিয়ে নন্দা যাচ্ছে, পরমুহূর্তে এই মিহিরডা এসে ঘরে ঢুকল; আমার আর দোষ কী?

বই থেকে মুখ তুলে, অবাক হয়ে আমি বললাম।

ধুতি পরন। তর তো আবার কাছাখান ক্যাবলই খ্যুইলা যায়। ভাল কইর‍্যা শিইখ্যা ল' দেহি।

শুধু কাছা কেন? কোঁচাও যায়।

আমি সখেদ স্বগতোক্তি করলাম।

হঃ। জানি। তা, একখান ধুতি লইয়া আয় দেহি দৌড়াইয়া উপর থিক্যা। তরে শিখাইয়া যাই। ভাইফোঁটা ত আইয়াই গেল গিয়া। মাসিমারে কইস না য্যান আবার যে আমিই চাইতাছি। তর পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটাইতাছি ভাববনে।

ছাড়! পড়াশোনা তো করছি লংকা! কিন্তু ধুতি চাইতে গেলে তো মা শুধোবেনই।

তবে, ছাদে যাইয়া শিগগির তগো পাঁচুর বা ঠাকুরের একখান ধুতি লইয়া আয়। আমার টাইম নাই নষ্ট করনের। ভালো কইর‍্যা শিইখ্যা ল'। ভাইফোঁটার দিন পইর‍্যা দেখিসানে। এক্কেরে এস্মার্ট বইল্যা এস্মার্ট; নিজেরে চিনতে পর্যন্ত পারন কঠিন হইব। বুঝলি কি? হঃ।

মিহিরডার কথা। অমান্যও করতে পারি না।

মিহিরের মতো পরোপকারী ও ভালো ছেলে হয় না। তাছাড়া আমাকে ভালো বাসতও খুব। আজও বাসে। যদিও আমাদের জীবনে আর সাযুজ্য নেই।

পাঁচুর ধুতি নয়, অনুপস্থিত ছোটোকাকুর একখানি ধুতি নিয়ে এলাম, আলনা থেকে। আমাদের শোবার ঘরখানি আশ্চর্যজনকভাবে খালি ছিল সেই মুহূর্তে। কেউ জানতেও পেল না।

মিহরডা নীচের ঘরে ধুতির দৈর্ঘ্য সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে ঠিক মধ্যিখানে গিঁট দিল, তারপরে সোফায় থেবড়ে বসে-থাকা হাঁদা বরের মতো আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, রীতিমতো রানিং-কমেন্টারি করতে করতে হাতে করে ডেমনস্ট্রেশন দিতে লাগল।

বলল, এই আধখান, বুঝলি কি? ভালো কইর‍্যা দ্যাখ, এই আধখান, ডানদিকের ভাগখান, এমনি কইর‍্যা কোঁচাইয়া লইয়া এমনি কইর‍্যা পিছনে লইয়্যা, এমনি কইর‍্যা গুঁইজা থুবি পিছনে।

পরক্ষণেই কনফার্ম করল, বুঝছস কিছু?

মাথা নাড়িয়ে বললাম, হুঁ।

হ! এই আধখান হইয়া গেলে তারপর হেই আধখান।

বলেই...আবারও পুনরাবৃত্তি করল।

ধতি পরানো হলে বলল, ক্যামন দ্যাখাইতাছে তাই ক? ফুর-ফ্যরা লাগতাছে না? কীরে? কথা কইস না ক্যান কার্তিক?

সত্যিই অভিভূত হয়ে গেলাম। ধুতি পরা যে এত সহজ তা আগে ভাবতেও পারিনি।

কিন্তু মিহিরডার কাছে ওইরকমভাবে ধুতি পরার কায়দা শেখাই কাল হল আমার।

ভাইফোঁটার দিন সকালে নব্য-কায়দাতে ধুতি পরে গেছি, বড়োমাসির বাড়িতে। সার দিয়ে বসেছি বড়ো থেকে ছোটো ভায়েরা, মস্ত হলঘরের এপাশ থেকে ওপাশে। বোনেরা ও দিদিরা কুচো-কাঁচা থেকে বড়দিদিরা, এক-এক করে এসে সকলকে ফোঁটা দিয়ে চলে যাচ্ছে ও যাচ্ছেন। সবসুদ্ধ জনা পনেরো-কুড়ি বোন ও দিদি।

বোনেদের মধ্যে, প্রায় প্রত্যেকেই, দেখি আমাকে ফোঁটা দিতে এসেই ফিক-ফিক করে হেসে দিচ্ছে।

কেউ কেউ-বা আমার সামনেই হাঁটু গেড়ে বসে ফোঁটা দিতে দিতে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কী হল! বা, হতে পারে!

ভাবছিলাম, মিহির-মাস্টেরের ধুতি পরার কায়দা কি এতই অভিনব যে, প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে রি-অ্যাক্ট করছে? মুগ্ধ হয়ে গেছে? প্রত্যেকে?

বড়োমাসিমা সেবারে ধুতি আর পাঞ্জাবি দিচ্ছিলেন আমাদের প্রত্যেককে। ভাগলপুরি সিল্কের পাঞ্জাবি।

কুচো-কাঁচা এবং ছোটোদের আসা শেষ হলে দিদিরা একে একে আসতে আরম্ভ করলেন—তাঁরা অধিকাংশই মাসতুতো ভাই-বোনেদের খুড়তুতো-পিসতুতো বোন। তাঁরাও দেখলাম হাসছেন, নয়তো মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন।

কী যে হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

বড়ো দিদিদের মধ্যে ছোটো তিন-চারজন দিদি আসার পর এলেন অঞ্জলিদি। সেই অঞ্জলিদি, বড়োমাসিমার তৃতীয় কন্যা, উত্তর কলকাতার বিখ্যাত স্বর্ণ-ব্যবসায়ী সরকারদের বাড়ি যাঁর বিয়ে হয়েছে। বরিশালে স্বল্পদিনের জন্যে বেড়াতে-যাওয়া যে-অঞ্জলি দিদিকেই দেখে আয়কর-বিভাগে বাবার সহকর্মী, অনুজ আলমকাকু, যিনি বরিশালে আমাদের জর্ডন-কোয়ার্টার্সের বাড়িতেই থাকতেন; একেবারে অথৈ প্রেমে পড়েছিলেন। যাকে বলে, হেড ওভার হিলস। কিন্তু মুসলমানের ছেলের সঙ্গে হিন্দুর মেয়ের বা হিন্দুর ছেলের সঙ্গে মুসলমানের মেয়ের বিয়ে তো দূরস্থান, প্রেমও সেকালে অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য ছিল। আলমকাকু হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন বড়ো মাসিমারা ফিরে যাওয়ার পরে।

ততদিনে আমি রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়িতে ছোটোকাকুর ব্যর্থ-প্রেমের কান্না দেখলেই বুঝতে পারতাম কোন্‌টা পরীক্ষা ফেলের, কোন্‌টা মাথার যন্ত্রণার আর কোন্‌টা ব্যর্থ-প্রেমের। বলতে গেলে, ব্যর্থ-প্রেমের উপরে অথরিটি-বিশেষ হয়ে গেছিলাম। তাই, নিশ্চিত জানি!

কালো হলেও অপরূপ সুন্দরী, ছিপছিপে, দারুণ-ফিগারের অঞ্জলিদিদির মনের খবর আমি রাখতাম না। তাছাড়া বড়োমাসিমাদের বাড়ির সকলেই বেশ কনসার্ভেটিভও ছিলেন। বাবার তুলনাতে তো অবশ্যই। তাই অত্যন্ত সুদর্শন, দীর্ঘ, ফরসা, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, সরকারি চাকুরে আলমকাকুর প্রতি অঞ্জলিদিদির মন দ্রবীভূত যদি হয়েও থাকত, তবুও ব্যাপারটায় ওইখানেই ইতি হয়ে গেছিল। সব তরফের স্বস্তির মধ্যে।

আমি অঞ্জলিদিদির খুব বড়ো অ্যাডমায়ারার ছিলাম। আজকেও সেই প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ভাইফোঁটার দিনের সকালের চান-করে ওঠা প্যাটভাঙা তাঁতের শাড়িপরা, চুল-খোলা, সুগন্ধি অঞ্জলিদির সালঙ্কারা চেহারাটা চোখে স্পষ্ট ভাসে। অঞ্জলিদি আমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে সামনে ঘিয়ের প্রদীপ, ধান-দুর্বো সাজানো ঝকঝকে রুপোর থালাটি রেখে, "দ্বিতীয়াতে দিয়া ফোঁটা/তৃতীয়াতে দিয়া নিতা/ না যাইও ভাই যমদুয়ারে। যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা"তে আসার আগেই আতঙ্কগ্রস্ত গলাতে চাপা স্বরে বলল, "এই ছেলে!"

অঞ্জলিদির চোখ অনুসরণ করে জোড়াসনে-বসা বুদ্ধদেবের মতো ধ্যানমগ্ন আমার শরীরের মধ্যভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করামাত্রই মনে মনে বললাম, "হারামজাদা"!

হারামজাদা মিহিরও অকুস্থলে অবশ্যই হাজির ছিল। সে ধুতি-জনিত কিছু একটা অঘটন যে ঘটেছে তা আঁচ করেই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, দেওয়ালের আনন্দময়ী মার ছবির দিকে মনোযোগ সহকারে চেয়ে রইল, আমাকে নিরানন্দসাগরে ভাসিয়ে।

বড়োমাসিমার বাড়ির সকলেই আনন্দময়ীমার বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

মিহিরডার ধুতি পরানোর কায়দাতে কোনও ভুলই ছিল না। সে শুধু একথা আমাকে বলতে ভুলে গেছিল যে, ওই নব্য-কায়দাতে ধুতি পরলে অন্তর্বাস পরাটাও অবশ্যই দরকার।

ধুতির সঙ্গে, যে-ধরনের অন্তর্বাস পরতে হয়, তা যাঁরা অ্যাডাল্ট এবং নিয়মিত ধুতি পরেন তাঁদেরই শুধু থাকে। বছরে মাত্র তিন চার দিন ধুতি পরা কিশোর—আমার তা থাকার কথা ছিল না। ফলে, মিহিরডা-নির্দেশিত দু-ভাগ করা ধুতি দুদিকে চমৎকার ভাবেই শোভা পাচ্ছিল যদিও কিন্তু মধ্যবর্তী স্থলভাগ অর্থাৎ যে স্থানটুকু ঢেকে রাখার জন্যেই অত "স্মার্টলি" ধুতি পরা; সেটুকুই আঢাকা পড়েছিল।

অঞ্জলিদির "এই ছেলে!" বলার সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেকে সবেগে এবং সমূলে উৎপাটিত করে ঘিয়ের প্রদীপ, ধান-দুর্বো সবই প্রায় উলটে ফেলে, অগ্নিকাণ্ড লাগাতে লাগাতে, না-লাগিয়ে, পার্কসাইড রোডের দোতলা থেকে সেই যে আফ্রিকান ইম্পালা অ্যান্টিলোপের মতো লাফ মেরে দৌড় লাগালাম, তেমন কেউ কাউকে ইলোপ করার সময়েও লাগায় না।

থামলাম এসে, সোজা ডোভার রোডে নিজ-নিকেতনে। হোম, সুইট হোমে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে মিহির এল আমার প্রাপ্য নতুন ধুতি আর পাঞ্জাবি প্যাকেটে করে নিয়ে। সঙ্গে মিষ্টির প্যাকেটও। বলল, স্লাইট ভুল হইয়া গেছিল আমার। ক্ষমা কইর‍্যা দিস। বোঝছস!

তারপর বলল, তুইও আছস! তর এত লজ্জা পাওনের আছিলটা কী? খামখা ভালো ভালো খাবারগুলান ফ্যালাইয়া দৌড় লাগাইলি ক্যান? এক্কেরে ছাগল তুই। গলদা-চিংড়ির মাথা ভাজা আর নারকোল দিয়া মালাইকারিটা যা রাঁধছিল না আজ বিজলীদি! কী কমু তরে। বরিশালের ইচা মাছের কথা মনে হইতে আছিল আমার। খুব ঠইক্যা গেলি গিয়া তুই।

তারপর ফাইনাল কনক্লুশনে এসে দার্শনিকের মতো বলল, যে-বস্তুখান পূর্বে কোনওদিনও হ্যারায় দ্যাহে নাই, তা দেইখ্যা হ্যাগো অইল গিয়া বিমল আনন্দ, আর তর হইল গিয়া লজ্জা! হঃ। ক্যালকেশিয়ান ছাগল আর কারে কয়! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ!

এইমাত্র খবর পেলাম যে, দেবেশদা চলে গেছেন পরপারে। যখন আমি নিজে অসুস্থ হয়ে উডল্যান্ডস নার্সিং হোমে ছিলাম।

বাবার কড়া শাসনে "আড্ডাবাজি" করতে পারিনি বটে, তবে বাবার হাত ধরেই প্রকৃতির বিভিন্ন আঙিনাতে শিশুকাল থেকেই যে ঘুরে বেড়াতে পেরেছি, একথা শত মুখে স্বীকার না করলে বাবার প্রতি অবিচার এবং পরম অকৃতজ্ঞতাও হবে।

যে 'সম্পত্তি' আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি, তা খুব কম বাঙালি-সন্তানই পেয়েছেন। এর কোনও অর্থমূল্য হয় না।

অমন বাবা-মা অনেক জন্ম তপস্যা করলেই কেউ পায়।

মা ছিলেন নারীত্বের সংজ্ঞা আর বাবা ছিলেন পৌরুষের সংজ্ঞা। পুরুষ ও প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে জানার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল আমার এবং এই দুই 'ভাব' এই যে সম্পৃক্ত, পরিপ্লুত হতে পেরেছি এই জীবনে, তা ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ বলতে হবে।

কোয়েলের কাছে উপন্যাসের প্রথমে চারটি পংক্তি উদ্ধৃত আছে :

"I had an inheritance from my father
It was the moon and the Sun
I can travel throughout the World now
The spending of it is never done."

—এর চেয়ে সত্য স্বীকারোক্তি আমার পক্ষে আর হয় না।

এই চারটি পংক্তি একটি স্প্যানিশ গানের পংক্তি। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে যখন স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তখন প্রখর শীতের এক শেষ রাতে আগুনের সামনে গোল হয়ে বসে-দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা গিটারে সুর তুলে নাকি ওই গানটি গাইছিলেন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের একটি জীবনীতে ওই গানটির হদিস পেয়েছিলাম।

শীত পড়লেই, কলকাতাতে, প্রায় প্রতি রবিবারেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে গুলি-বন্দুক আর জলের বোতল নিয়ে বেলা বাবোটা নাগাদ বাবা গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে পড়তেন সোনারপুরের দিকে। ছোটো ভায়েরা আমার চেয়ে অনেকই ছোটো ছিল তাই তাদের নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু অন্য কাউকেও নিতেন না।

কেন?

তা বাবাই জানতেন। আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

সোনারপুরের আগে "মালঞ্চ" ফাঁড়ি যেখানে, সেখানে বাঁদিকে মোড় নিয়ে কাঁচা রাস্তাতে ঢুকতাম আমরা। তখন ঢাকুরিয়ার পর থেকেই পথ অতি নির্জন ছিল। যাদবপুরে তো পথের পাশের পুকুরে ও ডোবাতে ডাহুক ও অন্যান্য পাখিও ছিল। এই কলকাতা কত অন্যরকম ছিল! আজকে ভাবলেও মন খারাপ হয়ে যায়। মানুষ নিজেই নিজের ভবিষ্যৎকে দলিত-পিষ্ট করল, জাগতিক, আত্মিক, পারমার্থিক, সবরকম সর্বনাশই তার সম্পূর্ণ করল সে নিজ হাতেই, অন্যের বিন্দুমাত্র ইন্ধন অথবা সাহায্য ব্যতিরেকেই।

সে-অময়ে পুরো অঞ্চলটি জুড়েই বহু বর্গ মাইলের 'বাদা' ছিল। বিধানবাবুই সেইসব অঞ্চল "রিক্লেম" করেন। জলাভূমি বুজিয়ে।

সে পথে কিছুটা গাড়িতে গিয়ে, বাদার একেবারে মুখে গাড়ি রেখে, কাচ-টাচ তুলে দিয়ে, "লক" করে দিয়ে দুজনে দুটি আলাদা তালের ডোঙায় ভেসে পড়তাম।

বাবা আগেই পোস্টকার্ড লিখে দিতেন মরশুমের প্রথমে। তারপরে তো মুখেই বলতেন। তখনও প্রতি সপ্তাহ-শেষেই বহরমপুরে যেতে হত না বাবাকে। তাই প্রতি রবিবারেই যাওয়া সম্ভব ছিল।

প্রথম প্রথম তালের ডোঙাতে চড়তে খুবই অসুবিধে হত। অর্থনীতির "জার্গন"-এ বলতে গেলে বলতে হয়, পৃথিবীর সব জলযানের মধ্যে তালের ডোঙাই সম্ভবত মোস্ট "আনস্টেবল ইকুলিব্রায়ম"—এর জলযান। দিশি-বিদেশি বহুধরনের জলযানে চড়ার অভিজ্ঞতা থেকেই এই মতকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে অসুবিধে দেখি না কোনও।

ডাঙা ছেড়ে জলের ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতেই সম্পূর্ণ এক অন্য জগতে সেঁধিয়ে যেতাম। সেই জগৎকে বর্ণনা করি তেমন ভাষা যে আমার নেই! জলে ভাসার পরই দু'নৌকো দুদিকে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। লম্বা একটি বাঁশ দিয়ে (লগি) ডোঙা চালাত পরান, হারান, বিশে, কলিমুদ্দি, এরফান অথবা মকবুলেরা। একেকদিন একেক জনে। "দোকনো" ভাষাতে কথা বলত তারা। যে ভাষাতে, "সারেং মিএগ্রা" লেখা।

তারা তৈরি হয়েই থাকত ধুতি বা লুঙ্গি গুটিয়ে, ডোঙার সরু দিকটাতে, সামনে। আর যাত্রীরা থাকতাম চওড়া দিকটাতে, মানে, গুঁড়ির দিকে। ওদের গায়ে জামা রাখত না, জামা দেখে পাখি উড়ে যাবে বলে। তাছাড়া, পরিশ্রমের জন্যে ওদের শীতও লাগত না। আমাদের গায়ে থাকত খাকি অথবা জলপাই-সবুজ জামা।

লগি একেকবার নীচের পাঁকে গুঁজে দিয়ে তাদের ছিপছিপে শরীরের সমস্তটুকু ভার দিয়ে পেছনে ঠেলা মারত তারা, আর ডোঙা এগিয়ে যেত সরসর করে জলে। লগিটা, জল থেকে টেনে তুলে আবারও ফেলত জলে। বারবার। একবার ডানে আরেকবার বাঁয়ে। লগি তুলতেই লগি বেয়ে জল ঝরত। লগির সঙ্গে কখনও উঠে আসত দলদলির হলুদ-সবুজ ঝাঁঝি কখনও-বা হাঁসের বা অন্য জলপাখির ভেসে যাওয়া পালক। বাদাময়, বরিশালের হোগল-বাদারই মতো, তবে, ছাড়া ছাড়া, ঘাস বন ছিল।

শীতের মিষ্টি-মিষ্টি রোদ, ওপরের সুনীল আকাশ আর নীচের নীলচে-কালচে-সবজে-রুপোলি জলের জলজ রাজ্যে পৌঁছে মনে হত কলকাতাকে কত দূরেই না ফেলে এসেছি! অথচ জোরে গাড়ি চালিয়ে ছুটির দিনে ডোভার রোড থেকে দুপুর বারোটার সময়ে বেরিয়ে আধঘণ্টার বেশি লাগত না সেখানে পৌঁছোতে। ফেরার সময়ে অবশ্য সময় অনেক বেশি লাগত ছুটির দিনে। ভিড় হয়ে যেত রাস্তাতে। গাড়ি ও ট্রাকের সংখ্যাও বাড়ত। গড়িয়ার সরু লোহার ব্রিজ পেরিয়ে যেতে-আসতে হত।

পানকৌড়ি বসে থাকত নিঝুম-দুপুরে। জলের মধ্যের জেলেদের পুঁতে-রাখা বাঁশের খোঁটাতে। নিশ্চল হয়ে। যেন কত বড়ো দার্শনিক। এই সব বাদাতে কাম পাখি বা কায়মা, আশ্চর্য সুন্দর সবুজে-বেগুনিতে মেশা গা আর লাল মাথার রেড-হেডেড মুরহেন, কম ছিল। বেশি ছিল, কোবরা; বহরমপুর কৃষ্ণনগরের বিলে-বাদায় যাদের বলে, ডাইকল (Coot)। কালো চকচকে শরীর, সাদা ঠোঁট। জলের উপরে পায়ে পায়ে জল-ছড়া দিয়ে নিচু হয়ে তাদের উড়ে যাওয়ার ভঙ্গিটি দেখার মতো ছিল। এরা ছাড়াও আসত অগণ্য পরিযায়ী পাখি। নানরকম হাঁস। Teals! কমোন টিল, কটন টিল, গার্গনি, পোচার্ড, পিন-টেইল।

বারোমাসের বাসিন্দা ছিল, পানকৌড়ি, জলপিপি ও ডুবডবা বা DABCHICK. জলে যারা ডোবে আর ওঠে।

পরিযায়ী পাখিরা আসত বটে, তবে বড় নদীতে, যেমন গঙ্গা, তিস্তা, মহানদী, নর্মদা এবং ওড়িশার চিলকা হ্রদে প্রতি বছর যেসব পরিযায়ী হাঁস ও রাজহাঁসেদের দেখা যায়, তারা এইসব বিলে-বাদাত আসত না কখনওই। যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাইবেরিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ান সোয়ান, সোনালি বাহমনি ডাকস, বা চখা-চখি, গিজ ইত্যাদি।

'সারেং মিএগ্রা'—প্রকাশক মিত্র ঘোষ প্রাঃ লিঃ

বাদার মিশ্রগন্ধী নিস্তরঙ্গ জলকে, মনে হত, প্রকাণ্ড একটি আয়না। তার ওপরে ছায়া পড়ত আকাশের, ছায়া পড়ত উড়ে-যাওয়া জল-পাখির ঝাঁকের, একলা কাঁকপাখির, জড়ামড়ি করে দাঁড়িয়ে-থাকা জল-ঘাসের; আর সেই নিথর উজ্জ্বল আয়নাকে, শীতের ওম-ধরা দুপুরে হিরে যেমন কাচ কাটে, তেমনই দ্বিভাগ করে কেটে চলে যেত সাপ। জলের ওপরে শুধু তার মাথাটিই দেখা যেত। আর তার পেছনে দ্বিখণ্ডিত আয়নার দু'খণ্ড ক্রমশই তরঙ্গিত হতে হতে বিস্তৃত হতে থাকত; নিঃশব্দে। দূরের পরিযায়ী বিদেশি পাখির ঝাঁকের স্বগতোক্তির সঙ্গে মিশে যেত ডোঙা-চালানো, দিশি নারান, হান্নান, কলিমুদ্দিন বা মকবুলের চাপা স্বগতোক্তি। লগি ফেলার আর লগিতোলার আর লগির সঙ্গে ডোঙার স্পর্শের সামান্য কেঠো-শব্দতেই ছিদ্রিত, আলোড়িত হত দিনমানের সেই অপার্থিব গভীর ভাবগম্ভীর জলজ নৈঃশব্দ।

শিশুকাল থেকে বিলে-বাদায়-নদীতে-খালে, পাহাড়ে-জঙ্গলে অনেকই ঘোরার, অগণ্য রাত-দিন কাটাবার সৌভাগ্য, প্রধানত আমার বাবারই দাক্ষিণ্যে হয়েছিল বলেই জেনেছিলাম যে নৈঃশব্দের চেয়ে বড়ো শব্দ আর কিছুই নেই। মৌনী মানুষই বাচাল মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বাঙ্ময়। এ এক পরম জানা। নিবিড়, নিশ্চিদ্র অন্ধকার আর গা-ছমছমে নৈঃশব্দকে জীবনে যাঁরাই দীর্ঘদিনের সঙ্গী করেছেন, শুধু তাঁরাই জানবেন, অন্ধকার এবং আলোর নৈঃশব্দের এবং স্বাতন্ত্র্য এবং পারস্পরিক সম্পর্কর কথা। তাদের বৈপরীত্যর তীব্রতার কথাও।

প্রতি বছরই এপ্রিলের গোড়াতে, 'ফিনান্সিয়াল ইয়ার' শেষের টাইম-বারিং অ্যাসেসমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশনের রাত আটটা-ন'টা অবধি হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরই বাবা কোনও না কোনও না কোনও জঙ্গলে যেতেনই। সঙ্গে আমাকেও নিতেন। স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন ও সামনে পরীক্ষা বা টেস্ট থাকলেও মায়ের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও নিয়ে যেতেন।

বলতেন, জীবনে "শুধুই পড়াশোনো" কোনওই কাজে লাগে না। "স্কোয়ার" হতে হবে।

"স্কোয়ার" হতে গিয়ে রেকটাঙ্গুলার হয়ে গেলাম এবং জীবনে সেই "রেকট্যাঙ্গল" কোনও কাজেই যে এল না, এটাই দুঃখের কথা।

চিলকা-হ্রদে যাওয়া হত ওরই মধ্যে, সময় করে; ফেব্রুয়ারিতে। পাখি থাকতে থাকতে। আর পাখি বলে পাখি! পৃথিবীর কোন্ প্রান্ত থেকে না তারা উড়ে আসত! আফ্রিকান ফ্লেমিংগোর ঝাঁক, তাদের গোলাপি, লম্বা লম্বা পা আর সাদা-গোলাপিতে মেশানো গা নিয়ে যেদিকে থাকত, সেদিকের জলকেই গোলাপি দেখাত। চখা-চখিরা যেদিকে থাকত, সেদিকটা সোনালি হয়ে যেত।

মস্ত নৌকোতে আমরা কাটাতাম চার-পাঁচদিন। ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া, দিনের বেলায় 'পাল' হত আর রাতের বেলা 'ছই'। তারই নীচে রাতের শিশিরের হাত থেকে বেঁচে শোওয়া। নৌকোতেই খাওয়া-দাওয়া।

চিলকা-হ্রদেরই মধ্যে ছিল পারিকুতের দ্বীপ। রাজার শুটিং-লজও ছিল সেখানে। একদিকে দেখা যেত "বড়কুল"-এর ডাক বাংলো। সেদিকে জল খুব গভীর।

এখন "বড়কুল"-এ মস্ত ট্যুরিস্ট লজ হয়েছে সেখানে।

আর ছিল, ছরপড়িয়া। সমুদ্র আর চিলকা হ্রদের মধ্যের বিভাজক। সমুদ্রের জল আর ঢোকেও না, বেরোয়ও না চিলকা থেকে। তাই তার জল অমন লবণাক্ত। ছড়পড়িয়ার মধ্যে মধ্যে ছোটো বড়ো বালির টিলা। ঘাস বন সেই ঘাস বনে অগণ্য খরগোশ ছিল। আর ছিল কয়েক ঝাঁক কৃষ্ণসার হরিণ (BLACK BUCK)। একবার, তখন নাইন-এ বা টেন-এ পড়ি, বহু দূর থেকে, অত্যন্ত দ্রুত ছুটে-যাওয়া একটি কৃষ্ণসার হরিণ থার্টি-ও-সিক্স রাইফেল দিয়ে শিকার করে, বাবা এবং বাবার বন্ধুদের কাছে খুব প্রশংসিত হয়েছিলাম।

বাড়িতে বাবার সঙ্গে বাক্যালাপ ছিল না। যা "কমিউনিকেশন" তা সবই ছিল মায়েরই মাধ্যমে। কিন্তু বাড়ির বাইরে, বিশেষ করে শিকারে গেলে বাবা খুবই কাছের মানুষ হয়ে যেতেন। বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন "গুডশট। কনগ্র্যাচুলেশনস।"

রংপুর, বরিশাল, দেওঘর, মধুপুর, মামাবাড়ির দেশ গিরিডি, কোডারমা এবং তার সংলগ্ন বন-পাহাড়, রাঁচি-পালামৌ, নিম্ন-আসামের বিভিন্ন জায়গা, ওড়িশার অগণ্য জায়গা ছাড়াও,

বিন্ধ্যাচলের নিসর্গও আমার ওপরে খুব প্রভাব ফেলেছিল। বিন্ধ্যাচলের গঙ্গার ঘাটের অশ্বত্থগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমার কেবলই অদেখা ভাগলপুরের কথা মনে হত, মনে হত শরৎচন্দ্রর কথা।

কেন, জানি না।

প্রত্যেক জায়গারই আলাদা আলাদা ও নিজস্ব সৌন্দর্য থাকে। কেউই কারও চেয়ে কম নয় যেমন থাকে, প্রত্যেক ঋতুর।

বাবা কবি ছিলেন না কিন্তু তাঁর রুক্ষ বহিরাবরণের আড়ালে একটি প্রকৃতিমুগ্ধ মন ছিল। গান গাইতেন না কিন্তু গান ভালোবাসতেন। তবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নয়। বাবার সঙ্গে আমার চরিত্রের তফাত ছিল অনেক এবং অনেক রকম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা স্পষ্টতরও হয়েছিল।

বাবার "ছায়া" যে হইনি, সেটা ভালো হয়েছে কি মন্দ, তার বিচার করবেন অন্যে। সে বিচারের ক্ষমতা আমার নেই। দায়ও নেই। তবে বাবার ক্ষমা পেয়েছিলাম।

বিন্ধ্যাচলে আমরা প্রায়ই যেতাম শীতে, হাওয়া-বদল করতে। ওখানকার জল বিখ্যাত। যেতাম অবশ্য পুজোর সময়েই বেশি। তাড়াতাড়ি পুজো পড়লে, বেশ গরমই থাকত। বিন্ধ্যাচলে থাকার মতো ভালো ভাড়া বাড়ি বিশেষ ছিল না একটি ছাড়া। সে বাড়িটি আবার সব সময়ে পাওয়াও যেত না, তার চাহিদা এতই বেশি ছিল। কিন্তু তাতে আমার নিজের কিছুমাত্র যেত-আসত না। কারণ, সকাল থেকে সূর্যাস্ত এবং কখনও সূর্যাস্তর পরও বাড়ির বাইরেই থাকতাম। হয় পাহাড়ের ওপরের মালভূমিতে, নয়, মালভূমি পেরিয়ে গভীর ঘন-তৃণাবৃত এবং টিলাময় উপত্যকায়; যেখানে নীলগাইদের দল ছিল কয়েকটি, চিতাবাঘ, খরগোশ এবং বন শুয়োরের অনেক "ঝুন্ড" ছিল। তাছাড়া ময়ূরও ছিল অগণ্য। আর পাহাড়ের ওপরের ছাড়া-ছাড়া ঝাঁটি জঙ্গলে-ভরা মালভূমিতে ছিল এক ঝাঁক চিংকারা হরিণ। বিরাট বিরাট আমলকি গাছের আমলকি বন; সাধু-সন্তদের আখড়া, নানা দেব-দেবীর "থান"।

বিন্ধ্যাচলের প্রধান আকর্ষণ ছিল পেট-রোগা বাঙালিদের কাছে, "কালি কুঁয়োর" সর্বরোগহারী, ধন্বন্তরী জল। বিন্ধ্যাবাসিনী দেবীর মন্দির ছিল পাহাড়ের উপরে। গঙ্গার সমান্তরালে ছিল গা-ছমছম মাছিন্দা। পাহাড়ের নীচে।

বিন্ধ্যাচলের পটভূমিতে আমার একটি উপন্যাস আছে, "পুজোর সময়ে" এবং অগণ্য ছোটো গল্পও আছে, "পহেলি পেয়ার" এর মতো। বড়ো গল্পও আছে, "আয়নার সামনে।"

বিকেলে যখন আলো কমে আসত, রাইফেল কাঁধে, মালভূমির উপরের আমলকি গাছের নিচে একা দাঁড়িয়ে নীচে দূরে গেরুয়া আর পাটকিলে-রঙা ছোটোবড়ো চরজাগানো, এঁকে বেঁকে যাওয়া গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকতাম। তবে এটা ঠিক যে, গঙ্গার দৃশ্য বিন্ধ্যাচলের মালভূমির থেকে যত না সুন্দর দেখায় তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখায় চুনারের দুর্গের উপর থেকে।

ধোঁয়া-ওড়ানো ট্রেন চলে যেত নিঃশব্দে খয়েরি সাপের মতো। বগিগুলোকে ওপর থেকে মনে হত দেশলাইয়ের খোল। অত উঁচু ও দূর থেকে, শব্দ শোনা যেত না। দিনান্তবেলাতে সাইবেরিয়ান রাজহাঁস উড়ত গঙ্গার চরের উপরে, ঘুরে ঘুরে। তাদের গায়ের ধূসর-রঙা শরীর আর মরালী গ্রীবাতে, শরৎ-শেষের অথবা হেমন্তের দিন-শেষের সূর্যের ম্লান বিধুর লালিমার ছোঁয়া লেগে, কোনও স্বপ্নের দেশের উড়াল-পাখি বলে মনে হত। গেরুয়া বা সাদা পাল তুলে মন্থর গতিতে ভেসে যেত মহাজনী নৌকো, গঙ্গার বুক বেয়ে। পাহাড়ের ওপারের নানা মন্দিরে এবং সাধু-সন্তদের আখড়ায় সন্ধ্যারতির সমবেত ঘণ্টাধ্বনি উঠত। আখড়ার ধুনিতে আগুন দেওয়া হত। তখন হঠাৎই আমার মনে হত, আমার দেশ, বেদ-বেদান্তর দেশ, উপনিষদের দেশ, অনেকই পুরোনো ঐতিহ্যের দেশ।

বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের পথের দু'পাশের, সারা দিনমান পুণ্যার্থীদের ওপর উৎপাত করা হনুমানের দল, রাতের জন্যে তৈরি হত হুপ-হাপ-হাপ শব্দে দিনান্তবেলার শান্তিকে মথিত করে। কালো ফিতের মতো, নীচের পিচের পথ বেয়ে চলে যেত ক্বচিৎ ট্রাক। হয় এলাহাবাদ, নয় কাশীর দিকে। বিন্ধ্যাচল

'পুজোর সময়ে'—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

'আয়নার সামনে'—দে'জ পাবলিশিং

'পহেলি পেয়ার'—সাহিত্যম

থেকে পুবে পঞ্চাশ মাইল গেলে বেনারস আর পশ্চিমেও ঠিক পঞ্চাশ মাইল গেলে এলাহাবাদ। বাইজি আর গালিচা আর গুণ্ডার জন্যে বিখ্যাত-কুখ্যাত মির্জাপুর ছিল মাত্র মাইল তিনেক দূরে।

নানকু পানওয়ালার দোকানে হ্যাজাক জ্বলে উঠত। রাতের প্রথম ভাগে, পাহাড় থেকে নেমে, সমতলে পৌঁছে, যখন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত আমি বাড়ি ফিরতাম তখন নানকু পানওয়ালার দেওয়াল-জোড়া মস্ত আয়নাতে হ্যাজাকের আলোতে প্রতিফলিত সতেরো বছরের টগবগে তরুণ আমি, নিজেকে ভারি সুন্দর দেখতাম।

হয়তো সকলেই অমন দেখে। ওই বয়সী সব ছেলে, সব মেয়ে।

"Sweet seventeen, yet unkissed"!

বিন্ধ্যাচলে মাছ খুবই শস্তা। এবং আমার বাবার সঙ্গে শস্তা অথবা দামি মাছের যোগাযোগে, হাটে, মাঠে ঘাটে যেখানেই হোক না কেন, আমার মায়ের প্রতিবারেই কোরামিন খাবার মতো অবস্থা হতো। মায়ের 'ছুটি' বলতে কিছুই ছিল না। মাছ রেঁধে আর খাইয়েই বেলা যেত। সেসব দিনের কথা ভাবলে যেমন কষ্ট হয় নারী জাতির প্রতি, তেমন আনন্দও কম হয় না।

অমন স্বামী-গত-প্রাণা নারীরা যে আবার কবে ফিরে আসবেন!

বাবা, মাকে ডাকতেন 'আহ্লাদী' বলে। মা যতদিন বেঁচেছিলেন, তার মধ্যে অমন মারাত্মক অঘটন মাত্র দিন দুই ঘটেছিল, যখন বাবা অফিস থেকে ফিরে এসে মাকে বাড়িতে দেখতে পাননি। পুরুষ, খেটেখুটে এসে বাড়িতে যদি তাঁর নারীকে না দেখতে পান, তাহলে যে কী কাণ্ড ঘটতে পারে, তা ভাষাতে প্রকাশ করা যায় না। "তুলকালাম" শব্দটি জানেন অনেকেই কিন্তু অভিধানে শব্দমাত্রই, বাবার টার্মিনোলজিতে বলতে গেলে বলতে হয়, 'মটকা মেরে' শুয়ে থাকে। তাদের প্রকৃত অর্থ, জীবনে এবং যথাসময়ে; মুখব্যাদান করে আক্কেল একেবারে গুড়ুম করে দেয়। 'তুলকালাম'-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। নব্যযুগের স্ত্রীরা অমন সম্পর্কের কথা, দাবির বহর এবং হাসিমুখে সব দাবি মান্য করার কথা ভাবতেও পারবেন না।

অনেক পুরনো ফ্যাশানও তো ফিরে আসে! মেগিয়া-হাতা ব্লাউজের মতো, মকরবালার মতো, কানপাশা বা "গোট"-এর মতো! তাই আমার মায়েদের মতো নারীরা আজকের হতভাগা পুরুষদের জীবন থেকে চিরতরেই যে নির্বাসিত হয়েছেন একথা মেনে নিতে বিশ্বাস হয় না। নারীদের সব স্বাধীনতাই আমি দিতে রাজি কিন্তু দায়িত্ব-কর্তব্যহীন, বিবেকহীন এবং অনেক সময়ই শিক্ষাহীন উগ্র আধুনিকতা চোখে বড়ো অসহ্য ঠেকে। মেনে নিতে প্রাণান্ত হয়।

আমাদের মায়েরা কি আর কোনও দিনও ফিরে আসবেন না পুরোনো দিনের গয়নার মতো?

তসলিমা বোন আমার যাই বলুন না কেন, বিধাতা, নারী আর পুরুষকে শরীরে এবং মনে এমন আশ্চর্যরকম ও মারাত্মকরকম ভাবে আলাদা করে হয়তো গড়তেন না, যদি-না এটা সৃষ্টিকর্তারই ইচ্ছা হত যে, এই দুই লিঙ্গের বুদ্ধিসর্বস্ব, শরীরী (দ্বিপদ) জীবেরা এসে অন্যের উপরে গর্জন বোধহয় ঈশ্বর বা খোদার অভিপ্রেত ছিল না। তারা একে অন্যের বিকাশ ও পূর্ণতার দ্যোতক ও বাহক হয়ে উঠুক এই হয়তো বিধাতার ইচ্ছা ছিল।

আমার তো মনে হয় যে, পুরুষদের যেটা দুর্বলতা, সেটাই মেয়েদের বল। মেয়েরা যখন পূর্ণ-লিবারেটেড হবেন তখন তা হবে পরম দুর্দৈব। আবার পুরুষেরাও স্বয়ম্ভু ও স্বয়ম্ভর হলে তাও হবে সমানই দুর্দৈব। আমি পুরুষ বলেই জানি, অত্যন্ত গভীরভাবেই জানি এবং কৃতজ্ঞচিত্তে মানিও যে; মেয়েরা পুরুষের জীবনের, শরীর-মনের কত বড়ো শূন্যতা পূরণ করেন। সবসময়ে হয়তো করেন না, কিন্তু করাটাই স্বাভাবিক। নারী নইলে, যেমন পুরুষ তার সম্পূর্ণতার সাধনাতে মর্মান্তিকভাবে অসফল, পুরুষ নইলেও, সম্ভবত প্রকৃতিও অসম্পূর্ণ থেকে যেতেন।

যাই হোক, সাম্প্রতিক অতীত থেকে নারী ও পুরুষদের মধ্যে যে ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছে, ভাগ্যক্রমে তার অধিকাংশই শুধুমাত্র তার্কিক পর্যায়েই এখনও আছে; তা নিজে পুরোনো হয়ে গেছি বলেই হয়তো, আদৌ ভাল চোখে দেখছি না। মেয়েদের উপরে যুগযুগান্ত ধরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা,

ইনক্লুডিং আমার বাবাদের প্রজন্ম, এবং হয়তো আমরাও যে একতরফা দাবির অত্যাচার চালিয়ে এসেছেন ও এসেছি তার কোনও নজির কোনও দাস-দাসীর ইতিহাসেও নেই।

অনেকেরই মতে, আমিও নাকি "বাপকা বেটা সিপাহি কা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।" তবে সেই "অনেকে" অনেক জানতে পারেন, সবটুকু অবশ্যই জানেন না। তাঁদের নিজগুণে ক্ষমা করে দিলাম।

তসলিমা নাসরিনেরা ফায়ার-বল, অগ্নিগোলক। ওঁরা নিজেরাই শুধু পোড়েন না, অন্যদেরও পোড়ান আর অন্যতরদেরও, যাঁরা ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতা যে তাঁদের আদৌ ছিল, সেই কথাটা পুরোপুরিই ভুলে বসেছিলেন, তাঁদেরও তসলিমারা ভাবান। তসলিমা সকলকেই ভাবতে উদ্বুদ্ধ এবং বাধ্য করেন। আর ভাবনা-চিন্তা তো জানোয়ারদের প্রেরোগেটিভ নয়, তা শুধুমাত্র মানুষদেরই।

তাছাড়া, এই রকম আলোড়নের দাম আছে বইকি! সব সমাজে, সব দেশে; সব যুগেই।

তসলিমার প্রসঙ্গ এসে গেল বলেই অগণ্য পত্রের এবং টেলিফোনের জিজ্ঞাসার উত্তরে এইখানে একটা ব্যাপার একটু পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। আরও করছি, যেহেতু আমি কোনও ক্ষমতাশালী মিডিয়ারই বশংবদ নই, কর্মচারী তো নই। মোসাহেবিকে তো আমি অন্তর থেকেই ঘৃণা করি।

"লজ্জা" আমাকে উৎসর্গীকৃত হওয়ার পরেও একটি সংবাদপত্র আমার কাছে কিছু জানতে চাননি বলেই এই প্রশ্ন নিয়ে কোনও কাগজই আমার কাছে আসেননি। আসেননি, কারণ, তাঁরা শুধু তাদের "চাকরদেরই" প্রচার চান।

প্রতিদিন অগণ্য মানুষ চিঠিতে, ফোনে এবং মুখেও প্রশ্ন করছেন, ব্যাপারটা কী? সকলকেই মুখে বা চিঠি লিখে জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কলকাতার কোনো কাগজই আসেননি অথচ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস শুধু ইন্টারভ্যুই করেননি, আমন্ত্রণ করে লেখাও ছেপেছিলেন। বি বি সি টিভির একটি টিম লানডান থেকে এসে ইন্টারভ্যু করেন এবং সেই ইন্টারভ্যু দিনের পর দিন বি বি সি টিভির ওয়ার্ল্ড নিউজ সার্ভিসে সম্প্রচারিতও হয়।

আমার পাঠক-পাঠিকাদের প্রশ্ন : "তসলিমা নাসরিন-এর "লজ্জা" আপনাকেই তিনি উৎসর্গ করলেন কেন? পশ্চিমবাংলার অনেক নামী কবি-সাহিত্যিকই যখন প্রায় প্রতিমাসেই বাংলাদেশে যাচ্ছেন, তসলিমার সঙ্গে যাঁদের বহুদিনের সখ্য, চেনাশোনা, তাঁরা থাকতে অপাঙ্‌ক্তেয়, দলরহিত, মিডিয়া-বর্জিত আপনি কেন? কেন? কেন? কেন?"

এই সব অগণ্য প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই! তসলিমাই শুধু তা দিতে পারেন।

তসলিমা যখন "আনন্দ পুরস্কার" নিতে আসেন তখন গ্রান্ড-হোটেলের বলরুমেই বাগ্মিতাতে মুগ্ধ, অভিভূত হই। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর এই পুরস্কার বিতরণী সভায় অমন বক্তৃতা ও বাগ্মিতা খুব বেশি দেখেছি ও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তাই স্বাভাবিক কারণেই, অনুষ্ঠানের পরেই গিয়ে তাঁর সঙ্গে বলরুমেই আলাপ করি। আমাদের কথা হয়, বড়োজোর এক মিনিট। অতক্ষণও নয় বোধহয়।

তসলিমা বলেন যে, "শিশুকাল থেকেই আমি আপনার লেখার ভক্ত। আপনার উপন্যাস "মাধুকরী"* বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কোরানের মতো পঠিত হয় এবং প্রত্যেকের শোবার ঘরে, মাথার কাছে থাকে।"

স্বাভাবিক কারণেই আমিও ওঁর বাগ্মিতা এবং বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করি।

'মাধুকরীর' কথাটা যদিও অতিশয়োক্তি হয়তো, তবু খুশি যে হইনি, তা বলব না।

তসলিমার সঙ্গে আলাপিত হবার অনেকদিন পরে, ঠিকানা জোগাড় করে আমি ওঁকে চিঠি লিখি। উনিও উত্তর দেন। তারপর চিঠিতে-চিঠিতেই এক আশ্চর্য সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমাদের।

আমার স্ত্রী ও কন্যারাও তসলিমার মস্ত অনুরাগী। যেমন ওঁর হাতের লেখা, আর তেমনই ছবি-আঁকারও হাত তসলিমার। চিঠির মধ্যেই কলমের একেক টানে তিনি যেমন ছবি আঁকেন তা কম মানুষই পারেন। তসলিমা গানও খুব ভালোবাসেন।

'মাধুকরী'—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

একবার উনি চিঠিতে লিখলেন, "দাদা আমি কখনও উপন্যাস লিখিনি। আমাকে বলে দেবেন? কী করে লিখব?

আমি নিজেই উপন্যাস কী করে লিখতে হয় তা এখনও শিখিনি যে, সে-কথা ওঁকে জানিয়েও শুধু উপন্যাস সম্বন্ধেই নয়, লেখালেখি সম্বন্ধেও আমার মতো অশিক্ষিত, বাংলায় বি এ, এম এ ডিগ্রিহীন লেখকের সাধারণভাবে যতটুকু ধ্যানধারণা, তা ওঁকে জানাই।

অবশ্য তসলিমার সঙ্গে এক বাবদে আমার মিল আছে। ওঁরও পেশা অন্য। উনি এম বি বি এস ডাক্তার। যদিও এখন মেডিকেল কলেজ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

চিঠিগুলি লিখেছিলাম দিল্লি এবং বম্বের নানা হোটেল থেকে। কারণ, দিল্লি বম্বেতে কাজে গিয়ে যখন দু'চারদিন থাকতে হয়, তখনই শুধু দীর্ঘ চিঠি লেখার মতো অবকাশ একটু জোটে।

এর কিছুদিন পরেই, তসলিমা একদিন ফোন করে বলেন, দাদা। আমার প্রথম উপন্যাস আপনাকেই উৎসর্গ করছি।

তারপরই লোক মারফত দু'কপি "লজ্জা" আমাকে পাঠান কলকাতাতে। আগে পরে আর অনেক কিছুই পাঠান, অনেকই উপহার। ওখানকার লেখকদের বই, জয়নুল আবেদিনের ছবির অ্যালবাম; লিকুওর চকোলেট, বিটোভেনের ক্যাসেট।

আমি ওঁর বই পেয়েই তক্ষুনি ফোন করে বলি যে, আশ্চর্য কো-ইনসিডেন্স! আমি আমার অনেক অপমানের অসম্মানের ও দলবদ্ধ চক্রান্ত ও আক্রমণের শিকার যে উপন্যাস "অবরোহী", তা তোমাকেই উৎসর্গ করছি। আর তুমি পাঠালে আমাকে উৎসর্গ করা "লজ্জা"।

তারপর "লজ্জা" পড়ে আমি তসলিমাকে জানাই যে, ব্যাপারটা একটু "একপেশে" হয়ে গেছে। উপন্যাস হিসেবে শুধু একটি হিন্দু পরিবারই নয়, এদিকের কোনও মুসলমান পরিবারের কথাও লিখতে হয়তো পারতে। নতুন সংস্করণে একটা অদল-বদল কোরো, পারলে।

তবে, একথাও হয়তো মিথ্যে নয়, এই সময়ে মুসলমান-গরিষ্ঠ সব দেশেই হিন্দুদেব নিরাপত্তা, মান-সম্মান কমবেশি যতটা বিঘ্নিত, সেরকম অবস্থা ভারতীয় মুসলমানেদেব আদৌ নয়। বরং কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভোট পাওয়ার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে লজ্জাকর সংখ্যালঘু-তোষণ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয়ের পক্ষেই অস্বস্তিকর। লজ্জাকরও। এইসব তথাকথিত জনদরদী সরকার লংখ্যালঘুদের জন্যে করাব মতো কিছুমাত্রই করেননি। তাদের প্রতি এই "বড়ে সরকার, ছোটে সরকারের" কোনও প্রকৃত দরদই নেই।

ভোটের জন্যেই যত প্যায়েরভি।

আমার এই মতের জন্যে আমাকে বি জে পি -র সমর্থক বলেও রটানো হয়েছে এবং বিশেষ কার বাংলাদেশে এই অপপ্রচার লাগাতার চলেছেই। এই অপপ্রচার কারা আরম্ভ করেছিলেন এবং কারা তা চালিয়ে যাচ্ছেন তাও আমার অজানা নয়। তাঁদের প্রতি আমার অনুকম্পা ছাড়া আর কিছুই নেই। এই অপপ্রচারের মূলে বাংলাদেশি একজন কবি এবং পশ্চিমবঙ্গীয় কিছু লেখক ও কবিও আছেন। তাঁদের নাম নাইবা করলাম। তসলিমা নিজে আমাকে ফোন করে বলেছেন কে-কে ওঁকে গিয়ে বলেছেন যে আমি বি জে পি।

আমি যে বি জে পি নই এবং অন্য কোনো রাজনৈতিক দলভুক্তই নই এবং আমার যে ভারতের কোনো রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতার প্রতিই ভক্তি আদৌ নেই তা আমার পাঠক-পাঠিকারা ভালো করেই জানেন। এই কথা জানাতে নিজের এই বইয়ের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম আমার নেই বলেই এখানে একথা বলতে হল। তবে বি জে পি র অফিসেই উৎসাহীরা খোঁজ করতে পারেন। মিথ্যা মিথ্যাই! গগননিনাদী চিৎকারের সঙ্গে মিথ্যা বললেই মিথ্যা সত্যি হয়ে যায় না।

আমি অবশ্যই ভারতীয়। আমার দেশকে আমি ভালোবাসি। আমার দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ যাঁরাই করবেন বা সে কাজে মদত দেবেন তাদের প্রত্যেকেরই আমি বিরোধী। তাঁরা যেই হন, আমি তাঁদের শত্রু বলেই গণ্য করব।

'অবরোহী—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

তাঁর বয়সের তারুণ্যের জন্যেই হয়তো তসলিমা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। কিন্তু সততা, সৎসাহস, ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দগুলির সঙ্গে তসলিমা নাসরিন এখন সমার্থক হয়ে গেছেন।

তাঁর বইয়ের প্রারম্ভে আলাদা একটি পাতাতে লেখা আছে "আজ থেকে ধর্মের আরেক নাম মনুষ্যত্ব হোক।"

এর চেয়ে বড় "বাণী" স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া কোনও মুনি-ঋষি, মনীষীরাই, কোনও ধর্মের ধর্মগুরুরাই তো বর্তমান পৃথিবীর প্রেক্ষিতে দেননি, বা দিতে পারেননি; তসলিমা যা করেছেন, তা টগবগে যৌবনের আগুনে দগ্ধ হয়েই করেছেন। প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ-সাবধানী—নিজ-নিজ বইয়ের ধূর্ত-সেলসম্যানদের, রপ্তানি-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এই অসমসাহস কোনওদিনই আশা করা যায় না। মুখে যিনি যে বক্তৃতাই দিন না কেন! তসলিমা দীর্ঘজীবী হোন। তসলিমার দৃষ্টান্তে সারা পৃথিবীর অগণ্য তরুণ-তরুণী উদ্বুদ্ধ হোক; হয়ে, নিজ নিজ দেশ থেকে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিশ্চান-বৌদ্ধ এবং ইহুদি, জগতের সমস্ত অন্ধ, পেছনে-টানা ধর্মান্ধ মৌলবাদী এবং অন্য সমস্ত জ্ঞানহীন প্রাগৈতিহাসিক বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে পদদলিত করুক, এই প্রার্থনা।

তসলিমার একক বিদ্রোহ, ওর সাহস, ওর বুকের আগুন দাবানলের মতো সারা বিশ্বেই অচিরে ছড়িয়ে পড়ুক, এই প্রার্থনাও করব।

এবারে প্রসঙ্গান্তরে যাই।

কোডারমার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু একটু বিস্তারিত বলা দরকার।

একবছর, এপ্রিলের গোড়ার একরাতে, আমরা হাওড়া-বম্বে মেলে রওনা হলাম কোডারমার উদ্দেশে। সেই প্রথমবার যাওয়া।

কোডারমার চারদিকে অনেকই অভ্রখনি ছিল। তার মধ্যে 'খলকতুম্বি' ছিল পৃথিবীর গভীরতম অভ্রখনি। কোডারমা-রজৌলি ঘাটের উপরে গহন জঙ্গলের মধ্যে ছিল খলকতুম্বি। ওই খনিও ছিল ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানিরই! ওই অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে গায়ে, পথপাশে, রাতের বেলা গাড়ির হেডলাইট পড়লে, পাথরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্রের কুচি চিকচিক করে উঠত। অনভিজ্ঞের চোখে মনে হত, জংলি জানোয়ারের চোখই বুঝি!

কোডারমা স্টেশনের একদিকে কোডারমা, ডোমচাঁচ, শিবসাগর আর অন্যদিকে ঝুমরী-তিলাইয়া। প্রথমবার, কিশোর বয়সে ওই নামটা শুনেই প্রেমে পড়ে গেছিলাম। ঝুমরী-তিলাইয়ার কাছেই তিলাইয়া বাঁধ তৈরি হয়। তখন তিলাইয়া বাঁধের কাজ শুরু হয়েছিল কি না ঠিক মনে নেই।

চারদিকে এপ্রিলের কচি-কলাপাতা-সবুজ শাল জঙ্গল, ছোটো ছোটো কালো পাথরের টিলা, নালা আর অন্যান্য হরজাই জঙ্গল। মহুয়া-বন। সারাদিন ধরে নির্মল অকলুষিত পরিবেশে তীক্ষ্ণ, তীব্র, চকিত ডাকের চাবুক মেরে টিয়ার ঝাঁকের আকাশ-চিরে চলে যাওয়া, নীলকণ্ঠ পাখির বাংলো পরিক্রমা, কিশোর আমাকে মুগ্ধ, মন্ত্রপূত করেছিল। সেই কিশোরের চোখ দিয়ে দেখা লাল-মাটি, কালো-পাথর আর টিলা আর কচিকলাপাতারঙা চৈত্র-শেষের শালবন আর মহুয়ার গন্ধ, করৌঞ্জের গন্ধ-বওয়া হাওয়ার ঘোর আজও কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।

গেস্ট হাউসটি ছিল পাঁচ নম্বর বাংলোতে। তার হাতা ছিল কম করেও পঁচিশ তিরিশ বিঘার। দেখবার মতো বাংলো। তরুণ শালবনের মধ্যে কোনও বাউন্ডারি ওয়াল ছিল না। হয়তো কোনও ঝোপ-ঝাড়ের বেড়া বা কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও থাকতে পারত। আজ আর স্পষ্ট মনে নেই।

গেট পেরিয়ে, লাল-মাটির লম্বা ড্রাইভ দিয়ে বাংলোতে পৌঁছতে হত। এক পাশে ছিল বাবুর্চিখানা, প্যান্ট্রিসুদ্ধ। বিহারি মুসলমান বাবুর্চি ছিল, মাথায় মেরুন "ফেজ" পরা, পরনে সাদা ইম্যাক্যুলেট লিভারিজ। সে এবং তার সাকরেদরা ছিল ইংরাজি এবং নবাবি-খানা বানাবার জন্যে। হিন্দু পাচকও ছিল অন্যান্য খানার জন্যে। তখনকার দিনে পাঁচ নম্বর বাংলোর জন্যে একজন বি এ পাস ইংরেজি-জানা বাঙালি ভদ্রলোক স্টুয়ার্ডও ছিলেন। যাঁর কাজই ছিল অতিথিদের ফরমাশ অনুযায়ী মেনু তৈরি করে, তা রান্না করিয়ে, ঠিকমত সার্ভ করা, পূর্ব-নির্ধারিত, নির্ভুল সময়ে। সকালে বিকেলে চা-এর সঙ্গে হান্টলি-পামার বিস্কিটের সমারোহ ছিল নানারকম।

দুটি বড়ো গাড়ি, একটি ওয়েপন-ক্যারিয়ার আর একটি জিপ সদসর্বদা মজুদ থাকত বাংলোর ড্রাইভে, ড্রাইভার সমেত। বিকেল হলেই সহিসেরা দুটি ঘোড়া নিয়ে আসত—খোকাবাবা ও মিসিবাবাদের চড়াবার জন্যে। ছোটো ঘোড়া অবশ্য।

জীবনে সেই প্রথম ঘোড়ায়-চড়া। পরে হাতি এবং উটেও চড়েছি শিকার করার জন্যে। কিন্তু ঘোড়ায় তার পরে দু-একবারই চড়েছি।

"শিকারের" বা "স্বীকারের" বৃত্তান্ত এখানে দেবার নয়, কারণ, সে সব তো বিস্তারিত বলেইছি "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে"-তে।

তবে, "বিগ-গেম হান্টিং"-এ তখন আমার এবং বাবারও হাতে-খড়ি পর্ব চলেছে সবে, একই সঙ্গে। যদিও বাবা পাখি শিকারে এবং বিশেষ করে উড়ন্ত পাখি মারাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, বিগ-গেম তার আগে করেননি।

বিগ-গেমে কার হাত কত ভালো তার চেয়েও কার নার্ভ, কার ধৈর্য, তিতিক্ষা, কত ভালো ও অসীম সেটাই বিবেচ্য। অনেক দিনের অভিজ্ঞতা লাগে। মহারাজকুমার বা মহারাজকুমারীদের মতো সেরিমনিয়াল শিকার তো নয় যে, বহুমূল্য কার্পেটের উপরে মখমলের আসনে বসে আগুপিছু ও দু'পাশে বাঘা বাঘা শিকারি মজুত রেখে পাকা আমের মতো বাঘটি পেড়ে নিলাম!

আমাদের শিকারি হয়ে ওঠার আগে 'স্বীকারী' হতে হয়েছিল।

সফল ব্যারিস্টার, ডাক্তার, উকিল, অ্যাকাউন্ট্যান্টদের এসব ব্যাপারে যে সুযোগ সুবিধা ছিল, তা খুব কম মানুষেরই ছিল। মনস্থ করলেই হত। বলামাত্রই ভারতের বিভিন্ন জায়গার বড়ো বড়ো প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মক্কেলরা সঙ্গে সঙ্গেই শিকারের "ইন্তেজাম" পুরো করে ফেলতেন। কোনও কিছুরই "কম্মী" থাকত না।

শুধু তাঁর কাজের বোঝা ম্যানেজ করে ছুটি নেওয়ার অপেক্ষা।

অনেক রাজা-মহারাজা, এবং তাঁদের চেয়ে কোনও অংশে কম প্রভাবশালী নন এমন অগণ্য ব্যবসায়ীও বাবার মক্কেল ছিলেন। তাঁদের সুবাদেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কম বনে-জঙ্গলে যাওয়া হয়নি। এবং বড়ো কম খাতির-যত্ন খিদমতগারিও পাওয়া হয়নি। পরিতাপের কথা শুধু এটুকুই ছিল যে, তখন আমরা যত বড়ো না "শিকারি" ছিলাম, "স্বীকারী" ছিলাম তার চেয়ে অনেকই বড়ো।

বাবা প্রকৃত স্পোর্টসম্যান ছিলেন। অনেকই "শিক্ষিত" শহুরে নতুন শিকারিরা যা করে থাকেন, সেই অপকর্ম, স্থানীয় শিকারিদের দিয়ে শিকার করিয়ে তা নিজকৃত বলে কোনওদিনও শ্বশুরবাড়িতে বা পরিচিত মহলে চালাননি।

তখন যে কোনও বড়ো জানোয়ার যেমন—বাঘ, চিতা, ভালুক, শম্বর, নীলগাই (ওদিকে বলত ঘোড়ফরাস), বড়ো দাঁতালো শুয়োর, কাঁটা-ঝনঝনানো অবিশ্বাস্যরকম প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শজারু, চিতল হরিণ, কোটরা হরিণ, হায়না (হুণ্ডার), অজগর অথবা শঙ্খচূড় বা কেউটে সাপ, পিপীলিকাভুক, এমনকি খরগোশ দেখেও আমাদের যেরকম উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা এবং চিত্তচাঞ্চল্য হত যে, বলার নয়। যে কোনও জানোয়ার দেখেই তখন আমরা বাপব্যাটা দুই-পুরুষ একই সঙ্গে উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত, উন্মুখ, উৎকর্ণ এবং যাকে বলে, "যাবতীয় উঃ"।

ইটখোরি-পিতিজ, টোঁড়াখোলা, চৌপারণ, রজৌলি, সিঙ্গার, দানুয়া-ভুলুয়া, কাটাকামচারী, বিষুণপুর, টাটিঝারিয়া, ইত্যাদি এক একটি জঙ্গলের নাম কানে যাওয়া মাত্রই যেন বৈদ্যুতিক শক দিত গায়ে আমার। গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠত। আর যেসব জায়গাতে তখনও যাওয়া হয়ে ওঠেনি, সেইসব জায়গার জীবন্ত ছবি, কল্পনাতে ইচ্ছেমতো সৃষ্টি করে নিতাম মনের মধ্যে। অবশ্য ওই সমস্ত জায়গাতেই পরে যাওয়া হয়েছিল এবং আরও অনেক অনেকই জায়গাতে। বিভিন্ন মেজাজের অগণ্য জানোয়ার এবং বিচিত্র শিক্ষা, মেজাজ এবং পোশাকের অগণ্য শিকারিদের সঙ্গেও মোলাকাত হয়েছিল বছরের পর বছর। দীর্ঘ সময় ধরে।

তখন রজৌলির ঘাটে যা শিকার ছিল, তা বলার নয়। বাস বা গাড়িও কচিৎ যেত-আসত। আঁকাবাঁকা উঁচু-নিচু চমৎকার পিচ-বাঁধানো পথ ছিল পুরো ঘাটেই, কোডারমার দিক থেকে সিঙ্গারের

উপত্যকা পর্যন্ত। সিঙ্গার পেরিয়ে পৌঁছোতে হত নওয়াদাতে। একটু দূরেই জৈনদের মন্দির, হ্রদের মধ্যে "পাবাপুরী"। আরও একটু গেলে, রাজগীর, নালন্দা।

কী সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য যে ছিল নিবিড় অরণ্য-বেষ্টিত উঁচু পাহাড়শ্রেণির! গ্রানিট, ব্যাসাল্ট আর কোয়ার্টজাইট পাথরের সাদা ও কালো চাঙড়, দিন শেষের ম্লানিমায়-রাঙা বহুবর্ণ পাতাঝরা অরণ্য, মহুয়ার আর করৌঞ্জের আর প্রাচীন শালবনের শালফুলের তীব্র, আবিষ্টকরা গন্ধ; সব মিলেমিশে ক্লাস এইট-নাইনে পড়া আমার মনোজগতে, সাঁওতাল পরগনা প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটানোর পর চিরজীবনের মতোই যেন এক মোহাবরণের সৃষ্টি করেছিল। সেই মোহাবরণ এতবছর পেরিয়ে এসেও দু'হাতে চেষ্টা করেও, ছিঁড়ে ফেলতে পারলাম না।

পারিনি যে, তা হয়তো ভালোই হয়েছে। এই রূঢ় বাস্তবের স্বার্থময় জগতে এমন এক বহুবর্ণ সুগন্ধি ঘোমটাতে নিজেকে মুড়ে রাখতে পারাটা খুবই জরুরি।

এমন কোনও এক বা একাধিক মনের স্যাংচুয়ারি বনের প্রাণীরই মতো প্রত্যেক মানুষেরই দরকার, শুধু বেঁচে থাকারই জন্যে। আজকে সামান্য শ্লাঘার সঙ্গে বলতে পারি যে, বিহারের হাজারিবাগ, রাঁচি, কোডারমা, পালামৌ এবং সিংভূম জেলার খুব কম অরণ্যই আছে যেখানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি একাধিকবার থেকে অগণ্যবার। ওরাওঁ, হো, মুণ্ডা, সাঁওতালদেরও তাদের জঙ্গল-পাহাড়েরই মতোই ভালোবেসেছি কাছ থেকে। পরে অবশ্য মধ্যপ্রদেশের মুণ্ডাদেরও, নর্মদাতীরের মান্দলার উত্তরের। জেনেছি, ভীলদেরও কিছুটা।

বাবার হাত ধরে দশ বছর বয়স থেকে সারা দেশের বনে-জঙ্গলে পাহাড়-নদীতে—বিলে-বাদায় না-ঘুরে বেড়ালে আমার এই সুন্দর বিরাট দেশ আর সেই দেশের ভালো ও গরিব মানুষদের এমন করে ভালোবাসতে হয়তো আদৌ পারতাম না।

দেশের এই ভোট-ব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলি এবং তাদের মহান নেতারাই যে আজকের ভারতবর্ষের , ভারতের অপামর জনসাধারণের চরম দুর্দশার জন্যে পুরোপুরি দায়ী, সেকথাও এমন ঘৃণা এবং গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বারংবার উচ্চারণও করতে পারতাম না।

এই দেশ কী ছিল, কী হয়েছে এবং কেন হয়েছে, তা বড়ো বেদনার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছি বলেই এত উষ্মা, এত ক্রোধ, এত ক্ষোভ!

যদিও জানি যে, তা অক্ষমেরই উষ্মা, অপারগের ক্রোধ।

দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছরের যোগসমষ্টিই জীবন। এই করেই একদিন যাবার ক্ষণ উপস্থিত হতে হয়। দিন যায়। দেখতে দেখতে বেলা বাড়ে।

স্কুলের জীবন প্রায় শেষ হয়ে এল। অথচ পাঠ্যবইয়ের কিছুই পড়তে ভালো লাগে না। নিজের ঘরে বসে গান গাই, আবৃত্তি করি; ছবি আঁকি। কবিতা লিখি।

বাবা, অঙ্ক আর ইংরেজির জন্যে দুজন মাস্টারমশাই ঠিক করে দিলেন। অ্যাডিশনাল ম্যাথস না থাকলে নাকি ফল ভালো করা যায় না। তাই অ্যাডিশনাল ম্যাথস নিতে হল। এদিকে এমনি ম্যাথস-এর জন্যে আমাদের স্কুলের অমূল্যবাবুকে ঠিক করা হল। নিচু ক্লাসে ওঁর কাছে আগেও পড়েছি উনি পাকড়াশিবাবুর মতো কানের রগ মুলে যন্ত্রণাতে কাতর করতেন না বটে, তবে খারাপ ছাত্র বলে তাঁর ফরসা মুখে আমার প্রতি একধরনের ঘৃণা ফুটে উঠত।

সেটা, পাকড়াশিবাবুর কানমলার চেয়েও অনেক বেশি অপমানকর ছিল। যে-কোনও অঙ্কেই, অন্যমনস্কতার জন্যেই; ভীষণই কাটাকুটি হত আমার। সেই কাটাকুটির উপরেই আবার লিখতাম।

উনি বলতেন, কাটাকুটির জায়গা ভালো করে কেটে, পাশে আবার নতুন করে ও পরিষ্কার করে উত্তর লিখতে। আমার ভালোর জন্যেই অবশ্য বলতেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। সমস্ত উপদেশই এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেত।

সেই তুলনাতে ইংরেজির মাস্টারমশাই, নাম ভুলে গেছি, তিনিও বাবার বন্ধু, রংপুর থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন। তাঁর পদবিও ছিল লাহিড়ী। তবে দেশ ছিল পাবনাতে। চলন বিলের পাশে। আমাদের দেশ রংপুর শহর থেকে ওঁর বাড়ি অনেকই দূরে ছিল। জানি না, বাবার সঙ্গে কোথায় আলাপ হয়েছিল ওঁর।

শীতের সকালে তাঁর নস্যিরঙা আলোয়ান, ছাইরঙা ফ্ল্যানেলের, নস্যির ছাপ-ধরা পাঞ্জাবি আর মিলের ধুতি পরে তিনি এসে পায়খানাতে বসার মতো করে চেয়ারে বসে 'ব্যাড ম্যানার্স'-এর পরাকাষ্ঠা করে গরম চা খেতেন ডিশে ঢেলে এবং জোর জোরে শব্দ করে। বাবার চেয়ে বড়ো ছিলেন উনি বয়সে। নস্যির ডিবে বের করে নস্যি নিতেন। অমূল্যবাবুও নস্যি নিতেন, তবে বিশিষ্টতা ছিল তাঁর নস্যি নেওয়াতে।

নেসফিল্ডের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান চ্যাপটার ছিল লাহিড়ী সায়েবের "FORTE"।

বলতেন, এইটি বাবা ভালো করে মুখস্ত না করতে পারলে ইংরেজি শিখতেই পারবে না। স্বপ্ন দেখবে ইংরেজিতে, ঝগড়া করবে ইংরেজিতে, তবে না ইংরেজি শিখবে!

'Riding Roughshod' ছিল তাঁর অতি প্রিয়। তাঁকে ভুলে গেছি। কিন্তু Riding Roughshod এখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি এত দীর্ঘ সময়েও। এখনও ডিকটেশন দিতে বসলেই কোন্ ফাঁকে যে, সেই শব্দদুটি উড়ে এসে জুড়ে বসে!

ইনকাম ট্যাক্সের ট্রাইবুনালের একজন মাননীয় অবাঙালি ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বছর কয়েক আগের কথা, একদিন আমার সওয়ালের মধ্যে Riding Roughshod শুনে হঠাৎই হিন্দিতে বলে উঠলেন। "আরে গুহা সাব, তুমহারা আংরেজি মেরি সমঝমে নেহি আতা। আই ওয়াজ এড়ুকেটেড ইন অ্যান অর্ডিনারি হিন্দি-মিডিয়াম স্কুল — জারা ইন্ডিয়ান-আংরেজি মে আর্গু তো করো!"

কথাটা বলেছিলেন অবশ্য সহাস্যে এবং ভালোভাবেই।

মনে মনে হেসেছিলাম।

আমিও তো আর 'হ্যারো', 'ইটন' কি 'ডুন স্কুলে' পড়িনি। দুঃখও হয়েছিল এই কথা ভেবে যে, শীতে-ক্লিষ্ট বহু দূরাগত আমার ভাগ্যবিধ্বস্ত অসহায় মাস্টারমশাই যে নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজি শিখিয়েছিলেন আমাকে, তা আমার জীবদ্দশাতেই অচল হয়ে গেল।

ওই মাস্টারমশাই-ই শিখিয়েছিলেন, ভাওয়েল-এর আগে থাকলে 'THE'-এর উচ্চারণ হবে 'দি' আর কনসোনেন্টের আগে থাকলে হবে 'দ্যা'। শিখিয়েছিলেন 'A' কখনও "এ" বলে ইংরিজিতে উচ্চারিত হয় না। ইংরেজদের জিভের দোষে তারা এ বলতে পারে না, বর্ধমান বলতে পারে না, অনিন্দ্য বলতে পারে না। তারা বলে 'আ'। DATA শব্দটি, PLURAL, Singular হচ্ছে DATUM। Fact ও Plural Facts লিখবে না কখনও। Fact-এর Singular হচ্ছে FACTUM।

একদিন বলেছিলেন, বলো দেখি, তুমি লানডানের একটি রেস্তোরাঁতে খেতে গেছ চারজনে। দেখলে, ওয়েটার তোমাদের টেবলে পাঁচটি প্লেট এনে দিল। তখন তুমি তাকে কী বলবে?

আমি বলেছিলাম, প্লিজ টেক ব্যাক ওয়ান। অথবা, ওয়ান ইজ মোর।

মাস্টারমশাই হেসে বলেছিলেন, হল না।

তারপর এক টিপ নস্যি নিয়ে বলেছিলেন, বলবে, 'One too many'

এই বাক্যটি দিয়ে বহুদিন আগে যেমন যেবার প্রথমে লানডানে যাই, আমার মাসতুতো ভাই বাপিকে একেবারে অবাক বানিয়ে দিয়েছিলাম।

বাপি বলেছিল, আমার কাছে প্রতিমাসেই একজন করে অতিথি আসেন ইন্ডিয়া থেকে, থাকেন আমার সঙ্গে , কিন্তু লালাদা, তোমাকে দেখে মনে হয়, যেন এখানেই আছ তুমি অনেক বছর।

আমি হেসে বলেছিলাম, বিলেত তো মনে ছিলই। এতোদিনে এলাম। তা বলে, তুই তোর দাদাকে ক্যাবলা ভেবেছিলি? তাছাড়া আমাদের দেশেও তো তোদের দেশের মানুষ বহু আছেন। তাঁদের সঙ্গেও মেলামেশা তো করতে হয়।

বাপি বলেছিল, 'খী খারবার!' কে তোমাকে ক্যাবলা বলবে!

আমার 'প্রথম প্রবাস' ভ্রমণোপন্যাসে বাপির কথা ও 'খী খারবারে'র কথা আছে। ইউরোপের ভ্রমণ নিয়ে লেখা।

আজকে যখন "THE TELEGRAPH" এর ইংরেজি পড়ি, তখন আজও মাস্টারমশাইয়ের ম্লান হিমেল-হাওয়া তাড়িত দারিদ্রক্লিষ্ট দাড়ি-না-কামানো ঘষা-কাচের চশমা পরা শীত-সকালের ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মুখটি ভেসে ওঠে। হায়! APPROPRIATE PREPOSITION CHAPTER!

আর, হায়! ইংরেজি ভাষা! নতুনের জয় হোক!

টাইপ-রাইটারের চাবি টিপলেই INCUBATOR-এ ডিম ফোটার মতো ইংরেজি ফুটে বেরোয় এখন। আমেরিকান ইংরেজি। ইন্ডিয়ান ইংরেজি। কেউটে সাপের বাচ্চার মতো ইংরেজির ডিম ফুটছে চারধারে। এখন, মানে বোঝা গেলেই হল। Riding Roughshod -এরই মতো।

স্কুল-ফাইনালের টেস্ট পরীক্ষা এসে গেছে। মনকে যতখানি বাঁধা সম্ভব বাঁধছি। মাঝেমাঝেই একলা ঘরে নিজেকে শুনিয়ে গাই, 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।'

একদিন ঠাকুমা সেই গান শুনতে পেয়ে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "তুই তো সত্য সত্যই একদিন পাগল হইয়া যাইবি গিয়া। তর বাবাগো ল্যাখাপড়াও দ্যাখছি আর তরেও দ্যাখতাছি। খাওন নাই, দাওন নাই—ড্যানা দুখান শুকাইয়া য্যান পাটকাঠি হইয়া গেছে। অমন পরীক্ষা দেওনের কাম নাই। আমি যতদিন আছি তরে আমিই খাওয়াইমু।"

মা বলতেন, মা, তা তো বলবেনই!

"মানুষ হওয়াটা" কী ব্যাপার ঠিক বুঝতাম না।

মন-বাঁধা, পড়া-বাঁধা, বুদ্ধি-বাঁধা চলছে, এমন সময় একদিন বাবা বললেন, শিকারে যাচ্ছি কোডারমাতে। যাবি নাকি?

একেবারে ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান। তাও না, কার জন্যে? কার অর্ডারে? সিমেস্টার ডিরেক্টরের। আমার জন্মদাতার; দণ্ডমুণ্ডের কর্তার।

মা তো শুনে প্রচণ্ড রাগারাগি করলেন। শেষে মাস্টারমশাইদের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা দুজনেই দু-নাকের ফুটোয় নস্যি দেগে মাথা দুপাশে আস্তে আস্তে নেড়ে যুগপৎ নীরব আপত্তি জানালেন। অতএব হল না যাওয়া। ওঁরা সম্মতি দেবেন কী করে? বাবা তো মনসুন রেসের দর্শক আর ওঁরা দুজন তো ঘোড়ার ট্রেনার। ঘোড়া যে কী জাতের আর তার দৌড়ের বহরও যে কী রকম তা ওঁদের মতো আর কেউই জানতেন না।

টেস্ট তো পেরুনো গেল লেংচে লেংচে। তারপর ফাইনাল। ফাইনালের আসা তো নয় যেন বসন্তের আসা। জলবসন্ত নয়, আসল বসন্ত।

আমাদের বেলা ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষার নাম বদলে গিয়ে হল আবার স্কুল ফাইনাল। বাবারা দিয়েছিলেন 'এন্ট্রান্স', তারপরে হয়েছিল 'ম্যাট্রিক'। এখন হল স্কুল ফাইনাল। স্কুল-স্কুল গন্ধটা রয়েই গেল বলে মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েও যেন পেরুনো হবে না।

আমার পিসতুতো দিদির বিয়ে ঠিক হল আমার ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগেই। তখন কোথায় পড়ি? কোথায় শুই? তারই ঠিক নেই।

সেই সব সচ্ছলতার দিনে, "বাঙাল-বাড়িতে" বিয়ের আগে থেকেই প্রচুর জনসমাগম হতো। বলত, 'নারি-ঝিওরি'। অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়াতে, সবকিছুই

'প্রথম প্রবাস'—প্রকাশক, দে'জ পাবলিশিং

"হিজ-হিজ-হুজ-হুজ" হয়ে যাওয়াতে একটি বিয়ে ঘিরে দিনকয়েক লাগাতার পুরো পরিবারের যে পুনর্মিলন, হাসিঠাট্টা, গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া, হইহুল্লোড় তার সবই চলে গেছে। এখন তো বিয়ে মানে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে। ক'জন আসবেন। তাও কার সঙ্গে কার বিয়ে না জেনেই কাঠের চেয়ারে বসে ঠ্যাং নাচাবেন। ক্যাটারারের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র দৌড়ে গিয়ে বসে খেয়েদেয়ে পকেট থেকে, বাড়ি থেকে নিয়ে আসা; স্ত্রীর অথবা মেয়ের পুরনো শাড়ির একটি গোল করে পাকানো টুকরো বের করে মুখ মুছেই, হাওয়া।

"ঘরোয়া", "পারিবারিক" এই শব্দগুলো ক্রমশ তামাদি হয়ে যেতে বসেছে। বহু দূর দূর থেকে আত্মীয়-পরিজনেরা বিয়ের বেশ কয়েকদিন আগে থাকতেই এসে থাকতেন বাড়িতে। বউভাতের পরে খেপে খেপে যেতেন তাঁরা। তাই কখনও তেতলার সিঁড়িতে বসে, কখনও ঠাকুর-চাকরদের ঘরে বসে কখনও বা দিনের বেলাতে ছাদে বসে পড়েছি তখন। তা নিয়ে কারও উত্তেজনা বা ব্লাড-প্রেশার বৃদ্ধি ঘটেনি। ATTITUDE টা ছিল 'COULD NOT CARELESS' সকলেরই।

বাবা-মাকে কোনও দোষ দিই না। তখনকার দিনকাল ওইরকমই ছিল। তার মধ্যেই যারা ভালো ছেলে, ভালো ফল করত, ফার্স্ট-সেকেন্ডও তারা হত পরীক্ষাতে। এই সব বাইরের বাধা, মেধার কাছে কোনও বাধাই নয়। নিছকই বাহানা, আমাদের মতো সাধারণ ছেলেদের পক্ষে।

বাবারও তখন আর কোনওদিকেই তাকাবার অবকাশ ছিল না। বেচারি বাবা! বেশি বয়সে চাকরি ছেড়েছেন। তখন রিটায়ারমেন্টের বয়স ছিল পঞ্চান্ন। চাকরি ছাড়েন পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ যখন বয়স। অত ঝামেলার মধ্যেও আমার প্রতি মনোযোগ তাঁর যথেষ্টই ছিল। সুযোগের সদ্ব্যবহার যে করতে পারিনি সে দোষ আমারই একার।

আঠারো ঘণ্টা পেশাতে ডুবে থাকা ছাড়া বাবার তখন একমাত্র নেশা বলতে ছিল ওয়েস্টার্ন-থ্রিলার পড়া। ব্যাং-ব্যাং-স্টোরিজ। লাইটহাউসের সামনে থেকে গাড়িতে তুলে আনতেন পাঁজা পাঁজা বই। রাত আড়াইটে তিনটে অবধি পড়তেন রোজ। তারপর পড়া হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে আবার নতুন পাঁজা নিয়ে আসতেন। সাহিত্য বা অন্য কোনওরকম বইয়ের প্রতি কোনও আকর্ষণ ছিল না। ছিল না যে, তা নিয়ে কোনও দুঃখও ছিল না। কোনওরকম প্রিটেনশানসই ছিল না! তখন কাজের চাপে স্কোয়াশ খেলাও ছেড়ে দিয়েছেন।

চাকরি জীবনে অবশ্য, বর্ষার ক'টা মাস ছাড়া নিয়মিতই মোহনবাগান ক্লাবে টেনিস খেলতেন। তিরিশ দশক থেকে সে ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক। মোহনবাগানের গোলকিপারও তো ছিলেন। আগেই বলেছি। চাকরি ছাড়ার পর নেশা বলতে জরদাপান ছাড়া বই। আর মাঝে মধ্যে শিকার। শীতকালেই বেশিবার যাওয়া হত শিকারে। আর ইয়ার-এন্ডিং এর পরে প্রতি বছরই একবার।

তাস তো দূরের কথা, লুডো বা ক্যারাম খেলাও একদম পছন্দ করতেন না বাবা। বলতেন, পুরুষ মানুষ, খেলাধুলো অবশ্যই করবে, তবে সব আউটডোর গেমস।

সেই জন্যে আমি তাস চিনি না পর্যন্ত। আজও।

বাবার শাসনের বাঁধন আমার ওপরে যতখানি ছিল তা স্বভাবতই বেশি বয়সের সন্তানদের ওপরে ছিল না। তাছাড়া একথাও অবশ্যস্বীকার্য যে আমি ছিলাম মধ্যবিত্তর দুঃখকষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা দিনের প্রথম সন্তান। আমাকে নিয়ে হয়তো বেশি আশা এবং কল্পনা ছিল বাবা-মায়ের। আমার উপরে প্রযোজ্য শাসন-বাধা, অনুশাসন, নিয়মানুবর্তিতার ছিটেফোঁটাও আমার অনুজদের উপরে প্রযোজ্য হয়নি জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই।

হয়নি যে, তা নিয়ে আমার কোনও অনুযোগ নেই। এমনই হওয়াই স্বাভাবিক।

শিশুকাল থেকে দিনের পর দিন একা থাকা, একা ভাবা, একা পড়াশোনা করা, পাঠ্যপুস্তক যদিও খুব কম; বাইরের নানা ধরনের বই, বিশেষ করে সাহিত্যের বই, গান, ছবি আঁকা—এই সবই আমার চরিত্রের প্রকৃতিতে এক বিশেষ মাত্রা যে অবশ্যই দিয়েছিল তা আজ উপলব্ধি করে বুঝতে পারি যে,

ওই একাকিত্বর জীবন আমাকে 'Run of the mills' না করে একটু অন্যরকম, আমার নিজেরই মতো হতে সাহায্য করেছিল। সেজন্যে আমার বাবা-মায়ের শাসনের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

সবাই যা করে, আমি যে আজও তা করি না, করতে চাইও না, আমি যে আমিই ছিলাম, আছি এবং থাকব যে ক'দিন বাঁচি, এই বোধটাই একটি মস্ত বোধ। এই বোধের জন্যে অনুক্ষণই মূল্য দিতে হয়েছে। আজও দিতে হচ্ছে। কিন্তু আমার 'আমিত্ব' বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবতেও পারি না। এই আমিত্ব EGO আদৌ নয়। শস্তা কোনও মার্কামারা নয় এই আমিত্ব। এই আমিকে আমি নিজেও পুরোপুরি চিনি না। অন্য আমি সে! অন্য এক আমি।

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, ফুরাবে না।

সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।"

জানি না, হয়তো মনস্তাত্ত্বিকেরা বলতে পারবেন, এই বোধই আমার রক্ষাকবচ হয়ে এসেছে। ঝড়ের রাতে, ঘনান্ধকার বনে বা চাঁদভাসি প্রান্তরে আমার সহজিয়া আনন্দঘন একাকিত্বকে বইবার জন্যে হাঁক পাড়তে হয়নি কোনওদিন।

হাত ধরতে হয়নি অন্য কারোরই; কী পুরুষ, কী নারীর।

রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি আছে না?

"তুই কেবল থাকিস সরে সরে/ তাই পাসনে কিছুই হৃদয় ভরে/ আনন্দ ভাণ্ডারের থেকে দূত যে তোরে গেল ডেকে/ তুই কোণে বসে সব খোয়ালি এমনি করে/তুই কেবল থাকিস সরে সরে।।"

অবস্থাটা সেই রকমই। অনেক কিছুই খুইয়েছি ঠিকই। লক্ষ জনে যাকে "খোয়ানো" বলেই জানেন। কিন্তু যা পেয়েছি, তার মূল্যও যেদিন নিরূপিত হবে, সেদিন হয়তো দেখা যাবে যে, যা হারিয়েছি, তার মূল্য; যা পেয়েছি তার কাছে কানাকড়িও নয়।

প্রত্যেকের জীবনেই PRIORITY-র ব্যাপার থাকে। থাকা উচিত, অন্তত। কোন্ মানুষ তাঁর জীবনে কোন্ জিনিসকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেবেন এবং সেই প্রাধান্যর ক্রমই বা কী হবে? তার ওপরেই নির্ভর করবে তাঁর জীবনের গতি, গন্তব্য এবং প্রাপ্তিও। যদি তেমন বড়ো কিছুর প্রার্থনা থাকে কারও, তবে তার জন্যে বড়ো মূল্যও অবশ্যই দিতে হবে এবং দেওয়ার পরেও, নিজের জীবদ্দশাতে, হয়তো দশজনে যাকে 'পাওয়া' বলেন, তার কিছুমাত্রই পাওয়া নাও হতে পার।

তবে, তাতে কোনোই দুঃখের কারণ নেই। দুঃখ করলে, নিজেকেই ছোটো করা হবে। নিজের আত্মবিশ্বাস থাকলে এবং কোনও লেখক প্রকৃতপক্ষে লেখক পদবাচ্য হলে, পাঠক-পাঠিকারা মৃত্যুর বহুদিন পর পর্যন্ত তাঁকে মাল্যবান করে রাখবেনই; যা আলমারির ড্রয়ারবন্ধ করে রাখা কোনও 'বাগানো' ফলক বা 'পাকানো' কাগজের সঙ্গে কোনও দিনই তুলনীয় হবে না।

ওইসব 'তুচ্ছ' পুরস্কার পাঠকদের মনে বিন্দুমাত্রই প্রভাব ফেলে না বলেই আমার বিশ্বাস। যতদিন পুরস্কারের মধ্যে প্রকৃত সম্মান নিহিত ছিল, ততদিন হয়তো প্রভাব বাড়ত। আজ আর পড়ে না সত্যিই!

আমাদের দেশে অধিকাংশ কৃতিত্বের ক্ষেত্রের অধিকাংশ পুরস্কারই কী প্রক্রিয়াতে যে 'দেওয়া' হয়, এবং কী প্রক্রিয়াতে 'পাওয়া' হয়, সে-সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা জন্মে গেছে গত দীর্ঘ ত্রিশ বছরে। তবে, ব্যতিক্রমী প্রাপক যে নেই তা নন; অবশ্যই আছেন। তবে, তাঁরা ব্যতিক্রমই। তাই সরকারি কোনও পুরস্কারে পুরস্কৃত হলে আমি গর্বিত বোধ না করে, লজ্জিতই বোধ করব।

আমার সাহিত্যে "কোনও শৈল্পিক মাত্রা যুক্ত হয় না, হয়নি"; 'আমি' সাহিত্যিকই নই, এমন মন্তব্য যে-সব পণ্ডিত, বৈয়াকরণ, এবং দেশের পণ্ডিতম্মন্য সমালোচকেরা করে থাকেন, তাঁদের মতামত, কলকাতার হাইড্রান্টের গোঁফওয়ালা ছুঁচো এবং তেলাপোকাদের সঙ্গেই কালের অমোঘ স্রোতে বহিত্র হয়ে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যে, সে বিষয়ে আমার অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকারই কোনও সন্দেহ নেই।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সিট পড়ল জগবন্ধু ইনস্টিট্যুশনে। প্রথম দিন, পরীক্ষা দিতে যাব; দেখি, রান্নাই হয়নি। বাড়িতে তখন তুলকালাম কাণ্ড চলছে। পূর্ববঙ্গীয়দের বা উত্তরবঙ্গীয়দের বিয়েতে বা অন্য অনুষ্ঠানে বড়োই চেঁচামেচি, ভিড়, হই-হট্টগোল হত সে সময়ে, এবং লেগে থাকতো লাগাতার খাওয়া।

কিন্তু একথাও বলব যে, বাঙালদের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ছিল এবং আজও আছে। তাঁদের গ্রাম্য চরিত্রটা তখনও ঠিক ধুয়ে-মুছে যায়নি। তাছাড়া, নাওরি-ঝিওরিদের মধ্যে অনেকেই গ্রামাঞ্চল থেকেই এসেছিলেন। ওই ডামাডোলের মধ্যে কার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা? কী খেয়ে সে যাবে পরীক্ষা দিতে? এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তখন কারওরই ছিল না। পরীক্ষা অনেকবার দেওয়া যেতে পারে কিন্তু বিয়ে তো জীবনে একবারই হবে!

ছাদে গিয়ে, ঠাকুরকে বলে, ভাত আর ডাল হয়েছিল; তাই গরম গরম খেয়ে নিয়ে অ্যাডমিট-কার্ডটি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পৌঁছোলাম আট নম্বর বাসে করে গড়িয়াহাটার মোড়ে। গড়িয়াহাট বাজারের পাশেই জগবন্ধু ইনস্টিট্যুশন। সেখানে সিট পড়েছিল।

এই আট নম্বর বাসের এক বিশেষ ভূমিকা আছে আমার জীবনে। এই বাসে করেই আমার তালেবর বন্ধু পরেশ, গারস্টিন প্লেস থেকে আমার অডিশন শেষে ডোভার রোডের মোড়ে এসে নামে সেই বিশেষ সকালে। এই আট নম্বর বাসেই এক সন্ধ্যাতে, প্রেসিডেন্সির ফার্স্ট-ইয়ারের নবনীতা দেবের পাশে বসে তিনটি মহামূল্য মিনিট গড়িয়াহাটের মোড় থেকে সেন্ট জেভিয়ার্সের ফার্স্ট-ইয়ারের বুক-ধড়ফড়-করা ভ্যাবলা বুদ্ধদেব গুহ এসেছিল বালিগঞ্জ ফাঁড়ি অবধি।

আজও পিছন ফিরে চাইলে, মনে পড়ে যে, বাড়ি ফিরে 'নবনীতা দেবের সঙ্গে তিন মিনিট' শীর্ষক একটি কবিতা লিখে ফেলেছিলাম।

নবনীতার সে-সময়ে যা গ্ল্যামার ছিল তা এখনকার নবনীতাকে দেখে বোঝা যাবে না। এখন তো সে শাশুড়ি হল। কিন্তু আজকালকার দাদু-দিদিমারা কেউই আগেকার দিনের দাদু-দিদিমার মতো জড়সড় হন না।

আট নম্বর বাসের প্রসঙ্গ পরে আবার আনা যাবে। এদিকে পরীক্ষায় বসতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। যাওয়া যাক সেদিকে।

আট নম্বর বাসের প্রসঙ্গ পরে আবার আনা যাবে। এদিকে পরীক্ষায় বসতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। যাওয়া যাক সেদিকে।

আট নম্বর বাসে গিয়ে গড়িয়াহাটের মোড়ে নেমে, ঘর খুঁজে, ফ্লোর খুঁজে, সিট খুঁজে বসতে না বসতেই হাতে হাতে প্রশ্নপত্র ধরিয়ে দেওয়া হল। প্রশ্নপত্র তো নয়; হ্যারিকেন। 'হাতে হ্যারিকেন'।

প্রশ্নপত্র আদ্যোপান্ত পড়ে দেখলাম যে, জানি সবই কিন্তু কী লিখব তা জানি না।

পুরো বই পড়লে এই রকমই হয়। আর আমি চিরদিনই, মায় সি এ পরীক্ষা অবধি পুরো বইই পড়েছি প্রত্যেক বিষয়ে। তার উপরে কিছু রেফারেন্স বইও পড়েছি।

যারা অনেক বছরের কোয়েশ্চেন দেখে, এ বি টি এ, আরও কত টি-এর মোটা মোটা বই দেখে দেখে, দশজনকে দিয়ে প্রশ্নর লাজোয়াব উত্তর লিখিয়ে সেগুলো গোগ্রাসে গিলে উগরে দিয়ে ফার্স্ট হয়েছে এবং আকছার ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে এমন অনেক পরিচিত জনকে আমি জানি। তাঁরা মেধাবী এবং আমার চেয়ে সবদিক দিয়ে ভালো, এ কথা দু'কানে হাত দিয়ে স্বীকার করেও বলব যে, আমি সেদিনও মনে করিনি, আজও মনে করি না যে, ওইরকমভাবে কোয়েশ্চেন মুখস্থ করে উগরে দেওয়ার সঙ্গে বুদ্ধি বা মেধার আদৌ কোনও সাযুজ্য আছে। আমাদের দেশের পরীক্ষা ব্যববস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থারও বটে; আমূল বদল দরকার।

কবে হবে? কে করবেন? তা রাজ্যের ও কেন্দ্রের ঈশ্বররাই জানেন।

পুরো টেক্সট পড়লে, তা জীবনে নানা কাজে লেগে যায়। "BATTLE OF LIFE" বলে যদি কিছু সত্যিই থাকে, তাহলে ওই পুরো টেক্সট যারা পড়ে, মূর্খের মতো, তাদের পক্ষে সেই যুদ্ধে অনেক সময়েই জয়ী হওয়া সুবিধার হয়।

তাছাড়া, আর একটা কথা স্বীকার করা দরকার সবিনয়ে যে, মুখস্থও আমি করতে পারতাম না। সেদিক দিয়েও অতি সরেস ছিলাম। অপদার্থতাতে এমন চৌকশ ছেলে আমাদের ব্যাচে সত্যিই হয়তো আর ছিল না।

স্মৃতিশক্তিরও চার রকম আছে। চির-চিরা, চির-বেগা, বেগ-চিরা এবং বেগ-বেগা।

চির-চিরা, অর্থাৎ মুখস্থ হতে প্রচুর সময় নেয় কিন্তু একবার মগজে সেঁধিয়ে গেলে চিরদিন পাথর হয়ে সেখানে থেকে যায়। চির-বেগা মানে, মুখস্থ হতে জীবন বেরিয়ে যায় কিন্তু প্রাণপাত করে মুখস্থ করার সঙ্গে সঙ্গেই মগজ থেকে তা তীরবেগে বেরিয়ে যায়। বেগ-চিরা হচ্ছে, এমন শ্রেণির স্মৃতিশক্তি, যা বেগে মগজে প্রবেশ করে কিন্তু চিরদিনের জন্যে থিতু হয়ে থেকে যায়। শেষ হচ্ছে, বেগ-বেগা। তা বেগে প্রবেশ করে এবং বেগে বেরিয়ে যায়।

আমার স্মৃতিশক্তির ধরন ছিল 'চির-বেগা'। কোনও কিছু মুখস্থ করতে পারি না। মুখস্থ করার মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতার গন্ধ পাই আমি। কলকাতার বাইরে গেলে, আমার বন্ধুবান্ধবদের Standing joke হচ্ছে—তোর ঘরের নাম্বার কত? অধিকাংশ মানুষকেই নিজের হোটেলের ঘরের নাম্বারটাও সঠিক বলতে পারি না। ইদানীং যেটা আরও ঘটছে তা DIGIT উলটো পালটা হয়ে যাচ্ছে। ৩২৬-কে বলছি ৩৬২, ৫৫৬-কে ৫৬৫ এই রকম।

শিশুকাল থেকে এমন একটা ধারণা ছিল যে, মুখস্থবিদ্যার দিকে মন দিলে কল্পনাশক্তি ব্যাহত হবে। এই ধারণাটা হয়তো ভুল। পণ্ডিতেরা জানবেন। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যর ছবি, সূক্ষ্মতম ডিটেইলসে, মাথার মধ্যে রাখতে পারব না। ভুলে যাব, কত সুন্দরীর মুখ; হাসির ক্ষণটি। অ্যালজেবরা, জিয়োমেট্রি, আব্রাকাডাব্রা। অধুনা কম্পিউটারের লক্ষ লক্ষ ডিজিটস যাঁরা মুখস্থ করেন, করুন। পৃথিবী যেদিকে এগোচ্ছে, যেমন ভাবে এগোচ্ছে, দেখা যাবে যে, নিজের পরিচয়টা পর্যন্ত কম্পিউটারাইজড হয়ে এমন হয়ে গেছে যে, আমি ৫০৫১২-এর (বাবার নাম) ৩১২ ছেলে। আমার জন্মস্থান Z/113, আমার শ্বশুরমশাইয়ের নাম কম্পিউটার বলবে, Y/017।

এসব ভাবলেও আমার গায়ে জ্বর আসে। মুখস্থ করা এ-জীবনে হল না, হবে না সুতরাং ভারতবর্ষে আমি এবং আমার মতো ছাত্ররা চিরদিনই বাজে বলেই গণ্য হবে। কম্পিউটারের শেষটা আমার দেখে যাওয়া হয়তো হবে না। তবে মানুষ যে একদিন একটা ভুল চাবি টিপেই তার এতদিনের সমস্ত প্রাপ্তি এক মুহূর্তে ধ্বংস করবে সে বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ নেই।

শেষ দিনের পরীক্ষা ছিল, অ্যাডিশনাল ম্যাথসের। যতবারই প্রশ্নপত্র দেখি, ততবারই যুগল-ফ্রেমে বাবার স্যুট-টাই-পরা চেহারার ছবি আর অমূল্যবাবুর নবজাত ইঁদুরবাচ্চার মতো লাল এবং বড়ো বড়ো দুটি কানসমেত ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, ঘৃণামাকা মুখের ছবি ফুটে ওঠে। কোয়েশ্চেন আর পড়তেই পারি না। চোখ জলে ভরে যায়।

বেচারা বাবা।

আমার মনে হয়, আমার মতো এত ঘৃণা এ-জীবনে অমূল্যবাবু আর অন্য কোনও ছাত্রকেই করেননি। জানি না উনি বেঁচে আছেন কি না। বেঁচে থাকলে, ওঁর এই অপদার্থ, অযোগ্য ছাত্রকে দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন, এই আশা করব। ওঁর আশীর্বাদ থেকেও বঞ্চিত করবেন না আশা করি।

পরীক্ষা যে রাতে হয়ে গেল, সে রাতেই বাবা অফিস থেকে ফিরেই ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হল পরীক্ষা?

ওই।

ওইটা আবার কী জিনিস?

ওই। হল।

মানে?

একরকম।

কোনও পজিশন পাবি?

লজ্জাতে অধোবদন হয়ে গেলাম।

মনে মনে বললাম, হয়তো পাব, কিন্তু নীচের দিক থেকে।

বঙ্গদেশের পিতৃদেবদের কি আশার কোনও সীমা নেই? আর্মির টাট্টু দিয়ে যদি কেউ ডার্বি জিততে চান তবে দোষ তো শুধু টাট্টুর উপরেই বর্তায় না, ঘোড়ার মালিকের উপরেও কিছুটা বর্তায়।

মুখের মধ্যে একটা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হাসিকে চারিয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে রেখে, বাবার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। হোঁদলকুতকুত।

বাবা, ইংরেজিতে যাকে বলে QUIZZICAL, তেমন চোখে একবার চেয়ে, ঘরে চলে গেলেন।

পরক্ষণেই ফিরে এসে বললেন, 'কাল থেকে অফিসে যাবি। পোস্টিং-কাস্টিং চেক করবি। আড্ডাবাজি চলবে না।'

উনিশশো বাহান্নর এক মধ্যদিনে, মধ্য বছরে, পরদিন সকালে আট নম্বর বাসে চড়ে পড়লাম চৌরঙ্গির উদ্দেশে। একটা বড়ো মোড়ে গিয়ে নামলাম বাস থেকে চৌরঙ্গির ভাড়া দিয়ে। নামার পর খেয়াল হল যে, চৌরঙ্গির মোড়টা সে মোড় থেকে একটু যেন অন্যরকম। যেন, আরও বড়ো।

একজন ঝাঁকা মুটে তার ঝাঁকা নামিয়ে রেখে দুটি পা জোড়া করে গামছা দিয়ে বেঁধে, উড্ডীন করে; সমস্ত শরীরের ওজন তার ক্ষীণ পশ্চাৎদেশের উপরে রেখে দ্বারভাঙ্গা অথবা মজঃফরপুরি কেতায় বসেছিল। অথবা ঘুরছিল।

সে আমার PREDICAMENT বুঝতে পেরে বলল, ফিন চড় যাইয়ে।

মতলব?

ঘাবড়ে গিয়ে বললাম।

আট নম্বরমে ফিন চড় যাইয়ে। ইয়ে, ওয়েলিসলি বা।

অতএব আবার আট নম্বর বাসে চড়ে বেরিয়ে পড়লাম অফিস নামক সেই গর্তের উদ্দেশে, যে গর্তে সেদিন থেকে আজ; এই বেয়াল্লিশ বছর প্রতিদিন....প্রতিদিন....। সেই অন্ধকার, ভাঙা-সিঁড়ি; আমার বিধিলিপি।

আজ একত্রিশে ডিসেম্বর, নতুন বছরের জন্যে আমার প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাকে আমার আন্তরিক ও উষ্ণ শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানাচ্ছি।

যেন হঠাৎই জানা গেল যে, একটা বছর বয়স বেড়ে গেল। আয়ুর মালা থেকে একটা বছর খসেও গেল। অথচ এই সেদিন তো জন্মালাম।

আজকে অফিসে যাইনি লেখারই জন্যে। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। চোখ জুড়ে আসতেই একটি স্বপ্ন দেখলাম। আজ থেকে পঞ্চাশ বছরের আগের আজকের দিনটিতে, এমনই এক দুপুরবেলায় ফিরে গেছিলাম।

কী আশ্চর্য। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

সাত বছরের আমি উনিশশো বেয়াল্লিশের একত্রিশে ডিসেম্বরের শীতার্ত কিন্তু রোদঝলমল দুপুরে দাঁড়িয়ে আছি রংপুরের ধাপ-এর হরিসভার পুকুপাড়ে। দাঁড়িয়ে আছি ঠিক নয়, বসে আছি, মধুফুলের ঝাড়ের মধ্যে। সাদা সাদা, ছোটো ছোটো ফুলগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মধু খাচ্ছি চুষে চুষে। আমার প্রতিযোগী দুটি মৌটুসকি পাখি।

হরিসভার পুকুরে পুজোর পরে যে কলাগাছের ভেলায় করে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল তাদেরই দুটি ভেলা পুকুরের মাঝে জেগে আছে। তার একটিতে উঠে মুখ হাঁ করে রোদ পোয়াচ্ছে মেছো কুমিরটা। ঘড়িয়াল। অন্যটির দখল নিয়েছে বিরাট দারাজ সাপটি, যাকে জল-ঢোঁড়াও বলেন কেউ কেউ। দুটি গো-বক বসে আছে, নিশ্চল, পুকুরপাড়ের গাছে। একঝাঁক পাতিহাঁস, নানা বর্ণের; ঘুরে ঘুরে গুগলি, শামুক তুলে তুলে খাচ্ছে। ফড়িং উড়ছে মুথা-ঘাসে ভরা মাঠে। বড়ো কদম গাছটার ঘন সবুজ পাতাতে রোদের জেল্লা লেগেছে। হলুদ ফড়িং উড়ছে ধোপার পাটকে ঘিরে। বদু মিঞার সাদা খাসি পটপটিয়ে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। খোঁটা উপড়ে নিয়ে। খোঁটা উপড়ে নিয়ে খোঁটা সুদ্ধ চলে এসেছে সে; মুক্ত মনে, মুক্তির আলোয়। বোসেদের লাল গোরু চরছে তার পাশে পাশে।

কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু গোরু ও খাসির পটাপট করে ঘাস ছিঁড়ে খাওয়ার শব্দ, ফড়িঙের ফিনফিনে ডানার প্রায়-নিঃসঙ্গ শব্দ, লাল গোরুর গলার পেতলের ঘণ্টার মৃদু টিনটিন ছাড়া।

বুকের মধ্যে অনেক শব্দই সেদিনও ছিল। আজও আছে। কিন্তু সেই সব শব্দ শুধু নিজেই শোনার জন্যে। অন্যকে শোনাবার জন্যে নয়।

ডিমলার রাজবাড়ির পেটা-ঘড়িতে দুপুর দুটো বাজল। আস্তাবলে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল ঘোড়া।

আমাদের "ধাপ"-এর বাড়িতে, আমার ঠাকুমা, সাদা পাথরের জাম-বাটিতে ফুলমণি-গোরুর দুধের থকথকে সরের লালরঙা পায়েস রেঁধে রেখেছেন খেজুর গুড় দিয়ে। সঙ্গে পাটিসাপটা। ছোটোকাকু, বাইরের ঘরের বারান্দার সামনের গোলাপ বাগানের মধ্যে চেয়ার পেতে শরৎবাবুর "বিপ্রদাস" পড়ছেন।

সেজকাকু বিপ্লবী, ফেরার। তাঁর নামে ওয়ারেন্ট ঝুলছে অনেকদিন হল। কোমরে রিভলবার আর কাঁধের থলেতে ডিনামাইট নিয়ে কোন্ রাজ্যে তখন কোন্ ভেক ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি, কে

'ঋভুর শ্রাবণ'—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
'দূরের দুপুর'—দে'জ পাবলিশিং

জানে! মা, রোদে পিঠ দিয়ে বসে আমার ছোটো বোন ইলুর জন্যে সোয়েটার বুনছেন সিঁদুরে-রঙা উলের লাছি মাদুরের উপরে লুটিয়ে।

বাবা আসবেন দু'দিন পরে। তাই মায়ের মধ্যে এক চঞ্চলতা এসেছে। কলকাতা থেকে আসা নীল খামের চিঠি, সিঁড়িতে বসে পড়তে পড়তে, উদাস হয়ে যান মা। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে আসবে দেখতে দেখতে। তিক্ত কষায় গন্ধ বেরুবে চোতরা বন থেকে। বাদুড়েরা উড়ে যাবে বড়ো বড়ো ডানায় সপসপ শব্দ তুলে। তিস্তার শাখানদী ঘোঘটের দিক থেকে 'ভি' শেপ-এ উড়ে যাবে আমাদের বাড়ির বাঁশবনের মাথার উপর দিয়ে গম্ভীর স্বরে কোয়াক! কোয়াক! কোয়াক! করে ডাকতে ডাকতে পরদেশি হাঁসেরা। কোথায় যাবে, কে জানে। কোথা থেকে আসে তাই বা কে জানে! কত দূরের শীতার্ত জলাভূমি থেকে!

চারদিকে কী আশ্চর্য শান্তি। খিদে নেই, ভিড় নেই, মানুষ নেই, যানবাহন নেই। কদমগাছ থেকে পাতা পড়লে জলে, মনে হয় কলসি ডুবল। আর সাত বছরের আমি, মৌটুসুকি পাখি হয়ে গিয়ে, তাদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে, ফলের মধু খাচ্ছি। বোসেদের গোরু ও বদু মিঞাব খাসি ঘাস খাচ্ছে। কুমির ও সাপ রোদ পোয়াচ্ছে। আর আমার বুলবুল বসে আছে ঘাটের উপর চুল খুলে, একা একা, কী সব ভাবছে। তার মুখে শ্রাবণের ভার। চারিদিকের এই উদ্ভাসিত প্রসন্নতার মধ্যে বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি হয়ে বসে আছে যেন সে।

হঠাৎই খেয়াল হল যে মাত্র পঞ্চাশটা বছর কেটে গেছে মাঝে। আজ ঠাকুমা নেই, বাবা নেই, মা নেই, ছোটোকাকু নেই, বোসেদের বাড়ির সেই লাল গোরু নেই, বদু মিঞার খাসি কবে বকর-ইদে কুরবানি হয়ে বিরিয়ানি বনে গেছে। এমনকি আমার বুলবুলিও নেই।

আমি আছি এখনও। আর সেজকাকু এখনও আছেন। পিতৃপুরুষের শেষ প্রতিভূ। patriarchal পরিবারের শেষতম patriarch।*

তিনি এখন থাকেন বাবার খামার-বাড়িতে, জোকার কাছে, কোনচৌকিতে। জোকার কিছু পবে। যে-খামারে দু'একদিন, জীবনে প্রথম, এবং শেষবার ষাটের দশকের শুরুতে, ট্রাক্টর চালিয়ে মাঠ চষেছিলাম। হাতে চালানো জাপানিজ "টিলার" অনেকই পরে আসে। তখন যেটি ছিল, সেটি ছিল রাশ্যান ট্রাক্টর, প্রকাণ্ড এবং ভারী। ভারী বলেই তা বসে যেতে লাগল মাটিতে এবং তাকে কিছুদিনের মধ্যেই বিদায় করতে হল।

আউট-বোর্ড এঞ্জিন বসানো মোটর-বোট চালিয়ে অক্সিজেন ডাইল্যুট করে মাছের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করেছি প্রায় একমাইল দৈর্ঘ্যের গভীব ক্যানালে—যে ক্যানাল ছিল সেই খামারের চারপাশে।

বাবা এক জীবনে অনেক কিছুই করে গেছিলেন। অভাবনীয় সব ক্রিয়াকাণ্ড। সেই খামারের এলাকা ছিল পঁচাত্তর বিঘা। পৈতৃক নিবাস "কনীনিকা" থেকে যেতে লাগত তখন আধঘণ্টা। যদিও বেহালার রাস্তা তখন এত চওড়া ছিল না। কলকাতার এত কাছে অমন খামার আর বেশি ছিল বলে জানি না। রংপুরের স্মৃতি সেজকাকু ভুলতে চাননি। উনি বলেছিলেন, খামাবের নাম দেওয়া হোক "রংপুর গার্ডেনস।"

বাবা নাম দিয়েছিলেন, "গুহ'স মালটিপারপাস ফার্ম"। মালটিপারপাস, অর্থাৎ তাতে হাঁস-মুরগি প্রতিপালন হত, মাছ চাষ হত, সবজি, নারকোল—এ সবও চাষ হত। খেজুর গুড় হত।

তৎকালীন ডিরেক্টর অফ অ্যাগ্রিকালচার, ডিবেক্টর অফ হেলথ — ওঁরা সব আসতেন নিয়মিত দুর্গাকাকুর সঙ্গে। দুর্গা রায়, যাঁর সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংসের সব সেক্রেটারিরই সখ্য ছিল।**

খামারের কথাতে পরে আসা যাবে। এখন রংপুরের শৈশব ছেড়ে কলকাতায় ফেরা যাক। উনিশশো বাহান্নতে। দশবছর একজন মানুষের জীবনে অনেকই সময়। এক দশকে কত কী ওলট-পালট হয়ে যায়!

---

* 'ঋভু', প্রথম পর্ব—প্রকাশক, দেজ পাবলিশিং

** 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকাবে' ১ম ও ২য় খণ্ড— প্রকাশক, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

অফিসে গিয়ে পোস্টিং এবং কাস্টিং চেকিং করতাম।

তখনও বাঙালি ব্যবসায়ী অনেকই ছিলেন। সেই সম্প্রদায়ে এমন মড়ক লাগেনি। বাঙালি মুহুরিও ছিলেন অনেক। সকলেই ধুতি-পাঞ্জাবি বা ধুতি শার্ট পরতেন। নস্যি নিতেন এবং রেওয়া না মিললেই দু'নাকে দু'টিপ নস্যি মেরে দিয়ে, পটাক করে দু লক্ষ পাঁচ লক্ষ ডিফারেন্সের 'রেওয়া' মিল করে দিতেন। যোগ চেক করতেন (কাস্টিং), তর্জনীটি ইয়ামোটা লেজারের উপর থেকে নিচু অবধি শুধু বুলিয়ে নিয়ে।

হিউম্যান কম্পিউটার ছিলেন তাঁরা।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জি. বাসু (গুরুগোবিন্দ বাসু) সম্বন্ধে জনশ্রুতি ছিল যে, তিনি বাঘা বাঘা চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের ড্র করা ব্যালান্স শিটের উপর থেকে নিচে পেনসিলের উলটোদিকে ছুঁইয়ে যেখানে এসে থেমে যেতেন, সব গোলমাল সেখান থেকেই বেরোত।

তাঁর অংশীদার ছিলেন শ্রী গিরীন্দ্রমোহন সাহা, জি বাসু অ্যান্ড কোম্পানির। তাঁদের অফিসও ছিল আমাদের অফিসের কাছাকাছি। পরে, সাহা সাহেব জি বাসু ছেড়ে, রায় অ্যান্ড রায় কোম্পানিতে চলে যান। পরে তিনিই সর্বেসর্বা হন।

সেই একই ব্যাপার। রায় অ্যান্ড রায়-এর মতো তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ও অত্যন্ত বড়ো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মের একজন পার্টনারেরও ছেলে ছিল না। এ-ব্যাপারটা নিয়ে যোগ্যজনেদের অবিলম্বে একটা গবেষণা করা সত্যিই দরকার নইলে প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা সকলেই কি চিরদিনই নির্বংশ হয়ে থাকবেন? প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের ছেলে হয় না কেন?

বাংলা খাতাতে নানারকম শব্দ থাকত, যা আজকালকার নব্য অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টরা জানবেন না। জানবেন না কারণ, বাঙালির ব্যবসাই নেই আজকাল, আর থাকলেও প্রায় কোনও খাতাই আর বাংলাতে লেখা হয় না।

তখন খাতা শুধু বাংলাতে যে লেখা হতো তাই নয়, খাতার সব এন্ট্রি তো নয়, যেন ক্যালিগ্রাফি। ইচ্ছে করেই দুঁদে মুহুরিরা নিজেদের নিজস্ব হরফ উদ্ভাবন করতেন, যাতে তাঁদের ছাড়া মালিক এক পাও নড়তে না পারেন। কোনও ইনকামট্যাক্স অফিসারের পিতৃপুরুষদের সাধ্য ছিল না, নিজ চেষ্টায় সেই হাতের লেখা পড়েন। রীতিমতো ডিসাইফারিং করতে হত যেসব খাতা।

'হরজাই' খাতে, 'নাজাই' 'খাতে', 'রেওয়া-মিল', 'জাবদা-খতেন'—এসব শব্দের সঙ্গে এখনকার অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা অ্যাকাউন্টেন্সি-পড়া ছাত্রদের পরিচয়ই নেই।

ফিগারের চেয়ে এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত নামেই আমার বেশি আগ্রহ ছিল। মনে হত, এ এক অজ্ঞাত অনাঘ্রাত জগৎ। একটি খাতায় দেখলাম, দুই আনা (পুরনো টাকা আনা, মেট্রিক সিসটেমের নয়) ডেবিট,—"শরীর মেরামতি খাতে"।

তদন্ত করাই অডিটরের কাজ। শেষে তদন্ত করে জানা গেল যে, মুহুরিবাবুর অহিফেনের নেশা ছিল। প্রতিদিন তাঁর মালিকই তাঁকে দুই আনার আফিং বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। তাই দিনান্তবেলায় দিনের শেষ এন্ট্রি পড়ত, সেই মুহুরিবাবুর স্বহস্তলিখনে জাবদাতে—"শরীর মেরামতি খাতে" দুই আনা।

একবার এক ফিল্ম কোম্পানিতে অডিট করতে গেলাম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পর পরই।

বাবার রেজিমেন্টেশান ছিল টাটা গোষ্ঠীরই মতো। মালিকের ছেলে বলে, নো একস্ট্রা খাতির-প্রতিপত্তি। সকলের সঙ্গে বসে সকলে যা টিফিন পেয়েছেন, সকলে যেসব কাজ করেছেন তেমনই করতে হত। এবং তা করতাম হাসিমুখেই। ছেলে বলে, বাবা কোনওদিনই এইসব বাজে আদর দেননি।

গিয়ে কাজ করতে করতে দেখি, খাতাতে ফিল্ম ডিরেক্টরের নামে তিন পয়সা ডেবিট। পুরোনো পয়সা?

অ্যাকাউন্ট্যান্টকে জিগগেস করতেই তিনি চোখ টিপে মানা করলেন। বললেন, পরে কম্যুঅনে।*

মালিকেরা ছিলেন তিন ভায়রাভাই। এমন ভায়রাভাই অ্যান্ড কোং আর দেখিনি। রমরমে ব্যবসা তখন। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার। তখনকার দিনের টাকা। তিনজনেই প্রায় সমান তালেবর। কিন্তু টাকা

* 'খেলা যখন'—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

করেছিলেন বিস্তর। সকলেই বসতেন একটি বড়ো এয়ারকন্ডিশনড ঘরেরই মধ্যে, তিনজনে তিন পাশে। অ্যাকাউন্টসের কাজ যেহেতু কনফিডেনশিয়াল কাজ, তাই ওই ঘরেরই এক কোনাতে অ্যাকাউন্ট্যান্টের টেবল ছিল। অ্যাকাউন্ট্যান্টের নাম ছিল 'অ' বাবু। ঢাকার বাঙাল। চমৎকার মানুষ। রসিক। পরবর্তী জীবনে তিনি, জ্যোতিষীতে-এখনও বিশ্বাসহীন আমাকে, ঠিকুজি দেখে কিছু কথা লিখে দিয়েছিলেন, যা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে।

তাঁর স্ত্রী পরপারে চলে গেছিলেন অল্প বয়সেই। ভদ্রলোকের একটি পা ছিল কাঠের। রোগা, কালো চেহারা। সম্ভবত যক্ষ্মা বা ব্রঙ্কাইটিস ছিল। সর্বক্ষণই উইলস সিগারেট খেতেন। পরে অবশ্য চারমিনার খেতেন। খুবই স্নেহ করতেন 'অ' বাবু আমাকে।

'অ' বাবু, গলা নামিয়ে বললেন, কোম্পানির ডিরেক্টরেরা যখন লাঞ্চে যাইবেন তখন আপনারে এক্সপ্ল্যানেশন দিমু।

ডিরেক্টরেরা লাঞ্চে গেলে উনি বললেন, ব্যাপারখান হইল গিয়া এই। ভাল কইর‍্যা দুই কান খুইল্যা শোনেন। আজে-বাজে এন্ট্রি আমার খাতায় পাইবেন না। পাইপয়সাও ইখানে রেকর্ড হয়। হইছিল কী, আমাগা ফিলিম-ডিরেক্টর আইছিলেন আমাগো কোম্পানির ডিরেক্টরগো কাছে। তা, তাড়াহুড়ায় যখন চইল্যা যান তিনি, তাঁর ছাতাখান ফ্যালাইয়া গেছিলেন গিয়া। বর্ষার দিন আছিল। ছাতা যখন আবিষ্কার হইল তখন আমাগো ডিরেক্টরেরা বোর্ড-ডিরেক্টরেরা বোর্ড-মিটিং কইর‍্যা হেই ডিসিশান লইলেন যে, দারোয়ান রামশরণরে দিয়া ছাতাখান ফিলিম-ডিরেক্টরের বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেওন আমাগা আশু কর্তব্য।

রামশরণ ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে যাইব। তার বাড়ির পথেই ফিলিম ডিরেক্টরের বাড়ি। তাই সেকেন্ড ক্লাস ট্রাম-ফেয়ার ফিলিম ডিরেক্টরের নামে ডেবিট হইছে। এহনে কয়েন দেহি, কিছু অবজেকশান কি আছে?

আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না।

বললাম, বাবাঃ এ যে মাইক্রো-অ্যাকাউন্টিং দেখি।

অ বাবু বললেন, হ! বোর্ড-মিটিং-এ এই সিদ্ধান্ত লওনের পিছনে আরও একটা কারণ আছিল এই য্যা, ফিলিম-ডিরেক্টর টাহা চাওনের লইগ্যাই আইছিলেন। টাহা-ফাহা পান নাই কিছু। পাছে হেই মক্কেল ছাতা লইয়া যাওনের আছিলায় আবারও আইয়া পইড়্যা কিছু চাইয়া বসে দুই একদিনের মদ্দে, তাই দ্যাও সত্বর ছাতাখান ফিরৎ পাঠাইয়া, সেই বিপদেরে এক্কেরে 'নিপ্ট ইন দ্যা বাড' কইর‍্যা।

আমি তখনও হাসছিলাম।

'অ' বাবু বললেন, হাইস্যেন না। আপনে পোলাপন। অডিটিং বড়োই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। যতই গভীরে যাইবেন গিয়া, ততই ভাইস্যা উঠতে হইবনানে। হঃ।

"অ" বাবুও আজ নেই। সেই তিন ডিরেক্টরেরাও নেই। হয়তো, সেই কোম্পানিও নেই। থাকলেও, অন্য দশটি বাঙালি কোম্পানির মতোই টিমটিম করে বেঁচে আছে হয়তো।

দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ বাঙালি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা-বুদ্ধি অনেকটা এই রকমই। ব্যবসা করতে সুবুদ্ধির মতো দুর্বুদ্ধিও হয়তো কখনও কখনও লাগে, কিন্তু এই রকম বুদ্ধিকে 'সু' বা 'কু' কিছুই না বলে, অজ-বুদ্ধি বলাই ভালো। এত ছোটো মন যাঁদের, তাঁদের আর যাই হোক; ব্যবসা কখনওই হতে পারে না।

অফিসের উলটোদিকে একটা গ্রামাফোনের দোকান ছিল। সারা দুপুর দারুণ দারুণ সব রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজত, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, কমলা বসু, রাজেশ্বরী দত্ত, মালতী ঘোষালের। আধুনিক গান বাজত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুধীরলাল চক্রবর্তীর, অখিলবন্ধু ঘোষের, শ্যামল মিত্রের, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, উৎপলা সেন এবং আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আর যখন বাজত, তখন কাস্টিং বা পোস্টিং চেকিং আমার মাথায় উঠত। "জীবন-মুখী" গানের "জীবন-মুখী"লেখার হিড়িক ওঠেনি তখনও। গায়ক-গায়িকার গলা সুরে বলত। অনেক সাধনার পরে তাঁরা আসরে আসতেন। খালি গলায় গাইলেও সুরেই গাইতেন, পনেরোটি বাজনা দিয়ে বেসুরো গলা ঢাকার কোনও প্রয়োজন ছিল না তখন। আধুনিক গানেরও সুর এবং বাণী দুইই ছিল চমৎকার।

যখন বাইরে ক্লায়েন্টদের অফিসে যেতাম তখনই ভাল কাজ হতো।

তবে, কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে গেলাম যে, কাস্টিং বা পোস্টিং-চেকিং-এর মতো মেক্যানিক্যাল, রিপিটিটিভ এবং বুদ্ধিহীন কাজ আমার পোষাবে না। তার চেয়ে, জার্নাল-চেকিঙে বেশি ইন্টারেস্ট পেতাম।

এদিকে দেখতে দেখতে পরীক্ষার ফল বেরুনোর সময় এগিয়ে আসতে লাগল। আই কম অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট কমার্স পাস করার পরে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবার জন্যে আর্টিক্‌ল্ড ক্লার্ক হতে পারব। বি কম পাস করেও হওয়া যায়।

আগে স্কুল-ফাইন্যালটাই পাস করা যাক তার পরেই ওসব ভাবা যাবে।

তবে আমার কোনওই চয়েস ছিল না, আমার নিজের জীবন সম্পর্কে। জীবন নয় জীবিকা সম্বন্ধে। আমাদের প্রজন্মে দশটা গাধা মরে একটা বড়ো ছেলে জন্মাত কোনও পরিবারে। সেই গাধার দাঁতে দড়ি বেঁধে পিতৃদেবেরা যেখানে নিয়ে যেতেন, সেই চত্বরেই তাকে যেতে হত। পুরোপুরি নিরুপায়েই। নিজস্ব মতামত থাকাটা, কোনও ব্যাপারেই পছন্দ-অপছন্দ থাকাটা; ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা বলেই গণ্য হতো।

কেউ কেউ বলতে পারেন, বাবার কথা শুনতে হবেই তার কী মানে? তেমন জেদ থাকলে কি অন্যপথে যাওয়া যেত না?

অবশ্যই যেত। জেদ থাকলেও যেত, নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হলেও যেত। কিন্তু আমরা যে প্রজন্মর ছেলেমেয়ে, সে প্রজন্মে আমার নিজেদের স্বার্থকে সবচেয়ে পরে স্থান দিতাম। একথা একটুও মিথ্যে নয়।

তাছাড়াও, একটা ব্যাপার ছিল, বাবা-মাকে দুঃখ দেবার ব্যাপার। তাদের দুঃখ দেওয়া আমাদের দুঃস্বপ্নেরও অতীত ছিল। নিজের ইচ্ছা, নিজের স্বপ্ন, নিজের পছন্দ-অপছন্দের চেয়ে অনেকই বড়ো ছিল, প্রত্যেক বড়ো ছেলেরই কাছে; পরিবারের স্বার্থের কথা ভেবেই বাবারা বড়ো ছেলেদের নিজেদের ব্যবসা বা পেশায় আনতে চাইতেন। যারা ছোটো, তাদের ইচ্ছা বা জেদ থাকলে, তারা অন্য কিছু করলেও করতে পারে বা পারত। কিন্তু বড়ো ছেলেদের সত্যিই কোনও চয়েসই ছিল না, যদি-না তারা নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হয়ে মা-মাবাকে দুঃখ দিতে তৈরি থাকত।

আমার ইচ্ছে করত, শান্তিনিকেতনে বাংলার অধ্যাপক হব, বাংলাতে এম এ করে। অথবা আর্ট কলেজ থেকে পাস করে কলাভবনে অধ্যাপনা করব। অন্য এবং অত্যন্ত পরস্পরবিরোধী ইচ্ছেও হতো। স্বপ্ন দেখতাম আর্মির জেনারেল হব, নয়তো এয়ারফোর্সের ফাইটার-পাইলট।

ভারতীয় মা-বাবাব মতো স্নেহশীল মা-বাবাও তো পশ্চিমি দেশে হয় না!

আমাদের ছেলেবেলায় মা-ই আমাদের পড়াতেন এবং সে-কারণে বাবার অনেক অনুরোধেও তিনি বছরে দু-একদিন ছাড়া সিনেমা দেখতেও যাননি। কোন্ দেশের ক'জন বাবা আমার বাবার মতো তাঁর ছেলেকে এমন প্রকৃতিপাঠ দিয়েছিলেন? পরিচিত করিয়েছিলেন প্রকৃত 'আউটডোর ওয়ার্ল্ড'-এর সঙ্গে? দেশের বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষদের সঙ্গে? আমার পক্ষে বাবার মতের বিরুদ্ধাচরণ করা বা, মাকে দুঃখ দেওয়ার মতো নিষ্ঠুরতা সম্ভব ছিল না।

আমাদের প্রজন্মেও অনেকেই ফেলিক্স মেন্ডেলসনের মতো মানসিকতার মানুষ এদেশে হতে পারতেন, পারেননি এইসব টিপিক্যাল ভারতীয় মনস্তাত্ত্বিক কারণে, যা ঠিকভাবে অনুধাবন করা, বা বোঝা, কোনও পশ্চিমির পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

তবে, আজকে পশ্চিমে এবং পুবে এবং হয়তো পৃথিবীর সর্বত্রই হাওয়া পালটেছে। আমি তো চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি। গত চল্লিশ বছরে এই পৃথিবীর খোল-নলচে পালটে গেছে, সার্বিক পরিবর্তন ঘটে গেছে মনুষ্য জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই। আজকের দিনে, আমার সেই দিনের মনোভাবের কথা বোঝা, তরুণদের পক্ষে হয়তো সম্ভবই হবে না।

স্কুল খোলা থাকতে, স্কুলের জীবন শিগগিরি শেষ হয়ে আসবে একথা মনে হলেই মন বড়ো খারাপ লাগত।

পরীক্ষার পরে বন্ধুদের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগই প্রায় ছিল না। কে কোন্ কলেজে গিয়ে ভরতি হবে, কে জানে! কে আর্টস নিয়ে পড়বে? কে সায়ান্স নেবে? কে কমার্স? তারও কোনও স্থিরতা নেই। সবই ঠিক করে দেবেন যার যার গুরুজনেরা। মায়েরাও যেমন তখন নিজের পছন্দসই

ছেলে দেখে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিতেন অনেক সময়েই; বাবারাও, নিজেরা যা হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি, তাই হওয়াতে চাইতেন ছেলেদের। অবশ্য যাদের বাবার নিজের স্বাধীন পেশা বা ব্যবসা থাকত তাদের যে সেদিকেই খেদা-করা হাদির মতো চালিত করা হবে, তা সে, সেই পথ পছন্দ করুক আর না-ই করুক; তাই ছিল অবধারিত।

অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিল এবং এখনও আছে। যে-কোনও ক্ষেত্রের ব্যতিক্রমই তো প্রমাণ করে সেই ক্ষেত্রের নিয়মকে!

প্ল্যাটফর্মের ওপরে বসানো চেয়ার-টেবিল যেখানে থাকত, তার ডানদিকের প্রথম বেঞ্চে, মাস্টারমশাইদেরও ডানদিকের বেঞ্চে বসতাম আমি, চুনী আর প্রণব পাশাপাশি। চুনী (সুবিমল) গোস্বামী আর প্রণবনারায়ণ সেন। মাস্টারমশাইদের সামনের প্রথম বেঞ্চে বসত, প্রীতি আর শ্যামলেন্দু। যতদূর মনে পড়ে। ওরাই ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। যদিও বন্ধু ছিল সকলেই। কনক, মানে কনককান্তি দাশগুপ্ত, অত্যন্ত ফরসা, একটু মেয়েলি চেহারা, খুবই প্রাণোচ্ছল কিন্তু কেউ অসভ্য কথা বললেই লজ্জায় কান লাল হতে যেত ওর। মেধাবী ছাত্র ছিল। ওর কথা ঋভুর প্রথম পর্বে বলেছি। আর প্রীতির কথাও প্রীতিভূষণ ঘোষদস্তিদার, বলেছি আগে।

শ্যামলেন্দু ছিল লাজুক প্রকৃতির ছেলে। কালো ছিপছিপে। ভালো ছেলে।

প্রণবের কথাও প্রথম পর্বে বলেছি। কুমার মিত্র দত্তর কথাও বলেছি, যদিও সে আমাদের সেকশনে ছিল না। আমরা ছিলাম 'বি' সেকশনে। কুমারও অত্যন্ত মেধাবী ছিল। পরবর্তী জীবনে কমার্স নিয়ে পড়ে এবং এখানে অ্যাকাউন্টেন্সি পাস করে ইংল্যান্ডে গিয়ে আরও অনেক ডিগ্রি নিয়ে আসে। লানডান স্কুল অব ইকনমিক্সের ডিগ্রিও। অর্থনীতিবিদ এবং ইংরেজি ও বাংলাতে সুপন্ডিত শ্রীঅশোক মিত্র, কুমারের মামাশ্বশুর।

স্কুলের শেষের দিনগুলোতে, শেষের পিরিয়ডে, বিশেষ করে শীতকালে, যখন তির্যক রোদের ফালি জানলা দিয়ে এসে প্রীতির গাল এবং কনকের লাল কানকে আরও লাল করে দিত, কোথা থেকে হঠাৎ বুকের মধ্যে এক তীব্র অভাববোধ করতাম। বুঝতে পারতাম, জীবনের একটা মস্ত পর্ব এবং হয়তো মধুরতম পর্বও শেষ হয়ে যাবে শিগগিরি। তারপর কে কোথায় ছিটকে যাবে, কে জানে! এই স্বার্থহীন সখ্য, এই ভালবাসা; আলুকাবলি, ফুচকা, আর ট্যাঁপারি ভাগ করে খাওয়া দু'পয়সার টিফিন থেকে; এই ঘর্মাক্ত, উদ্বেল, উন্মুখ, কল্পনাবিলাসেব দিনগুলি, কৈশোরের দিনগুলি, কোথায়, কেমন করে হারিয়ে যাবে, তা আমাদের সকলেরই যে অজানা, তা ভেবেই চোখে জল আসত।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' থেকে 'অপুর পাঠশালা' যখন পড়ানো হত ক্লাসে, যখন জিম করবেট-এর গা-ছমছম 'ম্যান-ইটারস-অফ কুমায়ুন' পড়া হতো কারিকুলামের বাইরের বই হিসেবে, তখন ক্লাসরুমের বাইরেও যে এক বিচিত্র ও বর্ণময় জগত আছে, সেই জগত সম্বন্ধে এক তীব্র কৌতূহল জাগত মনে। মনে হত, শেষ হলেও সব শেষ হবে না হয়তো। পড়াশোনা অথবা বন্ধুত্ব অথবা সহমর্মিতার কোনও শেষ নেই। যতই বয়স বাড়ে ততই সেসব বেড়ে যেতে থাকে।

তবে তখন 'বন্ধুত্ব' বলতে যা বুঝতাম এখন, তা বুঝি না। বন্ধুত্ব, পরিণত বয়সের বোধ নয়। স্কুল-কলেজ জীবনের প্রগাঢ় সখ্য আর পরিণত বয়সের সমমানসিকতার বাছ-বিচারী বন্ধুত্ব এক নয়। প্রথমটি অন্ধ। দ্বিতীয়টি চক্ষুষ্মান।

প্রণব একদিন ফোন করে বলল, রেজাল্ট কাল সকালে স্কুলে টাঙিয়ে দেবে রে!

বাড়িতে, আত্মীয়-স্বজন মহলে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়িয়ে গেল। আমি অন্যরকম ছিলাম এবং অধিকাংশ সময়েই একা পড়াশোনার ঘবে থাকতাম। কোনও বন্ধু আসত না বাড়িতে। তাই সকলেরই বোধহয় ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, আমিও মেধাবী। কিন্তু আমার মেধার রকম সম্বন্ধে আমার চেয়ে ভালো জ্ঞান আর কারও ছিল না তখন। আজও নেই।

দারুণ রেজাল্ট করলে প্রেসিডেন্সিতে পড়তে হবে, এমন একটা নিরুচ্চারিত কথার গুঞ্জরণ উঠেছিল বেশ কিছুদিন থেকেই। কিন্তু তখনকার প্রেসিডেন্সিতে কমার্স ছিল না সম্ভবত। আমার যে কম পড়তে হবে।

দারুণ ভোজও হবে। কী কী খাওয়া হবে, তার লিস্ট তৈরি হয়ে গেল মুখে মুখে আর আমার বুক ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল।

মানুষের মনে দুঃখ দিতে চিরদিনই কষ্ট পেতোম। যেখানে দুঃখের কারণ স্বয়ং আমি; সেখানে কষ্ট আরও বাড়ত।

গতবছর কোনও আত্মীয়ার নিজের ছেলে অথবা কার জা-এর ছেলে অথবা কার পিসতুতো অথবা মামাতো ভাই ন'টা আটটা, সাতটা, ছ'টা লেটার নিয়ে পাস করে ম্যাট্রিকে থার্টিফোর্থ বা ফর্টিসেভেন্থ বা ফিফটিফার্স্ট হয়েছে এবং কী কী খাইয়েছেন তাদের মা-বাবারা, তার আলোচনা চলছিল অনেকদিন ধরে, আর আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল।

বাবার হাবভাব ছিল কাম, কুল অ্যান্ড কালেক্টেড। তাঁর ছেলে যে ব্রিলিয়ান্ট এমন একটা ধারণা কোনও পূর্বাপর কারণ-ব্যতিরেকেই কী করে যে তাঁর মনে জন্মে গেছিল তা উনিই জানেন।

তাই তাঁর বিন্দুমাত্রও উত্তেজনা ছিল না আমার ফলাফল নিয়ে। বাবা যতই উত্তেজনাহীন, আমি ততই উত্তেজিত। মার অবস্থা কোরামিন খাওয়ার মতো। বেচারি মা।

অপদার্থ সন্তানের মায়েরাই শুধু জানেন, মা হওয়ার কষ্ট; রত্নগর্ভাদের প্রেক্ষিতে।

রেজাল্ট দেখতে গেলাম। সেকেন্ড ডিভিশন। টোটাল, চারশো আঠাশ।

'স্ট্যান্ড করার' জন্য যে অ্যাডিশনাল ম্যাথস নেওয়া হয়েছিল, অথবা নেওয়ানো হয়েছিল; তাতে পেয়েছি শুধুই পঁচিশ। তা ছাই আর যোগ হবে কী?

আমি বিস্মিত হইনি। কিন্তু ভেবেছিলাম, প্রার্থনার, উইশফুল থিঙ্কিং-এর একটু দাম তো থাকবে? যারাই আমার চেয়ে ভালো ফল করেছে, তারা সকলেই কি আমার চেয়ে সত্যি ভালো?

সেই রাত্রে অফিস থেকে ফিরে বাবা আমার দিকে এমন চোখে তাকালেন যে, মনে হল ছবিতে দেখা নায়াগ্রা ফলস ঘৃণা হয়ে আমার ওপরে ভেঙে পড়ল। কিন্তু কোনও কথা বললেন না। কথা বললে স্বস্তি পেতাম, যদি চড় মারতেন তবে আরও স্বস্তি পেতাম।

সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করলাম যে, নৈঃশব্দের চেয়ে বড়ো শব্দ আর নেই।

ভালো ছেলে-মেয়েদের মা-বাবা, কাকা-কাকিমারা তাঁদের ভালো কলেজে ভরতি করানোর জন্যে উদ্যম নেন। এদিকে ষোলো বছর বয়স হলে কী হয়, তখন আমি ধর্মতলার রোড ভালো করে চিনি না। মনুমেন্টটা অবশ্য চিনি। আমাব সার্কিট ছিল ডোভার রোড থেকে ল্যান্সডাউন মার্কেট, বাজারের থলি নিয়ে বেঙ্গল স্টি ং লন্ড্রির পেছনের সরু একফালি গলি দিয়ে হেঁটে বা সাইকেলে বাড়ি ফিরে আসা। বাজার করতে হত হয় আমাকে, নয় বড়োদাদাকে, পিসতুতো দাদাকে। অন্য সার্কিট ছিল, ডোভার রোড থেকে তীর্থপতি স্কুল, ভায়া হাজরা লেন। আউটার লিমিটস ছিল চেতলাতে ছোটোমাসির বাড়ি আর ওদিকে যাদবপুর, রেশনের চালে টান পড়লে; আর অন্যদিকে হাজরা মোড় থেকে রাসবিহারী মোড়, এবং হাজরা মোড় থেকে জগুবাবুর বাজার। এর বাইরে কলকাতা শহর আমার কাছে লন্ডন বা নিউইয়র্কের মতোই অদেখা শহর ছিল।

আমি কী করে গিয়ে একা একা কলেজে ভরতি হব, সেকথা ভেবেই ভয় করতে লাগল।

বাবার মুখ দেখেই বুঝলাম যে, উনি কিছু না বলেই বললেন, জাহান্নামে যাও। বলতে ভুলে গেছিলাম, অফিসে একমাস কাজ করার পর নির্মলকাকু একটি খাম দিয়েছিলেন হাতে।

কত টাকা আছে, জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হওয়ায় বাথরুমে গিয়ে সেই খামটা খুললাম। দেখি, কড়কড়ে নতুন পাঁচখানা নোট। দশটাকার বড়ো বড়ো নোট।

বাবা ডেকে পাঁচটাকা হাতে দিয়ে, একটি ফর্ম-এ ইনট্রোডাকশান করে দিয়ে বলেছিলেন, যাও, ব্যাংকে গিয়ে একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে এসো। স্পেন্ডথ্রিন্ট হয়ো না। প্রথম রোজগারের দিন থেকে সেভিংসকে হ্যাবিট করে তোলো।

বলেছিলেন, সব সময় মনে রাখবে যে, 'আ রুপি সেভড, ইজ আ রুপি আর্নড।'

বাবার অনেক ভালো শিক্ষারই মতো এই শিক্ষার পাঠও আমার নেওয়া হয়নি, কিন্তু আজও সেই ব্যাংকেই আমার অ্যাকাউন্ট আছে। তখন লয়েডস এখন এ এন জেড গ্রিন্ডলেজ।

সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। তবে কাঁদলাম টাঁদলাম না। অপমানে, লজ্জাতে দু'কান জ্বালা করল সারারাত। খাওয়া-দাওয়া, মানে, ভোজন-টোজন তো হলই না। বাড়িতে সকলেরই থমথমে মুখ। বন্ধুরা প্রায় সকলেই আমার চেয়ে অনেকই ভালো ফল করেছে।

আজকে ভাবি যে, আমরা কত ভাগ্যবান ছিলাম। এখনকার দিনে যে সব ছেলেমেয়ে চারশো পাচ্ছে, তাদের তো ঠোঙা বানানো বা রিকশা চালানো চাড়া অন্য কোনও উপায়ই নেই! কোনও ভালো কলেজ তো দূরস্থান, সাধারণ কলেজও তাদের নেবে না।

কিন্তু রিকশা-চালানো বা ঠোঙা-বানানোর মধ্যে লজ্জারই বা কী আছে? এই কথাটিই আজ অবধি বুঝে উঠতে পারলাম না, বোঝাতেও পারলাম না।

গুণটা আমার নয়। দোষটাও আমার নয়।

এখনকার ছেলেমেয়েরাও আমাকে নিজগুণে মার্জনা করে দিও।

গুণ যদি কিছু থেকে থাকে তো, সেটা আমাদের সময়ের, জনসংখ্যা যে কম ছিল, তার। শুধু তাই নয়, আমাদের সময়ে আমাদের শৈশব ছিল, কৈশোর ছিল যৌবন ছিল। কত অবকাশ ছিল নিজেদের ইচ্ছেমতো গড়ে তোলবার। আর এখনকার ছেলেমেয়েদের নিছক 'জীবিকার' জন্যই সবকিছু নিবেদিত হয়ে যাচ্ছে, তাদের 'জীবনকে' দেবার মতো একটুও সময় বেচারারা পাবে কোথা থেকে? এদের কথা ভাবলে, এই গুণী, সিরিয়াস, পরিশ্রমী, মেধাবী ছেলেমেয়েদের দুরবস্থার কথা ভাবলে, এদের মা-বাবাদের হেনস্তার কথা ভাবলে, চোখে জল আসে।

আমরা এদের তুলনায় একেবারেই অপদার্থ ছিলাম। এদের জন্য বড়ো কষ্ট হয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ যে অন্য কিছু বয়ে আনবে এদের জন্য, তেমন আশা করার মতোও তো কিছু নেই। কার সময় আছে এইসব নিয়ে ভাবার? সকলেই তো যে যার দল, যে যার গদি নিয়ে ব্যস্ত।

অথচ প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। পঞ্চাশ বছর। পঞ্চাশ বছরে কী করা যায় তা যুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানি, ইংল্যান্ড এবং জাপান করে দেখিয়েছে। কিন্তু আমরা তা দেখব কী করে! আমাদের চোখই যে চুরি হয়ে গেছে!

আমি নিজে চিরদিনই খারাপ ছেলে বলেই খারাপদের কষ্টের কথা আমি সবসময়েই বুঝি।

কলকাতার জোড়াসাঁকো পেরিয়ে গিয়ে পেল্লায় নাখুদা মসজিদের কাছে কতকগুলো দোকান ছিল জুতোর। সেখানে "রিয়্যাল কাবুলিদের" জন্য রিয়্যাল কাবুলি জুতো বিক্রি হত।

এই সংবাদ পেয়েছিলাম ছোটোকাকুর কাছ থেকে।

ছোটোকাকু চিরদিনই "মারকুইট্টা" ছিলেন। কথায় কথায় হাত চলত। বিশেষ বিশেষ অকেশনে "পাঞ্জার" পকেটে নিয়ে যেতেন। কোমরে বেঁধে নিয়ে যেতেন সাইকেলের চেন।

"পাঞ্জার" ব্যাপারটার অঙ্ক ছিল এইরকম। স্টিলেরও হত, আবার পেতল এবং তামারও হত। হাতের চার আঙুলে একই সঙ্গে পরবার মতো একটি জোড়া-আংটি। তার বেস-টা ছিল, রীতিমত চওড়া। তানপুরার "মোগরা"-র মতো। সেই 'বেস' থেকে চারটি গোল বল, শীতের নদীর বুকের চরের মতো জেগে থাকত।

ডান হাত মুঠি করে, বেঁফোরা বাঁ হাতে পরত, সেই "যন্তর" দিয়ে ঘুসি কষালে অনেক গ্রিক অ্যাপোলোই ইনস্ট্যান্ট চীনেম্যান হয়ে যেত।

ছোটোকাকুকে যদি কেউ ভুলেও বলত "জবান সামহালকে বাত কিজিয়েগা", সঙ্গে সঙ্গে ছোটোকাকু হামলে পড়ে তার তামাম "জবান" যে স্থান দিয়ে নির্গত হয় সেই 'মু'-র অবস্থা এমনই করতেন যে, তা আর কহতব্য নয়। সে হতভাগার "মু"-তে ইনভেরিয়েবলি সেলাই পড়ত, ডাক্তারের ছুঁচ-এর; ঘোড়ার লেজের চুলের।

ছোটোকাকু ওই "রিয়্যাল কাবলি" পরতেন, হাতের পাঞ্জারেরই মতো; পায়ের অস্ত্র হিসেবে।

ভাগ্যে, সে যুগে ক্যারাটে বা কুং-ফু, টুং-ফুর কথা আমরা জানতাম না। ছোটোকাকু যদি রিয়্যাল মাথামোটা মোষের, "রিয়্যাল কাবলি" জুতো পরে কারও তলপেটে লাথি কষাতেন, তবে সেই হতভাগার কিছু প্রত্যঙ্গ মুরগির কাটলেট বানানোর জন্যে পেস্টে-এর মতো হত।

তবু ভাগ্য ভালো যে, এই "রিয়্যাল কাবলি" পায়ে দিয়ে ক্যারাটে করতেন না ছোটোকাকু।

তা, ছোটোকাকু নিজের জন্য যখন কেনেন তখন দয়া পরবশে, ভাইপোর জন্যেও একটি "রিয়্যাল কাবলি" কিনে, প্রেজেন্ট করেছিলেন।

আমাদের পূর্ববঙ্গীয় ভাষাতে ভাইপোকে বলে ভাইস্তা। সব কিছুই "ভ্যাস্তায়" বলেই হয়তো তাদের নাম ভাইস্তা। সেই প্রেজেন্টেড কাবলির ঘাড়ের ওপরে ছিল, সাঁওতালদের মোরগা-লড়াইয়ের লড়াকু মোরগার ঝুঁটির মতো দগদগে লালরঙা পশমের নরম ফুল। কোনো কাবুলি মেয়েরই নিবেদিত কিনা জানা ছিল না। কাবুলের জবরদস্ত পুরুষদের পায়ে হয়তো মেয়েরাই ফুল নিবেদন করে, পার্মানেন্টলি জুতোতে গেঁথে দেয়।

নতুন অবস্থাতে, সেই জুতো পরে হাঁটলে, পায়ের সমুদয় চামড়া, ময়দার চর্বি-পিঠের চর্বির মতো উঠে যেত। যখন কোনও বিশেষ কারণে আমার মন খুব খারাপ হত, তখনই আমি ওই "রিয়্যাল কাবলি"-টি পরতাম। চর্ম-ঘর্ষণের কারণে মনের আর্দ্রতা কেটে যেত।

পরীক্ষার ফল বেরুনোর পরের দিন, বাড়িতে গভীর শোকের দিন; "হররলালকার" প্রমাণ-সাইজের একটি ছিটের হাফশার্ট এবং মালকোঁচা মারা ধুতি পরে নিজেকে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ-পসিব্‌ল করে সাজিয়ে, বেরিয়ে পড়লাম ভাগ্যান্বেষণে।

"সিম্পলিসিটি" এক জিনিস আর "সিম্পলটন" হওয়া আর এক জিনিস। বুঝতে সময় লেগেছিল। সেই অঘটন-ঘটন- পটীয়সী ভাইফোঁটার দিনের পরে আমি আর "মিহিরডা-স্পেশ্যাল" ধুতি পরতে সাহস পেতাম না। তাই মালকোঁচা মেরেই পরেছিলাম।

সেন্ট জেভিয়ার্স' কলেজটির অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা ছিল, বাবার সঙ্গে গাড়ির সহযাত্রী হিসেবে, নিউ মার্কেটে যাবার পথে এবং বাবার অফিস্ যাওয়ার পথে বহুবারই কলেজটি দেখেছিলাম। নিজে চিনে যাওয়াটা মুশকিল ছিল না। তাছাড়া ভরসা ছিল, আট নম্বর বাস।

সর্দারজিদের বাস। তখন সব বাসই সর্দারজিদের ছিল। আট নম্বর বাসের ভিতরের লম্বা লেডিজ সিটের মাথার উপরে লাল-নীল গোলাপ ফুল আঁকা থাকত। আর লেখা থাকত : "BEAUTY IS TO SEE NOT TO TOUCH, FLOWER IS TO SEE NOT TO PLUCK."

সেন্ট জেভিয়ার্স' কলেজ সম্বন্ধে একটাই ভীতি ছিল। তা হচ্ছে, সাদা আলখাল্লা পরে অনেক পাদরিসাহেব সেখানে ঘুরে বেড়ান এবং কথাবার্তা সর্বক্ষণ ইংরেজিতেই বলতে হয়। আমার মতো বাংলা-মিডিয়াম স্কুলের ছেলেদের কাছে অনর্গল ইংরেজি বলা আর নিমপাতা চিবনোর মধ্যে কোনওই তফাত ছিল না।

ইংরেজি শিখেই আমরা জাত হিসেবে উচ্ছন্নে গেলাম। ইংরেজি বলতে বা লিখতে পারার সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার যে কোনোই সাযুজ্য নেই, রামায়ণ-মহাভারত-বেদ্-উপনিষদ-কোরানের শিক্ষাও যে শিক্ষা, এই সত্যটা কবে যে আমরা বুঝতে শিখব তা জানি না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরের এই ইংরেজির দাপটে সংস্কৃত, উর্দু, এবং ফারসির মতো উচ্চশ্রেণির

ভাষাও কবরস্থ হল। তাছাড়া আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে ওই সব ভাষার যোগ ছিল গভীর। ইংরেজি শিখে আমরা স্বাধীন হয়ে Anglo-Indian সংস্কৃতিতে শামিল হলাম। পরাধীনতার সময়ে যে সংস্কৃতি দূষণীয় ছিল।

পাঠক! ইংরেজি ভাষাটা আজকের কলকাতায় যেমন প্লেইন-দোসারই মতো সহজলভ্য এবং সহজপাচ্য হয়ে গেছে, সেদিন তেমন আদৌ ছিল না। যারা "বড়লোকের ছেলে" বা "বড়োঘরের ছেলে" বা যারা "সেন্ট জেভিয়ার্স" অথবা "লা-মার্টস" স্কুলে পড়াশোনা করেছে; তারা ছাড়া ফটাফট ইংরেজি বলা লোক কমই পাওয়া যেত।

আজকাল যেমন আচারের বা দাদের মলমের সেলসম্যানও ফটাফট ইংরেজি বলেন কিন্তু একটি প্যারাগ্রাফ ভালো ইংরেজি লিখনেওয়ালা ক্রমশই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে; তেমনই, সেদিন দুর্দান্ত ইংরেজি লিখিয়ে মানুষ সহজেই পাওয়া যেত কিন্তু বলার সুযোগের বা ইচ্ছার অভাবে ইংরেজি বলিয়ে লোক কিন্তু খুব কম পাওয়া যেত। মফস্বল শহরের কলেজে সদ্য-চাকরি পাওয়া ইংরেজির লেকচারারেরা অনেকেই নিউ মার্কেটে ঘুরে ঘুরে "Take take, no take, no take, একবার তো see" বলা দোকানদারদের সঙ্গে মিথ্যে দরদাম করে ইংরেজি বলা প্র্যাকটিস করতেন। জড়তা কাটাতেন।

উনিশশো সাতচল্লিশ অবধি আমরা ইংরেজদের পরাধীন ছিলাম বলেই ইংরেজি জানাটা আর বিশেষ করে "কপচানো"-টা, আর "শিক্ষাটা" আজকের মতো এমন সমার্থক হয়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝেই ঘোর সন্দেহ জাগে মনে যে, পরাধীনতার সময়েই কি আমরা যথার্থ স্বাধীন ছিলাম? না এখনই পরাধীন?

দ্যা গ্রেট ইন্ডিয়া হেটার, দ্যা গ্রেট মিস্টার উইনস্টন চার্চিল যে আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এই অবস্থা দেখে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হবার উল্লাসে, আহ্লাদে, তাঁর কফিনের মধ্যে উঠেই বসেন না বার বার, সে কথা হলফ করে বলা যায় না।

ইংরেজি শিক্ষা এদেশের কতখানি ভালো করেছে আর কতখানি ক্ষতি; তার সমীক্ষা করার প্রয়োজন অবশ্যই হবে ভবিষ্যতে। আজকের এই ইংরেজি-শিক্ষা, ইংরেজিয়ানা; "ভারতীয়ত্ব"-র ক্ষতি যে অবশ্যই করেছে, সে বিষয়ে আমার নিজের অন্তত কোনওই সন্দেহ নেই।

আট নম্বর বাস থেকে, পার্ক স্ট্রিট আর সার্কুলার রোডের মোড়ে নেমে, গুটি গুটি হেঁটে তো সেন্ট জেভিয়ার্স' কলেজের চত্বরে প্রথমবার ভয়ে ভয়ে পা দিলাম।

নিস্তব্ধ; নির্জন। যাঁরা আছেন ভিতরে, তাঁরাও নিচু স্বরে ফিশ-ফিশ করে কথা বলছেন।

আমাদের সময়ের তীর্থপতি স্কুলের সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের মাঠ বা ইস্ট বেঙ্গল-মোহনবাগানের মাঠের বিশেষ তফাত ছিল না বললেই চলে। সেথায় উপস্থিত ব্যক্তিদের অকারণে উল্লাসের ও উচ্চরবে কথোপকথনের কথা চিন্তা করেও মন যুগপৎ আহ্লাদ এবং বিষাদে ভরে গেল। ভাবছিলাম, কোন্ জিয়ন-পুরের স্বর্গে বাস ছিল, আর এ-কোন্ মৃতদের নিস্তব্ধ রাজ্যে এসে পড়লাম। এ যে কবরখানা! ঠান্ডা ঠান্ডা, ভয় ভয়, নিশ্চুপ পরিবেশ। ঝকঝকে তকতকে মেঝে। তাতে আবার আমার "রিয়্যাল কাবলি" এতই মসমস আওয়াজ করছিল যে, প্রত্যেকেই বিরক্তির চোখে তাকাচ্ছেন আমার দিকে।

অফিসটি খুঁজে নিয়ে ফর্ম-এর কথা বললাম। চারশো আঠাশ পেয়ে, সায়ান্স পড়তে চাইলে, কুকুর লেলিয়ে দিতেন হয়তো। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট কমার্স অর্থাৎ আই কম শুনে, ফর্ম দিলেন। কমার্সের ওজন তখন কমই ছিল। বি কমেরও, কমই। কিন্তু আমরা যখন "কৃতবিদ্য" হলাম, তখন চিত্র সম্পূর্ণই বদলে গেছিল।

বঙ্গভূমে কোন্ জীবিকার পেশার কোন্ সময়ে কতখানি কদর, তা রবিবারের বাংলা কাগজের, বিশেষ করে আনন্দবাজারের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন নজর করলেই বোঝা যায়। যখন কলেজে ভরতি হতে গেছিলাম উনিশশো বাহান্নতে, তখন এঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তার পাত্রদের কদর ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সেই দশকের শেষ দিকেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পাত্রদের চাহিদা এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারদের থেকে অনেকই বেড়ে গেছিল। সাম্প্রতিক অতীতে, ব্যাংক-অফিসারদের চাহিদাও বেড়েছিল। পড়ে

যাবে হয়তো, হর্ষদ মেহেতা কেলেঙ্কারি এবং বড়ো বড়ো ব্যাংকের চেয়ারম্যানদের পটাপট চাকরি যাওয়ার পরে।

কখন যে কাদের কদর বাড়ে, আর কাদের কমে, তা কে বলতে পারে? তাই "কম বা "বেশি নিয়ে হীনমন্যতা ব উচ্চমন্যতার কারণ নেই কোনও।

ফর্ম ভরতি করে, টাকা দিয়ে তো জমা করে দিলাম। কিছুদিন পরে চিঠিও এল। নির্ধারিত দিনে " নির্ধারিত সময়ে", "প্রিফেক্ট"-এর ঘরে ডাক পড়ল।

আমার পাশে একটি ছেলে বসেছিল, অন্য কোনও বাংলা-মিডিয়াম স্কুল থেকে আসা। সে আগ বাড়িয়ে আমাকে হৃদ্যতার সঙ্গে বলল, "যান, পারফেক্ট আপনাকে ডাকছেন।"

তার চেয়ে আমিও কিছু বেশি বুদ্ধি ধরতাম না। "প্রিফেক্ট" নামের একটা গাড়ি ছিল, আমেরিকান ফোর্ড কোম্পানির। ছোটো গাড়ি। ভণ্টু কাকু, বাবার বন্ধু; তাঁর একটি ছিল। সব কলেজেরই প্রিন্সিপাল হয় জানতাম, "প্রিফেক্ট" হতে গেলেন যে উনি কেন, তা স্থূল বুদ্ধিতে কুলোল না।

স্টিলের ফ্রেমের চশমা-পরা, বেঁটে-খাটো এক ভদ্রলোক, সাদা, পাতলা কাপড়ের পাদরির পোশাক পরা, ঝকঝকে টেবলের সামনে বসেছিলেন।

ঘরে ঢুকেই বললাম, গুডমর্নিং স্যার।

উনি আমাকে আপদমস্তক আমার "রিয়্যাল কাবলি" সুদ্ধু মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করে, জিজ্ঞেস করলেন, "হুইচ স্কুল দু য়্যু কাম ফ্রম?

কিন্তু উচ্চারণ শুনে মনে হল, যে উনি ইংরেজ নন, ইউরোপের কোনও দেশের হবেন।

আমি মাথা নিচু করে আমার বাংলা-মিডিয়াম স্কুলের জন্য লজ্জিত হয়ে বললাম, তীর্থপতি ইনস্টিট্যুশন।

পরক্ষণেই চমকে উঠলাম ওঁর গলার স্বরে।

উনি বললেন, 'ওহ! তীর্তপতি ইনস্টিট্যুশন! দ্যাতস আ ভেরি গুড স্কুল। থো মেনি গুড স্টুডেন্টস কেম ফ্রম দ্যাত স্কুল।"

শুনেই তো আমার হরলালকার "প্রমাণ" সাইজের শার্ট- পরা বুকের ছাতি "প্রমাণ" সাইজ ফুলে উঠল।

পরে বুঝেছিলাম যে, ভাল স্কুলিংটা অত্যন্ত জরুরি ও জীবনের পথে মস্ত সহায়ক যদিও হয়, ভালো স্কুল, স্বভাবতই ভালো ছেলে তৈরি করতে পারে না। তেমনই আবার তথাকথিত অনামী স্কুলের ছাত্র মাত্রই খারাপ হয় না। ভালো ছেলে, তার নিজের গুণেই ভালো হয়, যদিও ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সে স্কুলই হোক বা কলেজ, যে শিক্ষা দেয়; তাকে কতটা নিতে পারে, তার উপরেই সব নির্ভর করে। নেওয়ার ক্ষমতা বা ইচ্ছা প্রত্যেক ছাত্রের কখনওই সমান হয় না। হলে, আমি স্কুল-ফাইনালে অনেক ভাল ফল করতে পারতাম। জীবনে বড়ো হব, দশজনের একজন হব, এই জেদও সকলের থাকে না, যেমন আমার ছিল না। আর থাকে না বলেই, দেশের সবচেয়ে ভালো স্কুল-কলেজে পড়েও অনেকে খারাপ হয়, ছাত্র হিসেব এবং জীবনে তো বটেই, জীবিকাতেও ব্যর্থ হয়।

আমার এই ধারণা যদি ভ্রান্ত হত, তাহলে ইংল্যান্ডের "হ্যারো" বা "ইটন"-এর বা ভারতের ডুন স্কুল এবং অগণ্য পাবলিক স্কুল, যেখানে রাজা-মহারাজা বা বড়ো বড়ো শিল্পপতি এবং পেশাদারদের ছেলে-মেয়েরাই শুধু পড়াশোনা করার সুযোগ পায়, দেশের উজ্জ্বলতম রত্নদের প্রসব করতে পারত। বাস্তবে তো তা হয় না। অখ্যাত কলেজের সেকেন্ড ক্লাস এম এ -রা কী করে তাহলে প্রাবাদ-প্রতিম অধ্যাপক হন? পরীক্ষাতে অনেকবার ফেল-করা ডাক্তার কী করে প্রবাদ-প্রতিম ডাক্তার হন? বা, অন্য পেশার মানুষ?

অবশ্য একথাও ঠিক যে উলটোটাই সত্যি। মেধাবী ছাত্ররা এবং ভালো স্কুল-কলেজের ছাত্ররাই জীবিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণত উপরে উঠে আসে যে এমনই দেখা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভালো স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা আদৌ খারাপ হয় কেন? ভালো ভালো কলেজে ভর্তির সময়ে এমন ছেঁকে ভর্তি করা সত্ত্বেও সেই সব প্রতিষ্ঠানের সব ছেলেমেয়েই, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থানে থাকে না কেন?

তীর্থপতির আমার পূর্বসুরিরা, সেন্ট জেভিয়ার্সে এসে অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে যদি প্রমাণ করে গিয়ে থাকেন তাঁদের নিজেদের মেধাতে এবং ব্যবহারে যে, তীর্থপতি ভালো স্কুল, তাহলে স্কুল এবং সেই সব ছাত্র উভয়েরই গর্বিত হবার কথা। এখানে বলে নেওয়া দরকার যে, শুধু পূর্বসূরিরা নয় উত্তরসূরিদের মধ্যে তীর্থপতির বহু উজ্জ্বল ছাত্র এ-শহরের অনেক প্রথম সারির কলেজকে গর্বিত করেছে। তবে এসব নেহাতই "অ্যাকাডেমিক ডিসকাশান।"

তীর্থপতি থেকে সেন্ট জেভিয়ার্সে', এই নরাধমের কোনওই উন্নতি হয়নি বিশেষ। না গর্বিত করতে পেরেছি স্কুলকে; না কলেজকে।

আমার বরিশাল জেলার স্কুলের সহপাঠী এবং মেধাবী বন্ধু মঞ্জুর-উল-করিম, যাকে, "ঋভু"-র প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করেছি, বাহান্নতেই অবিভক্ত-পাকিস্তানের স্কুল ফাইনাল বা ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে প্রথম হয়েছিল।

বরিশালের জেলা স্কুলের আরেকজন সহপাঠী ও বন্ধু দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর (পাহাড়ী) জন্যেও আমি গর্বিত। সে এখন ব্যাঙ্গালোরের ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে একটি বিভাগের কর্তা। ওর বাবা ছিলেন বরিশালের বিখ্যাত ব্রজমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল।

দেশভাগের বেশ কিছুদিন পর পাহাড়ী আমাকে চিঠি লিখল, একটি মিলিয়ন-ডলার প্রশ্ন করে, যে; তোদের স্কুলটি কেমন?

আমার স্কুল খারাপ, যে এই কথা বলে, সে বড়োই নীচ। তাছাড়া খারাপ তো নয়ও। অনামী হতে পারে। অতএব, আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর গেল যে, "ভালো"।

পাহাড়ী বরিশাল ছেড়ে এসে তীর্থপতিতে ভরতি হল।

কিছুদিন বাদেই সে বলল, তুই ভালো বলেছিলি কেন?

বললাম, ভালোকে কী বলব?

ও বলল, বাথরুমের দেওয়ালে যেসব ছবি আর কথা আঁকা ও লেখা আছে, তা কি ভালো?

বললাম, বাথরুমে তো আর পড়াশোনা হয় না। সেখানে অন্য কর্ম করতে স্বল্পক্ষণের জন্যে যাওয়া। তার দেওয়াল-লিখনের সঙ্গে স্কুলের ভালো-খারাপের সম্পর্ক কী?

দেওয়াল-লিখন ব্যাপারটার জন্যই পাহাড়ী আমাদের ত্যাগ করে বালিগঞ্জ গভের্নমেন্ট স্কুলে চলে গেল।

আমার বাবাও সরকারি অফিসার ছিলেন, তবু আমাকে ভরতি করেননি বলিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে শিশু বয়সেই, কারণ, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে একটি শিশুর পক্ষে আর্মির মানুষ-খেকো ট্রাক-অধ্যুষিত কলকাতার পথে একা একা রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়ি থেকে হেঁটে হেঁটে যাওয়া অত্যন্তই বিপজ্জনক ছিল। তাছাড়া, রাসবিহারী থেকে কোনও সরকারি বাসরুটও ছিল না। ট্রাম তো ছিলই না। সেখানে ভরতি হতে পারলে, হয়তো যত বড়ো বাঁদর হয়েছি, তত বড়ো বাঁদর হতাম না।

বরিশাল জেলা স্কুলে অবশ্য আমানতগঞ্জ থেকে অনেক মাইল পথই দু'বেলা পায়ে হেঁটে পড়তে যেতাম। অবশ্য, তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। তাছাড়া উপায়ও ছিল না। তীর্থপতিতে ভরতি হয়েছিলাম টু বা ক্লাস থ্রি-তে, রংপুর জেলা স্কুল থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এসো।

"দেওয়াল-লিখন" ব্যাপারটা যে কতখানি প্রলয়ংকরী হতে পারত, তা পাহাড়ী মেধাবী বলেই তার কৈশোরেই, চল্লিশের দশকেই বুঝে ফেলেছিল। নকশাল আন্দোলন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি।

পাহাড়ীদের বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের একটা বড়ো দল এসে সেন্ট জেভিয়ার্সে ভরতি হয়েছিল। পাহাড়ী গেছিল প্রেসিডেন্সিতে। ওদের ব্যাচের মেধাবী ছাত্র দেবু, দেবব্রত হুইও প্রেসিডেন্সিতে গেছিল। দেবুরা বালিগঞ্জ প্লেসে থাকত।

মাঝে মাঝে, বাবার কার্ফু-অর্ডার লঙ্ঘন না করে, কলেজের পরে, ঢাকুরিয়া লেকের পাশের একটি বিশেষ বেঞ্চে আমরা আড্ডা মারার জন্যে জমায়েত হতাম। আমি ফিরে যেতাম সন্ধের আগেই। রজত রায়চৌধুরী, গৌতম মিত্র (কয়েক মাস আগে কলকাতা থেকেই রিটায়ার করা, আর্মির জেনারেল

গৌতম মিত্র), সুমন্ত্র বসু (বাপি), দেবু (ছুই) এবং আরও অনেকেই থাকত রাত অবধি। প্রেসিডেন্সি, সেন্ট জেভিয়ার্স' এবং অন্যান্য কলেজে ছিটকে-ছাটকে গেলেও বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের ছেলেরা, স্কুলের-বন্ধুত্ব সহজে ছিঁড়তে রাজি ছিল না। এটা বোধহয় ওই স্কুলের ছাত্রদের একটি ট্র্যাডিশান এবং সেজন্যে তাদের গর্বিত হবার ন্যায্য কারণ আছে।

প্রথম দিন কলেজে গেলাম, সেদিনটির কথা বলি। কারণ, স্পষ্ট মনে আছে সেদিনটির কথা। সকলেরই হয়তো মনে থাকে।

সেদিন আট নম্বর বাস না পেয়ে সার্কুলার রোডে, এখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড; আর হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের মোড়ে নেমে হেঁটেই গেলাম। ঢুকলাম পেছনের গেট দিয়ে। প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। তার একপাশে স্কুলের ছেলেদের লাঞ্চ খাওয়ার জায়গা। আর পিছনে খ্রিস্টান ছেলেদের হস্টেল। টেনিসের হার্ড-কোর্ট।

ক্লাসে ঢোকার আগেই আমাদের ক্লাসেরই একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল, মাঠের মধ্যেই। লম্বা, চশমা-পরা, তীক্ষ্ণ নাক, প্রশস্ত কপাল, মুখে ব্রণ; ধুতি ও ফুলহাতা শার্ট পরা। শার্টের হাতা গোটানো। নাম বলল, দীপক চক্রবর্তী। আর্টস স্ট্রিমের। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিট্যুশন থেকে এসেছে। ওই প্রথম বন্ধু হল।

তারপরে গৌতম, রজত রায়চৌধুরী, সুমন্ত্র বসু (বাপি), অরুণ দাম (পূর্বা দাম, যার স্ত্রী), নির্মলেন্দু সেনগুপ্ত, কচি (সুমোহন ঠাকর), সত্যব্রত রায়চৌধুরী (ভালো সেতার বাজাত, দাড়ি ছিল এবং পরে অধ্যাপনাতে ঢুকেছিল), সমীর, (শম্পু) সেন, (টেস্ট ক্রিকেটার খোকন সেনের ভাই), রাজু ঘটক (আর এন ঘটক; এলগিন রোডের ঘটক বাড়ির); সঞ্জয় ভট্টাচার্য (শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের একরকমের নাতি), অমিতাভ ব্যানার্জি (কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্যালক), অনুপম রায়চৌধুরী এবং আরও অনেক বাঙালি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়।

সেন্ট জেভিয়ার্স' কলেজের অবাঙালি যেসব ছেলের সঙ্গে আলাপিত হই তাদের জেনে, অশেষ উপকৃত হয়েছিলাম। কারণ তারাই হল আমার প্রথম 'ভারত-দর্শন'।

উনিশশো বাহান্নতেও, কলকাতার মালিক বাঙালিরাই ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, বেসরকারি ও সরকারি, দোকানদারি—এসব অধিকাংশই তখনও বাঙালিদের হাতেই ছিল। এখন বিরানব্বইতে সে বাঙালিদের খুঁজে বের করতে হয়।

তখন, অবাঙালিদের সঙ্গে মেশার সুযোগ-সুবিধা ছাত্রবস্থাতে কারোরই বিশেষ ছিল না। সেন্ট জেভিয়ার্স' কলেজ আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছিল।

আমাদের স্কুলে পড়ত জগদীশ চৌখানি, ফিল্মের ব্যবসা ছিল ওর বাবার। দেশপ্রিয় পার্কের কোনাতে, মতিলাল নেহরু রোর্ডের ওপরে ওদের বাড়ি ছিল।

আমার নিজের জগতকে বড়ো করতেই, কলেজে ঢুকেই ক্লাসের নানারকম ছাত্রদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করেছিলাম প্রথমেই। তখনও কিন্তু বাঙালিরা নিজেদের সবসময়ে আলাদা করেই রাখত দেখতাম। অফ-পিরিয়ডে বাঙালি ছেলেরা আলাদা হয়ে গল্প করত। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কম সহপাঠীকেই দেখেছি। উচ্চমন্যতা, তখনও প্রখর ছিল। আরও কতদিন আমরা এই দুরারোগ্য রোগে ভুগব, জানি না।

অবাঙালি বন্ধুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ছিল। ভিনয় নিভাটিয়া; (কুসুম প্রডাক্টস)। ভিনয় খুব ভালবাসত আমাকে। পড়াশোনাতেও খুব ভালো ছিল। বি কম-এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। অবাঙালিরা উচ্চারণ করতো "ভিনে"।

অধিকাংশ মাড়োয়ারি সহপাঠীরা তখন ব্যবসাও দেখত, আবার কলেজেও পড়ত। বিশেষ করে বি কম পড়ার সময়ে। বিজয় সোয়াইকা, হরি বাজোরিয়া, মোহন সিংঘি, মোহন বছর কয়েক আগে ক্যালকাটা ক্লাবে সকালে টেনিস খেলতে খেলতেই চলে গেছে, দীনেশ চানচানি, দীনুভাই, হরনন্দন ট্যান্ডন, ট্যান্ডনেরা ছিল উত্তরপ্রদেশীয়, এটাওয়ার কাছে বাড়ি ছিল ওদের, খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল, এখন স্টেটসে থাকে। জিমি সুটারিয়া। আরও অনেকে। আস্তে আস্তে সব নাম মনে পড়বে। নেপালের

রাজপরিবারের একটি ছেলে ছিল। খুব লাজুক, সিরিয়াস এবং বিনয়ী। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেও করা যায়নি। একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছেলে ছিল, খুব সিরিয়াস এবং ভদ্র। ডা-সিলভা। খুব কম কথা বলত।

ডা-সিলভা ছাড়া খ্রিস্টান ছেলেরা অনেকই ছিল, যেমন হরিশ জেমস, হ্যারি জেমস। সম্ভবত এখন পুলিশের আই জি হয়েছে। ওর দাদা ছিলেন ইনকাম ট্যাক্সে। তাঁকে পরে, পেশার জীবনে চিনেছি।

প্রথম দিনের কথাতেই ফিরি। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্লাস। আমাদের হাতে অঢেল সময় ছিল। এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো আমরা "পল-সায়েন্স" বলতাম না, অধ্যাপকদের ইনিশিয়ালস ধরে উল্লেখ করতাম না। ফাদার লে জলি ক্লাস নিচ্ছেন। বেলজিয়ামের এক রাজপরিবারের ছেলে। নীল-রঙা চোখ। দোহারা, লম্বা, হ্যান্ডসাম চেহারা। মাথাভর্তি সুন্দর বাদামি চুল।

তীর্থপতি স্কুল ভার্সাস' সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। তীর্থপতি স্কুল ব্যাটিং, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ বোলিং।

প্রথম বল : "আ তেত, ইদ আ পোলিতিকাল অর্গানাইজেশন—ন-ন্-ন-ন্"।

একেবারে ঝনঝনায়মান বাম্পার! "আ স্টেট ইজ আ পোলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন।"

মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। প্রথম বলটিই খেলা গেল না।

বুঝলাম যে, অধ্যাপকেরা কে কী বলছেন, তা বোঝার আগে, তাঁদের ভাষা বুঝতেই এই তালেবরের ছ'মাস লাগবে। তার পরে, তা হজম করার ব্যাপার! এ যে কী বিপদেই পড়লাম!

আমাদের সময়ে, সেন্ট জেভিয়ার্সে'র মাস্থলি টেস্টের রেজাল্ট আবার ডাকে যেত, গার্জেনের নামে বাড়িতে। ভাগ্যিস ডাকে যেত। আমার গার্জেন বাবা, আমার সৌভাগ্য, তা জানতেনই না। এবং বাবা তখন পেশাতে আরও অনেকই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সব রেজাল্টই ডাক বাক্স থেকে আমিই নিজ দায়ে এবং নিজ কৃতিত্বে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম।

প্রথম ছ' মাসে অ্যাভারেজ নাম্বার পেলাম পঁচিশ পার্সেন্ট। অ্যাডিশনাল ম্যাথসে যে নম্বর পেয়েছিলাম। অ্যাডিশনাল ম্যাথস-এর পঁচিশ, সারাটা জীবনই আমার পিছু নিয়ে বেড়াবে। যেখানেই নাক গলাই, মাথা ঢোকাই, সেখানেই পঁচিশ। "নিহিল্ অ্যালট্রা"-র ছত্রছায়াতে এসেও মুক্তির উপায় হল না।

ভেবেছিলাম, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভরতি হয়ে ক্রিকেট টিমে খেলব।

আমাদের সহপাঠী কুট্টু (কুণাল দত্ত) খুব ভালো ক্রিকেটার ছিল। কিন্তু নেটে পড়বার আগেই বাবার ফতোয়া এল : এন সি সি-তে নাম লেখাও।

মেজর নিয়োগী, সায়েন্স স্ট্রিমের অধ্যাপক, বাবার সঙ্গে আরবান ইনফ্যান্ট্রিতে (টেরিটোরিয়াল আর্মি) ছিলেন। তিনিই কুমন্ত্রণাদাতা।

ক্রিকেট খেলা মাথায় উঠল।

অন্য ছেলেরা যখন কোলবালিশ জড়িয়ে পাড়ার বা বেপাড়ার কোনও সুন্দরী মেয়েকে মনে করে, পাশ ফিরে শোয়; তখন আমরা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত নির্বিশেষে আপাদমস্তক অলিভ-গ্রিন মিলিটারি পোশাক করে, বুট-পট্টি লাগিয়ে, টুপি ঠিক করতে করতে দৌড়োতে ময়দানের দিকে এগোই। ডোভার রোড থেকে সরাসরি বাসও ছিল না। তাই, অনেকই আগে বেরোতে হতো।

যখন রণক্লান্ত সৈন্যের মতো, কাদা মেখে, ঘর্মাক্ত হয়ে, বাড়ি ফিরে নাকে-মুখে দুটি গুঁজে, কলেজ যাবার জন্যে দৌড়োতাম, তখন পাড়ার রকে-বসা, 'গণ-চ্যাংড়ারা' আওয়াজ দিত : 'ঘাস-বিচালি। ঘাস-বিচালি। ঘাস।'

লেফট-রাইটের বিকল্প আর কী!

রাগে গা জ্বলে যেত।

পুরো দু'বছর এন সি সি করেছিলাম। প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার এবং প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ক্যাম্প, তাও রাঁচির কাছে, রাঁচি-ঝালদার পথে, এক বিশ্ব-টাড় জায়গা, বাগাইচাটোলিতে।

সেই ক্যাম্পের গল্প, পরে রসিয়ে করা যাবে।

এন সি সি-তে সার্জেন্ট ছিল সি এল (ছগনলাল) পার্সন। দেখতে সাহেবদের মতো। আসলে পাঞ্জাবি। আমাদের এক বছরের সিনিয়র ছিল। কেন জানি না, তার আমাকে খুবই ভালো লেগে গেল। মিলিটারি সায়েন্স সোসাইটি ছিল আমাদের কলেজে। পার্সন ছিল তার সেক্রেটারি।

একদিন ময়দানে ড্রিলের পর আমাকে বলল, তোমাকে ইলেকশনে দাঁড়াতে হবে।

কিসের ইলেকশন?

মিলিটারি সায়েন্স অ্যাকাডেমির সেক্রেটারির পদের ইলেকশন।

আমি দুই কানে দুই হাত ঠেকিয়ে 'তওবা'! 'তওবা'। করার মতো করে বললাম, কখনও নয়। আমার বাবা বলেন, ইলেকশনে দাঁড়ায় মতলবাজেরা। নয়তো বড়লোকের ছেলেরা, যাদের খেটে খাবার দরকার হয় না।

কেন জানি না, বাবা এই কথা বলতেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে, যখন অনেকই জায়গা থেকে, পেশা, নেশা, ক্লাব, সাংস্কৃতিক-গোষ্ঠী ইত্যাদি অনেক প্রতিষ্ঠানেই আমাকে ইলেকশানে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন পরিচিতরা, আমি সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাটলি রিফিউজ করেছি একবার ছাড়া। সেবারে দাঁড়িয়ে, যদিও বা পিতৃবাক্যের শিক্ষা অপূর্ণ ছিল; তা পুরো হয়েছিল।

কিন্তু পার্সন নাছোড়বান্দা। পরে জেনেছিলাম যে, সেই 'উচ্চপদের' উপর ওর কোনও পয়লা নম্বরি শত্রুর লোভ ছিল, তাই আমাকে দাঁড় করিয়ে, সে তার শত্রুর উচ্চাশাকে একেবারে 'নিপ্‌ট ইন দ্যা বাড' করে দিতে চেয়েছিল। ইলেকশন-ফিলেকশনে দাঁড়ালে এই হয়। হয় নিজের উচ্চাশা 'নিপ্‌ট ইন দ্যা বাড' হয়, নয়তো পরের আশাকে তাই করতে হয়। যাই হোক, পাঞ্জাব-তনয়ের, আমার ওপর এত ভরসা দেখে এবং বারংবার পীড়াপীড়িতে 'হ্যাঁ' করে দিলাম।

আমরা ছিলাম 'এ' কোম্পানিতে— আশুতোষ কলেজ এবং সেন্ট জেভিয়ার্স। এন সি সি-র সেকেন্ড বেঙ্গল ব্যাটালিয়নে তখন চারটি কোম্পানি ছিল।

ওদিকে ইংরেজি বলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের ভাষায়, খারাপ রান্নায় লংকা ঠেসে দিয়ে গাঁক গাঁক করে ইংরেজি বলা যাকে বলে, তেমনই করে ইংরেজি বলছি।

আমার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সহপাঠী, ডা-সিলভা, পারসি সহপাঠীরা, জিমি সুটারিয়া, বাবা আদম (ইভ ওকে দিয়েই আপেলটা খাইয়েছিল) স্যামি মেঢোরা ইত্যাদি এবং লা-মার্টস এবং সেন্ট জেভিয়ার্স' স্কুলের প্রায়-সাহেব 'CORP'-দের সঙ্গে প্রচুর হৃদ্যতা হয়েছে। এমন অনর্গল ইংরজি বলেছি তিনমাসের মধ্যে যে, 'যার নেই কোনও গতি, সে যায় তীর্থপতি' থেকে এসেছি, তা নিজেরই পেত্যয় হচ্ছে না।

একদিন করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ শম্পু কাকে যেন বলল, 'ডোন্ট বি ইনকুইজিটিভ'।

'ইনকুইজিটিভ'।

ইনকুইটিজিভ শব্দটার মানে জানতাম না। তবে ঈশ্বর, প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আমাকে অনেক খামতিই পূরণ করে দিয়েছিলেন। যদিও, তা মাঝে মাঝেই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো হত। মানেটা, কী হতে পারে, আন্দাজ করে নিলাম। তারপর বাড়ি গিয়েই ডিকশনারি দেখে বুঝলাম যে, যা আন্দাজ করেছিলাম, তাই ঠিক।

এমনি করে করেই সাহস ক্রমশ বাড়তে থাকল।

অবাঙালিদের সঙ্গে বেশি মিশতে লাগলাম ইংরেজি আর হিন্দিটা সড়গড় করে নেওয়ার জন্য। তারাও আমাকে লুফে নিল। তবে অবাঙালি ছেলেদের মধ্যেও হিন্দি-মিডিয়াম স্কুলের ছেলেরাও ছিল। প্রত্যেকেই প্রবল বেগে সাহেবদের মতো ইংরেজি বলার চেষ্টা আপ্রাণ করতে লাগল বটে, তবে প্রথম পনেরো থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ড সাহেবি ইংরেজিতে চালিয়ে, তারপরই ধরাধামে প্রত্যাবর্তন করত : বাঙালি, বাঙাল, হরিয়ানা, গুজরাতি, পাঞ্জাবি, মারাঠি অ্যাকসেন্ট প্রবল আকার ধারণ করত। অবাক হয়ে যেতাম প্রিফেক্ট, ফাদার স্কেফার্স, ফাদার লে-জলি, ফাদার ট্রুমসের ক্ষমতা দেখে। তাঁরা এইরকম হেটারোজেনাস এলিমেন্টসের মুখে ইংরেজি শুনেও হাঁসেদের মতো 'ক্ষীরম অম্বুমধ্যাৎ', অর্থাৎ জলের থেকে দুধ শুষে নেবার মতো আমাদের বক্তব্যের সারবস্তু বুঝে নিতেন। কখনওই খারাপ ইংরেজি বলার জন্য বকতেন না।

আজকালকার ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলের 'মিস'রা যেমন বাচ্চাদের বাড়িতে ইংরেজি বলতে শেখান মা-বাবাকে বাচ্চাদের সঙ্গে ইংরেজি বলতে বলেন, সেই প্রক্রিয়াটাই আমাদের স্বীয় চেষ্টাতে করতে হয়েছিল, যৌবনোদ্গমের পরে। তবে আজকালকার দিদিমণি অথবা বাচ্চাদের সঙ্গে আমাদের তফাতটা এই ছিল যে, ইংরেজি বলা (জানা নয়) আর শিক্ষাকে, আমরা কখনওই সমার্থক বলে ভাবিনি। নিজের নিজের মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধও হইনি। নিজের নিজের মাতৃভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা সম্বন্ধে সুতীব্র উৎসাহ রেখেই ইংরেজি বা ইংরেজিয়ানার দিকে ঝুঁকেছিলাম। রবি ঠাকুর, অবন ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি, যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, সুকুমার রায়, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ, তারাশঙ্কর, মানিকবাবুর বা মালতী ঘোষাল বা জর্জ বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বিদেশি সাহিত্য, বিদেশি সঙ্গীত বিদেশি চিত্রকলা সম্বন্ধে সমান ঔৎসুক্য বজায় রেখেছি। কোনও কোনও পশ্চিমের পা-চাটা এঁচড়ে-পাকা কালো সাহেব আঁতেলের মতো বাখ-বিটোভেন-মোৎজার্টকে কৃষ্ণনামের মতো জপ করিনি, সাহেবদের পিঠ-চাপড়ানি বা হাততালি পাবার জন্যে। আমরা যে আমরাই, আর ওরা যে ওরা; আমাদের নিজস্ব সব কিছু নিয়েও যে গর্ব করার কিছু কম নেই, এই বোধটা আমাদের মধ্যে ছিল যে বোধ, খুবই দুঃখের কথা এই যে গত দুই দশকে একেবারেই শেষ হয়ে যেতে বসেছে।

আমাদের ক্লাসে একটি মুসলমান ছেলে ছিল। আমাদের, অন্তত আমার বিশেষ বন্ধু, হানিফ মহম্মদ। কালো, মিষ্টি চেহারা, ছিপছিপে। বছর দশেক আগে একবার হঠাৎ বম্বে বা ব্যাঙ্গালোরের ফ্লাইটে দেখা হয়েছিল। তখন আমি ওর নাম মনে করতে পারিনি কিন্তু ও পেরেছিল। করমর্দন করে, হাসি-ঠাট্টাও করেছিলাম কিন্তু লজ্জাতে ওর নামটা জিগ্যেস করতে পারিনি, পাছে ও দুঃখ পায়। অথচ আজ এতদিন পরে হঠাৎই মনে পড়ে গেল।

হানিফ ছিল অধ্যাপক বি বি চ্যাটার্জির 'জানি-দুশমন'। দুশমনির কারণ অন্য কিছুই নয়। চ্যাটার্জি সাহেব ছিলেন লেফটেন্যান্ট, আমাদের এন সি সি-তে। ইকনমিক্স পড়াতেন উনি। অনেকদিন সোজা প্যারেডের ময়দান থেকেই ক্লাসে চলে আসতে হত, যেদিন বেশিক্ষণ ড্রিল বা অন্যান্য ব্যাপার থাকত। আসতে হত ওই পোশাকেই। এবং ওই পোশাকে থাকা মানে, সেনাবাহিনীর কেতা-অনুযায়ী, ঠিকঠাক থাকা। পান থেকে চুনটি খসলে চলবে না, টুপিটি একটুও বেঁকলে চলবে না, ইত্যাদি। আর আমাদের হানিফ চিরদিনই তার ক্যাপটি, BERET, ইতালীয় 'বেরে' ক্যাপটি; পরত ঠিক ট্রাম-কন্ডাকটরদের মতো করে। প্রত্যহ পর্যাপ্ত পরিমাণ উমদা বিরিয়ানি খাবার জন্য তার মস্তিষ্ক-প্রদেশে উত্তাপের আধিক্য থাকত হয়তো, তাই সে 'বেরে' দিয়ে মাথার প্রায় পুরোটা (একদিক হেলিয়ে, যেমন নিয়ম ছিল) না ঢেকে, ট্রাম-কন্ডাক্টর বা ইদগাতে জমায়েত হওয়া ইদের নামাজিরা যেমন করে ইদের দিনে টুপি পরেন, তেমনভাবে টুপিটা পরত।

আর মিনিটে মিনিটে সংঘাত ঘটত প্রফেসর চ্যাটার্জির সঙ্গে।

এখন মনে হয়, সেই ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বিনা কারণে আমাদের যবন-সখার সঙ্গে দুশমনি করতেন। কলেজ ক্লাসরুমে বসে, ইকনমিক্সের লেকচার শোনবার সময়ে, মুসোলিনি সাহেবের দেশের ফতোয়া না মেনে, টুপিটাকে একটু অন্যভাবে পরলে যদি হাওয়া একটু বেশি খাওয়ানো যায় খিলুতে তাতে প্রফেসর চ্যাটার্জির কী এমন উষ্মার কারণ থকতে পারত, তা বুঝতে পারতাম না।

কিন্তু 'স্যাকরার ঠুক ঠুক, কামারের এক ঘা'-এর মতো, প্রফেসর চ্যাটার্জির সব দুশমনি, হানিফ একটি মাস্টার-স্ট্রোকে উশুল করে নিয়েছিল, এন সি সি র বাগাইচাটোলির ক্যাম্পে।

সে গল্প, যখন ক্যাম্পে যাওয়া যাবে তখনই বলা যাবে।

প্রফেসর চ্যাটার্জির হালকা বাদামি রঙা সিল্কের একটা টাই ছিল। মেঘের মধ্যে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, বা উঠছে, এইরকম একটি ছবি। সেটি বোধহয় তাঁর প্রিয় টাই ছিল। কারণ, প্রায় রোজই তিনি ওই টাইটি পরেই আসতেন। আর ক্লাস আরম্ভ করতেন, 'টোডে, উই বিগিন উইথ' বলে।

উনিও নিশ্চয়ই আমারই মতো কোনও বাঙালি-মিডিয়াম স্কুল থেকে এসেছিলেন, যেখানের ইংরেজির মাস্টারমশায় 'টুডে' কে 'টোডে' বলতেন।

একেই বলে, 'হ্যাবিটস ডাই হার্ড'।

প্রফেসর নেট্টো, আমাদের কমার্শিয়াল জিয়োগ্রাফি পড়াতেন। এবং অ্যাকাউন্টেন্সিও পড়াতেন। সম্ভবত, কেরলের লোক। সবসময় স্যুটেড-বুটেড। একটি মুদ্রাদোষ ছিল। মাঝে মাঝেই কাঁধটা বাঁদিকে মোচড় দিতেন। উনি লেজারকে বলতেন, 'লেজ্জার'। খ্যাসু নাটসকে বলতেন, ক্যাসু নাটস। 'জার্নাল' উচ্চারণ করতেন, একটা ঝাঁকি দিয়ে, যেন জার্মান সাহেবের নিকার-বোকার ছিঁড়ে গেল; বলতেন, 'ঝার্নাল'।

পড়াতেন সকলেই ভালো।

ফাদার ট্রুমস সম্ভবত আর্টস স্ট্রিমের ছাত্রদের ইকনমিক্স পড়াতেন। আমরা তো কম-কম-এর দলে। তারা সব বি এ (ইকন) হয়ে লানডান স্কুল বা হার্ভার্ডে ইকনমিক্স পড়তে যাবে, কাজেই তাদের দাবি অগ্রগণ্য।

খুব আনন্দ হতো ভার্নাকুলার ক্লাসে। আর্টস সায়েন্স আর কমার্স, তিন স্ট্রিমের সব বাঙালি ছেলে এক ক্লাসে বসে বাংলার ক্লাস করত। বিরাট বড়ো ক্লাসরুম নির্ধারিত হতো সেই ক্লাসের জন্য। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর শ্রীমণীন্দ্রলাল চক্রবর্তী আমাদের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। অনেক মধুর স্মৃতি আছে আমার মনে, ওঁদের দুজনেরই সম্বন্ধে। ধীরেনবাবুর বেশভূষা ছিল সাদা খদ্দরের। শুভ্রতার প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। টকটকে গায়ের রঙ, বেঁটেখাটো, ছোট্ট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, রবীন্দ্রভক্ত, মিতভাষী মানুষটি। নিচু গলায় কথা বলতেন। এবং রাশভারীও ছিলেন।

ওঁর বড়ো ছেলে দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (দেবুদা) কিছুদিন পরে বা ওই সময়েই আশুতোষ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হয়েছিলেন। ওঁর ছোটো ছেলে, আমাদের সহপাঠী, অমিতাভ, পরে সেন্ট জেভিয়ার্স' কলেজেই অধ্যাপক হন।

আমার সহপাঠীদের মধ্যে অমিতাভ ছাড়াও অরুণ গুপ্ত এবং টি কে বাসু (তরুণ) আমাদের কলেজেই অধ্যাপনা করেন, বহু বছর। আমার মতো খারাপ ছেলের বন্ধু 'প্রফেসর', একথা মনে করলেই গর্বে বুক এখনও হরলালকার শার্টের প্রমাণ সাইজ হয়ে যায়।

অফিস দুপুরে বলে, ইন্টারমিডিয়েট কমার্স পড়ার সময়ে অফিসে নিয়মিত যাওয়া সম্ভব ছিল না। যেতাম না। তবে মাইনেটা ঠিকই পেতাম। এবং সেই মাইনে থেকেই আমার সমস্ত খরচ চালাতাম। স্বাবলম্বন এবং আত্মসম্মানের শিক্ষা বাবার নানারকম ইনডাইরেক্ট উক্তি ও মানসিকতা থেকেই জন্মেছিল। আমাকে-দেওয়া বাবার শিক্ষাতে কোনও খুঁত ছিল না। অথচ উনি কোনও দিনও 'শেখাবার' জন্য বা 'জ্ঞান দেওয়ার' জন্যে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি।

তখনও দশ টাকার মূল্যও ছিল অনেক। দশ টাকার একটি নোট ভাঙিয়ে বাজার করলে, বয়ে আনা যেত না। ওই মাইনের সেভিংস থেকেই মাকে নববর্ষে জরিপাড়ের টাঙাইল শাড়ি, ঠাকুমাকে থান এবং ছোটোবোনকে ব্লাউজ পিস কিনে দিতাম। এবং পরে, পিসতুতো ও খুড়তুতো বোনেদেরও যখন ওরা থাকত আমাদের সঙ্গে 'কনীনিকা'তে।

জামাকাপড়ের 'চালিয়াতি' তখন একেবারেই ছিল না আমাদের পরিবারে। পিতৃকুলে, মাতৃকুলে। মাতৃকুলে তো ধুতি-পাঞ্জাবি বা ধুতি-শার্ট। পিতৃকুলেও অতি সাদামাঠা সাজ-পোশাক। হাজরা লেনের জিতেনদার (দর্জি) বানানো রঙিন খদ্দেরের হাফ-শার্ট আর জিনের ট্রাউজার পরতাম। সেই জিন আজকের 'জিনস' নয়। আর সামাজিক অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠানে পায়জামা-পাঞ্জাবি।

মিলিটারি-সায়েন্স সোসাইটির ইলেকশনের আর সাতদিন বাকি আছে এমন সময়ে বাবা একদিন আমাকে ডাকলেন, অফিস থেকে ফিরে।

বললেন, ওড়িশাতে শিকারে যাবি না কি?

স্নেহপ্রবণ বাবা, পুত্রের পরীক্ষার ডিসগ্রেসফুল ফলজনিত অসম্মান, গ্লানি ও মনোকষ্ট ততদিনে একেবারেই ভুলে গেছেন। বাবার MOTTO-ই ছিল, 'নেভার লুক ব্যাক ইন লাইফ'। কথায় কথায় বলতেন, 'যানে দো কনডাক্টর, সামনা দেখো'।

মুশকিল হল, আমার মতো পুত্র থাকলে 'নেভার লুক ব্যাক' বললেই তো হয় না, 'লুক ব্যাক' করে থাকতে থাকতে ঘাড়ে এমন ব্যথা হয়ে যাওয়ার কথা যে, সোজা তাকানোর উপায় কি আর ছিল?

বাবার এই মহানুভবতাতে চোখে জল এসে গেল। গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে উঠল।

বললাম, যাব। তবে পাঁচ তারিখের মধ্যে ফিরতে হবে।

ক্যান? বিয়া ঠিক করছস নাকি?

বাবা বললেন।

না, তা নয়। কলেজে একটু কাজ আছে।

কাজটা যে ইলেকশন, তা আর বলতে পারলাম না।

সেবারে আমরা গেছিলাম সিমলিপাল। ময়ূরভঞ্জের রাজার আমন্ত্রণটা সরাসরি বাবাকে করেননি উনি, করেছিলেন বাবার প্রাক্তন কলিগ, বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র দাশকে, তাঁর কথা 'বন জ্যোৎস্না'র প্রথম খন্ডে অনেক আছে। কিছুদিন তিনি গত হলেন। বাবা যাওয়ার কিছুদিন পরে।

দাশকাকু তখন ইনকাম ট্যাক্সের ইন্সপেক্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। যাঁরা ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে কিছুমাত্র জানেন, তাঁরা শুনে অবাক হয়ে যাবেন যে, উনিশশো বাহান্নতে বিহার ও ওড়িশার 'জয়েন্ট চার্জ'-এ মাত্র একজন ইন্সপেকটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিলেন। ব্যাপারটা অভাবনীয়। তার মানে, কমিশনারও ছিলেন বিহার ও ওড়িশার চার্জের জন্য মাত্র একজন। আর আজকে বিহার ও ওড়িশার জন্যে কমিশনারই কত জন যে আছেন, তারই ঠিক নেই। (এখন বলে, ডি সি) যে কত, তার গোনাগুনতি নেই।

ওই শিকার অথবা স্বীকার পর্ব নিয়ে যা লেখার, তা 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছি।

বালাসোরে যাওয়া হল পুরী-এক্সপ্রেসে। স্টেশনে, বাবাব এক মক্কেল রাধাকৃষ্ণ বালা জিপ নিয়ে আমাদের বিসিভ করলেন। আমাদের সঙ্গে অহীনকাকু, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরি, বাবার ভ্রাতৃসম। উনিও বহুদিন হল অবসর নিয়েছেন কমিশনার হিসাবে। এবং আমার ছোটোকাকু ছিলেন। বালাবাবুর ধানকল ছিল বেতনুটি গ্রামে। সেই গ্রামে, তাঁরই অতিথিশালাতে থেকে, পরদিন কাজ শেষ করে আমরা পৌঁছেছিলাম বারিপদাতে।

কামিনী পট্টনায়েক ছিলেন ওখানে ইনকাম ট্যাক্সের উকিল। শুনেছি, বিজু পট্টনায়েকের কীরকম আত্মীয় হন। তাঁরই ব্যবস্থাপনাতে দাশকাকুর সঙ্গে আমরা একদিন বিকেলে বেরিয়ে রাতে একটি বনবাংলোতে রাত্রিবাস করে পরদিন প্রায় সন্ধের সময়ে গিয়ে একটি ছোটো বাংলোতে মালপত্র রেখে পদব্রজে রাজার 'পার্মানেন্ট' লোহার মাচানে বসলাম শিকারের জন্য। মাচাটি ছিল একটি সল্ট-লিকের উপরে।

বলতে ভুলে গেছি যে, বেতনুটিতে রাতে আমি একটি চিতল-হরিণ শিকার করেছিলাম।

কলেজে ভরতি হওয়ামাত্রই, বিশ্ববিখ্যাত ইংলিশ কোম্পানির বন্দুক, (ডবু ডবু গ্রিনার), বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেল, সাইড-লক, ডাবল-চোক, বাবা আমার নামে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া, অস্ট্রিয়া থেকে দুটো রাইফেলও ইমপোর্ট করেছিলেন কিছুদিন পরেই চৌরঙ্গির ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মসের প্রশান্তকাকু এবং এ বি কাকুদের দিয়ে।

আমাদের যত শিকার, যত হাতিয়ার, তা প্রায় এক আর্মারিরই সমান; সবই প্রায় জোগাড় হয়েছিল ওঁদেরই মাধ্যমে। রাইফেল দুটি ছিল, ম্যানলিকার শুনার কোম্পানির। একটি ছিল পয়েন্ট থ্রি-সিক্স, নাইন পয়েন্ট থ্রি। আর অন্যটি ছিল, থার্টি-ও-সিক্স; যা দিয়ে চিলকা হ্রদের ছরপরিয়াতে কৃষ্ণসার হরিণ শিকার করেছিলাম। সে গল্প তো আগেই করেছি। না কি, করিনি?

থ্রি-সিক্সটি-সিক্স রাইফেলটি বাবা আমাকে দিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে, শিকার বারণ না-হওয়া অবধি, যত স্মল এবং বিগ-গেমসে শিকার করেছি, তার অধিকাংশই বাবার দেওয়া ওই গ্রিনার বন্দুকে এবং ওই থ্রি-সিক্সটি-সিক্স ম্যানলিকার শুনার রাইফেলেই। এসব ছাড়াও বহু রাইফেল-বন্দুক, নানা বোরের, সিঙ্গল ও ডাবলব্যারেল, রিভলভার ও পিস্তলও ছিল।

এখন সিমলিপালের কথা সকলেই জানেন, বিশেষ করে, সরোজ রায়চৌধুরীর পোষাবাঘ খৈরির জনপ্রিয়তার পর থেকে; কিন্তু, উনিশশো বাহান্নতে সিমলিপালের নাম খুব কম মানুষই জানতেন।

একটি মস্ত নুনীর (SALT LICK)-এর উপরে ছিল ময়ূরভঞ্জের রাজার স্থায়ী লোহার মাচা। নুনীটি এত বড়ো ছিল যে 'জিম করবেট'-এর "Tree Tops"বইতে আফ্রিকার কিনিয়ার যে 'নুনী'র কথা আছে, তারই সমান। কিনিয়াতে গিয়ে, খোঁজ করে সেই নুনীতে গেছিলামও, কিন্তু 'Tree Tops"আর তখন ছিল না। 'মাউ মাউ' আন্দোলনের সময়ে মাউ-মাউরা তা পুড়িয়ে দেয়, ঘিসিং সাহেবের চেলা চামুণ্ডারা।*

যে-কোনও জিনিস গড়ে তুলতে লাগে অনেকই সময়, শ্রম এবং যত্ন; কিন্তু তা সোৎসাহে ভেঙে দিতে বা পুড়িয়ে দিতে লাগে পাঁচ মিনিট।

রাতে সেই নুনীতে, ওড়িয়াতে বলে খলিমাটি, বাইসনের (গাউর) এবং শম্বরের দল এবং শেষ রাতে বড় বাঘও এসেছিল শম্বরদের পিছু পিছু; কিন্তু বিগ-গেমে রংরুট আমরা তখনও; কিছুই শিকার করতে পারিনি।

ফোর্ট উইলিয়ামের রাইফেল রেঞ্জে আমাদের রাইফেল-শ্যুটিং হত এন সি সি র। পয়েন্ট টু-টু-তে। আর কোনও ভাল কর্মই তো করিনি, কিন্তু দশ বছর বয়স থেকে ওই কুকর্মটি করছি, সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের দিন থেকেই। তাই, আমি যখন রাইফেল ছুড়তাম, 'প্রোন-পজিশানে', তখন ইনস্ট্রাক্টর অন্যদের বলতেন, 'লুক অ্যাট হিজ হোল্ডিং। দ্যাটস দ্যা রাইট ওয়ে টু হোল্ড ইওর রাইফেল'।

যে মুষ্টিমেয় ক'জন ক্যাডেটের টিম, অল ইন্ডিয়া রাইফেল শুটিং এবং আর্ল রবার্ট ক্যাডেট ট্রফি'র জন্য সিলেক্টেড হতো সেকেন্ড বেঙ্গল ব্যাটালিয়ান থেকে, তাদের পিক-আপ ভ্যানে করে ফাইনালের আগে নিয়ে যাওয়া হত ব্যারাকপুরে শুটিং রেঞ্জে, প্র্যাকটিস দেওয়ার জন্য। র‍্যাপিড শুটিং, ফিগার শুটিং, কার্ড পাঞ্চিং, নানারকম আইটেমে আমাদের পার্টিসিপেট করতে হত। আর্ল রবার্ট ক্যাডেট ট্রফির পরীক্ষা ব্যারাকপুরেই হয়েছিল। ন্যাশনালে সিলেক্টেডও হয়েছিলাম কিন্তু কোলাইটিস হয়ে যাওয়াতে বাবা দিল্লিতে যেতে দেননি। প্রথমটি ছিল ইন্টারন্যাশনাল।

থ্রি-ও-থ্রি রাইফেলে, গরমের মধ্যে ত্রিপল পেতে শুয়ে অল্পসময়ের মধ্যে দেড়শো-দুশো গুলি ছুড়তে প্রথম যৌবনেও খুব কষ্ট হত। ফাঁকা কার্তুজের খোল, আগুনের মতো গরম হয়ে ইজেক্টেড হতো। ছোঁয়া লাগলে, ফোস্কা পড়ে যেত, যেখানে লাগত সেখানেই। তাছাড়া, কাঠে মোড়া থাকা সত্ত্বেও ব্যারেলও আগুনের মতো তেতে যেত। তার ওপর নিজেদের ছোড়া হয়ে গেলে, অন্যদের ছোড়ার সময়ে 'বাট' ডিউটি করতে হত। টার্গেট ওঠানো নামানো করতে হত, ভারী লোহার ফ্রেম উঠিয়ে নামিয়ে। সেই ফ্রেমেও ফিগার ও টার্গেট থাকত।

র‍্যাপিড-শুটিং মানে, টিনের উপর সাদা রং-করা একজন মানুষের বুক পাঁচ সেকেন্ডের জন্য দর্শন দেবে, আর তাকে মারতে হবে দুশো বা তিনশো গজ দূর থেকে, এবং পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে। মারা কঠিন ছিল না কিন্তু বাট ডিউটির সময়ে, বাঁদরের মতো শরীরের সব ওজন দিয়ে বিরাট লোহার ফ্রেম নামাতে আর ওঠাতে বেদম হয়ে যেতে হত।

তবুও ভালো লগাত। খুবই ভালো লাগত। পুরুষ-সঙ্গে, ঘামের সঙ্গে, রোদের সঙ্গে কুস্তি লড়তে, সারাটা গ্রীষ্ম দিন।

আমরা যখন বিভিন্ন দূরত্ব থেকে সরে সরে রাইফেল ছুড়তাম, তখন মাথার ওপরে ব্যারাকপুর

* 'পঞ্চম প্রবাস'(ভ্রমণোপন্যাস) দে'জ পাবলিশিং

ফ্লাইং ক্লাবের 'বনাঞ্জা' অথবা 'টাইগার-মথ' প্লেন উড়ত বোঁ বোঁ বোঁ শব্দ করে, মস্ত মস্ত ফড়িঙয়ের মতো।

সারাদিন গুলি ছোড়ার পরে, রাইফেল ক্লিনিং করতে হত। প্রথমে গরম জল দিয়ে, তারপরে পুল-থ্রু দিয়ে।

দিনশেষে, অভুক্ত, রণক্লান্ত সৈনিকের মতো ময়দানের দিকে রওনা হতাম, আর্মির পিক- আপ ভ্যানে। আমরা পাঁচ-ছ'জন বা আরও কম। মনে নেই। তাও আবার আমাদের পিক-আপ ভ্যানে বসিয়ে রেখে, যে অফিসারদের তত্ত্বাবধানে আমাদের গুলি ছুড়তে হত, তাঁরা ব্যারাকপুর-ক্লাবে আকণ্ঠ বিয়ার পান করতেন। তারপর যখন এসে স্টিয়ারিঙে বসতেন, পিক-আপ ভ্যান চালাচ্ছেন, না বনাঞ্জা প্লেন; তা বোঝা যেত না। আমরা ক'টি কচি-প্রাণ বিপন্ন বিস্ময়ে, প্রচণ্ড ভয়ে, ঠাকুর-দেবতার নাম স্মরণ করতাম। আমাদের প্রাণ ফোর্ট উইলিয়াম অবধি পৌঁছোবে কি না আদৌ, সে বিষয়ে সন্দেহ জাগত মনে।

তবে, ভরসা ছিল এই যে, 'অ' বাবু অ্যাকাউন্ট্যান্ট সেই যে কুষ্ঠি দেখে যা লিখে দিয়েছিলেন, তাতে ছিল একটি লাইন।

'আপনার মা বেঁচে থাকতে, বাঘের মুখে মাথা ঢোকালেও আপনার কিছু হবে না।'

তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী যে কত বড়ো সত্যি, তা বহুবারই প্রমাণিত হয়েছে। মা আজকে নেই বলেই সেই রক্ষাকবচটিও আর নেই।

দীপক চক্রবর্তীর ন্যায্য কারণেই শ্লাঘা ছিল যে, সে বাংলাতে ভালো। কারণ ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে সে কবিশেখর কালিদাস রায়ের কাছে বাংলা পড়েছিল।

এটা অত্যন্তই লজ্জার কথা যে, আমি আমার স্কুলের বাংলার মাস্টারমশাইয়ের নামটি পর্যন্ত মনে করতে পারছি না। ননীবাবু কি? না বোধহয়। অথচ ওঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ঔৎসুক্য তো তিনিই প্রথম জাগিয়েছিলেন এবং আমাদের ইতিহাসের মাস্টারমশাইও।

কলেজে, বাংলাতে দীপক প্রায়ই প্রথম হত। কখনও কখনও "ফাঁকতালে গোলমালে" আমি। কী করে হতাম, তা আজও জানি না। তবে মণিবাবুর (মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর) কাছে আমি বেশি প্রশ্রয় পেতাম, তিনি সহজগম্য ছিলেন বলে।

ধীরেনবাবু ও মণিবাবু; দু'জনের কাছেই আমার ঋণের শেষ নেই। অথচ পরবর্তী জীবনে যখন একটু আধটু লেখালিখি শুরু করেছি, তখন কতবার ভেবেছি যে, একবার গিয়ে খোঁজ করি। কিন্তু, আমার মতো কুব্যস্ততা যেন পরম শত্রুরও না হয়। সপ্তাহের সাতদিনের একটি দিনও যদি কলকাতায় থাকতাম; ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া, ছুটি বলতে কিছুই ছিল না। পেশার কাজের পরে লেখা এবং পড়ার কাজই ছিল আমার সব আনন্দ, আড্ডা, বন্ধুতা। তাছাড়া, যাঁরাই লেখেন, তাঁরাই জানেন যে, বাংলাতে লেখার কাজ কী প্রচণ্ড পরিশ্রমের ব্যাপার।

এখন ভাবলেও অবাক হই যে, কী করে অত এবং অতরকম বিভিন্নমুখী কাজ একসঙ্গে করেছি। আমি করিনি, ওপরওয়ালাই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। নইলে, ওই অমানুষিক পরিশ্রম সম্ভব

ছিল না। যত দিন যাচ্ছে ততই আরও বেশি করে যেন এই গহ্বরের গভীরে প্রোথিত হয়ে যাচ্ছি। এই চোরাবালি থেকে যদি কেউ হাত ধরে ওঠাতে পারতেন! রামারাও-এর লক্ষ্মী-পার্বতী'র মতো কেউ?

"বেঙ্গলি লিটারারি সোসাইটি"-ও ছিল আমাদের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে; মিলিটারি-সায়েন্স সোসাইটির মতোই। সেই সোসাইটিরও সেক্রেটারি হয়ে গেলাম। মিলিটারি-সায়েন্স সোসাইটির সেক্রেটারি হবার প্রায় সমসময়েই। ইলেকশনে অবিশ্বাসী ছাত্র যে কী করে হলাম, কে বা কারা যে অপকর্মটি করল, বা করাল আজ আর কিছুই মনে নেই। ছাত্ররা এবং অধ্যাপকেরাই করেছিলেন বা করেছিল নিশ্চয়ই। সব কৃতিত্ব তাঁদেরই। এই রকম পরস্পর-বিরোধী সংস্থার সেক্রেটারি একই ব্যক্তি এ কথা ভেবে হাসি পেত।

সেই সময়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ইউনিয়নের চাঁই ছিলেন, নরুদা, পশ্চিমবঙ্গের এখনকার অ্যাডভোকেট জেনারেল, নরনারায়ণ গুপ্ত, অমিয়দা, অমিয় গুপ্ত, কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ, আর কল্যাণদা; কল্যাণকুমার রায়।

আমাদের সময়ের "দক্ষিণী"-র ছাত্রী এবং সতীর্থ, সাদা পাতিহাঁসের মতো ফর্সা, সরল, বড়ো বড়ো ডাগর চোখের ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বাণী ঠাকুর পরে ওই কল্যাণদাকেই বিয়ে করে।

ওঁরা তিনজন ছিলেন থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স। পাকা রাজনীতিক। কলেজ জীবনেই।

মনে পড়ছে ওঁদের সঙ্গে বিকাশদাও ছিলেন। বিকাশদার পদবি আজ আর মনে পড়ছে না।

কল্যাণদার গলার স্বরটি ছিল ভরাট। চমৎকার আবৃত্তি করতেন। ইংরেজি ও বাংলা ডিকশান ছিল অতি চমৎকার। খুব ভালো অভিনয়ও করতেন, বাংলা এবং ইংরেজি নাটকে।

আমি বেঙ্গলি লিটারারি সোসাইটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়াতে দীপকের কোনও মনোবেদনা হয়নি। হলেও, তার কোনও বহিঃপ্রকাশ হয়নি। দীপক চিরদিনই অন্তর্মুখী ছেলে। এবং লাজুকও ছিল। কিন্তু সেই দীপকও, ন্যায্য কারণে; রেগে গেল আমার ওপরে, যখন "কবি দরবার"-এর জন্য শান্তিনিকেতনের বাংলা বিভাগ থেকে নিমন্ত্রণ করে আনানো কোনও অধ্যাপক আমার আবৃত্তি শুনে আমাকেই রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার জন্যে নির্বাচিত করলেন।

দীপকও প্রতিযোগী ছিল।

দীপক বলল, 'বাজে! বাজে। আবৃত্তির কিসস্যুই বোঝে না।'

তবে, দীপকই আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল কলেজ জীবনের এবং কলেজ জীবনের পরেও বহুদিন। আমাদের মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। দুষ্টু ছেলেরা আমাদের বন্ধুত্বের রকম দেখে খ্যাপাত, 'হোমো' বলে। অবাঙালি দুষ্টু ছেলেরা আমার মুখে তখন ব্রণ ছিল বলে ডাকত, "ভি ডি" বলে।

অহিংস এবং সংযুক্ত বুদ্ধদেবকে, আমার গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বাবা, অনুজের নামের আদ্যক্ষরও 'বি' বলে নির্দয়ভাবে দ্বিখণ্ডিত করে বি ডি করে দিলেন। পাছে, ছেলেদের নাম নিয়ে কোনও গোল বাধে পরে, সেই আশঙ্কা দূরীভূত করে।

সেই বি ডি থেকেই "ভি ডি"।

ফাদার স্কেফার্স একদিন সকালে একজন অসাধারণ চেহারার, ছিপছিপে, লম্বা তরুণকে নিয়ে ইংরেজির ক্লাসে ঢুকলেন, বললেন, "লেট্‌ মি ইনট্রুডুাস মিস্টার পি লাল, অ্যান এক্স স্টুডেন্ট অফ দিস কলেজ। হি উইল টিচ য়্যু ইংলিশ ফ্রম দিস ডে।"

প্রফেসর লালকে প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেল আমার। এবং আরও অনেকেরই। ওঁর চলন-বলন সবকিছুই মধ্যেই এক বিশেষ আভিজাত্য ছিল। চেহারা দেখলেই মনে হত জিনিয়াস। বিশেষ করে, ওঁর চোখ দুটি এবং চুল ছিল একেবারেই নিজস্ব। তার উপরে একটি চোখ সামান্য একটু লক্ষ্মী ট্যারা হওয়াতে, তাঁর সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গেছিল।

প্রথম দিনই উনি আমাদের লেসলি এবারকম্বির একটি কবিতা পড়িয়েছিলেন; যতদূর মনে পড়ে। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর আগের কথা তো! ভুলও হতে পারে! কবির নামও ভুল হতে পারে।

"She! She!
Like a visiting sea.

Which no door could ever restrain."

ক'টি লাইন এখনও মনে আছে।

প্রফেসর পি লাল একদিন ক্লাসের মধ্যেই বলেছিলেন, তোমার নাম তো "বুদ্ধদেভা", তুমি বি ডি লেখো কেন?

উত্তরে কী আর বলব! পুরুষসিংহ বাবার স্নেহের সঙ্গে, অত্যাচারও তো সহ্য করতে হয়ই!

প্রফেসর পি লালের হয়তো মনে আছে যে, ওঁর অধ্যাপক জীবনের প্রথম পাঠটিই তিনি আমাদের ক্লাস নিয়েই আরম্ভ করেন।

"কভি দরবার"-এর উদ্ভট আইডিয়াটা বেরিয়েছিল কলেজের জেনারেল সেক্রেটারি, বিনয় ভাটিয়ার মাথা থেকে। অবাঙালিরা "বিনয়" উচ্চারণ করত, "ভিনয়"ও নয়; "ভিনে" বলে।

"কভি দরবার"-এ ভারতীয় অনেক ভাষার কবিরা তাঁদের মতো মেকআপ নিয়ে, কলেজের হলের স্টেজে, তাঁদের রচিত কবিতা আবৃত্তি করবেন, এমনই ছিল বিনয়ের মস্তিষ্কপ্রসূত অভিনব আইডিয়া সেই আইডিয়ার সে বাস্তব রূপও দিয়েছিল।

কিন্তু, আমার হল সমূহ বিপদ। গ্রিনরুমে মেক-আপ ম্যানেরা সমস্বরে বললেন, "আর লোক পেলে না মাইরি! এই নাকে রবীন্দ্রনাথ সাজাই কী করে?

জানি না, দীপক তাদের টিপে দিয়েছিল কি না!

কিন্তু না সাজিয়েও তো নিরুপায়। দেড়ঘন্টা পরেই আরম্ভ হবে অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ সাজাতে গিযে উদ্যোক্তাদের উপর রেগে গিয়ে, প্রতিবাদ হিসেবে, তাঁরা আমারই নাকে, অদৃশ্য ক্লিপ মেরে দিলেন তা তীক্ষ্ণ করার জন্য। নাকের BRIDGE বরাবর সাদা রঙের রেখাও টানলেন। তাতে নাক আমার উন্নত হল কি না জানি না, কিন্তু গলার স্বর নাকি নাকি এবং সরু হয়ে গেল। ভালোই হল। নাকে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি পৌঁছোতে না পরলেও, গলার স্বরে পৌঁছোলাম।

দুটি কবিতা আবৃত্তি করতে হয়েছিল। "ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে" এবং রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যায় শেষ কবিতা,"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি।"

কালোবঙা জোব্বা পরে, ববীন্দ্রনাথের মতো কালো কালো টুপি পরে, সামনে ঈষৎ ঝুঁকে, পেছন দিকে দুটি হাত রেখে, যখন মঞ্চে প্রবেশ করলাম, তখন হাততালিতে সারা হল প্রায় ফেটে পড়ল।

সেটা আমার কোনও গুণ ব্যতিরেকেই। মেকআপ ম্যানদেরই গুণে।

দীপক তখন কোথায় ছিল, জানি না।

আরও চিত্তির হল, যখন অনুষ্ঠান শেষে, মানে, অন্যান্য ভাষার বিখ্যাত কবিদের ভেক-ধরা আমারাই মতো অর্বাচীনেরা নিজ নিজ মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল করে যাঁর যাঁর ভূমিকায় আবৃত্তি সম্পাদন করলেন; তখন কোনও একজন মিসেস খেমকা, আমাকে স্বর্ণপদক দান করবেন বলে ঘোষণা করলেন।

ঘোষণাটি শুনেই বুঝলাম, বাংলা জানেন না বলেই তিনি আমার প্রতিভাতে অভিভূত হয়ে গেছেন। যে-পদক পাওয়া উচিত ছিল মেকআপ ম্যানদের, তা জুটল আমার কপালে। মেডেল এবং পুরস্কারের ক্ষেত্রে এই ঘটনাই বোধহয় ঘটে আসছে চিরটা কাল। যাই হোক, জীবনের কোনও ক্ষেত্রে কোনওদিন মেডেল-না পাওয়া আমার জীবনে, সেই সোনার মেডেলটিই একমাত্র জ্বলজ্বলে লজ্জা হয়ে আজও বিরাজ করছে।

আমি অন্য জগতের মানুষ হয়েও যদি বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে এবং অনেকেরই গাত্রপীড়ার কারণ হয়ে প্রবেশ করে থাকি; সেজন্যে আমাকে দোষারোপ না করে আমার তৎকালীন বন্ধু দীপক চক্রবর্তীকেই দায়ী করা উচিত।

তাহলে একটু ব্যাখ্যা করেই বলি।

আমাদের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল বেরুনোর পরে ১৯৫৪-তে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অনেকের বাড়িতেই নেমন্তন্ন খাওয়া এবং খাওয়ানো হয়েছিল পালটাপালটি করে। সেসব নেমন্তন্নের কথা বিস্তারিতভাবে পরে বলা যাবে।

দীপকদের কাঁসারিপাড়া লেনের ভাড়া বাড়িতে, যেদিন অমরা স্বল্পক'জন খেতে যাই, সেদিনই ঘটনাটা ঘটে।

দীপক ছাড়াও সাহিত্যমনস্ক অনেকেই ছিল আমাদের মধ্যে। দীপকদের বাড়িতে নেমন্তন্ন হয়েছিল দুপুরে। ওর পরমাসুন্দরী মা এবং দিদির তত্ত্বাবধানে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন গল্পটল্প হচ্ছে, (কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনীশক্তি কত এবং কতরকম বিষয়ের গল্পেরই না জন্মদাতা তারা!) তখন কী কথাতে যেন দীপক হঠাৎ বলল, "বাংলা সাহিত্যের যা অবস্থা দেখছি, তাতে কোনওদিন দেখব বুদ্ধও সাহিত্যিক হয়ে গেছে।"

একথা শুনেই তো আমার মধ্যের বাঙাল খেপে উঠল। ওদের বাইরের ঘরের কাঠের টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে বললাম, "তুই এতজনের সামনে একথা বললি তো? তবে দেখে নিস, আমি সাহিত্যিক হই কি না।"

সাহিত্যিক আজও হইনি। কিন্তু, কথায় বলে না, "পাগলা রে পাগলা, সাঁকোটা নাড়াস না।" দীপক সেদিন সেই পাগলাকে খেপিয়ে দিয়েছিল বলেই, সাঁকোটা নাড়িয়ে দিয়েছিলাম এবং এখনও নাড়িয়ে চলেছি।

দীপকের বাংলা-জ্ঞান ছিল গভীর। কিন্তু, আমার নিজের মনে হয় ও লেখালেখি করলে যতবড় লেখক না হত, তার চেয়ে ভাল প্রবন্ধকার হতে পারত। তাছাড়া, যাঁরা খুব বেশি ভাবেন বা বেশি পড়াশোনা করেন, তাঁদের বোধহয় লেখালেখিতে অনীহাও জন্মায়। তাঁরা একটু আলস্য-পরায়ণও হন। লেখালেখি, প্রচণ্ড পরিশ্রমেরও ব্যাপার। তাছাড়া বাংলার জ্ঞানই সাহিত্যিক হওয়ার একমাত্র মূলধন নয়।

পরবর্তী জীবনে দীপক তুলনামূলক সাহিত্য নিয় যাদবপুর থেকে এম এম করে। দিব্যেন্দু, মানবেন্দ্র, দীপক (মজুমদার) প্রমুখ ওর সতীর্থ ছিল। ওদের আগের ব্যাচ এবং তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম ব্যাচ ছিল নবনীতা এবং প্রণবেন্দু। উলটো পালটাও হতে পারে। সব কথা সঠিক মনে নেই।

পরে, ওর মুখেই শুনতাম, বাংলার দিকপাল কবিদের কথা। ওদের উজ্জ্বল অধ্যাপকদের কথা। আমি যখন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবার চেষ্টায় ব্যাপৃত, তখন বুদ্ধদেব বসুর ভাষার শুদ্ধতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের হাসি, নরেশ গুহর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে দীপকের মনোলগ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারেই শুনতাম এবং হায় হায় করতাম!

দীপকেরই পাঠ্য বইয়ের তালিকা চেয়ে নিয়ে একটি একটি করে বই সংগ্রহ করে নিজের লাইব্রেরিতে আস্তে আস্তে যোগ করতাম। থমাস মানের "ম্যাজিক মাউনটেইন", জার্মান কবি রিলকের "সনেটস টু অর্ফিউস", ফরাসি কবি ব্যোদলেয়ারের "ফ্লুর দ্য মাল", ইংরেজি ফ্লাওয়ার্স অফ ইভিল, (বুদ্ধদেব বসু বাংলা অনুবাদ করেছিলেন বলে শুনেছি) এবং আরও অগণ্য বই নিয়ে আমি আর দীপক ঘণ্টার পর ঘণ্টা "কনীনিকা"-তে, নয় পথে হাঁটতে হাঁটতে, নয় ওদের বাড়িতে, নয়তো বসুশ্রী কফি হাউসে, আলোচনা করতাম। যদিও আমি ছিলাম সর্বার্থেই অনধিকারী। বেশিই শুনতাম; বলতাম কম।

বুদ্ধদেব বসুর অন্ধ ভক্ত ছিল দীপক। তাঁর ব্যক্তিত্বের, ব্যবহারের, ম্যানারিজমের এমন অনুপঙ্খ বর্ণনা দিত ও! দু আঙুলে তাঁর সিগারেট ধরার কায়দা থেকে তাঁর প্রুফ-রিডিঙের কিংবদন্তি পারফেকশান, তাঁর সতত-সজাগ ছাত্র-মনস্কতার এমনই উত্তেজিত চিত্রণ করত ও যে, জীবনে কোনওদিনও বুদ্ধদেব বসুকে না দেখেও তাঁর মস্ত ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম আমিও।

ভক্তি, রোগ হিসেবে সংক্রামক।

বুদ্ধদেবের 'তিথিডোর' উপন্যাসটি আজকালকার পাঠকদের মধ্যে ক'জন পড়েছেন জানি না কিন্তু ওই একটি উপন্যাসের জন্যই ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর স্থান বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী হওয়া উচিত। ওঁর নায়িকা "স্বাতী" যে কত বাঙালি পরিবারের অগণ্য কন্যার নামকরণের অনুপ্রেরণা হয়েছিল, তা বলার নয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লেখা উপন্যাসটি এখনও যখন পড়ি, তখনও মনে হয়, উপন্যাস কী করে লিখতে হয়, তা শেখার জন্যেও ওই উপন্যাসটি পড়া প্রত্যেক তরুণ লেখকের প্রয়োজন আছে আজও।

লেখালেখি শুরু করার অনেকদিন পরে একদিন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বলেছিলাম, প্রেমেনদা, আমার লেখালেখিতে বড়ো কাটাকুটি হয়। লেখা কপি করানোর পরও এত কাটাকুটি হয় যে, লেখা প্রায় পুরোটাই বলে যায়।

প্রেমেনদা বলেছিলেন, "সে তো ভালো কথা! বুঝলে বুদ্ধদেব, কাটে সকলেই। কেউ লিখে কাটে; কেউ মনে কাটে।"

এই "মনে-কাটার" প্রসঙ্গে একজন লেখককে আমি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর নাম রমাপদ চৌধুরী। সারা বছর তিনি অগণ্য কাপ চা খান। আর, অগণ্য সিগারেট খেতে খেতে খেতে, আড্ডা মারতে মারতে, তাঁর মন চলে যায় দূরে। মাথার মধ্যে পরের উপন্যাসের চরিত্ররা ডানা মেলতে থাকে। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে যা লেখেন, তার একটি শব্দও কাটেন না। কলম ধরাবার আগেই মনের মধ্যে সব কাটাকুটিই সেরে নেন।

আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে এলাম।

দীপকের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। "বে-লাইনের ছেলেকে" বাংলা সাহিত্য এবং কবি-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যা কিছু জানানো, তা সে নির্দ্বিধায় জানাত বলে।

মনে আছে, পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে, ওদের কাঁসারিপাড়া রোডের বাড়ির বাইরের ঘরে বসে গল্প করতে করতে একদিন ও একটি লিটল ম্যাগজিন আমার হাতে তুলে দেয়। আজ আর সেই ম্যাগাজিনের নামও মনে নেই। কিন্তু স্পষ্টই মনে আছে যে, শঙ্খ ঘোষ নামক এক তরুণ কবির একটি কবিতা ছিল তাতে। রোগশয্যায় শায়ীন প্রেমিকাকে নিয়ে লেখা কবিতাটি পড়ে, সেই যে শঙ্খ ঘোষের ভক্ত হয়ে পড়ি, আজও সেই ভক্তি অটুট আছে।

'ছন্দ' ব্যাপারটাকে; পাকা গায়ক যেমন করে 'তাল' ব্যাপরটা "গুলে খান", তেমন করে উনিও যে গুলে খেয়েছেন, তা প্রথম পাঠেই বুঝি। শঙ্খ ঘোষের আজকের কবিতার রকম পালটে গেছে। তবে, ধার কমেনি। বরং বেড়েছে।

দীপক আমাকে না খ্যাপালে এবং পরবর্তী জীবনে সাহিত্য সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে আমাকে ওয়াকিবহাল না করলে, আমি আজ যত বড়ো মূর্খ; তার চেয়েও অনেক বড়ো মূর্খ হতাম। শুধু সাহিত্যই নয়, সংস্কৃতির সবরকম শাখা সম্বন্ধেই দীপকের উৎসাহ এবং নিজস্ব মতামত ছিল। গান-বাজনা, ছবি, ফিল্ম ইত্যাদি সব বিষয়েই ওর উৎসাহ ছিল অপরিসীম এবং বন্ধুতার প্রধান কারণ ছিল এই যে আমাদের দুজনের রুচি ও মতে মিল হত প্রায় সব ব্যাপারেই।

একবার তোপঁচাচিতে গিয়ে আমি আর দীপক ছিলাম কয়েকদিন। তখন ওরই মুখে, ইতালীয় চিত্র পরিচালক ফেলিনির কথা প্রথমবার শুনি। "লা ডলচে ভিতা"-র কথা। "To die with a bang and not with a whimper" -এর কথা।

এই বাক্যবন্ধটি আমাকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমার লেখক-জীবনকে এবং লেখালেখিকেও।

সকাল আটটা থেকে রাত আটটা অবধি যে মানুষ টাকা-আনা-পাই আর আইনের কচকচি নিয়ে কাটায় সপ্তাহে ছ'দিন; তার মলিন জগতকে দীপকই হঠাৎ হঠাৎ উদ্ভাসিত করে দিত।

ফেলিনির ওই ছবি আজও আমার দেখা হয়নি। এবারেও ফিল্ম-ফেস্টিভালে দেখা হল না। টিকিট কে দেবে, এই না-ডান, না-বাম দলহীন, গোষ্ঠীহীন নন-এনটিটিকে?

সাহিত্যবোধ ছাড়াও, আমার একসময়ের ঘনিষ্ঠতম এবং প্রায় একমাত্র শহুরে বন্ধু দীপকের ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত নরম, ভদ্র, শালীন এবং মধুর। আমার মতো রাগী, প্রচণ্ড MOODY, কখনও কখনও অত্যন্ত চাঁচা-ছোলা, আউটস্পোকেন, ট্যাক্টলেস ছেলের যে দীপকের মতো বন্ধু কী করে হয়েছিল; তা ঈশ্বরই জানেন। হয়তো আমরা বিপরীত মেরুর বলেই উপরওয়ালা এই মেরুমিলন ঘটিয়েছিলেন। তার পেছনে, তাঁর হয়তো কোনও উদ্দেশ্যও ছিল।

আমার বন্ধু দীপক চক্রবর্তীর প্রতি আমার গভীর ঋণ আমার জীবদ্দশাতে স্বীকার না করে গেলে, তা পরম অকৃতজ্ঞতা হবে, সে কারণেই, দীপক সম্বন্ধে এত কথা বলা।

জীবনের একটা সময় পর্যন্ত ওকে দেওয়ার মতো সময় আমার ছিল।

তারপর সময়ের বড়ই অকুলান হল।

দীপক বেশ দেরি করে বিয়ে করে। বিয়ের পরেই ও ঘোরতর সংসারী হয়ে গেল। ওর চেয়ে অনেকই দিন আগে সংসার করেও "সংসারী হওয়া" যাকে বলে তা আমি কোনওদিনই হয়ে উঠতে পারিনি। হয়ে উঠতে চাইও নি।

ওর বিয়ের পরই ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ কমে আসতে থাকে। হয়তো দুজনের মানসিকতাও বদলে যায়। একটা সময়ের পর থেকে ও আমার কলেজ-জীবনের অনেক বন্ধুর একজন হয়ে যায় সবচেয়ে কাছের মানুষ আর থাকে না।

জীবন এইরকমই। চিরদিনই, কাছে কিছুই থাকে না।

তবে দীপকের স্ত্রীর অকালমৃত্যুতে দীপক অত্যন্ত একলা হয়ে গেছে। সম্প্রতি অবসরও নিয়েছে সরকারি চাকরি থেকে। এখন আবার বন্ধুত্ব গাঢ় হতে পারে কিন্তু আমার অবকাশ যে সেই সময় থেকে আরও অনেকই কমে গেছে আজ!

এখন জীবনে কাজ ছাড়া আর কোনো কিছুই প্রায় নেই। সময়ও নেই। ছুটির ঘণ্টাও বাজছে দূরে, শুনতে পাই প্রায়ই।

দীপক তো সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলই। বলতে গেলে ও আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছিল। ও যে কত জায়গাতে গেছে আমার সঙ্গে তার লেখাজোখা নেই। আমাদের বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও গেছে। হাজারিবাগ, সুন্দরবন, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, তোপচাঁচি, এমনকি আমার বিয়ের পরে, এপ্রিলের শেষাশেষি যে অভিনব হানিমুন হয়েছিল সেই হানিমুনেও সে গেছিল।

ঋতুর জন্যে বাবা অলিভগ্রিন রঙের কাপড়ের শিকারের পোশাক বানিয়ে দিয়েছিলেন। মাথায় টুপি সুদ্ধু। হাজারিবাগ জেলার চাতরা সাবডিভিশনে, চাতরা আর সীমারীয়ার মাঝামাঝি একটা জায়গাতে গভীর জঙ্গলের মধ্যে টাইগার ট্র্যাকের মধ্যে শুকনো পাহাড়ি নদীতে ক্যাম্প করেছিলাম আমরা। চারটি ক্যাম্প গেছিল। চারটি গাড়ি, একটা জিপ। ঠাকুর চাকর, চিকন-কালো দুটি বঙ্গজ অজ, জ্যান্ত লম্বকর্ণ; যদি শিকার না পাওয়া যায় তার শির ইনস্যুরেন্স হিসেবে। তারা গেছিল গাড়ির ক্যারিয়ারে বসে, ছাদের উপরে; হাজারীবাগ থেকে।

বাবা এবং মাও গেছিলেন, আমার খুড়শ্বশুর ও খুড়শাশুড়ি এবং আরও অনেকে। এবং বলা বাহুল্য, দীপকও। হাজারিবাগ থেকে নাজিম সাহেব এবং হাজারিবাগের বন্ধু, সুব্রত চ্যাটার্জিও এসেছিলেন। আমার ছোট বোন ও ভগ্নীপতি, পিসতুতো ভাই ঝন্টু এবং আমার দুই সহোদর। তারা তখন স্কুলের ছাত্র।

অভিনব হানিমুন ছাড়া একে আর কী বলব!

সেই যাত্রায়, দীপককে সাক্ষী রেখে, একটি সকালের "ছুলোয়াতে", শ' দেড়েক গজ দূর থেকে, দ্রুত-ধাবমান একটি দারুণ গর্বিত প্রকাণ্ড শিঙ্গাল শম্বরকে কানের ফুটোর পাশে গুলি করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কাটা কলাগাছের মতো সে তার পথেই পড়ে গেছিল। এগোনো হয়নি তার আর এক পাও।

সেদিনের বাহাদুরি-প্রবণতার কথা মনে হলে আজ মন অবশ্যই খারাপ হয়। জীবনে বিভিন্ন বয়সে, বুদ্ধির রকম বিভিন্ন হয়ই। এ-ব্যাপারে কিছুই করার নেই কারোরই।

প্রত্যেক শিকারির স্মৃতিতেই কিছু বিশেষ বিশেষ 'শট' থাকে, যা নিয়ে প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে পৌঁছেও গর্ব করা যেতে পারে। সেদিনের সেই শটটা তার মধ্যে অন্যতম ছিল।

দীপক বলেছিল, তুই ভাগ্যবান। হানিমুনে এসে বউকে অনেকে অনেকভাবে ইমপ্রেস করে। তোর মতো এমন 'উইথ আ ব্যাং' ইমপ্রেস করতে খুব কম মানুষই পেরেছে!

দীপককে বলেছিলাম, প্রার্থনা করিস, যেন নিজের মৃত্যুর সময়েও এইরকমভাবেই মরতে পারি। With a bang and not with a whimper.

তবে এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, 'হানিমুন' বলতে যা বোঝায়, তা আমার আদৌ হয়নি। কারণ, বাবা ছুটি দেননি। বাবার অফিস বা কারখানাতে যুক্ত থাকার এও আরেক অসুবিধে। ছুটি দেননি, কারণ পরিবারের কুলাঙ্গার হয়ে নিজের মনোমতো পাত্রীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। তজ্জনিত অপরাধের জন্য HIGHLY TACTFUL পিতার চাপা রাগ তো ছিলই। তাঁর উপরে ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে করেছিলাম, আর মার্চ মাসে ইনকাম ট্যাক্সের টাইম-বারিং অ্যাসেসমেন্টস ও অন্যান্য নানা প্রসিডিংসের ভিড় লেগে থাকেই। এ-কারণেও ছুটি 'না-মঞ্জুর' হল। আমার ছোটো ভগ্নীপতির অনেক উমেদারি সত্ত্বেও 'না', 'হ্যাঁ' হল না।

সেই হানিমুন হয়েছিল গড়িয়ে গিয়ে এপ্রিলের গোড়াতে।

যদিও তখন There was no honey in the moon. It was all sour.

একটি দ্বিপদীও লিখেছিলাম তখন :

'হানিমুনে হানি নেই,
মানিব্যাগে মানি'

এপ্রিলে গেছিলাম, 'গোপালপুর অন সি'-তে। সেখানে একটি শস্তাতম হোটেলে, চারঘরের হোটেল, স্বাবলম্বী এবং আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন আমি দেড়মাস পুরনো হয়ে যাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে একটা ছইওয়ালা ঘোড়ার গাড়িতে করে বেহরামপুর গঞ্জাম স্টেশন থেকে গিয়ে উঠেছিলাম। অথচ তখন বাবার ছ'খানা গাড়ি ছিল, ফার্মে ট্রাক্টর থেকে পাওয়ার টিলার থেকে আউটবোর্ড এঞ্জিনওয়ালা মোটর-বোটও ছিল।

এই কথা আমি কোনও অনুযোগ হিসেবে বলছি না। আমার নিজস্ব সঞ্চয় এবং মাইনে সেদিন এমন ছিল না যাতে আমি ভবিষ্যতের কথা ভেবে, কোনওরকম "চালিয়াতি"—ই করতে পারতাম। এখন পেছন পানে চেয়ে মনে হয় যে, করা উচিত ছিল। জীবনের কোনো কোনো সময় অত্যন্তই দামি। TIME IS THE ESSENCE OF LIFE। যে-সময়ে যা করার, তা ভালো করে না করতে পারলে, পরে আর করা হয়ে ওঠে না। সময়-বিশেষের দৈন্য অন্যসময়ের আড়ম্বর দিয়েও পূরিত হয় না। এটা দুঃখের।

জীবনে পেছন ফিরে চেয়ে নানা কারণে দুঃখবোধ করি নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছি এবং নিজেও নিজেকে বঞ্চিত করেছি বলে। কিন্তু তখনকার সময়ে পারিবারিক অনুশাসন এমনই ছিল যে, নিজের পয়সাতেও বাবুয়ানি করাটা Censorship-এর আওতায় আসত।

তবে আমার নিজসামর্থ্য তখন অতি সামান্যই ছিল।

ঋতু আর আমি হাত ধরাধরি করে বেলাভূমি দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওবেরয়-এর বিখ্যাত হোটেল 'পাম-বিচ' অবধি যেতাম। ওকে, হাতে চাপ দিয়ে বলতাম, যদি কোনওদিন নিজের পায়ে দাঁড়াই, যদি অ্যাফোর্ড করতে পারি; তখন তোমাকে এই হোটেলে এনে রাখব একবার। দুজনে একসঙ্গে আর যাওয়া হয়নি সেখানে।

যে হোটেলে উঠেছিলাম, তার ভাড়া ও থাকা-খাওয়া নিয়ে দিনে ত্রিশ টাকা পড়ত দুজনের। 'পাম বিচে'র চার্জ ছিল অন্তত দশ-পনেরো গুণ বেশি। এর জন্যেও কোনও প্রকৃত আক্ষেপ যেমন থাকার কথা, তেমন আবার থাকার কথা নয়ও। যা কিছুই পিতৃদত্ত নয়, শ্বশুরদত্ত বা অন্যদত্ত নয়; তার সবটুকুই নিজের চেষ্টাতে পরিশ্রমে জেদে গড়ে নেওয়ারই আরেক নাম আত্মসম্মানবোধ।

আমার অভিধানে অন্তত তাই বলে।

শিশুকাল থেকেই 'বড়লোকের ছেলে' এবং 'বাবার পয়সায় ফুটানি করা' মানুষদের সম্বন্ধে বাবারই কাছ থেকে অনবরত নানা কথা শুনে অনবধানে তাদের সম্বন্ধে একধরণের ঘৃণা জন্মে গেছিল, যা, আজ অবধিও গভীরে প্রোথিত আছে। যারা শুধুমাত্র বাবার জোরে বা শ্বশুরমশাইয়ের জোরেই বড়োলোক বা সে-পরিচয় ছাড়া যাদের অন্য কোনো পরিচয়ই নেই; তাদের প্রতি আমার এক গভীর অসূয়া ছিল কৈশোর থেকেই।

বড়োলোকের ছেলে হওয়াতে দোষ নেই কিন্তু তাদের অন্যকিছু গুণপনা, পরিশ্রম করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা অবশ্যই থাকা দরকার। বাবা বলতেন, 'কুঁজোর জল গড়িয়ে খেলে, বেশি দিন থাকে না।' বড়োলোকের ছেলে যে, তাকে নিজ চেষ্টায়, নিজ পরিশ্রমে জীবনে প্রমাণিত করতে হয়, যে তারও ভালোভাবে খেয়েপরে থাকার যোগ্যতা আছে, 'সৎ পথের' এবং 'সম্মানের' রোজগারে।

বাবার কাছে টাকা চাইলে, টাকা অনেকই দিতেন। ঔদার্যতার কোনওদিন অভাব ছিল না তাঁর। বিশেষ করে নিজ সন্তানদের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমি কোনওদিনও চাইনি বলেই দেননি। অথচ আমার নিজের রোজগার তখন এমন ছিল না, সঞ্চয়ও; যে, বিয়ে করেই গ্র্যান্ড স্কেলে হানিমুন করে 'ফুটানি' করি। নিজে থেকেও দেননি।

সে কারণে তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নেই।

প্রত্যেক বাবা-মা-ই পক্ষপাতিত্ব-দোষে দোষী। সন্তান যদি সুখী হয়, তবে তাঁদের সেই দোষ নিজেগুণেই ক্ষমা করে দেওয়া উচিত এই মনে করে যে, সে নিজে যখন বাবা বা মা হবে তখন সেও হয়তো ওই দোষে দোষী হবে।

আমাদের পরিবারে আমিই প্রথম কুলাঙ্গার যে, নিজমতে বিয়ে করি এবং হানিমুনে যাওয়ার মতো "আস্পর্ধা" প্রকাশ করি। সে কারণেই হয়তো বাবা আমাকে, তাঁর ভাষায় বলতে গেলে, একটু 'টাইট' দিতে চেয়েছিলেন। আমার আগে, আমাদের অতি সাধারণ পটভূমির পিতৃপরিবারে এবং মাতৃ-পরিবারেও কেউই 'হানিমুনে' যাননি।

আমার পিতা মুখ ফুটে একথা বলেননি। কিন্তু অনেক মানুষকেই আমি এই 'টাইট দেওয়া' বা 'দিতে হবে' এই বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করতে শুনি। কিন্তু আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এই যে, যাঁরাই বেশি টাইট দিতে যান কোনও কিছুকেই, তা জলের কলই হোক কি অন্য কিছু; তাঁদেরই প্যাঁচ কেটে যায় এবং পুরো ব্যাপারটাই ঢলঢলে হয়ে যায়। জলের কলই হোক বা সম্পর্কই হোক। প্যাঁচ, পরে আর আটকায় না। এই ঘোরকলিতেও আমার গভীর বিশ্বাস এই যে, আমাদের উপরে যিনি আছেন, সেই গ্রেট প্লাম্বার, ড্যাডি অফ ওল ড্যাডিজ, নিজহাতেই এখানে যা কিছুই 'টাইট' করার, করেন। আর তিনি যাকে টাইট দেন, তার দমবন্ধ হয়ে যায়।

আমরা সামান্য মানুষ। অন্যের ভালো করার ক্ষমতা আমাদের আছে, ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। ক্ষতি সাময়িকভাবে করা যায় অবশ্যই এবং ইতরজনেরা করেও কিন্তু সেই সব 'ক্ষতিই' চতুর্গুণ হয়ে 'বুমেরাং' হয়ে ফিরে আসেই তাদের বুকে। উপরওয়ালার বুমেরাং সহ্য করা বা ঠেকানো পর্বতপ্রমাণ মূর্খামি বা অর্থজনিত লজ্জাকর দম্ভ দিয়ে কখনওই যায় না। তাঁর মারা বড়ো মার।

অন্য কথাতে চলে গেলাম। আজকাল বয়স হচ্ছে, সবাই নীরদ চৌধুরী নন যে বয়সে যৌবন বাড়বে! ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়ই!

একটু আগেই বোধহয় বলেছি যে, আমরা যে হোটেলে ছিলাম উনিশশো বাষট্টির এপ্রিলে, গোপালপুর-অন-সিতে, তার টারিফ ছিল দৈনিক ত্রিশ টাকা মাত্র। দুজনের থাকা-খাওয়া, আদর-যত্ন, মায় সমুদ্রতীরে 'হানিমুনিং-কাপল' (কট, অলওয়েজ ফাইটিং)—এর জন্যে গরম কফি বা ড্রিংকিং চকোলেট সরবরাহ করাও তার মধ্যে পড়ত। দোতলাতে একটি বড়ো বেডরুম, বড়ো বাথরুম এবং একটি ছোটো সিটিং-রুম সমেত স্যুইট। একজন বেঁটে-খাটো চাইনিজ ভদ্রলোক হোটেলটির মালিক ছিলেন। তিনিই অবশ্য জমাদার-মায়-ঝাড়ুদার-মায়-কুক-মায়-বেয়ারা ছিলেন। 'ওয়ান-ম্যান-শো'র

উৎকৃষ্টতম অথবা নিকৃষ্টতম উদারহণ। ওইরকম আরেকজন মালিক দেখেছিলাম উনিশশো চুয়ান্নতে কুমায়ুঁ হিমালয়ের আলমোড়াতে, কোশী ব্রিজের প্রায় গায়েই লাগানো একটি হোটেলে।*

তার কথাতে পরে আবার আসব।

আমাদের আগল-তোলা লাগাতার-আদর এবং আগল-খোলা লাগাতার ঝগড়া এবং তারই মাঝে মাঝে ইন্টারভ্যাল হিসেবে, লুনাটিকদের ল্যুসিড ইন্টারভ্যালের মতো, আবার গানের ক্লাসও চলত। ঋতু আমাকে হানিমুনে "আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে" গানটা তুলিয়ে দিয়েছিল।

তার কথাতে পরে আবার আসব।

এমন সব আটারলি কনট্রাডিক্টরি ক্রিয়া-বিক্রিয়াতে বুদ্ধিনাশ হত ভদ্রলোকের। চাইনিজ ভদ্রলোক রীতিমতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে থাকতেন সবসময়ই। আমাদের ভালবাসবেন না বকবেন, না তাড়িয়ে দেবেন বুঝতে পারতেন না।

তিসরি দিনের বিকেলে, উনি আমাকে ডেকে নিয়ে উলটোদিকের বাদামি রঙা খণ্ডহারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, শোঁ-শোঁ করা নোনা হাওয়া, সমুদ্রের হুড়ুম-দুড়ুম শব্দ, লাল-ভেটকির গন্ধ, বিরহী টার্ন আর মিলিত স্যান্ডপাইপার পাখিদের বিষণ্ণ এবং উদ্দীপ্ত চিকন ডাকের পটভূমিতে, আধ-বোজা চোখ দুখানি প্রায় বুজে ফেলেই আমাকে বললেন, 'লুক। মিস্তার গুহা। আই উইল তেল উ্য থামথিং।

আমি তখনও 'মিস্তার গুহাতে' অনভ্যস্ত মিস্টার গুহা; বললাম, হোয়াট?

ভয়ে থুথু আটকে গেল গলাতে।

ভাবলাম, তাড়িয়ে টাড়িয়ে দেবেন, নয় পুলিশে দেবেন হয়তো।

না। সেসব কিছুই করলেন না।

বললেন, 'ইউ থি! দেয়ার আর ওনলি তু ওয়েদ উইথ দ্যা উইমেন।'

আমি সেই হেঁয়ালিতে ততোধিক ঘাবড়ে গিয়ে আবারও বললাম, 'হোয়াট? হোয়াট ওয়েজ?'

'ইউ থি। আইদার ইউ কিথ দেম আর উ্য কিল দেম। দেয়ার আর নো ইনবিতুইন ওয়েদ।'

অর্থাৎ, Either you kiss them or you kill them. There are no inbetween ways! আমি ফাঁপরে পড়ে বললাম, হোয়াট শ্যাল আই ডু?

তিনি বললেন, ড্যু নট কোয়ারল! ড্যু নট কোয়ারল।

যেমন করে গ্রাঁ-প্রি-ড্রাইভার মাইক সাটো বলেছিলেন, 'ডু নট লুক অ্যাট দ্যা হেডলাইট, ডু নট লুক অ্যাট দ্যা হেডলাইট, ডু নট লুক অ্যাট দ্যা হেডলাইট।'

তেমন করেই।

তারপর স্বপ্নাদেশের মতো বলেছিলেন, মেক লাভ।

কী করে "হিন্দি-চীনী ভাই-ভাই তোমায় আমায় ফারাক নাই"- কে, কেন যে, আক্রমণটা করেছিলে! হিটিং বিলো দ্যা বেল্ট! মানে, ভারত আক্রমণের কথা বলছি; বলি যে, সেইটাই তো জীবনের মূল মন্ত্র বলে ভেবেছিলাম। 'হানিমুনে' থুড়ি 'সাওয়ারমুনে'র মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল চলন্ত-রেলগাড়ির ফার্স্ট-ক্লাস কুপেতে, সাড়েসাতশো বাঁশের প্যান্ডেল বেঁধে দু'হাজার লোক খাইয়ে বিয়ে-করা, অত দামি এবং দারুণ ফিগারের গাইয়ে-বউকে আদর করে কী ধরনের সুখানুভূতি হয় তা জানা!

অন্য একটি মহোত্তর পরিকল্পনাও ছিল। ভরা-পূর্ণিমার মধ্যরাতে, ভরা-জোয়ারের সমুদ্র আর চাঁদকে সাক্ষী রেখে, নির্জন সমুদ্রে দুধলি বেলাভূমিতেও একবার আদর করব। কিন্তু সেই মহৎ পরিকল্পনা রূপায়িত করা গেল না আমার দেড়মাস-পুরোনো স্ত্রীরই জন্যে। সে বলল, চারদিকে কাঁকড়া আর কাঁকড়ার গর্ত। কখন কোথায় কামড়ে দেবে! আমি ওই সব অসভ্যতার মধ্যে নেই।

এখন সেসব কথা ভাবলে আনন্দ হয়, মজাও পাই। আমাদেরও যে অমন দিন ছিল তা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। সাতাশ বছরের আমি! আর বাইশ বছরের ঋতু! হায়! হায়! দিন যায়। দিন যায়।

---

* "অনুমতির জন্যে" (উপন্যাস)—মিত্র ঘোষ প্রাঃ লিঃ

পাঠক, আমার এই সব সংলাপ-বিলাপকে আদিখ্যেতা বলে ভাববেন না দয়া করে। আপনার যৌবনও একদিন স্থলপদ্মের মতো সকালবেলার রোদ্দুরে কী আশ্চর্য গোলাপি হয়ে উঠবে, পাপড়ি মেলবে, যদি ইতিমধ্যেই না হয়ে উঠে থাকে এবং দিনশেষে, সেই সুন্দর গোলাপি পাতাগুলিই আবার পাপড়ি গুটিয়ে নিয়ে ছাইরঙা হয়ে যাবে।

যৌবন এত স্বল্পকাল থাকে, এত তাড়াতাড়ি গলে যায় যে; তাকে আইসক্রিমেরই মতো তাড়াতাড়ি চেটেপুটে খাওয়াটাই উচিত। সজাগ সতর্ক চোখে দেখা উচিত, যাতে একটুও যৌবন আঙুল-গলে পড়ে না যায়!

অনেকই দূরে চলে এলাম। আবার ব্যাক টু সেন্ট জেভিয়ার্স' কলেজ।

হানিমুনের ছুটি পাইনি বলে হানিমুন সম্বন্ধে আমার একটা Fixation হয়ে যায়। আমার দুই ছোটো ভাইয়ের যখন বিয়ে হয় তখন তাদের দু'জনকেই "ক্যাপের" টিকিট কেটে, 'পামবিচ হোটেল' বুক করে টাকা দিয়ে সেই গোপালপুরেই পাঠাই। সেখানেই, যেখানে আমরা যেতে পারিনি।

আমার কনিষ্ঠতম ভ্রাতা যায়নি। একটু অতিরিক্তরকম বিষয়ী সে। টাকাটা সে ব্যাংকে পুরে দেয়।

ছোটো ভাইয়েরা ছাড়াও অফিসের অগণ্য সহকর্মীকে হানিমুনে পাঠিয়েছি। কারণ, থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়ের জীবনে হানিমুনের সময় একবারই আসে।

মাত্র একবারই, যদি না আপনি একাধিক বিয়ে করার মতো ভাগ্যবান হন!

কলেজের বন্ধুদের মধ্যে আর্টস-স্ট্রিমের বন্ধুদের সঙ্গেই আমার বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, বিশেষ করে প্রথম দু'বছর।

বি কম-এর ক্লাসে উঠে যখন আমাদের কলেজ সকালে হয়ে গেল তখন অবশ্য কমার্স পড়া ছেলে ছাড়া অন্যদের সঙ্গে দেখাই হত না, কলেজের বাইরে ছাড়া।

অরুণ দাম ছিল বাংলা সাহিত্যের খুব অনুরাগী এবং খুব পরিশ্রমী। বলতে গেলে, ও একা হাতেই একটি দেওয়াল-পত্রিকা বের করত। কলেজের একতলার করিডরের দেওয়ালে টাঙানো থাকত অরুণের পত্রিকা। আমরা সকলেই যেমন কলেজ ম্যাগাজিনে বাংলাতে এবং ইংরেজিতেও লিখতাম, তেমন অরুণের সম্পাদিত কাগজেও লিখতাম। কাগজটির নাম ভুলে গেছি।

অরুণের সঙ্গে দেখা হল বহুদিন পরে এবারে বইমেলাতে কিন্তু ওর কাগজের নামটা ও নিজেও মনে করত পারল না।

অরুণ গানও খুব ভালোবাসত। গান ভালোবাসত বলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী পূর্বা সিনহা তার ঘরণী হয়েছিল, এখন দাম।

মুখ্যত দীপকেরই উদ্যোগে সেন্ট জেভিয়ার্সের আমরা, আমাদের ব্যাচের প্রেসিডেন্সির নবনীতা এবং আরও কয়েকজনের পৌরোহিত্যে, একটি কাগজ যুগ্মভাবে বের করতাম। তার নাম ছিল "সংলাপ"।

প্রেসিডেন্সি কলেজের রি-ইউনিয়নের স্মারক সংখ্যাতে নবনীতার একটি লেখা পড়ে মনে পড়ল যে, অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ও বর্তমানে প্রেসিডেন্সির প্রিন্সিপাল নবনীতার সঙ্গে ছিলেন। 'সংলাপ'-এ আমরা লিখতাম এবং কাগজটা "ধরে" গেছিল প্রেসিডেন্সি ও সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে।

আর্টসের সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছিল দুষ্টু-চূড়ামণি। প্রচণ্ড WITTY এবং সকলেরই পেছনে লাগত। ইন্টারমিডিয়েট পড়া পর্যন্ত ওরা থাকত হাওড়াতে। সঞ্জয়ের বাবা সম্ভবত বার্ন কোম্পানির বড়ো সাহেব ছিলেন। উনিশশো চুয়ান্নতে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে দেখেছিলাম যে, পুরো বাড়িটাই এয়ার-কন্ডিশনড।

উনিশশো চুয়ান্নতে এয়ারকন্ডিশনিং কলকতায় খুব কম বাড়ি বা অফিসেই ছিল। ওর বাবা-মা আমাদের মেসোমশাই-মাসিমা এবং ওর তিন সুন্দরী বোন সকলেই গান-বাজনা ভালোবাসতেন ও বাসত। পরে যখন হাজরা রোডে চলে আসেন মেসোমশাই, ফাঁড়ির কাছের একটি সুন্দর লনওয়ালা বাড়িতে, তখন দোলের দিন ওদের বাড়িতে যেতামই। লনে আবির খেলা হত। ওদেরই গড়িয়াহাট রোডের বাড়িতে প্রথমবার উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেবকে দু'হাত সামনে থেকে সকালের ভৈরবীর আসরে দেখি এবং শুনি।

সঞ্জয়, সহপাঠীদের মধ্যে নানাজনের নানা নামকরণ করেছিল। কোলিয়ারির মালিক শেঠিয়াদের এক ছেলে দিলীপ আমাদের সঙ্গে পড়ত। সঞ্জয় ওর নাম দিয়েছিল "Concept of ugliness" ।

দিলীপের সঙ্গে গত বছরও দেখা হয়েছে আমার। আগের থেকে এখন ও অনেকই সুন্দর হয়ে গেছে। একটি কনভার্টিবল শেভ্রলে গাড়ি চালিয়ে আসত দিলীপ।

সঞ্জয়, মন্টির নাম দিয়েছিল "Concept of strangeneses"

কিন্তু আমার মতে Concept of strangeness নামকরণ করা উচিত ছিল সুভাষেরই!

"আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে, গতকাল" ওই কবিতাটি লেখা হওয়ার পরদিন থেকে সুভাষকে আমি 'কবি' বলেই ডাকতাম।

বেঁটেখাটো, কালো-কোলো, শক্ত-সমর্থ, যোগাভ্যাস-করা, ঝাঁকড়া একমাথা চুলের সুভাষ মুখার্জি সত্যিই Strange ছিল সর্বার্থেই। সবসময়েই তার হাতে থাকত মোটা মোটা ইংরেজি-বাংলা বই। অধিকাংশই ইংরেজি। কখনও দর্শনের, কখনও নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের, কখনও উপনিষদের, কখনও কবিতার, কখনও মোটরগাড়ি রিপেয়ারিঙের। ওর মতো Totally confused অথবা Genius সহপাঠী আমাদের আর একজনও ছিল না।

সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল এই যে, ওর নিজের ভিতরের Confusion টা ও আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। মাঝে মাঝেই হীনমন্যতাতে ভুগতে হত আমাদের অনেকেরই, ও আমাদের সকলের চেয়ে কত বেশি জানে ভেবে! ঢুলুঢুলু কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটিকে পুরু চশমার আড়াল থেকে সে যখন আমাদের চোখে ফোকাস করত তখন ওকে বাতিল করার হিম্মৎ আমাদের কারওই হত না।

সুভাষ মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যেত। পনেরো দিন বা একমাসের জন্যে। কলকাতাতে থাকলেও ক্লাসে বিশেষ আসত না। হয়তো ম্যাগনোলিয়াতে 'পিকোলো' বা 'কোনা কফি' খেত বসে বসে। চেইন স্মোকারও ছিল।

দীপকও সিগারেট খেত। আমি থার্ড ইয়ারের শেষ দিক থেকে থেকে একটু আধটু পাইপ খেতাম। পাইপ খেয়েছিলাম একটানা তিরিশ বছর। It was my staple food। ভাত না হলেও চলত; পাইপ না হলে চলত না। ডাক্তার বারণ করাতে একদিনেই ছেড়ে দিয়েছিলাম পাইপ। পাছে, খেতে ইচ্ছে করে, তাই সারা পৃথিবী থেকে আনানো ও আনা, আফ্রিকান "মীরশ্যাম" সমেত, পাইপের পুরো কালেকশান পরিচিত পাইপ-খেকোদের মধ্যে বিলিয়ে দিই এক সপ্তাহের মধ্যে।

সুভাষ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবার পর একদিন আবার এসে হঠাৎই উদয় হতো। ওকে জিজ্ঞেস করতাম, কোথায় গেছিলি?

সুন্দরনে।

কী করতে?

কলেরা হয়েছিল বাস্তাবেলিয়াতে। সেবা করতে গেছিলাম।

কিছুদিন পরে আবারও নিরুদ্দেশ।

আইসবার্গের মতো এক-তৃতীয়াংশ থাকত ওর বহিরঙ্গে, দুই তৃতীয়াংশ থাকত অন্তরঙ্গে। ওর রঙ্গ বোঝা ভারি ভার ছিল। বন্ধুত্বও ওর সকলের সঙ্গে ছিল না। দীপক এবং আমার সঙ্গে ছাড়া।

সঞ্জয়ের লিডারশিপে আমরা নিউএম্পায়ারে দশ আনার লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে সকলে মিলে একটা ছবি দেখেছিলাম একদিন কলেজ কেটে। ছবিটার নাম ছিল : "An Alligator named Daisy"। তাতে একটা দৃশ্য ছিল, বনলোকের বাগানবাড়ির মেছো কুমিরে-ভরা একটা পুকুরের উপরের কাঠের সাঁকো পেরোতে গিয়ে গুচ্ছের বিভিন্ন-বয়সী ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার জলে পড়ে যাওয়ার।

সেই দৃশ্য দেখে আমরা এতো হাসি হেসেছিলাম এ ওর পিঠে চড় মেরে যে, তা বলার নয়।

সেই সব নির্দোষ আনন্দের উজ্জ্বল দিনগুলির কথা আজ মনে হলে মন সত্যিই বিষণ্ণ হয়ে আসে। কী সব অগাধ এবং সহজ সুখের দিন ছিল! আমাদের চাহিদা ছিল অতি সামান্য তাই অল্পেই সুখী হতে পারতাম সহজে। যে-দিনগুলি পিছনে ফেলে এসেছি, সেগুলিই ছিল সবচেয়ে সুন্দর। বর্তমান একঘেয়ে। ভবিষ্যৎ অজানা।

মনে আছে, সেইদিনই সঞ্জয় 'নিজাম'-এ নিয়ে গিয়ে জয়নগর-মজিলপুরের ব্রাহ্মণ দীপক চক্রবর্তী এবং গোঁড়া হিন্দু ঠাকুমার আদরের নাতি আমাকে, গোরু খাইয়েছিল। আগে কিছুই বলেনি। শুধু বলেছিল, তোদের 'রোল' খাওয়াব। আজকাল যেমন সব ফুটপাতেই রোলের দোকান, তখন তেমন ছিল না। ওই রোল শুধু পাওয়া যেত মুসলমান রেস্তোরাঁতেই। বিফ, মটন,চিকেন। সঞ্জয় যে চক্রান্ত করে বিফ খাইয়ে দেবে, তা কে জানত! আমি আর দীপক হতভম্ব। দীপক তো বমিই করে ফেলল। আমার গা-গুলিয়েছিল কিন্তু বমি করিনি।

কবি (সুভাষ) রেলিশ করে খেয়ে, চায়ে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, খেতে ভালো 'ভিল'। বিফ, গরিবেরা খায়।

বমি-মুখেই দীপক শুধোল, 'ভিল' কী?

বাছুর রে, বাছুর!

কবি বলেছিল।

"অ জ্যাঠাইমা!" বলেই, আবারও বমি করল দীপক।

দীপক ছিল তার নিঃসন্তান জ্যাঠাইমার চোখের মণি।

একদিন কবি লাইটহাউসের উলটোদিকের "মডার্ন বুক ডিপো" থেকে আমাকে একটি বই কিনে প্রেজেন্ট করল। ওর হাতে সবসময়েই প্রচুর পয়সা থাকত। সে জন্যে, সহপাঠীদের মধ্যে একাংশ ওর চামচেগিরি করতে চাইত। কিন্তু কবি, কবি হলে কী হয়, মহা সেয়ানা ছিল। তাদের কাটিয়ে দিত। আমাকে আর দীপককে ভালবাসত বলে বহু জিনিস উপহার দিত আমাদের। মনটা খুব বড়ো ছিল কবির। যদিও পয়সাটা ছিল তার বাবার।

যে বইটা কিনে দিল, সে বইটার নাম ছিল "গ্রেটার অ্যান্ড লেসার হর্নবিলস"। ধনেশ পাখিদের নিয়ে লেখা।

আমি বললাম, হঠাৎ? তোর কি অর্নিথোলজিতে ইন্টারেস্ট আছে না কি?

ও বলল, হঠাৎ আবার কী? তোর নাকের সঙ্গে ধনেশ পাখিদের নাকের কেমন মিল তা কি তুই জানিস?

শুনে আমি দুঃখিত হওয়াতে কবি সুখী হল।

তারপর বইটার ওপরে ওপর সোনার পেলিক্যান কলম দিয়ে লিখল,

"To Dear Buddha,

I Could do no better and this I belive."

তারপর বলল, আসলে, আজ বোদল্যেয়রের জন্মদিন। কবি হিসেবে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ কমিটমেন্ট তো আছে। থাকা উচিত অন্তত প্রেমে-পড়া আমার বিশেষ কমিটমেন্ট তো আছে। থাকা উচিত অন্তত।

প্রেমে-পড়া আমার জীবনের এক FAVOURITE PAST TIME। কবে থেকে যে ধপাধপ প্রেমে পড়ে আসছি! সেই সব একতরফা প্রেমে কারোই ক্ষতি হয়নি, আমারও হয়নি। বরং লাভ হয়েছে! আকাশ-কুসুম কল্পনা করতে করতেই তো না-পাঠানো চিঠির পর চিঠি লিখতে লিখতেই তো একদিন মনস্থ করলাম যা কিছুই লিখি তা ছিঁড়ে না ফেলে পত্র-পত্রিকাতে পাঠাব। পাঠক, আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা দিন যে এই চিরসবুজ মনটিকে চিতায় যেদিন উঠব সেদিনও বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

আমরা যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, কবি একদিন বলল, দেওঘরে বেড়াতে যাবি?

এপ্রিল মাস। সম্ভবত গুড-ফ্রাইডের ছুটি পড়বে সামনেই।

দেওঘরে, স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন একবার গেছিলাম বাবা-মা এবং বোনেদের সঙ্গে। একটি ভাড়া বাড়িতে ছিলাম। রোহিণীর পথের কাছে। তার স্মৃতি ছিল সুন্দর।

কবি বলল, ওর জেঠামশাহয়ের বাড়ি আছে নন্দন পাহাড়ের নীচে। কোনওরকম অসুবিধে নেই। ফাঁকা বাড়ি। রান্না এবং খিদমদগারির লোকও আছে। সুতরাং আমরা, মানে আমি আর দীপক ঝুলে পড়লাম।

কবিই ম্যানেজার। আমি আর দীপক আমাদের যা সামান্য পুঁজি, তা কবির হাতেই তুলে দিলাম। সে প্রথমেই গোল্ড ফ্লেকের একটি টিন কিনে ফেলল। দু-একটা দীপককে দিত যদিও সেই টিন থেকে। আর আমি তো সিগারেট খেতামই না।

একদিন ভোরে গিয়ে পৌঁছোলাম যশিডি। সেখান থেকে, টাঙাতে করে দেওঘর। বাড়িটি সুন্দর। ছবির মতো। সামনে পেছনে নানা ফুলের বাগান।

পাশেই একটি বাড়ি ছিল। সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতেন একটি বাঙালি পরিবার। তাঁরা প্রায় বিহারীই হয়ে গেছিলেন। কবি, তাঁদের ভালো করে চিনত। প্রতি সন্ধ্যাতেই আমরা ওখানে যেতাম। কবি আমাকে গান গাইতে বলত। কবি কিন্তু গান ভালোবাসতো না আদৌ। শুধু ওই দু'নম্বরি কবিই নয় আমি এযাবৎ বহুত একনম্বরী, নামীদামি কবি দেখছি, যাঁরা গান ভালবাসেন না। গান না ভালোবেসেও কবিতা কী করে তাঁরা লেখেন তা জানি না। তবে যা তাঁরা লেখেন তাকে "আধুনিক কবিতা" বলে। জীবনমুখী গানেরই মতো ওই সব জীবনমুখী কবিতা, কবিতা কি-না তা শুধু "প্রকৃত জিরো-নম্বরি" কবিরাই বলতে পারবেন!

সেই বাড়িতে, তিনটি পিঠোপিঠি বোন ছিল! ফরসা ছিপছিপে। যতদূর মনে পড়ে, তাদের মুখগুলি একটু পাণ্ডুর ছিল। কেন, জানি না। তবে তাদের মুখের ও শরীরের গড়ন ছিল ভারি সুন্দর। তাছাড়া, আমাদের তখন যা বয়স এবং আমি যেমন জন্ম-রোমান্টিক, তাতে বন্ধুর বোন অথবা বোনের বন্ধু অথবা কেউই নয়; এমন মেয়েদের কাছাকাছি এলেও প্রায় সকলকেই ভালো লেগে যেত। জন্মস্থানে চন্দ্রের অভিশাপ থাকায়, ঘন ঘন একতরফা প্রেমে পড়ে যেতাম। আজও সেই অভিশাপ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কী সাংঘাতিক অথচ কী সুন্দর সব নিত্যনতুন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েও যে বেঁচে এসেছি এবং এখনও বেঁচে আছি; তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!

লণ্ঠনের আলো সেই মেয়েদের চোখে পড়ায়, তাদের চোখ রাতের উপত্যকার চিতল হরিণদের আলো-পড়া চোখের মতোই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠত। তারা তিন বোনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আমার গান শুনত।

অথবা, কে জানে! হয়তো আমিই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাদের গান শোনাতাম।

ওদের মধ্যে একজন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইত। আমার গানের সময়ে সে-ই "ফলো" করত। তার গাওয়া একটি গান এখনও মনে আছে। "লক্ষ্মী বন্দনার" গান। যতদূর মনে পড়ে, লক্ষ্মী, সেই বাড়িতে তখন ছিলেন না।

ছিলেন না বলেই হয়তো "লক্ষ্মীর বন্দনা'-তে গভীর মনোনিবেশ ছিল।

একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হই যে, লক্ষ্মী যখন যে-গৃহে থাকেন না, তখনই সেই গৃহে সবচেয়ে বেশি বন্দিত হন, বিশেষ করে বাঙালিদের বাড়িতে। লক্ষ্মীর আগমন ঘটলেই তাঁর বন্দনা বন্ধ হয়ে যায়

এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, সরস্বতীও প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গে সঙ্গেই পেছনের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করেন।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহাবস্থান বড়ো বেশি চোখে পড়ে না।

মেয়েটি গেয়েছিল :

"এসো সোনার বরণ রানি গো, এসো শঙ্খ কমল করে
এসো মা লক্ষ্মী, বোসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।"

চল্লিশ বছর হয়ে গেছে অথচ তবুও সেই সব নিরালা এবং সুরেলা সন্ধের, উজ্জ্বল চোখের তিনটি ছিপছিপে মেয়ের কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। তারা হয়তো আজকে দিদিমা হয়ে গেছে, হয়তো খুব ঐশ্বর্যবতী হয়েছে; হলে খুবই খুশি হব। একথাও নিশ্চিত যে, তারা আজ আদৌ আমাকে মনে রাখেনি। তাদের নাম মনে নেই, বাবার নাম মনে নেই; কিন্তু তাঁরা যদি দৈবাৎ এই লেখা পড়েন, তবে হয়তো সেই সব শালীন, সভ্য, মনোজগতের সন্ধেগুলির কথা তাঁদের নতুন করে মনে পড়ে যাবে। তাঁদের মন স্নিগ্ধ হবে, পুরোনো দিনের কথা দুর-প্রান্তরের আলেয়ার মতো মনের দিগন্তে দপদপ করবে।

আগেই বলেছি যে, দেওঘরে আমি তার আগেও এসেছিলাম। বদ্যিনাথধামের পাণ্ডাদের অসভ্যতার স্মৃতি মনে অত্যন্তই স্পষ্ট ছিল। হিন্দুদের অধিকাংশ ধর্মস্থানই ভীতিপ্রদ ছিল এই লোভী, ইতর একদল কোনওরকম ধর্ম-বিবর্জিত মানুষেরই কারণে, এই বিশ্বাসই জন্মে গেছে আমার, বহু তীর্থস্থানে গিয়ে। কলেজে ওঠার পর থেকে তাই ঠাকুমার বা মায়ের অনুরোধে বা আদেশে তাঁদের নানা ধর্মস্থানে নিয়ে গেলেও আমি কখনওই কোনও মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢুকিনি। চত্বরে গেছি, মন্দিরের সৌন্দর্যও যে-শিল্পীরা তা বানিয়েছিলেন তাঁদের গুণপনাতে অভিভূত হয়ে গেছি, কিন্তু ভিতরে ঢুকিনি।

আমার ঈশ্বর, যদি তিনি আদৌ থাকেন; তবে আছেন আকাশে, বাতাসে, নদীতে, পাহাড়ে, গভীর জঙ্গলে। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি আছে না? "ওদের কথায় ধাঁধাঁ লাগে তোমার কথা আমি বুঝি। তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি"। সেই কথা, আমারও মনের কথা।

মন্দিরে গেল দীপক। প্রচুর ভক্তিভরে পুজোর প্রসাদ খেল, দেওঘরের বিখ্যাত প্যাঁড়া বাড়ির জন্যেও নিল। কবি বলল, আমার ঈশ্বর নীটশে।

নীটশে, জার্মান দার্শনিক। তাঁর মোটা মোটা বই থাকত কবির সঙ্গে সবসময়ে এবং তারই সঙ্গে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের বই। বার্ট্রান্ড রাসেলকেও মাঝে মাঝে ঈশ্বর বানাত ও। এবং ওর ঈশ্বরদের প্রভাব ওর উপরে পড়লেই ও এমন মুখ করে উদাস চোখে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসে থাকত যে মনে হত্যো, নিমপাতার পিটুলিগোলা খেয়েছে। মদ না খেয়েও অমন মাতলামি করতে কারোকেই দেখিনি।

দীপক পরদিনই বলল, একদিন ডিগারিয়া পাহাড়ে যাওয়া যাক।

আমাদের সময়কার ভবানীপুরের ছেলেরা খুব অ্যাডভেঞ্চারাস হত। দীপকের বাস ছিল ভবানীপুরে।

নন্দন পাহাড় ছিল বাড়ির কাছেই! কিন্তু দূরেব ডিগারিয়া পাহাড় দেখা যেত কবির জেঠামশাইয়ের বাড়ির দোতলার জানালা দিয়ে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি। প্রকৃতি পুরোপুরি বিবাগী হবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সারাদিন লাল ধুলো আর ঝরা পাতা-ওড়ানো হাওয়া বয় কৈশোরের প্রথম প্রেমের মতো এলোমেলো, অস্থির। ঠোঁট ফাটে হাওয়ায়। নবযৌবনের দলের আমাদের বুকের মধ্যে কষ্ট হয় খুব। গাইতে ইচ্ছে করে : "আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে, কোথায় লুকিয়ে থাকে রে।"

দীপক বলল, চ' বুদ্ধু, কাল বিকেলে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ি। আলো থাকতে থাকতেই ফিরে আসব।

কবি বলল, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' পড়িসনি বুঝি?

না, তার সঙ্গে পাহাড়ের কী সম্পর্ক?

আছে আছে। বাঙালির যে পাহাড়ের দূরত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তা তোর কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। উনি সে কথাই লিখেছিলেন।

দীপক বলল, পাহাড়টা কতদূর হবে? আমাদের কাঁসারিপাড়ার বাড়ি থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ যতটা, ততখানি?

ততখানি! তোর মাথা! ডিগারিয়ায় পায়ে হেঁটে যেতে আসতে চার ঘণ্টা লেগে যাবে বেড়িয়ে টেড়িয়ে। সাইকেলে গেল, ঘণ্টা দুয়েক লাগবে।

তুই কখনও পাহাড় দেখেছিস?

কবি জিজ্ঞেস করল।

ও বলল, দেখব না কেন? দুগ্‌গোপুজোর সময়ে দুগ্‌গোমূর্তির সামনে যে "কৈলাস" করে তেরপক-টেরপল দিয়ে সেই কৈলাস দেখেছি।

তবে তো দেখেছিসই।

সবজান্তা ভাব করিসনি সুভাষ।

দীপক বলল।

তারপর আমাকে সালিশি ঠাউরে বলল, দেখেছিস বুদ্ধু!

দীপক, ওর ঘোর দক্ষিণ বাংলার জয়নগর-মজিলপুরি উচ্চারণে আমাকে বুদ্ধ না বলে প্রায়ই ভালোবেসে এবং সচেতন যখন থাকত না, তখন বুদ্ধু বলে ডাকত।

আমি কখনওই আপত্তি করিনি। "ইন্টেলিজেন্ট" বললেই বরং করতাম।

দীপকের বাড়িতে ফোন করলেই, নাম্বারটা এতদিন পরেও স্পষ্ট মনে আছে, ৪৭-৮২০৯. মাসিমা বা মেসোমশাই ধরতেন।

মাসিমাকে বলতাম, মাসিমা, আমি বুদ্ধ বলছি।

তখন মাসিমা বলতেন, বুদ্ধু! তাই বলো! নামটা, ঠিক করে বলবে তো বাবা। ঠোঁট দু'খানি পানের রক্তিমাতে সবসময়েই রক্তিম থাকত। জরদার গন্ধ বেরুত মুখ থেকে। "ড্রেস" দিয়ে শাড়ি পরতেন না কখনওই। আমাদের মা-মাসিমারা, সদা-হাস্যময়, পতিপ্রাণা, সংসার সর্বস্ব ছিলেন যদিও কিন্তু তাঁদের মতো সুখী প্রজন্ম, মেয়েদের মধ্যে আর হবে কি না জানি না।

মা চলে গেছেন, মাসিমা আছেন। তাঁরা সকলেই একে একে চলে গেলে বাঙালি জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়, বিশেষ ট্রাডিশান শেষ হয়ে যাবে—পাণ্ডা ভাল্লুকদেরই মতো। পাণ্ডা ভাল্লুকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বা সিভেট-ক্যাট বা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা চলেছে এবং আমরা অনেকেই তাতে "শামিল" হয়েছি অথচ মা-মাসিমাদের প্রজন্মের সাজ-পোশাক, আচার-ব্যবহার, স্নেহ-আদর এবং তাঁদের মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কেউই বিন্দুমাত্রই করলাম না।

অবশ্য তাঁদের "লিবারেশনে"র জন্যে আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল না কোনও। তাঁরা পুরুষের সমান হতে চাননি কোনওদিনই, কারণ, তাঁদের স্থান ছিল মাথায়। তাঁরা ছিলেন, শিরোধার্য।

দীপক বলল, তাহালে কি দেখা হবে না আমাদের ডিগারিয়া পাহাড়?

হবে না কেন? সাইকেলে যেতে হবে।

কবি বলল, ওর ইউজুয়াল নৈর্ব্যক্তিক স্বরে।

সাইকেল কোথায় পাব?

আমাদের জেঠামশাই কবি, তার জেঠামশাইয়ের বাড়ির বারান্দাতে দাঁড়িয়ে বলল, তোদের এই বালখিল্য সুলভ ঔৎসুক্য যে কবে যাবে? পাহাড় সব পাহাড়ই, দূর থেকেই ভালো। পাহাড়ের কাছে গিয়ে দেখার কী আছে? কোনও সুন্দরীর মুখ ভালো লাগলে কি মই লাগিয়ে তার মুখের ওপরে চড়ে তা দেখতে হবে? বেশি করে অ্যাপ্রিশিয়েট করার জন্যে?

ওসব কথা ছাড়। এখন বল, সাইকেল কোথায় পাব?

দীপক বলল।

সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায় এখানে? চওকে। ঘড়ি-ঘরের কাছে।

কবি বলল।

তুই যাবি না?

নাঃ।

কেন?

বললামই তো! ওসব বোকা-বোকা ব্যাপারে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।

দীপক বলল, তা বললে তো হবে না। একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গেই যেতে হবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল, সেটি হচ্ছে না।

হাঃ। যেন স্বর্গরাজ্যে যাচ্ছিস তোরা। তোদের যেতে হলে, তোরা যা। আমি ওসবের মধ্যে নেই।

দীপকও নাছোড়বান্দা। সে বলল, তোকে যেতে হবেই।

কবি কথা না বলে, কবি-কবি চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু উত্তর দিল না কোনও। দেওঘরের চওকের চৌমাথাতে ঘড়ি-ঘরের কাছে একটা মস্ত সাইকেলের দোকান সত্যিই ছিল। সেখান থেকে তিনটি লজ্‌ঝড়ে সাইকেল ভাড়া করে আমরা তো রওনা দিলাম। অগ্রিম মোটা টাকা ডিপজিট দিতে হল। তিন ঘণ্টার কড়ারে ভাড়া নিলাম আমরা। ফিরে এলে ভাড়া কেটে নিয়ে বাকি টাকা ফেরত দেবে বলল দোকানি।

কবি বলল, তোরা এগো। আমি সিগারেট কিনে নিয়ে আসছি।

সিগারেট ফুরিয়ে ফেললি? এরই মধ্যে? এক টিন?

দীপক বলল, উষ্মার সঙ্গে।

ফুরিয়ে ফেলব না তো কি? আতর মাখিয়ে মুর্শিদাবাদি বালাপোশের মতো আলমারিতে তুলে রাখব সিগারেট?

তুই কিনে আন। আমরা অপেক্ষা করছি তোর জন্যে।

দীপক বলল।

কবি বলল, আমার আরও কাজ আছে, তোরা এগো বললামই তো!

দীপক বলল, দ্যাখ কবি! তুই যদি না আসিস, তো আমরা কিন্তু তোদের বাড়িতে থাকব না।

না থাকলে, না থাকলি। এখানে অনেক ধরমশালা আছে সেখানেই গিয়ে থাক।

দীপক বলল, দেখছিস বুদ্ধ, কী ছোটলোকের পাল্লায় পড়েছি! এদিকে তো উনি আমাদের ক্যাশিয়ার। এখন তাড়িয়ে দেবার মতলব।

তারপর কবিকে বলল, সব টাকাই তো আমরা তোকে জিম্মা করে দিয়েছি। ধরমশালায় কি আমাদের মুখ দেখে থাকতে দেবে?

কী দেখে থাকতে দেবে তা আমি কী করে বলব? আমি তো বলিনি আমাদের বাড়িতে না-থাকতে। কথা বাড়াস না, বলছি তো তোরা এগো, আমি যাচ্ছি। ধরে নেব ঠিক তোদের। আমাদের পাড়ার ফাটা-কেষ্টর দিবারাত্রি সাইকেল-চালনা প্রতিযোগিতাতে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম বারো বছর বয়সে। জানিস? হাওয়ার মতো উড়ে যাব। যা, তোরা এগো।

অগত্যা আমি আর দীপক এগোলাম।

একটু পরেই পৃথিবী, জনমানব, ঘরবাড়ি, শূন্য হয়ে গেল। এদিকে প্রচণ্ড শুকনো গরম। শোঁ শোঁ করে লু বইছে। নাক চোখ ঠোঁট সব শুকিয়ে যাচ্ছে হাওয়াতে। দীপকের সঙ্গে 'লু'র সেই প্রথম পরিচয়। দক্ষিণ বাংলার জয়নগরের ছেলে।

চৈত্রাহত হয়ে ও বলল, এ কী হাওয়ারে! শরীরের সব রক্তই যে খেয়ে নেবে। আজ বাড়ি ফিরেই কাঁচা কলাইয়ের ডাল আর আলু-পোস্ত খেতে হবে। যদি গন্ধরাজ নেবু পাওয়া যায় একটু। মনে করিস তো, দেখতে হবে ফেরার সময়ে বাজারে।

আমি বললাম, কবির জেঠামশায়ের বাড়ির পাশের বাড়িতেই তো কত গাছ আছে। আমি তুলে নিয়ে আসব।

থাক, তোর আর গিয়ে কাজ নেই সেই বাড়িতে। কোন্ ফুল তুলতে কোন্ ফুল তুলবি তুই!

আমি বললাম, খুব যে ইয়ে দেখছি তোর!

ও মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে হাসল।

দীপকের সেন্স অফ হিউমার ছিল খুব SUBTLE। সেজন্যেও ভাল লাগতো ওকে। শিক্ষিত মানুষদের যেমনভাবে রসিকতা করা উচিত তেমন ভাবে এবং ভাষায় ও রসিকতা করতে জানত।

ক্যাঁচর-কোঁচোর শব্দ উঠছে ভাড়া-করা লজ্‌ঝড় সাইকেলে। আমার সাইকেলের সামনের চাকাটা টাল খাচ্ছে। হ্যান্ডেল কেবলই অটোম্যাটিকালি বাঁদিকে ঘুরে যাচ্ছে। তাকে বাগে আনতে সর্বক্ষণই ডানদিকে জোরে চেপে রাখতে হচ্ছে হ্যান্ডেল।

এরকম কট্টর বামপন্থী সাইকেলের দেখা আগে কখনওই পাইনি।

দীপক স্বগতোক্তি করল, একটু জল নিয়ে এলে হত।

কাঁচা রাস্তা চলে গেছে উদোম বিশ্বটাঁড়ের মধ্য দিয়ে। হাওয়াটা চাঁটি মেরে মেরে খাবলা-খাবলা ধুলো তুলছে জমি থেকে এক এক দমকে। আর সেই ধুলোরা থাপ্পড় মারছে আমাদের চোখে-মুখে-নাকে। দূরে, ধুলো-ওড়া টাঁড়ের শেষে ডিগারিয়া পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ধুঁয়ো-ধুঁয়ো, মেঘ-মেঘ।

মনে হল, আমরা বেশ অনেকদূর চলে এসেছি।

দীপক বলল, নাক দিয়ে রক্ত বেরুবে। আমার নাক জ্বালা করছে।

আমি বললাম, জেঠাইমার খোকা! এখন থেকে জুনের মাঝামাঝি বা শেষ অবধি এই 'লু'তে শুধু নাকই নয়, চোখ, কর্ণমূল, গন্ডমূল এবং শরীরের যেখানে যা মূল আছে তাতেই অমন জ্বলন থাকবে। বৃষ্টি নামলে তবেই...।

বাঙালির ঘরে ঘরে খোকা আর খোকনেরা চিরদিনই বেঁচে থাকে। দীপক বুড়ো হবে কিছুদিন পরে। রিটায়ার করেছে, স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে বেচারার। ওর একমাত্র সন্তান, ছেলে। 'কোজাগর'*-এর নায়কের নামে তার নাম রেখেছে দীপক, 'সায়ন'। কিন্তু তার ডাক নামও খোকা।

খোকা আসে, খোকা যায়, কিন্তু বাঙালির ঘরে ঘরে খোকারা থাকেই চিরদিন।

ওর জেঠাইমা এবং মাও দীপককে খোকা বলেই ডাকতেন।

আসলে, শিশুকাল থেকে বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির এইসব খেয়ালিপনা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতাম, এমন অনেক অভিজ্ঞতাতেই অভিজ্ঞ ছিলাম, যা শহুরে দীপক অথবা কবির জানায় বা অভিজ্ঞতাতে ছিল না। আবার ওরাও শহরের আঁতঘাঁত অনেক কিছুই জানত এবং অনেকই ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিল। যে সবে আমি সম্পূর্ণই জ্ঞানহীন এবং অনভিজ্ঞ ছিলাম।

একটা জোর হাওয়ার হঠাৎ দমকে, দীপক সাইকেল সুদ্ধ পড়ে গেল ধুলোর মধ্যে। কিন্তু পড়ে গিয়েই চমৎকৃত, স্তম্ভিত হয়ে স্বগতোক্তি করল, বাঃ! বাঃ!

আমি পতিত বন্ধুকে দেখে সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম।

ঘূর্ণি হাওয়াটা শুকনো-পাতা, খড়কুটো এবং মিহি ধুলোর সমষ্টিকে পাকিয়ে পাকিয়ে দেখতে দেখতে একটি স্তম্ভ গড়ে তুলল। এবং স্তম্ভটি দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রায় পনেরো-কুড়ি ফিট উঁচু হয়ে উঠল। তারপরেই কয়েক মুহূর্ত সেখানে থিতু হয়ে, ফণা-তোলা সাপ, শট গানের ছররা গুলি খেয়ে যেমন করে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, তেমন করেই লুটিয়ে পড়ল।

দীপক, মুহূর্তমধ্যে তার অজানিতেই সমুদয় আঁতেলপনার নকল নির্মোক ছিন্ন করে বেরিয়ে এসে বলল, "আই বাপ! কী জিনিস মাইরি! দেখলি বুদ্ধ!"

মন্ত্রমুগ্ধ, যুগপৎ বিস্মিত এবং স্তম্ভিত দীপককে আশ্বস্ত করে বললাম, দ্যাখ দ্যাখ। দু'চোখ ভরে দেখে নে। এমনি ঘূর্ণি ওঠে জলেও। জলস্তম্ভ ওঠে। নদীতে সমুদ্রে।

তাই?

---

* 'কোজাগর" (উপন্যাস)—প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং

অবাক হয়ে বলল দীপক!

ইয়েস স্যার।

আমি বললাম।

বায়ুস্তম্ভর মূর্ছার ঘোর তখনও দীপকের কাটেনি, আমি বললাম, কবির কী হল রে? আমরা তো ডিগারিয়ার প্রায় পায়ের কাছাকাছিই পৌঁছে গেছি।

তাই তো।

দীপক, কবি যে কোন্ অজ্ঞাত চক্রান্ত করেছে আমাদের বিরুদ্ধে, তা বুঝতে না পেরে, ন্যায্য কারণেই ভাবিত হল।

ঠিক সেই সময়েই ঝুম-ঝুম-ঝুম-ঝুম একটা আওয়াজ একই সঙ্গে আমাদের দুজনের কানে এল। পেছনে দুজনে তাকিয়ে দেখি, একটা টাঙা আসছে।

দেখতে দেখতে, টাঙাটা কাছে এসে গেল এবং আমাদের পাশ কাটিয়ে যখন টাঙাটা চলে যাচ্ছে তখন আমরা দুজনেই সবিস্ময়ে এবং সভয়ে এবং সক্রোধে দেখলাম যে, কবি, স-সাইকেল সেই টাঙার উপরে বসে আছে দার্শনিকের মতো "পোজ" মেরে, বেঁকে। এবং তার পকেট থেকে পাঁচ টাকার কড়কড়ে নতুন নোট উড়ে যাচ্ছে হাওয়ার দমকে-ধমকে। আর মুর্তিমানের হাতে ধরা রয়েছে একটি মোটা ইংরেজি বই পাতা খোলা। কবি পড়তে পড়তে যাচ্ছে। নীটশে বা মেটারলিঙ্ক বা কনফ্যুসিয়াস বা স্পিনোজা বা থোরো বা আইনস্টাইন কারও বই হবে। গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকাও হতে পারে, বাঁধাকপির বীজের বিজ্ঞাপন। তবে সাধারণত সহজবোধ্য কোনও বই-ই ও পড়ত না। বাংলা বই তো নয়ই!

কবি, আমাদের চিনল না পর্যন্ত। আমরা যে ওকে চিনব বা ওকে বকব তার সময়ও দিল না। সময় আমাদের ছিলও না। কারণ, আমাদেরই গচ্ছিত-রাখা টাকা, যা ও ওর জেঠামশায়ের বাড়ির কেয়ারটেকারকে দিয়ে ব্যাংক থেকে ভাঙিয়ে ছোটো ডিনমনিশনের নোটের বান্ডিল আনিয়েছিল, সেই টাকাই সর্বনেশে হাওয়াতে উড়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে! সিগারেটে ধোঁয়া হয়েও উড়ে যাচ্ছে কিছু। ধোঁয়া তো ধরা যায় না, টাকা যায়। তাই ডিগারিয়া পাহাড় দেখার ইচ্ছাকে তখনকার মতো মুলতুবি রেখে আমি আর দীপক এদিক-ওদিক সামনে-পেছনে দৌড়াদৌড়ি করে টাকা কুড়োতে লাগলাম। আর কবির টাঙা, ঝুমঝুমি বাজিয়ে ক্রমশ ডিগারিয়া পাহাড়ের দিকে চলে যেতে লাগল স-সাইকেল কবিকে নিয়ে।

টাকাগুলোকে উদ্ধার করে, দীপক বলল, শালা! ফিলসফার! ফিলসফির আমিও কিছু কম জানি না।

সাইকেলটা নির্জন, লালধুলোর পথ থেকে উঠিয়ে নিয়ে আমি বললাম, কী জানিস?

চাইনিজ ফিলসফার কনফ্যুসিয়াস কী বলেছিলেন জানিস?

দীপক বলল, উষ্মার সঙ্গে।

কী?

বলেছিলেন, "If you pay evil with good, what do you pay god with?

আমি চুপ করে রইলাম।

দীপক উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, তুই! তুই! তুই একটা রিয়্যাল বুদ্ধু। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস? কিছু বলবি তো? একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। আর দেখলি তুই। শালা আমাদেরই পুঁজি ভেঙে গোল্ডফ্লেক খেতে খেতে, আমাদেরই টাকা লিটারালি ওড়াতে ওড়াতে, আমাদেরই নাকের সামনে দিয়ে, আমাদেরই চিনতে পর্যন্ত না পেরে; সাইকেল সুদ্ধু টাঙা করে চলে গেল। ওকে দেখাব আমি।

দীপক অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত-রুচির ছেলে। শালা-টালা একেবারেই বলত না। ওর উত্তেজনা যে চরমে পৌঁছেছে তা বোঝা গেল।

বললাম, কবি, গেল তো গেল। এবারে চল। ওঠ সাইকেলে। ধরব শালাকে।

আলগা-মুখের আমি বললাম।

সেদিন থেকে চল্লিশ বছর পরে, আজকেও, যখনই কারও মুখে শুনি যে, কেউ "দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছে", তখনই আক্ষরিকভাবে, শুকনো পাতার আর খড়কুটোর সঙ্গে কবির পাঞ্জাবির পকেট থেকে উড়তে-থাকা, ছাত্র-আমাদের, হাওয়াতে নৃত্যরত উড়াল-টাকাগুলোর ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কবিকে বকাঝকা করে লাভও হত না কোনও। কিছু বললেও ও চুপ করেই থাকত। ওর এক কান দিয়ে ঢুকে সব কথাই অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেত। মনে হত, হয় ও ভগবান, নয় শয়তান।

দীপক ও আমার সব আস্ফালনই বিফলে গেল।

কবি পরদিন বলল, অবশেষে ডিগারিয়া পাহাড়ের দর্শন তো হল তোদের। কী দেখলি? ন্যাংটো পাহাড় দেখার কী আছে? ন্যাংটা মেয়ে হলেও না হয় বুঝতাম। যাই হোক এবারে তোদের ডিগারিয়া পাহাড়ের পরে "বিগারিয়া" বাবার দর্শন করিয়ে আনব।

সেটা কী জিনিস?

দীপক শুধোল।

এখানে একজন সন্ত আছেন। তাঁর নাম গিটিগিটি বাবা। প্রচুর ভক্ত আছেন তাঁর। বেশিই সুন্দরী মেয়ে-বউ, বড়োলোকের ঘরের। দারুণ রমরমে ব্যবসা। প্রচুর মানুষকে বিগড়ে দিয়েছেন বলে, তাঁর নাম গিটিগিটি হলেও, আমি তাঁকে বিগাড়িয়া বাবা বলেই ডাকি।

কোথায় তাঁর আশ্রম। বিহারি বাবা?

আশ্রম বহুতই দূর আছে। তবে বিহারি বাবা নন। বাঙালি বাবা। এই সব ফেরেববাজির লাইনে বাঙালিরাই ফোরমোস্ট।

কী করে যাবি?

আমি যাব না। তোরা গেলে, যা না। আমি তো হদিস দিলামই। টাঙাও ঠিক করে দেব।

এবারে তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব বেঁধে। "তোরা এগো, আমি আসছি" তোর এই মিথ্যে স্তোকে আমি জীবনে আর বিশ্বাস করব না।

দীপক এমফ্যাটিকালি বলল।

একেবারে পজিটিভ স্টেটমেন্ট।

আমি ওসব বুজরুকিতে নেই। তাহলে যাস না তোরা। আমার সময়ের দাম আছে।

কবি বলল।

কবি এবং কবির পুরো পরিবার রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওর বাবার সেই মিশনে অনেক দান-ধ্যানও ছিল বলে শুনেছি। নানা সময়েই "এই মহারাজ" "সেই মহারাজের" গল্প শুনতাম ওর মুখে। মনে মনে ভাবতাম যে, স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব বহুদিন আগে দেহ রেখেছেন তাই রক্ষা। হইলে, কবির মতো "ভক্ত", তাঁর কী হাল করে ছেড়ে দিত তা কে জানে! গিরিশ ঘোষ-টোষও কবির মতো "PUZZLE"-এর কাছে নেহাতই নস্যি।

দীপক বলল, না। ও সব চলবে না। তোকেও যেতে হবে।

কী যেন ভেবে কবি বলল, ঠিক আছে। কাল বিকেল বিকেল যাব। সন্ধেবেলায় তিনি দর্শন দেন।

পরদিন একটি টাঙা ভাড়া করে আমরা তো গিয়ে পৌঁছোলাম সেই আশ্রমে। কোনো অচিনপুরে। বাড়ি থেকে বহু দূরে। মধুপুরের পথে। টাঙা চলেছে তো চলেছেই। কত মাইল পেরিয়ে এলাম তা ভগবান জানেন। অবশেষে ঘণ্টাখানেক ধরে টাঙাতে চড়ে গিয়ে যখন পৌঁছোনো হল অবশেষে, তখন দীপক বলল; টাঙাতে চড়ে গিয়ে যখন পৌঁছনো হল অবশেষে, তখন দীপক বলল, টাঙাটাকে রেখে দে কবি। এত দূরে এলাম। ফেরার সময়ে পাওয়া যায় কি না যায়!

কবি বলল, দেখছিস না, ভক্তরা আসছে যাচ্ছে। মিছিমিছি বেশি ভাড়া দিয়ে লাভ কী? ফেরার সময়ে অন্য টাঙা ধরে নিলেই হবে।

অতএব টাঙা ছেড়ে দেওয়া হল।

আশ্রমটি ছোটোই। মাত্র কয়েকটি মাটির ঘরের বৃত্ত। কয়েকটি নিমগাছ। বেলগাছ। বহির্বৃত্তে বড়ো বড়ো স্থলপদ্মর গাছ ছিল। কিছু হরশিঙ্গড়ের। গোটা চারেক শিমুল কৃষ্ণচূড়া। গেরুয়া বসনধারী কয়েকজন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নানা প্রদেশীয় মানুষ। "বাবা" বাঙালি হলেও শিষ্যরা নানা প্রদেশের।

কী ভাষাতে বাবা কথা বলেন, কে জানে।

দূর থেকে দেখা গেল, একটি ছাতিম গাছের নীচে, "গিটিগিটি" অথবা কবির ভাষায়, "বিগাড়িয়া" বাবা বসে আছেন গোবর-নিকোনো উঁচু বেদির উপরে।

একটু ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেল। চার-পাঁচটি হ্যাজাক জ্বলছে। আর সামনে, ডাইনে-বাঁয়ে বসে-দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ভক্তরা। অধিকাংশই পরমা-সুন্দরী মহিলা। সব-বয়সী, সব প্রদেশীয়। তবে যুবতীই বেশি। বাদ্যযন্ত্র সহকারে সমস্বরে অথবা কখনও দ্বৈতকণ্ঠে এবং কখনও একক কণ্ঠে গিটিগিটি বাবা সম্বন্ধে অথবা তস্য বাবা অথবা কোনও পরমপূজ্য জন, অথবা প্রাণধন সর্বজনপূজ্য তাঁর অন্য কোনও পূর্বসূরির প্রশংসাসূচক গান এবং বক্তৃতা ইত্যাদি চলেছে লাগাতার। কখনও বাংলাতে, কখনও অন্য ভাষাতে।

ভালো করে নিরীক্ষা করে দেখলাম, বাবার চেহারাটি মোটেই "বাবা-বাবা" নয়। বাবাদের চেহারা বাবা-বাবা না হলেই বা কী হয়, বাবার ছেলেদের অথবা সন্তানদের অথবা ভক্তদের চেহারা বাবার মতো হলেই হয়। তা না হলেই, মায়েদের বিপদে পড়তে হয়। এ-বাবদে বাবাদের কোনও বিপদ কোনওকালেই হয়নি।

আমাদের মতো 'গণ-চ্যাংড়াদের' দেখে, সমবেত গণ-মণ্ডল একটু সন্দিগ্ধ চোখে চাইলেন। হাইলি-ইন্টেলিজেন্ট বাবাও এক নজরেই আমাদের মতো ভয়-ভক্তিহীন নবীন যুবাদের Size-up করে নিলেন।

তারপর বাবার ভক্তদেরই মধ্যে কেউ একজন, ভিড় কাটিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে, বাবার একেবারে সামনে বসালেন।

বাবা, আবার চোখ বুজে ফেললেন আমাদের একবার দেখেই।

হয়তো কোনও সুন্দরীর ধ্যান করছিলেন।

আমরা বসার পরেই, বাবা হঠাৎই চোখ খুলতেই, ভক্তদের মধ্যে গুঞ্জরণ উঠল।

বড়োলোকের ছেলে কবি, একটা আদ্দির পাঞ্জাবি পরেছিল। মুসলমান কোচোয়ানদের পাঞ্জাবির মতো স্বচ্ছ। বুক এবং বুকের চুল দেখানো। যদিও ওর বুকে চুল ছিল না বিশেষ। "আচায়তানা কহে পুকার উসসে রহো হুঁশিয়ার, যিসকি ছাতিমে নেহি একোবার"।

পাঁচুর কোটেশান।

কবির সেই আদ্দির পাঞ্জাবিতে লাগানো ছিল এক সেট দুর্মূল্য হিরের বোতাম। কত্ত দাম হবে কে জানে।

আমার আর দীপকের পোশাক-আশাক দেখে বড়োলোক বলে কারোরই ভুল করার উপায় ছিল না।

"গিটিগিটি" বাবা, কারও সঙ্গে কোনও কথা বলছিলেন না। শুধু মৃদু মৃদু হাসছিলেন। সেই হাসির সঙ্গে চোর-ছ্যাঁচোড়ের হাসির মিল ছিল কিন্তু "সাধক" বলে, তাঁকে আদৌ মনে হচ্ছিল না। হ্যাজাকের আলোতে কবির হিরের বোতামগুলো ঝকমক করছিল। তখন অ্যামেরিকান ডায়মন্ডের এমন রবরবা ছিল না যে, যে-সে হিরে-শোভিত হবেন।

এবারে বাবার চোখ কবির দিকে স্থির হয়ে নিবদ্ধ হল। আসলে কবির দিকে নয়, কবির হিরে-শোভিত পাঞ্জাবির দিকে।

হঠাৎই বাবা কবিকে বললেন, মনে পড়ে?

সমগ্র সভাস্থল বাবার মুখ-নিঃসৃত শব্দে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সমবেত জনমন্ডলীর প্রত্যেকেই কবির এহেন প্রসন্ন-ভাগ্যে যেন ঈর্ষান্বিত হলেন।

কবি ইতি-উতি চাইতে লাগল।

আমি আর দীপকও রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলাম।

আমাদের পেছনের সারির কাউকেই কি করলেন বাবা প্রশ্নটা?

চেয়ে দেখলাম, দীপকও ঘামছে দরদর করে।

বাবা আবারও কথা বললেন।

বললেন, মনে পড়ে? মনে কি পড়ে না?

এবারে কবিও ঘামতে ঘামতে বলল, আঁজ্ঞে? আমাকে বলছেন কি?

বাবা স্মিতহাস্যে স্বীয় মস্তক দু'ধারে ঈষৎ আন্দোলন করলেন। তামিলনাড়ুর লোকেদের "হ্যাঁ" করার মতো করে। উপরে-নীচেও নাড়লেন দু'বার। মানে, আমাদের কারোরই আর বুঝতে বাকি রইল না যে, উনি কবিকেই ও কথা বলছেন।

এবারে বাবা বহু ঘাটের জল-খাওয়া দার্শনিক কবিকেও খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে, "যারপরনাই" ঘেবড়ে দিয়ে বললেন, মনে কি পড়ে না? সেই যে দেখা হয়েছিল?

"তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে গতকাল" এমন পংক্তি-লেখা কবি, ইংরেজি-বিশারদ, দার্শনিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সুভাষদা! আপনার এমন COUNTERFIET যে আছে তা কি কখনও জানতেন?) এবারে বাবার "দর্শনে" আরও ঘেবড়ে গিয়ে বলল, আমার সঙ্গে..? আপনার?...দেখা?

গিটিগিটি বাবা আবারও মাথা নাড়লেন দু'পাশে। মুখে স্মিতহাসি নিয়ে।

এবারে কবি সাহস সঞ্চয় করে ডেসপারেটলি বলল, কোথায়? কোথায় দেখা হয়েছিল?

বাবা, হাসি-হাসিমুখে বললেন, কেন? মনে পড়ে না? বেন্দাবনে।

বৃন্দাবনে?

আকাশ থেকে পড়ে, কবি অসহায় গলাতে বলল, এবারে।

আমি মনে মনে বললাম, বোঝ এবারে ঠেলা শালা। বাবারও বাবা থাকে।

আঁজ্ঞে, বৃন্দাবনে তো আমি ককোনো যাইনি।

কুঁই-কুঁই করে কবি বলল।

গিটিগিটি বাবা আবারও হাসলেন। নিঃশব্দে।

নানারকম ফুল, ধূপধুনো আর গুগগুলের গন্ধে এবং ধুঁয়োতে এক মোহময় বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল। তা ভেদ করে, গিটিগিটি বাবার মনের তো দূরস্থান, মুখের ভাব বোঝাও অমাদের পক্ষে প্রায় অসাধ্য ছিল।

বাবা বললেন, এ কী কতা। মনে পডে না কি? সেই যে দেকা হয়েচেল গতজন্মে; বেন্দাবনে।

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই আমার মুখ থেকে হেয়াব-ট্রিগাব লাগানো সিঙ্গল-ব্যারেল রাইফেলের গুলিব মতো একটি শব্দ ছিটকে বেরিয়ে গেল। শব্দ অথবা গুলি, মুখ অথবা নল-নিঃসৃত হলে, আর তা ফেরানো যায় না। সেই শব্দ নিঃসৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুঞ্জনমুখর, সুগন্ধে আমোদিত, আলোকিত সভাস্থল হঠাৎই কবরখানায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। থমথম ছমছম করছিল তখন গর্ভবতী নিস্তব্ধতা।

গিটিগিটি বাবা কিন্তু অনডন্টেড।

যে, যতবড় "Fake" যে যতবড় ভণ্ড বা জোচ্চোর, সে তত বেশি unruffled, undaunted থাকে। পরবর্তী জীবনে এই কথাই সত্য বলে জেনেছিলাম।

কিন্তু তখন তো আমি আঠারো বছরের ছেলে। তখনও বোঝাবুঝির বাকি ছিল অনেকই।

মুখ-নিঃসৃত শব্দটি ছিল "বুজরুক"। অথচ শব্দটি আমার অনুর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত নয়। কবি নিজেই গতকাল "গিটিগিটি বা "বিগাড়িয়া" বাবা সম্বন্ধে ওই সম্বোধন করেছিল।

বাবার মুখের অলিম্পিকের শিখার মতো অনির্বাণ হাসি কিন্তু নিভল না। শুধু চোখ দুটি একবার নেচে উঠেই কোনও সংকেত দিল কাবোকে। অথবা একাধিক জনকে।

বিপদ বুঝে, কবিই প্রথমে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো টানটান দাঁড়িয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনও।

পরক্ষণেই ভিড় কাটিয়ে, আমরা নিষ্ক্রমণের চেষ্টা করতঃ আশ্রমের সীমানার বাইরের দিকে যথাসাধ্য সম্ভব দ্রুত এগোতে লাগলাম।

ইতিমধ্যেই চতুর্দিক থেকে চার-পাঁচজন মানুষ আমাদের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে, কাদের যেন কী বললেন।

প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাইরে বেরিয়েই আমরা দেখলাম, কয়েকজন ডাকাতের মতো মানুষ আমাদের পেছনে পেছনে আসছে।

দীপক বলল, টা...

অর্থাৎ; টাঙা।

তখন কোথায় টাঙা? কখন টাঙা যার যার টাঙ অথবা টেঙরিতে যত জোর আছে তাই তখন প্রয়োগ করার "ওয়াক্ত" এসেছে।

কবি, তার দার্শনিকের মুখোশ খুলে ফেলে হাঁফাতে হাঁফাতে আদেশ করল; "জুতো হাতে নিয়ে দৌড়ো।"

ওর আদেশের অপেক্ষাতে আমরা থোড়ি ছিলাম!

চন্দ্রালোকিত, লাল মাটির উদোম মাঠ বেয়ে, প্রাণ-ভয়ে, আমরা তিনজনে দে দৌড়। দে দৌড়! দে দৌড়।"

তখন আমরা সেকেন্ড-ইয়ারের ছাত্র। তাছাড়া, জাতে বাঙালি। "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি-' তে ঘোর বিশ্বাস আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের। আমাদের সঙ্গে দৌড়ে পারে কখনও "গিটিগিটি" বাবার বিহারি পেহলোয়ানেরা?

মাইলখানেক দৌড়ে যাবার পর প্রথমবার থামলাম আমরা।

কবি আমাকে বলল, তুই একটা আটারলি ট্যাক্টলেস ইডিয়ট। তোর জন্যে আমাদের প্রাণই যেতে পারত আজ।

দীপক আমাকে বলল, আমাকে তুই একজোড়া চটি কিনে দিবি।

কেন?

সবিস্ময়ে বললাম আমি।

কেন নয়? এক পাটি চটি তো আশ্রমের সামনেই পড়ে রইল।

বেচারি দীপক। তখনও দীপক ট্রাউজারে অভ্যস্ত হয়নি। ও সব সময়েই ধুতি এবং ফুলহাতা শার্ট বা পাঞ্জাবি পরত। সেকেন্ড-ইয়ারের ছাত্র হিসেবে আজকাল যে-পোশাকের কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

দীপক আবার বলল, তুই যদি "বুজরুক" না বলতি, তবে কি আর অমন প্রাণ সংশয় হত।

আমি বললাম, কবির সঙ্গে গিটিগিটি বাবার যে স্বপ্নে দেখা হয়েছিল তা আমি জানব কেমন করে?

তারপর কবিকে বললাম, তোকে কি গিটিগিটি বাবা স্বপ্নে দেখেছিলেন?

দার্শনিক কবি, একেবারে ক্রেস্ট-ফলেন হয়ে বলল, তা আমি কী করে জানব? সে শালা হোমো হলে দেখতে পারে।

দীপক এক পায়ে চটি পরে, জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে এবং বারে বারে পেছনে চেয়ে, কেউ এখনও তাড়া করে আসছে কি-না, তা দেখতে দেখতে কবিকে বলল; তুই কি কখনও গিটিগিটিবাবাকে সত্যিই স্বপ্নে দেখেছিস?

কবি বলল, আমি সুন্দরী মেয়ে ছাড়া স্বপ্নে আর কারোকেই দেখি না।

আমাদের ব্যাচে, আর্ট স্ট্রিমের ঝা-জি ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মৈথিলি ব্রাহ্মণ। প্রমোদ নারায়ণ ঝা। প্রথমের দিকে ব্রাহ্মণের সম্মানসূচক 'জি' যোগ করে ওকে সম্বোধন করতাম। পরে আমার অবাঙালি বন্ধুদের মধ্যে ঝা অন্যতম হয়ে ওঠাতে ওর নামের পুচ্ছ 'জি' টি কর্তিত হয়েছিল।

আসলে 'জি' এমনিতেই বলা উচিত। কিন্তু তখনও হিন্দির এমন রমরমা ছিল না বলে অত শত জানা ছিল না। 'ইন্দিরাজি' বা 'রাজীবজি' তখনও চালু হয়নি।

ঝা ছিল কবি। ছিপছিপে, অত্যন্ত রসিক। হিন্দিতে কবিতা লিখত। উর্দুতেও। এবং উর্দুর প্রতি ওর অশেষ দুর্বলতা ছিল। যে দুর্বলতা আমার প্রথম যৌবনেই ও আমার মধ্যেও চারিয়ে দেয়। আমাকে নাড়িয়েও দেয়। বিহারি ও উত্তরপ্রদেশীয় শিকারি বন্ধু-বান্ধবদের কল্যাণে সেই দুর্বলতা আরও গাঢ় হয়েছিল পরবর্তী জীবনে এবং যার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই পড়েছে প্রথম দিকের গল্প সংকলন 'জঙ্গল মহল' বা 'বনবাসর' থেকে পরিণত বয়সের ফসল 'মাধুকরী'— তেও।*

আমাদের যখন 'দোস্তি' হয় তখন প্রমোদ সাহির লুধিয়ানবীর ঘোরে ছিল। তখনও লুধিয়ানবী বেঁচে। উনি দেহ রাখেন অনেক পরে, সম্ভবত উনআশি, আশিতে। শুধু লুধিয়ানভীই নন, প্রমোদের মাধ্যমেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ইকবাল আহম্মেদ, ফিরাখ গোরখপুরী, মির্জা গালিব এবং জিগর মোরাদাবাদীর সঙ্গেও।

হাজারিবাগের জুতো আর বন্দুকের দোকানি প্রথম যৌবনের শিকার সঙ্গী মহম্মদ নাজিম; উর্দু-ফারসি শের-শায়েরির বাদশার সঙ্গে বিহারের জঙ্গল পাহাড়ে বহু দিনরাত কাটিয়ে, আমার সেই উর্দু-প্রীতি গাঢ়তর হয় যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অবশ্য এসব 'মাধুকরী'তে পৌঁছোনোর অনেকই আগের কথা।

ঝা-এর কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎই সেদিন বালিগঞ্জ পোস্ট অফিসের উলটোদিকে 'সানি-টাওয়ার্স'—এ সর্বগুণ-গ্রাহী, রাজসদৃশ সুপুরুষ, ভ্রাতৃপতিম জয়ন্ত চ্যাটার্জির ফ্লাটে মেহদি হাসান সাহেবের গজল শুনতে গিয়ে। হাসান সাহেব পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও যতখানি প্রেমিক এবং ভাবুক, তাঁর গলায় এখনও যতখানি 'হামদর্দি' তা অনেক যুবাবয়সী গায়কের মধ্যেও দেখিনি।

একটি গজল গাইলেন, তার প্রথম দুটি কলির বাংলা তর্জমা করলে এইরকম দাঁড়ায় : তোমার জন্যে সারাটা জীবন শুকনো চোখে কেঁদে মরলাম। আর তুমি যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ালে, তখন হঠাৎই আসা বাষ্পে আমার দু চোখ ভরে গেল; তোমাকে ভালো করে দেখতে পর্যন্ত পারলাম না।'

যাঁদের কথা বললাম, তাঁদের কথা সব রসিকজনই অল্পবিস্তর জানবেন, আমিও জানতাম। তবে একটু একটু। ঝা-এর বিদ্যা, ওপর-ওপর ছিল না।

---

* "মাধুকরী" (উপন্যাস)—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
"জঙ্গল মহল" (গল্পগ্রন্থ)—প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং
"বনবাসর"—দে'জ পাবলিশিং

ফাঁকা-আঁতেলদের মতো বিদেশি পেপার ব্যাক হাতে করে ঘুরে বেড়িয়ে আর বইয়ের ব্লার্ব পড়েই আমরা সুপণ্ডিত বলে মান্য হতাম না। নিজেরাও নিজেদের তা মনে করতাম না। আজকেও মনে করি না যে, কিছুমাত্রই জানি। জানার ইচ্ছেটুকুমাত্র নিয়েই যতটুকু শ্লাঘা।

ওই পাঞ্জাবি কবি, সাহির-এর নামের মানে হল জাদুকর। মাতৃভাষা গুরুমুখি হলেও তিনি কিন্তু লিখতেন সাদামাঠা হিন্দি এবং অবশ্যই উর্দুতে। গুরুমুখির 'ওয়েহোয়ের' কোনওরকম প্রভাব ছিল না তাঁর লেখাতে। গজল, গীত, নজ্‌ম, রুবাই-ই বেশি লিখতেন। সেই সবের তুলনাতে তাঁর 'শের' কম ছিল।

ঝা যখন লুধিয়ানবীর কথা বলত, তখন আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। ওর গলার শির ফুলে উঠত। আবৃত্তি করত ও সাহির সাহেবের শের :

'তু হিন্দু বনেগা, ন মুসলমান বনেগা,
ইনসান কি ঔলাদ হ্যায়, ইনসান বনেগা।'

অর্থাৎ তোরা না হিন্দু হবি, না মুসলমান; অমৃতর পুত্র তোরা, মানুষের বাচ্চা; তোরা মানুষই হবি। মানুষ হোস।

অথবা,

'হরাত ইক মুস্তকিল গম কে সিওয়া কুছ ভি নহি শায়দ,
খুশি ভি ইয়াদ আতি হ্যায়, তো আঁসু বনকে আতি হ্যায়।'

মানে হল সম্ভবত, এই জীবন, দুঃখেরই অনন্ত স্থিতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আনন্দ-স্মৃতিও যখন মনে আসে, তখনও তো চোখের জল হয়েই তা আসে! আনন্দেও তো কান্নাই পায়!

সাহির সাহেবের একটি রুবাই ছিল ঝা-এর বিশেষ প্রিয়। প্রায়ই, যখন ও ওর ডানহাতের পাঁচটি আঙুল নাড়িয়ে সেই রুবাই আওড়াত; তখন আমার মনে হত ও এক চিরন্তন কবি। আমার এবং বিশ্বের সব কবির প্রতিভূ হয়েই যেন ও আঙুল নাড়িয়ে রাজা, মহারাজা, এস্টাব্লিশমেন্টকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তাদের সঙ্গে কোনও 'তক্‌রার'-এ না গিয়েও অনুকম্পার সঙ্গে তাদের বাতিল করে দিচ্ছে।

যিনি কবি, যিনি লেখক, তিনি তা হন শুধুমাত্র তাঁর পাঠকদের জোরেই! কোনও রাজা-মহারাজা আমির-ওমরাহ বা এস্টব্লিশমেন্টের দয়ার পরোয়া তিনি কখনওই করেন না।

আর মেরুদণ্ড না থাকলে তো কেউ কবি-সাহিত্যিক হতে পারেনও না। মেরুদণ্ডহীন মানুষ নিজেকে কবি-সাহিত্যিক বলে মনে করতে পারেন, মহাকাল কখনওই করবে না। তাঁদের যেখানে স্থান, সেই পুতিগন্ধ আবর্জনার স্তূপেই তাঁরা নিক্ষিপ্ত হবেন।

মেরুদণ্ডহীন মানুষের মতোই ভণ্ড মানুষও কোনওদিন কবি সাহিত্যিকের প্রাপ্য সম্মান পান না। কোনও দেশেই পাননি। সততা, মেরুদণ্ড এবং ঈশ্বরবোধ, এই তিন গুণ এবং অবশ্যই প্রতিভার সহাবস্থান না হলে, ভবিষ্যৎ, সেই সব পণ্ডিতম্মন্যকে তাঁরা যে আসনের যোগ্য, সেই আসনেই দেবে। তার চেয়ে একটুও উচ্চাসন নয়।

ঝা, আওড়াত :

"ইয়ে মহলোঁ, ইয়ে তখ্‌তোঁ, ইয়ে তাজোঁ কী দুনিয়া
ইয়ে ইনসা কে দুশমন সমাজো কী দুনিয়া,
ইয়ে দওলত কে ভুখে, রিয়াজো কী দুনিয়া
ইয়ে দুনিয়া অগর না মিলে ভি তো কেয়া হ্যায়।"

অর্থাৎ এই মহল, এই সিংহাসন, এই মুকুট আর পুরস্কারের জগৎ, এই মানুষের শত্রু সমাজের জগৎ, এই ধন-দৌলতের ভিখিরি, এই নিয়মের দাসের জগৎ; এই জগৎ যদি করতলগত নাই হয়, তো থোড়িই আসে যায়।

আজকে পেছন ফিরে তাকিয়ে মনে হয়, এ-পর্যন্ত যাই লিখেছি, 'দুনম্বর', 'বিন্যাস', 'বাঘের মাংস', 'মাধুকরী', 'কোজাগর' অথবা 'চানঘরে গান'ও, সেই সবই শুধু আমার একার কথা নয়। আমাদের এই বিরাট, সুন্দর, চমৎকার সৎ গ্রামীণ মানুষে ভরা ভারত, আমার স্বদেশ, বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী জগতের অগণ্য বন্ধু-বান্ধব, আমাদের অগণ্য যোগ্য পূর্বসূরি, এঁদের সকলেরই কিছু না কিছু দান আছে সব লেখালেখির পেছনে। আমি একা কিছুই পারতাম না।

দীপকের মতো, ঝা-এর মতো, কাব্য-মনস্ক বন্ধুরা, শিকারের জগতের বন্ধুরা, অ্যাকাউনট্যান্সি পেশার জগতের বন্ধুরা — সকলেরই কিছু না কিছু অবদান আছেই আমার সামান্য প্রাপ্তি এবং যদি কিছুমাত্র যোগ্যতা অর্জিত হয়ে থাকে, তার পেছনেও। জীবনে, প্রকৃতির কাছ থেকে যা শিখেছি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মানসিকতা এবং অভিজ্ঞতা থেকে; তার তুলনাতে ছিটেফোঁটাও শিখিনি বই পড়ে।

ঝা এখন কোথায় আছে আমি জানি না। শেষবার দেখা হয়েছিল বৃন্দাবনে। বছর তিরিশেক আগে। দিল্লি থেকে গাড়িতে আসছিলাম। ভাবলাম কবির সঙ্গে 'গিটিগিটি' বাবার যে 'বেন্দাবনে গতজন্মে দেখা হয়েছেল' সেই বেন্দাবন জায়গাটা একবার দেখেই যাই। "কোয়ালিটির" হোটেলে ঢুকেই দেখি ঝা। সেও রাত কাটাবে।

বেন্দাবন জায়গাটি কিন্তু আমার আদৌ পছন্দ হয়নি কিন্তু ঝা-এর সঙ্গে সেই হঠাৎ দেখাতে আমরা দুজনেই যে কী খুশি হয়েছিলাম, তা বলার নয়। সারা রাত ধরে কত শের, গজল, রুবাই, নজম্ যে আবৃত্তি করেছিল ঝা, আর কত রবীন্দ্রসঙ্গীত যে শুনেছিল অর্ডার করে করে আমার কাছ থেকে; সে কথা ভোলবার নয়।

ঝা বাংলাও পড়তে পারত এবং রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড ভক্ত ছিল। কলেজের 'কণ্ডি দরবারে' রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলাম এবং আমার হাঁটা চলা, ঝুঁকে দাঁড়ানো এবং আবৃত্তি ওর খুব ভালো লেগেছিল বলে, ও আমাকে ডাকত 'বুদ্ধ ঠাকুর' বলে।

তারপরেও দু-একবার হঠাৎ দু'একদিনের জন্যে কলকাতাতে এলেও আমার অফিসে টুঁ মেরে যেতই। তখন ও থাকত পাটনাতে। জানি না, এখন কোথায় আছে ঝা। এবং এখনও বাংলা পড়ে কি না! পড়লে, যদি এই লেখা ওর চোখে পড়ে, তাহলে বন্ধুকৃত্য করেছি যে, একথা ও জানতে পারবে। পেলে, আমি খুব খুশি হব। পুনর্মিলনও হবে ওর সঙ্গে।

ফিরাখ গোরখপুরীও খুব প্রিয় ছিল ঝা-এর। ফিরাখ-এর একটি শের ওর ঠোঁটের ডগায় থাকত সব সময়ে।

'কৌঈ সমঝে তো এক বাত কঁহু,
ইশক্ তৌফিক হ্যায় গুনাহ নহি।'

মানে, যদি বোঝো কেউ, তো একটা কথা বলি। প্রেম করা বড় প্রাপ্তির, গুণেরই ব্যাপার হে, কোনও দোষের ব্যাপার নয়।

আরও একটা বলত ·

'মওত, ইক গীত, রাত গাতি থি,
জিন্দগি, ঝুম ঝুম যাতি থি';

মানে হল, মৃত্যু, এক রাতে তার অনিত্যতার গান গেয়ে ফিরছিল আর তখনই জীবন, মনমৌজি জীবন; আনন্দর বন্যা বইয়ে দিয়ে নিত্যতার সংজ্ঞার মতো বয়ে যাচ্ছিল।

"দু নম্বর" (উপন্যাস)—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
"বাঘের মাংস" (উপন্যাস)—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
"চানঘরে গান"—(প্রকাশক) দে'জ পাবলিশিং

ফিরাখ যে হিন্দু একথাও আমি ঝা-এর কাছেই প্রথম শুনি ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময়ে। ফিরাখ-এর আসল নাম ছিল রঘুপতি সহায়।

সাহির লুধিয়ানবীও ছদ্মনাম। সাহির সাহেবের আসল নাম ছিল আবদুল হুই।

মীর্জা গালিবের মতো তিনিও নাম বদলে সাহির লুধিয়ানবী হন। লুধিয়ানবী, কারণ, লুধিয়ানার মানুষ, তাই।

গালিব-এর আসল নাম ছিল মিঞা আশাদুল্লা খাঁ।

জিগর, মোরাদাবাদের মানুষ ছিলেন। তাই 'মোরাদাবাদী।'

জিগর মোরাদাবাদীর একটি শেরও ঝা-এর খুব প্রিয় ছিল। সেটি হল :

"হম্ন কী হর-হর অদ পর জানো দিল সদকে মগর,
লুৎফ কুছ দামন বচাকর হি গুজর জানে মেঁ হ্যায়।'

মানে হল, আমি তো সুন্দরী দেখলেই পাগল হয়ে যাই, নিজেকে সঁপে দিয়ে বুঁদ হয়ে যাই; তাই সুন্দরীদেরই উচিত আঁচলে মুখ ঢেকে চলা। তাতে দুপক্ষেরই হাঙ্গামা থেকে বাঁচোয়া!

ফিরাখ গোরখপুরীর দুটি শের ছিল আমার নিজের খুব প্রিয়। আমি সে দুটি প্রায়ই শোনাতাম ঝাকে। সেই দুটি শের 'মাধুকরী'র গিরিশদার জবানে বলিয়েওছি পৃথু ঘোষকে।

তার একটি হল :

'থি মুনতাজার সি দুনিয়া খামোশ থি ফিজায়ে
আঈ যো ইয়াদ উন্‌কি, চালনে লাগে হাভায়ে।'

মানে, পৃথিবী একেবারেই নিশ্চুপ ছিল। যেই মনে পড়ল তোমার কথা, অমনি হওয়া দিল ঝুরঝুর।

অন্য শেরটি আমার খুবই প্রিয় ছিল কাব্যিক গুণ ছাড়া, অন্য কারণেও।

প্রত্যেক মানুষেরই, দীর্ঘদিনের পরিশ্রম আর সাধনার দ্বারা অর্জিত কিছু যোগ্যতার জন্যে ন্যায্যকারণে গর্বিত থাকা উচিত। গর্বহীন, মাতা নীচু-করা, অনধিকারীদের হাত থেকে অর্থ ও পুরস্কারপ্রত্যাশী মানুষ এই গর্বর কথা জানেন না। জানবেনও না। কিন্তু যাঁরা জানেন, তাঁরা এই শেরটির গভীর তাৎপর্য অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন। এবং এই কারণেই সতেরো বছরের আমাকে ফিরাখেব এই শেরটি অনেকই উদ্দীপনা এবং জেদ জুগিয়েছিল, জীবনে 'কিছু' হয়ে ওঠার জন্যে।

কিছুমাত্র হয়ে ওঠা আজও হয়নি। তবে সেই জেদটা এখনও ভিতরে আছে, সমুদ্রের জোয়ারের নৃত্যরত ঢেউয়ের মাথার উপরে উড়ে-বেড়ানো টার্ন আর সী-গাল-এর বিষণ্ণ, চাপা স্বরের মধ্যে বিড়বিড়-কবা ফেনার মতোই তা মাঝে মাঝে এখনও অস্ফুটে কথা যে কয়, যে জন্যেও বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞ থাকি।

জানি না, মৃত্যুর আগে "কিছু" হয়ে ওঠা আদৌ হবে কি না কিন্তু ফিরাখ গোরখপুরীর প্রতি গভীর সম্মান সতেরো বছরে যেমনটা ছিল, আমার মৃত্যুর ক্ষণেও তেমনটিই থাকবে।

শেবটি ছিল :

'আনেওয়ালি নাসলে, তুম পর রাশখ্‌
করেঙ্গি হাম আসরোঁ
যব ইয়ে ধিয়ান অয়েগা উন কো, তুমনে
ফিরাখ কো দেখা হ্যায়।'

মানে, ভবিষ্যতের প্রজন্মের সকলেই আজকের তোমাদের ঈর্ষা করবে, যখন তারা জানতে পারবে যে, তোমরা ফিরাখকে দেখেছিলে, জেনেছিলে।

এমন 'কিছু' জীবনে হতে পারলে, হওয়ার মতো; তবেই মনুষ্য জীবন সার্থক।

'দ্যা স্টেটসম্যানের' এককালীন সম্পাদক সুনন্দ দত্ত রায়ও আমাদের ব্যাচের ছাত্র ছিল। তবে ওর Alternative English ছিল। বাংলা ছিল না। থাকত, সেইন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ক্রিশ্চান-হস্টেলে। সেখানের বন্দোবস্ত ছিল এলাহি। বেয়ারা জুতো পালিশ করে দিত। সেদিনকার ফর্সা, ছিপছিপে, সুনন্দর সঙ্গে আজকের সুনন্দ দত্ত রায়ের চেহারার কোনও মিল নেই।

কয়েক বছর আগে 'দ্যা টেলিগ্রাফের' সম্পাদক এম জে আকবরের ফ্ল্যাটের একটি ছোট্ট পার্টিতে দেখা হয়েছিল। সেই সময়ে আমিও সেই মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্টেই থাকতাম, বালিগঞ্জ পার্ক রোডে। সুনন্দ, ধুতি-পাঞ্জাবি, জামেয়ার এবং তালতলার চটি-শোভিত হয়ে পাকা বাঙালি বাবুটি সেজেই এসেছিল সেই রাতে।

সুনন্দ আমার বন্ধু ছিল না। তবে সুনন্দর জন্যে গর্ববোধ করতাম একটি ঘটনার পরে। তখন তো আমরা কেউই জানতাম না যে, সুনন্দ কী হবে পরবর্তী জীবনে। তবে বড়ো কিছু যে হবে, তা বুঝেছিলাম।

অরুণ দাম একদিন কলেজ ক্যানটিনে এসে উত্তেজিত গলায় বলল, আজ কী হল জানিস? হিস্ট্রি ক্লাসে?

কী?

ফাদার স্কেফার্স আজ আমাদের হিস্ট্রি ক্লাসে সুন্দর একটা পেপার পড়ে শোনালেন।

কিসের পেপার?

মান্থলি টেস্ট-এর পেপার। আবার কিসের?

কেন?

ফাদার স্কেফার্স ওর পেপারটা আমাদের সকলকে শোনাবার পরে বললেন, 'সুনন্দকে আমি আটানব্বুই দিলাম। কারণ ইতিহাস, অঙ্ক নয়। ইতিহাস যদি অঙ্ক হতো, তবে ওকে আমি একশোতে একশোই দিতাম। অঙ্ক নয় বলেই দুনম্বর কাটতে হল। ও যেমন ইংরেজি লেখে, তেমন ইংরেজি আমি নিজে লিখতে পারলে গর্বিত বোধ করতাম।'

আমার সেকথা শুনে স্বাভাবিক কারণেই গর্ব হওয়া উচিত ছিল।

কারণ ফাদার স্কেফার্সের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল পুলিশ এবং ফুটপাথের ফেরিওয়ালার মধ্যে যেমন সম্পর্ক তেমন সম্পর্করই মতো। ক্যানটিনে বসে সিঙাড়া আর চা খেতাম আর অন্যান্য ক্লাস শুরু হয়ে যাবার পরেও যখন উচ্চস্বরে গল্প করতাম বন্ধুদের সঙ্গে তখন হঠাৎই দেখতাম, পেছনে সাক্ষাৎ যম দাঁড়িয়ে।

প্রায় বার্গম্যানের ছবি 'The Seventh Seal'-এর দাবাড়ু মৃত্যুরই মতো পোশাকে ফাদার স্কেফার্স এসে আমাদের কুকুর-খেদানোর মতো 'Shoo-Off' করতেন। দুটি হাত দুদিকে প্রসারিত করে বলতেন : 'Enough is enough!

আমি ভালো ছাত্র ছিলাম না বলে ব্যক্তিগতভাবে উনি আমাকে চিনতেন না। আবার এমন বেশি খারাপ বা ছাত্রও ছিলাম না, তাই বজ্জাত বলেও নাম কিনতে পারিনি। আমি ছিলাম সর্বার্থেই 'জনগণের' অথবা "গণ-গণের" একজন। তাই, স্বাভাবিক কারণেই সুনন্দ দত্ত রায়কে স্বয়ং ফাদার স্কেফার্স এমন শ্রদ্ধার চোখে দেখেন জেনে, সুনন্দ সহপাঠী হলেও; তার প্রতি একধরনের শ্রদ্ধা জন্মে গেল অরুণের মুখে ওই ঘটনা শোনবার পর থেকেই।

বসন্তকালে আর বর্ষায় কলেজে বসন্তোৎসব এবং বর্ষামঙ্গল উৎসব হত। প্রধান উদ্যোক্তা যদিও ছিল বেঙ্গলি লিটারারি সোসাইটি কিন্তু যাঁরা সেই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থাকতেন না তাঁরাও ওই সব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন।

মহড়ার দায়িত্ব নিতেন দিলীপকুমার রায়, কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। সেই দিলীপকুমার রায়, যিনি দীর্ঘদেহী, কৃষ্ণবর্ণ, তীক্ষ্ণনাসা, মেঘগর্জনের মতো যাঁর কণ্ঠস্বর এবং যিনি উনিশশো বাহান্নতে যতখানি যুবক উনিশশো চুরানব্বুইতেও ঠিক ততখানিই যুবক।

দিলীপদার রজনীকান্ত সেনের গান, অতুলপ্রসাদের গান এবং অন্যান্য গান শোনেননি এমন সঙ্গীতপ্রেমী খুব কমই আছেন। আজকেও তাঁর গলাতে তেমনই তারুণ্য।

দিলীপদা মহড়া পরিচালনা করলেও নেপথ্যে থেকে বাংলার অধ্যাপক ধীরেনবাবু সব কিছুই তদারকি করতেন। অনেক সময়ে স্ক্রিপ্টও লিখে দিতেন।

ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়েই প্রথম অনুষ্ঠানের মহড়াতেই, আমাদের চেয়ে এক বছরের সিনিয়র একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল এবং পরে সে আমার বন্ধু হয়ে গেল সারাজীবনের।

যে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হল, সে সায়েন্স স্ট্রিমের ছাত্র ছিল। তখনকার দিনের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সায়েন্স-স্ট্রিমে আজেবাজে ছাত্ররা ভর্তির সুযোগই পেত না। খুব সুনাম ছিল ওই স্ট্রিমের। আমাদের কলেজের "অবজার্ভেটরিও" তখন বিখ্যাত ছিল। ছেলেটির নাম অর্ঘ্য সেন। ধুতি পরা। খদ্দরের ফুলহাতা শার্ট। হাত-গুটিয়ে পরা। পায়ে চটি। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। তাতে বইপত্র থাকত। আমাদের সময়ে ওইরকম ব্যাগকে আমরা বলতাম, 'শান্তিনিকেতনী ব্যাগ'।

অর্ঘ্যরও কোনও পরিবর্তন হয়নি, না পোশাকে, না ব্যবহারে, না কৌমার্যে, দিলীপদারই মতো; গত বেয়াল্লিশ বছরে।

অর্ঘ্য সম্ভবত তখনই জর্জদার (দেবব্রত বিশ্বাস) কাছে গান শিখত। ও যখন আমাকে জর্জদার কাছে নিয়ে যায় উনিশশো ছাপান্ন-সাতান্নতে, তখন ও জর্জদার সিনিয়র ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিল।

অর্ঘ্যই ছিল কলেজের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সব অনুষ্ঠানের মধ্যমণি।

তরুণও থাকত প্রত্যেক অনুষ্ঠানে। তরুণকুমার বোস। টি. কে. বাসু। তরুণ কমার্স স্ট্রিমের ছাত্র ছিল। পড়াশোনাতে ভাল ছাত্র ছিল। কালো, ছিপছিপে, মাঝারি উচ্চতার, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখের উজ্জ্বল ছেলে। পরে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে কিলবার্ন কোম্পানিতে যোগ দেয়। তখন তরুণও ডোভার রোডেই থাকত। পরে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। বহুদিনই দেখা হয়নি তরুণের সঙ্গে। জানি না, কোথায় আছে।

আসলে আমাকে এমনই কাজের ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে হয় পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকেই যে কলেজের কোনও বন্ধুর সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ প্রায় ছিলই না। একমাত্র দীপকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হত কিন্তু যখন হত তখন আমাদের নিজেদের জগতেই থাকতাম। অন্যরকম আলাপচারিতা বিশেষ হত না।

শ্যামল মুখোপাধ্যায়ও কমার্স স্ট্রিমের ছাত্র ছিল। এক বছরের সিনিয়র। অর্ঘ্যকে দাদা বলিনি কোনওদিন, অথচ তাকে কেন দাদা বলতাম জানি না। সামুদা ছিল বাঙালি-অবাঙালি সব ছাত্রেরই হিরো। একটু মোটা সোটা, কালোর মধ্যে খুবই সুশ্রী চেহারা ছিল। শার্প ফিচার্স। বাংলা ও হিন্দি আধুনিক গান গাইত মুখ্যত।

তখন বাংলা আধুনিক গানের জগতের আজকের মতো দৈন্যদশা নয়। শচীন কর্তা, জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সুধীরলাল চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, আলপনা ব্যানার্জি—আরও কত সব নক্ষত্র। শ্যামল মিত্ররা তখন সবে নাম করেছেন। পাড়ায় পাড়ায় আধুনিক গানের জলসা লেগে থাকত প্রায়ই এবং সেই সব জলসাও রাত জেগে শোনার মতো উৎসাহ মানুষের ছিল। ছিল, কারণ প্রত্যেক গায়ক-গায়িকার গলাই "সুরে বলত" আর রামকুমারবাবুর (চাটুজ্যে) ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় তখন "গান-বাজনার'ই দিন ছিল, "বাজনা-গানের" দিন আসেনি এখনকার মতো।

আজকালকার অতি কম আধুনিক এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীই খালি গলাতে গান করেন। করলেই, অনেকেই ধরা পড়ে যান। স্বর দাঁড়ায় না, সব পর্দাতে গলাও পৌঁছোয় না, সব স্বরে সুর লাগে না, তাই বিপুল পরিমাণ বাজনা দিয়ে, সৈয়দ মজতবা আলী সাহেবের ভাষাতে যাকে বলে "খারাপ রান্নায় ঠেসে লংকা দেওয়া" তা করেই খালি গলার দৈন্য এবং লজ্জাকে ঢাকতে হয়।

রামকুমারবাবু যথার্থই বলেন যে, আগে ছিল "গান-বাজনা" আর এখন হয়েছে "বাজনা-গান"।

সামুদাকে অবাঙালি ছেলেরা ডাকত "হেমন্তকুমার" বলে। অসাধারণ সুরেলা গলা ছিল সামুদার।

আর গলাতে ভাবও ছিল লাজোয়াব। সামুদা সিরিয়াসলি গান গাইলে অত্যন্ত উঁচুদরের গায়ক হতে পারত। হারমোনিয়মও বাজাত চমৎকার। নিজেই বাজিয়ে গাইত অর্ঘ্যের মতো, সোলো গাইত যখন। নইলে দিলীপদাই হারমোনিয়ম বাজাতেন।

সামুদা রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইত। আমি ছিলাম সবচেয়ে খারাপ গায়ক, দলের মধ্যে।

অর্ঘ্য আমাকে খুব ভালোবাসত। সামুদাও পরে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়। আবুধাবি, না দুবাই, না আফ্রিকার কোনও দেশে চলে যায় বেশি টাকা মাইনের জন্যে। তার সঙ্গেও শেষ দেখা হয়েছে বাইশ-তেইশ বছর আগে তাদের রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়ির কাছে।

আগেই বলেছি কিনা মনে নেই, মহড়া হত কখনও-কখনও ধীরেনবাবুর গোলপার্কের কাছের বাড়ির একতলার ঘরেও। চমৎকার সিঙাড়া খাওয়াতেন উনি। আর চা। সেই সিঙাড়ার স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে। মহড়ার সময়ে দেবুদাও, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক উপস্থিত থাকতেন। অমিতাভও গান গাইত।

অমিতাভ, তরুণ, অরুণ গুপ্ত—আমাদের এই তিন সহপাঠীই সেন্ট জেভিয়ার্সের কমার্স ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক হয়েছিল। হয়তো এখনও আছে। অরুণের কথা পবে আরও বলব। যদি ভুলে না যাই।

বিনয় নিভাটিয়া, কলেজের ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি, একবার একটি গানের অনুষ্ঠান করল। তাতে আমি গাইলাম রবীন্দ্রসঙ্গীত আব সামুদা গাইল হিন্দি ছবির গান। আরও কে কে গেয়েছিল ঠিক মনে নেই। গান ছাড়াও অন্য সব ব্যাপারও ছিল। তবে এটা স্পষ্ট মনে আছে যে, প্রোগ্রাম ছাপা হয়েছিল প্যাম্ফলেটের মতো। তাতে ইংরেজিতে ছাপা হয়েছিল, অন্যান্য অনুষ্ঠানসূচির সঙ্গে, BUDDHADEV GUHA : SNAG। SONG- এর জায়গায় SNAG

যার যেমন কপাল!

সারা জীবনই ওই SNAG নিয়েই কারবার করতে হল।

তখন রেস্তোরাঁ বলতে ছিল কলেজের কাছে পার্ক স্ট্রিটের "ম্যাগনোলিয়া" "অলিম্পিযা" ছাড়া সম্ভবত আর কোনও বারও ছিল না। ঠিক মনে নেই। হয়তো "মোকাম্বো" ছিল। কিন্তু আমরা কেউই বার-এর খদ্দের ছিলাম না।

আসামে বাঘ শিকারে গিয়ে, by a sheer accident আমি জীবনে প্রথমবার মদ্যপান করতে "বাধ্য" হই যখন, তখন আমার বয়স ত্রিশ। জীবনে প্রতিষ্ঠিত, বিবাহিত এবং সন্তানের বাবা।

শুধু আমিই নই, আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউই মদ খেত না। তখন, মদ খাওয়াকে কোনও বাহাদুরির ব্যাপার বলেও জানতাম না। আজও জানি না। জীবনে বাহাদুরি করার ক্ষেত্র অনেকই আছে। প্রচণ্ড মদ খাওয়াটা সেই ক্ষেত্রের মধ্যে কোনওদিনও গণ্য নয় এবং গণ্য হবেও না কোনওদিন। তবে এখন খাই মাঝেমধ্যেই। খেতে ভালো লাগে তাই খাই। ক্লান্তি অপনোদনের জন্যেও খাই। ঘরোয়া অনুষ্ঠানে গান গাইতে বসলেও খাই, গলা ভাল "বলে"। জানি না, সেটা মানসিক কি না!

"ম্যাগনালিয়াতে" লাঞ্চ বা অন্য কিছু খাওয়ার মতো সচ্ছলতা আমাদের কারোরই প্রায় ছিল না। চাইনিজ রেস্তোঁরা বলতে ছিল পিপিং। ওই পিপিংই।

'দ্য নুক' বলে একটি রেস্তোঁরা খুলল, আমরা কলেজে ঢোকার পরই ওয়েলেসলি স্ট্রিটে, পার্ক স্ট্রিটের কাছেই। সাদামাঠা রেস্তোরাঁ। আমরা কখনওসখনও চা আর সিঙাড়া খাওয়ার জন্যে অফ-পিরিয়ডে সেখানে যেতাম।

"আমরা" মানে আমি, দীপক, রজত, গৌতম, ইত্যাদি।

রজত আর গৌতমের কথা মনে আছে, বিশেষ করে একটি কারণের জন্যে। 'দ্য নুক'-এর দোতলাতে উঠে আমরা চা আর সিঙাড়ার অর্ডার দিতাম। বেয়ারা অর্ডার নিয়ে নীচে নেমে যেত। কারণ, কিচেন ও প্যান্ট্রিটা ছিল নীচে। বেয়ারা, নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই নতুন ও নির্জন রেস্তোরাঁর টেবল থেকে সুগার বাওলটা তুলে নিয়ে গৌতম চিনি খেত আর আমাদের বলত, "চিনি খা, চিনি খা, চিনি খেলে, এনার্জি বাড়ে!"

আর রজত এদিক-ওদিক তাকিয়ে, কোনও উচ্চবাচ্য না করে, টোম্যাটো সস-এর বোতলের ছিপিটি খুলে পুরো বোতলটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে, ঢকঢক করে জলের মতো খেয়ে পুরো বোতল সাফ করে দিত।

নো-ওয়ান্ডার যে, 'দ্য নুক' কিছুদিনের মধ্যেই লাল বাতি জ্বালল।

তাতে অবশ্য গৌতমের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি হল না। কারণ, সেকেন্ড ইয়ারে উঠেই ও ইউ পি এস সি-র পরীক্ষাতে বসে, আর্মির কমিশনড অফিসার হওয়ার জন্যে "পুনের" কাছে খাডাকভাসলার ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে চলে গেল।

গৌতম আমাদের সঙ্গে এন সি সি-তে ছিল। রজতও ছিল।

রজতের কথা আর একটু বলি। রজত রায়চৌধুরী। লম্বা, ফরসা, ছিপছিপে, শার্পফিচাসের। অত্যন্ত রসিক। ওর এক বিশেষ ঢং ছিল কথা বলার। গৌতমেরও ছিল। ওরা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের সতীর্থ ছিল।

রজত থাকত ল্যান্সডাউন রোডের উপরের রামকৃষ্ণ মিশনের শিশু মঙ্গলের উলটোদিক দিয়ে যে পথাটা বেরিয়ে গিয়ে হাজরা রোডের সমান্তরাল রেখাতে গিয়ে হাজরা লেনে পড়েছে সেই রাস্তায়। রাস্তাটার নাম ভুলে গেছি।

একটা ইতালিয়ান ক্যানোপির ধাঁচের বারান্দাওয়ালা বাড়িতে।

ডোভার রোড থেকে সাইকেলে করে গিয়ে ওদের বাড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আমি ডাকতাম, রজত! রজত! বলে।

রজতের বোনের নাম ছিল জয়তী। রজতের মা আমাদের মাসিমা ছিলেন ঠাকুরবাড়ির মেয়ে। মেসোমশাই ও মাসিমা দুজনের চেহারাই সুন্দর ছিল। আমার সঙ্গে ওঁদের তেমন ঘনিষ্ঠতা অবশ্য ছিল না।

জয়তীর চেহারার মধ্যে এমন একটা অ্যারিস্টোক্র্যাসি ছিল যে বলার নয়। আমার বকনা-বাছুরের মতো ডাক শুনে জয়তী দোতলার বারান্দাতে এসে বলত, "দাদা বেরিয়ে গেল এক্ষুণি" অথবা "বাড়িতে নেই" অথবা "আসছে"। ওইটুকুই। কথাবার্তা কোনওদিনও ডাইরেক্ট ন্যারেশানে হতো না সবাই তো রোমিও-জুলিয়েট নয় যে, দোতলা-একতলায় দাঁড়িয়ে রোমান্টিক ডায়ালগ দেবে? জয়তীর বিয়ে হয়েছে অত্যন্ত সুদর্শন, প্রতিষ্ঠিত, বিখ্যাত সুপ্রিয় ঠাকুরের সঙ্গে। অমন মেয়ের যেমনটি হওয়ার কথা ছিল।

রজতের বাড়ির ভেতরেও কোনওদিন ঢুকিনি। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের গৌতম-রজতদের ট্র্যাডিশন ছিল আড্ডার। রজতকে ডেকে নিয়ে ঢাকুরিয়া লেকে ওদের পূর্ব-নির্ধারিত বেঞ্চে, ওদের ভাষায় "রিজার্ভড", গিয়ে কিছুক্ষণ বসতাম। প্রেসিডেন্সি, সেন্ট জেভিয়ার্স' এবং আশুতোষের অনেকে আসত। সবাই ওদেরই স্কুলের বন্ধু।

কয়েক বছর আগে এক শ্রাদ্ধবাড়িতে দূর থেকে দেখেছিলাম জয়তীকে। আমাকে ও চিনতে পারেনি। চেনার কথাও নয়। কারণ, ওর সঙ্গে কোনওদিন ফর্ম্যালি আলাপ পর্যন্ত হয়নি।

রজত কিছুদিন আগে চলে গেছে। তখন থাকত সেবক বৈদ্য স্ট্রিটে। সে বাড়িতেও বছর কুড়ি আগে একদিন দশ মিনিটের জন্যে গেছিলাম। আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। তবে, দীপকের কাছ থেকে বা হঠাৎ-দেখা হওয়া অন্য বন্ধুদের কাছ থেকে ওর খবরাখবর পেতাম।

গৌতম থাকত জনক রোডে। মাসিমা ছিলেন সদাহাস্যময়ী সুন্দরী। গৌতমের কোনও ভাই ছিল না, রজতেরই মতো। ওর পরের বোনের নাম ছিল মনীষা! এবং ছোটো বোনের নাম সোমা। মনীষা কালো ছিল, কিন্তু অত্যন্ত সপ্রতিভ মেয়ে। সোমা ফরসা ছিল। ছোটোখাটো। অনেকই ছোটো ছিল গৌতমের চেয়ে। মনীষা অনেকদিন হল বিদেশেই থাকে। সম্ভবত ডাক্তার হয়েছিল ও। সোমাও সম্ভবত ডাক্তারই। সেও সম্ভবত বিদেশেই।

গৌতম বিয়ে করে, থিয়েটার সেন্টার-খ্যাত দীপান্বিতা রায়ের কনিষ্ঠা সহোদরা উষসীকে।

তখন 'উষসী' ব্র্যান্ডের একটা ট্যালকম পাউডার ছিল বাজারে। গৌতম বলত, বিয়ে করলে পাউডারের গন্ধওয়ালা মেয়েকেই করা উচিত।

তারপর থেকেই গৌতম বাইরে বাইরে। ব্রিগেডিয়ার হয়ে যায় জব্বলপুরে। অনেক বছর পরে। 'মাধুকরী' লেখার আগে আশির দশকে কানহার পথে জব্বলপুরে গেছিলাম। ওর খোঁজও করেছিলাম। শুনলাম, অল্পদিন আগে দিল্লি চলে গেছে।

ম্যাকলাক্সিগঞ্জের বাংলোর মালি, ওখানকার এক রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ারকে (ব্রিগেডিয়ার স্টিভেন্স) বলত "বিগাড়িও সাব"। আমার বন্ধুও 'বিগাড়িও' হয়েছে জেনে খুবই খুশি হয়েছিলাম।

দিল্লি থেকে গৌতম কলকাতায় এল জেনারেল হয়ে। ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতরে দেখার মতো কোয়ার্টার ছিল জেনারেল সাহেবের। তখন জেনারেল ব্রার ছিলেন ইস্টার্নকম্যান্ডের চিফ। ভীষণ কড়াকড়ি ছিল সিকিউরিটির। গৌতমের বিয়েতে না যেতে পারার দুঃখ মেটালাম আমরা বিয়ের সিলভার-জুবিলির গ্র্যান্ড পার্টিতে গিয়ে। মাসিমা মেসোমশাইয়ের সঙ্গেও দেখা হল বহু যুগ বাদে।

হাজারিবাগের শিকারী বন্ধু সুব্রত চ্যাটার্জিও দেড়-দু'বছর আগে ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস থেকে রিটায়ার করল। আমার কলকাতা, হাজারিবাগ এবং জঙ্গলের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট গোপাল (মিহির সেন) পৃথিবী থেকেই রিটায়ার করে চলে গেছে দু'বছর আগে। কলেজের সহপাঠী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দিলীপ দাসও চলে গেছে। চলে গেছে আরও অনেক নিকট বন্ধু।

আমার ছুটি নেই, ছুটি হল না এখনও।

লেখার কাজ তো আনন্দেরই; যদিও বড়োই পরিশ্রমের কাজ। সেই কাজটা কাজ বলে মনে করি না। করিনি কখনও।

কিন্তু পেশার কাজও তো ছাড়তে পারলাম না।

ইচ্ছে করে যে, রিটায়ার করে, শুধুই ডায়রি লিখব, ছবি আঁকব আর শুধুমাত্র নিজেরই আনন্দের জন্যে চানঘরে গান গাইব। জানি না, কবে হবে তা। আমার রিটায়ারমেন্টের ক্ষণ, আর লাল, গনগনে আগুনের ইলেকট্রিক চুল্লির মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া বোধহয় একই সঙ্গে, একই ক্ষণে আসবে।

রিটায়ার করা তার আগে হয়তো হবে না।

অবশ্য লেখকের রিটায়ারমেন্ট বোধহয় হয়ও না। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলেছিলেন :

"Retire? How the hell can a writer retire?"

বাল্যবন্ধু চুনী গোস্বামী রিটায়ার করতে পারে, পেরেছে আর রাজার মতোই রিটায়ার করেছে। হেমিংওয়ের কথাতে বললে বলতে হয়, "Thats the way a champ should go out like Antonio. A champion cannot retire like any one else." অ্যান্তোনিয়ো, পৃথিবী-বিখ্যাত স্প্যানিশ মাতাডর বুলফাইটার ছিলেন।

হেমিংওয়েকে তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন, তোমার বইয়ের শেল্ফেও তো তোমার নিজের লেখা বেশ কিছু বই আছে? তবে? তোমারও রিটায়ার করাতে অসুবিধে কি?

উনি বলেছিলেন 'Sure! I have got Six books I declare to win with. I can stand on that. But unlike your baseball player and your prize-tighter and your matador, how does a writer retire? No one accepts that his legs are shot or the whiplash gone from his reflexes. Everywhere he goes, he hears the same goddam question`what are you working on?"

কী লিখছেন? কী নিয়ে লিখছেন? আপনি? কোন পটভূমি নিয়ে?

জানি না, পেশা ছেড়ে দিলেও কবে, কী করে লেখা থেকে অবসর নেব। সত্যিই জানি না।

"অবরোহী" তে লিখেছিলাম যে, "চূড়োয় উঠে, কারোই মৌরসি-পাট্টা গেড়ে সেখানে বসে থাকার কথা নয়, পতাকা পুঁতে দিয়েই নেমে আসাটাই রেওয়াজ। আরোহণেরই মতো; অবরোহণও একটা উঁচু দরের শিল্প, গানের আরোহণ অবরোহণেরই মতো।"

কিন্তু প্রথমত, আজও চূড়োতে পৌঁছোনো হয়নি; দ্বিতীয়ত, এখনও যে অনেকই কথা বলা বাকি। অনেকরকম কথা, সুখের এবং দুঃখেরও।

'অবরোহী' (পত্রোপন্যাস)—প্রকাশক, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

তবুও লেখা থেকেও অবসর নেওয়ার কথা মাঝে মাঝেই ভাবি বইকি!

প্রায় সারাটা জীবনেই জেদের বশে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের চূড়োতে পৌঁছোনোর দুর্দম পণ নিয়ে দিনে-রাতের আঠারো ঘণ্টা অবিশ্বাস্য পরিশ্রম করেই এলাম। এই পরিশ্রমের রকমের কথা আমার স্ত্রী, মেয়েরা এবং অফিসের দু'একজন ছাড়া আর কেউই জানেন না, জানতে চানওনি কখনও। তবে ভরসা এইটুকুই যে, ঈশ্বর অবশ্যই জানেন!

কত বই এখনও পড়া বাকি, শোনা বাকি কত গান; কত মানুষকে ভালোবাসা বাকি, কত মানুষের ভালোবাসা পাওয়া বাকি, নেহাত নিজের আনন্দের জন্যে কিছুমাত্রই না করে, এলেবেলে, হিজিবিজি, 'Most coveted nothingness'-এ নিজেকে পুরোপুরি নিমজ্জিত করে, শুধু একটি দিন, একটি রাত, কবে যে শুধুমাত্র নিজেকেই দিতে পারব! দাবি-দাওয়াহীন!

এদিকে সময় বেশি যে বাকি নেই, সেকথাও বুঝতে পারি প্রতিমুহূর্তে। এই অমানুষিক পরিশ্রমের মাশুল তো গুনতে হবেই!

বয়স অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু আজও তো দেখি জীবনীশক্তি সেরকমই আছে। কমে তো নি বরং বেড়েইছে। জানি না, উপরওয়ালার কী ইচ্ছা! আমাকে দিয়ে তাঁর কোন ইচ্ছাপূরণ করাবেন তিনি তাও অজানা।

"আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান।
অমি তোমার ভুবন মাঝে লাগিনি, নাথ, কোনো কাজে—
শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ।।

সোনার সুরে ভোরে যখন আকাশ জুড়ে বাজবে বীণা।
আমি যেন না রই দূরে এই দিয়ো মোর মান।।"

শম্পু সেন (সমীর সেন) যার মুখ-নির্গত 'ডোন্ট বি ইনকুইজিটিভ' বাক্যটি শুনে 'ইনকুইজিটিভ' শব্দটির মানে শিখেছিলাম, সে আমার একজন অত্যন্ত প্রিয়বন্ধু ছিল। তবে ওরা খুবই বড়োলোক ছিল তখন তাই আমার বন্ধুত্ব মধ্যবিত্ত দীপকের সঙ্গে বা গৌতমের সঙ্গে যেমন গাঢ় হতে পেরেছিল ততটা গাঢ় হতে পারেনি ওর সঙ্গে।

তবু, ও আমাদের সকলেরই প্রিয়বন্ধু ছিল।

অসম আর্থিক অবস্থার ছেলে বা মেয়েদের মধ্যে সখ্য বাঁচিয়ে রাখতে যার অবস্থা অন্যের মতো ভালো নয়, তার হৃদয়ের ঔদার্যের প্রয়োজন হয় অনেকই বেশি। কোনও না কোনও রকম 'কমপ্লেক্স'-এ ভোগেন না এমন মানুষ পৃথিবীতে কমই আছেন। কিন্তু অসম আর্থিক অবস্থার বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে সব কমপ্লেক্সকে জয় করেই যেতে হয়।

হয়তো দুজনেরই জয় করতে হয়। কম আর বেশি।

শম্পুদের বাড়ি ছিল আলিপুরে। আজকালকার মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের বস্তির আলিপুর নয়, পঞ্চাশের দশকের আলিপুরের অন্য এক আভিজাত্য ছিল। পুরো তল্লাটে সম্ভবত একটিও

মাল্টিস্টোরিড বাড়ি ছিল না সেই সময়ে। আলিপুরে নিউ রোডে মস্ত লনওয়ালা বাড়ি ছিল শম্পুদের। শম্পুর বাবা-কাকারা একসঙ্গে থাকতেন।

কাকারা বললাম বটে কিন্তু একজন কাকার কথাই জানতাম।

শম্পুর খুড়তুতো বোন মুন্নাও আমাদের ব্যাচের ছিল, ও লরেটোতে পড়ত।

আমাদের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাসের পর শম্পু ও মুন্নার পাস করা উপলক্ষে জয়েন্ট-পার্টি হয়েছিল শম্পুদের বাড়িতে, মুন্না কাশ্মীর থেকে বেড়িয়ে ফেরার পরে। সে এক পার্টি বটে! ওদের বাড়িতেই প্রথম হাই-সোসাইটির অপরূপ সুন্দরী সব মহিলাকে মদ্যপান করতে ও সিগারেট খেতে দেখি। আজকাল তো হেঁজিপেঁজি গলি ঘুঁচির সব মহিলাই মদ্যপানকে 'প্যাশান' বলে মনে করেন। মদ খেয়ে ও খাইয়ে 'জাতে উঠেছেন' বলে মনে করেন আরও অনেকেই। কিন্তু সেদিনের রহিসি ও অ্যারিস্টোক্র্যাসির রকম অন্য ছিল।

শম্পুর দাদা ছিলেন বিখ্যাত ক্রিকেটার পি সেন। ওরকম স্টাইলিস্ট ও সপ্রতিভ উইকেটকিপার ভারতীয় ক্রিকেট টিমে আর হয়েছেন বলে জানি না। 'খোকন' সেন এই ডাকনামে সকলেই চিনত তাঁকে।

আমি তখন স্কুলে পড়ি। শম্পুর সঙ্গে আলাপ ছিল না। টেস্ট খেলা দেখছি একদিন, আর আমার সামনের বেঞ্চেই বসে দুই হাই-সোসাইটির অকারণে ইংরেজি বলা মহিলা বসে খেলা দেখছেন। তাঁদের মধ্যে একজন আবার সোয়েটার বুনছিলেন। খোকন সেন উইকেট-কিপিং করছিলেন।

এক মহিলা অন্য মহিলাকে শুধোলেন, খোকন সেনকো দেখিয়ে; 'ইজ হি ওয়েল-অফ?'

অন্য মহিলা সোয়েটার-বোনা ছেড়ে, প্লাক- করা, আইব্রো-পেনসিল ঘষা ভুরু তুলে সানগ্লাসের উপর দিয়ে, যেন হাওয়াইন সমুদ্রের উপরের সূর্যর দিকে চেয়ে বললনে, 'মাই! মাই! ওয়াট ড্যু উ্য সেএ? দে আর ভেরি ভেরি ওয়েল-অফফ।'

ওঁরা ঠিক কতখানি ওয়েল-অফফ তা শম্পুদের বাড়িতে প্রথম দিন গিয়েই বুঝেছিলাম।

আমাদের কলেজের সহপাঠী এবং শম্পুর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের সহপাঠী ছিল রাজু ঘটকও। তার কথা হয়তো আগেও বলেছি। রাজু ছিল ছ'ফিট দু'ইঞ্চি লম্বা আগুনের মতো ফরসা। ইংরেজিতে ছাড়া কথা বলত না রাজু। খুবই প্রাণবন্ত ছেলে ছিল। রাজু ছিল শম্পুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুবই সরল ছেলে।

শেষ দেখা হয়েছিল রাজুর সঙ্গে বুছর পঁচিশেক আগে রাঁচি-হাওড়া এক্সপ্রেসে। আমি এন সি ডি সি'-র অডিট শেষ করে বাটলিবয়ের এন এম নারিয়েলওয়ালা আর সিংঘি কোম্পানির, আমার সহপাঠী মোহন সিংঘির দাদা জয় সিংঘির সঙ্গে কলকাতা ফিরছি এ সি ফার্স্ট ক্লাসে, দেখি, পাশেব কম্পার্টমেন্টে রাজু একেবারে দোকান সাজিয়ে বসেছে।

তখন রাঁচি-হাওড়া এক্সপ্রেস শেষ বিকেলে ছাড়ত রাঁচি থেকে। রাজু, পিওর ব্ল্যাক-লেদারের কেস খুলে রেখেছে সামনে। সিভাস রিগ্যাল হুইস্কির বোতল, জলের বোতল এবং চারটে গ্লাস।

আমাকে দেখেই বলল, 'আয় আয় লালাবাবু, বেলা যায়।'

রাজু মাঝে মাঝে এইরকম বাক্যবন্ধ বলত বাংলাতে। For a change! ও তখন ছিল সম্ভবত রেকিট অ্যান্ড কলম্যান বা অ্যাটলান্টিস ইস্টে। ঠিক মনে নেই।

জানি না, রাজু কেমন আছে। ওদের পৈতৃক নিবাস ছিল এলগিন রোডে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড আর হরিশ মুখার্জি রোডের মাঝে।

শম্পুদের বাড়িতে যখন শীতকালে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলতাম, ওদের প্রতিবেশী বিখ্যাত আর্কিটেক্ট অর্জুন রায়ের বড়ো মেয়ে লোরেটো হাউসের কাকলিও খেলত। আমাদের ব্যাচেরই ছিল। কাকলি খুব ভালো অ্যাথেলেট ছিল। ব্যাডমিন্টন খেলতাম, ওদের প্রতিবেশী, বিখ্যাত আর্কিটেক্ট অর্জুন রায়ের বড় মেয়ে লোরেটো হাউসের কাকলিও খেলত। আমাদের ব্যাচেরই ছিল। কাকলি খুব ভাল অ্যাথলেট ছিল। ব্যাডমিন্টনও খেলত ভালো। কালোর মধ্যে অত্যন্ত সপ্রতিভ চেহারা ছিল। পরে কাকলির বিয়ে হয়েছিল নির্মল সিদ্ধান্ত ও বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা চিত্রলেখা সিদ্ধান্তর ছেলে নিখিল সিদ্ধান্তর সঙ্গে।

কাকলিও চলে গেছে।

চলে যাওয়ার আগে থাকত ওরা আমাদের বালিগঞ্জ পার্কের কাছেই। চমৎকার বাড়িটি। সম্ভবত অর্জুন রায়ই (রাঁচির কাঁকে রোডের বিখ্যাত জাহাজ-বাড়িটিও ওঁরই বাড়ি ছিল) প্ল্যান করে দিয়েছিলেন।

ব্যাডমিন্টন খেলতে আসত শম্পুদের বাড়ির উলটোদিকের বাড়ির ব্যারিস্টার গুহর ছেলে, বাবু। বাবুর ভালো নাম ভুলে গেছি। বাবুর তিন দিদি ছিল। খুকুদি, অতুদি এবং মণিদি। পরমাসুন্দরী মহিলা ছিলেন বাবুর মা।

বাবু কিছুদিন আগে সম্ভবত গুডইয়ার কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু করছে। বাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা হয় কিন্তু ওর ভালো নাম জিজ্ঞেস করার অবকাশ অথবা প্রয়োজন দুটোর কোনওটাই হয়নি।

খোকনদার স্ত্রী, বউদি ছিলেন, আমার চোখে তো বটেই, নিশ্চয়ই অন্য সকলের চোখেও 'পরমাসুন্দরী' মহিলা। তবে ওরকম শান্ত, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, ওরকম পটভূমিতেই খোলে, জার্মানির 'রোজেনথাল' বা ইংল্যান্ডের 'ওয়েজউড'-এর ফুলদানিতে যেমন খোলে, মহার্ঘ ফুল।

বউদির নাম ছিল রিণা।

একটি ইংরেজি ছোটো গল্পের বই, তাঁর নাম সই করা; এখনও আমার কাছে আছে। শম্পুকে ফেরত দিইনি। বউদি অবশ্য বইটি আমাকে সই করে দেননি। আমাকে সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে চিনতেনও না আলাদা করে। শম্পুর একদল বন্ধুর মধ্যে একজন ছিলাম আমি। কিন্তু তাতে আর কী!

বই চুরি করা বা মেরে দেওয়াটা চুরির মধ্যে আদৌ গণ্য নয়। তাই আমার অগণ্য বন্ধু আমার প্রচুর ভালো বই মেরে দিয়েছে (তাদের তালিকাও করতে পারি বললে) জেনেও তাদের কাছ থেকে বই ফেরত চাইনি কখনও। চুরি করা বা মেরে দেওয়া অর্থে গোবরের গন্ধ। আর চুরি করা মেরে-দেওয়া, বইয়ে ফুলের গন্ধ। এই বক্তব্য বানানো নয়। এই আমার বিশ্বাস।

শম্পুই আমাকে প্রথম শেখায় যে, রুলটানা কাগজে, রুলের উপরে ইংরেজি লিখতে হয় আর নীচে বাংলা। রুলটিকে মাত্রার মতো ব্যবহার করে। আশ্চর্য, এই সরল ব্যাপারটা স্কুলের কোনও মাস্টারমশাই যে আমাকে আগে শেখাননি কেন, তা ভেবে আজও অবাক হই। বাড়ির কেউও শেখাননি।

শম্পু খুব ভালো ছবি আঁকত। ক্লাসে যখন অধ্যাপকেরা পড়াতেন তখন শম্পু আমার পাশে বসে ছবি আঁকত। মাঝে মাঝেই বাঁ হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করত ও। সবসময়েই ফিটফাট থাকত।

একদিন শম্পু আমাদের অনেককে খুবই বিপদে ফেলেছিল।

তখন আমরা বি কম পড়ি। সকালের ক্লাসের পর আমরা মাঝে মাঝেই ম্যাগনোলিয়াতে এক কাপ করে কফি খেয়ে যে যার পথে যেতাম আমি অফিসে, ওরা বাড়িতে। কফির দাম দেওয়ার পরে যার পকেটে ট্রাম বা বাসভাড়াটুকুই থাকত শুধু।

আগের সপ্তাহে একদিন কফি খাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেদিন কফি খাওয়ার পর যখন বিলটি এল, তখন দেখা গেল যে দাম বেড়ে গেছে।

সকলের পকেট কুড়িয়ে তো কফির দাম দেওয়া হল কিন্তু দেখা গেল যে, সকলের ফার্স্ট ক্লাস ট্রামের ভাড়া নেই। তখন কনসেনসাস হল যে সেকেন্ড ক্লাসে করেই যাওয়া হবে।

আমরা বলতে সেদিন আমরা অনেকেই ছিলাম বি কম ক্লাসের। আমাদের মধ্যে অমিতাভও ছিল। অমিতাভ ব্যানার্জি। বার্নপুরের মস্ত অফিসার ছিলেন অমিতাভর বাবা। থাকতেন জি টি রোডে 'এভিলিন লজ' আসানসোলে। কেয়াতলা রোডে তখন অমিতাভদের বাড়িও শেষ হয়েছে। অমিতাভর জামাইবাবু ছিলেন কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। থাকতেন এলগিন রোড আর আশুতোষ মুখার্জি রোডের মোড়ের কাছাকাছি, এলগিন রোডের ওপরেই একটি বাড়িতে।

সেকেন্ড ক্লাসে যেতে হবে শুনেই শম্পু বেঁকে বসল।

বলল, আনথিংকেবল। আই কান্ট থিংক অফ ট্রাভেলিং সেকেন্ড ক্লাস।

এদিকে শম্পুকে ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া দিতে হলে আমাদের মধ্যে একজনের সেকেন্ড ক্লাসের ভাড়া কম পড়ে যায়। কিন্তু শম্পু অটল। অতএব শম্পুকে আলিপুরগামী ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে চড়িয়ে দিয়ে আমরা সকলে হন্টন মেরে এলগিন রোডের মোড় অবধি এসে অমিতাভর দিদির কাছ থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে আবার ট্রামে চাপি।

অমিতাভর কথা পরে আবার বলা যাবে।

শম্পু এখন ইন্টিরিয়র ডিজাইনার। সকলের বাবারাই, আমাদের প্রজন্মে, তাঁদের ইচ্ছাটা জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইতেন ছেলেমেয়েদের উপরে। শম্পু যদি আর্ট স্কুলে পড়ত তবে হয়তো অত্যন্ত নামী আর্টিস্ট হত। বি. কম. পাশ করলেও শেষে ও সূক্ষ্মবৃত্তিতেই গেল। ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে বছর দুয়েক আগে বম্বেতে। একটি বড়ো মালটিন্যাশনাল কোম্পানির বোর্ডরুম-এর ইন্টিরিয়র ডিজাইনিং করতে এসেছিল। এসেছিল আমার হোটেলে। বহুদিন পর অনেক সুখ-দুঃখের গল্প হয়েছিল। ডিনারও খেয়েছিলাম একসঙ্গে।

তারপরেও দু-একবার দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। বম্বে এবং কলকাতা এয়ারপোর্টে।

শম্পুর সঙ্গে দেখা হলেই কলেজের দিনগুলোর কথা, ওদের নিউ রোডের বাড়ি, খোকনদা, রিনাবউদি, মুন্না, কাকলি এবং বাবুর কথা মনে পড়ে। অনেক সুখস্মৃতিও।

কী সব দিনই না ছিল আমাদের।

আমাদের আরেক বন্ধু ছিল অরূপ। অরূপ চক্রবর্তী। অরূপ অবশ্য আর্টস স্ট্রিমের ছিল। ওরা থাকত লেক ভিউ রোডের একটি বাড়ির একতলাতে। বাড়িটি ছিল অসমের এক রাজপরিবারের। ওই পরিবারের মেয়ে মঞ্জুলা 'দক্ষিণীতে' ছিলেন। খুব ভালো নাচতেন।

মঞ্জুলাদির দাদা আমার সঙ্গে পরে টেনিস খেলতেন দক্ষিণ কলকাতা সংসদে, দেশপ্রিয় পার্কে; আমি থার্ড ইয়ারে ওঠার পর থেকে।

মঞ্জুলাদির মা ছিলেন কিংবদন্তি গায়িকা মালতী ঘোষালের বোন।

অরূপের বাবা নিস্তারণ চক্রবর্তী ছিলেন ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ বা ওইরকম কিছু। তখন পশ্চিমবাংলাতে অনেক ইন্ডাস্ট্রি ছিল। এখনকার মতো ন্যাংটো দশা ছিল না অর্থনীতির, শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা। ভারতের মানচিত্রে তখন পশ্চিমবঙ্গের আলাদা মর্যাদা ছিল ওই ব্যাপারে।

অরূপ কোন্ স্কুল থেকে এসেছিল মনে নেই তবে তার গভীর জ্ঞান ছিল ইংরেজিতে। অরূপই আমাকে 'Wee' শব্দটির মানে শিখিয়েছিল। 'Wee' মানে যে Small তা আমি জানতাম না।

উত্তরবঙ্গের চা বাগানের স্কটসম্যান দুই ম্যানেজারের সঙ্গে আমাদের আলাপ ও পরে শিকারের দোস্তি হয়েছিল আরও অন্য ম্যানেজারদের সঙ্গে। বাগরাকোটের ম্যানেজার ছিলেন ডনাল্ড ম্যাকেঞ্জি আর সামসিং-এর ম্যানেজার ছিলেন রনাল্ড রস ম্যাকেঞ্জি। ডনাল্ড ছিলেন ছোটখাট, তবে দুবলা-পাতলা আদৌ নয়। প্ল্যানটার্সরা তাই তাঁকে 'Wee Mac' বলে ডাকতেন। পাছে, দুই ম্যাকেঞ্জিতে গুলিয়ে যায়।

আমরাও Wee Mac বলতাম। কিন্তু ভাবতাম যে Wee বোধহয় নামটাম হবে।

অরূপের কাছে এই ঋণ অবশ্যস্বীকার্য।

ডনাল্ড এবং তার অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রী বেটি এবং রনাল্ড এবং আরও অনেকের কথা আছে 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে' শিকারের স্মৃতিচারণের বইটির প্রথম খণ্ডে।

অরূপ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বড়ো বোদ্ধা ছিল এবং ওই কারণে সঞ্জয় এবং রুমাদেরও ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

বলতে ভুলে গেছি যে, সঞ্জয়দের হাজরা রোডের বাড়ির উলটোদিকে থাকত আশিস। আশিসনাথ রায়। নিজবাটিতে। আশিস শুধু মেধাবী ছাত্র ছিল তাই নয় ওর মতো ভদ্র, সভ্য ও নরম ছেলে খুব কমই দেখেছি। সেও ছিল আর্টস স্ট্রিমের। ওর পড়ার ঘরটি ছিল একতলাতে। সেই ঘরে আমাদের অনেক সুখের সময় কেটেছে।

অনেকবছর পরে সেই একতলাতেই বাণী (ঠাকুর) আর কল্যাণদা (কল্যাণকুমার রায়) ভাড়া থাকতেন। তখনও একাধিকবার গেছি সে বাড়িতে।

আশিস আর ওর সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী সুপ্রিয়া এখন থাকে নিউ আলিপুরে।

অরূপের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে সম্ভবত বছর খানেক আগে । আমাদের বন্ধু দিল্লিবাসী সেতারি, পদ্মভূষণ দেবু চৌধুরী পদ্মভূষণ হবার পরে প্রথম কলকাতাতে এলে একটি সংস্থা দেবুকে বিড়লা সভাগৃহে সংবর্ধনা দেয়। তারপর দেবু বাজায়ও। দেবু দিল্লি থেকেই খবর দিয়েছিল বাজনা শুনতে আসার। দেবু আর হাজারিবাগের স্মৃতি আছে 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'-তে।

বিড়লা সভাগৃহে গিয়েই অরূপের সঙ্গে দেখা। চা-সংক্রান্ত ব্যবসা আছে অরূপের।

পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবার পরে ইচ্ছে করে যে, আবার দেখা হোক, কোথাও বসা হোক, কিন্তু কবে যে কোথায় থাকি, ঝড়ে-পড়া পাখির মতো তার ঠিক থাকে না। তাছাড়া, এখানে থাকলেও উদ্বৃত্ত সময় বলতে যে কিছুমাত্রই নেই। বন্ধুদের হারিয়েছি প্রায় চিরদিনেরই মতো সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নেই।

আত্মীয়দেরও হারিয়েছি বলা চলে। কারণ, আমার কোনও সামাজিক জীবন নেই।

সকলেই ভুল বোঝেন, ভুল বুঝেছেন। কিন্তু আমার কিছুই করণীয় নেই।

কিন্তু এও ঠিক যে, যা হারিয়েছি তার বদলে পেয়েছি লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকার অকুণ্ঠ, অপ্রত্যাশিত, underserved ভালোবাসা, সম্মান এবং শ্রদ্ধা।

প্রত্যেক প্রাপ্তির গায়েই একটি করে প্রাইস-ট্যাগ থাকেই। বড়ো প্রাপ্তির জন্যে বড়োমূল্য দিতে হয়। মূল্য দিতে কার্পণ্য করলে তার প্রাপ্তিও সেই মাপের হয়।

লেখক যদি প্রকৃত লেখক হন, তাঁর জীবন একাকী, নির্জন হতে বাধ্য। সামাজিকতা করে, অন্য দশজনের মতো জীবনযাপন করে লেখক হওয়া হওয়া যায় না এমন বিশ্বাসই আমার জন্মেছে গত তিরিশ বছর লেখালেখি করে। তাছাড়া, আমার পেশা না থাকলে হয়তো তবু কিছু সময় বের করতে পারতাম। সে জন্যেও পারি না।

আমি অপারগ। সকলের কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার বন্ধু এবং আত্মীয় এবং অনাত্মীয়রাও অবশ্যই জানেন, যাঁরা আমার নিকট সান্নিধ্য কখনও না কখনও পেয়েছেন, আমি কী রকম আড্ডাবাজ এবং হুল্লোড়ে। মানুষ কত ভালবাসি আমি। মানুষের সঙ্গও। আড্ডা মারতে যে পারি না তা তার জন্যে একধরনের দুঃখমিশ্রিত আনন্দ বোধ করি। নিজেকে নানা সহজ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করার মধ্যেও একধরনের আনন্দ আছে। সে আনন্দর কথা প্রত্যেক সৃষ্টিশীল মানুষই জানেন। কিছু না-পাওয়ার দুঃখ এবং সেই মূল্যে কেনা কিছু পাওয়ার আনন্দ। আড্ডা তো সকলেই মারেন! লেখক তো সকলে হন না! এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিই।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলেছিলেন : 'Writing at its best is a lonely life.'

একজন লেখকের জীবনবোধ, সাহিত্যবোধ, ঈশ্বরবোধ, জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে আমার সুচিন্তিত এবং বিশ্বাসসঞ্জাত মতামত ব্যক্ত হয়েছে পরিণত বয়সের বহুবিতর্কিত পত্রাশ্রয়ী উপন্যাস 'অবরোহী'তে। 'অবরোহী' আমার অন্যতম প্রিয় উপন্যাস। আমার লেখা যাঁদের ভালো লাগে সেই সব পাঠক-পাঠিকাকে পড়তে অনুরোধ করব ওই উপন্যাসটি। ওটি আমার অনেক দুঃখের ফসল, আমার প্রতি অনেকই অন্যায়ের চিহ্নবাহীও।

আমাদের আরেকজন বন্ধু ছিল বিশু। যদিও ও আর্টসের ছাত্র ছিল। ধুতি শার্ট, কোঁকড়া চুল, ফরসা ফিটফাট। যতদূর মনে পড়ে, বিশু রেগে গেলে একটু তোতলাতো। কলেজ ছাড়ার পর আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। তবে দীপক চক্রবর্তী আর অরুণ দামের কাছে শুনেছি যে ও এখন গোবরডাঙা কলেজের অধ্যাপক।

চঞ্চল ঘোষ, যুগান্তরের শিশুসাহিত্যিক, আমার বড়োমামার সমসাময়িক বিমল ঘোষের (মৌমাছি) ছেলেও ছিল আমাদের সতীর্থ। বারো মাইনাস পাওয়ারের চশমা ছিল চঞ্চলের। ভারি ভদ্র, শান্ত ছেলে। ওর সঙ্গেও যোগাযোগ কলেজ ছাড়ার পরই ছিন্ন হয়ে গেছে। শুনেছিলাম যে ও এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিলে আছে।

অনুপম রায়চৌধুরী, আমাদের অনু, ভাল ক্রিকেটার এবং মারকুট্টে, খুব প্রাণবন্ত ছেলে ছিল। এখন কল্যাণীতে থাকে। ল্যান্সডাউন রোডের উপর চক্রবেড়িয়ার মোড়ের কাছে ওদের বাড়ি ছিল। অনুর বাবা ছিলেন ডি পি রায়চৌধুরি, ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস।

অনু এবং তার দাদারা মিলে পরে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে 'চয়ন' নামে একটি বইয়ের দোকান এবং প্রকাশনা সংস্থা করেছিল।

ওর এক দাদার কথাও মনে আছে। ফরসা মিষ্টি। ছোটোখাটো চেহারা, অনুর সঙ্গে কোনওই মিল ছিল না তাঁর।

বইয়ের দোকান পরে বন্ধ হয়ে যায় সম্ভবত। খদ্দেরদের দোষ নেই। অনু এবং দাদার বন্ধুরা এমনভাবে দোকানটিকে আড্ডাস্থল করে তুলেছিল যে কোনও খদ্দেরের সাধ্যই ছিল না সেই ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে বই চান। তাতে অবশ্য অনু এবং দাদাদের বন্ধুবৎসল-চরিত্রের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

নির্মলেন্দু সেনগুপ্তও পড়ত আমাদের সঙ্গে। বন্ধু ছিল। ইকনমিস্ট। দেখা হয় না কলেজ ছাড়ার পর। শুনেছি, ফিলিপস ইন্ডিয়াতে আছে। ছাত্রাবস্থায় থাকত লেক টেম্পল রোডে।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ক্যানটিন, কনট্রাক্টে নিয়েছিল জগদীশ। পদবি মনে নেই। বয়সে সে বড়ো ছিল আমাদের চেয়ে বছর পাঁচেকের। পাঞ্জাবি। দাড়ি ছিল না। তবে শিখ কি না, তা জিজ্ঞেস করিনি। অনেক শিখেরই দাড়ি থাকে না। উদ্বাস্তু। হিন্দিতেই কথা বলত। তার দুজন চ্যালা ছিল। তারা জল দিত, চা বানাত। একজন ছিল, যে সিঙাড়া বানাত। জগদীশ তাকে "মিস্তিরি' বলে।

পরবর্তী জীবনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের হাইওয়েতে, যেখানেই ধাবা দেখেছি; সেখানেই দেখেছি রাঁধুনিকে "মিস্তিরি" বলে। বড়ো বড়ো ধাবাতে বড়ো মিস্তিরি, মেজো মিস্তিরি, ছোটো মিস্তিরি থাকে। পথ এবং পান্থ নিয়েই তাদের কারবার; আর ড্রাইভার আর খালাসি; তাই পথ-পাশের ধাবার 'ভোক্যাবুলারি'র উপরও ট্রাকের আর ড্রাইভারদের প্রভাব স্বভাবিকভাবেই পড়ে।

কোনও কোনও ধাবাতে নানা রকম চা পাওয়া যায়। "পঁচাশ মিল কি চায়ে" না "দোশো মিল কি চায়ে", তা বাতলে দিলেই, সেইমতো দাওয়াই। বলাই বাহুল্য, সেই চা, চা নয়।

সিঙাড়ার সঙ্গে একটা তেঁতুল-গোলা চাটনি দিত জগদীশ। আর চা! যে চা খেয়ে প্রত্যেক দিনই, ফাদার লেজলির অনেক গল্পের একটি গল্পের কথা মনে পড়ে যায়।

লানডানের মিন্সিং লেনে পৃথিবীর সব জায়গার চায়ের নিলাম হয়। ফাদার লেজলি একদিন আমাদের বলেছিলেন, "সামথিং ওজ বিয়িং সোল্ড অ্যাট মিসিং লেন, হুইচ লুকড লাইক কফি, টেস্টেড লাইক কোকো অ্যান্ড ওজ টোল্ড টু বি টি।"

আমাদের কলেজ ক্যানটিনের জগদীশের চা-ও সেই গোত্রীয়ই ছিল।

ক্যানটিনওয়ালা জগদীশের সঙ্গে খারাপ-ছাত্র আমার এক ধরনের সখ্য গড়ে উঠেছিল। তা অবশ্য সীমিত ছিল ক্যানটিনের মধ্যেই। আমি সিগারেট খেতাম না জগদীশ খেত। ওর বলত, ওর মায়ের কথা, পরিবারের কথা। ওই চা-সিঙাড়া বিক্রি করেই ও সংসাব চালাত। দেশে টাকা পাঠাত।

ওর ফরসা, রুক্ষ মুখে চেয়ে, পাঞ্জাব কি হরিয়ানার বা দিল্লির কোনও গ্রামে রঙিন ঘাঘরা বা সালোয়ার-কামিজ পরা ওরা মা-বউ, বাবলা গাছের ছায়ায় লাল বা নীল বা হলুদ পাগড়ি মাথায় দিয়ে, চারপাই পেতে হুঁকো-হাতে বসে-থাকা ওর বৃদ্ধ বাবা, ওদের মাটির বাড়ি, রুক্ষ, নির্দয়, লাল প্রকৃতির পটভূমিতে ওদের মোষ অথবা উটকে কল্পনা করে নিতাম ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে।

দেশভাগ পাঞ্জাবেও হয়েছিল বাংলার মতোই, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালিরা যেমন পশ্চিমবঙ্গেই গুঁতোগুঁতি করে থেকে নিজেদের এবং পশ্চিমবঙ্গের মূল বাসিন্দাদেরও ক্ষতি করেছেন, ওঁরা তা করেননি। সারা ভারতে, সারা পৃথিবীতেই ওঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন।

এই জাতকে পরবর্তী জীবনে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হওয়াতে আমি এঁদের মস্ত অনুরাগী হয়ে উঠেছি। দোষও ওঁদের অনেক। কিন্তু গুণ তার চেয়ে অনেকই বেশি। আমাদের অনেকই শেখার ছিল পাঞ্জাবের মানুষদের কাছ থেকে অথচ কিছু শিখিনি। ওদের, বিশেষ করে শিখদের চেহারা, সারল্য, বহির্মুখীনতা এবং পৌরুষ আমাকে চিরদিনই আকৃষ্ট করে।

জীবনে বন্ধুতার সঙ্গে বিত্ত, তথাকথিত শিক্ষা, বয়স এবং দেশ বা প্রদেশের সাযুজ্যকে কোনও দিন বড়ো বলে মনে করিনি। তাই, পানওয়ালা , বিড়িওয়ালা, সামোসাওয়ালা, জুতোর দোকানি, ঘড়ি-সারাইওয়ালা, ছুতোর, মুচি, কুলি-কামিন, ধাঙর, মোটর-মেকানিক, সকলকেই বন্ধুরূপে পেয়েছি। এবং দেখেছি যে, শহরের বিত্তবান 'শিক্ষিত' মানুষের তুলনাতে এঁরা মানুষ হিসেবে অনেকই উচ্চস্তরের। আমার এইসব শ্রেণির বন্ধু কখনওই আমাকে ঠকায়নি। আমার ভালবাসা, বিশ্বাস, সম্মানকে আহত, পদদলিত করেনি। অকৃতজ্ঞতা করেনি, নির্লজ্জভাবে তঞ্চকতা করেনি আমার সঙ্গে।

এই শিক্ষা আমি পেয়েছিলাম আমার বাবার কাছ থেকেই। বাবা চিরদিনই বলতেন যে, যে-মানুষ অন্য মানুষকে মানুষের মর্যাদা না দেয়, জাত বা পেশা বা ধর্মের বিচার আছে যে মানুষের ভিতরে; অথবা বিত্তর বিচার, সেই মানুষ, মানুষই নয়!

মানুষের ভেক-ধরা শিক্ষিত, নামী-দামি কিন্তু ভণ্ড, আপাদমস্তক অসৎ, বুদ্ধিজীবী, চাকুরে, ব্যবসায়ী দেখে দেখে যখন ঘেন্না ধরে গেল; তখন কেবলই বাবার ওই কথাটা মনে হয়।

ঢাকুরিয়া লেকের কাছে, বাবার নতুন বাড়ির যেদিন গৃহপ্রবেশ হয়, সেদিনই বাবা, যাঁরা বাড়ি বানিয়েছিলেন; সেইসব রাজমিস্ত্রি, ছুতোর, মুটে-মজুর প্রত্যেককেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এবং তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি আদর করে, মহাসমারোহে, অন্য অতিথিদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে খাইয়েছিলেন।

তাতে কোনও কোনও "মান্যগণ্য" "বড়োলোক" অতিথি অপমানিত বোধ করাতে বাবা তাঁদের বলেছিলেন যে, যারা তিল তিল করে, দিনের পর দিন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতে, মাটি খুঁড়ে, ইট বয়ে, বাঁশের ভারার ওপর প্রাণ হাতে করে বসে বাড়িটা বানাল, আজ তারাই আমার সবচেয়ে বড়ো অতিথি। আপনারা অপমানিত বোধ করলে না খেয়েই চলে যেতে পারেন।

বাবা বারবার বলতেন, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটা বড়ো অংশের উদ্ভব হয়েছে নিম্নবর্ণের অত্যাচরিত হিন্দুদের থেকে। মানুষের আবাব শ্রেণি কিসের? সবমানুষই সমান; সব জাতই সমান। হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে বড়ো দোষ এই শ্রেণিবিভেদ, মানুষের মধ্যে কৃত্রিম স্তরের সৃষ্টি।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, পঞ্চাশের দশক আর নব্বইয়ের দশক এক নয়। ওই সময়ে ওরকম কথা বলতে পারতেন এমন মানুষ আমাদের আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিতদের মধ্যে খুব কমই দেখেছিলাম।

আমার পরম সৌভাগ্য যে শিশুকাল থেকেই বাবার দেওয়া সেই 'মনুষ্যত্বের' শিক্ষা আমার মধ্যে পরোপুরি সম্পৃক্ত হয়ে গেছিল, গেছে; যে-কারণে "তথাকথিত ভদ্রলোকদের" সঙ্গে মেলামেশা করে বিশেষ আনন্দ পাই না। "ইয়ে ইন্‌সা কে দুশমন সমাজো কী দুনিয়ার" সমাজে আমার "অসামাজিক" বলে বিবেচিত হওয়ার এও আরেকটি কারণ।

সামোসাওয়ালা জগদীশের কথা বলতে বসে এত কথা মনে হল এই জন্য যে, জগদীশ যদিও আমার সহপাঠী ছিল না, কিন্তু সে আমাদের সেই সময়টুকুর সাক্ষী ছিল। সেই ভুলতে না পারা "ওয়াক্ত"-এর "হরগিজ হিসসা" তারও অবশ্যই ছিল এবং আমাদের প্রথম যৌবনের উড়াল দিনগুলির মরকত-মনির উজ্জ্বল টায়ারার মধ্যে জগদীশেরও একটি মণির স্থান আমাদের দুঃখ সুখের সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল। জগদীশের কথা মনে হলেই কলেজের দিনগুলো, অগণ্য বাঙালি-অবাঙালি বন্ধুদের হাসিখুশি উজ্জ্বল মুখগুলোর কথাও মনে.এস ভিড় করে।

বছর আট-দশ আগে, কি তারও আগে হবে, জগদীশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দিল্লির কনট-সার্কাসে। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডায়রেক্ট ট্যাক্সেস-এ একটি কাজ ছিল, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের

নর্থ-ব্লকে। কাজের পরে, যদিও সেবারে উঠেছিলাম, মানসিং রোডের তাজমহল হোটেলে, মক্কেলকে বললাম, বহু বছর কনট-সার্কাসের 'GAYLORD'–এ খাই না। চলুন দেখি কী পরিবর্তন হয়েছে তার। তারা কি এখনও তেমনই ভাল 'বেকটি ম্যুনিয়ের' করে?

'GAYLORD'–এ লাঞ্চ খেয়ে বেরুচ্ছি, দেখি ফুটপাতে জগদীশ। গায়ে একটি সবুজ-রঙা ফুলহাতা সোয়েটার। কলেজে ও একটা চেন লাগানো জার্কিন পরে আসত শীতকালে, খয়েরি রঙা।

আমি তো প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম। কিন্তু ওর মুখ দেখেই বুঝলাম ও আমার মুখ চিনল বটে, কিন্তু নাম মনে করতে পারল না।

হাজার হাজার মুখ। কাকে মনে রাখবে? তাছাড়া, আমার মুখ, না সুশ্রী না কুশ্রী। সাধারণ। সাধারণদের কেউই মনে রাখে না।

বলল, তুমি কী করো?

ওকে বললাম, কী করি।

তারপর বললাম, তুমি?

ঔর ক্যা করেগা, সামোসাই বিকতি হ্যায়।

জগদীশ বলল হাসিমুখেই, কাশ্মীর গেটের কাছেই চাটের দোকান দিয়েছি। পারলে একদিন এসো। কোথায় উঠেছ? আছ ক'দিন?

বললাম ওকে, কোথায় উঠেছি।

তারপর বললাম, পরশু সকালের ফ্লাইটেই চলে যাব।

বাব্বা! তাজমহল হোটেল।

তারপর অবিশ্বাসের গলাতে বলল, তুম চাট খানেকো লিয়ে নেহি আওগে। খয়ের, হমারা দাওয়াত দেনা ফর্জ থা। আনা, নেহি আনা, তুমহারি মর্জি।

সেইদিনই সন্ধের পরে জগদীশকে অবাক করে দিয়ে ওর চাট-এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সামোসা খেয়েছিলাম তেঁতুল-গোলা দিয়ে। তবে সামোসার স্বাদ অন্যরকম লেগেছিল। সেই কলেজ ক্যান্টিনের সামোসাতে যে শুধু আলু আর লংকাই ছিল না। আমাদের দুর্দম, উথাল-পাতাল প্রথম যৌবনও যে মাখামাখি হয়েছিল সেইসব সামোসার মশলার মধ্যে।

জগদীশ কিছুতেই পয়সা নিল না। বলল, "অজীব আদমি হ্যায় ভাই তু! কিতনা আদমি কালিজমে পড়তা থা। কওন মুঝে ইয়াদ রাখখা? বেগড়-পড়ে লিখে সামোসাওয়ালাকো কওন পুছতা থা আংরেজ লোঁগোকা কালিজমে? তুম বহতই ইজ্জৎ দিয়া মুঝকো। খুদা কি সলামৎ রহে তুঝপর।"

আমার চোখ জলে ভরে এসেছিল।

জগদীশ গরিবের ছেলে। তাই পাঞ্জাব থেকে উদ্বাস্তু হয়ে-আসা পরিবারের একজন হয়ে, বাঁচার লড়াই করার জন্য সুদূর কলকাতাতে এসে সামোসা আর চা বিক্রির ঠিকা নিয়েছিল কলেজে। তা বলে, তার বুদ্ধি কিছু কম ছিল না। পড়াশুনার সুযোগ পেলে আমিই হয়তো তার অধীনে কাজ করতাম। জীবনে কে ভাগ্যবান হয়ে জন্মায় আর কে অভাগা, সেটা বড়ো কথা নয়। কে জীবনে নিজে কী করে গেল, সেইটাই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। লোক-ঠকানো, ভোটার-পাকড়ানো, মেকি সোসালিজম নয়, যেদিন প্রকৃত সোসালিজম আসবে এদেশে, যদি আসে কোনওদিন; যেদিন প্রত্যেকে সমান সুযোগ পাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার; সেদিন জগদীশ আর আমাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকবে না। "deijure" নয়, "detacto", সোসালিজম। আশ্চর্য! এমন সোসালিজম অনেক "ধনতান্ত্রিক" দেশেই আছে। নিজচোখেই দেখে এসেছি।

জগদীশকে পরদিন তাজমহল হোটেলে ডেকেছিলাম সপরিবারে। ও অভিভূত হয়ে গেছিল। বলেছিল, বাহরসে দেখা। বড়া শানদার হোটেল হ্যায়। মগর অন্দরমে কভভি ঘুষা নেহি। নিকালতো নেহি না দেগা, ফাটা কাপড়ে পিনা-হুয়া আদমিকো?

বললাম, তুম মেরা মেহমান হ্যায়। বড়া ইজ্জত মিলেগি তুমহারা। বিবি, বাচ্চা সবহি কো লেকে আনা।

ঔর মাতাজি? উনকি কাঁহা ছোড়কর আউংগা?

সরি জগদীশ। উনকিভি জরুরই লেতে আনা। মুঝে মাপ কর দেনা।

লজ্জিত হয়ে আমি বলেছিলাম।

বলেছিল, গদগদ হয়ে জগদীশ যে, নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু আসতে পারেনি। ওর মায়েরই খুব জ্বর এসেছিল রাতে। আর মাকে একা বাড়িতে ফেলে আসতে রাজি হয়নি ও। ফোন করে জানিয়েছিল যে, আসতে পারছে না।

মাসখানেক পরে আবার গেছিলাম দিল্লি। ওর দোকানেও গেছিলাম আবারও নেমন্তন্ন করতে। কিন্তু দেখলাম, দোকানই উঠে গেছে।

কাছেরই এক দোকানি বলল, ওর মাতাজির ডেথ হয়ে গেছে দিন পনেরো আগে। ওর শ্বশুরের সামান্য জমিজমা আছে নাকি রাজস্থানের আলোয়ারে। সেখানেই চলে গেছে ও। ওর শাশুড়িও মারা গেছেন স্বল্পদিন আগে। এখন শ্বশুরকে দেখার ওরা ছাড়া আর কেউই নেই।

জানি না, সেই দোকানি সঠিক জানে কি না। তাই অবিশ্বাসী গলাতে বললাম, কাশ্মীরী গেটের কাছের এমন জমজমাট ব্যবসা ছেড়ে চলে গেল। বেশ তো ভালোই কামাই ছিল এখানে।

সো থা। মগর ডিউটি তো পহিলে করনা না!

দোকানি বলল।

জগদীশের ছেলেমেয়ে কী করে?

সো নেহি জানতা। মগর ইক লেড়কা জে. এন. ইউ. মে ইকনমিক্স লেকর পড়তা হ্যায়। বি এ মে ফার্স্টক্লাস মিলা থা। বড়া তেজ নিকলা উ লড়কা। সবহি উপরওয়ালোকি দোয়া।

বাঃ!

আমি বললাম।

গরিব জগদীশের মতো বা তার তনয়েরই মতো বহু বড়োলোকের ছেলেও অনেক কষ্ট করে, যাদের নিজেদের আত্মসম্মানবোধ আছে, "একটু দাগ" রেখে যাওয়ার জেদ আছে জীবনে কিন্তু সেই কষ্টটা অনেকের চোখেই পড়ে না। তাছাড়া, বাইরের লোকের পক্ষে আদৌ বোঝা সম্ভব নয় যে, কে কতটা কষ্ট করছে। বিশেষ করে বহিরঙ্গে যদি কষ্টর করার চিহ্ন স্পষ্ট বা সহজগোচর হয় না।

বাবা অফিস থেকে ফিরে ডেকে পাঠালেন একদিন।

তখন কলেজ খুলে গেছে গরমের ছুটির পর। তেসরা শ্রাবণ। রোজ সন্ধেবেলা একটি করে কবিতা লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি। সেই অপকর্মের কথা বাবা জানতে পেলেন কি না কে জানে। কেন ডাক?

বাবা ডেকে পাঠালেই বুক দুরদুর করত। হয় কোনও কারণে বকতেন, নয় কোনও উপহার দিতেন। ডায়েরি, কলম, ইত্যাদি। অথবা কোথাও শিকারে যাওয়ার কথা বলতেন।

বাবা বললেন, কুমির শিকারে যাবি?

লাফিয়ে উঠলাম আমি।

বললাম, কোথায়?

জিঞ্জিরাম-এ।

সেটা কোথায়?

সেটা একটা নদী। মানে, নদ। গারো পাহড়ের পায়ের কাছ দিয়ে বয়ে গেছে। গভীর খুব। সেখানে বর্ষাকালেই কুমিরদের মোচ্ছব।

যাব।

ক্লাস কামাই করে?

কী আর বলব। বাবা তো জানতেনই যে কলেজ খুলে গেছে। তাই চুপ করেই থাকলাম।

মা বললেন, তুমিই ওকে নষ্ট করার গোড়া।

বাবা বললেন, আগায় নষ্ট হবার চেয়ে গোড়ায় নষ্ট হওয়া ভালো।

বলা হয়নি, এপ্রিল মাসে, চৈত্র শেষে কোডারমাতে আবারও গেছিলাম।

বাবার সঙ্গে, প্রতি বছরই, ফিনান্সিয়াল ইয়ার-এন্ডিংয়ের পরেই জঙ্গলে গিয়ে গিয়ে আজও সেই নেশা অটুট আছে। চৈত্র শেষে প্রতি বছরই আজও জঙ্গলে যাই। যদিও বন্দুক রাইফেলের গুলি ছুড়িনি গত বাইশ বছর, শিকার 'মানা' হয়ে যাবার পরে। তবে পিস্তলটা সঙ্গে নিই। তাও সব সময়ে নয়। রাতে বালিশের নীচে রেখে ঘুমোই।

কৈশোর বয়স থেকে অভ্যেস, কোনও না কোনও আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া, তাই খালি হাতে ইনসিকিওর লাগে। তবে জংলি জানোয়াবেব ভয়ে নিয়ে যাই না। জানোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ যে জানোয়ার, প্রয়োজনে সেই মানুষদেরই মোকাবিলা করার জন্যে নিয়ে যাই।

চৈত্র-শেষে আমাদের সুন্দর ভারতেব প্রতি বাজ্যের বনে বনেই যে সৌন্দর্য, নানা বিচিত্র রঙের দাঙ্গা, মন্থর, উদাসী হাওয়াতে মহুয়া, করৌঞ্জ, শালফুলের আর জংলি আমের মুকুল আব কাঁঠালের মুচির যে গন্ধ তার তো কোনও তুলনা নেই!

পবে স্টেটস, কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং জাপানেও "FALL"-এর সময়ে বহুবার গেছি। সেখানেও "কনিফেরাস" জঙ্গলে মেপল, জুনিপার, সেডার, বার্চ, চেস্টনাট, ওক, স্প্রুস ইত্যাদি হাজারো গাছের রঙিন সাজ মোহিত অবশ্যই করে কিন্তু আমাদের ভারতের পর্ণমোচী বন-জঙ্গলের মতো রূপ, রস, বর্ণ, শব্দ, গন্ধ,—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির মহোৎসব পৃথিবীর আর কোথাওই আছে বলে তো আমি জানি না। গেছি আফ্রিকাতেও। সেখানেও। সেখানেও জীবজন্তু, পাখি-প্রজাপতি আছে কিন্তু আমাদের দেশ, আমাদেরই দেশ! শুধু নেতা নামক জীব-জন্তুরা যদি একটু উচ্চস্তরের হত তবে এই দেশ নিয়ে কী না করতে পাবতাম আমরা! দেশের জনসংখ্যা, যা সবচেয়ে বড়ো বাধা সবরকম উন্নতির পথেই; সেই বাধাই অপসারণ করার চেষ্টা আজ অবধি তেমন করে কেউই করল না। এই ভোট-ভিখারিরাই এমন একটি রানির দেশকে ভিখারিনির দেশে পর্যবসিত করে দিল। এত বিচিত্র মাংসাশী ও তৃণভোজী জীব খুব বেশি দেশে তো নেই!

পণ্ডিত আঁতেলরা 'ইন্টারন্যাশনালিজম'-এর সাধনা করেন। অশিক্ষিত গোঁড়া মানুষ, দেশকে ভালোবেসেই খুশি থাকি। স্বদেশের প্রতি যাঁদের মমত্ব নেই, যাঁরা স্বদেশের মানুষকে, স্বদেশি ভাষাকেই ভালো করে জানলেন না তাঁদের মুখে আন্তর্জাতিকতার বুলি বেমানান কি না, সেকথা গুণিজনেরাই বিচার করবেন।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন জ্যামেয়ার কোম্পানির ডাকোটা প্লেনের সার্ভিস ছিল। ধুবড়ি এবং শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি যেতেও সেই কোম্পানির সাহায্য নিতে হত। 'ডাকোটা' প্লেন আজকালকার কম মানুষই দেখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে এই আমেরিকান প্লেনটির খুবই ব্যবহার ছিল পৃথিবীর সর্বত্র। একাধিক পাইলট বন্ধুর মুখে শুনেছি যে, অমন "WEATHER WORTHY" প্লেন নাকি পৃথিবীতেই কম ছিল।

যুদ্ধের সময়ে আমেরিকানরা "রূপসী" নামক একটি জায়গাতে মিলিটারি এয়ার স্ট্রিপ বানিয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার অনেকদিন পরেও সেই এয়ারপোর্টের টারম্যাক অক্ষত ছিল কোনওরকম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতিরেকেই। কিন্তু তার চারপাশে এবং মধ্যে মধ্যে নিবিড় ল্যানটারার (বিহারে যাকে 'পুটুস' বলে) জঙ্গল গজিয়ে গেছিল। সেখানে ছিল অগণ্য লেপার্ডের বাস। 'রূপসী' ছিল আসামের ধুবড়ির কাছেই।

ধুবড়ি যেতে হলে আমরা উনপঞ্চাশ সন থেকেই ওই ডাকোটা সার্ভিসে গিয়েই রূপসীতে নামতাম। জলপাইগুড়ি যেতে হলেও আমবাড়ি-ফালাকাটাতে। আমবাড়ি-ফালাকাটাতেও ওই রকম এয়ারস্ট্রিপ ছিল। তবে রূপসীর মতো অত বড়ো নয়। সেই প্লেন আবার বিভিন্ন চা বাগানে নামতে নামতেও যেত। গোরু ছাগল চরে বেড়াচ্ছে উদোম মাঠে, তারই মধ্যে ডাকোটা তাদের "হ্যাটা" করতে করতে বা "হ্যাট হ্যাট" করতে করতে নেমে পড়ত। চায়ের পেটি উঠত, চা বাগান থেকে ডাক নামত, প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর লেখা, প্রাবাসী স্বামীর জন্যে। শর্টস আর গেঞ্জি পরা চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বা ম্যানেজারেরা জিপ অথবা গাড়ি নিয়ে কাপড়ের বা খড়ের টুপি মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতেন।

ডাকোটা প্লেনের কথা বলতে বসে মনে হল ভারতের Aviation History-র সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশি। এক সময়ে দিল্লি যেতাম ডাক বয়ে নিয়ে-যাওয়া স্কাইমাস্টার প্লেনে। রাতে ছাড়ত দমদম থেকে। শেষ রাতে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে নামত নাগপুরে। ভোর চারটেতে ব্রেকফাস্ট দিত। "বিনি পয়সায় দাদের মলম পেলেও ছাড়া উচিত নয়", যুদ্ধকালীন এয়ারফোর্স থেকে ফিরে-আসা তামারহাটের মানিককাকুর এই উপদেশ স্মরণ করে ঘুম চোখে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ফেলতাম। ইয়া বড়ো বড়ো কমলালেবু, জোড়া ডিমের পোচ অথবা স্ক্র্যাম্বল অথবা ফ্রাই অথবা ওমলেট অথবা পোচ অথবা ওয়াটার-পোচ নইলে, ফুল-বয়েলড বা হাফ-বয়েলড ডিম। কর্নফ্লেকস বা পরিজ এবং গরম দুধ। তার সঙ্গে টোস্ট ইত্যাদি যা পৃথিবীর প্রায় সকলেই ব্রেকফাস্টে খান। সিরিয়ালও।

নাগপুর থেকে গিয়ে জোর করে নিয়ে সেখানে ডাক নামানো হলে, আবার দিল্লিমুখো। তাও পৌঁছোতে পৌঁছোতে সকাল গড়িয়ে অনেক দূর চলে যেত। দু'ঘন্টার বোয়িং বা এয়ারবাসের কথা কেউ তখন স্বপ্নেও ভাবেনি। রাতের মেইল - প্লেনে ভাড়া কম লাগত।

বিরাট বড়ো বড়ো এঞ্জিন ছিল স্কাইমাস্টারের। তখন ডাকোটা দেখে দেখে চোখ অভ্যস্ত, তাই বড়ো লাগত। তারপর এল ফ্রেঞ্চ ক্যারাভিল।

এই সমস্ত প্লেনই ছিল নন-প্রেসারাইজড, নন-এয়ারকন্ডিশনড। কানে তুলো গোঁজা সত্ত্বেও মনে হতো যন্ত্রণাতে কান ফেটে রক্ত বেরুবে। আর গরমে গরম, ঠান্ডাতে ঠাণ্ডা।

তবে রূপসী থেকে গরমের দিনে যে ডাকোটা আসত তাতে চড়া পৃথিবী পরম অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। প্যাসেঞ্জার বলতে পুংলিঙ্গের আমি, স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে পাঁচজন ঘোর লাল-নীল-সবুজ চুমকি-বসানো শাড়ি পরা বিপুলা মাড়োয়ারি মহিলা। তখনকার মাড়োয়ারি মহিলারা এমন মাধুরী দীক্ষিতের মতো বা রূপা গাঙ্গুলির মতো দেখতে হতেন না। তাঁরা আজকের মতো সফিস্টিকেটেডও হয়ে ওঠেননি তখন। ফটাফট করে ইংরেজিও বলতেন না।

তাঁরা ছাড়াও প্যাসেঞ্জার আরও থাকত। গারো পাহাড় থেকে ধরা হাজারখানেক বুনো ময়না। তাদের লিঙ্গ বিচার করা যেত না। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে তারা খাঁচায় ভরা থাকত। তাছাড়া, তার সঙ্গে গাঁট-গাঁট অতি উৎকৃষ্ট, অসমের বিখ্যাত তামাক পাতা। গ্রীষ্মের কাঁঠাল-পাকা গরমে যখন তামাক পাতার গাঁটরি থেকে বিটকেল গন্ধ ছাড়ত বাঘেদের ঠাকুরদার গায়ের গন্ধকেও ম্লান করে দিয়ে এবং ময়নারা সমস্বরে খাদের "সা" থেকে চড়ার "সা"-তে একসঙ্গে আরোহণ অবরোহণ সহকারে চিৎকার করত এবং সমবেত মহিলাদের বমি যখন সশব্দে এবং সবেগে উৎক্ষিপ্ত হত প্রায় আমার গায়েরই উপর তখন যেন উৎকট দুর্গন্ধের খামতি ঘোচাতেই, বমির দুর্গন্ধ যুক্ত হত তামাক পাতা এবং ময়না পাখিদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে।

আহা! সে কী আনন্দ তখন।

দু' পাশে কাঠের বেঞ্চ পাতা থকত। সেই বেঞ্চে বসে, তামাক পাতার গাঁঠরির পাশ দিয়ে বেঁধে-রাখা মোটা পাটের দড়ি ধরে প্রাণ হাতে করে, যাকে ইংরেজিতে বলে সিটিং "উইথ দ্যা হার্ট ইন ওয়ানস মাউথ", যাত্রীদের বসে থাকতে হত। প্লেন টেক-অফ করার সময়ে যাত্রীদের শরীরগুলি পিছন দিকে চলে যেতে চাইত আবার ল্যান্ডিংয়ের সময়ে ককপিটের দিকে গুঁতোগুতি করতে চাইত।

ওই ডাকোটাই ঝড়-জল, বিদ্যুৎ, কালবৈশাখীর ঘনকালো পরতের পর পরত "কিউমুলাস নিম্বাস" মেঘের স্তম্ভের পর স্তম্ভকে "থোড়াই কেয়ার" করে আমাদের বৈতরণী পার করাত। ডাকোটার পাইলটদের রীতিমতো কুস্তিগির হতে হত। ঝড় বৃষ্টি এবং সঙ্গে বিদ্যুতের সঙ্গে রোদে জলে চাঁদ তঁদের নানা "হরকত" করতে হত।

প্রতিবারই প্লেন মানে-মানে মাটি ছুঁলেই পাইলটসাহেবকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে করত।

ষাটের দশকের গোড়া থেকে আমাকে বছরে একাধিকবার শিলঙে যেতে হত কারণ তখন অসমের কোনও আলাদা বেঞ্চ ছিল না ইনকাম ট্যাক্স আপেলেট ট্রাইব্যুনালের। বম্বের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে কলকাতা থেকে ট্রাইব্যুনালের একটি বেঞ্চ বছরে এক বা একাধিকবার শিলঙে "ক্যাম্প" করে অসমের আপিল শুনতেন। তখন আমাদের বেশ কিছু কেস ছিল অসমের। কলকাতারও কিছু দুর্বল কেস "ফিক্স" করানো যেত শুনানির জন্যে। যে-কেস কলকাতাতে জেতা মুশকিল সেই কেসই শিলঙের মনোরম আবহাওয়াতে এবং মেম্বারেরা সকালের গল্ফ এবং রাতের হুইস্কির কারণে MELLOW হয়ে থাকাতে তাঁদের কাছেই শুনানির সময়ে অন্যরকম শোনাত। ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টিটিভরা "হলিডে মুড"-এই থাকতেন। কাজেই, কেস জেতা অনেকই সহজ হত।

প্রথম নন-প্রেসারাইজড, এয়ার-কন্ডিশনড প্লেন আসে ওই সেক্টরে এবং গুয়াহাটি-ইম্ফল সেক্টরে ষাটের দশকের মাঝামাঝি। ছোটো হলেও চমৎকার প্লেন। ফকার ফ্রেন্ডশিপ।

অ্যাভ্রোও ছোটো প্লেন কিন্তু বম্বে থেকে বাঙ্গালোরের ফ্লাইটে সত্তরের দশকের গোড়াতে একবার মাত্র চড়েছিলাম। দুর্গা নাম জপ করতে করতে বাঙ্গালোরে নেমে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, জীবনে আর ওই প্লেনে চড়ব না। তখনও কিন্তু অ্যাভ্রোর অত বদনাম হয়নি। কেন যে মনে হয়েছিল, বলতে পারব না। কিন্তু সিক্সথ সেন্স বলেছিল যে, এই প্লেন, আনন্দবাজারের গণেশ নাগের ভাষায় বলিলে বলতে হয়, একদিন অবশ্যই "কেলো" করবে।

করেও যে ছিল, তা তো পাঠক আপনাদের জানা-ই!

তার অনেকই পরে বোয়িং এল। ছোটো ও বড়ো। তারপরে এয়ার বাস। থ্রি হান্ড্রেড, থ্রি টোয়েন্টি।

বিদেশে গিয়ে সবচেয়ে ছোটো জেট প্লেনে, না-জেনে চড়েছিলাম তিন বছর আগে।

ওয়াংশিটনের বিশু (বিশ্বজিৎ সেন) আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেই। মানে, ওয়াশিংটনে। ন্যুইয়র্ক, ন্যু জার্সির অত্যন্ত উষ্ণ নেমন্তন্ন রাখতে পারিনি। কিন্তু বিশু, বস্টনে আমি যাঁদের বাড়ি উঠেছিলাম, হীরক আর রীতা সেনগুপ্ত; তাঁদের বাড়িতেই এসে উঠত ওয়াশিংটন থেকে। তাই ওর বিশেষ দাবি ছিল আমার উপরে।

প্রবাসী বাঙালিদের নেমন্তন্নেই বস্টনে গেছিলাম। সেই সম্বন্ধে ছোট্ট করে অলোলিকা মুখোপাধ্যায় সাপ্তাহিক বর্তমানে লিখেওছিলেন। অন্য কোনও কাগজে এক লাইনও বেরোয়নি।

"ছোট্ট" করে লিখেছিলেন আমি "ছোট্ট" সাহিত্যিক বলে। "বড়ো" সাহিত্যিক হলে অথবা বড়ো কাগজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, অনেককে অনেককিছু পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে, পাতার পর পাতা রঙিন ছবি-টবি দিয়ে শুধু 'বর্তমান'-এই নয় সব বড়ো কাগজে ও পত্রিকাতেও অবশ্যই "রাইট-আপ" বেরোত। উনিই লিখতেন।

বস্টন থেকে টরেন্টোতেও যেতে হয়েছিল আমার পিসতুতো ভাই সাগরের পীড়াপীড়িতে। শেষ গেছিলাম, টরেন্টোতে; চুয়াত্তরে। ওই সব বেপাড়াতে গেলে টরেন্টো না গিয়ে আমার কোনও উপায়ই ছিল না কোনওবারই। তাই ওর অনুরোধ রেখে গেছিলাম বিরানব্বইতেও।

বিশুর দেওয়া টিকিটে যখন টরেন্টো থেকে ওয়াশিংটনে রওনা হই, চেক-ইন করার সময়ে কাউন্টারের ছেলেটি বলল, "এনি সিট প্রেফারেন্স স্যার?"

বললাম, 'ওয়ান এ'।

ছেলেটি যেন একটু মিচকি হেসে বলল, ইয়েসে স্যার। হিয়ার উ্য আর।

কিন্তু ফ্লাইট অ্যানাউন্সড হবার পরে প্লেন দেখেই তো চক্ষুস্থির হয়ে গেল। জনা ছয়েক মানুষ

তাতে ধরে। হ্যান্ড ব্যাগ রাখারও জায়গা নেই। কো-পাইলট নিজেই হ্যান্ড-ব্যাগটাগগুলো নিয়ে পেছনে ডাম্প করে দিল।

"স্টুয়ার্ডেস নেই, ল্যাভেটরিও নেই। অমন ইন্টারন্যাশানল ফ্লাইটে জীবনে চড়িনি। সিট।

"ওয়ান এ" সিটটিও প্লেনের সবচেয়ে খারাপ সিট। "রো ওয়ান-এ" শুধু একটিই সিট। নাকের সামনে ককপিট। জানালা নেই। তাও যতক্ষণ টেক-অফ করেনি, প্যানেলের নানারঙা ডিজিটাল বোর্ডগুলো দেখে একঘেয়েমিটা কাটছিল। কো-পাইলট নিজে উঠে, বেঁটে-সিঁড়িটা ভিতরে তুলে নিয়েই টেক-অফ করার আগে নাকের সামনে দড়াম করে কাঠের দরজা বন্ধ করে ককপিটের আলোর ছটাও ঢেকে দিল।

তারপরই বলল, রিড-দ্যা সেফটি রুলস প্লিজ।

এমন রসিকতা জীবনে কেউ করেনি। ওই প্লেনেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাব? থুড়ি, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে! প্লেন যদি গোঁত্তা মেরে নীচের অন্ধকারে কোথাও পড়ত তাহলে পড়ার আগেই ঘেন্নাতেই মরে যেতাম।

মৃত্যুর নানা রকম হয়। বেবি-অস্টিনে চাপা পড়ে মরার মতো মৃত্যু? ছিঃ! ওয়াশিংটনে "ইন ওয়ান পিস" পৌঁছোবার পরে অবশ্য বিশু, তস্য স্ত্রী রত্না; পল্টন এবং মিতালিদের আদর যত্নে সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি উবে গেছিল।

ওয়াশিংটনে উঠেছিলাম অশোক এবং গোপা মোতায়েদদের বাড়িতে, ডার্নসটাউনে। সেই স্মৃতি, হীরক-রীতাদের বাড়ির স্মৃতির মতোই অমলিন থাকবে। যতদিন বাঁচি।

ছোটো প্লেনে আরও একবার চড়েছিলাম সেসেলস আইল্যান্ডসে। সেই প্লেনগুলি অবশ্য জেট-প্লেন নয়। আফ্রিকা থেকে ফেরার সময়ে সেসেলস আইল্যান্ডসে Seychelles! ফ্রেঞ্চে উচ্চারণ, সেসেলস। ছিলাম ক'দিন।

পৃথিবীর ম্যাপে, খুঁজে পাবেন পাঠক অবশ্যই ওই দেশকে। তবে খুবই কষ্ট করতে হবে।

মরিশাস ও জাঞ্জিবারের কাছে সরষে দানার মতো পাঁচটি দানা দেখতে পাবেন ভারত মহাসমুদ্রের মধ্যে। না দেখতে পাওয়াই অবশ্য অস্বাভাবিক। কারণ সেই দ্বীপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যে দ্বীপ, যে দ্বীপে দেশের রাজধানী, নাম "মাহে", তা পাঁচ মাইল লম্বা এবং দু'মাইল চওড়া। অতএব পৃথিবীর ম্যাপে খুঁজে পাওয়া একটু মুশকিল!

সেসেলসে 'আইল্যান্ডার' প্লেনের একটি ফ্লিট আছে। মোনো-এঞ্জিনের প্লেন। প্রপেলার-ড্রিভন। নারকোল গাছে-ঘেরা খোলা মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে। যতদূর মনে আছে। সেভেন-সিটার। উনআশিতে গেছিলাম, অনেক দিন হয়েও গেছে। ভুলও হতে পারে। স্বদেশে অশ্য ছোটো প্লেন বলতে ডর্নিয়ারে চড়েছি।

তবে টরেন্টো থেকে ওয়াশিংটনে যে প্লেনে এসেছিলাম সেটা জেট-প্লেন অবশ্যই। দ্রুতগামী। প্লেনের নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না এখন।

অসমের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ি শহরে তখন, মানে উনিশশো বাহান্নতে বলতে গেলে, একটিই ভালো হোটেল ছিল। "ভালো" মানে, আজকালকার বিশ্বব্যাপী ট্যুরিজম আর হোটেলিয়ারিঙের দিনে সেই হোটেল হয়তো হোটেল বলেই গণ্য হবে না কিন্তু চুয়াল্লিশ বছর আগে ওই হোটেলই যথেষ্ট ভালো বলে বিবেচিত হত। হোটেলের নাম ছিল 'টাউন হোটেল'। রায় পরিবার তার মালিক ছিলেন। তাঁদের একটি মস্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সও ছিল ধুবড়ি শহরে, নাম ছিল 'টাউন স্টোর্স"। রায় পরিবার বাবার মক্কেল ছিলেন। শচীনবাবু ছিলেন পরিবারের প্রধান।

জিঞ্জিরামে কুমির শিকারের পরিকল্পনাটা ছিল আবু ছাত্তারের।

ধুবড়িতে পৌঁছোবার পরদিন তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নেতাধোপানির ঘাট থেকে বর্ষার দামাল ব্রহ্মপুত্রের বুকে ছোটো একটি ছইওয়ালা নৌকোতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম জিঞ্জিরাম নদীর উদ্দেশে। নদী নয়, নদ। নদ মাত্রই আমার প্রিয়। ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, তিস্তা, তোর্ষা, শোন আরও কত নাম বলব। নদ মাত্রই দুর্দম, ভয়াবহ, প্রলয়ংকরী পুরুষসুলভ।

তাই আমার প্রিয়।

নদীর লিঙ্গ বিচারের লক্ষণ কী? কে বা কারা তা বিচার করেন তা আজও জানা নেই, তবে জানতে ইচ্ছে করে।

আমরা মানে, বাবা, শচীনবাবু, আবু ছাত্তার আর আমি।

দু'জন মাঝিও ছিল। তাদের নাম আজ আর মনে নেই।

ছাত্তারের সঙ্গে এর আগে এবং পরে অনেকই শিকার করেছি ওই অঞ্চলে। আমাকে "লালদা" বলে ডাকত। খুব ভালবাসত আমাকে। তবে রাগীও ছিল আমারই মতো। একই দিনে আত্মীয়দের ইতরামি ও Meanness-এ বিরক্ত হয়ে এগারোজন ভাই-ভাতিজাকে গুলি করে সাবড়ে দিয়েছিল।*

সারা জীবনে অনেকই বাঘ মেরেছে ছাত্তার ওর ম্যান্টন কোম্পানির আঠাশ ইঞ্চি ব্যারেলের বন্দুক দিয়ে, পায়ে হেঁটে। বিষয়-বিবশ মানুষ নামক নিকৃষ্টতম জানোয়ারদের ওই একই বন্দুক দিয়ে মেরে ও বাঘেদের অপমান করেছিল।

ছাত্তারের ফাঁসি হয়ে গেছে প্রায় পঁচিশ বছর হল। গুয়াহাটি হাইকোর্টে আপিল করেও কিছু হয়নি। টাকা-পয়সাও পাঠিয়েছিলাম। লাভ হয়নি কোনও। আইন, চিরদিনই গুলি যে চালায় তাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করে। সব দেশেই, সব পরিবারেই। যারা গুলি চালাবার মতো অবস্থার উদ্ভব করে, সেই খল, কুচক্রী, মিথ্যাচারী, ভণ্ড, নীচ মানুষদের কোনওদিনই কোনও দোষ দেখে না আইন।

পাল তুলে দিয়েছিল মাঝিরা, ব্রহ্মপুত্র পেরুতে গিয়ে প্রায় সলিল-সমাধি হয়ে গেছিল আমাদের।

যাঁরা ভরা-বর্ষার বহ্মপুত্রকে না দেখেছেন তাঁরা ব্যাপারটার ভয়াবহতা ঠিক বুঝতে পারবেন না। এখনও মনে করলে, ভয়ে বুক কাঁপে। তিস্তাও তথৈবচ।

ওইরকম আরেকবার হয়েছিল সুন্দরবনে, বাগচিবাবুর ছোট্ট, ব্যক্তিগত, মোটর বোট 'লীলা'-তে চড়ে, ডি এফ ও-র আমন্ত্রণ "চামটার" মানুষখেকো বাঘ মারতে গিয়ে। এসব কথাই সবিস্তারে বলেছি 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'র প্রথম খণ্ডে। তাই এখানে আর পুনরাবৃত্তি করব না।**

সেই ভরা-শ্রাবণের ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে শালমাড়া হয়ে গারো পাহাড়ের কোলের জিঞ্জিরাম নদীতে তিন রাত বাসের অভিজ্ঞতা, গারো ও রাভাদের নদীপারের ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের কথা, মানুষখেকো কুমিরের আতঙ্কে আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসীদের কথা, নানারকম কুমিরদের মোচ্ছব-লাগা জিঞ্জিরামের "দহ"-র কথা, ভাঙনি মাছের স্বাদু ঝোলের কথা; আর প্রায় অবিরাম বৃষ্টির কথা স্মৃতিতে গেঁথে গেছে।

সেই জলজ, শ্রাবণী, সুগন্ধি, মৃত্যুগন্ধময় দিন কটি বাবা, শচীনবাবু এবং ছাত্তারের সঙ্গে কাটানোর কথা চিরদিন মনে থাকবে।

গারো পাহাড়শ্রেণির দিকে, নদীর পারে এক রকমের গাছে ফিকে-বেগুনি ফুল ফুটে থাকত। সেই ফুলগুলি ঝরে পড়ত পাহাড় থেকে জলের উপর দিয়ে বয়ে-আসা, জোলো, শিরশিরানি-তোলা হাওয়াতে। সেই হাওয়াটাও যেন এখনও গায়ে লাগে মাঝেমাঝে।

কুমিরের সঙ্গে দেখা হয়নি যদিও কিন্তু সর্বত্র কুমিরের চিহ্ন ভরা স্মৃতি বড়োই স্পষ্ট মনে আছে।

গারো পাহাড়শ্রেণির রাজধানী "তুরা"। সেখানেও গেছিলাম বাবার সঙ্গে পরের বছরে। সেকথাও পরেই বলা যাবে।

এবারে আবার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফিরে যাওয়া যাক।

হরনন্দন ট্যান্ডনও ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর দীনেশ চানচানি। ট্যান্ডন আর দীনু ভাই-এর সঙ্গে কলেজ ছাড়ার পরেও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল অনেকদিন। দীনুর সঙ্গে আজও আছে। আমরা একই সঙ্গে বি কম তো বটেই, সি এ-ও পড়েছি এবং পাস করেছি।

* জঙ্গল মহল—প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং

** বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে (প্রথম পর্ব)—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

ট্যান্ডন স্টেটসে চলে যায়। মাঝে একবার এসেছিল। দেখাও করেছিল। তারপর আর যোগযোগ নেই। ট্যান্ডনের দেশ এটাওয়া ছিল বেহড়ের জায়গা। বম্বে মেল থেকে এটাওয়া স্টেশনের পূর্বাপর যা প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ে তা থেকেই বলছি। এটাওয়াতে কোনওদিনও যাইনি।

দীনু ছিল ছটফটে স্বভাবের। বম্বের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মেয়ে জ্যোতির সঙ্গে তার প্রেম হয়েছিল পরে, যখন আমরা সি এ পড়ি। ওদের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে ওর এয়ার-কন্ডিশান বেডরুমে "স্পাইসার পেগলার", "পিকলস", এবং লানডান-এর "ফুকলিঞ্চ ইনস্টিট্যুটের" অ্যাকাউন্ট্যান্সি জার্নালের আদ্যশ্রাদ্ধ করতাম আমরা দুজনে ওর বিছানার ওপর বসে। পড়াশোনার চেয়ে গল্পই হত বেশি, আর ও বম্বেতে জ্যোতির সঙ্গে কথা বলত টেলিফোনে এক এক খেপে আধঘণ্টা করে।

দীনুর বাবা ছিলেন খুবই বড়োলোক এবং দীনু ছিল বাবার একমাত্র ছেলে। অথচ একটি ফিয়াট গাড়িতে চড়ত দীনু এবং হিন্দুস্থান পার্কে আজীবন ভাড়াবাড়িতে রয়ে গেল দু-পুরুষ। কোনও চালিয়াতি ছিল না এবং আজও নেই ওব। শখের মধ্যে স্কচ হুইস্কি এবং গল্ফ খেলা। Keen Golfer ও। কাজে, যে শহরেই থাক না কেন, গল্ফ ও খেলবেই।

আমরা ফার্স্ট ইয়ারে থাকাকালীন বিয়ে হল বন্ধু বিজয় সোয়াইকার। সোয়াইকা অয়েল মিলসের। টালিগঞ্জে ওদের বাড়িতে বউভাত খেতে গেলাম আমরা। সিনেমার শ্যুটিং-এর মতো আলো জ্বেলে এইট মি মি মুভি ক্যামেরাতে আমাদের সকলের ছবি তোলা হল। তখন ভিডিও-র জন্ম হয়নি।

পরের বছর বিয়ে হল ভিনয় নিভাটিয়ার। ওর বিয়ে হল ট্রাম কোম্পানির ও আরও অনেক ব্যবসার মালিক আনন্দীলাল পোদ্দারের মেয়ের সঙ্গে। তখনও মাড়োয়ারিরা দক্ষিণ কলকাতা এবং আলিপুরের দখল নেননি। তাঁরা থাকতেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু এবং তারও পশ্চিমে। নিভাটিয়ার বিয়েতে বরযাত্রীও গেছিলাম, বউভাতেও গেছিলাম মনে আছে।

আরেকজন অবাঙালি বন্ধু ছিল হরি বাজোরিয়া। সোনলি চুলের, সুদর্শন; মিতভাষী। ওদের বাড়ি ছিল রাসবিহারী অ্যাভিন্যু এবং শ্যামাপ্রাসাদ মুখার্জি রোডের মোড়ের (এখন যেখানে মেট্রো রেলের স্টেশন) কাছেই। ছোট্ট বাড়ি কিন্তু বড়িতে লিফট ছিল মনে আছে। ওদের বাড়ি গেলেই নানারকম ঘিয়ে ভাজা নোনতা ও ঘিয়ের মিষ্টি খেতাম। হরি, রুপোলি-রঙা একটি কনভার্টিবল প্যাকার্ড গাড়ি চালিয়ে আসত। ওবা ছিল স্টার পেপার মিলসের মালিক।

এত হাসি, এত মজা, এত উল্লাসের মধ্যে ফার্স্ট ইয়াবের দিনগুলি হাউইয়ের মতো বিচিত্রবর্ণে এবং বিভিন্ন মুখে উৎসারিত হয়ে উঠেছিল যদিও তবু তারই মধ্যে, আলোর মধ্যে ছায়ার মতো, গানের মধ্যে স্তব্ধ যতির মতো। দুই স্বরের মধ্যে অশ্রুত কিন্তু সত্য শ্রুতিরই মতো বিষাদও ছিল মাখামাখি হয়ে।

এই বিষাদের কথা বুঝিয়ে বলা যায় না কাউকেই। বললেও, খুব কম মানুষই বোঝেন। এই বিষাদের রং চোখে দেখার নয়, এর স্বর কানে শোনা যায় না অথচ সমস্ত সত্তা এর চকিত চামরের আন্দোলনে নুয়ে পড়ে।

শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ-বিষাদের নাগরদোলাতে চেপেই আমার মন পৌষের হু-হু হাওয়ার নিচুগ্রামের আর্তি-ভরা তেপান্তরের মাঠ, বা টলটলে এবং কানায় কানায় ভরা শরতের পদ্মদিঘির বিল ও সাঁওতাল পরগনার প্রখর গ্রীষ্মদিনের বিশ্বটাঁড় পেরিয়ে এসেছে হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে অথচ এই হাসিকান্নার শব্দও অন্যে শুনতে পাননি কোনওদিন।

শুধু আমার মা বুঝতে পারতেন। মা বলতেন, কী হয়েছে রে খোকন?

কিছু না তো!

হয়েছে কিছু। আমি তোর পেটে হয়েছি না তুই আমার পেটে? মায়ের কাছে কী করে লুকোবি? কী হয়েছে, আমি জনি।

কী জানো?

আমারও তোর মতোই হত। মাঝে মাঝেই ইচ্ছা করত যে, মরে যাই। আবার পরমুহূর্তেই ইচ্ছা করত যে সূর্যমুখী ফুলের মতো আলোর দিকে মুখ করে দারুণভাবে বাঁচি।

আমি বলতাম, ভ্যান গঘের সূর্যমুখীর মতো?

মা বুঝতে না পেরে আমার মুখে চেয়ে থাকতেন।

মা, ভ্যান গঘ-এর ছবি দেখেননি। মায়ের মনের মধ্যে সূর্যমুখী ফুল তো ছিলই! যে ফুল, ভ্যান গঘকে তাঁর "সূর্যমুখী" আঁকতে প্রেরণা দিয়েছিল।

আমি ওই রকমই ছিলাম। আজও রকমই আছি। দু'মাস সুখী থাকি, আবার পরের পক্ষে বা মাসে ভীষণই দুখী। তখন কেবলই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে যায। মনে হয়, কী লাভ? লাভ কী বেঁচে থেকে?

রবীন্দ্রনাথ যে বয়সে "কিছুই তো হল না, সেই সব সেই সব, সেই অশ্রু হাহাকার রব" লিখেছিলেন, লিখেছিলেন, "কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই"—আমারও তখন সেই বকম বযস।

ব্যাপারটা বয়সের নয়, মানসিকতাব। কেউ কেউ অমন মন নিয়েই জন্মান। আব যাঁরা জন্মান, তাঁরাই জানেন তাঁদের সুখ অথবা দুঃখেব গভীবতা, পৃথিবীব এত আলো, এত গান, এত ভালবাসা, পাখি, প্রজাপতি, নীলাকাশ, অর্থ, যশ, স্তুতি, প্রেম, নারীব হৃদয় ও শরীরের অর্ঘ্যের সম্মানসিঞ্চিত পরিপূর্ণ ডালি কিছুই খুশি করতে পারে না সেই আশ্চর্য স্বভাবের মানুষদের। তাঁদের সব আনন্দর মধ্যে দুঃখ গুঁড়ি মেরে বসে থাকে, বনজ্যোৎস্নার বুকের কোরকেব ঝুপড়ি ছায়াতে চিতাবাঘ যেমন করে বসে থাকে। আর দুঃখের মধ্যে আনন্দ, চকিতে 'প্রক্সি' দিয়ে যায় এসে, ঘন কালো কিউমুলাস নিম্বাস মেঘপুঞ্জের মধ্যে যেমন এক মুহূর্তের জন্যে ঝলকে ওঠে অশনি-সংকেত।

তবে আমার জীবনে এই আনন্দ সংকেত বড়ো স্বপ্লস্থায়ী।

এই বিষাদকে দীপক বলত, "বেদনা বিলাস।" কিন্তু আমিই জানি যে এই বেদনা কোনও বিলাস নয়। এ বেদনাও নয।

বিষাদ গভীর। বিশ্ববিষাদ। জার্মান ভাষায় যাকে বলে "WELTSMERZ '। আত্মহত্যার তীব্র ইচ্ছা। এ আদৌ কোনও "ROMANTIC AGONY" নয়। কবি নরেশ গুহ, কবি অমিয় চক্রবর্তীও রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র প্রসঙ্গে এই ব্যাপারটির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাতে বেশ কিছুদিন আগে।

আমার 'অবরোহী'* পত্রোপন্যাসেও এই বিষয়ে আলোচনা করেছি।

জানি না, সম্ভবত এই এক ধরনের শূন্যতা। স্প্যানিশ ভাষায় যাকে বলে 'NADA'। এই 'NADA' শব্দটি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের খুব প্রিয় ছিল। উনি অবশ্য 'NADA'É-র বিশেষ এক অর্থ করেছিলেন। উনি বলতেন ওঁর নিজস্ব সংজ্ঞায়, "Coveted nothingness"। এই ব্যাপারটি আমাকে এতই নাড়া দিয়েছিল, মানে এই ব্যাখ্যাটি যে আমার একাধিক লেখাতে এর পুনরাবৃত্তি করেছে। একঘেয়ে লাগতে পারে তাঁদের কাছে, যাঁরা আমার সব লেখা পড়েন।

পাঠক! নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

যখনই আমার ওইরকম 'SPELL'-এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তখনই পাগল পাগল লাগত। এবং লাগে। এখনও লাগে।

জীবনের পথে এগিয়ে এসে, জীবনে অনেক দূর হেঁটে এসে এই বিষাদ থেকে সাময়িক মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছিলাম। লক্ষ করেছিলাম যে, তখন যে-কোনও সৃষ্টিমূলক কাজে ডুবে যাওয়াই

* অবরোহী—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

একমাত্র পথ। ডুবে গেলেই ওই বিষাদ ধীরে ধীরে আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে যায়। "সৃষ্টিমূলক কাজ" বলতে কবিতা বা গদ্য লেখা, ছবি আঁকা, গান গাওয়া ইত্যাদি। কোনও নারী-শরীরে অবগাহন স্নানও এই বিষাদকে দূরীভূত তো বটেই, তাকে আনন্দেও পরিণত করে।

শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত ওয়াঝালকারের গলাতে যাঁরা "পরিপূর্ণাম আনন্দম" গানটি কখনও শুনেছেন তাঁরাই এই আনন্দর স্বরূপকে সার্বিক উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রস্ফুটিত তীব্র কামনায় কম্পিত কিন্তু নগ্ন নারী-শরীরের পূর্ণ, প্রসন্ন, অনাবিল বন্দনাতে আর ঈশ্বর-বন্দনাতে একই রোমাঞ্চ একই পুলক। দুই-ই সমান উচ্চতার সাধনা। এসে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হওয়ার সাধনা।

একজন পুরুষেরই মতো, যে-কোনো নারীর বেলাতেও এই কথা অবশ্যই খাটে।

আমাদের প্রজন্মর শতকরা নিরানব্বুইভাগ মানুষই সেক্স-স্টার্ভড। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ আমরা করিনি। করবার উপায়ও ছিল না। এত সংস্কার, এত বাধা, এত দড়াদড়ি, বাঁধাবাঁধি, এত মনরাখা; এত লোকভয়! আমাদের সময়ের আর কতটুকুই বা বাকি আছে! আমাদের পরের পরের পরের প্রজন্মেরা যেন নিজেদের খুশি মতো বাঁচে, অন্যকে দুঃখী না করে; এই প্রার্থনা।

জীবন যদি একটিমাত্রই জীবন হয় তবে পরজন্মের ভরসাও আমাদের আর নেই। বলতে হবে, আমরা নিতান্তই অভাগা!

ফাদার স্কেফার্স আমাদের ফ্রেঞ্চের ক্লাস নিতেন। ফ্রেঞ্চ ক্লাসে ভরতিও হয়েছিলাম। কিন্তু তখন সাহেবদের মুখের ইংরেজিই ভালো করে বুঝি না। My hand were very much full। তার উপরে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতোই দাঁড়িয়েছিল ফ্রেঞ্চ।

ফাদার স্কেফার্স আমাদের যখন ক্লাস নিতেন তখন আমি ক্লাস রুমের গরাদহীন মস্ত জানালা দিয়ে বাইরের রোদে, পাশের জিয়োলজিকাল সার্ভের দালানের দেওয়ালে গজিয়ে-ওঠা অশ্বত্থ গাছের প্রবল প্রাণশক্তির প্রতিভূ, হাওয়ায় দোলা-লাগা ক্লোরোফিল-উজ্জ্বল সবুজ পাতাগুলির দিকে চেয়ে থাকতাম। হঠাৎই সমস্বরে হাসির শব্দ শুনে একদিন বাইরে থেকে ভিতরে চোখকে ফিরিয়েই চমকে চেয়ে দেখলাম যে, ফাদার আমাকে নিয়েই ঠাট্টা করছেন। বলছেন, "লা গার্সোঁ আ দ্যঁ লা লুনে"।

অর্থাৎ, ছেলেটা চাঁদে চলে গেছে।

এবং ক্লাসশুদ্ধ সকলেই ফাদারের চামচেগিরি করে সোৎসাহে তাঁকে সাপোর্ট করছে।

মনে মনে বলতাম, হতভাগারা! তোরা তো ফ্রেঞ্চ শিখেও যেতে পারবি না চাঁদে। আর দ্যাখ, আমি কেমন ভাদ্রর রোদদুরে ভেসে চাঁদে-পৌঁছে গেলাম। চাঁদে পৌঁছোনোটাই বড়ো কথা।

ছেড়েই দিলাম ফ্রেঞ্চ। ফাদার স্কেফার্স অনেক করে মানা করেছিলেন। পরে ফ্রান্সে এবং ইউরোপের অন্যত্র এবং কানাডাতে গিয়ে বুঝেছিলাম যে, ফ্রেঞ্চটা শিখলে ভালো করতাম। কন্টিনেন্টে ফ্রেঞ্চ জার্মান অথবা স্প্যানিশ না জানলে বড়োই বিপদে পড়তে হত। অন্তত আগে। তবে এখন অ্যামেরিকানদের দৌলতে ইংরেজি অথবা "অ্যামেরিকান ইংরেজি" সর্বরোগহর অথবা সর্বরোগবহ ভাষা হয়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পৌঁছে গেছে।

ফেঞ্চ অতি কাব্যিক ভাষা সন্দেহ নেই। কিন্তু জার্মান ও স্প্যানিশে বেশ একটা Kick আছে। জার্মান ভাষাটা শুনতে বেরসিক শোনায়, কিন্তু রত্নগর্ভা ভাষা। ডিনামাইটের মতো বিস্ফোরকও বটে। স্প্যানিশ কিন্তু ভাষা হিসেবে মিষ্টিও। UNLUCKY বা ভাগ্যহীনকে যদি NEFASTA বলা যায় তবে ভালো শোনায় না?

NOVIZAGO মানে ENGAGEMENT FAACASO মানে FAILURE. NONO মানে SILLY. NENE মানে শিশু।

চমৎকার না? আমার তো খুবই ভালো লাগে। দারুণ মিষ্টত্ব আছে ওই ভাষাতে। ইটালিয়ান ভাষাও মিষ্টি লাগে আমার কানে।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি যে, আমার ওইসব বিষাদঘন সময়ে কল্পনাশক্তি প্রচণ্ড তীব্র হয়ে ওঠে। চেয়ারে বসে, জানালার পাশের বোগেনভিলিয়া লতার দিকে চেয়েই ব্রাজিলের নিবিড় অরণ্যকে কল্পনা করা যায়। ANGUSTURA BITTERS-এর শিশি অথবা জিন-এর বা ভদকার গ্লাসে তার তারল্যের

ম্লান খয়েরি আভার দিকে চেয়ে অ্যাঙ্গুস্টুরা গাছের কথা ভাবা যায়, ANGUSTURA শহরে এই বিশ্ববিখ্যাত বিটার্স প্রথমে তৈরি হয়েছিল বলেই এর নাম ANGUSTURA!

বিষাদমগ্ন অবস্থাতে কল্পনাতে পিরিনিজ পর্বতমালার যে দিকটা স্পেনে পড়ে সেই দিকের পর্বতে ট্রেকিং করে "আনডোরা'র দিকে এগোচ্ছি, এমন ভাবা যায়। অথবা আফ্রিকার রুয়েনজোরি রেঞ্জে রুপোঝুরি "MOUNTAIN OF THE MOON"-এর সামনে দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্নের পর্বতের দিকে চেয়ে আছি এমনও কল্পনা করা যায়।

তখন আমার কল্পনার আস্তাবলে অগণ্য কল্পনার ঘোড়া সার সার সতত বাঁধা থাকে। আলোর গতির চেয়ে দ্রুতগতি কল্পনার সেই ঘোড়ারা। আলোর গতি তো মোটে সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। নিজের দুটি পায়ে হেঁটে অথবা গাড়িতে অথবা প্লেনে এক জীবনে এই বিপুলা পৃথিবীর কতটুকুই বা দেখতে পারতাম? যাঁরা দেখতে যান ও পান তাঁরাই বা কতটুকু দেখেন? অক্ষিগোলকের মতো চকচকে দুটি বস্তু সব মানুষেরই থাকে কিন্তু দেখার চোখ থাকে ক'জনের? আমারও কি আছে? চোখের দেখা, আর দেখার চোখ; হাতের লেখা আর লেখার হাতে আকাশ-পাতাল তফাত।

ভাগ্যিস বিষাদ ছিল, আত্মহত্যা প্রবণতা ছিল; কল্পনা ছিল, নইলে এই জীবন বড়োই কাটখোট্টা Matter of fact-এর হতো!

শিশুকাল থেকে অনেকই বড়ো কিছুর প্রার্থনা বুকে করে বেঁচে রয়েছি। সে সব পাওয়া হলে ভালো। না হলেও দুঃখ নেই। তুচ্ছ-প্রার্থনার সফল প্রাপ্তির চেয়ে অসফল কিন্তু মহৎ-প্রার্থনা অনেকই শ্রেয়।

জীবনে পাওয়ার মতো পাওয়া এখনও কিছুমাত্রই হয়নি। কিন্তু কৈশোরের দিনে যেমন ছিল আজও চাওয়া তেমনই তীব্র আছে। অজাগতিক প্রাপ্তির প্রার্থনা। কিন্তু যে যৎসামান্য পেয়েছি তার কারণেই জেরবার হয়ে আছি।

এমনই সমাজে আমাদের বাস!

ফার্স্ট ইয়ার থেকেই আমাদের সহপাঠী ছিল প্রণবকুমাব। আমরা বাঁড়ুজ্যেকে ছেঁটে বলতাম "বাঁড়ু"। অত্যন্ত দীর্ঘ প্রণব তার নামের এই হ্রস্বতা মেনে নিয়েছিল বিনা প্রতিবাদে। পড়াশোনোয় ভালো ছিল। মেধাবী বলব না, বলব প্রচণ্ড অধ্যবসায়ী। বি কম-এ ফার্স্ট ক্লাসও পেয়েছিল। ওর মতো ছেলেদেরই এইসব লাইনে আসা উচিত। ওদের জন্যেই বি কম বা অ্যাকাউন্ট্যান্সির উদ্ভব হয়েছিল আমাদের দিনে। Matter of fact ছিল প্রণব টু হান্ড্রেড পারসেন্ট খুব সরল ছেলে ছিল। কোনও ঘোরপ্যাঁচ বুঝত না। তবে একটু স্বার্থপর ছিল। তাতে কোনও দোষ দেখিনি। এই স্বার্থপর ছিল। তাতে কোনও দোষ দেখিনি। এই স্বার্থমগ্ন পৃথিবীতে স্বার্থপর না হলে যে কী বিপুল দুঃখের শরিক হতে হয় তা নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছি। দুঃখ পেয়েছি কিন্তু নিজের বিশ্বাস থেকে সরিনি একচুলও। স্বার্থমগ্ন না-হওয়াই যে প্রকৃত মানুষের কাম্য এই বিশ্বাস শতবাধা সত্ত্বেও আজও বাঁচিয়ে রেখেছি, ঝড়ের রাতের মধ্যে হাতের প্রদীপেরই মতো।

কাব্যরোগাক্রান্ত আদৌ ছিল না প্রণব। দু'নম্বর বাসের হ্যান্ডেল ধরে আমরা কলেজ থেকে ফিরতাম। কখনও অফিস থেকেও।

ও অন্য একটি ফার্মে আর্টিকল্ড-ক্লার্ক ছিল। সেখানে পয়সা-কড়ি প্রায় কিছুই পেত না। এবং ওর অসুবিধের কথা কলেজ থেকে যাওয়া-আসার পথে ও আমাকে প্রায়ই বলত। তাই বাবাকে বলে, ওকে আমি বাবার অফিসে এনেছিলাম।

বাসের ঝাঁকুনির মধ্যে ও বলত, সি এ টা পাস করেই, বুঝলি বি ডি (ও আমাকে বি ডি বলে ডাকত অনেক অবাঙালি বন্ধুদেরই মতো) বিয়েটা করে ফেলব। এবং সপ্তাহে একদিন চাইনিজ খাবই।

এই ছিল বাঁড়ুর জীবনের প্রাথমিক অ্যামবিশান।

তখন অবশ্য কলকাতায় চাইনিজ বলতে পার্ক স্ট্রিটের "পিপিং", চায়না টাউনের "নানকিং" আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও সুতারকিন স্ট্রিটের মোড়ের দোকানটিই ছিল সম্ভবত, ওয়ালডর্ফও হয়নি। গ্র্যান্ডেও সম্ভবত চীনে পাওয়া যেত ন।

প্রণবের বোনেরা লোরেটোতে পড়ত। তারা খুব ভালো মেয়ে ছিল পড়াশোনোতে, অধ্যবসায়ী। ওর পরের বোনের নাম ছিল বন্দনা। ছোটোদের নাম সম্ভবত ছিল আলপনা আর কল্পনা। ওরা প্রত্যেকেই খুবই ভালো মেয়ে ছিল। বিদুষী কিন্তু রাগি রাগি চেহারা ছিল বন্দনার। ওরা ভাই-বোন সকলেই খুব লম্বা ছিল। বন্দনা ইংরেজির ছাত্রী ছিল। শুনেছি, এখন কোনো কলেজের ইংরেজির অধ্যাপিকা সে। বহুবছর ওদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তবে প্রণবের সঙ্গে হঠাৎ কখনও কখনও দেখা হয়ে যায় পথে-ঘাটে।

বন্দনা আমাকে শ্লেষের সঙ্গে একদিন বলেছিল, "তুমি তো বড়লোকের পিয়ানোবাজানো কোনও ইনসিপিড মেয়েকে বিয়ে করবে।"

পিয়ানো বাজালেই কেউ "ইনসিপিড" কেন হবে তা বুঝতে পারিনি সেদিন। কেমন মেয়ে বিয়ে করলে ও সুখী হতো তাও বলেনি।

লেক টেরেসে ছোট্ট একতলা বাড়ি ছিল প্রণবদের। মাসিমাও খুব লম্বা ছিলেন। মেসোমশাইও। মেসোমশাইয়ের বেতের ব্যবসা ছিল। আমাদের সহপাঠী জিম্মি সুতারিয়ার বাবারও ওই একই ব্যবসা ছিল এবং কলকাতার একই মহল্লায়।

মেসোমশাই অত্যন্ত স্বল্পবাক মানুষ ছিলেন। ওঁদের অবস্থা যে অত্যন্ত সচ্ছল ছিল এমন নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি সন্তানকে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স ও লরেটোতে পড়িয়েছিলেন। অত্যন্ত সাদাসিধে পোশাক ছিল ওঁর। চেহারা দেখে মনে হত, আদর্শবানও ছিলেন।

সেন্ট-জেভিয়ার্স এবং লরেটোতে বা লা-মার্টিসে, আজকালকার ডন-বসকো বা মডার্ন হাই-তে পড়লে ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে দড় অবশ্যই হয়, বাবা মাকে ড্যাড্ডি মাম্মি বলে শ্লাঘা বোধও করে অনেকে, কিন্তু প্রত্যেকেই মানুষ যে তৈরি হয়ই এমন কথা জোর করে বলতে পারব না। কেন হয় না, তা পণ্ডিত শিক্ষাবিদেরাই বলতে পারবেন।

জিম্মির বাবা আমার বাবার মক্কেল ছিলেন। জিম্মির চোখেও চঞ্চল ঘোষেরই মতো মাইনাস বারো পাওয়ারের চশমা ছিল। ওই চোখের জন্য বেচারা বিয়েটিয়েও করল না। এখন অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে।

আমাদের চোখদুটি যে ঈশ্বরের কত বড়ো দান তা যাঁদের চোখ নেই এবং যাঁদের চোখ খারাপ শুধুমাত্র তাঁরাই জানেন। নিজের স্বনির্ভর দুটি পায়ে হাঁটতে পারা, দু কানে পাখির ডাক, ঝরাপাতার শব্দ, প্রিয় গান শুনতে পাওয়া, বনের রং, প্রজাপতির ডানা; নাকে বনপথের গন্ধ নিতে পারা এই সব যে কত বড়ো প্রাপ্তি তা আমরা বুঝি না বলেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিরন্তর অভিযোগ করি, হাজারো নশ্বর, অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের না-দেবার জন্যে।

জিম্মির খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল হালিম। এখন যিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার। মহামান্য হালিম সাহেব। হালিমও আমাদের সহপাঠী। তবে যতদূর মনে পড়ে, ইন্টারমিডিয়েটে ও ছিল না। বি কম-এ এসে জয়েন করে অন্য কোনও কলেজ থেকে। যেমন, আমাদের অন্য অনেক বন্ধুই করেছিল।

এখন পেছন ফিরে তাকালে মনে হয়, আমাদের ব্যাচটি, আমার মতো দু-একজন কুলাঙ্গারের কথা বাদ দিলে; রীতিমতো STAR-STUDDED-ই ছিল।

হালিমের চেহারাটি মনে আছে। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল চোখের লম্বা দোহারা চেহারা। কলেজে তার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। যদি জানতাম যে ও একদিন স্পিকার হবে, তবে অবশ্যই ঘনিষ্ঠ হতাম। মুশকিল হল এই যে, "গোকুলে বেড়ে" কে যে কী হবে তা তো কৃষ্ণর. মতো সকলের ক্ষেত্রেই আগে থাকতে জানা যায় না!

আমাদের আরেক বন্ধু ছিল গোপী। সৌমেন্দ্রলাল ব্যানার্জি। এস. এল. ব্যানার্জি। গোপীর বাবা হরিলাল ব্যানার্জি হাওড়ার খুব নামকরা উকিল ছিলেন। ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিস করতেন। খুব বড়ো বড়ো মক্কেল ছিল। হাওড়া চিরদিনই টাকার আড়ত।

গোপী প্রথমে বি কম করার পরে সি এ-ই করতে যায় কিন্তু পরে অ্যাডভোকেটই হয়ে যায়। আমরা দুজনে প্রায় একইসঙ্গে ট্রাইব্যুনালে প্র্যাকটিস আরম্ভ করি। প্রফেশনে যাঁরা সি. এ. এবং

অ্যাডভোকেট ছিলেন সিনিয়র, তাঁরা বলতেন, "পুরোনোদের পুত্রদের মধ্যে ওই ছোঁড়া দুটোই ভালো করছে।"

আইনের ওপরে গোপীর খুব ভালো দখল ছিল। ওরকম রসিক, সদাহাস্যময় সহপাঠী আমাদের খুব বেশি ছিল না। গোপী এখন ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের একজন সিনিয়র মেম্বার। ওর স্ত্রী কিছুদিন আগে কিডনি ফেইলিওরের দরুন অনেক ভুগে চলে গেছেন। এক মেয়ে। তারও বিয়ে হয়ে গেছে। পরম দুঃখের দিনেও গোপীর মুখের হাসির কোনও অভাব লক্ষিত হয়নি। যথার্থ পুরুষ।

আরেক বন্ধু ছিল আমার শ্যামল সিনহা। ছিপছিপে, কালো, মাঝারি উচ্চতার, অত্যন্ত ওয়েল-ম্যানার্ড ছেলে ছিল শ্যামল। মুখে সবসময়েই মিষ্টি হাসি। হাসিটা আরও মিষ্টি দেখাত ওর দুটি গজদন্ত ছিল বলে। শ্যামলের বাবা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সেক্রেটারি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঁর মতো এতো ভালো মার্কস নাকি ইংরেজিতে কেউই পাননি আজ অবধি। এমনই শুনেছিলাম শ্যামলের কাছে। মাস্টারমশাই হরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, ধুতি-পরা, খালি-গায়ে থাকা, হুঁকো-খাওয়া রাজ্যপাল; জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত যে, শিক্ষার সঙ্গে বাহিরের ভড়ংয়ের, ইংরেজি জ্ঞানের সঙ্গে কোট-প্যান্টালুন বা 'জিনস্'-এর কোনো সম্পর্ক নেই, তিনিই তাঁর প্রিয় ছাত্রকে, আই এ এস ও বটেন; তাঁর সেক্রেটারি করে নিয়ে আসেন পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর হওয়ার পরেই।

রাজভবনের উলটোদিকে যে সুন্দর থামওয়ালা দোতলা বাড়িটি আছে, বারান্দাওয়ালা; সেটিই ছিল ওঁর অফিসিয়াল রেসিডেন্স। ইংরেজ গভর্নরের ইংরেজ সেক্রেটারিদের জন্যে বানানো, তাই দারুণ ছিল সেই রেসিডেন্স। সেই বাড়িরই একতলাতে ছিল গভর্নরস গ্যাবাজ। কত যে বিভিন্ন 'মেক'-এর বড়ো বড়ো রকমারি গাড়ি থাকত সেখানে, নাম্বার প্লেটহীন; শুধু অশোকচক্র লাগানো, তা বলার নয়।

শ্যামলের একমাত্র দাদার সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব ছিল। দাদার মাথা-ভর্তি ঝাঁকড়া চুল ছিল। নাম ছিল অশোক (পলি)। তখনই পাইপ খেতেন। শ্যামলের মতো শার্প ছিল না ফিচার্স। আর্টিস্ট ছিলেন দাদা। অথবা পরে হয়েছিলেন আর্টিস্ট।

মেসোমশাই পরে, ল্যান্সডাউন রোডের উপরে, এলগিন রোডের কাছাকাছি একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন একতলাতে। সামনে গাড়ি বারান্দা। পেছনে একটি ঢাকা ও ঘেরা বারান্দা। তারও পেছনে একফালি বাগান। ওই বাড়িতে এখন একটি গানের স্কুল হয়েছে। "সৌরভ"।

মাসিমা-মেসোমশাইকে প্রায়ই পার্টিতে যেতে হত। মাসিমা দিনের বেলাও চুলে "কার্লার" লাগিয়ে রাখতেন। সাজতে-গুজতে ভালোবাসতেন। বাঙালি মহিলাদের মধ্যে ওঁকেই প্রথম দেখি কার্লার লাগাতে।

শ্যামলের মামাও থাকতেন ওদের সঙ্গে। অত্যন্ত বুদ্ধি চেহারা, তীক্ষ্ণ নাসা মেধাবী। বিদেশ থেকে অনেক ডিগ্রি এনেছিলেন এঞ্জিনিয়ারিং-এ। শ্রী এম কে মিত্র। পরবর্তী জীবনে মামার সঙ্গে প্রায়ই বিভিন্ন এয়ারপোর্টে দেখা হতো। একটি সুইডিশ পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিনারির কারবারি কোম্পানির উনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। সুইডিশ ভাষাতে ম্যানুফাকচারিং কোম্পানিকে বলত, "মেকানিস্কা আকটিবোলাগেট"। মামার কাছ থেকেই শুনেছিলাম।

সেই কোম্পানির তিনি এখন চেয়ারম্যান এমিরিটাস। মামার সঙ্গে এখনও বিভিন্ন এয়ারপোর্টে দেখা হয়। মামা ইংরেজি তো বটেই, খুব ভালো বলতে পারেন নর্ডিক কান্ট্রিজ-এর সমস্ত ভাষাই। চেইন-স্মোকার। শ্যামল কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়। আরও কিছু হয়েছিল ঠিক মনে নেই। খুব ভালো ফরাসি জানত। অ্যালিয়াঁস ফ্র্যাঁসে থেকে যত ডিগ্রি পাওয়া যায় সবই পেয়েছিল।

দাদার সঙ্গে দাদার ছবি আঁকার স্টুডিয়োতে, ওদের বাড়িতেই, বসে নানা ফ্রেঞ্চ গানের ও কবিতার রেকর্ড শনতাম আমি আর অরুণ গুপ্ত। তখনও অড্ডা-না-মারা আমি, একটা সময়ে দীপকের সঙ্গে এবং শ্যামলদের সঙ্গে প্রচুর আড্ডা মেরেছি। ফ্রেঞ্চ ম্যাগাজিনের পাতার মধ্যেও কাগজের ডিস্ক আসত গানের আর কবিতার। দাদা প্রিন্স-হ্যেনরি টোব্যাকো খেতেন। ঘুমোবার সময় ছাড়া সব সময়েই পাইপ থাকত মুখে। দিনে অগণ্য কাপ কফি খেতেন। ঘুমোবার সময় ছাড়া সব সময়েই পাইপ থাকত মুখে। দাদার স্টুডিয়োতে, ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে এক সময়ে আমার অনেকই সুন্দর দুপুর ও বিকেল

কেটেছে। ওরা দুই ভাই ছিল একেবারে হরিহর-আত্মা। দাদা খুব ভালো ফোটোও তুলতেন। মনে আছে, আমার একটি টাই-পরা ফোটো তুলে দিয়েছিলেন। জীবনে একমাত্র সেই ফোটোটিতেই নিজেকে সুন্দর দেখেছিলাম। প্রোফাইলও নয়, আবার ফ্রন্টালও নয়। এক বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে তুলেছিলেন দাদা।

বিশেষ দুর্বলতা ছিল বলে ফোটোটা অনেকদিন যত্ন করে রেখেছিলাম। এখন আর খুঁজেই পাই না। বাঁচা গেছে। নিজেকে ভালো না-বাসাই ভালো।

এত কথা মনে পড়ছে এই জন্যে যে, দাদা অত্যন্ত অল্প বয়সেই চলে যান। শ্যামল আনন্দবাজারে ছিল অল্পদিন। তারপরে সম্ভবত সাধন দত্তের কুলজিয়ান করপোরেশনে ঢোকে। বহুদিন দেখা হয় না শ্যামলের সঙ্গে। মামার কাছ থেকে খবর নেওয়া যায়, কারণ, মামার কোম্পানির ট্যাক্সের কাজ আমিই দেখি, কিন্তু ওই যে! প্রায়ই ভাবি কিন্তু হয়ে ওঠে না সময়াভাবে। কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা করি! সত্যিই!

শ্যামলের মতো ভদ্র, নরম, এবং লো-প্রোফাইলের ছেলে খুব কমই দেখেছি। ও যদি "লাউড" হত, তবে আমাদের অনেকের কানেই তালা লেগে যেতে পারত। মনুষ্য চরিত্রে SUBTLITY কাকে বলে, তা শ্যামলের কাছ থেকে শেখার ছিল।

বসন্তে আর বর্ষাতে মনের মধ্যের সমস্ত তন্ত্রীতে যেন ঝড় উঠত। তখন পৃথিবীও অন্যরকম ছিল। প্রত্যেক ঋতু চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ এবং অন্য ঋতুর আসার পায়ের শব্দ অতি স্পষ্টই শোনা যেত।

প্রতিবার ঋতু পরিবর্তন ঋতু পরিবর্তনের সময়ে এক পশলা ঝড়বৃষ্টি হতই, মনে আছে। বসন্তকে এই কলকাতা শহরেও আলাদা করে চেনা যেত প্রতিবছর কোকিলের ডাকে গাছের নতুন পাতাতে এবং মন উদাস করা মিষ্টি মিষ্টি হাওয়াকে। তখন শীত আর গ্রীষ্মের মধ্যে বসন্তের অত্যন্ত স্পষ্ট একটি আসন ছিল, যা এখন শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলে বা বনাঞ্চলেই দৃষ্টি এবং শ্রবণগোচর হয়।

বসন্তের মৃত্যু ঘোষিত হত ঘন ঘন কালবৈশাখীর দাপটে। কালবৈশাখীর মরশুম শেষ হলেই বৈশাখের এই ভোরের বেলার হাওয়ার এক বিশেষ অভিনবত্ব ছিল। রবীন্দ্রনাথ এমনিই লেখেননি সেই গান "বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া"।

তাছাড়া, তখন এই সব লক্ষ করার মতো অবকাশও মানুষের ছিল। টাকা, কেরিয়ার আর প্রতিষ্ঠাই প্রত্যেক মানুষের একমাত্র গন্তব্য এবং প্রার্থিত বস্তু হয়ে ওঠেনি। মানুষের চোখ ছিল, কান ছিল, নাক ছিল, এই বিভিন্ন ঋতুর আসা ও যাওয়ার দৃশ্য, শব্দ ও গন্ধ আলাদা করে চিনে নেবার।

"A violette by a mossy grey" দেখার ঔৎসুক্য ছিল।

ঋতু আজও আসে এবং যায় কিন্তু ক্ষণকালের জন্যে দাঁড়িয়ে তার যাওয়া-আসা লক্ষ করবার মতো সময় ও মানসিকতাই আজকের মানুষ হারিয়ে ফেলেছে।

এ এক পরম দুর্দৈব।

বর্ষাও আমাদের তখনকার কলকাতাতে এক বিশেষ রূপ নিয়ে আসত। বাড়ির কার্নিশে কার্নিশে কামাতুর কবুতররা কবুতরীদের ঘিরে ঘিরে ঘুরে ঘুরে আদর করত। পুরোনো দিনের টেলিফোনের আওয়াজের মতো আওয়াজ উঠত মেঘলা দুপুরে, তাদের গলায়, কুরর-কুরর-কুরর-কুরর। বৃষ্টি মাথায়

করে সেই কলকাতার ফাঁকা রাস্তায় দুপুরের ফাঁকা ট্রাম দৌড়ে যেত ঝমঝম শব্দ করে। কেয়া আর বেলফুলওলারা পথে হেঁকে যেত সন্ধ্যাবেলায়। গরমের দিনে যেমন কুলফিওলা হাঁক দিয়ে যেত।

ফুচকা, দহিবড়া, ভেলপুর, বাটাটা-পুরির নাম জানত না সেই কলকাতা। তখনও হলদিরাম ভুজিয়াওলা কলকাতার অলিতে-গলিতে এমনভাবে ইনফিলট্রেট করেনি। কলকাতা তখনও পুরোপুরি বাঙালিদেরই শহর ছিল। হয়তো গরিব ছিল, হয়তো এত চাকচিক্য ছিল না; কিন্তু তার বাঙালিয়ানাতে কোনও ফাঁকি ছিল না।

ফুলকপির সিঙাড়া জানিয়ে দিত যে শীত এসেছে এবং নলেন গুড়ের সন্দেশ। সব মিষ্টির দোকানেই চমচম, রসমুণ্ডি পাওয়া যেত। সীতাভোগ, মিহিদানা, নানারকম বাঙালি সন্দেশ, ঢাকাই পরোটা, বিকেলবেলা ছোলার ডালের সঙ্গে। কাননবালা, কুন্দনলাল সায়গল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, আঙুরবালা আর গহরজানের গানের অনুষঙ্গে বাঙালি তখন বাঙালি পোশাক পরত, বাঙালি খাবার খেতো; নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে গর্বিত বোধ করত। তথাকথিত ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়া, লাল-নীল নেংটি-ইঁদুরের মতো ছোট্ট ছোট্ট টাই গলায় ঝুলিয়ে ঘরে ঘরে শিশুরা ড্যাডি, মাম্মি, আন্টি আর থ্যাঙ্ক ইউ বলতে শিখে ধরাকে সরা জ্ঞান করত না। পয়লা বৈশাখে বাবা-মাকে হতবাক করে দিত না, 'আচ্ছা মাম্মি, এই একলা বৈশাখ ব্যাপারটা কী বলো তো?' ১লা বৈশাখই যে পয়লা বৈশাখ, আমাদের নববর্ষ; ২রা মানে যে দোসরা, তা তখনও জানত প্রত্যেক বাঙালি ছেলেমেয়ে।

নববর্ষে, দোলে দুর্গোৎসবে, রথে, চড়কে এই গরিব কুচুটে, ঈর্ষা-জর্জর জাতটা যে বেঁচে আছে তা তখনও বোঝা যেত। আজকের মতো লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশ দ্বারা এমন ভাবে পরিত্যক্ত হয়ে সর্বস্বহৃত হয়নি বাঙালি। তখনও বাঙালির ভবিষ্যৎ বলতে কিছু ছিল। যা, আজ আর নেই।

আমরা যখন এন সি সি তে ঢুকি তখন আমাদের সেকেন্ড বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের (এন সি সি) কর্তা ছিলেন মেজর জেনারেল ফ্রিম্যান্টল। দুর্দান্ত সুন্দর চেহারা। দয়া করে কখনও সখনও তিনি আমাদের দেখা দিতেন। যেদিন দিতেন, সেদিন সাজ সাজ রব পড়ে যেত।

তারপরে কর্তা হলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল অথবা ব্রিগেডিয়ার কামা। ঠিক মনে নেই। কোথাকার লোক জানতাম না। তবে তিনিও সাহেবদের মতোই ফরসা এবং স্মার্ট ছিলেন। তবে বেঁটে ছিলেন।

অনেকদিন এন সি সি করা হল। তখন লাইট মেশিনগান, হ্যান্ড গ্রেনেড—এসব চালানো ও ছোড়া শেখানো হচ্ছে। ম্যাপ-রিডিং, ড্রিল, রাইফেল-শুটিং, সিগন্যালিং—এসব তো ছিলই।

এন সি সি-তে আমাদের ক্লাসের শুক্লা এবং বাবা আদম ছিল জবরদস্ত ক্যাডেট। বাবা আদমও গৌতমেরই মতো আর্মিতে চলে যায়। কিন্তু শুনেছি যে, একটি মোটর দুর্ঘটনাতে সে নাকি কিছুদিন পরেই মারা যায়।

স্যার যদুনাথ সরকারের নাতি, সুদর্শন, মেধাবী, সপ্রতিভ অমিতদা ছিলেন সার্জেন্ট মেজর। আশাকরি, নামটি ভুল করলাম না।

করপোরাল ছিলেন, আমাদের কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র পাইপ-খেকো কটা-চোখের গ্রেট অমিয় ব্যানার্জি এবং সপ্রতিভ অশোক ব্যানার্জি। দুজনে ছিলেন হরিহর আত্মা। আরও অনেকেই ছিলেন, নাম মনে পড়ছে না অথচ মুখগুলি স্পষ্ট মনে আছে। আশুতোষের আরেকজন সার্জেন্ট মেজর ছিলেন দত্তদা। নামটাও জানতাম, ভুলে গেছি। আরেকজন দত্ত ছিলেন আশুতোষেরই, তিনি একটু বেঁটে ছিলেন। ইনিশিয়ালস তাঁর ভুলে গেছি।

সরকারদাও (অমিত) আর্মিতে যান এবং অল্পবয়সে তিনিও দুর্ঘটনাতেই মারা যান। খবরটা শুনে ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলাম আমরা। বাবা আদমের খবরটা শুনেও। আমাদের বাগাইচাটোলির 'ক্যাম্পের' সঙ্গে অমিত সরকারের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

স্যার যদুনাথ সরকার থাকতেন তাঁর নিজ নিকেতনে, লেক টেরাসের 'বাঁদু'-দের বাড়ির কাছেই। বিকেলে তখনও নিয়মিত হাঁটতে যেতেন, দেখতে পেতাম আমরা।

ওঁর মতো, সুনীতি চ্যাটার্জির মতো, সত্যেন বোসের মতো, ড. কালিদাস নাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মতো অনেক বড়ো বাঙালিকে চাক্ষুস দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

বাঙালিদের মধ্যে তারপরে "বড়ো বাঙালির" মড়ক লাগল। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কষ্ট করে মনে করতে হবে একজনও "বড়ো বাঙালি"কে তারা দেখেছিল কি না কমবয়সে। অথবা পূর্বসুরিদের প্রেক্ষিতে একজনও তেমন বড়ো বাঙালি আদৌ হয়েছিলেন কি না! এটা সত্যিই গভীর অনুশোচনার বিষয়।

পুজো চলে গেল। ক্রিসমাস হলিডেতে আমাদের প্রথম ক্যাম্প।

ক্যাম্প বললেই, শিশুকাল থেকেই চোখের সামনে ভেসে উঠত ছবিতে ও ইংরেজি সিনেমাতে দেখা ধবধবে সাদা তাঁবু, ক্যাম্পফায়ার, তাঁবুর সামনে ডেকচেয়ারে ড্রেসিংগাউন পরে বসে সাদারঙা কাঠের টেবলের উপর সবুজ বা হলুদ বোনচায়নার কফির পট থেকে কফি ঢেলে খাচ্ছেন কেউ।

ক্যাম্পে যাব শুনে আনন্দে মন নেচে উঠল।

নির্ধারিত দিনে সকলেকেই রাত সাতটাতে হাওড়া স্টেশনে 'রিপোর্ট' করতে বলা হল।

আর্মির টার্মিনোলজিতে 'অ্যাট নাইনটিন আওয়ার্স শার্প'। সব নোটিসেই ওই 'শার্প' কথাটি লেখা থাকত। দু'বছর এন সি সি করে নানারকম 'খেসারত' দিতে হয়েছিল আমাকে, তার মধ্যে অন্যতম হল, নিয়মানুবর্তিতা রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে যাওয়া। 'খেসারত' এ জন্যই বলছি যে, সময়-মানাটা বঙ্গভূমে এখন মস্ত দোষেরই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনও কাউকে সময় দিলে এবং কেউ আমাকে সময় দিলে এখনও ধরেই নিই যে, ফোর্টিন আওয়ার্স 'শার্প' অথবা ফিফটিন থার্টি আওয়ার্স 'শার্প'। অথচ বঙ্গভূমে বর্তমানে সময় মান্য করার মতো আহাম্মকি আর দুটি হয় না। কী ডাক্তার, কী উকিল, কী সরকারি আমলা, কী কেরানি, কী সাংস্কৃতিক বা নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা বা মহড়াতে আসা শিল্পীরা কেউই সময় মানাটা যে শিক্ষা এবং ভদ্রতার এক অন্যতম প্রধান অঙ্গ সে সম্বন্ধে আর আদৌ অবহিত নন। কেউ চারটেতে আসবেন বলে, সাড়ে পাঁচটাতে এলেও আপনি যদি অপ্রসন্ন হন, তবে আগন্তুকের মুখে ক্রোধ ফুটে ওঠে। সকলেই এমনই ভান করেন যেন ভারতেরই অন্যান্য শহরে মানুষে হেঁটে বা বাসে বা লোকাল ট্রেনে নয়, হেলিকপ্টারেই যাতায়াত করে থাকেন। সময়, এমনকি সামাজিক অনুষ্ঠানেও কেউই মানেন না। অজুহাতেরও মাথামুণ্ডু নেই। আমরা যে কতবড়ো কল্পনাপ্রবণ জাত তা আমাদের অজুহাতের রকম দেখেই বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্র বাহাদুর নামের একজন আয়কর-অফিসারের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর একটি ট্রায়াম্ফ মোটর গাড়ি ছিল। রোজই দেখতাম, আয়কর ভবনের গারাজে গাড়িটি পার্ক করানো আছে আর এখানে-ওখানে ঠোক্করের বা আঁচড়ের দাগ। সেই সব অলঙ্কারের সংখ্যা প্রায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

কী ব্যাপার? তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, মত বলিয়ে সাহাব আপলোগোঁকি কলকত্তাকি ট্রাম-ড্রাইভারলোগোঁনে ঐসি অজীব আদমী হ্যায় যো রোজই উনলোগোঁনে ট্রাম-লাইন ছোড়কর আকর হামারা গাড়িমে টকরাতা।

শুনে তো আমি থ'।

আমাদের অনেক অজুহাতের কথা শুনেই নরেন্দ্র বাহাদুর সাহেবের এই উক্তির কথা মনে পড়ে যায়।

শুধু এন সি সি নয়, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুল 'দক্ষিণী' থেকেও নিয়মানুবর্তিতা শিখেছিলাম। শুনতে আশ্চর্য মনে হলেও, একথা বলব যে, সম্ভবত সবচেয়ে বেশি শিখেছিলাম 'দক্ষিণী' থেকেই। 'দক্ষিণী'-তে যদি সাতটায় ক্লাস আরম্ভ হওয়ার কথা তো কাঁটায় সাতটাতেই আরম্ভ হত। একমিনিট অআগেও নয়, একমিনিট পরেও নয়। এবং ক্লাস আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজাও বন্ধ হয়ে যেত। যতদূর জানি, আজও তাই হয়।

আমার জ্ঞানমতে কলকাতাতে 'দক্ষিণী'-ই হয়তো একমাত্র বেসরকারি এবং সরকার বা অন্য কারও সাহায্য-অনির্ভর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমন্ত্রণপত্রে ছাপা থাকে যে, যে-সময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার কথা, ঠিক সেই সময়েই কাঁটায় কাঁটায় "প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেওয়া হবে।" যদি কখনও টিকিট বা কার্ড

বিক্রি করেও 'দক্ষিণী'-র কোনও অনুষ্ঠান হয় তখনও এই কঠোর এবং ঋজু নিয়মই বলবত থাকে। এমন "হিম্মত" বঙ্গভূমের আর কোনও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেখিনি। শুভ গুহঠাকুরতার মতো কিছু মানুষ যদি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে থাকতেন তবে পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে যেত। প্রকৃত শিক্ষা পেত। নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা থাকলে অন্য অনেক শিক্ষা আপনিই আকর্ষিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের অনেকই ঘাটতি পূরিত হয়ে যায়।

ক্যাম্পে আমরা যেদিন রওনা হব সেই সন্ধেতে যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে তো ড্রাইভার আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। ড্রাইভারেরাও মানুষ, তাই তাঁদের সবসময়েই তাঁদের নামেই ডাকা উচিত। কিন্তু এতোদিন পরে মনে নেই উনিশশো বাহান্নতে কে সেই গাড়িটি চালাত। সম্ভবত প্রেমচাঁদ।

কুলিকে দিয়ে নিজের মাল বইয়ে এনে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছোলাম। হোল্ডল ছাড়া একটি স্যুটকেসও এনেছি।

লক্ষ করলাম, সার্জেন্ট-মেজর তির্যক চোখে একবার আমার এবং আমার মাল ও কুলির দিকে তাকালেন। কেন যে, তা বুঝলাম না।

নিজের কিটব্যাগে ও স্যুটকেসে বিচিত্র সব জিনিস। ক্যাম্পে যাচ্ছি বলে কথা! বাবার ড্রেসিং-গাউন, স্লিপিং স্যুট, যা উনি বাইরে গেলে নিয়ে যেতেন, মাকে বলে ম্যানেজ করা, বাবার অজ্ঞাতসারে, স্ট্র-হ্যাট। সবই পৈতৃক সম্পত্তি। পায়জামা-পাঞ্জাবি, অবসর সময়ে পড়বার জন্য জীবনানন্দের নতুন কবিতা সংকলন ইত্যাদি ইত্যাদি। হোল্ডলে স্যুটকেসে যা ছিল তা তো ছিলই আর বুকের মধ্যে ছিল উন্মাদনা। ক্যাম্পের কল্পনানির্ভর সুতীব্র উত্তেজনা।

প্ল্যাটফর্মে গিয়ে সার্জেন্ট মেজরের কাছে (দত্তদার নাম কি ছিল বি. এন. দত্ত?) রিপোর্ট করতেই প্ল্যাটফর্মের মধ্যই আমাদের Fall in করতে বলা হল। আমরা লাইন করে Four deep করতে বলা হল। আমরা লাইন করে Four deep-এ দাঁড়ালাম। 2nd Bengal Batalion তখন চারটি Company ছিল। আমরা, সেন্ট জেভিয়ার্সের ক্যাডেটরা আর আশুতোষের ক্যাডেটরা ছিলাম 'A' Company-তে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজের ছেলেরাও ছিল। আমাদের 'Attention'-এ দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করা হল, মাঝামাঝি ওগুলো কী? দেখতে পাচ্ছ?

ইয়েস স্যার, পাচ্ছি।

দেখলাম, ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বিরাট বিরাট বড়ো আর্মি ট্রাকে করে প্রায় বিরাটতর সব কাঠের বাক্স নামছে। শনের মোটা কাছি দিয়ে তৈরি হ্যান্ডেল ঝোলানো আছে সেই সব বাক্স থেকে। নামছে তো নামছেই। বাক্সর পাহাড় হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে Steel- এর ট্রাংকও আছে।

সার্জেন্ট মেজর বললেন, ক্যাডেটস, লিভ ইওর লাগেজ হিয়ার অ্যান্ড ডাবল-আপ ট্যু দ্য মিডল অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম টু লোড অন দোজ বক্সেস ইনটু দ্য স্পেশ্যাল ট্রেন।

স্বপ্নোত্থিত হয়ে দেখলাম, আমাদের স্পেশ্যাল ট্রেনটির লেজ তখন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে, ব্যাক গিয়ারে।

'Double up' মানে, আর্মির টার্মিনোলজিতে; দৌড়ে যাওয়া অথবা মার্চ করার ডাবল স্পিডে যাওয়া।

সাহেবরা সবে সাত বছর হল গেছেন। তখনও সমস্ত 'কম্যান্ড' ইংরেজিতেই দেওয়া হত। তবে হিন্দি কম্যান্ড তৈরি হচ্ছিল জোরকদমে। বিশেষ করে জওয়ানদের লেভেলে প্রয়োগ করার জন্যে। এখন শুনতে পাই কম্যান্ড সব হিন্দিতেই হয়ে গেছে।

Spanish-এ কম্যান্ডারকে বলে Mandatario আর কম্যান্ডকে বলে Mandato। সম্ভবত ইংরেজি শব্দ Mandate এই শব্দটি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। যাই হোক, তখনও হিন্দি কম্যান্ডের সঙ্গে পরিচয় হয়নি আমাদের! আমাদের এন সি সি র পুরো জীবনেই হয়নি।

মেজর নিয়োগী সেবারের ক্যাম্পেই বাগাইচাটোলির পশের এক বিশ্বটাঁড় জায়গাতে (গোপাল সেনের Terminology) নিয়ে গিয়ে সিমেন্টের একটা ফুটিফাটা বাঁধের মতো দেখিয়ে আমাদের বলেছিলেন, ক্যাডেটস। হোয়াট ইজ দ্যাট?

আ ড্যাম স্যার।

আমরা সমস্বরে বলেছিলাম।

ফাজিল রজত নিচু গলাতে বলেছিল Damn it।

আমরা বলেছিলাম ইয়েস স্যার। আ ড্যাম।

ইটস আ কভার। ইজ নট ইট?

মেজর নিয়োগী বলেছিলেন।

ইয়েস স্যার।

ইজ নট ইট ম্যান মেড?

ইয়েস স্যার।

আমরা সমস্বরে বললাম।

নাউ। ক্যাডেটস, ড়ু উ্য সি দ্যাট ডিপ্রেশন ওভার দেয়ার? অন্য দ্যা রাইট?

ইয়েস স্যার

গণ-চ্যাংড়ারা সবসময় গণ-চ্যাংড়াই থাকে। ইউনিফর্ম পরুক আর নাই পরুক। 'ইয়েস' শব্দটিতে একটি বাড়তি 'S'-এব অলংকরণ প্রথমে করে রজত।

রজত ছিল আমাদের মধ্যে চ্যাংড়া-উৎকৃষ্ট। ওকে অনুকরণ বা অনুসরণ করে আমরা সমস্বরে 'ইয়েসস্' বলতে লাগলাম।

বেঁটে খাটো ছোট্টখাট্টো প্রফেসর নিয়োগী। কেমিস্ট্রি অথবা ফিজিকস-এর প্রফেসর ছিলেন উনি আমাদের কলেজে ঠিক মনে নেই। এন সি সি-তে আসার আগে ইন্ডিয়ান টেরিট্যোরিয়াল ফোর্সে ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে উনিও মেজর ছিলেন। আমার বাবাও আই টি এফ এ ছিলেন বলেই বাবার মুখে মেজর নিয়োগী এবং মেজর চৌধুরীর নাম ৪৯-এ, রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ভাড়া বাড়িতে থাকার সময় থেকেই শুনতাম।

চৌধুরী সাহেব ছিলেন অতি সপ্রতিভ, সুদর্শন, সাহেব মানুষ। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড আর ডোভার রোডের মোড়ের বাড়িটিতে থাকতেন। পরে জেনেছিলাম যে, ওটা দ্বারিকদাদের (ডি এন মিত্র) বাড়ি। চৌধুরী সাহেব ইনকামট্যাক্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিলেন। এখনকার দিনের ডজন ডজন ডেপুটি কমি·নারের একজন নন। সে সময়কার মুষ্টিমেয় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত।

নিয়োগী সাহেব দেখতে তেমন সপ্রতিভ বা সুন্দর ছিলেন না কিন্তু তাঁর Solid worth ছিল।

উনি বললেন, সো, ওয়ান অফ দ্যা কাভারস ইজ ম্যান-মেড, আই মিন দ্যা ড্যাম, অ্যান্ড দ্যা আদার ওয়ান, আই মিন দ্যা ডিপ্রেশান ইজ ন্যাচারল। অ্যান্ড বোথ আর কাভারস, বিহাইন্ড হুইচ উ্য ক্যান কনসিল ইওরসেলভস।

কান্ট ইউ?

ইয়েসস। স্যা-আ-আ-র।

শীতের আকাশ বাতাস তরুণ কণ্ঠের সমবেত চিৎকারে কেঁপে উঠল।

নাউ, লিসসন টু মি ক্যাডেটস। ওয়ান ইজ কলড 'বানাওটি আড়' ইন হিন্দি অ্যান্ড দ্যা আদার ইজ কলড 'কুদ্‌রতি আড়'। উ্য আন্ডারস্ট্যান্ড?

মেজর নিয়োগী বললেন।

'নোও স্যা-আ-আ-র।'

রজতই লিড দিচ্ছিল কোরাসের।

নিয়োগী সাহেব একবার আড়চোখে রজতের দিকে তাকালেন দেখলাম। বললেন, 'সিনস দিস ওয়ান', বলেই নিজের বগলতলির ব্রাউন চামড়া-মোড়া বেঁটে ব্যাটনটা বগলতলি থেকে বের করে বাটনা বাটার মতো করে সেটা দিয়ে হাওয়াতে বাটনা বেটে বললেন, 'দিস ওয়ান ইজ মেড বাই মেন

দ্যাটস হোয়াই দিস ইজ 'বানাওটি আড়' আন্ড দ্যাট ওয়ান ইজ মেড বাই নেচার, হেন্স দ্যাট ওয়ান ইজ 'কুদরতি আড়'। কুদরত্নে বানায়া। আন্ডারস্ট্যান্ড?

ইয়েস্-স স্যা-আ-আ-র। কুদ্রত রঙ্গিবিরঙ্গী।

রজত বলল।

রজতকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে তার দিকে অজগরের দৃষ্টির মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টি নিক্ষপ করে উনি বললেন, ন্যাও, ডু উ্য নো, হোয়াট অ্যান আড় ইজ?

রজত বলল, আ কাইন্ড অফ টালা স্যা-আ-আ-র।

হোয়াট?

নিয়োগী সাহেবের নীচের পুরু ঠোঁটটি ঝুলে গেল। মুখ বেগনে হয়ে গেল রাগে। আমরা প্রমাদ গুনলাম। ডেঞ্জার সিগন্যাল।

আনডন্টেড রজত বলল, রিদম। বিইং আ বেঙ্গলি ডোন্ট উ্য নো "আড়ে আড়ে" স্যার? "ওই দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ বেড়া"—

বলেই, আড়ে আড়ে গোপাল ওড়িয়ার বিখ্যাত গানটির আস্তাইটি গেয়েও দিল।

অনভিজ্ঞ ও বোকা ক্যাডেটরা হেসে উঠল।

সেয়ানারা হাসিটা গিলে ফেলল।

স্টপ ইট। ন্যাউ।

নিয়োগী সাহেব রাইফেল-শটের মতো বলে উঠলেন। পরক্ষণেই রাইফেলের বোল্ট বন্ধ করলেন।

তারপর বললেন, লিসসিন এভরিওয়ান। অ্যাট আড় ইজ আ কভার। তাবপরই মুখ উঁচু করে ওঁর চেয়ে লম্বা লেফটেন্যান্ট চ্যাটার্জিকে কী যেন বললেন, লেফটেন্যান্ট চ্যাটার্জি, সার্জেন্ট মেজর অমিত সরকারকে কী যেন বললেন, আব অমনি অমিতদা বজ্রনির্ঘোষের সঙ্গে কম্যান্ড করলেন। কোম্পানি-ই-ই—অ্যাটেন—শান।

আমরা স্ট্যান্ড-অ্যাট-ইজ-এ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বুটে বুটে খটাখট আওয়াজ তুলে অ্যাটেনশনে ফিরলাম।

অ্যাবাউট টার্ন।

আমরা মুখ উলটোদিকে করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে কম্যান্ড হল, 'ডাবল আপ টু দ্যা প্যারেড গ্রাউন্ড।'

সামনে সামনে সার্জেন্টরা লিড করে যেতে লাগলেন ছন্দময় দৌড়ে। আমরা "বারিরির" দিকে এগোতে লাগলাম।

ওড়িশার উঁচু পাহাড়ে বসবাসকারী কন্দ বা খন্দ উপজাতীয়দের ভাষায় 'বারিরি' শব্দটির অর্থ হল 'বধ্যভূমি।'*

আমরা দৌড়তে লাগলাম। শুকনো শীতের ধূলি-ময়লা ধোঁয়া-বিবর্জিত টাটকা অকলুষ হাওয়া নাকে টানতে টানতে।

প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছে আবারও অ্যাটেনশানে দাঁড়াতে হল।

রজত রায়চৌধুরিকে সার্জেন্টরা লেফটেন্যান্ট চ্যাটার্জির নির্দেশে নিয়ে গিয়ে 'কোয়ার্টার গার্ড' এ পুরে দিল।

লোকমুখে এও শোনা গেল যে, বিকেল থেকে ওকে "ফেটিগ ডিউটি" দেওয়া হবে।

গোবেচারা মা-বাবার, গোবেচারা ছেলে আমরা; ব্যাপার দেখে অত্যন্তই ঘাবড়ে গেলাম।

অনেকেই বলাবলি করছিল যে, ওরা বলবে 'খেলব না'।

এমন তো কতা ছেলনি! ক্যাম্পে আসবার সময়ে তো এই সব শব্দের সঙ্গে আদৌ আমাদের পরিচয় করানো হয়নি। 'কোয়ার্টার গার্ড', 'ফেটিগ-ডিউটি' এসব কি আনপার্লামেন্টরি কথা?

* "লবঙ্গীর জঙ্গলে" (উপন্যাস)—প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং, "পাখিধী" উপন্যাসের পরের খণ্ড

উচ্ছল রজতের মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেল। দোষটা ওর একার নয়। আমরা যদি সকলে পোঁ না ধরতাম তাহলে ও হয়তো বাহাদুরি করে বারবার ওরকম করত না।

সতেরো বছরের ফার্স্ট-ইয়ারে পড়া ছেলে বাহাদুরি করবে না তো কে করবে? চিতায়-ওঠা বাত-জর্জর বুড়োতে করবে?

কী খিটক্যাল!

পরে জানা গেল, 'কোয়ার্টার গার্ড' মানে জেলখানা। যেখানেই আর্মি মুভ করে সেখানেই 'কোয়ার্টার গার্ড' বানানো হয়ে যায়। আর ফেটিগ-ডিউটি মানে এমনই ডিউটি, যাতে সৈন্য ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ে। ফর এগজাম্পল, তাকে একটা দশ ফিট বাই দশ ফিট বাই পাঁচ ফিট গর্ত খুঁড়তে বলা হল হয়তো ওই পাথুরে জমিতে, হাতে গাঁইতি-কোদাল ধরিয়ে দিয়ে।

রক্ত বমি করে তো খোঁড়া যখন শেষ হল তখনই তাকে বলা হল সেটাকে নিপুণ করে বুজিয়ে দিতে। এই হল আর্মির হরকৎ। কখখনও বসে থাকেন না জওয়ানেরা বা অফিসারেরা। যে দেশের আর্মি যত ফিজিক্যালি ফিট, যত তাড়াতাড়ি মুভ করতে পারার অভ্যাস রাখে, তারা তত বেশি সুবিধাজনক পজিশানে থাকে আসল যুদ্ধের সময়। আর্মি একটি INSTITUTION না, এটি একটি CULT। এবং এই CULT- এর জন্যে আমাদের এবং পৃথিবীর সমস্ত আর্মির অগণ্য রেজিমেন্ট ন্যায্য কারণে গর্বিত।

হেমিংওয়ের লেখাতে পড়েছিলাম, "There is a difference between movement and action. An army move from one place to the other. But when an army go into action it means quite something else."

তবে আর্মি অনবরত যুদ্ধের মহড়া দিতে দিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে সরতে থাকে এই জন্যেই যে, তাদের গায়ে যাতে শ্যাওলা না জমে, শিকড় না গজায়। তবেই তার ACTION -এর সময় যখন আসে, তখন সহজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

জীবনে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ সিভিলিয়ানের জীবনই এমন রঙহীন, বিবর্ণ সাদামাঠা হয়।

লেফটেন্যান্ট চ্যাটার্জি বললেন, কোম্পানি-ই-ই-ই ডি-স্-মি-স্।

আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম। সার্জেন দু'জন দু'পাশে মার্চ করতে করতে রজতকে দূরের 'কোয়ার্টার গার্ডে' নিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমরা নিঃশব্দে বললাম, চিয়ারিও কমরেড। সবকা সাপোর্ট হ্যায় তুমপর।

নিঃশব্দেই বললাম, কারণ, এখন আমরা আর্মির প্রজা। সশব্দে বললে আমাদেরও কোয়ার্টার গার্ডে পুরে দিত।

আমাদের কোমল, মাখমবাবু হাতগুলিতে দেড়-দু'মণ ওজনের অ্যামুনিশান বক্স, হান্ডা-হান্ডি, হাতা-ডান্ডার বাক্স কাছি ধরে উঠিয়ে উঠিয়ে হাওড়া স্টেশনেই প্রথম রাতেই হাতে ফসকা পড়ে গেছিল। আমার হাতের পাতা আবার মেয়েদের মতো নরম। কবির হাত তো! অনেকের হাত কেটেও গেছিল। কারোই ঘা বা ফোসকা শুকোয়নি তখনও আর সেই ক্ষত-বিক্ষত হাতেই রজতকে কোদাল গাঁইতি দিয়ে গর্ত খুঁড়তে হবে পাথুরে মাটিতে। একথা ভেবেই আমাদের চোখে জল আসছিল।

ভাবছিলাম, যদি আমাদের মধ্যে একজনের মা-ও বাগাইচাটোলিতে এস ননীর পুতুলদের এমন হেনস্তা দেখতে পেতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তিন সঙ্গীর ল্যাবরেটরির রেবতীর পিসিমারই মতো আমাদের চলে আসতে বলতেন।

বলতেন, 'রেবু, চলে আয়।'

আবার হাওড়া স্টেশনে ফেরা যাক।

ড্রেসিং গাউন পরে দুগ্ধফেননিভ তাঁবুর সামনে বসে সাদা ফোল্ডিং-টেবলে সবুজ বা হলুদ বোনচায়নার কফি খাওয়ার স্বপ্ন প্রথম রাতেই মিলিয়ে গেছিল। নিজেকে শাপান্ত করছিলাম, অত জিনিস বেকার বেকার বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে এসেছি বলে। তাও আবার নিজে বইনি, কুলিকে দিয়ে বইয়েছি!

হাওড়া স্টেশনে যখন আমরা আক্ষরিকভাবে কুঁততে কুঁততে অ্যাম্যুনিশান-বক্স তুলছি স্পেশ্যাল ট্রেনে, তখন যে-কুলিটি আমার মাল বয়ে নিয়ে এসেছিল, তাকে হঠাৎই দেখতে পেলাম জানালা দিয়ে। দেখলাম, তার মুখটা এত বড়ো হাঁ হয়ে গেছে যে, যে-কোনও মুহূর্তে কাটা-ফলওয়ালার স্টল থেকে মাছি উড়ে তার মুখগহ্বরে ঢুকে যেতে পারে।

তার পক্ষে ব্যাপারটা যে কী ঘটল তার স্বরূপটি বোঝা বিস্তর অসুবিধের ছিল।

মালপত্র, ইনক্লুডিং আমরা; ভালোমতো লোড হলে, ট্রেন ছাড়ল। আর্মি স্পেশ্যাল ট্রেন, স্পেশ্যাল গার্ড, স্পেশ্যাল এঞ্জিনম্যান। আনাগোনার স্পেশ্যাল টাইম। নো-ডিনার, নো-কিচ্ছু। খড়গপুর স্টেশনের প্লাটফর্মে নেমে আঁজলা ভরে জল খেয়ে নিলাম সারা রাতের মতো।

আমাদের শাসিয়ে রাখা হল যে, শেষ রাতে 'মুড়ি" স্টেশনে ট্রেন বদল করে ছোটো লাইনের ট্রেনে উঠে আবার এই গন্ধমাদন নতুন করে "লাদতে" হবে।

আমরা ভদ্রঘরের সন্তান না ভারবাহী খচ্চর সে সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই মনে গভীর জিজ্ঞাসা জাগল।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কে যেন কনুইয়ের এক ধাক্কা দিয়ে বলল, ওঠ ওঠ মুড়ি জংশন এসে গেছে।

মুড়ি অবশ্য ক্যান্টনমেন্ট। যেখানে আর্মি, সেখানেই সুবন্দোবস্ত। ওই শীতের শেষ রাতের অন্ধকারেও আমাদের প্লাটফর্মের উপরে ঘুমচোখে 'ফল ইন' করতে বলা হল রুটি, ডিমসেদ্ধ, কলা; থরে থরে সাজানো ছিল। লাইন করে গিয়ে এক একজন নিজের নিজের কলাইকরা থালাতে নিজের নিজের বরাদ্দ তুলে নিলাম। তারপর আবার লাইন করে গিয়ে নিজের নিজের কলাইকরা মগে এক মগ করে ধূমায়িত গরম চা। লস্করেরা সার্ভ করছিল। দেওয়া-নেওয়া সবই হচ্ছিল পরম নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে।

আজকের কলকাতাতে যখন কোনও অফিসের লিফটের সামনে 'ভদ্রলোকদের' হুড়োহুড়ি মারামারি করতে দেখি অথবা বাসের সামনে, তখন সেই শেষ রাতের মুড়ি স্টেশনের কথা মনে পড়ে যায়। এবং মনে পড়ে বড়ো লজ্জা করে।

দেশটাকে কিছুদিনের জন্যেও অন্তত আর্মির হাতে তুলে দিতে পারলে দেশের মানুষ হয়তো সহবত শিখতেন, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই; স্বাধীনতা বলতে যে জীবনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কিছু কিছু পরাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়াটাও বোঝায়, এই দামি কথাটাই আদৌ জানেন না।

সম্প্রতিক অতীত থেকে বঙ্গভূমের বুদ্ধিজীবীদের আর এক নতুন এবং প্রায় দুরারোগ্য রোগে ধরেছে বলে মনে হচ্ছে।

তা হল, নিজেদের যেনতেন প্রকারণে ধর্মরহিত বলে প্রতিপন্ন করা।

অবশ্যই, বিশেষ উদ্দেশ্যে। এদিকে ধর্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ তাঁরা সকলেই যে জানেন এমনও মনে হয় না। বাংলাদেশে (আগের পূর্ব পাকিস্তান) যেনতেনপ্রকারেণ জনপ্রিয় হবার জন্যে তাঁরা সবরকম ট্রাপিজের খেলাই আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু তাঁরা হয়তো একটা কথা ভুলে যান যে, বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকা বাংলা ভাষাকে, বঙ্গসংস্কৃতিকে ভালবাসেন। যেসব লেখকের লেখা বা গায়কের গান বা চিত্রীর ছবি তাঁদের পড়তে শুনতে বা দেখতে ভালো লাগে তাঁদের কদর তাঁরা করবেনই। তা সেই সব লেখক যে-বাংলারই হন না কেন।

এই কথা পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের বেলাতেও সমানভাবেই প্রযোজ্য।

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনও বিভেদ বা বৈষম্য চলে না। তাই এই সব হরকত যাঁরা করেন বা করছেন তাঁরা নিজেদের ছোটো করা ছাড়া অন্য কোনও মহোত্তর উদ্দেশ্য সাধন করতে সম্পূর্ণই অপারগ হবেন।

ধর্ম আমিও মানি না, আমিও বিশ্বাস করি যে, মানবতাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। কিন্তু আমি একথাও অস্বীকার করতে পারি না এবং করি না যে, আমি হিন্দু বাবা-মার সন্তান এবং আমার অনেক আত্মীয়স্বজন তো বটেই। এবং আমার অগণ্য বন্ধুবান্ধব মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীও। আমি নিজের বিশ্বাসে নিজে চলি। কিন্তু সেই বিশ্বাস কোনও প্রচলিত ও মান্য ধর্মানুসারী নয়। কিন্তু তা বলে হিন্দুদের মুসলমান হতে এবং মুসলমানদের হিন্দু হতে বলি না। নিজের ধর্মাচরণ করেও পরের ধর্মের প্রতি অনেকে পরম শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারেন যে তাও দেখেছি। শিক্ষিত তাঁদেরই বলে।

ধর্ম না মানার মতো মানসিক উচ্চতা ও মুক্তি যে সর্বসাধারণের থাকবে তা আশাও করা যায় না। আশা করাটা উচিতও নয়। বরং যে-কোনও ধর্মের Rituals- এর মধ্যে দিয়েই সাধারণে তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের মাধ্যমে শুভ ও ন্যায়ের অনুসারী হন।

মুসলমানদের রোজা রাখা অথবা ইফতার খোলা, হিন্দুদের একাদশী, পূর্ণিমা, শিবরাত্রি, নীলের পুজো, দুর্গোৎসব এবং অন্যান্য পুজোর দিনের উপোস, মুসলমানদের ইদগাহ্‌তে জমায়েত হয়ে ইদের নামাজ পড়ার সময়ে খুৎবা মাধ্যমে আল্লার কাছে 'দুয়া' মাঙ্গা বা দিনে পাঁচবার নামাজ পড়া, ফজর (ফেজির), জোহর (দ্বিপ্রাহ্‌রিক), আসর (বৈকালিক), মগরেব (সান্ধ্যকালীন, মগরীব) এবং এশা (ঈশা) রাতের নামাজ—এসবও এই rituals -এর মধ্যেই পড়ে।

আত্মিক উচ্চতা সাধনের পথ এককে মানুষের এককেরকম। এই সব ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষের এককেরকম। এই সব ধর্মাচরণের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষই একই গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করেন। 'All Roads lead to Rome'।

স্বামী বিবেকানন্দ এই ব্যাপারটা যে স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন শুধু তাই নয়, প্রাঞ্জল করে সকলের জন্যে বুঝিয়েও গেছিলেন যে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু মুশকিলের কথা হল এই যে, এখন স্বামী বিবেকানন্দের লেখা ক'জনে পড়েন!

তবে পড়বেন।

ইংল্যান্ড, আমেরিকাতেও এই টি ভি-র হিড়িক এসেছিল অনেকই আগে। ভিডিও ক্যাসেটও। কিন্তু অন্তর্মুখী, প্রকৃত-শিক্ষিত মানুষ তো বই সেই সব দেশেও আজও পড়েন। আগের চেয়ে বরং বেশিই পড়েন। যাঁরা কোনওদিনও বই পড়ার মতো মানসিকতা অর্জন করেননি তাঁরা টি ভি আসার আগেও পড়তেন না, এখনও পড়েন না। তাঁদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনা উচিত নয়।

ভবিষ্যতে বইয়ের কদর হয়তো আরো বাড়বে বলে আমার মনে হয়।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নিরাকারের 'ধারণা' সকলে করতে পারেন না, তাই সাধারণের জন্যে মূর্তি-পুজোর বিধান দেওয়া আছে৷ Rituals-এরও প্রয়োজন আছে। মানুষের সার্বিক শুভবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগরুক করার জন্যে কিছু regimentation প্রত্যেক ধর্মের অনুশাসনেই আছে।

এর দ্বারা ব্যতিক্রমী মানুষ কোনওদিনই বদ্ধ ছিলেন না। আজও বদ্ধ নন।

এই প্রসঙ্গে এসে অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

Secular state বলতে কী বোঝায়?

আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই Secular শব্দটিকে নানা কদর্থ দিয়েছে এবং আজও তেমন ব্যাখ্যাই দিয়ে চলেছে। সবচেয়ে বেশি বিকৃত করেছে শব্দটিকে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার। তাদের ধ্বজাধারীদের অবগতির জন্যে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। এর জবাবে ওঁরা ওঁদের অপপ্রচারের সপক্ষে কী বলেন, তা জানতে ইচ্ছে করে।

এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে নেওয়া দরকার যে, আমার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলেরই ভাব যেমন নেই, শত্রুতাও নেই। আসলে আমি কোনও সরকারকেই পছন্দ করি না। কারণ, I want minimum government।

যদি প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের Avowed object দেশের হিতই হয় তবে আমার সঙ্গে তাঁদের কারওই কোনও বিরোধ থাকার কথা নয়। বিরোধ ঘটে, যখন মিথ্যাচার করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে; শুধুমাত্র ভোট বাগাবার জন্যেই রাজ্য ও দেশের ক্ষতি করা হয়।

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, বহুবছর আগে ড. আবিদ হুসেইনের একটি বই 'Indian Nationhood and national Culture'-এর রিভিউ করতে গিয়ে লিখেছিলেন : "It may appear somewhat strange that the Government should be a secular one while our culture is rooted in spiritual values. Secularism here does not mean irreligion or atheism or even stress on material comforts. It proclaims that it lays stress on the universality of spiritual values which may be attained by a variety of ways.

There is a difference between contact with reality and opinion about it. Between mystery of Godliness and belief of God. This is the meaning of secular conception of the state thought it is not generally understood."

সকলেই সবকিছু যদি বুঝে ফেলতে পারতেন তবে আর দুঃখ ছিল কী? নেতাগিরি করলে বা বি এ এম এ পাস করলেই যদি সর্বজ্ঞ হওয়া যেত তবে তো এই পৃথিবী সর্বজ্ঞতে ভরে যেত। তাঁদের পায়ের কাছে বসে শেখার জন্যে আমাদের হন্যে হয়ে সর্বজ্ঞ ও পণ্ডিত খুঁজে বেড়াতে হত না।

আনন্দবাজার পত্রিকাতে একটি মজার খবর পড়েছিলাম বেশ কিছুদিন আগে। সল্টলেক স্টেডিয়াম বা অন্য কোনও বাড়ি বা কমপ্লেক্সের উদ্বোধন অথবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্যে কেন্দ্রের মন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা মশাই যখন হিন্দু পুরোহিত এনে হাজির করেছিলেন তখন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সংস্কৃতি ও তথ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশায় উষ্মার সঙ্গে সেই পুরোহিতকে তাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'পুরোহিতের দরকার নেই। আমাদের রাজ্য ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য।'

যদি আনন্দবাজারের এই খবর সত্যি হয়, (জ্যোতিবাবুরা বলেন কিনা যে, আনন্দবাজার আর সত্য নাকি কখনই সহাবস্থান করে না।) তবে বলব যে, বুদ্ধদেববাবুর মতো সুপণ্ডিত মানুষ কী করে অমনটি বললেন বা করলেন তা আজও ভেবে পাই না।

এও জানি না যে, তখন বাগ্মী ব্যারিস্টার অজিতবাবু উত্তরে কী বলেছিলেন।

বা আদৌ কিছু বলেছিলেন কি না!

Secular State কাকে বলে তা নিশ্চয়ই দার্শনিক পণ্ডিত ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের; যিনি রাষ্ট্রপতিই শুধু নন, ভারতের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদূতও বটেন, চেয়ে নিশ্চয়ই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাই ভালো জানেন না। কারণ বুদ্ধদেববাবু যত বড়ো পণ্ডিতই হন না কেন ড. রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে তাঁর কোনোদিক দিয়েই তুলনা করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথ একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'যাঁরা সবকিছুই পণ্ড করেন, তাঁরাই পণ্ডিত।' ড. রাধাকৃষ্ণান সেই রকমের পণ্ডিত ছিলেন না। পুরোহিতকে না তাড়িয়ে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রীর উচিত

ছিল মৌলবিকে এবং পাদ্রি সাহেবকে এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও জৈন সাধুকেও সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠানো।

Secular State মানে তেমন State, তেমন দেশ, যেখানে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-জৈন-জোরাস্ট্রিয়ান এবং অন্যান্য সব ধর্মাবলম্বীই নির্বিঘ্নে এবং অন্যের বিরক্তি উৎপাদন না করে নিজ নিজ ধর্মের পূর্ণ বিকাশ ও প্রতিপালন করতে পারেন। সেই State "ধর্মহীন" State আদৌ নয়। বুদ্ধদেববাবুকে বিনীতভাবে বলব যে, আমাদের ভারতের "ধর্মনিরপেক্ষতা"-র সম্যক এবং সঠিক ধারণা তাঁর পড়াশোনা করে জেনে নেওয়া উচিত। ধর্মের মানে, এই প্রেক্ষিতে, আদৌ Religion নয়।

উপনিষদে আছে :

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনম্ কাসামান্যামেতাৎপশুভিঃ নরানাঃ।

ধর্মহি তেষাম্ অধিকো বিশেষোঃ ধর্মেনাহীনা পশুভিরসমানাঃ।।"

এই ধর্ম, হিন্দু মুসলমানের ধর্ম নয়, মানবের ধর্ম। "ইনসানিয়াত্"। সাহির লুধিয়ানবীর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় : "ন তু হিন্দু বনেগা, ন মুসলমান, ইনসানকি আওলাদ হ্যায় তু ইনসানহি বনেগো"।

আহার নিদ্রা ভয় এবং মৈথুন, পশু এবং মানুষের দুইয়েরই। কিন্তু মানুষের যে ধর্ম বা মানবিক গুণপনা, যেমন সাহিত্য, ছবি আঁকা, গান গাওয়া ইত্যাদি মানবতা বোধ; তা পশুর নেই। এতেই মানুষ পশুর চেয়ে বড়ো।

এই 'ধর্ম'ই জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষের কাম্য ও প্রার্থনার হওয়া উচিত।

সর্বভারতীয় শিয়া সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতাতে বাহান্নর পঁচিশে ডিসেম্বরে ড. রাধাকৃষ্ণান বলেছিলেন :

"The ideal of secularism means that we abandon the inhumanity of fanaticism and give up the futile hatred of others."

এছাড়াও মীরট কলেজের হীরকজয়ন্তী উৎসবে' তেপ্পান্নর বিশে ডিসেম্বরের বক্তৃতাতে উনি বলেছিলেন : "When it is said that we are a secular state, it does not mean that we have an indifference to tradition or irreverence to religion."

যদি কোনও ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীকে ঘৃণা করেন তবে তা অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শের পরীপন্থী বলে গণ্য হবে। সেই ধর্মাবলম্বী হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ক্রিশ্চান যিনিই হন না কেন! সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ!

Communismও তো ধর্মবোধহীনদের এক উগ্র ধর্ম। এক বিশেষ অধর্ম।

উপরোক্ত এই সাবধানবাণী কমিউনিস্টদের প্রতিও পুরোপুরি প্রযোজ্য।

জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল কিন্তু অজ্ঞতার সীমা কোনওদিনই ছিল না।

এতো সকলেরই জানা।

সাধারণার্থে ধর্মাচারী যাঁরা, তাঁদেরও মনে রাখতে হবে যে, সেই ধর্মাচরণ যেন কখনও দেশদ্রোহিতা না হয়ে দাঁড়ায়। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। যে-দেশ Secularism- এর স্বাধীনতা দিয়েছে মানুষকে, সেই দেশের সঙ্গে কেউ নিমকহারামি করলে তা বরদাস্ত করা উচিত নয়। Secularism মানে ভোট বাগাবার জন্যে কোনও বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের তোষণ নয়। Secularism শব্দের প্রকৃত মানে বুঝলে কোনও শিক্ষিত মানুষের পক্ষেই এমন সংকীর্ণমনা বা স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

পাঠক! আমি খুবই দুঃখিত। আপনাদের শীতের শেষরাতে মুড়ি স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রেখে চরতে চরতে কোথায় চলে এলাম দেখুন! অধমকে ক্ষমা করবেন।

চলুন এবার যাই এন সি সি-র ক্যাম্পে—পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ার বাগাইচাটোলিতে।

মুড়ি থেকে মালপত্র এবং আমাদের লাদাই করে ট্রেন যখন ছাড়ল তার একটু পরেই ভোর হয়ে গেল। দু'পাশের দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গেলাম। সেই সময়ের জঙ্গলাকীর্ণ, কলুষহীন, লোভহীন, সাঁওতাল পরগনার বন-পাহাড় ও মানুষের রূপের বর্ণনা করি তেমন ভাষা ঈশ্বর আমাকে দেননি। এর আগেও রাঁচি এসেছিলাম বাবা-মা এবং অর্জুন আগরওয়ালার সঙ্গে। কিন্তু এসেছিলাম, গাড়িতে। ধানবাদ থেকে চাস রোড হয়ে। তখন ট্রেনের পথের দু'পাশের এই দৃশ্য দেখিনি। ওই পথে বন-পাহাড় নেই বেশি।

অত্যন্ত রোমান্টিক ছিলাম বলে ওই গা-ছমছম পাহাড় ও উপত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে কেবলই মনে হচ্ছিল যে, ক্যাম্পে গিয়ে আর কাজ নেই। ইচ্ছা করছিল যে, সেই ধীরগতি পাহাড়ে-উপত্যকাতে চড়তে-থাকা ট্রেন থেকে নেমে এই নিশ্ছিদ্র জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাই, তারপর এরই মধ্যে, এই বন-পাহাড়ের মানুষদেরই একজন হয়ে, থেকে যাই বাকি জীবন। সেই অরণ্য-পর্বত প্রীতি, আন্তরিক ভালবাসা সেদিন প্রথম যৌবনে যেমন ছিল আজও তেমনই অটুট আছে। কৈশোরের দিন থেকে আজ অবধি ভারতের কত বিভিন্ন জায়গাতেই যে মনে মনে কল্পনার ঘর বানিয়ে থেকেছি, তা বলার নয়।

পরিচিতেরা আমার এই কল্পনা-বিলাস নিয়ে ঠাট্টা করেন। আমার সঙ্গে তাঁরা কেউ যদি থাকেন তো বলেন,'এখানে একটি পর্ণকুটির বানিয়ে বাকি জীবনটা থেকে গেলে কেমন হয়? একজন বনের মেয়েকে সঙ্গী করে?'

অন্য কেউ টিপ্পনী কাটেন, 'চপলা তরুণী, আভরণহীন, সরলা, প্রকৃত সুন্দরী এবং সৎ।'

আরেকজন বলেন, 'সে রাঁধবে, বাড়বে মাটির হাঁড়িতে আর মালসাতে, আপনি সেই খাদ্য খাবেন শালপাতার দোনায়। শীতের রাতে সে আপনাকে বুকের মধ্যে নিয়ে উষ্ণতা দেবে, গ্রীষ্মদিনে তার আঁচলের হাওয়া দিয়ে দাবদাহ থেকে বাঁচাবে।'

'কেমন হয়?'

আমি চুপ করেই থাকি।

ওই পংক্তিগুলি আমারই একাধিক উপন্যাস থেকে 'কোট' করেই ওঁরা বলেন।

মুখে আমি হাসি বটে, কিন্তু আমার চোয়াল দুটি শক্ত হয়ে আসে। কল্পনা নয়, মিথ্যে নয়, যদি আর ক'টা দিন সুস্থ দেহে বাঁচতে পারি তো করেই দেখাবো আমার আবাল্য কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারি কি না।

মাঝে মাঝেই স্বদেশের মানুষের উপরে আমার বড়োই অভিমান হয়। তাঁদের অন্তরের সঙ্গে ভালোবেসেছি বলেই অভিমান হয়। আমি কারও কাছ থেকেই কোনও শিরোপা চাই না। কিন্তু অভিমান হয় এই কারণে যে ভাষায় আমি লিখি, সেই ভাষাভাষী শিশু ও কিশোরদের, যাঁদের মধ্যে এখন অনেকে যুবক এবং অনেকে বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ়; গত তিরিশবছর ধরে বনের কথা, বনের মানুষের কথা, ফুল পাখি প্রজাপতির কথা এবং মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের কথা লিখে লিখে তাদের সুস্থ, সুন্দর, সৎ, প্রকৃতিপ্রেমী ভারতীয় নাগরিক করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, সেই একাহাতের নির্দল কিন্তু লাগাতার প্রয়াস কি আজ অবধি এই রঙ্গভরা বঙ্গভূমের কারও চোখেই পড়ল না? সারা জীবনের বিশ্বাসসঞ্জাত প্রকৃতি-প্রেমের বিকিরণ কি পুরোপুরিই বিফলে গেল?

এ কথা ভাবলেই মন বড়ো খারাপ হয়ে যায়। এই প্রচার-সর্বস্বতার দিনে আমার মতো মানুষের কথা কেই বা মনে রাখে! এমন মানুষের দাম কেই বা দেয়! আমি, না কোনো সংবাদপত্রের বশংবদ, না কোনও রাজনৈতিক দলের। পাঠক-পাঠিকারা ছাড়া আমার আর তো কেউই নেই।

নেই যে, সেজন্যে সত্যিই কোনও দুঃখ নেই। তাঁদের উপরে আমার বিন্দুমাত্র অনুযোগ বা অভিমান নেই। ঈশ্বর অনেকই দিয়েছেন। "যা দিয়েছ তুমি অনেক দিয়েছ। অযাচিত তব দান"।

রাঁচি থেকে যে-পথটি পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলার ঝালদাতে চলে গেছে সেই পথের উপরে একটি উদোম এবং সম্ভবত অনামা জায়গাতে আমাদের স্পেশ্যাল ট্রেনটা দাঁড়াল এসে সকালবেলাতে। জায়গাটা টাটিসিলেয়াই-এর কাছাকাছি, যতদূর মনে আছে।

আবার গন্ধমাদন অনলোডিং। তারপর পুনর্বার ট্রাকে ট্রাকে সেই সব মাল লোডিং। ততক্ষণে আমাদের ভাগ্যলিখন মোটামুটি আমরা মেনেই নিয়েছি। সে লিখন, বন্দরের কুলিগিরির।

ভর-সকালে যখন ট্রাকের সারি গিয়ে আমাদের একটি বিশ্বটাড় জায়গাতে নামিয়ে দিল, সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের ভাষায় "মাল-জান" সমেত; তখন চোখে সরষেফুল দেখলাম।

দু'জনের ভাগে একটি করে তাঁবু পড়ল। থাকার জন্যে নয়; বইবার জন্যে।

দূরের শূন্য প্রান্তরে তাঁবু খাটাবার উষর জায়গাটি, আরও দূর থেকে ব্যাটন নাচিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেওয়া হল। নিজেদের মাল, নিজেদের কাঁধে বয়ে নিয়ে গিয়ে টলটলায়মান পায়ে কুব্জ, ন্যুব্জ হয়ে তাঁবুসুদ্ধ অকুস্থলে পৌঁছোনো গেল। তারপর বন্ধুরা যাতে কাছাকাছি থাকতে পারি সেই চেষ্টাতে সচেষ্ট হওয়া গেল।

সকলেরই মনে তখন একই চিন্তা!

"পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলে হয় এবারে।"

রজত বলল, ওর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতাতে।

দুপুরের মধ্যেই সার-সার তাঁবু পড়ে গেল। একচুলও ট্যারা-ব্যাঁকা হলে চলবে না। হলও না 'ট্যারা ব্যাঁকা।"

"অগোছালো", "লেট হয়ে গেল স্যার", "আজ একটু তাড়াতাড়ি যাব স্যার"—এসব শব্দ বা বাক্য আর্মিতে অচল। এখানে মানুষ তাঁবু, খচ্চর তো অবশ্যই, এমনকি ট্রাক এবং জিপও "ফল-ইন" করে। পৃথিবীর যে-কোনও দেশের আর্মির কোনও খবর রাখলেই আপনি জানবেন যে, Inanimate objects-রাও এই বিশেষ রাজ্যে Utterly disciplined. No liberties given or taken। No চ্যাংড়ামি, No গাফিলতি, No সুপারভিশান। যে কাজ যাকে করতে বলা হয়েছে সেই কাজ সে সুষ্ঠুভাবে অবশ্যই করবে যে, এইটাই প্রত্যাশার। দু'পক্ষেরই। আর্মির রাজ্যে কাউকেই মানুষের উপরে কুকুর বেড়ালের মতো ছড়ি ঘোরাতে হয় না। "রিপোর্টটা কি করেছেন? রিটার্নটা কি ভরেছেন? আপিলটা কি লিখেছেন?" এমন লাগাতার পেছনে লেগে থেকে কাজ আদায় করতে হয় না আর্মির হায়ারার্কির কোনও স্তরেই। কারণ, সমস্ত আদেশই মান্যতার হাত ধরে মান্যকারীদের মধ্যে এক ধরনের গভীর আত্মসম্মানবোধ প্রোথিত করে দেয় সেখানে। সর্বক্ষেত্রে। "ঠিক সময়েই করে দেব"।

আর্মিতে কোনও কাজেই তিরিশ দিন সময় হাতে থাকলেও তাঁরা একদিনও বসে থাকেন না। কোনও কাজ ফেলে রাখেন না। যে কাজটা করণীয়, তা এক্ষুণি করতে হবে। Right now! অথবা, দেরি হলে, By, 4 p.m. sharp! This very day! এবং sharp মানে Sharp। ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা মিলিয়ে।

এই বাঙালি জাতকে বাঁচাতে হলে মাড়োয়ারিদের চরিত্র থেকে নির্যাস তৈরি করে বাঙালিদের প্রত্যেককে ইনজেক্ট করে দেওয়া দরকার, যাতে কর্মক্ষমতা ও জেদ বাড়ে। আর দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক

বাঙালিকে আর্মির-ট্রেনিংও এখনই অবশ্য দেওয়া দরকার। এই দুই হল, জাত হিসেবে আমরা যে বর্তমানে ওয়াটার-পোচ করা ডিমের মতো থল থল টল টল করে পদ্মপাতায় জলবিন্দুর মতো এদিক ওদিক করতে করতে যে কোনও মুহূর্তেই ধরাশায়ী হবার আশঙ্কাতে আছি, সেই আশঙ্কা দূরীভূত হতে পারে।

তবে মনে হয়, অনেকই দেরি হয়ে গেছে।

তাঁবু খাটানো হল। যার যার হোল্ড-অল সার করে পাতা হল। সিমেট্রিতে একটুও ছন্দপতন হল না। এক তাঁবুতে এদিকে তিনজন ওদিকে দিনজন। মধ্যে প্যাসেজ। সার্জেন্ট মেজর এসে আমাদের দেখিয়ে দিলেন কীভাবে নিজের নিজের থালা-গ্লাস-মগ খাওয়াদাওয়ার পর ধুয়ে মুছে নিজের নিজের বালিশের উপরে সাজিয়ে রাখতে হবে, কীভাবে ভোরবেলা বিছানা তুলতে হবে, কীভাবে বিছানার চাদর গুঁজতে হবে।

বললেন, প্রতিদিন, প্রয়োজনে, দু'বার নিজের জুতো পালিশ করতে হবে, মোজা কাচতে হবে, পট্টি ও বেল্ট এবং টুপির পেতলের অংশ ব্রাসো দিয়ে মেজে ঝকঝকে-তকতকে করে রাখতে হবে।

বলে গেলেন, সকালে বিউগল বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা ছেড়ে উঠে কীভাবে পনেরো মিনিটের মধ্যে প্রাতঃকৃত্য সেরে উ্যনিফর্ম পরে ফল-ইন করতে হবে ঘড়ির কাঁটা ধরে।

তারপর বললেন, এনি কোয়েশ্চেনস?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফল-ইন অবস্থাতে, 'স্ট্যান্ড-অ্যাট-ইজ এ' দাঁড়িয়ে, তারপর?

পনেরো মিনিট ফ্রি-হ্যান্ড একসারসাইজ। তারপর প্যারেড।

তারপর ব্রেকফাস্ট। তারপর আবার প্যারেড, ম্যাপ-রিডিঙের ক্লাস, লাইট মেশিন-গান শ্যুটিং, লেপার্ড-ক্রলিং শেখা, এক হাতে রাইফেল নিয়ে প্রায় শুয়ে শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বুকে হেঁটে, রুক্ষ, পাথুরে, কঙ্করময় 'বিশ্বটাঁড়ে' কল্পিত শত্রুর দিকে চিতাবাঘের মতো চাতুর্যের সঙ্গে এগোনো। তারপরে সিগন্যাল ক্লাস। তারপর ব্রেক। চান করে লাঞ্চ। তারপর আবার ক্লাস। বিকেল চারটেতে টি-টাইম। তারপরে একটু ব্রেক। তারপরেই ক্যাম্পফায়ার। রাত ন'টার মধ্যে লাইটস-অফ। কারও তাঁবুতে আলো জ্বললেই শাস্তি।

তবে এই রুটিনের হেরফের, আগ-পরে হতে পারে।

সার্জেন্ট মেজর চলে গেলেই আশুতোষের সুশান্ত বলল, হাঁরে, বুদ্ধ, শালাবা দিয়েছে তো হ্যারিক্যান! তার আবার লাইটস-অফফ। হাতে হ্যারিক্যান করে বাতেল্লা। সুখে থাকতে কী ভুতে কিলোল মাইরি! কেন যে মরতে এখানে এলাম!

সার্জেন্ট মেজর ফিরে এসে বললেন, বলতে ভুলে গেছি, নাইটগার্ড ডিউটি দিতে হবে তোমাদের বদলে বদলে, চার ঘণ্টা করে। প্রথম রাতে একজন, শেষ রাতে আরেকজন। কে প্রথমে, কে পরে, কার কোনদিন তা, প্রতি ক্যাম্পের তোমরাই ঠিক করে নেবে। পনেরোদিনের ক্যাম্প।

ভাবলাম, এমনি করে কাটাতে পারব তো পনেরোটা দিন?

বলেই, সার্জেন্ট মেজর বললেন, "ডোন্ট ফরগেট দ্যাট উ্য আর আ জ্যাভেরিয়ান। উই হ্যাভ আ ট্রাডিশান!"

"কিপ ইট আপ বয়েজ। ডোন্ট লুজ আ সিঙ্গল পয়েন্ট। ইফ উ্য ড্যু, আই উইল কিল উ্য।"

সার্জেন্ট মেজর অমিতদা বললেন। অমিত সরকার।

পয়েন্ট? কিসের পয়েন্ট?

অরিজিৎ জিজ্ঞেস করল।

কিসের পয়েন্ট নয়? ক্লিনলিনেস-এ পয়েন্ট। পার্সোনাল ক্লিনলিনেস এবং তাঁবুর মধ্যের ক্লিনলিনেস। একটা বিচালি এদিক-ওদিক হলে চলবে না। বুট, পট্টি, টুপি, বেল্ট ঝিকমিক করবে। টার্ন-আউটে পয়েন্ট; প্যান্টালুনের মধ্যে শার্ট নিয়মমাফিক গুঁজতে হবে। শার্ট যদি বেরিয়ে থাকে তাহলে পয়েন্ট কাটা যাবে। কোন প্লেটুন কেমন টার্ন-আউট করল, তা দেখে পয়েন্ট দেওয়া হবে।

ড্রিলে পয়েন্ট। রাইফেল শ্যুটিং-এ প্রোন-পজিশানে, সিটিং-পজিশানে এবং স্ট্যান্ডিং পজিশানে আলাদা আলাদা পয়েন্ট। এল এম জি শ্যুটিং-এ পয়েন্ট, ম্যাপ রিডিং-এ পয়েন্ট, সিগন্যালিং-এ পয়েন্ট, লেপার্ড ক্রলিং-এ পয়েন্ট, অবসার্ভেশান-এ পয়েন্ট; সবই তো জানো! আবার ন্যাকামি করছ কেন?

এই 'অবজার্ভেশান' ব্যাপারটা খুব মজার ছিল। পাঠক! মনে করুন একটি ঝুড়ির মধ্যে পঁচাত্তর রকম জিনিস, বিভিন্ন রঙা, বিভিন্ন আকৃতির, একটা করে রাখা আছে। ঝুড়িটা একেকজনের সামনে তিরিশ সেকেন্ড বা মিনিট খানেক রেখেই সরিয়ে নেওয়া হবে। ওই একঝলক দেখেই কাগজে লিখে দিতে হবে সবক'টা জিনিসের নাম। সম্ভব হলে রঙ এবং আকৃতিও।

সুশান্ত স্বগতোক্তি করল, হত সুন্দরী মেয়ের মুখ, অবজার্ভেশান কারে কয় তা দেখিয়ে দিতাম।

আগেকার দিনের যুদ্ধ, এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও তো অনেকই অন্যরকম ছিল! সে যুদ্ধেও ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্যের অনেকই দাম ছিল ব্যক্তির বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। অবশ্যই। তা তিনি সামান্য সোলজারই হন বা জেনারেল। এখন তো যুদ্ধ বোতাম টেপাটেপিরই হয়ে গেছে।

যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সত্যিই লাগে কোনওদিন তবে সে যুদ্ধ তেমন শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস আদৌ রচনা করবে না, যতটা করবে টেকনোলজির। খুন আর ধর্ষণ আর সার্বিক ধ্বংসের আর কলঙ্কের ইতিহাস হবে সে যুদ্ধ। Croatia আর Serbs-দের যুদ্ধ যেমন হল!

'Guns of Navarone' বা 'The Bridge one the river Kawai' বা 'From here to etemity' বা 'All quiet on the Westen Front' বা Battle of Britain'- এর মতো বই লেখা বা ফিল্ম হওয়ার কোনও সুযোগই আধুনিক যুগের যুদ্ধ দেবে না।

সেই অনাগত যুদ্ধের রকমটা কেমন হতে পারে তার একটা আন্দাজ আমরা দেখেছি ইরাক আর মুখ্যত ইউ এস এ-র যুদ্ধর ভিডিও ফিল্ম দেখে, টিভিতে। মেয়ে সৈনিকরা এয়ার-কন্ডিশানড স্যুট পরে মরুভূমিতে, জার্মানির কিংবদন্তি হয়ে-যাওয়া 'ডেজার্টফক্স' জেনারেল রোমেল এবং ব্রিটেনেরও কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া জেনারেল মন্টোগোমারির ট্যাংক-ওয়ারফেয়ারের ব্যক্তিগত শৌর্যের কথা তো ইহিহাস হয়ে রয়েছে। তাঁদের দৃষ্টান্ত কত লক্ষ লক্ষ তরুণ আর্মি-অফিসারদের সারা পৃথিবীতে উদ্বুদ্ধ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

'লরেন্স অফ অ্যারাবিয়ান' শেষ হবার পরে দেশের স্বার্থে নিজেদের জীবন আহুতি-দেওয়া, মহান, দুঃসাহসী একগুচ্ছ পাইলটের স্তুতি করতে গিয়ে তৎকালীন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল পার্লামেন্টে তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ বাগ্মিতায় যে সামান্য ক'টি কথা বলেছিলেন, তেমন কথা ভবিষ্যতের কোনও যুদ্ধের মুষ্টিমেয় নায়কদের সম্বন্ধে আর বলা যাবে কি না আদৌ, যে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

উনি বলেছিলেন, মৃত পাইলটদের প্রতি দেশবাসীর হয়ে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে : "Never in the history of mankind, so many, had owed so much, to so few."

কার গায়ে কত জোর সেটা কখনই বিচার্য বিষয় নয়। অথরিটিকে, গায়ের জোরকে, চক্রান্তকে, এস্টাব্লিশমেন্টকে, মিডিয়ার দূরভিসন্ধিকে, মনোপলিকে কে কতখানি সাহসের সঙ্গে অগ্রাহ্য করতে পারেন, কে তাদের বশংবদ না হয়ে শোকে দুঃখে অপমানে অসম্মানে মাথা উঁচু করে মানুষের মতো মানুষ হয়ে এই ক্লীবে-ভরা পৃথিবীতে মানুষের যোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে বেঁচে থাকতে পারেন; সেটাই বড়ো কথা। মীর সাহেবের সেই একটা শের আছে না,

"হিঁয়া আদম নেহি হ্যায়,
সুরত-এ আদম বহত হ্যায়।"

অর্থাৎ মানুষ এখানে বেশি নেই, মানুষের চেহারার জীব অনেকই আছে।

এন সি সি-র ট্রেনিং, আর্মির ট্রেনিং প্রত্যেক অনুভূতিশীল মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে বলেই মনে হয়েছে আমার। যে-রেখা পরবর্তী জীবনে সাহসের সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শত্রুদের মোকাবিলা করতে গভীরভাবে সাহায্য করে। এক গভীর আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। ব্যক্তির চারিত্রিক

দার্ঢ্যই তার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। টাকা- পয়সা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ এসব আসলে বিশেষ কাজে লাগে না জীবনে। প্রত্যেক মানুষকেই একা হাতেই তার নিজের বিশ্বাসের ধ্বজা আজীবন বইতে হয়।

সবচেয়ে কষ্ট হতো সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরে পরদিন অন্ধকার থাকতে থাকতে ওই ঠান্ডাতে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠতে, শীতে, হাত-পায়ের আঙুলের কোনা ফেটে রক্ত বেরুত অনেকেরই। বিউগল বাজলেই কম্বল করিয়ে উঠে পড়তে ভারি কষ্ট হতো,। অমিতদা (সরকার) তাঁর ওই ছিপছিপে সুন্দর শরীরের মধ্যে থেকে যে কোন্ বাঘের গলা বের করতেন সাত সকালে, তা যাঁরা না শুনেছেন তাঁরা বুঝবেন না।

উনি বলতেন, বাঘেরই মতো তাঁবুর পর্দা দিয়ে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে—'উইল ড্যু গেট আপ?'

তখনও না উঠলে, তারপর বলতেন, উইলল্যু?

আমার কানে সেই 'উইলল্যু' টা 'উল্লু' শোনাত।

উনি হয়তো mean-ও করতেন, তাই।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মাঠের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ড দাঁড় করিয়ে প্রফেসরেরা, মেজর বা লেফটেন্যান্ট, আমাদের যুদ্ধের থিয়োরি পড়াতেন। নানারকম জিনিস শেখাতেন। কিন্তু অপরিসীম পরিশ্রমের শেষে, ভরপেট খাওয়ার পরে, ঘাড়ে বোদ পড়লেই শীতকালে চোখ বুজে আসে। চোখের পাতা খুলে রাখতে তখন বড়োই কষ্ট হত। তবে বাঁচোয়া ছিল এই যে, শখের অফিসার-প্রফেসরদের মধ্যেও কারও কারও সেই সময়ে ঘুম পেয়ে যেত। তাই তাঁরা বিশেষ নজর দিতেন না কোনও ক্যাডেটের চোখ বুজে এলে। ওঁদের সঙ্গে প্রফেশনাল আর্মি-অফিসারেরা, ল্যান্স নায়েক, নায়েক, সার্জেন্ট ইত্যাদিও থাকতেন। তাঁরা বড়ো মাখমবাবু, ছোটো মাখমবাবুদের নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করতেন।

চান করারও ছিল আরেক ঝামেলা। ফাঁকা মাঠে একটু পাঁচিল তোলা, আর দু'পাশটাতেও সামান্য পাঁচিল। উপরে শাওয়ার লাগানো ছিল পরপর। পাশাপাশি উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে শাওয়ারের নীচে চান করতে হত। অনেক ছেলে, সেই সময়ে অশ্লীল কিন্তু মজার মজার গান গাইত। তাদের স্টক দেখে অবাক হয়ে যেতে হত।

আশুতোষের একটি ছেলে পাটকেলের টুকরো দিয়ে দেওয়ালের ভিতর দিকে এক দুপুরে লিখে দিল 'প্রত্যেকে নিজ নিজ (নিজস্ব) পশ্চাদ্‌দেশ সামলাইবেন'।

'নিজস্ব পশ্চাদ্‌দেশ' শব্দ দুটি এখনও মনে পড়লে, হাসি পায়।

সেন্ট জেভিয়ার্সের অনেক ছেলেই মোটামুটি ভালো ইংরেজি বলতে পারত। আশুতোষ কলেজের ছেলেরা ভালো লিখত হয়তো ইংরেজি কিন্তু তেমন বলতে পারত না।

আশুতোষ অথবা মৌলানা আজাদ কলেজের ঠিক মনে নেই, একজন অধ্যাপকও অফিসার ছিলেন। লম্বাচওড়া কিন্তু গোলগাল নাদুসনুদুস, ফরসা, কিন্তু একেবারেই আনলাইক অ্যান আর্মি অফিসার। এবং তাঁর শরীরের গড়নও ছিল মেয়েলি। আর বিস্তারিত নাই বা বললাম।

আশুতোষেরই একটি ছেলে একদিন বাগাইচাটোলিতে পারেড করতে করতেই বলেছিল, 'যাঃ শালা! এই নারীহীন নির্বাসনে এটুকুই কনসোলেশান'।

সেই অধ্যাপককে তাঁর কলেজের ছেলেরা, আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে এবং পৃথিবীর কোনও পরিচিত ভাষাব সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক-বিবর্জিত একটি শব্দে তাঁকে আড়ালে সম্বোধন করত। শব্দটি ছিল 'ড্যাম্বা'।

কেন ড্যাম্বা? বা কিসের ড্যাম্বা? কী "ড্যাম্বা"। তা জিজ্ঞেস করিনি।

করলেও কেউ বলতে পারত বলে মনে হয় না।

উনি ছিলেন ওঁর কলেজের ছেলেদের আড়ালের "ড্যাম্বা"। ওই ড্যাম্বা নামকরণের কথা অন্য অফিসাররাও জানতেন। সম্ভাষণের অধিকার চিরদিনই গণতান্ত্রিক অধিকার। স্বৈরতন্ত্রে বা রাজন্যেও। তাতে, 'কি' বা 'কেন'র কোনও ভূমিকা নেই।

আমাদের তীর্থপতি স্কুলের বকা ছেলেরাও চারজন শিক্ষকের নামকরণ করেছিল 'ছুঁচো', 'ছলো', 'পিসিমা' এবং 'বমগার্টন'। স্কুলের অন্য শিক্ষকেরা ওই নামের কথা এবং আড়াল থেকে সম্ভাষণের কথা জানতেন। আর জেনে, শ্লাঘা বোধ করতেন। সুখে থাকতেন নিজেরা নিজেদের মান নিয়ে বেঁচে গেছেন বলে। ছেলেরা নিজেদের পা-টি মাড়ায়নি বলে।

আশুতোষের ছেলেদের মধ্যে একজন ক্যাডেটেরও নাম ছিল "ড্যাম্বা"। সেটা তার পিতৃমাতৃদত্ত নাম, না ছেলেদেরই দেওয়া নাম তা বলতে পারব না। এই ড্যাম্বা আর ওই ড্যাম্বাতে কী তফাত ছিল তাও বলতে পারব না। সকলেই তাকে প্রকাশেই ড্যাম্বা বলে ডাকত শুনতাম। ডোনাল্ড ম্যাকেঞ্জি আর উই ম্যাক-এরই মতো সকলে বলত 'বড়ো ড্যাম্বা' আর 'ছোটো ড্যাম্বা'। দুই ড্যাম্বার পৃথকীকরণের একমাত্র উপায়।

লাঞ্চের পরে, একদিন বুকে হেঁটে হেঁটে লেপার্ড-ক্রলিং করতে গিয়ে ক্যাডেট ড্যাম্বার, মানে 'উই' ড্যাম্বার শরীরের জায়গা-বিশেষের সঙ্গে বাগাইচাটোলির একটি সলিড, চতুষ্কোণ, অমসৃণ নুড়ির ঠোকাঠুকি হয়ে যায়।

পুরুষমাত্রই, পুরুষদের মধ্যে যারা বাঘ বা সিংহও, তারাও শরীরের জায়গাবিশেষে বড়োই দুর্বল। পুরুষমাত্রই তা জানেন। পুরুষের শরীরে সেই 'অ্যাকিলিসে'স হিল'-এ অচানক 'ঠোক দেল্।'

পাঠক, এই 'ঠোক দেল্' হল হাজারিবাগ, রাঁচি এবং পালাম্যু জেলার ভাষা।

এইরকম অচানক সব ঘটনার পৌনঃপুনিকতা থেকেই সম্ভবত মধ্যপ্রদেশর বিলাসপুর থেকে অমবকণ্টক যাবার পথে একটি জায়গার নাম 'অচানকমার' হয়েছে।*

অচানকমার হবার সঙ্গে সঙ্গেই 'ছোটো ড্যাম্বা' চোখ বড়ো বড়ো করে, রাইফেল এক পাশে ছুড়ে ফেলে, নিজে অন্যদিকে গড়িয়ে গিয়ে 'পিসি গোওও' বলেই, অজ্ঞান হয়ে গেল।

মা অথবা বাবা নন কেন? পিসি কেন?

তা আমি বলতে পারব না। সম্ভবত দীপকের জেঠাইমারই মতো ওরও একজন নিঃসন্তান স্নেহের আধার পিসি থেকে থাকবেন।

চশমা-পরা চোখ দুটো ড্যাম্বার এমনিতেই বড়ো বড়ো ছিল। ওই আঘাতে তা আরও বড়ো হয়ে, যাকে বলে ড্যাবা-ড্যাবা হয়ে চশমা প্রায় ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমরা কী করব বুঝতে না পেরে হতভম্ব হায় লেপার্ড-ক্রলিং করতে করতে বুকে-শোওয়া অবস্থাতেই স্ট্যাচু হয়ে গেলাম।

পাঠক! শুধু নকল যুদ্ধেই নয়, আসল যুদ্ধের সময়েও এমন ক্যালামিটি শুধু ঘটতে পারে না, ঘটেও।

সেই 'অচানকমারের' মুহূর্তে আমাদের কলেজের একজন প্রফেসর (মেরে ফেললেও তাঁর নাম বলব না) লেপার্ড ক্রলিংয়ের চার্জে ছিলেন। উদোম বিশ্বটাঁড়ে অগণ্য 'লেপার্ড' তখন 'ক্রল' করা অবস্থাতেই ফ্রিজ করে গেছিল। উনি ব্যাপারটা আন্দাজ করেই আশুতোষ কলেজের যে-ক্যাডেটটি হাতের কাছে ছিল এবং যে ড্যাম্বার অবস্থা দেখে সবচেয়ে বিচলিতও বটে, তাকেই বললেন, 'গো ইমিডিয়েটলি অ্যান্ড রিপোর্ট ট্যু দ্যা অ্যাডজুট্যান্ট। দ্যা ইনজিওরড ক্যাডেট শুড ইমিডিয়েটলি বি টেকন টু দ্যা হসপিটাল অ্যাট রাঁচি।'

তারপর বললেন, উৎফলো জ্যুলো মি?

ইয়েস স্যার।

এনি কোয়েশ্চেনস?

ইয়েস স্যার। নো স্যার। বলেই, ছেলেটি ক্রলিং-পজিশান থেকে দাঁড়িয়ে উঠে দৌড়ে গেল অ্যাডজুট্যান্টকে ব্যাপরটা রিপোর্ট করতে।

এদিকে সেই কুক্ষণে, মানে, আচনকমারের ক্ষণে; প্রফেসর ড্যাম্বা, মানে 'বড়ো ড্যাম্বা' লাঞ্চের পরে একটি গাছে হেলান দিয়ে বসে প্রবোধ সান্যাল মশাইয়ের একটি উপন্যাস পড়ছিলেন।

* 'পরদেশিয়া' (উপন্যাস)—প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং

এদিকে দূত, পৃথিবীতে দূতমাত্রই অবধ্য; বৃহস্পতি বা বুধ গ্রহর কথা জানি না, হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে অ্যাডজুট্যান্ট সাহেবকে জোরসে বুট-ঠুকে স্যালুট করে, ঘটনাটা জানাল।

পাঠক! সেই কুক্ষণে তাঁহাদের দুই জনের কথোপকথন ইংরেজি ভাষায় কিমৎ হইয়াছিল তাহা আক্ষরিকভাবে লিখিত হইলে নিম্নরূপ হইবেক :

অঙ্ক এক/ দৃশ্য এক

দূত—(হাঁপাতে হাঁপাতে) গুড আফটারনুন স্যার।

অ্যাঃ—(অ্যামেচার নন) গুড আফটারনুন।

(ওষ্ঠযুগল হইতে বাঁকানো ডানহিল পাইপ নামাইয়া) হোয়াট ইজ ইট ক্যাডেট? হোয়াট ব্রিংগস উ্য হিয়ার? হোয়াট মেকস উ্য প্যান্ট?

দূত—অ্যাকসিডেন্টালি স্যার। প্যান্ট অলরাইট।

অ্যাঃ—হোয়াট অ্যাকসিডেন্ট?

দূত—অ্যাকসিডেন্টালি লেপার্ড!

অ্যাঃ— হোয়াট ডু্য উ্য মিন?

দূত—স্যার। ড্যাম্বা স্যার। ড্যাম্বা গান ফট্।

অ্যাঃ—হোয়াট ড্যাম্বা? হোয়াট গান ফট্?

নিজ শরীরে অ্যাকিলিসে'স হিল এর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতঃ দূত কহিল, ক্রলিং, ক্রলিং গান ফট্?

দূত, বাক্যটি সম্পূর্ণ করিবামাত্রই অ্যাডজুট্যান্ট সাহেব চকিতে বুঝিয়া লইলেন যে-অধ্যাপককে ক্যাডেটরা 'ড্যাম্বা' বলিয়া সম্ভাষণ করিত তাঁহারই যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। মানে, দফারফা। তাঁহার উপরে অ্যাঃ-র (অ্যামেচার নন) কিঞ্চিৎ 'খার'-ও ছিল। তাই সংবাদ শুনিয়া যারপরনাই খুশি হইয়াও তিনি তাহা প্রকাশ কহিলেন না।

ঘটনার ভয়াবহতা অথবা গভীরতা না বুঝিয়াও অনুমান করিয়া লইয়া ক্ষণকালমাত্র চিন্তা করিয়াই সেনাধ্যক্ষসুলভ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত ফোন উঠাইয়া অ্যাডজুট্যান্ট কাহাকেও কিছু করিলেন।

ওইরূপ দ্রুত লয়ে নিক্ষিপ্ত এবং সাহেবি-উচ্চারণের ইংরেজি আমাদিগের প্রেরিত দূতের বোধগম্য হইল না। তাহার কর্ণমধ্যে শুধুমাত্র ড্যাম্বা শব্দটিই প্রবিষ্ট হইল।

দূত—গো স্যার, মি? নাউ? মে আই গো-ও?

অ্যাঃ—ইয়া। গো গো। উ্য গো। ডোন্ট ওয়ারি। উই আর ইমিডিয়েটলি রিমুভিং হিম টু রাঁচি মিলিটারি হসপিটাল।

ইহার পরের দৃশ্য।

দৃশ্য দুই/প্রথম অঙ্ক

প্রফেসর ড্যাম্বা প্রবোধ সান্যাল মহাশয়ের উপন্যাসের মধুরতম পাতাতে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। এমৎ সময়ে তাঁহার নিকটে তীর বেগে একটি জিপ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কিঞ্চিৎকালও বিলম্ব না করিয়া দুইজন 'মেডিকো' তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া, আমরা যে পদ্ধতিতে অ্যামুনিশন বক্স লাদাই করিয়াছিলাম সেই পদ্ধতিতে মুহূর্তমধ্যে জিপমধ্যে উপস্থাপিত করিবা-মাত্র চালকের আসনে উপবিষ্ট জওয়ান ভয়ানক বিপজ্জনক বেগে রাঁচি অভিমুখে জিপ 'ছুটাইয়া' দিল।

প্রোঃ ড্যাম্বা (মানে, বড়ো ড্যাম্বা) স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় কহিলেন, হোয়াট ইজ দিস?

ড্যাম ইট। হোয়াট ইজ দিস? হোয়্যার আর উ্য টেকিং মি? উঃ?

ওই 'উঃ' শব্দটিই প্রকাশ করিয়া দিল যে, তিনি ইংরেজ নন; বঙ্গসন্তান।

হরিয়ানা-তনয় প্রথম মেডিকো ততক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে দ্বিতীয়কে কহিল, 'আরে এ ভজনলাল, সাবকো অচ্ছাসে পাক্কড়কে বৈঠ। ডিলিরিয়াম হো রহ্যা হ্যায়। চোট বহতই জোর হ্যায়।

দ্বিতীয় মেডিকো (সেও জাঠ)-সাবকো হুয়া ক্যা? খুন-উন তো কুছ দিখত্যা নেহি।

প্রথম মেডিকো—কওন জানে হুয়া ক্যা? অ্যাডজুট্যান্ট সাবকা অর্ডার। আরে খুন কা কম্মি ক্যা হ্যায়? হাসপাতালকি সার্জনলোগ ফটাফ্ফট চাক্কু অন্দর করনেসেই খুন বহলতে লাগেগা যমুনাকি পানি যৈসি। হুঁঃ।

প্রোঃ ড্যাম্বা—আই সে-এ-এ স্টপ দিস ননসেন্স। আই উইল কোর্ট মার্শাল উ্য। ঘুমাও জিপ। বাঁদর কোথাকার। বাঁদরছানা!

সেই দ্রুতগতি জিপের ড্রাইভার নদী-নালা কদলী-নারিকেল কেরলের বাসিন্দা। সে জিপ চালাইতে চালাইতে, স্বীয় মস্তক পশ্চাদদেশে ঘুরাইয়া 'মেডিকোদের' কহিল : আরে বাই, থুনো এই থুনো। তুম দোনো উনকা টেংরি পাক্কাড়কে ছান্ত হো কর বৈটো। ছমঝা?

জিপ ছুটিতে লাগিল দ্রুতবেগে, রাঁচির মিলিটারি হসপিটালের উদ্দেশে।

দৃশ্য তিন/ প্রথম অঙ্ক

ভূমিশয্যায়-শয়ান 'ছোটো ড্যাম্বা' দুই হস্ত একত্রিত করিয়া দুই করপুটে অঞ্জলির মুদ্রা রিভার্স করিয়া অকুস্থলে সংস্থাপিত করত উচ্চৈস্বরে, সদ্য-প্রসূত পাটনাই বকনা বাছুরের ন্যায় কহিল, 'পিসিমা, অ পিসিমা। পিসিমা গো-ও-ও-ও।'

প্রত্যাবর্তন করত : অবধ্য দূত এবং অন্যেরা তাহার মুখমণ্ডলপরি ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমস্বরে কহিল : কোনও চিন্তা করিসনিরে ড্যাম্বা। অ্যাডজুট্যান্ট সায়েব অর্ডার দিয়েছেন তোকে এক্কনি হাসপাতালে নিয়ে যাবে জিপ এসে।

'ছোটো ড্যাম্বা' পুনর্বার অ পিসিমা। অঃ, অঃ; জল। জল করতঃ সংজ্ঞা হারাইল।

[যবনিকা পতন]

পাঠক! আশাকরি আপনারা ইতিমধ্যে আমাদের সেন্ট জেভিয়ার্সের সহপাঠী হানিফ মহম্মদকে ভুলে যাননি। সেই হানিফ যে, ট্রাম-কন্ডাকটরের মতো করে ইতালিয়ান "বেরে" (BERET) ক্যাপ পরে লেফটেন্যান্ট চ্যাটার্জির নিত্য এবং অত্যন্তই বিরাগভাজন হয়েছিল।

প্রফেসর চ্যাটার্জি তাকে অকথ্য গালাগালি করতেন। এবং আগেই বলেছি, সেই ব্রাহ্মণ সন্তানের হয়তো আমাদের যবন-সখার উপরে পূর্বজন্মের কোনও অসূয়া অথবা জাতক্রোধ ছিল। নইলে ইকমিক্সের ক্লাসে প্রচুর গোস্ত-বিরিয়ানি এবং গুলহার কাবাব খেয়ে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হওয়াতে টুপি বেঁকিয়ে মাথাতে একটু হাওয়া খেলালে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হতো তা আমরা বুঝতে পারতাম্ না।

আজও বুঝি না।

ক্লাসে একদিন ডা-সিলভা বলেছিল যে, ট্যু দ্যা বেস্ট অফ মাই নলেজ; হি জি আ ক্রিশ্চান।

প্রফেসর চ্যাটার্জি ক্রিশ্চান ছিলেন, হিন্দু ব্রাহ্মণ নন।

ডা-সিলভার মুখে শোনা অবশ্য।

কংস রাজাকে নিধন করার জন্যে গোপপুরে কৃষ্ণ যখন "শশীকলার ন্যায়" বৃদ্ধি পাইতেছিল তখনই তালেবররা জানিতেন যে ভবিষ্যতে কী হইবে। 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।'

আমাদের হানিফও যে তেমন করেই বাড়ছিল, চ্যাটার্জি সাহেবের যম হয়ে, সেকথা আমাদের কারোই জানা ছিল না।

সেদিন সকাল থেকেই সমস্ত ক্যাম্পে সাজো-সাজো রব পড়ে গেল।

আসলে, পড়েছিল তার আগের দিন থেকেই। কারণ, পরদিন সেকেন্ড বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের তৎকালীন কম্যান্ডিং অফিসার কামা আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শনে আসছেন।

আর্মিতে কোনও ব্যাপারই কিছুমাত্র কম সিরিয়াস নয়। জেনারেল মন্টোগোমারি বা আচিনলেক বা ম্যাকআর্থার টিউনিসিয়া বা ইতালি বা ফিলিপিনস 'পরিদর্শনে' গেলে যেমন সাজ সাজ রব পড়ে যেত, বাগাইচাটোলিতে বালখিল্য আমাদের শখের এন সি সি-র ক্যাম্প ইনস্পেকশনেও সিরিয়াসনেসের কোনও খামতি ছিল না।

"আ পারফেক্ট থিং ইজ পারফেক্ট হোয়াটেভার মে বি ইটস ম্যাগনিচ্যুড।" যে গৃহিণী সুন্দর করে গুছিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে সংসার পরিচালনা করেন তিনি যতখানি সার্থক ও প্রশংসার্হ, একজন বহুযুদ্ধ-জয়ী জেনারেলও তেমনই। দুজনের গুণপনাতে কোনওই তারতম্য নেই। যদিও তাঁদের কর্মক্ষেত্রের ম্যাগনিচ্যুডে অবশ্যই আছে।

এটা আঁদ্রে মরোয়ার কথা, তাঁর "THE ART OF LIVING" বইতে আছে।

ইন্সপেকশনের মহড়া চলছে জোর। পট্টিতে, টুপিতে, বেল্টে, ব্রাসো ঘসে ঘসে আঙুল খয়ে গেল। দাড়ি নিপুণ করে কামাতে গিয়ে মুখের চামড়াই এক পরত উঠে গেল, তবুও কর্তাদের মন পাওয়া যায় না। শীৎকারের সঙ্গে চিৎকার করে, আমার ঠাকুমা যাকে বলতেন "চিক্কুর পাইড়্যা"; মুখের যত্রতত্র খামচে ধরে সার্জেন্ট তবু বলেন, হোয়াট অ্যাবউট হিয়ার! হিয়ার? হি-হিয়ার?

সেই চিমটিতে তরুণ যৌবনের তরতাজা গালে কালশিরা পড়ে যেত আর ইচ্ছে করত, দিই রাইফেলের এক কুঁদোর বাড়ি মেরে তাঁর সার্জেনত্ব চিরদিনের মতো ঘুচিয়ে।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করি। ক্যাম্পের মধ্যে চার-ইঞ্চি বাই চার-ইঞ্চি আয়নাতে মুখ দেখে শীতের সূর্যোদয়ের আগের আধো-অন্ধকারে দাড়ি কামালে মুখের জঙ্গাল এর চেয়ে ভালো সাফ কী করে হতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির বাইরে ছিল।

বাগাইচাটোলির ক্যাম্পে লেফটেন্যান্ট চ্যাটার্জি ছিলেন কোয়ার্টার-মাস্টার। সোজা বাংলাতে যাঁকে বলা যায় যৌথ পরিবারের বড়ো গিন্নি; অথবা জেঠাইমা, অথবা বাল-বিধবা পিসিমা। যাঁর জিম্মাতে ভাঁড়ার ঘর, হেঁসেল—সব কিছু।

আগের দিন রাতে তিনি হানিফ মহম্মদের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়ে সশরীরে হানিফের ক্যাম্পে এসে বলে গেলেন, 'লিসসন হানিফ, তেমনই ভাবে হানিফ তার বাঁ চোখের আধখানা এবং ডান চোখের টু-থার্ড খুলে চ্যাটার্জি সাহেবের দিকে আধো মুখ তুলে বলেছিল, জি স্যার।

ও কখনওই চ্যাটার্জি সাহেবকে ইয়েস স্যার বলত না। আর চ্যাটার্জি সাহেবকে, আমাদের কাছে রেফার করার সময়ে বলত, "ছাঁটাচি" সাব।

চ্যাটার্জি সাহেব দাঁত কড়মড় করে (কিড়মিড়-এর সুপারলেটিভ) বললেন, উইল্যু ফরগেট অ্যাজ ওয়েল?

জি স্যার?

হোয়াট জি স্যার?

আই মিন ইওর ক্যাপ।

জি নেহি স্যার। টোপি তে হাইয়েই হ্যায় স্যার। হাউ ক্যান আই ফরগেট?

স্টপ ইট। ডোন্ট ফরগেট টু ওয়্যার ইট ইন দ্যা কারেক্ট ম্যানার।

নো জি।

প্রমিস?

প্রমিস জি।

এই ধরাধামে যে কত মহৎ মানুষের মধ্যে কতরকম ক্ষুদ্রতা থাকতে পারে এবং থাকে, কত ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যেও আবার কতরকম মহত্ত্বও থাকতে পারে তা ভাবা যায় না। কতরকম কমপ্লেক্স, মন-কষাকষি, জেদাজেদি; মিছিমিছি এই দু-দিনের দুনিয়ায়! ক্ষুদ্র এবং মহৎ মানুষও যে-যাঁর চরিত্র নিয়েই নিজের নিজের চিতাতে ওঠেন এবং কবরে নামেন। সেই এক সাধুর গল্প ছিল না? কোথায় যে পড়েছিলাম না, এ বি কাকুর মুখে শুনছিলাম মনে নেই।

সাধু নদীতে চান করতে নেমেছেন, পাশে তাঁর শিষ্যও চান করছেন। এমন সময়ে একটা বিছে জলের উপরে সাঁতরে এসে সাধুকে লাগাল এক জব্বর কামড়।

সাধুর মুখ ক্ষণকালের জন্যে বিকৃত হল। উনি বিছেটিকে তাঁর শরীর থেকে বিযুক্ত করে, জোরে ছুড়ে নদীপারের ঝোপঝাড়ে ফেলে দিলেন, যাতে সে জলে ডুবে না মারা যায়। কিন্তু একটু পরেই সেই বিছে বুকে হেঁটে জলে পড়ে ভাসতে ভাসতে এসে তাঁকে আবারও কামড়াল।

সেবারও সাধু তাকে নিজের শরীর থেকে বিযুক্ত করে আরও দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপরও বিছেটা আবারও অমনি করে এসে তাঁকে কামড়াল এবং সাধু আবারও তাকে বিযুক্ত করে ছুড়ে ফেললেন।

এতক্ষণে শিষ্য মনোযোগ সহকারে গুরুর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করছিলেন। উনি এবারে আর থাকতে না পেরে বললেন, গুরুজি, আপনি এটা কী করছেন? ওটাকে মেরে না ফেলে বার বার দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, যাতে ও বাঁচে। কিন্তু প্রতিবারই বেঁচে এসে ও আবারও যে আপনাকেই কামড়াচ্ছে! তবুও.....

সাধু হাসলেন। বললেন, ও যে কর্ম নিয়ে জন্মেছে, যে চরিত্র, তাতে ও সারাজীবন এমনি করে কামড়েই যাবে। ইঁদুরে যেমন কাটাকুটি করে। চারদিকে চেয়ে কি দেখতে পাও না যে, এই পৃথিবীতে মনুষরূপী ইঁদুরদের কী দৌরাত্ম্য! অবিরত কী নিপুণভাবে তারা সম্পর্ক কেটে যাচ্ছে?

শিষ্য বলল, গুরুজি, বিছে তো আর ইঁদুর নয়!

না, সে বিছেই। তার ধর্মই হল কামড়ানো আর আমার ধর্ম হল জীবকে বাঁচানো। ও আমাকে যতবারই কামড়াক না কেন, ওকে আমি বাঁচিয়েই যাব।

গুরুজি, ওকি কখনও আপনার এই মহত্ত্বর কথা বুঝবে? আমি এবারে ওর ইহলীলা শেষ করে দিচ্ছি প্রস্তরখণ্ড দিয়ে অন্য প্রস্তরখণ্ডে পিষে ফেলে।

না বৎস, আমি থাকতে তা হতে দেব না। এজন্মে ও অমনি করেই কামড়ে বেড়াবে সকলকে, আর ভাববে ও কী বলশালী ও ক্ষমতাবান। ওর সারাজন্মই কামড়াতে কামড়াতে কেটে যাবে। আর আমার জন্ম, বাঁচাতে বাঁচাতে, ক্ষমা করতে করতে।

সেই রকমই আমাদের দরবেশ হানিফ মহম্মদ এখানে এন সি সি ক্যাডেটদের ভেক ধারণ করে ট্রাম-কন্ডাকটরের মতো করে টুপি পরতে এসেছে আর প্রফেসর বি বি চ্যাটার্জি সেটা সঠিকভাবে পরাতে এসেছেন। দু'জনেই দু'জনেই কর্ম অথবা ধর্ম করে যাচ্ছেন ও যাবেন। আমরা পথপাশের তরু, নীরব সাক্ষী মাত্র।

অবশেষে প্রভাত হইল।

"কই এল? কই এল? কই আর সে এল?"

আমরা সবই টেনশনে টানটান। কম্যান্ডার কামা আসছেন আসছেন করে এলেন অনেকটাই দেরি করে। দেরি কারণ, ট্রেন লেট ছিল।

রাঁচিতে অফিসারস মেসে ব্রেকফাস্ট করে গাড়িতে মিলিটারি পুলিশের ফ্রন্ট-গার্ড রিয়ার-গার্ড জিপ নিয়ে তাঁর মোটরকেড বাগাইচাটোলিতে যখন প্রবেশ করল তখন আমাদের ব্রেকফাস্ট সবে শেষ হয়েছে।

কম্যান্ডার প্রথমেই অ্যাডজুট্যান্টের অফিসে গেলেন।

পরে শুনলাম যে, কম্যান্ডার নাকি লাঞ্চ খাওয়ার সময়ে আমাদের "ইন্সপেকশন" করবেন।

'এ' কোম্পানির আলাদা খাওয়ার জায়গা ছিল। একটি শেড-এর তলাতে অকুলানও হতো। যদিও বন্দোবস্ত বা খাওয়াতে কোনও তারতম্য ছিল না। মাথার উপরে অ্যাসবেস্টসের শেড, দু'পাশে পাঁচ ইঞ্চি দেওয়াল। মাঝে মাঝে গরাদবিহীন বড়ো বড়ো জনালা। কাঠের টেবল এবং বেঞ্চ পাতা একপাশে চারটি টেবল জড়ো করে লস্করেরা খাদ্যদ্রব্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। আমরা সিঙ্গল-ফাইলে এক এক করে গিয়ে সামনে দাঁড়াতাম। বড়ো বড়ো হাতা করে গরম কিন্তু দলা-পাকিয়ে-যাওয়া ভাত, রজতের ভাষায়, "ডগফিড"; অড়হর অথবা ছোলার ডাল, একটা ঘ্যাঁট মতো, আর মাছ বা মাংস। কখনও কখনও চাটনিও থকত। তবে আমাদের খিদে খুবই চনমনে থাকত ওই বয়সে এবং ওইরকম পরিশ্রমের পরে। তাতেও খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণে কোনও খামতি ঘটত না। ঢালাও খাওয়া-দাওয়া।

জওয়ানেরা খাটেও যেমন, খায়ও তেমন। তাছাড়া আর্মির ডায়াট ঠিক করার আগে বড়ো বড়ো ডায়েট্রেশিয়ানদেরও পরামর্শও নেওয়া হয়। যে ধরনের সুষম-খাদ্য আর্মির একজন লস্কর খায়, সেই ধরনের সুষম-খাদ্যের কথা কোটিপতি ব্যবসায়ী বা ইঁদুরের মতো নিয়ত কাটাকুটি-করা বুদ্ধিজীবীরা ভাবতেও পারেন না। পয়সার আধিক্য হলেই যে খাদ্য সুষম হবে, আবার পয়সা না থাকলেও যে সুষম হবে না, তার কোনওই মানে নেই। নিয়মিত পরিশ্রম, কায়িক এবং মানসিক, এবং সুষম খাদ্যই সুস্থ জীবনের সুষ্ঠুতম উপায়।

জওয়ানদের, আর্মি অফিসারদের খুবই কাছ থেকে দেখে এই বিশ্বাসই জন্মেছে।

সবে ব্রেকফাস্ট শেষ করে বাইরে বেরিয়েছি আমরা, দেখি কোয়ার্টার-মাস্টার লেফটেন্যান্ট প্রফেসর চ্যাটার্জি হন্তদন্ত হয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। ওই শীতের সকালেও তাঁর মুখে ঘাম। মাথার টুপি সরে গেছে একদিকে, হানিফ মহম্মদেরই মতো।

রজত অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে বুটে ক্লিক শব্দ করে স্যালুট করে বলল, হোয়াটস দ্যা ম্যাটার স্যার?

বাবা আদম, শুক্লা, আমি—আমরা প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে অ্যাটেনশনে দাঁড়ালাম স্যালুট করে।

স্ট্যান্ড-অ্যাট-ইজ প্লিজ। প্রফেসর চ্যাটার্জি বললেন, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে।

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। প্লিজ-ফ্লিজ সিভিলিয়ানদের ড্রয়িংরুমের ভাষা। আর্মির ভোক্যাবুলারি মানে গুলির শব্দ। কখনও পয়েন্ট টু-টু, কখনও কখনও থ্রি-ও থ্রি, কখনও এল এম জি। ধুম আর ধাড়াক্কা। ফিসফিসে প্লিজ-টিজ এর মেয়েলিপনা, সরি তসলিমা এই এলাকাতে নেই।

চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, আই হ্যাভ আ মেজর প্রবলেম। অ্যান্ড ইট ইজ ওনলি উ্য, মাই বয়েজ, হু ক্যান সেভ মি।

বলেই, হানিফের দিকেও তাকালেন।

হানিফের অর্ধ-নিমীলিত আঁখি আবার বুজে এল।

ব্রেকফাস্টের পরে, ঘাড়ে রোদ পড়েছিল।

কিন্তু চ্যাটার্জি সাহেবের বিপদে যে হানিফের কোনও ভাবন্তর আদৌ ঘটল এমন মনে হল না। বরং এক গির প্রশান্তিই ফুটে উঠল যেন তার মুখে।

লেফটেন্যান্ট চ্যাটার্জি বললেন, কনট্রাক্টর রাসকেলটা আজকেই পচা মাংস দিয়েছে। মানে, মাটন। আর আজ শুক্রবার, মাংস খাওয়ার দিন। এখন লক্ষ টাকা খরচ করলেও তো এত বেলাতে এই মাঠে বসে এতলোকের মাটন জোগাড় করতে পারব না ভাইসব। আজ তোমাদের ভেজিটেরিয়ান হতে হবে।

আমি বললাম, একদিন না হয় মাংস নাই-ই খাব, তার জন্যে স্যার কিসের এত চিন্তা!

শুক্লা বলল, আই অ্যাম আ ভেজ।

"অ্যাম" শব্দটার উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলল।

চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, আর-রে নেহি নেহি। হোয়াট আর উ্য টকিং বাউট? আর উ্য ক্রেজি? দি সাপ্লায়ার শ্যাল বি স্ক্রুড।

বাবা আদম বলল।

আই শ্যাল স্ক্রু হিম অলরাইট টুমরো, বাট লেঃ কর্নেল কামা উইল ট্যান মাই স্কিন টোডে।

লেফটেন্যান্ট চ্যাটার্জি টুডে-কে "টোডে" বলতেন যে, তা আগেই বলেছি।

তাহলে কিংকর্তব্যম্?

আমরা বিভিন্ন ভাষায় সমস্বরে প্রশ্ন করলাম।

চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, ওল অফ ঊ্য উইল হ্যাভ টু টেল আ লাই ফর মাই সেক। ফর দ্যা সেক অফ দ্য অনার অফ ইওর কলেজ।

ইয়েস স্যার। হোয়াটস দ্যাট লাই স্যার?

ঊ্য উইল হ্যাব টু পোজ দ্যাট ওল অফ ঊ্য আর ভেজেটেরিয়ানস।

নো প্রবলেম স্যার।

গৌতম বলল।

মে আই টেক দিস অ্যাজ আ প্রমিস? মাই গুড বয়েজ?

ইয়েস স্যার।

রজত বলল, কোয়ার্টার গার্ড থেকে ফিরেও, ফেটিগ-ডিউটি করেও।

ইনকরিজিবল!

চ্যাটার্জি সাহেবের মুখ কৃতজ্ঞতায় বেগনে হয়ে এল। চলে যাবার সময়ে, হানিফ মহম্মদের সামনে মুখ কালো হয়ে গেল। আমাদের সকলের মুখে একবার অসহায়ের মতো তাকিয়ে উনি চলে গেলেন।

উনি জানতেন যে "The strength of a chain is it's weakest link."

খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল ওকে।

আমরা বললাম, হোয়াট ইজ ইট হানিফ? ক্যান ঊ্য লেট ডাউন আওয়ার কলেজ?

"নিহিল আলট্রাকি বেইজ্জৎ করেগা তু?"

শুক্লা বলল।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের লিডিং-স্পিরিট ছিল NIHIL-ULTRA।

হানিফ বলল, ইসলামমে ঝুট বোলনা বহত বড়া গুণাহ্ হ্যায়। হামকো সিধা পুছনেসে ম্যায় ঝুট নেহি বোল পায়েগা।

অজীব আদমী হ্যায় তু। হামলোগোঁনে সব ঝুট বোলনেওয়ালা হ্যায় থোড়ি!

শুক্লা বলল।

হানিফ বলল, ম্যায় কেইসে জানু?

আমাদের মধ্যে সকাল থেকেই যে টেনশন গড়ে উঠেছিল তা আরও বেশি টানটান হল। বেলা যত বাড়তে লাগল। অতঃপর একসময়ে লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ল। আমরা সবাই চান করে এসে, খালি গায়ে খেতে বসলাম। কেউ কেউ আর্মির খাকি গেঞ্জি পরে ছিল। গৌতম, রজত, সুশান্ত প্রমুখ আমাদের মতো তাগড়া ছিল না। বাবা আদম, শুক্লা, আমি এবং আরও অনেকেরই বুকের ছাতি ছিল বিয়াল্লিশ ইঞ্চি এবং তদূর্ধ্ব।

খেতে বসেছি আমরা, এমন সময়ে প্রসেশন করে, হাসপাতালে বড়ো সার্জেন যেমন প্রসেশন করে প্রত্যেক ওয়ার্ডে ঢোকেন, তেমন করে কম্যান্ডান্ট কামা, অ্যাডজুট্যান্ট চ্যাটার্জির সঙ্গে বেটন নাচাতে-নাচাতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন।

এক জোড়া পাকানো গোঁফ। আগুনের মতো রং। গল্ফ খেলে এবং স্কচ-হুইস্কি খেয়ে তাতে একটু তামার ছোঁয়া লেগে তাঁর রূপ আরও খুলে গেছে।

স্বাস্থ্যবান জ্বলজ্বলে আমাদের দেখে, তিনি খুব খুশি হলেন। পরক্ষণেই বললেন, হোয়াটস দ্যা ম্যাটার বয়েজ? আর ঊ্য অল ভেজিটেরিয়ানস?

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, ইয়েস স্যার।

উনি একটু হেসে বললেন, দ্যাটস প্রেটি গুড। আই সি, দ্যাট দ্যা ভেজিটেরিয়ানস আর স্ট্রংগার দ্যান দ্যা মিটিটারিয়ানস।

আমরা গদগদ হয়ে ভাত-ডাল মুখে গবগব করে অ্যাপ্রিসিয়েশনের হাসি হেসে উঠলাম।

'মিটিটারিয়ান' শব্দটা আগে শুনিনি। ভেজ আর নন-ভেজ বলেই জানতাম। সেদিনই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলাম যে, কবিদের বেলাতে আর আর্মি অফিসারদের বেলাতে আর্ষপ্রয়োগ সচল। এঁরা যে শব্দই ব্যবহার করুন না কেন সব শব্দই সচল তো বটেই, বেগবানও।

আমরা আগে লক্ষ করিনি, তখনই লক্ষ করলাম যে, হানিফ মহম্মদ একেবারে দরজার কাছে এ-া বসে মুখ নিচু করে খাচ্ছে।

হিঁদুদের সঙ্গে বসে খেলে মুসলমানের জাত যায় এমন তো শুনিনি আগে! তাছাড়া হানিফ আমাদের জিগরি দোস্ত। রোজই একাসনে বসেই খায়। ওকে আজ আলাদা বসে খেতে দেখেই পেট-গুড়গুড় করে উঠল। লক্ষ করলাম যে, লেফটেন্যান্ট চ্যাটার্জির সঙ্গে হানিফের দৃষ্টি বিনিময়ও হল।

কম্যান্ডিং অফিসার কম্যান্ডান্ট কামা থেকে দাঁড়িয়ে বললেন, আর উ্য অল হ্যাপি হিয়ার বয়েজ? ড্যু উ্য হ্যাভ এনি কমপ্লেইনস বাউট এনিথিং?

আমরা সমস্বরে গলা ফাটিয়ে বললাম, নো স্যার।

ফাইন। দ্যাটস ভেরি গুড!

সঙ্গী অফিসারেরা বত্রিশ-পাটি বিগলিত হলেন।

কামা সাহেব ইনস্পেকশন সেরে চলে যাচ্ছেন, প্রায় দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন; হানিফ মহম্মদকেও ছাড়িয়ে চলে গেলেন, এবারে দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হবেন, আপদ বিদেয় হবে; ঠিক সেই সময়েই হনিফ দাঁড়িয়ে উঠে কম্যান্ডারের পিছু ডাকল, স্যার।

সভাস্থল নিস্তব্ধ হয়ে গেল। যার যাব মুখের ভাত, মুখেব ডাল তার তাব মুখেরই মধ্যে ফ্রিজ করে গেল।

কামা সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে বেটন নাড়িয়ে বললেন, ইয়েস ক্যাডেট, হোয়াট ইজ ইট? ড্যু উ্য ওযান্ট টু সে সামথিং?

ইয়েস স্যার।

হানিফ মহম্মদ খালি-মাথায় গেঞ্জি-পবে অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে বলল।

টেল মি বয়? হোয়াট ইজ ইট?

উই আর নট গিভন মিট স্যার। অল অফ দেম টোল্ড উ্য আ লাই। লেফটেন্যান্ট চ্যাটার্জি টিউটরড দেম টু টেল দ্যা লাই।

বাট হোযাই?

কম্যান্ডান্ট কামা বললেন।

কামা সাহেব সম্ভবত এনিমি ক্যাম্পের ইন্টারোগেটরের সামনে পড়েও অমন বিব্রত হতেন না। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কযেক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সঙ্গী অফিসারদের চোখে চকিতে একবার মুখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, স্বগতোক্তির মতো; বাট, হাউ কাম?

হানিফই উত্তর দিল, দ্যা কনট্রাকটর হ্যাড সাপ্লায়েড রটন মিট।

ওঃ। আই সি।

বলেই, বললেন, আই অ্যাপলজাইজ ট্যু উ্য অল অন বিহাফ অফ দ্যা কোয়ার্টার-মাস্টার। আই প্রমিস উ্য দ্যাট দ্যা ম্যাটার উইল বি সর্টেড আউট। আই প্রমিস দ্যাট অল অফ উ্য উইল বি গিভন মিট টু-মরো অ্যান্ড দ্যা ডে আফটার অ্যান্ড অন অল দ্যা ডেজ. ..। আই মাস্ট কনগ্রাচুলেট উ্য বয়েজ। উ্য আর আ ওয়ান্ডারফুল লট। কিপ ইওর ফ্ল্যাগ ফ্লাইং।

প্রসেশন চলে গেলে আমরা সবাই মুখ নিচু করে রইলাম।

হানিফ একা খুক-খুক করে হেসে চলল।

বলল, বড়ো মজা আগ্যায়া ইয়ার আজ। তুমলোগোঁনেভি মুঝকো আদমীই নেহি সমঝতা থা। আভভি দিখনা রজত, আজ তেরা ছাঁটাজি সাবকো কোয়ার্টার-গার্ডমে ঘুষনা পড়েগা। হাঃ। হাঃ। হুঃ। হুঃ।

আগে হনিফ হরষিত ছিল। এখন তার হর্ষবর্ধন হল।
আমাদের সকলকে বেইজ্জৎ করে আবার হাসছে!
সুশান্ত বলল।
হই! হল্লা! দেখেছিস! দেখেছিস!
রজত বলল, উত্তেজিত হয়ে।

বাগাইচাটোলির ক্যাম্পের আর একটা 'রিডিমিং ফিচার' ছিল ক্যাম্পফায়ার।

রাতে আগুনের সামনে গোল হয়ে বসে-দাঁড়িয়ে অগ্রজ এবং অফিসারদের অনুরোধ এবং আদেশে জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে যার যার "কুদরতি" বা "বানাওটি" বিদ্যার স্বয়ংক্রিয় প্রয়োগ করা হত।

কেউ গিটার বাজাত।

অ্যামুনিশান বক্সের চাপে গিটার অক্ষত রইল কেমন করে, কে জানে।

পাঞ্জাবি ছেলেরা ভাংরা নাচত। গুজরাতি, মারাঠি, ইংরেজি গান। উর্দু গজল ও নজমা। বাঁশি, মাউথ-অর্গান ইত্যাদি সবকিছুর অত্যাচারই করা হত। এবং সহ্যও করা হত।

এক রাতে, অনেকের অনুরোধ গাইলাম একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। পিয়ানোতে একমাত্র ওই গানটিই বাজিয়ে গাইতে পারতাম। তাও এক-আঙুলে চাবি টিপে। "হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।"

ওই ক্যাম্পে পিয়ানো কী করে আমদানি হল তা অভাবনীয়।

পরে শুনেছিলাম, আমরা যখন দুপুরে লেপার্ড-ক্রলিং করেছি তখন একদল জওয়ান রাঁচির আর্মির অফিসার্স-মেস থেকে ট্রাকে করে পিয়ানো এনে তাকে 'টিউন' পর্যন্ত করে রেখে গেছে।

এই নইলে আর্মি! সেনাবাহিনীর জীবনে কোনওই ফাঁকিবাজি নেই। কী কাজে, কী আনন্দে। প্রত্যেক বাঙালি পরিবারেরই একটি করে ছেলের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া উচিত। দিলে, পুরো বাঙালি জাতের প্রভূত উন্নতি হত।

গানটা-গাওয়া শেষ হতেই একটি ফরসা, সুগঠিত, হ্যান্ডসাম ছেলে, তবে সে খুব একটা লম্বা ছিল না, ক্যাডেটসদের ভিড়ের মধ্যের এক কোণ থেকে উঠে এসে আমাকে বলল, দারুণ গেয়েছ ভাই।

তারপর যে ঘটনাটা ঘটল সেটা সম্পূর্ণই অভাবনীয়। বাগাইচাটোলির যে 'বিশ্বটাড়কে' দুনিয়ার তাবৎ সুশ্রী, কুশ্রী, বুদ্ধিমান এবং নির্বুদ্ধি অজকুলও বর্জন করেছে বহুদিন আগেই; যাতে একটি তৃণকণাও বেঁচে নেই, সেই বাগাইচাটোলি মরুভূমিতেও সেই ছেলেটি আমাকে একটি রক্তগোলাপ উপহার দিল।

তখনই বুঝেছিলাম যে সে ছেলে ক্ষণজন্মা।

ছেলেটির নাম এস এন রায়চৌধুরী, ফার্স্ট নেম সম্ভবত ছিল সত্যেন। সত্যেন রায়চৌধুরী। আশুতোষের ছাত্র ছিল। এখন অনেক কোম্পানির ডিরেক্টর। বিয়ে করেছে, আমরা যাঁরা লেখা বই পড়তাম বি কমে এবং যিনি বাণিজ্যিক জগতে একটি বিশিষ্ট নাম; সেই বি বি ঘোষ মশাইয়ের কন্যাকে।

রায়চৌধুরীর সঙ্গে বছর কুড়ি-বাইশ আগে একবার হঠাৎ দেখা হয়েছিল ট্রেনে। আসানসোলে যাচ্ছিলাম ইনকাম ট্যাক্সের আপিল করতে। সে-ও যাচ্ছিল। সম্ভবত সেন র‍্যালে বা সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কোনও কাজে। রায়চৌধুরী আমারই মতো ওয়াল্ট হুইটম্যান এবং পি জি উডহাউসের খুব ভক্ত ছিল। ট্রেনে অতবছর পরে দেখা হওয়াতে মনে আছে, আমরা অনেকক্ষণ 'অ্যানিমেটেড ডিসকাশান' করেছিলাম ওই দুই প্রিয় লেখককে নিয়ে।

আমার চোখের নীচে বয়সের ছাপ অবশ্যই পড়েছে। দিনরাত চোরের কাজও সেজন্যে দায়ী। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে পড়েনি ভাগ্যিস! সেই দুটি চোখ দিয়েই আমি আমার ফেলে-আসা জীবনকে দেখি। বয়স যে বেড়েছে সেদিন থেকে একটুও, সত্যিই বুঝতে পারি না। মনে হয়, এখনও পাখির মতোই হালকা আছি, বন্দুক বা রাইফেল কাঁধে আমাদের এই অপরূপ সুন্দর দেশের বনে-পাহাড়ে শীতে-গ্রীষ্মে-বর্ষায় ঘুরে বেড়াচ্ছি দুটি মুগ্ধ চোখ নিয়ে, বাগাইচাটোলি থেকে রাঁচিতে হ্যাভারস্যাক কাঁধে রাইফেল হাতে 'রুটমার্চ' করে চলেছি, যাওয়া-আসা নিয়ে আঠারো মাইল। এই তো সেদিন। শরীরের বয়স অবশ্যই বেড়েছে।

বিপদ এই, বড়ই বিপদ যে, মনের বয়স বাড়েনি একটুও।

আমাদের সঙ্গে কলেজে বাপিও পড়ত। ভালো নাম সুমন্ত্র বসু।

গৌতম-রজতদের বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলেরই ফসল। থকত, বালিগঞ্জ প্লেসে। তবে ওদের বাড়ি আমি কখনওই যাইনি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার সঙ্গে খুব একটা ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। ও বন্ধুদের 'বন্ধু' হিসেবেই পরিচিত ছিল আমার কাছে।

বাপি হাসলেই ওর দাঁত দেখা যেত বলে, ডান বা বাঁ হাতের পাতা, হাসবার সময়ে মুখের সামনে তুলে ধরত ও; দাঁত আড়াল করে। প্রথম প্রথম ভাবতাম, ওরা বোধহয় হীনযান বৌদ্ধ, তাই অমন করে। পরে বুদ্ধি একটু বাড়ার পরে জেনেছিলাম যে, ওরা মহাযান বা হীনযান বৌদ্ধ নয় কিন্তু ব্রাহ্ম। তাই ওরকম করে। ব্রাহ্মদের মধ্যে নাকি দাঁত-দেখানো বা মুখ হাঁ-করে কথা বলা ইত্যাদি চরম অসভ্যতার লক্ষণ বলে গণ্য হয় চিরদিনই।

ব্রিটিশরা যেমন কী 'CRICKET' এবং কী 'NOT CRICKET' তার সূক্ষ্ম কিন্তু অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য তফাতটা বোঝেন তেমন 'ব্রাহ্ম' মাত্রই নাকি বোঝেন কী 'ব্রাহ্ম' আর কী 'অ-ব্রাহ্ম'।

আপনি যদি কাউকে হ্যাঁ-এর জায়গাতে 'হেঁ' বলতে শোনেন অথবা 'হ্যালো'র জায়গাতে 'হেলো' তাহলেই মোটামুটি ধরে নিতে পারেন তিনি সম্ভবত ব্রাহ্ম? এবং কেন? তা জানার আরও অনেকই লক্ষণ আছে। তবে সেসব জেনে আপনাদের কোনও উপকার হবে না। তাই জানালাম না।

আমার ব্রাহ্ম বন্ধুরা বা আত্মীয়েরা যেন ঘুণাক্ষরেও মনে না করেন যে আমি তাঁদের নিয়ে হাসি-মস্করা করছি।

বরিশাইল্লা অক্সফোর্ডের অর্থনীতিক তপন রায়চৌধুরীর "রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা" তে পড়েছি যে তাঁর বরিশাইল্লা জেঠামশায়ের মুখে তিনি শুনেছিলেন যে তাঁদের "ছেলেবেলায় নাকি স্থানীয় ব্রাহ্মরা 'কুসংস্কার-নিবারণী সভা' স্থাপন করেন। জনহিতৈষী ব্রাহ্ম যুবকবৃন্দ প্রভাতফেরিতে বের হতেন, খোল করতাল সহযোগে, রাগ ভৈরবী, ঝাঁপতালে কুসংস্কার-নিবারণী-কীর্তন করতে করতে :

"প্রভাতে উঠিয়া দেখ মাকুন্দ চো-ও-পা-আ।
বদন ভরিয়া বল ধোওপাআ ধোওপাআ।"

সনাতনীরা বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মদের ব্যঙ্গ করে প্রার্থনা সভা বসালেন। প্রার্থনা হত তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। কিন্তু পিতঃ তোমার এই মঙ্গলময় সৃষ্টিতে অবিচার কেন? তুমি জোনাকির পশ্চাতে আলোক দিয়াছ, আমাদের পশ্চাতে তো দাও নাই প্রভু?"

কেন জানি না, আমার বাবা ব্রাহ্মদের খুবই অপছন্দ করতেন। ঠাট্টা করে বলতেন, 'ব্রহ্মদৈত্যে'। হয়তো মা, গিরিডির ব্রাহ্মপরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলেই মা'কে পরোক্ষে হেনস্তা করার জন্যেই, অথবা নিছক রাগাবার জন্যেই অমন করতেন। তবে আমাদের বাড়িতে এক ব্রাহ্ম বউ এসে, আমার

শ্বশুরবাড়িতে তো কেউ কেউ ছিলেনই! বাবার ব্রাহ্ম-অপ্রীতিকে চিরদিনের মতো কবর দিয়ে দিয়েছিল।

মা বলেছিলেন, 'ভালো হয়েছে! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।'

সম্ভবত রজতরাও ব্রাহ্ম ছিল। ঠিক মনে নেই।

কচির ভাল নাম ছিল সম্মোহন চ্যাটার্জি। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল ওদের।

সম্মোহন করার মতো চেহারা ছিল কচির। খঙ্গের মতো নাক, বড়ো বড়ো চোখ, আগুনের মতো গয়ের রঙ, বড়ো সুন্দর স্বাস্থ্য। খামতির মধ্য এইটুকুই যে, ও ততটা লম্বা ছিল না। সুতির মালটি-কালারড চেকচেক জামা পরত। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম ওর দিকে। উ্যনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাবে কচি, স্যাম্মি মেঢোরা-এরা সব রোয়িং করত। স্যাম্মি, আমাদের সঙ্গে এন সি সি-তে ঢুকেও ছেড়ে দিয়ে রোয়িং শুরু করে।

রোয়িং করেছিলাম অনেকই পরে। লেক-ক্লাবের মেম্বার হয়ে। তবে তখন চ্যাম্পিয়ন হবার বয়স আর ছিল না। রোয়িং সত্যিই চমৎকার ব্যায়াম। ভুঁড়ি কমানোর জন্যে তো আইডিয়াল! তবে লেক ক্লাব ছেড়েও দিয়েছি বহুদিন।

কচি একটু ঝাঁকি দিয়ে কথা বলত। গানও গাইত অমন ঝাঁকি দিয়ে দিয়েই। রবীন্দ্রসঙ্গীতই গাইত। খুব মজার ধরন ছিল কচির কথা বলার। রসিকও ছিল খুবই। নিজে তো হাসতই, আমাদেরও হাসাত সর্বক্ষণ।

আমাদের সব বন্ধুরই অতি দুর্বল স্থান ছিল কচির সহোদরা। তারও ভাল নাম ভুলে গেছি। তার ডাক নাম ছিল বুদুস। তাকে আমাদের মধ্যে কমজনই সামনাসামনি দেখেছি কখনও কাছ থেকে। বুদুস ছিল, যাকে বলে অপরূপ সুন্দরী। তাকে দেখা যেত না বলেই তার সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই ছিল তীব্র ওৎসুক্য।

কচিদের বাড়ি ছিল হাজরা রোডে। ডোভার রোড আর রিচি রোডের মাঝামাঝি। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দিক থেকে এলে, ডানদিকে পড়ত। আমাদের ডোভার রোডের বাড়ি থেকে ওদের বাড়ির পেছনটা দেখা যেত। বিরাট বাড়ি। সলিসিটর ছিলেন কচির পিতৃপুরুষেরা। কচি নিজেও সলিসিটর হয়েছিল। ওই বাড়িতে এখন একটি হোটেল হয়েছে। সম্ভবত দক্ষিণ-ভারতীয়দের। ব্যাংক-ট্যাংক হয়েছে।

মাঝে মাঝে ক্বচিৎ দেবদুর্লভ ক্ষণে কোনও কালো, মেঘলা, মনখারাপ-করা বিকেলে কচিদের বাড়ির বারান্দাতে তার মৃদু সঞ্চারমান ছবি দেখা যেত। অথবা কোনও বসন্তের মন-চনমন-করা দিনে অস্তগামী সূর্যের পটভূমিতে বুদুসের শিল্যুট দেখা যেত কচিদের দুর্গপ্রতিম বাড়ির ছাদে।

"কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান।"

কোনওদিনই হল না।

ওই শিল্যুট দেখতে গিয়ে যে কতবার বাস চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি হাজরা রোডে, তা আমিই জানি।

তখনকার দিনের বাসগুলোও সব ছোটোখাটো ছিল। তাদের নীচে চাপা পড়ে মরলে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব, আজ স্টেটবাস চাপা পড়ে মরলে যতখানি দুঃখ করতেন ততখানি হয়তো আদৌ করতেন না। চাপা যে পড়িনি তখন, তা ভালোই হয়েছে। প্রাণটাও যেত, সমবেদনাও হারাতাম। যে-মানুষ বেবি-অস্টিন বা মারুতি চাপা পড়ে মরে, তার মৃত্যুও বৃথা!

আর সরদারজি ড্রাইভারেরা অত্যন্ত হৃদয়বানও ছিলেন। পথে যারা চলে, তাদের মধ্যে কে ন্যালাখ্যাপা, কে হতাশ-প্রেমিক, কে স্ত্রীর প্রচণ্ড 'ঝাড়' খেয়ে আত্মহত্যা করতে বেরিয়েছে; এ-সব-কিছুই স্টিয়ারিং হাতে-ধরেও খেয়াল রাখতেন তাঁরা। শুধু সর্দারজি বাস ড্রাইভারেরাই বা কেন, প্রত্যেক স্ত্রী-পালিত, সদা-তাড়িত পুরুষ মানুষ, প্রতিটি গৃহপালিত জীবজন্তু, পোষা-পাখি, মায় তৎকালীন কলকব্জা, যন্ত্রপাতি। যেমন বাসের এঞ্জিন পর্যন্তও অত্যন্তই হৃদয়বান ছিল।

এত মানুষ না-থাকাতে, পৃথিবীতে তখন প্রত্যেক মানুষেরই এক বিশেষ ইম্পর্ট্যান্সও ছিল। কিন্তু আমার পক্ষে অতীব দুঃখের বিষয় 'এই যে, আমার যতটুকু ইম্পর্ট্যান্স তা শুধু ছিল সরদারজি বাসড্রাইভারেরই কাছে।

বুদুসের কাছে আদৌ নয়।

কচির সঙ্গে বহু বছর দেখা হয় না। শুনেছি, দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতাতে কোথাও থাকে এখন। বুদুসের কোথায় বিয়ে হয়েছে তাও জানি না। আজ হয়তো সে দিদিমা বা ঠাকুমাও হয়ে গেছে। জানি না, সে এই লেখা পড়বে কি না। পড়লে, অবশ্যই গর্বিত হবে এবং তাঁর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসিও ফুটে উঠবে।

বড়ো সুন্দর দেখাবে সে হাসিটিকে নিশ্চয়ই।

দেখতে পেলে বেশ হত।

মাঝে মাঝেই ভাবি "মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে, নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে"—রবীন্দ্রনাথের এই দুটি পংক্তি আমার বেলায় শুধুমাত্র আংশিকভাবেই প্রযোজ্য। মন শুধু দিয়েই গেছি। হৃষীকেশের গঙ্গায় 'কাড়োয়া-চওথে' বা কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বিজয়াদশমীতে, উত্তরবাহিনী গঙ্গাতে প্রিয় অথবা প্রিয়তর কত জনের মঙ্গলকামনাতেই কত শত প্রদীপ যে ভাসিয়ে গেছি সারা জীবনে ধরে, আজও ভাসাই; তার ইয়ত্তা নেই। বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি একটুও বাড়েনি। অগণ্যবার বাসের নীচে চাপা পড়ে মরারই মতো অগণ্যবার নানারকম মৃত্যুর থাবা থেকে মরতে মরতে সরে এসে আজও নির্লজ্জর মতো বেঁচে আছি। তবু এই দুর্মর ইডিয়টের প্রেমিক-সত্তাটা এখনও মরল না। এ-জীবনে ক্ষতি কারোরই করিনি। এই স্বভাবের জন্যে শুধুমাত্র নিজের ক্ষতিই করেছি। অগণ্য নারীকে সুধন্য, গর্বিত করে; নিজে শুধু বঞ্চিত, অপমানিতই হয়েছি। তবুও গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে চটের বস্তার মুখ বন্ধ-করে দশমাইল দূরের সম্পূর্ণ অপরিচিত মোড়ে ছেড়ে দিয়ে-আসা পাড়ার প্রতিটি গৃহ-ঘৃণ্য হুলো-বেড়ালেরই মতো আমার প্রেমিক সত্তা আবারও ঠিক পথ চিনে, গৃহপালিত গন্ধ চিনে, বাড়ি ফিরে এসেছে অবিরত লাথি-ঝাঁটা-লাঠি খাবার জন্যে।

কষ্ট হয়তো কখনও কখনও অন্যদেরও কিছু দিয়েছি। কিন্তু নিজে যে কত কষ্ট পেয়েছি ও পাই, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তবে এও জানি যে, "জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পুণ্যের পদপরশ তাদের পরে।"

রাজলক্ষ্মী দেবীর একটি কবিতা আছে। একাধিক লেখাতে এই কবিতাটি উদ্ধৃতও করেছি আমি। পাঠক মনে করুন, অগণ্য শারীরিক অথবা মানসিক সৌন্দর্যে সুন্দরী মহিলা যদি থিতু হয়ে বসে কোনও মধ্যরাতের বা দুপুরের ক্ষণিক অবসরে আমার লেখা পড়ে এক মুহূর্তের জন্যেও রাজলক্ষ্মী দেবীর সেই কবিতাটির সঙ্গে একাত্মবোধ করেন তবেই আমি ধন্য মনে করব নিজেকে। আমার টগবগে প্রথম যৌবনের অন্তরের সব মাধুর্য সৌন্দর্যর সঙ্গে নিবেদিত-অর্ঘ্য, যে অর্ঘ্যের কোনও দাম এঁদের মধ্যে হয়তো কেউই দেননি এবং সেই নির্মল পবিত্র হৃদয়াবেগের অস্তিত্ব যে আদৌ ছিল, তাও হয়তো জানেনইনি, তাঁদের আমি নিজগুণেই ক্ষমা করে দিলাম। এটুকুই প্রার্থনার যে, আমার সব কষ্ট তাঁদের আনন্দ হয়ে জীবনের বিকেলবেলায় ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার মতো স্নিগ্ধ, সুগন্ধি হয়ে ফুটুক।

এই তো অনেক দেওয়া। শেষ বিকেলে। অনেক পাওয়াও।

রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতাটি এখানে তুলে দিলাম। প্রত্যেক মহিলারই এই কবিতাটি পড়া উচিত। তা তিনি, এই অধমের হৃদয়ের নৈবেদ্য পেয়ে থাকুন আর নাই থাকুন। "মাধুকরী"র কুর্চিও পৃথু ঘোষকে লেখা একটি চিঠিতে, এই কবিতাটি উদ্ধৃত করেছিল—

"জানি আমি একদিন বুড়ো হব। চশমার ফাঁকে।
উলের কাঁটার ঘর গুণে গুণে কাটবে সময়।
যদিও অনেক লোক আসে,যায়—দুটো কথা কয়—
মনে মনে জানা রবে, কেউ তারা খোঁজে না আমাকে।
অমনি মেহগ্নি আলো বিকেলের জানালাকে ছোঁবে।

"মাধুকরী"—'একবিংশ শতাব্দীর নারী ও পুরুষ'দের উৎসর্গ করা উপন্যাস—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

নরম চাঁদের বল ফের উঠে আসবে আকাশে।
বাতাস সাঁতার দেবে সবুজ ঢেউয়েরই মতো ঘাসে।
আকাশের বুক ভরে তারারা বিছানা পেতে শোবে।
সাদা চুল নেড়া দাঁত, আয়নায় ভ্যাংচানো ছায়াকে
তখনো বলব আমি রাজ্যচ্যুত রাজ্ঞীদের ভাষা।
"জানিস আমার ছিল, সে এক আশ্চর্য ভালোবাসা।
তোর কি ক্ষমতা আছে মিথ্যে করে দিবি সে পাওয়াকে?"

হঠাৎই একদিন কবি বলল, এবারে পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে যাবি?

রজত খ্যা খ্যা করে হেসে বলল, "হুই! হোল্লো!"

রজতের কথার ধরনই ওইরকম ছিল। নিজস্ব ভ্যোকাবুলারিতে কথা বলত।

তারপর বলল, যাবি তো মেয়ে দেখতে, তার আবার পৌষ উৎসবের অ্যালিবাই দিচ্ছিস কেন?

কবি বলল, আই অ্যাম নট টকিং ট্যু ড্যু।

রজত বলল, সো হোয়াট? আই অ্যাম টকিং টু ড্যু।

দীপক মাঝে পড়ে বলল, থামত! অনেকদিন যাই না।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন রেকর্ড সবে বেরিয়েছে—

"ওগো তুমি পঞ্চদশী
পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।"

আমার মনে হত এবং এখনও হয় যে, রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে এবং গাইতে তো বটেই, প্রকৃতি-পাঠের অবশ্যই প্রয়োজন আছে স্বদেশী প্রকৃতিকে, মেঘ-রৌদ্রকে, বিভিন্ন ঋতুকে, গাছগাছালিকে যিনি না হৃদয় দিয়ে ছুঁয়েছেন তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের গান যথার্থভাবে গাওয়া এবং তার যথার্থ রসাস্বাদন করাও সম্ভব নয় আদৌ। গায়ক বা শ্রোতা তিনি যিনিই হন না কেন, যাঁদের জীবন প্রকৃতি-বিবর্জিত, রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁদের জন্যে আদৌ নয়। কোনওদিনই ছিল না।

এই কারণেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনের ছাত্রছাত্রীরা অন্যদের চেয়ে ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন বলেই আমার মনে হয়। যদিও ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার আগে 'বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে' একবার গান গাইতে দেখেছিলাম। শান্তিনিকেতনে গেলে, কাছ থেকে দেখতে পাব এই লোভে আমি সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেলাম বাড়িতে জিজ্ঞেস না করেই।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে গেলে তো ধুতি পাঞ্জাবি পরে যেতে হবে। নয়তো পায়জামা পাঞ্জাবি। যা শীত এখন! আমি বললাম।

মনে মনে বললাম, আবার ধুতি!

কবি বলল, আমার বাবার একটা ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি আছে। তোর ঠিক ফিট করে যাবে। আমার গায়ে হবে না। ঢলঢল করবে। তবে সাদা ফ্ল্যানেলের মজা জানিস তো? নতুন অবস্থাতে সাদা থাকে আর যতই কাচাবি ততই সেই সাদাতে ঘি লাগবে। ঘিয়ে হতে হতে একেবারে কমলাভোগ।

বললাম, শীত আটকাবে তো? রসগোল্লা না কমলাভোগ তা দিয়ে আমি কী করব?

যাওয়া হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তখন শান্তিনিকেতনে যাওয়া এক ঝকমারি ছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, বিশ্বভারতী এসব কিছুই ছিল না। কেন যে শান্তিনিকেতনের মতো বিশ্ববিখ্যাত জায়গাতে কোনও দ্রুতগামী ট্রেন যেত না তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বাঘের বাচ্চা গনিখান চৌধুরী যা করে গেলেন তাতে তাঁকে সবচেয়ে বড়ো রবীন্দ্রভক্ত বলতে হয়। অবশ্য সোমনাথ চ্যাটার্জিরও অবদান আছে। কারণ, বোলপুর তাঁরই কনস্টিট্যুয়েন্সি। যতটুকু সম্ভব করার চেষ্টা করেন। কম্যুনিস্টদের মধ্যেও ভাল মন্দ থাকে। আসলে ব্যক্তিজীবনে যেসব মানুষ রাজনীতির জগতে আসার আগেই জীবনের অন্য ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদের সবসময়েই অন্য চোখে দেখা উচিত।

সেবারে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, দেবব্রত বিশ্বাস, ওয়াঝালকার সাহেব, সাবিত্রী দেবী কৃষ্ণাণ, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখকে চর্মচক্ষে দেখলাম।

সাগরময় ঘোষের দাদা হিসেবেই শান্তিদেব ঘোষকে আমরা চিনতাম। তিনি নেচে নেচে গান গাইতেন নানা রবীন্দ্রনাট্যে। ওঁরা সবাই রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলেন, তাই কিছু-না-কিছু না করেও যা ওঁদের মধ্যে ছিল, তা আজকালকার কম রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েদের মধ্যেই দেখতে পাই।

দেবব্রত বিশ্বাস খোলা গলায় অনেক গান গাইলেন। প্রশান্ত মহলানবিশের ছোটো ভাই বুলা মহলানবিশ ছিলেন। ভালো বাঁশি বাজাতেন। সুধীর খাস্তগিরও ছিলেন আর্টিস্ট। তখন তো জানতাম না যে একদিন তাঁর ছাত্র হব! মানে জর্জদাব।

শান্তিদেবদা-সাগরদাদের ছোটো ভাই শুভময় ঘোষকে ভারি ভাল লেগেছিল। লম্বা, দোহারা চেহারা, চমৎকার আবৃত্তি করলেন। শুভময়রা তখন ছিলেন থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স শান্তিনিকেতনের। শুভময় ঘোষ, বিশ্বজিৎ রায় এবং অমিতাভ চৌধুরী। ঘন্টাতলায় দাঁড়ানো সেই তরুণ তিনমূর্তির বেয়াল্লিশ বছর আগের ছবিটি এখনও যেন চোখে স্পষ্ট বাসে। কম্বিনেশানও একেবারে আইডিয়াল। একজন ব্রাহ্ম, অন্যজন বাঙাল এবং তৃতীয়জন সিলেটি বাঙাল। 'বিদেশী'ও বলা চলে। কারণ, র‍্যাশান, চাইনিজ, কামাচকাটকান এবং সিলেটি ভাষা আমাব কাছে সমান দুর্বোধ্য।

অমিতদা জুতোকে বলতেন 'জুতু'।

তখন পৌষমেলা হত ছোট্ট একটু জায়গাতে। 'কালোর দোকান' ছাড়া অল্পকটি দোকানই ছিল। দুপুরের খাওয়াও সেই সব দোকান-কাম হোটেলে পাওয়া যেত। বহু বিশুদ্ধ অনাবিল বাউল আসতেন। আজকাল অনেক FAKE বাউল দেখতে পাই যাঁরা শান্তিনিকেতনে অথবা কলকাতাতেও নেশা-ভাং করে মাথার উপর হাত তুলে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে নিজেদের বাউল প্রতিপন্ন করেন। যাঁরা নির্ভেজাল বাউল দেখেননি কখনও তাঁদের জন্যে মায়া হয়। পৌষমেলা তখন সত্যিই মেলা ছিল। শান্তিনিকেতন তখনও অশান্তিনিকেতন হয়ে ওঠেনি আজকের মতো। বি এ এম এ পাশ করলেই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সেক্রেটারি হলেই কেউ IPSO-FACT সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠেন না।

সংস্কৃতি টাকা দিয়েও কেনা যায় না।

আমি যে সময়ের কথা বলছি বা তারও আগে শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ বাসিন্দাই সংস্কৃতিবান ছিলেন। কোনো না কোনো বিশেষ গুণ ছিল তাঁদের। যাঁদের গুণ ছিল না, তাঁদের মধ্যে কিছু গুণগ্রাহিতা ছিল। তবে রাজনীতিতে সেদিনও "পল্লীসমাজ"-ই ছিল শান্তিনিকেতন। শুনতে পাই, এখনও তাই আছে।

সেই পৌষ-মেলাতে শোনা দেবব্রত বিশ্বাসেব খালি গলার গান এখনও কানে ভাসে। সুচিত্রা মিত্রর গলাও ছিল অত্যন্ত খোলা। অমন দরাজ গলা মেয়েদের মধ্যে অন্য কারোরই ছিল না। কিন্তু তাঁর গলাতে টপ্পা ছিল না, যা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বা নীলিমা সেনের গলাতে ছিল। সুচিত্রা মিত্র আই পি টি এ-তে যোগ দিয়ে হাটে-মাঠে চেঁচামেচি করে সুন্দর গলাটির সৌকর্য ও মাধুর্য সম্ভবত কিছুটা নষ্ট করেছিলেন। তবুও ওঁদের প্রত্যেকের গানেই একটা আলাদা ব্যাপার ছিল। রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে না পড়লে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর প্রত্যেকটি শব্দ যথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না এবং ফলে সেই সব "অশিক্ষিত" গায়ক-গায়িকার গান যে প্রাণহীন হয়ে পড়ে একথাও আজকালকার কম শিল্পীই বোঝেন। ভাব এবং সুরের, তাল এবং লয়ের এবং বাণীর যা বক্তব্য তাব সুষম সমন্বয়ের আরেক নামই যে

গান এবং গানের সঙ্গে প্রাণ যুক্ত না হলে তা যে শুধুমাত্র কষ্টকৃত স্বরলিপি-পঠন নয়তো মুদ্রাদোষে-ক্লিষ্ট আড়ষ্ট স্বরোদগারণ হয়েই দাঁড়ায়; এই সরল সত্যটিও আজকালকার কম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীই বোঝেন।

সুচিত্রা-কণিকা-নীলিমা রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে একটি বিশেষ যুগের প্রতিভূ। তার পরবর্তী যুগে কে বা কারা সবচেয়ে ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গান তা বিচার বা আলোচনার স্পৃহা নেই। এই বাবদে যাই বলি না কেন তা শুধুমাত্র একজন সজাগ শ্রোতা হিসেবেই বলি। গায়ক বা বোদ্ধা বলে নিজেকে মনে করার মতো মূর্খামি কোনওদিনও ছিল না। আজও নেই।

শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমরা উঠেছিলাম বাবাব এক বন্ধু, সতীশ কাকুর (মৈত্র) শ্যালক একজন চিত্রীর বাড়িতে। খুবই লজ্জার কথা, তাঁর নামটা পর্যন্ত ভুলে গেছি। মনেই করতে পারছি না। পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। কিছু কিছু জিনিস স্পষ্ট মনে আছে আবার কিছু ভুলে গেছি একেবারেই। কেন এমন হয়, তা কে জানে!

'ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে'র মতোই রাতে শোওয়ার বন্দোবস্তটা তাঁব নিচু-বাংলার কোয়ার্টারে হয়েছিল আব খাওয়াটা কখন কার ঘাড়ে 'বড়ি ফেলে' করা যায় সেই ভাব ছিল সঞ্জয়ের উপরে।

তখন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিচু বাংলার খড়ের চালের বাড়িতেই থাকতেন। তখনও "মোহরদির" সঙ্গে আলাপ হয়নি আমার।

বাপির বোন সানু তখন শান্তিনিকেতনে পড়ত। ওর অতিথি হয়ে দুপুরে তো আশ্রমের খাওয়া হল। অত্যন্তই বাজে খাওয়া। সংস্কৃতির মধ্যে খাওয়ার সংস্কৃতিও অবশ্যই পড়ে বলে আমার ধারণা। আশ্রমে নিরামিষ খাওয়াতে কোনও দোষ দেখি না। কিন্তু নিবামিষেরও তো রকম আছে! অথচ বলে কে! শান্তিনিকেতনে বলে কথা! সেখানে আমাদের মতো ব্রাত্যজনেরা মুখ খুললে তো "পেলয়" ঘটে যেত।

সঞ্জয় এবং রজত অন্যত্র উঠেছিল। কোথায়, ঠিক মনে নেই।

সঞ্জয় একসকালে বলল, আজ রাতে তোদের ভালো করে খাওয়াব। লীলা দিদুর ঘাড়ে বড়ি ফেলে দিয়েছি।

লীলা দিদু কে?

দীপক বলল।

ইডিয়ট! সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের নাম শুনিসনি?

"পদি পিসীর বর্মী বাক্স"—সিগনেট প্রেস—নাম শুনব না কীরে?

দীপক ইনসালটেড হয়ে বলল।

তিনিই আমার দিদিমা। পথের পাঁচালি করেছেন যে, সত্যজিৎ রায়, তিনি লীলা দিদুর আত্মীয়। জানিস তা?

তাই?

আমি বললাম।

রজত বলল, হই! হল্লো!

সে রাতে ঠাণ্ডার মধ্যে উদোম মাঠ পেরিয়ে হু-হু হাওয়ায় হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে চারজন ক্ষুধার্ত সদ্য-যুবক একটি চমৎকার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোলাম। তখন রতনপল্লীতে বা পূর্বপল্লীতে ক'টি বাড়িই বা ছিল!

জার্মান ব্যারনের মতো চেহারার, দীর্ঘাকৃতি, তীক্ষ্ণনাসা, প্রশস্ত ললাটের এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে, সঞ্জয় বলল, দাদু।

আমরা ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করলাম

ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, মুখে পাইপ, হেভি উলেনের ড্রেসিং গাউন-পরা পাক্কা সাহেব। সঞ্জয়ের দাদুকে আমাদের সকলেরই খুব ভালো লেগে গেল।

দিশি সাহেবদের মধ্যে কাঁচা বা আধ-পাকা সাহেবও অনেক দেখা যায়। কিন্তু ডঃ মজুমদার, মানে, সঞ্জয়ের দাদু ছিলেন সবদিক দিয়ে পাক্কা সাহেব। লীলা দিদুকে তো ভালো লাগলই। অত নামী লেখিকা

নিজে হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে রইল সেই অভিজ্ঞতা। আর খাওয়াটাও যা হল, তা বলার নয়। আমাদের অবস্থা তখন উপোসী ছারপোকারই মতো। যাহা পাই তাহা খাই অবস্থা। কিন্তু লীলা দিদুর হাতের রান্নার স্বাদ এখনও যেন মুখে লেগে আছে। পোলাও-মাংস, মাছের চপ, চমৎকার স্যালাড, দুর্দান্ত সুইট-ডিশ এবং আরও অনেক কিছু।

দুর্গাপুজোর সময়ে প্রায় প্রতিবছরই বাবা আমাদের কোথাও না কোথাও নিয়ে যেতেন। সে বছরে গেছিলাম বিন্ধ্যাচলে। বিন্ধ্যাচলের কথা তো আগেও বলেছি।

বিন্ধ্যাচল একটি ছোট্ট গ্রাম, কাছেই বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, পাহাড়ের উপরে। বিন্ধ্যাচলে অন্য নানা দেবদেবীর মন্দিরও আছে। ছোট লাইনের ট্রেনও সেখানে থামে। মোগলসরাই থেকে আসে।

আমরা মোগলসরাইতে নেমে, ট্যাক্সিতে মির্জাপুর হয়ে, বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে, কিন্তু বিন্ধ্যাচলের কাছেরই গঙ্গার উপরে এবং পাহাড়ের পদতলে শিউপুরা নামের একটি ছোট্ট গ্রামে পৌঁছতাম। পুরো অঞ্চলটিই বিন্ধ্যাচল বলে খ্যাত ছিল বলেই বিন্ধ্যাচল বললাম। পাথরের বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতাম। আজকে তেমন কোনও বাড়িতে থাকার কথা ভাবতেও পারি না। না ছিল বিজলি-আলো, না পাখা, সরু, অত্যন্ত উঁচু উঁচু পাথরের সিঁড়ি। পুজোর সময়ে বেশ গরমও থাকত শিউপুরাতে। অমন বাড়িব মধ্যে থাকতে দমবন্ধ হয়ে আসত বলেই প্রায় বাবো ঘণ্টা বাইরে বাইরেই থাকতাম। আগে বোধহয় বলেছি যে ভাল বাড়ি একটিই ছিল কিন্তু সেটি পাওয়া যেত না।

গঙ্গা নদীতে নানারকম মাছ ধরা পড়ত। আর মাছ ছিল অত্যন্তই সস্তা। বিন্ধ্যাচলের জল ছিল সবরকম পেটের অসুখের পক্ষে ধন্বন্তরি। খাঁটি দুধ ও দুধেব তৈরি সবরকম মিষ্টি, রাবড়ি ইত্যাদিও চমৎকার ছিল।

বাবার ছুটি-কাটানো মানেই ছিল সকাল থেকে রাত অবধি, কী দিয়ে কী রান্না হবে তা জম্পেস করে বাতলানো আর আমার বেচারি পতিপ্রাণা মায়েব কাজ ছিল সেই মতো রান্না করা। শেষের দিকে ঠাকুর-চাকর নিয়েই যাওয়া হতো এবং ওখানের সবচেয়ে ভাল বাড়িটি অনেক আগে থেকে ঠিক করে ভাড়া নিয়ে থাকা হতো। সেটি ছিল বাগানওয়ালা, খোলামেলা, কাশী-এলাহাবাদের রাস্তার উপরে।

বিন্ধ্যাচলে শেষবার গেছি উনিশশো বাষট্টির পুজোর সময়ে। সত্তরের দশকের শেষে একবার গেছিলাম একবেলার জন্যে বেনারস থেকে।

হনুমানের ভীষণ উপদ্রব ছিল শিউপুরাতে। অসভ্য সব হনুমান। বিশেষ করে পুরুষগুলো। যে-মহিলারা বলেন, "পুরুষমাত্রই হনুমান" তাঁদের বিশেষ দোষ দিতে পারি না বিন্ধ্যাচলের হনুমানদের দেখার পরে। তাদের অসভ্যতা-অভদ্রতার বর্ণনা নাই-বা দিলাম। অমন EVE-TEASERS হনুমানের দল বোধহয় ভূ-ভারতে নেই।

বিন্ধ্যাচলের* প্রকৃতি আমার তরুণ মনের উপর বিশেষ রেখাপাত যে করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনও। নানা রকম চরিত্রকে জেনেছিলাম। সম্ভবত বাবার মতো প্রবল ব্যক্তিত্বর ঘেরাটোপের বাইরে বেরিয়ে সেই প্রথম সব একক অভিযান এবং অভিসার আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ, বিস্মিত এবং অভিভূত করেছিল। একাকীত্বর সঙ্গে প্রেমে পড়ার সেই বোধহয় শুরু, গোঁফ গজাবার পরের অধ্যায়ে।

* "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে" ১ম পর্ব—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

উপরের মালভূমিতে উত্তরপ্রদেশের "বেহেড়িয়া" সম্প্রদায়ের (যারা নানা রকম জংলি জানোয়ার ও পাখি ধরে বেড়ায়, শিকারও করে) কুর্তা-পাজামা-শেরওয়ানি এবং মাথায় টিকি-ঝোলানো "ফেজ" টুপি পরিহিত শিকারী "মগ্‌গর-বুলানেওয়ালা'র সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। যে জল থেকে কুমিরদের "ব্রজ-বুলির'ই মতো "কুমির-বুলি" দিয়ে ডেকে, ড্যাঙ্গায় তুলে সেই কুমির সহজে মারতে পারত, তাই তার নাম "মগগর বুলানেওয়ালা"।

সে একদিন শম্বর শিকার করাবে বলে বহু মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে সারা রাত এক "তলাও"-এর পাশে গাছতলায় বসিয়ে রেখে শম্বর ভেবে, ভুল করে, দড়ি-দিয়ে পেছনের দু-পা বেঁধে-রাখা একটি বেতো ঘোড়া আমাকে দিয়ে মারিয়েছিল শুক্লপক্ষের চাঁদের শেষ রাতে।

সেই ঘোড়া ছিল আবার বিখ্যাত লেঠেলদের গ্রামের ঘোড়া।

ঘোড়া শিকার করার পরে প্রাণভয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসতে আসতে আবাবও "ভুল" করে সে কোনও দৈবী প্রাণী "ভেবে" পাহাড়ের উপরের বাজরা খেতের মধ্যে আমার ঠাকমার দুগ্ধফেননিভ কোলবালিশের মতো অথবা মেমসাহেবের গায়ের রঙের মতো রঙের অথবা সাঁত্রাগাছির ওলের মতো গায়ে লাল-লাল ফুটকি দেওয়া সাদা গোবদা বড়কা শুয়োর শিকার করিয়েছিল।

আসলে, সে শুয়োরটি ছিল সুইটজারল্যান্ডের শুয়োর। একটা ফার্ম ইমপোর্ট করিয়েছিল।

তারপর আবার দৌড় প্রাণ নিয়ে, দে দৌড়,দে দৌড়।

গঙ্গার চরে রাজহাঁস শিকার করাতে নিয়ে গিয়ে গিদাইয়া কীভাবে আর একটু হলেই চোরা বালিতে ডুবে মরছিল এবং আমাকেও মেরেছিল, কীভাবে সে রেল লাইনের পাশের, নীচে দলদলি এবং উপরে পদ্মবন আর সাপে ভরা এক তালাওতে, যেখানে ধোপারা কাপড় কাচত,সেখানে আমার শিকার-করা হাঁস, সাঁতার না-জেনেই সাঁতরে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রায় ডুবেই মরেছিল এবং তাকে কী প্রকার কসরত করে তখনও সাঁতার না-জানা আমি যে উদ্ধার করেছিলাম সেই সব হিলারিয়াস গল্প আছে "জঙ্গল মহল"-এ।*

পাহাড়তলিতে "মাছিন্দার" গা-ছমছম পরিবেশ, যার মধ্যে দিয়ে এলাহাবাদের দিকে "বিরহী"র পথ চলে গেছিল; সেই পথে এক গোধূলিবেলায় মির্জাপুরের চওক-এ গান শুনতে যাওয়া হয়েছিল যার কাছে, নিষিদ্ধ পাড়াতে; সেই তরুণী পরমাসুন্দরী বাঈজি আমাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছিল। মনে আছে।

শিউপুরা থেকে পথ একদিকে চলে গেছিল কাশী, পঞ্চাশ মাইল। অন্যদিকে এলাহাবাদ, সেও পঞ্চাশ মাইল।

ঝুমঝুম করে ঘোড়ার গলাব ঘুঙুর বাজিয়ে একটি ঘোড়ার গাড়ি চলে যাচ্ছিল এলাহাবাদের দিকে। হঠাৎই গাড়ি থেমে গেল। গাড়ির দরজা খুলে গেল। দেখলাম যে, সে বসে আছে। হাসল সে। তার গান তো শুনিয়েছিলই, আমার গানও শুনেছিল, সে একদিন তার ডেরাতে। অথচ পয়সা নেয়নি। কেন যে নেয়নি, সেই জানে। তার সঙ্গে কোনও শারীরিক সম্পর্কও হয়নি। বকে গেলেও এতটা বকিনি যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময়েই তা হবে। শারীরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাও হয়নি আমার কখনই বিয়ের আগে। হলেই বোধহয় ভাল হতো। এতখানি রোম্যান্টিক থাকতে হতো না। রোম্যান্টিকতা জীবনে এবং হয়তো সাহিত্যেও এ যুগে দুর্লভ গুণ বলে যেমন চিহ্নিত হয় তেমনই এক দুরারোগ্য ব্যাধিও। ভুক্তভোগী বলেই জানি।

তাকে বলেছিলাম, তুমি চলে যাচ্ছ?

কত দূরে চলে যাচ্ছ?

যাওয়ার আগে আমাকে দিয়ে যাও কিছু, যাতে তোমাকে মনে রাখতে পারি। কোনও উপহার।

সে হেসে গাড়ির দরজার উপরে রাখা আমার হাতের উপরে তার হাত রেখে বলেছিল, দিয়েতছিই। বোকাইটা!

কী দিয়েছ?

---

* জঙ্গল-মহল—প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং।

তুমি জান না?

না তো!

দিয়েছি, যা, আর কাউকেই এর আগে দিইনি, আর অন্য কাউকে দিতেও পারব না এ জীবনে। দ্বিতীয়বার। সে উপহার তোমারই!

'পহেলী পেয়ার'।*

আমার 'পহেলী পেয়ার' গল্পটি তাকে নিয়ে, মাছিন্দার সেই ছায়াচ্ছন্ন পথ নিয়ে, গোধূলিবেলার আলোয় বিধুর এক মহামূল্য মুহূর্তকে নিয়ে লেখা।

সে আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিল। সে আছে কি নেই, আজ কোথায় আছে, জানি না। আমিও চিরদিন থাকব না। মুখ্যত কলকাতাতেই বড় হয়ে-ওঠা, ছটফটে এক বাঙালি তরুণকে সেই তরুণী তওয়ায়েফ-এর দেওয়া উপহার, মহার্ঘ্য উপহার, "পহেলী পেয়ার" গল্পটির মধ্যে চিরদিন সুরে-বাঁধা-দিলরুবার মতোই বাঁধা থাকবে। যে পাঠক-পাঠিকাই চাইবেন তাতে আঙুল ছোঁয়াবেন। আঙুল ছোঁয়ালেই তা করুণ সুরে বেজে উঠবে।

পাহাড়ের উপরে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, কালী কুঁয়ো, গঙ্গার উপরের কত সকাল দুপুর নৌকোতে করে ঘুরে বেড়ানো, নদীর এক রূপ, নদীর চরের এক রূপ, সেই শারদ দিনে নদীর দুই পারের আবার অন্য রূপ ছিল। তারা সবাই যেন নীরবে বলে, আমাকে দ্যাখো, আমাকে দ্যাখো। কাকে ফেলে, কাকে দেখি!

রেড-ওয়াটেলড ল্যাপউইংগ-এর বুক-চমকানো ডাকে গা-ছমছম করা আসন্ন সন্ধ্যার সেই জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমিতে দাঁড়িয়ে রাইফেল-কাঁধে একা একা নীচের ছবির মতো শিউপুরার দিকে চেয়ে থাকতাম। দেশলাইয়ের বাক্সের মতো রেলগাড়ি চলে যেত। ভায়া এলাহাবাদ। তখন কত ভাবনাই যে আসত মনে।

আবার চলে যেত।

অন্ধকার নামলে, অনেক নীচে শিউপুরার প্রধান পথে নানকু পানওয়ালার দোকানে হ্যাজাক জ্বলে উঠত। দেওয়াল-জোড়া অয়নাতে ঝকমক করত সেই উজ্জ্বল আলো।

উত্তর ভারতের সব পানের দোকানেরই ওই ট্রাডিশন। রংবাজ ছোঁড়ারা, কী গ্রামে, কী শহরে, সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জর্দা-পান খাবে আর রাজ্যের গুজব ছড়াবে আর গাল-গল্প করবে। এমনই চলে আসছে আবহমান কাল ধরে।

আমাদের ফেলে-আসা সেই বড় প্রিয় পৃথিবীতে আজকের তুলনাতে মানুষ অনেকই কম ছিল। কী কলকাতাতে, কী অন্যত্র। গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি অনেকই বেশি ছিল। এত আরাম, এত রকমের আরাম ছিল না হয়তো সেদিন, কিন্তু সহজ আনন্দ ছিল অনেকই। এত সুখ ছিল না। কিন্তু স্বস্তি ছিল ঢের। এত জানত না শহরের মানুষ, সর্বজ্ঞ ছিল না। গল্ফ, ক্রিকেট, বিলিয়ার্ড, টেনিস, ফুটবল, জিমন্যাস্টিকস সবেতেই জ্ঞান ছিল না তাদের। হয়তো একটা খেলা জানত, কিন্তু ভাল করে জানত। এত বিজ্ঞাপন ছিল না। এত লোভ ছিল না মানুষের চোখে মুখে। এত অপ্রয়োজনের প্রয়োজন ছিল না। একটি টিভি, একটি গাড়ি, একটি ফ্ল্যাটের জন্যে মনুষ্যত্ব এমন দু'হতে অট্টহাস্যে উপড়ে ফেলত না মানুষ সম্পূর্ণই কাণ্ডজ্ঞানরহিত হয়ে।

তখন সাধনা ছিল, মানুষ হওয়ার; বড়লোক হওয়ার নয়। তখন আমরা পড়াশোনা করতাম "শিক্ষিত" হওয়ার জন্যে, কেরিয়ার তৈরি করার জন্যে নয়। সাহিত্যিকেরা সাহিত্য করতেন নিজের ভেতরের তাগিদে। পুরস্কার পাবার জন্যে বা বাড়ি-গাড়ি করার জন্যে নয়। বিয়ে করতাম, কাউকে ভালবেসে বা বাবা-মায়ের ইচ্ছার দাম দিতে : Social climbing-এর জন্যে নয়। সি. এন. এন., বি. বি. সি. স্টার টিভি সমস্ত পৃথিবীকে সমস্ত পৃথিবীর তাবৎ অশান্তি, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোককে আমাদের ঘরের মধ্যে টেনে এনে আমাদের সামান্য সুখ-শান্তিকে ছারখারে দিত না তখন এমন করে, অথচ

* "পহেলী পেয়ার" গল্প সংকলন—প্রকাশক সাহিত্যম্

যেসব ঘটনা বা যুদ্ধ বা ধ্বংস বা নির্মাণ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবেও করণীয় তেমন কিছুমাত্রই নেই, মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করা ছাড়া।

অত বেশি জেনে, লাভ কিছুই হয় না। শুধুই মন খারাপ হয়। শান্তি নষ্ট হয়।

যে সর্বজ্ঞ, সবজান্তা; স্বস্তি বা শান্তি তার জন্যে নয়।

তবে, আমার মতো, এমন সব ভাবনা ভাবাটাও হয়তো আজকের দিনে পরম মূর্খামি। এই সদা-অগ্রসর সমাজে এসব নিতান্ত অনগ্রসর মানুষের ভাবনা-চিন্তা বলেই গণ্য হবে।

প্রত্যেকেই আজকে এত জানে, তাদের নিজ নিজ ভবিষ্যৎকে তাদের অধিকাংশই এমনই হেসেখেলে করতলগত করে রেখেছে, তাদের যার যার জীবনে "বড় হওয়ার" বাসনা এমনই বজ্র-বিশ্বাসের দৃঢ়তায় মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছে যে, সেই মুষ্টি যে খোলার তেমন ক্ষমতা তো আমার দুর্বল হাতে নেই।

মুষ্টিবদ্ধ, মৃত-মানুষের মুঠি তো খোলা যায়ও না।

যা হবার তা হবে।

কালের স্রোতে কুটোর মতো ভেসে যাব আমি, আমার সব চিন্তা-ভাবনা। যা অমোঘ, যা হবেই; তাকে কি ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার আছে?

মানুষের মস্তিষ্ক, যা সুপার কমপিউটরের জনক এবং যা হাজার সুপার কমপিউটরের চেয়েও বেশি শক্তিশালী, সেই মস্তিষ্কও ধীরে ধীরে ইজারা দিচ্ছি আমরা কমপিউটরকে। অর্থনীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি আজকে। অন্য কোনও নীতি, কোনও বোধেরই কণামাত্র দাম নেই এই পৃথিবীতে।

সম্ভবত আমার মতো মানুষেরা মৃতর চেয়েও মৃততর হয়ে গেছি। হয়তো 'ফসিল'ও হয়ে যাব।

শিগগিরি।

পুজোর ছুটিতে যেমন প্রায়ই বিন্ধ্যাচলে যেতাম, তেমন গরমের ছুটিতে যেতাম নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার তামারহাটে!

শীতেও যেতাম ছেলেবেলাতে। সেসব কথা ঋভুর প্রথম পর্বে আছে।

তামারহাটের কথা বলতে বসে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলাম। তামারহাটে আমার বড় পিসেমশাই থাকতেন। পাটের ব্যবসা ছিল তাঁর। ধুবড়ি-তামারহাটের মিত্তির পরিবারকে ও-অঞ্চলেব সকলেই চিনতেন। সচ্ছল অবস্থা ছিল পিসেমশায়দের। তিস্তা এবং গঙ্গাধর নদীর বড় বড় মহাশোল মাছ, ঝুড়ি-ঝুড়ি কমলালেবু, খেতের সুগন্ধি চাল, ফেনাভাত, পায়েস; সে সব এখন স্মৃতি হয়ে গেছে।

রংপুরের স্মৃতিও অবশ্য স্মৃতিই হয়ে আছে।

যাঁরা উদ্বাস্তু হয়নি, তাঁরা জানবেনও না কখনওই যে, দেশ-গাঁয়ের গরিবও শহরের বড়লোকদের তুলনাতে কত বেশি সচ্ছল।

এখনও চোখ বুজে ভাবলে পিসেমশায়ের মস্ত পাটগুদামে গুদামজাত ব্লন্ড বা ব্রুনেট মেসাহেবের চুলের মতো পাটের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ যেন নাকে আসে। রঙ্গন আর কাঠটগরের ডালে মৌটুসকি পাখিরা এখনও টুসকি মেরে যায়। বৃষ্টিশেষের জলভারাবনত পুষ্পস্তবক থেকে নবীন কিশোরীর কান্নার মতো জল ঝরে। জবা গাছের ফুলের মধ্যে জোড়া বুলবুলির খুনসুটিও যেন চোখের সামনে ঝিলিক মেরে যায়। বর্ষাস্নাত গরুর গায়ের গন্ধ, বৃষ্টিভেজা রেশমী গো-বকের গায়ের গন্ধ, চাপ-চাপ সতেজ সবুজ মুথা ঘাসে ভরা মাঠের গন্ধে নাক ভরে আসে।

ভাল লাগাতে মন খারাপ হয়ে যায়।

আর হাটের গন্ধ?

সুদর্শন, সুগঠিত, মুসলমান চড়ুয়াদের পাথরের মতো শরীরের ঘামের গন্ধ, মদেশিয়া মেয়েদের স্তনসন্ধির আর বগলতলির মিষ্টি গন্ধ; এখনও বিড়ি, তেলেভাজা আর হাঁস-মুরগি-বকরির গায়ের গন্ধের সঙ্গে, সরষের আর কেরোসিনের তেল আর খোলের গন্ধের সঙ্গের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে কোনও অদৃশ্যপুর থেকে যেন ভেসে আসে।

একজন মানুষের চেতনার মধ্যে কত রঙের কত রংপুরই যে থাকে, তা কী বলব। রংপুরের ছাড়াছড়ি।

যেদিন এই মস্তিষ্ক থেমে যাবে, তা স্মৃতি মন্থন করতে পারবে না আর; এই দুটি চোখের মণিতে প্রকৃতির আশ্চর্য মধুর রূপের প্রতিবিম্ব আর যখন পড়বে না, এই দুটি কানের কাছে আর পৃথিবীর বিচিত্র সুন্দর, সুরেলা সব পাখি যখন ডাকাডাকি করবে না, নামক আর মিশ্র মিষ্টি-তিক্ত-কটু-কষায়-বনগন্ধে শিহরিত হবে না; বর্ষার সোঁদামাটির গন্ধ, গ্রীষ্মশেষে, পঁচিশ বছর অবদমিত—কাম পুরুষের মতো বৃষ্টি যখন যুবতী প্রকৃতিকে পাগলের মতো রমণ করবে সেই তপ্তজমিতে প্রথম জলপড়ার শব্দের ধোঁয়া-ধোঁয়া গন্ধ, আর পৃথিবীর প্রাণিত হওয়ার গন্ধ, ধরিত্রীর গর্ভাধানের গন্ধ চিনতে পারবে না এই নাক; সেদিন আমার বাঁচা আর মরাতে তফাতই বা কী থাকবে!

তামারহাটে বড় পিসিমা ও পিসেমশাই-এর কাছে বড়ই আদর-যত্ন পেয়েছি। সেই ঋণ-এ জীবনে শোধার নয়। আর পেয়েছি, উদার প্রকৃতির সান্নিধ্য। তিস্তা থেকে বয়ে আসা গঙ্গাধর নদী, যে গিয়ে পড়েছিল ধুবড়ির কাছের ব্রহ্মপুত্রে, তার শান্ত ধীরা ঋতির কথা মনে পড়ে।

প্রত্যেকটি নদ এবং নদীই তাদের ঋতিতে পরোপুরি ভিন্ন। ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। তাদের ব্যক্তিত্বও ভিন্ন।

নিস্তব্ধ দুপুরে অগণ্য উদবেড়ালের মাছ ধরা দেখেছি অবাক চোখে, শহুরে ছেলে। উঁচু বালির পাড়ে তাদের গর্ত থেকে ঝাঁপাঝাঁপি করে, তারা সংক্ষিপ্ত চকিত ডাকে দুপুরের অপার্থিব নিস্তব্ধতাকে মথিত করেছে। পরক্ষণেই জলভেজা শরীরে বালিতে দাগ ফেলে গর্তে ফিরে গেছে তারা মাছ মুখে করে। সোনালি চখা-চখির আশ্চর্য বিষণ্ণ ডাক শুনেছি শীতের আমেজ ভরা দুপুরে, নানা মাছরাঙার উছলে ওঠা; রং ছিটিয়ে, জল ছিটিয়ে, লক্ষ লক্ষ হিরে চমকিয়ে; সেইসব আর দেখতে পাব না। কোনওদিনও। সেদিনের প্রকৃতির মধ্যে খাদ্য ও খাদকের কারোরই যেন কোনও অভাব ছিল না। অঢেল ঐশ্বর্য ছিল পৃথিবীর। live and let live-এ বিশ্বাস করত মানুষ এবং প্রত্যেকটি প্রাণী। ভরপুর প্রাচুর্য ছিল। সেই অল্প-জ্ঞানী, বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা অন্যমনস্ক মানুষদের লোভ এমন করে সব কিছুকে গ্রাস করেনি। গ্রাস করেনি বিজ্ঞাপনসঞ্জাত এত রকম অপ্রয়োজনের প্রযোজন।

সেসব দিনের কথা মনে পড়লেও মন স্নিগ্ধ হয়ে আসে।

শীতের তিস্তার কাকচক্ষু জলের কথা মনে পড়ে। জলের নীচে নানারঙা নুড়ি। নানারঙা পরিযায়ী হাঁস: পাখি, ছোট-বড় বন্দুকের নানা-রঙা, নানা "ধ্বক"-এর বিলিতি টোটা, ফোটো-কার্তুজেব বারুদের মিষ্টি গন্ধ, এইসব কিছুর সঙ্গেই আমার কৈশোর-যৌবন যেন এখনও থেঁতো-চালতার সঙ্গে ধনেপাতা-কাঁচালংকার মতো মাখামাখি হয়ে আছে।

কোনওরকম অভাবই যে ছিল, আরামের অপ্রাচুর্য যে ছিল, কলকাতার বাড়িতে যে রেডিও পর্যন্ত ছিল না একদিন, জানলার তাকে বসে দূরের পড়শির রেডিওতে আমরা তিন ভাইবোন যখন অনুরোধের আসরের গান শুনতাম—বা মহালয়ার অনুষ্ঠান—খুবই ছেলেবেলায়—সেইসব দিনের কথা আজ ভাবলেও বড় আশ্চর্য লাগে।

মনে হয়, সেই সব দিনেই যেন অনেক ভালো ছিল। মনে হয় না, হয়তো সত্যিই ছিল।

অভাব পূরিত হলে, সুখ চলে যায়; সুখের কল্পনা চলে যায়, আশ মিটে গেলে যেমন প্রেমিক আর ফিরে আসে না, প্রেম অপমানিত হয়; অভাবও পূরিত হয়ে গেলে, একদিন পূরিত যে হবে, সেই সুখকল্পনার আনন্দ থেকে মানুষকে পুরোপুরিই বঞ্চিত হতে হয়।

অর্থ, সত্যি সত্যিই সমস্ত অনর্থর মূল। অর্থ হজম করা লোহা হজম করার চেয়েও শক্ত। শতকরা নিরানব্বই পয়েন্ট নিরানব্বই ভাগ মানুষকেই অর্থ পুরোপুরি নষ্ট করে দেয় বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অর্থর লোভ পূরিত হলে ক্ষমতার লোভ জাগে। ক্ষমতার লোভ পূরিত হলে যশের লোভ। মানুষ বড় লোভী জানোয়ার। তার মজ্জায় মজ্জায় লোভ। আজকে বুঝি যে, অর্থর কোনও নিজস্বতাও নেই

তার চরিত্রে। যে আধারে সে যখন থাকে, যে মানুষের পার্স-এ, যে মানুষের লকার-এ বা ব্যাঙ্ক-এ, অর্থ সেই মানুষের চরিত্রই অধিগ্রহণ করে। জলেরই মতো তরল চরিত্র তার। সবচেয়ে বিপদ এইটেই।

এই কথাটা আমাদের ছেলেমেয়েদের শেখানো দরকার। জীবনের পরম গন্তব্য যে অর্থোপার্জন নয়, মানুষ হওয়া; মানুষের মতো মানুষ হওয়া; এই কথাটি প্রতি ঘরে ঘরে প্রত্যেক মা-বাবার শেখানো দরকার তাঁদের সন্তানদের শিশুবয়স থেকে।

না। আজও অর্থই সব কিছু হয়ে ওঠেনি। শেষের দিনেও হবে না।

এই বিশ্বাস গড়ে তোলার সময় অবশ্যই এসেছে।

জানি না, চারধারে তাকিয়ে যা দেখি, তা অনুভব করি; তাতে মনে হয় না আমার এই কান্না অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুমাত্র হবে বলে। তবুও নিজের জীবন দিয়ে যা উপলব্ধি করেছি, যা সত্য বলে জেনেছি; সেই সত্যকে অন্যর কাছে উপস্থিত করার দায়িত্ব একজন সামান্য লেখক হিসেবে অবশ্যই থাকা উচিত বলেই আমি মনে করি।

তামারহাটের দিনে, বাঘডোরা গ্রাম থেকে টাট্টু ঘোড়াতে চড়ে আসতেন মুনসের মিঞা। সবাই তাকে ডাকত মুনসের সর্দার বলে। "সর্দার" কেন বলত জানি না। সে শিকারে নিয়ে গেছিল একবার আমাকে তাদের বাঘডোরা গ্রামে চিতাবাঘ মারতে। নীচে পাঁঠা-বেঁধে বসেছিলাম এক ঝুপড়ি আমগাছের উপরে। গুলি খাবে বলে বাঘ এসেও ছিল কিন্তু পিসেমশাইয়ের পড়শি রতু-জেঠু, তাঁর ফোর্ড গাড়িতে করেই গেছিলাম; সেই হতভম্ব, বে-ইজ্জৎ-হওয়া বাঘকে দুসস শালা! দুসস শালা! বলে মাচাতে বসে হাততালি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মানুষের ভগ্নিপতি হতে তার কোনও বাসনা ছিল বলেও জানা ছিল না।

আমি হোঁদল কুৎকুৎ এবং হাঁদা বলেই শুধিয়েছিলাম, কী? কী করলেন জেঠু?

জেঠু ঘুম ভেঙে উঠে বলেছিলেন, শালা শেয়াল।

বাঘটা সে কথা শুনতে পেলে মরমে মরে যেত। সে তখন অনেক দূরে চলে গেছে।

এ সব গল্পই আছে "জঙ্গল মহল"-এ এবং অনেক বিস্তারিতভাবেই আছে "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে"-তে।

ধুবড়ি থেকে তামারহাট আসতে নুড়ি-বিছোনো পথে গৌরীপুর আর কুমারগঞ্জ পড়ত। এই গৌরীপুরের রাজারা ছিলেন বড়ুয়া পরিবারের। প্রথমেশ বড়ুয়া, প্রকৃতীশ বড়ুয়া, বড়রাজকুমারী, ছোট রাজকুমারী। তাঁরা সকলে এবং তাঁদের "মাটিয়াবাগ প্যালেস" একজন কিশোর আর সদ্যযুবকের চোখে ঘোর লাগাত। প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া বা "লালজি" ছিলেন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ শিকারী এবং হাতি বিশেষজ্ঞ। জংলি হাতি ধরার ব্যবসা ছিল তাঁর। পরবর্তী জীবনে শিকার, আমারই মতো একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেন জানি না, তিনি, পরবর্তী জীবনে যখন আমাকে জানবার সুযোগ হয়েছিল তাঁর, তখন তিনি আমার মতো সামান্য জনকেও খুবই স্নেহ করতেন। আমার বনজঙ্গলের লেখার একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন তিনি। ছিলেন যে, তার প্রমাণ তাঁর একাধিক আন্তরিক চিঠি। একটি উল্লেখযোগ্য চিঠি "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে" প্রথম পর্ব-তে উদ্ধৃতও করেছি। অমন মানুষের স্নেহ ও সম্মান পেয়েছি, আমার মতো 'জ্ঞানপড়', অনভিজ্ঞ মানুষ, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

কেন জানি না, আমাকে উনি, "গুহ সাহেব" বলে সম্বোধন করতেন। বাবার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। "গুহ সাহেবে"র ছেলে বলেই "গুহ সাহেব" কি না তা বলতে পারব না।

কুমারগঞ্জ থেকে চলে যেতাম গভীর হরজাই জঙ্গলে-ঘেরা রাঙামাটি ও পর্বতজুয়ার পাহাড়ে। রাঙামাটির টুঙবাগানের মধ্যে দিয়ে। একটি মেচ মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। মনের ভালবাসা। গোবর দিয়ে তকতকে করে নিকোনো উঠোনে বসে সে তার মায়ের সঙ্গে তাঁত বসিয়ে বহুবর্ণ সুতো দিয়ে বহুবর্ণ দোহর ও পোশাক বুনত। তার মাথার উপরে, এবং চারধারে ছড়িয়ে পড়ত গ্রীষ্মদিনের কামগন্ধী দুপুরের দামাল হাওয়াতে খসেপড়া বহুবর্ণ কাঁটাল পাতারা। ব্যালেরিনার আলতো হাতের খুলে দেওয়া স্কার্টের মতো ঘুরে ঘুরে মচমচানি তুলে নীচে এসে পড়ত উড়ে উড়ে তারা। আমার মনের

মধ্যেও বহুবর্ণ তাঁত বুনতাম আমি। কাঁচপোকা উড়ত। অনাঘ্রাত কাঁচা-সোনা রঙা, আমার ভালবাসার মেচ তরুণীর থুতনিতে ঘামের বিন্দু জমত; আর আমার অনভিজ্ঞ মনে এবং শরীরে কামবিন্দু। উথাল-পাথাল করত পাহাড়ী চৈতি হাওয়া।

বড় সুন্দর ছিল সেই পৃথিবী।

আমাদের ছেলেবেলার পৃথিবী!

আমার মেচ প্রেমিকার দাদা, গাদা বন্দুক দিয়ে বড় বাঘ শিকার করত। কোনও প্রয়োজনে নয়। বাঘের সঙ্গে টক্কর দিতে। নিজের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। শিকারীদের অনেক অনভিজ্ঞই গালাগালি করেন, কিন্তু আমরা যখন শিকার করতাম তখন শিকার ছিল প্রতীকী। অসৎ সরকারকে, প্রবল প্রতাপান্বিত এস্টাব্লিশমেন্টকে, ধুরন্ধর ইতর প্রতিযোগীকে পরাস্ত করতে না পেরে বনের অসীম বনশালী রাজাকে আমরা সম্মুখসমরে আবাহন করতাম। সেই যুদ্ধটা আসলে ছিল নিজের কাছে নিজেই বেঁচে থাকার, যুদ্ধের অন্যরকম। 'BATTLE'-এ হারলেও, "WAR"-এ যে হারিনি এই জানাটা প্রত্যেক মানুষেরই বেঁচে থাকার পক্ষে অত্যন্তই জরুরি।

আজ বাঘ মারার নেশা রাখি না, কিন্তু বাঘের মতো নখদন্তী আঁতেলদের সঙ্গে টক্কর দিই। যুদ্ধই জীবন। মানুষের মতো মানুষ চিরদিন যুদ্ধ করেই বেঁচে থেকেছে। প্রতিপক্ষের' চেহারা পালটেছে যুগে যুগে, কালে কালে; কিন্তু যুদ্ধ, এই ব্যক্তিজগতের প্রায়শই অদৃশ্য, অপ্রচারিত যুদ্ধ, আজও রয়ে গেছে;

চিরদিনই থাকবে, মানুষ যতদিন থাকে।

আমাকেও 'সুন্দরী'র দাদা নিয়ে যেত সঙ্গে, কখনও সখনও। তার কথাও আছে 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'তে।

সাতই বোশেখে মেলা বসত প্রতি বছর লালমাটি পাহাড়ে। তার নামই ছিল "সাত বোশেখীর মেলা"। মুরগা বলি হতো, পায়রা বলি। বোশেখের পাতা-ঝরা গাছেদের ন্যাংটো ডালে ডালে লাল-হলুদ-খয়েরি মুরগিরা ফুটে থাকত বনফুলের মতো, নির্জন নিস্তব্ধ চৈত্র সকালে। অসমের সোনালি-সাদা ডোরা-কাটা বাঘ রাতের টহল সেরে ফিরে যেত তার গভীর জঙ্গলের অস্তানাতে। মস্ত বড় শিমুল গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে অপার বিস্ময় আর সম্ভ্রমে তাকিয়ে থাকতাম সদ্য-যুবক অনভিজ্ঞ আমি, সেই বনের সুন্দর রাজার দিকে।

ওই গ্রীষ্মবনের এক চাঁদের রাতে ওই বনেরই মধ্যে একটি পাহাড়ী ঝোড়ার উপরে পত্র-শূন্য গাছে-বসা একটি "উড-ডাক"কে না-জেনে শিকার করেছিলাম। "নাকটা" হাঁস এখনও অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। ওই পাখি যে দুষ্প্রাপ্য এবং তাদের প্রজাতি যে শেষ হয়ে আসছে তখন তো তা জানতাম না। তখন ছেলেমানুষি বাহাদুরি-প্রবণতা আর দুর্গম বিপজ্জনক বনে বন্দুক হাতে ঘুরে-বেড়ানোর উন্মাদনা বুকের মধ্যে দামামা বাজাত। কপালের দু'পাশে রক্ত ঝুনুক-ঝুনুক করত।

পশু পাখি, ফুল গাছকে চিনি, ভালবাসি; সেসব দিনের অনেকই পরে। তবে যা কিছুই ঘটে, মঙ্গলের জন্যেই ঘটে। ওই বয়সে মন করে যদি দামালপনা না করতাম, তবে আপনাদের জন্যে তো এই লেখা এবং আমার নিজের মুক্তির জন্যেও তো অন্য অনেক লেখাই লিখতে পারতাম না।

একজন লেখকের জীবনের ভাল-মন্দ সব অভিজ্ঞতাই কাজে লাগে। লেগে যায়। সুপার কমপিউটারে সব জমা হয়ে থাকে, মান, অপমান, চুমু ও লাথিও।

তাতে তাঁর জীবন এবং লেখাও সমৃদ্ধ হয়।

পর্বতজুয়ারের বন ছিল রাঙামাটির চেয়ে অনেকই বেশি গভীর। তাতে বড় বাঘ অনেকই ছিল। রাঙামাটিতে বেশিই ছিল চিতাবাঘ। তখন চিতাবাঘ সব গ্রামেরই গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে গোরু-ছাগল ধরত প্রায়ই। আর তামারহাটের রতু জেঠু ছিলেন সেইসব বাঘের যম।

তাঁর এক-নলা বন্দুকের গুলি সেই অঞ্চলের গুলিখোর বাঘেদের বড়ই প্রিয় ছিল।

দেখতে দেখতে ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাস শেষ হয়ে এল। এবারে আই.কম পরীক্ষাতে বসতে হবে।

আমাদের সময়ে ওইরকমই বলত। ইন্টারমিডিয়েট কমার্স আই কম অথচ ব্যাচেলার অফ কমার্স বি কম কেন? কেন বাই কম নয়? তা অবশ্য কারওই জানা ছিল না।

কিন্তু ঠিক সময়েই একটি মারাত্মক অঘটন ঘটল। আমি ভেবেছিলাম মিলিটারি সায়ান্স-এ কম করে দুশোর মধ্যে ১৮৫/১৯০ পাব। রাইফেল শুটিং-এ তো একশো তে একশো পাব, আর থিওরি, ম্যাপরিডিং, ড্রিল ইত্যাদিতে যদি নম্বর কাটাও যায় তাবেও ১৫/২০ নম্বরের বেশি কাটা.যাবে না।

কিন্তু ফাদার স্কেফার্স হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছেলেরা মিলিটারি সায়ান্স নিয়ে পরীক্ষাই দিতে পারবে না। তখন তো অন্য কিছু করারও ছিল না। তখনও 'ঘেরাও', 'প্যাঁদাও' ইত্যাদি সংস্কৃতিতে ছাত্রসমাজ শামিল হয়নি।

ওইসব শব্দ আমরা শুনিওনি।

কিন্তু কী কারণে আমাদের কিং ক্যান্যুটের এই অচানক সিদ্ধান্ত?

কারণটা হল, 'আই দোন্ত ফাইন্দ এনি থিগনিফিকেন্ত অফ মিলিতারি সায়ান্স ইন আ কান্ত্রি লাইক ইন্দিয়া।'

অর্থাৎ "I don't find any singnificance of military science in a country like India.!

এই জ্ঞানটি হল আমাদের ফাদারের, ওহ ফাদার! আমরা দুটি বছরের কত মাস কতদিন প্যারেড, রাইফেল শুটিং এবং ক্যাম্প করে নষ্ট করার পর।

ওই দু'বছর পাড়ার ছেলেরা রকে বসে সুন্দরী মেয়ে দেখে গেল কন্টিন্যুয়াসলি (তখনও 'লাগাতার' শব্দের এমন আকছার প্রয়োগ হয়নি) ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে; আর আমাদের ঘাস-বিচালি-ঘাস, ঘাস-বিচালি-ঘাস করে আওয়াজ দিলো। আর শেষে আমাদের হাল হল এই! একেবারে হলকর্ষিত।

ফাদার স্কেফার্স-এর অ্যাটিচ্যুড দেখে দেশ যে সাতবছর হল স্বাধীন হয়ে গেছে তেমনও বোঝা গেল না। পরাধীন, মেরুদণ্ডহীন, একপাল ভেড়ার মতো সেই অন্যায় সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিলাম। দুশো নম্বরের ক্ষতিই শুধু হল না, যে সময়ে এন সি সি করে ব্যয় করেছি তাতে অন্য সব বিষয়ের নম্বরও অনেক বাড়ানো যেত সহজেই।

তবে, জীবনে কিছুই ফেলা যায় না। নম্বরে সাহায্য করেনি বটে মিলিটারি সায়ান্স কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং নিয়মানুবর্তিতাতে ঋদ্ধ করেছিল। এন সি সি না করলে কি আর 'স্যার! স্যার! ড্যাম্বা গান ফট' জানতে পারতাম, না আপনাদের শোনাতে পারতাম!

টেস্ট পরীক্ষার সাতদিন আগে বাবা কোডারমাতে শিকারে যাচ্ছিলেন। বললেন, যাবি নাকি? সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে পড়লাম। মা কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন।

বললেন, ও কি তোমার নিজের ছেলে?

বাবা বললেন, সে তো আমার চেয়ে তোমারই বেশি জানার কথা।

মা রাগ করে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

তারপরে আমাকে ডেকে বললেন, তুই ফেল করবি খোকন।

বললাম, না ফেল করব না। তবে কত পেয়ে পাস করব তা বলতে পারছি না।

মা বললেন, স্কুল ফাইনালে মুখ হাসালি আমার। তোকে নিয়ে কত গর্ব ছিল নিদেনপক্ষে একটা ফার্স্ট ডিভিশনও তো পেতে পারিস। আমাদের চাঁপার মায়ের দিদির ছেলেও পেয়েছে। গতবারে।

চাঁপার মা কে?

ওরে দুপুরে যে মেয়েটা আসে বড়ি দিতে আর চাল ঝাড়তে।

ছিঃ ছিঃ এতই অল্প তোমার অ্যাম্বিশান মা! তোমার ছেলেকে তুমি শুধু ফার্স্ট ডিভিশনার করতে চাও, আর কিছুই নয়?

বললাম।

মা বললেন, যদি ফার্স্ট ডিভিশন পাস, উইদাউট ফোর্থ সাবজেক্টই তবে তোকে আমার এই আঙুলের হিরের আংটিটা দেব। তোর ফাদারকে একবার পেলে হতো।

বললাম, আমার ফাদারকে তো তুমিই পেয়েছ।

যেমন বাবা, তেমন ছেলে!

তাই তো হবার কথা। তবে তোমার আংটিটা গেল।

গেল মানে?

মানে তোমার সাধের আংটিটা গেল। কিন্তু ওই আংটি পরে বাইরে গেলে তো আঙুল কেটে নিয়ে যাবে।

তাও আঙুলহারা হলে তুই তাই হ, কিন্তু একটা ফার্স্ট ডিভিশন পা অন্তত খোকন।

মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ঠিক আছে মা। পাব।

পাবি?

বললাম তো।

মা দু'হাতের পাতা দিয়ে দু'গালে আদর করে দিলেন।

আসলে কী চাই সেইটাই ঠিক করে উঠতে পারতাম না। যদি মনস্থির করতাম তাহলে যা চাইতাম, তা পেতামই। অর্জুনের মতো মনোসংযোগের ক্ষমতা ছিল। এবং আজও আছে।

টেস্ট পরীক্ষাও হয়ে গেল। টেস্ট-এর ফল দারুণ ভাল হল। অপ্রত্যাশিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সব সেমিস্টারের ফল যোগ করে তার গড় করে ছাত্রছাত্রীর উৎকর্যর মান নিরূপণ করা হতো না। এখনও হয় না। এখনও যে কেন হয় না, তা জানি না।

ইংরেজরা না-হয় দেশ শাসন করার সুবিধার্থে আমাদের "EDUCATION OF LETTERS, NOT OF CHARACTER"-এর শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন করেছিল, কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে আমরা তো সেই ব্যবস্থাটুকুকেও পুরোপুরি নষ্ট করে দিলাম। শিক্ষা আর প্রহসনে এখন তফাত কতটুকু?

পরীক্ষার সময়ে মুখস্থবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, অনেক বছরের প্রশ্ন থেকে প্রশ্ন বেছে নিয়ে, রীতিমতো সংখ্যাতত্ত্বগত ভবিষ্যদ্বাণী করে নিয়ে তাদের উত্তর কোনও অধ্যাপক বা অধুনা 'কোচিং মাস্টার'দের দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে যে যত কণ্ঠস্থ করতে পাবে, সেই তত 'ভাল' ছাত্র। 'টেকস্ট বই' এখন সিলেবাসেই শুধু শোভা পাওয়ার জন্যে। ছাত্র-ছাত্রী, এমনকি শিক্ষক অধ্যাপকদেরও নাড়া-চাড়ার জন্যেও আদৌ নয়। এখন শিক্ষা গ্রহণ এবং দান; সবই মুখ্যত নোট বইয়ের মাধ্যমেই হয়।

আজকে যদি কোনও মূর্খ ছাত্র, সত্যিই সব টেকস্ট বই, আদ্যোপান্ত পড়ত তা সে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা কমার্শিয়াল ল-এর বই-ই হোক না কেন, তার মনে যে নিত্য-নতুন, অজ্ঞাত, অনধীত জগতে প্রবেশ করার কী গা-শিউরানো আনন্দ জাগতে পারত, অদেখা কোনও গভীর বনে প্রবেশ করারই মতো, তা শুধু আমার মতো মূর্খরাই জানে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, ওই অপকর্ম করে আমি "ডিসগ্রেসফুল" রেজাল্ট করেও একের পর এক বেড়া ডিঙিয়ে গেছি। এখন কোনও ছাত্র তা করতে গেলেই হোঁচট খেয়ে পড়বে। তার পাস করাই হবে না। বাধাটা আসবে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরীক্ষকদেরই কাছ থেকে।

শেঠনা সাহেবের কমার্শিয়াল ল'-এর বই পড়তাম আমরা। না কি 'ল অফ কনট্রাক্ট' ঠিক মনে নেই। কিন্তু তাঁর বইয়ের কোনও একটি অংশ সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাসা এবং প্রশ্ন জাগাতে তাঁকে তাঁর বম্বের প্রকাশকের ঠিকানাতে একটি চিঠি লিখি। তিনি স্বহস্তে আমাকে আমার জ্ঞাতব্যও সংশয় বুঝিয়ে ও মিটিয়ে আমার সেই চিঠির উত্তর দেন। টাইপ করা চিঠিতে নয়।

তখন পাঠ্যপুস্তক যাঁরা লিখতেন তাঁদেরও মানসিকতা ছিল দেবতুল্য। প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন তাঁরা।

জানি যে, এখনকার ছেলে-মেয়েদের নিঃশ্বাস নেবারই সময় নেই। কিন্তু এই কয়েদখানার মতো শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে দায়ী তো তারা নয়। দায়ী তো আমরাই! তাদের মা-বাবারাই। আমাদের পরম উদাসীনতা, নিশ্চেষ্টতা এবং অবশ্যই নির্লজ্জ, অশিক্ষিত, বাক্যবাগীশ, ইজম-সর্বস্ব রাজনীতিকেরা; যাঁদের রাজনীতির সঙ্গে স্বদেশ ও দেশের-দশের হিতের কোনওই সাযুজ্য নেই।

এও বড়ই পরিতাপের কথা যে, না শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্তা, না অধ্যাপক-শিক্ষক, না অভিভাবকেরা—কেউই একটুও ভাবেন না মুহূর্তের জন্যেও ওই পরম বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে। শিক্ষার মতো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নৈরাজ্য চলেছে, বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে, তার কোনও নজির বোধহয় পৃথিবীতে নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেই অপনি "প্রতিক্রিয়াশীল" হয়ে যাবেন। Action হলে Reaction হওয়াই তো স্বাভাবিক। এবং Inaction এরও Reaction হওয়াটা স্বাভাবিক।

অথচ গভীরভাবে ভেবে দেখলে এটা প্রাঞ্জল হয় যে অর্থোপার্জনের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তেমন কোনও প্রয়োজনই নেই। ছিল না কোনও দিনও। আগেও ছিল না, আজও নেই। অধিকাংশ বাঙালিই যেহেতু যুগ-যুগান্তরের চাকর আর পরের পদলেহনকারী, তাই শুধুমাত্র ভাল চাকরি পাওয়ার জন্যেই আমাদের পুরুষানুক্রমের প্রাণান্তকর প্রয়াস। কে কত ভাল চাকর হতে পারি তারই প্রতিযোগিতা আমাদের ঐতিহ্য। ডিগ্রিধারী হয়ে, টাই পরে, আমাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশই যা রোজগার করে তার চেয়ে অনেকই বেশি রোজগার করেন ওড়িশার বালেশ্বর বা জাজপুর রোড থেকে আসা বা বিহারের গয়া বা আরা জেলা থেকে আসা, পায়রার-খোপের মতো খোপের একজন সামান্য পানের দোকানিও। যে উদ্দেশ্যে এই তথাকথিত ইংরেজি মিডিয়ামের প্রাণান্তকর শিক্ষা সেই উদ্দেশ্যও তো সফল হয় না! জি ডি বিড়লা কী, জামশেদজি টাটা কী, ধীরুভাই আম্বানিরা অথবা গোয়েঙ্কারাও কেউই আদা জল খেয়ে নোট বই মুখস্থ করে ছাপ পাবার প্রতিযোগিতাতে নামেননি। স্কুল-কলেজে না গিয়েও মানুষ শিক্ষিত হতে পারেন। বইপড়া শিক্ষার সঙ্গে ব্যবসায়িক বা জাগতিক সাফল্যর আদৌ কোনও সংযোগও নেই। সেইসব শিল্পপতির ওরিজিনালিটি ছিল। তাঁরা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাননি। 'ভেড়চাল'-এর মানুষ ছিলেন না। তাই তাঁরা হাজার হাজার তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতকে নিজেদের ব্যবসায়িক বা শৈল্পিক উদ্দেশ্যসাধনে (সে উদ্দেশ্য যেমনই হোক) নিয়োজিত করতে পেরেছেন শুধুমাত্র মোটা মাইনের বিনিময়ে। তাঁরা হয়েছেন অন্নদাতা আর তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষিতরা তাঁদের নেতৃত্ব মতো কাজ করেছেন। ভালো চাকর হয়েছেন।

"ব্রেইন-ড্রেইন" শুধু মেধাবী ছাত্ররা বিদেশে গেলেই হয় না, মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষার সব উদ্দেশ্য ভুল কোনও সীমিত, স্বার্থমগ্ন উদ্দেশ্যে নিজেদের সব মেধা ও পাণ্ডিত্যকে যখন বিক্রি করে দেন তখনও "ব্রেইন-ড্রেইন" অবশ্যই হয়।

যে শিক্ষিত, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই অনবহিত, তাঁর মস্তিষ্ক ছিল কি ছিল না তা নিয়ে মাথাব্যথাও কি আদৌ থাকা উচিত?

যখন এ-দেশীয় সংস্কৃত টোল-এ বা চতুষ্পাঠীতে বা মাদ্রাসাতে ছাত্ররা গুরু বা মৌলবীর কাছে "অধ্যয়নং তপঃ" ব্রত করে, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" পণ করে লেখাপড়া করত তখন তাদের শিক্ষার গন্তব্য শুধুমাত্র একটি ভালো চাকরি, ভালো ফ্ল্যাট বা ভালো গাড়িই ছিল না। শিক্ষা আর আত্মিক উন্নতি এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সমার্থক ছিল।

একসময়ে বাংলা সাহিত্যে এবং চলচ্চিত্রে সব নায়কই হতেন হয় "মাস্টারদা"রা নয় "ডাক্তারদা"রাই! নয়তো আত্মভোলা দেশপ্রেমী লেখক! তাই, শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, ডাক্তারি এবং সাহিত্য—এসব পেশা তো নিছক পেশাই নয়; এ সবই যে ব্রত!

এদেরও দোষ দিই না। দোষ হয়তো পরিবেশেরই।

পরিবেশেই লোভ উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় আবিল হয়ে গেছে সব। পরিবেশ দূষণ নিয়ে কথা কন সবাই কিন্তু মানুষের চরিত্রর দূষণ নিয়ে কেউ একটি কথাও বলেন না। বড় অবাক লাগে।

অনেকেই আজকাল বলেন, "আদর্শ-ফাদর্শ সব বোগাস। আজকাল ওসব নিয়ে আলোচনা করারই কোনও মানে হয় না। ফালতু। মেলা জ্ঞান দেনেওয়ালা এসেছে রে!"

না। আদর্শ মরেনি। এখনও মরেনি। তা শুধু চোখের আড়ালে চলে গেছে। ঢাকা পড়ে গেছে, সাময়িকভাবে। প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহর মধ্যেও প্রাণের বীজ তো সুপ্ত থাকেই! অদৃশ্য হয়ে, নিঃশব্দ হয়ে, কিশলয়ের স্বপ্নে, পোকা-মাকড়ের প্রাণের মতো, প্রজাপতির দ্যোতক মথেদেরই মতো। বছরের প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সুপ্তির আড়াল ছেড়ে পরম পুলকভরে হঠাৎ বেরিয়ে এসে তারা দৃশ্যমান হয়, শ্রুত হয়। আদর্শ মরতেই পারে না।

আদর্শ যেদিন মরে যাবে সেদিন মানুষের ভবিষ্যৎ বলে আর কিছুমাত্রই থাকবে না।

পুরনো দিনে এবং আমাদের ছেলেবেলাতেও অধিকাংশে অধ্যাপক কী ডাক্তারের বা লেখকের আর্থিক অবস্থা যে ভালো ছিলই এমন নয়। অধিকাংশরই ভালো ছিল না। কিন্তু তাঁদের সম্মান অবশ্যই ছিল। জজ-ব্যারিস্টার-আই সি এস ছাত্রও উলটোদিকের ফুটপাথে তাঁদের দেখলে দৌড়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন, বলতেন, কেমন আছেন মাস্টারমশাই? ভাল আছেন স্যার? ডাক্তারবাবু নমস্কার! মানুষের মন আর শরীরের জিম্মাদার ছিলেন তাঁরাই! ABSENT-MINDED মাস্টারমশাই, অধ্যাপক অথবা ডাক্তারবাবুরা অতি সাধারণ পোশাকে, ঘষা কাচের চশমার মধ্যে দিয়ে বড় ক্লান্ত কিন্তু আদর্শে আর প্রত্যয়ে উজ্জ্বল দৃপ্ত তাঁদের চোখ দু'খানি তুলে অস্ফুটে বলতেন, তুমি কে বাবা? ছাত্র যখন নিজের পরিচয় দিয়ে নিজের কৃতিত্বর কথা সবিনয়ে বলতেন তাঁদের শিক্ষকের, অধ্যাপকদের মুখ-চোখে তখন আত্মতৃপ্তি ও সুখ ঝলমল করে উঠত। কেউ বলতেন, চিনতে পারলেন না ডাক্তারবাবু? আপনি আমার স্ত্রীকে বিনি-পয়সাতে অপারেশন করে বাঁচিয়েছিলেন? এখন আমার অবস্থা ফিরেছে, ছেলে পায়ে দাঁড়িয়েছে, একদিন 'আমার বাড়িতে' দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন ডাক্তারবাবু?

তাই?

সেই সব দিনে লেখক আর দার্শনিকে আর পাঠকের প্রাণের মানুষে কোনো তফাত ছিল না।

সেইটুকুই ছিল তাঁদের সারাজীবনের দারিদ্র্যর সঙ্গে, সংগ্রামের সঙ্গে, অশুভর সঙ্গে, চারদিকের লোভের সহস্র লোলুপ হাতের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার, আদর্শকে বিশ্বাস করার একমাত্র পুরস্কার। তাঁদের অভাবই ছিল তাঁদের অলঙ্কার। তা নিয়ে কোনও অনুযোগ ছিল না তাঁদের। তাঁরা কখনওই অর্থোপার্জনের জন্যে শিক্ষক-অধ্যাপক লেখক হতেন না। হিরের টুকরো, আদর্শবান মানুষ তৈরি করার জন্যেই হতেন। যে-ছাত্ররা, দেশের মুখোজ্জ্বলকারী এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। তাঁদের তৈরি করার জন্যেই তাঁরা শিক্ষকতা করতেন। প্রয়াত সাহিত্যিক মনোজ বসুর ভাষাতে বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁরা সব ছিলেন "মানুষ গড়ার কারিগর"। আর মানুষের প্রাণ বাঁচানো দেবতা। বনফুল-এর "অগ্নীশ্বরের" মতো।

অর্থর মধ্যে যে কোনও দোষ আছে, তা আমার বক্তব্য নয় আদৌ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এমন কি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তো প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন। জীবনানন্দ দাশও। এঁদের মধ্যে সকলেই হয়তো তাঁদের নিজ নিজ জীবদ্দশাতে ধনী হননি কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরিরা এবং অবশ্যই ভাগ্যবান প্রকাশকেরা তার সুফল ভোগ করেছেন। এবং আজও করছেন। অনেকে আবার নিজ জীবদ্দশাতেই প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন তাঁদের গুণপনার স্বীকৃতির কারণে। সত্যজিৎ রায়

যে-বছরে মারা গেলেন, শুধু সে বছরেই, তাঁর প্রকাশকের মুখে শুনেছি; তাঁর বইয়ের রয়্যালটি পেয়েছেন বারো লাখ টাকা। ছবি ইত্যাদির রোজগারের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু কেউ যদি বলেন, যাঁদের নাম করলাম; তাঁদের মধ্যে একজনও অর্থাভিলাষী ছিলেন বা অর্থোপার্জনের জন্যেই বই লিখতেন বা গান বাজনা করতেন বা ছবি করতেন, তাহলে তার চেয়ে বড়, গর্দভ-প্রবরতা আর কিছুই হতে পারে না। কোনও লেখক বা গায়ক বা শিল্পী বা শিক্ষক বা অধ্যাপক বা ডাক্তার বা সার্জন যদি তাঁর গুণের সার্বিক স্বীকৃতির প্রতিফলন হিসেবে ধনীও হয়ে ওঠেন তবে শুধু সে কারণেই তাঁদের আদৌ দোষী করা যায় না। সেই ধন, তাঁদের ভক্তদের নৈবেদ্য, শ্রদ্ধার সঙ্গে দেওয়া; প্রত্যেক ভক্তের কষ্টার্জিত আয় থেকে।

আমরা যে ভিখিরি, মানসিকতাতে তো বটেই; তাই না-চাইতেই ধনী হবার অপরাধে কুউদ্দেশ্যপ্রণোদিত কূপমণ্ডুক স্বার্থপরায়ণ কিছু কিছু মানুষ তাঁদেরও বলবেন অপরাধী, বুর্জোয়া।

তারা তাঁদের যা খুশি তাই বলতে পারেন, কিন্তু দেশের লোকে কখনও তা বলবেন না।

বিশেষ যোগ্যতার বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্তির মধ্যে দোষ দেখি না কোনও।

দোষ দেখি, অর্থকেই জীবনের একমাত্র গন্তব্য করার মধ্যে।

পরীক্ষার ক'দিন পরেই বাবা বললেন, আমি শিলং-এ যাচ্ছি। যাবি নাকি?

"শেষের কবিতা"র অমিত রায়ের শিলং? যাব না মানে? মনে মনে বললাম। বাবাকে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালাম।

এক সকালে প্লেনে করে কলকাতা থেকে গুয়াহাটি পৌঁছে সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ি পথে শিলং-এ পৌঁছলাম। সেই প্রথমবার শিলং যাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা" যে কত প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকাকে মোহিত করে রেখেছিল তা সঠিক বলতে পারব না। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যদি শেষের কবিতা না পড়ে থাকে তবে তাদেরই মন্দভাগ্য বলতে হবে। 'শেষের কবিতা'র নয়।

পথের প্রতি বাঁকেই আশা করছিলাম যে, লাবণ্য অথবা অমিত রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। "মোর লাগি যদি কেহ প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে/মোর লাগি করিও না শোক, আমার রয়েছে কর্ম আমার রয়েছে বিশ্বলোক/হে বন্ধু বিদায়।"

শান্তিনিকেতনের কৃষ্ণ কৃপালনি "শেষের কবিতা"র অনুবাদ করেছিলেন ইংরেজিতে, "Adiew my friend"!

তীর্থপতি স্কুলের নীচের সিগনেট প্রেসের দোকানের শো কেস-এ দেখেছিলাম। সেই বইয়ের পাশেই আমার ডাক্তার মেজমামা সুবিমল বসু'র একটি বইও থাকত। "রূপচিন্তা"। সত্যজিৎ রায়ের আঁকা অনবদ্য প্রচ্ছদ। বইটির সাইজ ছিল ছোট্ট। যাতে মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগে সহজেই যেতে পারে। তখনকার দিনে অমন মাপের এবং অমন বিষয়ের বই বড় একটা দেখা যেত না। "রূপচিন্তা"তে বিভিন্ন অধ্যায় ছিল। মুখ, চোখ, ঠোঁট, দাঁত, নখ—ওইরকম। মেজমামা আমাকে এক কপি দিয়েছিলেন। আমার মামারা সকলেই রসিক ছিলেন প্রচণ্ড। নইলে গণ্ডারকে "রূপচিন্তা" প্রেজেন্ট কেনই বা করবেন!

পাঠক! শিলং গেলেই যে সকলের মনেই আমারই মতো কবিত্ব জাগবে এমন নয়। আমার এক সহপাঠী ছিল। দিলীপ দাস। ভারি ভাল ছেলে। পরে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছিল। ওর বাবার নিজের ফার্ম ছিল। সেখানেই যোগ দেয়। বাবার একমাত্র ছেলে। দিলীপ ইন্টারমিডিয়েটে অন্য কলেজে ছিল। কোন কলেজ তা মনে নেই। সেখান থেকে সেন্ট ডেভিয়ার্স-এ এসেছিল বি কম এ।

মনে আছে, সিন্থল সাবানের গন্ধ ওর গায়েই প্রথম পাই। সাবানের নাম জিজ্ঞেস করে জানি যে একটা নতুন সাবান বেরিয়েছে, তার নাম সিন্থল।

আমার নাসিকা চিরদিনই অত্যন্ত প্রখর, ছেলেবেলা থেকেই। তা নইলে আপনাদের পাতে বনজঙ্গলের, পৃথিবীর বহু দেশের মাটির, পাখির, প্রজাপতির বিচিত্র গন্ধ হয়তো পরিবেশনই করতে

পারতাম না এমন ভাবে। সেই দিলীপ শিলং-এ গিয়েই চিঠি লিখল আমাকে : "ভাই বুদ্ধ, শিলং-এ আসিয়া গতকল্য পৌঁছিয়াছি। এখানে আনারস অত্যন্তই সস্তা। প্রচুর আনারস খাইতেছি।"

একেক জায়গার মাহাত্ম্য একেকজন মানুষের কাছে একেক রকম।

দিলীপ বড় ভাল ছেলে ছিল। সরল, সদাহাস্যময়, আমার একজন প্রকৃত আডমায়ারার, স্বার্থহীন বন্ধু; হিতার্থী।

ওয়াটার্লু স্ট্রিটের অফিসের সামনে প্রায়ই দেখা হয়ে যেত ওর সঙ্গে। হয়, ইনকাম ট্যাক্স থেকে (আয়কর ভবন) ফিরছে অথবা সেখানে যাচ্ছে। দেখা হলেই দাঁড়িয়ে হাতে-হাত রেখে বলত, "এত ঘুরিস কেন তুই? আজ এখানে, কাল সেখানে? মেয়ে দুটো ছোট, কিছু একটা হলে তখন কী হবে? ঘোরাঘুরি কমিয়ে ফ্যাল, শরীরের দিকে একটু দ্যাখ।"

সেই দিলীপই জামশেদপুরে অডিট করতে গিয়ে দিন শেষে ত্রিতল হোটেলের ঘরে হেঁটে উঠে বাথরুমে ঢুকে হার্ট অ্যাটাকে বাথরুমের ভিতরেই পড়ে গেল। কেউ জানতেই পারল না বহুক্ষণ। বিনা চিকিৎসাতেই চলে গেল। তাও আজ বছর পনেরো হয়ে গেল কম করে।

কিসে যে কী হয়, আর কার যে কখন যেতে হবে তা তো আমাদের কারওরই জানা নেই!

দেজ মেডিক্যালের শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ দে, আমাদের মক্কেলই শুধু ছিলেন না, ওঁর দাদা শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দে'র মোহনবাগানের বন্ধু ছিলেন আমার বাবা। বাবা তো মোহনবাগানের গোলকিপার ছিলেন। সেই কারণে ভূপেনবাবু বাবাকে ডাকনামে ডাকতেন, "মনাদা" বলে। আমাকে অত্যন্তই স্নেহ করতেন। পেশাদার হিসেবে আমার উপরে ওঁর প্রচণ্ড আস্থাও ছিল। ওঁর কোনও কেস কোনওদিন হারিনি।

উনি বলতেন, আমরা যেমন ওষুধ বানিয়ে গায়ে লিখে দিই "ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট আর এক্সপায়ারি ডেট", ঠিক তেমন করেই আমাদেরও যিনি বানিয়েছেন তিনিও লিখে দিয়েছেন প্রত্যেকের কপালে এক্সপায়ারি ডেট। আমরা দেখতে পাই না, এই যা।

এখন মনে হয়, ভূপেনবাবুর কথাই বোধহয় ঠিক।

শিলং-এ গিয়ে উঠলাম "PEAK HOTEL"-এ।

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলেও এই PEAK HOTEL-এর শাখা ছিল। সেখানেও উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি অবধি বহুবার গেছি। মুখ্যত, বেড়াতেই। পরে বলা যাবে সেসব কথা।

PEAK HOTEL-এ মুখার্জি জেঠু ছিলেন। বাবার প্রাক্তন বড়সাহেব। উনি তখন অসম, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ের কমিশনার অফ ইনকামট্যাক্স। তখন গণ্ডা গণ্ডা কমিশনারের পদ ছিল না। এখন শিলং-এ একজন, মেঘালয়ের কমিশনার এবং আর একজন কমিশনার (অ্যাপিলস)। গুয়াহাটিতেও তাই, অসমের।

গুয়াহাটিতে এখন ইনকামট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের স্থায়ী বেঞ্চও হয়ে গেছে।

আগেই বলেছি কোনও বেঞ্চ শিলং-এ ক্যাম্প করত বছরে কমপক্ষে একবার। দিন পনেরো বা একমাসের জন্য। একাধিকবারও হতো কোনও কোনও বছরে। সব অ্যাপিলই শুনে আসতেন মেম্বারেরা।

তখন প্রতি বছরই শিলং-এ যেতে হতো আমাকে। তখন থাকতাম পাইনউড হোটেলে। সকালে শিলং ক্লাব-এ টেনিস খেলতাম। তখন ক্লাব বলতে লেকের পাশে একটি কাঠের দু'কামরার ক্লাব-হাউস ছিল শুধু। এবং দুপুরে ট্রাইব্যুনালে সওয়াল করতাম। বিকেলে, অসমের বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব উকিল আসতেন তাঁদের সঙ্গে এবং কলকাতার যে দু-তিনজন উকিল যেতেন নিয়মিত, শ্রী সি আর ব্যানার্জি, মনু দাশগুপ্ত প্রমুখ এবং কলকাতা থেকেই যাওয়া ট্রাইব্যুনালের ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেনটেটিভদের সঙ্গে হালকা আড্ডা দিতাম, মামলার নথি দেখার ফাঁকে ফাঁকে।

কলকাতা থেকেও আমি ছাড়া অন্য কোনও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টই যেতেন না।

কল্যাণকুমার সেনও একবার ডি আর হয়ে গিয়েছিলেন সেখানে। পরে উনি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডায়রেকট ট্যাক্সেস-এর মেম্বার এবং ইনকামট্যাক্স অ্যান্ড ওয়েলথ ট্যাক্স সেটলমেন্ট কমিশন-এর মেম্বার হয়ে রিটায়ার করেন।

ডি সি রাজগোপালন, গোঁফওয়ালা, অকৃতদার দক্ষিণ ভারতে যাঁদের রাবার-প্ল্যানটেশন ছিল এবং রেসের ঘোড়া ব্যাঙ্গালোরে; হুইস্কির বোতলের সঙ্গে যাঁর বিয়ে হয়েছিল, সেই সাদা-মনের মজলিসি মানুষটিও একবার গেছিলেন।

অসমের নামকরা উকিল রমেশ আগরওয়ালাও প্রতিবছরই আসত গাড়ি করে। সম্ভবত জোরহাট থেকে। গাড়ি-ভর্তি ইনকামট্যাক্স রিপোর্টের বাঁধানো বই নিয়ে। তার অনেকই অ্যাপিল থাকত। প্রতিবারই পাইনউড হোটেলের এক নম্বর ঘরে উঠত রমেশ। খুব মেধাবী উকিল ছিল। প্রায় আমারই সমবয়সী ছিল বলে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল খুব। রোটারিও করত ও। আইনের উপর ভালো দখল ছিল।

পাইনউড হোটেল তখন এক মেমসাহেব চালাতেন। সম্ভবত তিনিই মালিক ছিলেন। কী "স্মোকড-হিলসা" বানাত সেখানে! অমন স্মোকড হিলসা ক্যালকাটা ক্লাবেও হয় না। আর খাওয়ার কী পরিমাণ! ব্রেকফাস্ট খেলে, ছ'কোর্স লাঞ্চ খাবার জায়গা থাকত না। আর লাঞ্চ খেলে ছ'কোর্স ডিনারের।

মেম্বারেরা ছুটির দিনে বিকেলে রেস-এ যেতেন।

আমাকে বাবা তাস পর্যন্ত চিনতে দেননি, আজও চিনি না। আর রেস-এর মাঠে যাব কি? কিন্তু টি পি মুখার্জি সাহেব, জুডিসিয়াল মেম্বার, পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন, আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন বলে ধমকে-ধামকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

বলতেন "বাবা আবার কী বকবেন? জ্যাঠার সঙ্গে যাচ্ছ তো! বাবা কি জ্যাঠার চেয়ে বড়?"

গিয়ে, পশলা পশলা বৃষ্টির মধ্যে বেঁটে ঘোড়া এবং বেঁটে জকিদের হুল্লোড়ে রেস দেখতাম।

সেই সব দিনের কথা মনে হলে মন বড় মেদুর হয়ে আসে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

জানা ছিল যে, আমরা চান করে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়ব নওগাঁর উদ্দেশে। সেখানে সার্কিট হাউস রাতটা কাটিয়ে পরদিন যাব কাজিরাঙ্গা। উনিশশো বাহান্নতে কাজিরাঙ্গা সবে তৈরি হচ্ছে গণ্ডারের অভয়ারণ্য হিসেবে। অসমের ফরেস্ট মিনিস্টার আর এন দাস এবং চিফ কনসার্ভেটর অফ ফরেস্টস মিস্টার স্ট্রেসি আমাদের সঙ্গে একই প্লেনে কলকাতা থেকে গুয়াহাটি গেছিলেন, মনে আছে। মিস্টার স্ট্রেসিই কাজিরাঙ্গাতে আমাকে প্রথম "ফ্লোরিকান" পাখি চিনিয়েছিলেন এবং ছোট ছোট "রাইনো-বার্ড", যারা গণ্ডারের গায়ে বসে গায়ের পোকা খায়। বুনো মোষেদের গায়েও বসতে দেখা যায় ওদের। বুনো হাতির গায়েও কখনও কখনও, যখন ওই সব জানোয়ার "WALLOWING" করে। কাদায় গা ডুবিয়ে বসে থাকে। হাতিরা অবশ্য "WALLOWING" ঠিক করে না।

শীতিকণ্ঠ, মুখার্জি জ্যেঠুর ছেলে এবং আমার সতীর্থ পীক হোটেলে মুখার্জি জ্যেঠুর বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বলল, সোপকেসটা দেখছ তো? হ্যাঁ।

সাবানটা কেস-এর উপরে পাথালি করে রাখা আছে, দেখেছ?

হ্যাঁ।

ভাল করে ধুয়ে নিয়ে চান করবে। চান হয়ে গেল, যেমন করে রাখা আছে ঠিক তেমন করে রাখবে আবার। নইলে বাবা কুরুক্ষেত্র বাধাবে।

আচ্ছা!

আজ অবধি আমি সোপকেসে সাবান ওই রকমভাবেই রাখি।

শীতিকণ্ঠর সঙ্গে ওর সহোদরা নমিতা, নমু, (ইংল্যান্ডে থাকে বহু বছর হল) এবং ওর দিদিও ছিলেন। এতদিন বাদে দিদির নামটা এক্ষুনি মনে করতে পারছি না। পরে হঠাৎ মনে পড়ে যাবে।

সপ্রতিভ দিদি, ভালোবেসে এক দক্ষিণ ভারতীয় সুদর্শন সপ্রতিভ ক্রিকেটারকে বিয়ে করাতে মুখার্জি জেঠু খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। তবে তখন "প্রেম-বিবাহ"র তো চল ছিল না মোটেই। জেঠুর কোনও দোষ নেই।

জেঠু বলেছিলেন কন্যার মুখদর্শন করবেন না। অনেকদিন করেনওনি। কিন্তু বস্তা বস্তা চকোলেট কিনে পরিচিত অপরিচিত পথের মানুষদের বিলোতেন।

পরে জানতে পাই জামাইবাবু ওই দক্ষিণ ভারতীয় চকোলেট কোম্পানিতে কাজ করতেন।

অপত্যস্নেহ যে কতরকমের রূপই নেয়! জেদি মানুষদেরও উত্তরণের, প্রায়শ্চিত্তর অনেকই পথ খোলা আছে। মুখার্জি জেঠুর উদাহরণ দেখে তাঁরা শিখতে পারেন। স্নেহ সততই নিম্নগামী।

অত্যন্ত মেধাবী, দৃঢ়চেতা, সরল, মুখার্জি জেঠুকে আড়ালে অনেকেই ডাকতেন 'পাগলা মুখার্জি' বলে। জিনিয়াস যাঁরা, তাঁরা একটু পাগলাটেই হনই।

মুখার্জি জেঠুরা প্রবাসী বাঙালি ছিলেন "Best of the Bengalees come from outside Bengal" এই প্রবচনকে সত্যি প্রমাণ করার মতোই বাঙালি ছিলেন উনি। ওঁর প্রত্যেকটা কথার তিনটে মানে হতো। দ্ব্যর্থক শব্দ অবধি জানি কিন্তু....

রওনা হওয়া গেল খাওয়া-দাওয়ার পর। তবে সেদিন নয়, পরদিন।

সেদিন যাওয়া হল চেরাপুঞ্জি। তখনও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হতো সেখানে। ভরা বর্ষায়, সরু জিলিপির প্যাঁচের মতো সাংঘাতিক বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে বাদল আঁধারে সেবার চেরাপুঞ্জি পৌঁছনোর স্মৃতি আজও মনে স্পষ্ট আছে। জীবনে অত ভয় আর কখনও পাইনি। কেনেথ এডওয়ার্ড জনসন-এর সঙ্গে বাঘ শিকারে গিয়ে একবার অসমের যমদুয়ারে আরেকবার ওড়িশার কালাহাণ্ডিতে বাঘের মুখের মধ্যে মাথা ঢোকানোর সময়েও অত ভয় পাইনি। সত্যি!

সেই দুটি দুর্ঘটনার কথাও সবিস্তারে আছে "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারেতে"।

চেরাপুঞ্জিতে পৌঁছে মওসমাই প্রপাত দেখতে গেলাম। বহু দূরে, কিন্তু অপূর্ব। তা ছাড়া তখন যা দেখি তাই ভালো লাগে, যে মেয়ে দেখি তারই প্রেমে পড়ি। নীচে বর্ষাস্নাত Bottle-green সিলেট উপত্যকা—বিস্তৃত—স্বপ্নময়।

কাভেরীর প্রপাত দেখার আগে মওসমাইই তখন পর্যন্ত আমার দেখা সবচেয়ে বড় প্রপাত। তারপর বহুবার ইউনাইটেড স্টেটস আর কানাডার নায়গ্রা প্রপাত দেখেছি। নায়াগ্রা দেখার পরে কোনও প্রপাতকেই আর প্রপাত বলে মনে হয় না।

তবে অ্যামেরিকান জাতটা অনেকটা বিহারের বনবিভাগের আমলাদেরই মতো। প্রকৃতিকে প্রাকৃতিকভাবে আদৌ দেখতে শেখেনি, রাখতেও শেখেনি। সব জায়গাতেই পয়সা কামাবার ফিকিরে এমন সব বিপুল ক্রিয়াকাণ্ডর বন্দোবস্ত করেছে অমন সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যর জায়গাতে যে, আমার গরিব দেশের পালামৌর মারুমারের কাছের মীরচাইয়া প্রপাতের নীচে নির্জনে বসে থাকতে নায়াগ্রাতে যাবার চেয়ে অনেকেই বেশি ভাল লাগে। খোদার উপরে যারা খোদকারি করতে যায়, তারা না শ্রদ্ধা করে খোদাকে, না জানে "ক্রিয়াকান্ডর" রকম।

হেনরি ডেভিড থোরোর বিশ্ববিখ্যাত "WALDEN" Pool দেখতে গিয়ে STATES -এর ম্যাসাচুসেটস-এ আমার রাগে দুঃখে বমি পেয়ে গেছিল। অ্যামেরিকান জাতটার বোধহয় কোনওই সৌন্দর্যজ্ঞান বা প্রকৃতি-তন্ময়তা নেই। এমনই মনে হয়েছে বারবার।

টাকা থাকলেও, যতই টাকা থাকুক; প্রকৃতির প্রাকৃতিকতাতে হস্তক্ষেপ করা যায় না। করা উচিত তো নয়ই।

"প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ" হতে হয়।

এই বাক্যটি ধার করা।

এক ভক্ত পাঠক, বহরমপুরের শ্রীঅশোক লাহিড়ী 'অবরোহী' পড়ে চিঠিতে যা লিখেছিলেন তা কিছুটা উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। প্রকৃতি এবং প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধীয় এমন প্রশংসা আমাকে এই জীবনে কেউই করেনি। অশোক পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়র। বহরমপুর ডিভিশনের। যখন চিঠি লিখেছিলেন তখন ছিলেন বীরভূমে।

লিখেছিলেন : "আবরোহী আর আমি, হিরণ্ময় মুহূর্ত, FLAUBERT-এর ভাষায় "EJACULATION OF SOUL".

তারপর লিখেছিলেন, "আমার মনে হয় না আপনি Concioulsy এমন একটা ART FORMকে গ্রহণ করেছেন। আসলে, আপনার ART FORM আপনার প্রকৃতির আদলে তৈরি, আপনার Intellect এবং romanticism ওই দুটো অনায়াসে আপনার মধ্যে Synthesised হয়েছে, তাই তা অত সহজ তীব্রতায় প্রকাশিত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার অগ্রজ সাহিত্যিক। তাঁর সঙ্গে আপনার অনেক মিল। অনেক মিলের মধ্যে একটা বড় অমিল আছে। সেটা হল, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে মুখ্য চরিত্র প্রকৃতি, আর আপনার সৃষ্ট চরিত্রেরা প্রকৃতিরই মতো, তারা শহুরে হোক কী জঙ্গল পাহাড়েরই মানুষ হোক।

আপনার এই প্রকৃতিস্থতা দীর্ঘজীবী হোক।"

অশোক লাহিড়ী বাংলা সাহিত্যের সেবক হলে আমার লেখা আপনারা কেউই পড়তেন না যে সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

মুখার্জি জেঠুকে যে অনেকেই কেন পাগলা মুখার্জি বলতেন তার প্রমাণ পেলাম পরদিন সকালেই।

জেঠু আমার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বাসে করে শিলং থেকে নওগাঁ রওনা হয়ে গেলেন। আর আমরা রয়ে গেলাম গাড়িতে যাওয়ার জন্যে।

বাবা মুখার্জি জেঠুর অধস্তন কর্মচারী ছিলেন, যখন বাবা চাকরিতে ছিলেন, যদিও তিনি বাবাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি নিজে সহজেই গাড়িতে করে যেতে পারতেন এবং সেটাই স্বাভাবিক ছিল।

শিলং-এর ইন্সপেক্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার শ্রীগুরুদাস ঘোষ সাহেবের অস্টিন টুয়েলভ গাড়ি ছিল। তিনি নিজেই চালিয়ে যাবেন। কিন্তু জেঠু, ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাড়িতে গেলে বাবা এবং আমার বাসে করেই নওগাঁ যেতে হতো। অথবা অন্য গাড়িতে। গাড়ি হয়তো বাবা ভাড়া করে নিতেন অথবা কোনও মক্কেলের গাড়ি নিতেন, সেটা কোনও সমস্যা ছিল না।

কিন্তু অসম, মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয়, এবং নাগাল্যান্ডের যিনি কমিশনার, তাও ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের; তাঁর অঙ্গুলি হেলনে গাড়ির সারি লেগে যেতে পারত পীক হোটেলের সামনে।

কিন্তু তখনকার দিনকালই অন্যরকম ছিল। মানুষের চরিত্রর গড়ন অন্যরকম ছিল। যা সহজেই পাওয়া যায়, তা না নেওয়ার মধ্যে যে ত্যাগ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার শ্লাঘা ছিল তার আনন্দর কথা ওঁরা জানতেন।

গুরুদাসকাকুও বাবার সহকর্মী ছিলেন। "তুমি" বলতেন দু'জনে দু'জনকে।

লাল টুকটুকে পাকা আমের মতো চেহারাটি। পান-জর্দা খেতেন। খুব সাবধানী মানুষ। আস্তে কথা বলতেন, আস্তে গাড়ি চালাতেন। পরে তিনি মুখার্জি জেঠুরই মতো ওই অঞ্চলের কমিশনার হন। তখন আমি ট্রাইব্যুনাল করতে যেতাম শিলপ-এ। পরে গুরুদাসকাকু অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের মেম্বার হন। কলকাতা থেকেই রিটায়ার করেন। যোধপুর পার্কে বাড়িও করেন।

উনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং আমার সওয়ালের খুব তারিফ করতেন। কেন জানি না। বলতেন, তোমার মতো প্রিপেয়ার্ড হয়ে সকলে এলে এবং এমন সওয়াল করলে আমাদের কাজটা খুবই সহজ হয়ে যেতে পারত।

সেইসব গুণীর আর গুণগ্রাহিতার সততা আর সারল্যর অনাবিল দিন পৃথিবী তেকে ক্রমশই উধাও হয়ে যাচ্ছে।

পুরনো দিনের কথা মনে হল মন বড় খারাপ হয়ে যায়।

গুরুদাসকাকুর গাড়িতে করে আমরা রওনা হলাম।

আমি সামনে, গুরুদাসকাকু ড্রাইভিং সিট-এ। পেছনে শীতিকণ্ঠ, নমু এবং দিদি। সারা পথ আমরা ওয়ার্ড-মেকিং খেলতে খেলতে এলাম। গুরুদাসকাকুও আমাদের সঙ্গে খেললেন। খুব ভাল ইংরেজি জ্ঞান ছিল তাঁর।

শিলং পাহাড়ের ঠাণ্ডা থেকে নেমে নওগাঁতে পৌঁছে গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমরা।

নেমেছিলাম গরম পোশাক পরেই। আমাদের ঠাণ্ডা পোশাক বাবা ও জেঠুর সঙ্গে আসছে বাসে। মালপত্র কেন বাসে তোলা হয়েছিল জানি না।

সার্কিট হাউসের বারান্দাতে বসে কখন আমাদের বাবারা আসবেন তার প্রতীক্ষাতে রইলাম। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে আমি বিরক্তি প্রকাশ করাতে গুরুদাসকাকু বললেন, তোমার বাবার গায়েও তো গরম স্যুট। তাই পরে তো উনি বাসে আসছেন। কখন এসে পৌঁছবেন তারও ঠিক নেই। তাঁর কষ্টর কথাটা একবার ভাবো।

খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। কথাটা শুনে।

ওঁদের আসতে সত্যিই সন্ধে হল। তখন এমন সব আধুনিক বাস তো হয়নি। রাস্তাও সরু ছিল। নংপোতে অনেকক্ষণ দাঁড়াতেও হতো "ONE WAY" রাস্তা বলে।

যেদিন আমরা শিলং পৌঁছেছিলাম, সেদিন বিকেলে গুরুদাসকাকুর ধানক্ষেতির চমৎকার বাগানওয়ালা বাড়িতে বিকেলে সকলের চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। কাকিমার সঙ্গে আলাপ হল। খুবই সুন্দরী মহিলা গুরুদাসকাকুর চেয়ে বয়সে বেশ ছোট। দু'জনে একেবারে MADE FOR EACH OTHER.

সেই ধানক্ষেতির বাড়িটিই বহুদিন পর্যন্ত অসম, মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের আয়কর কমিশনারের অফিসিয়াল রেসিডেন্স ছিল।

শীতিকণ্ঠের ডাক নাম ছিল গোপাল। ও আর্টস-এর ছাত্র ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স-এ। আমাদেরই ব্যাচের। বি. এ. করে গোপাল ইংল্যান্ডে গিয়ে লানডান স্কুল অফ ইকনমিকস্ থেকে বি এস-সি (ইকন) করে এসে বিড়লাদের হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়ামে ঢোকে। সেই সময়ে বিখ্যাত কনট্রাকটর শিব মুখার্জির সঙ্গে মুখার্জি জেঠুর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর দুই পুত্রের সঙ্গেও পরে একদিন মুখার্জি জেঠুর এবং পরে গোপালের, চৌরঙ্গি রোডের ফ্ল্যাটে আলাপ হয়।

গোপালের বিয়ে ঠিক করেন জেঠু অন্য এক প্রবাসী বাঙালির কন্যার সঙ্গে। সুন্দরী কন্যার নাম ব্রততী। হাজারিবাগের জজ সাহেবের মেয়ে সে।

"জজ সাহেবের নাতনী" বলে একটি মুভি দেখেছিলাম স্কুলে পড়ার সময়ে। সেকালের জজ সাহেব বা পুলিশ সাহেবের প্রতাপ, প্রতিপত্তি এবং সম্মানও ছিল অভাবনীয়।

আমার আরেক বন্ধু, যার ডাক নামও গোপাল, মিহির সেন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আমাকে হাজারিবাগে প্রথমবার নিয়ে যায় উনিশশো সাতান্নতে। গোপালদের সেই ছবির মতো বাড়ি 'পূর্বাচল'-এ থাকতাম। বড়হি রোডের ওপরে। রিফর্মেটরির রাস্তার মোড়ে সে সময়ে ওই পথটিকে লোকে বলত "গয়া রোড"।

আমাদের শিকারের বন্ধু সুব্রত চ্যাটার্জির বাবা তখন সবে হাজারিবাগের পুলিশ সাহেবের পদ থেকে অবসর নিয়ে হাজারিবাগেই কানহারি হিল রোড-এ বাড়ি কিনে সেটল করেছেন। বাড়ির নাম "THE UCALYPTA"।

আমি যদিও বরযাত্রী গেছিলাম, কিন্তু উঠেছিলাম সুব্রতদের বাড়িতেই। সুব্রত তখন গোমিয়াতে ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ-এ চাকরি করে। ওর ছোট ভাই মুকুল তখন হাজারিবাগেই ছিল। মাসিমা, মেসোমশাই, মুকুল এবং ওদের অ্যালসেশিয়ান কুকুর বুলেটকে নিয়ে আমার ক'টি দিন বড় আনন্দে কেটেছিল সেবারে।

মাসিমার হাতের রান্না, যত্ন, আদর; মেসোমশায়ের সুরসিক ব্যক্তিত্ব, পুলিশ জীবনের গল্প, সেসব কথা মনে এলে, এত কথাই মনে পড়ে যায়, যে কী বলব।

একেই বোধহয় "বুড়িয়ে যাওয়া" বলে। আজকে মেসোমশাই নেই, মুকুল মুঙ্গেরে, মাসিমা কলকাতাতে, সুব্রত ও তার স্ত্রী অলকাও (মুজাফফরপুরের মেয়ে) কলকাতাতে। সুব্রতর ছেলে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। নাম ঋজু। ও যখন হয় সেই সময়েই 'ঋজুদার' গল্প লেখা সবে শুরু করি। সেই সুবাদে "ঋজু"।

দীপকও তার একমাত্র ছেলের নাম রেখেছে 'কোজাগর'-এর নায়ক 'সায়ন'-এর নামে।

আমি আমার বন্ধুদের এই ভালবাসার জন্যে, আমার প্রতি নয়; আমার লেখার নায়কদের প্রতি ভালবাসার জন্যে, এই বন্ধুকৃত্যের জন্যে, তাদের কাছে অশেষই কৃতজ্ঞ।

পরদিন সকালে নওগাঁ থেকে দুটি গাড়িতে করে কাজিরাঙ্গাতে গেলাম আমরা।

নওগাঁর ইনকামট্যাক্স অফিসারও ছিলেন একজন বাঙালি। নাম কিছুতেই মনে আসছে না। তাঁর কাছে পরে কেসও করেছি, কলকাতাতে। অথচ নামই মনে করতে পারছি না। অত্যন্তই লজ্জার কথা। তবে দোষ বিশেষ নেই। মাত্র বেয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা তো।

তাঁরও সম্ভবত একটি অস্টিন গাড়ি ছিল। অস্টিন্ টেন। অথবা মরিস। মনে করতে পারছি না। ওই দুই গাড়ি করে আমরা গেছিলাম কাজিরাঙ্গাতে। একটি স্কুলে রাত কাটিয়েছিলাম কার্বি-অ্যাঙ্গলঙ্গ-এর কোনও জায়গাতে। নাম মনে নেই। কাজিরাঙ্গারে ট্যুরিস্ট বাংলো-টাংলো তখন কিছুই ছিল না। একটি মাত্র খড়ের বাংলো ছিল কাজিরাঙ্গাতে বন বিভাগের। সম্ভবত RANGE OFFICE। ঘাস বনের মধ্য ছোট্ট হাতাওয়ালা খড়ের বাংলো। তাতে কাঠের গেট। গেটের দু'দিকে দুটি কাঠের গণ্ডার ছিল, মনে আছে। সেই অফিসে "বুড়া গোঢ়ার" খড়্গ রাখা ছিল। অসমিয়া ভাষায় গণ্ডারকে বলে 'গোঢ়া'। কাজিরাঙ্গাতে আমরা গিয়ে পৌঁছনোর কিছুদিন আগেও একটি বিখ্যাত এবং অতিকায় প্রাচীন গণ্ডার ছিল। সে মরে যাওয়ার পরে তার খড়্গ যত্ন করে বন বিভাগের আমলারা ওই অফিসে রেখে দিয়েছিলেন।

পাঠক! আপনারা জানেন কি না জানি না, গণ্ডারের খড়্গ কিন্তু হাড়ের বা মাংসের নয়। লোমের সমষ্টি। এই খড়গর চূর্ণ খেলে নাকি যৌনক্ষমতা বাড়ে, APHRODISIAC। তাই পৃথিবীর তাবৎ অর্থবান অপগণ্ডদের সুখের জন্যে ভারতের এক-খড়্গ এবং আফ্রিকার দুই-খড়্গ গণ্ডারদের প্রাণ দিতে হচ্ছে চোরা-শিকারীদের হাতে আবহমানকাল থেকে।

যখনকার কথা বলছি তখন সকলেরই রাইফেল ছিল না। চোরা শিকারীরা খুঁজে খুঁজে বের করত, গণ্ডাররা কোথায় মলত্যাগ করে। ওরা একই জায়গাতে বেশ কিছুদিন মলত্যাগ করে করে ছোটখাটো ঢিপি মতো বানিয়ে ফেলে। সেই জায়গার কাছাকাছি গাছের উপরে গাদা-বন্দুক নিয়ে চোরা-শিকারীরা অপেক্ষা করত। গণ্ডার যেই মলত্যাগের জন্যে লেজ তুলত অমনি নরম গুহ্যদ্বারে তারা গুলি করত।

বন্দুকের গুলিতে গণ্ডার মরত না। কিন্তু রক্তপাত শুরু হতো। গুহ্যদ্বারের আঘাতের রক্তপাত বন্ধ করা ভারি কঠিন। শল্যবিদেরাও পারেন না। নকশাল আন্দোলনের সময় আমার এক তরুণ আত্মীয়কে নকশাল ছেলেরা, তার পরিচিত বন্ধুরা; বেহালার কাছের সরশুনাতে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে গুহ্যদ্বারে উপর্যুপুরি বহুবার ছুরি চালিয়েছিল। আমাদের অফিসশুদ্ধ ছেলেরা রক্ত দিয়েও তাকে বাঁচাতে পারেনি।

আহত গণ্ডারের রক্ত অনুসরণ করত শিকারীরা। রক্তক্ষরণের কারণে অল্প কিছুদিনের মধ্যে রক্তাল্পতায় দুর্বল হয়ে গণ্ডার চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলত। শুয়ে পড়ত। নড়াচড়ার শক্তি থাকত না আর। তখন তার কাছে গিয়ে তার কানের ফুটোতে গুলি করে দিত। অথবা অসহায় গণ্ডারের খড়গটি তার জীবদ্দশাতেই কেটে নিত।

যাঁরা ওইসব ওষুধ ব্যবহার করেন তাঁরা যদি জানতেন তাঁদের আনন্দ বর্ধনের জন্যে ওই পাহাড়ের মতো, নিরামিশাষী, নির্বিরোধী জানোয়ারদের কী কষ্টই না করতে হয়েছিল, জীবদ্দশাতেই তাদের নাক কাটা গেছিল, থুড়ি, নাকের খড়গ, তাহলে হয়তো আনন্দে একটু খামতি ঘটত।

মানুষ সত্যিই বড় আশ্চর্য জানোয়ার।

কাজিরাঙ্গাতে অগণ্য গণ্ডার, বুনো মোষ, সোয়াম্প ডিয়ার, হগ-ডিয়ার, ময়ূর, ফ্লোরিকান, নানা জাতের সারস ইত্যাদি দেখেছিলাম।

যাঁরা ওখানে যাননি তাঁদের জন্যে বলি, যে ব্রহ্মপুত্রের তীরের বিস্তীর্ণ তৃণভূমিই কাজিরাঙ্গা। একদিকে মিকির হিলস, কার্বি অ্যাংলং-এর অঞ্চল আর অন্যদিকে এ-কূল ও-কূল দেখা-না-যাওয়া ব্রহ্মপুত্র। বর্ষাকালে প্রতিবছরই ব্রহ্মপুত্র কাজিরাঙ্গাকে ভাসিয়ে দেয়। বন্যা হয়। ন্যাশনাল হাইওয়েটুকু কোনওক্রমে জেগে থাকে শুধু চরের মতো। ওই পথই সোজা চলে গেছে চা বাগানের পর চা বাগান পেরিয়ে ডিমাপুরে। নাগাল্যান্ডে। সেখান থেকে ডিফু নদীকে ডানদিকে রেখে পাহাড়ে চড়েছে।

পৌঁছেছে কোহিমাতে। নাগাল্যান্ডের রাজধানী। সেখান থেকে মাও, তাদূবী, কাঙ্গপোকপি হয়ে মণিপুরে উপত্যকাতে, ইম্ফলে।.বড় চমৎকার নৈসর্গিক দৃশ্য ওই রাস্তার।

আমরা 'বাবলি' এবং 'কাঙ্গোপকপি' উপন্যাস দুটি ওই অঞ্চলের পটভূমিকাতেই লেখা। কঙ্গোপকপি একটি নাগা শব্দ। মানে হচ্ছে মশার জন্মস্থান।.

কোনও কোনও বছর হাইওয়েও ডুবে যায় বন্যাতে, তখন কাজিরাঙ্গার জীবজন্তুদের বন্যাত্রাণে লেগে থাকেন অসমের বন-বিভাগের কর্মীরা।

এখন যে অঞ্চলে বন-বাংলো, ট্যুরিস্ট-কটেজ ও নানা ট্যুরিস্ট লজ এবং বনবিভাগের অফিস হয়েছে সেই অঞ্চলটি অনেক উঁচুতে। সেখানে জল পৌঁছয় না বর্ষাকালেও।

কেন জানি না, কাজিরাঙ্গা আমার ভাল লাগেনি কোনওদিনও। এর চেয়ে মানাস অনেকই সুন্দর এবং বৈচিত্রময়। মানাস নদীটিরই কোনও তুলনা নেই।

অবশ্য মানাসকে পৃথিবীতে বিখ্যাত করার পেছনে অসমের কর্মিৎকর্মা বিদ্যোৎসাহী কনসার্ভেটর সঞ্জয় দেবরায়েরও এক বিশেষ ভূমিকা আছে। দেবরায় সাহেব সম্ভবত গুয়াহাটি থেকে ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেস্টস হয়ে তারপর দিল্লীতেও বড়সাহেব হয়েছিলেন।

মুখার্জি জেঠুর কথা বলতে বসে যে কত কথাই মনে পড়ে। অমন সুরসিক, তীক্ষ্ণধী, জীবনের প্রত্যেক দিক সম্বন্ধে পরম উৎসাহী মানুষ খুব কমই দেখেছি।

মুখার্জি জেঠু রিটায়ার করেছিলেন ডিরেক্টর অফ ইনভেস্টিগেশন পদ থেকে। ওই পদ সেই সময়েই সৃষ্টি হয়। হরিদাস মুন্দ্রার কেসও ইনভেস্টিগেট করেছিলেন তিনি। ওঁর পরে ওই পদে আসেন এস কে লাহিড়ী। তাঁর মেয়ের ঘরের নাতিও এখন ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার, শ্রীপ্রশান্ত রায়। তাঁর স্ত্রী স্বপ্না রায়ও কমিশনার।

রিটায়ার করে মুখার্জি জেঠু মুসৌরিতে একটি বাগানওয়ালা বাংলো ভাড়া করে থাকতেন। জেঠিমা তো বহুদিন আগেই গত হয়েছিলেন। স্নেহশীলা, পরম করুণাময়ী মহিলা ছিলেন তিনি। সেই বাংলোতে রাতে চিতাবাঘ আসত। মুখার্জি জেঠু গোটা গোটা অক্ষরে চিঠি লিখতেন, ইংরেজিতে; মাঝারি নিব-এর কলম দিয়ে। অনেকেই লিখতেন, চলে আয় আমার এখানে চিতা মারবি তো।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পরীক্ষার অ্যাকাউন্টস গ্রুপে যখন ফেল করলাম, এই দুর্ঘটনাবহুল ফেলুড়ে জীবনে সেই প্রথমবার ফেল করা; তাই বুকে বড় বেজেছিল। পরে আরও ফেল করেছিলাম। গা সয়ে গেছিল। তখন মুখার্জি জেঠু আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। বাবা হয়তো তাঁকে লিখেছিলেন দুঃখ করে 'ছেলে প্রেম করছে, খালি গান, থিয়েটার নিয়েই থাকে, কবিতা লেখে; সি এ পাশ আর করা হয়েছে ছেলের।'

মুখার্জি জেঠু তাই লিখলেন "My dear Lala, you must pass in your mere educational examination. The battle of life is yet to begin."

"Battle of life" কথাটা মুখার্জি জেঠুর কাছ থেকেই প্রথম শুনি।

সে যে কী সাংঘাতিক 'Battle", প্রত্যেক মানুষকেই যে সেই BATTLE লড়তেই হয়, ইচ্ছে করুক আর নাই করুক, তাও জেনেছিলাম।

এই Battle-এর কাছে যে "Battle of Bulge", "Battle of Britain", "Battle of the desrts" কিছুই নয় তাও পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু ওঁর ওই চিঠিতেই আমার মনের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছিল। পরবর্তী জীবনে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে, জেঠুও সবটা বলেননি। যেটা আমাকে কেউই শেখাননি, নিজেই শিখেছিলাম; সেটা হচ্ছে, One may afford to lose more than one battle but the war can't be lost.

বর্তমান যুগের জীবন যুদ্ধ আর Battle নেইও, WAR হয়ে গেছে।

অগণ্য BATTLE-এর সমষ্টি এই জীবন। একটি মাত্র BATTLE নয়।

জেঠুদের সময়ে জীবন অনেকই কম কমপ্লিকেটেড ছিল।

"বাবলি" উপন্যাস—প্রকাশক সাহিত্যম

"কাঙ্গোপকপি"—ঋজুদার গোয়েন্দা কাহিনী—প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং

পাঠক! আপনারা ঐতিহাসিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। অক্সফোর্ডের ডি-লিট। অনেকে যাঁকে বলতেন সাহেব-ঘেঁষা। ঐতিহাসিক গবেষণাতে ছত্রপতি শিবাজীকে নাকি তিনি ততখানি বড় করে দেখাননি; তাই।

যাই হোক, ওই সব গুরু বিষয় আমার মতো লঘুজনের বিবেচ্য নয়।

ডঃ সেনের বড় ছেলের নাম ছিল শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ সেন। (এস এন সেন) তিনি ইনকামট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন। আই আর এস। তখন চিফ কমিশনারের পোস্ট ছিল না, কিন্তু কমিশনার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়ান, মানেই de-facto চিফ কমিশনার ছিলেন। ক্ষমতা অবশ্য আজকের তুলনাতে অনেকই কম ছিল।

তাঁর ডাক নাম ছিল সোনা। আমি ডাকতাম সোনাকাকু। আমাকে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সুজাতা কাকিমা অত্যন্তই স্নেহ করতেন। সোনাকাকুর মতো অমন পণ্ডিত, সৎ, অধ্যয়নশীল, অভিমানহীন মানুষ আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি।

সোনাকাকু কলকাতা থেকেই এক একত্রিশে ডিসেম্বর রিটায়ার করে পরদিন, পয়লা জানুয়ারি তাঁর সমসাময়িক বন্ধু, 'ইনকামট্যাক্স অ্যান্ড ওয়েলথ ট্যাক্স সেটলমেন্ট কমিশনে'র মেম্বার কে কে সেন (কল্যাণকুমার সেন)-এর সঙ্গে সেটেলমেন্ট কমিশনের রোল্যান্ড রোডের অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলেন। লিফট খারাপ ছিল। হেঁটে চারতলাতে উঠে, ইজি চেয়ারে বসেই রিটায়ার করেছিলেন পৃথিবী থেকেই।

সোনাকাকু বনাম মুখার্জি জেঠুর এনকাউন্টারের গল্পটি বলার আগে ওঁর সম্বন্ধে আর একটু বলে নিই। কারণ এমন সব মানুষ আর এ-পৃথিবীতে বেশিদিন দেখা যাবে না। ওঁরা ছিলেন "Last of the Mohicans"।

যখনকার কথা বলছি, তখন উনি নর্থবেঙ্গলের কমিশনার।

ট্যুর থেকে ফিরে এসেই একদিন ফোন করলেন "করো কী? বেশি কাজ দেখিও না। চলে এসো।"

আমাদের অফিসের পাশেই আয়কর ভবন। চলে গেলাম।

বললেন, বোসো বোসো। কী রোমহর্ষক অভিজ্ঞতাই যে হল এবারে! তোমাকে না বলতে পারলে পেট ফুলে যাবে।

কী হল?

এবারে আমাকে ওরা নেপালের বর্ডারে ধুলাবাড়িতে নিয়ে গেছিল, বুঝলে।

ওরা মানে অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারেরা।

আমি চুপ করে রইলাম।

সোনাকাকু জানতেন না যে, শিলিগুড়িতে আমার এক মক্কেল ছিল যে ফিস দিত না। আমিও নিতাম না। ফিস-এর বদলে তার সঙ্গে গাড়ি করে উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতাম, বছরে তিনচারবার, ডিকিতে কম্বলে-মোড়া খিচুড়ির হাঁড়ি, পেছনের সিটে রাম-এর বোতল আর গ্লাস নিয়ে।

সে প্রতিবারেই আমাকে ধুলাবাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলত, পছন্দ করুন দাদা। যা-পছন্দ করবেন তাই আমার প্রেজেন্ট। বাঙালি মক্কেল। নাম বিকাশ দাস।

সে কারণে ধুলাবাড়ি সম্বন্ধে আমার সম্যক জ্ঞান ছিল।

সোনাকাকু বললেন, কী যে জিনিস, কত যে জিনিস কত রকমের যে জিনিস, কী বলব তোমাকে। কোরিয়ান APHRODISIAC থেকে, জাপানিজ কম্বল, আমেরিকান প্যান্টি-ব্রেসিয়ার, ইংলিশ টাই, মোজা, ফ্রেঞ্চ পারফ্যুম, সুইস ও জাপানিজ ঘড়ি, ক্যামেরা, জার্মান কলম, বায়নাকুলার, কত কী? একজন মানুষ এক জীবনে অত কিছু যে কী করে ব্যবহার করে তাই আমি ভেবে পেলাম না। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বড় দুঃখ হল।

তারপর?

আমি বললাম।

তারপর আর কী?

খুব দুঃখ হল নিশ্চয়ই আপনার, কিছুই কিনতে পারলেন না বলে?

নারে পাগলা! ইনকামট্যাক্সের কমিশনারকে, কোনও কিছু কিনে দেবার মানুষের অভাব কি কোনওদিনও ছিল? আমার দুঃখ হল সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

কী কারণে?

অত জিনিস। অত রকমের জিনিস অথচ আমরা ওর একটিতেও প্রয়োজন নেই। দুঃখের কথা নয়। কী বল?

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম কথা শুনে। ওঁর সামনে বসে ভাবছিলাম, কোনও দেবতার সামনে বসে আছি এই ঘোর কলিতে।

প্রয়োজন আর প্রয়োজনবোধটাই হচ্ছে আমাদের সর্বনাশের মূল কারণ। কোন জিনিসটার সত্যিই প্রয়োজন আর কোনটা বাহুল্য, কতটুকুতে চলে যেতে পারত আর লাগে কতখানি আমাদের, এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, যে দূরত্ব তারই মধ্যে আমাদের সব সুখ শান্তি সততা মাখামাখি হয়ে আছে।

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন প্রান্তিক জীবন। সততা-অসততার দুই ঘরের মধ্যে, প্রয়োজন আর বাহুল্যর দুই ঘরের মধ্যের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকি আমরা প্রত্যেকেই চিরদিন। পা একবার এ ঘরে পড়ে, আরেকবার ও ঘরে।

বড় কষ্ট সেই বেঁচে থাকাতে। মন থাকলেই বড় কষ্ট!

সোনাকাকু তাঁর জীবন দিয়ে যা শিখিয়েছিলেন তার সামান্যই হয়তো শিখতে পেরেছিলাম, কিন্তু শেখার আকাঙ্ক্ষাটা সেদিনেরই মতো আজও তীব্রই আছে।

সোনাকাকুর শ্যালক, সুজাতা কাকিমার সহোদর হলেন অক্সফোর্ডের মেধাবী এবং বিখ্যাত ইকনমিস্ট শ্রীতপন রায়চৌধুরী। তিনি অত্যন্ত রসিকও বটেন। বরিশালের মানুষদের নিয়ে লেখা বইখানি (তিনি নিজেও "বরিশাইল্যা") বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের ভাণ্ডারে একটি Important Landmark।*

সোনাকাকু সবে চাকরিতে ঢুকেছেন। আই টি ও। কলকাতাতে মেস-এ থাকেন। সম্ভবত বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে তাঁদের পৈতৃক বাড়ি তখনও হয়নি, অথবা হয়েছে, ঠিক বলতে পারব না। ডঃ সুরেন সেন তখন দিল্লিতে। মুখার্জি জেঠুও দিল্লিতে।

* "রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা"—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

মুখার্জি জেঠুর এক বন্ধু-কন্যার সঙ্গে কোনও সূত্রে সোনাকাকুর সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। মুখার্জি জেঠুকে তাঁর বন্ধু ছেলেটির সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে বলেন, তাঁরই ডিপার্টমেন্টে যখন পাত্র কাজ করে।

মুখার্জি জেঠু কলকাতাতে এসেছেন কাজে।

'হাই-থিংকিং লো-লিভিং'-এ বিশ্বাসী সোনাকাকু অফিস থেকে ফিরে, খালি গায়ে, ধুতি পরে, ধুতির খুঁটটি গায়ে জড়িয়ে তক্তপোষে শুয়ে আছেন বাইরের ঘরে।

এমন সময়ে কে যেন খটাখট করে কড়া নাড়লেন।

বিরক্ত হয়ে উঠে দরজা খুলে দেখেন, থ্রি-পিস স্যুট পরা ছোট্টখাট্টো এক বাঙালি সাহেব। চোখে পুরু লেন্সের চশমা।

সাহেব ভ্রূকুঞ্চন করে শুধোলেন, এটা কি ডঃ সুরেন সেনের বাড়ি?

হ্যাঁ।

সোনাকাকু বললেন।

ওঁর বড় ছেলে শৈলেন্দ্রনাথ সেন কি আছেন?

পাত্র তাঁর ডিপার্টমেন্টেরই অফিসার, কলকাতাতে পোস্টেড এবং বর্তমানে কলকাতাতেই আছে, এ-খবর নিয়েই তিনি এসেছিলেন।

সোনাকাকু বললেন, না। উনি তো বাড়ি নেই।

বলেই, সেই আগন্তুক সাহেবের মুখের উপরেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ভদ্রলোক কে? কী চান? কেন এসেছিলেন? এসব নিয়ে সোনাকাকুর মাথাব্যথা ছিল না। তবে ভদ্রলোক যে তাঁর 'সম্বন্ধ' নিয়েও আসতে পারেন এবং তাঁকে চাক্ষুষ দেখতেও এসেছেন, এমন একটা সন্দেহ মনে অবশ্যই উঁকি মেরেছিল। সেই জন্যেই ওই হঠাৎ-অসূয়া।

তবে খালি গায়ে ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে তক্তপোষে শুয়ে-থাকা ছেলেকে সাহেব মুখার্জি জেঠুর, তাঁর প্রবাসী বাঙালি বন্ধু-কন্যার হবু বর হিসেবে পছন্দ হবার কথাই ছিল না। এবং মুখার্জি সাহেব তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বুঝেও ছিলেন যে, এই ছেলেটিই পাত্র। পাত্র বা অপাত্র যাই হোক, তার অভব্যতায় পাক্কা ভদ্রলোক এবং সাহেব জেঠু বিলক্ষণ বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

বন্ধুকে সেদিনই লিখে দিলেন অন্যত্র সম্বন্ধ করতে কন্যার জন্যে।

এবার যেটি বলব সেটি এর বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। এই পুরো এপিসোডটি আমি সোনাকাকুরই মুখ থেকে শুনি বিস্তারিতভাবে। অমন রেলিশ করে নিজেরই হেনস্তার কথা আমি কম মানুষকেই বলতে শুনেছি।

একদিন সোনাকাকু ট্রামের জন্যে গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অফিসে যাবেন। তিন নম্বর গভর্নমেন্ট প্লেস ওয়েস্ট-এ, এ জি বেঙ্গলের পাশে লালরঙা বাড়ি ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট। তখন ঐ একটিই অফিস ছিল ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের। এমন সময়ে এস এন গুহ অর্থাৎ আমার পিতৃদেব, গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে ওঁকে দেখে গাড়ি থামালেন।

যাবা কই?

আর কই? অফিস।

তা উইঠ্যা পড়।

অফিস যাইতাছেন তো?

আর কই যামু? মোল্লার দৌড় মসজিদ।

তবে, পথে আলিপুর থেকে মুখার্জি সাহেবকে তুলে নেব। দিল্লি থেকে এসেছেন।

দেরি হবে না তো দাদা?

নারে, না।

মুখার্জি জেঠু তখন সোনাকাকুরই কমিশনার। জানি না, তখন উনি কোন চার্জ-এ ছিলেন। সেন্ট্রাল সার্কেল-ও হতে পারে।

সোনাকাকু তখন পর্যন্ত তাঁর বড় সাহেব পি মুখার্জিকে চাক্ষুষ দেখেননি। নামেই শুধু চেনেন।

যে সাহবটি তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন তাঁর পরিচয় তো উনি জানতেন না! মুখার্জি সাহেবের নাম শুনেই উনি বললেন, কী দরকার দাদা। আমি ট্রামেই চলে যাব।

বাবা জোর করলেন, বললেন, চলো না। তোমার কমিশনারের সঙ্গে আলাপও হয়ে যাবে।

আলিপুরেই তখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গেস্ট হাউস ছিল।

আর্মি-ব্যারাকে বাবার সঙ্গে সেখানে পৌঁছে সোনাকাকু দেখলেন থ্রি-পিস স্যুট পরা কাঙ্গা অ্যান্ড পালকিয়ালার দু'ভল্যুম ইনকামট্যাক্সের ট্রিটাইজকে মাথার বালিশ করে ড্রয়িং রুমের সোফার উপর শুয়ে আছেন পি মুখার্জি সাহেব।

বাবা পৌঁছতেই তড়াক করে উঠে বললেন, চলুন গুহ। উ্য আর লেট বাই ইলেভেন মিনিটস!

বাবা বললেন, ভেরি সরি স্যার।

বলেই, গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে সোনাকাকুর সঙ্গে মুখার্জি জেঠুর আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এস এন সেন। ডঃ সুরেন সেনের ছেলে। আপনার চার্জেই আছে। খুবই ভালো ছেলে।

মুখার্জি জেঠু সোনাকাকুর দিকে একঝলক অপাঙ্গে তাকিয়ে বললেন, নমস্কার।

তারপরেই বললেন, উনি আমার চার্জ-এ থাকতে পারেন অবশ্যই, কিন্তু উনি ডঃ সুরেন সেনের ছেলে হতেই পারেন না!

বাবা, বোকার মতো ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মুখার্জি সাহেবকে চাক্ষুষ দেখামাত্রই তো সোনাকাকুর হয়ে গিয়েছিল। ত্রাহি! ত্রাহি! অবস্থা তখন। সেই মানুষই এই মানুষ। সেই সাহেব, যাঁর মুখের উপরে দড়াম করে দরজা বন্ধ করেছিলেন উনি! এ যে যম!

গাড়িতে উঠে মুখার্জি জেঠু বললেন, আপনাকে দেখে তো রীতিমতো ভদ্রলোকই মনে হয়। আপনি কখনওই ডঃ সুরেন সেনের ছেলে শৈলেন্দ্রনাথ সেন হতেই পারেন না।

বাবাও বুঝলেন যে, কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। 'হাইলি' গুবলেট। কিন্তু সেটা যে কী, তা বুঝতে পারলেন না।

গভর্নমেন্ট প্লেস ওয়েস্ট-এ বাবা দু'জনকেই নামিয়ে দিয়ে ওয়াটারলু স্ট্রিটের দিকে এগোলেন।

গাড়ি থেকে নামবার আগে মুখার্জি সাহেব সোনাকাকুকে বললেন, চলুন সেন সাহেব, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন আমার ঘরে। আফটার অল, আপনি আমার চার্জ-এই যখন আছেন।

লিফট-এ দোতলাতে উঠে, কমিশনারের ঘরে পৌঁছে সোনাকাকু ঘাড় গোঁজ করে বসে চা খেলেন।

চা খাওয়া হলে, মুখার্জি সাহেব তাঁর বিশাল ঘরের দরজা অবধি এগিয়ে দিলেন সোনাকাকুকে।

হ্যান্ডশেক করে বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপিত হয়ে খুবই খুশি হলাম। আপনি সত্যিই একজন ভদ্রলোক। কিন্তু ডঃ সুরেন সেনের বড় ছেলে শৈলেন্দ্রনাথ সেন আপনি কিছুতেই হতে পারেন না।

কাতর চোখে মুখার্জি সাহেবের চোখে চেয়ে, নীরবে ক্ষমা প্রার্থনা করে সোনাকাকু নমস্কার করে ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে পৌঁছেই বাবাকে ফোন করলেন।

বাবা লাইনে আসতেই বললেন, শচীনদা। আপনে আমারে এক্কেরেই ডুবাইলেন আইজ।

বাবা বললেন, আমি জানুম ক্যামনে যে তুই আগেই কেলো কইর‍্যা থুইছস? তুই তো ডুইব্যাই আছিলি। তরে লইয়া গ্যালাম সঙ্গে, তর ভালর লইগ্যা। আর হইয়া গেল মন্দ। যাউক। যা কিছুই ঘটে, মঙ্গলেরই জন্য। কী কইস তুই?

আমি আর কমু কী। আমার বাইক্য সইরতাছে না আর।

সোনাকাকু বললেন।

সোনাকাকুদের দেশ ছিল বরিশালের মাহিলাড়া গ্রামে।

মাধবপাশার বিশাল দিঘি দেখার মতো ছিল। তাতে সহজে স্টিমার চলতে পারত। চাঁদের রাতে জিন পরীরা নাকি সাঁতার কাটত সে দিঘিতে।

মাহিলাড়া গ্রামটি পড়ত সম্ভবত বরিশাল থেকে মাধবপাশার রাস্তাতে। মাধবপাশা হয়েই বানরীপাড়াতেও যেতে হতো।

আমি বরিশাল থেকে জিপে করে উনিশশো ছেচল্লিশে (আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে) বানরীপাড়াতে গেছিলাম। তখনকার দিনে প্রায় অভাবনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ইট বাঁধানো রাস্তা ছিল সেই গ্রামে। লাইব্রেরি ছিল মনে আছে।

মায়ের এক আত্মীয়র বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম একবেলার জন্যে। আমার মায়ের মামাবাড়িও বানরীপাড়াতেই ছিল। আগেই বলেছি, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এবং মনোরমা দেবী ছিলেন আমার মায়ের দাদু এবং দিদিমা। আমার শ্বশুরবাড়িও বানরীপাড়াতেই তবে আমার শ্বশুরবাড়িতে জীবিত যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে কেউই বানরীপাড়াতে যাননি। বানরীপাড়াতে কিন্তু বানরী দেখিনি কোনও।

মুসলমানের ঘরে যেমন মোরগা-আন্ডা সবসময়েই মজুদ থাকেই অতিথি-সৎকারের জন্যে, বানরীপাড়া এবং অবশ্যই বরিশালের অন্যান্য গ্রামেও হিন্দুর ঘরে ঘরে মজুদ থাকে কাউঠ্যা বা কাছিম। পুকুরের মধ্যে পায়ে-দড়ি বাঁধা অবস্থাতে তারা সাঁতরে বেড়ায়, পোকামাকড়, অ্যালগি, ফাঙ্গি, প্ল্যাংকটন খেয়ে তাগড়া হয়।

হঠাৎ কোনও অতিথি এলেই দড়িতে টান পড়ে। উঠোনে কাছিমকে উলটো করে ফেলে দিয়ে তাকে কাটা হয়। নরম কচকচে পিঠ, কাছিমের ডিম, কাছিমের ডুমো-ডুমো মাংস, কষে পেঁয়াজ-রসুন লঙ্কা দিয়ে রাঁধলে দারুণ স্বাদ হয়। এক থালা ভাত খাওয়া যায় শুধু তা দিয়েই।

সোনাকাকুদের মাহিলাড়া গ্রামে একবার পাখি শিকারে গিয়ে বাবা ওই সোনাকাকুরই মতো এক 'কেলো' করেছিলেন। তাঁর প্রিন্স অব ওয়েলস, হোঁদল কুৎকুৎ অধমও সঙ্গে ছিলাম। সঙ্গে আর ছিলেন বরিশালের জমিদার মহারাজ মনোরঞ্জন বর্মণ। জাতে পাঞ্জাবি, কিন্তু ব্যবহারে পোশাকে এবং ভাষায় "এক্কেরে বরিশাইল্ল্যা"। বরিশালে জমিদারদের 'মহারাজ' বলত।

তাঁরই জিপে করে যাওয়া হয়েছিল শিকারে।

পুকুরভর্তি সোনালি সল্লি হাঁস ছিল। কিন্তু বেইমান ইংরেজের অত্যুৎসাহী ছররা গুলি, বন্দুক ফুটোতেই কিছু সল্লি হাঁসকে নিহত এবং আহত করেই, যেন কর্তব্য সুসম্পাদিত হয়নি, এমন মনে করে, দোকানে ব্যাঙের মতোই জলে "লাইপ্যে" গিয়ে গ্রেটার মোমেন্টাম-এর সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ওপারের মন্দিরের চাতালে বসে পরচর্চায় নিয়োজিত একজন অ-বদ্যি গ্রামবাসী পরচর্চাজনিত আনন্দ এবং তজ্জনিত উত্তেজনাবশত ঠ্যাং নাচাচ্ছিলেন।

পিতৃদেবের বন্দুকের নল-নিঃসৃত গুলি জল "লাইপ্যে" যেয়ে তেনার আন্দোলিত ঠ্যাঙের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

তারপরে কী!

কেলো কী কেলো!

পিতাপুত্র একই সঙ্গে সেদিন নিহত হওয়ার কথা ছিল বরিশালিয়া 'রামদা'র কোপে। কিন্তু মহারাজ মনোরঞ্জন বর্মণ বাঁচালেন তাঁর Charishma দিয়ে।

অথবা তখনও পিতা-পুত্রর আরও অনেকই 'কেলো' করা বাকি ছিল সে জন্যেই হয়তো ঈশ্বর এই অঘটন-পটিয়সী পিতা-পুত্রকে জীবিত রেখেছিলেন।

কোনওক্রমে প্রাণে "বেঁইচ্যে এইয়েচিলাম সেদনে"।

মাহিলাড়ার 'কেলোর' বদলাই হয়তো নিয়েছিলেন বাবা, মাহিলাড়ার 'স্যাগো বাড়ির' পোলারে পি মুখার্জি সাহেব নামক সাক্ষাৎ ব্যাঘ্রের মুখে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসে।

মাঝেমাঝেই মাহিলাড়ার নাম করতেন সোনাকাকু আর উদাস হয়ে যেতেন।

যে-প্রজন্ম দেশভাগজনিত কারণে সবচেয়ে বেশি দুঃখিত হয়েছিলেন, বড় বেজেছিল দেশ ছেড়ে আসাটা যাঁদের বুকে; সৌভাগ্যের কথা এই যে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই একে একে পৃথিবী থেকে চলে গিয়ে সেই দুঃখ, সেই অপমান, সেই হঠাৎ অসহায়তার গ্লানি বোধ থেকে, ক্ষমতালোভী নেহরু সাহেব আর জিন্না সাহেবের আওতার বাইরে পালিয়ে চিরদিনের মতোই বেঁচে গেছেন।

উদ্বাস্তু, পরের প্রজন্মর কাছে বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, রাজশাহী, পাবনা—এসব শুধুই এক একটি নামই মাত্র। না তাঁরা দেখেছেন সেই প্রাচুর্য, সেই শান্তি; না সেই আদিগন্ত স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। তাঁদের মধ্যে যাঁরা পারেন, তাঁদের উচিত "Roots"-এর খোঁজে একবার অন্তত গিয়ে পিতা-প্রপিতামহের জন্মস্থান দেখে আসা, অনুভব করে আসা, শিকড়-ছেঁড়ার দুঃখের প্রকৃতি।

অবশ্য তাঁরা গিয়ে যে "দেশ" দেখবেন, সেই দেশ অনেকই অন্যরকম হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

পাছে স্বপ্নভঙ্গ হয়, তাই আমি যাইনি বাংলাদেশে আর উনিশশো-আটচল্লিশের পরে।

যাবার ইচ্ছে যে করে না তা নয়। কিন্তু যাব না। স্মৃতিতে যে স্বদেশ আছে তাই বেঁচে থাক।

ঋভু

তৃতীয় পর্ব

কোনো লেখকই আকাশের শূন্যতায় জন্মগ্রহণ করে না, তারা ছোট বড় মাঝারি যে দরেরই হোক না কেন।

লেখকের সামাজিক পরিবেশ, দেশ ও কালের প্রভাব, পারিবারিক প্রবণতা প্রভৃতি লেখককে অজ্ঞাতে নিয়ন্ত্রিত করে। এখানে লেখক মানে, তার শক্তির বিশেষ রূপটি। কোনো লেখককে সম্যকভাবে বুঝতে হলে এই সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কিংবা এই সমস্ত মানচিত্রের উপরে যথাস্থানে তাকে প্রতিষ্ঠিত কবে বুঝতে হবে।

"কবিকে পাবে না কবির জীবনচরিতে", একথা সর্বাংশে গ্রাহ্য নয়। জীবনচরিত যদি যথার্থ হয় তবে অবশ্যই কবিকে তাতে পাওয়া যাবে।

প্রমথনাথ বিশী—পরশুরাম গল্পসমগ্র ভূমিকাতে

বৌদি ও মোহরদিকে,
পুরনো দিনের স্মৃতিতে

প্রথম প্রকাশ . জানুয়ারি ১৯৯৬, মাঘ ১৪০২

"TIME PRESENT AND TIME PAST ARE BOTH PERHAPS PRESENT IN TIME FUTURE, AND TIME FUTURE CONTAINED IN TIME PAST"

T.S.ELIOT

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল বেরুল। মোটামুটি ভদ্রগোছের ফার্স্ট ডিভিশন। কুলীন হতে পারত হয়তো, যদি মিলিটারি সায়েন্সটা ফোর্থ সাবজেক্ট হিসেবে দিতেন আমাদের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রিফেক্ট ফাদার স্কেফার্স।

মায়ের হাতের হিরের আংটিটাও গেল। কিন্তু গ্রহাদি এবং রত্ন-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁদের আদৌ জ্ঞান আছে তাঁরা বিলক্ষণই জানতেন যে কোনো রত্নই আমা-হেন পাথর-টাতরের মঙ্গল করতে অপরাগ।

আমার বাবা জীবনে কখনওই আংটি পরেননি। আংটি-তাবিজ গুরুদীক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে এক ধরনের গভীর বিদ্বেষ ছিল বাবার। আমিও ওসব গ্রহরত্নদি আজ অবধি পরিনি। যদিও বিদ্বেষ অথবা প্রেম কিছুই ছিল না।

বেচারি মা! তাঁর ডান হাতের মধ্যমার বড়ো হিরের আংটিটি বাগদত্ত বলেই আমাকে দিয়েছিলেন পরীক্ষার ফল বেরুবার পরেই। কিন্তু হিরে পরে আমার ভালো তো হয়ইনি খারাপই হয়েছিল। সে কথাটা বোধগম্য যখন হল তখন নানারকম খারাপত্বের গহ্বরে নিরুপায় এবং গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছি।

পঞ্চাশের দশকের শেষে প্রচণ্ড শীতের এক রাতে শিকার শেষে পালমৌর চিপাদোহর থেকে ধানবাদে জিপে করে এসে পৌঁছে হাওড়ার ট্রেন ধরবার সময়ে হঠাৎই স্টেশনে খেয়াল হয় যে, হিরেটি সোনার আংটির কক্ষে নেই। জঙ্গলে বা পথে কোথাও অলক্ষে পড়ে গেছে।

দেখলাম, যেখানে হিরেটি দেদীপ্যমান ছিল, সেখানে শুধু একটি গর্ত বিরাজ করছে।

এই অঘটনের পরেই কিন্তু আমার খারাপ সময় কেটে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। কিন্তু সে সব ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার অনেকই পরের কথা।

তার কিছুদিন পরেই আমার স্নেহময়ী মা পুত্রের অকল্যাণাশঙ্কাতে, এবং পুত্রের অজ্ঞাতে বাড়ির পুরুতঠাকুরের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে আমাকে বহুত-রতির একটি অ্যামেথিস্টের আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন এবং একটি বড়কা পীত-পোখরাজও। মাতৃ আজ্ঞা বলে কথা! 'না' করতে পারিনি।

"ভাগ্যলিখন" অনুসারে আমার উপরে নাকি অনাত্মীয়া নারীজাতির প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করার 'দুর্যোগ' ছিল এবং আমার গুম্ফশশ্রু পুরুতমশাই মাকে বুঝিয়েছিলেন যে, আমি সেইসব আংটি ধারণ করলে সেই 'দুর্যোগ' সম্পূর্ণ কেটে যাবে।

পুরুতমশাই জুয়েলারের কাছ থেকে কমিশন পেতেন কি-না তা অবশ্য আমার আজও অজানা। আমার মা এবং পুরুতমশাইয়ের জ্যোতিষশাস্ত্রে কতটুকু জ্ঞান ছিল তাও জানি না। যা, মায়ের চোখে 'সর্বনাশ' তাই পুত্রের কাছে 'পৌষমাস' হতে পারত। কিন্তু ভাগ্যলিখন তেমন 'ছেলনি'।

সেই আংটি দুটিও যথাক্রমে কয়েকবছর পরে ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবে টেনিস খেলতে গিয়ে এবং ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে সাঁতার কাটতে গিয়ে আঙুল-ছিটকে স্বেচ্ছায় কক্ষচ্যুত হয়ে বেরিয়ে যায়। আমিও বাঁচি। তারাও সম্ভবত তাদের মহৎ কর্তব্যকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে বেঁচে যায়। ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টেরও তো দুঃখকষ্ট থাকে!

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত আমার ওইটুকু পরোক্ষ অভিজ্ঞতা।

আংটি হারানোর কথা শুনে আমাদের এক জুয়েলার মক্কেল বউবাজারের দে দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি অ্যাকাউন্ট্যান্ট এন সি সি-র অচানকমারে কাহিল "ড্যাম্বার" মতন বড়ো বড়ো চোখের হাসিখুশি আনন্দবাবু আনন্দর সঙ্গে বলেছিলেন, "ওরা নিজেরাই পাইল্যে গেচে, ভালোই হইয়েচে।""

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করি না যদিও কিন্তু প্রতি সপ্তাহেই যেসব রাশিফল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়, তা আজও মজা করে পড়ি এবং যে সপ্তাহে যে রাশির ভবিষ্যদ্‌বাণী আমার মনে ধরে, সেই সপ্তাহে পরম আহ্লাদে আমি সেই রাশিভূক্ত করে নিই নিজেকে মনে মনে।

ইংরেজি জন্মতারিখ হিসেবে আমি ক্যানসারিয়ান। মানে কর্কট। কিন্তু আমার মা বলতেন "শনিবার জন্ম, জন্মস্থানে চন্দ্র ছিল এবং তোর মিথুন রাশি। জানি না, জানার কোনো উৎসাহও নেই। আজ জানার উপায়ও নেই। কারণ ছকটক সবই হারিয়ে গেছে।

তবে ওই নামেই লগনচাঁদা। কোনোকিছুই জীবনে বিনা-মেহনতে পাইনি। না, কোনো কিছুই নয়। কথাতেই বলে : A saturday born has to work hard for a living। সেই living রাজার মতোই হোক কী ভিখিরি মতো।

আমি জন্মাবার পরে মা যখন চোখ খোলেন তখন নাকি বিছানার পাশে ভগবান বুদ্ধদেবকে দেখতে পান। কোন্ বুদ্ধদেব কেন বুদ্ধদেব তা জানি না। বৈশালীর বুদ্ধদেব তো আমার মতন এতো পশুপাখি মারেননি। যাই হোক, আমার নাম নাকি সেই কারণেই রাখা হয় বুদ্ধদেব।

নিজের নাম তাড়াতাড়ি সই করতে গিয়ে প্রায়ই 'উ'কার দিতে ভুলে যাই। তাই 'বদ্ধদেব' হয়ে যায়। আসলে আমার 'পৈতৃক' নাম হয়তো বদ্ধদেবই।

মামাবাড়ি ছিল বিহারের গিরিডিতে। দিদিমা ডাকতেন 'নন্দলালা' বলে। তা থেকেই ডাক নাম হয়, লালা। মা অবশ্য চিরদিন "খোকন" বলেই ডাকতেন। ছোটোমামা ডাকতেন গাডলু বলে। সেজকাকু ডাকতেন 'চোর'। শিশুকালে, ঠাকুরঘরের সন্দেশ চুরি করে খেয়েছিলাম, তাই।

আমার জন্মদিন নিয়েও ধন্দ আছে। প্রকৃত জন্মদিন উনত্রিশে জুন, চৌদ্দই আষাঢ়। কিন্তু বাবা স্কুলে ভরতি করার সময়ে আমার জন্ম তারিখ করে দেন দোসরা জানুয়ারি। কেন এই পরিবর্তন তা বলতে পারব না। আফটার অল জন্মদাতা বলে কথা। জন্মদিন পালটাবার ছক তাঁর ছিল বইকী। ছ-মাস ছোটো হয়ে গিয়েও বুদ্ধির পক্বতা বাড়ত কি জানি না। সম্ভবত সরকারি চাকুরে দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই বয়স ভাঁড়িয়ে নিয়ে সরকারি চাকরিতে বহুদিন বহাল তবিয়তে থাকেন দেখে, নিজের পুত্রের ভবিষ্যৎ "পাক্কা" করতেই বাবা এই অপকর্মটি করে থাকবেন। কিন্তু অপকর্মই যদি করলেন তবে মাত্র ছ'মাস কমালেন কেন তাও অনেক ভেবেটেবেও বুঝে উঠতে পারিনি। বয়স কমানোর সঙ্গে জন্ম তারিখটাও বদলে দেওয়াটা পুত্রর প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হয়েছিল কি না তা বাবাই জানবেন।

তবে বাবার এই "অপচেষ্টা" বৃথাই হয়েছিল। কারণ ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অথবা অন্য কোনো সরকারের চাকরি করাই আমার কোষ্ঠীতে ছিল না। চাকরি ব্যাপারটাই আমার চরিত্রানুগ নয়। চাকরদের প্রতি আমার এক গভীর অসূয়াও জন্মে গেছে। জীবনে এতো ও এতোরকম আত্মসম্মানজ্ঞানহীন, মালিকের পদলেহনকারী মর্কট এবং সারমেয় সুলভ চাকর দেখলাম যে, এই অসূয়া জন্মাবার যুক্তিযুক্ত কারণও ছিল।

পাঠক, শুয়োরের ব্রিডিং-ফার্মেরই মতো চাকরের অনেক ব্রিডিং-ফার্মও দেখেছি চিংড়ি বা চারা-পোনার মতোই যাঁরা চাকরের চাষ করে থাকেন।

তেমন তেমন বহু প্রতিষ্ঠান, চাকর ধরে এনে জোয়ালে জুতে দিয়ে, লেজ মুলে মুলে তাঁদের চরিত্রের সবরকম দার্ঢ্য ও ঋজুতা এবং আত্মসম্মানজ্ঞান নিংড়ে নিয়ে তাঁদের "আদর্শ চাকরে" রূপান্তরিক করাটাই বাহাদুরির এবং উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেন।

এইসব "চাকব-হাটির" কোনোটাতে যে অর্থ বা যশের লোভে ফেঁদে যাইনি জন্মের মতো এও ঈশ্বরের ও আমার মা-বাবার অশেষ আশীর্বাদই বলতে হবে।

সাহিত্যিক মনোজ বসুর একটি বই ছিল। নাম—"মানুষ গড়ার কারিগর"। এইসব চাকর-তৈরির কারখানাদের কাছ থেকে দেখে মাঝে মাঝে ইচ্ছে যায় "চাকর-গড়ার কারিগর" নামের একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখি।

জানি না, হয়তো লিখবও কোনোদিন, তেমন তাগিদ বোধ করলে।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরের দীর্ঘ অবকাশে যে কী কী করলাম অফিস করা ছাড়া তা এখন আর স্পষ্ট মনে নেই। অফিসও তো তখনও বলতে গেলে সখের অফিস।

সাহিত্যপাঠ, সাহিত্যআলোচনা, গান শোনা ছবি আঁকা কবিতা লেখার ব্যর্থ চেষ্টা এই সব করেই দিন কাটত। বাবার শাসন তখনও একটুও শিথিল হয়নি। আড্ডা মারা, বাড়িতে বন্ধুবান্ধব আসা তখনও TABOO ছিল। আসত একমাত্র দীপক। আমিও ওর বাড়ি যেতাম কাঁসারিপাড়া রোডে।

সেই সময়ে তো বটেই পরবর্তী জীবনেও, আমার সমসাময়িক অনেক নামী-দামি কবি-সাহিত্যিকের মতো কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস, ছোটা ব্রিস্টল বা খালাসিটোলা বা সোনাগাছি বিশারদ হয়ে ওঠার সৌভাগ্য অথবা সম্ভ্রান্ততা আমার হয়নি। হয়নি যে, তার জন্যে তেমন কোনো দুঃখবোধও নেই। যাঁরা হয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার কোনো ঈর্ষা নেই, অসূয়াও নেই। আমি চিরদিনেরই একা, Loner । নিজের মতো একা একাই বড়ো হয়ে উঠেছি। তাছাড়া কবি সাহিত্যিক যে হয়েছি এমন দাবিও করি না।

যখন আইন পড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন একদিন খিদে পাওয়াতে ইনটেলেকচুয়াল খিদে নয়, নেহাতই লিটারাল খিদে, পাকৌড়া, আর কফি খেতে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে গেছিলাম। তখনই হঠাৎ এক আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে, যাঁরা কফি হাউসের নিয়মিত খদ্দের, তাঁদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করে ভদ্রলোকের নাম জানতে পারি। ভদ্রলোকের বয়স আমাদেরই মতন হবে, দু এক বছরের বড়ো হতে পারেন। গ্রীষ্ম-দুপুর স্কাইলাইট দিয়ে আসা খররোদ্রের মধ্যে বসে কফি খেতে খেতে হঠাৎ তারস্বরে 'সখী আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না' গেয়ে ওঠেন।

সেই চিৎকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ Showing- off।

ওই সময়কার বহু কবি-সাহিত্যিক (পরে হওয়া) ওই দোষে দুষ্ট ছিলেন, এবং আজও আছেন।

গান গাইতে না জানলেও গায়ক বলে প্রচারিত হওয়ার এক তীব্র বাসনা আজও বহু নামীদামি কবির মধ্যে দেখতে পাই। সেই প্রচারের মাত্রা যখন শোভনতার সব সীমা লঙ্ঘন করে, তখন অনুকম্পা হয় তাঁদের প্রতি।

জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই সাধনার যে এক বিশেষ ভূমিকা আছে তা একধরনের মিডিয়া-বাহিত দৈত্য-দানোরা ভুলে যান। তাতে আমার আপনার না হলেও অল্পবয়সি গুণগ্রাহীদের ক্ষতি হয়। অবশ্যই হয়।

বেশ কিছুদিন পরে আমার Literary Attache দীপকের কাছে শুনি যে, সেই ভদ্রলোক তাঁরই নেমসেক। নাম দীপক মজুমদার। মহাশয় নাকি তুলনামূলক সাহিত্যেরই ছাত্র, যাদবপুরের। ওই

বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ বুদ্ধদেব বসুর Blue-eyed Boy এবং তদুপরি "দেশ" সম্পাদক সাগরময় ঘোষের ভাগিনেয়।

পাঠক, যে সময়ের কথা বলছি এবং তার পরবর্তী তিন যুগেও 'দেশ' সম্পাদক সাগরময়দার প্রতাপ বঙ্গভূমের সাহিত্যক্ষেত্রে ছিল ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একসময়ের ইন্দিরা গান্ধির প্রতাপেরই মতো। এখন যাঁরা সাহিত্য-জগতের বাঘ-ভাল্লুক তেমন অনেককে হাত-কচলাতে দেখেছি সাগরদার সামনে। কী করলে একটু কৃপাধন্য হওয়া যায়, সেই মতলবে "কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান"-এর জন্যে হুড়োহুড়ি করতে দেখেছি।

তবে পাঠক, আমার সঙ্গে সাগরদার প্রথম Encounter-এর কথা যখন জানবেন তখন আপনারা অবশ্যই হাসবেন।

কিন্তু আমি নিজে তখন কেঁদেছিলাম।

সেকথা সময়ে বলা যাবে।

সেই সাগরদারই ভাগিনেয় এবং বুদ্ধদেব বসুর চোখের মণি যে সেই ব্যক্তি সেই কথা জানবার পরেও আমি দুঃসাহস করে কী করে বলব যে তিনি গায়ক নন! শুধুমাত্র দীপক মজুমদারই নন, অন্য অনেক কবি-সাহিত্যিকেরও, তাঁরা বড়ো নামী অথবা লেখক বলেই ভুল সুরে গান গাইবার IPSO-FACTO "হক্ক" আছে একথা কারোরই মেনে নেওয়া উচিত নয়। সেদিনও আমি মানতে পারিনি। আজও পারি না। মাতালের চিৎকার আর গানে চিরদিনই তফাত ছিল এবং থাকবে।

আশাকরি এই সত্য-কথনের জন্যে পাঠক আমাকে নিজগুণে মার্জনা করবেন।

কবিদের আর্ষপ্রয়োগের অধিকার অবশ্যই আছে কিন্তু তা কাব্য-সাহিত্যক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।

গানে, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বঙ্গভূমের কবি-সাহিত্যকদের যেন জন্মগত অধিকার।

গানও সাহিত্যেরই মতন এক অন্য জগৎ। এবং সে-জগতে অন্য কোনো জগতের পাসপোর্ট নিয়ে গা-জোয়ারি প্রবেশ চলে না যে, এ কথাটা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝি, ততই মঙ্গল। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বদের তো এ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হওয়াটাই উচিত নিছক নিজেদেরই সম্মানের কারণে। তাঁদের অনেক স্তাবক এবং মোসায়েব থাকা মানেই এই নয় যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল তাবৎ জনগণই তাঁদের গায়ক বলে মেনে নেবেন। এইসব "হরকৎ"-এ তাঁরা নিজেরাই নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তোলেন।

তবে এ-কথা অবশ্যই বলব যে, দীপক মজুমদার এবং শক্তির কণ্ঠস্বর খুবই ভালো ছিল। শক্তির গলার জুয়ারির তো তুলনা ছিল না।

জুয়ারির কথা বললে তারাপদ রায়ের কথাও না বলে উপায় নেই। একেবারে 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়'-এর মতন। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর জুয়ারিও ভাল। শিবশম্ভু পাল, শুনেছি ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গান। এখনও শোনার সৌভাগ্য হয়নি।

মুশকিল হল এই যে তারাপদর গান ব্যাপারটাই আদৌ পছন্দের নয়। কিন্তু তারাপদ গাইলে হ্যারি বেলাফন্টে, পল রোবসন বা ন্যাট-কিং কোলও বিপদে পড়তেন। তারাপদ মতন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর কোনো কবি-সাহিত্যিকেরই নেই।

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথাতে চলে এলাম। একেই উত্তরবঙ্গীয় ভাষায় বলে "প্যাচাল" পাড়া।

যা বলছিলাম তাই বলি।

বাবা শিলং যাচ্ছিলেন কাজে। বললেন আমার সঙ্গে চল। গারো হিলসের রাজধানী তুরাতে পাগলা হাতি বেরিয়েছে। মুখার্জি সাহেবকে গারো হিলসের জুরিসডিকশান যাঁরা, তিনি নেমন্তন্ন করেছেন সেই হাতি মারতে।

আমার মন বলল যে, সেই অফিসারের মুখার্জি জেঠুর উপরে যিনি, অত্যন্ত দুর্মুখ ছিলেন এবং তাঁর সুতীক্ষ্ণ মেধার কারণে আয়কর বিভাগের অনেকেই যাঁকে "পাগল মুখার্জি" বলতেন "ক্ষার" ছিল বলে পরোক্ষে মুখার্জি জেঠু এবং তাঁর সঙ্গীদের খুন করবার মতলব করেছেন।

তাছাড়া পাড়ার পাগলা কুকুর বা নারীর শাড়ি ধরে টানাটানি করা বে-পাড়ার হনুমান আর পাগলা হাতি তো একই জীব নয় যে এক গাছা বন্দুক নিয়ে দুগাছা গুলি ভরে তাতে চোট করলেই তারা অক্কা পাবে। তখনও হনুমান মারাটা অবশ্য বিধর্মীর কাজ বলে গণ্য হত না।

আমি নিজেও বহু জায়গাতে বহু অসভ্য হনুমান মেরেছি। পূর্ব ভারতের কোথাও হনুমানকে দেবজ্ঞানে কোনোদিনই পুজো করা হয়নি। তবে, হনুমান তাড়ানোর সবচেয়ে ভালো এবং গানধীয়ান পন্থা হচ্ছে বেশি পরিমাণে খুব কড়া পারগেটিভ ট্যাবলেট কলার খোসার মধ্যে পুরে কলার মধ্যে পুরে কলার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে কানের মধ্যে দিয়ে মরমে পশিয়ে দেওয়ার মতন করে আর কী। ছড়া-ছড়া কলা হুড়োহুড়ি করে তাদের খেতে দেওয়া। পরদিন প্রত্যুষে যা করুণ দৃশ্য দেখা যাবে তা দেখলে বিধর্মী মোচলমানদেরও বড়ই কষ্ট হবে।

আজকাল তো বি জে পি ওয়ালাদের জন্যে, যত পাজিই হোক না কেন, নারীর শ্লীলতানিই করুক আর যাই করুক, কোনো হনুমান মারার কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না। হনু! হনু! হায়! হায়!

কি হনু আমরা!

বাবার সঙ্গে খাসিয়া পাহাড়ের শিলং এবং গারো পাহাড়ের তুরা যাবার জন্যে তো আমি নেচে উঠলাম।

রোগ অথবা নীরোগ যে-কোনো হাতিই হোক, শিকার তো দূরস্থান দর্শন পর্যন্ত এর আগে করিনি জঙ্গলে।

ঠিক সেই জন্যেই দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লাম। যে কোনো অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বঞ্চিত হতে চাইতাম না সুযোগ পেলে। শিশুকাল থেকে এই আমার দোষ অথবা গুণ যাই বলুন ছিল।

মায়ের ভাষায় বললে বাবার মতো এমন "কান্ডজ্ঞানহীন মানুষ" সত্যিই বোধ হয় বেশি হননি। নইলে নেমন্তন্ন হয়েছে বলেই অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতন পাগলা হাতি মারতে রাজি হয়ে গেলেন।

বাবার ভাষায় বলতে গেলে, মূলত ক্যানিং গোসাবা বোট কোম্পানির মালিক গোপেন বাগচী মশাইয়ের ভাষায় আমার মায়ের মতন "High voltage resistance" নাকি ভূ-ভারতে আর ছিলেন না।

এইরকম বাবা এবং মায়ের তাবৎ প্রবাহ আমার মতন সদ্য যুবকের শরীরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়াতে আমি একেবারে হাই-টেনসান তামার তারের মতো হয়ে উঠেছিলাম। পাঠক! আমাকে মালা অথবা বালা করে পরলে আপনার বাত নির্ঘাৎ সেরে যাবে। পাঠিকারা কী করলে কী হবে তা বলতে পারব না।

সেবারেও মুখার্জি জ্যেঠু 'পিক' হোটেলেই ছিলেন শিলঙয়ে।

প্লেনে, গৌহাটি হয়ে আমরা বমি করি-করি অবস্থাতে পৌঁছোলাম গিয়ে। উনিশশো চুয়ান্নতে শিলঙয়ের পথ আজকের মতো ছিল না।

বাবার কাজ শেষ হলে আমরা ওখান থেকে গৌহাটি এলাম গাড়িতে। সেখানে থেকে ট্রান্সপোর্ট বদলে জিপে করে আমরা এলাম তুরাতে—গারো পাহাড় জেলার রাজধানী।

বড়ো সুন্দর লাগল গারো পাহাড়, বছরের সময়টিতে। অবশ্য চৈত্রশেষে ভারতের সব বনাঞ্চলই সুন্দর। চৈত্রের শেষ, বৈশাখের প্রথম দু-পাশেই জুম চাষ করার জন্যে জঙ্গলে আগুন দিয়েছে গারোরা। আগুনে পুড়ে গেছে জঙ্গল। কালো হয়ে রয়েছে ভস্মাবশেষ। আর সেই পুড়ে-যাওয়া নানারকম প্যাস্টেল রঙা কালো শেডস-এর জঙ্গলে অগণ্য মোরগ-মুরগি খুঁটে খুঁটে পোকা খাচ্ছে। আর তাদের মাথার উপর উড়ছে নানারকম রঙিন ফ্লাইক্যাচার পাখি, উড়ো-পোকা কপাকপ ধরে খাওয়ার জন্যে।

সে এক চোখ-কাড়া দৃশ্য!

জিপে বসেই শট-গান দিয়ে কিছু মোরগা-মুরগি মারলাম আমাদের খাওয়ার জন্যে। Pot-Hunting। তারপর তুরা সার্কিট হাউসে গিয়ে আমরা উঠলাম।

এখন ভাবলে মনে হয় যে, তখনকার দিনে যে কোনো সার্কিট হাউসের অবস্থানই যে কী সুন্দর ছিল। প্রতিটি ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স-এর সম্ভবত সবচেয়ে ভালো জায়গাটুকু বেছে নিয়ে সেখানে

সার্কিট হাউস করা হত। এমনভাবে তৈরি করা হত যে বহু রছরের ব্যবহারে আদৌ ক্ষয়ক্ষতি হত বলেও মনে হয় না। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে তখন সরকারি তহবিল থেকে যা কিছু খরচা হত, তা যে কারণে যে তহবিল থেকে বরাদ্দ হত, তার পুরোটাই শুধুমাত্র নির্ধারিত কারণেই ব্যয়িত হত। সরকারি আমলা বা ঠিকাদারেরা সেই বরাদ্দের সিংহভাগই তখন পকেটস্থ করতেন না।

অথচ ইংরেজরা এসেছিলেন আমাদের দেশ শোষণ করতে।

আমরা নিজেরা নিজেদের রক্ত যেভাবে শোষণ করছি তার নজির বোধহয় পৃথিবীর কম জায়গাতেই আছে।

যাই হোক, মুখার্জি জেঠু বললেন, আমি ওসব হাতি-ফাতি মারতে গিয়ে হাতির লাথি খেয়ে মরবার মধ্যে নেই গুহ। আমি সার্কিট হাউসের হাতার মধ্যে পায়চারি করব, খাবদাব। বহুদিন ধরে পড়ব পড়ব করে পড়া হয়নি এমন বই এনেছি কিছু সঙ্গে। নিরিবিলিতে সেগুলো পড়ব। আপনি যান লালাকে নিয়ে।

এও এক আজ্ঞা বলতে হবে। কারণ মুখার্জি জেঠু যেহেতু বাবার প্রাক্তন বস ছিলেন, তাঁর আজ্ঞাতে পাগলা হাতি মারাটাও অবশ্য কর্তব্য। তবে সে হাতি যথাযথই পাগলা ছিল, না মুখার্জি জেঠুর মতো Pseudo পাগলা, তা তো জানা ছিল না।

আমরা জিপে করে মাইল দশেক গিয়ে তুরার পথ ছেড়ে উৎরাই নেমে, বাঁদিকের একটি কাঁচা রাস্তাতে মাইল দশেক গেলাম গাইডের নির্দেশ মতো। ছোটো একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছোনো হল। গ্রামটির নাম আজ আর মনে নেই। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার কথা। আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেছে। সেই গ্রামে জিপ রেখে, গ্রামেই আস্তানা গেড়ে গাইডদের নিয়ে আমরা তিনদিন বাঁশবনে ভরা পাহাড়ে আর উপত্যকায়, নদী পেরিয়ে, বাঁশের কঞ্চিতে আর কাঁটাতে ছিঁড়ে-খুঁড়ে গিয়ে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করলাম। নতুন গাইডদের কথায়, তাদের চোখে তাদের দেওয়া নাকে হাতির গায়ের গন্ধ পেলাম। হাতির পদচিহ্নও দেখলাম বহুবার। হাতির পুরীষও দেখলাম বহু জায়গায়। কোথাও ঠান্ডা, কোথাও ধুঁয়ো উঠছে, কোথাও গরম।

আমাদের ভাগ্যবশত সেই 'রোগ'-হাতি আমাদের দর্শন দিলেন না। দয়াপরবশ হয়েই বলতে হবে। দর্শন দিলে যে কী হত, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

কিন্তু বাবা বলতেন যে, হাতি লোকে কেন মারে জানি না। অত বড়ো জানোয়ার তাছাড়া ম্যামালদের পূর্বপুরুষ। আর অতবড়ো জানোয়ার মারার মধ্যে আর বাহাদুরি কি। গুলি ঠিক জায়গাতে সেঁধোলেই পাহাড়ের মতন হাতিও পড়ে যাবে।

হাতি-শিকার সম্বন্ধে বাবার বরাবরই একটি বিশেষ অসূয়া ছিল। অবশ্য সেকথা 'রোগ এলিফ্যান্টের' বেলায় আদৌ প্রযোজ্য নয়। 'রোগ এলিফ্যান্ট' মারা অত্যন্তই কঠিন। বুনো হাতির সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, শুধুমাত্র তাঁরাই জানেন যে, হাতি শুধুমাত্র তার শুঁড় দিয়েই কী কান্ড করতে পারে এবং অতবড় জানোয়ার যে কীভাবে লুকিয়ে থাকতে পারে বাঘের মতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কী করে অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে। কী ভয়ানক বেগে পাহাড়-নদী পেরিয়ে ছুটে যেতে পারে চার পা তুলে। নিজচোখে না দেখলে বিশ্বাস করার নয়।

আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন আসামের গৌরীপুরের রাজা প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া (লালজী) এবং আমার দুই ভ্রাতৃপ্রতিম চঞ্চল সরকার এবং রঞ্জিত মুখার্জির কাছে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা অনেক শুনেছি। লালজী 'রোগ' হাতিদের সাক্ষাৎ যম। কত 'রোগ' হাতিই যে তাঁরা বিভিন্ন সরকারের অনুরোধে মেরে হাজার হাজার মানুষ আর গবাদি পশু ঘর-বাড়ি আর শস্যকে নিশ্চিত সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

এই লালজীরই মেয়ে পার্বতী বড়ুয়া।

যাই হোক আমাদের হাতি-শিকার খেলা সাঙ্গ হওয়ার পরে বাবা এবং মুখার্জি জেঠু তুরা থেকে ফিরে গেলেন গৌহাটি। গৌহাটি থেকে প্লেন ধরে বাবা কলকাতা ফিরলেন। আর মুখার্জি জেঠু আবার

চলে যাবেন শিলঙয়ে। আমাকে ওঁরা ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে ধুবড়িতে যাওয়ার জন্যে ছেড়ে দিয়ে গেলেন এবং আমি সেইমতো ধুবড়িতে গেলাম।

ধুবড়িতে একদিন আমার পিসেমশাইয়ের দাদা পূর্ণ মিত্রের বাড়িতে থেকে, লজ্‌ঝড় বাসে চড়ে নুড়ি-পাথরে ভরা পথ বেয়ে পৌঁছোলাম ধুবড়ি। গৌরীপুর হয়ে।

তখন লালজীর সঙ্গে আলাপ ছিল না আমার। লালজীর বড়ো দিদি, যাঁকে বড়ো রাজকুমারী বলতেন স্থানীয় মানুষেরা, তাঁর সঙ্গে দু-একবার কলকাতা-রূপসী-রূপসী-কলকাতার প্লেনে ডাকোটাতে আলাপ হয়েছিল। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত সুন্দরী মহিলা। তাঁরই ছেলে মণীন্দ্র বড়ুয়া। হাতি মারতে গিয়ে একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়া জখম করে শেষজীবনে শয্যাশায়ী হয়ে মারা যান। এবং শেষকালে থাকতেনও আমার বাবার রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়ির কাছেই দক্ষিণ কলকাতার বিবেকানন্দ পার্কের পাশে। মণীন্দ্র বড়ুয়ার ডাক নাম ছিল মণি।

যাই হোক, তামাহাটে তখন একটি হাট বসতো। নামও হয়েছিল তামাহাট সেই কারণেই। তামাহাটের কথা 'ঋভু'র প্রথম পর্বে এবং "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে"র প্রথম পর্বেও এতো বলেছি যে এখানে আর পুনরাবৃত্তি করাটা শোভন হবে না।

যখনকার কথা বলছি তার কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানে দেশভাগের আগে পর্যন্ত, পূর্ববঙ্গের যত পাট ওই তামারহাটের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গঙ্গাধর নদী হয়ে মহাজনী নৌকা করে ধুবড়ি শহরে আসত। সেখানে থেকে স্টিমারে করে অন্যত্র চালান হত। তখন তো যোগাযোগ ব্যবস্থা এতো ভালো ছিল না কোথাওই, সেইজন্যে প্রত্যন্ত প্রদেশের জিনিসপত্রের দাম তখন খুবই শস্তা ছিল গ্রামাঞ্চলে এবং এতোই অঢেল ছিল যে, বলবার নয়। বড়োবড়ো মহাশোল মাছ সোনালি আঁশের, ঝুড়িঝুড়ি কমলালেবু, সুন্দর সুগন্ধি চাল, হাঁস-মুরগি—সে এক স্বর্গরাজ্য ছিল।

রংপুর বরিশাল বিন্ধ্যাচল ও তারপরে তামারহাটেও কিছুদিন থাকাতে আমি যেন বাংলা, উত্তরপ্রদেশ ও নিম্ন আসামের গ্রাম প্রকৃতির সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হলাম, নতুন করে প্রেমে পড়লাম।

তেমন বেশিদিনের জন্যে গ্রামবাংলায় আমার কোনোদিনই থাকা হয়নি শিশুকালে। রংপুর এবং বরিশালে। রংপুরেও থাকতাম শহরের প্রান্তে আর বরিশালেও মুখ্যত তাই। রংপুর বরিশাল এবং তামারহাটে প্রথম আমাকে প্রকৃতি-সচেতন করে তোলে। এক প্রগাঢ় সখ্যতা এবং প্রকৃতিপ্রেম আমার মধ্যে গড়ে ওঠে অবচেতনে।

তামারহাট থেকে গৌরীপুর আসতে একটি ছোটো গ্রাম পড়ে, তার নাম কুমারগঞ্জ। সেই কুমারগঞ্জ থেকে তামারহাটের দিকে আসার পথের উপরে, পরে অথবা আগে একটি ছড়ানো পাহাড় ছিল, তার নাম আলোকঝারি। এই আলোকঝারি নামটি, সেই কবি-ভাবাপন্ন আমার মনকে এতোই আচ্ছন্ন করত যে ওই পটভূমিতে একটি উপন্যাস, ওই 'আলোকঝারি' নাম দিয়ে লিখেছি।

আলোকঝারিতে যেতাম সাইকেল চড়ে। অবশ্য পাহাড়ে উঠতে হত সাইকেল ঠেলে ঠেলে। ওখানে টুঙ বাগান ছিল। সেসব কথা বোধহয় লিখেছি প্রথম খন্ডতে 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে'র।

তামারহাটে তখন কড়িদা ছিলেন। তিনকড়ি মিত্র। পিসেমশাইয়ের আরেক দাদার একমাত্র পুত্র। কড়িদার বিধবা মা, আমাদের জেঠিমা থাকতেন কুমারগঞ্জে। সবসময়েই হাসিমুখ। জেঠিমার তিন পুত্র জন্মবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনটি কড়ি দিয়ে তাঁকে কিনে নেন, তাই তিনকড়ি।

তরুণ-তরুণী পাঠক-পাঠিকারা "এক কড়ি", "দুকড়ি", "পাঁচকড়ি", "সাতকড়ি," নাম শুনে থাকতে পারেন কিন্তু সেই নামের ব্যাখ্যা জানেন না বলেই এই ব্যাখ্যা দিলাম।

কড়িদা আমার চেয়ে বছর খানেকের বড়ো ছিল। আমার পিসতুতোভাই ঝন্টুরই (প্রণবকুমার মিত্র) মতো কুচবিহারের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করত। ঝন্টুর সবচেয়ে ছোটো ভাই বাপ্পু হোস্টেলে থেকে পড়ত। স্কুল-কলেজ ছুটি হলেই তারা বাড়িতে এসে ভালোটা-মন্দটা খেত, আদরের সঙ্গে। আরাম করত। পিসতুতো বোন ববিও (জয়া) সেবারে তামারহাটেই ছিল। ববি আমার চেয়ে দুমাসের

বড়ো ছিল বয়সে এবং সেই দাবিতে আমাকে দিয়ে জোর করেই "দিদি" বলিয়ে নিত। পরে ববিদিদি কলকাতাতে বাবার রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে ছিল বেশ কয়েকবছর তার বিয়ের আগে পর্যন্ত।

আমি কড়িদা, আর ঝন্টু সারা দিন সাইকেল ঠেঙিয়ে রাঙামাটি-আলোকঝারি পর্বতজুয়ারের পাহাড় আর মেচ-বস্তিতে ঘুরে বেড়াতাম। কখনও বা নৌকোতে গঙ্গাধর নদীতেও। আমার পিসেমশাইয়ের ধুবড়ির দাদা পূর্ণ জেঠুর বন্দুকটা মারত "ফ্যাসকেলাস" কিন্তু ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের উড়ান এরই মতন মাঝে মাঝেই "টেকনিক্যাল-ফল্ট"-এ উইদাউট নোটিশ পীড়িত হত। ডানপিঠের ব্যারেল ফায়ার করার পরে ফাঁকা কার্তুজটা বেরোতে বেজায় গাঁইগুঁই করতো। ব্যারেলের মধ্যে যে কী আঠা ছিল তা সে গুলিরাই জানত। বন্দুকে ইজেক্টরও ছিল না। তাই ঝন্টু একটি বাঁশের মোটা কঞ্চি ব্যারেলের দৈর্ঘ্যের সমান করে কেটে সঙ্গে রাখত। ফাঁকা কার্তুজ বেরুতে বেগড়বাঁই করলেই বন্দুকের ব্রিচটা ভেঙে, নলের মুখ দিয়ে বাঁশের সেই কঞ্চি ঢুকিয়ে গুতিয়ে গুঁতিয়ে ফাঁকা কার্তুজকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত। ফাঁকা কার্তুজ মাটিতে পড়লেই বাপ্পু তা কুড়িয়ে নিয়ে বারুদের গন্ধ শুঁকত দু'নাক ভরে। তার চোখমুখে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। নানারঙা ফাঁকা কার্তুজ জমানোই ছিল বাপ্পুর নেশা।

বাপ্পু ও ঝন্টু দুজনেই আমাকে 'লালাদা' না বলে 'লালদা' বলে ডাকত। পরবর্তী সময়ে অনেকেই লালদা বলে ডাকত আমাকে বা লালাসাহেব। কিন্তু লালার আকার কর্তন করে লালদা বলে ওরাই প্রথমে সম্বোধন করে।

বাপ্পু পরিণত বয়সে দিল্লিতে চলে যায়। আভেরি লিমিটেডের ফরিদাবাদের ফ্যাক্টরির অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিল। কয়েকবছর আগে হঠাৎ আনডায়গনাইজড রোগে সে মারা যায়। মৃত্যুর আগে ধরা পড়ে যে, হাইলি-ডায়াবেটিক ছিল। তখন আর কিছুই করার উপায় ছিল না। এই জীবন বড়ো গোলমেলে। এই পৃথিবীতে আসার সময়ের হিসেব রাখা সহজ কিন্তু যাবার বেলাতে ক্রম-এর কোনোই বালাই নেই।

কড়িদা পরে কলকাতাতে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বিকম পড়ে। থাকত ভবানীপুরে, গোবিন্দ বোস লেনের ভাড়াবাড়িতে। গঙ্গার নালার কাছে। সকলে মিলে।

পূর্ণ জেঠু মানে আমার পিসেমশাই-এর দাদা শ্রীপূর্ণ মিত্র যাঁব কথা একটু আগেই বলেছি, তাঁর দোনলা বন্দুকটি ছিল সম্ভবত চেকোস্লোভোকিয়ান অথবা স্প্যানিশ। তখনও ইন্ডিয়ান অর্ডনান্স কোম্পানি পয়েন্ট বারো বোরের শটগান বা পয়েন্ট তিনশো পনেরো বোরের রাইফেল বানানো আরম্ভ করেনি। সব বন্দুক-রাইফেলই বিদেশ থেকে আমদানি হত। তবে দেশে যে বন্দুক তৈরি একেবারেই হত না তা নয়। বিহরের মুঙ্গের ইত্যাদি অঞ্চলে এবং অন্যত্র হত। তবে, সেসবের অধিকাংশই ছিল টোপিওয়ালা গাদা বন্দুক। সেই সব বন্দুকে , হাজারিবাগ শহরের কিছু দূরের কুসুমভা বস্তির বিখ্যাত শিকারি কাড়ুয়ার ভাষায় "হুম্মচ্‌কে দো-আংগলি কসকে" মানে, কষে দু'আঙুল বারুদ ঠুসে দিয়ে তার সামলে সিসের বল দিয়ে বহুবিধ কেষ্টর জীবের ইহলীলা সাঙ্গ করা হত।

গাদা বন্দুকের সঙ্গে কিন্তু আমার কোনোদিনও পিরিত ছিল না। পরবর্তী জীবনে একবারই হাজারিবাগ জেলার বিহরের চাতরা সাবডিভিশনের জঙ্গলের এক ইয়ারের গাদা বন্দুক ফুটিয়ে ডানদিকের গাল পড়ে গেছিল এবং ডানদিকের কলার-বোনেও চিড় ধরে গেছিল।

পূর্ণ জেঠু দয়াপরবশ হয়ে আমাকে তাঁর বন্দুকটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। সেইসময়ে আমাদের দেশের কোনো আইনই আজকের মতন "বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো" হয়ে যায়নি। আইনের ক্ষেত্রেও অনেকানেক ছাড় ছিল, উদ্দেশ্য-অপ্রণোদিত অন্ধত্ব ছিল। বিশেষ করে, পিসেমশাইর দাদা যদি দয়াপরবশে তাঁর ভাইয়েরর শালার ছেলেকে নিজের লাইসেন্সড বন্দুকটি শিকার শিকার খেলা করার জন্যে ধার দিতেন তাতে ইন্ডিয়ান আর্মস অ্যাক্ট তখন আদৌ লঙ্ঘিত হয়েছে এমন কেউই মনে করতেন না।

আমার নিজের নামে তখনও কোনো বন্দুক-রাইফেল ছিল না। সেকেন্ড লাইসেন্সও ছিল না। যদিও সে-বছরই পরে দুই-ই হয়, বাবার দয়ায়। মানুষে "মায়ের দয়া" তে বহুত কষ্ট পায়, আমি কিন্তু আমার "বাবার দয়া"তে বিস্তর এবং বহুবিধ আনন্দ-আহ্লাদ করে নিয়েছি এই জীবনে।

কড়িদা বিকম পাশ করার পরে বাবার ফার্মেই আর্টিকল্ড ক্লার্ক হয় সি এ পড়ার জন্যে। ইন্টারমিডিয়েট সি এ পাশ করে ফাইনালেও বসে। বিয়ে করে চমৎকার মেয়ে অপরাজিতাকে। সেই সময়েই কড়িদার ইউরিন ব্লাডারে ক্যানসার ধরা পড়ে। গড়িয়াহাটের প্রেসিডেন্সি নার্সিং হোমে অপারেশন হয়, কিন্তু জ্ঞান আর ফেরেনি।

সবসময়ে হাসিখুশি বাপ্পু ও কড়িদা আজ নেই। কড়িদার মতো পরোপকারী সদাহাস্যময় শতকরা একশো ভাগ ভালো প্রকৃতার্থে অজাতশত্রু মানুষ বড়ো কমই দেখেছি এ জীবনে। কড়িদা যখন মারা যায় তখন তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে হয়ত। হয়ত অতও হবে না।

ঝন্টুর যে এঞ্জিনিয়ারিঙে "ন্যাক" ছিল তা তার বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ফোটা-কার্তুজ বের করা দেখেই আঁচ করেছিলাম। এখন সে নিজে ফার্ম করেছে। ও এখন ধানবাদ হাজারিবাগ ও রাঁচি জেলার বহুতই জায়গা আর বরানগরের বাড়ির মধ্যে শাটল করে। খুব গাড়ির শখ ওর। টাটামোবিল এবং অন্যান্য গাড়িও আছে। টাটা-সুমো নেবারও মতলবে আছে। ওর বড়ো ছেলে মুকুটও এঞ্জিনিয়ার। বম্বের একটি কম্পানিতে জয়েন করেছে। ছোটো ছেলে 'ছোটে'র কবি হওয়ার শখ। তাই সবসময়েই বাড়িতে গঞ্জনা সহ্য করে স্কুলের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তবে "কাব্যিরোগে" এখনও জর্জরিত।

তামারহাটে এবং তার চারপাশের নানা-জায়গা নিয়ে 'ঋভু'-র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে এবং 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'তে এতো লিখেছি যে সে কারণেই এখানে আর বেশি কিছু বলতে চাই না। তামারহাট-কুমারগঞ্জ গৌরীপুর-ধুবড়ি রাঙামাটি আলোকঝারি পর্বতজুয়ার বরবাধা যমদুয়ারের কথা একবার শুরু করলে আর থামতে ইচ্ছে করে না। নস্টালজিক হয়ে পড়ি। কত মানুষের কত স্মৃতি, কত ভালবাসা।

পিসিমার এক ভাসুরপোব (ভানুদা) মেয়ের নাম ছিল শেলি। পিসিমা ডাকতেন শিলু। কালোর মধ্যে ভারি মিষ্টি, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ছিল। সে মাঝে মাঝেই তাদের বাড়ি থেকে ধূলিধূসরিত চৈত্রের রোদে পথ বেয়ে হেঁটে আসত পিসিমার কাছে কোনো খবর দিতে বা নিতে বা এমনিই। তার তখন চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স বা আরও কম। আমার বয়স তখন উনিশ-কুড়ি। রোদে হেঁটে এসে সে দাঁড়াত। হয় ফুলভর্তি রঙ্গন গাছটার পাশে, নয়তো গন্ধরাজ গাছটার পাশে। সে আসত সদ্যস্নাতা। চুল খুলে আসত শেলি। রোদে হেঁটে আসাতে তার ফলসা-রঙা নাকে ঘামের গুঁড়ি-গুঁড়ি ফোঁটা জমত। সে আমার দিকে মুখ তুলে চাইত না। আমি কিন্তু অনিমিষে চেয়ে থাকতাম তার মুখে। চোখ না তুলেই আমার দৃষ্টির পরশ অনুভব কর৩ ও। মানে, সব মেয়েরাই যেমন পারে। অনুভব করত আর চাপা বিরক্তি অথবা উত্তেজনাতে চটির মধ্যে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে ঘষত।

খুব ভালো লাগত আমার ওকে। ওর সুন্দর দুটি ভুরু কুঁচকে যেত।

কে জানে, হয়তো সেই বিরক্তির অন্য কোনো নামও ছিল।

আজকে শেলি কুচবিহারে একটি স্কুলের শিক্ষিকা। তার স্বামী কুচবিহারের একজন জনপ্রিয় এবং সুপণ্ডিত অধ্যাপক। শেলিকে দেখিনি আর উনিশশো চুয়ান্নর পরে। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর। দেখতে আর ইচ্ছেও নেই। শেলি নিজে তো জানেই না, জানেন না পিসিমা কী ববিদিদি কী ঝন্টুও যে, মনের ফ্রেমে নিম্ন আসামের সেই বৃষ্টি-স্নাত রৌদ্র-দগ্ধ শেষ বিকেলে রঙ্গন আর গন্ধরাজ গাছেদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্রক-পরা ছিপছিপে শেলির ছবিটা মৌটুসি পাখিদের কিসকিস ফিসফিস আওয়াজের সঙ্গে রূপে, রসে, গন্ধে মিশে আমার চেতনাতে কী দুর্দান্ত জীবন্ত ও সত্যি হয়ে আছে এবং থাকবে যতদিন বাঁচি।

প্রত্যেক নাবী ও পুরুষই জীবনের বিভিন্ন সময়ে কত মানুষকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা ভালোলাগার কত যে রকম হয়, তা কেই বা বলতে পারে।

কলেজের সহপাঠী 'আমাব সঙ্গে তোমার দেখা হবে গতকাল' কবিতা লেখা কবির (যার কথা ঋভুর প্রথম পর্বে আছে) দেওঘরের নন্দনকাননের পথের উপরে জেঠামশাইয়ের বাড়ির পাশের বাড়িতে লণ্ঠনের আলোতে দেখা সেই গায়িকা তিন বোনের পাণ্ডুর, ম্লান কিন্তু সুন্দর কম্পমান ছবি যেমন আজও আমার চোখের মণিতে কাঁপে তিরতির করে, মুছে যেতে যেতেও বেঁচে যায়, চুয়াল্লিশ বছর পরে, তেমনই শেলির ছবিটাও ঝকঝক করে। পাখি ওড়ে, ভ্রমর গুনগুনায় হাওয়াতে ফুল নড়ে, পাতা,

পাটগুদাম থেকে আষাঢ়ের মেঘে ও রোদে উষ্ণ-হওয়া পাটের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোয় আজও আর শেলি দাঁড়িয়ে থাকে চোখ নামিয়ে। দাঁড়িয়ে থাকে আমার চোখের সামনে।

যুগের পর যুগ বয়ে যায়, কিন্তু শেলির ছবিটি অনড়।

ভাবলেও দুঃখ হয় যে, শেলি কোনোদিন জানলোও না যে সে আমার হৃদয়ের নীরব অর্ঘ্য পেয়েছিল। পেয়েছিল এক অস্ফুট, আশ্চর্য ভালোবাসা, যার বিন্দুমাত্র দাম নেই এই ব্যস্ত, শরীর-সর্বস্ব কেরিয়ার-মগ্ন অর্থগৃধ্নু পৃথিবীর কাছে।

এখন জীবনের পথের শেষে পৌঁছে মনে হয় যে, সেই সব অস্ফুট, অব্যক্ত ভালোবাসাই উৎকৃষ্টতম ভালোবাসা যা অপ্রকাশিত থাকে, থাকে অপ্রস্ফুটিত, কাকা সম্পর্কের একটি দূরাত্মীয় উনিশ বছরের যুবকের বুকের সুগন্ধি ভাবনা হয়ে, তেরো-চোদ্দো বছরের এক কিশোরীর শেষরাতের বেগুনি-রঙা স্বপ্নে সিক্ত।

পাঠক, আপনারা কি এমন ভালোবাসার কথা জানেন? মানেন না যে, তা তো আমিও জানি। কিন্তু জানেনও না কি?

সত্যি! আমরা যে কী সুন্দর, শান্ত স্নিগ্ধ, নির্লোভ, সুগন্ধি এবং নির্জন এক পৃথিবীর বাসিন্দা ছিলাম। যে পৃথিবীর কথা, যে মানসিকতার কথা আজকের পৃথিবীর এই দাঁতে দাঁত-কামড়ে প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত মানুষেরা ভাবতেও পারবেন না।

শেলিকে ইচ্ছে করলেই দেখতে পারি। কুচবিহার থেকে অনেকবার নেমন্তন্নও পেয়েছি সাহিত্যবাসরের। একবার আমি যাব একথা লোকমুখে শুনে শেলিও নাকি এসেছিল সার্কিট হাউসে খোঁজ করতে।

ভাগ্যিস আমি যাইনি সেবারে।

ভবিষ্যতে কুচবিহারে গেলেও শেলিব স্বামীর সঙ্গে দেখা কবব কিন্তু শেলির সঙ্গে করব না। সেই সকালবেলার ছবিটা আমার চোখে তেমনই থাকুক। তাকে আর নড়াতে চাই না একটুও। আর ক'দিনই বা এই দুটি চোখ চেয়ে থাকবে এই পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্যব দিকে? এমন পাগলের মতো? দিন তো বেশি বাকি নেই।

জীবনটা বড়োই ছোটো। পেছন ফিরে চাইলে মনে হয় এইতো সেদিন উত্তর-বাংলার রংপুরের ধাপ-এর পাঠশালাতে পড়তাম। পণ্ডিতমশাই বেত হাতে মাটিতে বসে পোড়োদের পড়াতেন। ডিমলার রাজার বাড়ির পেটা ঘড়িতে প্রহরে প্রহরে ঘন্টা বাজত। আস্তাবল থেকে ঘোড়ার হ্রেষারব ভেসে আসত। শীতের রোদ তেরছা হয়ে এসে পড়ত চোতরা বনের উপরে গোলা কাঁটালের গাছে। লাল গোরু আর কালোছাগল চরত পাঠশালার হাতাতে। তারা গাঢ় সবুজ মুথাঘাস খেত কুচুক শব্দ করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। কুয়োতলিতে কারো জলতোলার শব্দ উঠত। বড় রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ শোনা যেত আর উদলা গায়ে আধলা শাড়ি জড়িয়ে বুলবুলি, আমার ভালোবাসার কিশোরী বুলবুলি নিজের মনে নিচুগলায় গান গাইতে গাইতে তার সাদা-রঙের ছাগলছানাটি বুকে করে চলে যেত শংকামারী শ্মশানের দিকে, সব মানুষকেই যেদিকে যেতে হবে, আজ আর কাল।

কত সুখ, কত স্মৃতি কত মিলন, কত বিরহ, কত হাসি, কত গান, কত মান-অভিমান আনন্দ, একা থাকলেই মনে ভিড় করে আসে। দুঃখ, হতাশা, অথবা তিক্ততাও যে ছিল না তা নয়, আছেও। অনেক অপমান এবং চক্রান্তও। কিন্তু আশ্চর্য। সেই সব মনে একেবারেই আসে না। শুধু সুন্দরেই মন ভরে থাকে আমার।

শেষের প্রহরেও যেন তাই থাকে। এইটুকুই প্রার্থনা।

বি কম-এর ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে। সকালে ক্লাস। আমাদের ব্যাচ উনিশশো চুয়ান্নর। তারই দু-একবছর আগে সম্ভবত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সকালের বি কম ক্লাস শুরু হয়েছিল।

আমরা যারা ইন্টারমিডিয়েট কমার্সে সেন্ট জেভিয়ার্সে ছিলাম তারা তো এলামই, বাইরের নানান কলেজ থেকেও বেশ কিছু ছেলে এসে আমাদের সঙ্গে বি কমের ক্লাস শুরু করল। ফাদার পি জরিস কমার্স ডিপার্টমেন্টের প্রিফেক্ট। ফরাসি দেশীয়। পড়াতেনও ফ্রেঞ্চ।

ফাদার স্কেফার্সের নিকেল করা গোল ফ্রেমের চশমাকে তাঁকে আন্ডারগ্রাউন্ডের আদর্শবাদ বুদ্ধিজীবী নেতা বলেও মনে করা যেত এবং অবশ্যই অধ্যাপক বলে। কিন্তু ফাদার জরিস ছিলেন রীতিমতো গাঁট্টাগোট্টা হাট্টাকাট্টা। পাদ্রির সাদা পোশাকের খোলস ছাড়িয়ে দেখলে মনে হতে পারত সকার টিমের স্টপার। তিনি চরকির মতন ঘুরে বেড়াতেন করিডরে করিডরে। এ ক্লাসরুম থেকে সে ক্লাসরুমে। বান্ডল অফ এনার্জি। কিন্তু জগৎ সংসারের নিয়ম এই যে একাধিক 'এনার্জি' একই আধারে অথবা বেশি কাছাকাছি থাকলেই সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই আমা-হেন "মেধাবী" ছাত্রের সঙ্গে তাঁর সংঘাত লাগত প্রায়ই। আমাদের সময়ে শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সঙ্ঘর্ষ ঠিক হত না সংঘাতও নয়। ছাত্রও অধ্যাপকদের মধ্যে তখন সবকিছুই ছিল পুরোপুরি একতরফা। মনে মনে আস্ফালন করতাম অন্যায় ঘটেছে বা ঘটছে, এমন মনে হলেও কিন্তু বাইরে তার বহিঃপ্রকাশের উপায় ছিল না। আমাদের প্রজন্মের তেমন শিক্ষাও ছিল না। বেদবাক্য, পিতৃবাক্য এবং গুরুবাক্যের ভার তখন সামানই ছিল। সবকিছুকেই মান্য করাটা, একধরনের ন্যক্কারজনক সর্বজনমান্য অভ্যেস ছিল আমাদের সময়ে প্রায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরই। সেটা মানবচরিত্রের স্বাস্থ্যর পক্ষে আদৌ ইপ্সিত ছিল কি না তা' অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। সকলেই ছিল "গুডি-গুডি" টাইপ। সেন্ট জেভিয়ার্সের নিরুত্তাপ নিয়মানুবর্তী পরিবেশের প্রেক্ষিতে ফেলে আসা তীর্থপতি ইনস্টিট্যুশনের তুমুল হই-হল্লা ও বেআদপির দিনগুলির কথা মনে হত। এই মান্যতারও যেমন ভালো দিক ছিল সেই অমান্যতারও অবশ্যই ভালো দিক ছিল অনেক।

সকলে বি কমের ক্লাস করি। দুপুরে অফিস। বিকেলে টেনিস খেলি দক্ষিণ কলিকাতা সংসদে। দেশপ্রিয় পার্কে। তখন সে ক্লাবের হার্ডকোর্ট ছিল না একটিও। শুধুই চারটি গ্রাস কোর্ট। তখন বয়স্ক মানুষেরাই বেশি আসতেন টেনিস খেলতে। গল্ফেরই মতো ওইসব খেলতে তরুণেরা আজকের মতন এমন ভিড় জমাতেন না। যাঁরা প্রতিযোগিতামূলক খেলা খেলতেন তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা ছিল। তৎকালীন দক্ষিণ কলিকাতা সংসদের টেনিস খেলার মাঠে আমিই সম্ভবত কনিষ্ঠতম ছিলাম। সে কারণে সকলের স্নেহও পেতাম উকিল সরকারি কর্মচারী অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে ইত্যাদির। মাত্র একজন মহিলা খেলতেন। শাড়ি পরে। আমার মা-মাসির বয়সী। নাম ভুলে গেছি। ভারি ভালো ছিলেন তিনি। সুন্দর হার্দ্য পরিবেশ ছিল ওই ক্লাবে এবং তখন ওই ক্লাবের বাংলা বইয়ের লাইব্রেরিটিও ছিল চমৎকার।

সেই সময়ের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত বাঙালিরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রকৃত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন। বাঙালি সংস্কৃতি সাহিত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের গভীর মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা ছিল, গভীরতা ছিল চরিত্রে। অর্থহীন চাপল্যে সর্বগ্রাসী দূরদর্শনের নেশায় বুড়ির-চুল লোলুপ কিশোর কিশোরীর মতন তাঁরা তখন আজকের বাঙালিদের মতো এমন করে তাঁদের বাঙালিয়ানাকে এবং বাঙালির একুল-ওকুল দু-কুলকেই প্রশ্নাতীতভাবে নষ্ট করেনি। অর্থই মানুষের একমাত্র পরিচায়ক হয়ে

ওঠেনি। এখন যেমন কী নিম্নবিত্ত কী উচ্চবিত্ত প্রায় প্রত্যেকেরই মনের গভীরতার ঘরে, সংস্কৃতি-সাহিত্য-সঙ্গীতের ঘরে, প্রায় শূন্য বিরাজ করে, তখন ছবিটি একেবারেই অন্যরকম ছিল। জানি না, এমনটি কেন শুধুমাত্র বাঙালিরাই ঘটালেন। তখন আমরা বাঙালি বলে ন্যায্যতই এক বিশেষ গর্ববোধ করতাম।

ঢাকুরিয়া লেকের কাছে রাজা বসন্ত রায় রোড এক্সটেনশান তামিলভাষীরা 'থিয়াগারাজা' হল তৈরি করেছিলেন ওই সময়েই ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট থেকে জমি নিয়ে। কলকাতার সকলের কাছে, বাঙালি অবাঙালি প্রত্যেকেরই কাছ থেকে চাঁদা তুলে। সেই থিয়াগারাজ হলো দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতের নানান অনুষ্ঠান হয় 'রসিকারঞ্জনা সভা'র উদ্যোগে। দলে দলে দক্ষিণ ভারতীয় পুরুষদের সাদা ধুতি লুঙির মতো করে পরে আর তার উপরে সাদা শার্ট চাপিয়ে আর মেয়েরা কাঞ্জিভরম বা তাঞ্জোর সিল্কের রঙ-বেরঙা শাড়িতে সেজে, চুলে বা বেণীতে ফুল গুঁজে সেই সব অনুষ্ঠান আজও শুনতে যান। দেখে ভালো লাগে ওঁদের। নিজেদের জন্যে মন খারাপ করে।

ওঁরা "থিয়াগরাজা হল" করলেন, মারাঠিরা হাজরা রোডের কাছে "মহারাষ্ট্র নিবাস" করলেন, অন্ধ্রের মানুষেরা শরৎ ব্যানার্জি রোডে নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে "মাইসোর হল" বানালেন আর কলকাতা আদি বাসিন্দা পায়রা ওড়ানো, বেড়ালের বিয়ে দেওয়া ও বাইজি-বিলাসী আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলাম। যদি সেই বাবু-কালচারও বাঁচিয়ে বাখতে পারতাম তাহলেও না হয় জানতাম আমরা ট্রাডিশানে বিশ্বাস করি।

তখন তো বাঙালিদের মধ্যে বড়োলোক কম ছিলেন না। সবকিছুই মালিকই তো বাঙালিরাই ছিলেন। চা-বাগান, কয়লাখনি, বাড়ি-জমি, নানা শিল্প-ব্যবসাব সিংহভাগ অথচ নিজেদের জন্যে কিছুমাত্রই করলাম না আমরা।

এই আমরাই আজকে মেয়ের বিয়ে দিই পরমানন্দে "থিয়াগারাজা হল"-এ, নাতির অন্নপ্রাশন বা ছেলের পইতের অনুষ্ঠান করি "মাইসোর হল" বা "মহাবাষ্ট্র নিবাসে।"আমাদের লজ্জাবোধও বোধহয় আর অবশিষ্ট নেই কোনো। আজকে আর এইসব নিয়ে আলোচনা করেও লাভ নেই কিছু। সময় পেরিয়ে গেছে। সময়ে কর্তব্যকর্ম না করলে, জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই পরে আর কিছুই করা হয়ে ওঠে না। আমরা, আজকের বাঙালিরা তো সবার্থেই ভিখিবি। মাড়োয়ারি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি হোয়াইট কালার্ড চাকর।

এসব মনে হলেই বড়ো উষ্মা হয়, উত্তেজিত বোধ করি। তবে এসব অতৃপ্তি মন থেকে ঝেড়ে ফেলাই ভালো। নিজেকে বলি মনে মনে । এই ভিখিবি মানসিকতার, সমস্ত ব্যাপারেই সরকারের মুখ-চাওয়া আজকের বাঙালিদেব পথের ধুলোতেই ফেলে রেখে, আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পিছনের সময়েই ফিরে যাই, যে মধুর এবং গৌরবের সময়ের কথা বলছিলাম সেই সময়ে।

দেশপ্রিয় পার্কে দক্ষিণ কলিকাতা সংসদ আজও আছে। তাব রমরমা অনেকই বেড়েছে। টেনিসেব হার্ড কোর্ট হয়েছে, ক্রিকেটের টিম, জানি না, হয়তো ফুটবলেরও। তাস-পাশাও খেলা হয় শুনতে পাই। কিন্তু বাংলা বইয়ের লাইব্রেরিটির কী অবস্থা হয়েছে তা জানতে বড়ো ইচ্ছে করে। তার কি উন্নতি হয়েছে না অবনতি? বইয়ের সংখ্যা কি বেড়েছে? নিয়মিত কেনা হয় কি নতুন বাংলা বই?

এক বিকেলে টেনিস খেলার পর দেশপ্রিয় পার্কের উলটোদিকের বিশ্ববিখ্যাত "সুতৃপ্তি" রেস্তোরাঁতে এক কাপ চা আর একটি ভেজিটেবল চপ খেয়ে বাড়িব দিকে এগোব বলে বেরোলাম। এই সুতৃপ্তি, সেই সময় থেকেই কলেজ স্ট্রিটের কফি-হাউসের মতো উঠতি কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, রাজনীতিকদের মিলনস্থল ছিল। যদিও "আড্ডা" যাকে বলে তা মারার সময় আমার কোনোদিনই ছিল না। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত সেইসব মুখগুলিকে চিনতাম। পরে তাঁদেব মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন।

বেরোলাম বটে, কিন্তু পা দুটি আটকে গেল। হঠাৎই চোখে পড়ল ঝকঝকে নতুন একটি দোতলা দু-নম্বর লেল্যান্ড বাস থেকে এক ভদ্রমহিলা নামলেন। আমার হৃৎপিন্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা বয়সে আমার চেয়ে হয়তো কিছু বড়ো। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, চশমা পরা, পরনে একটি জংলা কাজের

ছাপাশাড়ি। অফ-হোয়াইটের উপরে হালকা সবুজের কাজ। অফ-হোয়াইট ব্লাউজ। গা ধুয়ে বেরিয়েছেন বিকেলে। তাঁর গ্রীবা হেলনের ভঙ্গি, তাঁর মুখশ্রীর অসামান্য সৌন্দর্য তাঁর সুষমামণ্ডিত গাম্ভীর্য এবং তাঁর ঋজু দীর্ঘাঙ্গী শরীর এবং সব ছাপিয়ে তাঁর শালীন ব্যক্তিত্ব আমাকে অতর্কিতে বুকে সফটনোজড বুলেট খাওয়া শিঙাল হরিণেরই মতো চলচ্ছক্তিহীন করে দিল। পথের উপর প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। অমন মারকেই বোধহয় সৌন্দর্যের মার বলে। অথবা "অচানক" মার।

হরিণ হয়তো শুধু শারীরিক কষ্টের কথাই জানে—কিন্তু আমি যে মানুষ। আমার যে কতরকম কষ্ট ছিল এবং আছে কত সব গভীর কষ্ট, শুধু একজন অন্য মানুষ বা মানুষীর পক্ষেই সেই কষ্টর কথা বুঝতে পারা সম্ভব।

নিশিতে ডাকলে যেমন মানুষে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে পথে বেরোয়, শক্ত-সমর্থ শিকারি, এন সি সি করা টেনিস খেলোয়াড় আমিও তেমনই স্লিপ-ওয়াকারের মতোই ভদ্রমহিলার পেছন পেছন চলতে লাগলাম। জ্যোৎস্নারাত নয়, ভরা-বিকেলের আমার মরা-কপালের রাসবিহারী ল্যান্সডাউনের মোড়ে।

ভাগ্যিস তখনও বেলা ছিল, আমার জীবনের বেলাও। আমার চারধারে অগণ্য নারী-পুরুষ, ছিল ট্রাম-বাস গাড়ি। কিন্তু পাঠক ভুলে যাবেন না যে, ওইখানেই কবি জীবনানন্দ দাশ, আমাকে দিনমানে 'নিশি'তে ডাকার কিছুদিন আগেই ট্রামে চাপা পড়ে দেহ রেখেছিলেন। আমার মনে হল হয়তো ওই মহিলাকে অথবা যুবতীকেই দেখে জীবনানন্দ সোজ ট্রামের নিচে চলে গেছিলেন।

সম্ভবত আমার ভাগ্যের ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হল। যুবতী ট্রামলাইনের দিকে না গিয়ে কোণাকুণি ল্যান্সডাউন রোডটি পেরিয়ে ল্যান্সডাউন আর রাসবিহারীর ঠিক মোড়ে লেকের দিকে যেতে এবং সুতৃপ্তির উলটোদিকের ফুটপাতে যে বাড়িটি, সেই বাড়িটিরই দিকে এগিয়ে চললেন।

বাড়িটির সামনে গাড়ি ঘোরানোর জায়গা ছিল। রাসবিহারীর অ্যাভিন্যুর ওই বাড়িটিরই দেওয়ালে বছর পঁচিশেক হল একটি বইয়ের দোকান হয়েছে। "দক্ষিণী বুক এম্পোরিয়াম"।

বাড়িটি কার এবং ভদ্রমহিলার সঙ্গে সে-বাড়ির মালিকের কী সম্পর্ক তাও ঘুণাক্ষরে জানি না। কিন্তু বাড়ির সামনে পৌঁছেই দেখলাম যে, লেখা আছে 'গীতভানু' এবং 'দক্ষিণী'। সেখানে কোন্ কর্ম হয় তা জানা ছিল না। শিশুকাল থেকে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপরেই আমার যত "লীলাখেলা"। অথচ কোনোদিন নজর করে দেখিনি পর্যন্ত যে ওই দুটি সাইনবোর্ড টাঙানো আছে সে বাড়িতে।

উপরে তাকিয়ে চলে ·ং বলেই বাঘের মতো মহাপ্রাণ, মহাবলী প্রাণীও গাছের উপরের মাচায়-বসা ছুছুন্দরের মতন দুবলা-পাতলা শিকারির গুলি খেয়ে মরে যে কেন, তা যেন এতদিনে সম্যক বুঝলাম।

যুবতীর অথবা "বনলতা সেনে"র পেছনে পেছনে চলমান বাঘেরর পেছনে যতখানি দূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণ করতে হয় ঠিক ততটুকু দূরত্ব রেখে এবং যাতে পাবলিকের 'অচানকমার'-এর বলি না হতে হয় সে ভাবনাও মাথাতে রেখে সেই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তেই শুনি হারমোনিয়ামের আর গানের আওয়াজ।

জীবনে তার আগে অমন করে বাঘিনির পেছনে গেলেও কোনোদিনও কোনো বিবশ করা মহিলার পেছনে পেছনে যাইনি। কিন্তু এ মহিলা তো মহিলা নন, ইনি যে সাক্ষাৎ দেবী! এই মর্ত্যভূমিতে যে এমন মেয়েলি মেয়ের এবং চলমান সৌন্দর্যের সংজ্ঞার মুখোমুখি হব তা স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

যুবতী খুব যে একটা ফরসা তাও নন। ওঁর সৌন্দর্য সিনেমার নায়িকাদের মতো আদৌ নয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে যে সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিতা সপ্রতিভ অথচ শিষ্ট মানসীর ধারণা আমার মনের গভীরে গড়ে উঠেছিল, অদেখা লাবণ্যের মতো, শেষের কবিতার পাইনগাছ ঘেরা শিলং শহরের পথে পথে মোটরে ঘোরার সময়ে পথের যে কোনো বাঁকে বাঁকে হঠাৎ দেখতে পাবো ভেবেছিলাম, তাঁরই সঙ্গে যেন দৈবকৃপায় দেখা হয়ে গেল আমাদের সেই চিরচেনা রাসবিহারী ল্যান্সডাউনের মোড়ে।

এই কলকাতাতেই! অহো!

খাকি পোশাক-পরা একটি লোক টুলে বসে ছিল। আমাকে চোরের মতন মহিলার পিছু পিছু ঢুকতে দেখেই আচানক দাঁড়িয়ে উঠে বলল, কী চাই?

আমার চেহারা আর যাই হোক, কোনোদিনই আদৌ চোরের মতো ছিল না। তাই নীরব জবাবে আমি কটমট করে তাকাতেই এবারে বলল সমীহ করে, মানে কাকে চাই?

চাই না কারোকে। কি হয় এখানে?

কি হয় মানে? এটা গানের স্কুল।

কি গান? নাম কি?

"দক্ষিণী", রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুল।

আর "গীতভানু"?

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের স্কুল।

দ্বাররক্ষীকে তো আর শুধোনো যায় না যে এখুনি যে যুবতী ঢুকলেন তাঁর সঙ্গে এইসব স্কুলের সম্পর্কটি কি?

তাই বললাম যে, আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিখব। ফর্ম চাই।

সেই রক্ষী টেনিস-র‍্যাকেট হাতে ঘর্মাক্ত আমার দিকে চেয়ে বললেন এখনই চাই?

এখনই!

মনে মনে বললাম—Right now!

এখন ভরতি হওয়া যাবে তো?

এখনই তো ভরতির সময়।

বলেই রক্ষী আমাকে ভিতরের ছোট্ট অফিসে নিয়ে গেলেন। ঢুকেই দেখলাম, একজন ফরসা, বেঁটে-খাটো সুন্দর সৌম্য চেহারার ভদ্রলোক আদ্দির পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে ছোট্ট টেবলের সামনে বসে আছেন। এবং তাঁরই পাশে সেই যুবতী।

কী যে হয়ে গেল। যাঁকে অনুসরণ করে এসে ঢুকলাম, যাঁকে একবার পূর্ণদৃষ্টিতে পূর্ণ প্রাণে দেখব বলে, তাঁরই মুখের দিকে ভালো করে একবার চাইতেই পারলাম না। আমার বাবা কি আর সাধে আমাকে হোঁদলকুতকুত বলতেন।

হিপপকেট থেকে টাকা বের করে সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণীর ফর্ম ভরতি করে নিজেও ভরতি হয়ে গেলাম। শনিবার রাতে ও রবিবার সকালে ক্লাস। রবীন্দ্রসঙ্গীতের।

রবীন্দ্রনাথকে তো শ্রদ্ধা করতামই। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তো ভালোবাসতামই। স্কুলে পড়াকালীনই অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে, আমার বন্ধু পরেশের প্ররোচনাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই অডিশান দিয়ে ফেল করেছিলাম। রবীন্দ্রসঙ্গীত তো তুলসী লাহিড়ীর অনুজ সানুকাকাও দিলরুবা বাজিয়ে শেখাতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত তো আমার কাছে নতুন কিছু ছিল না। কিন্তু হঠাৎই টেনিস-র‍্যাকেট হাতে নিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে মে মাসের এক প্রখর সন্ধ্যাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুলে সত্যিই ভরতি হয়ে যাব যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, তা পনেরো মিনিট আগেও ভাবতে পারিনি।

মন বলল, অচানকমারের জন্যে তৈরি হও।

সৌন্দর্য, রসিক মানুষমাত্রকে মুগ্ধ করেই। সে সৌন্দর্য প্রাকৃতিকই হোক প্রাণীরই হোক কী মানুষেরই হোক তা জানতাম। কিন্তু রমণীয় সৌন্দর্য যে স্তম্ভিতও করে, পুরুষের বুদ্ধিলোপও করে, মানুষকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করে জিন-পরিদের সৌন্দর্যেরই মতো, এমনকী তার আগে সত্যিই জানা ছিল না।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলাম নাম জানা হল না কোথায় থাকেন, জানা হল না কি করেন, জানা হল না সেই যুবতীর সঙ্গে ওই সুন্দরমতো ছোটোখাটো ভদ্রলোকের কি সম্পর্ক তাও জানা হল না।

নাঃ, আমি একটা যাচ্ছেতাই। একটা রিয়াল হোঁদলকুতকুত।

উনিও কি গান শেখাবেন আমাকে? ভদ্রলোকের নামটাই বা কি?

সম্পূর্ণই বিনা কারণে ভদ্রলোকের উপর বড়ো বিরক্ত হয়ে উঠল মন।

তারপরই নিজেকে বললাম, শনৈঃ শনৈঃ! বৎস। শনৈঃ শনৈঃ। পরীর দেশে ঢুকে যখন পড়েইছ জানতে পাবে একে একে।

কিন্তু আমি কি করব? বাবাকে কোনোদিন নিশিতে ডেকে থাকলে তিনি জানতে পারতেন ব্যাপারটা কি? তাঁর প্রিন্স অফ ওয়েলস যে কবি জীবনানন্দ দাশের মতো ট্রামের নীচে চাপা না পড়ে শুধুমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুলে ভরতি হয়েই রক্ষা পেল এ যাত্রা, একথা জানলে হয়তো উনি ক্রুদ্ধ হতেন না।

বাবা কি ইতিমধ্যেই ক্রুদ্ধ হয়েছেন? কে জানে। আমার বাবা ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁর দিব্যচক্ষুও লেসার বিমের মতো। কিছুই বলা যায় না।

বাড়ি ফিরে খেলার জামা-কাপড় ছেড়ে চান-টান করে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে অডিটিং পড়তে বসলাম।

"অ্যান অডিটর ইজ আ ওয়াচডগ। অ্যান অডিটর ইজ আ ওয়াচডগ!"

কিন্তু পড়ব কী? চোখের পাতা মেললেই সেই ঋজু মহিমময়ী মূর্তিকে দেখি, আর চোখ বন্ধ করলেও তাই। আমাকে এখন কোন্ ওয়াচ-ডগে বাঁচায়!

লগ্নে চন্দ্র থাকলে জন্মের পরে বুদ্ধদেব প্রসূতির শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ালে অথবা মিথুন রাশিতে জন্ম হলে (ইংরেজিতে নাকি কর্কট রাশি) লগনচাঁদা সকলেরই এই দশা হয় কি না জানি না কিন্তু দশ বছর বয়স থেকে আমি হতভাগার এমনই কপাললিখন। পাখির সঙ্গেও প্রেমে পড়েছি, হরিণের সঙ্গেও, ফুলের সঙ্গে প্রজাপতির সঙ্গে আর নারীর সঙ্গে তো কথাই নেই।

ক্রমান্বয়ে আছাড় খেয়ে চলেছি আজীবন। সৃষ্টিকর্তা যে কী গেরোতেই ফেলেছেন আমায়। আমার কপাললিখন বা দোষ খন্ডাতে পারে এমন কোনো পীত-পোখবাজ হিরে, মুক্তো চুনি, অ্যামেথিস্ট, এই গ্রহের গর্ভে সৃষ্টি হয়নি।

"মন দেওয়া-নেওয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে, নূপুরের মতো বেজেছি চরণে।" ষাট বছর বয়স হতে চলল কিন্তু মনের বয়স আমার এখনও সেই দশই রয়ে গেছে। নাইনটিন টুয়েন্টি এইট মেক-এর টি. এইট মডেল ফোর্ডের শরীরে টাটা-সিয়েরার এঞ্জিন বসালে যে কী হতে পারে তা আমার মতন ভালো আর কেউই জানে না।

আমাদের বিকমের ক্লাসে সেন্ট জেভিয়ার্সেব বন্ধুরা ছাড়াও, আগেই বলেছি, অনেক অন্যান্য কলেজের ছেলেরা এসে যোগ দিল। তাদের মধ্যে যাদেব বিশেষ করে মনে আছে, তাদেব মধ্যে একজন হল দিলীপ দাস। দিলীপের বাবাও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন। তাঁর নিজের ফার্ম এখনও আছে। তা দিলীপও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছিল। জামশেদপুরে অডিট করতে গেছিল। সেখানে হোটেলে ছিল। হোটেলেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যায়। সবচেয়ে মজার কথা মজার কথা নয়, বলব দুঃখের কথা, যে যখন দিলীপের সঙ্গে আমাদের অফিসের নীচে দেখা হয়ে যেত প্রায়ই ও হয়তো ইনকাম ট্যাক্সে গেছে অথবা ফিরে আসছে, দেখা হলেই ও বলত আরে অত ঘোরাঘুরি করিস না। দুটো মেয়ে আছে বাচ্চা-বাচ্চা, হঠাৎ কিছু হলে কি হবে? ও আমাকে চিরদিনই সাবধান বাণী দিত, অথচ নিজেই চলে গেল অতি অল্পবয়সে।

আসলে স্মৃতিচারণ করতে বসে এত্তো কথা এলোমেলোভাবে এসে পড়ে যেন সমুদ্রে এসে বিভিন্ন নদী-উপনদীর শাখা এসে পড়ছে। তাদের আয়তন নির্ধারণ করা অথবা তাদের গতি নির্ধারণ করাটা ভারি মুশকিল। করতে গেলে বোধহয় স্মৃতিচারণের স্বাভাবিকতাই নষ্ট হয়ে যায়। যেতে পারে বলেই,

আমি এলোমেলোভাবে পুরো ব্যাপারটাই লিখছি। আপনারা আশাকরি নিজগুণে এই অপরাধ মার্জনা করে নেবেন।

আরো অনেক নতুন ছেলেরা এসেছিল, এখুনি তাদের নাম মনে করতে পারছি না। তবে, আমাদের চেয়ে এক বছরের সিনিয়ার ছিল কৃষ্ণ শর্মা। কৃষ্ণকুমার শর্মা পুরো নাম। অত্যন্ত সুদর্শন, আমার চেয়েও লম্বা, ছ ফিটেরও দু-এক ইঞ্চি বেশিই হবে।

কৃষ্ণ আমাদের অফিসে আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হল। কারণ, কৃষ্ণের বাবা ছিলেন মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জ স্টেটের নায়েব। এখন যে ক্যামাক স্ট্রিটে 'আজিমগঞ্জ' হাউস হয়েছে, সেই আজিমগঞ্জ হাউসই আজিমগঞ্জ স্টেটের বাড়ি ছিল কলকাতার। তখনকার রাজার দুই ছেলে, তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় বিভিন্ন ক্লাবে। অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী তাঁরা। যাই হোক, কৃষ্ণের বাবা আমার বাবাকে বলে, ওকে আমাদের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণ বাংলা বলত অনর্গল এবং যে কোনো বাঙালির চেয়েও ভালো বাংলা বলত। এবং কৃষ্ণর একটা বদ দোষ ছিল যে ও ভীষণ কথা বলত এবং আমার ধারণা ওর জন্যে ওর নিজের কাজটা নষ্ট তো হতোই এবং অফিসের অন্য অনেকের কাজও নষ্ট হতো। কিন্তু ও খুব ভালো কথা বলত। হেসে হেসে কথা বলত। তার উপর অতি সুন্দর চেহারা, লোকে একেবারে মুগ্ধ হয়ে ওর কথা শুনত।

কৃষ্ণ 'জিজ্ঞেস করত' না বলে 'শুধোলো' বা 'শুধোলেম' কথাটি ব্যবহার করত। রবীন্দ্রনাথের গানে কিংবা কবিতাতে যে শব্দটি মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে থাকাতে, আমার লেখাতেও এই দোষটি এসে গেছে। প্রচুর জায়গাতে আমি 'শুধোলো' বা 'শুধোলেম' বা 'শুধোলাম' শব্দগুলি ব্যবহার করেছি। এবং তাতে এখন পর্যন্ত প্রচুর ন্যায্য সমালোচনারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। চেষ্টা করছি এই বদভ্যাসটি ত্যাগ করবার কিন্তু কৃষ্ণকুমার কি আমাকে ছাড়বে? জানি না কবে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে এই দোষ থেকে। যখন তাড়াতাড়ি লিখি, আমি তো প্রবন্ধ লিখি না, গল্প উপন্যাসেই লিখি এবং সময়ের বড়োই অভাব, তাই সবসময় খেয়াল থাকে না এবং খেয়াল থাকে না বলেই কৃষ্ণ শর্মার প্রভাব আমাকে এখনও গালাগালি খাওয়াতে বাধ্য করছে।

কৃষ্ণ প্রায়ই অফিসে গল্প করত যে, লালসাহেব, কৃষ্ণ আমাকে লালসাহেব বলেই ডাকত, কেন জানি না। 'কোয়েলের কাছে'র নায়কের নাম যে হয় লালসাহেব, তার পিছনে কৃষ্ণর অবদান আছে। কৃষ্ণ বলত যে, তুমি তো প্রায়ই শিকার-টিকার কর, আমাদের ক্লাসে একটি ছেলে আছে মিহির সেন, তার বাবাও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তাঁর নামেই তাঁর কোম্পানির নাম, জে সেন অ্যান্ড কোম্পানি। জে সেন সাহেবের বড়ো ছেলে মিহির (ডাকনাম, গোপাল) খুব শিকার করতে ভালোবাসে। হাজারিবাগে তাদের ছবির মতো একটা বাড়ি আছে।

আমি কিন্তু মিহিরকে চিনতাম না। চিনতাম না মানে, আমাদের ক্লাস শেষ হয়েছে, ওদের ক্লাস আরম্ভ হয়েছে, দেখা হল করিডরে ওদের সঙ্গে, দেখলাম এক ঝলক, এই। ফর্মাল আলাপ যাকে বলে তেমন কিছু ছিল না। ওরা সিনিয়র ছিল এক বছরের।

আরেকজনের কথাও প্রায়ই বলত ও, অবশ্য তার কথা না বললেও তাকে না দেখা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তাঁর নাম ছিল দ্বারিকানাথ মিত্র। দেখতে অবিকল গ্রেগরি পেকের মতো, শুধু রঙটা অত ফরসা নয়। দ্বারিকদা বি এস-সি পাশ করে এসে সেন্ট জেভিয়ার্সে বি কমে কৃষ্ণ ও গোপালদের ব্যাচে জয়েন করেছিলেন। কৃষ্ণরা, সবাই দ্বারিকদাকে ডাকত "স্যার ডি এন" বলে।

পরে দ্বারিকদার কথা বলব সাতকাহন করে। পরে দ্বারিকদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠও হয়েছিলাম। একজন অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ, মানে এ যুগের হারুন-অল-রশিদ। এমন বড়ো বেশি দেখিনি। এরকম স্নেহবৎসল এরকম আদর-যত্ন করা, এরকম ভালবাসা বড়ো কম দাদাস্থানীয় মানুষের কাছ থেকেই পেয়েছি এজীবনে।

ক্লাস করি। বি কমের। আমাদের পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে কবি, দীপক এদের সঙ্গে দেখা বড়ো বিশেষ হয় না একটা। কারণ, ওরা যখন ক্লাসে আসে আমাদের তখন ক্লাস শেষ হয়ে যায়। কবি তো নিয়মিত ক্লাসেই আসত না। আর দীপকেরও বি এ তে উঠে কিছু আঁতেল বন্ধুবান্ধব জুটে গেল ।

পড়াশুনা তো লাটে উঠল। দেখলাম, প্রায়ই গিয়ে বসে থাকত ম্যাগনোলিয়াতে বা অন্যত্র, আর প্রত্যেকেই প্রচুর সিগারেট খেত।

তবে একটা জিনিস আমাদের সময়ে, আমাদের প্রায় সব বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই ছিল, শুধু কলেজে পড়ার সময় নয়, অনেকদিন পর পর্যন্তও, আমরা কেউই মদ-টদ খেতাম না। বাবার পয়সায় মদ খাওয়ার মতো ঘৃণ্য ব্যাপারে বিশ্বাসও করতাম না। আর মদ যে একটা বিশেষ উপাদেয় পানীয় তাও আমরা জানতাম না। কারণ, আমাদের কারুর বাড়িতেই মদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। হয়তো পিতৃস্থানীয়রা কেউ-কেউ কখনো-সখনো ক্লাবে গিয়ে খেতেন। কিন্তু কখনও বেলেল্লাপনা কেউই করেননি এবং মদ যে একটা মারাত্মক লোভনীয় বস্তু, মানে সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ খেতেই হবে, এরকম ঘটনা তখন একেবারেই অভাবনীয় ছিল। মদ খাওয়াটা মোটেই গুণের মধ্যেও গণ্য হত না। অন্তত আমাদের আমরা যাদের চিনতাম বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, আমরা যাদের সঙ্গে মিশতাম সেইসব ছেলেদের মধ্যে।

আমি তো আগেই বলেছি, দুর্ঘটনাবশত আমি যখন প্রথম মদ ছুঁই তখন আমার বয়স তিরিশ। তার আগে কোনোদিন মদ স্পর্শও করিনি। এমনকী বিয়ারও নয়।

যাই হোক, আমাদের গ্রেট সুভাষ মুখুজ্জ্যে, (রিয়্যাল কবি সুভাষদা নন! এ দুনম্বরি) দ্যা গ্রেটেস্ট কবি ঠিক সেইরকমই ছিল। ঋভুর দ্বিতীয় খন্ড যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ওকে ভোলেননি। কবির সঙ্গে দেখা হতেই চশমার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, কেমন আছিস?

বললাম ভালোই আছি। তুই কেমন আছিস?

ও বলল, আমি তো আমার জন্যে থাকি না, আমি থাকি দশজনের জন্যে।

বলেই বলল, এই তো গরমের ছুটি পড়বে। যাবি আমার সঙ্গে?

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়?

ও বলল, আলমোড়া।

আমি বললাম, সেটা কোথায়?

ও বলল ইডিয়ট। নামও শুনিসনি? তার কাছেই তো মায়াবতী। মায়াবতীতে বিবেকানন্দ ছিলেন একসময়ে। জানিস? সেই মায়াবতীতেও যাব। যাবি তো চল।

বললাম কি করে যেতে হয়?

বলল, ইডিয়ট। কি করে যেতে হয় তা জেনে তোর দরকার কী? আমার সঙ্গে যাবি। যেতে হয় অনেক রাজ্য পেরিয়ে। এখান থেকে ট্রেনে আমরা যাব কাটগোদাম, কাটগোদাম থেকে বাসে করে যেতে হবে আলমোড়া। তারপর ইচ্ছে আছে মায়াবতীতে যাব। ঠাকুর করলে হাঁটা পথে।

আমি বললাম, হাঁটা পথ কেন, বাস যায় না?

না না, এখনও বাস-ফাস হয়নি। বাস-ফাস হয়নি বলেই তো যাব!

আগেই বলেছি, কবির বাবা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, অনেক দান-ধ্যান করতেন। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম যেবার দেওঘরে কবির জেঠামশাইয়ের বাড়িতে উঠেছিলাম। সে সব কথা ঋভুর দ্বিতীয় পর্বে আছে।

আমরা একদিন দেওঘরের স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে গেছিলাম। গিয়ে কবির যা খাতির প্রতিপত্তি দেখেছিলাম সেখানে তা বলার নয়। আমরা দুবেলা খেয়েওছিলাম মিশনে মনে আছে। তাতে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম আমরা। তবে, একটা জিনিস দেখে ভালো লাগেনি আমার, কথাটা রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষর ভালো লাগবে না, মনে হয়েছিল যে সেখানে যেন বড়োলোকদেরই বেশি প্রতিপত্তি। যাঁর বেশি পয়সা আছে, যিনি বেশি ডোনেশন দেন, যিনি গণ্যমান্য—তাঁদেরই বেশি খাতির যেন রামকৃষ্ণ মিশনে। একথা সত্যি কিনা জানি না, তবে সত্যি যদি না হয়, তবে আশাকরি ওঁরা আমাকে মার্জনা করবেন। আমার যেটা মনে হয়েছিল সেটাই বলেছি।

কোনোদিন বাবার সঙ্গে ছাড়া, ডামারহাটে যাওয়া ছাড়া, তখন পর্যন্ত একা কোথায়ও বাইরে যাইনি। সে শিকারই হোক কি অন্য কোথাও হোক।

আমি মাকে বললাম। আমার সঙ্গে বাবার কোনো ডাইরেক্ট কম্যুনিকেশন ছিল না। আমার মনে হয় আমাদের প্রজন্মের সেই বয়সি কোনো ছেলেরই ছিল না। অধিকাংশ বাবাই এক দুর্জ্ঞেয় আড়াল গড়ে থাকতেন এবং আমাদের আরজ্জি-আবদার-মান-অভিমান যা কিছু দাবি-দাওয়া সবই ছিল মায়েদেরই কাছে। মায়েরা সেইসব দাবি-দাওয়ার পেশ করতেন বাবাদের কাছে এবং সেই আবেদন মঞ্জুর হল না নামমঞ্জুর সেসব আমরা মায়েদের মারফতেই জানতে পারতাম। মায়েরা ছিলেন সর্বার্থেই পেশকার।

মাকে বললাম, মা কবি যাচ্ছে। আমাকে নিয়ে যাবে বলছে। আমি কি যাব?

মা বললেন, বাবাকে জিজ্ঞেস করব।

তার পরের দিন বললেন, হ্যাঁ বাবা বলেছেন তুমি যাও। আরও বলেছেন ট্রাভেলিং ইজ এডুকেশন। মানুষ দেশ বেড়িয়ে লোকের সঙ্গে মিশে যা শেখে, তা গন্ডা গন্ডা বই পড়ে কোনোদিনই শিখতে পারে না। যখনই সুযোগ হবে বাইরে যাওয়ার, বাইরে যাবে। বলেছেন, আমাকে জিজ্ঞেস করারও কোনো প্রয়োজন নেই। তবে নিজের পড়াশুনোটা যেন ঠিক করে করে। পড়াশোনোর ক্ষতি করে যেন না বেড়িয়ে বেড়ায়।

গরমের ছুটি পড়তেই, কবির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ির নাম এখন আর মনে নেই। আমি আর কবি। অর্ডিনারি থার্ড ক্লাস। রিজার্ভেশন সিস্টেমই ছিল না তখন। রিজার্ভেশন থাকত খালি ফার্স্ট ক্লাসে আর সেকেন্ড ক্লাসে। ইন্টারক্লাস আর থার্ড ক্লাসে সম্ভবত তখন কোনো রিজার্ভেশন থাকত না।

পরদিন দুপুরবেলায়, মে মাস, উষর উত্তরপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে ট্রেনে চলেছে বাদামিরঙা সর্পিণীর মতো হিসহিস শব্দ তুলে। উঃ কী গরম। গা জ্বলে যাচ্ছে গরমে।

আমাদের কম্পার্টমেন্টে আমরা দুজন ছাড়া আর মাত্র দুজন। একজন কুমায়ুঁনি। আরেকজন পাঞ্জাবি সর্দার। কুল্লে চারজন যাত্রী সেই কম্পার্টমেন্টে, বাস্, আজকালকার দিনে ভাবা যায়। এই মানুষই মানে জনসংখ্যাই আমাদের দেশটাকে শেষ করল। অথচ এই মূল সমস্যা নিয়ে পঞ্চাশ বছরেও কিছুই করা হল না। শুধু ভোট আর ভোট বাড়ার চিন্তা। যত বেশি ভোট বাড়ে, তত বেশি কনস্টিট্যুয়েন্সি, তত বেশি প্রতিনিধি, দলের সংখ্যা যেমন বাড়বে, দলের জোর তত বাড়বে। দেশের কথা কে ভাবে। স্বাধীনতার পরদিন থেকেই যদি জনসংখ্যা ওয়ার-ফুটিং এ ট্যাকল করা হত জওহরলাল নেহরুর আমল থেকে তাহলে আজকে আমাদের দেশে হয়তো এতো সমস্যার কোনো সমস্যাই থাকত না। সারাদিন আটঘন্টা গাড়ি চালিয়ে গেলে ইউরোপের চার-পাঁচটি দেশ ছাড়িয়ে চলে যাওয়া যায়। একরত্তি সব দেশ। তারা কী না করেছে। জার্মানি বলুন, ফ্রান্সই বলুন, সুইটজারল্যান্ডই বলুন। আসলে জনসংখ্যা দিয়ে কিছুই হয় না। সে কোনো দেশের মানুষের চরিত্র, তাদের খাটবার ক্ষমতা এবং ইচ্ছে তাদের শিল্পায়ন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপরেই দেশের ভালোমন্দ সবকিছুই নির্ভর করে। কিন্তু এখন ভাবলেও হাত-পা ছেড়ে আসে। আর কি করে এই স্রোতকে অন্যমুখে অন্যদিকে চালিত করা যাবে তা তো ভেবেই পাই না। সেই খুড়োর কল। সুকুমার রায়ের 'খুড়োর কল'। উৎপাদন কি বাড়েনি। উৎপাদন অনেকই বেড়েছে। এতোগুলো ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে অনেক অনেক গুণ বেড়েছে সমস্ত ক্ষেত্রে। কিন্তু এই যে জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত যার বৃদ্ধি জ্যামিতিক হারে সেই সব লুটেপুটে খেয়ে নিচ্ছে। কোনোদিনই এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না। যাঁদের প্রচুর অর্থ আছে, যেনতেনপ্রকারেণ অর্জিত, তাঁরাই একমাত্র এখানে মানুষের মতো বাঁচতে পারবেন। তাছাড়া আসল যারা জনগণ যাঁরা ভারতবর্ষ, তাঁদের মুক্তির তো কোনো উপায় সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হয় না।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছি জানালা দিয়ে বাইরে। উত্তরপ্রদেশ বলতে আমার দৌড় ছিল বিন্ধ্যাচল আর কাশী অবধি। এতো গভীরে আসিনি আগে কখনও। লু বইছে, আর সেই লু মধ্যে উষর প্রকৃতির মধ্যে মুঠো মুঠো ধুলো উড়ছে। কোথাও কোথাও ঘূর্ণি উঠছে। যে ঘূর্ণি দেখে দেওঘরে দীপক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সাইকেল থেকে পড়ে গেছিল দেওঘরে। ধুলোর ঘূর্ণি। উট বাঁধা রয়েছে কৃষকের বাড়িতে, মোষ বাবলাগাছের ছায়ার বসে জাবর কাটছে। দগ্ধ প্রকৃতি, একেবারে দগ্ধ প্রকৃতি। একেবারে কোথাও কোনো ছায়া নেই, কোথাও জল নেই, কোনো শ্যামলিমা নেই। মাথায় পাগড়ি বেঁধে, কান ঢেকে কৃষকেরা মাটির বাড়ির মধ্যে। কেউ কেউ বাইরে বিশেষ কাজে বেরিয়েছে। আমরা

বাংলার ছেলে, বাংলাদেশে প্রখর গ্রীষ্ম অত্যন্ত মনোরম যে, সে কথাটা বিহার-উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশে না গেলে রুক্ষ গ্রীষ্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো অনুমানই করা যায় না।

গরমে যখন প্রাণ অতিষ্ঠ, কবি বলল এক কাজ কর। বাথরুম থেকে মগে করে জল এনে এনে পুরো কম্পার্টমেন্ট ভিজিয়ে দে।

কবি বলে ব্যাপার, একে ফিলোসফার, তায় মোটর-মেকানিক, তায় ন্যাচারালিস্ট, তায় কম্পাউন্ডার, তা কবির কথা কি আর ফেলা যায়।

মগে করে জল এনে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছি, কম্পার্টমেন্টের ভিতরে, দেওয়ালে, জানলাতে। অন্য দুই যাত্রী নিস্পৃহ চোখে ছেলেমানুষ আমাদের হরকত দেখছেন। সমর্থনও করছেন না, প্রতিবাদও করছেন না। কী বলব মগের পর মগ কম্পার্টমেন্টের গায়ে ঢালছি, আর সঙ্গে সঙ্গে সব জল শুষে নিচ্ছে কাঠ। চিমসে গন্ধ উড়িয়ে বাষ্প উঠতে লাগল। জল গড়িয়ে পড়ার অবকাশ রইল না। কম্পার্টমেন্ট এতই গরম হয়েছিল। অবশ্য তখনকার দিনে কম্পার্টমেন্টও আজকালকার মতো উন্নত হয়নি। তখন তো সম্ভবত শালকাঠ দিয়েই বানানো হত থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট।

সারা দুপুর ধরে কামরায় জল ঢেলে ঢেলে হাত ব্যথা হয়ে গেল কিন্তু কম্পার্টমেন্ট একটুও ঠান্ডা হল বলে তো মনে হল না। পাখা চলছে মাথার উপরে বনবন করে আর গরম আরও বাড়ছে। এদিকে শার্সিও নামানো যাচ্ছে না। হাওয়া আসছে দমকে দমকে ধুলোর সঙ্গে, প্রচন্ড গরম। গায়ে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে তবুও হাওয়া তো!

সর্দারজি ও সেই কুমায়ুঁনি ভদ্রলোক বললেন, শার্সি নামিয়ে দিন, নয়তো লু লেগে যাবে।

কবি বলল, লু লাগবে না কি কি লাগবে সেসব পরের কথা। এখন প্রাণ তো বাঁচা। বন্ধ জায়গায় থাকতে পারি না। দমবন্ধ হয়ে যাবে।

ওদের দিকের জানালাগুলো বন্ধ হল। আমাদের দিকেরগুলো খোলা রইল। আমিও ক্রমাগত জল ঢেলেই চললাম যতক্ষণ না সূর্য নামে পাটে।

সন্ধের পরে আস্তে আস্তে বাইরেটা এবং গাড়ির ভিতরও ঠান্ডা হয়ে এল। আমরা, গিয়ে পৌঁছোলাম লক্ষ্ণৌতে পরদিন দুপুরে। চমৎকার স্টেশন। খিলান, গম্বুজে ঠান্ডা। শ'য়ে শয়ে কবুতর প্লাটফর্মের উপরে ঝটপট করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

স্টেশনের লেফট-লাগেজ রুমে আমাদের সামান্য মাল রেখে একটা টাঙা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম লক্ষ্ণৌ দর্শনের উদ্দেশ্যে। লক্ষ্ণৌ শহর সম্বন্ধে আমার উৎসাহ প্রচন্ড ছিল এবং আজও আছে। তবে দুঃখের বিষয়, ওই একটি দিন ওইভাবে ঘুরে বেরিয়ে লক্ষ্ণৌ দেখা ছাড়া আর কোনোদিনও লক্ষ্ণৌ দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। জানি না বাকি জীবনে আর হবে কি না।

লক্ষ্ণৌ থেকে বাত্তিরে একটি ছোটো ট্রেন ছাড়ত ছোটো লাইনের, কাটগোদাম গিয়ে পৌঁছোত সকালবেলা, সেই ট্রেনে আমরা উঠে পড়লাম, সন্ধের পরে, খাওয়াদাওয়া করে। থার্ডক্লাস কামরায় নিভু-নিভু লো-ওয়াটের বাতির আলোকে কিছু পড়া যায় না কিন্তু তারই মধ্যে কবি "দ্য প্রবলেম অফ বিইং ইন্টেলিজেন্ট" নামক একটা বই পড়তে লাগল সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে। চেইনস্মোকার ছিল ও। ব্রাত্যজনের সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলা প্রয়োজন মনে করছিল না। কী আর করি। বোরড হয়ে গিয়ে আমি একটা স্টেশনে একগাদা শাণ্ডিল্লা লাড্ডু কিনে ফেললাম।

কবিকে বললাম, খাবি?

কবি চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে এক ঝলক অপাঙ্গে দেখে বলল Adolescence জীবনে আর পেরুনো হল না তোর।

সকালবেলা গিয়ে কাটগোদামে পৌঁছোলাম। বেশ ঠান্ডা যদিও পাহাড়ের উপরে নয়, ফুট হিলসে পাহাড়ের নীচে। কাঁধে দড়ির ঝাঁকা নিয়ে কুলিরা ভিড় করল। স্থানীয় ভাষায় বলে ডুটোয়াল মালবাহক। তাদের কাছে মাল দিয়ে আমরা বাসস্ট্যান্ড এলাম।

কাটগোদামে কুলহারে (ভাঁড়ে) যে চা খেয়েছিলাম সেদিন সকালবেলায়, এখনও যেন মুখে লেগে আছে।

চা খেয়ে আমরা বাসে উঠলাম। বাস ঘুরে ঘুরে কমায়ুঁ হিলসে উঠতে লাগল। প্রথমে এল কি যেন জায়টার নাম? যেখানে যক্ষ্মা রোগীদের বিখ্যাত স্যানাটোরিয়াম ছিল? মনে পড়েছে, ভাওয়ালি। ভাওয়ালিতে এসে বাস দাঁড়াল। আড়ু খোবানি পাম, পিচ আপেল আরও কত বংবেরঙি ফলের মেলা বসেছে পথপাশে।

ভাওয়ালিতে কিছুক্ষণ দাঁড়াল বাস। আমরা তো বাঙালির ছেলে ফল খাব কি! মধ্যবিত্ত বাঙালির ফল আর ফুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শুধুমাত্র বিয়েতে, আর রোগশয্যায় এবং মৃত্যুতে। এছাড়া ফুল আর ফলের ব্যবহার তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালি প্রায় জানতোই না। ইদানীং দেখি যে একটু রেওয়াজ হয়েছে প্রাতঃরাশের সময়ে ফল খাওয়া কিংবা রাতের খাবারের পরে ফল খাওয়া, ঘরে ফুল-টুল সাজানো, ফুল উপহার দেওয়া। তখন মধ্যবিত্ত বাঙালির কারো হাতে ফুল দেখলেই আতঙ্ক হত, কেউ বুঝি ফওত হয়ে গেছেন, মানে টেঁসেছেন। তাই আমরা ফল-টল না খেয়ে ঐতিহ্যানুযায়ী সিঙাড়া আর চা খেলাম বাস থেকে নেমে। তবে তখন কুকিং মিডিয়াম এমন ভেজাল ছিল না। ওই সব অঞ্চলে খাঁটি দেশি ঘিতে ভাজাভুজি হত।

সব যাত্রীর 'নাস্তা' করা শেষ হলে আবার চলতে লাগল বাস ঘুরে ঘুরে কুমায়ুন হিমালয়ের বুকে। আস্তে আস্তে উচ্চতা যত বাড়তে লাগল, গাছগাছালির চেহারা ক্রমশই পালটাতে লাগল। অনেক দূর গিয়ে, সেটা কতদূর, আমি এক্ষুণি আপনাদের বলতে পারি, কিন্তু বলব না। সব বললে, সব জানলে রহস্য থাকে না।

অনেকদূর গিয়ে রাস্তা দু-ভাগ হয়ে গেছে নৈনিতাল আর আমরা চলেছি রানিখেত হয়ে যে পথটি আলমোড়াতে গেছে, সেই পথে।

আমার পাশের সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, ঠান্ডা কেমন হবে আলমোড়াতে?

উনি বললেন, দো কমলিকি তো হোগীই।

সেই প্রথম জানলাম, ঠান্ডার পরিমাপ সেন্টিগ্রেড বা ফারেনহাইটে মাপা হয় না। ভারতবর্ষে ঠান্ডার পরিমাপ হয় কম্বলের হিসেব দিয়েই। দু'কম্বলের ঠান্ডা? হ্যাঁ, মে মাসেও তখন দু'কম্বলের ঠান্ডা আলমোড়াতে। পৃথিবীতে মানুষ তখন কম ছিল। গাছপালা অনেক বেশি ছিল। সব জায়গাতেই শীত বেশি ছিল। কিন্তু দু'কম্বল তখন আমাদের সঙ্গে ছিল না। তাই নিয়ে ভেবে লাভও ছিল না।

বাস চলতে লাগল। ওই বাইফারকেশানটি ছেড়ে আসার পর আমরা বেশ কিছুক্ষণ পরে ভর দুপুরে এসে পৌঁছোলাম রানীখেতে। পাহাড়ী এলাকাতে তখন ছোটো ছোটো শ্লথগতি বাস চলত। ফোর্ড বেডফোর্ড বা শেভ্রলে। মার্সিডিস ইত্যাদি তো সেদিন এল।

রানিখেতের যে প্রধান রাস্তা চলে গেছে আলমোড়ার দিকে সেটি দেখে বোঝাই যায় না যে রানিখেত অত সুন্দর জায়গা। এই কথা প্রায় সব পাহাড়ি শহর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। প্রধান রাস্তাটি সবসময়েই ঘিঞ্জি, নোংরা এবং জন-যানবহুল। সে শহর শিলং, দার্জিলিং, মুসৌরি, রানিখেত, পৌরি, বা উটিই হোক। রানিখেতের আসল সৌন্দর্য হয় রানিখেত ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতে।

বাস ছেড়ে দিল। এবারে বাস ছাড়ার পরই দেখলাম যে রাস্তার দুপাশটা একেবারে ন্যাড়া হয়ে গেল হঠাৎ করে। এরকম ন্যাড়া পর্বত আমার দেখা ছিল না। ভাবলাম এদেরই কি নাঙ্গা পর্বত বলে?

এসব Crucial প্রশ্ন ফিলসফার কবিকে করা যায় না। ও হয়তো প্রশ্নর উত্তরে চশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে বলবে বালখিল্য। অথচ হঠাৎ মাথাতে ক্ষুর চালাল কে তাও জানতে ইচ্ছে হল খুবই।

খাদ নেমেছে কোথাও দু-তিনহাজার ফিট একবার। নদী নেই, এমনি খাদ। পথের ডানদিকের উত্তুঙ্গ পর্বতে কিছু চির পাইনের জঙ্গল। চলছে বাস, হাওয়াতে চিরের গন্ধ। এরা পর্ণমোচী নয়। আঃ কী সুন্দর নির্মল হাওয়া। জোরে নিঃশ্বাস নিলে মনে হয় আয়ু বেড়ে গেল। চলতে চলতে আমরা শেষ বিকেলে একটি নদীর ওপর সাঁকো পেরিয়ে আলমোড়া শহরে ঢুকলাম। কিছুক্ষণ আগে নদীটি দু-একবার উঁকি মেরেছিল নীচের গিরিখাত থেকে। নদীটির নাম শুনলাম কোশী। কোশী নদ। প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। ছোটো নদী। নদ আর নদীর লিঙ্গ বিচার কি করে করা হয় সেটা আমার জানা নেই।

পার্বত্য নদী অবশ্য চওড়ার খুব একটা বড়ো হয় না। খাতের মধ্যে দিয়ে বইছে তো। প্রচন্ড বেগে ধাবমান। অবশ্য সাঁকোটির অনেকই নিচু দিয়ে নদীটি বইছে। সাঁকোটির কিছুটা পরেই বাসস্ট্যান্ড। আমরা বাস থেকে নামলাম। নেমেই একজন ডুটোয়াল ঠিক করে তার দড়ির ঝোলাতে আমাদের মালপত্র দিয়ে এগোলাম।

কিন্তু ওঠা যায় কোথায়? বাবার অবস্থা ভালো হতে পারে, আমার অবস্থা অত্যন্তই খারাপ। কবির অবস্থা কবির বড়লোক বাবার চেয়েও অনেক ভালো। আদরে গোবরে মাথা-খাওয়া। আমার সামান্য মাস মাইনের টাকাই সম্বল। মনে নেই, মা কিছু দিয়েছিলেন, কি না। হয়তো দিয়েছিলেন। তবে বাবা হাতে কখনওই সংসারের খরচের টাকা ছাড়া বেশি টাকা দিতেন না।

বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছিই একটি হোটেল চোখে পড়ল রাস্তার উপরেই। হোটেলটির নাম আজ আর মনে নেই। হোটেলটিতে সবসুদ্ধ গোটা চারেক ঘর, একতলা। একটি ঘরের জানালার কাচের পাশ দিয়ে শুধু বোগেনভেলিয়া নয়, একটি কমলা-রঙা ফুলওয়ালা লতাও লতিয়ে রয়েছে পশ্চিম এবং দক্ষিণমুখো। সেই ঘরটির একপাশে আলমোড়ার প্রধান পথ। অন্য পাশে জানলা দিয়ে দেখা যায় অদূরের কোশী নদী। তবে কোনো ঘরেই সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম নেই। একদম করিডরের শেষে গিয়ে বাথরুম।

খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত জিজ্ঞেস করাতে ম্যানেজার-কাম ঝাড়ুদার-কাম কাশিয়ার-কাম দারোয়ান বললেন, খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। পাশেই একটি হালুইকরের দোকান আছে, সেখানে চা কচৌরি হালুয়া অথবা রাবড়িমালাই অথবা আলুর ভুজি খেতে পারেন। যা খুশি খেতে পারেন। তবে ভাত-ফাত পাবেন না।

ঘর ভাড়া?

বললেন, দু টাকা চার আনা দিনে।

আমরা বললাম ঠিক আছে।

পাঠক, ভাববেন না যে শস্তা হল। পঞ্চান্নর দুটাকা চার আনা পঁচানব্বুইতে এসে দুশো চল্লিশ টাকা হয়েছে হয়তো। মুদ্রাস্ফীতির তুফানে তো সবই ভেসে গেল। বদর বদর।

কবি লোকাল গার্জেনের মতো মুরুব্বিয়ানার গলাতে বলল, তুই এই ফুল-টুলওয়ালা ঘরটিই নে। তোর তো আবার কাব্যি রোগ আছে। আমি পেছনে যাচ্ছি।

সে হল আধুনিক কবি অ'র আমাকে কাব্যি রোগের দোষে দুষছে। যাই হোক তার মহানুভবতাতে খুশি হলাম। কবির মনটা সত্যিই বড়ো ছিল। তার অনেক প্রমাণই পেয়েছি। কবির নিজের ঘরটি খুব ছোটো না হলেও আমার চেয়ে ছোটো। কবি অত্যন্তই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। সে বলল লাইফে অন্য কারও সঙ্গে এক ঘরে শুইনি।

বললাম, বিয়ে করলে কি করবি?

ও বলল আমার মন শোবে না। শরীর শোবে কোনো নারীর সঙ্গে এক খাটে।

কবি সিগারেট খায় মিনিটে মিনিটে। ধুঁয়োয় সারা ঘর ভরে যাবে, আমার জীবন বেরিয়ে যাবে। তাই, আমরা দুটি ঘরই ভাড়া করলাম। দিনে দুটাকা চার আনা করে একেকটির ভাড়া। দুপুরবেলা লাঞ্চ বলতে কিছুই খাইনি আমরা। ওই যা চা-সিঙাড়া খেয়েছিলাম রানিখেতে নেমে। আমরা হাত-মুখ ধুয়ে সেই হালুইকরের দোকানে গিয়ে দেখি খাঁটি দিশি ঘিয়ে পুরি ভাজা হচ্ছে। ম-ম করছে ঘিয়ের গন্ধ। পুরি, হালুয়া আলুর তরকারি নানারকম মিষ্টি, রাবড়ি মালাইও ছিল।

বললাম চমৎকার। এই খাওয়াতেই চলবে।

কবি চট করে দরদাম করে নিয়ে বলল দুবেলা খাওয়া এবং হোটেলে থাকা নিয়ে আমাদের চার টাকা করে পড়ত পার হেড।

প্রথম দুটো দিন শান্তিতে কাটল। হেঁটে হেঁটে অনেক জায়গাই দেখলাম। তবে উদ্দেশ্যহীন ভাবেই হাঁটলাম বেশি। সারাটা জীবনই কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য ঠিক করে জীবনের ও শহর-গ্রামের নানান পথে যতটুকু হেঁটেছি, তার চেয়ে অনেকই বেশি হেঁটেছি উদ্দেশ্যহীন ভাবে। সেই পথ চলতে যা আনন্দ সে পথের দু-পাশে যেসব অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার তার কথা শুধুমাত্র সেই পথিকেরাই জানেন।

নৈনিতালের হ্রদের উপরের অংশকে বলে মল্লিতাল আর নীচের অংশকে বলে, তল্লিতাল। নৈনি মানে উঁচু তল্লি মানে নিচু কুমায়ুনি ভাষাতে।

আলমোড়া শহরটা এরকম স্লান্টিং। পুরো শহরটাই একটি স্লান্টের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। সমকৌণিক না হলেও পনেরো কুড়ি ডিগ্রি হবে। সমতল জায়গা কমই আছে। আমাদের হোটেলটির থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে ছিল বশি সেনের বাড়ি। বশি সেনের বাড়ি খুব বিখ্যাত ছিল। উদয়শঙ্করের নাচের স্কুলও ওখানে ছিল শুনেছি। বশি সেনের বিরাট যোগাযোগ ছিল। উনি যে কী করতেন তা ঠিক বলতে পারবো না। বাড়িটি দেখবার মতো বাড়ি। প্রধান রাস্তার উপরেই ছিল, বাঁদিকে। আলমোড়ার মস্ত বাজারটি ছিল লম্বাতে অনেক কিন্তু চওড়াতে সামান্য।

উপর থেকে নীচে নেমে গেছিল অনেকখানি। সেই বাজারের উপরদিকের নাম ছিল মল্লিবাজার, আর নীচের অংশের নাম ছিল তল্লিবাজার। তখন ফলের সময়, বহুরকমের ফলে ফলে বাজার একেবারে ভরে ছিল। আড়ু খোবানি, পাম, পিচ, আপেল কত রকমের যে ফল। ছিট কাপড়ের দোকান। তামা-পেতলের বাসন-কোশন। আরও কত কী! বাজারের মধ্যে ঘুরে বেড়ালে যে কোনো জায়গার বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্র বোঝা যায়, চোখ-কান খুলে যদি কেউ হাঁটেন। চড়াই উঠে, উৎরাই নেমে পুরো বাজার ঘুরতাম। তখন তো পথচলাতেই আনন্দ ছিল।

আমি বাজারের এপ্রান্তে থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে বেড়াতাম, চোখ ভরে দেখতাম, কান ভরে শুনতাম কিনতাম না কিছুই। প্রয়োজনও ছিল না, পয়সাও ছিল না। দশ-পনেরো মাইল হাঁটাটা কোনো ব্যাপাবই ছিল না। তবে সমতলে। পার্বত্যপথে হাঁটার অভ্যেস ছিল না।

কবি তার ঘরের চেয়ারে বসে, সিগারেটের ধোঁয়াতে ঘর অন্ধকার করে পায়ের উপর পা তুলে মুখ নিচু করে নীটশে বা শোপেনহাওয়াতে পড়ত। কখনও কনুফুসিয়াস বা স্পিনোজা।

কবি নিয়ে গেল একদিন "বামকৃষ্ণ ধামে"। আমি বলতে পারব না রামকৃষ্ণ "ধামেব" সঙ্গে রামকৃষ্ণ "মিশনের" কোনো সম্পর্ক ছিল কি না। কিংবা রামকৃষ্ণদেবের কোনো শিষ্য স্থাপন করেছিলেন কি না। আজকে আর মনে নেই। কিন্তু সেই সন্ন্যাসীদের ব্যবহার একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমরা দুটি উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে গেছি, ওই শস্তাতম হোটেলে উঠেছি, হালুইকরের দোকানে খাই, ওঁরা বোধহয় দয়াপরবশেই বললেন দুবলাই আসবেন। আমাদের সঙ্গে দুটি ডাল ভাত খাবেন, রাতে হাত রুটি। আমরা তো খাই-ই। দু-বেলাই আমাদের সঙ্গে খাবেন। নেমন্তন্ন রইলো।

এরকম উদ্বাহু হয়ে অপরিচিত ক্ষমতাহীনদের কাউকে নেমন্তন্ন করতে খুব কমই দেখেছি। তবে জানতাম না, কবির বাবাকে ওঁরা চিনতেন কি না।

পরদিন দুপরবেলা গিয়ে চমৎকার খাওয়া হলো। খুবই আদরের সঙ্গে খাবার পরিবেশিত হল গরম গরম। খাওয়াদাওয়া বা নিমন্ত্রণের ব্যাপার আদর-যত্নটাই যে আসল এটাই অধিকাংশ মানুষ বোঝেন না। যখন কোনো বিয়েবাড়িতে বা নেমন্তন্ন বাড়িতে কোনো মানুষে যান, তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো বড়োলোক, কেউ মধ্যবিত্ত , কেউ নিম্নবিত্ত তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো বাড়িতে রোজই পোলাও মাংস খান, কেউ বা ডাল-ভাত খান কিন্তু বড়োলোক মধ্যবিত্ত গরিব নির্বিশেষে কেউই কাবোর বাড়িতে শুধুই খেতে যান না। একটু আদর-আপ্যায়ন পাওয়ার জন্যেই যান। প্রত্যেক মানুষই তার নিজের কাছে অত্যন্ত ইমপর্টান্ট।

প্রত্যেক উৎসবের, অনুষ্ঠানের এমনকী শোকপালনের বাড়িতেও গৃহস্বামীর উচিত অতিথি নির্বিশেষে দরজায় দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করা। গাড়ির দরজা খুলে রিকশা থেকে হাত ধরে, ট্যাক্সি দরজা খুলে নামানো, যাঁরা হেঁটে আসছেন তাঁদের হাতে ধরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে যাওয়া। সেই জিনিসই দেখলাম সেই রামকৃষ্ণধামে। আন্তরিকতা এবং উষ্ণতাতে সেই সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ সমুজ্জ্বল।

আশ্রমটি পাহাড়ের একেবারে একপ্রান্তে। খুব নিরিবিলি জায়গাতে। যে জায়গা আশ্রমেরই উপযুক্ত। পাহাড় তো নয়, সবই পর্বত সেখানে। আশ্রমের পেছন থেকেই নেমে গেছে গভীর গিরিখাদ। দিগ্‌বলয়ে সেই খয়েরি রঙা পর্বতশ্রেণির ঢেউয়ের পর ঢেউ মিশে গেছে আকাশের সঙ্গে।

দুপুরের খাওয়ার পরে ওঁরা বললেন, সন্ধেবেলা আসছেন তো?

কবি বলল, তা আসব কিন্তু দু-বেলা আপনাদের এখানে খাব না। কারণ আমরা ঘুরে বেড়াতে এসেছি। আর আপনাদের আশ্রমটিও আমাদের হোটেল থেকে বহুদূরে। অনেকখানি রাস্তা, প্রায় দু আড়াই মাইল রাস্তা তো হবেই চড়াই উত্তরাইয়ের পথে।

ওঁরা বললেন, ঠিক আছে যেমন অভিরুচি। তবে হোটেলে থাকারই বা দরকার কি? শরীর দুটি উঠিয়ে এখানে এনে ফেললেই তো হয়। মন তো এসেইছে।

ভাবলাম, একেই বোধহয় আমার স্কুলের বন্ধু পরেশ বলত "বডি ফেলে দেওয়া।"

আপনাদের অবগতির জন্যে জানাই যে "বডি ফেলে দেওয়া" আর "লাশ ফেলে দেওয়া" বাক্যবন্ধ দুটিতে তফাৎ আছে।

আমাদের হোটেল থেকে, হোটেলের নামটা আজ আর মনে নেই, একটু গেলেই কোশী নদী। কোশী নদী, কোশী গন্ডক এইসব নদী বিহার দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে পরে। হোটেলের পেছনে কোশী নদীর ওপারে অনেক উঁচু পর্বতচুড়োতে একটি ছোট্ট মন্দির রোদে ঝলমল করত। সেই মন্দিরটি নাম ছিল কাটারমলের মন্দির। সেখানে থাকতেন সূর্যদেবতা। যাঁরা ভক্ত, তাঁরা নাকি ওই অত উঁচু খাড়া পাহাড়ে হেঁটে উঠে সেই সূর্যমন্দিরে পুজো দিতে যেতেন। চকচক করত রৌদ্রালোকিত সকালে এবং বিকালে সেই কাটারমলের মন্দির। তবে মন্দিরের সামনে কোনো জনমনিষ্যি দেখা যেত না। কোশী নদীর ঠিক উপরে Perpendicular ছিল মন্দিরটি, খাড়া উপরে।

কাটারমলের মন্দিরটি দেখলে মনে হত হাতের কাছেই। কিন্তু বাঙালি পাহাড়ের দূরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান তো কিংবদন্তি। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "পালামৌ"তে সে বিষয়ে বিশদ লিখেও গেছেন। আসলে দূরত্ব ছিল সতেরো মাইল, কিলোমিটারও নয়।

কবিকে বললাম, চলো যাই।

কবি বলল এখানে চিড়িয়াখানা নেই বুঝি? তাই কাটারমল, বালখিল্য!

চিড়িয়াখানা কবির মতে, আমাদের ছেলেবেলাতে কর্ণাটকের গুজরাতের বা মধ্যপ্রদেশের ঘোড়ার গাড়ি চড়ে কলকাতা ঘুরে বেড়ানো পুণ্যার্থীদেরই বুঝি শুধুমাত্র দ্রষ্টব্য। ও জানত না যে, চিড়িয়াখানায় খাঁচা খালি থাকলে আমরা কবিকেই সেখানে পুরে দিতাম পরমোৎসাহে।

কবি যাবে না বলল যখন, তখন আমি একাই যাব ঠিক করলাম পরদিন। যাব আর আসব। মন্দির তো কাছেই। ধীরে সুস্থে চান করে, দোকানে গিয়ে নাস্তা করে যখন শেষপর্যন্ত বেরোলাম, তখন প্রায় বেলা দশটা। ঠান্ডার মধ্যে দশটা কিছু বেলা নয়। কাঁধের ঝোলাতে শিকারের আউটফিট জলের বোতল। অ্যামেরিকান আর্মির ডিসপোজাল থেকে বাবা এক ডজন কিনে এনেছিলেন। গরম খাকি ফ্লানেল দেওয়ার থাকত উপরে—তামার বডি। একটু ভারী হলেও চমৎকার বোতল সব। শীতে জল গরম থাকে, গরমে ফ্লানেল ভিজিয়ে নিলে, বরফের মতন ঠান্ডা। এবং গোটা কয়েক আড়ু আর খোবানি পকেটে পুরে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম। তখন কি জানি যে একদিনে দশ-এগারো মাইল ওই চড়াই উঠে আবার নেমে আসা সম্ভব ছিল না। তখন তো ছাই জানতাম, না যে, দূরত্ব অত মাইল। ভেবেছিলাম, মাইল তিন-চার হবে।

যখন বেরোলাম, তখন কবি ওর ঘরে জানালার পাশে বসে বই পড়ছিল। কী করতে যে বাইরে এসেছে ওই জানে। বাইরে একসঙ্গে না এলে কোনো মানুষকেই চেনা যায় না।

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে দিয়ে বলল, যাবিই অগত্যা। তবে যা। উইশ ঊ্য অল দ্যা বেস্ট।

তখন বুঝিনি, পরদিন রণক্লান্ত সৈনিকের মতন সন্ধেবেলায় হোটেলে ফিরে বুঝেছিলাম যে কবি দূরত্বের কথা এবং রাতে আমার যে ফেরা হবে না আদৌ তাও জানত, জেনেও আমাকে সাবধান করেনি, কম্বল নিয়ে যেতে বলেনি। বন্ধু না শত্রু। —গিণিবাবার সঙ্গে মন্দিরে আমার সেদিন দেখা না হলে তো শীতে মরেই যেতাম।

উঠছি তো উঠছিই। আর কী খাড়া পথ! পনেরো কুড়ি ডিগ্রি খাড়া। বার বার থামি, জল খাই। আধাআধি পথ গিয়ে একটু ফল খেলাম। পথ থেকে আলমোড়া শহরটিকে কোশী নদীকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে। ছবির মতো। ভাবলাম ভাগ্যিস এসেছিলাম।

মন্দিরের কাছে পৌঁছে বুঝলাম যে নীচ থেকে যে মন্দিরকে দেশলাইয়ের বাক্সর মতো মন হয় সেই মন্দির আসলে মস্ত। বছরের এই সময়ে ভিড় নেই। মেদহীন, ঋজু তামারঙা পুরোহিত আমাকে দেখে বাইরে এসে বসলেন চাতালে। ঘন্টা ঝুলছে সার সার মন্দিরের বারান্দা থেকে। আমি ঘন্টাগুলি নাড়িয়ে দিলাম। পূজারি হাসলেন।

কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, এখানে যা শীত। সন্ধেও হয়ে যাবে একটু পরে। অন্ধকারে তো এতোখানি পথ নামা যাবে না আলমোড়ায়। কি হবে?

উনি হেসে বললেন, সূর্যদেব যখন আপনাকে এখানে উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন তখন তিনিই গতি করবেন। ভয়ের কিছু নেই, মনকে শান্ত করুন। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

কলকাতা।

শুনেছি ভারী শহর।

যাননি কখনও?

না।

কোনো বড়ো শহরেই যাননি?

হ্যাঁ। গেছি শ্রীনগরে।

কাশ্মীরে?

উনি হেসে বললেন তাতো জানি না। এখান থেকে পৌরি গেছিলাম। সেখানে থেকে শ্রীনগর হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ—রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বদ্রীবিশাল। তারপর আবার রুদ্র প্রয়াগে ফিরে এসে কেদারনাথ।

তাই? কাশ্মীরের শ্রীনগর নয়?

হ্যাঁ। শ্রীনগরই আমার দেখা সবচেয়ে বড়ো শহর। অলকানন্দার উপত্যকাতে। অবশ্য সেই অলকানন্দাতে মন্দাকিনীও মিশেছে রুদ্রপ্রয়াগে এসে।

আলমোড়াতে যান না?

যাই, তবে কম। মানুষজন আওয়াজ আমার ভালো লাগে না। এখানেই থাকি। দেবতার পুজো করি। বড়ো শান্তিতে আছি বাবা।

এই মন্দির কতদিনের? এতো দেখছি কোনার্কের সূর্যমন্দিরেরই মতো।

উনি হাসলেন।

বললেন লোকে তো তাই বলে! তবে বানিয়েছেনও একই মানুষ দুটি মন্দিরই।

কে?

রাজা নবসিংহদেব, উৎকলের রাজা ছিলেন। তিনি তো কোনার্কেব মন্দিরও বানিয়েছিলেন। এই মন্দিরের বয়স হল আটশ বছরের বেশি। তবে এখন যা দেখছেন তা তো ভগ্নাবশেষ। বক্ষণাবেক্ষণ হয় না।

তাই?

তা ছাড়া কি?

তবে পুজো আমি যেমন করার করি। নরসিংহদেব সূর্যের উপাসক ছিলেন। সূর্য পুজো এখন কম মানুষই করেন। এত কষ্ট করে কম মানুষই পায়ে হেঁটে পাকদন্ডী বেয়ে সারাদিন ধরে উঠে আসেন। প্রায় এগারো মাইল পথ তো! পরে যদি ভাল রাস্তা হয় তো সময় কম লাগবে। আপনার উচিত ভোরে উঠে চলে আসা। তাহলে আজই নেমে যেতে পারতেন। বেরিয়েছেন কখন?

নাস্তা টাস্তা করে দশটারও পরে। তাছাড়া কলকাতাতে তো পাহাড়-টাহাড় নেই। আর এ তো হিমালয় পর্বত। আমাদের এমন খাড়া পাহাড়ে চড়া অভ্যেস নেই।

হতেই পারে।

চারদিকের এই ছোটো ছোটো মন্দিরগুলি কি?

মূল মন্দিরেরই অংশ। ভেঙেচুরে গেছে।

কোনার্কের বিরাট মন্দিরের সঙ্গে এর তুলনা চলে না, তার স্থাপত্যের উৎকর্ষও অনেক উঁচুদরের। তবে উৎকলে বসে এতদূরে যে মন্দির বানিয়েছিলেন রাজা নরসিংহদেব, এই তো যথেষ্ট।

কবে বানিয়েছিলেন?

শুনেছি এটি সম্পূর্ণ হয় বারোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে।

অত্তদিন আগে? আর বানানো শুরু হয়?

বারোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দ।

বাবা! এত বছর লেগেছে বানাতে?

তাতো লাগবেই বাবা। যা কিছু সুন্দর, যা কিছুই স্থায়ী সেসব বানাতে সময় তো লাগেই। আপনার মন্দিরে উঠে আসতেই শুধু দেখার জন্যে যদি একদিন সময় লেগে থাকে তবে এই মন্দির এমন জায়গাতে বানাতে সময় তো লাগবেই। তাছাড়া কোথায় কুমায়ুন আর কোথায় উৎকল। আমি জানি না আপনি হয়তো বলতে পারবেন। উৎকলের নামই শুনেছি শুধু।

বেলা পড়ে আসছিল। মন্দির সূর্যমুখী। এখন সূর্য ঘুরছে। কোশী নদীর জলে কমলার আভা লেগেছে। ভারি ভালো লাগছিল। মন ভরে আসছিল এক ধরনের শান্তিতে যে ধরনের শান্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না আদৌ। পাঠক! মনের ভাব ঠিক বোঝাতে পারব না।

এই নদী কোথা থেকে আসছে? কোশী? জানেন আপনি?

এ সব তো আপনাদেরই জানার কথা বাবা। আপনারা পড়ে-লিখে আদমি। নিজের দেশ, দেশের মানুষ, দেশের নদ-নদী, দেশের দেব-দেবী, মন্দির এসব সম্বন্ধে এই অশিক্ষিত সূর্য-নিবেদিত কূপমন্ডুক পূজারির চেয়ে অনেক বেশি তো আপনাদেরই জানবার কথা।

আমি মাথা নিচু করে রইলাম।

ভাবছিলাম, আমরা ইংরেজি জানি, অল্পস্বল্প ফরাসি জানি, জিশুখ্রিস্টের জীবনী আমাদের মুখস্থ, প্যারিসের নতরদাম গির্জা বা ব্রিটেইনের রাজবাড়ির কুষ্ঠি-ঠিকুজি আমাদের মুখস্থ, ইটালির রোম নগরীর খিলান এবং গম্বুজ সম্বন্ধেও আমরা অনেকই জানি। ক্যাটারমল-ফ্যাটারমল সম্বন্ধে জেনে কি করব আমরা? বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত এসব অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষদের বিষয়। আমাদের স্পিনোজা, কনফুসিয়াস, নীটশে, শোপেনহাওয়ার ইত্যাদিরা আছেন। আসলে কবি কোনো বিশেষ মানব আদৌ নয়। ও আমাদেরই একজন যারা ইংরেজি জেনে নিজের দেশকে অবজ্ঞা করতে শিখেছি। যে-প্রজন্ম প্রকৃতার্থে অশিক্ষিত। ইংরেজি শিক্ষা আর পশ্চিমি জগত যাদের পুরোপুরিই আত্মবিস্মৃত করেছে। ইংরেজরা যতদিন এদেশে ছিলেন ততদিন তাঁদের বিজয়েকেতন আদৌ ওড়েনি। উনিশশো সাতচল্লিশ যতই দূরে সরে যাচ্ছে ততই তাদের বিজয়কেতন প্রবল বিক্রমে উড়ছে বাড়ি থেকে বাড়িতে, ভারতের শহর থেকে গ্রামে।

কাটারমলের সূর্য মন্দিরের চত্বরে বসে সেই আসন্ন-সন্ধ্যায় ভাবছিলাম, একটা সময় হয়তো আসবে কিছুদিনের মধ্যেই যখন কবি বা আমার মতন ভারতীয়রা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম আমাদের ভারতীয়ত্ব সম্পূর্ণই বর্জন করে পুরোপুরি সাহেব হয়ে উঠব। যখন আমরা ভারতে বাস করেও নিজেদের তাবৎ ভারতীয়ত্ব বিসর্জন দেব।

পূজারি বললেন, আমি যতটুকু জানি ততটুকুই বলছি আপনাকে এই কোশী নদী সম্বন্ধে।

বলুন।

গঙ্গা মানে ভগীরথী জানেন তো?

হ্যাঁ, আমাদের কলকাতা শহরও গঙ্গারই উপরে।

তাই? তা গঙ্গার উপনদীদের মধ্যে সবচেয়ে খামখেয়ালি উচ্ছল হচ্ছে এই কোশী নদী। নেপালের হিমালয় পাহাড়ে এর জন্ম। আসলে তিনটি ছোটো নদী মিলিত হয়ে কোশী হয়েছে।

তাদের নাম কি?

তাদের নাম, সান কোশী, অরুণ কোশী এবং তামুর কোশী। এই শেষ নদীটি মানে তামুর কোশীর খাতের দু-পাশের পাহাড় নাকি অত্যন্তই খাড়া। অরুণকোশী নদীর অববাহিকার মধ্যে পড়েছে হিমালয়ের পৃথিবীবিখ্যাত দুটি চূড়া।

কোন্ কোন্ চুড়ো?

এভারেস্ট আর কাঞ্চনজঙ্ঘা।

তারপর?

ওই তিন নদীর মিলনের পর দু-পাশের উত্তুঙ্গ পর্বতরাজির মধ্যের গভীর গিরিখাত বেয়ে কিছুদূর এসে নেপাল থেকে ভারতে ঢুকেছে কোশী হনুমাননগরে এসে। এই কোশী বয়ে গিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বিহারের কুরসেলায়। এই নদী কিন্তু সর্বনাশা। মাঝে মাঝেই এ তীর ভাসিয়ে নিয়ে বহু ক্ষয়ক্ষতি করে দেয়। আমার গুরুদেবের কাছে শুনেছি এ নদী ক্রমশ পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। কে জানে! এই নদীও হয়তো সূর্যপূজারি। পশ্চিমে সরে এলে সূর্যকে ভালো করে দেখা যাবে পূর্বে, তাই বুঝি এই হরকত। শুনেছি, কোশী নাকি গত দুশো বছরে ষাট সত্তর মাইল সরে এসেছে পশ্চিমে।

তাই?

অবাক হয়ে বললাম আমি।

এমন সময়ে, অস্তগামী সূর্যের উলটোদিকে দীর্ঘ ছায়া ফেলে এক দীর্ঘ সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে।

পূজারি হাসলেন। তাঁকে বললেন, দেবতা এসেছে।

আমাকে বললেন, ওঁর নাম গিনিবাবা।

আমি হাতজোড় করে নমস্কার করলাম। স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি না জাগলে আমি কারোকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে পারি না।

গিনিসন্ন্যাসী আমার দিকে চেয়ে রইলেন। মুখে স্মিত হাসি।

আমি বুঝলাম অতিথি নারায়ণ। তাই দেবতা। ভারতের এই চিরকালীন ঐতিহ্য। আজকের বহুতল বস্তিবাসী স্বার্থপর, নিজসুখপরায়ণেরা কি এই ভারতীয় মনোভাবের খবর আদৌ রাখেন?

আও বেটা।

পরম স্নেহে বললেন সন্ন্যাসী। যেমন করে আমার বাবা আমাকে "হারমজাদা" বলেন। নিজের পুত্রকে হারামজাদা বলাতে নিজেই যে শুয়োর হয়ে যান, তা সম্ভবত বাবা জানতেন না।

আমি মন্দিরের মধ্যে যে ঢুকিনি, পুজো যে চড়াইনি, তা পূজারি লক্ষ্য করেছিলেন। যাবার সময়ে আমি ওঁকে পাঁচটি টাকা দিলাম। পাঁচ টাকা ছাত্র-আমার কাছে তখন অনেকই টাকা ছিল আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে।

পূজারি বললেন, আপনি তো মন্দিরে ঢোকেনওনি। পুজোও চড়াননি। এই টাকা আমি নিতে পারি না। আপনি সন্ন্যাসীবাবাকে দিন। এখানে পুণ্যার্থীর আদৌ ভিড় নেই। বিশেষ বিশেষ দিন ছাড়া। তাই, 'মাধুকরী' করে খাওয়া। ওঁর দিন গুজরানে অসুবিধা হয়। অনেকসময় উপোসও থাকেন। তবে ওঁরা সিদ্ধপুরুষ, খিদে-তৃষ্ণা নেই।

আমি নোটটা সন্ন্যাসীকেই দিলাম।

আও বেটা।

বললেন সন্ন্যাসী।

আমি চাতাল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে পূজারি বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি বাবা?

নিশ্চয়ই।

আপনি তো পুজোই দিলেন না তবে এতো কষ্ট করে এই উঁচু পাহাড়ে উঠে এলেন কেন? আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না?

ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। কিন্তু দেব-দেবীতে করি না।

আমি বললাম।

কেন?

ঈশ্বরের সঙ্গে এই মন্দিরে আসার পথেই আমার দেখা হয়ে গেছে। এই পাহাড়ে, রোদঝলমল এই সূর্যমন্দিরের চাতালে, এই বেগে বয়ে-যাওয়া কোশী নদীতে এই দিগন্তব্যাপী পর্বতমালা আর আকাশে ঈশ্বর যতখানি আছেন তার চেয়েও বেশি কি আছেন এই মন্দিরের কোটরে?

যারা দেবদেবীতে বিশ্বাস করে, মানে মূর্তিতে, তাদের বুঝি আপনি ছোটো ভাবেন?

একেবারেই নয়।

আমি বললাম।

তারপর হেসে বললাম, কে বলতে পারে আমি হয়তো অনেক পথ হেঁটে এসেছি আগের আগের জন্মে, অনেক মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে অনেকই পুজো-আচ্চা করে এসেছি, তাই আজকে আমার আর মন্দিরের ভিতরে ঢুকে বিগ্রহের পুজো করার দরকারই হয় না।

এই কথা শুনেই পূজারি আর সন্ন্যাসী দুজনেই দুজনের মুখে চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

পূর্বজন্মে আপনি বিশ্বাস করেন?

পূজারি জিজ্ঞেস করলেন।

বিশ্বাস যেমন করি না তেমন অবিশ্বাসও করতে পারি নি। দুই-ই প্রমাণেই অভাবে। আমার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্বান বুদ্ধিমান এবং বয়স্করা কেউ কেউ যখন বিশ্বাস করেন এবং অবিশ্বাসও তখন দুটো সম্ভাবনার একটাকেও তো অবহেলাতে উড়িয়ে দিতে পারি না!

সন্ন্যাসী খড়মপরা পা এগিয়ে বললেন, হুমম। আও বেটা!

পূজারিকে হাতজোড় করে নমস্কার করে আমি সন্ন্যাসীর পেছন পেছন এগোলাম।

যখন তাঁর গুহাতে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন মনে হল কোডারমার জঙ্গলে দেখা বাঘেরই গুহা। গুহার বাইরে একটি মস্ত কালো চ্যাটালো পাথর, যার উপরে বাঘ বসে রোদ পোহাত।

সন্ন্যাসী ভেতর থেকে একটাা বাঘছাল বের করে এনে বললেন, জুতা উতারকে চেনসে বৈঠো। চাউল সিঝা হুয়া হ্যায়। আলু ভি হ্যায় উসমে। গরম কর দুঁ?

আমি মাথা নাড়লাম ইতিবাচক।

তারপর বললাম, আপনি কি খাবেন?

উনি হেসে বললেন, আমি একচড়াই খাই বেটা। চাল-ডাল তো খাই না। একটু আলু বা কপি সেদ্ধ করে নিই। যা জোটে। নুন বা চিনি খাই না। আনাজ নেই তাই।

নুনহীন সেদ্ধভাত আর আলুই সেদিন পরমানন্দে খেলাম।

তারপর দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এল। শহরে নগরে অন্ধকার "হয়"। সে রাতে বুঝলাম যে পাহাড়-পর্বতে অন্ধকার "নামে"—পাহাড় বেয়ে নদী নামার মতো, গুহা ছেড়ে বাঘ নামার মতো। আলমোড়ার মতো জায়গাতে এসে যে হোটেলে থাকার কোনোই মানে হয় না, সেই রাতে প্রথম বুঝলাম। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে নিচের আলমোড়া শহরের আওয়াজ কমে এল। যানবাহন বলতে এবং ক্বচিৎ গাড়ি সামান্য সংখ্যক বাস ও ট্রাক ছিল, অটো ছিল না। প্রচন্ড বিরক্তিকর এবং বিচ্ছিরি শব্দ-করা মোপেডও ছিল না সেই সময়ে কোনোরকম। কিছুক্ষণের মধ্যেই নানান পোকা ও রাত-পাখির ডাকে পুরো পর্বত সরগরম হয়ে উঠল। এরা কোথায় যে থাকে দিনমানে। ক্রমশ কোশীনদীর শব্দ জোর হতে লাগল। আকাশ ভরে তারা ফুটল। সবচেয়ে আগে ফুটল সন্ধ্যাতারা। জ্বলজ্বল করতে লাগল উপরে উঠে পথভোলা পথিকের দিশারি হয়ে।

সন্ন্যাসী বাইরে এসে বসলেন পাথরের উপরে, তারপরে ভজন গাইতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনিও থামলেন। বললেন, অ্যাইসা বইঠো বাবা। বলেই তিনি জোড়াসনে বসে দেখালেন আমাকে। তারপর এক নাক বন্ধ করে অন্য নাক দিয়ে প্রশ্বাস নেওয়া এবং আবার অন্য নাক দিয়ে কী করে নিঃশ্বাস ছাড়তে হয় তা দেখালেন।

বললেন হররোজ সুবে করতে রহো। মন শান্ত যাযগা। বেটা তুম পিছলা জনমমে কোঈ সাধু-সন্ত থা। জরুর থা।

মনে মনে বললাম, সে তো আমি জানিই। কিন্তু কবি হতচ্ছাড়া মানে কই?

সন্ন্যাসী একটা কম্বল দিয়েছিলেন। ধুনি জ্বলছিল বাইরে। মাঝরাতে একটি বিরাট হিমালয়ান ভাল্লুক বুকে সাদা 'V' চিহ্ন দেওয়া, এসে গুহামুখে দাঁড়িয়েছিল। অতবড়ো ভাল্লুক বিহারে বা উত্তরপ্রদেশে দেখিনি। সেখানে যেসব ভাল্লুক আছে সেসব Sloth Bear। দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। খালি হাত।

সন্ন্যাসী আদর করার মতন বললেন, যা বেটা, যা। আজ মেহমান হ্যায়।

আমি বললাম, সে কি। ভালুক আপনার কথা শোনে?

সন্ন্যাসী বললেন, এই ওর শেষ জন্ম। এবার মরলেই ও মুক্ত হয়ে যাবে।

বলতে পারলাম না কিছুই। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কাটারমল থেকে নামার সময়ে অত সময় লাগল না তবে যে-কোনো মুহূর্তে পা হড়কে গিয়ে হাত-পা ভাঙতে পারত। সন্ন্যাসী এবং পূজারিকেও খুব ভালো লেগেছিল আমার। সকালে উদীয়মান সূর্যের দিকে চেয়ে যা সূর্যমন্ত্র জপ করলেন গিনিবাবা যে, আমার ভয়ই করতে লাগল সূর্য বুঝি কাছে চলে আসবে।

এলেই তো পুড়ে ছারখার।

ভগ্নদূতের মতো যখন আলমোড়াতে পৌঁছে হোটেলে ফিবলাম তখন কবি সবে চান করে বেরুল। তাক তাক ঘন কালো চুল। রাতে না ফেরাতে সে যে আদৌ চিন্তিত তা মনে হল না। উল্টে, আমাকে আমাকে দেখেই ফিচিক করে হেসে বলল, বাতে কোথায় ছিলি ব্যা? আজই তোর বাবাকে টেলিগ্রাম করব। লিখব ছেলে বয়ে গেছে। বাইরে রাত কাটাচ্ছে।

কবি কিন্তু একদিনও আমাদের বাড়িতে আসেনি, আমার বাবা অথবা মায়ের সঙ্গে পবিচিত হয়নি। আসতে বললে, নানা ছুতোতে কাটিয়ে দিয়েছে বারবার।

দীপক বলত, এসব ভাল লক্ষণ নয়রে বুদ্ধু। ক্রিমিনালেরা এরকম করে। তুই একা যাচ্ছিস যা কিন্তু ইন ওয়ান-পিস ফিরলে হয়। বলত, কবির চরিত্রেব দুর্বোধ্যতাটা পুরোপুরি imposed ব্যাপার। আসলে ও মহা সেয়ানা। আমার ন' দাদু পুলিশের দারোগা ছিলন জয়নগরে। তিনি বলতেন এই সব ন্যালাখ্যাপা হাবভাব আসলে ভেক।

দীপকই যে ঠিক তা পরে বুঝেছিলাম। অনেক অনেক বছর পরে।

আমি কিছুই বললাম না কবিকে উত্তরে।

ও বলল, গাঁজার কলকেটা বের কর তোর পকেট থেকে। কাল বাতে এক সাধুর কাছ থেকে ভালো গাঁজা জোগাড় করেছি, আজ খাব। তার কলকেতে খেতে সাহস হয় না। ভেনারাল ডিজিজ হবে। বাপ বিশ্বেস করবে না যে গাঁজার কলকে থেকেই ইনফেকশন এসেছে। মধ্যে দিয়ে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবে। বুড়ো, শেয়ার বাজারে যা কামিয়েছে, সেই যুদ্ধের সময় থেকেই তার আশায়ই তো বসে আছি। চার পুরুষ দুহাতে খরচ করেও শেষ হবে না। আমার বাবা একটা হারামি।

বাবা সম্বন্ধে এরকম কুরুচিকর মন্তব্য, এসব কথাবার্তা শুধু আমি কেন, দীপকও একেবারেই বরদাস্ত করত না। কবির মধ্যে একজন হৃদয়হীন, অসামাজিক তো নিশ্চয়ই, এমনকি সমাজবিরোধী নিষ্ঠুর মানুষ বাস কবত। সেই মানুষের মুখটি মাঝে মাঝেই তার রসিক, অধ্যয়নশীল, বুদ্ধিদীপ্ত মুখোশের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারত। তখন বড়ো ভয় করত আমার।

পরদিন সেজেগুজে বিকেল বিকেল আমি আর কবি রামকৃষ্ণধামে গেছি। যেতেই রামকৃষ্ণধামের মহারাজেরা যেরকম উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করেন সেরকমই করলেন। বললেন, রাত্তিরে খেয়ে যাবেন তো?

আমাদেরই লজ্জা করত। পয়সা নেন না। আমরা ছাত্র, আমাদের নিজেদেরও এমন কিছু সামর্থ্য নেই যে, ওঁদের কিছু সাহায্য করি। অন্তত আমার। আমি জানতাম না যে, কবির বড়োলোক বাবার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কী সম্পর্ক ছিল! তবে ভালো সম্পর্ক যে ছিল তা তো দেওঘরে গিয়েই বুঝেছিলাম। এও জানতাম না যে, আলমোড়ার এই রামকৃষ্ণধামের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের আদৌ কোনও সম্পর্ক ছিল কি-না। সারা ভারতবর্ষেই তো রামকৃষ্ণদেবের নামে অগণ্য মঠ আশ্রম এবং ধরমশালা আছে। সাধারণের অনেকেই হয়তো মনে করেন যে, সে-সবের সবক'টিই রামকৃষ্ণ মিশন চালান। তা নয়। রামকৃষ্ণ মিশন না চালালেও তাদের মধ্যে বহু আশ্রম ও মঠই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

যাই হোক, ওঁরা বললেন যে, খান আর নাই খান থেকে যান কিছুক্ষণ আজকে। ভজন গাইবেন সজ্জনবাবু সন্ধের পরে।

সজ্জনবাবুটি কে?

সজ্জনবাবু আলমোড়া শহরের একজন বিশিষ্ট গায়ক। চোখ নেই। বড়ো ভালো গান করেন।

কবি আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, দুসস শালা! কী গান-ফান শুনব। চল ভেগে পড়ি এখান থেকে। কবির সঙ্গে গানের কোনওদিনও কোনও সম্পর্ক ছিল না। গান যে ভালোবাসে না, সে মানুষও খুন করতে পারে। কথাটা মিথ্যে নয়।

আমি বললাম, তোর যেতে হলে তুই যা, আমি থাকব। আমি সজ্জনবাবুর ভজন শুনে তারপরেই যাব।

তখন শুক্লপক্ষ। সন্ধের পরে চাঁদ উঠেছে। আদিগন্ত কুমায়ুঁন হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে, খাদের খাঁজে খাঁজে, ফুটফুট করবে চাঁদের আলো সন্ধের পরে আমি জানি। মন্দিরের অগুরু চন্দন ধূপকাঠির গন্ধে তখনই প্রাণটা গান-গান করছিল।

আমি আবার বললাম যে, যেতে হলে তুই যা, আমি কিন্তু থাকব।

কি মনে করে কবি বলল, ঠিক আছে। আমার করবারই-বা কি আছে! মল্লিতাল হয়ে হেঁটে গিয়ে অতদূরে কোশী নদীর পাড়ে সেই হোটেলে গিয়ে তো রাতে খেয়েদেয়ে শুয়েই থাকতে হবে। ঠিক আছে তুই যদি শুনিস, আমিও থাকব তোর সঙ্গে।

নানারকম গল্প-গুজব হল সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। সন্ধেও হল। আগেই বলেছি যে, রামকৃষ্ণধামের পিছনে গভীর খাদ এবং তার পরে আবার সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি। তারপরে আবার খাদ, আবার পাহাড়। এবং সেসব পাহাড়ে একটিও গাছ নেই, লতা নেই, গুল্ম নেই। তখন মে মাস। এই কুমায়ুঁন হিমালয়ের কিছু কিছু জায়গা বোধহয় এইরকমই হয়। তার আগে আমার এরকম কোনও দৃশ্য দেখা ছিল না বলে আমাকে ভীষণই আহত করল। পাহাড় মানে, জঙ্গল থাকবে, গাছ থাকবে, ফুল থাকবে, পাখি থাকবে। এরকম ন্যাড়া পাহাড় আমি আগে কখনও দেখিনি। অনেকদিন পরে দেখেছিলাম, ওড়িশার কালাহান্ডিতে এবং গাড়োয়াল হিমালয়তেও। সে প্রসঙ্গ অন্য। আমার হিমালয়, আমার কাছে তখনও পর্যন্ত দার্জিলিং শিলং এবং তুরাতেই সীমিত ছিল। এই হিমালয় দেখে বুঝলাম আসল হিমালয় একেই বলে।

এরকম ন্যাড়া পাহাড়, ছমছমে নয় কিন্তু এক ধরনের নির্জন ভৌতিক অনুভূতি মনের মধ্যে সঞ্চারিত করত। তখন আমার কতই বা বয়স! আগেই বলেছি আঠারো-উনিশ। ওই বয়সের ছেলের পক্ষে যা কিছুই দেখি, যা কিছুই শুনি, তাই শরীরে রোমাঞ্চ জাগায়। আর একটা কথা শিখেছিলাম যে, কোনও অভিজ্ঞতাই জীবনে ফেলা যায় না।

দীপক কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ আওড়াত—"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা/ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা/পুণ্যের পদপরশ তাদের পরে।"

রবীন্দ্রনাথকে আমরা কটু-কাটব্য তো করতাম না। কোনো কোনো সর্বজ্ঞ, আধুনিক সাহিত্যিকদের মতো তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করতাম না। তিনি আমাদের "বিলাস" ছিলেন না। আমাদের "Mentor" ছিলেন। "নাই মামা"র চেয়ে যেমন "কানা মামা" ভাল, তেমন গুরুহীন গোরু হওয়ার চেয়ে গুরুমুখী গোরু হওয়াকেই আমরা শ্রেয় বলে বিবেচনা করতাম।

তখন তো জানতামও না যে কোনোদিন লেখক হব! আজকে যখন একটু আধটু লেখালেখি করি তখন ভাবি যে ভাগ্যিস সেই তরুণ বয়সে আমাদের এরকম মনোভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের একাধিকভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

আমরা বসে আছি। অন্ধকার নেমে এল এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদ উঠল। তারাও ফুটে উঠল অগণন. সমস্ত আকাশে। যদিও শুক্লপক্ষে তারা নিষ্প্রভ। সবচেয়ে আগে ফুটল সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করে। তার নীল সুবজাভ স্নিগ্ধ দ্যুতিতে। তারপরে চাঁদ তার স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্বচরাচর উদ্ভাসিত করে সেই আদিগন্ত বৃক্ষহীন রুক্ষ পর্বতশ্রেণির মধ্যে। ডাইনি-জ্যোস্না ছমছম করতে লাগল। মনে হল অমন রাতেই বোধহয় জিন-পরিরা খেলা করে ওইসব পর্বতরাজির অন্দরে-কন্দরে।

বসে আছি। যখন সাড়ে সাতটা মতো বাজে তখন এলেন সজ্জনবাবু। বেঁটেখাটো ভদ্রলোক। সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা। চোখে কালো চশমা। অন্ধ তো! তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীরা দোতলার একটি ঘরে বসালেন। আগে থেকেই ধূপ জ্বালানো হয়েছিল। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ছমছমে জ্যোৎস্না এবং নির্জনতা মিলেমিশে অদ্ভুত পরিবেশ। ভজন বোধহয় এমন পরিবেশেই শুনতে হয়।

সজ্জনবাবু এসে বসার পরে আমরা সবাই সেই ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে বসলাম। তাঁর দুই শিষ্য জোড়া তানপুরায় পুরো ঘরটি সুরে ভরপুর করে দিয়েছিল। তবলচিও ছিলেন একজন। মুখে পান, গলাতে চেকচেক মাফলার।

গান গাইবেন সজ্জনবাবু, তবলচিব গলাতে মাফলার কেন। তা বোঝা গেল না।

জোড়া তানপুরার আওয়াজ শুনে কবি বলল, এ কী যন্তর রে!

বলল, অবশ্য আস্তে আস্তে, আমার কানে কাঠ ঠেকিয়ে।

আমি বললাম, একে বলে তানপুরা।

কবি বলল, কী বললি? পুরোনো তান।

আমি বললাম, চুপ কর।

একটু পরেই সজ্জনবাবুর ভজন আরম্ভ হল।

প্রথমে গানটি এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে : 'খোঁজহে খোঁজহে তুমহে কানহাইয়া মুঝে নয়না ধরে'। মানে, ও কৃষ্ণ, তোমাকে আমি আমার চোখের কোণে কোণে খুঁজে বেডাচ্ছি। তুমি কবে আমাকে দেখা দেবে?

আমার অবাক লাগল, অন্ধ বলেই হয়তো এই গায়কের নিজের চোখ দিয়ে কৃষ্ণকে দেখার এতো আকুতি। কী ভাব গলায়! কী সুর, কী স্বর, প্রতিটি পর্দা স্বরে নিষ্কম্প নিবাত প্রদীপের মতো দাঁড়াচ্ছে। না, এক চুল নড়ে না। যতই হাওয়া বয়ে যাক, যতই ঝড উঠুক, স্বর নড়ে না। স্বর স্বস্থানে সুস্থিত।

আমি গায়ক নই, বোদ্ধা নই, কিছুই নই। আজও নই, তখন তো ছিলামই না। উনিশশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে। আমি একটি থার্ড ক্লাস জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই। তবে শুধু এটুকুই বলব যে, সেই গান আমাকে বিদ্ধ করে ফেলল।

পরপর অনেকগুলি গান গাইলেন সজ্জনবাবু।

গান শেষ হল। কিন্তু মহারাজ বললেন যে, আপনারা এখুনি যাবেন না, সজ্জনবাবু আরও গাইবেন। আরও হয়তো অনেকক্ষণই গাইবেন, হয়তো অনেক ঘণ্টা থাকবেন, তারপরে খেয়ে দেয়ে বাড়ি যাবেন। কিন্তু আমাদের তো আবার অনেক পথ ঠেঙিয়ে তিন —সাড়ে তিন মাইল পথ চড়াই উতরাই পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছে, হালুইকরের দোকানে খেয়ে শুতে হবে। ততক্ষণে যদি হালুইকরের দোকান বন্ধ হয়ে যায় খাবারও পাওয়া যাবে না। আর আমার সঙ্গী কবি, গানের সঙ্গে যে তার ঘোর নফরত।

যাই হোক, আমরা বসলাম। আরেকটা গান উনি আরম্ভ করবেন এই আশায় বসলাম। এবং ঠিক করলাম, ওই গানটা হলেই আমরা চলে যাব।

আবার জোড়া তানপুরা বাজতে লাগল। ঘরময় সুরের পায়রাগুলি ওড়াওড়ি করতে লাগল। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ কেমন এক আবেশ জাগাল মনে।

জানালা দিয়ে তাকালাম সেই বিশ্বচরাচর ভরাট করা-জ্যোৎস্নাতে ভিজে সপসপে অসীম দুর্দম পর্বতশ্রেণির দিকে, যে পর্বতের সঙ্গে আমার কোনও পূর্ব পরিচয় ছিল না।

অনেক জায়গাতেই শিকারে গেছি শিশুকাল থেকে, কিন্তু সেসব জঙ্গল হালকা-গাঢ় কতরকমের সবুজে, কত ধরনের হলুদে, লালে, কালোতে, পাটকিলেতে কর্বুর। কিন্তু এই যে দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ না করে বিদ্ধ করেছিল। কে জানে! গুণীরা বলতে পারেন, বিদ্ধ হওয়াটা মুগ্ধ হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি মুগ্ধতা কি না! নিজে জানি না।

আবার গান ধরলেন সজ্জনবাবু একটু পরেই। ভজনই।

সে গানটি হচ্ছে : "বসসো মেরে নয়নানোমে নন্দলাল।"

গানটি পুরোই গেয়েছিলেন। কিন্তু আজ আর আমার গানটির বাণী মনে নেই। শুধু মুখটিই মনে ছিল গানের। কোথায় উনিশশো চুয়ান্ন আর আজকে উনিশশো ছিয়ানব্বই। বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর হতে চলল।

আপনারা বললে হয়তো অবাক হয়ে যাবেন, এই গানটির বাকি পদ আমি আবিষ্কার করেছিলাম উনিশশো চুরানব্বইয়ের দেওয়ালির সময় যখন গাড়োয়াল হিমালয়ের পাদদেশে, হৃষীকেশে ছিলাম। সেখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, ধিয়ানগিরি সন্ন্যাসী। বিরাট বড়ো গাইয়ে। নিজের নামে একটি রাগও সৃষ্টি করেছেন 'ধিয়ান যোগ' বলে। যোগ রাগের ভ্যারিয়েশান বিশেষ।

তাঁকে যখন বললাম, একটি ভজন বড়ো ভালো লেগেছিল, আলমোড়ায় শুনেছিলাম। বলেই, গানেব মুখটি যখন তাঁকে গেয়ে শোনালাম উনি বললেন, বেটা, ম্যায় তুমকো পুরা সুনাউঙ্গা।

তাই ভাবি। এক জীবনে কত কী ঘটল। আমি কী দারুণ ভাগ্যবান।

সেদিন ফেরবার পথে ফুটফুটে চাঁদের আলোয় ভেসে গানের সুরে মোহিত হয়ে হোটেলে ফিরলাম।

তারপরে ভালোই কাটছিল দিন। কিন্তু তিনদিন পরেই কবির মাথায় ভূত চাপল। ও বলল, আমি কাল সকালেই মায়াবতীতে চলে যাব।

বুঝিয়ে বললাম যে, এদিকটাতে তো কোনোদিন আসিনি। তুইও তো দেখিসনি এদিকটা। চল আমরা রানিখেতে গিয়ে দুদিন থাকি। সেখানে চৌবাটিয়া গার্ডেনস আছে। দেখবার মতো। শুনেছি আরও কত কিছু দেখবার জায়গা আছে। তারপর রানিক্ষেত থেকে নৈনিতাল যাব। নৈনিতালটাও দেখে নেব। জিম করবেটের ভক্ত আমি সেই কৈশোর থেকেই। জিম করবেটের বাড়ি আছে নৈনিতালে। নৈনিতাল থেকে চলে যাবো কালাধুঙি। জিম করবেটের গ্রীষ্মাবকাশের বাড়ি যেখানে। "জাঙ্গল লোব"-এর পটভূমি। কালাধুঙিতে যেতে হয় নৈনিতাল থেকে ভীমতাল হয়ে।

কবি বলল, তোর ওসব মতলব রাখ। ওসব দেখতে হয়, আলাদা আবার আসিস একা একা। আমি মায়াবতী যাব বলেই এসেছি, মায়াবতীতেই যাব।

আমার ওসব সাধু-সন্ন্যাসী, মিশন-ফিশন ভালো লাগে না। আমার বেড়াতে ভালো লাগে। তুই একাই যা। আমি যাব না।

আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম।

ও বলল, সেসব ভয় কি দেখাচ্ছিস? আমি তো সারাজীবনই একা। তোর মতন কি লালু ছেলে? একাই যাব।

বললাম, আমার পয়সাটা ফেরত দিয়ে যেয়ো। নইলে তো দেওঘরের মতোই অবস্থা হবে আমার আবারও। তাও সেবার দীপক সঙ্গে ছিল। টাঙায় করে আসবে তুমি, টাঙার উপরে ভাড়া-করা সাইকেল চড়িয়ে, আমার আর দীপকের টাকা উড়বে তোমার দুপাশের পকেট থেকে ঝরা পাতার মতো। ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘে দেখে ভয় পায়। হিজ-হিজ হুজ-হুজ হয়ে যাক।

ও বলল, বিলক্ষণ। তোমার টাকা তোমাকে দিযেই যাব। যা আমার কাছে গচ্ছিত আছে।

যা দিল, তা-ই পরমানন্দে হাত পেতে নিলাম। একা প্রবাসে, সামান্য অর্থ পকেটে নিয়ে নানারকম বিপদই হতে পারত কিন্তু একটা কথা অবশ্যই বলব, ঈশ্বর আমার প্রতি পরম করুণাময়। দেশে কী

বিদেশে, দেশে-বিদেশের কোনো নগরে, গ্রামে বা কোনো প্রত্যন্ত প্রদেশেই কখনও কিছুর জন্যেই আজ পর্যন্ত আমার ঠেকে থাকেনি। সে পকেটে পয়সা থাকুক আর না-ই থাকুক। ঈশ্বরের এ এক পরম আশীর্বাদ। সারাজীবনই এরকম আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটেছে! সে সমস্ত ঘটনা ঘটার কোনো কথাও ছিল না। এই সংসারে, সমাজে একা যে থাকতে চায় তার কপালে অশেষ দুঃখ। দুঃখ ভোগ করেছি, করছি, কিন্তু রাজনৈতিক, পারিবারিক, সাহিত্যিক কোনো দলেই ভিড়তে পারিনি। ওর দলে ভিড়লাম না বলে কবি তো আমার উপরে এমনই রেগে গেল যে বলার নয়।

কথা ছিল, সকালবেলা আমি ওকে বাসে তুলে দেব। ও কিছুটা রাস্তা বাসে যেতে পারবে এবং কিছুটা হেঁটে যেতে হবে এই বলেছিল। কিন্তু ও আমার উপরে এমন রেগে ছিল যে, ঘুম থেকে খুব তাড়াতাড়ি উঠেও দেখলাম যে, সে চলে গেছে।

আমার মনটা খারাপ লাগছিল।

আগেই বলেছি, কলকাতা থেকে এতো দূরে কোনোদিন আগে কখনও একা আসিনি। আর তখন বয়সই বা কত! তাছাড়া, তখন তো কমিউনিকেশনও এতো ডেভেলপড ছিল না। S T D ছিল না, FAX ছিল না, E.MAIL কিছুই ছিল না। কোনো খবরাখবর, দেওয়া-নেওয়া করতে অনেকই সময় লাগত। কিন্তু ডাকবিভাগ অনেক দায়িত্ববান এবং দক্ষ ছিল। তিনদিনে মায়ের লেখা পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম আমি কলকাতা থেকে। তখন একমাত্র ভরসাই ছিল পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিস।

আমি যেখানেই যেতাম, মা ভারি সুন্দর চিঠি লিখতেন আমাকে গোটা গোটা অক্ষরে। সুন্দর হাতের লেখা ছিল মায়ের। পোস্টকার্ডেই লিখতেন সবসময়ে সময়াভাবে। স্নেহের খোকন বলে সম্বোধন করে। যা সব মায়েরাই লিখে থাকেন, সব ছেলেদের, আমার মা-ও তাই লিখতেন। সাবধানে থাকবে, আজেবাজে জিনিস খাবে না, ঠান্ডা লাগাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমার জন্যে মন খারাপ করে।

আমার মা আমাকে অত্যন্তই স্নেহ করতেন এবং সেজন্যে বাবা তাঁকে ঠাট্টা করতেও ছাড়তেন না।

আলমোড়াতে পৌঁছোনো মাত্র মাকে চিঠি লিখেছিলাম। জানতাম চিন্তা করবেন অযথা তাই। আমি আবার পোস্টকার্ডে কোনোদিন চিঠি লেখা পছন্দ করিনি, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া। সবসময়েই দীর্ঘ চিঠি লিখতাম এবং খামে লিখতাম। চিঠি লিখতে লিখতেই বাংলা ও ইংরেজি লেখা একটু রপ্ত হয়েছে। তাও এ-জীবনে কয়েক লক্ষ চিঠি লিখেছি বইকী। আর প্রায় পঞ্চাশ হাজার মতন লিখে, ছিঁড়ে ফেলেছি।

কবি চলে গেল। মনটা ভীষণই খারাপ, ওর সঙ্গেই তো এসেছিলাম। ও না নিয়ে এলে তো আলমোড়া আসাই হত না আমার। কী আর করা যাবে। মনকে বোঝালাম, সংসারে মানুষ তো মরেও যায়। কবি না-হয় আমাকে ছেড়েই গেছে শুধু।

সারাটা দিন হোটেলেই বসে রইলাম। তাবপর বিকেলে বেরিয়ে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালাম। এ ক'টি দিন কবির সঙ্গে যে কতখানি অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম তা ও চলে যাওয়াতে বুঝলাম।

আলমোড়া থেকে দেখা যেত হিমালয়ের নন্দাদেবী, ত্রিশূল ইত্যাদি শৃঙ্গ। অবশ্য আকাশ পরিষ্কার থাকলে। কাটারমলে উঠে-নেমে জুতোটার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল। পথে দাঁড়িয়ে এক জুতো-পালিশওয়ালাকে দিয়ে জুতোটা পালিশ করাচ্ছিলাম। সে বলল, বাবু এখানে শীতকালে আসবেন। এখন কেন এসেছেন? শীতকালে আসবেন, দেখবেন এর কী রূপ! আলমোড়ার রূপ, চতুর্দিকের রূপ। ঝকঝক করবে বরফে-ঢাকা চুড়োগুলো।

মনে মনে বললাম, আসব।

এদিক-ওদিক উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটাহাটি করে ফিরে যখন আসছি হোটেলের দিকে, দেখলাম এক বেঁটে-খাটো ভদ্রলোক! দেখে মনে হল বাঙালিই। আমার উলটোদিক দিয়ে আসছেন। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে বললেন, বাঙালি মনে হচ্ছে।

বাঙালিদের এই এক দুরারোগ্য রোগ। উনিশশো চুয়ান্নতে যেমন ছিল ছিয়ানব্বুইতেও তেমনই আছে।

বললাম, হ্যাঁ।

তা, কি করতে আসা?

বেড়াতে।

একা একা? কলকাতা থেকে?

কি করা যাবে। দোকাই এসেছিলাম। আমার সঙ্গী আমাকে একা রেখেই চলে গেছে।

কোথায়?

মায়াবতী।

সে তো ভালো জায়গা।

হবে।

তাপর বললেন, এখন কোথায় যাচ্ছেন?

হোটেলে। কোথায় যাব আর? রামকৃষ্ণধামে যেতে পারতাম। তবে আজ আর ইচ্ছে করছে না।

এই বয়সেই ধাম-টাম কেন? সন্ন্যাস নেবেন নাকি? উঠেছেন কোথায়? এখানে আবার কোনো হোটেল আছে নাকি ভদ্রলোকের থাকার মতো।

হোটেলের নাম বললাম। বললাম, ছোটো লোকদের পক্ষে চলে যায়। দেখালামও আঙুল দিয়ে আমাদের আস্তানা। হোটেলের কাছেই পৌঁছে গেছিলাম।

উনি বললেন, চলুন। সন্ধে তো হয়নি এখনও। এখন হোটেলে গিয়ে করবেনটাই বা কি? চলুন আমার বাড়িতে। এখানে বাঙালি দেখার জন্যে আমরা হাঁ করে থাকি। যাঁরা আসেনও, সব বুড়ো-থুড়ো পুণ্য-প্রত্যাশী, যদিও তেমন বিখ্যাত মন্দির এদিকে নেই এক কাটারমল ছাড়া। সেখানেও কেউ যায় না।

আমি গেছিলাম।

বলেন কি? আমি তিনবছর এখানে আছি, আমিই যাইনি।

তাই?

ভদ্রলোক আমার হাতে ধরে নিয়ে গেলেন বেশ খানিকটা পথ।

ওঁর বাড়িতে গিয়ে জানা গেল যে, উনি আলমোড়া জেলার হেলথ অফিসার। উত্তরপ্রদেশ সরকারের। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলেন। কালোর মধ্যে অত্যন্ত সুশ্রী, বুদ্ধিমতী চেহারা। এবং তাঁর শালীর সঙ্গেও। তার তখন বয়স হবে এই চোদ্দো-পনেরো। ছিপছিপে মিষ্টি চেহারা সপ্রতিভ। খলবলে। গল্প হল। গাজরের হালুয়া খেতে দিয়েছিলেন মনে আছে, বউদি।

আমি তখন 'দক্ষিণী'তে ভরতি হয়ে গেছি। নিয়মিত ক্লাস করে কিছু কিছু গান শিখেওছি রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভদ্রমহিলা আমাকে দেখে বললেন, আপনাকে দেখে মনে হয় যে, আপনি গান করেন, নিশ্চয় করেন।

বললাম, এরকম কথা তো কোনোদিনও শুনিনি। দেখে মনে হতে পারে ফলটা পচা, মনে হতে পারে মিষ্টিটা ভালো। কোনো মানুষকে দেখে যে মনে হতে পারে সে গান গায়, এ তো অভাবনীয় ব্যাপার! আপনি অসাধারণ মহিলা বলতে হবে। গান গাই বটে, তবে তাকে গান বলা হয়তো চলে না। এখনও গায়ক যাকে বলে, তা হয়ে উঠিনি।

আমরা এখানে অগায়কের গানই বা কোথায় শুনতে পাই বলুন? গান শোনান আমাদের।

আমি তো শিশুকাল থেকে গান শোনাবাব জন্যে মুখিয়েই আছি, তার উপর পরেশের উসকানি। কিন্তু আমার গান শুনতে চায়টা কে? তাই গান শোনাবার অনুরোধ আসামাত্র সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে ফেললাম গান। পরপর কয়েকটি।

আমার গান শুনে তো বৌদি আর তাঁর সহোদরা একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। ভাব দেখে মনে হল, হয়তো গাধা গাইলেও হতেন। ভদ্রলোককে মনে হল, গান-টানে বিশেষ মতি নেই। তবে আপত্তিও নেই। খুবই স্নেহপ্রবণ এবং বন্ধুবৎসল মানুষ। একবার যেতেই আমি যেন ওঁদের পরিবারভুক্ত হয়ে গেলাম।

তার পরদিন থেকে এবেলা ওবেলা যেতে লাগলাম। না গেলে, মান-অভিমান এবং রাগারাগিও হত। আমার জন্যে স্পেশাল রান্না হত, বিশেষ করে গাজরের হালুয়া। সেসময় ওই অঞ্চলে গাজর

অঢেল। অতি সুস্বাদু গাজরের হালুয়া। সিঙাড়া, নিমকি সবই বাড়িতে বানানো। মনমতো খিচুড়ি। ওঁরা প্রায়ই বলতেন কেন কষ্ট করে ওখানে আছেন? আমাদের এখানেই চলে আসুন। এক্সট্রা ঘরও আছে। কোনোই অসুবিধে নেই।

ওঁদের বাড়িটা ছিল প্রধান পথটির উপরেই তবে শহরের ভিড়-ভাট্টা ছাড়িয়ে। নির্জন, সুন্দর জায়গাতে।

বললাম, হোটেলে উঠেছি, ভালোই আছি। স্বাধীনতা আছে, বুঝলেন না।

আমরা কি তা কেড়ে নেব?

না, তা নয়।

তবে?

বউদি বললেন।

Man proposes God disposes! তার ঠিক দুদিন পরেই, আমার হঠাৎই জ্বর এলো। বিকেলের দিকে ওই হালুইকরের দোকানে গিয়ে এক গেলাস গরম দুধ খেয়ে এসে শুয়ে পড়লাম দরজা বন্ধ করে।

পরদিন আমার দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা দিল যেন কেউ। বেলা কত? দিন না রাত কিছুই বুঝতে পারলাম না। স্বপ্ন দেখছি কি?

ঘুম ভেঙে দেখি, বিছানা থেকে নামতে পর্যন্ত পারছি না, আমার গায়ে এতো জ্বর। তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। প্রায় সাড়ে-বারোটা একটা বাজে।

কবি কি দূর থেকে বাণ মারল আমাকে? ভাবলাম।

সকাল থেকে ঘর থেকে বেরোইনি দেখে ওই হোটেলের ম্যানেজার কাম-বেয়ারা, কাম-ঝাড়ুদার-কাম-ক্যাশিয়ার-কাম-প্রোপ্রাইটার দরজা ধাক্কা দিচ্ছিলেন। কোনোরকমে উঠে কম্বলটা সরিয়ে টলতে টলতে গিয়ে দরজাটা খুলেছি, উনি বললেন, ক্যায়া হুয়া সাব আপকি?

বললাম, বুখার।

আর কিছু বলার অবস্থা ছিল না।

আমার কপালে সস্নেহে হাত দিয়ে বললেন, বাহুতই জাদা বুখার হ্যায়। ম্যায় ডাগদার বুলাতা হ্যায়।

বলেই, উনি কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার ডেকে আনলেন। ডাক্তার কিসব ওষুধ-টষুধও লিখে দিলেন।

ইতিমধ্যে আমাব সেই হেলথ-অফিসার দাদা এসে হাজির।

দেখুন পাঠক! কত আদর-যত্ন পেয়েছি, কত ভালোবাসা, অথচ আজকে তাঁদের একজনেরও নাম কিছুতেই মনে পর্যন্ত করতে পারছি না। পদবিও নয়। তবে মনে আছে যে ওঁরা বৈদ্য ছিলেন। সেন, সেনগুপ্ত, গুপ্ত বা দাশগুপ্ত এরকম কিছু। সময় এরকমই নিষ্ঠুর, স্মৃতি এরকমই বিভ্রমকারী, প্রতারক।

উনি বললেন, কী ব্যাপার? তুমি পরপর দুদিন যাওনি। আমরা তোমার পথ চেয়ে বসে থাকি। তোমার বউদি বারবার তোমার কথা বলেন। তিনিই বললেন এসে খোঁজ করতে। ভাবলাম, খাওয়ার সময় তো হোটেলে ফিরবেই, তখন ধরব। রামকৃষ্ণধামেও খোঁজ করেছি তোমার।

আমার তখন তো কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। কি বলেছিলাম ওঁকে কিছুই মনে নেই। আবারও আমি শুয়ে পড়লাম। তখন হোটেলের মালিক ওষুধ আনতে গেছিলেন। ওঁরা আমাকে দুধ খাওয়াবার জন্যে জোরাজুরি করতে লাগলেন যে এটুকু মনে আছে আমার। দুধ খাবার মতো অবস্থাই ছিল না। আবারও অজ্ঞানের মতো বিছানাতে শুয়ে পড়লাম। কত জ্বর ছিল ভগবানই জানেন। তারপরে আর কিছুই মনে নেই।

জ্ঞান যখন ফিরল, দেখি হোটেলের ঘরে নয়, একটি অচেনা ঘরে শুয়ে আছি। এবং তখন সকাল বেলা।

একি হাসপাতাল?

ঘরের পাশেই মস্ত জানলা। জানলা দিয়ে নন্দাদেবী দেখা যাচ্ছে। আজ আকাশ ঝকঝকে নীল। আমার আমার পায়ের কাছে মোড়া পেতে বউদির ছোটো বোন বসে আছে। তারও নাম ভুলে গেছি।

কী অকৃতজ্ঞ আমি! বউদি আমার মাথার কাছে বসে ওডিকলোন মেশানো জলে ন্যাকড়ার পট্টি ডুবিয়ে ডুবিয়ে কপালে দিচ্ছেন। বউদির বোন একটি কচি কলাপাতা-রঙা সালোয়ার-কামিজ পরে ছিল। আজও অসুস্থ হলে, মাঝে মাঝে দেখতে পাই তাকে। উদ্বিগ্ন মুখে দুদিকে দু-বিনুনি ঝুলিয়ে আমার মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে আছে সে। মাঝে মাঝে ভাবি, এক জীবনে কত কী প্রাপ্তিই না ঘটল! ঋণে আকণ্ঠ ডুবে আছি। শোধ করা তো দূরস্থান, স্বীকার যে করব তারও উপায় নেই। ছিঃ ছিঃ!

কথা বলার আগেই বললেন, কথা বলবে না একদম। চুপ করে শুয়ে থাকো। জ্বর কমেছে। আস্তে আস্তে আরও কমবে এবং ছেড়ে যাবে।

কিছুদিন আগেই আমার 'আপনি" থেকে "তুমিতে" demotion হয়েছিল। নাকি সেটাই promotion? কে জানে!

ওঁরা যে আমাকে কী যত্নে ও আদরে সুস্থ করে তুললেন দুদিনের মধ্যে তা কী বলব!

সুস্থ হয়ে ওঠার পর বউদি বললেন, তোমার আর হোটেলে ফিরে যাওয়ার দরকার নেই। প্রথমেই বলেছিলাম এখানেই থাকো। লোকজনের কোনো অভাব হবে না। আমাদের এখানে ঘরও আছে। তোমার এখান থেকে আর কোথাওই যেতে হবে না। যেতে দেব না আমি।

সকালে-বিকেলে গান গাইতাম। ঋণের সামান্যটুকু তাতে শোধ হত। বেড়াতাম। কখনও বউদি বা বউদির ছোটো বোনও আমার সঙ্গে যেতেন। কত মজা!

একদিন দাদা বললেন, টুরে যাচ্ছি। একটি আমেরিকান মিশনের হাসপাতাল ইন্সপেক্ট করতে। তুমি থাকো বাড়িতে। তোমার যত্ন-আত্তির কোনোই অসুবিধা হবে না। দেখাশোনা কোরো ওদের। ওরা তো একাই থাকবে। একদিন পরই ফিরে আসব।

কোথায় যাচ্ছেন টুরে?

কৈলাসের রাস্তায়। এখান থেকে মাইল কুড়ি হবে।

কৈলাস মানস সরোবর, সেই কৈলাসে?

কৈলাস নয়রে পাগল। সেই পথেই যাব কিছুটা।

কিসে করে যাবেন?

কেন? হেঁটেই যাব। কৈলাস মানস সরোবরেও তো মানুষ হেঁটেই যায়।

ঝুলে পড়ে বললাম, দাদা! আমাকে নিয়ে চলুন, প্লিজ!

তুমি কি পারবে? একদিনে অতটা?

আমি উৎসাহে ডগমগ হয়ে বললাম, নিশ্চয়ই পারব। কাটারমলে গেলাম না সেদিন! তাছাড়া আমি তো শিকার করি, টেনিস খেলি।

ডাক্তারদা বললেন, তোমার শরীব এখনও দুর্বল আছে। কাটারমলের চেয়ে অনেকই বেশি পথ কিন্তু।

তারপর কি ভেবে বললেন, চলো। এদের দেখাশোনার ভার আমাব অফিসের এক কলিগের উপরে দিয়ে যাব।

পরদিন ভোরে রওনা হলাম। দাদার সঙ্গে। দুটি খচ্চরের পিঠে ওষুধ-পত্র নানারকম। আমাদের কম্বল ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং একজন ডুটোয়ালও রইল সঙ্গে, তারা কপালে দড়ি লাগিয়ে মাল বয়। দড়ি দিয়ে বানানো ঝাঁকার দড়ি, কপালে থাকে, মালের সঙ্গে কাঁধের সরাসরি সম্পর্ক। ঝাঁকাটা থাকে পিছনে, তার মধ্যে থাকে জিনিস। বউদির হাতের করা লুচি-তরকারি মিষ্টি পথে যাতে মধ্যাহ্নভোজের সময় আমাদের কষ্ট না হয়।

আলমোড়া শহর ছেড়ে আমরা গ্রাম্য, পার্বত্য, পায়ে-চলা পথে এসে পড়লাম দেখতে দেখতে। দাদা বললেন, বুঝলে ভায়া মাইল কুড়ি পথ। সারাদিন লাগবে যেতে। আর এ তো সমতল পথ নয়। কুমায়ুণ হিমালয়ের চড়াই-উতরাই এর পথ।

মনে প্রচুর আনন্দ। কৈলাসের রাস্তায় যাচ্ছি। একথা ভেবেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বই পড়েছিলাম স্কুলে থাকতেই। "তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ", "কৈলাস ও

মানস সরোবর"। বুঢঢা বোসের (বুদ্ধদেব বোস) রঙিন মুভি ফিল্ম দেখেছি মানস সরোবরের উপরে। মানস সরোবরেই পৌঁছে গেছি, এইরকম একটা ভাব আর কি।

আজ পেছন ফিরে তাকিয়ে ভাবি যে, সেই যাত্রায় সেদিন দাদার সঙ্গে সামিল না হলে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হতাম। আজকে বাঙালি যুবকেরা অনেকেই যেমন Trekking- এর ভক্ত হয়ে উঠেছে উনিশশো চুয়ান্নতে তেমন ছিল না। খুব কম যুবকই পাহাড়ে যেতেন। পর্বতারোহণের কথা বাদই দিলাম, ট্রেকিঙের কথাও বলছি। তখন পথ-ঘাট এবং সুযোগ সুবিধা ছিল না আজকের মতন।

আস্তে আস্তে আমরা উপরে উঠছি, আস্তে আস্তে টোপোগ্রাফি পালটে যাচ্ছে, তরুরাজি, বৃক্ষলতা সবই পালটে যাচ্ছে, আবহাওয়া পালটে যাচ্ছে। কুলকুল করে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কী সুন্দর যে দৃশ্য কী বলব। পাখি ডাকছে নানা রকম। ভেড়া চরাচ্ছে, ছাগল্ চরাচ্ছে কুমায়ুনের ছেলে, বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে। আর আমার কেবলই জিম করবেটের লেখা বিভিন্ন গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

ছোটো ছোটো বাড়ি। তার চারপাশে পাথর দিয়ে বানানো রাস্তা বা কম্পাউন্ড ওয়াল। জিম করবেটের লেখাতে যেমন পড়েছিলাম তা হুবহু বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছিল কী বলব। দাদাকে সেকথা বললাম। শুনে, মনে হল না যে দাদা জিম করবেটের নাম শুনেছেন! বা আদৌ তাঁর কোনো বই পড়েছেন বলে।

কিছু মানুষ থাকেন, অত্যন্তই ভালোমানুষ, অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ কিন্তু তাঁদের জগৎটা একটু ছোটো হয়। মানে, কোনো একটা বিশেষ ঘেরের মধ্যেই তাঁরা থাকেন। তারা কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তাঁদের জীবিকার জগতের বাইরে তাঁরা আর কোনো জগতেরই খোঁজ রাখেন না। জীবিকা আর জীবন যে কখনওই সমার্থক নয় এই দরকারি কথাটা ওঁরা বোঝেননি। কেউ ওঁদের বুঝিয়েও দেননি হয়ত। এটা ওঁদের দোষ বলব না। এমনও হতে পারে যে, তাঁরা তাঁদের জগতের অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করবেন বলেই হয়ত অন্য জগতের খোঁজ রাখতে পারেন না।

তবে, আমার মনে হয় যে নিজের জীবিকার বাইরে, বাইরের বিশ্ব সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার আছে, থাকে, থাকবে সবসময়েই। সংসারে যে কতরকম বিষয় আছে, কতরকম জিনিস, সেসব সম্বন্ধে একটু উৎসাহ থাকলে, একটু গান-বাজনা-ছবি-সাহিত্য জীবনে থাকলে বোধহয় আমাদের সকলের জীবন অনেকই সুন্দর হতে পারত। দাদার জীবনও। সাধারণত মেয়েরা কিন্তু পুরুষদের চেয়ে এই বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন। তাই হয়তো শিল্প, সাহিত্য, গান সম্বন্ধে তাঁদের মতামতটাই যুগে যুগে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

দাদা বললেন, গিয়ে খোঁজ করব তো জমি করবেটের বইয়ের, তুমি যখন এতো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছো।

আস্তে আস্তে হাঁটছি, আস্তে আস্তে উচ্চতা বাড়ছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে অর্কিডও দেখা যেতে লাগলো। তার মানে, বেশ উঁচুতেই উঠে এসেছি। হাওয়াটা যেন আরও মিষ্টি, আরও সুন্দর। মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। কত কিছু ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে হাওয়া। নিষ্কলুষ পবিত্র। উপরে উঠছি আর উঠছি।—

দুপুর-নাগাদ একটা জায়গাতে গিয়ে পৌঁছোলাম। সম্ভবত জায়গাটার নাম ছিল বড়েছিনা। বড়েছিনাতে খাওয়া-দাওয়া করলাম আমরা। আর জলও খেলাম। স্থানীয় জল। সে যে কী মিষ্টি জল। যেন মনে হল, অমৃতই খাচ্ছি।

খাওয়াদাওয়া করে আবার রওনা হলাম। যেন স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে দিয়ে চলেছি। ক্রমশ উচ্চতা বাড়ছে। এখন সুগন্ধি কনফেরাসদের রাজ্যে পৌঁছে গেছি পুরোপুরি।

সূর্য প্রায় ডুবে এসেছে, এমন সময়ে আমরা পানুয়ানালা বলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছোলাম। জা- গাটা বেশ উঁচু। পরে জেনেছিলাম যে সাড়ে-ছ'হাজার ফিট উঁচু। থাকব আমরা ডাকবাংলোয়। পরের দিনে আমরা আরও কিছুদূরে হেঁটে যাব, মাইল দুই আড়াই, মীরতোলাতে। সেখানে,

আমেরিকান মিশন নয়, গেরুয়া বসন পরা আমেরিকান সন্ন্যাসীরা একটি হাসপাতাল চালান। ছোট্ট হাসপাতাল। সেই হাসপাতাল পরিদর্শন করতেই দাদার এই টুর।

পানুয়ানালা থেকে পথ চলে গেছে ধওলা দেবীতে, মাইল সাত-আট পথ। তারপর রামেশ্বরে, সামান্য দূরে। রামেশ্বরের পরে ঘাট। বাঁ দিকে গেলে পিথোরাগড়, ডানদিকে গেলে টনকপুর।

পানুয়ানালার ডাকবাংলোটা ছোট্ট, দু'কামরার। আলমোড়া থেকে ধওলা গিরির পথের উপরেই। মীরপুরের পথ অন্য। সে পথ মীরপুরে গিয়েই থেমে গেছে।

ডাকবাংলোর সামনে চওড়া বারান্দা। নীচে গভীর বন, খাদের মধ্যে। জিম করবেটের বইয়ে যেমন বর্ণনা আছে RAVINES এর, ঠিক তেমন। ফুটফুটে পূর্ণিমার রাত। গ্রীষ্মদিনের পূর্ণিমা। শীতের পূর্ণিমা আর বর্ষার পূর্ণিমার রূপ তো এমন নয়। সব পার্বত্য অঞ্চলে কিংবা যেখানে গ্রীষ্ম দেরি করে আসে, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লি সেখানেও বসন্তের পূর্ণিমা এরকম সুন্দর নয়। তবে শ্রাবণী পূর্ণিমার কথা আলাদা। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তবেই অবশ্য সে রূপ খোলে।

ঝকঝক করছিল প্রকৃতি, চতুর্দিকে, সেই পূর্ণিমা রাতে। চিড়, পাইন, ওক, সিলভার-বার্চ, হর্স চেস্টনাটের গাছ, উইলো। ঝড়ের মতো হাওয়া বইছে সাড়ে-ছ'হাজার ফিট উঁচুতে। আর সেই হাওয়া বয়ে নিয়ে আসছে কী সুন্দর মিশ্র গন্ধ। পার্বত্য বনরাজির, ফুল লতা পাতার গন্ধ, যার সঙ্গে সমতলের আমরা পরিচিত নই। আর নীচে খাদের মধ্যে ঘন জঙ্গলে রয়েছে ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরার বন, ঘন বন। আরা রোডাডেনড্রন ঝলকে ঝলকে ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরার গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায় অন্য গন্ধের সঙ্গে মিশে। আমার মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাব। আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে গেছিলাম।

এদিকে প্রচণ্ড ফোসকা পড়েছে দু'পায়েই। এন সি সি তেও পনেরো-কুড়ি মাইলের রুট-মার্চ করতে হত আমাদের। শিকারে তো হাঁটতে হতই বহু মাইল পাহাড়ে-বনে। কিন্তু এ তো পাহাড় নয়, এ যে পর্বত! এবং পর্বতের রাজা পর্বত। হিমালয়!

তখনকার দিনের সমস্ত পুরোনো ডাকবাংলোতেই এবং বনবাংলোতেই বিরাট বিরাট ইজিচেয়ার থাকত। তাদের হাতাগুলোকে লম্বা করে নিলে পা রাখতে খুব সুবিধা হত। চওড়া চেয়ার। সেসব ইজিচেয়ারে শুয়ে দিব্যি রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। সেসব চেয়ার আর আজকাল কোথাও দেখি না। আমার মন ভারি নস্টালজিক হয়ে রয়েছে সেসব চেয়ার সম্বন্ধে।

কফি দিয়ে দিয়েছিলেন সঙ্গে বউদি। গরম গরম কফি খাওয়ার পরে বারান্দায় রাখা ইজিচেয়ারে দু পা তুলে বসে আছি সেই ছমছমে ডাইনি-জ্যোৎস্নার মধ্যে। পথের সব কষ্ট ভুলে গেছি। সব কষ্ট। এক গভীর আনন্দে আমি মুহ্যমান।

খাওয়া-দাওয়ারও বন্দোবস্ত হল। ডাক্তারদা সরকারি ট্যুরেই গেছিলেন। কুমায়ুনি চৌকিদার ডাক্তারদাদাকে বলল, খিচুড়ি রান্না করে দেবে। সে-রাতে কিছুমাত্র না খেলেও আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হত না। প্রকৃতি আমাকে এমনই মোহিত করেছিল।

খিচুড়ি রান্না হয়ে গেলে গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে নিলাম আমরা। খাওয়ার পরে দাদা বললেন, ভাইটি, আমি চললুম শুতে। কালকে আবার আমাদের ভোরে উঠে যেতে হবে তো! তুমি কি বাইরেই বসবে? বাঘ-ভালুক তুলে নিয়ে গেলে! বিরাট-বিরাট বাঘ-ভালুক আছে এসব অঞ্চলে।

বললাম, ওরা কেউই আমাকে তুলবে না। আপনি যান তো দাদা। শুয়ে পড়ুন। এ সুযোগ তো আমি আর এ জীবনে পাব না। এইরকম দেবভূমিতে এমন চাঁদের রাতে বাইরে বসে থাকার সুযোগ আবার কবে আসবে, কে জানে!

চৌকিদার আমার পায়ের কাছে বসে আছে। নানান গল্প করছে। আমি জিজ্ঞেস করছি, এটা-ওটা-সেটা। সব প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছে সে ধৈর্য ধরে। তবে তার হিন্দিতে কুমায়ুনি অ্যাকসেন্ট থাকাতে আমার বুঝতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। ছমছমে জ্যোৎস্নার মধ্যে নানান রাত-পাখি ডাকছে। হঠাৎই আমাদের বাংলার 'বউ কথা কও' খাদের গভীর থেকে ডেকে উঠল।

চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি পাখি?

সে বলল, কাউফল পাক্কৌ।

অবাক হয়ে গেলাম একথা ভেবে যে, দেশ-ভেদে পাখির নাম কেমন বদলে যায়!

এখানে কাউফল নামে একরকম berry হয়। ছোটো ছোটো, কালো কালো সেই গোলাকৃতি বেরি খেতে পাখিগুলো খুব ভালোবাসে। সেই বেরিগুলো গরমেই পাকে, তখন এরা ডাকে, "কাউফল পাক্কৌ", "কাউফল পাক্কৌ", "কাউফল পাক্কৌ"। তাই পাখির নামও হল "কাউফল পাক্কৌ"।

পানুয়ানালায় সেই রাত কাটাবার বছর পাঁচেক পরে যখন ওড়িশার উঁচু পাহাড়ি অঞ্চল, আদিবাসী খন্দদের আবাস, "খন্দমাল"-এর বিরিগরের জঙ্গলে যাই দশপাল্লা স্টেটে, সেখানেও 'বউ কথা কও' ডাকছিল। তখন জেনেছিলাম যে, ওরা ওড়িয়াতে ওই পাখিকে বলে "মু চাষা পুও" অর্থাৎ আমি চাষার ছেলে।

নামটি ভিন্ন হলেও, পাখিও এক, তার ধ্বনিটাও কিন্তু এক।

বউ কথা কও, কাউফল পাক্কো, এবং মু চাষা পুও এবং ইংরেজিতে ব্রেইন-ফিভার পাখি একই পাখি।

বুঝলাম, দেশভেদে পাখির নাম বদলে গেছে। অবাক লাগল আমরা চৌকিদারের কথায়।

চৌকিদার অনেকক্ষণ গল্প করে উঠে চলে গেল তার ঘরে। আর বলল, সাব, কভি কভি ভাল আ যাতা হ্যায় হিঁয়া। বহতই খতরনাক। শেরভি হ্যায়, ডাবল ডাবল শের মগর। শের তো খতরামে নেহি ডালতা। হিঁয়াপর ম্যান-ইটার শের নেহি হ্যায়। তবভি সামহালকে রহনা চাইয়ে। সামকো বাদ কোঈ ঘরসে বাহার নেহি যাতা হিঁয়া। শের-ভাল ছোড়কর ভি ঔর ভি ডরকা বাঁতে হ্যায়।

কি? ভূত?

জী সাব। বহত কিসিমকি হ্যায় হিঁয়া।

হেসে বললাম, মুঝে দর্শন দেনে সে বড়া খুশ হো যায়েগা ম্যায়।

আররে সাব। মজাক মত করনা ইনলোগোঁসে। ম্যায় চলতা হুঁ। আপ জাদা দের তক্ বাহারমে মত রহিয়ে। অন্দর চলে যাইয়ে। হিঁয়া অকেলা অ্যায়সি রহনা নেহি চাহিয়ে। হামারা বাত মানিয়ে সাহাব। বললাম, ঠিক হ্যায়। তুম বেফিক্কর রহো, ম্যায় চলা যাউঙ্গা। আরও ঘণ্টাকানেক বাইরেই বসে ছিলাম। বন্ধ ঘর থেকে দাদার নাক ডাকার আওয়াজ আসছিল। আর বাইরে নানান শব্দ। সেই নিস্তব্ধ চন্দ্রলোকিত রাত্রি আমাকে আজ পর্যন্ত haunt করে। কী নিস্তব্ধতা, কী পবিত্রতা, কী সুগন্ধ সেই জঙ্গলে। সাধে কি এই সব পথে-চলা সব মানুষই আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকে? পথকষ্ট ভুলে যায়? স্থানেরই মতন পথেরও মাহাত্ম্য আছে বইকী।

ঘণ্টাখানেক পরে, চৌকিদারকে খুশি করার জন্যেই চেয়ার ছেড়ে উঠে, বলতে গেলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই ঘরে এসে দোর দিলাম। ঠান্ডাও ছিল ভালো। সাড়ে ছ'-হাজার ফিট উঁচু। দু পায়ে তো ফসকা পড়েই ছিল। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর গন্ধ আর রাত-পাখিদের ডাক আর কাচের শার্সি দিয়ে আসা ঘরময় জ্যোৎস্না বিবশ করেছিল।

সেই রাতটির কথা আমার আজীবন মনে আছে, থাকবেও একাধিক কারণে।

একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম সে রাতে। একটি মেয়েকে দেখেছিলাম। তাকে আমি আগের বছর পৌষ-উৎসবে শান্তিনিকেতনে এক ঝলক দেখেছিলাম রাতের নীল আলোতে। পরিদর্শন হয়েছিল আমার। তার নাম নাই-বা বললাম। হয়তো সে-নামে অন্য কেউও থাকবেন এবং সে তো ছিলই! তার তো একটা প্রকৃত নামও ছিল। তাই নামটা নাই বললাম।

সে-এক মারাত্মক স্বপ্ন।

তখন উনিশ-কুড়ি বছরের একটি ছেলে, স্বাস্থ্যবান, রোমান্টিক, টগবগে যুবক। সারাজীবন কোনো স্বপ্ন দেখে অত কষ্ট পাইনি শারীরিক। অমন প্রলয়ংকরী স্বপ্ন সেই প্রথম দেখি। পরে অবশ্য অনেকই দেখেছি। তখন পর্যন্ত কোনো নারীকে নগ্নাবস্থাতে দেখিনি আমি। সেই প্রথম দেখি কল্পনার নারীকে, স্বপ্নে বহুদিন। নারীর মুখের সৌন্দর্য, গলার স্বরের, গানের, এই সব নিয়েই সুখী ছিলাম নিষ্পাপ, অনভিজ্ঞ নবীন-যুবা। নারীর শরীরে মুখ ছাড়াও, চোখ ছাড়াও যে আরও অনেক কিছু থাকে সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না। নারী মাত্রই পরি ছিলেন সেই আমার কাছে।

সে রাতেই স্বপ্নে প্রথম নগ্না নারীকে দেখলাম।

সে এক বিষম ডিসটার্বিং বিপজ্জনক স্বপ্ন।

আলমোড়া থেকে ফিরে এসে আমার জীবনের প্রথম উপন্যাস, মানে নভেলেটই বলব, লিখেছিলাম। তার নাম দিয়েছিলাম "আলমোড়ার চিঠি"। নায়িকার নাম দিয়েছিলাম অনুমতি। এবং অনুমতিকে গড়েছিলাম শান্তিনিকেতনের সেই মেয়েটিরই আদলে অথবা আমার স্বপ্নে-দেখা তার আদলে। নায়ক ছিল একজন এয়ারফোর্সের অফিসার।

এয়ারফোর্সের একজন কর্মীর সঙ্গে পরে আমার আলাপ হয় আলমোড়াতেই। পাইলট তিনি ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে পাইলট বানিয়েই গল্পটা ফেঁদেছিলাম। নায়িকা অনুমতি। অনুমতির স্বামী থাকেন আলমোড়ায়। আর সেই পাইলট সেখানে বেড়াতে গেছেন।

কোশী নদীর ব্রিজে, আমি থাককালীনই একটি অ্যাকসিডেন্ট হয়। বাস পড়ে যায় কোশীতে। অনেক নীচে। অনেক লোকই মারা যান। আমার নায়ক পাইলটকে সেই বাসেই চড়িয়ে দিয়ে মেরে ফেলি। ট্রাজেডি করার জন্যে।

তা এইসব যোগাযোগ কি করে হল, স্বপ্নের, গল্পের, কেন অনুমতি নামটা মনে এল, কেন বা সেই ডিসটার্বিং স্বপ্ন দেখলাম, কেন সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ল পানুয়ানালার ডাকবাংলোতে সেই রহস্যময় রাতে, যে-রাতে জিন-পরিরা খেলা করে চাঁদের বনে, ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরার গন্ধের মধ্যে, কে জানে!

লেখাটা লিখেছিলাম কিন্তু পড়েই ছিল। কোথাওই ছাপতে দিইনি, ইতিমধ্যে একটু-আধটু লেখালেখি করে ততদিনে আমার একটু পরিচিতি হয়েছে।

একবার কোনো এক কাগজ, বোধহয় বসুমতী হবে, পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লিখতে বললেন। কিছুতেই লিখতে পারব না। একদম সময় নেই। অন্য এবং আরও বড়ো কাগজেও লিখব বলে কথা দিয়েছিলাম সেবার কি-না জানি না, মনে নেই। যাই হোক, বললাম, পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়, একটা নভেলেট আছে লেখা, সেটা ছাপবেন? ছাপলে দেব।

সম্পাদক বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা-ই দেবেন, তাই-ই ছাপব। তখন তো আমার একটু একটু নাম হয়ে গেছে। নাম হলে, ব্যাপারটা পুরো বদলে যায়। তখন সম্পাদকেরাই দৌড়াদৌড়ি করেন। অন্যদের চেয়ে বেশি টাকাও দিতে চান। নভেলেটটি ছাপা হয়েছিল বসুমতীতে পুজো সংখ্যায়। তবে আলমোড়ার চিঠি নামটি বদলে নাম করে দিই "অনুমতির জন্যে"।

তারও অনেকদিন পরে প্রকাশক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স সেই উপন্যাসটি পুস্তকাকারে ছাপলেন।

'জলছবি' নামে একটি নভেলেট লিখেছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকার এক বার্ষিক সংখ্যায়। এই দুটি একত্র করে ওঁরাই বই করেছেন। বই পাওয়া যায়। 'জলছবি, অনুমতির জন্যে'।

পাঠক। আপনাদের মধ্যে যাঁদের আলমোড়ার এই কাহিনি পড়ে ভালো লাগবে তাঁরা বইটি পড়ে দেখতে পারেন। অবশ্য অতি কাঁচা লেখা। তখন লেখার কিছুই জানতাম না। এখনও কিছু জানি বলে দাবি করতে পারি না। সেই নভেলেটটির মধ্যে অনুমতি, পাইলট, দাদার মতো একটি কাল্পনিক চরিত্র সবাই রয়ে গেছেন। তবে উপন্যাসটি সম্পূর্ণই কাল্পনিক।

তার পরদিন গেলাম সেই ছোট্ট আমেরিকান হাসপাতালে। সেখানে তাঁদের সঙ্গে দাদার ব্যবহারটা আমার ভালো লাগলো না। যেন কেমন সন্দিগ্ধ ভাব। অ্যামেরিকান গেরুয়া বসনাবৃত সন্ন্যাসীরা যেন স্পাইং করতে এসেছেন ভারতে। কেন অমন করলেন দাদা, তা বুঝলাম না আমি। হয়তো তাঁকে ভুলও বুঝে থাকতে পারি। দেখলাম, তাঁর বেশ সুন্দরভাবেই চালাচ্ছেন ছোট্ট চার-পাঁচ বেডের হাসপাতাল। এই রকম দুর্গম জায়গাতে, বিশেষ করে সরকারি তরফে যখন সেখানে সুচিকিৎসার কোনো বন্দোবস্তই নেই।

যাই হোক, ইন্স্পেকশন সাঙ্গ হল। ইনস্পেকশন সাঙ্গ করে সেদিন পানুয়ানালাতেই রেস্ট নিয়ে, তার পরের দিন সারাদিন হেঁটে হেঁটে বেশিটাই উৎরাই বেয়ে আলমোড়াতে এসে পৌঁছোলাম।

আলমোড়ার দিন অবশেষে শেষ হল। বউদি ও বউদির বোনকে চোখের জলে ভাসিয়ে একদিন

বাসে চড়ে বসলাম। কৃতজ্ঞতাতে মন নুয়ে রইল। দাদা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এসে আমাকে বাসে তুলে দিলেন।

রানিখেতে পৌঁছে বাজারের মধ্যে আলমোড়ারই মতো একটা শস্তা হোটেল খুঁজে বের করে, সেখানেই উঠলাম। তারও চার্জ তিন-টাকা চার-টাকাই হবে। পরদিন বাসে করে গেলাম চৌবাটিয়া গার্ডেনস। রানিখেত ক্যান্টনমেন্ট ছাড়িয়ে। কতরকম আপেল, কত হাজার আপেল গাছ।

রানিখেত ক্যান্টনমেন্টে একটি হোটেল দেখেছিলাম, তার নাম "ওয়েস্ট-ভিউ", এক মেমসাহেব চালান। আহা! দেখেই যেন মন জুড়িয়ে গেল।

ভাবলাম, যদি কখনও বিয়েটিয়ে করি, এখানেই হানিমুন করতে আসব।

বিয়ে করে সেখানে যাওয়া হয়নি। বিয়ে করে যে কোথায় গেছিলাম, তা আগে ঋভুর দ্বিতীয় পর্বেই বলেছি। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে, ছোট মেয়ে এবং আমার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম রানিখেতের "ওয়েস্ট-ভিউ" হোটেলে। ছিলাম দিন দশেক। বড়ো মেয়ে যেতে পারেনি, তার অফিসের কাজ ছিল। এখন হোটেলের মালিকানা বদলে গেছে। একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক মালিক। আকাশ-পাতাল তফাত! কিন্তু ওয়েস্ট-ভিউ-এর পরিবেশটা এতোই ভালো, যে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে, কী লেখবার জন্যে "ওয়েস্ট-ভিউ" হোটেলের কোনো তুলনা নেই, ফর আ কোয়াইট হলিডে, ইন আ সীরিন, আউট অফ দি ওয়ার্লড প্লেস।

হোটেলের পাশ দিয়েই একটা রাস্তা গেছে। সেটা গিয়ে একটি প্রাচীন মন্দিরের সামনে পড়েছে। একটি নতুন মন্দিরও হয়েছে। রাম-মন্দির। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মন্দিরের পথটি চলে গেছে। একপাশে জঙ্গলময় ঘন খাদ। ছোট্ট রাস্তা। আধ কিলোমিটার মতন রাস্তা। সেখানেও এখনও রাতে বাঘ বেরোয় রোজ। বড়ো বাঘ। এবং মাঝে মাঝে গোরুও ধরে। সন্ধের পরে হাঁটাচলাটা আদৌ নিরাপদ নয়। কারণ, জঙ্গল অত্যন্তই গভীর। শিকারও তো বারণ হয়ে গেছে। অতএব বাঘেদের দৌরাত্ম্য প্রচুর।

রানিখেতে দুদিন থেকে তারপরে গেলাম নৈনিতালে।

পয়সা না থাকলে তো সব জায়গায় চোরের মতোই থাকতে হয়। সেখানে খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে শস্তা একটা হোটেলে উঠলাম। অত্যন্তই খারাপ ব্যবহার। হরিয়ানার লোক হোটেলটির মালিক। উত্তরভারতের লোকদের ব্যবহার এতোই রুক্ষ বলে মনে হয়েছিল সে সময়ে যে, তা আর বলবার নয়। কথাবার্তার ঢঙ, ব্যবহার সবই খারাপ। বিনয়ের সঙ্গে তাদের সহাবস্থান নেই। কেবলই হায় পয়সা! হায় পয়সা করে!

খুবই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে সেবারে নৈনিতালের। খাওয়া ও চান করার গরম জল দিত না। খাবারও অত্যন্ত বাজে, খাওয়া যেত না। তবুও লেকের চারদিকে হেঁটে হেঁটে বেড়াতাম একা একা। সারাদিন রাস্তাতেই থাকতাম। বাইরেই যা হোক কিছু খেয়ে নিতাম। নৌকোও চড়তাম। কিন্তু ভীমতাল বা কালাধুঙ্গিতে সেবারে আর যাওয়া হয়নি।

বছর পাঁচেক আগে যখন গেছিলাম, তখন ভীমতাল হয়ে জিম করবেটের বাড়ি দেখেছিলাম কালাধুঙ্গিতে।

সেও তো এক তীর্থ।

স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল।

অমন নিখাদ ভারতপ্রেমী, অমন বড়ো লেখক তো বেশি দেখলাম না। কিপলিংকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল যে কেন এখনও ভেবে পাই না। তবে আমাদের লজ্জা রাখার জায়গা নেই এ কারণে যে জিম করবেটকেও অভিমানে ভারত ছেড়ে আফ্রিকার কিনিয়াতে চলে যেতে হল অথচ তা নিয়ে একজনও কিছু বললেন না। উনি কেন চলে গেলেন তা নিয়েও কোনো তদন্ত হল না আজ অবধিও।

বড়ই অকৃতজ্ঞ আমরা।

আবার ফিরে এলাম কলকাতাতে। হোম, সুইট হোমে। তার কিছুদিন পরেই কলেজ শুরু হল। দক্ষিণী-র ক্লাসও আবার শুরু হল। অফিস তো ছিলই। সেই সময়কার দক্ষিণী এবং আমার দক্ষিণী-প্রভাবিত দিনগুলোর কথা ভাবলে আজও যেন কেমন এক আচ্ছন্নতা বোধ করি।

মনে আছে, ভরতি হওয়ার পরেই প্রথম যে গানটি আমাদের মানে, নবাগন্তুকদের ক্লাসে শেখানো হয়েছিল, সেটি ছিল, 'অরূপ তোমার বাণী..'

এখন মনে হয় যে, প্রথম দিনই ওই গানটি শেখানোর কী তাৎপর্য তখন বুঝিনি। এবং আজও বুঝি না। 'দূর দেশী ঐ রাখাল ছেলে' অথবা আরও অসংখ্য গান ছিল যেগুলো শেখা অত্যন্ত সহজ, বিশেষ করে যেগুলির মানে অত্যন্ত সহজ। তখন আমি কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ি, 'অরূপ তোমার বাণী'র মানে বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি কিন্তু ক্লাসে অনেক অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা ছিল। যদিও আমাদের সেকশানে ছিল না। তাদের পক্ষে "অরূপ তোমার বাণীর" মর্ম উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভবই ছিল।

গানের বেলায়, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় 'বাণী'-র তাৎপর্য যদি প্রাঞ্জলভাবে বোধগম্য না হয়, তাহলে সে গান যে গায় তার গাওয়া এবং যারা শোনে, দুই-ই বহুলাংশে ব্যর্থ হয় বলেই আমার ধারণা।

তখন দক্ষিণীতে যে শিক্ষকমণ্ডলী ছিলেন, তাঁদের কথা আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করি। তাঁদের কাছ থেকে যে ভালবাসা, স্নেহ পেয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে যা নিষ্ঠা দেখেছিলাম, তা আজকাল অভাবনীয়।

যে বেঁটেখাটো ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোকের কথা আগে বলেছি সেই ভদ্রলোকই শুভদা। আর যে মহিলার পিছু পিছু নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো এসে প্রথমদিন দক্ষিণীতে ঢুকেছিলাম, তিনি হলেন মঞ্জুলা গুহঠাকুরতা, শুভ গুহঠাকুরতার স্ত্রী।

প্রায় একযুগ পরে তিনি আমার খুড়শাশুড়ি হন।

শুভ গুহঠাকুরতা ছিলেন দক্ষিণীর অধ্যক্ষ। শুভদা নিজে গান গাইতেন না বাইরে কিন্তু অত্যন্ত ভালো শিক্ষক ছিলেন। আজকের দিনে শিক্ষকদের কাছে এই সংযম প্রত্যাশার নয়। আজকাল শিক্ষকরা প্রায় সকলেই নিজেরাও গান, সম্পাদকেরাও নিজেরা নিজেদের কাগজে লেখা থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করেন না, ব্যতিক্রমী সাগরময় ঘোষ এবং শুভদার কাছে রমাপদ চৌধুরীদের মতো। শুভদা অ্যাডমিনিস্ট্রেশান এবং স্পেশাল ক্লাস নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতেন।

দক্ষিণীতে থাকাকালীন আমি মাত্র দুটি গান শিখেছিলাম শুভদার কাছে। একটি হচ্ছে খুব সোজা গান, কিন্তু খুব সুন্দর করে শিখিয়েছিলেন। 'ওদের কথায় ধাঁধা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি'। আর যে গানটি শিখিয়েছিলেন; তার মুখটি হচ্ছে, "গাও বীণা—বীণা, গাও রে/অমৃতমধুর তাঁর প্রেমগান মানব-সবে শুনাও রে/মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম জাগাও রে।"

এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

তখন সুনীলদাও ছিলেন, সুনীল রায়। অসাধারণ সুরেলা গলা। এবং উচ্চাঙ্গসঙ্গীতও উনি গুলে খেয়েছিলেন। সুনীলদার মতো এমন কাউকে আজ অবধি দেখিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে, অবশ্য আমি

যাঁদের দেখেছি, শৈলজাদা, শান্তিদা এঁদের কাছে গান শেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কারণ ওঁরা কলকাতাতে তো তখন শেখাতেন না। কী করে সুর লাগাতে হয়, কোন গানে কোন রাগের রূপটি কেমন ভাবে মেলে ধরতে হয়, তার কী তাৎপর্য তা বোধহয় সুনীলদার মতো কম শিক্ষকই জানতেন। সুর যে হঠাৎ লাগে না, সুর যে আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টির মতো দূর থেকে আস্তে আস্তে এসে তার স্বস্থানে দাঁড়ায়, শুধু দাঁড়ায় না, আবার চলে যাবার সময়ও তার রেশ রেখে যায়, এই ব্যাপারটা সুনীলদার মতো আর কারোকেই শেখাতে দেখিনি, ছাত্রছাত্রীদের। আর শুধু থিয়োরিটিক্যাল শিক্ষা নয়, নিজের গলায় গেয়ে শেখানো এবং ছাত্র-ছাত্রীর গলায়ও তা স্থানান্তরিত করাও। সে এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা।

মনে পড়ে, একটি গান সুনীলদা শিখিয়েছিলেন সে-গানটি আমার অত্যন্তই প্রিয় গান এবং মনে হয় যত রবীন্দ্রসঙ্গীত ভৈরবীতে বাঁধা আছে, তার মধ্যে এই গানটি একটি উৎকৃষ্টতম উদাহরণ। গানটির মুখ হল : "নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি/নে রে ও মন, নে রে আপন প্রাণে টানি।" অন্তরাতে যেখানে আছে : "সবুজ-নীলে সোনায় মিলে যে সুধা এই ছড়িয়ে দিলে", এখানে কড়ি মা এমন করে লাগাতেন সুনীলদা যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

আরও অনেক গানই সুনীলদা শিখিয়েছিলেন।

ধ্রুপদাঙ্গ এবং ধামার-এর উপর যেসব গান রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে, সেইসব গান সুনীল রায়ের গলায় আপনাদের অনেকেরই হয়তো শোনার সৌভাগ্য হয়নি। যাঁদের হয়নি তাঁরা জানেনও না আপনারা কি হারিয়েছেন! সুনীলদা অল্পবয়সে চলে গিয়ে আমাদের মতন অগণ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভক্ত মানুষদের বঞ্চিত করে গেলেন।

দক্ষিণীর যেসব ব্লক-সঙ্গীতানুষ্ঠান হত, রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে, সমাবর্তন-উৎসবে তার অধিকাংশই হতো সুনীলদার তত্ত্বাবধানে। কিছু কিছু সম্মেলক গানের কথা, আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, যেমন "দাঁড়াও, মন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে আনন্দসভা-ভবনে আজ..." তারপরে "প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে..."

আরও অনেক গান। সম্মেলক গান যে কি ভাবে গাইতে হয় তা সুনীলদা শুভদারা ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়ে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সম্মেলক গান বা দ্বৈত-সঙ্গীতের একসঙ্গে ধরা ও ছাড়া, প্রশ্বাস ও নিশ্বাস নেওয়ার রকম নিখুঁতভাবে শেখানো দক্ষিণীর একটি বিশেষত্ব ছিল।

অনেক লঘু সুরের গান, হাসির গান : যেমন "তুই থাকিস কোন পাড়া, তোর পাই নে যে সাড়া/পথের মধ্যে হাঁ করে যে রয়েছি খাড়া।" এমন করে গাইতেন সুনীলদা যে, গানের মধ্যে প্রাণ তো সঞ্চারিত হতোই, গায়কের এবং শ্রোতার মধ্যেও হাসির রেশও পৌঁছে যেত।

গান তো একেই বলে!

গান তো গান অনেকেই, কিন্তু গানের মধ্যে যে প্রাণটাই আসল, প্রতিটি শব্দের যে তাৎপর্য আছে, গানের বাণী যে সুরের মতোই ইম্পর্ট্যান্ট এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত যে শিক্ষিত মানুষেরই গান, অশিক্ষিতদের নয়, সেকথা এইসব মানুষের সংস্পর্শে এসে এঁদের কাছে গান শুনে এবং শিখে হৃদয়ের অন্তঃস্তলে অনুভব করেছিলাম।

সুবিনয় রায়ও দক্ষিণীতে ক্লাস নিতেন। তবে আমি তাঁর ক্লাস করিনি। সুবিনয়দার সঙ্গেও পরবর্তী জীবনে নানা প্লাটফর্মে ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হয়েছিল। আমার মনে হয় জীবিত শিল্পীদের মধ্যে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের কথা ধরেই বলছি, সুবিনয়দার মতন এমন পণ্ডিত, শাস্ত্র এবং ডেমনস্ট্রেশান দুইয়েতেই, রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে আর একজনও নেই। অথচ দুঃখের কথা এই যে আজ অবধি সুবিনয়দাকে সঙ্গীত-নাটক-আকাডেমির পুরস্কার দেওয়া হল না। শান্তিনিকেতন থেকে দেশিকোত্তম পর্যন্ত সুবিনয়দাকে দেওয়া হল না। ওঁর অনেকই বয়স হয়ে গেছে। তাই ভয় হয়, উনি হয়ত জীবদ্দশায় সেসব পুরস্কার পাবেন না।

এতে সুবিনয়দার কোনো অসম্মান হয়নি। যাঁরা পুরস্কার দেন, সেই যূথবদ্ধ "ভেড়চাল"-এর গুণী-জ্ঞানীরা, যাঁরা দেশের সমস্ত সাংস্কৃতিক, সাংগীতিক, সাহিত্যিক ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতা ও দুর্বুদ্ধি

দিয়ে প্রমাণ করেন যে, তাঁরা হস্তীমূর্খ এবং অতি ইতর, তাঁদেরই অপমান এটা। ইতিহাস সেকথাই বলবে যে সে-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুবিনয়দা যে সম্মান ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পেয়েছেন, পাচ্ছেন এবং পাবেনও ভবিষ্যতে তেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে খুব কম মানুষই আজ অবধি পেয়েছেন।

দেবব্রত বিশ্বাস, মানে আমাদের জর্জদা অত্যন্তই ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন, কিন্তু অনেক ব্যাপারে সুবিনয়দার সঙ্গে জর্জদারও তুলনা করা চলে না। কারণ, সুবিনয়দা শাস্ত্রটাকে তো গুলে খেয়েছিলেন। তালও গুলে খেয়েছিলেন। ওঁর আয়ত্তে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদ এবং ধামার পর্যায়ের যে সমস্ত গান আছে তা যেভাবে পরিস্ফুট হয়, তা আর কোনো গায়কের গানেই হয়নি। গায়িকার গানেও হয়নি।

সুশীল চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে শেখাতেন। অমল নাগ বলে একজন ছিলেন, তিনি যে কোথায় হারিয়ে গেলেন কে জানে! এঁরা সব তরুণ, সবে ক্লাস নিতে শুরু করেছেন কি শিখছেন তখন আমার সঠিক মনে নেই।

তখন দক্ষিণীতে রমা ভট্টাচার্যও ছিলেন। রমাদির মতো সুন্দরী মহিলা, কালোর মধ্যে ওরকম শ্রীময়ী চেহারা, বড়োই কম দেখেছি। এরকম ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলাও খুব কম দেখেছি। আমার রমাদির গানও খুব ভালো লাগত।

শুভদার প্রথম রেকর্ড বেরোয় আমি যখন তাঁর সংস্পর্শে আসি তার অনেকই আগে। সেই রেকর্ড হিন্দুস্তান কি মেগাফোন কি গ্রামোফোন কোম্পানির, আমার এখন ঠিক মনে নেই। তবে, গানটির কথা ঠিকই মনে আছে। একদিকে ছিল 'তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ-করা', আর উলটোপিঠে ছিল 'হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী'।

তখনকার দিনের রেওয়াজ ছিল গায়ক-গায়িকার শিক্ষাগত কোয়ালিফিকেশান রেকর্ডের মধ্যে রেকর্ডেড থাকা। গহরজান যেমন বলে দিতেন একলাইন, আমি গহরজান। শুভদার রেকর্ডে ডিস্কের উপরে ছাপা ছিল : "শুভ ঠাকুরতা, বি কম।" সে রেকর্ডও আমার কাছে ছিল, কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি।

এখন ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু তখন ঐ রকমই রেওয়াজ ছিল।

শুভদার স্ত্রী মঞ্জুলা গুহঠাকুরতা, আমি যাঁকে দেখে, যাঁর পেছন পেছন গিয়ে আমি দক্ষিণীতে ভরতি হয়েছিলাম, তাঁরও গলা অত্যন্ত সুরে বলত। তবে আমি ঠিক বলতে পারব না যে ওঁর রূপ অথবা গুণ কোন্‌টাতে বেশি আচ্ছন্ন হতাম। মোহরদির (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) বেলায়ও সেকথা প্রযোজ্য। তবে বউদির (শুভদার স্ত্রীকে, আমরা সব ছাত্র-ছাত্রীরা বউদি বলেই ডাকতাম) গলা খুব সুরেলা ছিল যদিও উনি খুব কমই গাইতেন।

একটি গান বউদি পরে রেকর্ড কর্বেছিলেন। সেটি : 'কী সুর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে।' কিন্তু এই গানটি সুনীলদা যা গাইতেন, তার কোনো তুলনা নেই। তুলনাহীন। তখন তো সুনীলদা বেঁচেও।

আমি বউদিকে বলেছিলাম, আপনি গানটা রেকর্ড করলেন! এটা সুনীলদা করলে আরও ভাল হত। জানি না, বউদি কিছু মনে করেছিলেন কি-না।

আমি চিরদিনই ঠোঁটকাটা। যা যখন সত্যি বলে মনে করেছি, বলেছি এবং যাকে খুশি বলেছি। এবং সেই স্বভাবের জন্যে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে সারাজীবন এবং আজও হচ্ছে। তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। যে স্বভাব নিয়ে জন্মেছি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন এই স্বভাব নিয়েই চিতায় যেতে পারি।

অন্য প্রসঙ্গে চলে এলাম।

আরেকজন ছিলেন শিক্ষক শ্যামল মুখোপাধ্যায়। থাকতেন শ্রীরামপুরে। লম্বা, রোগা, আদ্দির ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতেন। তখন সকলেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। পাজামা দক্ষিণীতে TABOO ছিল। শ্যামলদা, ভীষণ রোগা ছিলেন এবং লম্বা। মনে হত, ফুঁ দিলেই পড়ে যাবেন। মজলিশি লোক ছিলেন খুবই এবং গান শেখাবার সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ফেলতেন নিজেকে। আর হারমোনিয়ামের ব্যবহারটা একটু বেশিই ছিল। হারমোনিয়ামের উপরে হাত রেখে, মাঝে মাঝেই

বেলো করা ছেড়ে দিয়ে ধপাধপ করে বাঁ হাত দিয়ে তাল দিতেন। প্রথম দিকে সব শিক্ষকদেরই তালের উপরে ভীষণ জোর দিতে দেখা যেত। তাল আর তাল-ফাঁক বোঝাতে গলদঘর্ম হতেন ওঁরা। কারণ, আমার মতো তালকানা বহু ছেলেমেয়েই গান শিখতে যেত। গানটা যে বাণী, সুর, তাল—এই তিন দিয়ে বাঁধা একটি ফুলের তোড়া, এইটা বোঝানোর আগ্রহ কিন্তু বিশেষ দেখতাম না। শুধুমাত্র তাল নিয়েই মাতামাতি আমাদের পছন্দ হত না।

শ্যামলদা, শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, যতদূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও 'ভুশুন্ডির মাঠে'র (সুকুমার রায়ের) গান অসাধারণ ভাল গাইতেন। সম্ভবত শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ থেকেই ভুশুন্ডির মাঠের নাট্যরূপ এবং গানের স্বরলিপি বানানো হয়েছিল। আমার আজ আর ঠিক মনে নেই। কিন্তু অসাধারণ গাইতেন উনি ভুশুন্ডির মাঠের সেই গানগুলি।

কোনো কারণে, কী কারণে, আমার মনে পড়ে না, শ্যামলদাকেই চলে যেতে বলা হল দক্ষিণী থেকে, না শ্যামলদা নিজেই ছেড়ে চলে গেলেন।

আমার বিশেষ দুর্বলতা ছিল শ্যামলদার প্রতি। দক্ষিণী ছাড়ার পর প্রায় বছর পঁচিশ বাদে শ্রীরামপুরে আমার এক মক্কেলের ইনকাম ট্যাক্সের কেস করতে চুঁচুড়া গেছি। সেখানেই খাওয়াদাওয়া করলাম কেস করার পরে তার বাড়িতেই। সেদিন কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল যে, শ্যামলদা কাছেই থাকেন। তাই বিকেলে গেলাম শ্যামলদার সঙ্গে দেখা করতে। বেশ পুরোনো একটি বাড়ি, প্রায় খন্ডাহার হয়ে গেছে। আমি গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে শ্যামলদা বলে ডাকতেই, শ্যামলদা বেরিয়ে এলেন ধুতি পরে, গায়ে একটা আধময়লা পাঞ্জাবি। খুব খুশি হলেন আমাকে দেখে। জড়িয়ে ধরলেন। সে এক সুখস্মৃতি। সে দেখাও তো কতবছর হয়ে গেছে, আজ প্রায় কুড়ি বছর হতে চলল।

মনে পড়ে বেয়াল্লিশ বছর আগের দক্ষিণীর দিনগুলির কথা। মনে হয় এই সেদিনের কথা। জীবনটা বড়ো ছোটো। কত যে ছোটো তা জীবনের শেষ পর্যায়ে না এসে পৌঁছোলে বোঝা যায় না। যৌবনের মতন, সময়ের মতো দামি যে আর কিছুমাত্রই নেই এই জীবনে তা বুঝতে পারার আগেই যেন জীবন ফুরিয়ে যায়।

সুনীলদা ভীষণই খেতে ভালোবাসতেন, বিশেষ করে ডিম। তখন তো লোকে এত হেলথ-কনসাস হয়ে যায়নি! হাঁসের সুস্বাদু ডিম খেলে বা খাওয়ালে যে মানুষ খুন করার মতো অপরাধ হয় এমন সব পুতুপুতু ধ্যান-ধারণা ছিল না মানুষের সব কিছুই, যে যা খেতে ভালোবাসতেন, মানুষ তা সবই খেতেন। ছেলেবেলায় আমরাই তো ডিমের কারি বা ফেনা ভাতের সঙ্গে ছ'টা-আটটা হাঁসের ডিম আকছার খেয়েছি জম্পেশ করে। ক্লোরোস্টোরলের ভূত আমাদের ঘাড় ধরে অনুক্ষণ তো ঝাঁকায়নি!

সুনীলদা ক্লাস শেষ করে এসে একতলাতে নামতেন। তখন মুরারী ছিল আমাদের দক্ষিণীর বেয়ারা। মুরারী ছাড়াও আরেকজন ছিল চা-টা করে দিত। এখন আর নাম মনে নেই তার। সে একটাই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করত সুনীলদাকে, ক'টা ডিমের?

আটটা ডিমের। কখনও দশটা ডিমের।

এই পরিমাণ হাঁসের ডিমের ওমলেট খেযে এত অল্পবয়সে, চল্লিশের ঘরে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন হার্ট-অ্যাটাক হয়ে মারা যাবেন যে সুনীলদা সেটা আমরা কেউই ভাবিনি। হাঁসের ডিমের জন্য অমন না-ও ঘটে থাকতে পারে। উনি হাইলি ডায়াবেটিকও ছিলেন।

আমার "খেলা যখন" উপন্যাসে, (দক্ষিণীর এই সব দিন নিয়ে লেখা আত্মজৈবনিক উপন্যাস।) সুনীলদার কথা অনেকই আছে।

মনে আছে, দক্ষিণীর পাট শেষ হবার বহুবছর পরে একদিন রাসবিহারী অ্যাভিন্যু দিয়ে হেঁটে আসছি, গড়িয়াহাটের মোড়ের দিকে বাবার রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়ি থেকে, ঈশানচন্দ্র ঘোষের বাড়ির সামনে সুনীলদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। উনি দেশপ্রিয় পার্কের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। "খেলা যখন" উপন্যাসটি বেরিয়েছিল সেই বছরই আনন্দবাজারের পুজো সংখ্যাতে। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে, পরম স্নেহভরে সুনীলদা বললেন, আরে! তুমি আমাকে বিখ্যাত করে দিয়েছ! কী ভালো লিখেছ! আমার সম্বন্ধে কত কথা লিখেছ।

আমি বললাম, কিছু তো বাড়িয়ে লিখিনি।

তার অল্প কিছুদিন বাদেই সুনীলদার আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেলাম। সুনীলদার শ্যালক ছিলেন হিমঘ্ন রায়চৌধুরী। উনিও গায়ক ছিলেন। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া অন্যান্য গানই বেশি গাইতেন। চমৎকার সুদর্শন পুরুষ। সুনীলদার স্ত্রী ছিলেন আমাদের হেনাদি।..তিনিও অত্যন্ত সুন্দরী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা ছিলেন। লম্বা, কাটা কাটা চোখ-মুখ। ফরসা। হেনাদিও গান গাইতেন ভালো। উনি কোথায় যেন কাজ করতেন।

এখন কেবলই মনে হয় যে, সত্যিই বোধহয় আমরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। সুনীলদার ছেলে শিবাজী, শিবাজী রায়, ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতার বাইরে কাজ করত বহুদিন। হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে এল কলকাতায়। বছরখানেকও বোধহয় হবে না। একদিন আমার অফিসে এসে বলল, একটা বায়োডাটা নিয়ে এসেছি। দ্যাখো তো, যদি এখানে একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারো।

আমি বললাম, আমি তো এখন লেখক, এসব কাজ তো ছেড়েই দিয়েছি বলতে গেলে। আমার কথা কি কেউ মানবে? রেখে যাও। দেখি, কি করতে পারি।

তার সাত দিন পরেই শুভদার বড়ো ছেলে, সুদেব গুহঠাকুরতা, যে এখন দক্ষিণীর অধ্যক্ষ, টেলিফোন করে বলল, শিবাজী হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে গত রাতে।

কী বলব! যাওয়ার ব্যাপারে আগে-পরের তো কোনো ব্যাপার নেই। কখন যে কে চলে যায় না বলে কয়ে। হিমঘ্ন রায়চৌধুরীও চলে গেছেন বেশ কিছুদিন আগে। আনন্দবাজারের অভীপ সরকার গেল মাসখানেক আগে, আমাদের সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে হঠাৎ। ভালো যারা তাদের বড়োই তাড়া থাকে যাওয়ার।

"দক্ষিণীর" আরেকজন শিক্ষকের কথাও মনে পড়ে, হৃষীকেশ বাবুর। হৃষীকেশ মুখার্জী কি? পদবিটি ঠিক মনে নেই। উনি ছিলেন 'ভয়েস-ট্রেনিং' ক্লাসের শিক্ষক। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে আসা ছাত্রছাত্রীদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এলিমেন্টারিজ শেখাতেন। যা শেখা খুবই দরকার। রাগরাগিনী, ঠাট, ইত্যাদি। নস্যি নিতেন, মোটাসোটা মানুষ।

আমাদের সঙ্গে যাঁরা গান শিখতেন, তাদের অধিকাংশকেই ভুলে গেছি। কিন্তু অনেককে আবার মনেও আছে। যেমন, অমরেন্দ্রনাথ রায়, লম্বা সুদর্শন, ওয়েল-বিলট। তারপর সুপ্রভাত অধিকারী। ডাক নাম ছিল নড়ি। থাকতেন বালিগঞ্জ প্লেসে। মানে, শুভদারা তখন যেখানে থাকতেন, 'ঠাকুরতা বাড়ি', তারই পাশে।

আমাদের সঙ্গে যাঁরা গান শিখতেন, জ্যোতির্ময় সিনহারায়ও। উনি ছিলেন পুব বাংলার ময়মনসিংহ জেলার "সুসঙ্গের" জমিদার বাড়ির। তাঁরই দাদার মেয়ে ছিল পূর্বা সিনহা। অনেকটা সুচিত্রাদির মতো। দারুণ গাইত। সুচিত্রাদির কাছে গানও শিখেছিল। তখন দক্ষিণীতে গান শিখত। চমৎকার খোলা গলা ছিল পূর্বার। এখন সে পূর্বা দাম হয়েছে। আমার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সহপাঠী, বন্ধু অরুণ দামকে বিয়ে করে। যার কথা আমি অনেকই লিখেছি "ঋভু"র দ্বিতীয় পর্বে।

একটি ছেলে গান শিখতে আসত। খুবই সুন্দর দেখতে। লম্বা, ফরসা। যাদবপুরে সম্ভবত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত।

আমাদের প্রথম ভয়েস-ট্রেনিং ক্লাসে হৃষীকেশবাবু বিলাওল ঠাটের একটি রাগ বর্ণনা করে বুঝিয়ে বললেন, ভালো করে তুলে আসবে। পরের সপ্তাহে ধরব।

আগের সপ্তাহের ক্লাসে শেখানো গান পরের দিন ধরা হত ক্লাসে। সব মাস্টারমশাই-ই তাই করতেন। প্রত্যেক ছেলেকেই গাইতে হত, কোথায় কি ভুল হত, দেখিয়ে দিতেন শিক্ষক। গলার কোনো কাজ ভুল হলে বলে দিতেন। সুর কম লাগলে বলতেন, সুর কম লাগছে। বেসুর হলে তাও বলতেন।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে আমাদের 'পণ্ডিত' করবার প্রথম প্রচেষ্টার দ্বিতীয় দিনে, হৃষীকেশবাবু তাঁর দু'নাকে ভাল করে নস্যি গুঁজে নিয়ে বললেন, গাও অনুপম, গাও। তার নাম ছিল অনুপম। পদবি আজ আর মনে নেই। খুবই ভালো ছেলে। আমার খুব বন্ধুও ছিল। লম্বা, সুদর্শন, ফরসা। অত্যন্ত ভালো পরিবারের ছেলে।

অনুপম গেয়ে শোনাল।

হৃষীকেশবাবু তখন হারমোনিয়াম ছেড়ে দিয়ে যেমন করে গাদা বন্দুকের নলে বারুদ গেদে গেঁয়ো শিকারিরা শিকার করে, তেমন করে আবারও দু' নাকে নস্যি পুরে দিয়ে বললেন, অহো! কী শোনালে অনুপম!

অনুপম অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমরাও তাকিয়ে রইলাম হৃষীকেশবাবুর দিকে।

উনি বললেন, দ্যাখো, পরশুদিন রাত্তিরে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর হাজরা রোডে একটা অনুষ্ঠানে গান গাইলেন। পণ্ডিতজি সাত-সাতটা সুরই বেসুরে গেয়ে আমাদের শোনালেন। ভেবে দেখো একবার, সাধনার কত উচ্চমার্গে পৌঁছোলে তবেই সাতটা সুর বেসুরে গাওয়া যায়। তুমি জানোই না হে যে তুমি কত সামান্য সাধনাতে কী অর্জন করেছ অনুপম। তুমিও সাত-সাতটা সুরই বেসুরে গেয়ে দেখিয়ে দিলে তুমিও পণ্ডিত ওঙ্কারনাথজির চেয়ে কিছু কম নও।

এটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফরসা অনুপমের কর্ণমূল, গণ্ডমূল এবং পুরুষের শরীরে আরও যা যা মূল থাকে সব লাল হয়ে গেল। সেদিন ক্লাসে ও আর একটিও কথা বলল না। পরের সপ্তাহ থেকে ওকে আর দেখলাম না। যোগাযোগও করল না অনুপম কারও সঙ্গে।

বেশ করেছিল ও, দক্ষিণী ছেড়ে দিয়েছিল। আমাকেও যদি সকলের সামনে কেউ অমন করে বলত, নিশ্চয়ই আমিও ছেড়ে দিতাম। আত্মসম্মানবোধ তো সকলের থাকে না। আত্মসম্মানবোধ যাদের থাকে তারা জানে যে, কোথায় লাগে, কখন লাগে, আর লাগলে অভিঘাত হিসেবে তার কী করণীয়।

তখন 'দক্ষিণীতে' অনেক মেয়েরাও গান শিখতে আসতেন। আমাদের সময়ে তো আর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ছিল না কোনো। আমাদের পবিবারও ছিল অত্যন্তই রক্ষণশীল পরিবার। চিরদিনই মেয়েদের প্রতি এই মূর্খ, অনভিজ্ঞ রোম্যান্টিকের এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল। তাই প্রায় ঘোরের মধ্যেই থাকতাম।

এত সব সুন্দরী, শিক্ষিতা, নৃত্যকলা-সঙ্গীত পটিয়সী মেয়ে।

বউদি, মানে মঞ্জুলা বউদি একদিন বললেন, কী ভালো একটি মেয়ে যে এসেছে!

কে?

নাম মালিনী। মালিনী বসু ছিল সম্ভবত।

মালিনী খুব সুন্দর করে শাড়ি পরত। যেন রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' থেকে এলা নেমে এসেছে। এসে, স্টিমারের ফার্স্ট ক্লাস ডেকে দাঁড়িয়ে আছে অন্তর পাশে। অথবা, যেন রবীন্দ্রনাথের 'তিন সঙ্গী' গল্প সংকলনের রবিবার গল্পের নায়িকা, সাক্ষাৎ বিভা। মালিনী ইংরেজির ছাত্রী ছিল। ঋতু গুহঠাকুরতা বলে একটি মেয়ে ছিল, শুভদার ভাইঝি, ভালো গান গাইত। তার সঙ্গে মালিনীর আলাপ ছিল।

মালিনীর হাঁটাচলা, কথা-বলা, সবই আমাকে মুগ্ধ করত। সামান্য একটু লক্ষ্মীট্যারা ছিল তার একটি চোখ। আমার তো ভালো লাগতই। ঋতুরও খুব ভালো লাগত।

কয়েকবছর পরে যখন এই ঋতু গুহঠাকুরতাই ঠাকুরতা কর্তন করে আমার স্ত্রী হয়ে আসে তখন আমরা ঠিক করি যে, যদি আমাদেব মেয়ে হয়, তার নাম রাখব মালিনী।

আমার দুই মেয়ে, প্রথমা কন্যার নাম রেখেছি মালিনী। সেও ইংরেজির ছাত্রী ছিল প্রেসিডেন্সির। পরে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কম্পারেটিভ লিটারেচার নিয়ে পড়েছে। 'দক্ষিণী'ব মালিনী তো এখন সাংসদ, বিখ্যাত ব্যক্তি। শুনেছি তাঁর স্বামীও অধ্যাপক।

বছর চারেক আগে বেড়াতে গেছিলাম রানিখেত, আলমোড়া, নৈনিতাল। ফেরবার সময়ে আমরা আসছি দিল্লি থেকে প্লেনে। আমাদের পাশেই মালিনী বসে ছিল। চেহারায় অনেকই বদল হয়ে গেছে। ঋতুর চেহারাও তো অনেকই বদল হয়ে গেছে।

মালিনী ভট্টাচার্যের আমাকে চেনার কথা নয়। সে ঋতুকেও চিনতে পারল কি-না জানি না। হয়তো পারেনি।

আমিই ফিসফিস করে বললাম ঋতুকে।

যেহেতু মালিনী কথা বলল না তাই ঋতুও কথা বলল না।

খুব অবাক লাগল ভেবে যে, সময় মানুষকে কত বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

আরেকজন ছাত্রী ছিল দক্ষিণীর। আমাদের সমসাময়িক। খুব ভালো গাইত। খুবই সুরে বসা ছিল। ত্রিগুণা সেনের সুহৃতা। ঋতুদের সঙ্গেই গান শিখত। সুহৃতার বিয়ে হয়েছে বিখ্যাত ছাত্র-নেতা নন্দন ভট্টাচার্যর সঙ্গে। ইঞ্জিনিয়ার নন্দন এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি শিল্প সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সুহৃতার সঙ্গে ঋতুর অনেকই মিল ছিল স্বভাবে এবং এখনও আছে। দুজনেই অন্তর্মুখী। ক্লাব, পার্টি, মদ খাওয়া এসব একেবারেই পছন্দ করে না দুজনেই। সেইজন্যেই বোধহয় খুব ভালো মিল ছিল দুজনের। সুহৃতার সঙ্গে দেখা হয় না বহুদিন। তবে নন্দনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। এয়ারপোর্টে এবং ক্যালকাটা ক্লাবেও।

তখন নাচেও দক্ষিণীতে খুব ভালো ভালো মেয়ে ছিল। অসাধারণ তাদের নাচ, এক্সপ্রেশান।

তাদের মধ্যে একজন ছিল, চন্দ্রিকা বসু। সে থাকত প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে। চন্দ্রিকার মুখের এক্সপ্রেশান এত সুন্দর ছিল যে, বলবার নয়।

আরেকজন মেয়ে ছিল, কালোর মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর ফিগার। একেবারে কাটা কাটা চোখ-মুখ, যেন অজন্তা থেকে নেমে এসেছে। তার নাম ছিল মন্দিরা সেনগুপ্ত। সম্ভবত। তাকে বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে দেখেছি এক স্কুটারের পেছনে বসে চলে যেতে। বেশ স্মার্ট স্বামী। ব্যক্তিগত আলাপ আমার সঙ্গে ছিল না কিন্তু আমি তার খুব অ্যাডমায়ার ছিলাম।

দুঃখের কথা এই যে, কে যে কার অ্যাডমায়ার তা অন্যে জানতও না। আমরা খুবই লাজুক ছিলাম বলেই অ্যাডিমিরেশনের কথা অনেকেই প্রকাশ করতাম না। কিন্তু সেই সুন্দর অনুভূতি যে চারযুগ পরেও অবিকৃত আছে এই তো মস্ত বড়ো কথা। আমরা ওইরকমই ছিলাম। মনে মনে মালা গাঁথতাম, মনে মনে সকলের অলক্ষে ছিঁড়ে ফেলতাম। যার জন্যে মালা গাঁথা, সে জানতেও পারত না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। দেখা যে হয় না, আর কথাও যে হয়নি কখনওই, তবু সে কথা সে-সময়ে, জানানো যে হয়নি, এরও একটা আলাদা মাধুর্য আছে বলে মনে করি। এসব হয়নি বলেই সেই নৃত্যগীতপটিয়সী অগণ্য কিন্নরীরা তো বটেই, আরও অনেকেই আমার স্মৃতিতে অবশ্যই জ্বলজ্বলে হয়ে আছে।

চন্দ্রিকার সঙ্গে অবশ্য কথাবার্তা বলতাম। চন্দ্রিকা ঋতুরও খুব ভালো বান্ধবী ছিল, সেই সূত্রে। সবসময়েই হাসি-খুশি। ভাল মেয়ে। প্রাণবন্ত। আরও অনেকেই ছিল যারা নাচত গাইত। সকলের কথা বলতে বসলে আলাদা বই লিখতে হয়। আমার 'খেলা যখন' উপন্যাসে ওইসব দিন এবং ওই জগত নিয়ে লিখেছি। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশক।

তখন কলকাতাতে সঙ্গীতানুষ্ঠানের বা নাটকের জন্যেও সেরকম কোনো হল ছিল না। রবীন্দ্রসদন ছিল না, নন্দন ছিল না, বিড়লা সভাগৃহ, কলামন্দির কিছুই ছিল না। জ্ঞানমঞ্চ, নজরুল মঞ্চ এসব তো সেদিনের। নাটক-টাটকের জন্যে সে বহুরূপীর নাটকই হোক কি লিটিল থিয়েটারের নাটকই হোক, প্রেস্টিজিয়াস জায়গা ছিল নিউ এম্পায়ার সিনেমা। রবিবারের সকালবেলায় নাটক হত।

"দক্ষিণীর" সব অনুষ্ঠান হতো আশুতোষ কলেজের হলে। আমি দক্ষিণীতে যোগ দেওয়ার আগে এবং পরে যে দুটি 'রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন' দক্ষিণী করেছিলেন, তাতে বাংলাদেশের অনেক শিল্পীও এসেছিলেন। তাও হয়েছিল সেখানেই।

সন্ধেবেলা ছ'টা বা সাতটার সময়ে হত। সেই হলে একপাশে ছেলেরা একপাশে মেয়েরা বসত। মধ্যখানে শুভদা বসতেন হারমোনিয়াম নিয়ে, কোনো-কোনোদিন সুবিনয়দা অথবা সুনীলদাও বসতেন। যিনি পুরো ব্যাপারটার মহড়া পরিচালনা করতেন বহুদিন ধরে নিষ্ঠাভারে তিনিই পরিচালনা করতেন অনুষ্ঠান। পিছনে বসতেন যন্ত্রশিল্পীরা এবং একক গানের সময়ে, যাঁর গান হয়ে যেত, তিনি পিছনে সরে বসতেন, যাঁর একক গান তিনি মাইকের সামনে এসে বসতেন। দ্বৈত-গানের শিল্পীরাও তাই করতেন।

মনে আছে, রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানের মহড়া চলছে। সুনীলদা হারমোনিয়ামে। মহড়া পরিচালনা করছেন। ধ্রুপদাঙ্গের একটি অত্যন্ত কঠিন গান।

হঠাৎই বেলো-করা বন্ধ করে সুনীলদা আর্তনাদ করে উঠলেন, কে? কে? কে—এ—এ—এ? বলে।

আবার কে?

আমি ছাড়া আর কে?

অত ছেলেমেয়ের মধ্যেই যেই গলাতে সুর একটু কম লেগেছে সঙ্গে সঙ্গে ধরেছেন উনি।

আমার অনেকই দোষ। অনেকরকমের দোষ। কিন্তু সেই সব দোষ স্বীকার করতে কোনোদিনও দ্বিধা করিনি।

"হেথা যে গান গাইতে আসা, আমার হয়নি সে গান গাওয়া—
আজও কেবলই সুর সাধা, আমার কেবল গাইতে চাওয়া।।
আমার লাগে নাই সে সুর, আমার বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে গানের ব্যাকুলতা।।"

সুর লাগাবার সাধনাতেই জীবন শেষ হল। সুর তবু লাগল কই?

"দক্ষিণীর" একটি নাট্যবিভাগও ছিল। সেই নাট্যবিভাগ থেকে অনেক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। যেমন, 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'নষ্টনীড়', যেমন, 'ফাল্গুনী', যেমন 'রবিবার', 'পণরক্ষা', ইত্যাদি। ড. কালিদাস নাগের মেজমেয়ে মঞ্জুদি, মঞ্জুশ্রী নাগ, রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের নাট্যরূপ দিতেন "দক্ষিণী"র নাট্যবিভাগের জন্যে। আমি একটি নাটকেই অভিনয় করেছিলাম, 'রবিবার'। নিউ এম্পায়ারেই অভিনীত হয়েছিল সে নাটক সকালবেলা। উনিশশো ছাপান্ন-সাতান্নতে হবে। অভিনেতা আমি, গায়কের মতোই খারাপ ছিলাম। কারণ, জীবনেই যে অভিনয় করতে পারেনি কখনও, সে আর মঞ্চে অভিনয় করবে কী করে!

"দক্ষিণী"র একটা জিনিস ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয়। সেটা হল কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও নিষ্ঠা। "ঋভু"র দ্বিতীয় পর্বে বলেছি বোধহয় যে, দক্ষিণীর ক্লাসে কী মহড়াতেও কোনোদিনও এক মিনিটও দেরি করে ঢোকা চলত না। কারণ, দরজা বন্ধ হয়ে যেত।

মনে আছে, তখন "দক্ষিণী"র পুরোনো বাড়িতেই মহড়া হত। "দক্ষিণীর" বাড়ি হল একনম্বর দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্টে, উনিশশো পঞ্চান্নর মহালয়ার দিনে। দিনটি মনে আছে, কারণ সেই একই দিনে আমার বাবার বাড়ির রাজা বসন্ত রায় রোডে 'কনীনিকা'র গৃহপ্রবেশ হয়েছিল। নতুন বাড়ি হওয়াব আগে গীতাভবন বলে যে বাড়িটি আছে ঠিক দেশপ্রিয় পার্কের গায়ে, ল্যান্সডাউন রোডের উপরে, সেই গীতাভবনের একতলায় একটি হলে নাটকের রিহার্সাল হত।

মহড়া চলাকালীন নাট্যজগতের কোনো কোনো মানুষ মহড়া দেখতে আসতেন। বসে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সলিল সেনগুপ্ত। তিনি নাট্যজগতের কী চিত্রজগতের তা অমি জানতাম না।

একদিন মহড়ার পবে আমাকে আলাদা করে ডেকে বললেন, কালকে রবিবাব সকালে আমার সঙ্গে একটা জাযগায় যেতে পারবে?

কোথায়?

চিত্ত বসুর বাড়িতে।

পঞ্চাশের দশকে চিত্ত বসুর সফল পরিচালক হিসেবে খুব নামডাক। বহু বাণিজ্যিকভাবে সফল ছবি উনি পরিচালনা করেছেন। তরুণ মজুমদারেরা তেমন করে তখনও আসেননি।

কেন?

উনি তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন। কথা বলতে চেযেছেন।

কী ব্যাপারে?

একটি ছবি আরম্ভ করবেন। তোমার কথা আমার কাছে শুনে তোমাকে একটি রোল দিতে চান, যদি অবশ্য তোমাকে পছন্দ হয। তারপরে অবশ্য স্ক্রিন টেস্ট এবং ভয়েস টেস্ট। সেসব পরের ব্যাপার।

বললাম, "মেয়েদেখা" বলে একটি বাজে ব্যাপার বেশ চালু আছে এখনও তা জানি কিন্তু ছেলে-দেখাও যে আছে তা তো জানা ছিল না! ঠিক আছে, যাব।

আমাকে ঠিকানা দিয়েছিলেন বকুল বাগান রোড কি ওইরকম কি একটা জায়গার। আজ আর সঠিক মনে নেই। বাড়িটা ছিল ল্যান্সডাউন রোড থেকে ভবানীপুরের মাঝামাঝি কোনো জায়গাতে।

গিয়ে তো পৌঁছোলাম। দেখলাম কালো, সুদর্শন এক ভদ্রলোক।

কথা বললেন মিনিট দশ-পনেরো।

তারপরে বললেন, আপনাকে পছন্দ হয়েছে আমার। আপনার বাড়ি কি খুব কনজার্ভেটিভ? আমার ছবিতে অভিনয় আপনি করতে পারবেন কি না দয়া করে এক সপ্তাহের মধ্যেই জানাবেন। এই আমার ফোন নাম্বার। বলে, লিখে দিলেন ফোন নাম্বার।

জিজ্ঞেস করলাম, আর কে কে থাকবেন ছবিতে?

উত্তমকুমার আছেন নায়কের রোলে। মালা সিনহা আছেন নায়িকার রোলে। ভিলেন বলব না, মানে নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই রোলটিতেই আপনাকেই নেবার ইচ্ছে।

বললাম, ঠিক আছে। বাড়িতে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাব।

যেতে-আসতে আমার অনেকই সময় লেগেছিল, তখন তো গাড়ি ছিল না। কলেজের ছাত্র। ততক্ষণে মা আর সেজকাকু খেতে বসে গেছেন।

কোথায় গেছিলি? বিকেলে টেনিস খেলা, রাতে নাটকের রিহার্সাল আর দিনে টৌ-টৌ করে ঘুরে বেড়ানো শুধু। পড়াশোনা তো করতে দেখি না।

বললাম, মা, আমাকে ছবি করবার জন্যে ডেকেছিলেন চিত্তবাবু। উত্তমকুমার নায়ক। মালা সিনহা নায়িকা। উনি জিজ্ঞেস করেছেন যে, আমাদের বাড়ি কি খুব কনজার্ভেটিভ?

সেজকাকু খেতে খেতে মুখে তুলে বললেন, তুই কি বললি?

আমি আর কী বলব। প্রশ্নটা তো আমাকে করা নয়।

স্বাধীনতা-সংগ্রামী খদ্দর-পরিহিত, এম এ বি এল, অবিবাহিত, outspoken প্রাচীনপন্থী সেজকাকু চিত্ত বসু-সংসর্গে ভাইপোর এহেন চিত্তবিভ্রমে অত্যন্তই বিরক্ত হয়ে বললেন, বললি না কেন, যাদের কনজার্ভ করার কিছু থাকে, তারাই কনজার্ভেটিভ হয়।

মা বললেন, খবরদার। বাবা জানতে পারলে একদম দক্ষযজ্ঞ হয়ে যাবে। পড়াশোনা তো কিছুই করছ না। খালি 'দক্ষিণী' 'দক্ষিণী' করে বেড়াচ্ছ। রাজ্যের যত মেয়ে সেখানে গান শিখতে যায়। তারপর আবার সিনেমা! আমার তো মত নেই-ই। আর তোমার বাবারও হ্যাঁ বলার কোনো প্রশ্নই নেই।

ভাবলাম, কী জানি! বাবা তো স্পোর্টসম্যান। হয়তো রাজিও হয়ে যেতে পারেন।

বাবা রাতে ডেকে বললেন, ওসব ভুলে যাও। সিনেমা-থিয়েটার বন্ধ করো। এবার পড়াশোনায় মন দাও। আজকাল তো আর পড়াশোনা করতেই দেখি না। সকালবেলায় কলেজ, আর দুপুরবেলায় অফিস-অফিস খেলা, বিকেলবেলা টেনিস আর সন্ধেবেলায় দক্ষিণী। হয় গানের রিহার্সাল, নয় নাটকের রিহার্সাল। তো ব্যাপারটা কী?

কী আর বলব। কিছুই বললাম না। কথাটা সত্যিই। কিছুই পড়াশোনা হচ্ছে না। পড়াশোনা করতে বসলেই নানা মেয়ের মুখ টেবলের উলটোদিকে সার দিয়ে ভিড় করে। এ জীবনে "জীবিকার জন্যে পড়াশুনো" আর আদৌ হবে বলেও মনে হয় না। কেবলই কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে, পাঠ্য পুস্তক ছাড়া, রাজ্যের বই পড়তে, ছবি আঁকতে এবং গান গাইতে।

অ্যান অডিটার ইজ আ ওয়াচডগ! অ্যান অডিটার ইজ আ ওয়াচডগ! আর যারই হোক আমার জীবনের জপমন্ত্র করতে আমি রাজি নই।

বলা হয়নি, আমাদের সেই নাট্যবিভাগের সেক্রেটারি ছিলেন আশিস মুখার্জি।

আশিসদা নাটক-টাটক করেছেন। দু একটি ছবি-টবিও করেছেন। যে ভূমিকাটি আমাকে চিত্তবাবু দিতে চেয়েছিলেন, আমি "না" বলাতে আশিসদা পরে সেই ভূমিকাটিতে করেন। ছবিটির নাম আমি ভুলে গেছি।

দক্ষিণীর নাট্যবিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলাম আমি। কোন্ গুণের জন্যে যে আমার উপরে এই পদ ন্যস্ত হয়েছিল তা আমি বলতে পারব না। তবে এই পদভারে আমার চলাচলের সাবলীলতা, যারপরনাই ক্লিষ্ট হয়েছিল।

'রবিবার'-এর রিহার্সাল আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যাবেলায় যাই। তিন ঘণ্টা পরে ফিরি। যার ভূমিকা যেমনই থাকুক না কেন, রাজা থেকে ভগ্নদূত, প্রত্যেককেই মহড়ার পুরো সময়টুকুতে উপস্থিত থাকতে হত। আমার যা ভূমিকা, দু'বার মঞ্চে প্রবেশ করেও সাকুল্যে পাঁচ মিনিট মঞ্চে থাকার কথা।

বাবা থিয়েটার দেখতে যাননি। বাবার সময় একবারেই ছিল না। নিজের কাজ এবং খাওয়াদাওয়ার পরে শুয়ে শুয়ে, মাথার কাছে টেবলল্যাম্প জ্বালিয়ে 'ব্যাং ব্যাং ওয়েস্টার্ন-থ্রিলার' পড়াই তাঁর একমাত্র বিনোদন ছিল।

"রবিবার" নাটকটি আমরা নিউ এম্পায়ারে করার পরে রেডিয়োতে করবার জন্যেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। রেডিয়োর জন্যে আবারও নতুন করে মহড়া শুরু হল। নিউ এম্পায়ারে অভিনয় করার পর অনেক দিনের ব্যবধান রচিত হয়েছিল রেডিয়োতে সম্প্রচারিত হওয়ার তারিখের। তাই।

বাবা বললেন, রেডিয়োর নাটকের জন্যে তো আর বাইরে যেতে হবে না! তোর নাটক কবে রেডিয়োতে ব্রডকাস্ট হবে জানাবি, আমি শুনব। সেদিন তাড়াতাড়ি ফিরব অফিস থেকে।

অবশেষে যেদিন নাটক রেডিয়োতে সম্প্রচারিত হবে সেদিন এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। সবে ইডেন গার্ডেন্সে তখন আকাশবাণীর নতুন বাড়ি হয়েছে। গারস্টিন প্লেসকে ত্যাগ করে এখানে উঠে এসেছে অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো lock Stock and Barrel।

স্টুডিয়ো দেখলাম। ক্যানটিনটা ছিল পিছনে। পিছনের গেটটাও তখন খোলা থাকত। এবং তখন ঝকঝকে-তকতকে মেশিন, আকাশবাণীর কর্মচারীরা তখন প্রত্যেকেই নিয়মানুবর্তী ছিলেন। প্রত্যেকেই যার যার কাজ করতেন। শৃঙ্খলা ছিল। ইউনিয়নবাজি করে সর্বনাশ সম্পূর্ণ করা হয়নি। আজকের মতন নৈরাজ্য আসেনি সেখানে।

যেদিন নাটক সম্প্রচারিত হল, সেদিন বাবা সত্যিই তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরলেন। এমনিতে ন'টার আগে ফিরতেন না। বাবা, মা, আমার ছোটো বোন ইলু, ববি, খুড়তুতো বোন বীথি, আমার ছোটো ভায়েরা সবাই বসে আছি।

আমি উৎকর্ণ, উদ্গ্রীব এবং যাবতীয় উঃ হয়ে।

নাটক আরম্ভ হল। নাটকের মনে নাটক এগোচ্ছে।

বাবা খালি বলছেন, আরে হোঁদল কই রে, তুই কোথায়? তোর পার্ট কখন?

আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, আমার পার্ট কত বড়ো!

বললাম, আসছে, আসছে।

সকলেরই তখন "Waiting for Godot"– এর মতো অবস্থা।

আমি যখন এলাম, দ্রুত দুবার এলাম, মানে এলাম আর গেলাম আর কী! তখন বাবা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, এর পরে কখন? কতক্ষণ পরে?

অধোবদনে বললাম, আমি আর নেই।

বাবা কপালে হাত দিয়ে বললেন, হায় ভগবান! এই রোলেরই জন্যে এত মহড়া আর এতদিন ধরে রিহার্সাল! তুই কি সত্যি সত্যিই রিহার্সালে যেতিস?

আমি চুপ করে রইলাম।

তা দোষ তো আমার নয়।

আমাদের মহড়া তখন দেখতেও আসতেন অনেকে। তাছাড়া, শুধু তো মহড়াই নয়, অন্য অনেক এবং অনেকরকম ভালোলাগাই যে ছিল।

দক্ষিণীর ঘোরের মধ্যে পড়ে, কী করে যে মাস-বছরগুলো কেটে গেল! দক্ষিণীতে গান শিখতে গিয়েই তরুণী গায়িকার প্রেমে পড়লাম। সেও আর এক অপরাধ।

আমাদের পৈতৃক পরিবারে তার আগে কোনোদিনই কেউ ভালোবেসে বিয়ে করেনি। গানও করেনি। সবদিক দিয়েই আমাদের পরিবারের "অগ্রবাল" ছিলাম আমি, রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গীর' "শেষ কথার" অগ্রবালেরই মতো এবং কুলাঙ্গারও। নানা অপরাধে অপরাধী।

এতরকম এবং এত বিপর্যয় সত্ত্বেও আমি বলব যে, আমাদের প্রজন্মে আমরা পড়াশোনা ছাড়াও অনেক কিছুই করার সময় পেতাম। তবে এও বলব যে, যাকে "নষ্ট করা" বলে, তেমন ভাবে দিনের পনেরোটা মিনিটও কোনোদিন নষ্ট করিনি। বই পড়েছি, লেখার চেষ্টা করেছি, গান শুনেছি, গান গাওয়ার চেষ্টা করেছি, ছবি এঁকেছি, সবসময়েই কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি, আজও থাকি। এই সু-অভ্যেসের উন্মেষ হয়েছিল আমার বাবার কড়া শাসনেরই জন্যে হয় তো। কারণ, জোর করে ঘরে বন্দি করে না-দিলে হয়তো অন্তর্মুখীনতা এমনভাবে প্রস্ফুটিত হত না।

বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি বইতে, বইটির নাম ভুলে গেছি, পড়েছিলাম যে, শিশুদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলবার জন্যে শিশুদের একা ঘরে বন্ধ করে রেখে দেওয়াটা খুবই দরকার। একা না থাকলে, কারো ব্যক্তিত্বই পরিপূর্ণ বিকশিত হয় না। আমারও মনে হয় যে, উনি ঠিকই বলেছিলেন। যে-মানুষ, শিশুদের কথা বাদ দিয়েই বলছি, যে পূর্ণবয়স্ক মানুষ একা থাকতে ভয় পান বা একা থাকতে হাঁফিয়ে ওঠেন, আমার মনে হয় তাঁর ব্যক্তিত্ব সত্যিই সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। দলে-বলে থাকে জানোয়ার। মানুষের যা ভূমিকা এই পৃথিবীতে, তা একার ভূমিকা। তার যেসব প্রচেষ্টাতে উৎকর্ষে পৌঁছোনোব ব্যাপার তার প্রায় সবই একা একাই করতে হয়। দলে-বলে রাজনীতি করা চলে, দলে-বলে খেলা চলে, দলে-বলে নাটক করা চলে, কিন্তু লেখক বা গায়ক বা চিত্রী হওয়া যায় না। রাজনীতিক বা অভিনেতা বা খেলোয়াড়কেও একা ঘরে বসে অনেকই বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়। ভাবনা-চিন্তা তাঁদেরও অবশ্যই করতে হয়। মানুষমাত্ররই, যাঁদেরই করার মতো কিছুমাত্রই থাকে জীবনে, তাদের পক্ষে একা থাকাটা খুবই জরুরি।

দক্ষিণীর বাৎসরিক অনুষ্ঠান হত প্রতি বছরে। কোনো কোনো বছর পিকনিক হত কোনো বাগানবাড়িতে, কোনো কোনো বছর স্টিমার পার্টি হত। কর্নেল বোস ছিলেন তখন নেভির। তিনি দক্ষিণীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখতে আসতেন। তাছাড়া প্রত্যেক মাসেই একটি করে অনুষ্ঠান হত দক্ষিণীর বাড়িতে এই সংস্কৃতি বিভাগের সভ্যদের জন্যে। তাতে বিভিন্ন শিল্পী এসে গান গাইতেন, বাজাতেন, প্রতি মাসে। এখনও সেটি হয়। আমি এখনও সেই সংস্কৃতি বিভাগের সদস্য আছি। যদিও যেতে পারি না সময়াভাবে। কিন্তু যোগাযোগটা যাতে একেবারে না চলে যায়, সেজন্যেই সদস্যপদ ছাড়িনি। দক্ষিণীর বার্ষিক নানান অনুষ্ঠান, সমাবর্তন, রবীন্দ্রজন্মোৎসব ইত্যাদিতে, কলকাতাতে থাকলে এখনও যাই।

এই সংস্কৃতি বিভাগের সচিব ছিলেন প্রীতিরঞ্জন রায়। তিনি বিয়ে করেন শান্তনিকেতনের নৃত্যপটীয়সী ছাত্রী আলো দত্তকে। এক বসন্তোৎসবের রাতে নৃত্যরতা আলো দত্তকে দেখিয়ে মোহরদি আমাকে বলেন দ্যাখ দ্যাখ, এর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ করছি। ভালো নয়? বলেছিলাম, খুব ভালো।

চমৎকার নাচতেন আলো দত্ত। "দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা হৃদয় আকাশে" গানের সঙ্গে নাচছিলেন সেই পূর্ণিমার রাতে। খুব সুন্দর ফিগার ছিল।

প্রীতিদা কিছুদিন হল ইন্ডিয়ান অক্সিজেন কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে রিটয়ার করে দীর্ঘ এবং self-made কেরিয়ারের যতি টেনে শান্তিনিকেতনেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন "পূর্বপল্লীতে"। তাঁর বাড়ির নাম "আস্তানা"।

বলতে ভুলে গেছি, দক্ষিণীর মহড়া শুধু গীতাভবন বা দক্ষিণীতেই নয়, মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের কারও কারও বাড়িতেও হত। এবং কোনো কোনো সদস্যের বাড়িতেও হত এবং হিতাকাঙ্ক্ষীদের বাড়িতেও। সেরকম একটি মহড়া, মানে ফুল-রিহার্সাল যাকে বলে, বাবার বাড়ি কর্নীনিকাতেও হয়েছিল।

তার একদিন আগে ওড়িশার টুম্বকার জঙ্গল থেকে ফিরেছিলাম আমরা। সকলকে আমার শিকার-করা শম্বরের কাবাব খাওয়ানো হয়েছিল মনে আছে।

আমাদের বাড়িতে গান-বাজনা হলে লনটা অডিটরিয়াম হত আর খোলা বসার ঘরটা স্টেজ। মহড়ার সময়েও তাই করা হয়েছিল। এবং অবাক কান্ড! সেদিন বাবা অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে মহড়া দেখেছিলেন।

বলতে একেবারেই ভুলে গেছি যে, 'রবিবার'-এ আমাদের সঙ্গে এন বিশ্বনাথনও অভিনয় করেছিলেন। অশোক বিশ্বনাথনের বাবা। তখনও বিশ্বনাথনের সঙ্গে ড. কালিদাস নাগের ছোটোমেয়ে পারমিতার বিয়ে হয়নি। তবে তখন কোর্টশিপ চলছিল পুরোদমেই।

শুভদারা থাকতেন ড. নাগেরই বাড়ির একতলাতে তখন। অনেক পরে অবশ্য দশ নম্বর শরৎ ব্যানার্জি রোডে বাড়ি কিনে চলে যান। বিরাট বাড়ি, চমৎকার বাড়ি। আর তার অনেক আগে দক্ষিণীর বাড়ি হয় এক নম্বর দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্টে। সে কথা তো বলেইছি।

কত পুরোনো কথাই না মনে পড়ছে স্মৃতিচারণ করতে বসে। কত মানুষের কথা। তাঁরা অনেকেই আজ নেই। কিন্তু আমার স্মৃতিতে, চল্লিশ বছর আগেব অনেক স্ত্রীপুরুষ-সকলেরই যৌবন-দীপ্ত ও মাধুর্যময় রূপবান রূপবতী মুখগুলিই ধরা আছে। সেই মুখগুলিই আজীবন মনে রাখতে চাই। কোনো মৃত মানুষের মুখ আমি দেখি না। পারতপক্ষে দেখতে চাই না। আমার স্মৃতিতে আমার পবিচিত প্রত্যেকেই দীপ্ত, দৃপ্ত, ঋজু হয়ে যেন চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকেন।

মনে পড়ে, মোহরদিকে প্রথম কাছ থেকে দেখি শুভদার বাড়িতেই। কী যে রূপ ছিল মোহরদির তখন। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই শুধু জানেন।

বেশ একটু আহ্লাদি-আহ্লাদি ভাব। কেন বলতে পারব না, মোহরদির গান ছোটোবেলা থেকে আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করত। যেন শান্তিনিকেতনে থাকবার জন্যেই, বড়ো হয়ে ওঠার জন্যেই মোহরদি বাচ্চুদিরা জন্মেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার জন্যেই যেন বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। মোহরদির মধ্যে এবং কিছুটা বাচ্চুদির মধ্যেও (নীলিমা সেন) শান্তিনিকেতনের শালবন, আম্রকুঞ্জ, শিরীষ, অগ্নিশিখা, বাসন্তী পূর্ণিমার চাঁদ ভরা শ্রাবণের বর্ষণ, মাঘি রুক্ষতা যেন ছায়া ফেলেছিল। তাঁদের মধ্যে আমাদের সময়কার শান্তিনিকেতনেব ছায়া যেন দেখতে পেতাম।

ব্যাপারটা ঠিক ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না, কিন্তু কথাটা সত্যিই। আশ্রমিক সংঘের সভ্যরা ভুল বুঝবেন না। আমি যে কখনও শান্তিনিকেতনে পড়িনি এবং আশ্রমিক ছিলাম না এই কথা পরিষ্কার কবে জানাচ্ছি। আশ্রমিক হই আর না হই, রবীন্দ্রনাথের প্রতি যাঁদেরই ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তাঁদেরই আমার মতো শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল, হয়তো আজও আছে। আছে বলেই, এই শান্তিনিকেতনে যেতে মন কবে না।

একটা কথা কথা বলতে ভুলে গেছি। ড. নাগের আরেক মেয়ে কিশাদির সঙ্গে পরে আমাদের কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক এবং অত্যন্ত প্রিয় পি লালের বিয়ে হয়। প্রফেসর লালের কথা ঋভুর দ্বিতীয় পর্বে অনেক বলেছি। তাঁর অধ্যাপক জীবনের প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস, আমাদের ক্লাস নিয়েই শুরু করেছিলেন তিনি।

মোহরদি খুব সাজতে ভালবাসতেন। এবং মোহরদি আর বউদি দুজনে সেজেগুজে পাশাপাশি দাঁড়ালে মনে হত পৃথিবী ওই সৌন্দর্যরাজির ভার সইতে না পেরে রসাতলে যাবে। ঠিক করতে পারতাম না যে, কাকে ফেলে কাকে দেখব।

বউদির মধ্যে একজন নারী ছিলেন, যিনি আমার চোখে THE MOST FEMININE IN HUMAN FEMININE SPECY বলে মনে হত আমার। এরকম মেয়েলি মেয়ে আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি।

মনে আছে একদিন, সদ্য ড্রাইভিং-লাইসেন্স পেয়ে গাড়ি চালিয়ে মোহরদি আর বৌদিকে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে পিপিঙে চাইনিজ খেতে গিয়েছিলা। তখন পিপিং-ই ছিল ওই পাড়ার নামি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। নয়তো সেই চিনেপাড়ায় যেতে হত। নয়তো সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর নানকিং। তখন ওয়ালডর্ফ হয়নি এবং প্রত্যেক বাঙালি বাড়িতেই আজকের মতন চাইনিজ রান্নার মহামারী লাগেনি। এমনই রান্না, যে—চাইনিজ রান্না খাইয়ে যে-কোনো ওরিজিনাল চিনকে অহিংস উপায়ে প্রাণে মেরে দেওয়া যায়।

গাড়ি থেকে নেমে মোহরদি আলো-ঝলমল ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো তো? ভালো করে দেখে বলো।

আমি বললাম, কী বলব বলুন, বউদিকে দেখাচ্ছে শিলংয়ের পাইন গাছের মতো, আর আপনাকে দেখাচ্ছে ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরার মতো।

কী খুশিই যে হয়েছিলেন মোহরদি তা কী বলব!

আমার মা, এই সব সুন্দরী এবং গুণী মহিলাদের প্রতি আমার জন্মগত দুর্বলতাটা মোটেই ভালো চোখে দেখতেন না কোনোদিনও। আমি মোহরদিকে খুবই পছন্দ করতাম। মোহরদি আমাদের বাড়িতেও এসেছেন তখনই, পঞ্চান্ন-ছাপান্ন সালে। বউদি তো এসেছেনই।

মা, তাঁর অপছন্দ ব্যক্ত করতেন নানাভাবে। পরোক্ষভাবে অবশ্যই।

মা বলতেন, কী যে গায়! গালে সুপুরি দিয়ে।

আমি হাসতাম।

তাতে আমার সরল, বাবার ভাষায়, ভালোমানুষ "ট্যাক্টলেস" মা আরও চটে যেতেন।

মনে হয় না সারল্য বা ভালমানুষীর সঙ্গে tact-এর কোনো যোগাযোগ কখনওই ছিল বলে। tact অনেকই সময়ে খলতার বাহক। আমি আমার মায়েরই মতো। tactless, out snoken হয়েছি। ফলে প্রতিমুহূর্তেই দণ্ড গুনতে হয়।

তাহলেও tactful হওয়ার কোনো উচ্চাশা আমার নেই এ-জীবনে।

বীরেনদার কথা আগেই বলেছি। আত্মভোলা মানুষ। কবি। বীরেনদার অনেক কবিতার বইও বেরিয়েছিল। আমাকে সব বই-ই পাঠাতেন। যখনই বেরোত। রসিক বলে নয়, পুব বাংলার মানুষ বলে। মোহরদিকে ডাকতেন "মহর" বলে।

একবার আমরা সুন্দরবনে যাচ্ছি বেড়াতে। মস্ত দলে, বাবার মক্কেল ক্যানিং-গোসাবা বোট কোম্পানির কর্ণধার গোপেন্দ্রচন্দ্র বাগচীর বোটে করে। আমাদের সঙ্গে গেছিলেন বীরেনদা, মোহরদি, রেখা বউদি, রেখা বউদির ছোটো জা, নিনা বউদি, আশিসদা, বৌদি, প্রীতিদা, আলোদি, ঋতু এবং আরও অনেকে। এই রেখা-বউদিই পরে সত্যজিৎ রায়ের বেয়ান হন। ক্যানিং থেকে আমরা উঠব লঞ্চে। ক্যানিং অবধি একটি ট্রেনে যাওয়া হচ্ছে বালিগঞ্জ থেকে।

হঠাৎই কম্পার্টমেন্টে কিছু লোক গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে উঠল মধ্যবর্তী কোনো স্টেশনে।

অমনি বীরেনদা বললেন, আরে। আরে। ঢাক। ঢাক। গুড়। গুড়। ঢাক ঢাক গুড় গুড়।

সকলে হেসে বাঁচি না।

যখন প্রথম ওঁদের সঙ্গে আলাপ হয়, শান্তিনিকেতনের তখন ওঁরা থাকতেন নিচু বাংলোর বাড়িতে। খড়ের ছাদের ছোট্ট বাড়ি ছিল। মানে, আশ্রমের মধ্যেই।

তার বহুবছর পরে মোহরদি বিরাট বাড়ি করলেন, অ্যান্ড্রুজ পল্লীতে। সে-বাড়িতেও গেছি অনেকইবার। বীরেনদা থাকতেও গেছি, বীরেনদা চলে যাবার পরেও গেছি। সেই বাড়ি কমপ্লিট হওয়ার পরে, বিরাট গ্যারাজ করলেন বীরেনদা গাড়ি রাখবার জন্যে।

শুভদা বলতেন, ওটার নাম শ্যামা গ্যারাজ। 'শ্যামা'-র লং-প্লেয়িং রেকর্ড থেকে রয়্যালটি অনেক পেয়েছিলেন মোহরদি। সেই রয়্যালটি থেকেই হতে পারত গ্যারাজটি। তাই ঠাট্টা করে বলতেন, "শ্যামা গ্যারাজ"।

তখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েদের ইজ্জৎ ছিল। রয়্যালটিও সময়ে দেওয়া হত।

মোহরদি বছর কয়েক আগে, মাত্র চার-পাঁচ বছর আগে হবে, আমার বাবার বাড়িতে এসেছিলেন। তখন বাবা গত হয়েছেন।

এক সন্ধেবেলায় গিয়ে দেখি, মোহরদি বসে আছেন। সেবারে মোহরদি কলকাতায় এসে উঠেছিলেন অরুণের বাড়ি। অরুণ ভট্টাচার্য। তখন ইনফরমেশানের সেক্রেটারি ছিল অরুণ। অরুণের স্ত্রী ভারতী মোহরদির ছাত্রী ছিল। ভারতীরই সঙ্গে মোহরদি এসেছিলেন। অরুণের সঙ্গে আমার সহোদরদের ঘনিষ্ঠতা আছে। বন্যাও ছিল সঙ্গে। বন্যা রেজওয়ানা চৌধুরী। বন্যার বাবা-মা বহুবছর আগে, সেই পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে, বা শেষের দিকে আমাদের বাড়িতে এসে একবার উঠেছিলেন। সে কথা আমার সহোদরদের জানার কথা নয়। বন্যার বাবা ছিলেন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। সেই সূত্রে বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিল। বাবার অধস্তন কর্মচারী হিসেবে ওঁকে বাবা চিনতেন এবং ভালোবাসতেন।

আমাদের বাড়িতে থেকে, কলকাতাতে অনেক বাজার-টাজার করে কয়েকদিন থেকে তারপর ঢাকাতে ফিরে গেছিলেন।

গান নিয়ে কথা হচ্ছিল। তো, বন্যা গানও গাইল। কিন্তু বন্যার গান আমার ভাল লাগেনি। অন্য গান হয়তো ও ভালই গায় কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত ওর জন্যে নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনোদিনও সকলের জন্যে কখনওই ছিল না।

দুঃখের বিষয় এই যে, এই সরল সত্যটা কম জনেই বোঝেন!

নিধুবাবুর গান, পুরোনো বাংলা গান যে দুয়েকবার আমি গেয়েছি টি ভি তে এবং অন্যত্র তা মোহরদি জানতেন কিন্তু শোনেননি। আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত তিনি অনেকই শুনেছিলেন। শান্তিনিকেতনে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে গেলেই বৈতালিকে জোর করে টেনে নিতেন। বুঝতেন বোধহয় যে, ষাঁড়ের গলা মিললে বৈতালিকের জোর বাড়বে।

মোহরদি বললেন, তুমি যে অন্যরকম গান গাইছ আজকাল তা শোনাও তো একটু, সুযোগ হয় না। তুমি তো শান্তিনিকেতনে যাওই না আজকাল।

অনেক গানই গেয়েছিলাম সেদিন। মোহরদি এতই অভিভূত হয়ে গেছিলেন যে, বললেন, ইসস। আমরা কেন এসব গান শিখলাম না! টপ্পা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে তো নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এসব গানের মতো টপ্পা নেই। এসব গানের বাণীও তো অসাধারণ।

আমি বললাম, অনেক গান আছে, সেসবের কথা একেবারে প্রায় হুবহু, বিশেষ করে নিধুবাবুর গান, শ্রীধর কথকের গান, হুবহু রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো। ভাবার্থে তো বটেই। প্রচুর অনামা লেখকের গানও আছে। প্রাচীন গানের মধ্যে পড়ে। যেমন একটি গান আছে : 'কী সুর, বাজে আমার প্রাণের' মতোই কথা। গানের মুখটা, সেই গানেও 'কী সুর বাজে', রবীন্দ্রনাথের গানও 'কী সুর বাজে'।

তাতে অবশ্য কোনো দোষ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এমনিভাবেই তো বাংলা গানের মাধ্যমে আউল-বাউল-জারি-সারি সমস্ত রকম গানকে নিয়ে নিজের জারক রসে জারিত করে আমাদের জন্যে পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কারো কাছ থেকে কিছু নিয়ে থাকলেও তা তাঁর প্রতিভার স্পর্শে original হয়ে উঠত, অনুকরণ রইত না।

সকলেই যখন করে, তখন আমিও এবারে একটু নিজের ঢাক নিজে বাজাই। আমিই মোহরদির রূপগ্রাহী গুণগ্রাহী নই। মোহরদিও চিরদিনই আমার গুণগ্রাহী। আমার চিঠির প্রশংসা করতেন উচ্ছ্বসিত হয়ে সকলের কাছে। 'সাউন্ড-উইং' থেকে আমার পুরাতনী গানের একটি ক্যাসেট বেরিয়েছে। শান্তিনিকেতনের সুবর্ণরেখা থেকে তা যে এতো বিক্রি হয়েছে, তার মূলে মোহরদি। জনে জনে কিনতে বলেছেন এবং এখনও বলে চলেছেন।

আজকে তো আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, নাটকের ক্ষেত্রে তাও ভালো কাজ হচ্ছে কিছু কিছু কিন্তু নৃত্য ও গীতের ব্যাপারে বাঙালির নিজস্ব বলতে তো রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। নেই বলেই, পুরাতনী বাংলা গানের প্রতি এবং পুরোনো দিনের আধুনিক গানের প্রতি যে গানের বাণী এবং সুর দুইই খুবই সমৃদ্ধ ছিল। আকর্ষণ বাড়ছে।

কীর্তন ছিল আমাদের অসাধারণ একটি সম্পদ। সেই কীর্তনও তো চোখের সামনেই নষ্ট হয়ে গেল। একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। তাকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা সরকারি বেসরকারি কোনো মহলেই

হল না। এখন ভালো কীর্তনীয়াতো বলতে গেলে দেখাই যায় না এবং তাঁরা পরের প্রজন্মকেও তৈরি করে যেতে পারেননি।

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় আর কতদিন একা হাতে পতাকা ধরে থাকতে পারবেন?

একবার জাপানে গেছিলাম উনিশশ চুয়াত্তরে। সেখানে জাপানের যে ক্ল্যাসিকাল, মানে, প্রাচীন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনেছিলাম, নাটকের মধ্যেই (কাবুকাজি) তা কী বলব!..

হলটির নাম মনে নেই, বিরাট বড়ো হল। প্রকাণ্ড দোতলা স্টেজ এবং এতো উঁচু যে দেখবার মতো। সেখানেই সমস্ত ক্ল্যাসিকাল জাপানি নাটক টোকিয়োর "গিনজা'তে আজও মঞ্চস্থ হয়। নাটক দেখতে গিয়ে, গান শুনে তো একেবারে অবাক। চোখ বন্ধ করে থাকলে এবং ভাষাটাকে যদি ইগনোর করা যায়, তবে মনে হবে যে কীর্তনই শুনছি। আমাদের কীর্তনে তালের যে বিচিত্র ভ্যারিয়েশন আছে, ওই জাপানি ক্ল্যাসিকাল গানেও ঠিক দেখেছিলাম সেরকমটি। এবং বাদ্যযন্ত্রও আমাদের খোলেরই মতো। এতোই অবাক হয়েছিলাম, যে তা বলবার নয়। জাপানের মতো দেশ এখনও সেই পুরোনো ঐতিহ্য বজায় রেখেছে, অথচ আমাদের কীর্তন হারিয়ে যাচ্ছে একেবারেই। বড়োই দুঃখের কথা।

সুন্দরবনে, ওই সময়ে মনে, উনিশ চুয়ান্ন থেকে, ছাপ্পান্নর পরও তো বহুবারই গেছি। তবে বেড়াতে নয়, শিকারে। সুন্দরবনের মতন ভয়ংকর, নিথর নিস্তব্ধ, মৃত্যুশীতল সৌন্দর্য পৃথিবীর আর কোনো বনেই দেখিনি। পৃথিবীর কম দেশের বনে তো ঘুরলাম না! তাই জোর দিয়েই বলতে পারি একথা।

আমরা তখন প্রতি শীতেই যেতাম। মায়া আইল্যান্ড, লোথিয়ান আইল্যান্ড, ভাঙ্গাডুনি আইল্যান্ড, বড়ো চামটা, ছোটো চামটা, বড়ো বালি, ছোট বালি করতে করতে একদম মোহানা অবধি চলে যেতাম। সেইসব অভিজ্ঞতার কিছু লিখেছি শিকার এবং জঙ্গল সম্বন্ধে লেখা আত্মজৈবনিক 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারের' দুখণ্ডে। অন্য আরও দুটি বই আছে সুন্দরবন নিয়ে। 'বনবিবির বনে' এবং 'সারেং মিঞা'। পৃথিবীর অনেক জঙ্গলেই গেছি, কিন্তু সুন্দরবনের মতো এরকম uncanny, eerie. সেনসেশান আর কোনো জঙ্গলেই অনুভব করিনি। আফ্রিকান জঙ্গলেও নয়। এরকম ভয়াবহ অথচ অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত mangrove forests নোনা জলের পৃথিবীতে আর বেশি জায়গাতে নেই।

'বনবিবির বনে' আছে "ঋজুদা সমগ্র"তে। আনন্দ পাবলিশার্স-এর আর 'সারেং মিঞা' মিত্র ঘোষের বই।
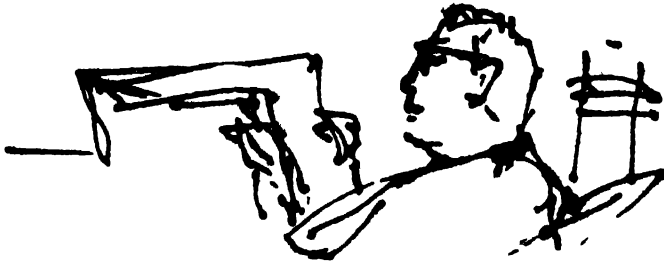
কলেজে পড়ার সময়েই একটু আধটু লেখালেখি করি বাড়িতে বসে। এখানে ওখানে গল্প বেরোয়। ছোটো ছোটো কাগজে। লিটল ম্যাগাজিনে। তখন 'সচিত্র ভারত' বলে একটি ভালো কাগজ ছিল। বহুদিন চলেছিল। 'সচিত্র ভারতে' গল্প বেরোত, গল্প বেরোত "গ্রন্থ ভারতী"তেও। শচীনবাবু-মনোজবাবুদের কাগজেও গল্প বেরোত, "সাহিত্যের খবর"-এ। কোনো বড়ো কাগজের সঙ্গে কোনো জানাশোনা ছিল না। কেউ লিখতেও বলেননি আমাকে।

একটি কবিতা 'দেশ'-এ পাঠিয়েছিলাম। তারপরে ভুলেই গেছিলাম।

একদিন দীপক সকালে টেলিফোন করে খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, তুই দেশে কোনো কবিতা পাঠিয়েছিলি?

হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলাম।

তোর কবিতা ছাপা হয়েছে এই সংখ্যায়। উনিশ ছাপ্পান্নতে। মাসটা মনে নেই। তখন 'দেশ'-এ কবিতা ছাপা হওয়া মানে একটা স্ট্যাটাস-এর ব্যাপার। আজকালকার মতো অপাঠ্য কবিতা 'দেশ'-এ তখন ছাপা হত না। তখন দেশ কবিতে এমন ছেয়েও যায়নি। এখন 'দেশ'-এ কয়েকপাতা জুড়ে কবিতা প্রকাশিত হয়। তখন হত মাত্র দুটি কবিতা। সাহিত্য বা কাব্যগুণ ছাড়া কনসিডারেশন ছিল না সাহিত্যের ক্ষেত্রে। মান ভালো হলেই ছাপা হত।

সেই কবিতাটিতে যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম, পানুয়ানালার বাংলোয় যাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, সেই মেয়েটিকে নিয়েই লেখা। নাম ছিল 'শান্তিনিকেতনের একজনের ছবি'। সম্ভবত সাগরদাই তখন সম্পাদক। জানি না, কে কবিতা দেখতেন, নামটি ছেঁটে ছোটো করে দেন, 'ছবি'। ওপরে অরবিন্দ গুহর একটি কবিতা আর নীচে আমার।

তখন উনিশ বছরের আমাকে আর পায় কে!

আমাদের পাড়াতে যত প্রতিবেশী ছিলেন, যাঁদেরই বাড়িতে বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি খুব প্রিয় ছিলাম। পড়াশোনোয় মেধাবী না হতে পারি, কিন্তু ছেলে হিসেবে খারাপ ছিলাম না। সব কিছু অল্প অল্প করে করতে পারতাম। দেশ-এ কবিতা বেরোয়, টেনিস খেলি, শিকার করি, ছবি আঁকি, অফিস করি, যদিও খেলা-খেলা অফিস তখন; নাটক করি, গান করি, সিনেমা করার অফার পাই। বাবার ছ'খানা গাড়ি, লনওয়ালা বাড়ি, মোটামুটি সুদর্শন। বাংলাদেশে এরকম জামাই সকলেই আশা করে। কিন্তু আগেই বলেছি, বিধিবাম। অগ্রবাল হয়েই চিরদিন আমি নিজের সর্বনাশ করলাম।

রাজা বসন্ত রায় রোডে নতুন বাড়িতে যাওয়া হল মহালয়ায়, উনিশশো পঞ্চান্ন সালে। তখন প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের উলটোদিকের বাড়ি ছিল, রাউরকেলা স্টিল প্লান্টের ঘোষ সাহেবের। এস সি ঘোষ। উনি বাড়ি তৈরি করবার সময়ে ছিলেন, কিন্তু গৃহপ্রবেশ করে যেতে পারেননি।...আমাদেব বাড়ির লাগোয়া গলির মধ্যে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন উমা সিদ্ধান্ত ও তাঁর সুদর্শন অধ্যাপক স্বামী। পরে অবশ্য ওঁরা কাছেই নিজেরা ছোট্ট বাড়ি করে চলে যান। দুর্লভচন্দ্র মজুমদার ছিলেন। যিনি হাওড়ার কাউন্সিলার ছিলেন বহুবছর, ক্রকারিজ কাটলারিজের ব্যবসা ছিল চিনাবাজারে। বড়ো ভালবাসতেন আমাকে। তাঁর তিনতলা বাড়ি ছিল দেশলাইয়ের খোলের মতো। আর রাজা বসন্ত রায় রোডেই উলটোদিকে ছিল ড. নৃপেন দাসের বাড়ি। অত্যন্ত বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক। মানে, পেটের ব্যাপারে ধন্বন্তরি ছিলেন। অত ভালো সার্জন আর অন্য কেউ ছিলেন কি না তখন, জানি না। উনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সেক্রেটারিও ছিলেন। বহুদিকে ইন্টারেস্ট ছিল। আমাদের বাড়ির লোকেরই মতো ছিলেন পুরো পরিবার। ওঁদের বাড়িতে পুজো হত তখন। আমাদের বাড়ির পুজো বলেই মনে হতো। ওঁদের বাড়ির বিয়ে হত আমাদের বাড়ির লনে। আর পুজোর সময় তো চারদিন পাড়ার কারো বাড়িতেই হাঁড়ি চড়ত না দুবেলা। চাকর-বাকরসুদ্ধু সবাই ওখানে খাওয়াদাওয়া করতাম। ভাসানে যেতাম। প্রতিমাতে ভক্তিবশে নয়, অনেক মজা হত বলে। সব বাড়ির মেয়েরাও যেত। ফাংশান হত। গানও করতাম। পুজোর পরেই বিজয়া সম্মিলনী হত।

দক্ষিণ কলকাতার বাঙালিরা তখনও এরকম ট্যাশ বনে যাননি। তখনও বাঙালিয়ানা ছিল। যার অবস্থা যতই ভালো হোক না কেন, যিনি যতই শিক্ষিত হোন না কেন, সবরকম বাঙালিত্ব ওইভাবে বর্জন সে-প্রজন্মের কোনো মানুষই দেননি।

ড. নৃপেন দাসকে আমরা ডাক্তার কাকা বলতাম। ডাক্তারকাকার মেজভাই ছিলেন অমর দাস। তখন উনি স্ট্যাডমেড কোম্পানি দেখতেন। নিজেদেরও আলাদা কোম্পানি ছিল, ওষুধেরই কোম্পানি। উনি অত্যন্ত উৎসাহী, উচ্ছল, অতি অমায়িক ভদ্রলোক। ওঁরই এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অরুণ নাগের।

তখন অবশ্য সে মেয়েটি অতি ছোটো ছিল। অথবা জন্মায়ইনি। ডাক্তারকাকার দাদা ছিলেন, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি রাজকলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁর বড়ো ছেলে মনু আমাদেরই সমবয়সি, ভাল নাম ভুলে গেছি। ডাক্তারি পাশ করে দুর্লভবাবুরই এক নাতনির সঙ্গে, খুব সুন্দর দেখতে ছিল মেয়েটি,

প্রেমে-পড়ে বিয়ে করে ইংল্যান্ডে চলে গেল। ডাক্তারকাকার দাদা এবং ছোটো ভাই রুনুকাকা চলে গেছেন পরপারে। ডাক্তারকাকাও।

ছিলেন এম সি দাস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তাঁর স্ত্রী কমলা মাসিমা। ভারি সুন্দরী, স্নেহপ্রবণা। সদাহাস্যময়ী। কপোত-কপোতীর মতন ছিলেন। তেতলার বারান্দাতে দুজনের একসঙ্গে বসে চা খাওয়ার ছবিটি এখনও চোখে ভাসে। সৌন্দর্য ও সুখের প্রতিমূর্তি। ওঁরা দুজনেই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ওঁদের চা-বাগানও ছিল। ওঁরা দুজনেই চলে গেছেন। ওঁদের একমাত্র মেধাবী সন্তান বুবু।

আমাদের ওই পাড়াটি ছোট্ট ছিল যদিও কিন্তু একটি close-nit-family-র মতো ছিল। ঐ পাড়াতে আমি ছিলাম উনিশ পঞ্চান্ন থেকে ছিয়াত্তর অবধি। কুড়ি বছরের মতো মাত্র কিন্তু তবুও এখনও যখনই যাই মনে হয় সেখানেই বুঝি থাকি। তবে বাড়িগুলিই আছে শুধু। সেইসব মানুষেরা কেউই আর নেই। অনেক বাড়িতেই বংশধরদের মধ্যে শান্তি এবং সদ্ভাব নেই। অর্থই অনর্থর মূল। বাড়ি দিয়ে তো পাড়া হয় না। হয়, মানুষ দিয়েই।

ভাবলেও দুঃখ হয়। ডাক্তারকাকা নিউ আলিপুরে বাড়ি করে চলে গেছিলেন বহুদিন। গতও হয়েছে বহুদিন। বাবার মৃত্যুর পরে সুন্দরী কাকিমা এসেছিলেন খবর পেয়ে।

বলা হয়নি যে, দক্ষিণীতে নানারকম মজার মজার কাণ্ড হত। নানা ঘটনা। একটির কথা বলি। 'বাল্মীকি প্রতিভা' হচ্ছে, তাতে অরূপ গুহঠাকুরতা বাল্মীকি, লক্ষ্মী করেছিলেন বউদি মানে, মঞ্জুলা গুহঠাকুরতা, বালিকা এবং সরস্বতী কে করেছিলেন এখন আর মনে নেই। লক্ষ্মীর গলাতে "কেন গো আপনমনে ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল বহিছে দু নয়নে" গানটি এখনও কানে ভাসে।

পরাগদার খুবই ইচ্ছে যে নাটক করবেন অথচ একটাই অসুবিধা ছিল। উনি ব্যঞ্জনবর্ণের প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ এই পাঁচটি শব্দ উচ্চারণ করতে গেলেই একটু তোতলাতেন। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে পরিচালক আশিসদা ওঁকে দস্যুদলের এক দস্যুর ভূমিকা দিলেন। তাতে একটি বাক্য ছিল। অবশ্য বাক্যটি গানের মতো করে গেয়ে বলতে হবে। অতি সরল একটি বাক্য। 'দেখ্ দেখ্, দুটো পাখি বসেছে গাছে।'

উনি মহড়ার সময় ঠিকঠাকই বলেছিলেন। প্ প্ করে দু-একবার হয়তো আটকে গেছিলেন। কিন্তু যেদিন মঞ্চস্থ হল নাটক, নিউ এম্পায়ারে এক রবিবার সকালে, দেখ্ দেখ্ দুটো প-প-প-প-প-প-প-প করতে করতে পাখি আর বেরোলোই না সেদিন।

এক কেলো হয়েছিল।

আগেই বলেছি, দক্ষিণীর ব্লক প্রোগ্রামে এক মহড়াতে লাল-কালো-ডুরে তাঁতের শাড়ি পরা একজন মেয়েকে প্রথম দেখে তীরবিদ্ধ হরিণের মতো অবস্থা হয়েছিল আমার। ছেলেদের ক্লাস এবং মেয়েদের ক্লাস আলাদা হত। তাই সেই যুক্ত-মহড়ার আগে তাকে কখনও চোখে পড়েনি। তার গায়ে ছিল লাল ব্লাউজ। দু' বিনুনি করা। কানে ছিল দুটি রুবির দুল। তার বয়স তখন হবে সতেরো-আঠারো। অতও নয় বোধহয়। তারপরে মহড়া কিছুটা এগোনোর পরে, সুনীলদা মহড়া নিচ্ছিলেন, সে একক গান গাইল। 'জগতে অনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।' এরকম সুরে গাইল গানটি ছিপছিপে শরীরে, গলার শিরা ফুলিয়ে যে, কী বলব! যে স্বর সে বের করছিল, আনন্দবাজারের গানের সমালোচক পার্থ বসুর ভাষাতে তা হচ্ছে একেবারে "সুরঋদ্ধ" স্বর সেই শর আমাকে একেবারে ভীষ্মের শরশয্যায় শায়িত করল। কী যে হয়ে গেল বুকের মধ্যে, তা ঈশ্বরই জানেন।

একটা জিনিস লক্ষ করেছি শিশুকাল থেকেই যে, সুর আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে। চিরদিনই। এই পরিণত বয়সে পৌঁছেও তার কোনো ব্যত্যয় হয়নি। হয়তো কোনদিন সকালে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, কী রাতে, হঠাৎ কোনো পানের দোকানের রেডিয়োতে কোনও গায়ক বা গায়িকার গান শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি আজকেও। দোকানের কাছে গিয়ে পান কেনার বা অন্য কিছুর অছিলাতে দাঁড়িয়ে থাকি এবং সেই গান শুনি।

তবে গান তো প্রতিদিনই শ'য়ে শ'য়ে পুরুষ ও নারী গাইছেন। আজকাল তো খবরের কাগজ খুললেই চোখ ধেঁধে যাওয়ার উপক্রম ক্যাসেটের বিজ্ঞাপনে। কিন্তু যেমন কবিদের ক্ষেত্রে বলা হয় 'সকলেই কবি নন কেউ কেউ কবি', গানের ক্ষেত্রেও বলা যায় 'সকলেই গায়ক নন অথবা গায়িকা

নন, কেউ কেউ গায়ক অথবা গায়িকা।' গান গাইলেই, কী রেডিয়োতে, কী টিভিতে গাইলেই গায়ক বা গায়িকা হয়ে যান না কেউই। যাঁর গলায় সুর আছে, যাঁর স্বরস্থান অত্যন্ত স্থির এবং নিষ্কম্প, তাঁর গলার গান শুনে বনের হরিণও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। অথচ খুবই দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিক অতীত থেকে দেখতে পাচ্ছি, গায়কের সংখ্যা শ্রোতার সংখ্যার চেয়ে অনেকই বেড়ে গেছে। আমাদের সময়ে কিন্তু অবস্থাটা বিপরীত ছিল। শ্রোতার দলেই আমরা বেশি মানুষ ছিলাম। মঞ্চে বসে গান গাইতেন অতি স্বল্প সংখ্যক মানুষই। তাছাড়া রেডিয়ো, টি ভি এবং ক্যাসেট-করা কত গাইয়ের গলা যে সুরেই বলে না, তা দেখে হতবাক হয়ে যাই। যার কানে সুর আছে, গলাতে নাই বা থাকল, তার পক্ষেও বেসুর অসুরের মতনই পীড়া দেয়।

এতোবড়ো অত্যাচার আর হয় না বেশি!

যাই হোক, সেই যে গান শুনলাম, এবং দেখলাম মেয়েটিকে, যার পর থেকেই, যাকে বলে, প্রেমের যন্ত্রণা শুরু হল। পাকা ফোঁড়ার যন্ত্রণার চেয়েও বাড়া। সম্ভবত উনিশশো পঞ্চান্নতে প্রথম তাকে দেখি। অথচ উনিশশো একষট্টির আগে তার সঙ্গে আমার সরাসরি কোনও কথা পর্যন্ত হয়নি। পরিচয়ও হয়নি ফর্মালি। যদিও আমরা জানতাম আমাদের দুজনের পরিচয়। আমাকে কাছাকাছি দেখলেই সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন চমকে উঠত। চোখে-মুখে এক তীব্র বিরক্তি ফুটে উঠত এবং শাড়ির আঁচল, যা সবসময়েই যথেষ্ট শক্ত করে বুক ঢেকে কোমরে প্যাঁচানো থাকত, সেই আঁচলও তড়িঘড়ি শক্ততর করতে সচেষ্ট হত।

আমি সরল মানুষ চিরদিনই। অত প্যাঁচ-ঘোঁচ, মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া-বিক্রিয়া কিছুই বুঝতাম না। আর বুঝতাম না বলেই নানারকম 'কুচিন্তা' অথবা বাঙাল ভাষায় যাকে আমরা বলি 'নাই চিন্তা' তাই-ই করতাম সবসময়ে।

পড়াশোনো তো এমনিতেই কিছু হচ্ছিল না। তার উপবে এই নতুন বিপত্তিতে পড়াশোনা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। ভাগ্যিস অক্ষরজ্ঞানটুকু হয়েছিল, নইলে নিরক্ষরই থাকতে হত।

কলেজের প্রফেসরেরা কী পড়াচ্ছেন, তার কোনও নোটও নিতাম না। লেকচারের মনে লেকচার হয়ে যেত। সেইন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বড়ো বড়ো গরাদহীন জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকতাম। বাইবে চেয়ে বিভিন্ন ঋতুর খেলা লক্ষ করতাম, পাখির ডাক, রোদের আঁচল। এইভাবেই বেলা বয়ে যেত।

চিরদিনই প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুতে বিদ্ধ ছিলাম, বিদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এক নতুন ঋতু সেই ঋতুগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাকে একেবারেই ধরাশায়ী করে দিল।

যেখানে তার গান থাকত, বিশেষ করে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সময়ে, সেখানেই, সে দিন-রাতের যে সময়েই হোক না কেন, সকাল অথবা বিকেল অথবা রাত্রি এবং তা যতদূরেই হোক না কেন, পড়াশোনা ফেলে আমি তার গান শুনতে যেতাম এবং ভিড়ের মধ্যে টিকিট কেটে পিছনের দিকে বসে গান শুনতাম। সে জানতেও পারত না যে, আমি তার গান শুনতে গেছি।

সেই সময় একটি কবিতা লিখেছিলাম। তাকে অবশ্য আধুনিক কবিতা বলবেন না কেউই। আসলে, আধুনিক কবিদের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান জানিয়ে সবিনয়ে একটা কথা বলব যে, তাঁরা কবিতা বলতে কী বোঝেন, আমার কাছে এখনও তা স্পষ্ট হয়নি এবং তাঁরা কবিতা বলে যা কিছুই লেখেন সে সবের অধিকাংশই কবিতা বলেও আমার মনে হয় না। আমার এই দুর্মর অপারগতা তাঁরা এবং পাঠকবর্গ যদি নিজগুণে মার্জনা করে দেন তবে কৃতজ্ঞ থাকব।

রবীন্দ্রনাথ ছন্দ এবং অন্ত্যমিলের চূড়ান্ত করে নিজে হাতে প্রাসাদ গড়ে তুলে সে-প্রাসাদ নিজে হাতেই ধূলিসাৎ করে গদ্য কবিতার দিকে এগিয়েছিলেন। এবং এখনও রবীন্দ্রনাথ অথবা জীবনানন্দ সাম্প্রতিক এবং একটুও অকাব্যিক নন।

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত ভালো কবিতা লেখেন যে তাতে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু যে অগণ্য কবিতা পড়তে হয় তার মধ্যে অধিকাংশই বেসুরো গানেরই মতো পীড়াদায়ক।

বি কমের ক্লাসে অডিটিং-এর অধ্যাপক ছিলেন মিস্টার পি এম নারিয়েলওয়ালা। উনি এস. আর. বাটলিবয়, বিখ্যাত সি এ ফার্মের সিনিয়র পার্টনার ছিলেন। ওইরকম সুদর্শন, সুবেশ, সুগন্ধী দুর্দান্ত অধ্যাপককে পাওয়ার সৌভাগ্য বেশি ছাত্র হয় না। যদিও পড়াতেন অডিটিং কিন্তু অ্যাকাউন্ট্যান্সি, ট্যাক্সেশান ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ে ওঁর যে গভীর পাণ্ডিতা ছিল এবং সেই পাণ্ডিত্য সরলীকরণ করে আমাদের মধ্যে স্থানান্তরিত করার যে দেবদুর্লভ ক্ষমতা ছিল, তেমন ক্ষমতা খুব কম অধ্যাপকেরই থাকে।

আরও বড়ো কথা এই যে উনি পেশাতে অধ্যাপক ছিলেন না। অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন নিজের ফার্মের কাজে। মাঝে মাঝেই উনি দীর্ঘদিনের জন্যে অনুপস্থিত থাকতেন। শুনতাম যে, তখন স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানির অডিট করতে যেতেন বোম্বেতে।

আমাদের কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়াতেন শ্রী জি এম সাহা। গিরীন্দ্রমোহন সাহা। উনি তখন জি বাসু অ্যান্ড কোম্পানির পার্টনার ছিলেন। জি বাসু অ্যান্ড কোম্পানি তখন বাঙালি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস এরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। যেখানেই যেতেন, সেখানেই প্রেসিডেন্ট হতেন। সেজন্যেই ঠাট্টা করে বলতেন যে, "I am a president by profession !"

সাহা সাহেব ছিলেন বাসু সাহেবের পার্টনার। তখন জি বাসু অ্যান্ড কোম্পানিতেই ছিলেন। পরে সাহা সাহেব ওই ফার্ম ছেড়ে রায় অ্যান্ড রায় কোম্পানিতে চলে যান এবং বলতে গেলে, উনিই সেই ফার্মের মালিক হন।

ঋভুর দ্বিতীয় পর্বে আগেই বলেছি বাঙালি পেশাদার অ্যাকাউন্ট্যান্টদের প্রায় কারোরই ছেলে হয় না। রায় সাহেবদেরও ছেলে ছিল না। সাহা সাহেবেরও ছেলে ছিল না। জামাই অবশ্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বাসু সাহেবের অবশ্য ছেলে ছিল, অরুণদা, তিনি কুল রক্ষা করার মতো বাবার ফার্ম রক্ষা করেছেন।

অল্প কিছুদিন আগে সাহা সাহেবও প্রয়াত হয়েছেন এবং তার অনেকদিন আগে বাসু সাহেব প্রায়াত হয়েছেন। সাহা সাহেব ছিলেন পূর্ব বাংলার লোক। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। যে বিষয়ে পড়াতেন সে-বিষয়ে। কিন্তু তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ আদৌ সাহেবদের মতো ছিল না।

একদিন উনি বাবাকে বললেন, ছেলে কী বলে? আমি যে পড়াই সেন্ট জেভিয়ার্সে, কী বলে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন রাত্তিরে। বললেন, দেখা হয়েছিল সাহা সাহেবের সঙ্গে। ডেকে জিজ্ঞেস করলেন কেমন পড়ান?

বললাম, পড়ান তো দারুণই। কিন্তু ইংরেজিটা মোটেই ভালো বলেন না।

বাবা তাঁকে সে কথা বলেছিলেন।

সাহা সাহেব হেসে বলেছিলেন, "আরে মশয়, আমরা তো সব পুব বাংলার গেরামের ইস্কুলে পড়ছি। আমরা সাহেবদের মতন ইংরাজি কমু ক্যামনে?"

নারিয়েলওয়ালা সাহেবের ছোটো ভাই, এন এম নারিয়েলওয়ালা, আমাদের চেয়ে এক ক্লাস সিনিয়র ছিল কলেজে। আমি পেশা আরম্ভ করার পরে, ষাট দশকের গোড়ার দিকে এন সি ডি সির, মানে, ন্যাশনাল কোল ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশনের অডিট করেছিলাম এন এম-এর সঙ্গে। এন এম, আমি এবং আর সিংঘি কোম্পানির জয়সিংঘি। বড়ো ছেলে সিংঘি সাহেবের। ছোটো ছেলে মোহনের কথা তো বলেছি। মোহন আমার সহপাঠী ছিল।

নারিয়েলওয়ালা সাহেবরা দুই ভাই-ই অত্যন্ত ভদ্র। পার্শিদের মধ্যে সাহেবদের অনেক গুণ এখনও লক্ষ করা যায়।

বছর সাত-আট আগে, বম্বে থেকে আসছি কাজ করে, বম্বে এয়ারপোর্টে দেখা পি এম নারিয়েলওয়ালা সাহেবের সঙ্গে। উনি আমাকে দেখতে পেয়ে অন্য কোণ থেকে অনেকখানি হেঁটে এসে, আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ!

বললাম, কেন স্যার?

উনি বললেন, কেন? তুমি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস-এর বোর্ডের অ্যাডভাইসরি কমিটির মেম্বার অ্যাপয়েন্টেড হয়েছ তাই।

বললাম, স্যার, আমি তো অত্যন্তই খারাপ ছাত্র ছিলাম আপনার। সেজন্যে আপনার যে লজ্জা, সেই লজ্জা ঢাকার জন্যে কিছু একটা হয়েছি, সেটুকুই অন্তত সুখের বিষয়।

উনি হেসে সস্নেহে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

নারিয়েলওয়ালা সাহেব অত্যন্তই ভদ্রলোক ছিলেন। উনি যদি ট্যাক্সেশান প্র্যাক্টিসে আসতেন, আমার ধারণা, উনি পালকিওয়ালা সাহেবের চেয়েও কিছু কম ভালো করতেন না। এরকম গভীর জ্ঞান, এরকম বাগ্মীতা, আইনের উপরে একরকম দখল খুব কম উকিল ব্যারিস্টারের মধ্যেই দেখেছি।

সেদিক দিয়ে আমারা খুব ভাগ্যবান ছিলাম বলতে হবে। প্রফেসর পি লালের কাছে ইংরেজি পড়েছিলাম, জি সাহা সাহেবের কাছে কস্টিং পড়েছিলাম, নারিয়েলওয়ালা সাহেবের কাঁছে অডিটিং পড়েছিলাম, ধীরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে এবং মনীন্দ্রলাল চক্রবর্তীর কাছে বাংলা পড়েছিলাম। যদিও ছাত্র হিসেবে সব বিষয়েই আমি অত্যন্তই খারাপ ছিলাম, আমার কথা তাই হয়তো ওঁদের অনেকেরই মনে থাকার কথাও নয় কিন্তু আমি তো তাঁদের মনে রেখেছি। গর্বটা আমার। লজ্জাটা ওঁদের। কারণ আমার মতো বাজে ছাত্রকেও ওঁরা পড়িয়েছিলেন।

যখন বি কমের ফোর্থ ইয়ারের মাঝামাঝি পৌঁছেছে ক্লাস, উনিশশো পঞ্চান্নর শেষে, তখন বাবা একদিন ডেকে আলটিমেটাম দিয়ে বললেন, তুমি এখুনি 'দক্ষিণী' ছেড়ে দাও। ওখানে আরও যদি যাও, পড়াশোনা তোমার কিছুই হবে না। তোমাব যা অবস্থা দেখছি বি কম-ই পাশ করতে পারবে না। সি এ পাশ তো দূরস্থান।

পিতৃ আজ্ঞা বলে "কতা"। ঘাড়ে একটাই "মাতা"। সাহস ছিল না যে, বাবার কোনো আজ্ঞাই পালন না করি। সুতরাং মনের দুঃখে 'দক্ষিণী' ছেড়ে দিলাম। ভেবেছিলাম, আমার জন্যে শোকসভা হবে। দেখলাম যে কোনো মহলেই কোনো ঢেউই উঠল না। পৃথিবী বড়োই অকৃতজ্ঞ। গান শেখা ছাড়লাম বটে কিন্তু সংস্কৃতি বিভাগের সভ্য হয়ে গেলাম। নইলে সেই গায়িকার সঙ্গে, ওই জগতের সঙ্গে সব সম্পর্কই তো ছিন্ন হয়ে যাবে।

ঋভুর দ্বিতীয় পর্ব-তে বলেছি যে, আমার কলেজের বন্ধু ছিল অর্ঘ্য সেন। আমরা ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময়ে একসঙ্গে কলেজের সমস্ত অনুষ্ঠানে গান গেয়েছি। ও আমার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র ছিল এবং বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। অর্ঘ্যর স্বাভাবটি ছিল সুন্দর। অর্ঘ্যর সঙ্গে বন্ধুত্বটা রয়েই গেছিল যদিও কলেজে আমাদের আর দেখা হত না।

একদিন অর্ঘ্যর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের সামনে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে রবিবারের এক সকালে।

অর্ঘ্য বলল, মানে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এই তো জর্জদার বাড়ি। আমি তো জর্জদার কাছেই শিখি। তুমি শিখবে? তোমাদের বাড়ি তো এতো কাছে! এখনই তো বেরোলাম ক্লাস শেষ করে। গান ছাড়া কি ঠিক হবে? চর্চা ছাড়লেই যাবে।

বললাম, দক্ষিণীও তো কাছেই। কতটুকু আর দূর! তা জর্জদার ক্লাসে মেয়েদের বেশি ভিড়-টিড় নেই তো!

তখন অর্ঘ্য হেসে বলল, কেন? মেয়েদের এত ভয় করো নাকি তুমি! তা মেয়েরা আছেন কেউ কেউ। তবে দক্ষিণীর মতো নয়। দক্ষিণী তো মেয়েদের আড়ত।

সেইটাই তো বিপদের কথা। সেইজনেই তো ছাড়তে হল।

ব্যাপারটা কি?

পিতৃআজ্ঞা।

বেচারি বাবা তো জানতেন না যে, লখিন্দরের জন্যে লোহার বাসর ঘর করেও বেহুলা তাকে বাঁচাতে পারেনি। সূক্ষ্ম শরীরে সর্পরাজ প্রবেশ ঠিকই করেছিল। প্রেমও হচ্ছে সাপেরই মতো। যাকে সে ধরাশায়ী করবে বলে মনস্থ করেছে, তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব। দক্ষিণী ছাড়ানো সহজ কিন্তু রোগ ছাড়বে কি করে!

পরের রবিবার, অর্ঘ্য বলল, তুমি এসে দাঁড়িয়ে থাকবে দশটার সময়ে, গাড়িবারান্দার নীচে। জর্জদার ভাড়া বাড়িব গাড়িবারান্দা। আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব জর্জদার কাছে।

ও তখন থাকত বেদিয়াডাঙা সেকেন্ড লেনে। ট্যাংরার কাছাকাছি কোথাও। সেই একই পোশাক। তখনও তাই, আজও তাই। ধুতি, কাবলি-জুতো, রঙিন খদ্দরের শার্ট। এবং চিরদিনই হেমন্তদারই মতো দুটি হাতাই গোটানো কনুইয়ের ওপর অবধি।

পরের রবিবারে অর্ঘ্য আমাকে নিয়ে গেল জর্জদার দু-ঘরের বাসাতে, দোতলাতে। গিয়ে দেখি, একটি অপরিসর ঘরে, বইপত্র, ছবি, নানারকম জিনিসের মধ্যে লুঙি আর হাতওয়ালা সাদা গেঞ্জি পরে সামনে হারমোনিয়াম নিয়ে জর্জদা বসে আছেন মেঝেতে। সবে চীন থেকে ফিরেছেন। দেওয়ালে একটা দারুণ বড়ো ছবি টাঙানো। চীনে শিল্পীর আঁকা। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। বাঁ পাশে পানের বাটা, ডান পাশে হাঁপানির জন্যে স্প্রে। গাড়ির বাল্ব হর্ন-এর মতো ছোটো হর্ন লাগানো। প্যাঁক প্যাঁক করা যে হর্ন ছিল আগে, প্যাঁকো প্যাঁকো করে বাজত ট্যাক্সিতে, বাসে, সেইরকম বাল্ব-হর্ন। তরল ওষুধের সঙ্গে লাগানো। সেই বাল্ব- হর্ন পাম্প করলে তবেই স্প্রে-টা মুখে যায় আর কি!

অর্ঘ্য বলল ঢুকেই, জর্জদা। এই আমার বন্ধু, যার কথা আপনাকে বলেছিলাম ফোনে।

জর্জদা ছিলেন মুখার্জি জেঠুরই মতো। তাঁরও প্রত্যেক কথারই অনেকগুলো মানে হত। নিদেনপক্ষে চারটে মানে তো হতই। অত্যন্তই রসিক লোক ছিলেন। কোনও প্রিটেনশানসই ছিল না। মুখে যা, মনে তা।

এক দরজা আমার দিকে তাকিয়ে পান-মুখে বললেন, বাঃ।

তারপরেই বললেন, চেহারাখান তো বেশ দেহি। গলাখানা ক্যামন?

মেঝের সতরঞ্চিতে-বসা অতজন অপরিচিত ছেলেমেয়েদের সামনে অপ্রস্তুত হয়ে মুখ নিচু কবে নমস্কার করে তো বসলাম।

অর্ধচন্দ্রাকারে ছাত্র-ছাত্রীরা বসে। তার মধ্যে একটি অত্যন্ত সুন্দরী মেয়েকে দেখলাম। প্রথম নজরেই যে চোখে পড়ে। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, কোমর ছাপানো চুল।

পরে জেনেছিলাম যে, তার নাম শ্রীলা সেন। ডাক নাম পিকো। চমৎকার চেহারা। ফরসা, দীর্ঘাঙ্গী, চশমা-পরা তীক্ষ্ণ নাক। একটু পরেই শোনা গেল, গানও দারুণ ভালো গায়।

মেয়েদের ওইরকম চেহারা আমাকে চিরদিনই প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট করেছে। টিকোলো নাকের মেয়ে। কেন জানি না। সম্ভবত নিজের নাকটা বাজে বলে।

তার আরও পরে জেনেছিলাম, শ্রীলা সেন আমার সহপাঠী জয়জ্যোতি সেনের দিদি!

হায়! হায়! কথায় বলে না, 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়'! আমারও সেই অবস্থা। কারণ, আমি জন্ম-প্রেমিক হলেও বন্ধুর দিদির সঙ্গে তো প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত নয়। আজকালকার রেওয়াজ তখন ছিল না। আমাদের সময়ে অনেকই বাধা-বন্ধ ছিল। অবশ্য আমাদের সময়কার প্রেম, ওইরকমই ছিল।

আগেই বলেছি যে, দক্ষিণীতে যে মেয়েটিকে ভালো লেগেছিল আমার, তার সঙ্গে জীবনে কথাও বলিনি কোনওদিন। সামনাসামনি কখনওই কথা বলিনি ফোনেও বলিনি। বসে গল্প করিনি। তবু গভীর প্রেম। সম্ভবত গোরু, ঘোড়া, পরম মূর্খ ছাড়া আমার মতো প্রেম কেউই করেনি। বাছুর-প্রেমের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

যাই হোক, জর্জদার ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেল। বাড়িতে আর কিছুই জানালাম না। গুহ পরিবারে গান ব্যাপারটা কখনওই বিশেষ সমাদৃত ছিল না। রেডিয়োতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হলেই ছোটোকাকা বলতেন, আবার কুকুরের কান্না! বন্ধ কর। কর!

ভাবলাম, কী দরকার বলে? নতুন ঝামেলাতে ফাঁসব আবার।

আমরা মাইনে দিতাম মাসে মাত্র দশ টাকা, মনে আছে। কিন্তু জর্জদা আমাদের মাসের চার রবিবার যে পরিমাণ জয়নগরের মোয়া ইত্যাদি ইত্যাদি খাওয়াতেন এবং চা একাধিক কাপ, তার খরচা দশ টাকার অনেকই বেশি ছিল।

জর্জ বিশ্বাস মানুষটির মধ্যে প্রাণ যেমন ছিল তেমনই ছিল উষ্ণতা। গান আর প্রাণ যে সমার্থক, একথাটা জর্জদার কাছাকাছি যাঁদেরই আসার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরাই জানেন।

জর্জদা একটা অত্যন্ত কঠিন গান আগের দিন শিখিয়েছেন। পরের রবিবারে গানটা ধরছেন। দক্ষিণীতে যেমন ধরা হত শেখানো গান। সব ছাত্রকেই গাইতে হত গানটি আলাদা আলাদা করে। আমার পাশে তখন বসেছিল, যে ছেলেটি, নাম ভুলে গেছি, বহুদিন হয় আমেরিকাতে সেটল করেছে সে, সে যখন গাইছে, অন্তরাতে একটি জায়গায় একটু গোলমাল মনে হল আমার। ফিসফিস করে কানের কাছে মুখটা নিয়ে জন্ম-পরোপকারী আমি কিছু বলতে গেলাম। মানে, একটু গেয়ে শোনাতে গেলাম।

হঠাৎই জর্জদা হারমোনিয়াম ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ল্যাংড়া, অন্ধরে পথ দেখায়।'

লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার। অতজন ছেলেমেয়ের সামনে।

জর্জদা এইরকমই ছিলেন।

একদিন আমরা গান শিখছি, এমন সময় এক মহিলা, অতি-ন্যাকা মহিলা, ন্যাকা না হলে মহিলাদের যদিও আমার ভালো লাগে না, মিথ্যে কথা বলব না কিন্তু অতি ন্যাকাদেরও ভাল লাগে না।

আর একদিন পুরোদমে ক্লাস চলছে। এ তো দক্ষিণী নয়। জর্জদার তো অবারিত-দ্বার। যার যখন খুশি এসে বসে পড়ছে। দরজা খোলা থাকত সবসময়েই। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে হাঁপানির কষ্ট লাঘব করার জন্যে গলাতে স্প্রে করতেন।

মহিলা আসতেই জর্জদা বললেন, কী ব্যাপার? পথ ভুইল্যা নাকি!

উনি বললেন, কী যে বলেন!

তারপরেই রঙি-ঢঙি হয়ে বললে, জর্জদা, রসগোল্লা খাব।

জর্জদা একটু চুপ করে থেকেই হাঁক দিলেন, ভয়ংকর, কুথায় গ্যালা বাবা।

জর্জদার কাজের লোক যে ছিল, তার নাম ছিল সুদর্শন।

জর্জদা বলতেন, আমার মতো কুৎসিত লোকের চাকরের নাম কাখনও সুদর্শন হইতে পারে? তোরাই ক? ওরে আমি ভয়ংকর বইল্যা ডাকি।

জর্জদার মতো এমন ব্রাহ্ম আমি জীবনে দেখিনি। ব্রাহ্মদের যে সব স্পষ্ট-লক্ষণে সহজে চিহ্নিত করা যায়, জর্জদার মধ্যে সেসব চিহ্নের একটিও ছিল না। অনেক রকমের ব্রাহ্ম দেখেছি কিন্তু এমন অব্রাহ্ম-ব্রাহ্ম সত্যিই বেশি হয় না।

পাঠক! আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমার "কোয়েলের কাছে" পড়েছেন, তাঁরা হয়তো মনে রেখেছেন যে, পালামৌর রেঞ্জার যশোয়ন্ত-এর ঘোড়ার নাম ছিল ভয়ংকর। এই নামটা জর্জদার কাছ থেকে 'মারা' বলতে পারেন। গুরুঋণ অবশ্য স্বীকার্য। তাই, স্বীকার করি।

সুদর্শন এল, ওকে কুড়ি টাকার নোট দিয়ে জর্জদা বললেন, যাও, রসগোল্লা লইয়া আসো।

তখনকার কুড়ি টাকা মানে এখনকার দুশো টাকা। কম করেও।

শুধু কি রঙি-ঢঙি একাই খাবেন? ছাত্রছাত্রীরা কি ভাগ পাবে না? তা কি হয়?

তারপরেই জর্জদা তাঁকে বললেন, রসগোল্লা খাওনের বেলায় জর্জদা, আর বিয়া করনের বেলায়, বলেই, এক ভদ্রলোকের নাম বললেন।

ভদ্রলোকের নামটা নাই-বা বললাম।

আমরা তো হাসতে পারছি না গুরুর সামনে। অথচ কিছু একটা ব্যাপার আছে বুঝতে পারছি।

ক্লাসের শেষে আমি আর অর্ঘ্য যখন বেরোলাম, ওকে জিজ্ঞেস করলাম কী, কী ব্যাপার বল তো?

অর্ঘ্য বলল, ব্যাপার আছে। জর্জদার খুব পছন্দ ছিল মহিলাকে, মহিলাও খুব ঢঙ করেছিলেন একসময়ে জর্জদার সঙ্গে। কিন্তু বিয়ে করার সময় যথারীতি লক্ষ লক্ষ অন্য মেয়েদের মতোই অন্য পুরুষকেই বিয়ে করেছিলেন। জর্জদা তাই বললেন। দুঃখ তাঁর হয়তো ছিল অনেকই রকম, কিন্তু দুঃখ স্বীকার করার বা দুঃখে সমবেদনা প্রার্থনা করার মতো সাধারণ জর্জদা কখনওই ছিলেন না।

আগেই বলেছি, জর্জদার গান প্রথম শুনি তাঁর ছাত্র হওয়ার বহুবছর আগে। বহুবছর অগে মানে, পঞ্চাশ দশকের একেবারে গোড়ার দিকে অথবা চল্লিশ দশকের শেষ দিকে। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায়। খালি গলায়। সেদিন জেনেছিলাম, গান কাকে বলে!

রামকুমারবাবু, মানে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই আমাকে একটা কথা বলেন যে, "আমাদের সময়ে ছিল গান-বাজনা, বুঝলেন, আর এখন হয়ে গেছে বাজনা-গান।"

কার গলা যে কেমন তা বোঝবার উপায় নেই। বাজনার মধ্যে দিয়ে, মানে গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেমন করে স্রোতস্বিনী সাদা রেখাতে চকিত দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়, এখন গায়কের কণ্ঠ সেরকমই। বাজনাসমূহর মধ্যে থেকে কখন যে এল আর কখনই বা মিলিয়ে গেল, তা বোঝা পর্যন্ত যায় না। স্বরের গুণাগুণের বা দোষাদোষের কিছুই বোঝার উপায় নেই।

না, তখনকার দিনের গায়কেরা আদৌ এরকম ছিলেন না। তাঁরা অধিকাংশই খালি গলাতে গাইতে পারতেন। উদাত্ত কণ্ঠ ছিল এবং স্বর এতটুকু এদিক-ওদিক হত না। এতটুকু সুর নড়ত না।

জর্জদা প্রথমে সকলকেই আপনি করে বলতেন। তুমি হ'ত, অনেক সময় লাগত।

দক্ষিণীর দাঁত-চাপা গান নিয়ে ঠাট্টা করতেন। ঠাট্টা করে মজা পেতেন। তবে এও বলতেন, এক ছেমরি গাইতাছে, শুভবাবুর দাদার মাইয়া, সে ছেমরি কালে বড়ো গাইয়া হইব। ফাসকেলাস।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন। মাইয়াডার নামটা যেন কি? জানেন আপনে?

আমি চুপ করে থাকলাম। অনেক কল টপকে টপকে এসছি। ইঁদুর কি আর নতুন কলে পড়ে!

অগেই বলেছি যে, জর্জদাকে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর চক্রান্তে পড়তে হল, তখন উনি লিখেছিলেন ওঁর বই "ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত"। সে বইটি পড়লে দুঃখ হয়। অবশ্য সে বইটি অনেকদিনই পরে উনি লিখেছিলেন। এটা একটা ঘটনা।

একথাও ঠিক যে, জর্জদা রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপি অনেক জায়গাতেই মানতেন না। আর ইচ্ছেমতো তার ভ্যারিয়েশানও করতেন। তাতে হয়তো অনেকসময়ে গান শুনতে বেশি ভালো লাগত। কারণ, এটা তো ঠিক যে দিনু ঠাকুরের পরে এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের মালিক বলে নিজেদের বিবেচনা করে এসেছেন এতোবছর এবং খেয়ালখুশিমতো স্বরলিপির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন অনাবশ্যকভাবে, তাঁদের চেয়ে জর্জদা কোনও অংশে কম রবীন্দ্রসঙ্গীত বুঝতেন না, জানতেন না, ভালোবাসতেন না। তার জন্যে, তাঁরা যখন জর্জদার বিচারক হলেন অন্যায়ভাবে এবং জর্জদাকে কোনওরকম স্বাধীনতা দিতে রাজি হলেন না, এবং আমার মনে হয়, যেহেতু তাঁরা বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে আছেন সুতরাং তাঁদের রবীন্দ্রনাথের গানকে অবাধভাবে পরিবর্তন করার স্বাধীনতা আছে।

কলকাতা করপোরেশন যেমন তার করণীয় যা কিছু কর্তব্য তার কিছুমাত্রও না করে বিনাকারণে রাস্তার নামগুলি অনাবশ্যকভাবে এবং বিভ্রান্তি ঘটাবার জন্যেই অনবরত বদলে যাচ্ছে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির মালিকেরাও তেমনই ইচ্ছে মতো স্বরলিপি বদলে গেছেন তাঁদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে। খোদার উপর খোদকারি ছাড়া একে আর কিছুই বলা চলে না।

সেই মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীনদের এ বাবদে যা যোগ্যতা, তার চেয়ে জর্জদার যোগ্যতা কিছুমাত্র কম ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ নিজে থাকলে বা দিনু ঠাকুর থাকলেও নিশ্চয়ই এই স্বাধীনতা তাঁদের দিতেন না। জর্জদা যদি এতোটুকু ভ্যারিয়েশান করতেন তাহলেই যেন আকাশ ভেঙে পড়ত সেইসব সর্বজ্ঞদের মাথায়। এটাও ঠিক যে, জর্জদাকে তৎকালীন অধিকাংশ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীই হেয় করেছিলেন একটা সময়ে। তার মধ্যে শুভদা এবং সুবিনয়দারাও ছিলেন। মহিলা-শিল্পীদের নাম আমি বললাম না।

একটি গান "কেন সারা দিন ধীরে ধীরে বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে"।—শেখাবার সময়ে একদিন জর্জদা অন্তরাতে এসে, যেখানে আছে "নাহি জানে মনে কী বাসিয়া, পথে বসে আছে কে আসিয়া", সেখানটায় বললেন, এইরকম কইর‍্যা গা তো দেহি। বলেই উনি স্বরলিপি থেকে সরে গাইলে গানটির মানে, গানটির সংযত, গভীর বেদনার্ত রূপ পরিস্ফুট হচ্ছে, মাধুর্য তাৎপর্যও অনেকই বেড়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে আমাদের কারও মনেই কোনও সন্দেহ রইল না। কিন্তু স্বরলিপিতে সেরকম ছিল না!

শুধু বলতেন, এইরকম কইর‍্যা গা দেহি। শুদ্ধর জায়গাতে কোমল লাগাতেন, কোথাও কোমলের জায়গাতে শুদ্ধ স্বর।

তারপরে রবীন্দ্রসঙ্গীতে যে ভাবের ব্যাপারটা আছে, যে সম্বন্ধে অধিকাংশ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েই অনবহিত, সেটা উনি দারুণভাবে বুঝতেন।

প্রথম দিকে, যখন জর্জদার কাছে সবে যাওয়া শুরু করেছি, একজন এস ডি ও সাহেব অফিসের জিপে করে প্রতি রবিবারে আসতেন ক্লাসে। বিরাট লম্বা চওড়া কালো, কুস্তিগিরের মতো চেহারা। পেটা-স্বাস্থ্য। অনেক আই এস আই পি এসদের মতো ওঁরও ধারণা ছিল যে, উনি যখন মহকুমা-শাসক তখন ওঁর অসাধ্য আর কিছুই নেই। উনি নাচ গান সাহিত্য চিত্র যা করবেন, তাতেই সমস্ত পৃথিবী ধন্য হয়ে যাবে। ক্ষমতা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, চেয়ার দিয়ে কী-না পাওয়া যায়। এবং হতভাগ্য উনি সেই ভাবনা নিয়েই জর্জদার কাছে গিয়েছিলেন। আর শিক্ষক জোটেনি বেচারার!

আমাদের শেখানো হচ্ছে, সেদিন, "ওই জানালার কাছে বসে আছে, করতলে রাখি মাথা" এই গানটি। গানটির অন্তরাতে যেখানে আছে "শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়, তার কানে কানে কী যে কহে যায়", সেখানে গিয়ে এস ডি ও গাইছেন "ঝুড়ু ঝুড়ু বায়ু বয়ে যায়, কানে কানে কী যে কয়ে ঝায়।"

জর্জদা হারমোনিয়াম থামিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আবে মশয়, ঝুড়ু ঝুড়ু নয়, কয়েন ঝুরু ঝুরু। মিষ্টি কইর‍্যা কয়েন। র-এ হ্রস্ব-উ। হাওয়ার শব্দ শোনেন নাই কি কখনও? হাওয়া যখন বয়, তখন কি ঝুড়ু ঝুড়ু শব্দ হয় না ঝুরু ঝুরু শব্দ হয়?

তিনি শুনলেন জর্জদার কথা ভুরু-কুঁচকে। কিন্তু আবারও যখন গাইতে বললেন, কোমলভাবে ও ঝুড়ু ঝুড়ু নয়, এবারে খুব ধমক দিয়েই ঝুড়ু ঝুড়ু বলতে লাগলেন।

জর্জদার অথরিটিকে slight করার জন্যে।

জর্জদা বললেন, আপনার অইব না। আপনে যাইয়া মহাকুমাই শাসন করেন। আপনের দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওন অইব না।

অতজন ছেলে-মেয়ের সামনেই নগ্ন-সত্যি কথাটা গালে থাপ্পড় মারার মতনই বলে দিলেন। আমাকে যেমন বলেছিলেন, "ল্যাংড়া আবার অন্ধেরে পথ দেখায়।"

তবে জানতাম যে, আমি ল্যাংড়া। আমার কোনও মিথ্যা আত্মাভিমান ছিল না। কিন্তু এদেশীয় নির্গুণ আমলাদের প্রচণ্ড আত্মাভিমান থাকে। তিনি চুনো পুঁটি এস ডি ও-ই হন, কী রাইটার্সের সেক্রেটারি। তবে good sense prevailed on him । পরদিন থেকে আর ক্লাসে এলেন না।

তবু জেনে আশ্বস্ত হওয়া গেল যে, মান-অপমান বোধটুকু খোয়াননি ভদ্রলোক।

অর্ঘ্য তখন নানান ফাংশানে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। ভালো গলা। তাছাড়া একেবারে জর্জদার স্টাইলেই গাইত তখন। অনেকেই বলতেন, হ্যাঁ জর্জদার ছাত্র বটে।

তো, একদিন ক্লাসে জর্জদা বললেন, শুনতাছি একজন নতুন আর্টিস্ট আইছে বাজারে, যার গলা নাকি এক্কেরে জর্জ বিশ্বাসের মতো। ফারাক এক্কেরে বোঝনই যায় না।

এই বাক্যটি বলতেই, লাজুক অর্ঘ্য মুখটা নামিয়ে নিল। বুঝলাম, অর্ঘ্যকেই বলছেন।

অর্ঘ্য চুপ করেই রইল। জর্জদা অর্ঘ্যকেই উদ্দেশ করে বললেন, কয়েন দেহি! খবরটা কি সত্য? কয়েন দেহি অর্ঘ্য সেন মশয়!

অর্ঘ্য তাতেও কিছু বলল না।

জর্জদা ক্ষ্যামা দিলেন।

এদিকে বি কম পরীক্ষার টেস্টের দিন এগিয়ে এল। পড়াশোনা কিছুই করিনি। কিন্তু টেস্ট পরীক্ষার আগে মাসখানেক খুব ভালো করে পড়াশোনা করায় টেস্টে মারাত্মক ভালো ফল হল। বাড়িতে, কলেজে সব ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

একটা জিনিস বুঝতাম যে, যদি আমি কোনও জিনিস সত্যিই করতে চাই, তাতে উৎকর্ষের কোনওই অভাব ঘটে না।

কিন্তু খুব কম কিছুই তেমন করে করতে চাই বলেই যত গোলমাল বাধে।

যাই হোক, টেস্ট পরীক্ষার সেই মারাত্মক ভালো রেজাল্টে আমার মাথা আরও ভারী হয়ে গেল। টেস্টের পরে পড়াশোনা প্রায় ছেড়েই দিলাম।

গেরুয়া রঙের বা টেরাকোটা রঙের পাঞ্জাবি পরতাম পাতলা খদ্দরের। ধুতি পরতাম। যখন দু'নম্বর বাসে উঠতাম, লেডিজ সিটের সমস্ত লেডিজ তখন তাদের মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখতেন।

আজকে?

একজনও মুখ ঘুরিয়ে দেখেন না। বরং দেখে, মুখ ঘরিয়ে নেন।

কিন্তু যে রোম্যান্টিক, তার ওপরে এই সমস্ত প্রভাব যে অত্যন্ত মারাত্মক ক্ষতিকারক। তখন বুঝতাম না, এখন বুঝি। এও জানি, যে ঈশ্বরের আশীর্বাদে এবং মা-বাবার আশীর্বাদে অনেক এবং অনেকরকম ফাঁড়া কাটিয়ে জীবনে একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি। কিন্তু আমার চেয়ে অনেক মেধাবী ছেলে দেখেছি, এই বয়সটাতে মোহগ্রস্ত হওয়ায় ভেসে গেছে একেবারে।

কত ছেলের এবং মেয়েরও যে জীবন নষ্ট হয়ে গেছে ওই উঠতি বয়সের রোম্যান্টিকতায়, কোনও কোনও খারাপ মেয়ের বা খারাপ ছেলের প্রভাবে, তার ইয়ত্তা নেই।

টেস্ট পরীক্ষাতে যে হীরের দ্যুতি ঠিকরেছিল তা ব্ল্যাক ডায়মন্ড হয়ে গেছিল ফাইনালে। পাঠ্য বই ছাড়া অন্য সব কিছুই পড়তে ইচ্ছে করত। গান গাইতাম। ছবি আঁকতাম।

তবে বি. কমে রেজাল্ট বেরোলে দেখলাম, কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছি। সাহা সাহেবের ভাষায় যাকে বলে, "ন্যারোলি এসকেপড।"

ইন্টারমিডিয়েট চার্টাড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি। পরের বছর মে মাসে পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজেও ভর্তি হয়েছি। ভোরে ইউনিভার্সিটি করে ইউনিভার্সিটি ক্যানটিনে খেয়ে অফিসে আসতাম। বিকেলে টেনিস খেলতাম। দক্ষিণীর কোনো ক্রিয়াকাণ্ড থাকলে সেখানে যেতাম। গান শিখতে মানা করেছিলেন বাবা।

আমি যে সংস্কৃতি-বিভাগের সভ্য তা তো তাঁর জানার কথা ছিল না।

ঠিক মনে নেই, তবে মনে আছে ডিসেম্বর মাসের এক শুক্লপক্ষে বাবা কাজে মণিপুরে যাচ্ছিলেন। মাকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, চল তোকেও মণিপুর দেখিয়ে আনি আসামে তো গেছিসই বহুবার। আগেই বলেছি তখন ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের একটিই চার্জ ছিল আসাম, মণিপুর, মেঘালয় এবং ত্রিপুরার জন্যে। গারো হিলস এবং নাগাল্যান্ডে ট্যাক্স ছিল না, আজও নেই। একজন মাত্র কমিশনার ছিলেন ওই পুরো চার্জে।

আমার আসাম বলতে অবশ্য মুখ্যত নিম্ন আসামই ছিল তখন। উত্তরে গৌহাটি এবং কাজিরাঙ্গা অবধি। তার উত্তরে তখনও যাওয়া হয়নি।

আমার এক মাসতুতো জামাইবাবু ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার কনসাল জেনারাল। উনি আগে রেঙ্গুনবাসী ছিলেন। স্বাধীনতার পরে ভারতে চলে আসেন এবং নানারকম ব্যবসাতে জড়িত হন। পাট, পাটজাত কাপড় ইত্যাদি রপ্তানি করতেন ওঁর কোম্পানি, মুখ্যত ইন্দেনেশিয়াতে। অনর্গল বর্মী এবং ইন্দোনেশীয় ভাষা বলতে পারতেন দ্বিজেন জামাইবাবু, মিস্টার ডি কে নাগ। তিনি একটা নতুন ব্যবসার পত্তন করেছিলেন মণিপুরে।

তখন বর্মা দেশের (এখন মায়ানমার) সীমান্তের সেগুনকাঠ পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। কথায় বলত, বার্মা টিক। বার্মার সালউইন নদীর অববাহিকার সেগুন ছিল পৃথিবীর অন্যতম সেরা সেগুন। বার্মা থেকে কাঠ আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। তাই উনি মণিপুরের বার্মা সীমান্তের সেগুন বনের Monopoly lease নিয়ে নিলেন মণিপুর সরকারের কাছ থেকে সেখান থেকে সেগুন কাঠ ভারতে আনতেন স্থলপথে। তাঁর সেই মণিপুরি কোম্পানির আয়কর সংক্রান্ত একটি আপিলের দিন ধার্য হয়েছিল মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে। সেই উপলক্ষেই বাবার যাওয়া।

সেই প্রথমবার উনিশ ছাপ্পান্নর মণিপুর ভ্রমণের স্মৃতি আজও মনে অটুট আছে। এমনই হয বোধহয়, একই জায়গাতে বহুবার গেলেও প্রথমবারের যাওয়ার স্মৃতি যেন গভীর ভাবে মনের মধ্যে থেকে যায়। সঙ্গীদের উপরেও নির্ভর করে। মা-বাবার সঙ্গে গেছিলাম বলেই হয়তো এত মেদুর মনে হয় সেই স্মৃতিকে। তারপরে পঞ্চাশের শতকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের মাঝামাঝি অবধি বহুবারই ইম্ফলে গেছি কিন্তু বাবা মায়ের সঙ্গে এবং দ্বিজেন জামাইবাবু এবং আমার বড়ো মামিমার মেজোছেলে নেপালদার (পি কে গুহ) সঙ্গে কাটানো সেই দিনক'টি সত্যিই ভোলার নয়। সঙ্গে ছিলেন দাশগুপ্ত দম্পতি। মনুকাকা এবং তার সুন্দরী স্ত্রী। মনুকাকা অ্যাডভোকেট ছিলেন এবং এবং আসামের বিভিন্ন জায়গাতে তাঁর অনেকেই মক্কেল ছিল। পরে প্রতিবছরই ওঁর সঙ্গে শিলংযে দেখা হত ইনকামট্যাক্স অ্যাপেলে ট্রাইবুনালে আপিল করতে গিয়ে। এই মনুকাকারই একমাত্র সন্তান, দূরদর্শনের কৃতী কর্মী অভিজিৎ দাশগুপ্ত।

প্লেনটা ক্রমশ নামতে লাগল নীচে। সম্ভবত ফকার-ফ্রেন্ডশিপ প্লেন ছিল। প্রেশারাইজড, এয়ার-কন্ডিশানড। পূর্বী-সেকটরে ওই প্লেন কবে চালু হয়েছিল তখন।

দ্বিজেন জামাইবাবু, নেপালদা এবং রবীন্দ্রকুমার পুরকায়স্থ নামের এক ভদ্রলোক এসেছিলেন গাড়ি নিয়ে, এয়ারপোর্টে আমাদেব নিতে। আমার গিয়ে 'THE PEAK HOTEL'- এ উঠলাম। দ্বিজেন জামাইবাবু এবং নেপালদা ওই হোটেলেই অস্থায়ী ক্যাম্প করেছিলেন। পুরকায়স্থ সাহেব ওঁদের জঙ্গলের কাজ দেখাশোনা করতেন। তিনি সম্ভবত শিলচর অথবা আগরতলার মানুষ ছিলেন।

ইম্ফলের "পিক হেটেল" ছিল মুখার্জি জেঠুর পছন্দসই, শিলংয়ের "পিক হোটেলেরই" শাখা। ইম্ফলের ওই হোটেলে গিয়ে পরে একাধিকবার থেকেছি সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কিন্তু পরিষেবাতে আকাশ-পাতাল তফাতও হয়ে যেতে দেখেছি, দুঃখের সঙ্গে। শিলংয়ের "পিক হোটেলের" পরিষেবার কথা বলতে পারব না কারণ, যতবার কাজে গেছি তারপরে এবং বেড়াতেও, সবসময়ে পাইনউড হোটেলেই উঠতাম। তবে বাবার সঙ্গে একবার এবং মা-বাবার সঙ্গে আরেকবার পুজোর সময়ে গিয়ে পিক হোটেলেই ছিলাম পঞ্চাশের দশকে। তখন আহামরি কিছু না হলেও, খারাপ ছিল না কিছু।

ইম্ফলে তো যা যা দর্শনীয় স্থান আছে তার সবই আমরা দেখলাম ঘুরে ঘুরে। ইম্ফলের কবরখানা বা সিমেটারিও দেখার মতন ছিল। কত অল্পবয়সী ইংরেজ ও স্কট ছেলেই যে তাদের মাতৃভূমি থেকে অত দূরে শুয়ে আছে। মর্মরফলকের লেখাগুলি পড়লে চোখ জলে ভরে আসে। এইরকমই সিমেটারি আছে নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমাতেও। ইম্ফল থেকে কোহিমা যাবার পথের বাঁদিকে একটি পাহাড়ের উপরে আছে সেই সিমেটারি।

বৈষ্ণবদের দেশ মণিপুরে দুবার রাস উৎসব হয়। একবার হয় দোলপূর্ণিমাতে। আরেকবার সম্ভবত মাঘি বা বুদ্ধ পূর্ণিমাতে। রাজবাড়িতে আমাদের রাস উৎসব এবং রাতের বেলা নাচগানের উৎসব

দেখার নেমন্তন্ন হল। সেই প্রথম রিয়্যাল মণিপুরি নাচ দেখে গীতবিতান, দক্ষিণী বা শান্তিনিকেতনী চিত্রাঙ্গদা যে মোটেই জীবন-সুলভ নয় তা বোঝা গেল। রিয়্যাল "মণিপুর-নৃপ-দুহিতা" দেরও দেখা গেল।

একদিন যাওয়া হল মইরাঙে। নেতাজির ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মির বাহিনী এই অবধি এসে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। মরচে পড়ে যাওয়া করোগেটেড টিনের ছাদে গুলির চিহ্ন তখনও ছিল।

মইরাং থেকে যাওয়া হল লকটাক হ্রদে। তখনও লকটাক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র টেন্দ্র কল্পনার গর্ভে ছিল। জলাধারও ছিল না। রাতটা কাটানো হল সেই হ্রদের কিনারায় সার্কিট হাউস অথবা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের বাংলোতে।

এই লকটাক হ্রদের মধ্যে একধরনের ভাসমান উদ্ভিদ হয়, ঘন। তার উপরে কুঁড়ে বানিয়ে থাকে জেলেরা। বিখ্যাত মণিপুরি "নাচুনে হরিণদের" বাসও এই ভাসমান উদ্ভিদেরই বনে।

রাতের বেলা জেলেরা তাদের ছোটো ছোটো কাঠের নৌকোতে যখন দাঁড় দিয়ে আওয়াজ করে তখন ডুং-ডুং-ডুং-ডুং-ডুং শব্দের এক আশ্চর্য আধিভৌতিক আওয়াজ হয়। জলজ অন্ধকারে, রাতে তাদের নৌকোগুলির লণ্ঠনের মিটমিট আলো জলের উপরে যেন অন্য কোনো অপার্থিব জগতের বাতাবরণ তৈরি করে। সারা রাত ধরে জেলেরা হ্রদময় ঘোরাঘুরি করে মাছ ধরে। ওই রকম শব্দ করলে নাকি মাছেরা এদিক থেকে ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করে। তাতে তাদের নাকি ধরা সহজ হয়। এখনও স্মৃতিতে স্পষ্ট আছে মণিপুরের সেই লকটাক হ্রদের উপরে কাটানো রাতটির স্মৃতি।

অনেকদিন পরে ইম্ফলের পটভূমিতে 'বাবলি' নামক একটি উপন্যাস লিখি। অবশ্য শুধুমাত্র ইম্ফলই নয়, বাবলির পটভূমি হিসেবে কোহিমা, দিল্লি ইত্যাদি জায়গাও আছে তবে উপন্যাস শেষ হয়েছে এসে লকটাক হ্রদের উপরের ওই বাংলোটিতেই। সেই বইয়ের প্রকাশক "সাহিত্যম"।

ওই সব অঞ্চলের পটভূমিতে আরেকটি উপন্যাস আছে আমার। ঋজুদার আখ্যান। গোয়েন্দা উপন্যাস, তাতে, ইম্ফল-নাগাল্যান্ড, মায়ানমার ইত্যাদি আছে পটভূমি হিসেবে। সেই ঋজুদা কাহিনির নাম "কাঙ্গপোকপি"।

নামটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে তো আপনাদের কাছে পাঠক! শোনাবেই! কিন্তু ওই নামে একটি জায়গা আছে নাগাল্যান্ড আর মণিপুরের সীমান্তে। 'কাঙ্গপোকপি' শব্দটির মানে হচ্ছে মশার জন্মস্থান। নাগা শব্দ ওটি। আমার অধিকাংশ উপন্যাসের পটভূমিই বাস্তব।

লকটাক থেকে ফিরে এসে পরদিন গেলাম বার্মার সীমান্তে। দ্বিজেন জামাইবাবু নেপালদাকে আমার সামনেই যখন বললেন যে "কালকে লালারা মরে যাবে" তখন চমকে উঠেছিলাম।

পরে, ব্যাখ্যা করে বলতে আশ্বস্ত হলাম। মরে যাব নয়, মোরেতে যাব। MOREH। এই মোরেই হচ্ছে ভারতের শেষ গ্রাম। বার্মার সীমান্তে। মধ্যে কিছুটা নোম্যান'স ল্যান্ড। একটি ছোট্ট নদী দু দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। নাম ভুলে গেছি নদীটির। তার উপরে আর্মির বানানো লোহার ব্রিজ। তারপরই বার্মার শেষ জনপদ তামু। TAMU।

ইম্ফল থেকে বেরিয়ে প্যালেসের চেকপোস্ট পেরিয়ে এসে টেংনোপাল হয়ে টিলার উপরে তামুর বাংলোতে এসে পৌঁছোলাম।

টেংনোপালের ঘাঁটি রীতিমতো উঁচু এবং পাহাড়ি ঘাটের পথ। প্যালেলেই শেষ ভারতীয় চেকপোস্ট ছিল।

লাঞ্চের পরে বিনা পাসপোর্টেই বার্মাতে চলে গেলাম। দেখলাম প্যাগোডাতে উপাসনা হচ্ছে। মেয়েরা স্বচ্ছ, হালকা সব প্যাস্টেল শেডস-এর কাঁচুলি পরে তার উপরে নাইলনের ব্লাউস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বার্মিজ মেয়েদের অতটুকু দেখেই মনে হল যে বর্মাতে বাস করলে আমার সমূহ বিপদ হত। যে বিপদ দক্ষিণী-সংক্রান্ত বিপদের চেয়েও আরও অনেক সাংঘাতিক।

মেয়েদেরই বেশি সক্রিয় দেখা গেল সেখানে। কুয়ো থেকে জল আনছে। দোকান থেকে আমরা কাঠের কাঁকই কিনলাম। হাতে বানানো কাঠের পাইপ, নাকি চরসের কল্কে, কে জানে! শরৎচন্দ্রের লেখার কথা খুব মনে পড়ছিল তখন।

"তামু"হয়ে "মোরে" থেকে ফিরে যখন আমরা শেষ বিকালে চা খেয়ে ইম্ফলের দিকে ফিরে আসছি টেংনোপালের ঘাঁটির উপরে জিপ খাবাপ হয়ে গেল। তখন রাত নেমেছে অনেকক্ষণ। সেই জঙ্গলে নানা জানোয়ারও ছিল। সেই পথ দিয়েই জাপানিরা ভারতে ঢুকে এসেছিল এবং পথের দুপাশে তখনও অনেক বিধ্বস্ত ট্যাংক পড়েছিল দেখেছিলাম। ওই বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত পথ বেয়েই হাজার হাজার ভারতীয় বার্মা ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে একদিন ভারতে এসেছিলেন। কত মানুষ পথেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। ওই পথই সেই ইতিহাসের "বার্মা-রোড"।

জিপ হাঁপানিরোগীর মতো কাশতে লাগল। আমরা তাকে হৃদয়হীনের মতো ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে এগোলাম। বাবা একটা লাঠি নিয়ে আগে আগে চললেন। মরাল বুস্টার হিসেবে। পেছনে পেছনে মা কাকিমা এবং মনুকাকা। একেবারে পেছনে আমি শূন্য হাতে REAR GUARD । সঙ্গে টর্চও ছিল না। তবে কোনো প্রয়োজনও ছিল না। দু-একদিন পরেই পূর্ণিমা। সন্ধে নামতে না নামতেই ফুটফুট করছিল ঘন জঙ্গলাবৃত দুপাশের পাহাড় চাঁদের আলোতে। আমরা আধমাইল যেতে না যেতেই জিপের অসমসাহসী ড্রাইভার, যে আমাদের সব আপত্তি সত্ত্বেও একাই বনেট খোলা জিপের সামনে দাঁড়িয়ে গাড়িকে ঠিক করছিল। আমরা শোভযাত্রা করে এগিয়ে যাবার আগে শুধু বলেছিল হেঁটে যাবেন! এখানের ভাল্লুকগুলো বড়ো বেয়াড়া।

বাবা বললেন, বেয়াড়া নয় এমন ভাল্লুক কি কোথাওই দেখেছ?

সে বলল, আমার দশ-পনেরো মিনিট লাগবে। ট্যাংকের নীচ থেকে ময়লা এসে গেছে পেট্রল পাইপে। চুষে সাফ করে দিচ্ছি।

করলও কিন্তু তাই। পেছন থেকে যখন আমেরিকান আর্মি ডিসপোজালের জিপের অতি পরিচিত ইঞ্জিনের ফাস্ট এবং সেকেন্ড গিয়ারে ফেলা আওয়াজ কানে এল তখন ভাবলাম একেই বলে ওয়েলকাম সাউন্ড অব অ্যান ইঞ্জিন।

সেদিন ইম্ফলে পৌঁছোতে অনেক রাত হয়ে গেছিল।

পরের রাতের কথা মনে আছে। আমরা স্থানীয় একটি ছোট্ট হলে মণিপুরি নাচ-গানের এক দীর্ঘ অনুষ্ঠান "থৈবী-খাম্বা" দেখার পরে বাইরের পথে এসে দাঁড়ালাম।

থৈবী ছিলেন রাজকুমারী আর খাম্বা ছিলেন সাধারণ কিন্তু অসাধারণ বীর যোদ্ধা। তাঁদের অসফল প্রেম কাহিনি। অমর অথবা আমার প্রেম-কাহিনি মাত্রই অবশ্যই ব্যর্থ প্রেমেরই হবে!

যখন পথে এসে দাঁড়ালাম তখন চাঁদের আলোয় মোহিত হয়ে গেলাম। ইম্ফলের পথে তখন বিজলি আলো ছিল না। মা চিরদিনের রোমান্টিক। বললেন, ইসস। গিরিডির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রে। "এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো।"

বললেন মনে পড়ে গিরিডির উশ্রী নদীর চরে হিমাংশুবাবু আমাদের রবীন্দ্রনাথের গানের এবং আবৃত্তি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তারপর আমরা ছেলেরা আর মেয়েরা আলাদা আলাদা এইরকম ছমছমে জ্যোৎস্নাতে হেঁটে ফিরতাম নদী পেরিয়ে। শালবনের ছায়া ছায়ায়। মিষ্টি-গন্ধ ধুলোর পথ বেয়ে, আমাদের বারগান্ডার বাড়িতে। মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। ইসস। কত্ব বয়স হয়ে গেল আমার। আমার ছেলেটা গ্রাজুয়েট হয়ে গেল।

আমি বললাম, গাড়ি ছেড়ে দিই মা। চল, আমরা হেঁটেই হোটেলে ফিরি, চাঁদের আলোয় ভেসে ভেসে।

মা পুলকিত হয়ে শীৎকার তুলে বললেন, যাবি খোকন? চল চল খুব মজা হবে।

মনুকাকিমা হেসে বললেন মা ও ছেলে কেউ দেখি কম যায় না!

বাবা বললেন, আর বলেন কেন! উদুরি ভাদুরি যক্ষ্মা এই তিনরোগেও রক্ষা পাওয়া যায় হয়তো কিন্তু কাব্যিরোগের রোগীরা তো নিজে মরে না অন্যদের মারে। মানে যারা তাঁদের কাছাকাছি থাকে। কী যে অবস্থা আমার!

মনু কাকিমা আর মনুকাকাও জোরে হেসে উঠলেন। কিন্তু মায়ের কাব্যিরোগ সকলকেই কমবেশি কাবু করল। আমি তো কাবু হয়ে ছিলামই।

কী ভালো যে লেগেছিল। কনকনে ঠাণ্ডা ছিল। ফুটফুটে জ্যেৎস্না। উত্তুরে হাওয়া বইছিল। পরিষ্কার নির্মল আকাশের নীলাভ সবুজাভ তারাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল সেই শীতের হাওয়াতে। পথপাশের বড়ো বড়ো পর্ণমোচী গাছগুলি উর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীদের মতো দাঁড়িয়েছিল। তাদের উপরের দিকের সরু সরু শাখা-প্রশাখা সেই হাওয়াতে ওদের অগণ্য হাত আর আঙুলের মতো আন্দোলিত হচ্ছিল। আমরা হাঁটছিলাম। আমার জন্মদাত্রী, কোমল স্নেহপরায়ণা, রোমান্টিক সুগন্ধী মা, আমার পুরুষালি সুপুরুষ ছ'ফিট লম্বা বাবার সঙ্গে এমন হাঁটার অভিজ্ঞতা বেশি হয়নি। বাবাকে ধুতি-পাঞ্জাবিতে ভারি সুন্দর দেখতাম আমি। তার উপরে শাল ছিল। তবে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন কদাচিৎ।

আমাদের সামনে সামনে পাঁচটি নাগা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছিল নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে। হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছিল। পাকা তামার মতো তাদের গায়ের রঙ। ভারতীয় মেয়েদের চুল যে কত বড়ো সৌন্দর্যের জিনিস তা যদি আজকালকার কাজের বাহানা দিয়ে চুল-ছাঁটা আধুনিকারা জানতেন। চুল মেয়েদের যৌনতার এক প্রধান উপকরণ। সটান উজ্জ্বল মসৃণ চুল নেমে এসেছে হাঁটুর পেছন অবধি—হালকা খয়েরিরঙা। আঃ।

আমি শ্লথ পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, এরা যখন নিরাবরণ হবে, তখন এদের সুন্দর তামা রঙা ছাপু ছাপানো ওই চুলের বাহার কী অবশ করাই না হবে!

ব্যসস, যেমনই এই কথা মনে হওয়া অমনি...

বুঝলাম যে সেইরাতে ঘুম হবে না। কষ্টে মবে যাব। সেই পানুয়ানালার রাতের মতো।

এই জীবনে, উনিশ-কুড়ি বছরের উদ্দাম অনভিজ্ঞ যৌবনকে বাঘের বাচ্চারই মতো যেমন বাগ মানাতে পারিনি, আজ ষাট বছর বয়সে পৌঁছে অনেক অভিজ্ঞ হয়েও মনের বয়সে সেই উনিশ-কুড়ি বছরেই রয়ে গেছি। বড়ো হওয়া হল না আর আমার। তবু বলব এখন ভাবলে কী ভালোই না লাগে অনভিজ্ঞ সেই সব দিনের কথা। জানা হয়ে গেলে, দেখা হয়ে গেলে সবকিছুই অভিজ্ঞতা হয়ে গেলে জীবন আর তেমন তীব্র রহস্যময় থাকে না-কী জানি। তবু তীব্রতা কমে গেলেও রহস্য হয়তো থেকেই যায়। রহস্যহীন জীবন, রহস্য-রহিত বাঁচা মৃত্যুরই সমার্থক। এই প্রজন্মের অনেক তরুণ-তরুণীরা জানেও না যে, আমরা হয়তো হয়ত কেন, অবশ্যই বোকা ছিলাম। ওদের তুলনায় অনভিজ্ঞ ছিলাম কত কিছুর ব্যাপারে। আমাদের স্বাধীনতা ছিল না আদৌ। আমাদের জীবন ছিল ঘেরাটোপের। কিন্তু আমাদের সেই অপ্রাপ্তির ~ক্লতার জগৎ যে কী দুর্মর, কর্বুর সুখের ছিল, তা কল্পনা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল যে মণিপুরে মেয়েরা একরকমের সুন্দর ডিজাইনের গয়না পরে। তার নাম "পারিজাত পারিং"। আমার ছোট গল্পের একটি বড়ো সংকলন আছে । তার নাম দিয়েছিলাম "পারিজাত পারিং"। আনন্দ পাবলিশার্স খণ্ডে খণ্ডে ছোটো গল্পও প্রকাশ করেছেন। দু খণ্ড প্রকাশিত হয়ে গেছে। পাঠক-পাঠিকারা সমাদরও করেছেন। কিন্তু 'পারিজাত-পারিং' এই উদ্ভট নামের কারণে বইটি যে ছোটো গল্পের সংকলন তা তাঁদের ন্যায্যকারণেই বোধগম্য হয়নি। দোষটা তাঁদের নয়, আমার।

'ঋজুদা' কিশোরদের কাছে একটি অত্যন্ত প্রিয় নাম। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত "ঋজুদা সমগ্রর" দুটি খণ্ডই অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে আনন্দবাজারের অতীব কষ্টসাধ্য 'বেস্ট-সেলার লিস্ট, যাই বলুক না কেন। কিন্তু 'কাঙ্গপোকপি' বইটিও যে ঋজুদা-কাহিনি এবং "অ্যালবিনো"রই মতো গোয়েন্দা কাহিনি একথাও আমারই মূর্খামির জন্যে পাঠককুল জানতে পারেননি, উদ্ভট নামেরই জন্যে।

যদিও সেবারে নাগাল্যান্ড যাইনি মণিপুর থেকে কিন্ত পরে গেছিলাম। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। অনেকে বলেন জম্মু থেকে শ্রীনগরের পথের দৃশ্যরই মতো সুন্দর। জম্মু থেকে শ্রীনগর—পথ বেয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। দিল্লি থেকে প্লেনে গেছিলাম শ্রীনগরে তাই এই তুলনার সত্য সম্বন্ধে নিজে মতামত দিতে পারব না। কিন্তু ইম্ফল থেকে কোহিমার পথের কাঙ্গাপোকপি মাও, তাদুবী হয়ে, দুপাশের দৃশ্য যে অপূর্ব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কোহিমার পরে পার্বত্য গণ্ডর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়ার দ্রুতগতি ও শীর্ণ ডিফু নদীর পাশে পাশে উতরাইয়ে পথ নেমেছে গিয়ে ডিমাপুরে। ডিফু সমতলে এসে নর্মদা, গঙ্গা, অথবা মহানদীরই মতো ছড়িয়ে গেছে। অনেক বিস্তৃত হয়েছে। কোহিমা থেকে মোককচোঙের পথও অপূর্ব।

কোহিমাতে গেলে কোহিমার ওয়ার-মেমোরিয়াল সিমেটারিটিও অবশ্য দেখা উচিত।

প্রায় এক যুগ হতে চলল ডিমাপুরেও এয়ারপোর্ট হয়ে গেছে। ইম্ফল তো জাপানিদের অকল্যাণে চল্লিশ শতকেই এয়ারপোর্ট হয়েছিল। তখন একমাত্র ভরসা ছিল আমেরিকান ডাকোটা অথবা রয়্যাল এয়ার ফোর্সের বা আই এফ এর নানাধরনের ছোটো প্লেন।

এখন জেট প্লেন যায় সবজায়গাতেই।

ডিমাপুর থেকে একটি পথ চলে এসেছে নানা চা-বাগান ও নানা জনপদ পেরিয়ে কাজিরাঙ্গা। ভারতীয় একশৃঙ্গ গণ্ডারদের অভয়ারণ্য। কাজিরাঙ্গাতে প্রথমবার যাই উনিশ বাহান্নতে—বাবার সঙ্গে। তখন সেই অভয়ারণ্য সবে পত্তন হয়েছে। সেকথা বিস্তারিত আছে 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'তে। এখন কাজিরাঙ্গা প্রায় শহরই হয়ে গেছে।

উনিশশ বাহান্নতে দেখা সেই ব্রহ্মপুত্রর উপত্যকার আদিগন্ত ঘাসবনের মধ্যে একটি ঘুমন্ত খড়ের ঘরের কাজিরাঙ্গা বনবাংলো, সেই বাংলোর কাঠের ছোট্ট গেটের পাল্লার উপরে বসানো কাঠের দুটি গণ্ডারের, অথবা ঢোলা খাকি হাফ প্যান্ট-পরা বনবিভাগের আমলাদের কথা এখন মনে পড়লে, আজকের কাজিরাঙ্গার প্রেক্ষিতে সত্যিই স্বপ্ন বলে মনে হয়।

প্রতি বছর শীতকালে বহরমপুরের শংকরপুরে বিলে একবার করে পাখি শিকারের ইন্তেজাম হতই। রীতিমতো RITUAL ছিল। সে এক এলাহি ব্যপার। ইলাহাবাদই হয়ে উঠত শংকরপুর একদিনের জন্যে।

তাঁর অফিসের একটি ব্রাঞ্চ খুলেছিলেন বাবা বহরমপুরে. পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে। অধিকাংশ পাটের ব্যবসায়ী, কাপড়ের ব্যবসায়ী খাগড়ার কাঁসার বাসনের ব্যপারী মক্কেল। সবচেয়ে বড়ো মক্কেল ছিলেন মোহনবাবু। মোহনলাল জৈন। যাঁর নামে "মোহন টকিজ"। তৎকালীন বহরমপুরের চলচ্চিত্র সঙ্গীত অথবা যে কোনো সভার একমাত্র ক্ষেত্র।

মোহনবাবুর একটি তেলকল ছিল শহরের শেষপ্রান্তে। সেই তেলকলের ম্যানেজারের অফিসেই বাবা অফিস শুরু করেন। বাবার বন্ধু শ্রী পি এন রায়। পরেশনাথ রায়, তখন ছিলেন বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ জেলার সদর) নতুন ইনকাম ট্যাক্স অফিসের হাকিম। তিনিই বহরমপুরে অফিস স্থাপন করতে প্রভূত সাহায্য করেন বাবাকে। তাঁর সাহায্য ছাড়া বহরমপুরের অফিস অত তাড়াতাড়ি বাড়তে পারত না।

বহরমপুর অফিসের পত্তনে সাহায্য করা ছাড়াও সদাহাস্যময় সুদর্শন চেইন-স্মোকার পরেশকাকুর অন্য একটি ভূমিকা ছিল আমাদের পরিবারে। চাঁটগা-বাসী তিনিই আমাদের শুঁটকি মাছের সঙ্গে পরিচয় করান। এবং পরে আমরা পরম-শুকনো হয়ে পড়ি।

মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য আধুনিক এবং মেমসাহেব বউদের দৌরাত্ম্যে সে মাছের প্রবেশ কাঁচা অথবা পাকা অবস্থায় আমার বাসস্থান অথবা পৈত্রিক আবাসেও TABOO হয়ে গেছে। তাই হায় শুঁটকি! কোথায় শুঁটকি? করে ঘুরে বেড়াই এখন কোথায় শুঁটকি খাওয়া যায় এই ধান্দাতে।

তখনকার দিনে সদ্য চাকরি ছেড়ে দেওয়া বন্ধুকে সাহায্য করার মধ্যে কোনো দোষ দেখবেন না কেউই। কোনো স্বার্থগন্ধও নয়।

মফস্‌সলের মক্কেলরা তখন প্রায় পুরোপুরিই unrepresented ছিলেন। তখনকার দিনের মফস্‌সলের আয়কর বিভাগের উকিলেরা নানান পদের হতেন। কেউ ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কেউ ছোট আদালতের কালো কোটপরা ফৌজদারি উকিল। তাঁদের মধ্য কারো কারো একমাত্র সওয়াল ছিল "মাইরেন না হুজুর, ছাইড়্যা দেন।"

এখানে বলাটা অবান্তর হবে না যে, মনীশ জেঠু আয়কর বিভাগ ছেড়ে বহরমপুরেই বাস করতেন এবং বহরমপুর কৃষ্ণনগরে প্র্যাকটিশও করতেন। আমার এইটুকুই সান্ত্বনা যে শক্তিমান গদ্যকার মনীশ ঘটক এবং বিশিষ্ট কবি যুবনাশ্বও ইনকাম-ট্যাক্সে ওকালতি করতেন। মনীশ জেঠুর মেয়ে বিদুষী লেখিকা এবং সমাজসেবিকা মহাশ্বেতাদি মনীশ জেঠুকে নিয়ে একটি অসাধারণ বই লিখেছিলেন। তাতে গোরু 'ন্যাদস'-এর চরিত্রটিও বাংলা সাহিত্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পাঠক, পারলে, বইটি জোগাড় করে অবশ্যই পড়বেন।

আয়কর বিভাগের হাকিমদের সামনে ওকালতি করতে হলে যে আইনের জ্ঞানের চেয়েও বেশি লাগে অ্যাকাউন্টসের জ্ঞান সেই জ্ঞান অধিকাংশ উকিলদেরই থাকত না। খাতা থেকে অ্যাকাউন্টস বানিয়ে, আগের বছরে প্রফিট নেট প্রফিট বিক্রি ক্রয় এসবের তুলনামূলক সমীক্ষা করা। শতাংশ বের করে, তার তারতম্যর ব্যাখ্যা করা, খাতাতে কোনো টাকা বা মূলধন নতুন অঙ্ক জমা পড়লে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা তৈরি করে দেওয়া খুবই জরুরি ছিল। বিশেষ বিশেষ খরচের (প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের ডেবিট সাইডের) ডিটেইলসও তৈরি করা প্রয়োজন হত। ক্যাশ বইতে জমার চেয়ে খরচ বেশি হয়ে গেছে কি না, (Cash Credit) মন গড়া বা বানানো খাতাতে প্রায়ই অমন হতো এই সব খাতা হাকিমের সামনে পেশ করার আগে ভালো করে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। এসব মুহুরিরা বা ওই ধরনের উকিলেরা করতেন না। তাই মফস্‌সলে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের অফিস থাকলে হাকিমেরাও পোকা বাছার ঝামেলা থেকে পরিত্রাণ পেতেন। অ্যাসেসমেন্ট কমপ্লিট করতেও সুবিধে হত। আয়কর বিভাগের স্বার্থেই তাঁরা চাইতেন যে, ভালো ফার্মের কাছে করদাতারা যান।

তৎকালীন বহরমপুরে আরও একটি ভালো অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্ম ছিল। নাম ছিল পি সেন অ্যান্ড কোং। এখনও আছে। তাঁদের খুব বড়ো বড়ো মক্কেলও ছিল।

বাবার অপরিসীম পরিশ্রম করার ক্ষমতাতে এবং অধ্যবসায়ে অল্পদিনের মধ্যেই বাবার ফার্মেই মক্কেল বাড়তে লাগল এবং অফিস শহরের সেই প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে উঠে এল গ্রান্ট হল রোডে।

উনিশ সত্তরের গোড়া পর্যন্ত আমি বহরমপুরে কখনও সখনও গেছি আপিলে এবং কেসেও। তবে বাবাই যেতেন মুখ্যত। বাহাত্তর-তিয়াত্তরের পরে আব ওদিকে যাইনি। কাজেও নয়, অকাজেও নয়। কৃষ্ণনগরেও আর যাইনি। যদিও কৃষ্ণনগরের অফিস আমিই পত্তন করেছিলাম ষাটের দশকের গোড়াতে।

ভায়েরা ফার্মে আসার পরে, বাবা বহরমপুর ও কৃষ্ণনগরের "জাগির" তাঁদেরই দিয়ে দেন। ওরা এবং বহরমপুর অফিসের কর্মচারীরাই এখন দেখাশোনা করেন। ওই দুই জায়গার মক্কেলদের সঙ্গেও আমার আর কোনো যোগাযোগই নেই গত পঁচিশ বছর সেই কারণেই। এমনকী ট্রাইব্যুনালেও ওই দুই জায়গা থেকে কোনো আপিল ফাইল হয় না। আপিল ফাইল হলেও তা আমার গোচরীভূত নয়।

বাবার ফার্মের অন্য কেউই ট্রাইব্যুনালের সামনে অ্যাপিয়ার করেন না। এমনকি বাবা নিজেও করতেন না। অন্য সিনিয়র উকিলদের ব্রিফ দিয়ে দিতেন। আমার সুরসিক বাবা হেসে বলতেন, "দাঁড়াইয়া উঠলেই ইংরেজি আটকাইয়া যায় আমার।" অথচ উনি অত্যন্তই ভাল TABLE TALKER ছিলেন।

ট্রাইব্যুনালে আসার হ্যাপাও অবশ্য অনেকই। খাটুনি বেশি, রোজগার কম। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক ফয়সালা করতে হয়। কাল দেব কী পরের সপ্তাহে দেব বলে কোনো নথিই ইচ্ছেমতো পেশ করা যায় না। ট্রাইব্যুনালে অ্যাপিয়ার করতে একধরনের "স্পেশালাইজড স্কিল"-এরও দরকার। যাঁরা

ঝামেলাহীন এবং ব্যক্তিগত কঠিন পরিশ্রমহীন সহজ উপার্জন করতে চান সেইসব উকিল অ্যাকাউন্টদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রাইব্যুনালে নিজেরা আসেন না কখনওই। সিনিয়রদের ব্রিফ দিয়ে দেন। এমনটাই দেখে আসছি গোড়ার দিন থেকে।

শংকরপুরের বিলের কথাতে ফিরে আসি। তখন আমাদের ফার্মের কাজ সপ্তাহ শেষে দু-তিনদিন লাগাতার ফিক্স করে রাখতেন বহরমপুরের সব হাকিমেরা। যতরকম সুযোগ দেওয়া যায়, বাবার ব্যক্তিত্বের কারণে সবই তাঁরা দিতেন। তাতে তাঁদের যেমন সুবিধা হত, আমাদেরও হত।

প্রতি বছরেই শীতে পরিযায়ী পাখিরা এসে ভিড় করলে কোনো সপ্তাহশেষে বাসে করে অথবা চার-পাঁচটি গাড়িতে করে বিরাট সৈন্যদলে গড়ে গিয়ে পৌঁছোনো হত পাখির বংশ নাশ করতে। পঞ্চাশের দশকে এত পাখি ছিল এবং লাইসেন্সড বন্দুক এত কম ছিল যে পাখির গুষ্টিনাশ হতো হতই না বরং শিকারি আসার উত্তেজনাতে তাদের বংশবৃদ্ধিই হত।

আগের দিন রাতে গিয়ে পৌঁছোতাম আমরা বাবার এক অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু মক্কেলের বাড়িতে শংকরপুরে। তিনি মুসলমান ছিলেন। মস্ত পরিবার। অগণ্য ভাই ভাতিজা সমেত। আমাদের কোনোরকম ত্রুটি ছিল না। ভদ্রলোকের নাম আজ আর মনে নেই বলে অত্যন্ত লজ্জিতবোধ করছি। বহরমপুর থেকে তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়াদাওয়ার সেরেই যাওয়া হত। বার-বাড়িতে দু'তিনটি মাটির ঘরে মেঝের উপরে পাতা খড়ের গদি এবং খড়ের বালিশের উপরে সতরঞ্চি এবং চাদর বিছানো থাকত, তার উপরে নিজের নিজের কম্বল নিয়ে শুয়ে পড়তাম।

ভোরের মোরগ ডাকারও আগে উঠে পড়ে এক কাপ চা খেয়ে গ্রামের মধ্যে এঁকেবেঁকে বেশ কিছুটা হেঁটে গিয়ে, বিলের পাড়ে পৌঁছোতাম আমরা। এককেজনে·এককেটি তালের ডোঙাতে উঠে পড়তাম সারা দিনের রসদ নিয়ে। ওয়াটার-বটলে পানীয় জল, কমলালেবু, সন্দেশ, বিস্কিট ডিমসেদ্ধ ইত্যাদি থাকত সঙ্গে। শিকারি এবং ডোঙা যে বাইবে তার জন্যেও। তারপর কুয়াশায় ভাবী হয়ে থাকা জলজ অন্ধকার মৃদু পকাৎ আওয়াজ করে লগির এক ঠেলাতে ডোঙা এগিয়ে যেত একের পর এক নিঃশব্দে। মাঝিরাই ঠিক করে নিত আগেই কার ডোঙা কোন্ দিকে যাবে। জলের মধ্যে বাঁশের লগি পাঁক থেকে তোলার সময়ে মৃদু জলছড়া দেওয়ার মতো শব্দ উঠত শুধু অন্ধকারে। জলের উপরে জলবিন্দু পড়ার মতো মধুর শব্দ বেশি নেই। এই সব বাদা-বিলের জলের মধ্যে যে কত বিচিত্র গন্ধ, শব্দ, রঙ, কত রহস্য তা যারা বিলে-বাদায় কখনও না সারাদিন কাটিয়েছেন তাঁরা জানবেনও না।

দু ব্যারালেই গুলিভরা বন্ধুকটা শোয়ানো আছে ডোঙার সামনের দিকের মুখের উপরে। জোড়াসনে বসে আছি, গুলির ব্যাগ আর খাবারের ব্যাগ পাশে নিয়ে। অন্ধকারের মধ্যে এপাশে ওপাশে অন্য ডোঙার অগভীর জল কেটে যাওয়ার সড়সড়, গুক-বুক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ডোঙাগুলি দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে যাবার পরে আর কোনো শব্দ নেই। নিজের ডোঙার শব্দ ছাড়া। তখন শুধু শীতের ভোরের কুয়াশা, পেছনে লগি-হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মাঝি আর UNSTABLE EQUILIBRIUAM তালের ডোঙা, রাতের স্বপ্ন নড়িয়ে দিয়ে হেলেদুলে চলেছে তিস্তার চরের পিঠের হাওদাতে শিকারি বসিয়ে নিয়ে, হাতি যেমন করে যায়।

সূর্য উঠবে একটু পরেই। হঠাৎ সামনে জলের মধ্যে পাখসাটের কলরোল উঠল যেন। তারপরেই অনেক পায়ের সম্মিলিত জলছড়ার শব্দ। ভোরের কুয়াশা, নানা পরিযায়ী পাখির আঁশটে ডানার গন্ধে ভরে গেল। বুঝলাম যে এগুলো coot. স্থানীয় নাম ডৌকল। কালো ডানা সাদা ঠোঁট। এরা হাঁস নয়, কুলীন হাঁস তো নয়ই। কিন্তু পরিযায়ী পাখি। এদের মাংসে আঁশটে গন্ধ থাকে। খুব কষে পেঁয়াজ রসুন গরম মশলা লংকা দিয়ে রাঁধতে হয় এই পাখির মাংস।

আমার বেচারি নরম মনের কবিভাবাপন্ন মাকে (*High Voltage Resistance*) আমার *LOUD* এবং জল্লাদ বাবারই জন্যে, প্রায় নিরুপায় হয়েই নাকে ভেজানো রুমাল লাগিয়ে শুঁটকি মাছ এবং হাজাররকম পাখির ও পশুর মাংস রান্না করা শিখতে হয়েছিল। মধ্য-যৌবন পর্যন্ত যতরকমের পশু ও পাখির মাংস খেয়েছি তাতে বাকি জীবন ভারসাম্য রাখতেই নিরামিশাষী হওয়া উচিত। এই কারণেই মাংস অনেকদিনই হল ভালো লাগে না। বিরিয়ানির কথা অবশ্য আলাদা। বিরিয়ানি চিকেনেরও হয়

না, নিরামিষও হয় না। বড়ো বড়ো মাংসর দানা, মুরগির ডিম, জাফরান, খাঁটি গাওয়া ঘি, গরম মশলা দিয়ে রান্না করা উমদা-বিবিয়ানি খেয়ে দোজখ-এ গেলেও সুখ। তবে অধুনা 'চাইনিজ'এরই মতো বাঙালির ঘরে ঘরে এবং কলকাতার হোটেল রেস্তোরাঁতে রান্না হওয়া অধুনা বিরিয়ানিও কোনো উত্তর ভারতীয় "রহিস" মুসলমানকে খাওয়ালে তাঁরাও সজ্ঞানে অক্কা যাবেন। মুসলমানি রান্নার অনেকপদই নেহাৎ উদরপূর্তির জন্যেই রান্না হয় না, সম্ভ্রান্ত হিঁদুবাড়ির অনেক রান্নারই মতো, সেসব রান্নাও আর্টের পর্যায়ে পড়ে। প্রচুর অধ্যবসায়, সময়, যত্ন এবং ভালোবাসা লাগে সেসব রান্নার এক একটি পদের পেছনে।

সূর্য উঠল বাদার ঝোপঝাড় এবং টিপি হওয়া কচুরিপানার গায় সবুজ আর জলের নীলাভ ও সাদাটে ভাবে সোনার আভা লাগিয়ে। দেখা গেল coot-এর ঝাঁক, সে ঝাঁকে কম করে হাজারখানেক পাখি ছিল, সরে গেছে চাতুর্যের সঙ্গে, দূরে। ডোঙা একহাত এগোলে তারাও জলের উপরে একহাত সরে যায় বিপরীতে। আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে তারাও কম বড়ো বিশেষজ্ঞ বলে মনে হয় না। কোন বন্দুকের পাল্লা কতখানি তা ইংল্যান্ড, বেলজিয়ান, ডাচ, স্প্যানিশ এবং আমেরিকান বন্দুক নির্মাতাদের মতো তাদেরও যেন নখদর্পণে ছিল।

শংকরপুরের বিলে ভালো জাতের হাঁস কমই নামত। কমোন টিল থাকত কিছু কিন্তু হুইসলিং টিল, গার্গানি, পোচার্ড, পিন-টেইল, স্পুন-বিলড, ম্যালার্ড, বাহমনি ডাকস, এবং কোনো প্রজাতির রাজহাঁসই নামত না সেই বিলে। বিল ভরতি হয়ে থাকত Coot এবং RED HEADED MOOR-HEN- এ, যাদের স্থানীয় মুরশিদাবাদ জবানে বলত "কায়মা" আর দক্ষিণ বাংলাতে বলত কাম পাখি।

কাম বলতে রিপুকেই জানতাম। পাখির নামও যে কাম হয় তা কলকাতার উপকণ্ঠে সোনারপুর, ধাপা (অধুনা "সল্ট লেক সিটি") ইত্যাদিতে শিকার করতে গিয়েই প্রথমে জানি। কিছু DABCHICK ও থাকত, যা সব জলাতেই তাকে। বিহারে যাকে বলে "ডুবডুবা"। ডাহুক, নানা প্রজাতির বক, পানকৌড়ি। তবে "কাঁক" দেখতাম না ওইসব বিলে, যেমন দেখা যেত ধাপার ভেড়িতে।

অনেকে নৌকো বোঝাই করে কায়মা আর ডৌকল মেরে দিনান্তবেলায় বিজয়ীর হাসি হেসে ডোঙা ভিড়াতেন পাড়ে। কে ক'টি কোন্ প্রজাতির হাঁস মারল, তা নিয়ে বাহাদুরি হত। বাবা এই নিধনযজ্ঞের হোতা ছিলেন এবং সংখ্যাতত্ত্ববিদ ছিলেন। আমি শিকারি অবশ্যই ছিলাম তা অস্বীকার করব না কিন্তু সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি বিলের জলে যে রঙের খেলা, যে আলোছায়ার ডোরাকাটা সব গালচে মেলা আর তোলা হত অবিরত, যে সব জলজ বর্ণ গন্ধ শব্দর সমষ্টি, তাতেই বুঁদ হয়ে যেতাম। Coot এর পায়ের জলছড়া দেখতে, কায়মার হঠাৎ-ওড়া একঘেয়ে উচ্চগ্রামের স্বগতোক্তি শুনতে, জলের উপরে শীতের বাতাসের হিল্লোল তুলে বয়ে যাওয়া দেখতে, গায়ে আমার পুলকভরা শিরশিরানি উঠত।

যদিও আমি বাবারই ছেলে কিন্তু চরিত্রের বহু দিকে আমার সঙ্গে বাবার তুমুল পার্থক্য ছিল। অনেকই ব্যাপারে। like father like son হিসেবে মিল ছিল অবশ্যই আবার অনেকই ব্যাপারে অমিলও কম ছিল না। বাবার চরিত্রর কিছু কিছু দিক OVERBEARING ছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের পথে এগোতে এগোতে বাবার সঙ্গে আমার তাই নানারকম মতবিরোধ ঘটেছিল। তা বলে বাবাকে কোনোদিনও অমান্য বা অগ্রাহ্য করিনি। প্রাণপণে বাবার বাধ্য ছেলে হবার চেষ্টা করেছি আজীবন। কখনও কখনও নিজের অংশে ক্ষতি করেও। কিন্তু আমি যে শুধুমাত্র বাবার ছেলে নই বাঙালির ঘরে ঘরের অন্য অনেক স্বাতন্ত্রবোধরহিত পুত্রের মতো, আমি যে একজন আলাদা মানুষ, আমার মত এবং পথ এবং জীবনের গন্তব্যও যে বাবারই নিজে হাতে কাটা খাত ধরেই প্রবাহিত হবে না, একথা যেন বুঝতে পারতাম।

আমি জানি যে, আমিও যেমন কষ্ট পেয়েছি এই স্বাতন্ত্র্যর কারণে আমাব বাবাও তেমনই কষ্ট পেয়েছেন আমার কারণে। নানাবিধ কষ্ট। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি যে, তা তাঁকে পেতে হয়েছে আমার স্বাতন্ত্র্যবোধকে অস্বীকার করারই জন্যে। "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে" এই কথাটি সবক্ষেত্রে সত্য নয়। প্রত্যেক শিশুরই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে অন্য মানুষ হয়ে ওঠাটাই বাঞ্ছনীয় এবং

তার পূর্বসূরিকে সবদিক দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়ার সাধনাই তার করা উচিত। প্রত্যেক বাবারই উচিত্ত তার সন্তানের কাছে, জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাসিমুখে হেরে গিয়ে জিতে যাওয়া।

আমি জানি না, পাঠক। আমার "বাবা হওয়া" গল্পটি আপনারা কেউ পড়েছেন কি না! "শ্রেষ্ঠ গল্পের" মধ্যে গল্পটি সংকলিত আছে। সে গল্পে আমি বলতে চেয়েছি, সব বাবাকেই বোঝাতে চেয়েছি যে, "জন্মদাতা" আর "পিতা" শব্দ দুটি সমার্থক নয়।

আমরা অধিকাংশই জন্মদাতা। বাবা নই।

বাবা হওয়া সহজ নয়।

সারাদিন শিকারের পরে অন্ধকার হবার আগে আগে শিকারিরা মরা পাখির স্তূপ, মাঝির লগির দু-প্রান্তে ঝুলিয়ে ফিরতেন। সব গাড়ির 'ডিকি' খুলে শিকার ওঠানো হতো—আমাদের HOST- এর জন্যেও অনেক পাখি বরাদ্দ থাকত। তারপর হাতমুখ ধুয়ে আমরা প্রায় এক ঐতিহাসিক এবং চিরস্মরণীয় সাপার-এ সামিল হতাম।

প্রতি বছরের RITUAL হয়ে গেছিল ওই ভোজ।

উঠোনের মধ্যে শতরঞ্জি ভাঁজ করে পেতে দেওয়া হতো আসন হিসেবে। আমাদের যাত্রাপার্টিতে গানেওয়ালা, নাচনেওয়ালা, সারেঙ্গিওয়ালা, পাখোয়াজওয়ালা, তবলচি, ক্ল্যারিয়োনেটওয়ালা, প্রম্পটার, হিরো, অ্যান্টি-হিরো, বুকে কৃত্রিম কাঁচুলি-সাঁটা হাট্টাকাট্টা নরপাঠঠা ফিমেল তো নেহাত কম থাকত না।

ভাঁজ-করা শতরঞ্চির সামনে সার সার কলাপাতা পড়ত। তারপর শুরু হত পরিবেশন।

পোলাও, কাতলা বা রুই মাছের মাথা-দেওয়া মুগের ডাল, চাকা-চাকা লাল রুই মাছ ভাজা, মাছের তেল ভাজা, রুই বা কাৎলা মাছের কালিয়া। তার আগে পুঁটি বা খলসে মাছ, কড়কড়ে করে ভাজা আর কড়কড়ে করে আলু ভাজা, বাড়িতে বানানো ঘিয়ের সঙ্গে। চারটে করে কাঁচা লংকা। দুটো করে আস্ত পেঁয়াজ, কাঁচা। বাবার জন্যে রসুন, ঘিয়ে ভাজা। তারপর গলদা-চিংড়ির মালাইকারি পাবদা বা পারশে মাছেব মাখা-মাখা ঝালের সঙ্গে ভেটকির ফ্রাই, ভেটকির কাঁটা-চচ্চড়ি, চিতলের পেটি, আট ইঞ্চি চওড়া, তেলওয়ালা। স্থানীয় নয়, শিলিগুড়ি থেকে আনানো। তারপরে মুরগির দোপেয়াজা, পাঁঠার সিনা ভাজা, পাঁঠার ঝোল। তারপরে জলপাইয়ের চাটনি। বহরমপুরের দই।

খাওয়া যাখন শেষ, আমাদের হোস্ট বললেন, গুহ সাহেব, বড়ো ভুল হয়ে গেল যে।

আমি যে বছরের কথা বলছি সে বছরে বাবার বয়স সাতষট্টি-আটষট্টি হবে।

বাবা বললেন, কী হল?

রানাঘাট থেকে ছানাবড়া আনিয়েছিলাম। একদম ভুলে গেছি।

বাবা বললেন, আরে দাদা! আমার পেটে আর জায়গা নেই। হোমিয়োপ্যাথির গুলি খাবারও জায়গা নেই, বিশ্বাস করেন মিঞাভাই।

মিঞা বললেন, আপনি না খেলে বড়োই দুঃখ পাব।

বাবা কারোকেই দুঃখ দিতে চাইতেন না।

বললেন, কাঁচালংকা আছে?

কেন?

হোস্ট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন, আসসে।

তবে নিয়ে আসুন ছানাবড়ার সঙ্গে কাঁচালংকা।

সমবেত বীর এবং ভীরু শিকারি এবং দর্শকদের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রায় খাওয়া থামিয়ে কি ঘটতে যাচ্ছে, তা দেখার জন্যে হঠাৎ জাবর-কাটা থামানো বলদের মতো ড্যাবাড্যাবা চোখে, উদ্গ্রীব হয়ে খাওয়া বন্ধ করে, আমার একমাত্র বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

এক হাঁড়ি ছানাবড়া এল পাকঘর থেকে।

বাবা একটা করে ছানাবড়া খেতে লাগলেন আর একটা করে কাঁচালঙ্কা। যাতে মুখ মেরে না যায়।

দেখতে দেখতে ডজন পুরে গেল। তখন পাশে বসা দুর্গাকাকু, যাঁর কথা 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারের' প্রথম খণ্ডে অনেকই বলেছি, বহুগুণান্বিত এবং আমার বাবার একসময়ের লাগাতার সঙ্গী, শিলিগুড়ির দুর্গা রায় মশাই, হাঁ হাঁ করে উঠে বললেন, "করেন কি? করেন কি! গুহসাহেব। মেলাই হইছে। ইবারে ছাড়ান দ্যান।"

ততক্ষণে মিঞা সাহেবেরও চোখ কপালে উঠেছে। অতিথি নারায়ণ সেকথা সত্যি! তাছাড়া, তিনি হাতেমতাইয়ের জাত-ভাই, অতিথিসেবা করতে যাঁরা প্রকৃতই দিলদরিয়া। "বকরইদের" পটভূমি যাঁরা জানেন সকলেই এই সত্যও জানেন। কিন্তু তবু ফাসকেলাস হোস্ট সেই বড়ে মিঞারও বড়ে মেহমানের খাওয়ার বহর দেখে চোখ কপালে উঠল। তাঁরই উঠোনে খেতে খেতেই এতবড় কৃতবিদ্য গুহসাহেব ফৌত হয়ে গেলে তাঁর গুস্তাকি কি কেউই মাপ করবেন?

এই সমবেত প্রতিরোধে এবং হাই-ভোল্টেজ রেজিস্ট্যান্সের মুখোমুখি হয়ে বাবা 'ক্ষ্যামা' দিলেন।

দুর্গাকাকুর "মেলাই হইছে" শব্দোচ্চারণের প্রসঙ্গ ওঠাতে উত্তরবঙ্গের এবং নিম্ন আসামের নানা কথা হঠাৎই মনে ভিড় করে এল।

উত্তরবঙ্গীয় ডায়ালেক্টে "মেলা" মানে অনেক।

'জঙ্গল মহল' আমার সর্বপ্রথম গল্পসংকলন। তিরিশ বছর আগে প্রথম প্রকাশিত কিন্তু এখনও সমান সমাদৃত। শিকরের পটভূমিতে হিউমারাস ভেইনে লেখা গল্পগুলি। তাতে একটি গল্প আছে "মাইর্য়েন এবং মাইর্য়েন না"। চা-বাগানে চাকুরীরত শিকার-প্রত্যাশী কিন্তু অতীব ভোজন-বিলাসী এক জামাইবাবু এবং তাঁর বন্ধুর গল্প। জামাইবাবু ঘুমের মধ্যেও পান চিবোতেন। গোরুর গাড়ির উপরে নদীপারে রন্ধনকার্য সমাধা করে গুরুপাক খাওয়ার পরে গোরুর গাড়ির মধ্যে খড়ের উপরে আলোয়ান গায়ে দিয়ে আরামে শুয়ে দুজনে হেলতে দুলতে ঘুমোতে ঘুমোতে শিকার-শিকার খেলা শেষ করে বাগানে ফিরে আসছিলেন। এমন সময়ে একটি ছোটো নদীর সোঁতার সামনে এসে দু ব্যাটা বলদই থমকে দাঁড়াল। উত্তরবঙ্গের আর্দ্র শীত। ঘোর কৃষ্ণপক্ষের রাত। কারণবারি সেবনের পক্ষে পরম উপযুক্ত। গো-শকট যখন একটি শীর্ণ নদী পেরুতে যাবে, গহন অন্ধকারে, যখন, ঘন সেগুন জঙ্গলের মধ্যে আকাশের নীল-সবুজ তারারা সব একে একে খোয়া গেছে কিছুক্ষণ আগেই ঠিক তখনই জুলজুল করে জ্বলে উঠল নদী-পারে অঙ্গারেব মতন অপার্থিব একজোড়া চোখ। বাঘের চোখ। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীরাই সেই গা-ছমছম অনুভূতির কথা জানবেন। গাড়োয়ানের অল্পবয়সী ছেলে অথবা ভাইপো চকিতে বলে উঠল. বাঘ! বাঘ!

ঘুমাতে ঘুমাতেই জামাইবাবু কোল-বালিশ করা বন্দুক-গাছা টেনে নিয়ে বাঘ অথবা টাগ অথবা যাইহোক এর দিকে তাক যেই করেছেন. সেই ছেলেটি বলল,হায়। হায়। এ যে দেহি মেলা বাঘ!

আর যায় কোথায়।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী হুমড়ি খেয়ে শিকারি অথবা হবু-শিকারির ঘাড়ে পড়ে, কেঁদে বললেন, "মাইর্য়েন না। মাইর্য়েন না মশয়, মেলা বাঘ। শুনতাছেন? ছ্যামড়ায় কয়, মেলা বাঘ।"

বাঘ অথবা টাগ অথবা যাই হোক অন্তর্হিত হলে যখন অনুযোগ করা হল জামাইবাবুকে শিকারে এসে ঘুমুবার জন্যে, এবং অবশ্যি বাঘ নিজে আত্মহত্যা করে মরবে বলে আসা সত্ত্বেও তার ভবলীলা সাঙ্গ না করার জন্যে, তখন পান-মুখে জবজবে গলায় জামাইবাবু স্বপক্ষে সওয়াল করলেন, 'ঘুমুচ্ছিত্ব লজ্জাপাকে'।

অর্থাৎ ঘুমাইতেছিলাম, তাতে লজ্জা পাওনের কি?

সেই বাক্যটিই পান এবং জরদার প্রভাবে অথবা প্রকোপে, যাই বলুন, সরলীকৃত হয়ে, হয়ে গেল "ঘুমুচ্ছিত্ব লজ্জাপাকে"।

তাছাড়া, বাঘ অথবা টাগ যেখানে একটি নয়, মেলা, সেখানে লজ্জা পাওয়ার মধ্যে সত্যিই তো লজ্জা কিছুমাত্র থাকার কথাও ছিল না।

এক কথা বলতে বসে কত কথাই যে এসে যায় অসংলগ্নভাবে। অন্যজগত থেকে এসে তারা অন্যের ঘাড়ে উঠে পড়ে। এবং না বলে কয়ে দলছুট হয়ে সারি ভেঙে জারি গাইতে চলে যায় অন্য জলায়। স্মৃতিচারণ করা সহজ নয় আদৌ বিশেষ করে আমার মতো অগোছালো মানুষের পক্ষে।

পাঠক! নিজগুণে মার্জনা করবেন।

বহরমপুরের কথা শেষ করার আগে মোহনবাবুর কথা এবং আমার অসাধারণ সঙ্গীত-প্রতিভার কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

মুরশিদাবাদ, নদিয়া, কুষ্টিয়ার অগণ্য রাজস্থানি পরিবারেরই মতো মোহনবাবুরা প্রায় বাঙালিই হয়ে গেছিলেন। নাহার, দুগার, শর্মা, জৈন, আগরওয়ালা ইত্যাদি পদবির অগণ্য মারোয়াড়ি পরিবার কথাে বার্তাতে আচারে আচরণে সত্যিই বাঙালি হয়ে গেছেন। তবে তাঁদের অধিকাংশই নিরামিষাশী এবং জৈন।

তবে মোহনবাবুর বাংলা খুব মজার ছিল। প্রতিটি বাক্যতেই নিদেনপক্ষে দুবার 'আপনার গিয়ে' বলতেন। মনে করুন, বাক্যটি হল, এ বছরে, মনে হচ্ছে, গরমটা খুব বেশিই পড়বে। মোহনবাবু সেই ব্যাকটিকেই বলবেন, মনে হচ্ছে, আপনার গিয়ে, এ বছরে গরমটা, আপনার গিয়ে, খুব বেশিই পড়বে।

একবার আমার বিয়ের পরপরই বহরমপুরের সুধী-সমাজ রবীন্দ্রজন্মোৎসবে ঋতুকে গান গাইতে আমন্ত্রণ জানালেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধায় সভাপতিত্ব করবেন। মোহনবাবুর 'মোহন টকিজ' হলে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হবে।

আমিও ঋতুর সঙ্গে গেছিলাম অফিসের কাজে। কেস ছিল, না আপিল ছিল মনে নেই। ঋতু তখন মহড়া দিতে গেছে। যাকে বলে স্টেজ রিহার্সাল। অন্যান্য পাঠ-টাঠও ছিল। পরদিন সকালে অনুষ্ঠান। বিকেলেও হতে পারে। ঠিক মনে নেই।

সকালবেলা মোহনবাবু এসে বললেন, আমার হলটা তো আপনার গিয়ে মাগনাতেই দিয়ে দিলাম ফাংশনের জন্যে, আপার ওয়াইফ গাইবেন যখন। কিন্তু আপনার গিয়ে আপনি গাইবেন না?

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, আমি তো বাথরুম-সিঙ্গার। আমি কি ফাংশনে গাইতে পারি! তেমন যোগ্যতা থাকলে তো উদ্যোক্তারাই অনুরোধ করতেন আমাকে গাইতে।

উদ্যোক্তারা, আপনার গিয়ে আবার কী বলবে! আমি মাগনা হল না দিলে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগের দশাটা কি হত? আপনার গিয়ে, আপনাকে ওঁদের অবশ্যই বলা উচিত ছিল। আপনিও তো বউমার সঙ্গেই, আপনার গিয়ে, এক ইস্কুলে গান গাইতেন।

আমি পাহাড়ী সান্যাল মশায় যেমন করে দু'হাত নেড়ে অভিনয় করতেন তেমন ভাবেই দু'হাত নেড়ে এবং অভিনয় না করে বললাম, ছিঃ ছিঃ। এ আপনি কি বলছেন? আমি তো সেই স্কুল থেকে কোনো সার্টিফিকেটও পাইনি। অল্পদিনই শিখেছিলাম।

আপনার গিয়ে, এই হল আমাদের দোষ। আপনি গান না জানলে কি আমাদের বউমা আপনাকে এমনি এমনি..।

বলেই, উনি উঠে পড়ে বললেন, আপনার গিয়ে, আমি এখুনি উদ্যোক্তাদের বলছি। আপনি না গাইলে আমি হল দেব না। আমার একটি শোর টিকিট সেল কত জানেন? তার ওপর এমন হিট ছবি উত্তম-সুচিত্রার।

ঋতু মহড়া দিয়ে ফিরে এসে বলল, এতোই যদি গাইবার শখ তো আমাকে বললেই পারতে। তোমায় গাইতে না দিলে উনি হল দেবেন না একথা ওঁরা জানতে পারায় কি তোমার সম্মান বাড়ল, না আমার?

লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম।

বিকেলে উদ্যোক্তারা এলেন এবং বললেন, আমরা লজ্জিত। আপনাকে আমাদেরই বলা উচিত ছিল। খুবই অন্যায় হয়ে গেছে।

আমি বললাম, অন্যায়টা আপনাদেরও নয় আমারও নয়। আপনার গিয়ে, মোহনবাবুর।

তা যাই হোক, আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছে আপনি অন্তত একটি গান করুন।

তাতে যখন রাজি হলাম না তখন ওরা হয়তো ভাবলেন যে, আমি একাধিক গান গাইতে চাইছি।

আরও লজ্জায় পড়লাম। তারপর ওঁদের আন্তরিক এবং উষ্ণ অনুরোধে রাজি হলাম প্রখ্যাত গায়িকার সঙ্গে একটি দ্বৈত-সঙ্গীত গাইতে।

ওড়িশার গোপালপুর-অন-সিতে Honeymoon অথবা Sour Moon (বিয়ের অনেক পরে গিয়েছিলাম, তাই)-এ গিয়ে ঋতু আমাকে একটিমাত্র সহজ গান তুলিয়ে দিয়েছিল "আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে কার উদ্দেশে'—। বর্ষার গান। রবীন্দ্রজন্মোৎসব হচ্ছে মে মাসে। কিন্তু যেহেতু ওই গানটি ঋতু আর আমি একসঙ্গে গেয়েছিলাম বেশ ক'দিন তাই রবীন্দ্রনাথের আত্মা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত ভক্তদের ভয়ংকর চটিয়ে দিয়েও ওটিই গাইব ঠিক করলাম।

অনুষ্ঠানের দিন গাইলামও। কিন্তু যে পোগ্রাম ছাপা হল তাতে ওই গানটির বেলাতেই ছাপা হল দৈত্য-সঙ্গীত। আমার এবং ঋতুর নাম দিয়ে।

এছাড়া আরও একক এবং সম্মেলক ছিল। ঋতুর অনেকগুলি একক ছিল।

দ্বৈত-সঙ্গীত, থুড়ি, দৈত্য-সঙ্গীত যখন গাইবার টার্ন এল তখন তো খুব মাথাটাথা নেড়ে, ইদানিং আই এ এস দীপক রুদ্র যেমন করে গান করেন "এমোশান" দিয়ে এবং নস্যি দিয়ে (আমারই ডিবে থেকে, অতএব এমোশনের আধিক্য হলে, তার জন্যে আমিই দায়ী!) গেয়ে দিলাম। খুব হাততালিও পড়ল। পড়বেই। আমাদের মক্কেলের বিনিপয়সাতে দেওয়া হল। মক্কেলের উকিলের (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের) স্ত্রী মুখ্য গায়িকা এবং খোদ মক্কেলের উকিল যখন সঙ্গে গাইছেন তখন হাততালি যে না দেবেন, তাঁরই সমূহ বিপদ।

পরে, রাতে ঋতু বলেছিল যে, এতোদিনেও স্কেল কাকে বলে জানলে না?

মানে?

আমি উষ্মার সঙ্গে বললাম।

ও বলল, দুই স্কেলের মধ্যের শ্রুতিতে ধরে দিলে গানটা এতবার মহড়া দেওয়া সত্ত্বেও।

আমি হাঁ হয়ে চেয়ে রইলাম।

যাকগে। প্রথম লাইনের পরে ন্যারোগেজ ছেড়ে ব্রডগেজে এসে উঠেছিল যদিও। এসব বে-আক্কেলে মক্কেল-বিক্কেলদের কথা শোনো কেন?

উত্তরে কি আর বলব! মক্কেলই যে লক্ষ্মী! আর মোহনবাবু তো ফাসকেলাস শাঁসালো মক্কেল। গোটা-তিরিশেক ফাইল। কতরকম রিয়্যাল বে-আক্কেলে এবং "ওয়ান-পাইস-ফাদার-মাদার" মক্কেল নিয়ে আমাদের ডিল করতে হয়! তার ঋতু কি বুঝবে? লক্ষ্মী থাকলেই না সরস্বতীর বাহলাওবা!

গল্প এটুকুই নয়, আরও আছে। গান এবং কাজ শেষ করে ফিরে এসেছি কলকাতাতে।

রবিবারের সকাল। ক্যালকাটা সাউথক্লাবে টেনিস খেলে এসে চানটান করে জলখাবার খেয়েছি। সাউথক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের টালিগঞ্জের শুটিং রেঞ্জে যাব বলে বেরোব বাড়ি থেকে। সেখানে পিস্তল ছুঁড়তে যেতাম। একটা আড্ডাও হতো আমাদের চাঁদোয়ার নীচে চা এবং আলুকাবলি খেতে খেতে। বেরোচ্ছি, এমন সময়ে দেখি তৎকালীন উত্তরবঙ্গের ডিআইজি (উনিশশ বাষট্টি-তেষট্টিতে পুলিশে গণ্ডা-গণ্ডা আই জি ডি আইজি ছিলেন না!) রঞ্জিত গুপ্ত বাড়িতে ঢুকছেন। দোতলাতে বাবা এবং দুর্গাকাকুর কাছে যাবেন। আমি একতলাতে থাকতাম। লনের পাশ দিয়ে এসে বসবার ঘর পেরিয়ে দোতলাতে উঠতে যাবেন উনি সিঁড়ি দিয়ে, এমন সময়ে আমার সঙ্গে মাঝপথে দেখা।

বিশুদ্ধ ঢাকাই-বাঙাল রঞ্জিতকাকু ঢাকাইয়া ভাষায় বললেন, রবিবারে এমন হন্তদন্ত হইয়া যাও কই?

কোমরের হোলস্টারে পিস্তলটা দেখিয়ে বললাম, হাত ঠিক করতে। আপনাদের পুলিশ রেঞ্জেই যাচ্ছি, টালিগঞ্জে। রবিবারে রবিবারে আমাদের ক্লাবের ব্যবহারের জন্যে দেন ওঁরা।

ঋতু কোথায়?

ও তো বাপের বাড়ি গেছে, বালিগঞ্জ প্লেসে।

তাই? তা ও নাকি বহরমপুরে গেছিল গান গাইতে?

হ্যাঁ।

আমি তো বহরমপুর হইয়াই আইলাম গাড়িতে। সক্কলে এক্কেবারে ধন্য ধন্য করতা আছিল। আচ্ছা, সঙ্গে কারে লইয়া গেছিল কও তো? গানের মাস্টার নাকি? স্যা অরে এক্কেরে ডুবাইছে।

কেন?

আতঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত, উদ্‌গ্রীব এবং যাবতীয় উঃ এবং আঃ হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম ওঁকে।

এক্কেরেই ডুবাইছে। বেসুরা। আজে বাজে লোকরে অ্যালাও করে ক্যান ও সঙ্গে গাইতে? অরে কইয়া দিয়ো।

রঞ্জিতকাকুর অনেক বিষয়ে ঔৎসুক ছিল। ইংরেজিটা চমৎকার লিখতেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে উৎসাহ ছিল। রাগরাগিণীও বুঝতেন মনে হয়।

দেব, দেব।

বললাম আমি।

ভাগ্যিস ঋতু বাড়িতে নেই। বহরমপুরে পরিচয়হীন আমার ইজ্জৎ তাই ধুলোতে লুটোলেও কলকাতায় রঞ্জিতকাকুর কাছে অন্তত বাঁচল। "আপনার গিয়ে" মোহমবাবুর উপরে এমন রাগ হল যে, কী বলব।

পাঠক। সেই মুহূর্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে জীবনে আর কোনওদিন কোনো বড়ো "আর্টিস"-এর সঙ্গে দ্বৈত বা দৈত্য সঙ্গীত গাইতে যাব না। একক বা solo গেয়ে যদি থান ইঁট বা পচা ডিমও খেতে হয়, তাওভি আচ্ছা!

পাঠক। অনেকেই অন্যান্য ক্ষেত্রেরই মতো গানের ব্যাপারেও বিদগ্ধজন তো বটেই সাধুজনও আমার প্রতিভার দাম আদৌ দিলেন না যে, একথা ভেবে মনে মনে বড়োই ব্যথিত হই। একজন জ্যোতিষী, জীবনে ওই একজন জ্যোতিষীর কাছেই এক পরম সংকটময় মুহূর্তে গেছিলাম, না, আমি নিজে যাইনি, আমার মানসিক অবস্থা আত্মহত্যা করার মতো হয়েছিল দেখে, তিনিই নিজে উদ্যোগী হয়ে আমার মায়ের কাছ থেকে 'ছক' আনতে বলে সেই ছক দেখে আমার জীবনের তাবৎ ভবিষ্যৎ একটি ছোটো খাতাতে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন ইংরেজিতে।

যথাকালে তাঁর সম্বন্ধে বলা যাবে। তিনি লিখেছিলেন INTER ALIA, যে যোগ্যতা অনুপাতে যশস্থান অত্যন্তই দুর্বল।"

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও একথা সত্যি হয়েছে মর্মান্তিকভাবে কিন্তু আপাতত শুধুমাত্র গানের কথা বলেই ক্ষান্ত হব।

পাঠক, আপনারা বিদগ্ধজন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই ডেভিড ম্যাককাচ্চন সম্বন্ধে জানেন। অথবা শুনেছেন। সেই বিখ্যাত বিদেশি কলকাতাতে, পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে অথবা ষাটের দশকের একেবারে গোড়াতে মারা যান। তখন তাঁর বয়সও কিছুই হয়নি। শহরময় কান্নাকাটি পড়ে যায় তাঁর মৃত্যুতে। সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে যত তাবড় তাবড় আঁতেল ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই 'THE STATESMAN' এ ডেভিড সম্বন্ধে স্মারক প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর ছবিও বেরোয় কাগজে এবং ছবি দেখেই এই অশিক্ষিত তাঁকে চিনতে পারি।

পৃথিবী এত জায়গাতে গেছি, সব জায়গার পাশের ঘরের সাহেব মেমসাহেবদের চিনতে কে যায়? চায়ই বা কে?

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে আমার ইংল্যান্ড-প্রবাসী সহোদরা মালা সপরিবারে দেশে আসে এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে কনীনিকাতেই ওঠে। সামনেই আমার ফাইনাল সি এ পরীক্ষা। কনীনিকাতে গোলমাল থাকাতে এবং মনও উচাটন হওয়াতে আমি মাসখানেকের জন্যে রামকৃষ্ণ মিশনের নবনির্মিত ইন্টারন্যাশনাল হস্টেলে (গোলপার্কে)। গিয়ে আস্তানা গাড়ি। সে এক অভিজ্ঞতা। যথাসময়ে বলা যাবে চতুর্থ খণ্ডে। এখন শুধু ডেভিডের কথাই বলি।

আমার পাশের ঘরেই সেই মাঝবয়সি সাহেব থাকতেন। সেই হস্টেলে তখন ভারতের এবং পৃথিবীর নানা দেশের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা থাকতেন। এবং তাঁদেরই মাঝে মাঝে স্যান্ডউইচের মধ্যের দড়কচ্চা-মারা শসার মতন আমাসদৃশ দিশি ফেলুড়ে অথবা লজ্‌ঝরে কিছু মালও থাকত।

সেখানের দক্ষিণা বেশ বেশিই ছিল। তবে আমার অ্যাকউন্ট্যান্ট বাবা বে-লাইনে চলে যাওয়া এবং প্রায় বকে-যাওয়া ছেলেকে নিজের অ্যাকাউন্ট্যান্সি পেশার সাম্রাজ্যে এবং নিজের এক্তিয়ারে

যেনতেনপ্রকারেণ ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসে খোঁয়াড়ে ভরে দেবার চেষ্টায় সবকিছুই করতে পারতেন। এসব ওঁর কাছে নস্যি ছিল। বড় ছেলে হিসেবেই শুধু নয়, পরিবারের আর্থিক-ভবিষ্যতের জন্যেই যে বড়ো ছেলেকে সবসময়েই নিজের নিজের 'লাইনে আনা' খুবই দরকার, তা আমাদের দেশের ব্যবসাদার এবং পেশাদার বাবা মাত্রই জানতেন। ওই সময়ে আমাদের দেশে বড়োছেলেদের কোনো নিজস্ব জীবন থাকার কথা ছিল না। অধিকারও ছিল না। তাদের স্বাধীন মতামতের তো প্রশ্নই উঠত না পারিবারিক ব্যবসা বা পেশা থাকলে। যারা বেগড়বাঁই করত আমার মতন, তাদের "বিদ্রোহীর" পর্যায়েই ফেলা হত। তাই বাবা সাগ্রহেই রাজি হয়েছিলেন।

আমার অবশ্য তখনও জানতে বাকি ছিল না শ' খানেক গাধা মরে একটা বড়ো ছেলে 'পয়দা' হয় পরিবারের 'ফয়দার' জন্যে।

ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ হস্টেলে তখনকার দিনের তোফা ফাইভ কোর্স লাঞ্চ ডিনার খাই, সেল্ফ-কনটেইনড ঘরে থাকি। জানালা খুলে ঢাকুরিয়া যাবার পথের দিকে চেয়ে থাকি। লেডিজ হস্টেলের সামনের বাসস্টপেজে সুন্দরী-অসুন্দরী বিভিন্ন বয়সী ফুলের মতন মেয়েদের দেখি। রাসেল, স্পিনোজা, থোরো, হেমিংওয়ে, কেদার চাটুজ্যে, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), কনফুসিয়াস, থমাস মান, অ্যারিস্টোটল, কিনস, ডস্টভয়স্কি, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, পি জি উডহাউস, এজরা পাউন্ড, এমারসন, বিভূতিভূষণ, সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবকে পড়ি। একসময়ের সহপাঠী কবির কুপ্রভাবে। দীপকের প্রভাবও ছিল।

আমার এক সাগরেদ ছিল সেই হস্টেলে। সে তখন ফাইনাল নয়, ইন্টারমিডিয়েট সি এর পড়া করতে ঢুকেছিল। কোনো ক্লাসওয়ান গ্রেড ওয়ান প্রাইভেট সেকটর কোম্পানির কেষ্টবিষ্টু রক্ষিত সাহেবের একমাত্র ছেলে, নামটা কি অশোক? মনে নেই! ঘরের মশারির মধ্যে বসে গড়গড়া খেত। বাইরে গড়গড়া রেখে চিৎপুর থেকে আনা ফাসকেলাস অম্বুরি তামাকের উমদা গন্ধ ছড়াত। ভাগাভাগি করে গড়গড়ার নলে দুজনে টান লাগাই দাদা-ভাই আর মনের সুখে আড্ডা মারি। এবং তাবৎ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং অ্যাকাউন্ট্যান্সি লাইনের শ্রাদ্ধ করি।

রক্ষিত, বিকেল চারটেতেই মশারি টাঙিয়ে বিছানাতে উঠে যেত। সেখানে বসেই পড়াশোনো থেকে যাবতীয় সুকর্ম-কুকর্ম করত। রক্ষিতের মশারিটি কিন্তু ছিল নিছকই মশাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে। নিজের বুদ্ধি ছিটকে বেরিয়ে যাবে তার প্রতিষেধক হিসেবে নয়। তখন গোলপার্কে যা মশা ছিল, মানে যে পরিমাণ এবং যে মাপের, তাতে দুবেলা গান্ডে-পিন্ডে ফাইভ-কোর্স লাঞ্চ-ডিনার খাওয়া গাবদা-গোবদা তামসিক "টু দ্যা পাওয়ার এন" কোনো কোনো সন্ন্যাসীকেও উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসাধ্য ছিল না।

আমার ঘরের পাশের সাহেবটির ঘরে প্রচুর পরমা সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী মেয়ে এবং কিছু হাবা-গবা ছেলে আসত। মেয়েরা কেউ কেউ কখনও একাও আসত। ঈর্ষাতে বুক ফেটে যেত। রক্ষিতই বলেছিল, ও সাহেব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। সবক'টা মেয়েই যাদবপুরের।

ও বলত, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়াটাই শালা মস্ত ভুল হয়ে গেছে!

গোলপার্কের ইউথ-হস্টেলে থাকাকালীনই দোল পড়ে গেল। বাড়িতে গেলাম সকালে উঠেই। বাড়ি তো হাঁটা পথ। দোল-পূর্ণিমাতে আমার পাগলামি ডেঞ্জারাসলি বাড়ত। রোম্যান্টিসিজিম একেবারে চুড়োয় পৌঁছোত। নিজের ধড়া-চূড়া সব খুলে ফেলে উলঙ্গবাহার নাচতে ইচ্ছে করত।

কনীনিকার পাড়াও তখন নতুন। নতুন নতুন পড়শি। নতুন গাড়ি, নতুন বাড়ি, নতুন কন্যেরা সব। রেডিয়োতে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত হলে, ছোটোকাকু 'বন্ধ কর বন্ধ কর কুকুরের চিৎকার' বলে রেডিয়ো বন্ধ করতে বললে কি হয়, বাবার নতুন লনওয়ালা বাড়িতে আবার সুনন্দা পট্টনায়েক, সালামৎ নাজাকৎ আলি খান ভায়েরা এবং আরও অনেকেই গান টান গাইতেন মাঝে মধ্যে। সেটা পরিবারের উচ্চাঙ্গসঙ্গীত প্রীতির জন্যে আদৌ নয়। আয়কর বিভাগের কোনো কোনো সঙ্গীত -পাগল আমলাদের মনোরঞ্জনের জন্যে বা তাঁদের অনুরোধেই বাবার লনওয়ালা বাড়িতে সেই সব আসর বসত। লনওয়ালা বাড়িতে গান গাইলে এবং গান শুনলে গায়কের এবং শ্রোতাদেরও ইজ্জৎ বাড়ে এবং গান

অনেক বেশি শ্রুতিমধুর হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত রসিকমণ্ডলীর এমন ধারণাও হয় যে, সেই গৃহস্বামীও তাবৎ কলা, কৃষ্টি এবং সঙ্গীত ইত্যাদি সম্বন্ধে "হেভি ফান্ডা" রাখেন। এই হল হা-ভাতেদের দোষ। পয়সা থাকলেই যত গুণ সব আপনা থেকেই তার ঘাড়ে গিয়ে ওঠে। দৌড়াদৌড়ি করে, পোষা বিড়ালনিদের মতো। লনওয়ালা বাড়ির লনে লাল-নীল টুনি-বাল্ব জ্বালিয়ে ককটেল-পার্টি দিলেও অতিথিদের নিছক গৃহস্বামীর লনের গুণেই তাড়াতাড়ি নেশা নয়। এসব আমার নিজচোখে দেখা। গভীরভাবে উপলব্ধ এবং পরীক্ষিত সত্য।

সন্ধে রাত্রে, পাড়ার মেয়েদের জড়ো করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে যত বসন্তের গান আছে এবং যত চাঁদের গান সব কোরাসে গেয়েটেয়ে তারপর খিচুড়ি খেয়ে নিজ ডেরার দিকে ধীরে সুস্থে এগোলাম।

আমাদের বাড়িতে তখনও কিছু পুরোনো ট্রাডিশান বেঁচে ছিল। অষ্টমীর দুপুরে মিষ্টি পোলাও আর কচি পাঁঠার মাংস, কালীপুজোর আগের দিন চোদ্দশাক ভাজা খাওয়া, কালীপুজোর রাতে লুচি-মাংস, সরস্বতী পুজোর দিন দুপুরে জোড়া ইলিশ, লাউডগা কাঁচালংকা-কালোজিরে দিয়ে রাঁধা, রাতে ভুনি-খিচুড়ি মুগের ডালের, মধ্যে বাদাম, কিশমিশ ইত্যাদি দিয়ে, পৌষ-পার্বনে হাজার রকমের পিঠে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে হাঁড়ি হাঁড়ি কাসুন্দি বানানো ইত্যাদি।

আমার বাবার মতন সংস্কারহীন, গুরু, ধর্ম, গ্রহ-রত্ন এবং পুরুত-বিদ্বেষী পুরুষমানুষেরও একটি সংস্কার ছিল অত্যন্ত গভীর। কাসুন্দি বানানোর সময়ে যদি হাঁড়িতে কাসুন্দি ফোলে তবে বুঝতে হবে গৃহস্বামীর সচ্ছলতাতে জোয়ার আসবে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বাড়ি ফিরেই বাবা ঠাকুমাকে শুধোতেন, কি মা, ফুলছিল? না, ফোলে নাই?

"ফুলছিল"। কথাটা শুনে বাবার মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

বাবার আরও একটি সংস্কার ছিল মোটর গাড়ির নাম্বার প্লেটের নাম্বারের। বেজোড় নাম্বার কখনই নিতেন না। বলতেন অপয়া। যদি কখনও নিতেনও তবে সব নাম্বার যোগ করে যোগফল অবশ্যই জোড় হতে হয় কি না তা দেখে নিতেন।

আমার দুই সহোদর বাবার এই সংস্কারটি পেয়েছে বাবার কাছ থেকে। তাদের অন্য নানা সংস্কারও আছে। একজনের আবার ভূতের ভয়ও আছে।

দোলের দিনে সেবারে এসে পড়শিদের বাড়ির অতজন তরুণীর এবং পাড়াতুতো বউদের সঙ্গে দুপুরে দোল খেলা তারপর ক্লান্ত হয়ে শ্যাম্পু করে পেট-মাদিয়ে খেয়ে বিকেল অবধি ঘুমোনো, তাবপরে আবার তরুণী-সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং তারও পরে খিচুড়ি, যেন বহুবিধ নেশার ঘোরেই ভাসতে ভাসতে, উড়তে উড়তে লেক রোড দিয়ে এসে সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে পড়ে গোলপার্কের দিকে এগোতে লাগলাম।

পূর্ণিমার চাঁদ যেন সত্যিই আমার শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে সেই সব দিনে রক্তে ঢুকে পড়ত। আজও পড়ে। তবে, ধীর বেগে।

হেঁটে যাচ্ছি প্রায় জনহীন সাদার্ন অ্যাভিন্যু দিয়ে, এমন সময়ে এক অঘটন ঘটল। লেকের দিকের ফুটপাথ ধরে তিনটি মেয়ে আসছিল গোলপার্কেব দিক থেকে। রাত তখন সাড়ে ন'টা হবে। এমন সময়ে জনাচারেক ছেলে লেকের দিকের ঝুপড়ি অন্ধকাব থেকে রেলিং টপকে তাদের সামনে পড়েই তাদের টেনে নিয়ে যেতে চাইল অন্ধকারে। ওরাও হয়তো নেশা করেছিল অন্য কিছুর। কিন্তু শালীন নারী সান্নিধ্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং তদুপরি মায়ের হাতে-রাঁধা খিচুড়ির নেশার সঙ্গে অন্য নেশা এঁটে উঠবে কেন?

আমার সামনে নারী নিগ্রহ? আমি একেবারে রে! রে! রে! করে উড়ে গিয়ে পড়লাম ওদের উপরে এবং যদিও মারামারি যাকে বলে তা কোনোদিনও করিনি তবুও যেন আমার চারিত্রিক পবিত্রতার জোরেই তাদের অবস্থা হল হাঙরে তাড়া-করা সার্ডিনের ঝাঁকের মতো। কে কোন্‌দিকে পালাবে, যেন দিশা পেল না। মুহূর্তের মধ্যে তারা যেমন অন্ধকার থেকে এসেছিল, তেমনই অন্ধকারে মিশে গেল।

মেয়ে তিনটি কী করে আমার ঋণ শুধবে ভেবে না পেয়ে একজন তার বেণী থেকে হলুদ গোলাপটি খুলে আমাকে দিল।

আমি বললাম, একা একা রাত করার দরকার কি এত? তাড়াতাড়ি বাড়ি যান।

একা কোথায়? আমরা তো তিনজন।

হেসে বলল, একজন।

সঙ্গে ছেলে নেই তো।

মেল-শভিনিস্ট আমি বললাম।

ও।

মেয়েটি বলল।

তারপর বলল, ছেলেদেরও তো অনেক রকম হয়। যারা আপনার ভয়ে পালিয়ে গেল ওরাও তো ছেলেই।

ছেলে হলেই কি আর ছেলে হয়!

বলেই, আমি হলুদ গোলাপের গন্ধ নিতে নিতে হলুদ জ্যোৎস্নাতে উড়ে উড়ে গোলপার্কের ইন্টারন্যাশনাল হস্টেলে এসে উঠলাম।

সেই রাতেই "হলুদ বসন্ত" নামটি আমার প্রথমবার মনে এল। ঠিক করলাম, এই সি এ পরীক্ষার ব্রহ্মদৈত্য আমার ঘাড় থেকে নামলেই একটি দারুণ সুন্দর মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস লিখব। নাম দেব তার 'হলুদ বসন্ত'। আমার জীবনের প্রথম উপন্যাস।

লিখেছিলাম। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবার বেশ কিছুদিন পরে যখন পুরোদমে কাজ করছি। আনন্দবাজার রবিবাসরীয়র সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী যেবার আমার শিকারভিত্তিক লেখার ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করে আমাকে "Proper" সাহিত্য করতে অনুমতি দিলেন, সেবারেই আনন্দবাজারের দোল সংখ্যাতেই (বার্ষিক সংখ্যা) লিখেছিলাম, "হলুদ বসন্ত"। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশ করেছেন সেই উপন্যাস এবং জীবনের প্রথম উপন্যাস হলেও আজও তা সমান সমাদৃত। "পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে" এই প্রবাদ শুধু চালের বেলাতেই নয়, সাহিত্যের বেলাতেও সমান প্রযোজ্য।

সেই বসন্তোৎসবের রাতে আমার ঘরে পৌঁছে হলুদ গোলাপ আর নাম না জানা মেয়েটির দীর্ঘ বেণীর সুগন্ধি ফুলেল তেলের গন্ধে, যে গন্ধ গোলাপে মিশে এক আচ্ছন্নতা তৈরি করেছিল, আমাকে হঠাৎই প্রচণ্ড "গানে পেল", অনেককেই যেমন সময়ে সময়ে "প্রচণ্ড হিসিতে" পায়, ডায়াবেটিস অথবা প্রোস্টেট গ্লান্ডের অসুখ না থাকলেও। অথবা নীরেনদার (চক্রবর্তী) ভাষায় বলতে গেলে, সঙ্গমে পায়। সঙ্গমের দেশজ শব্দটি উহ্যই থাক। অত্যন্ত রসিক এবং বড়ো কবি এবং সম্পাদক এবং আমার অগ্রজ নীরেনদা লজ্জা পাবেন বললে। বাড়ি থেকে বেরিয়েও সারা পথ আমি একলা একলাই গান গাইতে গাইতে আসছিলাম। আমার গান শুনেই মেয়ে তিনটি আমার উপস্থিতি টের পেয়ে সাহায্যের আবেদন করে।

ঘরে ঢুকে, মশার ভয় অগ্রাহ্য করে, জানালাটা খুলে দিয়ে নীচের শুনশান চন্দ্রাশোভিত গড়িয়াহাট রোডের দিকে তিনতলা থেকে তাকিয়ে গানের পর গান গেয়ে চললাম।

মানুষকে যখন গানে পায়, চানে পায়, যখন 'মান'-এ পায় তখন এইরকমই কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে মানুষ। কেউ লাগাতার গান গায়, কেউ ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ধরে চানই করে (শুধু কি চানই করে!) আর কেউ কেবলই মান বাড়াবার জন্যে প্রাইজের পর প্রাইজ বাগাবার নেশায় মত্ত হয়।

গানের পর গান গাইছি। বাইরে মুখ বের করে। কত রাত হয়ে গেছে খেয়ালই নেই। হঠাৎ বন্ধ দরজায় টুকটুক করে আওয়াজ হল। টুকটুকটুক হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছিল কিন্তু আমি যখন শুনতে পেলাম বাইরে মুখ বের-করা আমার কানের ভিতর দিয়ে, তখন তা-ঠাক-ঠাক-ঠাক বলে মনে হল।

চমকে উঠে, দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলেই দেখি, আমার পাশের ঘরের বাসিন্দা সেই ব্যাটা সাহেব দরজা-জুড়ে দাঁড়িয়ে।

আমার মনে হল, সাহেব বুঝি এবারে নিজের মনোমত গান শুনবেন অর্ডার দিয়ে। নিশ্চয়ই অনবরত আসা-যাওয়া করা অনেক বাঙালি তরুণীর একজনের প্রেমে পড়েছেন তিনি এবং তারই প্রিয় কোনো গান হয়ত শুনতে চাইবেন।

সাহেবকে বললাম, প্লিজ, কাম অন ইন।

উনি ঘরে না ঢুকে, দরজাতে দাঁড়িয়ে বিরক্তি এবং রাগ থুথুর সঙ্গে গিলে ফেলে গলাটা একবার খাঁকড়ে নিয়ে বললেন, "ওয়েল, ইওর ভয়েস ইজ ভেরি নাইস ইনডিড। বাট প্লিজ ফাইন্ড আ মোর অ্যাপ্রোপিয়েট টাইম টু সিং।"

আমার মুখে কে যেন সুলেখা এগজিক্যুটিভ ব্ল্যাক কালির বোতলই পুরো ঢেলে দিল। জীবনে অমন অপ্রতিভ কখনও হইনি। পরেশের উপরে সত্যি ভারী রাগ হল। আমার স্কুলের বন্ধু পরেশ, যে আমাকে রেডিয়োতে নিয়ে গিয়ে অডিশান দিইয়েছিল।

সাহেবের উপরে সেদিন থেকেই মনে মনে রাগ ছিল।

কয়েকবছর পরে এক সকালে "THE STATESMAN" খুলে (তখন তো কলকাতাতে অন্য ইংরেজি কাগজ ছিল না) দেখি পাতা-জুড়ে সেই সাহেবই দাঁড়িয়ে আছেন। আর তার কী প্রশস্তি! কী প্রশস্তি! লোকটা জীবন্ত অবস্থাতে তো আমাকে অপ্রতিভ করেইছিল। মরে গিয়ে, আরও বেশি অপ্রতিভ করে গেল।

আমরা যখন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়ি তখন কিছুমাত্র সাহায্য পাওয়ার উপায় ছিল না। কোনো কোচিং-ক্লাস বা ইনস্টিট্যুটও ছিল না। তবে কোনো কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং আইনজ্ঞ, অ্যাকাউন্ট্যান্সি এবং অডিটিং আর আইন পড়াতেন অল্প কিছু সংখ্যক ছাত্রকে তাঁদের বাড়িতে। যে ক'জনের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন শ্রী অমলেন্দু চ্যাটার্জি, বিজন সেনগুপ্ত ইত্যাদি। ইদানীং অনেকেই তেমন আছেন এবং আমার সহপাঠী প্রণবকুমার ব্যানার্জি, যে ব্রিটানিয়া এঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাকরি ছেড়ে, এখন নিজেই অনেক দেরিতে স্বাধীন-পেশা আরম্ভ করেছে, খুব ভালো কোচিং করে।

একথা বলছি এই কারণে যে আমার রেফারেন্সে যে, ক'জন গেছিল তারা খুব তাড়াতাড়ি এই মরুভূমি পার হয়ে গেছে। এখন অবশ্য ইনস্টিট্যুট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস নিজেরাই কোচিংয়ের এবং পোস্টাল কোচিংয়ের বন্দোবস্ত করেছেন—রিজিওনাল কাউনসিলও খুব ভালো কাজ করছেন, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে। এখন অনেকই সুবিধা।

আরও একটা কথা সাহস করে বলব, তাতে আমার সমসাময়িকেরা সকলে হয়তো খুশি হবেন না। কথাটা হচ্ছে এই যে আমাদের সময়ে কমার্স বা অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়তে তেমন ভালছেলেরা কমই আসত। অধিকাংশই আমার মতো গবেট। তাই ফেলের হারও বেশি ছিল হয়তো। তখন রবিবারের আনন্দবাজারের পাত্রর বিজ্ঞাপনে প্রাধান্য পেত ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার ইত্যাদিরা। "কলিকাতায় নিজবাটী"-ওয়ালারা অবশ্য তখনও যেমন পেত আজও তেমন পায় কিন্তু বাটীর যে কত রকম হয় তা শনৈঃ শনৈঃ পাত্রীর অভিভাবকেরা আবিষ্কার করে ফেলাতে আজকাল আর নিজবাটী-ওয়ালাদের অতটা আধিপত্য নেই। তারপরে একটা যুগ এল, আমাদের যুগ, যখন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা বাজার গরম করে রাখল। কিন্তু আজকালকার সি এ-রা যেমন শুধু মেধাবীই নয়, তাদের গান, বাজনা, ছবি, চলিচ্চত্র সাহিত্য সব ব্যাপারেই প্রচণ্ড ঔৎসুক্য আছে, আমাদের সময়কার সি এ-রা অধিকাংশই আমার বন্ধু দিলীপ বা প্রণব ব্যানার্জির মতো matter of fact ছিল। থার্ড ইয়ার বি. কম-এর ছাত্র, আমার

সহপাঠী দিলীপ, প্রথমবার শিলংএ গিয়ে অমিত রয় আর লাবণ্যর শেষের কবিতার প্রাকৃতিক মাধুর্যে রোম্যান্টিকতার শিকার আদৌ না হয়ে আমাকে চিঠি লিখেছিল এই রকম।

"ভাই বুদ্ধ,

কাল শিলং-এ আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পচা বৃষ্টি। তবে সুখের কথা এই যে আনারস এখানে প্রচণ্ড শস্তা এবং অতি উত্তম। প্রচুর আনারস আমরা খাইতেছি। বলিতে গেলে, আনারস ছাড়িয়া আর কিছুই খাইতেছি না।"

দিলীপ বড়ো ভালো এবং সরল ছেলে ছিল। আমাদের সকলেরই প্রিয়। সে যদিও অনেকদিন হল ওপারে চলে গেছে, মরুভূমি পার হওয়ার কিছুদিন পরে, তবু দিলীপের শিলংয়ের এমন আনরোম্যান্টিক বর্ণনা এবং আনারস খেয়ে থাকার কথাতে আমার আজও ম্যাকলাস্কিগঞ্জের বর্ষাকালের পেয়ারা খেয়ে-থাকা শেয়ালদের অথবা বাঁধাকপি বা গাজরের ফলন যে বছরে বেশি হয় সে বছরে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন সবজি-মণ্ডীতে কপি ও গাজর-খাওয়া গাই-বলদের কথা মনে পড়ে যায়।

আশাকরি আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। আমার বন্ধুরাও নয়। একথা বলা শুধু এইটুকু বোঝাবার জন্যেই যে আমাদের প্রজন্মের অধিকাংশ সি এ-রাই একটু রসকষহীন ছিলাম। আমার মতো গবেট না হলেও।

ইন্টারমিডিয়েট সি এ পরীক্ষার পড়াশোনো আরম্ভ করেছি। আমাদের স্কুলের ডাকসাইটে মেধাবী ছাত্র কুমার মিত্র দত্ত আশুতোষ কলেজ থেকে বি কম করে এন সি রায়ের কাছে আর্টিকল্ড হয়। কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার থাকাকালীন "মিস্ট্রি অফ বিড়লা হাউস" লিখে বিধানবাবুর আমলে এন সি কাকুর চাকরি গেছিল। চাকরি যাওয়ার পর বাবা আমাদেরই অফিসের একটি অব্যবহৃত ঘর ছেড়ে দেন এন সি কাকুর পেশার কাজের জন্যে। তবে সে যুগে তাঁর চাকরি গেছিল বিধানবাবুর আমলে (কংগ্রেসি) জ্যোতিবাবু বা অসীমবাবুর আমলেও যদি কোনো বিদ্রোহী কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার আবারও ওরকম কোনো বই লেখেন "মিস্ট্রি অফ বিড়লা হাউস" বা "গোয়েঙ্কা হাউস" নামে তবে তাঁর চাকরিও যে অবধারিত যাবেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্ষমতাসীন রাজনীতিকেরা চিরদিনই শিল্পপতিদের পদলেহন করেছেন। তাঁদের কালো টাকা দিয়েই নির্বাচন লড়েছেন, জনগণকে বোকা বানিয়ে জনগণকে বঞ্চিত করে তাঁদেরই ঘোরাপথে অনেক সুবিধে দিয়ে এসেছেন তা সকলেই জানে।

শেষান সাহেব এই সব অনাচারের বিরুদ্ধে একা লড়তে চেয়েছিলেন বলেই তো সব দলের নেতাদেরই এত রাগ তাঁর উপরে। আই এ এস তো দেশে স্বাধীনতার পরে শয়ে শয়ে হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে পরাধীন ভারতের কিছু দেশপ্রেমী আই সি এদের তুলনা চলে না। আজকালকার আমলাদের চরিত্রও রাজনীতিকদের পদলেহন করে করে তাদের মতোই হয়ে যাচ্ছে।

তাঁদের বড়োলোক বা শিল্পপতি বিদ্বেষ শুধুমাত্র ভাঁওতা দিয়ে গরিবের ভোট বাগানোর জন্যেই যে, সে কথা না-বোঝার মতো মূর্খ এখন বোধহয় কোনো শিশুও নেও। বড়োলোকের ট্যাক্সের টাকাতে গরিবের দেখভাল হয়েছে। নিজেদেরও দেখভাল কম হয়নি। তাই বড়লোকদের ঘিয়ে যাতে হাত না পড়ে তাও রাজনীতিকদের দেখা অবশ্যই কর্তব্য। তাই কী কেন্দ্রে বা রাজ্যে বছরের পর বছর করের বোঝা বেড়েছে। গরিবকে দেখানো হয়েছে যে তাঁরা কতবড়ো জনদরদি, গরিবি-হটানোই তাঁদের জীবনের মূল ব্রত। এই অবাস্তব ইডিয়টিক কর-কাঠামোতে কর-ফাঁকিও বেড়েছে দিনের পর দিন।

বছরের পর বছর কুমার আমার কাছে আসত এবং আমার ঘরে বসে দুজনে পড়াশোনো করতাম। পড়াশোনা আমি করতাম। করতে ভালবাসতাম। সব বিষয়েই পড়াশোনা করতে, শুধুমাত্র অ্যাকাউন্ট্যান্সি ছাড়া। অ্যাকাউন্ট্যান্সির প্রিন্সিপাল্‌স বা কনসেপ্ট বুঝতে একটুও অসুবিধা হত না। কিন্তু তিনঘন্টার মধ্যে যে ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স, হোল্ডিং-কোম্পানি (এখন উঠে গেছে, ম্যানেজিং এজেন্সিরই মতো) ইত্যাদির ব্যালান্স শিটের ফর্ম মুখস্থ করে ছ'ছটি বালান্স শিট তৈরি করতে হবে এই কথা ভাবলেই আমার মন বিদ্রোহ করত।

মুখস্থ বিদ্যার প্রতি চিরদিনই অসূয়া ছিল। আজও আছে। এও মনে হয় যে, যাঁরা সৃষ্টিশীল কাজকর্ম করেন, তাঁদের স্মৃতিশক্তি ভালো হলে তা তাঁদের সৃষ্টিশীলতার পরিপন্থী হয়। প্রখর স্মৃতিশক্তি, মানুষের কল্পনা শক্তি যা সৃষ্টিশীলতার মূলে, তা হয়তো কমবেশি প্রতিহত করে।

জানি না, এ কথা ঠিক কী না। মনস্তাত্ত্বিকেরাই বলতে পারবেন।

আমরা পড়ি আমার ঘরে বসে। কনীনিকাতে এসে আমার নিজের একটি ঘর হয়েছে। নিজের পছন্দমতন ছিমছাম করে সাজিয়েছি ঘরটিকে। যদিও ফার্নিচার STAYNOR কোম্পানি থেকে কেনা। STAYNOR Company- তে বাবার পরিচিত এক ভদ্রলোক ছিলেন। দারুণ দারুণ ফার্নিচার শস্তাতে জোগাড় করেছিলেন বাবা।

লেখাপড়ার টেবলের সামনের চেয়ারে বসে সবুজ লন দেখা যায়। লনে নানা গাছপালাও লাগিয়েছিলেন বাবা। গাছগুলো খুব তাড়াতাড়ি বেঁড়েও ছিল। সেজকাকু, ছোটোকাকুরও মদত ছিল অনেকই তার পেছনে। চেরি গাছ। তার তলাতে বেতের চেয়ার পেতেও কখনও কখনও শীতকালের সকালে বা বিকেলে রোদে বসে পড়াশোনা করতাম। কবিতা লেখার মতো অকাজও। "কোয়েলের কাছে" উপন্যাসটির অনেকখানিই (আমার জীবনের প্রথম লেখা বড়ো উপন্যাস—যদিও বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়) ওইখানে বসেই লেখা। সে সব অবশ্য বছর পাঁচ-ছয় পরের কথা।

স্থলপদ্মর গাছ ছিল। জবা, গন্ধরাজ ফুল ও লেবু। নিমগাছ বাড়ছিল হু হু করে। রঙ্গন, লালপাতিয়া, কেরলাইট বেঁটে নারকোল গাছ, টবে বহুবর্ণ পুর্টোলাকা। গ্রীষ্মে, কানীন কামনার মতো গুটি গুটি ফুটত আর মাথার মধ্যে দামামা বাজত। রক্ত নাচত শিরায় শিরায়, ঝুনুক-ঝুনুক করে।

কুমার শুধু পড়াশোনাতেই ভাল ছিল না কী করে ভালো ফল করতে হয় তাও ও জানত। কুমার আশুতোষ কলেজ থেকে বি কম করেছিল। চুনীও গেছিল ওই কলেজেই।

একদিন কুমার সঙ্গে করে একটি ছেলেকে নিয়ে এল। ওর আশুতোষের সহপাঠী। তার নাম বুদ্ধদেব সমাজদার। কালো-কালো। ওর মধ্যেই চুল পাতলা হয়ে গেছিল। বেঁটেই বলা চলে। গোল মুখ। সিগারেট খেত। পানও খেত। দুটি হাত আর দুটি পা ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে হাঁটত। সেও নাকি পড়াশুনোতে খুব মেধাবী। মেধাবী যে, তা অল্প ক'দিনেই বুঝলাম। আমার মুখস্থ করাতে অনীহা দেখে বুদ্ধ বলত একসঙ্গে মুখস্থ করতে যেয়ো না। আমার বাবা বলতেন, গীতা কি একদিনেই মুখস্থ হয়েছে নাকি? রোজ সকালে উঠে পুরোটা পাঠ করতে করতে একদিন দেখি পুরোটাই মুখস্ত হয়ে গেছে। পাঠ্যবইও তেমন করেই মুখস্থ করতে হয়। পুরো বই। তাকে মুখস্থ করা বলা উচিত নয়, তাকে বলা উচিত বুঝে হজম করা। মুখস্থ আর হজমে তফাত আছে।

মুখস্থ-বিদ্যা যে ওদের সাধুসঙ্গে অথবা অসাধুসঙ্গে পড়ে আয়ত্ত হচ্ছে আস্তে আস্তে তা হঠাৎই একদিন বুঝতে পারলাম যখন তিনজনে বেড়াতে বেড়াতে ঢাকুরিয়া লেকে গিয়ে লেকের পাশে ঘাসে বসে চিনাবাদাম খেতে খেতে কোম্পানিজ অ্যাক্টের আপাদমস্তক প্রথম থেকে শেষ অবধি তিনজনে এক তৃতীয়াংশ করে মুখস্থ বলে গেলাম, সাবসেকশন, ক্লজেজ, এবং প্রভাইসোস সুদ্ধু।

নিজের কৃতিত্বে নিজেই তাজ্জব বনে গেলাম।

এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হল ওদেরই মাস্টারিতে। তবে ইংরেজিটা ওদেরই মতে, আমি ওদের চেয়ে ভালো লিখতাম। ফলে অডিটিং, জেনারেল কমার্শিয়াল নলেজ, ট্যাক্সেশন ইত্যাদিতে আমি কোনো বেগ পেতাম না। আইনেও নয়। কোনো আইনেই নয়। বি কমের ক্লাসে থাকাকালীন Law of Contract পড়তে পড়তে এক জায়গাতে খটকা লাগাতে শেঠনা সাহেবকে চিঠি লিখি, প্রকাশকের প্রযত্নে। ব্যাখ্যা চেয়ে। আজকালকার দিনে এ হয়তো অভাবনীয়। কিন্তু সুপণ্ডিত এবং অত্যন্ত ব্যস্ত আইনজ্ঞ এবং পুস্তক-প্রণেতা শেঠনা সাহেব নিজে হাতে আমাকে চিঠির জবাব দেন আইন ব্যাখ্যা করে।

আমি কোনোদিনও কোনো বিষয়ে NOTES পড়িনি। সমস্ত বিষয়েই originally prescribed বই পড়েছি। মূল টেক্সট। তার ফলে, পরীক্ষার ফল হয়তো কোনোদিনও ভালো করতে পারিনি কিন্তু পলিটিকস, ইকনমিকস, ইনকাম ট্যাক্স, কমার্শিয়াল ল, অডিটিং, ইত্যাদি সব বিষয়েই মূল পাঠ্যবই পড়ে সেইসব বিষয় সম্বন্ধে যতটা ওয়াকিবহাল হয়েছি এবং ঔৎসুক্য জন্মেছে তা নোটস পড়লে কখনওই হয়তো হত না। স্পাইসার পেগলারের অডিটিং, কাঙ্গা অ্যান্ড পালকিওয়ালার ইনকামট্যাক্স, শেঠনা সাহেবের কমার্শিয়াল ল, বি বি ঘোষের জেনারেল কমার্শিয়াল নলেজ, CAIRIN CROSS- এর

ইকনমিকস এমনকি পাকামি করে মালথাস, অ্যারিস্টোটল, ইত্যাদি ইত্যাদি পড়তে গিয়ে ফেল করতে করতে বেঁচে গেছি বারবার অনেকই বিষয়ে। কিন্তু একথাও ঠিক যে নানা বিষয় সম্বন্ধেই এক গভীর জিগীষা যে জন্মে গেছে, সেকথা অস্বীকার করতে পারি না। পারি না বলেই আফ্রিকা থেকে ফিরে এসেই, বিশেষ করে কিশোরদের জন্যে কিছু লিখছি বলেই, যা হয় এলেবেলে কিছু লিখিনি। নিজে সেখানে যাওয়া সত্ত্বেও, নিজচোখে দেখা সত্ত্বেও, আফ্রিকার প্রকৃতি, গাছপালা, পশুপাখি সম্বন্ধে অনেকই পড়াশোনা করার পরেই 'গুগুনোগুম্বারের দেশে' বা 'রুআহা' লিখেছি। "ঋজুদা সমগ্র"র অথবা 'কাঙ্গপোকপি'র একটি কাহিনিরও পটভূমি বানানো নয়। গাছপালা, মানুষ, পশুপাখি, আগ্নেয়াস্ত্র, যানবাহন, চোরা-শিকারি ইত্যাদি যা-কিছুই নিয়ে লিখেছি তার পেছনেই নিজের জীবনভর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এসব বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্যে কত বিনিদ্র রাত যে কাটিয়েছি, তা আমিই জানি। যাঁরা একটু আধটু লিখতে পারেন তাঁরাও কলম ধরলেই পাতার পর পাতা ভরাতে পারেন সহজেই কিন্তু লেখার পেছনে যদি ভাবনা-চিন্তা পড়াশোনা না থাকে তবে তা পাঠকে সহজেই ধরে ফেলেন। পাঠক, বিশেষ করে আজকালকার পাঠকেরা আমাদের মতন গড়পড়তা লেখকদের চেয়ে অনেকই বেশি জানেন এবং বোঝেন। চালাকি দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা পাওয়া মুশকিল।

'কোয়েলের কাছে', 'পারিধী', 'মাধুকরী', 'সাসানডিরি', 'ইলমোরাণদের দেশে', 'অন্বেষ', 'পঞ্চম প্রবাস', 'একটু উষ্ণতার জন্যে', এবং 'ঋজুদা' কাহিনিগুলি লেখার আগে শুধু সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতাই হয়তো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাতে ভর করেও নিশ্চিন্ত হইনি। পড়াশোনা করতে হয়েছে।

যদিও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে যা বোঝায় তা আমি একটিও লিখিনি। একটি চটি ছোটো বই আছে আমার, "মাণ্ডুর রূপমতী"। ছোটোদেরই জন্যে। তা লেখার আগে নিজেই শুধু একাধিকবার মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার মাণ্ডুতে যাইনি, মাণ্ডুর উপরে পড়াশোনাও করেছি।

'কোয়েলের কাছে' লেখার আগে অন্তত বার ত্রিশেক পালামৌতে গেছি। 'কোজাগর' লেখার আগে পঞ্চাশবার। 'একটু উষ্ণতার জন্যে' লেখার আগে নিজে এক স্কটসম্যানের কটেজ কিনে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে সাত-আট বছর থেকেছি। যদিও উপন্যাসটি লিখব বলে আদৌ সেখানে যাইনি। ওখানে যাবার পরে ওখানকার পটভূমিতে মোহিত হয়ে, মানুষজনকে দেখে, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কম্যুনিটির দুরবস্থা দেখে ওই জায়গাটিকে সাহিত্যে অমর করার জন্যে উপন্যাসে হাত দিয়েছি। 'একটু উষ্ণতার জন্যে' লেখা শেষ হয়ে গেলে বাংলোটি ছেড়ে দিয়েছি। কারণ একজন লেখককে আর কিছু দেবার ছিল না ম্যাকলাস্কিগঞ্জের। 'একটু উষ্ণতার জন্যে' পড়লে ম্যাকলাস্কিকে যেভাবে জানা হয়, তার চেয়ে বেশি জানা কোনো পাঠকের পক্ষেই সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার মনে হয়, একজন লেখকের কখনওই উচিত নয় এক জায়গাতে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসে থাকা। He shall always be a wanderor. He shall never be tied town to one place। সে কারণেই সাত-আট বছর হল শান্তিনিকেতনে বাড়ি করা সত্ত্বেও বার-দুই যাওয়ার পরে আর যাইনি। ঋতু ও মেয়েরা যায়। শান্তিনিকেতন এখন অশান্তিনিকেতন হয়ে গেছে। যাই না যে, তা ভালোই করি। "অববাহিকা" এবং "রিইউনিয়ন" এই দুটি উপন্যাসে অনেকখানি আছে শান্তিনিকেতন।

একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে এলাম পাঠক। ঢাকুরিয়া লেকের পাশের ঘাসে বসে চিনাবাদাম খেতে খেতে কোম্পানিজ অ্যাক্ট (১৯৫৬) মুখস্থ বলছিলাম আমরা প্রথম থেকে শেষ সেকশান। আমরা মানে, আমি, কুমার আর বুদ্ধ।

কুমার আমাকে ভালোবাসত নিশ্চয়ই, আমার একধরনের অ্যাডমায়ররারও ছিল ও। ওর বোন রমা বলত, লালাদা, আপনি নামলেন গাড়ি থেকে, আমি ভেবেছিলাম উত্তমকুমার। একথা অনেকের মুখেই প্রায়ই শুনে অধমকুমারের আনন্দ হতো বইকী। ভারি মিষ্টি ও ভালো মেয়ে ছিল রমা।

কুমারের বাবা ছিলেন সাধক প্রকৃতির মানুষ। কুমারের মা, আমাদের মাসিমাও ছিলেন সাধিকা। চমৎকার মানুষ, সদাহাস্যময়ী।

বুদ্ধ ছিল আমার আরও বড়ো অ্যাডমায়ারার। পাগলের মতো ভালবাসত রবীন্দ্রসঙ্গীত। নিজের গলাতে সুর দেননি বিধাতা সেজন্যে নিজেকে সবসময়ই গালমন্দ করত। পড়াশোনার অছিলাতে দোর

বন্ধ করে তিনজনে বসে থাকতাম আর আমার করুণাময়ী অন্নপূর্ণা মায়ের পাঠানো রাশি রাশি মিষ্টি ও নোন্তা খাবার ধ্বংস করতাম। আর বুদ্ধ বলত, ছাড়ো তো ইনটারমিডিয়েট সি এ। ও আমরা তিনজনে পাশ করেই গেছি! আমরা যে পরীক্ষা দিচ্ছি এই ইনস্টিট্যুটের বাবার ভাগ্যি। গান গাও, গান।

বলেই, একের পর এক অর্ডার করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনত আমার কাছ থেকে।

ক্বচিৎ-কদাচিৎ অর্ঘ্যও আসত। সেদিন তো জমেই যেত।

তখন বসন্তে, দোলের রাতে 'বসন্তোৎসব', বর্ষাতে 'বর্ষামঙ্গল', পুজোর আগে বিশেষ অনুষ্ঠান এসব করতাম। কনীনিকাতে। প্রতি অনুষ্ঠানেই অর্ঘ্য থাকত। তার জন্যে মহড়াও হত। রমা চক্রবর্তী, আমাদের প্রতিবেশী, ভালো গান গাইত। আরও অনেকে গাইত। রমার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক পুলিশের বিয়ে হয়েছিল। তাঁর নাম ভুলে গেছি। তিনি নিশ্চয়ই এতদিনে ইন্সপেকটর জেনারেল হয়ে রিটায়ার করেছেন। পাড়ার সুন্দরী মেয়েকে বেপাড়ার পুলিশে এসে ধরে নিয়ে গেলে কেই বা সেই পুলিশের নাম মনে রাখে!

বলতে ভুলে গেছি, বি কমের ছাত্র থাকাকালীন আমাকে অ্যাকাউন্ট্যান্সিতে তালিম দেবার জন্যে বাবা একজন প্রাইভেট টিউটর রেখেছিলেন। বাবাই রেখেছিলেন না আমারই কোনো বন্ধু, সম্ভবত মানস মুখার্জি, ক্রিকেটার নির্মল চ্যাটার্জির ভাগনে ওঁকে ঠিক করে দিয়েছিলেন, ঠিক মনে পড়ে না আর আজ।

মানস, কিনিয়ার নাইরোবিতে ছিল বহুকাল। সেও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। মরিশাস, সেসেলস হয়ে তানজানিয়া এবং কিনিয়াতে যাওয়া সত্ত্বেও নাইরোবিতে ওর সঙ্গে দেখা করিনি বলে ও আজ পর্যন্ত খাপ্পা হয়ে আছে।

সত্যিই সময় করতে পারিনি।

মানস এখন কলকাতাতে এসে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ফ্ল্যাট কিনে থিতু হয়েছে। তখন মানসরা থাকত প্রিয়া সিনেমার পাশে মোতিলাল নেহরু রোডে। জজ-মেমসাহেব পদ্মা খাস্তগীরের বাড়ির পাশে। আমাদের যুগের যে-কোনো মেয়ে ওর চেহারা দেখামাত্রই প্রেমে পড়ত। কিন্তু ও মুখ খুললে প্রেম আর অতটা ঘন হয়তো থাকত না। ওরকম ইন্টেলিজেন্ট-চেহারার সহপাঠী আমার বেশি ছিল না। আমার গৃহশিক্ষকের নাম ছিল পুষ্পরঞ্জন মুখার্জি। বুদ্ধ ও কুমারের সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে যেমন পড়াশোনার চেয়ে গল্প গান, সাহিত্যালোচনাই বেশি হত, মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গেও তাই। তিনি কেবলই বলতেন, তোমার মতন ইন্টেলিজেন্ট ছেলেকে আর কী পড়াব! ভালোবাসতেন আমাকে খুবই। তারপরে মায়ের-পাঠানো খাবার খেয়ে একবার টয়লেটে গিয়ে অন্যত্র চলে যেতেন।

তাঁর হাইলি-ইন্টেলিজেন্ট ছাত্রের বি কম পরীক্ষার ফল দেখে তিনি জেনুইনলি শক্ড হয়েছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল বেরিয়ে যাওয়ার পরে তো ব্যাকগিয়ারে যাওয়ার উপায় থাকে না! মনঃকষ্টই সার হয়েছিল।

মাস্টারমশায় বর্তমানে আমাদের অফিসের লাগোয়া একটি ঘরেই বসেন। উনি চার্টার্ড সেক্রেটারিশিপ পাশ করে জেস্টেটনার ডুপ্লিকেটিং মেশিন কোম্পানির সেক্রেটারি হন। সেই কোম্পানির একজন বাঙালি ডিরেক্টর এবং তার জার্মান স্ত্রী কনীনিকার উলটোদিকের বাড়ি, কমলা মাসিমাদের বাড়িতে, ভাড়া থাকতেন। সেই সূত্রে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা হত। পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজও হন প্রাইভেট সেকটর ছেড়ে। পরে অনিল সুদের আমলের গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি হন। ওই সময়েই রেজিগনেশন দিয়ে পেশা আরম্ভ করেন।

প্রতিবছরই মার্চের শেষে আমাদের RITUAL ছিল চিলকা হ্রদে পাখি শিকারে যাওয়া। পাখি শিকার সম্বন্ধে যাঁদের কোনো ধারণা নেই, অথবা বাঘ শিকার সম্বন্ধেও নেই, তাঁরাই মনে করেন "ঘোড়া দাবানো" আর কি কঠিন কাজ! কিন্তু সব শিকারেই "ঘোড়া দাবানো" বা "ট্রিগার টানা" ব্যাপারটা least important। বিশেষ করে প্রকৃতিপ্রেমী শিক্ষিত শিকারিদের কাছে। শিকারটা একটা ছুতো, Alibi মাত্র। যে ছুতো না থাকলে, পাহাড়-বনের, বিল-বাদা-নদী-চরের প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়ে

পৌঁছোনোই সম্ভব হত না আমার পক্ষে। আপনাদের বন-গান্ধী, ফুল-গন্ধী, জল-গন্ধী, রক্ত-গন্ধী সব লেখাও উপহার দেওয়া হত না।

কত পরিযায়ী পাখিই যে আসত তখন ওড়িশার চিলকা হ্রদে। শীতে আসত কিন্তু থাকত মার্চ অবধি। আমরা বাঁশের চাটাইলের পালের বড়ো দুটি নৌকো ভাড়া নিয়ে তিনচারদিন থাকতাম ওর মধ্যেই। নৌকোতেই খাওয়াদাওয়া, শোওয়া। রাতে সেই মোটা চাটাইয়ের পালই নুইয়ে দিয়ে আমাদের মাথার উপরে ছাদ হয়ে যেত। হাওয়া থাকলে, জলের ছোটো ছোটো ঢেউয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ উঠত। সেই শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমোতাম। অস্ট্রেলিয়ান এবং সাইবেরিয়ান গিজ আসত। রাজহাঁসেরা। ফ্লেমিংগোর ঝাঁক। একসঙ্গে কয়েকহাজার। জলে কমলারঙা ছায়া নামত। যেমনটি দেখেছিলাম অনেকবছর পরে, তানজানিয়ার গোরোংগোরো (NGORONGORO) আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের গহ্বরের হ্রদে। গোরোংগোরো পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি। অবশ্য মৃত। এরই কাছে ওলডুবাই গর্জ, দ্য গ্রেট রিফট ভ্যালি। যেখানে জার্মান অধ্যাপক প্রফেসর লিকী একদিন একধরনের দুষ্প্রাপ্য প্রজাপতি ধরতে গিয়ে আদিম মানুষের ফসিল আবিষ্কার করেন। সেই সময় অবশ্য তানজানিয়ার জন্ম হয়নি। তখন ওইসব অঞ্চল ছিল, জার্মান ইস্ট-আফ্রিকা। এই অঞ্চলের কথা নিয়ে লিখেছি 'পঞ্চম প্রবাস' এবং 'ঋজুদা সমগ্র'র কিছু কাহিনি।

পাঠক। এক কথা থেকে অন্য কথায় এসে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, উনষাটেই বাহাত্তুরে ধরেছে!

চিলকাতে যতরকম পরিযায়ী হাঁস আসত তেমন অন্য কোথাওই দেখিনি। আমি অবশ্য ভরতপুরে যাইনি আজ অবধিও। যাঁরা এ সম্পর্কে জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন বললে যে, এক এক জাতের হাঁসের আকাশে ওড়ার ধরন—FORMATION– একেকরকম। তাদের ডানা ভেঙে বাঁক নেওয়ার রকমও আলাদা। পৃথিবীর সব সেনাবাহিনী সব বায়ুসেনা এবং ফাইটার বা বম্বার প্লেন এই পাখিদের থেকে অনেকই শিখেছে। পাখিদের পর্যবেক্ষণ করেই রাইট ব্রাদার্স সর্বপ্রথম এরোপ্লেন আবিষ্কার করেন। ডাঙা ছেড়ে ওড়া, দুর্বার গতিতে উড়তে উড়তে কী করে ডানা দিয়ে ব্রেক করে মাটিতে নামে পাখিরা এসব লক্ষ্য না করলে উড়োজাহাজ কখনও আবিষ্কৃতই হত না।

তখন অভিজ্ঞতা ছিল। দূর থেকে আকাশে হাঁসেদের ঝাঁক দেখেই বলতে পারতাম কোন্ ঝাঁক পিঙ্ক-হেডেড পোচার্ডের, বা গার্গনির, বা নাকটার বা শোভেলার বা পিন-টেইলসের বা কটন-টিলের। বা সোনালি বাহমনি ডাকসের। আরও কত প্রজাতি। কতরকমের কার্লু, স্নাইপ, স্নিপেট, স্টর্ক, হেরন।

ছরপরিয়ার বালিতেও, সমুদ্র আর চিলকার মধ্যে বিভাজকের নাম ছিল ছরপরিয়া, শীতের শেষ অবধিও প্রচুর পাখি থাকত। প্রচুর খরগোশ আর কৃষ্ণসার হরিণও ছিল। শিং-এ শিং-এ খটাখটি আওয়াজ তুলে তারা বালি উড়িয়ে খেলা, যুদ্ধ এবং কেলি করে বেড়াত।

এই সব শিকারের প্রসঙ্গে 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারের' দুই খণ্ডে বিস্তৃতভাবে বলেছি বলেই এখানে আর বিস্তার বা পুনরাবৃত্তি করছি না।

প্রথমবারে যেবারে চিলকাতে যাই তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। নোনা জলে চান করে খালি গায়ে সারাদিন থাকাতে রোদে পিঠ-পেটের এক পরত চামড়া উঠে যায়। যখন বালুগাঁ অথবা কালুপাড়াঘাট স্টেশনে উঠি ম্যাড্রাস-হাওড়া মেলে কলকাতা ফেরার জন্যে—মনে আছে, চোখ বুজলেই দেখি, স্বপ্নের মধ্যেও দেখি, ঝাঁকের পর ঝাঁক পরিযায়ী হাঁস শয়ে শয়ে, ঝাঁক ভাঙছে নীল আকাশে, আবার ঝাঁক গড়ছে ঝাঁক-বাঁধা আর ঝাঁক-ছুট হওয়া নীল-সমুদ্রের মাছেদেরই মতো।

আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও সেই অভিজ্ঞতার ঘোর আছে, মায়াঞ্জন, চোখে।

বুদ্ধদেব সমাজদার এখান থেকে সি এ পাশ করার পরে ইংল্যান্ডে গেল আরও পড়তে। ও থাকত কালীঘাটের একটি গলির মধ্যে, মামাবাড়িতে। গলির মধ্যে ছোট্ট বাড়ি ছিল। ছোটো ঘরে, ছোটো টেবলের সামনে বসে পড়ত মেধাবী বুদ্ধ।

জানালা দিয়ে আমি মুখ দেখালেই, আস্তে বলত, লাল্লা!

ওর জিভটা একটু ভারী ছিল। এক বিশেষভাবে উচ্চারণ করত আমার ডাক নামটি।

বন্ধুরা মিলে ওর জামা-কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে-টিনে তো ওকে প্লেনে

তুলে দিয়ে এল। কুমার আমার কাছ থেকেও চাঁদা নিয়েছিল। আমরা সকলেই তখন গরিব, কারও কারও বাবা বড়োলোক হলেও।

আমি কাজের জন্যে এয়ারপোর্টে যেতে পারিনি।

বুদ্ধ চলে যাবার পরে পরেই কুমারও গেল ইংল্যান্ডে। অনেক কিছু পড়তে। কুমার মিত্র দত্ত এখন প্রাইস ওয়াটার হাউসের ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের বড়ো সাহেব।

আমি নিজে অপদার্থ হলে কি হয়, কপালগুণে আমার ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধবারই এখন জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই বড়ো সাহেব এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা এই যে, তারা কিন্তু কী ছেলেবেলাতে, কী পরিণত বয়সে এসে আমি অপদার্থ বলে কখনও আমাকে দূর-ছাই করেনি। বলতে হবে, ঈশ্বর আমার প্রতি পরম দয়ালু।

পাছে দুই বুদ্ধে ঠোকাঠুকি হয়, তাই বুদ্ধ, স্কুলের বন্ধু কুমার যেমন ডাকত লালা বলে, আমাকে লালাই বলত। আমি ওকে ডাকতাম বুদ্ধ বলে। কুমার ইংল্যান্ডে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে বুদ্ধর অ্যাপেন্ডিসাইটিসের অপারেশান করাতে লানডান-এর এক হাসপাতালে ভর্তি হয়। ও অবিবাহিত ছিল তখনও। কী আশ্চর্য কো-ইনসিডেন্স। আমারও ঠিক ওই একদিনেই অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশান হয় কলকাতাতে। হাজরা রোডের নিউল্যান্ড নার্সিং হোমে।

নানারকম অসুবিধে ছিল। প্রধান অসুবিধে ছিল এই যে, অফিসে একঘণ্টা বসলেই তলপেটে ব্যথা করত। পা তুলে বসতে হত।

দীর্ঘদেহী ঢাকাইয়া মানুষ ড. অনিল রায় দেখে টেখে বললেন, "ম্যাকবার্নিস পয়েন্টটা টেন্ডার হইছে। কাটন লাগব।"

বলেই, এমন কাটাই কাটলেন যে, যদি আমি মেয়ে হতাম এবং সে গর্ভে ছেলে থাকত, তবে সেই ফাঁক দিয়ে অনায়াসে সে-ও বেরিয়ে আসত। পরে "অ্যাডিশান" হয়ে যাওয়াতে তখন থেকে আমার টেনিস খেলা এবং রোয়িং করাও বন্ধ হয়ে গেল।

তখনকার দিনে ওইরকমই বেশি করে কাটারই নাকি রেওয়াজ ছিল। আজকাল তো শুনি Button-hole insertion হয়। তখন তো কত কিছুই ছিল না, হলুদ-সবুজ-ওরাং-ওটাং-এর মতন বিচিত্র বীর্যদের জন্যে নানারঙা কনডোম, নানারকম বলবর্ধক বটিকা, ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা। উই হ্যাভ মিসড দ্যা বাস, দ্যাটস অল। তা নিয়ে, দুঃখ করে লাভ নেই কেনো। পরের জন্ম যদি থাকে তবে সেখানে এক্সট্রা-টাইম খেলে নেওয়া যাবে।

আমাদের ডাক্তারকাকা, ড. নৃপেন দাস, কুমিল্লার মানুষ, বলেছিলেন, "তর অ্যাপেন্ডিসাইটিস-ফাইটিস কিসসুই হয় নাই। তবে, তর ইউরিন ব্লাডারে একটা শ্যাডো দ্যাখতাছি। সেটা যে কী, তা বোঝতাছি না।"

সেটা যে কী, তা আমি নিজেও আজ অবধি বুঝিনি। তবে আমার এক পাড়াতুতো মেসোমশাই ইউরিন-ব্লাডারে ক্যানসার হয়ে কিছুদিন আগে চলে যাবার পরে মাঝে মাঝেই প্রচুর ঘাম দিয়ে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। সেই ছায়াটা কবে কি কেলো করে, কে জানে! ছায়াদের উপরে কোন্ ভরসা! আমাদের ডোভার রোডের প্রতিবেশিনী ছায়াই যদি অত বড়ো লেঙ্গিটা মারতে পেরে থাকে আমাকে, তাহলে ইউরিন-ব্লাডারের ছায়াকে বিশ্বাস কী?

আমার অপারেশান ভালোমতো হয়ে যাবার পরদিন খবর পাই যে, বুদ্ধ লানডানের হাসপাতালের অপারেটিং-টেবলেই মারা গেছে হার্ট-ফেইল করে। অথচ এরকম একটা তুচ্ছ অপারেশন। এবং লানডান-এর মতো জায়গাতে!

ভারি মন খারাপ হয়েছিল বুদ্ধের মৃত্যুসংবাদে!

অ্যাপেন্ডিসাইসটিস অপারেশানের এবং ওই নার্সিং হোমের পটভূমিতে 'জলছবি' নামের একটি ছোট্ট মধুর-বিধুর উপন্যাস লিখি আমি আনন্দবাজারের কোনও বার্ষিক সংখ্যাতে যাটের দশকের শেষাশেষি। ওই "জলছবি" এবং আলমোড়ার পটভূমিতে লেখা "অনুমতির জন্যে" একসঙ্গে বই হয়ে বেরোয়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ তার প্রকাশক।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলতেন, "Nothing is wasted in a writers' life." কেউ চুমুই খাক অথবা খেতে আপত্তি জানাক, কেউ লাথিই মারুক পশ্চাদ্দেশে, অথবা শেষ মুহূর্তে পা-সংবরণ করে নিক অথবা কোনো ডাক্তার পেটই কাটুন লেখকের অথবা অন্য কিছু, লেখক যিনি, তিনি ঠিকই প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই কল্পনার মিশেল দিয়ে সাহিত্যে উপস্থাপিত করতে পারেন। পাঠকদের বোঝবার জো-টি থাকবে না যে, যা লেখা হল তা কল্পনা, ওয়ান পারসেন্ট রিয়্যালিটি অ্যান্ড নাইন্টি-নাইন পার্সেন্ট কল্পনা।

শুধু রিয়্যালিটি-নির্ভর যে লেখা, তা জার্নালিজম, সাহিত্য কখনওই নয়। সেইসব লেখকও জার্নালিস্টই, সাহিত্যিক নন। তা বলে, জার্নালিজম যে সাহিত্যের চেয়ে কোনো অংশে খাটো একথা বলছি না, বলছি যে, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

বুদ্ধর প্রসঙ্গ মনে এলেই "ফুক-লিঞ্চ ইনস্টিট্যুটের" কথা মনে আসে। লানডানে কি অন্যত্র তা বলতে পারব না পঞ্চাশের দশকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সির ছাত্রদের কাছে ওই ইনস্টিট্যুটের স্টাডি-মেটেরিয়াল খুবই কাজে লাগত। সমস্ত কমোন-ওয়েলথের অবলা, চোখ-বাঁধা সি এ পরীক্ষার্থীরা ওই ইনস্টিট্যুটের শরণাপন্ন হয়ে পরীক্ষা সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করত। তাঁরা ডাকেই পাঠাতেন স্টাডি-মেটেরিয়াল, না বুদ্ধ অন্য কেনোভাবে জোগাড় করত তা আজ আর মনে নেই। মনে রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে ওঠা অতীব গর্বের ব্যাপার হতে পারে হয়ত কিন্তু এই ধরাধামে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া ছাড়াও অনেকই মহৎ কর্ম যে করা যেতে পারে বিকল্প হিসেবে, সে কথাও তখনকার দিনের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সির অসহায় ছাত্র মাত্র এবং অবশ্যই তাঁদের অভিভাবকদেরও মনে রাখা উচিত ছিল।

গুরুহীন গোরুপ্রায় তৎকালীন সি এ পরীক্ষার্থীদের অসহায়তার সঙ্গে একটি ঘটনার তুলনা করতে ইচ্ছে করছে। প্রায় তিনযুগ আগে সাহিত্যিক সমরেশদা (সমরেশ বসু) একবার পুরীতে গেছেন বেড়াতে। তখন বাংলা সাহিত্য জগতের সবচেয়ে গ্ল্যামারাস মানুষ। তখনও শিক্ষিত বাঙালিরা এমন ইংরেজি-প্রাণ হয়ে ইংলিশ-গত প্রাণ হননি। বাঙালিত্ব তখনও ছিল। তাঁকে বম্বের প্রডিউসার তখন গাড়ি দিচ্ছে ছবির স্ক্রিপট লেখার জন্যে। তাঁর সব উপন্যাসেরই খুব বিক্রি। ছবির পর ছবি হচ্ছে। অবশ্য টিভি তখন ছিল না। মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন উনি। সমরেশদার সদাহাস্যময় ব্যক্তিত্বের মধ্যেও এক বিশেষ মাধুর্য ছিল। ওঁর হাসিমুখে মিষ্টি করে নিচু স্বরে কথা বলার ঢংটিও ছিল অননুকরণীয়। অত্যন্তই মনোরম এবং PLEASANT ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব।

সেই সমরেশদা একবার পুরী গেছেন. সম্ভবত কোনো ছবিরই কাজে। উঠেছেন তৎকালীন পুরীর সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের হোটেলে। তখনও মুখেমুখে বি এন আব নামটি চালু ছিল। বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ে। ইংরেজদের আমলে বিভিন্ন কোম্পানির আওতাতে, প্রাইভেট সেক্টরেই ছিল ভারতের সব এলাকার রেলপথ, গাড়ি, স্টেশন। তখনকার রেলগাড়ি, স্টেশন, রেলের কর্মচারী, এমনকী ক্যাটারারদের ঝকঝক তকতক চেহারা, নম্র ব্যবহার, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং যাত্রী ও মালের প্রতি প্রখর ও দায়িত্ববান নজরের কথা যাঁদের মনে আছে তাঁরা নিশ্চয়ই আজকের কর্তৃপক্ষের পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক এবং যান্ত্রিক মনোভাবের কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। আজকের অবস্থার জন্যে রেলকর্তৃপক্ষকে আদৌ দোষী করা যায় না। আসল দোষ জনসংখ্যার। আমরা নিজেরা শুয়োর অথবা গিনিপিগের মতন বংশবৃদ্ধি করে এবং সেই বংশবৃদ্ধি রোধ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও না করে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই নিশ্চিত করেছি। এত মানুষের সেবা করতে হলে, সেবার মানে তারতম্য হতে বাধ্য।

সমরেশদার পাশের ঘরে ছিলেন অভিনেত্রী রুমা গুহঠাকুরতা এবং তাঁর আর্টিস্ট, গায়ক এবং চলচ্চিত্রকার স্বামী অরূপ গুহঠাকুরতা। আরও অনেকেই ছিলেন। সমুদ্রে এলেও সমরেশদা সুইমিং-কস্টুম নিয়ে আসেননি। মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে তখনও ওই সব বিজাতীয় ব্যাপার আজকের মতো প্রাধান্য পায়নি। অনেকেই শক্ত করে মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে সমুদ্রে নামতেন দেখেছি! ধুতি-পরিহিত মল্লবীরের সঙ্গে সামুদ্রিক ঢেউ-এর অসম কুস্তি হত। অনেকে কস্টুমের অভাবে

আন্ডারওয়্যারের উপরে গামছা জড়িয়ে (অশালীন স্বচ্ছতার হাত থেকে বাঁচতে) স্নানপর্ব সাঙ্গ করতেন। কিন্তু অভিনেত্রী-টেত্রীদের সামনে ওই প্রক্রিয়ায় চান করা তো যায় না। তাছাড়া সমরেশদা নিজেও বিখ্যাত মানুষ। নিজেও অন্য জগতের তারকা।

কিংকর্তব্যম?

অরূপদার কাছ থেকে একটি পাজামা ধার চাইলেন।

অরূপদা একটু মোটা কাপড়ের পাজামা পরতেন। অরূপদা খুব একটা না হলেও মোটামুটি লম্বাই। কিন্তু সমরেশদাকে বেঁটেই বলা চলত। অথবা রেখেঢেকে বললে, বলতে হতো গড়পড়তা বাঙালির উচ্চতা ছিল তাঁর। পাজামাটি পরে, ভালো করে গুটিয়ে-গাটিয়ে নিয়ে উপরে তুলে, প্রায় স্যুইমিং ট্র্যাঙ্ক করে ফেলে, নুলিয়ার হাত ধরে সমরেশদা যখন পুরীর সমুদ্রের দৈত্য-দানোর মতন নীলবর্ণ অবিরত ঢেউদের সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন তখন সেই অ্যান্টি-বেঙ্গলি ঢেউয়েরা তাঁকে রদ্দার পর রদ্দা মেরে বালিতে আছড়ে ফেলতে লাগল।

ওরা কী করে জানবে যে উনিই সমরেশ বসু!

বাংলা বই পড়তে পারলে তো!

এই পর্যন্ত গল্পটা কোনো গল্পই নয়। এমন ব্যবহার পুরীর সমুদ্রের ঢেউয়েরা প্রথম প্রথম সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক সকলের সঙ্গেই করে থাকে। তারপর যখন ঢেউয়ের মাথাতে লাফিয়ে-ওঠা অথবা কাছেই ভেঙে-পড়া পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের সামনে ডুব দেওয়ার কায়দাটা ভালোমতো রপ্ত হয়ে যায় তখন আর ঢেউকে ভয় না পেয়ে তাকে শাসন করা যায় সহজেই। কিন্তু সেই পর্বটি পেরিয়ে দুঃশাসন ঢেউদের শাসিত করার পর্যায়ে এসে পৌঁছোবার আগেই সমরেশদার (থুড়ি! অরূপদার) গোটানো-পাজামা ধাপে ধাপে খুলতে খুলতে হঠাৎ পুরোটা খুলে গিয়ে, কোমর থেকে নয়, পায়ের দিকে, লম্বাতে লম্বা দিয়ে লম্বকর্ণ হল। তাঁর নিজের পাজামা হলে অমন দুর্ঘটনা ঘটত না।

সমরেশদা সাধারণত ধুতিই পরতেন। অরূপদার পাজামা সমরেশদার কোমর থেকে গোড়ালির দৈর্ঘ্যর চেয়ে অনেকই বেশি দৈর্ঘ্যের ছিল। ফলে, সেই সাহিত্য-বেরসিক পাজামা সমরেশদার পায়ের পাতার নীচে জল এবং বালি সমাহারে আটকে গিয়ে নিরুপায়, সাহিত্যিককে একেবারে অসহায় করে দেওয়াতে ঢেউয়ের দৈত্য-দানোরা তাঁকে ধপাধ্বপ করে "পটকান"-এর পর "পটকান" দিতে লাগল বালির উপরে। ভীষম-সদৃশ সাড়ে ছ'ফিট ঘোর-কৃষ্ণবর্ণের নুলিয়া তাঁর এই অস্বাভাবিক এবং আকস্মিক বিপদ থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারল না। অতএব নাক ছড়ল, কনুই ছড়ল, হাঁটু ছড়ল, পশ্চাৎদেশ ছড়ে গেল, সর্বাঙ্গে বিষ-ব্যথা কামড়াল। তদুপরি সন্ধে থেকেই বেদম সর্দিও ঝামড়াল।

আমাদের সময়কার সি. এ পরীক্ষার্থীদের কথা মনে হলেই সমুদ্রপারের সমরেশদার অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়। ধাঁই-ধপাধ্বপ করে পটকান-এর পর পটকান খাওয়া ছাড়া তাদের মধ্যে অধিকাংশরই কোনো উপায় ছিল না।

তবু কুমার এবং বুদ্ধর সৎসঙ্গে আমার পড়াশোনা ভালোই এগোতে লাগল এবং প্রতিটি বিষয়ই আমাদের কবজাতে এসে গেল পুরোপুরি। বুদ্ধর রাত জেগে পড়ার বাতিক ছিল। রসিক বুদ্ধ বলত, রাতই হল সাধনার সময়, বুঝেছ লালা। বিদ্যাভ্যাস বলো, গর্ভাধান বলো, সিঁদকাটা বলো সবকিছুরই রাতই হল প্রশস্ত সময়।

ও জানত না যে, স্টেশন-মাস্টারদের স্ত্রীদের গর্ভাধান দুপুরবেলাতে হয়। রাতে ট্রেনকে বাতি দেখাতে হয় যে!

আমি আবার কোনোদিনই রাত জাগতে পারতাম না। শিকারে গিয়ে জাগতে হত। কিন্তু জাগলে, পরদিন অন্তত ঘণ্টা চারেক ঘুমোতে হতই। চিরদিনই তাড়াতাড়ি শুয়ে তাড়াতাড়ি ওঠার অভ্যাস ছিল। রাতে তখন কম করে আটঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন ছিল আমার। এখন অবশ্য চারঘণ্টাতেই কাজ চালাতে হয়। তাছাড়া বয়স বাড়লে, ঘুম হয়তো কমেও যায়। নিজে না চাইলেও বুদ্ধর পাল্লাতে পরে মাঝে মাঝেই রাত-জাগতে হত। রাত-জাগা রাতে বুদ্ধ আমার ঘরেই থেকে যেত। কিন্তু বুদ্ধ যাই বলুক, রাত জেগে যা পড়তাম, তার কিছুই আমার মনে থাকত না।

দুর্গাকাকু বলতেন, সবসময় মনে রাখবে, "মধ্যরাতের আগের একঘণ্টা ঘুম, রাত বারোটার পরে দুঘণ্টার ঘুমের সমান।" কথাটা মেনে চলার চেষ্টা করতাম। কারণ কথাটা হয়তো সত্যিই। তবে আজকাল জেট-এজে এবং কাজের রকম-সকম বদলে যাওয়াতে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের ঘুমের কোনো বিশেষ সময় আর নেই। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে যে-কোনো সময়ে ঘণ্টা চারেক ঘুমিয়ে নিয়েই কাজ চালাতে হয়। তাছাড়াও জীবনেরও বেলা তো ফুরিয়েই এল। কত বন্ধুবান্ধব চলে গেল আমাকে ছেড়ে একে একে। এখনতো আরওই "সময় নেই, সময় নষ্ট করবার"। কত কিছু কাজ বাকি আছে অথচ AUTUMN SOLISTICE শেষ হল না। 'করো ত্বরা, করো ত্বরা কাজ আছে মাঠ ভরা/দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে।"

'দক্ষিণী' ছেড়ে দিলেও যোগাযোগ পুরোই ছিল। নাট্যবিভাগের সঙ্গে, সংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে। বছরে একবার দক্ষিণীর স্টিমার পার্টি অথবা পিকনিক হতই। অতি-অবশ্যই যেতাম। তখন ঋতু ছাড়াও তার সিনিয়র এবং জুনিয়র, অনেকেই গাইয়ে ছিলেন দক্ষিণীতে। যেমন কৃষ্ণা সেন, হেনা সেন, স্নিগ্ধা বসু, ইলা সেন (তখন সিনহা ছিলেন!), পূর্বা দাম, মঞ্জরী লাল, অদিতি সেনগুপ্ত, সুহৃতা সেন, সাদা পাতিহাঁসের মতো ফর্সা বাণী ঠাকুর, রুপু বড়াল এবং আরও অনেকেই। স্টিমার পার্টিতে এবং পিকনিকে কোরাস এবং সোলো গান হত। আমাদের ইন্টারমিডিয়েট সি. এ. পরীক্ষার আগে দক্ষিণীর পিকনিক হল বি টি রোডে বাণীদেরই কোনো আত্মীয় অন্য কোনো ঠাকুরদের মস্ত বাগানবাড়িতে। সভ্য এবং অসভ্যরা ইচ্ছে করলে গাঁটের কড়ি গুনলেই অতিথি নিয়ে যেতে পারতেন। বুদ্ধ বলল, 'আম্মো' যাব। ততদিনে বুদ্ধ ও কুমার দুজনেই একজন গায়িকার গান শুনেই তার প্রতি যে আমার দুর্বলতা জন্মেছে একটু তা জেনে গেছে। আমার দুর্বলতা অবশ্যই জন্মেছে। কিন্তু বাছুরের প্রেম! অন্য বাছুরের মন তো তখনও জানা যায়নি। আমাদের সময়ে প্রেম ওরকমই ছিল। তাই হয়তো তাতে মাধুর্যও ছিল; প্রেম, বিয়ে, এসব ব্যাপারের সঙ্গে একটা কমিটমেন্ট জড়িয়ে ছিল। সবসময়ই ভাবতাম, আমি অন্তত ভাবতাম যে, আমার কারণে অন্য কারো ক্ষতি যেন না হয়। আমরা অনেকেই বিবেকবান ছিলাম।

অন্য পক্ষের মন জানবই বা কী করে? কোনোদিন তো কথাও বলিনি। তাছাড়া আমাকে দেখলেই তো তার ভুরু কুঁচকে যায়, রাগি-রাগি ভাব ফোটে মনে। পিকনিকে গিয়ে সারাটা দিন সেই মস্ত বাগানবাড়িতে কাটিয়ে এই সব ব্যাপারে "হেভি ফান্ডা" সম্পন্ন বুদ্ধদেব সমাজদার "CASE" টা CAREFULLY STUDY করে পিকনিকের পরে বাড়ি ফিরে বলল, তুমি একটি ইডিয়ট।

বললাম, হয়তো। নইলে, বাবা হোঁদল বলে ডাকবেনই বা কেন?

বুদ্ধ বলল, তোমার আর কতটুকু ছটফটানি। তার তো দেখলাম, হয়ে গেছে!

কি হয়ে গেছে?

কম্মো ফতে।

মানে?

মানে, গরমের দিনে ধুলোর মধ্যে ঝটপট-করা তৃষ্ণায় কাতর চড়াই পাখি দেখেছ কখনও?

দেখেছি। শুধু চড়াই-ই বা কেন! গরমের দিনে জঙ্গলে তিতির-বটেরও দেখেছি।

এই তোমার দোষ! আমি কি ছা-ই জঙ্গল-মঙ্গলে গেছি তোমার মতন? না, যাব কখনও? শহরে যা দেখেছি তাই বলছি। দু-কান খুলে শোনো যা বলছি।

আহা! বলোই না!

অধৈর্য হয়ে আমি বললাম।

বুদ্ধ বলল, সে পার্টির CASE হান্ড্রেড পার্সেন্ট RIPE হয়ে গেছে। যা করার তাড়াতাড়ি করো। দেরি করলে, রসে টইটম্বুর আম বোঁটা ছিঁড়ে ভুঁয়ে পড়বে। তারপর কোন্ কুকুরে-মেকুরে খাবে তা কে বলতে পারে!

কী করব?

বুদ্ধ বলল, টুসকি মারো।

টুসকি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, টুসকি।

কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝতে হবে না। এ শিকার তোমার জন্যে নয়। তুমি বন্দুক বাগিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে কচুবনে বুনো শুয়োরের পেছন পেছনই ঘোরো। যার যেরকম ভাগ্যলিপি। তুমি একটা ওয়ার্থলেস।

বুদ্ধ ঠিকই বলেছিল। আমি যে একটা ওয়ার্থলেস তা আমার মতো প্রতি মুহূর্তে এমন করে আর কেউই বোঝেনি জীবনের সব ক্ষেত্রেই। নিজের আদৌ অন্য কোনো গুণ আছে এমন দাবি করতে পারি না, শুধু এইটুকু ছাড়া যে, আমার সমস্ত দোষ সম্বন্ধেই আমি পুরোপুরি অবহিত। এইটুকুই আমার একমাত্র গুণ।

ইন্টরমিডিয়েট সি এ পরীক্ষার আগে আগে জর্জদার ক্লাসে প্রতি রবিবার রবিবার যাওয়াটাও ছেড়ে দিতে হল। গানের ক্লাসে সপ্তাহে একবার করে গেলেই তো হল না। গানের চর্চাও তো করা দরকার বাড়িতে। ঘরের মধ্যের সাধনাটাই আসল। আজকাল প্রত্যেকেই মঞ্চে গান করেন, প্রত্যেকেরেই ক্যাসেট বেরোয়। এই প্রেক্ষিতে আমাদের সময়কার কথা ভাবি।

আজকাল অনেক শিশুর মা-বাবাকেও দেখি তাঁদের ছেলেমেয়েদের একই সঙ্গে সরোদ বা সেতার শেখাচ্ছেন (আমজাদ আলি খাঁর রোজগার কি!), গান শেখাচ্ছেন (রশিদ খাঁ করবেন), পড়াশোনোতে পণ্ডিত, অর্থাৎ ফল ভালো করতে পারা এবং পরবর্তী জীবনে ভালো চাকরি বা পেশাদার হবার যোগ্যতা অর্জন, টেনিস বা ক্রিকেট খেলা (তেণ্ডুলকরের কী রোজগার! লিয়েন্ডার পেজ এর?), ডিবেটিং-করা সবই একসঙ্গে চালু রেখেছেন এবং তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎই মা-বাবার একমাত্র ধ্যান-ধারণা। দেখে বিস্মিত হই। অবাক হয়ে ভাবি এই সব ক্ষণজন্মা শিশুদের তুলনাতে আমরা আজও কত নিষ্প্রভ ছিলাম আর আমাদের বাবা-মায়েরা কী অ্যাম্বিশানলেস।

এই সব শিশুরা যখন পূর্ণ যবুক হবে এবং তারা কি হবে তা দেখে যাওয়ার সময় আমার হাতে নেই। তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশই যেনতেনপ্রকারেণ সচ্ছল হবে, চুরি করে হোক, টি এ বিল ইনফ্লেট করে হোক, ঘুষ খেয়ে হোক, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এখন বিদ্যার্জন তো বটেই, খেলাধুলো, গানবাজনা এসবও অর্থকরী হয়ে উঠেছে। টাকাই এখন মানবধর্ম-সারাৎসার। সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর শান্তির সৎ জীবন, সহজ অনাড়ম্বর আনন্দর জীবন এদের মধ্যে খুব কমেরই কাম্য হবে। হবে না যে, তার জন্যে এদের মা-বাবারাই সম্পূর্ণত দায়ী। ভালো থাকা, ভালো খাওয়া, ভাল গাড়ি চড়াই যাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে গেছে, বিবেকহীন, কর্তব্যজ্ঞানহীন, কৃতজ্ঞতাবোধহীন, সাহিত্য-সঙ্গীত-ভালোবাসাহীন, হায় টাকা! হায় টাকা! এ প্রজন্মের সন্তানদের এর চেয়ে অন্যরকম হবার কোনোই কথা নেই।

এদের মধ্যে যদি কেউ কেউ অন্যরকম হয়ে ওঠেও, এই সর্বনাশা স্রোতের বিরুদ্ধে একা হাতে সাঁতার কেটে, তাদের জন্যে রইল আমার অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। তারা যেন টাকা রোজগারের মেশিন না হয়ে মানুষ হয়ে ওঠে। সত্যিকারের মানুষ।

আধুনিক বাবা-মায়েদের অপ্রতিরোধ্য সন্তান-পালনের প্রকৃতি এবং সন্তানদের "মানুষ" করে তোলার জন্যে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ছটফটানি দেখে মীর সাহেবের সেই শায়েরটির কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। সেন্ট-জেভিয়ার্স কলেজে আমার সহপাঠী ভিনোদ ঝাঁ যে শায়ের প্রায়ই আবৃত্তি করত।

"হিয়া সুরত এ আদম বহত হ্যায়, আদম নেহি হ্যায়।"

মানে, মানুষের চেহারার জানোয়ারে ভরে গেছে এ পৃথিবী। মানুষ নেই।

পড়াশুনো যেমন চলছে অফিসও চলছে। তবে অডিটিংয়ের কাজই দেখি, ইনকামট্যাক্সে আদৌ যাই না। যাওয়ার যোগ্যতাও নেই। বি কম হিসেবে অবশ্য তখন যাওয়া যেত কিন্তু সি এ হওয়ার আগে যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি কোনো। ফার্মের অথরাইজেশানেও কেবল পার্টনারদের নামই থাকে। সি এ না হলে তো পার্টনার হতে পারি না!

অডিটিঙের পোস্টিং কাস্টিং চেকিং খুব একঘেয়ে কিন্তু চোখ খুলে কাজ করলে তারই মধ্যে কত যে শেখার জানার মজার জিনিস খুঁজে পাওয়া যায় তা বলার নয়। কত নতুন নতুন জায়গার নাম শেখা যায়, মক্কেলের অ্যাকাউন্ট্যান্টদের জিজ্ঞেস করে কত কিছু জানা যায়।

তবে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগত জার্নাল চেকিং। অ্যাকাউন্ট্যান্সির আসল মারপ্যাঁচ থাকত জার্নালে—ট্রান্সফার এন্ট্রিজে।

তখন বাঙালি ব্যবসায়ীদের বাঙালি অ্যাকাউন্ট্যান্ট থাকত, মাড়োয়ারিদের মাড়োয়ারি, গুজরাতিদের গুজরাতি। এবং তাঁদের হাতের লেখা এমনই personalised হত যে দ্বিতীয় কারো পক্ষে তা পড়াই সম্ভব হত না। ইংরেজি খাতা রাখা হত পয়লা এপ্রিল থেকে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত। বাংলা খাতা সাধারণত পয়লা বৈশাখ থেকে তিরিশে-একত্রিশে চৈত্র অবধি। অনেকে আবার অক্ষয়তৃতীয়ার দিনও খাতা আরম্ভ করতেন। আবার অনেকে করতেন রথযাত্রার দিন থেকে। মাড়োয়ারীরা এবং গুজরাতিরা সাধারণত দেওয়ালির দিন খাতা শুরু করতেন। তবে মাড়োয়ারি ও গুজরাতি দেওয়ালির তারিখ আলাদা হত, সালও আলাদা। শক আবার শুরু হত সাধারণত মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে। সম্বত—পয়লা চৈত্র, সুদিও শুরু হত মার্চের বিশ-একুশ তারিখ নাগাদ। গুজরাতি সম্বত অর্থাৎ পয়লা কার্তিক শুরু হত নভেম্বরের এগারো-বারো তারিখ নাগাদ কার্তিক শুক্লা। ফসলি আশ্বিন (কুঁয়ার) শুরু হত সেপ্টেম্বরের শেষে। অনেকে আবার খাতা শুরু করতেন শ্রীপঞ্চমীর দিন। অনেকে রামনবমীর দিন। এসব ছিল বিভিন্ন ব্যবসায়ীর "অ্যাকাউন্টিং ইয়ার"। 'অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার' একই বছরের জন্যে, খাতা শেষ হওয়ার তারিখ হিসেবে আগে পরে হতে পারত। আয়কর আইনে 'PREVIOUS YEAR' এর ডেফিনিশান ছিল, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সের সার্কুলারও থাকত নানা জিনিস ব্যাখ্যা করে। তবে এই সব বিভিন্নতার ফয়সালা হয়ে গেছে বেশ কয়েক বছর আগে দেশের সমস্ত ব্যবসার খাতা ইংরেজি মতানুসারে নির্ধারিত করে। খাতা যে যার খুশি রাখলেও রাখতে পারেন কিন্তু আয়কর এবং কোম্পানি আইন এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ পয়লা এপ্রিল থেকে একত্রিশে জানুয়ারিকেই প্রিভিয়াস ইয়ার বলে গণ্য করবেন। এই কারণে অনেক লিমিটেড কোম্পানিতে দুটি ব্যালান্স শিট বানাতে হয় এখন।

ভাউচিং-ও খুব ইন্টারেস্টিং লাগত। যে-কোনো ছোটো প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ ভাউচার এবং জার্নাল ভাউচার চেক করতে গিয়ে মালিক, অংশীদার এবং ডিরেক্টরদের নানা ব্যক্তিগত বিষয়ে জানা যেত। কে কোন ক্লাবের মেম্বার, কার রেসের ঘোড়া আছে, কে রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত, কে ভারত সেবাশ্রমের, কে বিলিতি হুইস্কি ছাড়া খান না, কার বগলামুখী কবচের উপরে গভীর বিশ্বাস, কে কিপটে বা কে উদার, এই সব তথ্য পরিষ্কার হত। অদেখা মালিক, অংশীদার অথবা ডিরেক্টরদের চেহারা-চরিত্র যেন খাতা এবং ভাউচার থেকে উঠে আসত আমার মনে। এও যেন একধরনের জ্যোতিষশাস্ত্র, মনে হত আমার।

পরে যখন কখনও তাঁদের সঙ্গে দেখা হত তখন মিলিয়ে নিতাম আমার অনুমান কতখানি ঠিক আর কতখানি বেঠিক।

খাতার পোস্টিং-কাস্টিং, ভাউচিং, জার্নাল-এন্ট্রিজ সব চেক করে ট্রায়াল-ব্যালান্স তুলতে হত। বাংলায় বলে, রেওয়া বা রেওয়া-মিল। রেওয়া মিল করে খাতা অডিট ফার্মে অডিটের জন্যে দেওয়া বা অডিটরদের অডিট করতে ডাকাই পুঁথিগতভাবে উচিত কিন্তু প্রায় সব জায়গাতেই অডিট ফার্মের ছেলেদেরই রেওয়া-মিল করে, ট্রেডিং বা ম্যানুফাকচারিং অ্যাকাউন্ট তারপর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট এবং ব্যালান্স শিট্ ড্র-আপ করতে হত।

রেওয়া তুলে হয়তো দেখা গেল প্রচুর তফাত। অ্যাকাউন্টিং পারল্যান্সে তাকে বলা হত "ডিফারেন্স ইন ট্রায়াল বালান্স।" বাংলা খাতা, একলাখ পাঁচ হাজার টাকার ডিফারেন্স। মুহুরিবাবুরা সকলেই ধুতি পরতেন। কেউ পাঞ্জাবি, কেউ শার্ট। প্রায় প্রত্যেকেরই নেশা ছিল। একটা না একটা নেশা না থাকলে অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করা যায় না এমন একটা বিশ্বাস ছিল সকলেরই। অনেকেই নস্যি নিতেন, পানও খেতেন দোক্তা দিয়ে, কেউ কেউ সিগারেট বা বিড়ি খেতেন। ডিফারেন্সের কথা শুনে মুহুরিবাবুরা ছেলেমানুষ আমাদের ধমক দিয়ে বলতেন, দাঁড়ান। দাঁড়ান। মেলা ফরফর করবেন না। ব'লেই দু নাকের ফুটোতে গাদা বন্দুকের নলে বারুদ ঠাসার মতো করে নস্যি গেদে নিয়ে পকেট থেকে নস্যি আর নাকের ঘন জলে খয়েরি হয়ে যাওয়া রুমাল অথবা গিন্নির ছেঁড়া শাড়ির অংশ বের করে ভালো করে নাক ঝাড়তেন। নস্যির গুঁড়ো উঠে এসে পড়ত আমাদের নাকে চোখে। আপত্তি করলে বলতেন, রসুন! রসুন!

তারপরেই আশ্চর্য কাণ্ড! নিকেলের ফ্রেমের চশমাটি নাকের ডগাতে বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে ঠেলে তুলে হাতে পেনসিল নিয়ে দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পেনসিল দিয়ে রেওয়াতে কিছু রদ্‌বদল করে দ্রুত তর্জনী বুলিয়ে তা রি-চেক করে রেওয়ার কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে বলতেন, নিন যোগেন চক্কোত্তির লেখা খাতাতে রেওয়া মেলে না!

জম্মে শুনিনি এমন কতা!

সত্যি সত্যি মিলিয়ে দিতেন।

এই রকম কত অ্যাকাউন্ট্যান্ট দেখেছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলে, অধিকাংশ বাঙালি ব্যবসায়ীরাই ব্যবসায়ী ছিলেন না। ব্যবসা একটা দীর্ঘমেয়াদি সাধনা। এবং সততার সঙ্গেই সেই সাধনা করতে হয়। যাঁদের ধারণা যে, ব্যবসায়ীমাত্রেই অসৎ তাঁরা ব্যবসা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। চালাকির দ্বারা যেমন সাহিত্য হয় না, চালাকির দ্বারা ব্যবসাও হয় না।

অধিকাংশ বাঙালি ব্যবসায়ীরাই তাঁদের মুহুরিদের অত্যন্ত কম মাইনে দিতেন। অনেক সময়ে আবার খাতা পুরোপুরি বানানো খাতা হত। তখন ব্যাংকিং এমন উন্নত ছিল না। অধিকাংশ লেনদেনই হত ক্যাশে। ব্যবসার মনে ব্যবসা চলত, খাতার মনে খাতা। কিছু কিছু অসৎ ব্যবসায়ী এই কল্পিত খাতা রেখে ট্যাক্স ফাঁকি দিতেন। অডিটিংও একটি প্রহসন। কারণ খাতা যদি ভাল করে লেখা হয় এবং তার স্বপক্ষে যদি সব নথিপত্র, ভাউচার মজুদ থাকে তবে অডিটরের পক্ষে সেই খাতার সঙ্গে সেই সব নথি মিলিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। তবে যেখানে বুঝতে পারতাম যে, খাতা গণ্ডগোলের সেখানে অডিট সার্টিফিকেট না দিয়ে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টসরা পরামর্শ দিতেন যে প্রিপারেশন বা কম্পাইলেশনের সার্টিফিকেট দিতে। যাতে, অডিটর ফার্মের গায়ে আঁচ না লাগে মক্কেল গাড্ডাতে পড়লেও।

এমনি অডিট তো প্রহসন ছিলই কিছুটা। আজকালকার গভর্নমেন্ট-অডিটও তাই। এই স্বাধীন ভারতের মতো প্রতিক্ষেত্রে এমন প্রহসন পৃথিবীর আর কোনো সভ্য দেশে হয়েছে বলে মনে হয় না। Apparent is not real. যত বড়ো কোম্পানি তার অ্যাকাউন্টসে সচরাচর তত বড়ো window dressing.

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত বলেছিলেন না, "আইন! সে ত তামাশা মাত্র। কেবল বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে"।

একথা আজও সত্যি।

প্রসঙ্গ থেকে সরে এলাম আবারও।

অধিকাংশ বাঙালি ব্যবসায়ীরাই তাঁদের মুহুরিদের মাইনে দিতেন না এবং মুহুরিদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁদের বড়ো পরিবার নিয়ে ল্যাজে-গোবরে হয়ে থাকতেন। অথচ তাঁদেরই দিয়ে সব কারচুপি করাতেন মালিকেরা। যে সব মালিকেরা কারচুপি করতেন, অতঃপর তাঁরাই আবার সেই সব মুহুরিদের মেয়ের বিয়ের সময়ে মুহুরিরা পরম বিনয়ের সঙ্গে করজোড়ে টাকা চাইলে সামান্য টাকা ঠেকিয়ে দিয়ে, অপমানকর ভাবে বলতেন : "এতটাকা একসঙ্গে দেখেছেন মশায় কখনও এ-জীবনে?"

তারপরও যদি সেই মুহুরিদের মধ্যে কেউ পোস্টকার্ড লিখে আয়কর বিভাগে মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন, গোপন কথা ফাঁস করে দিতেন, তাহলেও তাঁদের দোষ দিতে আমি অন্তত পারতাম না।

এই মুহুরিদের প্রতি আমার এক বিশেষ দরদ ছিল। তাই হয়তো একাধিক ছোটো গল্প লিখেছি মুহুরি-টাইপিস্টদের নিয়ে পরবর্তী জীবনে। তার মধ্যে 'নবীন মুহুরি', 'বিড়াল', 'জগন্নাথ' ইত্যাদি হয়তো উল্লেখযোগ্য।

কেন জানি না, অনেক মালিককেই ভুলে গেছি কিন্তু আমাদের একজন মক্কেলের অ্যাকাউন্ট্যান্টকেও ভুলিনি। তাঁদের কাছেও অনেক শিখেওছি। শিখেছি যে, নিজের কাজ, সে যে কাজই হোক না কেন, ভালো করে করার মধ্যে যে গর্ব, যে গুমোর প্রচ্ছন্ন থাকে তাকে প্রকাশ করার মধ্যে হয়তো কোনো লজ্জা থাকার কথা নয়। এও মনে হয় যে-মানুষের ন্যায্য কারণ-জাত কোনো গর্ব নেই, সে-মানুষের এ পৃথিবীতে না জন্মালেও কোনো ক্ষতি ছিল না। এই পরম সত্যটি কোনো আঁতেলের কাছে শিখিনি, শিখেছি এই সব তথাকথিত 'অশিক্ষিত' অগণ্য সাধারণ, অতি সাধারণ গরিবস্য গরিব, নিপীড়িত মানুষদের কাছ থেকেই।

রাইফেল বন্দুক পিস্তল রিভলবার চালাতে শিখেছিলাম শৈশব অতিক্রম করেই কিন্তু আমার সেই শিক্ষা বিফলেই গেছে। কারণ, আমি তার যথার্থ ব্যবহার করিনি। অনেক মানুষকেই গুলি করে মারতে চেয়েছিলাম, আজও চাই, কিন্তু মারতে পারিনি। তবে যদি নকশাল হতাম তাহলে পুলিশ কনস্টেবলদের না মেরে কমিশনার এবং আই জি-দেরই মারতাম। নেতাদের মারতাম। এ-দেশের বেশ কিছু নেতা আর বেশ কিছু আঁতেলদের।

গুলি কবে যে মারিনি তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। পিস্তল না চালিয়ে কলম চালিয়েছি। একটা দিন এই দেশে অবশ্যই আসবে, শিগগিরিই আসবে যখন এদেশের লক্ষ লক্ষ যুবক আমি যা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু করতে পারিনি, তাই করবে। দেশই যদি না বাঁচে তবে কি নিজস্বার্থপরায়ণ, অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন আমাদেব আদৌ বাঁচা হবে? কী করে বাঁচা হবে? "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

এই সব মুহুরিরা, প্রত্যেকেই কিন্তু অত্যন্তই গর্বিত ছিলেন। গর্বিত ছিলেন টাইপিস্টরাও।

"নবীন মুহুরি" আমারই এক পরিচিত মুহুরিকে নিযে লেখা। তাঁর নাম অবশ্য অন্য ছিল। স্বাভাবিক। যাঁর অশেষ গর্ব ছিল যে তিনি তর্জনী বুলিয়েই লক্ষ লক্ষ টাকার যোগফলে নির্ভুলভাবে আসতে পারেন চোখের পলকে। যেদিন তাঁর মালিক, তাঁর ফার্মে এক ছোকরা ইংরেজি-জানা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে নিয়োগ করলেন এবং জার্মানির তৈরি একটি ADDING MACHINE আনালেন অনেক টাকা দিয়ে তাড়াতাড়ি যোগ করার জন্যে, সেই রাতেই সেই মুহুরি তাঁর আত্মাভিমানে আঘাত লাগাতে নিজের ধুতির খুঁট গলায় বেঁধে গাছ থেকে ঝুলে আত্মহত্যা করলেন।

আজকে পুঁটি মাছের দোকানিও ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেন। আমি যে যুগের কথা বলছি তখন, প্রায় টাইপরাইটারের মতোই বড়ো এবং ভারী ADDING MACHINE ব্যবহৃত হত কোনো কোনো ফার্মে। বড়ো শহরের কোনো কোনো দোকানে ক্যাশ-রেজিস্টার দেখা যেত। তাই ছিল আধুনিকতার চোখ-ঝলসানো চমক।

'বিড়াল' গল্পটি কোনো অফিসে একটি জেরক্স মেশিন আসাতে অফিসের গরিব টাইপিস্ট ভদ্রলোকের (যাঁর একমাত্র কাজই ছিল, টাইপড-ম্যাটার কপি করা) মানসিক হতাশা নিয়ে লেখা।

অনেক কাঠের কারবারি মক্কেল ছিল বাবার। এস এন ঘোষ অ্যান্ড কোং, স্ট্যান্ডার্ড টিম্বার কোম্পানি, বি এন গুহ অ্যান্ড কোম্পানি ইত্যাদি। বি এন গুহর কাজ ছিল গভীর সব জঙ্গলে—রাসেলকুণ্ডা, বক্সা, নেপাল ও ভুটানের সীমান্তে। স্টান্ডার্ড টিম্বার কোম্পানি তখনও বার্মার (এখন মায়ানমার) স্যালউইন নদীর অববাহিকার স্যালউইন টিম্বার থেকে কাঠ আনাতেন—বার্মা টিক। পৃথিবীর সেরা সেগুন। বি এন গুহ অ্যান্ড কোং-এর একজন পার্টনারের নাম ছিল বুদ্ধদেব গুহ। তাঁর দাদারা আসতেন। তাঁকে কখনও দেখিনি। ওঁদের দেশ ছিল ঢাকাতে। ভাউচিং করতে করতে মনের চোখে কত সব গভীর অদেখা জঙ্গলের ছবি ফুটে উঠত।

এস এন ঘোষ ছিলেন খুব সৎ মানুষ। তিনি তখনকার দিনের বিখ্যাত চীনে ছুতোর কোম্পানি ক্যান্টন কার্পেন্টারি ওয়ার্কসকে কাঠ দিতেন। ক্যান্টন কার্পেন্টারি আবার জেসপ কোম্পানির ঠিকাদার ছিলেন। জেসপ তখন নানা রেল কোম্পানির ওয়াগন তৈরি করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাওয়াতে কাঠের দাম হু হু করে বেড়ে গেল অথচ এস এন ঘোষ মশাই আগেই ক্যান্টন কার্পেন্টারির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, যে, বিশেষ করে তাঁদেরই মস্ত বড়ো কনসাইনমেন্ট দেবেন। দাম বাড়ল মারাত্মক যদিও কিন্তু তিনি তাঁর কথা থেকে একটুও, একচুল সরলেন না। বহু ক্ষতি করেও তিনি তাঁর কথার দাম রেখেছিলেন। এই সততার কথা ক্যান্টন কার্পেন্টারির চিনে মালিকেরা ভোলেননি। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর অনেক অন্য কাঠ-ব্যবসায়ী থাকা সত্ত্বেও এস এন ঘোষের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি কাঠ কিনে তাঁরা তাঁর এক সময়ের ক্ষতি বহুগুণ পুষিয়ে দিয়েছিলেন। সততার দাম দিয়েছিলেন।

জীবনের বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি যে "HONESTY IS THE BEST POLICY"। সত্যিই সততার কোনোই বিকল্প নেই। সততা যা দেয় তা, অন্য কিছুই দিতে পারে না।

ক্যান্টন কার্পেন্টারির যে পার্টনার অ্যাকাউন্টস এবং ট্যাক্সেশান দেখতেন তাঁর নাম ছিল মিঃ চাও। নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং বিনয়ের প্রতিমূর্তি ছিলেন মিঃ চাও। উনি পরে কানাডাতে চলে যান ইমিগ্রেন্ট হয়ে এবং সেখানেই পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। টরেন্টো থেকে ষাটের দশকের শেষ অবধি চিঠিও লিখতেন আমাকে। তারপর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে।

চিনাদের মতো পরিশ্রমী জাত খুব কমই আছে। ওই দেশের মানুষ যাই করুন না কেন তাতেই সফলতা আসতে বাধ্য। কারণ চালাকি ও ফাঁকিবাজি কাকে বলে, তা তাঁরা জানেনেই না।

বেঙ্গল ট্রেডিং সিন্ডিকেট (১৯৫২) নামের এক মক্কেল ছিলেন আমাদের। শ্রীনির্মলকুমার দাস ও পরিমল দাস দুই উদ্বাস্তু ভাইদের গড়ে তোলা ফার্ম। তাঁদের কাঠের গোলা ছিল নিমতলায় কিন্তু আসল কাজ ছিল সেনাবাহিনীর ঠিকাদারি করা। জব্বলপুরে বড়ো ইউনিট ছিল। তাছাড়া যেখানেই সেনাবাহিনী ওঁদের ডাকতেন সেখানেই ওঁরা গিয়ে কাজ করতেন। ওঁরা দুই ভাই প্রায় তিন যুগ ধরে জঙ্গলে যাবার নেমন্তন্ন করতেন আমাকে।

সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল মশাই যখন দণ্ডকারণ্যের সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়র তখন ওঁরা দণ্ডকারণ্যেও ঠিকাদারি করেছেন। তাঁদের দণ্ডকারণ্য এবং কানহা কিসলিও দেখার নেমন্তন্ন রাখতে পারিনি উনিশ তিরাশি চুরাশির আগে। ওঁদের সবরকম সাহায্যই পেয়েছিলাম। সেনাবাহিনীরই এক ড্রাইভারকে ছুটি নিইয়ে তাঁদের একটি গাড়ি ও সেই ড্রাইভার (তার নাম ছিল, বাটুমা) আমাকে বরাদ্দ না করে দিলে আমার "মাধুকরী" লেখা হত না। জব্বলপুর, মালঞ্জখণ্ড, মুক্কি, সুফকর, কানহা, কিসলি, সীউনি ইত্যাদি জায়গাতে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে না বেড়াতে পারলে 'মাধুকরী' হয়তো কখনওই লেখা হত না। তবে সবচেয়ে মজার কথা হল এই যে, যখন জঙ্গল ও মধ্যপ্রদেশের ওই অঞ্চল দেখতে গেছিলাম তখন 'মাধুকরী' নামক উপন্যাসটি যে আদৌ লিখব সেকথা আমার নিজেরই জানা ছিল না। তারও পর বম্বের এক স্যুইস মক্কেলের কাজে একবার বম্বে গিয়ে ওঁদেরই অতিথি হয়ে ইন্দোর এবং ভোপালে যাই। মাণ্ডু দেখি, ভীমবৈঠকা, উজ্জয়িন। তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ আছি। দাস ভ্রাতাদের কাছে তো কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। মক্কেলদের ভালোবাসা, খাতির, খিদমতগারির ঋণ এ জীবনে শোধার নয়।

আরেকজন ছিলেন সোহনলাল ব্যাহেল। জার্মান কোম্পানি ছিল কালকাফ। আচ্ছুরাম কালকাফ

(শেলাক) প্রাঃ লিমিটেড কোম্পানির লাক্ষার কারখানা ছিল রাঁচি-সিংভূম জেলার সীমান্তে, মুরহুতে এবং পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারের সীমান্তের পুরুলিয়া জেলার ঝালদাতে।

সোহনলালবাবু খুব ধার্মিক মানুষ ছিলেন। মোটা সোটা লম্বা চওড়া, ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরিহিত দাড়িহীন সর্দারজি। তাঁদের দেশ ছিল পাঞ্জাবের রোপার-এ। তিনি, তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণাভাবি, তিন ছেলে কুক্কু, বাব্বি এবং গুল্লু এবং তাঁদের তিন সুন্দরী ও গুণবতী স্ত্রীদের কাছ থেকে যে স্নেহ প্রীতি ও সম্মান পেয়েছি তার ঋণ চিরদিন স্বীকার করব। কুক্কু আমেরিকাতেই পড়াশুনা করেছিল তার স্ত্রী রেশমি এন সি ডি সি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যানের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে। এমন ভদ্র, সভ্য, বিনয়ী স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি এবং পুরো পরিবারের সেবা-করা আধুনিক মেয়ে আমি আর দেখিনি। অবাঙালি ব্যবসাদারদের কাছ থেকে বাঙালিদের অনেকই শেখার আছে। তা তাঁরা পাঞ্জাবি বা মাড়োয়ারি বা গুজরাতি বা পারসি হোন না কেন। এঁদের মতন খাতিরদারি, দেখানো নয়, সমস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে, ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের, বাঙালিরা খুব কমই করতে পারেন। একবার যদি তাঁরা কোনো পেশাদারের গুণপনা ও সততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে যান তবে তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করেন।

সোহনলালবাবু গত হয়েছেন কিছুদিন আগে। বয়স ষাটও হয়নি। সাদা চুলে ভরা মাথা এবং মোটাসোটা চেহারা দেখলে অবশ্য বয়স অনেক বেশিই মনে হত। তাঁর মুরহুর লাক্ষা কারখানার মধ্যের অতিথিশালা এবং বিরাট লাইব্রেরি ঘরেও যে বছরের বিভিন্ন সময়ে কতবার থেকেছি তা বলার নয়। ঝালদাতেও থেকেছিলাম একবার। ওঁর সঙ্গে বিরশা মুণ্ডার উলগুলান বা বিদ্রোহের সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখা, খুঁটি-মুরহু-টেবো ঘাট হয়ে। আবার খুঁটি হয়ে, তামার-জামশেদপুরের কাছে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে কিছুটা গিয়ে পুরুলিয়া জেলার সব লাক্ষা কারখানা হয়ে ঝালদা গাড়িতে গেছি। ফেরার সময়, রাঁচি অবধি না এসে মুড়ি স্টেশন থেকে রাঁচী এক্সপ্রেস ধরে ফিরে এসেছি। রাঁচিতেও ওঁর সুন্দর বাড়ি ছিল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসের কাছে। নাম 'বৃন্দাবন'। সে বাড়িতেও বহুবার থেকেছি।

এত কথা আচ্ছুরাম কালকাফ বা সোহনলাল বাবুদের সম্বন্ধে এই জন্যে বললাম যে, ওঁর সসম্মান সাহায্য না পেলে "মাধুকরী"র মুখ্য পটভূমি কাল্পনিক হাটচান্দ্রাকে গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল। সাহিত্যিক যদিও কল্পনারই কারবারি তবু তাঁর অভিজ্ঞতা যদি না থাকে, যে পটভূমি এবং যে বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন, সেই সব সম্বন্ধে যদি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একেবারেই না থাকে, তবে সেই সাহিত্য স্থায়ী হবেই যে এমন বোধহয় জোর করে বলা যায় না।

আমার 'সাসানডিরি' উপন্যাসটিও ওঁদের মুরহুর কারখানা (আচ্ছুরামপুরী) এবং চারদিকের এলাকা, যেখানে মুণ্ডাদের বাস, নিয়ে লেখা।

মুঙ্গরু নামের একটি মেয়ে ওঁর কারখানাতে কাজ করত। সেবারে আমি ছিলাম লাইব্রেরি ঘরে। তার সামনেই ছিল মস্ত কুয়োটা। ফিনান্সিয়াল ইয়ার-এন্ডিংয়ের পরে এপ্রিলে গেছিলাম সেবারে। বেশ গরম ছিল। কামিনেরা জল খেতে আসত কুয়োতে দল বেঁধে। আমি লাইব্রেরি ঘরের ইজিচেয়ারে বা কখনও বাইরের বারান্দাতেও বসে বই পড়তাম বা লিখতাম। কখন সেই মরালী-গ্রীবার, রাশিয়ান ব্যালেরিনার মতন গ্রেসফুল মেয়েটি তার খোঁপাতে একটি হলুদরঙা রাধাচূড়া গাছের শিষ গুঁজে ছোটো-হাতার লাল ব্লাউজ এবং মিলের লালপেড়ে মোটা শাড়ি পরে জল খেতে আসবে, সেই প্রতীক্ষাতে থাকতাম ছদ্ম-গাম্ভীর্য নিয়ে। বলতে গেলে, ভালোই বেসে ফেলেছিলাম সেই মেয়েটিকে। ওকেই নায়িকা করেছিলাম 'সাসানডিরির'। বিরাট বাথরুমের পেছনের জানালা দিয়ে দেখা যেত ওদের কবরস্থান 'সাসানডিরি' এবং ঘন বিস্তৃত আম্রকুঞ্জে ঘেরা ওদের গ্রাম, উঁচু ডাঙা জমির উপরে।

সেবার মুরহুতে থাকাকালীন ওদের অনেক গান সংগ্রহ করেছিলাম। যেমন, "সোনালেকান রূপালেকান ছোটনাগাপুরাহো"।

ফাদার হফফম্যানের লেখা নানান প্রবন্ধ পড়েছিলাম, শরৎচন্দ্র রায়ের লেখা, ওদের ওপর, কলকাতাতে ফিরে। তারপর ধীরে ধীরে ওদের রূপকথা, ওদের প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে, মৃত্যু, ওদের

আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং এই নীচ-ইতর, সর্বগ্রাসী বিজলি আর দূরদর্শনের আধুনিকতা, শহরের মানুষের পয়সার লোভে পুরো অঞ্চলকে বৃক্ষহীন করার সর্বনাশা চক্রান্তের বিরুদ্ধে ওদের অসহায় লড়াই এবং হেরে যাওয়া নিয়েই লিখেছিলাম 'সাসানিডিরি'। আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই।

তথাকথিত শিক্ষা, বিদ্যা আর দূরদর্শন, শহর-সংস্কৃতি এবং শহুরে মানুষের সতত লেলিহান লোভ যে, আমাদের ভারতীয়ত্বর অশেষ এবং অপূরণীয় ক্ষতি করেছে, সার্বিক ক্ষতি, গ্রামীণ ভারতবর্ষের নির্লোভ, শান্ত, ঈশ্বর-বিশ্বাসী সুন্দর সৎ জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে, ইতিহাস একদিন সেই কথা লিপিবদ্ধ করবে। কিন্তু আদিম ভারতবর্ষ এবং আমাদের বিভিন্ন আদিবাসীরা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, গোঁন্দ, বাইগা, মুণ্ডা, মারিয়া এবং আরও অগণ্যরা যে তাদের অনাবিল সুখের এবং শান্তির জীবনের মাহাত্ম্য পুরোপুরি হারাবে একথা যখন তারা সকলে এবং আমরাও বুঝতে পারব সেদিন হয়ত বড়ই দেরি হয়ে যাবে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিহারে, আসামে, ওড়িশাতে, মণিপুরের, ন্যাগাল্যান্ডের এবং মধ্যপ্রদেশেরও বিভিন্ন অঞ্চলের জঙ্গলে বারংবার গিয়ে ও থেকে আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে, নগর-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ ও সৌরশক্তি, যাতায়াতের সুবিধা যে সবসময়েই গরিব ও নিভৃতাঞ্চলের মানুষদের ভালো করে, তা মোটেই নয়। আমরা বাহ্যিক আরাম, বহিরঙ্গের সুখে এতই অন্ধ হয়ে আছি যে, মানুষ যে একমাত্র মনসম্পন্ন জীব, মানুষের অন্তরই যে তার সঙ্গে অন্য জন্তু-জানোয়ারের পৃথকীকরণের একমাত্র উপায়, এই সরল এবং সুপ্রাচীন সত্যটি সম্ভবত আমরা, মানুষের চেহারার আমরা, এই শহরবাসী জন্তুরা পুরোপুরিই ভুলে গেছি। ভুলে গেছি, শুধু তাই নয়, অন্য সকলকেই ভোলাতে প্ররোচিত করেছি এবং করছি। ঈশ্বর যেন আমাদের ক্ষমা করেন।

আবার ফিরে যাই মক্কেলদের কথাতে।

একদিন অফিসে বসে কাজ করছি, বাবা ডেকে পাঠালেন তাঁর চেম্বারে। গিয়ে দেখি, এক অদ্ভুতদর্শন ভদ্রলোক বসে আছেন বাবার সামনে। কুচকুচে কালো গায়ের রং, ঈষৎ লাল চোখ, অবিন্যস্ত চুল, সাদা ফুল-হাতা টুইলের শার্ট। কলারটা তোলা ছিল পরার সময়ে। তখন ভেঙে গেছে। বুকপকেটে একটি রুমাল। গোল্লা-পাকানো। হাতে ক্যাপস্টান সিগারেটের প্যাকেট। নিম্নাঙ্গে ধুতি এবং পায়ে পাম্প-শু।

বাবা বললেন, এঁর নাম মুকুন্দবাবু। ডালটনগঞ্জে থাকেন। পালামৌর জঙ্গলে কাজ করেন। বেঙ্গল পেপার মিলের এবং আই-পি-পির কাগজকলের বাঁশের ঠিকাদার। বাঘের একটা বাচ্চা দেবেন বলেছেন আমাদের।

আর শিকার?

ততদিনে জঙ্গল-পাগল হয়ে-ওঠা আমি বললাম।

উনি হাসলেন। অদ্ভুত একটা খি-খি শব্দ করতেন উনি, আসল হাসিটা হাসবার আগে। বললেন, গণ্ডার আর নীলগাই নেই আমাদের পালামৌতে। এ ছাড়া তুমি অন্য যে-কোনো জানোয়ার শিকার করতে চাও তো তোমাকে দেখিয়ে দেব।

আসলে শুধু গণ্ডার আর নীলগাই নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেসব পশুপাখি সহজলভ্য তার অনেক প্রজাতিই নেই পালামৌতে। কিন্তু তখন দেশ বলতে আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ রাজ্য বোঝাতাম এবং বুঝতাম। ভারতবর্ষ যে মস্ত একটা দেশ—কত বৈচিত্র তার মধ্যে, তার মানুষের, পশুপাখির, আবহাওয়ার, প্রকৃতির, মানসিকতার ভাষার, সে সম্বন্ধে পঞ্চাশের দশকের কম ভারতীয়রই তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিদের মধ্যে কলকাতাবাসী একাংশ তো এতই কূপমণ্ডুক ছিলেন যে লুঙি পরা বা পাজামা পরা বা ধুতি পরা অজানা মানুষকে অম্লান বদনে জিজ্ঞেস করতেন, "আপনি কি বাঙালি, না মুসলমান?"

তাঁরা কী বোঝাতে চাইতেন তা তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পরিবারের (যদিও আক্ষরিকার্থে আমি নিজে উদ্বাস্তু নই) সদস্য হিসেবে এই প্রশ্নের গভীরতা অথবা মূর্খামি আমার জানার কথা ছিল না। অনেকে আবার বলতেন, আপনি কি বাঙালি না আপ-কান্ট্রি?

মধুপুর শিমুলতলা হাজারিবাগ, বেনারস বা কী বড়োজোর চুনার, যে-সব জায়গাতে সততই পেট-রোগা বাঙালিদের পক্ষে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল তার উত্তরে বা পশ্চিমে যে বিরাট ভারতবর্ষ ছিল তাকে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরম নিশ্চিন্তির সঙ্গে 'আপ-কান্ট্রি' নির্ধারণ করে ঝামেলা মিটোতেন। এই দোষ শুধু বাঙালিদেরই ছিল না। বম্বের মক্কেলদের কাছে শুনেছি যে, সেখানে দারোয়ান বা পাহারাদার মাত্রকেই, সে সর্দার বা উত্তরপ্রদেশীয় বা হরিয়ানার জাঠ, বা বিহারীই হোক না কেন, তাদের প্রত্যেককেই বম্বেবাসীরা 'গুর্খা' বলে ডাকতেন। সুতরাং কূপমণ্ডুকতা শুধুমাত্র কলকাতার বাঙালিদেরই দোষ ছিল না। এই বিরাট বিচিত্র দেশ সম্বন্ধে ধারণা তখন বম্বের মতো আধুনিক কসমোপলিটান "পশ্চিমের দ্বার' শহরের মানুষদেরও ছিল না।

মুকুন্দবাবুর ফার্মের নাম ছিল এম এল বিশ্বাস অ্যান্ড কোম্পানি। সাকিন নয়াটোলি, পোঃ ডালটনগঞ্জ, জেলা পালামৌ। তখনকার দিনে কোনো ছোট শহরেই হোটেল-টোটেল ছিল না। তবে পরিচিত অপরিচিত যে-কোনো বাঙালিরই অবারিত দ্বার ছিল মুকুন্দবাবুর নয়াটোলির অতি সাধারণ খাপরার চালের পাকা বাড়ি। চিপাদোহরে, লাতেহারে, চান্দোয়া-টোড়িতে এবং আরও অগণ্য বনাঞ্চলে তাঁর ডিপো ছিল। তখন বেতলা ছিল এক ঘুমন্ত গ্রাম। টিমটিম করে হ্যারিকেন জ্বলত। রাস্তার এক ইঞ্চিও পাকা ছিল না। সাহেবসুবোরা এলে হ্যাজাক জ্বলত। কাগজ কোম্পানির বড়ো সাহেব বব রাইট আর তাঁর স্ত্রী অ্যান রাইট প্রতি শীতে শিকারে যেতেন। ষাটের দশকে অনেকবার এমনও হয়েছে যে আমি বা আমরা আছি পালামৌর এক ব্লকে আর ওঁরা আছেন অন্য ব্লকে। এই বব রাইটই এখন কলকাতার টালিগঞ্জ ক্লাবের রেসিডেন্ট কমিটি মেম্বার আর অ্যান রাইট বিশ্ববিখ্যাত, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের দৌলতে। ওঁরা সত্তরের দশকের শেষ অথবা আশির দশকের গোড়া অবধিও বালিগঞ্জ পার্ক রোডে একটি বড়ো লনওয়ালা বাড়িতে থাকতেন। তারই পাশের বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে থাকতাম তখন আমি। সেই লনওয়ালা বাড়ির মালিক মামলা জিতে তাঁদের অত্যন্ত অপমানজনকভাবে বহিষ্কার করেন। এখন সেখানে শ' ওয়ালেস কোম্পানির অথবা তাদের অফিসারদের কোনো কো-অপারেটিভের চোদ্দতলা বাড়ি উঠে গেছে।

মুকুন্দবাবু মারা যান কম বয়সেই। হাইলি ডায়াবেটিক ছিলেন। ষাটের দশকেরই গোড়ার দিকে। তাঁর ছেলে মোহন (আর কে) তখন স্কুলের ছাত্র বা সবে স্কুল পেরিয়েছে। আমার যতটুকু পালামৌ সম্বন্ধে জানাশোনা, তার সবটুকুই বলতে গেলে মোহনেরই দয়া-দাক্ষিণ্যে। কম করে পঞ্চাশবার আমি গেছি পালামৌয়ের বিভিন্ন বনে। প্রতিবারই মোহনের অতিথি হয়ে। আর সে কী আতিথ্য। আমি একা নই। অনেকসময়ে সঙ্গে বহু সঙ্গীকে নিয়ে গেছি। মোহনের মতো বড়োমনের মানুষ, যে নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্যে এমন করে করতে পারে, এমন আর দেখিনি।

তবে বেশ কিছুদিন হল ডিজেল-সংকটে সে একেবারেই ভেঙে পড়েছে। এও ঈশ্বরেরই মার বলতে হবে। অথচ যে এত মানুষের ভালো করেছে তার প্রতিই ঈশ্বর কেন এত নির্দয় হলেন, কে জানে!

'জঙ্গলের জার্নালে' মোহন এবং তার চ্যালাচামুণ্ডাদের কথা কিছু লিখেছি। চ্যালাচামুণ্ডারা অন্য পরিচয়ে অন্য নানা উপন্যাসে আছেন। আছেন, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই ORIGINAL। কারওই PROTOTYPE নন।

একথা এখানে অবশ্যই বলা দরকার যে মোহন না থাকলে কোনওদিনও "কোয়েলের কাছে", "কোজাগর" অথবা "সবিনয় নিবেদন" লেখা হত না। লেখা হত না অগণ্য ছোটো গল্প, "একটি হলুদ চাঁদ এবং একপাত্র খুশি", প্রথম শিকার সম্পর্কহীন গল্প, 'অমৃত' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় "হাতি" ইত্যাদি।

আমার মা বলতেন, যদি কারও হাতে এক গ্লাস জলও খাও তাহলেও জীবনে সেকথা ভুলবে না। আর মোহন তো আমার জন্যে কী করেছে আর কী করেনি।

শতসহস্রবার বললেও ওর ঋণ স্বীকার করা হবে না। শোধ করা তো দূরস্থান।

এইরকম ঋণ আমার 'অমৃত' সম্পাদক এবং আনন্দবাজার গোষ্ঠীর কাছেও আছে। মিডিয়া যদি

পরিচিত না করাত তবে আমাকে চিনতেন কী করে পাঠক-পাঠিকারা। মিডিয়ার ভূমিকা এবং ঋণ আমি নতমস্তকে স্বীকার করি সবসময়েই কিন্তু এ কথাও বলি যে মিডিয়া পাদপ্রদীপের আলোতে অবশ্যই লেখকদের আনেন, আনতে পারেন, কিন্তু লেখকের নিজের যদি তেমন নিজস্ব যোগ্যতা না থাকে তবে মিডিয়া তাঁকে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ের চিরকালীন আসন পাইয়ে দিতে পারে না।

আমি মিডিয়া-বিরোধী নই। কিন্তু মিডিয়ার সমালোচক এই কারণে যে, অধিকাংশ সময়েই দেখা গেছে যে মিডিয়া ভুল ঘোড়াকে বেছে নিয়েছেন। তাঁকে বা তাঁদের শুধু মিডিয়ার প্রচারের জোরেই বা বাগানো বা পাইয়ে-দেওয়া পুরস্কারের ভারে ন্যুব্জ করে দিলেই যে পাঠক তাঁদের সম্মান দেবেন এমন কখনওই নয়।

মিডিয়া যদি ঘোড়া বাছতে ভুল করে তবে সেই মিডিয়া অপদস্থ হতে বাধ্য।

তবে আগেই বলেছি যে, আমিও হয়তো অযোগ্য ঘোড়া। কিন্তু অযোগ্য হলেও এ কথা একশোবার কৃতজ্ঞ তার সঙ্গে স্বীকার করব যে যতটুকু পরচিতি আমার হয়েছে আজ অবধি তার পেছনে গোড়াতে 'অমৃত' সাপ্তাহিকের এবং পরে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অবদান অবশ্যই আছে।

জল যখন খেযেছি, তখন মুক্তকণ্ঠে তা স্বীকার না-করার মতো অকৃতজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা আমার মা-বাবা আমাকে দেননি।

মক্কেলদের কথা এবং তাঁদের কাছে আমার যা ঋণ তা বলতে বসলে আলাদা বই লিখতে হবে। অতি সামান্য ক'জনের কথাই বলা গেল এই পরিসরে।

ইন্টারমিডিয়েট সি এ পরীক্ষা হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন।

কৃষ্ণ শর্মা তাদের ক্লাসের যে মিহির সেনের কথা বলত তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। শিকাবে, গান-বাজনার এবং ছবিব শখেবই কারণে।

মিহিবের ডাক নাম ছিল গোপাল। বন্ধুরা আদর করে ডাকত "গোপলা" বলে। গোপালরা তখন থাকত রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপরে লেক মার্কেটের উলটোদিকের ফুটপাথে 'জলযোগ' যে বাড়ির হাতাতে, সেই বাড়িতে। সে বাড়িটি, সাতাত্তরের সি রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, ছিল ওদের এজমালি বাড়ি। পরে গোপালের বাবা নিউ আলিপুরে ৩৭১, পি ব্লকে প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়ে উঠে যান সম্ভবত ষাটের দশকের মাঝামাঝি।

গোপালের বাবা শ্রী জে সেন বিলেত থেকে অ্যাকাউন্ট্যান্সি পাশ করে এসেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি এখানে পড়াও যেত না। পড়তে বিলেতেই যেতে হত। দুটি ইনস্টিট্যুট ছিল সেখানে। ইনস্টিট্যুট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং ইনস্টিট্যুট অব ইনকরপোরেট অ্যাকাউন্ট্যান্টস। এছাড়াও ইনস্টিট্যুট অব কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টসও ছিল। ইনস্টিট্যুট অব ইনসিওরেন্স অ্যাকাউন্ট্যান্টসও নিশ্চয়ই ছিল। কারণ, কানাডাতে সত্তরের গোড়ার দশকেই ওই ইনস্টিট্যুট দেখেছি। আমাদের দেশে অ্যাকাউন্ট্যান্সির যে পরীক্ষা হত তার নাম ছিল ডিপ্লোমা ইন অ্যাকাউন্ট্যান্সি। সরকারি পরীক্ষা ছিল। তাই যাঁরা পাশ করতেন তাঁদের বলা হতো জি ডি এ অর্থাৎ গভর্নমেন্ট ডিপ্লোমা হোল্ডার ইন অ্যাকাউন্ট্যান্সি। স্বাধীনতার পরে যখন ইনস্টিট্যুট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সির পত্তন হল তখন সব জি ডি এ-দেরই বাই নমিনেশন, সি এ করে দেওয়া হল।

এই প্রসঙ্গে বলার লোভ সামলাতে পারছি না যে আনন্দবাজারের এককালীন কর্ণধার অশোক সরকার মশাইও বিলেতের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন এবং বর্তমান কর্ণধার, যার মাধ্যমেই আনন্দবাজার গোষ্ঠী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পরিচিতি পেয়েছে, ইংরেজি পত্রপত্রিকা প্রকাশনে এসেছে, দেশের বিভিন্ন জায়গাতে প্রেস খুলেছে, সেই ক্ষণজন্মা ব্যবসাদার অরূপ সরকারও সি এ-র ছাত্র ছিলেন। অরূপ আর্টিকল্ড ক্লার্ক ছিলেন জি বাসু অ্যান্ড কোম্পানিতে। পার্টনার দীনেশ চানচানির অধীনে। এই দীনেশই দীনু ভাই। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সহপাঠী এবং আমার অদ্যাবধি বন্ধু।

গোপালদের পরিবার ভবানীপুরের লক্ষ্মীবাবুর সোনাচাঁদির দোকানেরও মালিক ছিলেন। বহুদিনের পারিবারিক ব্যবসা। এছাড়াও বহু সম্পত্তির মালিক ছিলেন সেই পরিবার। কিন্তু গোপালের বাবা নিজের পেশা নিয়েই থাকতেন।

একদিন, সেদিন সেকেন্ড স্যাটারডে, অফিস ছুটি ছিল আমাদের, বিকেলের দিকে হাজরা মোড়ের দিকে যাচ্ছি। আলিপুরের দিকে যাবার পথের মোড়ে হাজরার চৌমাথাতে যে বাড়িটি, তারই নীচে রসা রোডের উপরে একটি ছোট্ট দোকান ছিল। কলম সারাতেন, বেঁটেখাটো চশমা পরা ভদ্রলোক, খুব ভালো। অ্যান্টিক হয়ে যাওয়া পুরোনো কলমও রাখতেন কিছু। দোকানটি এমনই যে তিনজন খদ্দের পাশাপাশি সামনে দাঁড়ানো যেত না কিন্তু খুব ভিড় লেগে থাকত। খদ্দেররা ফুটপাথেই দাঁড়িয়ে থাকতেন। কলমের খুবই শখ ছিল আমার ছেলেবেলা থেকে। এখনও আছে। মক্কেলরা আর অনুরাগীরা সারা পৃথিবী থেকে কত ভালো ভালো কলম যে এনে দিয়েছেন আজ অবধি তা বলবার না। কিন্তু তবু যেখানে কলমের দোকান দেখি, সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ি আজও। পছন্দ হলে দুটাকা দামের কলমও কিনি।

জার্মান মঁ ব্লাঁ, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, কানাডিয়ান পার্কার ও শেফার্স, ইংলিশ ওয়াটারম্যান, স্যুইস শারানডাশ, আমেরিকান ক্রস-এর বল পয়েন্ট এবং পেন কত যে উপহার পেয়েছি!

অল্প ক'দিন আগে একজন মক্কেল এনে দিয়েছেন লিমিটেড এডিশান হেমিংওয়ে। মঁ ব্লাঁ কোম্পানির কমলা-রঙা বল পয়েন্ট পেন, যার গায়ে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের স্বাক্ষর আছে। মক্কেল বাঙালি এবং শিক্ষিত। তাই আমার হেমিংওয়ের প্রীতির কথা জানতেন।

এনে তো দিয়েছেন কিন্তু সে কলমে প্রাণে ধরে লিখতে পারছি না।

বড়োমামা সুনির্মল বসুর একটি কবিতা ছিল 'নতুন ছাতা'। নতুন ছাতা নিয়ে ছেলেটি স্কুলে গেছে। সারা দুপুর অঝোরধারার বৃষ্টিতে মাঠঘাট সব ভেসে গেছে। প্রায় বন্যার মতো অবস্থা। কিন্তু ছুটি হলে, সে এক বগলে বই আর অন্য বগলে নতুন ছাতা নিয়ে হাঁটু জল ভেঙে অঝোর ধারায় বকভেজা হয়ে বাড়ির দিকে আসছে।

কবিতার সঙ্গে কোন শিল্পীর আঁকা ছবি ছিল মনে নেই। হয়ত শৈল চক্রবর্তীর। কিন্তু সেই দারুণ ছবির কথা এখনও মনে আছে। কবিতার শেষ পংক্তি দুটি ছিল "কেমন করে খুলব ছাতা? নতুন ছাতা যে।"

হেমিংওয়ে-লিমিটেড এডিশানের বল-পয়েন্ট পেন উপহার পেয়ে আমারও সেই অবস্থা। ব্যবহার করি কেমন করে?

মঁ ব্লাঁ কলমের বা বলপেনেব মতো দ্বিতীয় কিছু পৃথিবীতে নেই। অবশ্য ক্রশ এবং শারানডাশের বলপয়েন্টও ভালো।

ভালো ভালো কলম কলম-রসিকেরা চেনেন আর চেনে কলকাতা বম্বের পকেটমারেরা। কলকাতার প্যারাডাইস সিনেমার সামনে আয়কর ভবনে যেতে কতবার যে আমার পেন পকেটমার হয়েছে তা বলার নয়। কিন্তু প্রতিবারই আজ পর্যন্ত, সঙ্গে সঙ্গেই মারা-যাওয়া কলম উদ্ধার করেছি শুধু তাই নয়, পকেটমারকে উত্তম মধ্যম দিয়েওছি। এখন জানি না কি হবে। Reflex ঢিলে হয়ে গেছে এখন।

রসিকজনেদের অবগতির জন্যে জানাই, যাঁরা জানেন না, যে, যাঁদের অর্থ আছে এবং কলমের প্রতি ভালোবাসা আছে তাঁরা এখন এখানেই মঁ ব্লাঁ পেতে পারেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমি কয়েকবছর

আগে মঁ ব্লাঁ কোম্পানি থেকেই একটি মাস্টারপিস এনেছিলাম তার যা দাম নিয়েছিল, এখানে দাম বেশি নয়, বরং কমই। চোরাপথে আসে না এসব কলম আজকাল। মনমোহন সিংয়ের দয়াতে সরাসরিই আসছে।

বম্বের তাজমহল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের লবিতে একটি দোকান আছে তার নাম "ক্লাসিক"। সেই দোকানটি মঁ ব্লাঁ রাখে। কলকাতাতেও লী রোডে যে "অভিনব শপিং কমপ্লেক্স" হয়েছে তাতে জুয়েলার বি সি সেন অ্যান্ড কোম্পানির শোরুম আছে। সেখানেও মঁ ব্লাঁ কলম রাখছেন কলকাতাতে ওঁরা। একবার দেখতে গেছিলাম। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, পিস্তলটা নিয়ে গিয়ে এক দুপুরে কলমগুলো লুটে নিয়ে আসি। এক মুঠো কলম তুললেই লাখ দুতিন টাকার কলম হবে হয়ত। কলমের নেশা দারুণ সর্বনেশে নেশা। এ নিয়ে "নাশা" শীর্ষক একটি ছোট গল্পও লিখেছিলাম। আনন্দর সংকলনে আছে।

কলমের দোকান থেকে বেরিয়ে হাজরা রোডে পড়েছি, ডোভার রোড আর হাজরা রোডের মোড়ের গুহ ফার্মেসিতে যাব কান দেখাতে ডা. আর এন গুহর কাছে, কান কটকট করছিল ক'দিন থেকেই, এমন সময়ে গোপালের সঙ্গে দেখা।

গোপাল বলল, হাজারিবাগ যাবে লাল সাহেব?

গোপালও সেবারে ইন্টারমিডিয়েট সি এ পরীক্ষা দিয়েছিল। আগেও দিয়েছিল।

লাফিয়ে উঠলাম। হাজারিবাগয়ের নাম শুনে আসছি ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু যাওয়া হয়নি কখনওই।

ইতিমধ্যে ওদের হালকা চকোলেট হেরাল্ড ট্রায়াম্ফ ইংলিশ গাড়িতে করে, লেকমার্কেটের পাশের গলির রাধুর দোকানের চা আর মটন চাঁপ খেতে খেতে শিকারের অনেক গল্প বিনিময় হয়েছে। মহাজাতি সদনে সারারাত ব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরের টিকিট না পেয়ে গোপালের ওই গাড়ির মধ্যেই বসে কনকনে শীতের রাতে গান ও বাজনা শোনা হয়েছে। অনিলদা, অনিলবরণ সাহা এবং শ্যামলদাদের, দত্ত রায়, সঙ্গে ছবিটবি নিয়ে অনেক আঁতেলপনাও করা হয়েছে। শ্যামলদা এবং অনিলদাকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। তখন 'সোসাইটি ফর কনটেমপোরারি আর্টিস্টস'-এর অফিস ছিল লেক মার্কেটের কাছে, মহীশূর রোডে। অনিলদাদের বাড়িরই একতলাতে। গোপালই ছিল ওই সোসাইটির প্রথম বিনি-পয়সার অডিটর। মানে, গোপালদের ফার্ম।

গুণী বলতে যা বোঝায়, গোপাল তা হয়তো ছিল না। কিন্তু গুণগ্রাহী ছিল। আজকাল জীবনের সর্বক্ষেত্রেই গুণীদের ভিড়ে পথ চলা দায়। গুণগ্রাহীর চেয়ে গুণীর সংখ্যা অনেকই বেশি হয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে গোপালের মতো রসিক, ভালো শ্রোতা, ভাল শিকারি, ভালো রাঁধিয়ের, ভাল সঙ্গীর কথা প্রায়ই মনে পড়ে। এমন রসিকজন যে এই রসের ঝরনাঝরা পৃথিবী থেকে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে তা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।

গোপাল চলে গেছে আজ পাঁচবছর হল।

হাজারিবাগের কথা এবং গোপালের কথা অনেকই বিস্তারিতভাবে বলেছি "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে"তে। সেও আত্মজৈবনিক লেখা। তবে শিকার-সম্বন্ধীয়। গোপাল "গপুবাবু" হয়ে এসেছে পত্রোপন্যাস "অবরোহীতে"ও। তাই 'ঋভু'তে হাজারিবাগের কথা বেশি বিস্তৃতভাবে বলতে চাই না।

একদিন রাতে যার যার বন্দুক কাঁধে আমি আর গোপাল হাওড়া-বম্বে মেলের (ভায়া ইলাহাবাদ) থার্ড ক্লাসের বগিতে উঠে পড়লাম। নানা ব্যাপারে আমার আর ওর মিল ছিল। বাবা বড়োলোক বলে বাবার পয়সাতে বড়োলোকি করতে দুজনের কেউই আমরা শিখিনি।

গোপালের মা-বাবা গোপালের এই যাযাবরবৃত্তি ভালো চোখে দেখতেন না। শিকারেও যেতে দিতে চাইতেন না ওকে। সেদিক দিয়ে আমার মা না হলেও বাবা অন্যরকম ছিলেন। যতরকম বিপদ এ ধরাধামে সম্ভবে সবরকম বিপদের মুখেই ছেলেকে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি তাকে জীবন-যুদ্ধের জন্যে তৈরি করতেন। শুধু পড়াশোনাই যে জীবনে কাজে লাগে, অন্য কিছুই লাগে না, সে কথা উনি একেবারেই বিশ্বাস করতেন না।

ভোর রাতে আমরা নামলাম হাজারিবাগ রোড স্টেশনে। তখন বর্ষাকাল। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজ আছে। স্টেশনের বাইরের স্টলে এক ভাঁড় করে গরম চা খেয়ে লজ্ঝড়ে বাসে চড়ে বসলাম।

ডাউনের কী একটা গাড়ির প্যাসেঞ্জারের জন্যে বাস অপেক্ষা করছিল। সেই ট্রেন এলে তার প্যাসেঞ্জারও তুলে নিয়ে শেষ রাতের অন্ধকারে ছেড়ে দিল বাস। তারপরে বাগোদরে এসে গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডকে তাড়াতাড়ি পেরিয়ে বাস ছুটল হাজারিবাগের দিকে। পথে বিষুনগড় এবং টাটিঝারিয়া পড়ে। টাটিঝারিয়ার আগে যখন বাস পৌঁছোল তখন পুবের আকাশপথের বাঁ দিকে লাল করে সূর্য উঠল। বাস এসে থামল টাটিঝারিয়া ডাকবাংলোর সামনে পণ্ডিতজির চায়ের দোকানে। সেখান থেকে চা, নিমকি এবং কালাজামুন খাওয়া হল। সেই স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। তারপর হাজারিবাগ।

প্রথমবার যেবার বাসস্ট্যান্ড থেকে সাইকেল রিকশাতে গোপালের পাশে বসে, সীতাগাড়া, সিলওয়ার আর কানাহারি পাহাড়ের ঘের দেওয়া নির্জন সুন্দর হাজারিবাগ শহরের গয়া রোডে ডি ভি সি-র মোড় এবং সার্কিট হাউস ছাড়িয়ে রিফর্মেটারি লেক এবং জেলখানার পথের উলটোদিকে গোপালদের ছবির মতো বাড়ি "পূর্বাচল"-এ গিয়ে পৌঁছেছিলাম তার শিহরন আজও বোধ করি।

তারপরে হাজারিবাগে গেছি অগণ্যবার। ফিসফিসে বৃষ্টির মধ্যে মোরব্বা খেতে খেতে রেইনকোট আর টুপি চড়িয়ে বন্দুক বগলে ঘুরে ঘুরে তিতির এবং খরগোশ মারার স্মৃতি এখনও টাটকা আছে। সীমারিয়ার পথে গোন্দা বাঁধের আগে বাঁ দিকে ঢুকে বোকারো নদী, কুসুমভা গ্রাম, বনক্ষেতি, বুড়হা বট, কাড়ুয়া, আসোয়া, পুনোয়াদের গ্রাম, নয়াতালাও; পুরানা তালাও, নাজিমসাহেবের কুঁড়ে এসবের কথা এতো বিস্তারিত বলেছি 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে'তে যে আরও বললে পুনরাবৃত্তি হবে বলে নিরস্ত করছি নিজেকে।

হাজারিবাগের দিন রাত, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, মহম্মদ নাজিম, মহম্মদ শামিম, টুটিলাওয়ার ইজাহারুল হক, কানহারি হিল রোডের সুব্রত চ্যাটার্জি এবং তার ছোটো ভাই মুকুল, গোপালদের বাড়ির কাজের লোক চমনলাল, মালি করম, নাপিত মহাবীর এবং গোপালের তৎকালীন চামচে ভূতনাথ এরা সকলে মিলে আমার মস্তিষ্কের একটি কোণ ভরে আছে। চিতাতে যখন এ শরীর জ্বলে যাবে শুধু তখনই এই স্মৃতি জ্বলে যাবে, তার আগে নয়।

গোপালকে নিয়ে যখন আমরা কেওড়াতলাতে গেছি গোপালের শব দাহ হচ্ছে ইলেকট্রিক চুল্লিতে, হঠাৎ ভূতনাথ খিঃ খিঃ খিঃ করে হেসে উঠল।

বলল, দাদা কেস কেচাইন।

কেন?

শ্মশানে এত হাসির কী হল তা জানতে চারপাশের মানুষ উদগ্রীব হলেন।

ভূতনাথ বলল, গোপালদা তো গিয়ে পৌঁছে গেলেন, এবার আপনার আর সুব্রতদার দিন ফুরোল।

সুব্রত বলল, কেন?

সুব্রত গোপালের মৃত্যুর সময়ে কলকাতাতেই ছিল। সে আই সি আই এর (আগের আই ই এল) গোমিয়ার বড়ো সাহেব ছিল। জয়েন করেছিল গোমিয়ার এক্সপ্লোসিভস প্লান্টে পঞ্চাশের দশকের শেষে।

ভূতনাথ বলল, নাজিম বুড়ো গোপালদাকে দেখে কি বলছে এখন?

নাজিম সাহেব তার ক'বছর আগেই হাজারিবাগে দেহ রেখেছিলেন। তাঁর সীমারীয়া যাবার পথের পাশের গোরস্থানে তাঁর কবরে মার্বলের ফলক লাগিয়ে দিয়েছি আমি আমার, গোপালের, সুব্রতর আর ভূতনাথের নাম লিখে।

হাজারিবাগে এখনও যখন যাই তাঁর কবরে মোমবাতি আর ধূপকাঠি জ্বেলে দিই।

ভূতনাথ বলল, নাজিম বুড়ো বলছেন, আরে গোপালবাবু! আপ একেলা আয়া হ্যায়? লালাবাবু কাঁহা? খোকাবাবু কাঁহা?

নাজিমসাহেব সুব্রতকে খোকাবাবু বলে ডাকতেন। সুব্রতর বাবা এস সি চ্যাটার্জি সাহেব হাজারিবাগের এস পি ছিলেন। নাজিম সাহেবের সঙ্গে যখন সুব্রতর বাবার প্রথম আলাপ, তখন সুব্রত খোকাবাবুটিই ছিল, তাই। সব জেলারই জেলা জজ, ডি এম বা এস পি সাহেবদের ছেলেমেয়েরা তখনকার দিনে পুরো জেলার আমজনতার কাছেই খোকা-খুকু বলেই গণ্য হত।

ভূতনাথের কথা শুনে ওই দুঃখের মধ্যে শ্মশানেও আমি আর সুব্রত হেসে ফেললাম। কারণ, কথাটা ভুতো মিথ্যে বলেনি। নাজিম সাহেব অমন করেই কথা বলতেন আর আমরা তিনজনে ছিলাম তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। ভূতনাথও, কখনও কখনও।

যাবার কথা কে বলতে পারে! কে আগে আর কে পরে? তবে ডাকাডাকি তো চলছেই অনুক্ষণ উপর থেকে। মা, বাবা, ঠাকুমা, ছোটোকাকু, নাজিম সাহেব, গোপাল, দিলীপ আরও কত প্রিয়জনে ডাকছে আমাকে। হঠাৎ কোনো বিধুর বিকেলে অথবা মধুর সকালে মন বড়ো খারাপ হয়ে যায় এ-কথা ভেবে যে এই পারের দিন যে-কোনো দিনই ফুরোবে। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যে-কোনো মুহূর্তেই চলে যেতে হবে। এর চেয়ে বড়ো সত্য আর নেই।

নাজিম সাহেব একটি দ্বিপদী বলতেন। বলতেন, এই পৃথিবীতে তুমি যখন এসেছিলে সকলেই হেসেছিল, তুমি একাই কেবল কেঁদেছিলে। এখানে এমন কিছু করে যেয়ো, যেন তোমার যাবার বেলাতে সকলেই কাঁদে আর তুমি একাই হাসতে হাসতে চলে যেতে পারো।

আমি বলি,

"গুস্তাকি ম্যায় ব্রিফ করেঙ্গে ইকবার,
যব সব প্যায়দল চলেঙ্গে,
ম্যায় কান্ধেপর সওয়ার।"

মানে, আমার কফন কাঁধে নিয়ে জানাজা যখন যাবে, আমার দোস্ত-বিরাদরেরা, আমার ভালোবাসার জন, অনুরাগীরা, যদি আদৌ কেউ থেকে থাকো। পায়ে হেঁটে যাবে নীরবে আর আমি তোমাদের কাঁধে চড়ে যাব। সেই একবারের পাপ, আমার অপরাধ, তোমরা সকলে ক্ষমা কোরো। এখনই ক্ষমা চেয়ে রাখছি সকলের কাছে।

হাজারিবাগের কথা এবং গোপালের কথা মনে হলেই আরও অনেক কথাই মনে ভিড় করে আসে। প্রায় দু' যুগ সামান্য কিছু বেশি ব্যবধানে এক গুচ্ছ দামাল ছেলেরা যে প্রকার পাগলামি করে বেড়িয়েছি বনে-পাহাড়ে, যত সাধারণ জঙ্গুলে মানুষ, গ্রামীণ গরিব মানুষের একাত্ম হয়েছি, তা বলার নয়। হিন্দু, মুসলমান, সর্দার, ক্রিশ্চান, জৈন এতরকম মানুষের হৃদয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি তা বলার নয়। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, "মাধুকবী" সম্পূর্ণ কল্পিত এবং মধ্যপ্রদেশের পটভূমিতে লেখা হলেও বিহারের হাজারিবাগ, রাঁচি এবং ডালটনগঞ্জ জেলার, মানে, "সোনালেকান রূপালেকান ছোটনাগপুরা"র প্রভাব গভীরভাবে ছিল আমার মনের গভীরে। মহম্মদ নাজিমের ছায়া পড়েছে মাধুকরীর সাবীর মিঞার উপরে। ভূতনাথের জীবনের Care-free, could not careless attitude প্রভাবিত করেছে ভুতু চরিত্রটিকে। হাজারিবাগের ঘড়ি আর কলম মেরামত করা দোকানের দোকানি মহম্মদ শামীম তো এসেছে 'মাধুকরীর' শামীমের মধ্যে প্রায় তার সব গুণাগুণ নিয়েই।

নাজিম সাহেবের দোকানে একজন মৌলবি আসতেন, গাঁট্টাগোট্টা মারাদোনার মতো দেখতে। মাথায় ফেজ টুপি পরা। কালো লম্বা কোট। নীচে লুঙি পরে সাইকেলে চড়ে, যাঁর দৈনিক হরকত ছিল শহরের কোনো উপান্তে গিয়ে গোটা তিন-চার বড়কা মোরগা মেরে আনা। গুলি জোগাতেন নাজিম সাহেব। তাই নাজিম সাহেবকে শিকারের আধাবখরা দিয়ে যেতেন সেই মৌলবিই।

যখন প্রথম প্রথম হাজারিবাগে যেতাম, আমাদের আড্ডাস্থলই ছিল পুরোনো মসজিদের সামনের ধূলি-ধূসরিত পথের উপরে মহম্মদ নাজিমের ছোট্ট দোকানটি। বন্দুক, গুলি, জুতোর পালিশ এবং এন সি ডি সির ইউনিফর্ম, বেল্ট, টুপি ইত্যাদির দোকান। সেই দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে আমার দেশের সাধারণ এবং সর্বধর্মের মানুষের নাড়ি টিপে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভারতবাসীর হৃদয়ের উত্তাপ ও ঘৃণা, ঈর্ষা ও দ্বেষ, স্বার্থহীন ভালবাসা এবং নীচ, ইতর স্বার্থপরতা সবই বড়ো কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে বাইশ-তেইশ বছরের এক টগবগে যুবকের। তা কলকাতা শহরবাসী কোনো যুবকের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

হাজারিবাগেই একদিন আমার প্রাণ যেত ওই মৌলবির হাতে, যাকে মৌলবি গিয়াসুদ্দিন করে এনেছি 'মাধুকরী'তে। মহম্মদ শামীম, আমরা বলতাম শামীম ভাই, একদিন আটারলি আনসাসপেক্টিং

আমাকে এমন প্রাণঘাতী সংকটে ফেলেছিল তা কী বলব! তাছাড়া, তখন আমি ছিলামও সেরকমই সরল, নিষ্পাপ অজ্ঞ। বলতে গেলে, প্রায় আটারলি বাটারলি আমুলেরই মতো।

শামীম বলল, আপনাকে একটি শায়ের শেখাচ্ছি। মৌলবি এলে বলবেন।

আর মৌলবি যখন জিজ্ঞেস করবে, কোথায় পড়েছেন এই শের?

আপনি বলবেন 'কোরান শরিফে'।

কোরান শরিফ তখনও আমি পড়িনি। গীতাও পড়িনি।

সেদিন তাই যা শিখিয়েছিল আমাকে শামীম পরম বাঁদরামো করে তাই সরল বিশ্বাসে কট্টর বিহারী-মুসলমান সেই মৌলবিকে বলে ফেলি। তার বন্দুকের গুলিতে প্রাণই গেছিল আর কী, যদি-না নাজিম সাহেব, শামীম, ইজাহার এবং নাজিম সাহেবের তিন হাট্টা-কাট্টা-নরপাঠ্ঠা ভাইপো মিলে মৌলবির হাত থেকে গুলি-ভরা বন্দুকটি ছিনিয়ে নিত।

শামীমের শেখানো শায়েরটা ছিল :

"আঁখে কিউ দিখলাতি হো?
যৌওন ত দিখলাও সাহাব,
উ অলগ বাঁধতে রাখ্‌না
যো মাল আচ্ছা হ্যায়।"

এইটি আবৃত্তি করাতেই ঘাড়ে-গর্দানে বেঁটে-নাটা মৌলবি তাঁর মাথাটি অতি কষ্টে ঘাড়ের উপরে ট্যাংকের উপরের কামানোর মতন এদিকে ওদিকে একবার ঘুরিয়ে বললেন, ওয়াহ! ওয়াহ!

বলেই বললেন, কিসকা থা উ্য? মীর্জা গালিব? ফিরাক গোরখপুরী? ইয়া জিগর মোরাদাবাদীকা?

আমি বত্রিশ পার্টি দন্ত বিকশিত করে বললাম, কোরান শরিফমে।

আর যায় কোথায়!

এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে মৌলবি দোকানের সামনে দাঁড়-করানো তাঁর সাইকেলের রড এর সঙ্গে বেঁধে রাখা বন্দুকটা খুলে নিয়েই নিজের জেব থেকে দুগাছা মুরগি-মারা চার-নম্বরি টোটা ভরেই, জ্যুইক করে লুঙিতে ঢেউ তুলে ঘুরে দাঁড়ালেন, কাফিরকে মারবেন বলে।

ভয়ে আমার পেট গুড়গুড়িয়ে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি তুতলে বললাম, শামীম মিঞানে শিখলায়া, মুঝে মত মারিয়ে। হামারা কুছ কসুর নেহি।

মৌলবি সাহেবের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। তবে আমারও কোনো দোষ ছিল না।

নেহাত বন্দুকটাই ততক্ষণে বেহাত হয়ে গেছিল নয়ত সেদিন শামীমের প্রাণ ধড়ে থাকত কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

এক মুসলমান যদি আনপড় হিন্দু কোনো নবাগন্তুক ছেলেকে মিথ্যে কথা বলে অমন বিচ্ছিরি রসিকতা করে, তাহলে যে-কোনো ধর্মের যে-কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষেরই রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেশে হয় এক ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে অন্য ধর্মাবলম্বীদের, তাদের মধ্যে অধিকাংশই শুরু হয় এই রকম নিছকই কোনো নির্দোষ মজা-করার প্রচেষ্টা থেকে। তারপর আতে ধৃতাহুতি দেয় গুজব।

তবে একথাও বলব যে, মুসলমানেরা বড়োই হঠাৎ-রাগি হন। হয়তো তাঁদের খাদ্যও তার একটি কারণ। আমিও যেহেতু দুবেলা রসুন, পেঁয়াজ ও কাঁচালংকা খেয়ে থাকি ও বিরিয়ানির ভক্ত আমিও ভীষণই বদরাগী।

আমার পরিচিত ও বহুদিনের শিকার-সাথী নিম্ন আসামের বন-জঙ্গলের, বিশেষ করে গোয়ালপাড়া জেলার মহম্মদ আবু সাত্তার (ছাত্তার) ওরকম হঠাৎ রেগে গিয়ে এক সকালে পরপর এগারোজন রিস্তাদারকে গুলি করে স্পট-ডেড করে ছেড়ে দেয়, জমি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জের হিসেবে। ধুবড়ির আদালতের বিচারে সাত্তারের ফাঁসি হয়ে যায়। গৌহাটি হাইকোর্টে আপিল করে সে। অনেক টাকা পয়সাও পাঠিয়েছিলাম—জঙ্গলের দোস্ত—কিন্তু লাভ হয় না কোনো। ফাঁসিতে তাকে ঝুলতেই হয়। সদাহাস্যময়, আস্তে কথা-বলা, পায়ে-হেঁটে বাঘ মারা অসীম-সাহসী সাত্তার কেন যে পৃথিবীর

নিকৃষ্টতম জীব মানুষকে বন্দুকের মতো পবিত্র যন্ত্র দিয়ে মারতে গেল তা কে জানে! বন্দুকের নল অবশ্যই অনেক ক্ষমতার উৎস কিন্তু সেই ক্ষমতাকে এমন অপাত্রে প্রয়োগের কোনো মানে হয় না।

হিন্দু-মুসলমানের প্রসঙ্গ এলেই, দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর কানে এলেই আমার যৌবনের সেই সব আনন্দমুখর বন-পাহাড়ের জিগরী-দোস্তির কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে আমার কলেজের সহপাঠী খাঁ-এর কথা। শায়ের শাহীর লুধিয়ানভীর শায়রীর কথা :

"তু হিন্দু বনেগা, ন মুসলমান বনেগা,
ইনসান কি ঔলাদ হ্যায়, ইনসানহি বনেগা।"

হাজারিবাগের সেই মৌলবিকে গিয়াসুদ্দিনের মাধ্যমে মাধুকরীতে অমরত্ব দিয়েছি।

একজন লেখকের কলম সাধারণকে অসাধারণ করতে পারে, কুৎসিতকে সুন্দর, বিরহকে মিলন এবং মিলনকে বিরহ। অতি সাধারণ অপাংক্তেয় স্থান ও কাল তাঁর কলমের আঁচড়ে চিরদিনের জন্যে আঁকা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু লেখকের নিজের চোখে, নিজের অনুভূতিতে কিছু না কিছু দেখা চাই, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

আমার যা মনে হয়, তা ভুলও হতে পারে। কিন্তু মনে হয়, যে-লেখকের অভিজ্ঞতা নেই তিনি কোনোদিনই পাঠক-পাঠিকার মনের স্থায়ী আসন পেতে পারেন না।

একবার, সাতান্ন বা আটান্নতেই হবে, হাজারিবাগের বাসস্ট্যান্ড থেকে গাঙ্গুলিদের লাল মোটর কোম্পানির মালিকদের মধ্যে একজন, রমেন গাঙ্গুলিকে পরে জেনেছিলাম।

রাঁচির রেডিয়ো স্টেশনের যখন উদ্বোধন হয়, সম্ভবত ষাট বা একষট্টিতে তখন ঋতুকে আকাশবাণী নিয়ে যান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্যে। তখনও বিয়ে হয়নি আমাদের। অনেক পরে আন্দামানের স্টেশন যখন উদ্বোধন হয় তখনও মোহরদি এবং ঋতু গেছিলেন ওঁদের আমন্ত্রণে।

প্রচণ্ড শীতের এক বিকেলে তো দীর্ঘ সফর করে আমরা বিকেল বিকেল গিয়ে পৌঁছোলাম চাতরাতে। চাতরাতে খাঁটি ঘিয়ে-ভাজা বড়ো বড়ো পান্তুয়া আর সিঙাড়া খেয়েছিলাম। আজও মনে আছে প্রায় চল্লিশ বছর পরে। তারপর বাস যখন শুক্লপক্ষের সপ্তমী-অষ্টমীর রাতে কুয়াশা ভেজা চাঁদের আলোতে ঘুমন্ত জৌরি গ্রামে নামিয়ে দিয়ে গেল তখন মনে হল কাঁধে বন্দুক-ঝোলানো তিনসঙ্গী কোনো ভূতুড়ে জায়গাতে নামলাম।

ডানদিকে একটি ছোট্ট মাদ্রাসা। মাটির ঘর, খাপরার চাল। উলটোদিকে মৌলবির বাড়ি। একরাম মিঞা মৌলবি। ছোট্ট বসার ঘরের তক্তপোশের উপরে চাদর বিছিয়ে মোটা মোটা বাজরার রুটির তাক সাজানো হল আর একটি লালনীল ফুলের কাজ করা বড়ো এনামেলের গামলাতে জবা-করা মোরগার ঝোল এল। ঝোলের পরিমাণ এতই বেশি ছিল যে, সেই গামলাতে হাত ডুবিয়ে মোরগা খুঁজতে যাওয়া আর পোলো দিয়ে চোত-বোশেখে শুকিয়ে ওঠা পুকুরে কই সিঙি মাছ ধরার হরকত একইরকম।

মৌলবির বাড়িতে আর চার-পাঁচজন স্থানীয় মানুষ ছিলেন নাজিম সাহেবের পরিচিত। সকলে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে রুটি ছিঁড়ে গামলার মধ্যে ফেলে খেতে লাগলাম।

মুসলমানদের এই জিনিসটা আমার ভারি ভালো লাগে চিরদিনই। এদের এই বিরাদরী। শিয়া সুন্নির ভাগ যদিও আছে কিন্তু ধর্মে কোনো বিভেদের বীজ নেই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভূমিহার, ক্ষত্রিয়, নমশূদ্র, নাপিত, ধোপা, ধুনুরি এই সব কৃত্রিম ভাগে ভাগ করেনি মানুষকে ইসলাম, যে বিভেদ হিন্দুধর্মের মধ্যে তার সর্বনাশের বীজ বপন করেছে এবং যে কারণে অগণ্য নিম্নবর্ণের হিন্দু, মুসলমান এবং ক্রিশ্চান হয়ে গিয়ে নিজেদের এই কৃত্রিমতা-জাত অপমান থেকে বাঁচিয়েছেন।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে মাদ্রাসার মেঝেতে খড়ের আঁটির উপর শুয়ে, ঘুমোবার বৃথা চেষ্টা করা গেল। ঘুমোনো গেল না। বড়ো বড়ো ছুঁচোর উপদ্রবে।

নাজিম সাহেব কিঁক কিঁক করে হেসে বললেন, আরে ছঁওড়াপুত্তান, সামাহালকে রহনা।

গোপাল বলল, কিঁউ?

ইসব চুহা বড়া খতরনাক হোতা। আদমীকা বদনকা সবসে নরম জাগা খা লেতা ইয়ে সব।

নাক খা লেগা?

আমি উদ্বিগ্ন গলাতে শুধোলাম।

নাজিম সাহেব খড়ের আঁটির উপরে কম্বলখানা বিছিয়ে বসে রাতের শেষ সিগারেটটি টান মারতে মারতে মাদ্রাসাকে জতুগৃহ বানানোর মতলবেই যেন, বললেন, হাঃ। মর্দকা বদন মে নাকসে নরম জাগা ওর নেহি হ্যায় ক্যা?

শুনে তো আমাদের ঘুমটুম সব ছুটে গেল।

নাজিম সাহেব বললেন, হাঁ। সামহালকর রাখনা উও কিমতি চিজ। চুহা খা লেনেসে দুনিয়ামে উসকি স্পেয়ার-পার্টস নেহি না মিলেগা। কোহিনুর ডায়মন্ড দেনেসেভি নেহি।

আমি আর গোপাল সারা রাত হিজ হিজ হুজ হুজ নিজের নিজের কিমতি চিজের উপরে দু'হাতের পাতা পদ্মপাতার মতো জোড়া করে রেখে পাহারাতে থেকে কাটিয়ে দিলাম।

ভোর রাতে ঘুমে চোখ যখন বুজে এসেছে ঠিক তখনই নাজিম সাহেব আমাদের ঘুম থেকে তুলে দিলেন তাঁর বিখ্যাত লালাবাবু-গোপালবাবু-গোপালবাবু-গোপালবাবু-লালাবাবু ডাক ডেকে।

অমন ডাক অন্য কোনো মানুষ ইচ্ছে করলেও ডাকতে পারবেন না। সে স্বরের কোনো আরোহন অবরোহন নেই। স্টিমারের ভোঁ এর মতন সটান সে ডাক। একই পর্দাতে শুদ্ধ স্বরে প্রথম থেকে শেষ অবধি বাঁধা। অপার্থিব।

ঘুম ভেঙে উঠে, যার যার কম্বল এবং বন্দুক হাতে করে বাইরে বেরিয়েই ঠাণ্ডাতে জমে গেলাম। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এদিকের পৃথিবী অনেক কম উষ্ণ ছিল, গাছপালা ছিল নিবিড়, মানুষ ছিল অনেক কম। দেখলাম একটি বয়েল-গাড়ি ঠ্যাং তুলে আছে। শিশির ভেজা তার কাঠামোতে মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমীর চাঁদের আলো চিকচিক করছে। বয়েল দুটো বসে বসে দুই নির্বিকার আঁতেলের মতন জাবর কাটছে। গাড়োয়ান একটি ছোটো আগুন করে তার দিকে পশ্চাৎদেশ এবং দুপায়ের পাতা নির্দেশ করে এক অদ্ভুত আনস্টেবল পশ্চারে বসে আছে।

নাজিম সাহেব, সে বেচারিকে ধমকে বললেন, চলো। চলো। শো গ্যায়ে ক্যা নবাবজাদা?

নেহি হুজৌর।

বলে, ঔরঙ্গজেবের মতো দাড়িওয়ালা গাড়োয়ান গাড়িতে বলদ জুতলো।

আমরা তিনমূর্তি উঠে বসলাম। পশ্চাদ্দেশ, শিশির ভেজা উদোম ছইহীন বয়েল গাড়ির সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডায় জমে পাথর হয়ে গেল। দোনলা বন্দুকের তিনটি উত্তুঙ্গ মাথা উচিয়ে থাকল সেই শেষরাতের ভুতুড়ে আধো-অন্ধকার আকাশের চাঁদোয়ার মাথা ফুঁড়ে। কোনো সত্যি ভূত বা দানো সেই সময়ে আমাদের দেখতে পেলে সে এই কিম্ভূতদের দেখে ভয়েই অক্কা পেত যে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

দুটি নদী পেরুনো হল বয়েল গাড়িতে। জল তো নয়, যেন কুলফি। ফ্রিজের দরজা খুললে যেমন ধোঁয়া বেরোয় তেমনিই ধোঁয়া বেরোচ্ছিল নদীর গা থেকে। তাদের একটির নাম "ইলাজান" অন্যটির নাম "জাঁম"। দুটিই ফল্গুর উপনদী।

জাঁম, মানে হচ্ছে পানপাত্র।

নাজিম সাহেব বললেন।

জৌরী, বিহারের হাজারিবাগ জেলাতে নয়। এখন কোনো অন্য জেলাতে পড়লেও পড়তে পারে, হাজারিবাগ কোডারমা আর গয়া জেলার সীমানার পুনর্বিন্যাস হয়েছে বেশ কিছুদিন হল। কিন্তু চল্লিশ বছর আগে জৌরী গয়া জেলাতেই ছিল।

গয়া জেলা শীত এবং গ্রীষ্ম দুইয়ের জন্যেই বিখ্যাত-কুখ্যাত। তাই মাঘের শেষ রাতে যে শীতে কাঁপব সামান্য গরম জামাতে তাতে আর আশ্চর্য কী! তখন গরম জামা কাপড় তেমন ছিলও না। জামা-কাপড়ের বিলাসিতা আমাদের পরিবারে আদৌ ছিল না, উলটে চালিয়াতি বলেই গণ্য করা হত তা।

যাই হোক, জানা গেল যে, আমরা চলেছি জৌরী থেকে সিজুয়াহারা পাহাড়ের উপরে রঘু শাহর ভাণ্ডারে। সেখানে নাস্তা করে সারাদিন ছুলোয়া শিকার হবে। কুসুমভা গ্রাম থেকে কাড়ুয়া নাকি

গতকাল সকালেই সেখানে পৌঁছে আমাদের ইন্তেজারী করছে। কাড়ুয়া ছাড়াও আনোয়ার আলি, আমজাদ খাঁ, আকবর বকরীওয়ালা, আনাজের কারবারি নজরুল হক এরা সব জৌরীর মৌলবির নির্দেশে গত সকালেই গিয়ে ছুলোয়ার ইন্তেজাম পাকা করেছিল। উদ্দেশ্য, এক একটি করে শম্বর অথবা চিতলের রাং কবজা করা। যদি শিকার আদৌ হয়।

এই কাড়ুয়া একটি আশ্চর্য চরিত্র। পুরোপুরি একশো ভাগ ভারতীয় চরিত্র। পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট মিশেল নেই সে চরিত্রে। তার কথা "বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে"তে বিস্তারিত লিখেছি। 'মাধুকরী'র ঠুঠা বাইগার মধ্যেও কাড়ুয়া অনেকখানি আছে।

সিজায়াহারার রঘু শাহকে ছেড়ে তার স্ত্রী চলে গেছিল। জৌরীতে যাওয়ার আগে অনেকই স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রী দেখা ছিল আমার কিন্তু স্ত্রী-পরিত্যক্তা স্বামী জীবনে সেই প্রথম দেখলাম। অ্যালবিনো টাইগারেরই মতন দুষ্প্রাপ্য প্রজাতি ছিল স্ত্রী-পরিত্যক্তা স্বামীরা। আজকাল অবশ্য খুঁজলে হাজারে হাজারে তাঁদের পাওয়া যাবে।

ভারী একটা বিষাদ দেখেছিলাম সেই একা-হয়ে যাওয়া মানুষটির চোখে। তিন বছরের মেয়ে ছিল তারই কাছে। মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার অসীম ক্ষমতাকে সে হয়তো তখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। তাই দুঃখ পাচ্ছিল তখনও।

স্ত্রী বা স্বামী, যেই যাকে ছেড়ে যায়, কী করে যে ছেড়ে যায়, আমি আজও ঠিক ভেবে পাই না।

'একটু উষ্ণতার জন্যে'র নায়িকা ছুটি যখন লিভ-টুগেদার শুরু করল রুদ্রর সঙ্গে, হাজার পাঠিকা তখন আমাকে উষ্মার সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন ছুটিকে অমন 'খারাপ' করে দিলাম কেন? অগ্রজ সাহিত্যিক বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), চিত্রতারকা সুপ্রিয়াদেবীর জামাইবাবু, যুগান্তরের বাড়ির ছাদে এক অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে প্রথম ও শেষ দেখা হওয়ার সময়ে আমাকে বলেছিলেন "কোয়েলের কাছে"' দারুণ লিখেছ কিন্তু শেষকালে ওই সুমিতা মেয়েটিকে "খারাপ" করে দিলে কেন? বিবাহিতা মেয়ের কি অমন পরপুরুষের সন্তান ধারণ করা উচিত?

আমার ভক্ত পাঠিকা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তিনিই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে। তিনি কী *বলেছিলেন তাঁকে, তা মনে নেই কিন্তু আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলাম, সুমিতা বউদি ওই রকমই ছিলেন।*

আমার আজও মনে হয় একেকজন মানুষ একেকরকম হবেই। এতে আশ্চর্য না হওয়াই বোধহয় ভালো। সবাই একইরকম হলে এই পৃথিবী হয়তো দারুণ আন-ইন্টারেস্টিং হত।

তাছাড়া প্রতিদিনই সমাজ এবং সংসারের চেহারা পালটাচ্ছে। বনফুলের সময়ের প্রেক্ষিতে 'কোয়েলের কাছে'র সুমিতা বউদি নিশ্চয়ই বিদ্রোহী। আমার ষাটের দশকের পাঠিকাদের প্রেক্ষিতে—যাদের মধ্যে কেউ কেউ মা তো বটেই হয়ত দিদিমাও হয়েছেন এখন, 'একটু উষ্ণতার জন্যে'র ছুটিও "বিদ্রোহী"। কিন্তু বর্তমানের পাঠক-পাঠিকার কাছে 'ছৌ' উপন্যাসের তেঁতুল চরিত্রটিও কিন্তু প্রচণ্ড প্রাসঙ্গিক। তেঁতুল লিভ-টুগেদারও করতে চায় না। তার ডিভোর্সের পরে সে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, ভবিষ্যতের সমাজে বিয়ে নামক একটি পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই উঠে যাবে।

তেঁতুলের ফিলজফির কথা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবছেনও এখন অগণ্য পাঠক-পাঠিকা। 'ছৌ' সম্পর্কে চিঠি যেসব পাই, তাই তার প্রমাণ। সমাজ এতটাই বদলে গেছে গত এক যুগে যে, গার্হস্থ্য, দাম্পত্য এবং অপত্যর ধরন যে। সেই কবিতাটির নাম, "সহজসুন্দরী" কাব্যগ্রন্থে ছিল কবিতাটি।

"কী আশ্চর্য ভেবেছিলাম
একটি পুরুষ, কোমল নয়ন, একটি তনয়,
ধরে রাখব ভালোবাসায়
আপন সুখের গোপন স্বর্গ শান্তির নীড়
খুব সহজেই বানানো যায়
ভেবেছিলাম, কী আশ্চর্য
ভেবেছিলাম।"

হাজারিবাগের অনুষঙ্গের কথা মনে এলেই শুধু হাজারিবাগই নয়, তার পরিমণ্ডলের কথাও মনে পড়ে যায়। বিশেষ-করে সীতাগড়া এবং কানহারি পাহাড়ের কথা। সিলওয়ার একটু দূরে ছিল। সীতাগড়ার উপরে একটি পিঁজরাপোল ছিল। সেখানের গোরু বাছুর অবাধে মারতে শুরু করে একটি বড়ো বাঘ। সেই বাঘটি পরে মানুষ মারতেও শুরু করে। গোপাল, আমি আর নাজিম সাহেব গিয়ে হাজারিবাগ শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে সাইকেল রিকশা করে তার তত্ত্বতালাশ করি। কারওই গাড়ি ছিল না তখন। সামর্থ্যও ছিল না গাড়ি ভাড়া করার। মাচা বেঁধে একরাত বসিও। বাঘ সেদিন আসে না। আমি কাজের জন্যে কলকাতায় ফিরে আসার পর গোপাল ও নাজিম সাহেব আবার একদিন বসেন। বাঘ এসে বেঁধে-রাখা মোষকে মারে। গোপাল বাঘকে গুলিও করে কিন্তু যে আমগাছে মাচা বেঁধে তারা বসেছিল তারই একটি ডালে লেগে গুলি কক্ষ্যচ্যুত হয়ে যাওয়াতে বাঘের গায়ে আর লাগে না। তারপর গোপালও কলকাতাতে ফিরে আসার পরে আসার পরে সুব্রত আর ইজাহার সেই ভয়াবহ বাঘকে মারে। দশ ফিট ছ ইঞ্চি ছিল সেই বাঘ। ওভার দ্যা কার্ভস। পঞ্চাশের দশকে পূর্বভারতে অতবড়ো বাঘ আর মারা পড়েছে বলে আমার জানা নেই।

ছাড়োয়া ড্যাম, রাজডেরোয়া (হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক), গোন্দা বাঁধ, ইটখোরি-পিতিজ, চৌপারন, জৌরী-হান্টারগঞ্জ, সীমারিয়া-চাতরা, টাটিঝারিয়া, বাঘড়া মোড়—চান্দোয়া-টোরী, কুসুমভা-বনক্ষেতি—সিঁদুর গাঁ—রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্কের মধ্যের হারহাত বনবাংলো এসব নিয়ে লেখা আমার কত যে উপন্যাস এবং ছোটো গল্প আছে তার ইয়ত্তা নেই। দিগন্তরেখাতে দেখা-যাওয়া পানুয়ান্না টাঁড় এবং করণপুরার টাঁড়ের জলপাই সবুজ রেখারা যেন আমাকে অদেখা নাড়া বইহার আর লবটুলিয়ার কথা মনে করিয়ে দিত।

রঘু শাহর ভাণ্ডারে রাতের খাওয়া দাওয়ার পরে রাত এগারোটা নাগাদ জৌরীর দিকে বেরোলাম আমরা। পরদিন ভোরের বাস ধরে হাজারিবাগে ফিরব বলে। শিকার কিছুমাত্রই হয়নি বলেই অত তাড়াতাড়ি বেরোন গেল। সারা দিনে বোধহয় মাইল কুড়ি হাঁটা হয়েছিল সেদিন। অথচ একটি ঘুঘুও দেখা যায়নি। নাজিম সাহেব বললেন এইরকমই হয়। গভর্নরের সুট-এও কখনও কখনও ঘুঘু বেরোয় শুধু। বাবা বলতেন "Failures arc the pilars of success"। শিকার থেকে যারা শিখতে চান তাঁরা অনেকেই শিখতে পারেন।

সিজায়াহারা থেকে ফেরার সময়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যের পথ দিয়ে শীতার্ত গভীর নির্জনে ক্যাঁচোর-কোচোর করে গোরুর গাড়ি চলেছে। রাতও গভীর।

রঘু শাহর ভাণ্ডারের খাঁটি ঘিয়ে ভাজা পুরী আর আলুর চোকা আর মুরগির মাংস খেয়ে বেরিয়েছি আমরা। সারাদিন ওই পরিশ্রমের পরে ঘুমে চোখ বুজে আসছে কিন্তু শীতে ঘুম আসছে না। নাজিম সাহেব, গোপাল এবং আমি বয়েল গাড়িতে আর পেছনে পেছনে কাড়ুয়া তার একনলা গাদা বন্দুকটি কাঁধে, খালি পায়ে, ধুতি আর শার্ট পরে, গায়ে তার চাদরটি নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে সেই শীতার্ত রাতে। খালি পায়ে কী করে যে হাঁটছিল সে তা আজও ভাবলে অবাক হই। কাড়ুয়ার জুতো ছিল না। জন্মাবধি পরেনি। দিলেও, পরে স্বস্তি পেত না। দিয়ে দেখেছি।

কাড়ুয়া গান গাইতে গাইতে আসছে;

"তু কেহরো...
কচমচ ছাতি,
তোরা সুরত দেখি মোরা বসল নজারিয়া হো
বসল নজারিয়া....
হো তানা কৈসানা দিনা
দেখব নজারিয়া হো,
দেখব নজারিয়া,
তু কেহরো?
কচমচ ছাতি..."

তুমি কেগো অমন কচমচে বুকের মেয়ে? তোমাকে ঝর্নাতে দেখে আমার চোখ যে বসে গেল।

কবে সেদিন আসবে যেদিন তোমার চোখ আমার চোখে পড়বে?

এই গানটিই 'কোজাগর' এর নানকুর মুখে লাগিয়ে দিয়েছি জুৎসই জায়গাতে।

আমার কোনো উপন্যাসই রাতারাতি লেখা হয়নি। শুধু বাস্তব পটভূমিই নয়, দীর্ঘদিনের ভাবনা চিন্তা থাকে প্রত্যেকটি উপন্যাসেরই পেছনে। সেই জন্যেই অত্যন্ত কম লেখালিখি করে উঠতে পারি।

আজ নাজিম সাহেব নেই, গোপাল নেই, এমনকি কাড়ুয়াও নেই। আমারও বয়স আগামী আষাঢ়ে ষাট হবে। আজকালকার হিসেবে এমন কিছু বেশি বয়স হয়নি। তবু সে-রাতের সঙ্গীরা কেউই আর নেই। প্রতিমুহূর্তেই ক্ষণ গুণি কবে মিলিত হব আমার জঙ্গলের সঙ্গীদের সঙ্গে, নির্লোভ, মৎলবহীন, দোস্তী-কসম, নিঃস্বার্থ সেই বন্ধুদের সঙ্গে?

এখানে দমবন্ধ লাগে। সত্যিই! স্বার্থপরতা, নীচতা, ইতরামি, টাকা-সর্বস্বতা, ঈর্ষা, বহিরঙ্গের এবং অন্তরঙ্গের পল্যুশান যেন বজ্রমুষ্ঠিতে গলা টিপে ধরে।

যেদিন ইন্টারমিডিয়েট সি. এ পরীক্ষার ফল বেরোলো সেদিন সকালে কুমার আর বুদ্ধ আমাকে নিয়ে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার অফিসে গেল ডালহাউসিতে। ওরা কত জানে শোনে। সত্যি! দেখে তাজ্জব বনে গেলাম।

আমি অনেক পাহাড় জঙ্গল নদী হ্রদ চিনি, চিনি মনের অনেকেই অলিগলি, নিজের মনের এবং অন্যমনেরও কিন্তু কলকাতা শহরের কিছুই প্রায় চিনি না। আজও চিনি না। শহরে আমি গৃহবাসী, পুরোপুরি অন্তঃপুরবাসী।

আমরা তিনজনেই পাশ করেছি। কুমার ও বুদ্ধ খুবই উত্তেজিত।

আমি ততখানি নই।

হতে চেয়েছিলাম এয়ারফোর্সের পাইলট বা আর্মির অফিসার, নিদেনপক্ষে শান্তিনিকেতনের বাংলার অধ্যাপক। অথচ যা বুঝতে পারছি, আমার ভাগ্যলিপি আমাকে চক্রান্ত করে অন্যদিকে চালিত করছে। এ-পরীক্ষা পাশ করা হতো না আমার। কারণ পাশ করার তেমন তাগিদ ছিল না। বলতে গেলে কুমার আর বুদ্ধর খপ্পরে পড়েই পাশ করতে হল।

ট্যাক্সি করে ওরা বিজয়ানন্দে সোজা আমাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এল মাকে প্রণাম করবে বলে। ওরা বলল, এতো আর ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নয়, প্রফেশানাল পরীক্ষা। চাট্টিখানি কতা। মর্নিং শোজ দ্য ডে। আমরা পারব। উই উইল মেক ইট।

ইন্টারমিডিয়েট সি এ তো পাশ করলাম।

অতঃপর?

এরপরে আর ফাইনাল না দিয়ে উপায় নেই।

এদিকে সকালে ল কলেজেও ভরতি হয়ে গেলাম। ইউনিভার্সিটি ল কলেজে। ভোরে উঠে ইউনিভার্সিটিতে যাই। কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটি ক্যানটিনে ভাত খাই তারপর ভিড়ের বাস ট্রামে অফিসের সময় উঠতে না পেরে, হেঁটে অফিসে আসি।

অফিস থেকে ফিরে সাধারণত বাড়িতেই আসি। কখনও কখনও দক্ষিণীতে যাই। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে যাওয়ার সময় এক-দুদিন ছাড়া আর পাইনি। পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে নিজের যে সব বিষয়ে উৎসাহ ছিল সাহিত্য, শিকার, প্রকৃতি, ছবি এসব বই কিনি। একবার পয়লা বৈশাখ অথবা পুজোর বোনাস পেয়ে অক্সফোর্ড থেকে একটা মঁ ব্লাঁ কলম কিনে ফেললাম। তখন আসত। দীপকও একটি জুনিয়র মঁ ব্লাঁ দিয়েছিল আমাকে। সেই কলমটি দিয়েই আমি 'কোয়েলের কাছে'র পুরোটা লিখি। দশ-পনেরো বার পুনর্লিখনও করি। এখনও লিখতে জানি না এবং তখন তো জানতামই না।

আধঘন্টা অন্তর অন্তর কলম বদলানোর কারণে পরবর্তী জীবনেও আমার হাতের লেখা কোনোদিনও ভাল হল না। আর হবার সম্ভাবনাও নেই। আমার লেখার টেবলে গোটা দশ-বারো কলম না থাকলে আমি একটি চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারি না, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করি। সে কারণেই হাতের লেখা ভালো হবার কোনো সম্ভাবনা আর দেখি না।

ইতিমধ্যে মোহনের বাবা মুকুন্দবাবুর নিমন্ত্রণে পালামৌ থেকেও ঘুরে এসেছি বার দুয়েক। প্রথমবারে গেছিলাম ট্রেনে। সঙ্গে বাবা, দুর্গাকাকু (শিলিগুড়ির দুর্গা রায়) আর ছোটোকাকু ছিলেন। দুন এক্সপ্রেসে বারকাকানা-কোচ থাকত। গোমোতে কেটে রেখে দিত। শেষ রাতে ছাড়ত। ভোর হলেই পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যের এক অন্য রাজ্যে পৌঁছে যেত গাড়ি।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম সারাটা পথ। আর তখন বর্ষশেষ। পয়লা বৈশাখের দিন দশেক আগের কথা। রেলপথের দুপাশে লাল-হলুদ পাটকিলে গাঢ়-সবুজ, ফিকে-সবুজ, খয়েরি বেগুনি রঙের দাঙ্গা লেগেছে গেরুয়া-রঙা বিবাগী জমির উপরে। চৈত্র শেষের ও বৈশাখের গোড়াতে ভারতীয় পর্ণমোচী বনজঙ্গলের যে শোভা তার সঙ্গে তুলনীয় পৃথিবীর আর কোনো জঙ্গলই নেই। ইয়ারোপ, ইউ এস এ, কানাডা, জাপান ইত্যাদি দেশে FALL -এর সময়ে রঙের সমারোহ দেখেছি কিন্তু তার সৌন্দর্য অন্যরকম। ভারতীয় বনের মতো রং, গন্ধ এবং শব্দের বৈচিত্র্য সেখানে নেই। পূর্ব-আফ্রিকাতে গেছিলাম শীতে। জুলাই মাসে শীত আসে আফ্রিকাতে। তাই তার বিবাগী রূপ দেখেছি। ভোগী রূপ দেখিনি। জানি না, কেমন সাজে সাজে তখন সেরেঙ্গেটি প্লেইনস বা গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ অথবা লেক মানীয়ারা। অস্ট্রেলিয়াতেই এখনও যাওয়া হয়নি। তবে ঋতুর কাছে শুনেছি যে অস্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও নকি বিবশ-করা।

বারকাকানার আগে গোমীয়া পড়ল। সুব্রত তখন ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস-এ চাকরি করে। গোমীয়ার পটভূমিতেও আমার একাধিক ছোটো গল্প আছে। অনেকবারই গেছি সেখানে। টড হান্টার সাহেবের নামে পাহাড় আছে। এক্সপ্লোসিভের কারখানা বলেই এক একটি ইউনিট দুটি টিলার মাঝখানে করা হয়েছিল যাতে একটা ইউনিটে দুর্ঘটনা ঘটলে যেন সেই টিলারা তা অন্যত্র না ছড়াতে সাহায্য করে।

কারখানার এলাকা অনেক বর্গ মাইল। পুরো এলাকাটা প্রায় দুমানুষ উঁচু পাঁচিল তোলা। তার উপরে কাঁটাতারের বেড়া।

কিন্তু সুব্রত চ্যাটার্জির কপাল বলে কথা! একটা ব্যর্থ প্রেমিক রয়্যাল বেঙ্গল "গুলিখোর" টাইগার সুব্রতর হাতে গুলি খেয়ে মরবে বলেই কি করে যে ওই পাঁচিল টপকে এবং কেন যে কারখানার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল কে জানে! কিন্তু বাঘ তো ডিনামাইট চিবিয়ে খেয়ে বাঁচতে পারে না। খরগোশ তিত্তির ইত্যাদি খেয়ে কিছুদিন থেকে পেটের জ্বালাতে রাতের বেলা ইতিউতি চলা ফেরা করতে লাগল সে। কারো ক্ষতি করেনি। কিন্তু লেবারার ও ফোরম্যানদের কারো কারো চোখে পড়ল। গাঁজাখোর বলে তাদের তো হুড়িয়ে দিল সকলে প্রথম প্রথম। তারপরে যখন আরও অনেকের চোখে পড়ল তখন ইংরেজ বড়ো সাহেব স্পোর্টসম্যান সুব্রতকে ছুটি দিয়ে, জিপ দিয়ে, ওই বাঘ মারার অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন। বাইরের কোনো শিকারি ওখানে কায়দাও করতে পারতেন না কারণ কোথায় কোথায় বিস্ফোরণের ব্যাটারি আছে না আছে তা স্থানীয় কর্মীরাই জানতেন। এলোপাথারি গুলি চালাবার জায়গা বিস্ফোরকের কারখানা নয়।

সুব্রত হাজারিবাগ থেকে নাজিম মিঞাকে তলব করে সারাদিন ঘুমিয়ে নিয়ে সন্ধের পর জিপ নিয়ে কারখানাতে ঢুকত। আলো হাতে নাজিম সাহেব আর রাইফেল হাতে সুব্রত স্টিয়ারিং হাতে ড্রাইভারের সঙ্গে চক্কর মারতে লাগল পুরো কম্পাউন্ড। দুসরি অথবা তিসরি রাতে চারচোখের মিলন হল। একেই বলে টাইগার-লাক। সুব্রতর মতন টাইগার-লাক সত্যিই কারো দেখিনি। যখন সীতাগড়ের মানুষখেকো বাঘটি মারল ওর বাবার পয়েন্ট ফোর টোয়েন্টি থ্রি আন্ডার-লিভার বন্দুক-রাইফেল দিয়ে ঘটাং-ঘটাং আওয়াজ করে তখন ও কাগা-বগাও মারেনি। নিজের রাইফেলও ছিল না। এস পি সাহেবের ব্যাটার কাছে সেই জেলাতে আর লাইসেন্স দেখতে চাইছেই বা কে!

যাই হোক, দু-দুটো বড় বাঘ তার মধ্যে একটি আবার মানুষখেকো, মেরে, সুব্রত এ-অঞ্চলে রীতিমত সেলিব্রিটি হয়ে গেল।

বারকাকানাতে নেমে, নাজিম সাহেবের ভাষাতে, "ডাটকে" নাস্তা করে, চৌপান এক্সপ্রেস-এ উঠলাম আমরা। তখনও পত্রাতু হয়নি। পুরো পথটি যেন স্বর্গরাজ্য ছিল। তার মধ্যে সামান্য রসভঙ্গ করত খিলাড়ির এ. সি. সি.র সিমেন্ট কারখানা আর কিছু লাইমস্টোন কোয়ারি। নইলে সবুজেরই সাম্রাজ্য ছিল। কী সব রোম্যান্টিক নাম স্টেশনগুলোর। হেহেগাড়া, (আন-রোম্যান্টিক) রিচুঘুটা, (এটাও তাই) ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, কুমাণ্ডি, মহুয়ামিলন, টৌরী, লাতেহার, চিপাদোহর ইত্যাদি করে শেষে ডাল্টনগঞ্জ। স্থানীয়রা বলতেন লাল্টনগঞ্জ।

আমরা চিপাদোহরে নেমে গেলাম। দুপাশে উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রেলপথ গেছে। শান্তিনিকেতনের খোয়াইয়ে যেমন আছে তার চেয়ে অনেকই গভীর সেই খাত।

চিপাদোহরে মোহনদের একটা ট্যান্সপোর্ট ডিপো ছিল। পেট্রল পাম্প। বহু বর্গ মাইল বিস্তৃত পরিমণ্ডল থেকে বাঁশ এনে ট্রাকেরা জমা করত চিপাদোহর ইয়ার্ডে। সেখান থেকে অনেকগুলি ওয়াগন এর Rake লাদাই হয়ে বাঁশ চলে যেত কলকাতার দিকে কাগজ কলে। আর আপ-চৌপান প্যাসেঞ্জার বয়ে নিয়ে যেত কয়লা, বাংলা আর বিহারের কয়লাখনিগুলো থেকে উত্তর ভারতে। শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস তো এই সেদিন হয়েছে। আগে সকালে একটি আর বিকেলে একটি শ্লথগতি ট্রেন শুধু। চৌপান এক্সপ্রেস।

চিপাদোহরে ছিলাম না, আমরা ছিলাম 'মুণ্ডু' বন বাংলোতে। সেই প্রথমবারে যাওয়া। কুটমূর মোড়ের আগে কেচকি, কুটমুর মোড় হয়ে বারোয়াড়ি-মোড়োয়াই-শুটার-কুজরুম হয়ে কূটকু। সেই কূটকু, 'কোয়েলের কাছে' তে যে কূটকূর কথা আছে। সুগত যেখানে বাঘের হাতে মারা গেছিল। নাকি, আত্মহত্যা করেছিল?

লাত, কুমাণ্ডি, গাড়ু, মারুমার, রাংকা (অন্যদিকে), বেতলা, বাড়েষাঁন ইত্যাদি কত আশ্চর্য সব জায়গা। বেতলাতে ঔরঙ্গার উপরে ওরাওঁ রাজাদের বানানো প্রাচীন সব দুর্গ, কমলদহ, ঔরঙ্গা আর কোয়েলের আশ্চর্য সুন্দর বিধুর রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

তখন বুঝিনি যে এই পালামৌ এর সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ ঘটবে।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জ নামের সেই চোখে না-পড়া স্টেশানটিতেও একদিন আমার পা পড়বে। সেখানে ডেরা করব অস্থায়ী। 'একটু উষ্ণতার জন্যে' পড়ে, বাঙালিরা ঐ অখ্যাত জায়গাটিকে ট্যুওরিস্ট স্পট করে তুলবেন জানতাম না।

তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

বেতলাও তাই।

বছরে কত হাজার বাঙালিই যে যান।

অধিকাংশই নাকি বলেন যে, 'কোয়েলের কাছে' আর 'কোজাগর' পড়েই তাঁরা আসেন।

টাইগার প্রজেক্টের সঙ্গম লাহিড়ী এবং ডি. এফ. ও কাজমি সাহেব তো তাই বলেন!

সত্যি কি না, তা যাঁরা বেতলা যাবেন ভবিষ্যতে, তাঁরাই বলতে পারবেন।

ভোরবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ, এবং অফিস ছাড়া কোথাওই আর বিশেষ যাই না। রাজা বসন্ত রায় এক্সটেনশন তখন নতুন পাড়া। যদিও পাড়া বেড়ানো বা পাড়ায় আড্ডা মারা যাকে বলে, তা কোনোদিনও ঘটে ওঠেনি। সেই অর্থে পাড়া-বেপাড়া চিরদিনই সমান ছিল। পুরো পাড়াই নতুন। সেই নতুন পাড়ার সব বাড়িও নতুন। মানুষজনও কম। ছেলেমেয়েরা ছোটো এবং অবিবাহিত। সন্ধের পরে মনে হত কলকাতা শহরে নেই, অন্য কোথাও আছি। শেষ বিকেলে টেনিস খেলে অথবা না-খেলে বাড়ি ফিরে চান-টান করে নিজের ঘরটিতে পড়াশোনোর টেবলে এসে যখন প্রিয় চেয়ারটি টেনে নিয়ে বসতাম তখন কী যে শান্তি পেতাম কী বলব।

আজও সেইরকমই মনে হয়। সারাদিনের নানা বৈষয়িক ঝামেলার পরে যখন রাতে চান-টান করে লেখার টেবলে এসে বসি, পড়ি নয়ত লিখি, নয়ত গান শুনি, নয়ত মেঝেতে বসে ছবি আঁকি তখন মনে হয় সারাদিন যে সময়টুকু অপব্যবহার করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছি এখন। "জীবিকার" বজ্রমুষ্টি ছাড়িয়ে নিয়ে এসে "জীবনের" মুখোমুখি বসেছি। যে-জন্যে প্রত্যেক মানুষেরই বেঁচে থাকা।

রাজা বসন্ত রায় রোডের 'কনীনিকা', বাবার বাড়ি ছেড়ে এসেছিলাম ছিয়াত্তরের মাঝামাঝি। কেন ছেড়ে এসেছিলাম, সেটা অবান্তর। ছিয়াত্তরের মাঝামাঝি থেকে নব্বুইয়ের মাঝামাঝি ছিলাম বালিগঞ্জ পার্ক রোডের একটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। "চানঘরে গান"-এ সে রাস্তার কথা বলা আছে। তারপর উঠে আসি আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিন্যুর অন্য একটি বহুতল বাড়িতে। এই রাস্তারই নাম ছিল আগে ওল্ড বালিগঞ্জ রোড। এই আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর দাদা। অত্যন্ত ধনী, কৃতী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন বিদ্বান। আপন দাদা ভাইয়ের একই নারীকে প্রেম নিবেদন করার এমন উজ্জ্বল উদাহরণ বঙ্গভূমের কেউকেটাদের মধ্যে আর হয়তো নেই, সাধারণের মধ্যে যদিও খুঁজলে অগণ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে। তবে যে নারীর পায়ে এই অর্ঘ্য নিবেদিত তিনি তো সাধারণ ছিলেন না! ইংরেজি, ফরাসি, সংস্কৃত, বাংলাতে পণ্ডিত। গানবাজনাতে অতি পারঙ্গম সেই মহিলা ছিলেন ইন্দিরা দেবী। তাঁর নিজ যৌবনে বাংলার সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক এবং সাঙ্গীতিক মহলে যাঁর প্রভাব ছিল ইন্দিরা গান্ধির চেয়ে কম নয়। বরেন্দ্রভূমির জমিদার প্রমথ চৌধুরীকে বিয়ে করে তিনি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী হন। তাঁদের দুজনের প্রাক-বিবাহ যুগের কিছু চিঠিপত্র 'দেশ' পত্রিকাতে একসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এমন মিলকেই হয় তো বলে রাজযোটক মিল।

পড়াশোনা করি বটে কিন্তু পাঠ্য বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগে পাঠ্য নয় এমন বই পড়তে। সেসব বই পাঠ্য যেমন নয়, অপাঠ্যও নয়। রীতিমত সুপাঠ্য। আমার দোষ বা গুণ যাই বলুন পাঠক, অভ্যেস ছিল, একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন বই পড়া। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালা', জিম করবেটের 'জাঙ্গল লোর', জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির কোনো বই, মোটর র‍্যালির ফার্স্ট-রেসিংয়ের গ্রা-প্রিঁর বই, রাধাকৃষ্ণনের উপনিষদ, হেনরি ডেভিড থোরোর ওয়ালডেন, সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের পঞ্চতন্ত্র বা আন্তন চেকভের গল্পগুচ্ছ। এরকম করে পড়তেই ভালো লাগত। যা ভাল লাগত তার নীচে দাগ দিয়ে রাখতাম। অনেক জায়গাতে নিজের মন্তব্যও লিখতাম। এই কারণেই অন্যের বা লাইব্রেরির বই পড়ে আমি আদৌ মজা পেতাম না। যে-বই ভালো লাগত সে বইই নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখতাম পরে।

যেদিন বইয়ের আলমারিগুলো গোছাতাম বা পরিষ্কার করতাম সেদিন সময় বয়ে যেত অন্যমনে। একটি প্রিয় বই তুলে নিয়ে তা পরিষ্কার করার সময়েই পাতা ওলট ওলট হয় তো অনবধানে আধঘণ্টা সময় কেটে যেত। সেদিন আর নাওয়া-খাওয়া হত না।

নতুন বইয়ের গন্ধ যেমন ভালবাসতাম, পুরোনো বইয়ের গন্ধও ভালো লাগত। এক একটি বই হাতে নিয়ে কত কথাই যে মনে পড়ে যেত, আজও যায়! সে বই হয়তো কোনো রেল স্টেশনে বা এয়ারপোর্টে কেনা। কোনো হোটেলের ঘরে বা জঙ্গলের কোনো বাংলোর বারান্দাতে বসে তা পড়েছিলাম। সেই সব অনুষঙ্গর কথা মনে পড়ে যেত।

মনে আছে, একবার পাটনাতে গেছি, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালে সওয়াল করতে। সত্তরের দশকের গোড়াতে। ধানবাদের এক মক্কেলের আপিল। সঙ্গে ছিল অমিয়নাথ সান্যালের 'স্মৃতির অতলে'। যাওয়ার পথে তো ট্রেনে পড়েছিলাম কিছুটা তারপর কেস শেষ হওয়ার পর থেকে সেই বইয়ে এমনই মন লেগে গেছিল যে ফেরার ট্রেন সে রাতে সত্যিই মিস করতাম যদি না মক্কেলের অ্যাকাউন্ট্যান্ট আমাকে স্বপ্নোত্থিতের মতো প্রায় পাঁজাকোলা করে হোটেল থেকে তুলে ট্রেনে উঠিয়ে না দিত। তবে একথাও ঠিক যে অমন বই, গানবাজনা এবং গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে, বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই। ব্যতিক্রম, কুদরত্‌ রঙ্গিবিরঙ্গি।

লেখক, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভালো বই। বার বার পড়তে ইচ্ছে যায়। সে উপন্যাসই হোক বা আত্মস্মৃতিই হোক। 'স্মৃতির অতলে'ই আরেকবার রসিয়ে রসিয়ে পড়েছিলাম নব্বুইয়ের গোড়াতে রাজস্থানের সারিসকা অভয়ারণ্যে এবং আলওয়ারের পূর্বতন এক রাজার বাড়িতে। তবু আবার যে-কোনো সময়ে অমিয়নাথ সান্যালের এই বইটি সাগ্রহে পড়া যায়। এইরকম লেখক যাঁরা, তাঁরাই সার্থক।

তখন কাব্যরোগে যে পেয়েছে তা তো আগেই বলেছি। কবিতার খাতা ছিল একটা পুরোনো মোটা ডায়েরি। একটি সুইডিশ কোম্পানির। সেটা যে সুইডিশ কোম্পানিরই ডায়েরি সে কথা মনে আছে 'আক্তিবোলাগেট' শব্দটির জন্যে। ইংরেজিতে যা লিমিটেড কোম্পানি, তাই সুইডিশে আক্তিবোলাগেট।

পরবর্তী জীবনে সুইডিশ মক্কেলদের কল্যাণে জেনেছিলাম এই তথ্য।

কাব্যরোগ আরও কিছুদিন পরে হঠাৎই মারাত্মক রূপ ধারণ করে। প্রায় Virulent হয়ে ওঠে। তার একটি বিশেষ কারণও ঘটেছিল।

তরুণী ঋতু গুহঠাকুরতার রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম রেকর্ড সবে বেরিয়েছিল কিছুদিন আগে। কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত ঋতুর প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, "ঈশ্বরীর" মতন গায়িকা। আমার প্রেমিকা বলেই নয়, ভাবতাম, যে এই আখ্যা অসত্য নয়।

আনন্দ পাবলিশার্সের বাদলবাবুর মুখের রঙের মতন নিকষ কালো কিন্তু মসৃণ এবং চকচকে সে ফর্টি এইট আর পি এম.-এর রেকর্ডয়ের রঙ। একপিঠে 'আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে' এবং অন্য দিকে 'আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা যাওয়া'। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তখন গানটি বাজাতাম। আর বাজালেই ঘরের মধ্যে শ্রাবণ ঢুকে পড়ত যেন সব কদমফুল, কেয়া, রজনীগন্ধা আর মেঘ নিয়ে। সে বড়ো কষ্ট ছিল। পরে যখন ওই গায়িকাকে আমার পছন্দ একথা মা জানতে পারলেন (বাবা তখনও জানেননি) তখন মা বলতেন, কারো গান ভালবাসিস সে তো খুবই ভালো কথা। তার রেকর্ড কিনে নে। যত রেকর্ড বেরোবে সব রেকর্ডই কিনে ফেলবি। কিন্তু গান ভালোবাসিস বলে গায়িকাকে বিয়ে করে বাড়িতে ঢোকাতে হবে এ আবার কেমন উদ্ভট কথা!

যে বাড়িতে রেডিয়োতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হলে কুকুরের কান্না বন্ধ করার আদেশ আসত শিশুকালে, সে বাড়িতে এমন গান-বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। মানে, গায়িকা বিদ্বেষ। তবে মা অন্যরকম ছিলেন আগে। পরে অসুরদের সংসারে এসে নিজের নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেন এই ব্যাপারে। মায়ের কোনো দোষ নেই। অগণ্য বিবাহিত নারী ও পুরুষ দেখেছি এ জীবনে যাঁরা বিয়ের সময়ে এবং তারপরও কিছুদিন সেই মানুষই ছিলেন কিন্তু পরে প্লান্ট-লাইফের অ্যাকুয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিকসের মতন স্বামীর বা স্ত্রীর ব্যক্তিত্যর দাপটে অজানিতে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। নিজস্বতা বলতে তাঁদের কিছুমাত্রই আর অবশিষ্ট নেই, থাকে না।

সেই সব কষ্টের দিনের কথা এবং আনন্দের দিনেরও কথা "খেলা যখন" উপন্যাসে লিখেছি। প্রেমে পড়া বড়ো কষ্টের। কিন্তু সেই কষ্টের মধ্যে যে তীব্র আনন্দ, তা, যে হতভাগারা সেই প্রাক-বিবাহ প্রেমের কামড় খেয়েছে, তারাই জানে।

বিবাহোত্তর প্রেমে অর্থাৎ বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমে কষ্ট আরও বেশি। ঝামেলা, ভয় এবং উত্তেজনাও বেশি। কিন্তু কী করা যাবে। আমি যে একজন অতি সাধারণ মানুষ। অসাধারণ হয়েও সাধারণ। ঈশ্বর হলে এই সব দুঃখকষ্ট এড়িয়ে যেতে পারতাম। মানুষ যেমন প্রশ্বাস না নিলে বাঁচে আমিও তেমন কষ্টকল্পিত কোনো প্রেম ছাড়া বাঁচি না। আজও বাঁচি না। আমার প্রত্যেক উপন্যাসের প্রত্যেক নায়িকাই এক একটি ব্যর্থ প্রেমের এপিটাফ। প্রেম সফল হলে এবং সেই সাফল্য যদি বিয়ের ফুল হয়ে দোলে তবে সেই প্রেমের তীব্রতা এবং মাধুর্য কমে না গেলেও পরিবর্তিত হয়। অবশ্যই হয়।

বিশেষ করে সন্তান আসার পরে।

প্রেম মানেই কষ্ট। এবং প্রকৃত এবং শুদ্ধ প্রেমমাত্রই ব্যর্থ প্রেম। উইশফুল থিংকিং। একতরফের প্রেম। এইরকম অব্যর্থ প্রেম নিয়ে একটি উপন্যাস এবং স্বল্পকটি কবিতা লেখা যায় বড়োজোর। যুগের পর যুগ ধরে লিখতে হলে এবং সেই লেখা পাঠক-পাঠিকাদের ভালোই লাগাতে হলে, ঝুড়ি ঝুড়ি ব্যর্থ প্রেম কুড়োনো ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমার প্রথম প্রকৃত এবং মহৎ প্রেম ঋতু গুহঠাকুরতার সঙ্গে। তারপর থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অ-প্রকৃত এবং অপ্রাকৃত বহুত প্রেমে পড়েছি। কষ্টটা আমার। আনন্দটা পুরোপুরিই আমার পাঠক-পাঠিকার। অতএব পাঠক। আমার সেই সব হরকত নিজগুণে ক্ষমার্হ।

আমার চরিত্রে চাপল্য ছিল, আজও আছে। যাকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া বলে, তা সম্ভবত আজও হয়ে উঠতে পারিনি। পুরোনো শরীরে মনটা তরুণই রয়ে গেছে। হৃদয় আমার বৈশাখের ঝরে-পড়া শুকনো বহুবর্ণ পাতারই মতো অতি সহজেই মুচমুচ করে ভেঙে যায় আজও কোনো রমণীর চাউনিতে, কারো গলার স্বরে, কারো চলার রীতিতে, কারো হাতের স্বাদু রান্নায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে গুলিবিদ্ধ শিঙাল হরিণের মতো হাঁটু ভেঙে পড়ে যাই। হৃদয়ে নীরবে রক্তক্ষরণ হয়, জ্ঞান বুঁজে আসে। খুবই কষ্ট পাই। আর পাঠক, আপনাদেরই জন্যে একটি নতুন উপন্যাস বা গল্পের গর্ভাধান হয় আমার মস্তিষ্কে।

আমার স্ত্রী প্রকৃতার্থেই গুণী শিল্পী তো বটেই খুব বড়ো মনের মহিলাও। অন্যান্য ব্যাপারেও অশেষ গুণবতী। পাগলা গারদের ডাক্তার যে ভাবে পাগলদের নাড়াচাড়া করেন সেই মুনসিয়ানা ও জ্ঞানের সঙ্গেই তিনি আমাকে আজীবন নাড়াচাড়া করেছেন।

পাছে আর সময় না পাই, তাই কিছু কথা বলে যাওয়া দরকার। ঋভুর চতুর্থ খণ্ড লেখার সময় আর নাও হতে পারে। বেলা পড়ে এল জীবনের। ছায়ারা দীর্ঘ হল। কার ডাক কখন আসে, তা কে বলতে পারে। তাই এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলে যাওয়া প্রয়োজন যে, আমার স্ত্রী একজন অত্যন্ত মহিয়সী এবং উদারমনের নারী। তিনি শিল্পী হয়েও অতি সুগৃহিণী। লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি। আমার জীবিকা এবং জীবনেও, পেশা, লেখা, গান, ছবি আঁকা এই সমস্ত ক্ষেত্রেই আমার যতটুকু অর্জন, তার পেছনে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ তো ছিলই, কিন্তু তাঁর নীরব এবং মঙ্গলময় অনুপ্রেরণাও সবসময়েই কাজ করেছে।

বাইরের লোকে, যাকে তাঁর রাগ বলে ভুল করতে পারেন অথবা করেন এবং আমাদের রাগারাগি, সেটার সবটুকুই আমাদের দুজনের উচ্চরক্তচাপ-জনিত। আসলে কোনো ঝগড়া আমাদের নেই। কোনোদিনও ছিল না। যদিও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের, নানা স্বার্থান্বেষী ঈর্ষাকাতর মানুষে, হাজারোরকম গুজব ছড়িয়ে এসেছেন।

একা বিখ্যাত হলেই যথেষ্ট। তার উপরে যদি সহধর্মিণীও বিখ্যাত হন তবে তো গুজব, তেলছাড়া আচারের মতোই স্বাদু হয় কর্মবিমুখ, পরচর্চাসর্বস্ব অধিকাংশ বাঙালিদেরই কাছে। এবং সে কারণেই গুজব ডানা মেলেছে।

এই প্রেক্ষিতেই এই কথাগুলি বলা।

আমি অত্যন্তই গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ ঈশ্বরের কাছে যে, ভালোবেসে বিয়ে করেও কাচকে হিরে বলে ভুল করিনি। আমার দুই কন্যা যে সবদিক দিয়ে কৃতী হয়েছে, সভ্য হয়েছে, সংস্কৃতিসম্পন্ন, মেধাবী

এবং সবচেয়ে বড়ো কথা এই, বহির্জগতের সার্বিক প্রলোভনের দিনেও মুখ্যত অন্তর্মুখীই হয়েছে আমাদের দুজনেরই মতো, তার সবটুকু কৃতিত্বই তাদের মায়েরই।

ফরাসি দেশীয় আঁন্দ্রে মঁরোয়া (মোরো নন) তাঁর বহু ভাষায় অনুদিত বই "লাইফ ইজ ফর লিভিং"এ লিখেছিলেন, 'আ পারফেক্ট থিং ইজ পারফেক্ট ইরেসপেক্টিভ অফ ইটস স্কেল'। তুলনা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে, আর্মির একজন জাঁদরেল জেনারাল একটি বিরাট যুদ্ধ নিপুণভাবে জয় করলে যে কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন, একজন গৃহিণী তাঁর ছোট্ট বাড়ি বা ফ্ল্যাট ও তাঁর পাগল স্বামী অবশ্য অধিকাংশ স্বামীই পাগল। কেউ সেয়ানা-পাগল, কেউ ন্যাকা-পাগল, কেউ বোকা-পাগল। এবং তাঁর কন্যাদের নিপুণভাবে চালিত-পালিত করতে পারেন, তাঁকেও সমান কৃতিত্বই দেওয়া উচিত। আমি দিই।

আমার সুরুচিসম্পন্ন, সুগায়িকা, সু-চিত্রী (অনেকেই যা জানেন না), খামখেয়ালি, তাবৎ বাহ্য-জিনিসের যেমন, ক্লাব, পার্টি, গয়না-প্রদর্শন, অর্থকেই সার বলে ভাবা ইত্যাদির প্রতি ঔৎসুক্যহীন স্ত্রীর কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। সৌভাগ্য যে তিনিও পাগলি।

এ জীবনে তাঁর জন্যে করার মতন আমি কিছুই করিনি। সবসময়েই নিজের পেশা ও নানা নেশা নিয়ে বুঁদ থেকেছি। সেই নেশার মধ্যে লেখাও পড়ে। যে-কোনো গড়পড়তা স্বামী, স্ত্রী ও সংসারের জন্যে যা-কিছুই করেন তার ন্যূনতম বেআক্কেলে আমি করিনি। না-করার জন্যে আমার দুঃখ এবং অপরাধ-বোধ আছে অসীম। কিন্তু নিজেকে চিরদিনই সান্ত্বনা দিয়েছি এই বলে যে, আমি তো গড়পড়তা স্বামী নই। গড়পড়তা মানুষও নই। গড়পড়তা হওয়ার সাধনা করিনি কোনোদিনও। তাই আমার জীবন অন্য দশজন সাধারণেব মতো হওয়ার কথাও ছিল না, হয়ওনি। কিন্তু সংসারের এবং গৃহের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে বহির্জগতে এবং অন্তর্জগতেও এমন বেদুইনয়ের মতন বেঁচে আসাটা আদৌ সম্ভব হতো না, আমার স্ত্রী অলক্ষ্যে থেকে সবকিছুই, আমার খাওয়াদাওয়া, জামা-কাপড়, বইপত্র গুছিয়ে রাখা, রোগের চিকিৎসা, লেখার পরিবেশ ইত্যাদি না অটুট বাখতেন এবং বাইরের হাজারো সময়-নষ্টকারী উপদ্রব থেকে আমাকে না বাঁচাতেন।

স্বামী-স্ত্রী এবং দুই মেয়ে আমরা চারজনই "অসামাজিক" বললে যে বোঝায় শুধু তাই নই হয়তো "সমাজবিরোধীও"। যদিও প্রচলিত অর্থে নই। এই "সমাজের" স্বরূপ আমার মতন করে কম মানুষই জেনেছেন। সমাজের প্রতি অনুকম্পা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এই "সমাজ" সাধারণদেব জন্যে, গড্ডলিকাপ্রবাহর জন্যে। যাঁরাই চিন্তা ভাবনা কাজে কর্মে অন্যরকম হতে চান, হতে চান কৃতিত্বে, তাঁদের এই Insipid সমাজকে বর্জন করাই উচিত। আমি এবং আমার স্ত্রী এক অতি বৃহৎ সমাজের অঙ্গীভূত। সেই সমাজ পিতৃ-মাতৃ-শ্বশুরকুলের সমাজ নয়, তা অনাত্মীয়ের সমাজ আপনাদেরই মতো পাঠক-পাঠিকাদের সমাজ, শ্রোতাদের সমাজ। যার সভ্যদের অধিকাংশক্ষেত্রেই আমরা চিনি না, চোখে দেখিনি কিন্তু তাঁরা যে আছেন এ কথা অনুক্ষণ অনুভব করি। তাঁরা না থাকলে এত পরিশ্রমের অনুপ্রেরণা জোগান কারা? পাঠক, আপনারাই আমার পরমাত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, আত্মার কাছে-থাকা আত্মীয়।

এই সমাজের কথা উঠলেই কলেজের সহপাঠী ভিনোদানন্দ ঝাঁ এর আবৃত্তি করা শাহির লুধিয়ানভী সাহেবের সেই শায়রির কথা মনে পড়ে যায়।

"ইয়ে মহলোঁ, ইয়ে তখ্‌তোঁ, ইয়ে তাঁজো কী দুনিয়া
ইয়ে ইনসা কে দুশমন সমাজো কী দুনিয়া
ইয়ে দওলত কে ভুখে, রিয়াজো কী দুনিয়া
ইয়ে দুনিয়া অগর না মিলে ভি তো কেয়া হ্যায়!"

অর্থাৎ এই মহল, এই সিংহাসন, এই মুকুট আর পুরস্কারের জগৎ, এই মানুষের শত্রু সমাজের জগৎ, এই ধনদৌলতের ভিখিরি এই নিয়মের দাসের জগৎ, এই জগৎ যদি করতলগত নাই হয় তো থোড়াই এসে যায়!

পাঠক! কাব্য রোগের কথা হচ্ছিল।

মা যখন প্রকারান্তরে জানিয়েই দিলেন যে এই বিয়েতে মত নেই তাঁর, তখনই ডায়েরিতে কবিতা নামক ডায়ারিয়ার প্রকোপ বাড়তে লাগল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু অনেক ডায়ারিয়া-রোগগ্রস্ত কবিই সেটা বোঝেন না।

কবিতা ভিতরে এমনই কামড়া-কামড়ি করতে লাগল যে, অগণ্য বাঙালি যুবকেরই মতো আমি একটা বই প্রকাশ করে ফেললাম। বলা যায়, প্রসব করে ফেললাম। অকালকুষ্মাণ্ড।

শ্যামলদা, মানে শিল্পী শ্যামল দত্তরায়, প্রচ্ছদ এঁকে দিলেন এবং অলংকরণও করে দিলেন। বইয়ের দাম এক টাকা। প্রকাশক এ টি ফোরাম।

সেটি কি বস্তু আজও জানি না। শ্যামলদারাই বলতে পারবেন।

মুদ্রিত বস্তুগুলিকে কবিতা আদৌ বলা চলে কি না তাও জানি না।

'কবিতা' বলে গত কুড়িবছরে যা প্রকাশিত হচ্ছে এবং বড়ো ছোটো সব পত্রিকাতেই, তাতে কবিতা কাকে যে বলে সেই ধারণাটার ভিতই নড়ে গেছে। কবিতা কী এবং কবিতা কী নয় তা বোঝার ক্ষমতা হারিয়েছি। তবে সবে কুড়ি পেরুনো উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের এই কবিতার বই ছাপানোকে পাপ কার্য বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না যখন অহরহ দেখি যে, প্রচুর পরিণত ও পরিপক্ক মানুষ লাগাতার বই ছেপে যাচ্ছেন নিজেদের কবি ঠাউরে এবং তাঁদের বইকে আবার তাবড় তাবড় কবিরা দলবদ্ধ হয়ে সার্টিফিকেটও দিচ্ছেন। অবশ্য কে বা কারা কেন এমন করছেন তাও যে বুঝতে পারি না এমনও নয় এবং বুঝতে পেরে Intellectual dishonesty যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা উপলব্ধি করে হতবাক হই।

এ প্রসঙ্গে আর আগে না বাড়াই ভালো সুরুচিরই কারণে।

এখন দেশের যা অবস্থা হয়েছে তাতে 'দেশ' পত্রিকাতে একটি কবিতাও যার ছাপা হয়েছে, সেই কবি।

এই দুঃসহ পরিস্থিতি যদি মান্যই হয় তবে "আম্মো" কবি বলে মান্য।

কবিতা এক : নাম—ত্রিকৌণিক

উৎসর্গ—বউদি ও মোহরদিকে,
অর্থাৎ, মঞ্জুলা গুহঠাকুরতা এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
কবিতার ভাঁড়ারে মাল কম (মাত্র সাতখানি) থাকাতেই এমন যুগ্ম-উৎসর্গ।

ত্রিকৌণিক

যখনি মাঝিকে
নোঙর খুলতে বলি
তখনি ও বলে
জোয়ার আসতে দেরী,
সজনের ফুল
উড়ে উড়ে পড়ে জলে,
মাছরাঙা পাখী
নরম দুপুরে ঝিমোয়।

অথচ আমার
এখুনি ভাসা উচিত,
উচিত বলেই
হয়তো ভাসেনা মাঝি
নৌকো ও মাঝি
আমি-তুমি আর মা,
এক হয়ে গেছি
মাঝির অনিচ্ছাতে।।

কবিতা দুই : নাম—অনুগত দুখ

উৎসর্গ—তিন বন্ধুকে

অনুগত দুখ

দাওনি তা বলে
কাঁদতে বসিনি কোনোদিন
অদেয় যা ছিল,
তা ছিল ত সব তোমারই
আমার যা দেয়
ফুরিয়ে ফেলেছি বহুকাল।
করুণা তোমার,

অবহেলে দুখ দিয়েছিলে
তাই দুখের চিবুকে
চুম্বন-এঁকে দিন গুনি
অনুগত দুখ,
যে দুখ আমার পরকাল।।

কবিতা তিন : নাম—সমস্তটুকু তুমি

উৎসর্গ—বিনয়দা-বউদিকে (প্রতিবেশী) যাঁদের সুন্দরী এক
বোন-ঝির সঙ্গে মা-বাবা গায়িকাকে ঠেকাবার জন্যে
আমার দু-হাত মেলাবার প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন।

সমস্তটুকু তুমি

গান গাও তুমি
আতর-হৃদয় ঢেলে
সত্তাকে মেলে
সে গান শুনেছি আমি,
আড়ালে থেকেছো
সুরের চিক-টি পেলে
পরাণে বেজেছে
আশাবরি-ঝুমঝুমি।

চিনেছি তোমায়
মনের মণিকোঠায়
যে তুমি ঝরেছো
প্রতিটি মূর্ছনায়
হরিণীর মতো
থরো থরো থরো থরো
যেখানে কেঁপেছো
সমস্তটুকু তুমি।।

কবিতা চার : নাম—কবিতা লেখো তুমি

উৎসর্গ—দীপককে (বন্ধু দীপক চক্রবর্তীকে)
এই কবিতাটি 'দক্ষিণী'র মালিনী ভট্টাচার্য, অধুনা সাংসদ-এর উদ্দেশে লেখা। দুঃখ এই যে মালিনী আজও জানেন না যে, তাঁকে মনে মনে প্রেম নিবেদন করেছিলাম! এটি আমার অনন্য একতরফা প্রেমের এক মহান নিদর্শন। উনিশশো ছাপ্পান্নতে লেখা। আশাকরি, পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজ ভঙ্গ করার দায়ে মামলা করবেন না উনি।

কবিতা লেখো তুমি

তোমার চলা
তোমার কথা-বলা
ভুরুর টানে
তোমার চোখ চাওয়া,
বলেনি কেউ
কবিকতা লেখো তুমি
প্রথম দেখা
হয়েছে চিনে নাওয়া।

চন্দনের গন্ধ দিয়ে বাঁধা
তোমার চুল
সোনার সাধে ছাওয়া,
হাসি তোমার
কৃষ্ণচূড়ার রাশি
সবুজ বনে
টিয়ার গান গাওয়া॥

কবিতা পাঁচ : নাম—আমাকে : তুমি

উৎসর্গ—কুমারকে (বন্ধু কুমার মিত্র দত্ত)

আমাকে : তুমি

সবুজ বনে
টিয়ার শিস শুনো
নরম পায়ে
দুপুর বেলায় এসে
ঝরনাতলায়
মনকে মেলে দিয়ো
এলিয়ে দিয়ো
লজ্জাবতী লতায়।

ফাগুন শেষের
হাওয়ায় হাওয়ায় তুমি
বিস্মরণের
ঘূর্ণিপাতা শুনো,
দেখো, শিরীষ-পাতায়
আমার প্রেমের গান
চিকন সুরে
কাঁপছে থরো থরো॥

কবিতা ছয় : নাম—অধিকার

উৎসর্গ—রুমাকে ('খেলা যখন' এর রুমাকে)

অধিকার

ভালোবাসা সে-কী
আমরা জানাব শুধু?
তোমরা কি নও
সমানাধিকারী তার?

অনাদিকালের
অভ্যাসে ববে থেমে?
পুরুষের মুখে,
নারীকে ভালোলাগার?

কবিতা সাত : নাম—গুনগুনিয়ে গাও

উৎসর্গ—ইলুকে (সহোদরা)

গুনগুনিয়ে গাও

তোমার যেমন
একটি গানই আছে
যে গান তুমি
গাওনা কারো কাছে,
কাঁকই-হাতে
বাদল-ঝরা বাতে
যে-গান তুমি
গুনগুনিয়ে গাও,
যে গান তোমাব
একান্ত আপনার
নিরজনের অবসরে
আপনাকে শোনাও।

সে গানখানি
আমার তরে রেখো

অন্য গান
বিলিয়ো যাকে তাকে
আমায় দিয়ো
তোমার গোপন গান
যে গান তোমার
মনের কারুকাজের
কারাগারেই
স্তব্ধ হয়ে থাকে,
কাঁকই-হাতে
বাদল-ঝরা রাতে,
যে গান তুমি
গুনগুনিয়ে গাও,
যে গান তোমার
একান্ত আপনার,
নিরজনের অবসরে
আপনাকে শোনাও।।

কবিতা আট : নাম—যখন বৃষ্টি নামল

উৎসর্গ—বুলবুলিকে ('খেলা যখন' এর বুলবুলি)

যখন বৃষ্টি নামল

যখন বৃষ্টি নামল
তুমি জানতে,
আমি আসবো, ঠিক আসবো
আমি আসবোই,
দরজা খুললে
কিছুই-না বলে
মুখ নিচু করে হাসবো, শুধু হাসবো
আমি হাসবোই।

যখন বৃষ্টি নামল
তুমি জানতে,
অন্ধ-আবেগে, বারণ-না-মেনে
ঝর্ণার মতো বাসবো, ভালো বাসবো
আমি বাসবোই।
আষাঢ়ে শ্রাবণে
মনে মনে, আমি
ছোট্ট দুষ্টু মাছ হয়ে
ধরা পড়বো, ধরা পড়বো
ধরা পড়বোই॥

কবিতা নয় : নাম—কেন যে মন ভোলে

উৎসর্গ—মালাকে (সহোদরা)

কেন যে মন ভোলে

ভুলতে এসেছি
কোলকাতা থেকে দূরে,
এখানে আসে না
স্মৃতির সুরেলা ফেউ
সারাদিন শুধু
অনামা ঝাউয়ের শিস
সন্ধ্যা হলেই
চাপা গোঙানির ঢেউ।

ভুলে গেছি তাকে
পারিনি ভুলতে গান,
যখনি দাঁড়াই
মনকে তাড়া-না-দিয়ে
তখনি হাওয়ায়
শুনি তার গান-গাওয়া,
বাঁধা মনটাকে
কোন্ দূরে যায় নিয়ে।।

কবিতা দশ : নাম—গেল যে খেলার বেলা

উৎসর্গ—বীরেনদাকে (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী)

গেল যে খেলার বেলা

পাবো কি পাবো না
যে কথা ভাবি না আর
স্মৃতি-যাতনায়
তোমার করুণ আঁখি।

খেলা যা খেলার
সাঙ্গ হয়েছে সবি,
ফুরিয়েছে শীত
পাহাড়ে ফিরেছে পাখি।।

কবিতা এগারো : নাম—অপরিচিতাকে

উৎসর্গ—ববিকে (পিসতুতো বোন)

অপরিচিতাকে

পরিচয়ের গণ্ডি টেনে
সীমায় বাঁধিনি
অচেনা-মন অন্ধকার
আমার স্বপক্ষে।

ঘনিষ্ঠতার রোশনাইতে
স্পষ্টতর ছবি,
তবুও আমি মোহ-ভাঙার
ঝুঁকির বিপক্ষে।।

কবিতা বারো : নাম—সারকথা

উৎসর্গ—বন্ধু, কুমার মিত্র দত্তকে

সারকথা

নিজেকে আর এমন
করে জ্বালিয়োনা
কি পেলে আর
কি পেলে না
তুচ্ছ তা,

মনকে মারো
ভাবনাগুলো মাড়িয়োনা
পাবেনা—যা
না-চাওয়াটাই সভ্যতা।।

কবিতা তেরো : নাম—মা'কে

উৎসর্গ নেই, অবশ্যই মাকেই

আমার মা'কে

যাচাই করার যন্ত্রণা নেই আর
বাতিল করাই তোমার সহজ জয়,
খোকন তোমার নিখাদ সোনায় ভরা
বোবা মেয়ের একটু সোনা নয়।

দৌড়ে যেতাম তোমার বুকে মাগো
ঝড় উঠলেই যখন পেতাম ভয়,
আজকে খোকন ঝড়ের বুকে একা
ভুল করোনি?
জানো কি নিশ্চয়?

পাঠক, যে কবি (?) তার জীবনের প্রথম ছাপা বই অপয়া সংখ্যা তেরোটি কবিতা দিয়ে শেষ করেন তার ভবিষ্যৎ কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

লক্ষ্মণ শেঠীর কথা কি আগে বলেছি?

হয়তো দ্বিতীয় পর্বে বলেছি।

রাজা বসন্ত রায় রোডে বাবার নতুন বাড়ি হবার কিছুদিন পরই সে এসে আমাদের বাড়িতে কাজে লাগে। পঞ্চান্ন-ছাপান্ন সালে। তারপর থেকে সে বাবার বাড়িতে তো বটেই আমাদের সঙ্গে বালিগঞ্জ পার্কেও থাকে প্রায় চুরানব্বইয়ের শেষ পর্যন্ত। তার বাড়ি ছিল ওড়িশার কটক জেলার রাজকনিকাতে। জাতে ছিল ধোপা। কাপড় কাচতে খুব ভালোবাসত। ওর জ্বালায় কোনো জামা কাপড়ই দু-ঘণ্টার বেশি পরা যেত না। টান মেরে নিয়ে যেত। আন্ডারওয়্যার, গেঞ্জি, রুমাল কোনো কিছুই ধবধবে করে কেচে ইস্তিরি না করলে তার ভাত হজম হত না। তার কার্যকলাপের পেছনে গৃহিণীর কতখানি মদত ছিল তা জানতাম না অবশ্য। বেলা চারটেতে সে খেত। তারপর সাতটা অবধি ঘুমোত।

লক্ষ্মণ মাকুন্দ ছিল। কিন্তু প্রতিদিন চানের আগে গান গাইতে গাইতে তার দাড়ি-কাটা দাড়ি-কাটা খেলা দেখবার মতো ছিল। স্বভাবেও কিঞ্চিৎ মেয়েলি ছিল সে।

ওড়িয়াতে যাকে বলে "মাইচা"।

আমি কাজ চালাবার মতন ওড়িয়া বলতে পারতাম এবং ওড়িশা এবং ওড়িয়াদের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল, আজও আছে। ওড়িশার এমন রাজ্য নেই যা আমি দেখিনি, যেখানের জঙ্গলে যাইনি বা শিকার করিনি।

ওড়িয়া পাছে ভুলে যাই, তাই লক্ষ্মণের সঙ্গে সবসময়ে ওড়িয়াতেই কথা বলতাম।

লক্ষ্মণের মতো এমন একজন অরিজিনাল মানুষ আজ অবধি কমই দেখেছি। চল্লিশ বছর কলকাতাতে থেকেও সে বাংলা বলতে শেখেনি। এ ব্যাপারে তার কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব অনেক বাঙালির কৃতিত্ব বা অকৃতিত্বের সঙ্গে তুলনীয়।

সি এ ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে আমি যখন আমার ঘরে বসে নিজের পড়া করতাম কনীনিকাতে, তখন লক্ষ্মণ আমার ঘরের সামনে বারান্দাতে পায়খানা করার মতো করে বসে, বাগানের দিকে মুখ করে ওড়িয়া রামায়ণ পড়ত সুর করে। গলাটি ওর ভারি মিষ্টি ছিল এবং গলাতে সুরও ছিল।

পুরো একতলাতে তখন আমি প্রায়ই একাই থাকতাম। ছোটোকাকু ডায়মন্ডহারবার রোডের জোকার কাছের কৌণচৌকি গ্রামে বাবার নতুন এগ্রিকালচারাল ফার্মের জিম্মাদারি নিয়ে তখন সেখানেই থাকতেন। একজোড়া অ্যালসেশিয়ান কুকুর আর কাজের লোকজন নিয়ে। সপ্তাহান্তে আসতেন।

সন্ধের পরে পুরো পাড়াই নিঃস্তব্ধ হয়ে যেত আর কনীনিকার একতলা তো হতই। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বাগান থেকে ভেসে-আসা নানা মিশ্র ফুলের গন্ধের মধ্যে লক্ষ্মণের সুর-ঝরে-পড়া ওড়িয়া রামায়ণের রেশ এখনও কানে ভাসে।

টেলিফোন যন্ত্রটিকে লক্ষ্মণ অত্যন্তই ভয়ের চোখে দেখত। টেলিফোন করতে ও ভয় পেত এবং ধরতেও। যদি দীপক ফোন করত বা কুমার, তাহলে নাম ঠিকঠাক বলতে পারত। কিন্তু ওর অপরিচিত কেউ ফোন করলে সে যা নাম বলত বা ওড়িয়াতে লিখে রাখত, তাতে কারো বাবার ক্ষমতা ছিল না যে বোঝে কে ফোন করেছিলেন!

প্রিয়ব্রত ফোন করলে ও বলত, আপংকু গুট্রে ফোন আসিথিলা।

করিথিলা কে? তাঁকু নাম কঁন?

কঁন কহিলা সে বাবু, বুঝি পারিলু না। পরক্ষণেই বলত, পেবু বাবু।

যদি যতীন বলে কেউ করত, তবে ও বলত তান বাবু।

অক্ষরের আদ্যক্ষর তো মিলতই না অনেক সময়ে ধ্বনির মিলও থাকত না আদৌ। ই-কারান্ত নামকে অবলীলায় সে আমার শিরঃপীড়া ঘটিয়ে আ-কারান্ত করে দিত। আদ্যক্ষর ম থাকলে তাকে প করে দিত।

ওকে নিয়ে যদি কখনও কেউ কোনো 'কুইজ' কনটেস্ট করত তবে নির্ঘাৎ তা জমে যেত। এ ব্যাপারে ওর উদ্ভাবনী শক্তির জন্যে গিনেস বুক অফ রেকর্ডস-এও ওর নাম উঠতে পারত নিঃসন্দেহে।

টেলিফোন করার বেলাতে আরেক চিত্তির হতো। আমি হয়তো ব্যস্ত আছি কিছু পড়তে বা লিখতে, উঠে গিয়ে ঘরের কোণের ফোন ডায়াল করতে ইচ্ছে করছে না, বলতাম, একটা নাম্বার ঘোরা তো লক্ষ্মণ।

কঁন নাম্বার?

আতঙ্কিত গলাতে ও শুধোত।

তারপর বলত, রহ রহ, টিক্কে থই ধর।

বলেই, কাগজ পেনসিল নিয়ে এসে বলত, কহন্তু আঁইজ্ঞা।

বাংলায় সংখ্যাগুলো বললে ও ওড়িয়াতে লিখে নিত চারি, ছয়, পাঁচ, দুয়, চারি, এক্ক।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলত, ঠিকি হেব্বা?

হ।

আমি বলতাম।

তারপর লক্ষ্মণ ডায়াল ঘোরাত রিলে করতে করতে, চাব্বি, ছুয়, পাঁচ, দুয়, চাব্বি, এক্ক।

আমি কাজ করতে করতে শুনতাম।

কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হলে বলতাম, কী হল রে?

ও বলত, নম্বর মিলি নাস্তি।

কাঁই।

ও বলত, ইংলিশ চালিচি।

আমি বলতাম, একটু পরে আবার কর।

"ইংলিশ চালিচি" মানে, এনগেজড আছে লাইন।

এই রকম অনেকক্ষণ হরকত করার পরেও যখন লাইন পেত না আমি বিরক্ত হয়ে উঠে ওর দিকে যখন এগোতাম, ও বলত, আপ্পনি দেখন্তু না। মু কি মিছা কহুচি?

আমি রিসিভার তুলে দেখতাম পরিষ্কার ডায়ালটোন।

ওকে ডেকে, ওর কানে রিসিভার লাগিয়ে বলতাম, এবে কঁন চালিচি?

লক্ষ্মণ আমাকে ধমকে দিয়ে বলত, আউ কঁন? মু কহিথিলা না, ইংলিশ চালিচি।

লক্ষ্মণের বাড়ির পোশাক ছিল ফিনফিনে মিলের ধুতি আর হাতাওয়ালা সাদা গেঞ্জি। ওর বুকের ছাতি ছিল সম্ভবত পঁচিশ ইঞ্চি আর কোমরের বেড় ছিল বাইশ ইঞ্চি। ওর গ্রামের যাত্রাদলে ও মেয়ে সাজত। তবে ওর মুখশ্রী ছিল খুবই খারাপ। কাপড়-কাচা সোডা-সাবান চুলে পড়ে পড়ে চুলের রঙ ছিল বাদামি। অধিকাংশ ধোপারই চুল আগেকার দিনে ওরকম বাদামি রঙেরই হত। কারণটা আমি আন্দাজে বললাম। হয়তো প্রকৃত কারণ নয়। ও যখন বাড়ির বাইরে যেত তখন ওর সাজ হত দেখার মতন।

ওর দর্জির বাড়ি কোথায় তা জানতাম না কিন্তু ও এক স্পেশ্যাল ডিজাইনের জামা বানাত। আজীবন স্ট্রাইপড ছিট-কাপড়ের শার্ট বানাত। পাথালি নয়, লম্বা স্ট্রাইপ। হাফ-হাতা শার্ট। দুই বাহুতে জানালা থাকত। জাফরি-কাটা। বুকে বড়ো পকেট। বুক পকেটে পেন গুঁজত একাধিক। আমার দেওয়া। হাতে সোনালি ব্যান্ডের হাতঘড়ি, অথচ ও ঘড়ি দেখতেই জানত না। ওর অরিজিনালিটির সেও আরেক প্রমাণ। চোখে একটা সানগ্লাস লাগাত। ঈর্ষা করতাম ওকে এই কারণে যে, যদিও ও থাকত নগর-কলকাতায়, ও ছিল গুহামানবের মতন সরল। ওকে স্পেনের আলতামিরা বা ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভীমবৈটকাতে অনেক বেশি মানাত কলকাতার চেয়ে।

মায়াদয়া ছিল সকলের জন্যেই মায়ের মতো। কোনোদিন কারো উপরে রাগ করে বা এমনিতেই রাতে খাব না বললে, ও বলত, হঃ। এত্তি বড্ড রাত্তিটা। সামান্য কিছি খানতু।

ওর ওড়িয়াও ছিল খিচুড়ি। বাংলার সঙ্গে মেশা।

অর্থাৎ, এত বড়ো রাত। সামান্য কিছু খেয়ে নাও। না-খেয়ে থেকো না। কিছু খেতেই হবে।

আমার মা ছাড়া এমন ভালবাসার কথা আর কেউই কোনোদিন বলত না।

লেখা-পড়ার কাজ যখন বেশি থাকে তখন অনেক সময়েই আমি খাবার টেবলে না গিয়ে নিজের ঘরেই খাবার আনতে বলি। তেমন হলে, ও খাবার সময়ে সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। বলত, আর একটু ভাত আনি? আর একটা মাছ আনি? চওড়া পেটি আছে। আরেকটু পায়েস খাও ইত্যাদি। আমের দিনে বলত, আরেকটা আম আনি?

আমের প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল একদিন খাবার টেবলে বসে ভরপেট খাবার পরে, মানে তিনরকম মাছ ও একরকম মাংস দিয়ে, তেতাল্লিশটা ল্যাংড়া আম খেয়েছিলাম, অনেকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। বহরমপুর থেকে বাবা চমৎকার ল্যাংড়া এনেছিলেন। ফ্রিজ-ভরতি আম। মা নিজে হাতে ছুলে ছুলে দিয়েছিলেন আর আমরা খেয়েছিলাম।

মা-ও খুব আম ভালোবাসতেন। তাই ছিঁয়াত্তরের বর্ষাতে মায়ের মৃত্যুর পরে আম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমারও প্রিয়তম ফল ছিল আম। অনেকেই দেখি, মা-বাবাকে লটকা বা আঁশফল বা পানিফল উৎসর্গ করেন। মানে বুঝি না। উৎসর্গ করলে সবচেয়ে ভালো জিনিসটি, মা-বাবার এবং নিজেরও প্রিয় কোনো জিনিসই বোধহয় উৎসর্গ করা ভালো।

উৎসর্গ করার লাভ হল মায়ের মনে পড়ে, যতবারই আম খাওয়ার প্রলোভন জয় করি, ততবারই।

এমনি করে স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা আর কী! স্মৃতি যে বড়োই ঘুমকাতুরে।

লক্ষ্মণেরা বড়ো গরিব ছিল। ও যখন ওর বুড়ো বাবা-মায়ের, ওর আলাদা হয়ে যাওয়া ভায়েদের গল্প করত, ওদের রাজকণিকার গল্প, বৈতরণী নদীর গল্প, কানে যেন নদীর কলরোলের শব্দ শুনতে পেতাম। আর নাকে পেতাম জোলো হাওয়ার গন্ধ। সব নদীরই আলাদা গন্ধ থাকে গায়ের। নারীর গায়ের গন্ধরই মতো। ওর গল্প শুনতে শুনতে মনে মনে লক্ষ্মণের গ্রাম একতালাতে চলে যেতাম।

সাকিন একতালা, পোস্টাপিস রাজকণিকা, জেলা কটক।

ওরা চার ভাই ছিল। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। জানি না, বাবার নাম দশরথ ছিল কিনা। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে কত কোটি পাণ্ডববংশীয় বাস করেন তার ধারণা শুধু তাঁদেরই আছে, যাঁরা এই সুন্দর বিরাট বিচিত্র দেশের আনাচে-কানাচেতে গেছেন। জনগণের জন্য যাঁদের দরদ কেতাবি নয়, যাঁরা নিজের বাড়ির কাজের লোককে লজ্জাকর মাইনে দিয়ে, মাঠে-ময়দানে আলোজ্বালা মঞ্চে উঠে জ্বালাময়ী ভাষায় গরিবের উপরে নির্যাতনের বিরুদ্ধে বক্তৃতাবাজি করেন তাঁদের আমি শুধুমাত্র এই কারণেই ঘেন্না করি। তাছাড়া গরিব-বড়োলোক শব্দ দুটি আপেক্ষিক।

লক্ষ্মণের যখন বিয়ে হল তখন আমি সি এ পরীক্ষা দেব। শীতকাল। মনে আছে লক্ষ্মণ বিয়ে করে ফিরে এল। আমাকে ও তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল পিঠে, চানের আগে। ও আমার সমবয়সী তো ছিলই, বন্ধুর মতোই ছিল।

বললাম, বিয়ের পর কী করলিরে?

কী করব?

না, সব বর-বউ যা করে!

লক্ষ্মণ বুঝতে পেরে, লজ্জা পেল।

বলল, মু জানিনান্তি।

এ আবার কি কথা? বিয়ে করলি তুই, বউয়ের সঙ্গে শুলি তুই? আর তুই জানিস না?

সে বলতে পারব না।

উৎসুক, অনভিজ্ঞ আমি বললাম, বলই না। আরে আমারও তো বিয়ে হবে একদিন। জেনে তো রাখা দরকার।

লক্ষ্মণ কিন্তু কিন্তু করে যা বলার বলল। যা বলল তার পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন দেখি না। এতবছর পরে যে বাক্য-বন্ধটি শুধু আমার স্পষ্ট মনে আছে, তা হল, কাঁ কহিবি দাদাবাবু, মোর সমস্ত দেহটা কান্দাকাটা করি উঠিথেলে।

লক্ষ্মণ তার সরল ভাষায় যা বলেছিল, তা প্রতিবার চরমপুলকের সময়েই আমার মনে পড়ত। সত্যিই তো! শরীরটা কান্নাকাটি করারই মতো অনুভূতিই তো হয়!

শরীরও যে কাঁদে এ কথা লক্ষ্মণ না শেখালে কি জানতাম!

অনেক ভদ্রলোক এবং বড়লোককে জানি, যাঁরা চাকর-বাকর-ড্রাইভার-কুলি-মজুর-রিকশাওয়ালা-ট্যাক্সিওয়ালা এবং তাবৎ সাধারণ গরিব মানুষদেরই সঙ্গে এমন অবাধ মেলামেশা ও তাদের ইয়ার-দোস্ত বানানোর ঘোরতর বিপক্ষে। অথচ এঁরাই যখন বিদেশে যান তখন বাড়ির বা হোটেলের মেইড-কে দেখে "ঝৈন" হয়ে ওঠেন। ব্যক্তিগত বেয়ারাকে, যদি রাখার সামর্থ্য থাকে, তবে "বাটলার" বলে ডেকে জেঠামশায়ের মতো সম্মান দেন। এই মানসিকতাটা আমার কোনোদিনই বোধগম্য হয়নি। লক্ষ্মণ আমার কাজ করত বলে সে যে আমার চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট ছিল তা কখনওই মনে হয়নি। মুখে হয়তো রেগে গিয়ে অনেকসময়ে তুলকালাম কাণ্ড করেছি, চড়চাপড়ও মারিনি তা নয়, কিন্তু তা আমার বদমেজাজের জনোই। উচ্চ-রক্তচাপের জন্যেও হতে পারে। এখন ডাক্তারেরা তাই বলেন। বিটোভোনের মেজাজে আর আমার মেজাজে বিশেষ তফাত ছিল না। আজও নেই। বাড়িতে বা অফিসে যাঁরাই আমার কাছাকাছি থাকেন তাঁরাই এই ভীতিজনক সত্য সম্বন্ধে অবহিত আছেন। কিন্তু লক্ষ্মণকে আমি আমার সখা বলেই জানতাম। দু-একজন দীর্ঘদিনের পরিচিত ব্যক্তি, ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার দু-নম্বর বউ কেমন আছে?

বিবাহ-পূর্ব দিনে লক্ষ্মণ আমাকে প্রায় স্বামীর মতোই দেখাশোনা করত।

মানুষকে, সে মানুষ যে জাতপাতেরই হন না কেন, সমাজের যে স্তরেরই হন না কেন, শিক্ষার যে সোপানেরই হন না কেন, ভারতের যে রাজ্যেরই হন না কেন তাঁকে আমি একশোভাগ সমান মানুষ বলেই চিরকাল জেনে এসেছি।

এই দোষের জন্যে অনেকেই তথাকথিত শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত আত্মীয়-অনাত্মীয় মানুষের কাছে অপমানিত হতে হয়েছে অগণ্যবার কিন্তু নিজের স্বভাব ছাড়িনি, ছাড়বও না।

লক্ষ্মণ আমাকে এতোটাই প্রভাবিত করেছিল যে ওকে নায়ক করে একটি উপন্যাস লিখি একসময়ে। আনন্দবাজারের কোনো এক পুজো সংখ্যাতে বেরিয়েছিল যে উপন্যাস। নাম 'বিন্যাস'। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশ করেছেন। সমাজের নানা শ্রেণির বিন্যাস নিয়ে লেখা উপন্যাসটি।

যে দেশে গেজেটেড অফিসারদের জন্যে বা কভেনান্টেড অফিসারদের জন্য আলাদা ল্যাভাটরি থাকে এখনও যেখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে আজও এতরকমের শ্রেণি, প্রাইভেট গাড়ি, প্রাইভেট ট্যাক্সি, পাবলিক ট্যাক্সি, মিনিবাস, লিমিটেড স্টপেজের বাস, এমনি বাস এবং ট্রাম সে দেশেই "শ্রেণিহীন সমাজ" নিয়ে বক্তৃতা করেন ময়দানে গলার শির ফুলিয়ে বিভিন্ন দলের নেতারা।

এই ভণ্ডামি আমাকে চিরদিনই চমৎকৃত করেছে। তাই, "বিন্যাস"।

কতরকমের শ্রেণি-বিভাগ যে এই দেশের নগর-গ্রামের সব মানুষেরই রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এমনভাবে ঢুকে গেছে যা তা বলার নয়। তার কারণ, শিক্ষা বলে যাকে আমরা জানি, তার সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। এ শিক্ষা, টাকা রোজগার করার শিক্ষা। ভালো থাকা, ভালো পরার, ভালো খাওয়ার শিক্ষা। যে শিক্ষা অন্য মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করতে না শেখায়, সে শিক্ষা আমার মতে কোনো শিক্ষাই নয়।

লক্ষ্মণের বউ ছিল খুব বেঁটে এবং কালোজিরের মতন কালো এবং কানে কালা। লক্ষ্মণের মতো আর্থিক অবস্থার অত্যন্ত কুদর্শন, 'মাইচা' ছেলের তার চেয়ে ভালো বউ পাবার যোগ্যতা ছিল না। লক্ষ্মণ তাকে ভালোবেসে ডাকত 'কালা বুড়ি' বলে।

লক্ষ্মণের দুই ছেলে ছিল। বড়োকে সে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। সে ছেলে 'দশম' পাশও করল। তারপর সেও চশমা-হাতঘড়ি পরে প্রায়ই কলকাতায় এসে লক্ষ্মণের কোয়ার্টারে থাকতে লাগল। সিনেমা দেখে, 'মড' জামাকাপড় পরে, ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ওর ছেলের জন্যে একটা কিছু করে দেওয়া আমার উচিত ছিল কিন্তু সে বাংলা, ইংরেজি বা হিন্দি কিছুই জানত না বলে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, তার চালিয়াতি দেখে ও বাবার প্রতি মনোভাব দেখেও আমি বিরূপ হয়েছিলাম তার উপরে। জানতাম যে, এই লোভের আর প্রলোভনের শহরে থাকলে ও নিজে পুরোপুরি নষ্ট তো হয়ে যাবেই তার বাবার জন্যেও বিন্দুমাত্রও করবে না, তিনহাজার টাকার চাকরি পেলেও। এখানেই বিয়ে করে আলাদা হয়ে যাবে।

অমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার অন্যান্য অনেক লোকজনকে দিয়ে হয়েছে।

লক্ষ্মণ রিটায়ার করে, চাষবাস নিয়ে থাকবে মনস্থ করল। সে বলল, বৈতরণীর ধারে দু'বিঘা জমি কিনে দিলে তার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। ওড়িশার বিঘা, বাংলার বিঘার চেয়ে বড়ো। সেখানে "গুঁট" হিসেবে জমির মাপ হয়। তারপর বিঘা।

কিনে দিলাম। মানে কেনার টাকা দিলাম। নদীপারের জমিতে ফসল ভালো ফলে বলে, জমির দাম নাকি বেশি।

লক্ষ্মণ খুশি মনে চলে গেল।

চিঠি লিখল কদিন পরে, দুটি হালের বলদ না হলে চাষ হবে কি করে?

তাইতো!

যে-টাকার উল্লেখ করেছিল তাই পাঠালাম।

জানলাম যে, বলদের দাম বুদ্ধিমানদের চেয়েও বেশি।

ছ'মাস পরে লক্ষ্মণ এক সকালে গামছার পুটুলির মধ্যে বেঁধে "পোড়াপিঠা" নিয়ে এসে হাজির।

বলল, বউ আর ছেলেরা তাঁর সঙ্গে বড়ো দুর্ব্যবহার করে। ছেলে লেখাপড়া শিখেছে তাই কথায় কথায় তাকে ইংরেজিতে গাল পাড়ে। তার আর সহ্য হয় না। যতদিন বাঁচে সে আমার কাছেই থাকবে।

বললাম, থাক।

তার কিছুদিন পরে বলল, আমাকে কিছু থোক টাকা দাও। আমি এবারে সত্যিই রিটায়ার করব।

বাবার বাড়িতে যতদিন ছিল, ছাদের উপরে তেতলাতে কাজের লোকজনের দক্ষিণ খোলা কোয়ার্টার ছিল। তার পরেও অত বড়ো ছাদটাও তাদেরই ভোগের জন্যে ছিল। একটি বড়ো পাকা ঘর এবং আরেকটা অ্যাসবেস্টসের ছাদ দেওয়া ঘর ছিল। মালটিস্টোরিড ফ্ল্যাটবাড়িতে

সার্ভেন্টস-কোয়ার্টার খুবই ছোটো। তাতে তিন চারজন লোকে গাদাগাদি করে থাকাটাও আরামের ছিল না আদৌ, যদিও ফ্যান-ট্যান সবই ছিল।

দিলাম আবারও থোক টাকা। লক্ষ্মণ নিয়ে চলে গেল।

তারপরও ফিরে এল ছেলে-বউয়ের খারাপ ব্যবহারে। খালি-হাতে।

আবার বহাল করলাম।

ওর একটা প্রধান দোষ ছিল গ্রাম্যতা। রেগে গেলে ও আমাকে তো "তুই তুই" করেই বলত, আমার স্ত্রীকেও বলত। তাছাড়া, বৈতরণীর তীরের সেই মানুষটা কথা বলত এমন করে, সবসময়েই যেন নদীর এপার থেকে ওপারে কথা বলছে। আমাদেরও অভ্যেস ও খারাপ করে দিয়েছিল। লনওয়ালা খোলামেলা পৈতৃক বাড়িতে যা সহনীয় ছিল নিজেদের এবং পড়শীরও, তা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে নয়। আমিও রেগে গেলে বৈতরণীর পারের মানুষের মতোই গলা চড়াই। গানটান এর আলাদা চর্চা তো হয় না। ঝগড়া করেই তারায় গলা তুলে, গলাটা ঠিক রাখি।

বাবু-বিবি এবং প্রধান কাজের লোকেরই যদি উচ্চরক্তচাপ থাকে তো তা প্রতিবেশীদের পক্ষে প্রাণঘাতী হয়।

একদিন লক্ষ্মণ রাগের মাথায় আমার স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। আমি কলকাতাতে ছিলাম না তখন। থাকলে কী হত জানি না। আমার সহ্যশক্তিও শেষ হয়ে আসছিল। যদি থাকতাম তবে হয়তো ওকে পিস্তল দিয়ে গুলি করার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই হত। ঋভুর তৃতীয় পর্ব আর লেখা হত না।

আমার স্ত্রীকে 'পপাতধরণীতলে' করে দিয়ে লক্ষ্মণ সেই যে ভাগলবা হল অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে, অথবা ভয়ে, যে আজ পর্যন্ত আর এমুখো হয়নি।

আমার দুই মেয়েই ওকে খুব ভালোবাসত। লক্ষ্মণদা বলতে দুজনেই অজ্ঞান ছিল। দুজনকেই জন্মাতে দেখেছিল ও। আমার বিয়ে তো হয়েছিল ওর বিয়ের অনেকই পরে।

ওর মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল তা আজকাল নিকটাত্মীয়র মধ্যেও দেখা যায় না।

দোষের মধ্যে একটা বড়ো দোষ ছিল এই যে, ছিঁচকে চোর। পুরনো লোক বলে আমি সব জেনেও ওকে নিজে তাড়াইনি। নানা জিনিস নিয়ে গিয়ে দুপুরবেলায় মল্লিকবাজারে বেচে দিয়ে আসত। একটা সময়ে, দেশ-বিদেশ থেকে আনা আমার নানান দুষ্প্রাপ্য বইও বিক্রি করতে লাগল গড়িয়াহাটার মোড়ের পুরোনো বইয়ের দোকানে। একজন সৎ দোকানি আমাকে ফোন করে না জানালে আমি জানতেও পেতাম না।

তবুও ওকে সহ্য করেছিলাম পরিবারেরই একজন হয়ে উঠেছিল বলে।

তারপর একদিন রুপোর কিছু জিনিসও চুরি গেল। আরও নানা উপহার এবং সম্মানী, দেশ-বিদেশ থেকে আমাদের দুজনেরই পাওয়া।

জানা গেল, ওরই যোগসাজশে আরেকজন নতুন লোক সেগুলো নিয়মিত সরাত। সে বামাল ধরাও পড়ে। কিন্তু কড়েয়া থানার অফিসারদের বলে আমি ছাড়িয়ে দিই তাকেও। 'গরিব লোক পেটের জন্যে চুরি করেছে' এই কথা বলে।

দেশের চতুর্দিকে শিক্ষিত মান্যগণ্য মানুষেরা অনুক্ষণ যে চুরি-ডাকাতি-ঘুষ-ঘাষ-এর মধ্যে আছেন সেই প্রেক্ষিতে ও-চুরি চুরিই নয়। সব জেনেশুনে কোন্ লজ্জায় ওই অপরাধে জেল খাটাই বেচারিকে!

জানতাম যে, লক্ষ্মণ চুরি করত ওর নিজের জন্যে নয়, ওর "শিক্ষিত" চালিয়াৎ ছেলেরই জন্যে।

সব শিক্ষা হয়তো সকলের জন্যে নয়। গ্রামে, মফস্‌সলে এবং বড়ো শহরে একই পুঁথিগত শিক্ষার প্রচলন থাকাতে এই রকম upstarts দের সৃষ্টি হচ্ছে বহুদিন হল সারা দেশে। লক্ষ্মণের ছেলের পুঁথি-পড়া শিক্ষা, ওকে মানুষ করেনি, অমানুষই করেছে।

যা ও শিখেছে তাকে শিক্ষাও বলে না। তার শিক্ষা তার প্রেক্ষিতে অকেজো।

তবে লক্ষ্মণ বলত যে, শিডিউল্ড কাস্টের "কোটাতে" ও নাকি চাকরি পেয়ে যাবে। হয়তো পেয়ে যাবেও, অনেক মেধাবী ছাত্রদের বঞ্চিত করেই। তবে জানি না, লক্ষ্মণের ছেলে আজও চাকরি পেয়েছে কি না!

কোনো কচিৎ-অবসরের মুহূর্তে লক্ষ্মণের কথা আমার খুবই মনে পড়ে। আমাদের কাছে অনেকদিনই ছিল ও। বাড়ির লোকেরই মতো। মায়া তো পড়বেই।

ও প্রায়ই আমাকে ওর গ্রামে একবার নিয়ে যাবে বলত। বলত, ওড়িশার এত জায়গাতে গেলে তুমি আর আমাদের রাজকণিকাতেই গেলে না! কী মাছ সেখানে।

মাছের প্রতি আমার দুর্বলতা ও ভালো করেই জানত।

ইচ্ছে করে যে, চলে যাই, গিয়ে দেখে আসি লক্ষ্মণ কেমন আছে? বেঁচে আছে কি না? ওর কোনো অভাব-অভিযোগ আছে কি না! জানি, অবশ্যই আছে। এখানে যতদিন ছিল, আমার সাধ্যমতো প্রকাশ্যে এবং গোপনে ওর সব অভাবই পূরণ করতাম। দেশে বন্যা হয়েছে, বৌয়ের অসুখ, বাবার হাঁপানি রোগ সবকিছুর জন্যেই যা লেগেছে দিয়েছি!

লক্ষ্মণ আমাদের জন্যে যা করেছে আমি তার বদলে সে তুলনাতে অতি সামান্যই করতে পেরেছি।

অর্থনীতিতে চাহিদা আর জোগানটাকে বড়ো করে দেখা হয়। সেই সময়ে কাজের লোকের জোগানের সংখ্যা কাজের সুযোগের চেয়ে অনেকই বেশি ছিল। তাই তাদের মাইনে চাহিদা-জোগানের চিরাচরিত ক্রিয়া-বিক্রিয়ার উপরে নির্ভরশীল ছিল। কম দিলে যখন চলে তখন কে আর বেশি দিতে চায়! অথচ যারা কাজ করছে, তারাও যে মানুষ, ঘর-সংসার, বউ-ছেলেমেয়েকে ফেলে জীবনের অধিকাংশ সময়টুকুই যে আমাদের সংসারে তারা কাটিয়ে যাচ্ছে, এই দুঃখজনক অনুভূতিটুকু যে মহা-আঁতেল ডানপন্থী বামপন্থী রাজনীতিক, লেখক, আমলা, গাইয়ে, বাজিয়েদের মধ্যেও কেন দেখা যায় না তা আমি এই অশিক্ষিত গোঁড়, জংলি মানুষটি আজ অবধি বুঝে উঠতে পারি না।

মানুষের মতন অত্যাচারী এবং অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন জানোয়ার বোধহয় আর নেই! সত্যিই নেই!

লক্ষ্মণকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম সে কেমন আছে না আছে, তার অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে জানতে চেয়ে। উত্তর পাইনি। এবারে একবার যাব ওর বৈতরণীর পারের গ্রামে। সেই হবে আমার শেষ প্রৌঢ়ত্বের তীর্থ।

কে জানে! বেঁচেও আছে কি না। আমারই সমবয়সী হবে ও, বয়সে।

এক নম্বর চৌরঙ্গিতে একটি বন্দুক-রাইফেল-পিস্তল-রিভলভারের দোকান আছে। নাম ইস্ট-ইন্ডিয়া আর্মস কোং। সেই দোকানের মালিক ছিলেন শ্রীপ্রশান্তকুমার বিশ্বাস এবং শ্রীঅনন্তকুমার বিশ্বাস। দুই সহোদর। ওঁদের সঙ্গে বাবার যোগাযোগ সম্ভবত ত্রিশ দশক থেকেই ছিল, বাবা যখন চাকরি করতেন। পারিবারিক বন্ধুর মতো হয়ে গেছিলেন ওঁরা।

বড়ো ভাই প্রশান্তকাকু ছিলেন বাবারই মতো এপিকিউরিয়ান। The only way to the heart is through the stomach এই মন্ত্রে মন্ত্রপূত। আয়কর বিভাগের মিস্টার কে ই জনসন, খাওয়ার ব্যাপারে পীড়াপিড়ি করার কারণে প্রশান্তকাকুর নাম দিয়েছিলেন "মিস্টার আরেকটু খান"। ওসব কথা বিস্তারিতভাবে লিখেছি "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারের" দুটি খণ্ডে।

প্রশান্তকাকুর ছোটো ভাই শ্রী অনন্ত বিশ্বাস (এ বি) ছিলেন কটকের কটকচণ্ডী রোডের রায়সাহেব নরেন্দ্রনাথ সুরে জামাই। নরেনবাবু কলকাতার শিল্পপতি মৃগাঙ্কমোহন সুরের অনুজ। আরও এক অনুজও কটকেই ছিলেন। তাঁর নাম শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সুর। নরেনবাবু আর ধীরেনবাবুর যৌথ ব্যবসা ছিল

সেই সময়ে। জনশ্রুতি আছে যে, নতুন ভুবনেশ্বর শহরের অনেকখানিই, মানে সরকারি ঘরবাড়ির, ওঁদেরই করা। বিল্ডিং কনট্রাক্টর তো ছিলেনই, ছিলেন ফরেস্ট কনট্রাক্টরও। দুর্গম, গা-ছমছম কুমারী জঙ্গলে নিজেরা পথ বানিয়ে, কৃপ কেটে নিজেদের ক্যাম্প থেকে কাঠ কেটে মোষ দিয়ে 'ঢোলাই' করে এনে এমন জায়গাতে রাখতেন যেখান থেকে ট্রাকে লাদাই করা যায় এবং কটকে নিয়ে আসা যায়।

আমরা যখন শিকার করেছি তখন শিকার স্পোর্টস বলেই গণ্য হত। আর্ম-চেয়ার কনজার্ভেটরেরা সর্বজ্ঞ নন। এককালীন শিকারিরাই সবচেয়ে ভালো কনজার্ভেটর হতে পারেন এবং হয়েছেন। একসময়ে আমি নিজেও শিকারী ছিলাম বলে আমার বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ নেই। শিকারি না হলে আমার দেশকে, দেশের সাধারণ মানুষদের এবং প্রকৃতিকে এমনভাবে জানার সুযোগ কখনওই হত না।

পাঠক, আপনাদের এবং অনেক মূর্খ শিকার-বিরোধীদেরও অবগতির জন্যে জানাই যে জিম করবেট, সালিম আলি ও ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের মুখ্য ভারতীয় প্রবক্তা মিসেস অ্যান রাইট (বব রাইটের স্ত্রী) একসময়ে নিয়মিত শিকার করতেন। আমি যখন পালামৌতে শিকার করেছি তখন অনেকবারই এমন হয়েছে যে, ক্রিসমাসের সময়ে ওঁরা পাশের ব্লক রিজার্ভ করে রুদ বা মারুমার বা গাড়ু বাংলোতে থেকেছেন।

এসব কথা কষ্টকল্পিত নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

শিকার, আইন মেনে করলে, কোনোদিনও দূষণীয় ছিল না। গুহামানব থেকে, আদিবাসী মানুষ থেকে আধুনিক মানুষ শিকারকে একটি পুরুষালি স্পোর্টস বলেই জেনে এসেছেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে।

এ দেশে উনিশশো বাহাত্তরে শিকার বন্ধ হয়েছে আইন করে। বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল না আদৌ যদি দেশে আইন বলে কিছু থাকত। মানুষ মেরে, বলাৎকার করে মানুষে আকছার পার পেয়ে যাচ্ছে, পশুপাখি মারার কথা আর কী বলব! ইংরেজরা যতদিন ছিলেন, ততদিন আইনকে আমরা চাকর-মনোবৃত্তির পরাধীন জাত, জুজুর মতো ভয় পেয়ে এসেছি। দেশ স্বাধীন হওয়ামাত্রই আমরাও অধুনা ঘানা কিংবা জাইর কিংবা অন্যান্য নানা আফ্রিকান অনুন্নত দেশেরই মতো লজ্জাকরভাবে পুরোপুরি "স্বাধীন" হয়ে উঠে সবরকম আইনশৃঙ্খলাই শিকেয় তুলেছি। স্বাধীনতা যে নিজেদের উপরে, নিজেদের দশ ও দেশের মঙ্গলের কারণে অনেকইরকম স্বেচ্ছারোপিত পরাধীনতাকে আরোপ করার দায়িত্ব নিয়ে আসে, এ কথা আমরা তথাকথিত শিক্ষিত হয়ে তখনও বুঝিনি, আজও বুঝলাম না। তাই, সাতচল্লিশের কয়েক বছর পরেই পশুপাখি নিধন তুঙ্গে উঠল। তুঙ্গে উঠল অরণ্য-বিনাশ।

শিকার ও গাছ-কাটা আজও সমানে চলেছে। ন্যাশনাল পার্ক তো বটেই অনেক টাইগার-প্রোজেক্টের মধ্যেও চলেছে। বনবিভাগের বেশ কিছু আমলাদের বিরুদ্ধে সি বি আই এর এনকোয়ারি করলেই একথা প্রাঞ্জল হবে।

সরষের মধ্যেই ভূত ঢুকে গেছে যে! তা ওরা ভূত ছাড়াবে কী করে!

বাহাত্তরের পরে আমার সব বন্দুক রাইফেল ওই দোকানেই জমা রাখা ছিল। তারপর থেকে এক রাউন্ডও গুলি ছুঁড়িনি বন্দুকে বা রাইফেলে। রাইফেল রেঞ্জে বা শটগানের ট্র্যাপ ও স্কিট শুটিঙয়ের রেঞ্জেও নয়। শুধু পিস্তলটি আছে মানুষ-জানোয়ার মারার জন্যে। কিন্তু এ কে ফর্টি সেভেনের যুগে পিস্তল দিয়ে কী হবে?

এই শিবঠাকুরের আইন-কানুনের দেশে, সব আইনই যে প্রবল সততা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে মান্য হচ্ছে।

অন্য কথাতে চলে এলাম পাঠক! হচ্ছিল কটকের সুরবাবুদের কথা।

তাঁদের জামাই এ বি কাকু এবং তাঁর দাদা প্রশান্তকাকুর দৌলতেই আমরা প্রথম ওড়িশার জঙ্গলে যাই উনিশ আটান্নতে। সেই শুরু। তারপর প্রতিবছরই গেছি যতদিন না শিকার বেআইনি ঘোষিত হয়েছে তার আগে পর্যন্ত। তারও পরে গেছি জঙ্গলে থাকতে। জঙ্গল ভালবাসি বলে।

গেছি অগণ্যবার মহানদীর gorge বা গণ্ডর দুপাশের বিভিন্ন জঙ্গলে।

মহানদীর জন্ম মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলাতে, ফরশিয়া নামের এক গ্রামের এক হ্রদ থেকে। উৎস থেকে বেরিয়ে উত্তরবাহিনী হয়ে সিউরিনারায়ণের কাছে তার সঙ্গে এসে মেশে আর একটি নদী। তার নাম শেওনাথ। মধ্যপ্রদেশ থেকে বয়ে এসে ওড়িশার সম্বলপুরে যখন এসেছে মহানদী তখন তার উপরে বিরাট বাঁধ বাধা হয়েছে হীরাকুদে। হীরাকুদ বাঁধ পেরিয়ে শোনপুর করদ রাজ্যের (যার রাজধানী বলাঙ্গির) বাশ দিয়ে এগিয়ে মহানদী প্রবেশ করেছে এক গিরিখাতে। চোদ্দোমাইল বা সাত ক্রোশ প্রবাহিত হয়েছে সেই গণ্ডের মধ্য দিয়ে। তাই নাম "সাতকোশীয়া গণ্ড"। সাতকোশীয়া গণ্ড আমার অতি প্রিয় বিচরণভূমি। কিন্তু মহানদী সেখানে এসে পৌছোনোর আগের বৃত্তান্ত পেয়েছি দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই 'নদী' থেকে। শিশুসাহিত্য সংসদ প্রকাশক সে বইয়ের।

শোনপুরের মহারাজা আমাদের মক্কেল ছিলেন। তিনি বহুবার বলাঙ্গিরে বাঘ মারতে যাওয়ার নেমন্তন্ন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

গণ্ডের নদী পেরুতে হয় টিকরপাড়ার ঘাট দিয়ে। পন্টুনের উপরে কাঠের ভেলার মতো বানানো। তারই উপরে চড়ে গাড়ি-বাস-ট্রাক সবই পেরিয়ে চলে যায় ওপারের বৌধ, ফুলবানী, দশপাল্লা ইত্যাদি জায়গাতে। ফুলবানী ও দশপাল্লার বিড়িগড় অঞ্চলে খন্দ উপজাতিদের বাস। তাদের জীবন নিয়ে লিখেছি 'পারিধী'। 'পারিধী' একটি খন্দ শব্দ। মানে, মৃগয়া। সেই উপন্যাসের পরের খণ্ড 'লবঙ্গীর জঙ্গলে'। দে'জ পাবলিশিং প্রকাশক সেই দুটি উপন্যাসেরই।

মহানদীর এ-পারের বহু বনে পা পড়েছে আমার। পুরুণাকোট, বাঘমুণ্ডা, টুল্বকা, লবঙ্গী, রায়গড় ইত্যাদি বনবাংলোতে কেটেছে অনেকই সুখের দিনরাত, লাগাতার পনেরো-কুড়ি বছর ধরে।

এই সব অঞ্চল নিয়ে 'পারিধী' ও 'লবঙ্গীর জঙ্গলে' ছাড়াও অনেকই লেখা আছে আমার। 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে', 'ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গী বনে'। এগুলি 'ঋজুদা সমগ্র'র মধ্যেও আছে অবশ্য। আনন্দ পাবলিশার্সের বই। 'নগ্ন নির্জন' বাঘমুণ্ডার পটভূমিতে লেখা। প্রকাশক, মিত্র ঘোষ প্রাঃ লিঃ। 'জঙ্গলের জার্নাল' পুরুণাকোটের এবং পালামৌর পটভূমিতে লেখা। প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং।

এই সব অঞ্চল এখনও হাতছানি দেয় আমাকে। স্থানীয় বন্ধুরাও বলেন, "সবই ছারেখারে যায়নি এখনও। বাকি আছে কিছু। চলে আসুন একবার।"

কিন্তু বড়ো ভয় পাই। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকে এবং তারও পর পঁচিশ বছর পর্যন্ত যা রূপ দেখেছি সেই সব অপরূপ' বন জঙ্গলের, আশ্চর্য সুন্দর সব বন-বাংলোর, নদী এবং নালার, তা যদি দেখতে না পাই গিয়ে?

এই সব অঞ্চলের কথা বিশদ বললাম না এখানে। যেসব পাঠক-পাঠিকা বন-জঙ্গল ও প্রকৃতি ভালোবাসেন তাঁর এই বইগুলি তো বটেই, 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে'র দুটি খণ্ড পড়লে এই অঞ্চলের বন, বন্যপ্রাণী, এবং মানুষজন সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করতে পারবেন। পরিচিত হবেন চাঁদুবাবু, বিমলবাবু, দুর্গা মুহুরী, রাজেন শিকারির মতো আশ্চর্য সব ভারতীয় চরিত্রের সঙ্গে। জঙ্গলের জার্নালে পালামৌয়ের কিছু কথাও আছে। পুরুণাকোটের কথার পরে। যেখানে ডাল্টনগঞ্জের মোহনের সাগরেদ বাবলু ও রমেনবাবুর কথাও আছে।

বাবলু চলে গেছে জঙ্গলের লীলাখেলা সেরে, ইন হ্যাপি হান্টিং গ্রাউন্ডস। রমেনবাবু আছেন। তবে একটি পা চলে গেছে, জিপ বম্বে রোডে ট্রাকের নীচে চলে যাওয়াতে। তবে অকৃতদার রমেনবাবু যখন চলেও যাবেন তখন শরীরটুকুই পুড়বে ডাল্টনগঞ্জের কোয়েলের তীরের শ্মশানে। তিনি থেকে যাবেন, অবশ্যই থেকে যাবেন আপনাদের মনে, "কোয়েলের কাছে", "কোজাগর" এবং "জঙ্গলের জার্নাল"-এর মাধ্যমে চিরদিন।

যাঁরা আমার জন্যে অনেকই করেছেন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, করেছেন অনেকই নিঃস্বার্থ খিদমতগারি, দিয়েছেন অনেক রুক্ষ পুরুষালি ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা, তাঁদের ঋণ কখনওই শোধবার নয়।

স্বীকারই করতে পারি শুধু। শুধু স্বীকারই করেছি।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড থেকে আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিন্যুর নতুন ফ্ল্যাটে আসবার সময়ে আমার "সবেধন নীলমনি" কবিতার খাতাটি খোওয়া গেছে।

কোনো কবিতা-পাগল আমার 'প্রতিভাতে' মোহিত হয়ে যে সেটি চুরি করেছেন এমন কথা ভাববার মতো মূর্খ আমি নই। তবে অনেকই 'কবিতা' অথবা ছড়া অথবা এক কবিকুল কর্তৃক ঘোষিত "কিছুই হয়নি" তাতে ছিল। ডাইরির সবকটি পাতাই এতদিনে ঝালমুড়ির ঠোঙা অথবা গরমমশলার বাহক হয়ে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে সসম্মানে ঠাঁই পেয়েছে, হয়তো শুধুমাত্র যে সম্মানের যোগ্যতাই যাদের ছিল।

ভাগ্যিস সেই ডায়েরি থেকে ক'টি কবিতা চালান করে দিয়েছিলাম "অববাহিকার" মাধ্যমে (আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই) সংগীতভবনের এক তরুণ ছাত্রের খাতাতে, শান্তিনিকেতনের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস। তাই আছে।

আসলে আমি তো আজও মনে মনে তরুণই আছি। অন্তরঙ্গে। বহিরঙ্গর রূপ যতই কদর্য হোক না কেন মন সুন্দর এবং তরুণই আছে। সজীব ভাবনা চিন্তাও। শরীর আমাকে বুড়ো করবে এমন সাধ্য কি তার।

পাঠক যেহেতু আমি কবি নই সেই হেতুই আপনাদের অনুমতি নিয়েই সেই কটি না-হারানো কবিতা পেশ করছি।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় যে আবারও "কবিতা" বা "ছড়া" বা "কিছুই হয়নি" লেখা আরম্ভ করব। তারপর নিজের আঁকা ছবি ও রঙিন প্রচ্ছদের মোড়কে সেই বই প্রকাশ করব কোনোদিন। তবে করব ইচ্ছা করলেই কি সবকিছু করা যায় এ জীবনে!

Man proposes, God disposes !

১

মৃত্যু জানি জীবনের সত্য অনুগামী
অথচ মৃত্যু কত জীবন বিলোয়,
আশ্লেষে মরণ রচি, আহ্লাদে জীবন,
অথচ জীবন মৃত্যু ইচ্ছাধীন নয়।

অন্বিষ্ট যা ছিল সব নিভৃত মনের
একে একে বিকৃত রুজির জোগাড়ে
চারটি দেওয়ালে শুধু মাথা খুঁড়ে মরা
মেয়াদ ফুরোবে কবে ভুলের ভাগাড়ে?

২

ভালোবাসা কোনো লিপ্ততা নয়,
কোনো বিলাসও নয়,
ভালোবাসা একটি প্রয়োজন।

জানি, লোকে বলবে
প্রয়োজনীয়তাটাই কি সব?
প্রয়োজনাতিরিক্ততাই কি শিল্প নয়?
তুমি বলবে, জানি না।
আমি বলব, জানতে চাই না;
দীপক বলবে, জানতে
চাইলেও জানতে পাই না

অথচ আমরা সবাই কী
নিশ্চিতভাবে জানি যে
ভালোবাসা এক আঙ্গিক, যা
নইলে ব্রহ্মা জগন্নাথ হতেন।

৩

উপহারভারে ভরিয়ে দাও তো তুমি
বারণ না মেনে আমার জন্মদিনে,
সাধ্য কী আছে প্রতিদানে কিছু দেব
আকণ্ঠ আমি নিমগ্ন তব ঋণে।

৪

জন্মদিনের উপহারে কাজ নেই
তার চেয়ে তুমি কাছে বসে গান গেয়ো
যে দিনগুলিকে পায়ে পায়ে ফেলে এলে,
স্মৃতিমন্থনে তাদের গাঁথতে দিয়ো।

জন্মদিনের সমারোহে ঝাঁঝ নেই
ঝাঁঝ যতটুকু তা আছে বাঁচারই সাধে
ছোট্ট জীবনে সুখ নেই ভালোবেসে
ছেড়ে যেতে হবে সেই দুখে মন কাঁদে।

৫

আমার বেলাশেষের গান,
চুরি করে পালিয়ে গেল
টিয়া,
আমার বেলাশেষের ছবির
সমস্ত রঙ গড়িয়ে গেল
বিলে।

দুপুর ছিল গোপন ব্যথায় ভরা
সেই ব্যথাকেও ছিনিয়ে নিল ঘুঘু,
শূন্য মনে কাঙাল হয়ে ফিরি,
মনও আমার না নিয়ে যায়
চিলে।

৬

হাতের কাছেতে বই
ঘরময় থই থই
লেখার কাগজ, কালি ও কলম
ছাইদানিখানি, চোখের মলম,
যখনই যা-কিছু প্রয়োজনে আসে
প্রতিটি জিনিসই গোছানো

গোছানো নেই যা
তা রয়েছে এই চোখের তারায়
পলকে পলকে আনমনে চায়
নিজেকে হারায়,
পাছে ধরা পড়ে
সেই ভয়ে চোখ
অনুখন মুখ লুকোনো
এই ঘরটিতে,
দুটি চোখ ছাড়া,
আর সবই আছে গোছানো।

৭

যতবার আঁকলাম
মুছলাম তার চেয়ে বেশি।
কল্পনার রঙ
স্মৃতির তুলিতে
বুলিয়ে বুলিয়ে
ফুরিয়ে এল
তবু আঁকা হল না তোমাকে
তোমার মতন করে।

মনে মনে আঁকি যতবার
চোখ চিবুক চুল
সবই মেলে,
শুধু মেলে না সেই
ভাবনাটুকু,
কবে যেন চুরি হয়ে গেছে।

৮

নাই বা চড়লাম মার্সিডিজ গাড়ি
নাই বা কুড়োলাম অগণ্য সুন্দরীর
স্নিগ্ধ চোখের স্তুতি-ভেজা নিমন্ত্রণ
শুধু আমি, আমার এই সুস্থ দেহ
আষাঢ়ের এই কুমারী দুপুরে
জানালার পাশের শিরীষ গাছটির দিকে
চেয়ে এক পরিপূর্ণ স্বেচ্ছাচারী আত্মবিস্মৃতি,
মুহূর্তের পর মুহূর্তের মালা গেঁথে
গেঁথে গেঁথে এক চমৎকার জীবন,
এক অভাবনীয় বেঁচে থাকা
তোমারই জন্যে,
শুধু তোমারই জন্যে
প্রতিটি প্রশ্বাস নেওয়া
তুমি কি তা জানো?

৯

মনে পড়ে কখনও আমাকে?
চান ঘরে কল খুলে
বাধ্য আয়নায় তোমার
ওই নগ্ন শরীরের ব্যথার
ছায়া ফেলে
সিক্তশরীরী
ভাব
কি ভাব কি আমাকে?

দেহটাত
নীলামে বিকোলে,
দেহটাকি বিকোলে নীলামে?
শুধু হাতুড়ি ছোঁয়নি বুঝি
মনটাকে?
ছোঁয়নি এখনও?
তাই বুঝি এখনও
কখনও মনে পড়ে,
মনে পড়ে এখনও আমাকে?

তুমি গান গাইছ হাজার লোকের মাঝে
বসন্তোৎসবের রাতে
আলো পড়েছে তোমার
সোনাঝুরি চুলে
তোমার প্রেমময় মুখে
মনে ক্ষণে আলোর রঙের সঙ্গে
নর্তকীর নাচের সঙ্গে
তোমার সুরের আর মনের
রঙ বদলাচ্ছে,
হঠাৎ সামনে থেকে কে
যেন নিচুগলায় বলে উঠল
স্বগতোক্তির মতন
আহা! কী গান!

হায়রে।
তুমি যদি সেই মুহূর্তে জানতে
গায়িকা হয়ে হাজার লোকের প্রশংসা
পাওয়ার সুখ,
যে
সেই গায়িকার ভালোবাসা পেয়েছে
তার সুখের কাছে কী অকিঞ্চিৎকর!

১১

নিজেকে আর এমন করে জ্বালিয়ো না
কী পেলে
আর কী পেলে না
তুচ্ছ তা,
মনকে মারো
ভাবনাগুলো মাড়িয়োনা,
পাবে না যা,
না চাওয়াটাই সভ্যতা।

ঋভু

চতুর্থ পর্ব

ভূমিকা

'ঋভু' আমার আত্মজীবনী। তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়ে গেছে। এটি চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম খণ্ড প্রথম পুরুষে লেখা নয়—আমার নাম সেখানে ঋভু, আমার মায়ের নাম তাপসী— কোনোটিই আসল নাম নয়। দ্বিতীয় খণ্ড থেকে অবশ্য খোলস ছেড়ে আসলে ফিরেছি।

ঋভু ছাড়াও বনচারণের এবং শিকারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত আমার আরেকটি আত্মজীবনী আছে যার নাম 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'। তার দুটি খণ্ড। প্রকাশক, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

এ ছাড়াও আমা-সম্বন্ধীয় আরও দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে—একটি কমল চৌধুরীর লেখা, নাম 'অয়ন' এবং দ্বিতীয়টি বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'প্রসঙ্গ বুদ্ধদেব গুহ'। এই দুটি বইয়েরই প্রকাশক 'সাহিত্যম্'।

শেষ প্যারাতে উল্লেখিত তথ্যটি তাঁদের জন্যেই দেওয়া যাঁরা আমার সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক। পাঠক-পাঠিকার অনেক প্রশ্নের জবাব হয়তো তাঁরা পাবেন এই দুটি বইয়ে।

নভেম্বর ২০০৩
"সনী টাওয়ার্স"
কলকাতা ৭০০ ০১৯

বিনীত—
বুদ্ধদেব গুহ

আমার স্ত্রী ঋতু এবং
আমার দুই কন্যা,
মালিনী ও সোহিনীকে

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৪, মাঘ ১৪১০

["কোনো লেখকই আকাশের শূন্যতায় জন্মগ্রহণ করে না, তারা ছোটো বড়ো মাঝারি যে দরেরই হোক না কেন।

লেখকের সামাজিক পরিবেশ, দেশ ও কালের প্রভাব, পারিবারিক প্রবণতা প্রভৃতি লেখককে অজ্ঞাতে নিয়ন্ত্রিত করে। এখানে লেখক মানে, তার শক্তির বিশেষ রূপটি। কোনো লেখককে সম্যকভাবে বুঝতে হলে এই সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কিংবা এই সমস্ত মানচিত্রের উপরে যথাস্থানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে বুঝতে হবে।

'কবিকে পাবে না কবির জীবনচরিতে', এ কথা সর্বাংশে গ্রাহ্য নয়। জীবনচরিত যদি যথার্থ হয় তবে অবশ্যই কবিকে তাতে পাওয়া যাবে।"]

—প্রমথনাথ বিশী—'পরশুরাম গল্পসমগ্র'-র ভূমিকাতে
(প্রকাশক : মিত্র ঘোষ প্রাঃ লিঃ)

আমার শিকারের বন্ধু মিহির সেন (গোপাল), যার কথা শিকারভিত্তিক আত্মজৈবনিক কাহিনি আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'-র প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত লিখেছি, আমার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। তাঁর বাবা শ্রী জে সেন ইনকরপোরেটেড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন এবং তাঁরও আমার পিতৃদেবেরই মতো নিজস্ব ফার্ম ছিল।

গোপালও তার বাবার বড়ো ছেলে। ওদের আর্থিক অবস্থা বংশপরম্পরাতে খুবই ভালো ছিল। ও পাশ না করলে ওর জীবনযাত্রার মানের কিছুমাত্রই হেরফের হত না। কিন্তু আমার পাশ করা-না-করার ওপরে বাবার অবসর নেওয়া এবং আমাদের পরিবারের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল ছিল। আমার তিন কাকা। দুজন কিছুই করতেন না। একজন দেশভাগের পরে আসামের ধুবড়িতে থাকতেন এবং নিজের সংসার চালাতেই হিমসিম খেতেন। বাবা নিজে দেশভাগের অনেক আগেই কলকাতাতে এসেছিলেন যদিও, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে প্রায় সকলেই পরেই এসেছিলেন। তাছাড়া পরিবার তখন যৌথই ছিল। পরিবার বলতে 'হাম দোনো অওর হামারা দো' বোঝাত না। বাবার ফার্মে উদ্বাস্তু হয়ে আসা অনেক আত্মীয় ও জ্ঞাতিরাই ঠাঁই পেয়েছিলেন। তাঁরা আজ স্বীকার করবেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাবার ফার্মে পা রাখার জায়গাটুকু না পেলে হয়তো ভেসে যেতেন চিরদিনেরই মতো সেই দুর্দিনে।

ঈশ্বর কিছু কিছু মানুষের কাঁধ খুব চওড়া করে এখানে পাঠান। নিজের প্রয়োজনটুকু তো সকলেই মিটিয়ে নিতে পারেন। তাতে বাহাদুরির কিছু নেই। রিকশাওয়ালা থেকে পানের দোকানিও নিজেরটা চালিয়ে নেয়ই। কিন্তু নিজেদের শক্ত কাঁধে পরের বোঝা বইতে যাঁরা পারেন তাঁরাই মানুষের মতো মানুষ। বাবা ছিলেন সেই প্রকৃতির মানুষ। তাই আমার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া না-হওয়ার উপরে আমাদের পরিবারের ভবিষ্যৎই নয়, আরও অনেক পরিবারের ভবিষ্যৎও হয়তো অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

আমার পরীক্ষার দিনগুলিতে বাবা অফিসে যেতেন না। বুঝতাম, টেনশান অত্যধিক হওয়াতে বাড়িতেই আছেন। খারাপ পরীক্ষা দিয়ে আমি যখন বিকেলে বাড়ি ফিরলাম, দেখি বাবা একা লনে বসে খুরপি দিয়ে মুথা ঘাস বাছছেন। আমি গেট খুলে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলেন, পরীক্ষা কেমন হল রে? আমি কোনোদিন বলতাম খারাপ, কোনোদিন বলতাম একরকম। বাবার মুখ কালো হয়ে যেত। এবং সেই কালিমা আমার সমস্ত অন্তরকে এক গভীর গ্লানিতে ভরে দিত।

কিন্তু কী করব! তখন পড়াশোনাতে আমার মন একেবারেই ছিল না। গান, অভিনয়, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা এইসব নিয়েই দিন কাটত। তদুপরি এক গায়িকার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি তখন। সামনে ঘড়ি রেখে ব্যাংক বা ইনস্যুরেন্স বা ইলেকট্রিসিটি কোম্পানির ব্যালান্সশিট দ্রুত মিল করার কোনো রকম তাগিদই বোধ করতাম না। কেরানির মনোবৃত্তি আমার মধ্যে কোনোদিনও ছিল না। আজও নেই। তাই তো নীরস পড়াশোনার প্রতি এক গভীর অসূয়া জন্মে গিয়েছিল। তাই নিশ্চেষ্ট হয়ে এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে ভাগ্যের 'রন্দা' নীরবে সহ্য করতাম।

সেদিনই সকালে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ইন্টারমিডিয়েট সি এ এবং ফাইনালের ল গ্রুপে ভালোভাবে একবারেই পাশ করে গিয়ে অ্যাকউন্টেন্সি গ্রুপের গাঁটে আটকে গেছিলাম।

গোপাল নানা ব্যাপারে কৃতী ছিল। সে শিকার করত, অত্যন্ত ভালো মারত উড়ন্ত পাখি। পববর্তী জীবনে প্রতিযোগিতামূলক রাইফেল ছোড়াতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমঝদার, সাহিত্য-রসিক এবং সুগন্ধি-রসিক ছিল। আতরের সংস্কৃতির সঙ্গে সেই আমাকে পরিচয় করায়। ভালো ফোটো তুলত, ভালো রান্না করত এবং ভালো ছবি আঁকত। সি এ পরীক্ষাতে সে আমার চেয়েও বেশিবার ফেল করেছিল। গোপালকে দেখে আমি সান্ত্বনা পেতাম। কিন্তু গোপাল কারও সান্ত্বনার পরোয়া করত না। ও একজন পুরোপুরি ওরিজিনাল মানুষ ছিল। প্রোটোটাইপ ছিল না কারোই। অন্যরা যা করত ও কখনোই তা করত না। পরবর্তী জীবনে ও কোনো 'ক্ষেপু-খেনু' ক্লাবেবই সভ্য হয়নি, নর্থ ক্যালকাটা ও সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব ছাড়া। ওর শিকার এবং নিজস্ব শখ এবং মুষ্টিমেয় সমমানসিকতার বন্ধুদের নিয়েই ও সময় কাটাত। ও যা করতে ভালো না বাসত ওকে দিয়ে তা করানো ঈশ্বরেরও অসাধ্য ছিল। তাই ওরও পিতৃ আজ্ঞাতে দরজা বন্ধ করে ট্রায়াল-ব্যালান্স আর ব্যালান্সশিট মেলাতে ইচ্ছে করত না। ওর কষ্টটা আমি বুঝতে পারতাম আব সে-ও বুঝত আমার কষ্ট।

গোপালের একজন জাপানি চিত্রী বন্ধু ছিল, হাজিমিশো। সে নেপালে মারা যায় ছবি আঁকতে গিয়ে। গোপাল 'সোসাইটি অফ কনটেম্পোবাবি আর্টিস্টস'-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিল।

রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর লেক মার্কেটের কাছেই যে 'জলযোগ'টি আছে সেটা গোপালদেবই বাড়ি। যৌথ পরিবারের। পরবর্তী সময়ে, সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি গোপালেব বাবা নিউ আলিপুরের ও ব্লকে দেখার মতো একটি বাড়ি করে উঠে যান সেখানে।

ফেল করেছি। সাতসকালেই অত্যুৎসাহী কেউ কেউ সুখবরটি ফোনে জানিয়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছে। আমার খুবই মন খারাপ। নিজের জন্যে তো বটেই, আমার জন্য মা-বাবা এত কষ্ট পাচ্ছেন সে কথা মনে করেই বুক ভেঙে যাচ্ছে। গুটিগুটি গোপালের বাড়ি গেলাম।

গোপাল বলল, কনগ্রাচুলেশনস্।

মানে?

ও বলল, "আরো আরো প্রভু, আরো আরো, এমনি করে আমায় মাবো।"

ও গান খুব ভালোবাসত কিন্তু নিজে কখনও সিবিয়াসলি গান গায়নি। ওর প্রিয় গান ছিল, ধমক দিয়ে 'কে-এ-এ? তোরা পারে যাবি কে-এ এ? আমি লৌকো লিয়ে বসে আচি লদী কিলারে।' যখনই আমরা হাজারিবাগে যেতাম অথবা কলকাতাব কাছাকাছি কোথাও, ও অর্ডার করে করে গান শুনত আমার কাছে। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'জাগো আলোক লগনে' ওর খুব প্রিয় গান ছিল। আর রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে প্রিয় ছিল 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে' এবং 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে ..'।

ও মুখটা ছোটো করে একটি তির্যক হাসি হেসে বলল, চলো।

কোথায়?

বাঃ, ফেল করাটা সেলিব্রেট করতে হবে না?

আমাকে নিয়ে গোপাল ওদের বাড়ির উলটোদিকের ফুটপাথের মাদ্রাজি কফিহাউসে পৌছোল। কফির অর্ডার দিয়ে পানামা সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, খাবে নাকি একটা বিড়ি? তোমার পাইপ কোথায়?

সিগারেটকে ও বিড়ি বলত। পাইপ লজ্জাতে বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। পাইপ-টাইপ ফেলুড়েদের জন্যে নয়। সে যুগে পাইপ ছিল সাফল্যের প্রতীক, অথবা সচ্ছলতার বা আভিজাত্যের। ফেলুড়ের মুখে পাইপ কি মানাত?

বললাম, দাও।

ও বলল, এহ বাহ্য আগে কহো আর। জীবনে সি এ পরীক্ষায় ফেল করলেই জীবন কিছু বৃথা হয়ে যায় না। বুঝেছ লালসাহেব! জীবনে বাঁচার মতো আরও বহুতই কারণ আছে। হাজারিবাগে চলো। নাজিম মিঞা চিঠি লিখেছে কোসমাতে একটা বড়ো চিতা গোরু-বাছুর মেরে খুব ক্ষতি করছে।

বর্ষার সময়ে তো মারবেই!

আমি বললাম।

এমন সময়ে ফুটপাথ দিয়ে-যাওয়া এক ভদ্রলোক গোপালকে দেখতে পেয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার মনে হল, উনি গোপালকে যে এখানে দেখতে পাওয়া যাবেই তা যেন জানতেন। নইলে, আমরা সবচেয়ে পেছনের টেবলে বসেছিলাম, আলোও জ্বলছিল না সকালবেলায় দোকানে, তাঁর আমাদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

গোপাল বলল, দেকেচ?

কী?

পার্টি যেন উল্লাসে ফেটে পড়চে!

উনি কে?

আমার এক আত্মীয়। আর ডিটেইলসে নাই বা জানলে!

বলতে বলতেই ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে এসে বললেন, এই যে গোপাল! কাল না তোমার রেজাল্ট বেরুবার কতা ছেল?

বেরিয়েছে তো!

গোপাল বলল, সিগারেটটা নামিয়ে।

কী হল?

যা হলে আপনি আনন্দিত হন। তাই হয়েছে। আপনার আশীর্বাদের কি কোনোই দাম নেই?

তার মানে?

মানে, আবারও ফেল করেছি।

তুমি ফেল করলে আমার আনন্দের কী?

সে আপনিই জানেন। আমি তো ভেবে পাই না কারণ কোনো। বসুন। একটা দোসা খেয়ে যান।

কেন? কেন? খামোখা দোসা খেতে যাব কেন?

তাহলে শুধু কফিই খান।

না। কফিই বা খাব কেন?

আমি ফেল করেছি, সেই জন্যে। আবার কেন?

না খাব না। তুমি বড়ো...।

উনি বিদ্যুস্পৃষ্টের মতো চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু গোপাল বলল, দেখুন স্যার ঠাকুরদা যা রেখে গেছেন এবং বাবাও যা রেখে যাবেন তাতে পায়ের উপরে পা তুলে আমার ইয়ার-দোস্ত নিয়ে কাপ্তেনি করেই চলে যাবে। আমার জন্যে মিছে উদ্বেগে শরীর নষ্ট করবেন না।

উনি বললেন, আমি যাচ্ছি।

যাওয়া নেই, আসুন।

তারপর গোপাল সিগারেটে একটা টান মেরে, ধোঁয়া ছেড়ে বলল, একেই বলে সমাজ, বুঝেছ লালসাহেব। তোমার খারাপ হলে মানুষের যা আনন্দ হয়, ভালো হলে তা হয় না। ভালো হলে তারা ঈর্ষায় জ্বলে। এই জন্যেই আমি কারো সঙ্গে মিশি না। মিশতে চাইও না। আমার হাজারিবাগই ভালো। জঙ্গল-পাহাড়, মুরগি-তিতির, নাজিম মিঞা, কাড়ুয়া, আসোয়া, ভূতনাথ, ইজাহারেরাই আমার সঙ্গী হয়ে থাক। ওদেরও কিছু প্রত্যাশা নেই আমার কাছে, আমারও নেই ওদের কাছে কিছু।

আমার জীবনের যে অধ্যায়ের কথা আমি বলতে বসেছি ঋভুর এই পর্বের শুরুতে তা আদৌ গৌরবজনক নয়, সুখদায়ক তো নয়ই। আবার হয়তো অন্যভাবে দেখলে বলতে হয়, সবচেয়ে বেশি

গৌরবজনকও। রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করে বলতে পারি যে "যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ, দিয়েছ তাঁরি পরিচয়, সবারে আমি নমি"। সেই সব দুঃখময় দিনে যা-কিছুই শিখেছিলাম তার সবকিছুই পরবর্তী জীবনে কাজে লেগেছিল আশাতীতভাবে। জেনেছিলাম যে, সুখের যোগ্যতা জন্মায়, দুঃখের হাত ধরে অনেকদূর হাঁটার পরেই।

অল্প বয়সে এবং বিশেষ করে যৌবনে, আমরা সকলেই বোধহয় নিজেদের সর্বজ্ঞ বলে মনে করি। তারপর জীবনের বেলা যতই বাড়তে থাকে, অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে, প্রতিবেশ, পরিবেশ, বন্ধুতা, অ য়তার নানা মিথ্যা নির্মোক যখন একে একে আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়ে খুলে পড়তে থাকে, তখনই বোঝা যায় যে, অনেক কষ্টময় অভিজ্ঞতাই আসলে সুখেরই ছিল। এবং অনেক সুখের অভিজ্ঞতাই দুঃখের। 'অল্পবয়সের' অনভিজ্ঞতাতে তাদের সময়ে ঠিকমতো চিনতে পারিনি, এই যা।

তাছাড়া, জীবনের বিকেলবেলাতে না পৌঁছোলে বোঝা তো যায় না যে, জীবনে কোনো সত্যই স্থির নয়। 'শাশ্বত সত্য' কিছু অবশ্যই আছে কিন্তু তারা সংখ্যাতে অত্যন্তই সীমিত। অন্য অধিকাংশ সত্যই, নক্ষত্রনিচয়েরই মতো, স্থান বদল করে। অনেক 'চরম সত্য' পরে 'পরম মিথ্যা'তে পর্যবসিত হয়। মনুষ্য-জীবনের গতি-প্রকৃতি এই রকমই। এতে জীবনমঞ্চের নায়ক-নায়িকাদের বিশেষ হাত বা ভূমিকা নেই। ঘূর্ণায়মান মঞ্চে যেমন এক দৃশ্যর পরে অন্য দৃশ্য ঘুরে ঘুরে আসে, মঞ্চের সেই অংশে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেমন আগে থেকেই নিজের নিজের অবস্থান অনুযায়ী স্থলাভিষিক্ত হয়ে যান এবং আলো জ্বলে উঠলেই সংলাপ বলতে আরম্ভ করেন, তেমনই হঠাৎ হঠাৎ ঘটে যায় নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনা। সেই সব ঘটনা-দুর্ঘটনার অভিঘাতের কিছু পূর্বাহ্নে বোঝা যায় এবং কিছু আবার পূর্বাহ্নে বোঝা যায়ও না।

এখন মাঝে মাঝেই মনে হয় যে খুব কম মানুষের জীবনের নাটকই বোধহয় তার নিজের জীবৎকালে মঞ্চস্থ হতে পারে অধিকাংশ মানুষই মহড়া দিতে দিতেই জীবন শেষ করে দেন।

আমার একটি প্রিয় উপন্যাস আছে। তার নাম 'মহড়া'। সেই উপন্যাসে এই অনুভূত সত্যটিকেই উপস্থাপিত করেছি। আমার অত্যন্ত প্রিয় হলেও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে খুব বেশিজন সম্ভবত এটি পড়েননি।

পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাঁদের মহানুভবতার কারণেই আমি লেখক। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা অন্যান্য পুরস্কারদাতা বেসরকারি সংস্থার কোনো পুরস্কার বা তকমার দাবিতেই আমি লেখক নই। শুধুমাত্র পুরস্কার-প্রাপক বলেই আমি লেখক নই, অগণ্য পাঠক-পাঠিকার শিরোপাতেই লেখক। সেজন্যেই পাঠক-পাঠিকার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। দু-এক সময়ে যখন আমার কোনো কোনো লেখা সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকার মূল্যায়ন আমার মূল্যায়নের সঙ্গে মেলে না, তখন বড়োই অভিমান হয় তাঁদের উপরে। আশা করি, তাঁরা নিজগুণে আমাকে এ কারণে মার্জনা করবেন।

ইন্টারমিডিয়েট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পরীক্ষাতে বেশ ভালো ফল করেছিলাম। জেনারেল কমার্শিয়াল নলেজ এবং অডিটিংয়ে অনেক বন্ধুরই ঈর্ষা জাগানোর মতো নম্বর পেয়েছিলাম। কম পরীক্ষাতেই তেমন ভালো ফল করেছি বলেই এ কথা উল্লেখ করছি, আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নয়। তারপর ফাইনাল পরীক্ষার দুটি গ্রুপের মধ্যে 'আইনের' গ্রুপেও বেশ ভালো ফল করে প্রথমবারেই পাশ করে যাই। কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্সি গ্রুপের পরীক্ষাতে ইনস্টিট্যুট আমার অবস্থা করেন নিজের মাপের চেয়ে অনেক লম্বা পাজামা গুটিয়ে নিয়ে সুইমিং-ট্রাংক করে পুরীর সমুদ্রে সাঁতার কাটতে-নামা সমরেশদার (বসু) মতো। নিদারুণ এবং পৌনঃপুনিক আছাড় মারে আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি আমাকে, যেমন লক্ষ লক্ষ অন্য মানুষকেও মেরেছে এবং আজও মেরে যাচ্ছে। স্বপক্ষে একটি কথাই বলব যে, সেই অসম্মান অপমান আমাকে ভেঙে দিতে পারেনি, বরং এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিই এক গভীর অনুকম্পা জন্মিয়ে দিয়েছিল। এখন ধারণা হয়েছে এই যে, এখনও এ দেশের অধিকাংশ পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত মেধা বা যোগ্যতার কোনো রকম সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। সংখ্যাতত্ত্বের নানা ক্রিয়াকাণ্ডে, মিন, মিডিয়ান, মোড প্রয়োগ করে পুরনো

অনেক বছরের প্রশ্নপত্র নেড়েঘেঁটে, সম্ভাব্যতার নিরিখে প্রশ্ন বেছে নিয়ে তারপর এক বা অগণ্য অত্যন্ত কৃতী ছাত্র বা অধ্যাপককে দিয়ে সেই সামান্য-সংখ্যক প্রশ্নর উত্তর লিখিয়ে নিয়ে, তা দাঁড়ি-কমা-সুদ্ধু মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতাতে উগরে দিতে পারলেই অধিকাংশ সময়েই এখানে অত্যন্ত 'মেধাবী' ছাত্র বলে গণ্য হওয়া যায়। যেসব 'বোকা' ছাত্র যে বিষয়ে পরীক্ষা, সে বিষয়ের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যবই ভালো করে আদ্যোপান্ত পড়ে পরীক্ষাতে বসে, ভালো ফল এই শিক্ষা-ব্যবস্থাতে তাদের মধ্যে খুব কম ছাত্রই করে। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, পরীক্ষকদের মধ্যেও অধিকাংশরাই ওই উগরে দেওয়ার প্রক্রিয়াতেই পরীক্ষাতে পাশ করেছিলেন। যারা ভালো ফল করে তারা যে বেশি জানে এবং তাও বলা যায় না এই প্রেক্ষিতে। কারণ, 'জীবনযুদ্ধে' সেই সব তথাকথিত ভালো ছাত্রদের মধ্যে অনেককেই হারিয়ে যেতে দেখা যায়। 'সংঘর্ষ' আর 'যুদ্ধ' এক নয়। 'যুদ্ধে' যারা জেতে তারা অনেক সংঘর্ষে হেরে যাবার পরও 'জয়ী' বলেই মান্য হয়। হওয়া উচিত অন্তত।

সিএ পরীক্ষার অ্যাকাউন্টেন্সি গ্রুপের পরীক্ষাতে তিন ঘণ্টায় ছটি ব্যালান্সশিট মেলাতে হত সেই সময়ে। তার মধ্যে, ইলেকট্রিসিটি কোম্পানি, ব্যাংকিং কোম্পানি, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি এবং হোল্ডিং কোম্পানির ব্যালান্সশিটও থাকত। এখন ফুটপাথ থেকে কেনা ষাট টাকা দামের একটা ক্যালকুলেটর যা করতে পারে অনায়াসে এবং পনেরো মিনিটেই, তা তিন ঘণ্টাতে করতে পারা-না-পারার উপরেই একজন বুদ্ধিমান ছাত্রের ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ভর করত। কত প্রকৃত মেধাবী ছাত্রই যে আমাদের সময়ে (যখন কোচিংয়ের কোনো ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলতে পারে) জীবনে এই অর্থহীন প্রক্রিয়া মেনে নিতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজের নিজের জীবনে, সমাজের কাছে, আত্মীয়স্বজনের কাছে, 'হারিত' বলে বিবেচিত হয়েছেন এবং জাগতিকার্থে 'সফল' হতে পারেননি, তার খতিয়ান রাখলে আজ সে খতিয়ানের অগণ্য খণ্ড হত। এই গ্লানি তাঁদের নয়, হওয়া উচিত এইরকম পরীক্ষা-ব্যবস্থারই।

খাতা লেখা, কাস্টিং ও পোস্টিং এবং ভাউচিংয়ের মধ্যে একটা কেরানিগিরি কেরানিগিরি গন্ধ পেতাম, এমনকী মাছিমারা কেরানিরও। ছেলেবেলা থেকেই।

'মাছি মারা উকিল' বলতে বোঝায়, যে উকিলের পসার নেই। যিনি সেরেস্তাতে বসে মাছি তাড়ান এবং মারেন। এই বাক্যবন্ধটি হয়তো অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু অল্পবয়সি পাঠকেরা 'মাছিমারা কেরানি' বাক্যবন্ধটির অর্থ হয়তো জানেন না। যে কেরানি ক্যাশবই বা দি বুক অফ প্রাইমারি এন্ট্রি থেকে লেজারে পোস্টিং করার সময়ে ক্যাশবইতে একটা মাছিকে চেপটে থাকতে দেখে লেজারেও একটা মাছি মেরে চেপটে রাখার জন্যে মাছি মারবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান, তাঁকেই 'মাছিমারা কেরানি' বলে।

'রেজিমেন্টেশন' হিসেবে, মনোসংযোগের পরীক্ষা হিসেবে অ্যাকাউন্টেন্সি অবশ্যই ভালো ছিল কিন্তু মেধাবীদের বিষয় আদৌ ছিল না সেই সময়ে। বাবা যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, এবং আমি যেহেতু বড়ো ছেলে, এবং যেহেতু আমার দুই ভাই বিশ্বজিৎ এবং ইন্দ্রজিৎ আমার চেয়ে যথাক্রমে নয় এবং দশ বছরের ছোটো, সেই জন্যেই আমার জাগতিক ভবিষ্যতের কারণ ছাড়াও পরিবারের অর্থনৈতিক সুরক্ষার কারণেই তিনি আমাকে যেনতেনপ্রকারেণ অ্যাকাউন্ট্যান্টই করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাছাড়া, বাবা ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী মানুষ। মায়ের মতো রোমান্টিক, কল্পনাবিলাসী, সূক্ষ্মরুচি, কাব্য বা সংগীতমনস্ক মানুষ ছিলেন না। যদিও এসব করলেও বারণ করতেন না, উৎসাহই দিতেন। বাবার 'থ্রি কম্যান্ডমেন্টস'-এর মধ্যে ছিল (১) চরিত্র, (২) পড়াশোনা, (৩) খেলাধুলো।

এ কথাও বিলক্ষণ উপলব্ধি করেছিলাম তখন যে আমাদের সময়ে দশটি গাধা মরে কোনো পরিবারে একটি বড়ো ছেলে জন্মায়।

সেই সময়ে পেশাদার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা ব্যারিস্টারের ছেলেদের এবং বিশেষ করে বড়ো ছেলেকে নিজ নিজ পেশায় আনবার চেষ্টা করতেন তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্যে। তখনও পরের প্রজন্মর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে দাম দেওয়াটা অনেক ক্ষেত্রেই আদৌ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হত না। কিন্তু আজকাল দেখতে পাই যে শুধু ওই সব পেশার ক্ষেত্রেই নয়, নান্দনিক

ক্ষেত্রেও সকলেই নিজেদের সন্তানদের যার যার পেশাতেই সামিল করছেন, সেই সন্তানের সেই সব সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে কোনো অধিকার থাক আর নাই থাক। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হচ্ছে।

আশার কথা এই যে, এখন পর্যন্ত দু-একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া লেখকের ছেলে বা মেয়েকে তার মা অথবা বাবা জবরদস্তি করে লেখক করেছেন এমন দেখিনি। জোর করে গায়ক বা নাচিয়ে পর্যন্ত হয়তো করা যায়, লেখক সম্ভবত করা যায় না। এই বাঁচোয়া।

সংসারে নিজসৃষ্ট অনেক দুঃখ থাকে। পরসৃষ্টও থাকে। নিজসৃষ্ট কিছু দুঃখ থাকে যে কারণে অন্যকেও দুঃখিত হতে হয়। সি এ পরীক্ষাতে আমার অ্যাকাউন্টেন্সি গ্রুপে ফেল করার দুঃখটা বাবার সৃষ্টি, কিন্তু ফেল করার কারণে বাবার দুঃখও কম ছিল না। আমার কারণে বাবাকে দুঃখিত হতে দেখে ভীষণই কষ্ট হত।

বাবার চরিত্রে যে অসাধারণ দার্ঢ্য ছিল তাতে কখনো তাঁর নিজের দুঃখের প্রকাশ দেখিনি। তিনি জন্ম-আশাবাদী ছিলেন। হার-স্বীকারে অবিশ্বাসী ছিলেন। আমাকে একদিনও বা একবারও মন্দ বলেননি পাশ করতে পারছি না বলে। বরং বলতেন, "Failures are the pillars of success"। বলতেন, "Never look back in life"। বলতেন, পাশ তোমাকে করতেই হবে। আর মা বলতেন আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে, বাবার ইচ্ছা, তুই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে যা। তারপরে তুই গান গাইবি, ছবি আঁকবি, লিখবি। আমি তোকে আশীর্বাদ করছি, তুই খুব বড়ো লেখক হবি।

বড়ো লেখক হয়েছি কি না জানি না। তবে আজকে লেখক হিসেবে অনেকেই আমার নাম জানেন। আমার মা আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে অল্পবয়সেই প্রথমবারের হার্ট-অ্যাটাকে চলে গেলেন। থাকলে, আজকে আমার কারণে সবচেয়ে বেশি গৌরবান্বিত হতেন আমার মা-ই। মায়ের কথা খুবই মনে পড়ে। মাকে মিস করি খুব। মা যে মা-ই!

লেখক ও পাঠকের একই উপন্যাসের ভিন্ন মূল্যায়নের কথা একটু আগেই বলেছি। সেই প্রসঙ্গেই বলি যে, আরেকটি উপন্যাস, যার নাম 'চবুতরা', অত্যন্তই প্রিয়। কাশীর পটভূমিতে লেখা এবং সাধুভাষাতে লেখা। এই উপন্যাসটিও অপেক্ষাকৃত কম পাঠক-পাঠিকাই পড়েছেন। যদিও মনে হয় যে এটি আমার অন্যতম ভালো উপন্যাস। প্রিয় তো বটেই। 'মহড়া' এবং 'চবুতরা' এই দুটিই দেজ-এর সংকলন : 'তেরোটি উপন্যাস'-এর মধ্যে আছে। ওই সংকলনটির প্রচ্ছদও আমারই আঁকা।

আবার গোপালের কথাতে আসি।

সেই আমার প্রথমবার হাজারিবাগে যাওয়া। তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু মনে হয়, এই যেন সেদিন।

গোপাল আজ নেই। সাত বছর আগে সেরিব্রাল স্ট্রোকে সে চলে গেছে। যখন ও অসুস্থ হয় আমি তখন পেশার কাজে বম্বে গেছিলাম। ফিরে শুনলাম ওর কথা বলার শক্তি হারিয়ে গেছে। ডাক্তারেরা ভরসা দিতে পারছেন না। পরদিনই সকালে বেলেভ্যু নার্সিংহোমে গেলাম। ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে ছিল ও। ওর পাশে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, দেখলাম চোখ বন্ধ। কিছুক্ষণ পরে, সম্ভবত ষষ্ঠবোধেই ও চোখ মেলল। দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়াতে লাগল। আমি বললাম, কোনো চিন্তা নেই গোপাল। তুমি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠবে। তারপরে আমরা আবার হাজারিবাগে যাব একসঙ্গে, পুরনো দিনের মতো, ক্রোসমাতে যাব, চড়ুইভাতি করব। বাখরখানি রুটি আর তিতিরের কাবাব খাব। হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্কে হারহাত নদীর পাশের হারহাত বাংলোর বারান্দাতে বসে বর্ষার অমাবস্যার রাতে দুজনে পাশাপাশি অথচ নিশ্চুপে বসে নদী বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনব আর জোনাকির আলপনা দেখব। ভালো তোমাকে হতেই হবে।

এই কথাতে তার চোখ দিয়ে আরো জল পড়ল। পরদিন মাঝরাতে গোপাল চলে গেল। দুজনের একসঙ্গে হাজারিবাগে যাওয়া আর হল না। হবে না।

মৃত্যুপথযাত্রী অনেক আত্মীয়-বন্ধুর বিছানার পাশে দাঁড়িয়েই এইরকম কথা বহুবার বলেছি কিন্তু আমার ভবিষ্যৎবাণী অধিকাংশ সময়েই সত্যি হয়নি। হয়নি যে, তার সবটুকু দুঃখ আমারই।

বন্ধু বলতে যা বোঝায় তা আমার কোনোদিনই বেশি ছিল না। কারণ, বন্ধুতা কখনোই হয় না সময় না-দিতে পারলে। সতেরো বছর বয়স থেকেই দিনে ষোলো ঘণ্টা নিজস্ব কাজ এবং অকাজে ব্যস্ত ছিলাম এবং আজও আছি তাই চলিতার্থে 'আড্ডা' মারা যাকে বলে তা তেমন মারার সুযোগ পাইনি, যদিও আমার পরিচিত এমনকী স্বল্পপরিচিতরাও আমাকে আড্ডাতে পেলে খুবই খুশি হন। সময়ের অভাবই আমার বন্ধুহীনতার মুখ্য কারণ। তাছাড়া, সমমানসিকতার মানুষও কমই পেয়েছি জীবনে। সে অর্থে পাঠক-পাঠিকারা যত বড় বন্ধু, তেমন বন্ধু বেশি পাইনি। জঙ্গলের বন্ধুরাই, খেলাধুলা, গান-বাজনার জগতের মানুষেরাই আমার কাছের মানুষ হয়ে এসেছেন জীবনে, তার মধ্যে আমার গায়িকা স্ত্রী ঋতুও পড়েন। 'অ্যাকোয়েন্টেন্স' আছে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে কিন্তু বন্ধুত্ব হয়েছে মুষ্টিমেয়দের সঙ্গে। 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায়/কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।'

আবার গোপালের কথাতেই ফিরি। রোগশয্যাতে শায়ীন গোপাল নয়, অত্যন্ত জীবন্ত, রসিক, ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল বাইশ বছর বয়সি গোপালের কথায়।

হাজারিবাগের কথা 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'তে এবং আরও অন্যান্য লেখাতে এতই বলেছি যে এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। করলে, পাঠকের বিরক্তি উৎপাদিত হতে পারে। শুধু একটি কথাই বলব যে, পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত হাজারিবাগ এবং তৎসংলগ্ন নানা অঞ্চল এবং সেই সব অঞ্চলের অগণ্য মানুষ আমার উপরে অশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং করেছেন।

হাজারিবাগেব গয়া রোডের (এখন বরহি রোড) উপরের, রিফর্মেটরির পথের প্রায় সঙ্গম-স্থলের বাগান-ঘেরা, ছবির মতো 'পূর্বাচল' বাড়িটির এবং গোপালের অনুষঙ্গ আমার নানা লেখাতে ছড়িয়ে আছে। 'মাধুকরীর' সাবির মিঞার উপরে হাজারিবাগের নাজিম মিঞার প্রভাব অনস্বীকার্য। শামিম তো সত্যি চরিত্র। তার একটা ছোটো ঘড়ি-সারাইয়ের দোকান ছিল মসজিদের পথে। টুটিলাওয়ার জমিদার এবং শিকারি ইজাহারুল হক, টুটিলাওয়ার পথে গোন্দা বাঁধের উলটোদিকে মাইল আড়াই-তিন পায়ে হাঁটা পথে গিয়ে যে কোসমা (বা কুসুমভা) গ্রাম, যে গ্রামের কথা অগ্রজ সুবোধ ঘোষ মশায়ের একটি গল্পে আছে, এবং সেই গ্রামের কাড়ুয়া, আসোয়া, রামধানীয়া, কাড়ুয়ার ছেলে রত্না ইত্যাদির কথাও অনেক লেখাতে আছে। নানা ছোট গল্প ছাড়াও 'মাধুকরী', 'ভোরের আগে', 'আরোহী' ইত্যাদি উপন্যাসে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে হাজারিবাগের প্রভাব আছে। মহম্মদ নাজিম, গোপাল, ইজাহারুল হক, শামিম মিঞা, কানহারি পাহাড়ে যাওয়ার পথে ইউক্যালিপটাসের সারি ঘেরা 'দি ইউক্যালিপটা'-র সুব্রত চ্যাটার্জি, আমার আর গোপালের শিকারের বন্ধুর কথাও অনেকই আছে, নানা লেখাতে। দুঃখের কথা এই যে, আজকে এঁরা কেউই আর ইহজগতে নেই। নেই বলেই, আমার হাজারিবাগে যেতে আর ইচ্ছেই করে না। যেমন করে না, ডালটনগঞ্জ, পালামৌ বা বেতলাতেও যেতে, আমাদের মক্কেল এবং অনুজপ্রতিম, 'প্রিন্স অফ পালামৌ' মোহন বিশ্বাসও আর নেই বলে। মোহন না থাকলে পালামৌর পটভূমিতে লেখা অজস্র উপন্যাস এবং গল্প কখনোই লিখতে পারতাম না। 'কোয়েলের কাছে' (আনন্দ), 'কোজাগর' (দে'জ), 'বাসনাকুসুম' (সাহিত্যম্) ইত্যাদি তার মধ্যে পড়ে। গত পুজোতে 'নবকল্লোল' শারদীয়াতে লেখা উপন্যাস 'দীপিতা'ও পড়ে। দীপিতার শ্বশুরবাড়ি ডালটনগঞ্জের নয়াটোলিতে। এই নয়াটোলিতেই মোহনের বাবা শ্রীমুকুন্দলাল বিশ্বাসের বাসভবন এবং পরবর্তীকালে মোহনের (রঞ্জিতকুমার বিশ্বাস) নিজস্ব বাসভবনও ছিল। দীর্ঘ চার দশক ধরে ডালটনগঞ্জে আমার যাতায়াত ছিল এবং মোহনেরই দৌলতে এবং স্বার্থহীন দাক্ষিণ্যে পালামৌয়ের আনাচেকানাচেও।

মোহন সম্বন্ধে নানা জনের মুখে নানা কথা হয়তো আপনারা শুনতে পারেন। তার কিছু ভালো কিছু বা মন্দও। কিছু সত্যি, কিছু মিথ্যা। কিন্তু আমি সমস্ত মানুষকেই চিরদিন বিচার করে এসেছি নিজেরই প্রেক্ষিতে। অন্যে কে কী বলল তার সম্বন্ধে, তা নিয়ে কখনোই মাথা ঘামাইনি। নিজস্ব

অভিজ্ঞতাতে একজন মানুষকে যেমন জেনেছি, তার উষ্ণতাতে যেমন উষ্ণ হয়েছি, শুধু সেই কথাই মনে রেখেছি।

আমার মা বলতেন, কার জন্যে কী করেছ, কাকে কী দিয়েছ তা কখনোই মনে রেখো না, কিন্তু কারো বাড়িতে এক গ্লাস জল খেলেও তা চিরদিন মনে রেখো। কৃতজ্ঞতাবোধ যে মানুষের নেই সে মানুষ-পদবাচ্যই নয়। আমার পরিচিত একাধিক বুদ্ধিজীবী না দুর্বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা অবস্থাপন্ন মানুষের স্কন্ধারূঢ় হয়ে অঢেল খাদ্য-পানীয়র শ্রাদ্ধ করে বাড়ি ফিরে জাঁক করে বলেন যে 'বর্বরস্য ধনক্ষয়' করে এলাম। ঈশ্বর করুন যে এমন বুদ্ধিজীবী যেন আমাকে কোনোদিনও না হতে হয়।

নাজিম সাহেব এখন কবরে শুয়ে আছেন। তাঁর মৃত্যুর সময়ে আমি হাজারিবাগে যেতে পারিনি তাই জানাজা বহন করতেও পারিনি। মনে হয়, নাজিম সাহেব নীরবে শেষযাত্রায় অন্যর স্কন্ধারূঢ় হয়ে যাওয়ার সময়ে হয়তো নিরুচ্চারে বলেছিলেন:

"গুস্তাকি ম্যায় ম্রিফ করেঙ্গে ইকবার
যব সব প্যায়দল চলেঙ্গে, ম্যায় কান্ধেপর সওয়ার"

হাজারিবাগ থেকে যে পথটি টুটিলাওয়া চলে গেছে সেই পথেই শহর ছাড়িয়ে কিছুদূর গেলেই ডানদিকে একটি কবরখানা পড়ে। সেই কবরখানাতেই নাজিম সাহেব শায়ীন আছেন। কলকাতা থেকে মার্বলের একটি স্মৃতিফলক বানিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে লাগিয়েছি কবরের পাশে। তাতে আমার, গোপালের, সুব্রতর এবং আমাদের অনুজ ভূতনাথ সরকারের তরফে কিছু কৃতজ্ঞতার কথা লেখা আছে। নাজিম সাহেব চলে যাওয়ার পরে যতবারই হাজারিবাগে গেছি, সেই কবরখানাতে গিয়ে তাঁর কবরের উপরে মোমবাতি এবং ধূপকাঠি জ্বেলেছি।

শুধু নাজিম সাহেবই নন, শিকার এবং পেশার সুবাদে অগণ্য বিহারী, উত্তরপ্রদেশীয়, মধ্যপ্রদেশীয়, ওড়িশা এবং বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। এবং পেয়ে, তাদেব ঈশ্বরবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ, তাদের জীবন সম্বন্ধে এক আশ্চর্য ভোগ এবং ত্যাগবাদী মানসিকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। মুসলমানদের এবং ইসলাম ধর্মের নানা গুণ এবং তাদের ধর্মান্ধতাকেও কাছে থেকে জানার সুযোগ পেয়েছি। তাঁদের আমি মস্ত গুণগ্রাহী। আমার মুসলমান-প্রেম রাজনীতিকদের মতো ভোট-প্রত্যাশার ঝুটো কারণে নয়, আমার জীবনে তাদের অনেককেই খুবই কাছ থেকে দেখেছি বলেই, তাদের জানি। ইসলাম ধর্মের 'বিরাদরি' থেকে আমাদের কট্টর জাতপাত-বিশ্বাসী হিন্দুরা যদি আজও কিছু শিখতে পারেন তবে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রভূত উপকার এখনও হতে পারে।

অন্য প্রসঙ্গে চলে এলাম পাঠক। ক্ষমা করবেন। পর পর তিন-তিনবার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হওয়াতে আমার স্মৃতিশক্তির খুবই ক্ষতি হয়েছে। পূর্বাপর জ্ঞান তো তার নষ্ট হয়েইছে, আরও নানা দোষে সে ক্লিষ্ট। আশা করি, পাঠক নিজগুণে আমাকে মার্জনা করবেন। তাছাড়া, চলে-যাওয়া বন্ধুবান্ধবের স্মৃতিচারণ করতে বসে মন বড়ো উদাস ও এলোমেলো হয়ে যায়। আমি নীরদ সি চৌধুরীর মতো মস্তিষ্কসর্বস্ব মানুষ নই। আমার অস্তিত্বে মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয়ের ভূমিকা অনেকই বড়ো। আর বড়ো বলেই হৃদয়ে ঝড় উঠলে আমার পারিপার্শ্ব, পরিবেশ, প্রতিবেশ সব ওলটপালট হয়ে যায়। এই বৈকল্যের জন্যে আমি আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরীক্ষা পাশ করতে না পেরে যখন মরমে মরে আছি তখনই আরেক মর্মপীড়ার শিকার হলাম। গানের স্কুলে গান শিখতে গিয়ে এক গায়িকার প্রেমে এমন ভাবেই পড়লাম যে তাতে পরীক্ষা পাশের সম্ভাবনা আরও দূরীভূত হল। সেই মানসিকতাকে, আজকের চলিতার্থে 'প্রেম' বলাটা বোধহয় সঙ্গত হবে না। তাকে 'মোহ' বলাই ভালো। ইংরেজিতে যাকে বলে ইনফ্যাচুয়েশন। কারণ, যাকে ভালোবেসে অশেষ কষ্ট পেলাম এবং মা-বাবাকে কষ্ট দিলাম তার সঙ্গে আমার মেলামেশা ছিল না। তবে দেখা হত কচিৎ-কদাচিৎ, মহড়াতে, পথেঘাটে, কোনো অনুষ্ঠানে। এবং সামনাসামনি হলেই তার ভুরু কুঁচকে যেত, মুখে বিষম বিরক্তি ফুটে উঠত এবং তৎক্ষণাৎ আমার নৈকট্য থেকে সে পালিয়ে বাঁচত। তাতে আমার কষ্টই বেড়ে যেত শুধু বহুগুণ। আমি বিশ্বাস করতাম যে, যে-মেয়েকে বিয়ে না-করতে পারব

তার সঙ্গে মেলামেশা করাটা তার পক্ষে অশেষ ক্ষতি ও দুর্নামের হতে পারে। আমাদের যৌবনকালে সমাজ আজকের তুলনাতে অনেকই অনুদার ছিল।

বিয়ের কথা তো তখন ভাবতেও পারতাম না। সি এ পরীক্ষাতে পাশ না করতে পারলে তখন আমার বাজারদর আড়াইশো টাকা ছিল। বাবা বড়োলোক হতে পারেন কিন্তু আমি বাবার পয়সাতে বড়োলোকি করার কথা কখনও ভাবিনি। সেই শিক্ষাও পাইনি। বাবার ছ'খানা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও, বাবার বড়োছেলে হওয়া সত্ত্বেও, বাসে-ট্রামে করেই বাবার অফিসেই গেছি। বাবার সঙ্গে যেতে হলে পৌঁছোতে দেরি হবে বলে বাবা বলা সত্ত্বেও বাবার সঙ্গে যেতাম না। ছটি গাড়ি থাকলে কী হবে, নিজে গাড়ি চালাতে জানলেই বা কী হবে, বাড়িতে তখন একটিমাত্র ড্রাইভার ছিল। বাবাও নিজে গাড়ি চালাতেন অনেকদিন পর্যন্ত। ছোটোকাকুও চালাতেন। আমি গাড়ি চালাতাম, বাবার আদেশ হলে। যেমন, হলেও তা—নেমন্তন্নের জন্যে ভালো ভালো বাজার করার সময়ে। বাবার কোনো জাগতিক সম্পত্তির কিছুমাত্রও যে আমার, সে কথা আমি কখনোই মনে করিনি। সে কারণেই যে-মেয়ের গানে আমি বিদ্ধ হয়েছিলাম তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার সাহসই আমার ছিল না। নিজে স্বাবলম্বী হইনি বলেই।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটল আমার জীবনে যা আমার জীবনকে আমূল বদলে দিল। আগেই বলেছি, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকালের ক্লাসে আইনও পড়তাম। ভোরে উঠে বাসে করে কলেজ স্ট্রিটে যেতাম। আইনের ক্লাস করে, ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে ভাত খেয়ে অফিসযাত্রীদের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে ধর্মতলাতে অফিসে আসতাম। অফিস থেকে অবশ্য অনেকদিনই চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়তাম। দেশপ্রিয় পার্কের দক্ষিণ কলকাতা সংসদের টেনিস খেলার জন্যে। অনেকদিন গানের ক্লাস বা নাটকের মহড়াও থাকত।

একদিন অফিসে বসে কাজ করছি, মার্চের মাঝামাঝি, বাবা ডাকলেন তাঁর চেম্বারে। দেখি, একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কালো হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক বসে আছেন বাবার উলটোদিকের চেয়ারে।

বাবা বললেন, পাটনাতে একটা আপিল ফিক্সড হয়েছে ট্রাইব্যুনালে, করতে পারবি?

দুবার না ভেবেই বললাম, হ্যাঁ।

দশ বছর বয়স থেকে বাঘের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ভয় ব্যাপারটা আমার চরিত্রে কখনোই সেঁধোতে পারেনি। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই। বরং অন্যে যা-কিছুই ভীতিজনক বা অসাধ্য বলে মনে করেছেন, চিরদিনই সেই কাজ করতেই সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি। একজন পেশাদারের সমস্ত আনন্দ তার পেশাদারি কৃতিত্বেই। তার প্রাপ্ত 'ফিস'-এ নয়। সেই ফিস যত বেশিই হোক না কেন। এ কথা প্রকৃত পেশাদার মাত্রই স্বীকার করবেন।

'হ্যাঁ' বলে দেওয়াতে ভদ্রলোক বাবাকে বললেন, দেখলেন তো গুহসাহেব। আপনি জানেনই না নিজের ছেলে সম্বন্ধে কিছু।

বাবা স্বগতোক্তি করলেন : যে কোনোদিনও ইনকামট্যাক্স অফিসারের সামনেই অ্যাপিয়ার করেনি সে হায়েস্ট ফাক্ট-ফাইন্ডিং অথরিটি, ইনকামট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের সামনে অ্যাপিয়ার করবে কীভাবে তা আমি জানি না। আমি তো নিজেও অ্যাপিয়ার করি না। ড. রাধাবিনোদ পাল, বা নলিনী সেনগুপ্ত বা কল্যাণ রায়কে দিই ট্রাইব্যুনালের ব্রিফ।

বলেই, চুপ করে গেলেন।

বাবা তাঁর ফেলুড়ে ছেলের এরকম সুপ্ত ও লুক্কায়িত পারদর্শিতার কথা জেনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন।

পরে জেনেছিলাম সেই ভদ্রলোক জামশেদপুরের বিষ্টুপুরের ডাকোস্টা ম্যানশনের 'ভারত বিল্ডার্স' নামক ঠিকাদারি ফার্মের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তাঁকে আমরা ঠাকুরবাবু বলেই ডাকতাম। অফিস থেকে যে সব অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং আর্টিকল্ড ক্লার্করা জামশেদপুরে ওঁদের অডিটে যেতেন তাঁরা সকলেই ঠাকুরবাবুর কাজের খুবই প্রশংসা করতেন। বলতেন তাঁর কাজ নিখুঁত। উনি ছিলেন পারফেকশনিস্ট।

সব পেশাতেই প্রফেশনাল কমপিটেন্স বলে একটা ব্যাপার আছে। আঁন্দ্রে মোরোয়ার (মাঁলরো নন) লেখা একটি বই The Art of Living-এর একটি অধ্যায় ছিল 'The Art of Working'। তাতে উনি লিখেছিলেন, "A perfect thing is perfect—whatever may be its scale." বহু যুদ্ধ জেতা একজন জেনারেলও যেমন কৃতী, নিজের ছোট্ট সংসারটিকে সুচারু ও নিপুণভাবে চালিত করেন যে গৃহিণী, তিনিও সেই জেনারেলের চেয়ে একটুও কম কৃতী নন। কৃতিত্বর মাপের উপরে কৃতিত্বর গুণপনা কখনোই নির্ভরশীল ছিল না। টিসকো বা আই সি আই কোম্পানির চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্টের কৃতিত্বের সঙ্গে ভারত বিল্ডার্সের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ঠাকুরবাবুর গুণমানের কোনো তফাত ছিল না। ক্রিয়াকাণ্ডর মাপের তফাত অবশ্যই ছিল। ঠাকুরবাবুর এক পুত্র, যিনি আমাদের ফার্ম থেকেই সি এ পাশ করেছিলেন, এখন ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর। বম্বেতে আছেন। কয়েক বছর আগে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বম্বের এক উড়ানে হঠাৎই দেখা হয়ে গেছিল।

ঠাকুরবাবুর ভূমিকা আমার জীবনে কেন অপরিসীম তাই বলছি এখন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের আমাদের ক্লাসে ঠাকুরবাবুর কোনো ভাইপো বা বোনপো নাকি পড়তেন। ব্যারিস্টার গৌরী মিত্তিরের ছোটো ভাই নির্মল, এখন সেও সিনিয়র ব্যারিস্টার। মনীষা, পদবি মনে নেই, এখন যিনি ড. দেবী পালের জুনিয়র, তিনিও আমাদের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তেন। গায়ের রং কালো হলেও খুবই সুশ্রী ছিলেন মনীষা। আজ থেকে মাত্র চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি।

আইন যাঁরাই পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে আইনের ক্লাসে 'Moot Court' বলে একটা ব্যাপার থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মোশন অথবা কোয়েশ্চেন অফ ল-র পক্ষে এবং বিপক্ষে সওয়াল-জবাব করতে হয় অধ্যাপকের সামনে। আমি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এসেছিলাম, হয়তো অন্য কলেজের ছেলেদের তুলনাতে ইংবেজিতে একটু বেশি সড়গড় ছিলাম। বিশেষত ইংরেজি বলার ব্যাপারে। কারণ, আমাদের সময়েও অনেক আইরিশ, স্কটিশ এবং বেলজিয়ান ফাদাররা অধ্যাপক ছিলেন। তাতেই নাকি ঠাকুরবাবুর আত্মীয়, আমার সেই সহপাঠী, যার সঙ্গে আমার আলাপও ছিল না, একেবারে মোহিত হয়ে ঠাকুরবাবুকে বলেছিল গুহসাহেবের ছেলে বুদ্ধদেব দারুণ বলে। এবং সেই সার্টিফিকেটেই ঠাকুরবাবুর ওই কাণ্ড। এবং আমার পিতৃদেব যাকে বলে, কুপোকাত।

বাবার চেম্বার থেকে বেরিয়ে পাশের টাইপিস্টদের ঘরে আমাকে নিয়ে ঢুকে ঠাকুরবাবু বললেন, কী বলবেন বলুন তো? রীতিমতো পরীক্ষা। তা কেসটা যে কী তা না দেখে, গ্রাউন্ডস অফ আপিলগুলি কী তা না দেখে কী করে বলি?

বললাম, 'মে আই প্লিজ ইয়োর লর্ডশিপ' বলে সম্বোধন করতে হয়।

ঠাকুরবাবু বললেন, সে তো হাইকোর্টে। ইনকামট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের মেম্বারদের 'ইয়োর অনার' বলে সম্বোধন করতে হয়।

ঠাকুরবাবু বললেন, তাহলে আগামী কাল আমি বাড়ি থেকে তুলে নেব আপনাকে। অমৃতসর মেলে যাব আমরা। ভোরে পাটনা পৌঁছোব।

বললাম, আচ্ছা।

আচ্ছা তো বললাম, কিন্তু সারা রাত ভয়ে ঘুমোতেই পারলাম না, সাতসকালে দেখি বাবা নীচে নেমে, আমার ঘরে এসে বললেন, কী রে? ভয় পাচ্ছিস নাকি? তাহলে যাস না। অ্যাডজোর্নমেন্ট নিয়ে নিতে বলব।

আমি বললাম, ঠাকুরবাবু যে বললেন, অ্যাডজোর্নমেন্ট দেবে না আর ট্রাইব্যুনাল। চারবার নেওয়া হয়েছে।

তাই? তাহলে যা। শুরু হয়ে যাক তোর জীবনের ব্যাটল অফ লাইফ। এই তো আসল পরীক্ষা। প্রথমেই ট্রাইব্যুনাল দিয়ে আরম্ভ করলে পরে কমিশনার এবং অন্যান্য লেভেলে যেতে কোনোই অসুবিধা হবে না। ওখানে দিলীপ আছে ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। ওকে একটা চিঠি লিখে দেব।

দিলীপ, মানে ডি কে সেন। তখন তিনি ইনকামট্যাক্স-অফিসার। ট্রাইব্যুনালে ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে পোস্টেড। দারুণ ইংরেজি বলেন। একবার ট্রেনে একজন মাদ্রাজি ভদ্রলোকের

সঙ্গে ইংরেজিতে ঝগড়া করতে শুনে তাঁর ওপরে স্কুল ছাত্র আমার খুবই ভক্তি হয়ে গেছিল। তীর্থপতির ছেলে তো! ফাদার স্কেফার্স যাই বলুন না কেন, আড়াই হাজার হীনম্মন্যতা ছিল তখন আমার। সেই সাহেবের মতো ইংরেজি বলা দিলীপকাকু আমার বিরুদ্ধে ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের হয়ে সওয়াল করবেন শুনেই তো হাত-পা আরও ঠাণ্ডা হয়ে এল। দিলীপকাকু অনেকদিন হল কমিশনার হিসেবে রিটায়ার করেছেন। এখন দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সের একজন ডিরেক্টর। হয়তো প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করেন, ঠিক জানি না।

উনিশশো উনষাটের মার্চ মাস। রাতে হাওড়াতে এসে ঠাকুরবাবু তো আমাকে ফার্স্ট ক্লাস এ সি-তে চড়ালেন। তখন এ সি-তে ট্রাভল করতেন মুষ্টিমেয় মানুষ। একে তো ভয়ে কুঁকড়ে আছি তার ওপরে বিরাট এ সি কম্পার্টমেন্টের ঠান্ডা। কম্বল মুড়ি দিয়ে অমৃতসর মেলের তৎকালীন বিরাট কম্পার্টমেন্টের লোয়ার বার্থে শুলাম বটে কিন্তু ঘুম এল না। রাতে যে স্টেশনেই গাড়ি থামে সেখানেই মনে হয় নেমে গিয়ে উলটো দিকের ট্রেনে চড়ে কলকাতা পালাই। তখন আমি তেইশে পড়েছি। এখন ভাবলে বিশ্বাস হয় না যে আমার ট্রাইব্যুনালের প্র্যাকটিসের চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে পঞ্চাশে পড়বে। মনে হয় সেদিনের কথা। তবে চল্লিশ বছর হয়েছে বলেই যে মস্ত বড়ো উকিল হয়েছি তা আদৌ নয়। ঈশ্বরের অশেষ আশীর্বাদে এবং অগণ্য মেম্বার এবং ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের প্রীতি ও স্নেহে সেই তেইশ বছরের টগবগে যুবক যেমন তেমন আজকের প্রায়-বৃদ্ধ, খুব কম আপিলই হেরেছি। বাবা শিশুকাল থেকে এমন এক জেদ তৈরি করে দিয়েছিলেন যে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই হারতে আমার ভালো লাগেনি। জীবনে দু'নম্বর হয়ে বাঁচতে কোনো মজা নেই। যা-কিছুই করি না কেন তাতে এক নম্বর হব এই ছিল দাঁতে দাঁত চাপা জেদ। হতে পেরেছি কি পারিনি তার বিচার আমার করার নয়। তবে চেষ্টা অবশ্যই করেছি এবং তার জন্যে মূল্যও কম দিইনি। আজকেও এই ষাটোর্ধ্ব জীবনেও আমি আঠারো ঘণ্টাই পরিশ্রম করি। তবে পেশার কাজ কমিয়ে লেখা, পড়া, গান গাওয়া, ছবি আঁকা এইসবে মনোনিবেশ করেছি। ইচ্ছে আছে শেষ জীবনে শুধু গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ছবি আঁকব এবং কবিতা লিখব। জানি না, ইচ্ছে পূরণ হবে কি না! তবে শেষ তো শুরুই হয়ে গেছে।

পাটনা স্টেশনে যখন নামলাম সকালে, বেশ শীত করতে লাগল। মার্চের মাঝামাঝি, তখনও মিষ্টি মিষ্টি ঠান্ডা ছিল। পাটনা শহরটাও ছোটোই ছিল। গঙ্গার উপরে পাটনার কাছে সেতু তখনও হয়নি দক্ষিণ ও উত্তর বিহারকে সংযুক্ত করে। সেতু হয়েছে তার অনেকই পরে।

ঠাকুরবাবু তো আমাকে তৎকালীন পাটনার সবচেয়ে বড়ো হোটেলে নিয়ে গিয়ে ওঠালেন। ভয়ে তখন গায়ে জ্বর এসে গেছে। ব্রেকফাস্ট-ট্রেকফাস্ট খেলাম না, চানও করলাম না, ফাইলটা, পেপারবুকটা একটু দেখে নিয়ে স্যুট পরে তৈরি হয়ে নিলাম। উনষাট সালে পাটনাতে ট্যাক্সি-ফ্যাক্সিও ছিল না বিশেষ। একটা সাইকেল রিকশাতে চেপে ক্যাঁচর ক্যাঁচর করতে করতে চাণক্যপুরীর দিকে এগোতে লাগলাম। পাটনা ট্রাইব্যুনালে তখন মাত্র একটিই বেঞ্চ ছিল। চাণক্যপুরীর নিরিবিলি এলাকাতে একটি ছোট্ট একতলা বাড়ির একতলা ভাড়া নিয়ে সে অফিস করেছিলেন। আর আগে পাটনার জন্যে, মানে বিহারের জন্যে কোনো আলাদা বেঞ্চ ছিল না। গৌহাটির বেঞ্চও তো সম্ভবত বছর তিরিশ হল হয়েছে। ভুবনেশ্বরের বেঞ্চও সম্ভবত পাটনার সমসাময়িক। তখন কলকাতাই ছিল পূর্ব ভারতের প্রাণকেন্দ্র। সাহিত্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, রাজনীতি এমনকী শিল্প-বাণিজ্যেরও। আজকে ভালো ছেলে-মেয়েরা এবং যারা সচ্ছল তারা স্কুলের পাট শেষ করেই বাইরে, ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে পড়তে চলে যাচ্ছে, চিকিৎসা করাতে যাচ্ছে মুম্বই, বাঙ্গালোর, চেন্নাই, ভেলোর এবং হায়দরাবাদেও। ব্যবসা ও বড়ো শিল্প প্রায় সবই চলে যাচ্ছে একে একে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে। ভাবলেও লজ্জা লাগে। পশ্চিমবঙ্গ এখন সারা ভারতের একটি বাজার মাত্র। অন্য রাজ্যে উৎপাদিত সব জিনিস বিক্রির জন্যে এত বড়ো বাজার আর হয় না।

পাটনা ট্রাইব্যুনালে তখন দুজন মেম্বার, শ্রীনিভাসন সাহেব অ্যাকাউন্ট্যান্ট মেম্বার এবং মাথায় পাগড়ি পরা কপালে চন্দনের তিলক লাগানো শ্রীরামালু সাহেব জুডিসিয়াল মেম্বার।

দিলীপকাকুই একমাত্র ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। একজন পেশকার, তিনজন স্টেনোগ্রাফার তিনজনের জন্যে, আর পিয়োন-টিয়োন জনাকয়েক স্টাফ নিয়ে ট্রাইব্যুনালের অফিস। বাবার চিঠিটি নিয়ে তো দিলীপকাকুর ঘরে গেলাম, আগে স্লিপ পাঠিয়ে।

দিলীপকাকু চিঠিটি পড়লেন। বাবা লিখেছিলেন :

My dear Dilip,

LALA is going to appear before the I.T.A.T. He has never appeared even before an Income Tax Officer. Please guide him, if you can.—Sachinda.

দিলীপকাকু একটু বক্র হাসি হেসে চিঠিটা পড়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী করে বেঞ্চকে অ্যাড্রেস করতে হয় জানো তো?

বললাম, ইয়োর অনার।

ব্যস। তবে আর কী! তবে তো সবই জানো। যখনই আটকে যাবে একটি করে ইয়োর অনার বলবে।

এখন ইনকামট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালও ওপেন কোর্টে হয়। ওপেন কোর্টে অসুবিধে এই যে আমার মতো তালেবর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য সকলের সামনে ধরা পড়ে যায়। এক কথাতে বললে বলতে হয়, হাটে হাঁড়ি ভাঙে! তখন হত না।

ওয়েটিং রুমে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছি। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে। গ্লাসের পর গ্লাস জল খাচ্ছি। অথচ গরম তখনও পড়েইনি। আমার অবস্থা দেখে ঠাকুরবাবুরও অবস্থা কাহিল। পনেরোটি গ্রাউন্ডস অফ অ্যাপিল। তখনকার দিনে দুলাখ টাকার ব্যাপার। উনষাট সালে টাকার মূল্য ছিল আজকের থেকে বহু বহুগুণ বেশি। ঠাকুরবাবু ভাবছিলেন তাঁর অপরিণামদর্শী ভাইপো-ভাগনের জন্যে তাঁর এমন চাকরিটিই না চলে যায়। ভারত বিল্ডার্সের অংশীদারদের মধ্যে একজন ছিলেন গোয়ানিজ এবং অন্যরা খুবই কৃতী ইঞ্জিনিয়ার। আজকের দিনের মতো শেঠ-মুনশিরাও তখন কনট্রাক্টর হতেন না এবং কনট্রাক্টরি মানেই মন্ত্রী এবং আমলাদের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা ছিল না। রাস্তা বা বাঁধ বানালে তাঁরা তাই বানাতেন। তিন মাসে রাস্তা ভেঙে যেত না, বাঁধ প্রতিবছর ধুয়ে যেত না জলের তোড় বাড়লেই।

বসে আছি তো বসেই আছি। মক্কেল এবং উকিল দুজনেই নীরব। বাইরে সোনাঝুরি গাছে একটা অলুক্ষণে দাঁড়কাক ডাকছে কা-কা-কা-কা-কা।

মনে মনে বলছি থাম তুই! বড়োই করুণ অবস্থা। জীবনে প্রথমদিকে কী পরীক্ষা, কী ট্রাইব্যুনালের অ্যাপিল সবেতেই ভীষণ নার্ভাস হয়ে যেতাম। আস্তে আস্তে জেনেছিলাম প্রস্তুতিই হচ্ছে সাফল্যের মূলমন্ত্র। সাফল্য আকাশ থেকে পড়ে না। এই দুই মদ্রদেশীয় মেম্বার আনপড় আমাকে যে কী হেনস্তা করবেন সেই আতঙ্কে কাঁটা হয়ে বসে আছি। এমন সময়ে গরম কাপড়ের ওপরে পেতলের ঝকঝকে চাপরাশ চড়ানো খাকি উর্দিপরা পিয়োন এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিল : ভারত বিল্ডার্স...।

দিলীপকাকুর বক্রহাসি ও আপ্তবাক্য শুনে তো আরোই ঘাবড়ে গেলাম। ভারত বিল্ডার্সের অ্যাপিল পাঁচ নম্বরে। ঘণ্টা বাজিয়ে হাড়ুম-দুড়ুম করে দরজাতে হাত দিয়ে শব্দ করে পিয়োনেরা মেম্বারদের চেম্বারে আগমনের সংকেত দিল। তখনকার দিনে ট্রাইব্যুনালের শুনানি হত 'ইন ক্যামেরা'। মানে যখন সওয়াল-জবাব হত, মেম্বারেরা, ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আর মক্কেল এবং তাঁর অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং উকিলেরা ছাড়া আর কেউই ঘরের মধ্যে থাকতেন না কারণ আয়কর একটি গোপন বিষয় বলে গণ্য হত। হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্টে চিরদিনই ওপেন কোর্টে সওয়াল-জবাব হত।

সেই প্রথমবার ইনকামট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের কোর্টরুমে ঢোকা। মস্ত উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর বাঁধ দিয়ে, প্যানেলিং করা উঁচু মস্ত টেবল। তার দুদিকে আরও উঁচু দুটি চেয়ার। সেই চেয়ারের মাথার কাছে খোদাই করা দাঁড়িপাল্লা আর পেছনের দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধির একটি ফোটো। বাঁদিকে সাদা পাগড়ি মাথায় কপালে লাল চন্দন মাখা এক দক্ষিণ ভারতীয় গম্ভীর বদন প্রৌঢ়। ডানদিকেও আরেকজন দক্ষিণ ভারতীয় তীক্ষ্ণনাসা-প্রৌঢ়। তবে তাঁর মাথায় পাগড়ি নেই।

পরে জেনেছিলাম যে, যিনি সিনিয়র মেম্বার তিনি সবসময়ে বাঁদিকে বসেন আর জুনিয়র মেম্বার যিনি, তিনি ডানদিকে। কোর্টরুমে ঢোকা-বেরুনোর বেলাতেও আগে সিনিয়র মেম্বার ঢোকেন এবং বেরোন সবসময়েই।

জুডিশিয়াল সার্ভিস থেকে অথবা দশ বছর সেশানস কোর্টে জজিয়তি করার পরই ট্রাইব্যুনালের জুডিশিয়াল মেম্বারের পদের জন্যে দরখাস্ত করা যায়। দশ বছরের বেশি প্র্যাকটিস হয়েছে এমন উকিলেরাও দরখাস্ত করতে পারেন। আর দশ বছরের বেশি প্র্যাকটিস যাঁর, এমন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অথবা দশ বছর চাকরি হয়েছে এমন আয়কর কমিশনারেরাও দরখাস্ত করতে পারেন এই পদের জন্যে। প্রতি বছর দিল্লি থেকে ল-সেক্রেটারি, সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি, যাঁর আয়কর সংক্রান্ত বিষয়সমূহে প্রভূত জ্ঞান আছে এবং ইনকামট্যাক্স বেঞ্চে বসেন এবং ইনকামট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট, দিল্লি, বম্বে, কলকাতা, ম্যাড্রাস এই চার শহরে ঘুরে দরখাস্তকারীদের ইন্টারভ্যু নিয়ে যতগুলি পদ পূরণের দরকার ততগুলি পদ পূরণ করতেন। শিডিউল্ড কাস্ট এবং শিডিউল্ড ট্রাইবের কোটাতে প্রার্থীদের অবশ্যই নিতে হত এবং এখনও হয় তা তাঁরা যদি ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের চেয়ে অনেকই কম নাম্বার পান তবুও।

সমস্ত সরকারি ও আধা-সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম চালু হয়েছে স্বাধীনতার পরে থেকেই এবং যোগ্যতার বিচারই একমাত্র বিচার না-হওয়াতে বিচারক, প্রশাসক, ডাক্তার ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক সময়ে গুণগত মান বিসর্জিত হয়। শুধু চাকরিতে ঢোকার ক্ষেত্রেই নয়, প্রোমোশনের ক্ষেত্রেও এই প্রথা চালু আছে। এখনও আছে। দেশ এতবছর স্বাধীন হবার পরও। এই প্রথাতে দেশের এবং দশের ভালো হয়েছে কী হয়নি এ নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে এবং অর্ধশতাব্দী পরেও এই প্রথা চলতে দেওয়া উচিত কি না তা নিয়েও তর্কের বিশেষ অবকাশ আছে। তবে গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতই মান্য। তাতে দেশের ভালোই হোক কী মন্দ।

অন্য প্রসঙ্গে চলে এলাম।

পাটনা বেঞ্চের জুডিশিয়াল মেম্বারের নাম ছিল শ্রীরামালু সাহেব আর অ্যাকাউন্ট্যান্ট মেম্বারের নাম ছিল শ্রীনিভাসন সাহেব। এই শ্রীনিভাসন সাহেব নতুন মেম্বার হয়েছিলেন। কারণ, উনি তার পরেও বহুবছর মেম্বার ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে কলকাতা বেঞ্চে সত্তরের দশকেও তাঁর বেঞ্চে সওয়াল করেছি।

অনেকগুলি গ্রাউন্ডস অফ অ্যাপিল! যদিও অ্যাপেলেন্ট, মানে, আমার মক্কেলের নাম 'ভারত বিল্ডার্স', সম্ভবত কনস্ট্রাকশান ছাড়াও তাঁদের আরো ব্যবসা ছিল। চল্লিশ বছর আগের কথা। সঠিক মনে নেই। তাঁদের অফিস ছিল জামশেদপুরের বিষ্টুপুরে, 'ডা কোস্টা' ম্যানশানে।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজে অনেক কথাই পড়েছিলাম। যেমন ইংরেজদের সংবিধান লিখিত নয়, অলিখিত। এইরকম নানা নবলব্ধ বিদ্যা হাত-পা ছুড়ে জাহির করতে থাকলাম। ভয়ে গলা শুকিয়ে এলেই একবার করে 'ইয়োর-অনার' বলতে লাগলাম দিলীপকাকুর কথামতো। তার আগে কোর্ট বলতে বাংলা সিনেমাতে কোর্ট দেখেছি এবং শ্রদ্ধেয় ছবি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধেয় পাহাড়ী সান্যালের মতো বড়ো মাপের অভিনেতাদের জজিয়তি অথবা ওকালতি করতে দেখেছি। 'ধর্মাবতার' বলে সম্বোধন করতে শুনেছি। সেই বিদ্যাই অনন্যোপায় হয়ে চালিয়ে দিলাম। করিই বা কী? ঠাকুরবাবুর আত্মীয় আমার অপরিচিত সহপাঠী যে আমাকে মস্ত বড়ো উকিল ঠাউরেছে।

সবগুলো গ্রাউন্ডস কভার করতে, পেপার বুকের কাগজপত্র ব্যাখ্যা করতে প্রায় আধঘণ্টা মতো লাগল।

আমার বলা শেষ হলে দিলীপকাকু দাঁড়িয়ে উঠে অল্প কথাতে সারলেন। বেশি বললে আমার অবশ্যই বিপদ হতে পারত যে, সে বিষয় কোনোই সন্দেহ নেই।

দিলীপকাকুর জবাব দেওয়া হলে শ্রীনিভাসন সাহেব পেপার বুকের মধ্যে যে ব্যালান্স-শিট ছিল সেটির উল্লেখ করে বললেন এই অডিট ফার্ম যাঁর নামে তাঁর সঙ্গে কি তোমার কোনো সম্পর্ক আছে?

আমি জবাব দেবার আগেই দিলীপকাকু বললেন, বি ডি এস এন গুহর বড়ো ছেলে।

শ্রীনিভাসন সাহেব বললেন, আই সি!

আগে বলেছি কিনা মনে নেই, আমার নাম বুদ্ধদেব; কিন্তু আমার অসীম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বাবা তাকে কেটে দু টুকরো করে বুদ্ধ + দেব করে বি ডি করে দিয়েছিলেন। কেননা আমার ছোটো ভাইয়ের নাম বিশ্বজিৎ। অর্থাৎ সেও বি গুহ। সুদূর ভবিষ্যতে সে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়ে অ্যাকাউন্টেন্সিই পড়ে (তখন সে স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়ত) এবং যদি বাবার ফার্মেই অংশীদার হয় তবে দুই বি নিয়ে ঝামেলা হতে পারে—অতএব দাও বুদ্ধদেবকে বি ডি করে।

'দশটা গাধা মরে একটা বড়োছেলে জন্মায়' এমন কথা কী লোকে সাধে বলে!

কিন্তু বাবার পাঁঠা বাবা লেজে কাটবেন না মাথায় তা তাঁরই ব্যাপার। অতএব সেদিন থেকেই পেশার জগতে আমি বি ডি গুহ নামেই পরিচিত।

কেসের সওয়াল-জবাব তো হয়ে গেল কিন্তু কি যে হল? আদৌ কিছু হল কিনা, তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কোর্টরুম থেকে বেরিয়েই ঠাকুরবাবু আমার চেয়ে বেঁটে হওয়া সত্ত্বেও আমাকে জড়িয়ে ধরে কোলে তোলার চেষ্টা করলেন।

আমি হতবাক হয়ে বললাম, হলটা কী? উনি বললেন, আমরা সব পয়েন্টেই পুরো জিতে গেছি। কামাল করেছেন আপনি বুদ্ধদেববাবু।

বাবু-টাবু বলবেন না।

আমি বললাম, লজ্জা পেয়ে।

তারপরে উনি বললেন, ট্রেন থেকে নেমে শুধু তো এক কাপ চা খেয়ে এসেছেন। খিদে পায়নি?

আমি হেসে বললাম, পায় আবার নি! ভীষণ খিদে পেয়েছে। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে ছিল কাল রাত থেকে, জ্বরও তো এসে গেছিল সকালে, খাব কী!

উনি হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, চলুন! পাটনার সবচেয়ে ভালো রেস্তোরাঁতে খাব আমরা। তারপর একটা সিনেমা দেখব। তারপর স্টেশনে গিয়ে ইয়ার্ডে হাওড়ার এ সি কোচে উঠে বসে থাকব। অমৃতসর মেল এলে কোচ জুড়ে দেবে। ইচ্ছে করলে সন্ধের সময়েই ঘুম লাগাতে পারেন।

তখনকার দিনের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টগুলোও ছিল বিরাট বিরাট। আর ফার্স্ট ক্লাস এ. সি. কোচের তো কথাই নেই। এখনকার ফোর-বার্থড কোচের চারগুণ বড়ো হত প্রায়।

ঠাকুরবাবুদের অ্যাপিল করার পরে পাটনাতে ট্রাইব্যুনাল করতে গেছি অগণ্য বার, কিন্তু সেই প্রথমবারের কথা কখনও ভুলবার নয়। ঠাকুরবাবুকেও কখনও ভুলব না। কারণ সি এ পরীক্ষাতে ফেল করা ছেলে বি কম হিসেবে ট্রাইব্যুনালের সামনে শুধু অ্যাপিয়ার করেই নয়, দারুণ জিতে আমার জীবনের গতিপথই পালটে গেছিল। সবরকম হীনম্মন্যতা চলে গেছিল। মরা নদীতে বান এসেছিল। বাইশ বছর বয়সি একটি ছেলের পক্ষে আইনের জগতে ঢুকে পড়া এবং শুধু ঢুকে পড়াই নয়, উইথ এ ব্যাং ঢুকে পড়া নিশ্চয়ই পেশার জীবনারম্ভের পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপনাময় ছিল।

নিতান্ত বাধ্য হয়েই নিজের গুণগান করতে হচ্ছে বলে আমি আন্তরিক লজ্জিত। পাঠক! নিজগুণে মার্জনা করবেন।

কলকাতাতে ফেরার পরে ঠাকুরবাবুর কাছে আমার 'কেদ্দানির' কথা শুনে বাবা আমাকে আমেরিকান আর্মি ডিসপোজালের একটি জিপ কিনে দিলেন। দাম মাত্র চার হাজার আটশো টাকা। টাকার দাম অবশ্য ছিল তখন।

বহুদিনের অবদমিত শখ মিটল। নিজের জিপ 'টিকিয়া-উড়ান' চালিয়ে হাজারিবাগ-পালামৌ-কোডারমা সব চষে ফেলব এমনই ভাবলাম। কিন্তু ঈশ্বরের মতো বড়ো অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর দেখলাম না এ জীবনে। এখানে ডেবিট করলে অন্যখানে ক্রেডিট অবশ্যই করবেন তিনি। একটা কিছু দিলে, অন্য কিছু ফিরিয়ে নেবেন। নিজের জিপ যখন হল তখন আর আগের ইচ্ছেমতো জঙ্গলে যাওয়ার অবকাশ ছিল না। জীবনের এই ট্রাজেডি। শুধু আমারই নয়। সকলেরই জীবনেরই।

তারপর থেকেই ট্রাইব্যুনালের সব অ্যাপিল খুব বড়ো ম্যাটার না হলে, বাবা আমাকে দিয়েই করাতেন। 'বি ডি গুহ বি কম' এই নামে ওকালতনামা দিয়ে একশো টাকা ফিসও দিতেন। তখন আমার

মাইনে সম্ভবত দেড়শো। মাসে আট-দশটা ট্রাইব্যুনাল করে তখন আমার পকেট গরম। তাছাড়া বড়ো কেসেও বড়োদের সঙ্গে থেকে তাঁদের কাছ থেকে যা শেখার ছিল তা শেখার চেষ্টা করতাম। শেখার ছিল অনেক কিন্তু শিখতে পেরেছি সামান্যই।

ড. রাধাবিনোদ পাল আসতেন বড়ো কেসে। তখন তিনি কানে কম শোনেন। ফিশফিশ করে কথা বলেন। কিন্তু তবুও রাধাবিনোদ পাল তো রাধাবিনোদ পালই! পরবর্তী জীবনে তাঁর পুত্র প্রণব পালের সঙ্গেও কাজ করেছি। প্রণবদা খুবই স্নেহ করেন আমাকে। ড. দেবী পাল, আমার তৎকালীন অধ্যাপক, ড. রাধাবিনোদ পালের ছোটো জামাইয়ের সঙ্গেও কাজ করেছি। দেবীদার সঙ্গে প্রায়ই মুম্বই-দিল্লির উড়ানে দেখা হয় এখনও।

ড. রাধাবিনোদ পালের বড়োজামাই ছিলেন ড. বলাই পাল। তিনি ছিলেন আয়কর-বিভাগের উকিল। হাইকোর্টেই সওয়াল করতেন বেশি। তবে হেভি-ম্যাটার থাকলে ট্রাইব্যুনালেও আসতেন। হাইকোর্টের ইনকামট্যাক্স বেঞ্চে একসময়ে 'পাল-ডাইন্যাস্টি' ছিল বলতে গেলে।

ইনকামট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালে অশোক সেন, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পি. পি. জিনওয়ালা সাহেব, বম্বে থেকে পালকিওয়ালা সাহেবও নিয়মিত আসতেন। তাঁদের কাছ থেকে দেখার ও অনেক সময়ে সওয়াল শোনারও সৌভাগ্য হয়েছে। ভারত-বিখ্যাত ব্যারিস্টার শচীন চৌধুরী ছিলেন পি পি জিনওয়ালার জুনিয়র। আর জুনিয়র জিনওয়ালা ছিলেন শচীন চৌধুরীর জুনিয়র। শচীন চৌধুরীর পুত্র ব্যারিস্টার অরিজিৎ চৌধুরী ছিলেন আবার জুনিয়র জিনওয়ালার জুনিয়র।

কল্যাণ রায়, অরর ডিগন্যাম-এর পি টি সানিয়াল, সুকুমার ভট্টাচার্যরা তো নিয়মিত আসতেন। বাবার সুবাদে তাঁরা সকলেই আমার 'কাকু'।

পাটনাতে বাইশ বছরের ছোকরা ট্রাইব্যুনাল জিতে এসে, অ্যাকাউন্টস গ্রুপে আবারও ফেল করলাম। যেদিন ফল বেরুল সেদিনই আমরা, মানে আমি আর বাবা ওড়িশাতে শিকারে যাচ্ছি। সঙ্গে কিরণ জেঠু (ডক্টর বোস, জ্যোতিবাবুর বড়ো ভাই), শিলিগুড়ির দুর্গা রায়, আর আর ম্যাকেঞ্জি, Wee MAC । তবে ওঁরা আলাদা এসেছিলেন হাওড়া স্টেশনে পুরী এক্সপ্রেস ধরতে। প্রশান্তকাকু (বিশ্বাস) সঙ্গে চলেছেন আমাদের লোকাল গার্জেন হয়ে।

আমি আর বাবা রাতে যখন হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছি, শীতের উত্তরে হাওয়া ছুটে আসছে জোরে ময়দান থেকে। লজ্জাতে বেদনাতে আমি কুঁকড়ে আছি। মনে আছে, অন্ধকার ময়দানের দিকে চেয়ে ড্রাইভারের পাশে সামনের সিটে বসে (বাবা সবসময়ে সামনের সিটেই বসতেন) বললেন, Failures are the pillars of success. তোর তো সব হয়েই গেছে। তুই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিয়মিত ট্রাইব্যুনালে যাচ্ছিস এবং সব কেসই তো জিতছিস। এখন শুধু স্ট্যাম্পটার দরকার। কত গোরু-গাধা পাশ করছে প্রতিবার, তোর মতো ইন্টেলিজেন্ট ছেলে পাশ করতে কেন যে পারছিস না তা আমার মাথাতেই আসে না। যাই হোক এবারেও হল না তো কী হয়েছে! পরের বারে নিশ্চয়ই হবে।

লজ্জাতে এবং বাবার প্রতি শ্রদ্ধাতে আমি অধোবদন হয়ে রইলাম।

মনে আছে, সেবারেই আমি পুরুনাকোটে একটি রোগ বাইসন (গাউর) এবং একটি মস্ত শম্বর শিকার করে খুব নাম কিনেছিলাম। সেই আমার প্রথমবার ওই অঞ্চলে যাওয়া। সেই বাইসনটি নিয়ে অনেক কাণ্ড হয়েছিল। সেসব 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারেতে' লিখেছি। বাইসন দেখবার জন্যে এবং মাংস নেবার জন্যে (শিকার) পাহাড় জঙ্গল নদী পেরিয়ে যখন দশ গাঁয়ের মানুষ এসে জমায়েত হয়েছে, বাবা বললেন, সি এ পরীক্ষাটাই জীবনের একমাত্র পরীক্ষা নয়। অন্য অনেক পরীক্ষার মধ্যে একটা পরীক্ষা। এই বাইসনটি তিনজন মানুষ মেরেছিল। তুই ট্রাইব্যুনালে রোজ জিতছিস, রোগ বাইসন মারলি আর ছাতার সি এ পরীক্ষাটা পাশ করতে পারবি না পরের বারে?

আমি মস্ত সেগুন গাছটার তলায় বসে থাকলাম চুপ করে। আমার দু'চোখ জলে ভরে এল। ভাবছিলাম, এমন বাবা ক'জনের হয়!

জীবনের কোনো পরীক্ষা পাশ করাই কিছু আহামরি কর্ম নয়, যদি মনঃসংযোগ করে পড়াশুনো করা যায়। কিন্তু তা হবে কী করে! আমার মন তখন পড়ে থাকত হয় বনে-জঙ্গলে, নয় দক্ষিণীতে এবং একজন গায়িকার মনে।

তাছাড়াও আরো অনেক বিপদ-আপদ ছিল। কিন্তু যেহেতু আমি বার্ট্রান্ড রাসেল অথবা তসলিমা নাসরিন নই, আমার পক্ষে আমার আত্মজীবনীতে সব সত্যিকথা অকপটে লেখা সহজ নয়। তা যদি কোনোদিনও লেখার সময় বা ইচ্ছা হয় তা হয়তো ব্যাঙ্কের লকারেই রেখে দিতে হবে, যাতে আমার মৃত্যুর অন্তত পঞ্চাশ বছর পরে তা প্রকাশিত হয়।

সবও একশো ভাগ সত্য কথনে আমার নিজের কারণে কোনো দ্বিধা ছিল না এবং আজও নেই। দ্বিধাটা আমার আত্মীয়-পরিজন, আমার কাছের মানুষদের জন্যে। যে সাহস অন্যকে সহজে আঘাত করতে পারে, সেই সাহস, আমার মতে, না দেখানোই ভারতীয় সংস্কৃতির শিক্ষা। আমার মত ভ্রান্ত হতেও পারে।

আজ পর্যন্ত আমার জীবনের যা কিছুই ঘটেছে, সেই সময়ে এবং এই পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবনের সব ক্ষেত্রেই, তার সবকিছুই লিখে ফেলতে পারলে সে বই হয়তো এই শতাব্দীর জনপ্রিয়তম বই হত, কিন্তু নিজেকে বা নিজের লেখাকে জনপ্রিয় করতে গিয়ে অগণ্য আত্মীয় অনাত্মীয় নারী-পুরুষকে এবং তাঁদের আত্মীয়-পরিজনকে অস্বস্তিতে এবং মনঃকষ্টে ফেলাটা পুরুষোচিত কাজ হত না।

পরজন্ম যদি আদৌ থাকে এবং তখন যদি পশ্চিমের কোনো 'আধুনিক' দেশে জন্মাই, তখন হয়তো ক্যান্ডিড অটোবায়োগ্রাফি লেখা সম্ভব হবে।

সব সত্যি যে কখনোই বলা যায় না! আজ অবধি কেউই বলতে পেরেছেন কিনা তা আমাব জানা নেই। এতে যদি পাঠক আমাকে কাপুরুষ ভাবেন তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনে আমার বলার কিছুই নেই। অথচ সব সত্যিই বলা গেলে একজন লেখককে তার পাপপুণ্য, সুখ-অসুখ, দোষ-গুণ, লোভ-রিরংসা, জিগীষা-জিজ্ঞাসা, সাফল্য-ব্যর্থতা এবং আরো অনেক কিছুরই সঙ্গে একজন খাঁটি কিন্তু এবড়োখেবড়ো মানুষকে আপনারা জানতে পারতেন। জীবন মসৃণ না হলে জীবনী কী করে মসৃণ হবে! গাধা অথবা জিরাফের হলেও হতে পারে। কোনো মানুষের জীবনই মসৃণ নয়, আমরা বাইরে থেকে যাই ভাবি না কেন!

ঋভুতে, আমার এই আত্মজীবনীতে যাই-ই বলি বা লিখি না কেন, তা হবে শুধু আমার প্রকৃত জীবনের এক অষ্টমাংশ। আমি হিমবাহরই মতো। হয়তো তথাকথিত 'শিক্ষিত', 'মার্জিত', 'নামী' মানুষদের অধিকাংশ আমারই মতো, হিমবাহই। তবে আনন্দর কথা এইটুকুই যে, বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে লোকচক্ষুর সামনে হার মানা বা ব্যর্থ হওয়ার কথা অকপটে বলবার মতো সততাটুকু আমার আছে। যা হয়তো অনেকেরই নেই। যে মানুষ যত বেশি শিক্ষিত, বিশেষ করে, যার শিক্ষাটুকু Education of letters হয়েই রয়েছে, Education of character হয়ে ওঠেনি তিনি তত বেশি ভণ্ড। জীবনেব প্রায় শেষে পৌঁছে এই সত্যকে উপলব্ধি করেছি অত্যন্তই দুঃখের সঙ্গে।

সেই যে একটি মেয়ের চেহারা, চলন-বলন, ব্রীড়ানম্রতা, তার পোশাক-আশাক, হৃদয় বিদ্ধ-করা কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম, মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম, সেই মেয়েটি বড়ো বেদনারই মতো বাজত অনুক্ষণ আমার তখনকার জীবনে। রক্ষণশীল পরিবার আমাদের। আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে তখনও একজনও 'লাভ ম্যারেজ' করেনি। তা রীতিমতো অপরাধ বলেই গণ্য ছিল। তাছাড়া আমি তখনও স্বাবলম্বী নই। শুধু তাই নয়, আমি আমার বাবার অফিসে চাকরি করি। যে-সব মানুষ নিজেদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানেই জীবন শুরু করেন, তাঁরাই জানেন তাঁদের অসহায়তার কথা। তাঁদের সুখটা যে কতবড়ো দুঃখও তা কেবল তাঁদেরই জানার। অন্যের পক্ষে এই সুখ-দুঃখের স্বরূপ বোঝাও সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে এল যে আত্মজীবনী লেখার সময়েও যেমন, জীবনের পথে চলার সময়েও তেমনই 'True to oneself' হওয়া ভারী অসুবিধের। প্রমথ চৌধুরী মশায় বিয়ের আগে ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'পৃথিবীতে True to oneself হবার বিপদ হচ্ছে,

লোকে আমাকে ভুল বোঝে—বহুরূপী মনে করে। একটি মাত্র pose অবলম্বন করে সেইটেই আর পাঁচজনের চোখের সামনে দিনরাত ধরে রাখতে পারলেই সে মানুষের চরিত্রটা সহজ সরল ঠেকে। অন্তত আমার মতো লোকের পক্ষে তাই। আমাদের "সরল" নাম করতে গেলে অসরল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আজকাল দিন পড়েছে এমনি যে, আমাদের লোকে অযথারূপে মন্দলোক বললেও সহ্য হয় কিন্তু হিপোক্রিট বললে কিছুতেই সহ্য হয় না।"

সেই বাপসোহাগি মেয়ের দেশভাগের কারণে অগণ্য আত্মীয়ের বোঝা-বওয়া একদা অশেষ-সচ্ছল, উদার, সংগীতরসিক এবং অমিতব্যয়ী বাবা হঠাৎই মারা গেলেন। তাতে তারা খুবই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ল। এমনই সাংঘাতিক বিপর্যয় যে, তাকে আর্থিক কারণে কলেজ পর্যন্ত ছাড়তে হল। তাদের উপার্জনশীল কাকাও যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। লোকমুখে শুনতাম, তাদের খুব কষ্ট চলছে। তবে বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় ছিল না। সব সময়েই পরিবারের সকলের মুখই হাসিখুশি। কেবল সেই গায়িকার নিজের ছাড়া। আমার সঙ্গে দেখা হলেই সে মুখ বেগুনপ্যাঁচা হয়ে যেত। মনে হত যেমন এখুনি চিরতার জল খেয়েছে।

একদিন খবর এল যে, আমারই পরিচিত এক অশিক্ষিত বড়োলোক ব্যবসায়ী ছেলের বাড়িতে তার কাকা তাকে গান গাইতে নিয়ে এসেছিলেন বিয়ের সম্বন্ধ করার জন্যে। সেই বাড়িও আমার পৈত্রিক নিবাস রাজা বসন্ত রায় রোডের 'কনীনিকা' থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়। খবরটা শুনে, আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করল। অথচ কীইবা আমি করতে পারি? তখনও যে নিজের পায়ে দাঁড়াইনি।

মা, কানাঘুষোয় এবং অনেক পরম 'হিতার্থী'র মুখে শুনেছিলেন সেই তরুণী এবং সুন্দর ফিগারের গায়িকার কথা। মায়ের পছন্দ নয় একটুও। অথচ মা তখনও তাকে দেখেনইনি। আমিও তো নিজেও তাকে দেখেছি—দূর থেকে। কাছ থেকে কখনো কখনো দেখলেও কোনো কথাই হয়নি, এমনকী চোখে-চোখেও নয়। চোখে চোখ পড়লেই সে চোখ সরিয়ে নিত। একে কি আজকালকার ছেলেমেয়েরা প্রেম আদৌ বলবে? এ হয়তো প্রেম ছিলও না, ছিল মোহ। কিন্তু সেই মোহের আনন্দ ও কষ্টও যে কী তীব্র তা যাঁরা আমারই মতো কখনো মোহাবিষ্ট হয়েছেন তাঁরাই জানবেন।

কী করি? কী করি? ভেবেই দিন কাটতে লাগল।

সেই সময়েই আমার প্রথম বই, কবিতার বই, 'যখন বৃষ্টি নামল' বেরুল রাইটার্স ফোরামের ব্যানারে। ইকনমিস্ট জ্যোতি দাশগুপ্ত, এখন আমেরিকাতে, আর্টিস্ট শ্যামল দত্তরায় ইত্যাদিরা এবং সম্ভবত আমাদের সেইন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক প্রফেসর পুরুষোত্তম লালও (যিনি আমাদের ক্লাসে, লেসলি এবারকমবির একটি কবিতা পড়িয়ে তাঁর অধ্যাপকজীবন শুরু করেছিলেন) ওই ফোরামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্যামলদা, আমার মামাতো দাদা আশিসকুমার বসুর (বড়োমামা সুর্নিমলের বড়ো ছেলে) সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। শ্যামলদাই প্রচ্ছদ এঁকে দিলেন। ভিতরের অলংকরণ আমিই করেছিলাম, দু'রঙে ছাপা বই। একটি কবিতাতে লিখেছিলাম,

"ঝড় উঠলেই দৌড়ে যেতাম মাগো
তোমার বুকে, যখন পেতাম ভয়
"খোকন" তোমার নিখাদ সোনায় মোড়া
বোবা মেয়ের একটু সোনা নয়।
যাচাই করার যন্ত্রণা নেই আর
বাতিল করাই তোমার সহজ জয়
আজকে "খোকন" ঝড়ের বুকে একা,
ভুল করেনি, জানো কি নিশ্চয়?"

তখন আমার কলেজের সহপাঠী কিন্তু আর্টসের ছাত্র দীপক চক্রবর্তী, যার কথা ঋভুর দ্বিতীয়-তৃতীয় পর্বে অনেকবারই বলেছি, আমার সাহিত্যমনস্কতার পেছনে যার অনেকই অবদান ছিল, সে

যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে পড়ছে। ওদের সিলেবাস থেকে দেখে দেখে ওর সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার জন্যে বই কিনি। বইয়ে দাগ দিয়ে পড়া আমার শিশুকালের অভ্যেস তাই যে বই পড়তে চাই তা না কিনলে চলত না।

দীপকতার অধ্যাপকদের গল্প করত চারমিনার সিগারেটে টান দিতে দিতে। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নরেশ গুহ, বড়ো বড়ো সব ব্যক্তিত্বর সমাহার তখন যাদবপুরে। তাঁদের চালচলন, কথোপকথন, তাঁদের 'বিয়র' পান, সুধীন্দ্রনাথের দরাজ হাসি, রাজসিক চেহারা ইত্যাদির গল্প শুনতাম। তাঁর বাড়িতে গেলে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মধ্যবিত্ত, গরিব এবং ভেবল ছাত্রদের মহার্ঘ ফরাসি মদ (wine হেঁজিপেজি রাম হুইস্কি, জিন, ভডকা নয়) এবং কিউবার হাভানা সিগার খাইয়ে কীরকম তাক লাগিয়ে দিতেন তার গল্পও আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে বলত দীপক। সম্ভবত ওই সময়েই বাঘা-বাঘা অধ্যাপকদেরই মতো বঙ্গভূমের বাঘা-বাঘিনি সব আঁতেলারও যাদবপুরের নতুন শুরু হওয়া তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দীপক মজুমদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, নবনীতা দেব, দিব্যেন্দু পালিত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদিরাও ছিলেন। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র দীপক মজুমদার, নবনীতা এবং মানবেন্দ্রকেই বহিরঙ্গে আঁতেল বলে মনে হত না।

ওই সময়েই, যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন কলেজে আইন পড়ছি, একদিন কফিহাউসে গিয়ে দেখি একজন আঁতেল গলা ছেড়ে রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন নিজস্ব সুরে। গ্রীষ্মের দুপুর। স্কাইলাইট দিয়ে রোদ এসে পড়েছে টেবলের ওপরে। গায়ক খুব চেঁচিয়ে গাইছেন "সখী আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।"

পরে জেনেছিলাম, গায়কের নাম দীপক মজুমদার, তিনি নাকি সম্পর্কে দেশ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষের বোনপো এবং ভালো কবিও।

দীপক মজুমদারের কাছ থেকে ওদের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের গল্প শুনে আমার বড় হীনমন্য লাগত নিজেকে। জীবনে যা কিছুই করতে চেয়েছিলাম তার কিছুই করা হল না। না হওয়া হল এয়ার ফোর্সের পাইলট, না পড়া হল তুলনামূলক সাহিত্য, না হওয়া হল শান্তিনিকেতনের বাংলার অধ্যাপক। কিছুই হল না।

দীপক প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তি দুটি আবৃত্তি করত, "জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।" ওই পংক্তি দুটি আমার মরমেও গেঁথে গেছিল। জীবনের কত সংকটই যে ওই পংক্তি দুটির ভেলায় চেপে আজ অবধি পার হয়েছি অবলীলায়, তা বলার নয়। রবীন্দ্রনাথ সবসময়ে সম্পদে-বিপদে যদি পাশে না থাকতেন তবে কী যে হতো তা ভাবতে পর্যন্ত পারি না।

ব্যালান্সশিট মেলাতে ভালো লাগে না। কিছুই ভালো লাগে না। কেবলই আত্মহত্যার কথা মাথায় ঘোরে। অফিসের কাজেও মন বসে না। পাগল-পাগল, অস্থির-অস্থির লাগে।

সেই সময়েই আমাদের এক মক্কেলের অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অনিল চ্যাটার্জি মশাই তাঁদের ওখানে অডিট করতে যাওয়া আমার মুখের দিকে একদিন চেয়ে বললেন, মন বড়ই উচাটন দেখতাছি।

উনি পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিলেন। পূর্ববঙ্গীয় ভাষাতেই কথা বলতেন। খাঁটি মানুষ।

আমি উত্তরে কিছুই বললাম না।

উনি বললেন, আপনের মায়ের থিক্যা চাইয়া আপনের ঠিকুজিটা লইয়া আইবেন তো। ভালো কইর‍্যা দেইখ্যা দিমুঅনে।

মাকে বলতেই মা বের করে দিলেন। আমার মানসিক অবস্থার কারণে তখন মায়েরও আত্মহত্যা করার মতো অবস্থা। পরদিনই ওঁকে দিয়ে দিলাম ঠিকুজি।

চারমিনার সিগারেট খেতেন অনিলবাবু। সাদা লংক্লথের ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি পরতেন। তাঁর বয়স তখন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। একটি পা ছিল কাঠের। অল্পবয়েসেই নিঃসন্তান অবস্থাতে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল। খুবই রসিক মানুষ ছিলেন। তাঁর নির্মম রসবোধের আড়ালে যে একটি অত্যন্ত দরদি মনও ছিল, পরের জন্যে সহমর্মিতায় ভরপুর, তা বাইরে থেকে অনেক সময়েই বোঝা যেত না।

উনি ওটা দেখে বললেন, গিভ মি সেভেন ডেইজ। ভালো কইর্‌য়া সব দেইখ্যা-টেইখ্যা একখান একসারসাইজ বুকে লিইখ্যা আনুম। তবে ইংরাজিতে লিখুম কিন্তু। বাংলা আমার আসে না।

বললাম, ঠিক আছে।

সাত দিন পরে সত্যি সত্যিই উনি আমাদের অফিসে এসে হাজির। আমার টেবলের উলটোদিকে বসে বললেন, আরে মশয়, আপনার হাতে দেহি পান্না মাইনস।

মানে?

মানে, এক্কেরে হিরার খনি! সিএ পরীক্ষা পাশ আপনের কাছে কুনো ব্যাপারই নয়।

মানে?

মানে, আপনার বাবায় তো চড়েন অস্টিন, ওপেল আর অ্যাম্বাসাডর। আপনে 'পোঁদ-উচা' গাড়ি চড়বেন।

মানে?

আরে ওই যে ঢাউস গাড়িগুলান আছে না—হুসস কইর্‌য়া চইল্যা যায়—আসতাছে না যাইতাছে—বোঝন পর্যন্ত যায় না। কী নাম তাদের—কয়েন না?"

ও।

আমি বললাম, স্টুডিবেকার কমান্ডার?

হইব। তা আপনে আপনার বাবার থ্যিকাও বড়োলোক অইবেন। টাকার উপর দিয়া হাইট্যা যাইবেন গিয়া। ইনকামট্যাক্সো রিটার্নের সব কয়টা ঘরই ভরন লাগব আপনের।

মানে।

মানে আর কী কই? বোঝলেন না? ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি, ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস, ইনকাম ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশান, ইনকাম ফ্রম স্যালারি, আর যা যা আছে। ঠিক ষাট বচ্ছর বয়সে পৌঁছাইয়া আপনে লাইন এক্কেরে চেঞ্জ কইর্‌য়া ফ্যালাইবেন আনে।

তার মানে? কী করব? চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি ছেড়ে দেব?

আমি বললাম, অবাক হয়ে।

কী কইরবেন তা কইতে পারুম না তবে লাইন অবশ্যাই চেঞ্জ হইবে। আপনেব কাছের মানুষেরা আপনেরে সম্মান দিবেন না কিন্তু পৃথিবীর মানষে আপনেরে যা দিবেন তার ভার আপনে বইবার পারবেন না।

অবাক হলাম। বলেন কী ভদ্রলোক? সেই মুহূর্তে কী অব্যক্ত মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, তা আমি জানি, আর উনি এসব কী পাগলের প্রলাপ বকছেন!

তারপরই বললেন, তিনটা জিনিস থিক্যা সাবধান থাকন লাগব।

কেন?

এই তিনটার একটা অথবা একাধিক আপনের মৃত্যুর কারণ হইব।

কী কী?

নারী, গাড়ি আর বন্দুক। পারলে যদি পারেন তো ওই তিনের গায়েই হাতই লাগাবেন না।

বলেন কী ভদ্রলোক! পাগল নাকি? ওই তিন জিনিসের গায়ে হাত না দিয়ে বেঁচে থেকে লাভই বা কী? নারী অবশ্য তখনও জীবনে আসেনি। মনে মনে এসেছে অনেকে, শারীরিকভাবে কেউই আসেনি। গাড়ি চালাতে আমি ভীষণই ভালোবাসতাম। পাটনার ট্রাইব্যুন্যালে ভারত বিল্ডার্সের কেস জেতার পরে বাবা যে আমেরিকান আর্মি ডিসপোজালের জিপটি আমাকে চার হাজার আটশো টাকাতে কিনে দিয়েছিলেন, তাই নিয়ে তখন হাজারিবাগ-পালামৌ চষে বেড়াব এমনই জল্পনা-কল্পনা করছিলাম। শিকারের বন্ধু গোপাল, সুব্রত এবং মহম্মদ নাজিম, শামিম মিঞা, ইজাহারুল হক সকলকে খবরও পাঠিয়েছি, যে আমি আসছি এবারে পরীক্ষা দিয়েই। আরে তখনই কিনা উনি বলছেন স্টিয়ারিংয়ে হাত না দিতে। আর বন্দুক-রাইফেল-পিস্তল বিবর্জিত জীবনের কথা তো তখন ভাবতে পর্যন্ত পারতাম না।

এ কী ভবিষ্যৎবাণী করলেন অনিলবাবু?

সত্যি কথা বলতে কী, যতদিন নিজে নানা গাড়ি ও নানা ধরনের জঙ্গুলে-গাড়ি চালিয়েছি কয়েক লক্ষ মাইল হাইওয়েতে, এবং ওড়িশা এবং বিহারের দুর্গমতম জঙ্গলের কাঁচা প্রস্তরসঙ্কুল পাহাড়ি পথে, ততদিন একটি দুর্ঘটনাও ঘটেনি। কিন্তু গত চার বছরে যখন গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছি তখনও দু-তিন বার অন্যচালিত গাড়িতে বসে এমন দুর্ঘটনায় পড়েছি যে বাঁচার কোনো কথাই ছিল না।

নারীর ভয়ও আর নেই। এই কুৎসিতদর্শন প্রায়-বৃদ্ধর কাছে আর কোন নারী আসবেন এখন? কার আর ভাল লাগবে এই আমাকে? তবে একথা সত্যি এই বয়সে এসে পৌঁছোনো পর্যন্ত অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবেই বেঁচেছি। গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি বটে কিন্তু কেন যে হয়নি, কী করে যে শেষ মুহূর্তে বেঁচে গেছি তা ঈশ্বরই জানেন। নারীরাও আমাকে অনেকই দিয়েছেন। না চাইতেই। ঈশ্বরের কোনো আশীর্বাদ হয়তো ছিল, নইলে এত বিভিন্ন-বয়সি বিভিন্ন-রূপগুণের নারীরা আমাতে আকৃষ্ট হবেন কেন? আমার নিজের তেমন কোনো রূপ বা গুণ ব্যতিরেকেই? জীবন ও মৃত্যু, সাফল্য ও ব্যর্থতার সাম্রাজ্যে তারের উপর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে হেঁটে এসেছি। পড়িনি বা মরিনি যে শতবার তাতে আমার কোনোই কৃতিত্ব নেই। সবই ঈশ্বরের দয়া। তবে পুতুপুতু করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেকই ভালো। এ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ যা-কিছুই পাইনি তার সব ক্ষোভ দূরীভূত হয়ে গেছে অযাচিতভাবে যা পেয়েছি, যতকিছু পেয়েছি, তার মধুর স্মৃতিতে। "যা দিয়েছ তুমি অনেক দিয়েছ, অযাচিত তব দান।"

ঋতু গুহঠাকুরতার সেভেন্টি-এইট আর পি এম-রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম রেকর্ড বেরিয়েছে তার কিছুদিন আগেই। ছোটো ডিস্ক। "আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে, মেঘ আঁচলে নিলে ঘিরে" এবং "আকাশে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া, বাতাসে আজ কোন পরশের লাগে হাওয়া"। একটি বর্ষার গান এবং একটি প্রেমের গান।

সবসময়েই গান দুটি শুনি। তাছাড়া যখনই তার রেডিয়ো প্রোগ্রাম থাকে, তা মস্ত বড়ো ইংলিশ টেপ-রেকর্ডারে টেপ করে রেখে নিশুতি রাতে নিজের ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে বাজাই, পাছে শব্দ বাইরে না যায়। মা-বাবার কানে না যায়!

"বাহির পথে বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে গেলি, আয়, আয়রে ফিরে আয়/পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি, বসিবি নিরালায়, আয়, আয়রে ফিরে আয়।"

আরও কত গান।

মা সব খবরই রাখতেন আমার, শিকারিরা যেমন জানোয়ারের 'রাহান-সাহানের' খবর রাখেন। কিন্তু বাবা তাঁর পেশার সাম্রাজ্য বিস্তারে এবং ডায়মন্ডহারবার রোডের কোনচৌকিতে তাঁর এগ্রিকালচারাল ফার্ম নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, এসব কোনো দিকেই তাঁর নজর দেওয়ার সময় ছিল না। ওঁর একমাত্র চিন্তা আমি পাশ করলেই আমার কাঁধে অফিসের দুর্বহ, ভারী জোয়ালটি চাপিয়ে দিয়ে অবসর নিয়ে চাষবাস নিয়ে থাকবেন ওই ফার্ম হাউসেই। তখন জোকা নামের একটি ঘুমন্ত গ্রামকে পেরিয়ে বাবার খামারে যেতে হত। 'শ্যামলী' বাগানবাড়িটি ছাড়া ওই পথে আর কোনো রিসর্ট বা বাড়ি বা অন্য কিছুই ছিল না বলতে গেলে। দু'পাশে ধুধু ধানজমি। বাবা পঁচাত্তর বিঘা জমি আস্তে আস্তে কিনে তার চারধারে খাল কাটিয়ে, মাটি তুলে, তার উপরে খামারবাড়ি ও গাছপালা, শাকসবজি লাগালেন। মস্ত গোয়ালঘরে শোনপুরের হাট থেকে কেনা পাটনাই আর পাঞ্জাবি গোরুরা হাম্বা-হাম্বা করতে লাগল। মধ্যের ধানজমিতে রাশিয়ান ট্রাক্টর ও জ্যাপানিজ পাওয়ার টিলার চলতে লাগল। আর ক্যানালে আমেরিকান আউট-বোর্ড ইঞ্জিন বসানো অ্যালুমিনিয়ামের নৌকোতে এবং দাঁড়-বাওয়া কাঠের নৌকোতে করেও প্রায় এক মাইল দৈর্ঘ্যের খালে নৌকো বিহার হতে লাগল। প্রতি রবিবার, শীতকালে ঢালাও নেমন্তন্ন থাকত। সে সময়ের কলকাতার কোন্ গণ্যমান্য ব্যক্তি যে যাননি—'গুহজ মালটিপারপাস ফার্ম'-এ তা বলা মুশকিল।

মা একদিন আমাকে ডেকে বললেন, তুই ওই মেয়েটির গান ভালবাসিস তো রেকর্ড শোন। গান শোনবার জন্যে গাইয়েকে বাড়িতে উঠিয়ে আনার কি দরকার? তাছাড়া, মনে কর তুই অফিস থেকে

ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে রাত নটাতে ফিরলি (তখন আমাদের কাজের রকম অমনই ছিল। কলকাতাতে থাকলে, সপ্তাহে ছদিন সকাল নটা থেকে রাত নটা কাজ করতে হত, বিশ্বাস করা-না-করা পাঠক আপনাদেরই ব্যাপার। তখন ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ইনকামট্যাক্সের আমলারাও সাতটা-আটটা অবধি থাকতেন অফিসে, টাইম-বারিং ম্যাটারসের জন্যে।) ফিরে দেখলি তোর বউ গান গাইতে গেছে, তোকে একটু যত্ন-আত্তি করবারও কেউ নেই। তোর ভালো লাগবে?

মা তো ছেলের ভালোই চান। সব মা-ই চান। বাবাও চান। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি'।

একটা কথা এখানে বলা অবশ্যই দরকার যে আমি জীবনের ওই সময়টুকুতে যতখানি কষ্ট পেয়েছি, আমার মা ও বাবাকে তার চেয়ে একটুও কম কষ্ট দিইনি। আমাজনিত কারণে তাঁদের কষ্টটা হয়তো আমার কষ্টর চেয়েও বেশি ছিল। আজ নিজে বাবা হয়েছি, পরিণত বয়সে পৌঁছেছি বলেই মা-বাবার 'পয়েন্ট অফ ভিউ'টা বুঝি।

বাবার কাছ থেকেই শিখেছিলাম, "Always appreciate the other man's point of view"—খুবই বড়ো শিক্ষা।

কিন্তু সেই সময়কার অবুঝ, জেদি, সর্বজ্ঞ যুবক আমি কোনো কিছুই শুনতে রাজি ছিলাম না। এই অভিশাপেই আমার সমস্ত জীবন অভিশপ্ত। যা-কিছুই এ জীবনে পেতে চেয়েছি, তা যাই-ই হোক না কেন তা আমি যে-কোনো মূল্য দিয়েও শেষ পর্যন্ত পেয়েছি। আমার সব চাওয়াকে পাওয়াতে পর্যবসিত করতে কী মূল্য যে দিয়েছি সেটা অবান্তর, কিন্তু একথা ভেবে আজকে ন্যায্য কারণেই শ্লাঘা বোধ করি যে আমার না-পাওয়া অতি কম চাওয়াকেই দেখেছি এ জীবনে। এমন কথা মনে হয়, কম মানুষই বলতে পারেন। তবে আরেক অভিশাপের কথাও বলব। "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই, তাহা চাই না।"

মানুষের জীবন বড়োই গোলমেলে। বড়ো দুর্জ্ঞেয়।

ভাগ্যিস!

অফিসের বোনাস পেয়ে পয়লা বৈশাখের আগে অনেকগুলো বই কিনে এনেছি। John Donne-এর কবিতার বই, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'তে উদ্ধৃত "Please hold you tongue and let me love" কবিতাটিও ছিল। Bertrand Russel-এর 'Conquest of Happiness' এবং "In praise of idleness", সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', বিভূতিভূষণের 'দেবযান', Andre Moreoa-র 'The Art of Living', Walter Whitman-এর 'Leaves of Grass', Emerson-এর 'Collection of Essays,' Robert Frost-এর একটি কবিতা সংকলন, T. S. Eliot-এর কবিতা সংকলন, Ernest Hemingway-এব "Men without Women", Thomas Mann-এর 'The Magic Mountain', James Joyce-এর 'Ulysses,' Oscar Wilde-এর 'Portrait of a Young Man as an Artist' এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। এছাড়াও আরও অনেক বই কিনে এনে গাড়ি থেকে নামিয়ে বসবার ঘরের সোফার উপরে যত্ন করে এবং প্রায় বোঝাই করে দিয়ে মেঝেতে পা-ছড়িয়ে বসে নতুন-কেনা বইয়ের গন্ধ শুঁকছি এমন সময়ে বাবা ঘরে ঢুকে বইগুলির প্রতি একবার তির্যক দৃষ্টি হানলেন। তারপর বললেন, বইগুলো কি তোর পড়ার বই?

আমি হেসে বললাম, না।

বাবা বললেন, তবে?

বলেই, ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

বাবার পক্ষে এই বৈপরীত্যর সংজ্ঞা—তাঁর বড়ো ছেলেকে বোঝা বা সমর্থন করা ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছিল। যে ছেলে তখনকার দিনের সি এ পরীক্ষার অ্যাকাউন্টস গ্রুপের তিন ঘণ্টায় ছটি ব্যালান্স-শিট মেলাবার মতো কেরানিসুলভ পরীক্ষাতে বারংবার ফেল করে, তার এইসব বিষয়-বহির্ভূত বই পড়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে বাবার বিপুল অজ্ঞতা তো ছিলই, বিলক্ষণ অসূয়াও ছিল। বই

বলতে, বাবা পড়তেন, আইনের বই ছাড়া, লাইটহাউস সিনেমার উলটোদিকের দোকান থেকে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসা ওয়েস্টার্ন থ্রিলারস—'ব্যাং ব্যাং ব্যাং'-এর রোমহর্ষক নানা কাহিনী। রাত দেড়টা-দুটো অবধি মাথার কাছে টেবল-ল্যাম্প জ্বেলে শুয়ে শুয়ে সেই সব বই পড়তেন এবং পড়া হয়ে গেলে দোকানে আবার ফেরত দিয়ে দিতেন।

আমাদের বাড়িতে কোনোরকম বই-টই পড়ারই তেমন রেওয়াজ ছিল না। অর্থকরী বিদ্যার জন্যে যা প্রয়োজনীয় সে সব বই ছাড়া অন্য কোনো বইয়ের প্রবেশ ঘটালে বাড়িতে তা অপরাধ বলেই গণ্য হত। বাড়িতে ছেলেবেলাতে 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি কোনো পত্রিকাই কোনোদিন দেখিনি। সাপ্তাহিক 'দেশ' আমি বাবার অফিসে চাকরিতে ঢোকার (পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে) পর থেকে রাখতাম। 'দেশ' পত্রিকা তখন আজকের মতো ছিল না। সাগরময় ঘোষের 'দেশ' সাহিত্য পত্রিকা অবশ্যই ছিল। এবং প্রত্যেক সাহিত্য-মনস্ক পাঠকেরই পাঠ্য ছিল। নানা পুজোসংখ্যা ও আনন্দবাজারের কোনো সংখ্যা বা বার্ষিক সংখ্যাও রাখতাম। তাই এমন দৈত্যকুলসুলভ পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে বড়ো হয়ে উঠে সাহিত্যের বা সংগীতের প্রতি অনুরাগ কী করে যে জন্মাল তা ভেবে আমি নিজেও বড়ো অবাক হই। গানের কথাও আগে বলেছি। রেডিয়োতে উচ্চাঙ্গ সংগীত হলে আমার ছোটোকাকা ধমকে বলতেন : কুকুরের কান্না বন্ধ কর, বন্ধ কর। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করব যে বাবা কিছুতেই বাধা দিতেন না এবং ডোভার রোডে থাকাকালীন আমার স্কুলের জীবনেই বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখে গান শেখাতেন। বাবার অসূয়া ছিল, সম্ভবত আমার ফড়িং-মনা হাবভাবে। বাবা চাইতেন আমি এক এক করে নানা বিষয়ে কৃতবিদ্য হই। কিন্তু সংসারে এমন অনেক বিদ্যা থাকে যা অনেকদিন ধরে এবং একটু একটু করে আয়ত্ত করতে হয়। যেমন গান বা সাহিত্য। পাশ করতে পারছি না বলে বাবার উষ্মা স্বাভাবিক ছিল।

অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে যে 'সংগ্রাম' শব্দটিতে বুঝি অর্থাভাবগ্রস্ত মানুষেরই একচেটিয়া অধিকার। আসলে তা নয়। সমাজের সব তলাতেই সংগ্রাম করতে হয় যদিও সেই সংগ্রামের অর্জিত ধনে তফাত থাকে। হয়তো সংগ্রামের তীব্রতাতেও তফাত থাকে। ক্ষুধার অন্নই 'মানুষের' একমাত্র প্রার্থনার বস্তু নয়।

মা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। ব্রহ্মসংগীতও। অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত। ডোভার রোডের বাড়িতেই চল্লিশের দশকের শেষে বাবা মাকে একটি কটেজ-অর্গান এবং কটেজ-পিয়ানো কিনে দিয়েছিলেন। চমৎকার গলা ছিল আমার মায়ের এবং সে গলাতে ভাব ছিল অশেষ। বড়োমামা সুনির্মল বসু ভালো গান গাইতেন, মেজোমামা সুকোমল ভালো বেহালা বাজাতেন। তারের বাজনাতে যাঁরা মুনশিয়ানা অর্জন করেন, বিশেষ করে বেহালা, এসরাজ, দিলরুবা ইত্যাদি, তাঁরা সুর শুলে না খেলে তা করতে পারতেন না।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'ইট রানস ইন দি ব্লাড'-গান সম্ভবত আমার রক্তে ছিল। এবং অন্য নানা সূক্ষ্ম ব্যাপারও পিতৃ-পরিবারে খেলাধুলো, শিকার, পরিশ্রম করার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা, অর্থপ্রেম, খাদ্যপ্রেম (খাদ্যরসিকতা নয়), বিলিভার ইন কোয়ানটিটি বাট নট সো মাচ ইন কোয়ালিটি, শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে গর্ব, এ সবই ছিল পুরো মাত্রাতে। কিন্তু সূক্ষ্মতার সঙ্গে হয়তো বিরোধ ছিল। তাই আমার মায়ের জন্য বড়ো কষ্ট হত। অন্তরে মা বড়ো একা ছিলেন এবং তাঁকে বোঝার মতো মানুষ আমাদের পিতৃপরিবারে সম্ভবত একজনও ছিলেন না। তাঁর ছেলেবেলার গিরিডির ব্রাহ্ম পরিবেশ, উশ্রী নদী, খান্ডলি পাহাড়, সিরসিয়া ঝিল, অভ্র ঝিকিমিকি তোলা লাল মাটি, বসন্তর সতেজ সবুজ শালবন, বড়ো মামার কলেজের বাংলার মাস্টারমশাই দুর্মর রবীন্দ্রভক্ত হিমাংশুবাবু (হিমাংশু রায়) মাকে চিরদিন আচ্ছন্ন করে ছিলেন। গিরিডির পূর্ণিমার চাঁদের গল্প, গিরিডিতে বড়ো মামার এক অপরূপ সুন্দরী সম্ভ্রান্ত বাড়ির কন্যা প্রেমিকা, যাঁকে ভালবাসা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বড়ো মামা মায়ের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সেই সব গল্প মা'র মুখে প্রায়ই শুনতাম। এবং শুনে, প্রেমের পরম গন্তব্য যে প্রেমাস্পদ বা প্রেমিকাকে পাওয়া নয় এই ব্যাপারটা কৈশোর বয়সেই বুঝতে শিখেছিলাম।

প্রেম যে ফুলের গন্ধ, বসন্তের ভোরের বাতাস, চৈত্রের বিকেলের আলো, শীতের সকালের রোদ তা মনে হয়, ওই বয়সেই বুঝতে শিখেছিলাম।

পাঠক! আপনারা অবশ্যই আমাকে এঁচড়ে পাকা বলতেই পারেন।

মায়েদের ছেলেবেলা ছিল নানারকম আদর্শময় ছেলেবেলা। আমাদের ছেলেবেলাও তাই ছিল কমবেশি। আদর্শের বালাই আজ আর নেই।

মায়ের মাতামহ অভ্র-ব্যবসায়ী, অত্যন্ত ধনী এবং শিক্ষিত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মাতামহী মনোরমা দেবীও মহীয়সী মহিলা ছিলেন। পাঠক! আপনারা না জানলেও, আপনাদের মা-বাবাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো 'মনোরমা জীবন চরিত'-এর কথা শুনেছেন বা পড়েছেন। মনোরঞ্জন নিজেও লেখক ছিলেন।

সেই সময়ের রূপবান ও গুণবান পুরুষেরা পরমাসুন্দরী, শিক্ষিতা, ধনীর দুলালির প্রেম পেয়েও প্রেমিকার বৃহত্তর স্বার্থে সেই.প্রেমকে উসকে না দিয়ে প্রেম-নিবেদন করা প্রেমিকার বৃহত্তর স্বার্থে নিভিয়ে দিতেন। সেই সময়ের সঙ্গে এখনকার কোনো মিল নেই।

আমার মধ্যে স্নিগ্ধ সূক্ষ্মতা যেটুকু এসেছে, সাহিত্য, গান, ছবি, সমস্তই এসেছে মাতৃকুল থেকেই। আর দুর্দম রুক্ষতা যা এসেছে, পরিশ্রমের ক্ষমতা, শারীরিক সাহস, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা, বিপদের প্রতি সহজাত আকর্ষণ, শিকার, খেলাধুলা এ সবই এসেছে পিতৃকুল থেকে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, Art is born out of superfluity. "তোমার জীবনপাত্র উছলিয়া মাধুরী করেছ দান, তুমি জানো নাই, তুমি জানো নাই তার মূল্যের পরিমাণ।" শিল্প, সূক্ষ্মবৃত্তি, গান, সাহিত্য, ছবি, প্রেম এ সবই হয়তো জীবনের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হবার পরে উপচে পড়ারই জিনিস। আমার মনে হয় সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, ছবি এ সব কিছুরই পূর্ণ বিকাশের জন্যে হয়তো আর্থিক সাচ্ছল্য খুবই সহায়ক। অথচ আর্থিক সাচ্ছল্য যাদের মধ্যে আছে সাধারণত তাদের মধ্যেই এসবের অপার অভাব দেখা যায়। কেন এমন হয়, কে জানে!

মনে হয়, অর্থোপার্জন ব্যাপারটা অতীব সোজা, বিশেষ করে আজকাল। কিন্তু অর্থ হজম করা, শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব। যশেও অর্থেরই মতো বহু মানুষেরই বদহজম হয়। আসলে অর্থ ও যশ যখন অসৎ উপায়ে বা চালাকির দ্বারা অর্জিত হয়, হয়তো তখনই এমনটি ঘটে থাকে। ঘটে যে থাকে, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমরা চোখের সামনে দুবেলাই দেখতে পাই। যে অর্থ বা যশ অর্থবান ও যশস্বী মানুষকে সৎ, উদার ও মহৎ করার কথা ছিল, তাই মানুষকে নীচ, অসৎ এবং ক্ষুদ্রমনা করে তোলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এ এক আশ্চর্য প্যারাডক্স।

তবে, সাহিত্য-মনস্কতা আমার মামাবাড়িতে থাকলেও বর্তমান প্রজন্মে আমার বড়ো মামা সুনির্মলের বড়ো ছেলে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আশিসকুমার বসুর মতো সাহিত্য-পাঠক এবং সাহিত্য-প্রীতি আর কারো মধ্যেই দেখিনি। বড়ো মামার সব পুত্রই কম-বেশি সাহিত্য-ভক্ত। জীবনের প্রথম ভাগে অর্থের জন্যে সংগ্রাম না করতে হলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক হতে পারতেন হয়তো। বড়ো মামার কনিষ্ঠতম পুত্র অভীককুমার বসুও নিজে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েও খুব ভাল ছড়াকারও। তাঁর একাধিক ছড়ার বইও আছে। আশিস আমার মা ও বাবার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন এবং বাবার অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্মের তিনিই প্রথম অংশীদারও। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ও কাব্যের তিনি একজন ব্যতিক্রমী পাঠক।

আমার নিজের ভায়েদের মধ্যে মেজো ভাই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিশ্বজিৎ বাংলা বই পড়ত বছর দশ-পনেরো আগে পর্যন্তও। তারপর থেকে নানা কারণে দেখতে পাই যে, আর পড়ে না। এই পথ, সুধীর চক্রবর্তীর ভাষাতে, একক নির্জনের পথ। কনিষ্ঠতম ভাই ইন্দ্রজিৎ কোনোদিনও কোনো বই-ই পড়েনি এবং পড়ে না। তবে তার অপরাধ পুরোপুরি স্খালন করেছে তার স্ত্রী আমার ছোটো ভাদ্রবউ সোনাই (অঞ্জনা)। সে ব্রাহ্ম এবং উচ্চশিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। তার মা চিত্রা মিত্র অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা, কলকাতার মডার্ন হাই স্কুল ফর গার্লসের বাংলার শিক্ষিকা ছিলেন। মায়ের কাছ থেকেই সম্ভবত সোনাই বাংলা সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। মেজো ভাদ্রবউ রঞ্জনা

পড়ে বাংলা বই। খুব বেশি না হলেও, পড়ে। তবে আমার বইগুলি উপহার হিসেবে পায় বলে পড়ে কিনা তা বলতে পারব না। যখন দেখব আমার বা অন্য লেখকদের বাংলা বই সে বা তারা কিনে পড়ছে, তখনই সত্যিমিথ্যে বোঝা যাবে।

আমার দুই বোন। মালা রায় এবং ইলা ঘোষ। আমার বড়ো বোন মালার বিয়ে দেন আমার প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বাবা, মালার অমতেই, সে যখন কমলা গার্লস স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ত। বিয়ের পরই সে চোখের ডাক্তার স্বামীর সঙ্গে (ড. সত্য সিংহরায়) ইংল্যান্ডে চলে যায় ১৯৫২-তে। ইংল্যান্ডের গ্লাসগো, লন্ডন ইত্যাদি জায়গাতে বহু বছর থেকে চলে যায় ব্রিটিশ গায়ানার জর্জটাউনে। তারপরে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে, আমার ভগ্নীপতি গত হওয়ার পরে পরে লন্ডনেই এসে থিতু হয়। ছেলেমেয়েরা বাংলা পড়তে পারে না স্বাভাবিক কারণেই। বাংলা বলেও ভাঙা-ভাঙা। ছেলেও ডাক্তার। সে একটি ক্যাথলিক ইংলিশ মেয়েকে বিয়ে করেছে। তার নাম কারেন। মেয়ে বড়ো। সে নামি সাইকিয়াট্রিস্ট। ইংল্যান্ডের একটি মানসিক হাসপাতালের এমরিটাস প্রফেসর—এত অল্পবয়সেই। ছেলে অভিজিৎও চোখের ডাক্তার।

বলাই বাহুল্য, মালার ছেলেমেয়ে অথবা নাতিনাতনিরা কেউই বাংলা পড়তে পারে না। মালা পারে, তবে বই পড়ে না। আমার ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ীরা জানে যে তাদের বুদ্ধমামা বাংলাতে লেখেন-টেখেন। কী লেখেন, কেমন লেখেন সে বিষয়ে তাদের এবং তাদের মায়েরও কোনো ধারণা বা উৎসাহ নেই। তবে "বুদ্ধমামা" নভেলিস্ট বলে আমার ভাগনে এবং ভাগনি দারুণ দারুণ সব কলম, Mont Blanc, Charandash, একেবারে লেটেস্ট মডেলের Waterman, Parker এবং Sheafars আমার নাম খোদাই করে এবং না করেও উপহার দেয়। মালা, শীতটা এখানে কাটায়, আমাদের পৈতৃক নিবাসেই এবং গরম পড়লেই চলে যায় ইংল্যান্ডে পরিযায়ী পাখিদেরই মতো।

আমার দ্বিতীয়, ছোটো বোন ইলার বিয়ে দেন বাবা উইমেনস ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষা দেবার পরই। বিয়ের পরে পরীক্ষা-পাশের ফল বেরোয়। ভগ্নীপতির নাম শ্রীসলিলেন্দু ঘোষ। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। জার্মানিতে ট্রেনিংয়ের সময়েই জার্মানির সিমেন্স কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে ভারতে এসে সিমেন্স ইন্ডিয়াতে যোগ দেন। তবে বিয়ের কয়েকবছর পর থেকেই সলিলবাবু রাউরকেল্লা, হায়দারাবাদ, ম্যাড্রাস হয়ে দিল্লিতে যান এবং ফরিদাবাদে প্রাসাদোপম বাড়ি কিনে থিতু হন রিটায়ার করার পরে। ওঁদেরও এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে কিংশুক (রানা), চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। নেসেলস ইন্ডিয়াতে আছে। দিল্লি থেকে কলকাতা আসে বদলি হয়ে তারপরে আবার চণ্ডিগড়ে বদলি হয়ে গেছে। তার স্ত্রী পারমিতা অত্যন্ত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে এবং আমার ভক্ত পাঠিকা। ওর পদবি রায় মুখার্জি ছিল বিয়ের আগে। বাবার নাম, অর্জুন রায় মুখার্জি। রসিক মানুষ। উনি দিল্লিতে এখনও কর্মরত ফেডারস লয়েডস গ্রুপে। পুঞ্জদের গ্রুপ। ওঁদের রভি পুঞ্জ কলকাতায় থাকাকালীন ক্যালকাটা র‍্যাকেট ক্লাবে আমার সঙ্গে স্কোয়াশ খেলতেন সত্তরের দশকে।

ইলার মেয়ে মিমি আর আমার বড়ো মেয়ে মালিনী একদিনের ছোটো-বড়ো। মিমিরা দিল্লিতে থাকে চিত্তরঞ্জন পার্কে। ওর স্বামী সুশান্ত ইঞ্জিনিয়ার। এখন থাকে দুবাইয়ে। মিমিও যায় মাঝে মাঝে এক ছেলে এক মেয়েকে নিয়ে।

ইলা এবং ইলার শ্বশুরবাড়িতে বাংলার চর্চা এখনও আছে। সলিলবাবুর মা আমার লেখার খুবই ভক্ত ছিলেন। উনি গতবছর গত হয়েছেন। ইলার বড়ো ননদও বাংলাতে লেখালেখি করতেন। বাণী গুহঠাকুরতা।

আমার শ্বশুরবাড়ির গুহঠাকুরতাদের মধ্যে ষাটের দশক অবধি বাংলা সাহিত্যের কদর ছিল। তারপর থেকে তা বর্জিত হয়েছে। কনিষ্ঠতম শ্যালক গায়ক অভিরূপের সুন্দরী সুগায়িকা স্ত্রী রিনাশংকর, উদয়শংকর, রবিশংকরের পরিবারের মেয়ে, শংকর লেখে না রিনা। লোরেটো ডে স্কুলের বাংলার শিক্ষিকা। একসময়ে সে আমার লেখা খুবই পড়ত। এখন তার মেধাবী ছেলেমেয়ের ও গায়ক ও ব্যবসায়ী স্বামীর দেখাশোনা করে নিজেও যেমন গান গাইতে সময় পায় না, সাহিত্য পড়ারও সময় পায় না। আরেকজন শালা ধীরূপের স্ত্রী শিখা বাংলা এখনও পড়ে। রিনা আমার লেখা পছন্দ করে না

এবং 'মাধুকরী' যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখন থেকে সে আমার উপরে খড়্গহস্ত হয়ে আছে। একথা জেনে আমার অগণ্য শত্রু এবং যাঁরা আমাকে লেখক বলে স্বীকার করেন না তাঁরা যারপরনাই খুশি হবেন নিশ্চয়। রিনার আদর্শ লেখক হচ্ছেন দিব্যেন্দু পালিত। একথা জেনে আঁতেল দিব্যেন্দুর অবশ্যই আহ্লাদ হবে।

চোখের সামনে দক্ষিণ কলকাতার মোটামুটি সচ্ছল বাঙালি পরিবার থেকে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতি যেভাবে গত তিরিশ দশকে বিতাড়িত হয়ে প্রায় নিশ্চিহ্নই হয়ে গেল তা লক্ষ করে বড়ো দুঃখ হয়। প্রত্যেকের ছেলেমেয়েরই হয় সেন্ট জেভিয়ার্স, লা মার্টিনিয়ার, ডন বসকোতে পড়ে। তার আগে মন্ট গ্রেস ও বি হার্টলি বা সেন্ট জেভিয়ার্স বা লা মার্টসের মতো স্কুলের কিন্ডারগার্টেন বা প্রিপারেটরি ক্লাসে। তারপরে প্রেসিডেন্সি, নয় ডাক্তারি, নয় ইঞ্জিনিয়ারিং, নয় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, নয় ম্যানেজমেন্ট স্কুল (জোকা), নয় দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি, নয় দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স, নয় জামিয়া মিলিয়া ইউনিভার্সিটি, নয় আহমেদাবাদের ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশান ডিজাইনস, নয় পুনা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চলে যায়। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তারা পয়লা বৈশাখকে বলে একলা বৈশাখ। এরা সকলেই 'কৃতী' হবে। অনেক টাকা মাইনের চাকরি করবে। অনেকে বিদেশেও যাবে। ভালো থাকবে, ভালো পরবে, কিন্তু এরা আর বাঙালি থাকবে না।

এর জন্যে দায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাব্যবস্থা। স্কুলের নিচুতলা থেকে রাজনীতি ঢুকিয়ে, শিক্ষকদের নিম্ন মান, উদ্দেশ্যপ্রসূত পাঠ্য-বই, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশ করে এঁরা মেধাবী এবং সচ্ছল ছেলে-মেয়েদের বাংলা থেকে তাড়ানোর বন্দোবস্ত বহুদিনই হল পাকা করেছেন। এঁদের জন্যেই বাঙালি জাতি ক্রমশ একটি জড়ভরতে পর্যবসিত হচ্ছে। হচ্ছে যে, তা তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরা যা-কিছুই গত একুশ বছর ধরে করে আসছেন তার পেছনে নৈরাজ্যের বীজ বপনের কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য হয়তো ছিলই। নইলে, সব জেনেশুনেই স্বজাতির এমন সর্বনাশ কেউ করতে পারেন বলে জানি না আমি।

ঋভুর চতুর্থ পর্ব লিখছি অথচ এ পর্যন্ত আমার পরিবারের সকলের পরিচয় দিইনি। প্রথম পর্বতে তো কাল্পনিক নাম 'ঋভু' এবং সব চরিত্রর নামও কাল্পনিক রেখেছিলাম। যেমন মায়ের আসল নাম মঞ্জুলিকা, প্রথম পর্বে আছে তাপসী। দ্বিতীয় পর্ব থেকেই অবশ্য ঋভু আত্মজীবনীর চেহারা পেয়েছে। আত্মীয়দের পরিচয় যে দিইনি সে কারণে গুঞ্জরনও উঠেছে। তাই এর পরের কিস্তি আরম্ভ করব একটি পূর্ণাঙ্গ বংশতালিকা দিয়ে। এটা অনেক আগেই করা উচিত ছিল। জীবনীই যখন লিখতে বসেছি এবং লুকিয়ে রাখার মতো কিছুই যখন নেইও তখন এই কর্তব্যটি করা প্রয়োজন। আমার বর্তমান পাঠক-পাঠিকারা আমার বংশতালিকা সম্বন্ধে জানতে উৎসুক না হলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকারা হয়তো জানতে চাইতেও পারেন। এতে আমার আত্মীয়-পরিজনদের প্রতিও অবশ্যই সুবিচার করা হবে আমার তরফে। আমার আত্মীয়-পরিজনদের দিয়ে বুদ্ধদেব গুহর সাহিত্য-বিচার যদিও কোনোদিনও হবে না, সে কারণে আমাকে দেয় নম্বর তাঁরা বাড়াবেনও না, কমাবেনও না, তবু এটা করা আমার অনেকদিন আগেই উচিত ছিল। বেটার লেট দ্যান নেভার!

সত্য অতীতের কথা বলাতে আমার কিছু আত্মীয়-পরিজন আমার উপরে রুষ্ট হয়ে আছেন। কিন্তু চিরদিনই আমার বিশ্বাস ছিল দারিদ্রের মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। দারিদ্রও ঈশ্বরের দান এবং দারিদ্র মানুষকে মানুষ করে তুলতে সাহায্যও করে। দারিদ্রের মধ্যে লজ্জা না-থাকলেও দারিদ্র লুকিয়ে রাখবার মধ্যে লজ্জা অবশ্যই আছে। যেমন অনেক সাহিত্যিক বহুদিন পর্যন্ত এ সত্য লুকিয়ে রেখে এমনই হাবভাব করেন যেন গড়িয়াহাটার মোড়ে হেলিকপ্টার থেকে পড়েছেন। হয়তো 'ঋভু'র প্রথম খণ্ড পড়ার পরে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মদর্শন করে ভেক ছেড়ে সত্যবাদী হতে আরম্ভ করেছেন।

মনীষীদের বা অত্যন্ত বড়ো মাপের মানুষদের বংশলতিকার প্রতি আগ্রহ থাকে মানুষের। আমি আগেই বলেছি যে আমি অতি সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও আমার আত্মীয়-পরিজনের সম্মানার্থে এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মের বাঙালি পাঠকদের কথা ভেবে এই বংশলতিকা সংযোজিত করব। দেশে

কোনোদিনও মূর্খ মানুষের অভাব ছিল না। সেই মূর্খদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো তাদের মূর্খামিরই কারণে আমার মৃত্যুর পরে এই বংশ পরিচয় সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হতেও পারেন।

আমার মায়ের পিতৃদেব বসু পরিবারের পশুপতির পিতৃদেব গিরীশচন্দ্র বসুঠাকুরের জীবনীমূলক গ্রন্থ 'দারোগার আত্মকাহিনী' প্রকাশিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। দারোগাগিরি ছেড়ে তিনি মুরশিদাবাদের নবাবের সেরেস্তাতে যোগ দেন। তাঁর গ্রন্থে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে যা ঋভুর প্রথম পর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আদি নিবাস ছিল ঢাকা, বিক্রমপুর, মালখাঁনগর গ্রামে।

ততদিনে বাবার কোনচৌকির (জোকার কাছে) খামার বাড়ি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে। ছোটোকাকু (ভালো নাম সুশীল, ডাক নাম গোপাল) ওখানেই থাকেন। সপ্তাহান্তে উনি এবং কলকাতাতে থাকেন—বাবা এবং সময়ে সময়ে মা-ও ওখানে গিয়ে থাকেন তখন। সেজোকাকু (সুনীল) যখন কলকাতাতে থাকেন তখন মাঝে মাঝে উনিও ওখানে গিয়ে থাকেন। তাঁর পুরোনো ভক্তরাও, খদ্দর-পরিহিত, কংগ্রেসের সতীন সেন অনুসারীরা যান। ছোটোকাকুর বন্ধুরাও কখনো কখনো যান।

খামারবাড়ি মানে, খামারবাড়িই। ওপরে টিন এবং ধারার বেড়া দেওয়া ঘর। চারখানি ঘর ছিল অ্যাটাচড বাথসুদ্ধু। ভিয়েন বসানোর জায়গা। একসঙ্গে দেড়শো মানুষ বসে খাবার মতো পাকাপোক্ত বেঞ্চ ও টেবলের বন্দোবস্ত, বেসিন, টয়লেট সব। আর ছিল রান্নাঘর, গোয়ালঘর, হাঁস-মুরগির ঘর, স্টোর রুম। স্টোররুমে রাশিয়ান ট্রাক্টর, জাপানিজ পাওয়ার-টিলার, খামারের নানা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি থাকত। পাঁচ-ছ খানি গাড়ি পর পর রাখার জায়গাও ছিল।

পঁচাত্তর বিঘা ধানজমিতে চারদিক ঘিরে খাল কেটে তা থেকে মাটি তুলে বাস ও ফলফুলের চাষযোগ্য ডাঙা জমি বের করা হয়েছিল। বর্ষাকালে খাল আর ধানজমি একাকার হয়ে যেত। মাছেরা দৌড়ে বেড়ানোর অনেক সুযোগ পেত এবং তাড়াতাড়ি বড়ো হতে পারত। তাদের দৌড় করানো এবং প্রমোদবিহারের জন্যেও অ্যালুমিনিয়ামের হালকা মোটরবোট ছিল দুটি, আমেরিকান আউটবোর্ড এঞ্জিন লাগানো। কাঠের দাঁড়-বাওয়া নৌকোও ছিল। রবিবার রবিবার, বিশেষ করে শীতকালে, পিকনিক লেগেই থাকত। তবে আমার যাওয়া হত না।

জানালা দিয়ে শীতের রোদ এসে ঘরে ঢুকত নিঃশব্দ পায়ে প্রেমিকার মতো। বুলবুলি ডাকত বাগানে। লনের মধ্যে চড়ুইদের জরুরি মিটিং বসত। কমলা কাকিমাদের বাড়ির তেতলা থেকে ভেসে আসত রাজেশ্বরী দত্তর 'পিপাসা নাহি মিটিল' অথবা 'কিছুই তো হল না, সেই সব সেই সব, সেই অশ্রু সেই হাহাকার রব'। বুকের মধ্যেটা হা হা করে উঠত। ব্যাঙ্কিং কোম্পানির ব্যালান্সশিট মেলানো বন্ধ করে, মনে হত উপর থেকে বন্দুকটা নিয়ে এসে কপালে নল ঠেকিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘোড়া টেনে দিই। শেষ করে দিই চৌকাঠে দাঁড়ানো এই প্রতীক্ষা-দগ্ধ জীবন।

ব্যালান্সশিট মেলানো বন্ধ করে কবিতার খাতা নিয়ে বসতাম, 'স্বপ্ন দেখা বন্ধ করুক কবি, মরে বাঁচুক, মরেও মানুষ হোক।' নয়তো রং-তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসতাম। নইলে, ডায়ারিতে লিখতাম আমার স্বপ্নের গায়িকাকে আমার ঘরনি করতে পারলে একদিন আমি আর সে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-রাজেশ্বরী দত্তর মতো স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত হব। তখন জানা ছিল না যে, বিখ্যাত হওয়ার ইচ্ছা আর সত্যি সত্যি বিখ্যাত হওয়ার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিভাবান হওয়া যে দৈবী ক্ষমতা নির্ভরই শুধু নয়, তার পেছনে যে প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় থাকতেই হয় তা তখনও জানা ছিল না। পরে জেনেছিলাম যে "Genius is 1 p.c. inspiration and 99 p.c. persipiration."

পরবর্তী জীবনে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর উপরে ভক্তি অটুট রাখা সম্ভব হয়নি। না, কবি বা গদ্যকার সুধীন্দ্রনাথ এখনও আমার প্রিয়। কিন্তু মানুষ সুধীন্দ্রনাথের নম্বর কাটতে বাধ্য হয়েছিলাম। হিরণ্ময় সান্যালের একটি লেখা 'দেশ' পত্রিকাতে পড়ে যখন জেনেছিলাম যে, কোনো বিয়েবাড়িতে সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর ড্রাইভারের সঙ্গে একই পংক্তিতে খেতে বসতে দেওয়াতে তিনি বিষম অপমানিত বোধ করেছিলেন। তা জানার পর থেকেই মানুষ হিসেবে তাঁকে ভক্তি করা আর সম্ভব হয়নি।

কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনবহিত আমার বাবার দৃষ্টান্ত ছিল একেবারেই অন্যরকম। রাজা বসন্ত রায় রোডে বাবার বাসগৃহ 'কনীনিকা'র গৃহপ্রবেশের সময়ে রাজমিস্ত্রি, ছুতোর মিস্ত্রি, কুলি,

কামিন, ইট-বওয়া মুটে প্রত্যেককে বাবা নেমন্তন্নই যে করেছিলেন তাই নয়, অন্য অতিথিদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে খাইয়েছিলেন। তাতে কিছু গণ্যমান্য অতিথি 'অপমানিত' বোধ করে না-খেয়ে চলে গেছিলেন। বাবা তাঁদের জন্যে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হননি বরং যারা নিজে হাতে বাড়ি বানিয়েছিল, সেই কাদের মিস্ত্রি এবং অন্যান্যদের কাছে তাদের অপ্রতিভ করার জন্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

এই দেশে সোসালিস্ট, ইন্টেলেকচুয়ালস, সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান থেকে না খেয়ে চলে যাওয়া অতিথিদেরই মতো। মানুষকে তাঁরা মানুষ জ্ঞান করেন না। মানুষের ইংরেজি-শিক্ষা, সাজপোশাক, পদমর্যাদা, বিত্ত ও ক্ষমতাই তাঁদের বিবেচনার একমাত্র বিষয়—তাই আজও স্বদেশের এই অবস্থা। সেই ছেলেবেলা থেকে এইরকমই দেখে আসছি বলেই এই পরিণত বয়সে পৌঁছেও আজ অবধি 'আঁতেল' প্রীতি আমার হল না।

আমাদের সেই খামারবাড়ির, সেজোকাকু রংপুরের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে নাম দিয়েছিলেন 'রংপুর গার্ডেনস'। বাবা নাম দিয়েছিলেন 'গুহজ মালটিপারপাস'। রাজ্যপালের বাড়ি থেকে ঠিক এগারো মাইল দূরে ডায়মন্ডহারবার রোডের উপরে ডানদিকে, পৈলান গ্রামে যাওয়ার পথে ছিল সেই খামার। এখন অবশ্য শুনি বারো বিঘা মতো আছে জমি। বাবা ও ছোটোকাকুর পরে ভায়েরাই সব দেখাশোনা বিক্রিবাটা করে। তরিতরকারি, নারকোল, আম। জমির বেশিটাই বিক্রি হয়ে গেছে দুখেপে। শেষে টুটু বসু নিয়েছেন অনেকখানি। নিয়ে, দেখার মতো ভিলা, লন ইত্যাদি বানিয়েছেন, ক্যানাল রেখে। তাঁর প্রাসাদোপম ভিলার পাশে আমাদের খামারবাড়িকে এখন বড়ো মলিন দেখায়।

চাষবাস করাও হোলটাইম ব্যাপার। অর্ধেক সময় ও অর্ধেক মনোযোগ দিয়ে করলে কোনো কিছুই করা হয়ে ওঠে না। আমি পরবর্তী জীবনে পেশার কাজ করে এবং অবসর সময়ের সবটুকুই লেখালিখিতে ব্যয় করে সেখানে পিকনিক করতেও যেতে পারতাম না। তাছাড়া আমার ভায়েরা আমার তুলনাতে এসব জাগতিক ব্যাপারে অনেকই দড়। বাড়িতে কোনো বিয়ে হলে আমি শুধু ধুতি-পাঞ্জাবি পরে অভ্যাগতদের আমন্ত্রণ জানাতাম গাড়ির দরজা খুলে, তাঁদের খাওয়ার সময়ে দেখাশোনা করতাম এবং চলে যাওয়ার সময়ে আবার বিদায় জানিয়ে আসতাম পথ অবধি গিয়ে। অন্য কোনো কাজ বা যাকে বলে 'আসল কাজ' তার কিছুমাত্রই আমার দ্বারা হয়নি একটুও। আসলে ঘরে-বাইরে সবখানেই আমি হয়তো ছিলাম অকাজের মানুষ। তাঁর শেষ জীবনে পৌঁছোনোর আগে পর্যন্ত বাবারও ধারণা সেইরকমই ছিল। আমাকে নিয়ে তিনি আদৌ গর্বিত ছিলেন না। সেটা আমার পরম দুর্ভাগ্য। অথচ তাঁর শিক্ষাতেই আমি নিজেকে গড়েছিলাম।

ভায়েদেরও হয়তো অনেক অসুবিধা ছিল অতবড় সম্পত্তির দেখাশোনা করার। তাছাড়া নানা রাজনৈতিক দলের কৃপাদৃষ্টিতে কোনো ভালো কিছু বা বড়ো কিছু পশ্চিমবঙ্গে গড়ে তোলা এবং ধরে রাখাও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছিল। নিজে হাতে না করলে, নিজেরা পুরোপুরি জমিতে না থাকলে সেখানে চুরি তো কম কথা, পুরো সম্পত্তিই জবরদখল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল। সেই সব পুঞ্জীভূত কারণে বেচারাম বাঙালিদের আদর্শে আদর্শবান হয়ে উঠে যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটেছিল।

চাষবাস করাটা, যদিও প্রভূত লাভজনক, এখনও মধ্যবিত্ত শহুরে বাঙালির পক্ষে হয়তো ভদ্রজনোচিত কাজ বলে গণ্য নয়। আমার বাবা ছিলেন ওরিজিনাল মানুষ। তাঁকে তা মানিয়ে গেছিল, যা তিনি এক জীবনে করেছিলেন, আমাদের তার কাছাকাছি কিছু করারও ক্ষমতা ছিল না। আজও হয়নি। বাবা ছিলেন পুরুষসিংহ। আর বেচারি মা! বাবার শিকারি বন্ধুরা তাঁকে খুব ঠাট্টা করতেন তিনি শিকার-বিরোধী ছিলেন বলে। শিকারে গিয়ে যদি কখনো খালি হাতে ফিরতে হত তাঁদের তখন তাঁরা বাবাকে বলতেন শিকার হবেটা কী করে! বাড়িতে যা "হাই-ভোল্টেজ রেজিস্ট্যান্স"।

আবার শীত গেল। বসন্ত অপগত হল। এবারও হল না গান। মে মাসে আবার পরীক্ষাতে বসে গোপালের সঙ্গে হাজারিবাগে গেলাম।

শিকারের খারাপ দিক অনেকই ছিল কিন্তু ভালো দিকও কম ছিল না। বন্দুক-রাইফেলের ট্রিগার টানাটা শিকারে সবচেয়ে সামান্য ঘটনা। যে সব শত্রুরা আমাদের নাগালের বাইরে ছিল, গোপালের মতে যেমন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পরীক্ষার পেপার-সেটার এবং পরীক্ষকেরা, তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতাও আমাদের ছিল না। তাই ট্রিগার টেনে লক্ষ্যকে এক গুলিতে ধরাশায়ী করার মধ্যে একধরনের তীব্র আনন্দ পেতাম আমরা। যেন গুলিবিদ্ধ পাখি বা খরগোশ বা হরিণই সিএ পরীক্ষার পরীক্ষক—আমাদের মতো বহুগুণসম্পন্ন ক্ষণজন্মা ছেলেদের যাঁরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতাতে অপমানিত অসম্মানিত করছেন বারংবার, তাদেরই উপরে প্রতিশোধ নেওয়া হত যেন।

এখনকার অনেক বন্যপ্রাণীপ্রেমী হয়তো জানেন না বা খোঁজ রাখেন না যে পরবর্তী জীবনে যাঁরা সবচেয়ে নামি-দামি কনজার্ভেশানিস্ট হয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই জীবনের একটা সময় পর্যন্ত শিকারি ছিলেন। যাঁরা জিম করবেটকে ভালো করে পড়েছেন, সালিম আলির "The fall of a sparrow" পড়েছেন, বা অ্যান রাইটকে কাছ থেকে জেনেছেন তাঁরা সকলেই জানেন একথা। তবে একথাও ঠিক যে, তখন শিকারের আইনকানুনও মান্য করত মানুষ। সারা দেশে এমন নিপাট নৈরাজ্য ছিল না। এই নৈরাজ্যেরই কারণে আজ শিকার করা অবশ্যই গর্হিত অপরাধ। আজ কেন, উনিশশো বাহাত্তরে যখন বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন দেশে অবশেষে চালু হল সেদিন থেকেই আমি অন্তত বন্দুক-রাইফেলে এক রাউন্ডও গুলি ছুড়িনি। বন্দুক-রাইফেল বন্দুকের দোকানেই গচ্ছিত রাখা ছিল।

ততদিনে বর্ষা নেমে গেছে। ছোটোনাগপুর মালভূমি, মানে, রাঁচি-হাজারিবাগ-পালামৌ-সিংভূম-কোডারমা অঞ্চলে বর্ষার যে রূপ তা ভাষায় বর্ণনার নয়। কখনো কখনো সারাদিন বৃষ্টি পড়ে ফিসফিস করে, যেন বাসরঘরের দম্পতি কথা বলছে। পুটুর-পুটুর করেও নয়, সত্যিই ফিসফিস করে। গোপালদের ছবির মতো বাড়ি 'পূর্বাচল'-এর ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর ভেজা গা থেকে সবে চান করে ওঠা নারীর গায়ের গন্ধের মতো সুগন্ধ ওড়ে। ইয়ালো-ওয়াটেলড ল্যাপউইং গয়া রোডের ওপাশের বৃষ্টিভেজা মোরব্বা খেতের উপরে ডিড-উ্য-ডু-ইট করে চমকে চমকে উড়ে বেড়ায়। স্মিথ সাহেবের বাড়ির গেটের পাশের অচেনা গাছটাতে বিধুর লাইলাক রঙের ফুল বৃষ্টিতে ভিজে কিশোরীর স্বপ্নের মতো দেখায়। বেশ শীত শীত ভাব।

চমনলালকে ভুনি খিচুড়ির জোগাড়যন্ত্র করতে বলে আমি আর গোপাল মাথাতে টুপি চড়িয়ে ওয়াটারপ্রুফ আর গামবুট পরে বন্দুক হাতে মোরব্বা খেতে ঘুরে বেড়াই। মোরব্বাতে কাদা হয় না। জল সরে যায় বলেই Sisal Hemp-এর গাছেরা মহানন্দে বাড়তে পারে। গামবুট পরার কারণ কাদার ভয় নয়, সাপের ভয়। বর্ষার মোরব্বা খেতে তিতির আর খরগোশ ধরার লোভে নানা জাতের ছোটো-বড়ো সাপের মেলা লেগে যায়।

একটা খরগোশ বা দুটো তিতির শিকার হয়ে গেলেই রাতের খাদ্য সংস্থান করে পট হান্টারস আমরা ফিরে আসি। রাতে খিচুড়ি খেয়ে বালাপোশ গায়ে দিয়ে ঘুমোব বলে। সামনের বাঁ দিকের ঘরে পাশাপাশি দুটি নেয়ারের খাটে আমি আর গোপাল শুতাম। সামনের জানালার একেবারে সামনে একটি মস্ত ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা গাছ ছিল। বর্ষাতেই ফুটত সে ফুল। গন্ধে ম-ম করত চারদিক অন্য নানা ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে।

বাঁদিকে ছিল বিরাট হাতাওয়ালা হক সাহেবের বাড়ি। কম করে পনেরো-কুড়ি বিঘা জায়গা ছিল সে বাড়িতে আর ছিল সুপ্রাচীন অনেকগুলি ইউক্যালিপটাস গাছ। অভিনেত্রী মঞ্জু দে কখনো কখনো সসঙ্গী কলকাতা থেকে গাড়ি চালিয়ে এসে সে বাড়িতে বিশ্রাম নিতেন। তবে বাড়ির বাইরে তাঁকে বিশেষ দেখা যেত না। আর হক সাহেবটিও যে কে তা আমাদের জানা ছিল না। তিনি মস্ত বড়োলোক এবং বিহারী মুসলমান এইটুকুই জানতাম শুধু।

ক্যানারি হিল রোডে ছিল রাজপ্রাসাদের মতো কালোরঙা ভূতুড়ে বাড়ি। তার নাম জিব্রাল্টার। হাতা যে কত বিঘার ছিল, তা অনুমান করাও মুশকিল ছিল। গাছগাছালির জন্যে বাড়িটা ভাল করে দেখাও যেত না। বিরাট লোহার ফটক ছিল। বাড়ির ভিতরে কখনো ঢোকাও হয়নি। বর্ষার রাতে ছেঁড়া চাঁদের আকাশে ভিজে হাওয়াতে সপসপ ঝিরঝির করা গাছগাছালির শব্দে আর গন্ধে ওই বাড়ির পাশ দিয়ে বন্দুক হাতে যেতেও গা-ছমছম করত। বন্দুক নিয়েই যেতাম সন্ধের পরে, কারণ কানহারি থেকে অনেক সময়ে চিতা নেমে আসত। আর ওই প্রাসাদের হাতার মধ্যে অনেক খরগোশ ছিল। বাঘও থাকতে পারত। খরগোশেরা কাঁটাতারের বেড়ার নীচ দিয়ে পথে বেরুলে আমরা টর্চ জ্বেলে মারতাম। কী করা যাবে? এবেলা খিচুড়ি ওবেলা খিচুড়ি—স্বোপার্জনের আয়ের সীমার মধ্যে থাকলে ওই অবস্থাই ছিল তখন আমাদের। শিকার হলে মাংস খাওয়া, নচেৎ নয়। লাল মোটর কোম্পানির ডিপো আর পার্ল মোটর কোম্পানির অফিসের কাছের জলের ট্যাংকের নীচ থেকে মাছ কিনতে যাওয়ার অনেক হ্যাপা এবং খরচাও ছিল। তাই রোজ যাওয়া হত না।

সন্ধের পরে বাঙাল ফ্যান্সি স্টোরের নাজিম সাহেব সাইকেলে করে এলেন ভিজতে ভিজতে হ্যান্ডেলে টিফিন ক্যারিয়ার ঝুলিয়ে। তাতে উমদা বিরিয়ানি ও গুলহার কাবাব ও সিনা-ভাজা নিয়ে। এসেই খুব গাল পাড়লেন 'বে-আক্কেলে' বলে। বললেন, ছঁওড়াপুত্তান আপলোগোঁকি আকল কভি নেহি বনেগা। এসে অবধি একটা খবর পর্যন্ত পাঠানো যায়নি?

গোপাল বলল, কাল সকালেই সশরীরে গিয়ে খবর দিতাম, তাই যাইনি।

এদিকে সীতাগড়াতে ম্যানইটার বাঘ বেরিয়েছে সে খবর কি অকলদারদের জানা আছে?

ম্যানইটার বাঘ?

আকাশ থেকে পড়লাম আমরা। কিন্তু ম্যানইটার বাঘ মারব আমরা কী করে? না আছে আমাদের রাইফেল না জিপ গাড়ি না হাতি-ঘোড়া।

এস পি সাহেবের ছেলে আপনাদেরই বয়সি। তারও শিকারের শখ আছে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।

গোপাল বলল, এই যে রাইটার সাহেব। এবারে দেখি তোমার ভাষার জোর। এক চিঠিতেই কাত করতে হবে কিন্তু এক গুলিতে বাঘ মারার মতো।

নাজিম সাহেব আগামীকাল তাঁর দোকানে বিকেলে যেতে বলে আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে নিজে কিছুই না খেয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময়ে পাটনা থেকে আনা, খুব মোটা কাপড়ে মোড়া, যাতে নেতিয়ে না যায়, বাখরখানি রুটি আর শিরমাল দিয়ে গেলেন এবং চারটি পাটনাই ল্যাংড়া আম।

জীবনে যতটুকু শিখেছি, যতটুকু হয়েছি, যদি আদৌ কিছু হয়ে থাকি, তবে তা বাবা-মায়ের, শিক্ষকদের, অধ্যাপকদের, গুরুজনদের শিক্ষাতে যেমন হয়েছি, তেমনই হয়েছি জীবনের পথে চলতে

চলতে নাজিম সাহেবেরও মতো অনেক মানুষের শিক্ষাতে। এই জুতো ও গাদা বন্দুকের ও গুলির দোকানি ইংরেজি না-জানা গরিব নাজিম সাহেবই যখন পরবর্তী জীবনে বড়োলোক হয়েছিলেন, গাড়ি কিনেছিলেন, তাঁর ছেলে আজ্জু মহম্মদ হাজারিবাগ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও হয়েছিল, তখন রাতের বেলা আমরা জিপ চালিয়ে জঙ্গলের বা শহরের পথেও যাওয়ার সময়ে উলটোদিক থেকে অন্ধকার পথে সাইকেল চালিয়ে কেউ এলে আমাদের ধমক দিয়ে বলতেন হেডলাইট ডিমার কিজিয়ে। উও বেচারি তো নাল্লেমে গিড় পড়েগা।

জীবনে অনেক সাইকেল-চড়া বা হেঁটে যাওয়া গরিবকেই বড়োলোক হতে দেখেছি কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই পথচলতি মানুষ বা সাইকেল আরোহীর কথা মনে রাখেন না, বরং তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে বিপদে ফেলে নিজেদের বড়লোকির আনন্দ চিটেগুড়ের মতো চেটেপুটে খান। ইংরেজি ফুটোলেই কেউ শিক্ষিত হয়ে যায় না। প্রকৃত শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অথবা বিত্তর কোনো সম্পর্ক নেই। অশিক্ষিত যে, সে অশিক্ষিতই থাকে সারাজীবন। সেই সব বড়োলোক এবং শিক্ষিতদের আমি অনুকম্পা করি। তাদের প্রতি হয়তো প্রচ্ছন্ন ঘৃণাও পোষণ করি।

নাজিম সাহেব বললেন, গুহা সাহেব তো আপকি জিপ খরিদকে দিয়া। লেতে কিঁউ নেহি আয়া। জিপ রহতে হুয়ে ভি ম্যানইটারকি শিকার বরবাদ হো যায়েগা?

বর্ষাকাল বলে বাবা জিপ নিয়ে আসতে বাবণ কবেছিলেন। জি টি রোডের অবস্থাও জায়গাতে জায়গাতে ভীষণই খারাপ ছিল। তাছাড়া বম্বে রোড তো সেদিন হল। হাজারিবাগে গাড়ি নিয়ে আসতে হলে জি টি রোড ছাড়া আসার উপায় ছিল না। তাছাড়া, এসেছি তো মোটে চারদিনের জন্যে। আগামী সোমবারে কেস আছে আমার ট্রাইব্যুনালে।

গোপাল, নাজিম সাহেবকে ব্যাখ্যা করে বলল আমাব হয়ে। তাছাড়া, ও বলল, হামল্লোগোনে থোরি জানতে থে কি যো আপ ম্যানইটার মজুদ করকে রাখ্‌খা হ্যায়। টেলিগ্রাম কাহে না ভেজ দিহিন ইকঠো?

নাজিম সাহেব বললেন, আমিও কি ছাই জানতাম? জেনেছি তো পরশু।

কটা মানুষ মেরেছে?

মানুষ মেরেছে দুটো। কিন্তু আসল ক্ষতি করছে সীতাগড়া পাহাড়ে যে পিঁজরাপোল আছে তার গোরু-বাছুরদের। দিনে দু-তিনটে করে মারছে। খাচ্ছে না, তবু মারছে।

সে আবার কী? বাঘিনি আছে নাকি সঙ্গে? শো অফ করছে?

না, না। বুড়ো বাঘ। শুনেছি মস্ত বাঘ। এতবড় বাঘ এ তল্লাটে কেউ দেখেনি গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে। কাল সন্ধেবেলা আসুন, আলোচনা করে ঠিক করতে হবে কী করে কী করা যায়।

তারপর সাইকেলে চড়াব আগে বলে গেলেন, খানা হামারা হুঁইয়ে পর। চমনকো বলিয়েগা খানা নেহি বানায়গে।

যেইসা কহিয়েগা আপ।

গোপাল বলল।

কখনো কখনো মনে হয় যে, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত নাজিম সাহেব বিনাস্বার্থে নিছক ভালোবেসে আমাদের যতবার কারণে-অকারণে দাওয়াত দিয়েছেন, ইদ, বকরিইদ, শবেবরাতের খানা ছাড়াও, সেই ঋণ দশবার জন্মালেও শোধ করা যাবে না। এ ঋণ মাতৃঋণ পিতৃঋণেরই মতো। শোধ করা যায় না, স্বীকার করা যায় শুধু।

নাজিম সাহেব চলে গেলে গোপাল বলল, কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়ো। এবার দেখা যাবে তোমার কেরামতি। এস পি সাহেবের ছেলেকে যদি কাত না করতে পারো তো জানব তুমি ছাতার লেখক।

সেটা উনপঞ্চাশ সাল। উনিশশো ছাপ্পান্নতে আমার কবিতা বেরিয়েছে 'দেশ' পত্রিকাতে। উনিশশো সাতান্নতে প্রথম কবিতার বই 'যখন বৃষ্টি নামল' প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চান্নতে, তখন থার্ড ইয়ারে

উঠেছি, গরমের ছুটিতে আলমোড়া গেছিলাম। সেখান থেকে ফিরে জীবনের প্রথম উপন্যাস 'আলমোড়ার চিঠি' লিখেছি এবং বন্ধুদের (গোপাল সুদ্ধু) একদিন পড়িয়েও শুনিয়েছি। তাই মনের মধ্যে একটু গুমোর তো জন্মেছিলই।

বললাম, ঠিক আছে।

পরদিন সকালে চা খাওয়ার পর বাইরের বারান্দাতে কাগজ-কলম নিয়ে বসে লিখে ফেললাম চিঠিটি। যাকে লিখব, তার নাম জানি না। নাজিম সাহেব বলেছিলেন এস পি সত্যচরণ চ্যাটার্জির দুই ছেলে। 'সবিনয় নিবেদন', এই সম্বোধন করে শ্রীসত্যচরণ চ্যাটার্জি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশের প্রযত্নে চিঠিটা লেখা হল। তারপর গোপালের কিছু সাজেশন ঢোকানো হল। তারও পরে তাকে আমার দুর্বোধ্য হাতের লেখার জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে কপি করে গোপালদের মালি করমের হাত দিয়ে দুর্গা দুর্গা করে পাঠানো হল।

চিঠি তো পাঠানো হল পরদিন ভোরেই করম মালিকে দিয়ে। কিন্তু সকাল গেল, দুপুর গেল, উত্তর আর আসে না। গোপাল বারবার করমকে জেরা করতে লাগল চিঠি ঠিকমতো দিয়েছে কি-না, নাকি পুলিশ সাহেবের বাংলোর বাইরের পুলিশি বন্দোবস্ত দেখে ভয়ে সে ভিতরেই ঢোকেনি। করম মালি হলফ করে বলল যে সে যথাস্থানে চিঠি পৌঁছে দিয়েছে।

চিঠি এল না বটে, তবে বিকেল বেলা 'লেম্ব্ উইদাউট ব্রেথ'-এর ছ'ফিট লম্বা একটি ফরসা, বুদ্ধিমান এবং গম্ভীর দর্শন ছেলে, আমাদেরই বয়সি, একটি কালোরঙা ঢাউস মার্কারি ফোর্ড গাড়ি চালিয়ে এসে, গাড়িটা গোপালদের গয়া রোডের বাড়ি 'পূর্বাচল'-এর গেটের বাইরে বাঁদর-লাঠি গাছের ছায়াতে পার্ক করিয়ে রেখে, গেট খুলে ভিতরে এল। আমরা দুই তৃষিত চাতক তখন বারান্দাতেই বসে ছিলাম।

জানা গেল যে, ছেলেটির নাম সুব্রত। সুব্রত চ্যাটার্জি। তার ছোটো ভাইয়ের নাম দেবব্রত চ্যাটার্জি। ডাক নাম মুকুল।

তাঁর জিভের কোনো ষড়যন্ত্রের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে নাজিম সাহেব, তার সঙ্গে পরিচিত হবার পরক্ষণ থেকেই সুব্রতকে 'সুরবোতো' বাবু বলে ডাকতেন। আর আমাকে ডাকতেন, 'লালাবাবু' আর গোপালকে ডাকতেন 'গোপালবাবু' বলে। নাজিম সাহেবের গলার স্বরে কোনো আরোহণ-অবরোহণের বালাই ছিল না। স্টিমারের ভোঁয়েরই মতো। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, গলায় কোনো মড্যুলেশান ছিল না। পরবর্তী সময়ে জঙ্গলের গভীরে কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনো বন-বাংলোয় অথবা যেখানে তা জোটেনি, জঙ্গলেরই মধ্যের গ্রামের কোনো কৃষকের গোয়ালঘরে বা মাটির দাওয়াতে বা অড়হর বা কুলথি খেতে চৌপাই বিছিয়ে উদোম আকাশের নীচে যখন শুয়ে আমরা রাত কাটাতাম তখন পুবের আকাশে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই নাজিম সাহেব দূরের অদৃশ্য মসজিদের থেকে আসা দৈববাণীর মতো অবিরত উচ্চারণ করে যেতেন একইভাবে কম্পনহীন স্বরে, লালাবাবু, গোপালবাবু, সুরবোতোবাবু, উঠিয়ে! উঠিয়ে! উঠিয়ে! গলার স্বরের স্কেলেরও কোনো অদলবদল হত না। সঙ্গে 'পিচ-পাইপ' থাকলে সেই স্বরের গতিপ্রকৃতি হয়তো মাপা যেত কিন্তু সেই ডাক, যতক্ষণ না আমরা চৌপাই ছেড়ে উঠে পড়ছি, ততক্ষণ থামত না।

অন্য প্রসঙ্গে চলে এলাম। নাজিম সাহেবের প্রসঙ্গ এলেই আমার মতিভ্রম হয়। কার্নিক খুলে-দেওয়া ঘুড়ির মতো আমি মাতাল হয়ে গিয়ে টালমাটাল ঘুরতে থাকি মনের আকাশে। উঠতে থাকি, নামতে থাকি, সরতে থাকি, পড়তে থাকি নিজের অজানিতে। একেকজন বা একাধিক মানুষ প্রত্যেক মানুষের

পুনশ্চ : 'আলমোড়ার চিঠি' যদিও পঞ্চান্নের বর্ষাকালে লেখা, বসুমতীর পুজো সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল সত্তরের দশকের শেষের দিকে এবং পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় আশির দশকে। নামটি বদলে করে দিই 'অনুমতির জন্যে'। নায়িকার নাম অনুমতি। এমন আবেগ-সর্বস্ব লেখা সম্ভবত এখন আর চেষ্টা করলেও লিখতে পারব না।

জীবনেই আসেন যাঁদের প্রভাব দুর্মর হয় প্রথমজনের জীবনে। তাই তাঁদের কথা বলতে বসলে আর সে কথা শেষ হয় না।

হাজারিবাগ শহরের জুতো ও গাদা-বন্দুকের দোকানি মহম্মদ নাজিমের সঙ্গে আমার শিক্ষা, দীক্ষা, পারিবারিক পটভূমি ইত্যাদি কোনো ব্যাপারেই কোনো মিল ছিল না কিন্তু হয়তো মনুষ্যত্বের বাবদে ছিল। আমার বাবা ছেলেবেলা থেকে একটি কথা প্রায়ই বলতেন, উপদেশের মতো করে নয়, স্বগতোক্তির মতো করে। সে কথা : মানুষকে মানুষ জ্ঞান করার কথা। বাবার কাছে মানুষের কোনো শ্রেণিবিন্যাস ছিল না। প্রত্যেক মানুষই একই শ্রেণিভুক্ত ছিলেন তাঁর কাছে। কে বড়োলোক, কে শিক্ষিত, কে ইংরেজিতে বা বাংলাতে বা অন্য ভাষাতে পণ্ডিত, এসব ব্যাপার তাঁর কাছে অপ্রধান ছিল। মানুষ, যে-কোনো মানুষই, নিছক মানুষের পরিচয়েই তাঁর কাছে 'যথেষ্ট মানুষ' হিসেবে প্রতিপন্ন হত মানুষ হওয়া ছাড়া, বাবার কাছে ভালো ব্যবহার পাওয়ার জন্যে তাকে অন্য কিছুই হতে হত না। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এই পংক্তি বাবার জীবনদর্শনের মধ্যে দিয়ে যেমন করে হৃদয়ে জেনেছি তেমন করে কোনো দার্শনিক বা পণ্ডিতের বই পড়েও কখনও জানিনি।

হচ্ছিল আমাদের সুব্রত বা নাজিম সাহেবের সুরবোতোর কথা। সুব্রত বলল, ও তার বাবার সঙ্গে আগামীকাল কোডারমাতে যাচ্ছে। বাবা যাচ্ছেন জিপে করে থানা ইনস্পেকশানে, তাই। ও ফিরে আসবে তিনদিনের মধ্যে। ফিরে এসেই যোগাযোগ করবে আমাদের সঙ্গে। কোডারমাতে একটু শিকার-টিকারও করবে। কিন্তু জিপ যে আমরা পেতে পারি এমন কোনো আশার কথা শোনা গেল না—অথচ শুধুমাত্র জিপের লোভেই 'সুরবোতো'বাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেছিলাম আমরা। মধ্যে দিয়ে লাভের মধ্যে লাভ এই হলো যে মানুষখেকো বাঘের খবরটি সুরবোতোবাবুর ট্যাঁকস্থ হয়ে গেল। জেলার পুলিশসাহেবের পুত্র, এই সুবাদে যাবতীয় সুযোগও সে পাবে। অর্থাৎ সীতাগড়ার মানুষখেকো আমাদেব হাতছাড়া হয়ে গেল।

চিন্তাতে পড়ে গেলাম আমরা। যাকে বলে 'হিতে বিপরীত' তাই হয়ে গেল। আমরা ঠিক করলাম যে নাজিম সাহেবকে সঙ্গে করে পরদিন ভোরেই দুজনে সাইকেল রিকশা করে যতদূর যাওয়া যায় গিয়ে তারপর কাঁচা রাস্তা ধরে সীতাগড়ার নীচের পথ ধরে একেবারে বস্তিতে পৌঁছে, যাকে দারোগারা বলে থাকেন 'সরেজমিনে' তদন্ত তাই করে আসব।

কিন্তু পরদিন সকালে চোখ খুলতেই দেখি আরেক বিপত্তি। 'পূর্বাচল'-এর বারান্দা দখল করে তিনজন জিন্স-পরা ছেলে, নগ্ন উর্ধ্বাঙ্গে শুধুমাত্র লোমের-জামা পরে চেয়ারে ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে বসে আছে।

কি ব্যাপার? এই নন্দীভৃঙ্গীরা কারা? না, গোপালের অ্যাকোয়েন্টেন্সেস। কি করতে তাঁদের আসা? না, শিকার করতে আসা। কি শিকার? না বাঘ শিকার। কেন? না হাজারিবাঘ তো হাজার বাঘেরই জায়গা। শব্দটা যে হাজারিবাগ, হাজার বাগিচা, হাজাব বাঘের সঙ্গে যে তার কোনো সম্পর্ক নেই এটুকুও তাদের জানা ছিল না। তাদের মধ্যে একজন, গোপালের অননুকরণীয় ওরিজনাল ভোক্যাবুলারিতে 'একগাছা' দোনলা বন্দুক কিনেছে এবং একগাছা ফ্রেঞ্চ 'সিঁএয়' গাড়ি, এবং অতএব 'দু গাছা' ইয়ার নিয়ে গোপালের 'হাজারিবাঘের' বাড়ির উদ্দেশে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাঘ মারতে।

গোপাল ফিশফিশ করে বলল, গাড়িটাকে কাজে লাগানো যেত কিন্তু এই আগাছা ওপড়ালে যে গাড়িগাছই বেহাত হয়ে যাবে!

অতএব আমরা সেই হরনাথ এবং হরুর দুই চ্যালাকে অন্ধকারে রেখে 'বাজারে যাব' এই বাহানা নিয়ে মাসকাবারি বাজারের বড়ো থলের মধ্যে বন্দুক ভেঙে নিয়ে পুরে সাইকেল রিকশা করে বেরিয়ে পড়লাম। নাজিম সাহেবকে দেখা গেল মাইল দুয়েক যাবার পর। পেছন পেছন তাঁর ঝিং-চ্যাক সাইকেল চালিয়ে গজল গাইতে গাইতে আসছেন। তাঁর পরনে সাদারঙা পায়জামা এবং নীলরঙা ফুলশার্ট, বুকপকেটটি ডায়ারি এবং আরো অগণ্য পুরচা, নামচা, বিলটি ইত্যাদি ইত্যাদিতে তিন ইঞ্চি

ফুলে রয়েছে। পায়ে, বাটার অ্যাম্বাসাডর শু। দু পায়ের ফিতে না বেঁধে পৌঁটলা করে রাখা হয়েছে উপরে জুতো খোলা ও পরার অপার সুবিধের জন্যে এবং কাঁধে ঝুলছে গোরুর খয়েরি রঙা চামড়ার 'ল্যাম্ব লেগ্‌স'-এর মধ্যে দ্বিখণ্ডিত বন্দুক।

মোড়ের মাথাতে একটি ফুলুরির দোকানে নাজিম সাহেবের সাইকেলটি জিম্মা দিয়ে আমরা হেঁটে এগোলাম সীতাগড়া পাহাড়ের পাদদেশের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে-যাওয়া লালমাটির পথ ধরে বস্তির দিকে। আধ মাইলখানেক যাবার পরে পথটি একটি নালার উপর দিয়ে গেছে। কালভার্টের নীচ দিয়ে তার পথ। কিন্তু তখনও বৃষ্টি তেমন হয়নি বলে জল নেই-ই বলতে গেলে। নাজিম সাহেব কালভার্টের উপরে দাঁড়িয়ে ভালো করে নালার দিকে নজর করে নালাতে নেমে গেলেন। আমরাও গেলাম পিছু পিছু। নালার নরম পুরু বালির উপরে বাঘের থাবার ছাপ দেখা গেল। বাঘের থাবা না হাতির পা বোঝা গেল না। পাঠক! আপনারা শুনলে অবাক হবেন হয়তো, হয়তো ভাববেন বাড়িয়ে বলছি। কিন্তু তার আগে এবং পরে এ জীবনে বিভিন্ন জঙ্গলে অগণ্য বাঘের থাবার দাগ দেখেছি, কিন্তু অতবড় থাবার দাগ কখনোই দেখিনি।

গোপাল বলল, সব ধাড়ির সেরা ধাড়ি।

নাজিম সাহেব বললেন, মাদিন নেহি, নর।

গোপাল বলল, মাদিনই হোক কি নর—বলেই তুলসীদাস আবৃত্তি করে দিল :

"সকল পদারথ্ হ্যায় জগমাহী
কর্মহীন নর পাওয়াত নাহি।"

অর্থাৎ এই দুনিয়াতে সব জিনিসই আছে কিন্তু যে কর্মহীন তার জন্যে কিছুই নয়। এই বাঘ মারার সাহস বা সামর্থ্য সে দুয়ের কিছুমাত্রই আমাদের নেই।

আমরা থাবার দাগের দিক ঘিরে সেই অদৃশ্য-পূর্বাপর দৃশ্যর তারিফ করছি আর পেট ভয়ে গুড়গুড় করে উঠছে যেই ভাবছি যার শ্রীচরণেরই এই ছিরি তার 'নুপ' কেমন হবে। এমন সময় প্রাগৈতিহাসিক বনমুরগির মতো কোঁও-ও-ও করে ডেকে একটি প্রাগৈতিহাসিক শুয়োরের মতো ঘোঁতঘোঁত রবে আর্তনাদ করতে করতে গোপালের শাগরেদদের সেই একগাছা সিঁএয় গাড়িটি সমুপস্থিত হল। জিন্‌স ও চকরা বকরা গেঞ্জি পরিহিত তিনগাছা শিকারি একগাছা বন্দুক নিয়ে দমাদ্দম শব্দে গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ে গোপালকে বলল, মাল চেনোনি বিশ্বেশ্বর। আমাদের ফেলে একা একাই বাঘ মারবে চাঁদু?

গোপাল চুপ করে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, বাঘ কী গাছ পাঁঠা যে পাড়লে আর মারলে!

তাদের মধ্যে যে গাড়ি ও বন্দুকের মালিক সে বলল, পেঁয়াজি ছাড়ো গুরু। বাঘ মেরে আমার নতুন 'জেকো' দোনলা বন্দুক বউনি করব।

আরেকজন, তখন পানামা সিগারেট নতুন বেরিয়েছে, কুড়িটির একটি প্যাক পকেট থেকে বের করে একটি সিগারেট তা থেকে বের করে নালার মধ্যে ছুড়ে দিয়ে বলল, নে শালা বাঘ, সিগারেট খা।

একগাছা গাড়ি এবং একগাছা বন্দুকধারী গোপালের তিনগাছা অ্যাকোয়েন্টেন্সের রকমসকম দেখে আমার আত্মা খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হলো।

গোপাল বলল, বাঘের কথা তোমাদের কে বলল?

কে আবার? তোমার খিদমতগার চমনলাল। তাকে তো তোমরা পড়িয়ে এসেছিলে যে, আমাদের বলবে যে তোমরা বাজারে গেছ। কিন্তু সে মাল একটা বড়ো 'পাত্তি' পেয়ে গলগল করে বমি করার মতো সত্যি কথা বলে গেল। সত্যি হজম করা সকলের কম্মো নয়।

আরেক গাছা বেঁটে-নাটা, রোগাপটকা, ছাগল-দাড়ি, কালো-কোলো বলল, বাজে কথা বন্ধ করো। এখন বলো গোপালদা, বাঘের কী হবে?

পাঠক! এই একগাছাকে ভালো করে চিনে রাখুন। পরে এ মঞ্চে আরও বহুবার প্রবেশ করবে। সে এমনই গাছ যে, তার চারা কলকাতাতে পুঁতলে তার গাছ জন্মাবে বর্ধমানে। এই গেছো বা গাছার নাম ভূতনাথ সরকার, ওরফে ভুতো। এর গুণাবলি এবং হাজারিবাগি ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমশ প্রকাশ্য। বহু বছর সে গোপালের ডান হাত ছিল। ক্ষণজন্মা ছেলে। তারপরে অনেক ডান হাতই যেমন স্থানচ্যুত হয়ে জগৎসংসারের সাধারণ নিয়মে অন্য কারো কাঁধের সংযোগস্থলে গিয়ে জমে যায় তেমন ভুতোও তাই হয়ে গেছিল।

কী, কেন, কখন ঘটে তার আলোচনাতে গিয়ে বৃথা কালক্ষেপ না-করে বলব সে সত্যি একটি ক্ষণজন্মা ছেলে। একাধারে গাড়ির মেকানিক, এনটারটেইনার, রেসের জকির শাগরেদ, গেছো বাবা, বেলতলার ন্যাড়া এবং গ্রেট কোম্পানি ছিল। পরবর্তীকালে গোপালের সর্বকনিষ্ঠ অনুজ তিমিরের সঙ্গে ভুতোর ভাগিনেয়ীর বিয়ে হওয়ার পর থেকে ভুতো গোপালের সঙ্গে বেয়াই-বেয়াই খেলতে যাওয়ায় সম্পর্ক একটু আলগা হয়ে যায় ওর সঙ্গে। তবে আমাদের সঙ্গে একইরকম আছে। যদিও সে এখন ডুমুরের ফুল।

গোপাল বলল, তোমরা গাড়ি নিয়ে চলে যাও সীতাগড়া বস্তিতে। সেখানে মাহাতোর কাছে গিয়ে বোসো গাছতলার ছায়াতে পাতা চৌপাইতে, জলটল খাও, আমরা পৌঁছোলাম বলে। তারপর গিয়ে সব আলোচনা হবে।

প্রথম গাছা বলল, প্রমিস?

গোপাল বলল, প্রমিস।

আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম যে দুপুরে এসে সীতাগড়া গ্রাম থেকে একটি কাঁড়া (মোষ) জোগাড় করে ওই নালা যেখানে লাল মাটির পথ কেটে কালভার্টের নীচ দিয়ে সীতাগড়া পাহাড়ের পাদদেশের জঙ্গলে চলে গেছে সেই নালারই কাছে কোনো গাছে মাচা বেঁধে সেই মাচার নীচে মোষ বেঁধে আমরা বসব। তখনই বেলা প্রায় দশটা বাজে। তাই আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।

বাঘের থাবার দাগ দেখেই ভয়ে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। আমার বয়স তখন পঁচিশ এবং গোপালের ছাব্বিশ। রাইফেল আমাদের কাবোরই নেই তখনও। শট গানের রেঞ্জ বেশি নয়। তাছাড়া, হেভি রাইফেলের মতো শক্তিশালীও নয় শট গান। তবে এ কথা ঠিক যে কাছাকাছি থেকে শট গান দিয়ে গুলি করলে, তা সে যে-কোনো ধরনের 'বল' (রোটাক্স, লেথাল, স্ফেরিক্যাল বা কনটাক্ট) দিয়ে অথবা ভালো কোম্পানির, যেমন ব্রিটিশ অ্যালফাম্যাক্সের পৌনে-তিন ইঞ্চি এল জি দিয়ে মারলে তাতে যে ধাক্কা এবং স্টপিং পাওয়ারের উৎপত্তি হয় তা হেভি রাইফেলেরও নেই। রাইফেলের গুলি জানোয়ারের বা মানুষের শরীর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে যায়। তাতে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পটকে যেতে পারে বটে কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী জন্তু, যেমন বাঘ, ভাল্লুক, বাইসন, বড়ো শম্বর, বুনো মোষ ইত্যাদি জানোয়ারকে সঙ্গে সঙ্গে থামাতে বা ফেলে দিতে পারে না। গুলি যদি মোক্ষম জায়গায় না লাগে তাহলে গুলি খেয়েও সে জানোয়ার কয়েক মাইল অবলীলাতে চলে যেতে পারে অথবা নিজে মরার আগে শিকারিকে আক্রমণ করে মেরে ফেলতেও পারে। যাই হোক, যেহেতু আমাদের কারোরই রাইফেল ছিল না এবং নাজিম সাহেবেরও নয়, সুতরাং বন্দুকের গুণ বা দোষ নিয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ ছিল না তখন। আমার বন্দুকটির ছিল বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা ব্যারেল, ডাবল-ইজেকটর, ডাবল-চোক, সাইড লকওয়ালা। পৃথিবীর অন্যতম সেরা বন্দুক, ইংল্যান্ডের W W Greener কোম্পানির। বাবা ইংল্যান্ড থেকে ইমপোর্ট করিয়ে এনেছিলেন। আমার সেকেন্ড লাইসেন্স ছিল। পরে আমার আঠারো বছর হলে আমার নামেই পূর্ণ মালিকানা করে দিয়েছিলেন। বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেল ছিল বলে বন্দুকের রেঞ্জ তিরিশ বা আঠাশ ইঞ্চি ব্যারেলের বন্দুকের চেয়ে অনেকই বেশি ছিল। কিন্তু ওই বাঘ বাবাজিকে দূর থেকে বন্দুক দিয়ে মেরে কিছুই করা যাবে না। একেবারে কাছাকাছি থেকে গুলি করে শরীরের কোনো মোক্ষম জায়গাতে মারতে পারলে অন্য কথা!

কোন্ গাছে মাচা বাঁধা যায় তা ভালো করে নিরীক্ষণ করে নাজিম সাহেব ঠিক করলেন যে একটি আমগাছে মাচা বাঁধান হবে এবং আমরা বিকেল বিকেল এসে সে মাচাতে অধিষ্ঠিত হব। নীচে হৃষ্ট-পুষ্ট সদ্য-যুবক তেল-চুকচুক মোষ বাঁধা থাকবে। বাঘ অবশ্যই আসবে। মোষকে বাঘ মারার আগেই যদি বাঘকে আমরা পটকে দিতে পারি তাহলে তো মামলার নিষ্পত্তিই হয়ে গেল। আর না পারলে যার মোষ তাকে মোষের দাম ধরে দেওয়া হবে। মোষের দাম ধরে দিলেই মোষের যে মালিক তার ক্ষতি অবশ্যই পূরিত হবে কিন্তু তার যে শিশুপুত্র বা কন্যা মোষটিকে নিয়ে জঙ্গলে চরাতে যেত তার বন্ধু-বিয়োগের ব্যথা তার বাবাকে পয়সা দিলেও কিছুতেই ঘোচানো যাবে না।

আমাদের দেশের বন-জঙ্গলের মধ্যের ছোটো ছোটো গ্রামের শিশু ও কিশোরদের সঙ্গে গৃহপালিত পশু ও পাখির মধ্যে যে ধরনের সখ্যতা গড়ে ওঠে তার তুলনা নেই। যাঁরা নিজস্ব অভিজ্ঞতাতে তা জেনেছেন তা তাঁরা জানেন। তবে যদি কোনো বাঘ বা বড়ো চিতা যথেচ্ছভাবে গৃহপালিত পশু মারতে থাকে তখন সমস্ত গ্রামবাসী তাদের প্রায় প্রাত্যহিক ক্ষতি সীমিত করবার জন্যে বিনা আপত্তিতে গোরু বা মোষ দিয়ে দিতে রাজি থাকে। অবশ্য অধিকাংশ শিকারিই, সেই গবাদি পশু বাঘে মারলে, যথেষ্ট টাকা দিয়ে মালিকের ক্ষতিপূরণ করে দেন।

ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা সীতাগড়া গ্রামের দিকে এগোলাম মাহাতোর সঙ্গে মাচা বাঁধা এবং মোষ নির্বাচন করার বিষয়ে কথাবার্তা বলতে। সেখানে পৌঁছোনোর আগেই দেখি ঝকঝকে করে পালিশ-তোলা কালো সিঁএয় গাড়িখানি সারা গায়ে লাল ধুলোর পাউডার মেখে ফিরে আসছে। আমাদের দেখে গাড়ি দাঁড়াল।

গোপাল বলল, কী হল? চলে এলে যে!

গাড়ির মালিক যে, পরে তার নাম জেনেছিলাম, তুতুল সেন, বলল, শালা মাহাতো মহা খচ্চর পার্টি।

কেন? কী হল? সে লোক তো খুবই ভালো।

নাজিম সাহেব গোপালের দেওয়া সার্টিফিকেট অথেন্টিকেট করলেন : ফাসক্লাস আদমি উও মাহাতো।

তুতুল নাজিম সাহেবকে তাচ্ছিল্য করে বলল, যেমন আপনারা ফাসকিলাস তেমন সেও ফাসকিলাস। আমরা চললাম। তোমরা এসো।

বাড়ি গিয়ে চমনলালকে তাড়াতাড়ি করে রান্না সারতে বলো, আমরা ফিরেই খেয়ে আবার আসব। তোমরা আসবে না বাঘ মারতে?

তারা সমস্বরে বলল, নো, নোপ্। অমন বাঘ আমরা মারি না। ও বাঘ তোমাদেরই যোগ্য—ফাসকিলাস শিকারিরা ফাসকিলাস বাঘ মারবে।

অতটুকু সময়ের ভিতরেই ওদের মধ্যে একজন জানালা দিয়ে একটি পানামা সিগারেট ছুড়ে দিল জঙ্গলে—বলল, নে বাঘ! খাস তো বিড়ি। নতুন বেরুনো পানামা সিগারেট খেয়ে মুখ বদল করে নে।

সিঁএয় গাড়ি তার আজব আরোহীদের নিয়ে লাল ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। যাবার সময়ে একজন চেঁচিয়ে বলে গেল, বিয়ার নিয়ে যাচ্ছি বাজার থেকে। বেশি দেরি কোরো না।

গোপাল বলল, আমরা খাই না।

ন্যাকা খোকা। তোমরা নাই বা খেলে। আমরা খাই। শাকিলের দোকান থেকে বিরিয়ানিও কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

নাজিম সাহেব স্বগতোক্তি করলেন, শাকিল লাল মোটর কোম্পানির বাসগুলোর ছ দিনের পোড়া মবিল দিয়ে বিরিয়ানি রাঁধে। ও বিরিয়ানি আপনারা ভুলেও খাবেন না ; খেলে পেটের বল-বিয়ারিং সব জ্যাম হয়ে যাবে।

আমরা হাসলাম। তবে সিঁএয়ের আরোহীরা সে হাসি শুনতে পেল না।

সত্যিই আমরা সেই সময়ে ওই সব খেতাম না। বাবার পয়সাতে নেশা করার মতো শিক্ষা আমরা পাইনি। আমার এবং গোপালেরও সামান্য মাইনে থেকে আমার পাইপের টোব্যাকো এবং গোপালের সিগারেট হয়ে যেত। মদ বা সিগারেট আমার বাবা একেবারেই খেতেন না এবং খাওয়া পছন্দও করতেন না। গোপালের বাবা ছিলেন বিলেতের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, খুবই শৌখিন মানুষ। উনি খেতেন, তবে পরিমিত। সন্ধেবেলা স্কচ হুইস্কি খেতেন সোডা দিয়ে। মাসিমা তাঁর জন্যে নিজে হাতে, উনি হুইস্কির সঙ্গে খাবেন বলে, কোনোদিন মাছের চপ, কোনোদিন চিকেন বা চিংড়ির কাটলেট এইসব বানাতেন। মাসিমা-মেসোমশাইয়ের মতো শৌখিন, সুরুচিসম্পন্ন, শিক্ষিত এবং উচ্চবিত্ত দম্পতি আমি খুব কমই দেখেছি।

জীবনে প্রথমবার মদ্যপান করেছি যখন তখন আমি পেশাতে প্রতিষ্ঠিত এবং যখন আমার বয়স তিরিশ। তাও আসামের গহন বনে বাঘ মারতে গিয়ে ডাঁশের কামড় খেয়ে যমদুয়ারের বাংলোতে ইনকামট্যাক্সের দুই কমিশনার, কেনেথ এডওয়ার্ড জনসন এবং এফ. এইচ ভল্লিভয় এবং ভুটানি ওয়াংদি সাহেবের ওই পাণ্ডববর্জিত বনে অন্য কোনো ওষুধের অভাবে জোর করে খাওয়ানো সর্বরোগহারী নির্জৌষধি হিসেবেই স্কচ হুইস্কি খাই ঘোরের মধ্যে। তখন প্রতিবাদ করার মতো অবস্থা ছিল না। সে গল্প অন্য গল্প। 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে'র প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত বলেছি। তাই এখানে উহ্যই থাক।

আমাদের সময়ে মদ খাওয়াটা স্কুল-কলেজের ছাত্রদের 'বাহাদুরি'র মধ্যে গণ্য হত না। পারিবারিক অনুশাসনও কঠোর ছিল। বাহাদুরি করার মতো আরও অন্য অনেক কিছুই আমাদের জীবনে ছিল। মদ খেয়ে বাহাদুর বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করার কোনো প্রয়োজন আমরা বা আমাদের গুরুজনেরাও বোধ করেননি।

আবার সীতাগড়াতে ফিরে আসি। যখন আমরা হেঁটে হেঁটে পাহাড়তলির দু দিকের গাঢ় সবুজ গাছপালার গায়ে আষাঢ়ের চেকনাই-তোলা ক্লোরোফিল-উজ্জ্বল জঙ্গলের মাঝের লাল মাটির পথ বেয়ে সীতাগড়া বস্তির দিকে যাচ্ছি, পট পট করে বড়ো বড়ো ফোঁটায় মেঘশূন্য আকাশ থেকে রুপোলি তিরের মতো বৃষ্টির ফোঁটা নেমে আমাদের ভিজিয়ে দিল।

নাজিম সাহেব বললেন, রামধনু উঠবে।

গোপাল বলল, শিবঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে।

তার পরেও ছেলেবেলাতে লুকিয়ে-পড়া দস্যু মোহনের উপন্যাসে যেমন থাকত, হঠাৎ কোথা হইতে কী হইয়া গেল আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল এবং প্রবল বর্ষা নামল। কাকভেজা হয়ে আমরা যখন মাহাতোর বাড়ির সামনে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার নীচে চৌপাইতে আমাদের অপেক্ষাতে বসে-থাকা মাহাতোর কাছে গিয়ে বসলাম, তখুনি ঝকঝকে করে মাজা পেতলের লোটা করে ঠান্ডা মিষ্টি জল, স্টেইনলেস স্টিলের গ্লাস এবং রেকাবিতে এখো গুড় নিয়ে খালি গায়ে লাল তাঁতের শাড়ি জড়ানো, পায়ে রুপোর মল ও নাকে পেতলের নথ পরে ওই বৃষ্টির মধ্যেই মাহাতোর নাতনি আমাদের আপ্যায়ন করল। তিন্তিড়ী বৃক্ষটির পাতা এমনই ঠাসবুনোন যে তার নীচে জল একটুও আসছিল না। তাছাড়া মাহাতোর নাতনির আতিথেয়তা গ্রহণ করার পরই বৃষ্টি ছেড়ে গেল। তবে আকাশ মেঘে ঢাকাই থাকল।

মাহাতোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় সামান্যই কিন্তু নাজিম সাহেবের পরিচয় বহুদিনের। পাবলিক রিলেশন কাকে বলে, গ্যাঁটের কড়ি বা অন্য কোনো ক্ষমতার জোর না থাকলেও শুধুমাত্র মুখের মিষ্টি কথাতেই যে জগৎ জয় করা যায়, তা নাজিম সাহেবকে দেখে শিখেছিলাম। সেই শিক্ষা নিজেদের জীবনে কতটুকু লাগাতে পেরেছি তা জানি না। তবে একথা ঠিক, ওই বয়সেই যা শিখেছিলাম নাজিম সাহেবের কাছে তা পরবর্তী জীবনে হায়দরাবাদের ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিট্যুট 'বেলা ভিস্তা'তে কোর্স করেও শেখা সম্ভব ছিল কিনা জানি না। ঈশ্বরের দয়ায় এবং মা-বাবার আশীর্বাদে শিশুকাল থেকেই শেখার ইচ্ছাটা তীব্র ছিল। মানুষ, তা সে রিকশাওয়ালাই হোক, কী পানের দোকানি, কী মোটর

মেকানিক, কী নাজিম সাহেবের মতো জুতোর দোকানি, তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমাদের প্রত্যেকেরই যে শেখার অনেকই আছে এবং সব সময়েই থাকে একথা বাবা আমায় জন্মাবধি শিখিয়ে এসেছিলেন। তাঁর শিক্ষা ছিল, 'মানুষকে মানুষ জ্ঞান করবে। তার ধর্ম, জাতপাত, তার কেতাবি শিক্ষা, তার বিত্ত, তার যশ, তার রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস এসবের কিছুতেই বিভ্রান্ত বা প্রভাবিত না হয়ে প্রত্যেক মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর মনুষ্যত্বের কারণেই সম্মান করবে এবং তাঁর কাছ থেকে যা শেখার তা শিখে নেবে। বই পড়ে মানুষ বেশি কিছু শেখে না। বরং বেশি বই পড়লে তার শিক্ষা বাড়ুক আর নাই বাড়ুক, গুমোর অবশ্যই বাড়ে। আর গুমোর হচ্ছে শিক্ষাভ্রংশতার প্রথম সোপান।'

আমার বাবা যে এইসব কথা আমাকে উপদেশামৃত হিসেবে বা 'বাণী' দিয়ে শিখিয়েছিলেন তা নয়। শিখিয়েছিলেন তাঁর জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে।

নাজিম সাহেব মাহাতোকে বললেন, ক্যা কিয়া থা ভাই তুমনে? কলকাত্তাওয়ালা ভারী শিকারি সব ডরকে মারে দৌড়কে ভাগা হিঁয়াসে! বাত তো খুলকর বোলো ভাই মাহাতো।

এই কথা বলতেই মাহাতো খিলখিল করে হেসে উঠল। এমনই হাসি, যে তার পেটে খিল ধরে গেল। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

তারপর সামলে নিয়ে বলল, ক্যা কহুঁ নাজিম মিঞা। ক্যা কহুঁ। ইতনা মজা বহত সালোঁমে নেহি মিলা।

অব বাতাও তো সহি মাহাতোজি। হুয়া ক্যা থা?

মাহাতো বলল, কুচ্ছো নেহি।

আমরা তাকে চেপে ধরতে সে বলল, বাঘোয়াকা ভাঞ্জ মিলা ক্যা নেহি?

মিলা মিলা। নালহামে মিলা। বহতই বড়া বাঘোয়া। নর বাঘোযা।

তো অব কিজিয়েগা ক্যা?

করেগা ক্যা? খা-পি কর লওটকে আওবেগা। একঠো মাচা বান্ধবে বাখিযে গা জি। অউব এঁক কাঁড়াকি ইন্তেজাম ভি কবকে রাখনা।

হোগা, হোগা। সবহি ইন্তেজাম হো যায়গা।

গোপাল বলল, কিছু টাকা দিয়ে যাই?

টাকা দিয়ে কী হবে; বাঘ মারতে পাবলে সারা বস্তিব লোক আজীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। এ তো শুধু যথেচ্ছ গোরু-মোষই মারছে না, এ যে মানুষও মারছে। যদিও এ পর্যন্ত দু জনকেই ধরেছে একমাসের মধ্যে। এই বস্তিতে আড়াইশো মানুষেব বাস। পুরো বস্তিই তো খতম হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। দয়া কবে বাঘটাকে মেরে দিন, আব কিছুর দবকাব নেই আমাদের। আমি সব বন্দোবস্ত করে রাখব। তবে চারটের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছোবেন। গোটা চারেক কাঁড়ার বন্দোবস্ত আমি করে রাখব। আপনারা পছন্দ করলে তার মালিক আপনাদের সঙ্গে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে মাচার নীচে বেঁধে দেবে।

গোপাল বলল, কাঁড়ার দাম?

বাঘ তো কাঁড়াকে মারার আগেই আপনারা বাঘকে মেবে দেবেন। যদি তা না হয়, যদি কাঁড়াকে মেরেই দেয় বাঘ তখন দামের কথা দেখা যাবে।

মাচা বাঁধবে কোন্ গাছে হে মাহাতোজি?

নাজিম সাহেব শুধোলেন।

আপনিই বলুন।

যে বড়ো আমগাছটা আছে বাঘের চলাচলের পথের পাশে, তাতে বাঁধলে কী হয়?

না। তাতে বাঁধব না। দশ দিন আগে পটকা সিং, কোডারমার অভ্র খাদানের মালিক, ওই গাছেই মাচা বেঁচে বাঘের উপরে গুলি চালিয়েছিল নীচে ঘোড়া বেঁধে।

তারপর?

তারপর আর কী? শিকারির গুলি বাঘের গায়ে না লেগে ঘোড়ার গায়ে লেগেছিল।

বলছ কী?

তা নইলে আর বলছি কী?

তা ঘোড়া পেল কোথা থেকে? এ বস্তিতে তো একটাও ঘোড়া নেই। এতদিন আসছি, কখনো চোখে পড়েনি।

আররে সাহাব, পটকা সিং বন্দোবস্ত করে ঘোড়া কিনে এনেছিল টাটিঝরিয়ার একজন কাঠের কারবারির কাছ থেকে। বহুতই দাম দিয়ে। হায় হায়। না হল পটকা সিংয়ের বাঘ শিকার না বাঘের ঘোড়া খাওয়া। ঘোড়া খেতে বাঘ খুবই ভালবাসে কিন্তু বাঘ তো শিয়াড় বা হুড়ার নয় যে, অন্যের মারা জানোয়ার খাবে।

তারপর?

তারপর আর কী। সেই রাতের পর থেকে হাজারিবাগ তো বটেই, সিলওয়ার সীতাগড়া কানহারির এলাকা থেকে নিয়ে ওদিকে টুটিলাওয়া সিমারিয়া আর এদিকে টাটিঝারিয়া বিষুনগঞ্জ পর্যন্ত পুরো ইলাকাতে পটকা সিংয়ের নাম হয়ে গেছে ঘোড়া-পটকান পটকা।

আমরা হেসে উঠলাম মাহাতোর কথা শুনে।

নাজিম সাহেব বললেন, তাহলে মাচা বাঁধাবে কোন্ গাছে?

আমগাছে। আমগাছটা থেকে চারদিকে নজর চলবে আর মাচা খুব একটা উঁচুতেও হবে না। গুলি করতে অসুবিধা হবে না।

মাহাতো আমাদের গুড় আর জল খাইয়ে বলল, অব যাইয়ে আপলোগোনে। খা-পি কর টাইমপর আইয়ে গা, সমঝে না নাজিমবাবু। পাক্কা চার বাজে আ কর পঁহুছনাহি হোগা। দের করনে সে সব গড়বড়া যায়গা। উস তরফকি টাঁড়োয়া— টাঁড়োয়া হোকর ওহি নাল্লোয়া-নাল্লোয়ামেঁই আতা উ বাঘোয়া। রামজিকি কিরপা হোনেসে আজহি পিটা যায়েগা বাঘোয়া। আভি আইয়ে নাজিমবাবু আপলোঁগ। জয় রামজিকি।

নাজিম সাহেব যে বাবু নয় মিঞা সাহেব—মহম্মদ নাজিম (নাজিমও নয়। তাঁর নামের সঠিক উচ্চারণ জ নয় z। নাzিম। পরশুরামের ‘গড্ডলিকার’ কবিরাজ যেমন করে বলেছিলেন, ‘হয় হয় zানতি পারো না’ সেইরকম z কিন্তু মাহাতোর। কী এল গেল। তারও এল গেল না। নাজিম মিঞারও নয়। এই দেশটার নাম ভারতবর্ষ। একজন সালাম আলায়কুম বলে সম্ভাষণ করে তো অন্যজনে ভালবেসে উত্তর দেয়, জয় রামজিকি! আইয়ে, আইয়ে, পাধারিয়ে। অর্থাৎ আসুন, আসুন পায়ের ধুলো দিন। কে হিন্দু কে মুসলমান কে শিখ তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না। এখন মাথাব্যথা হচ্ছে কারণ ওসামা বিন লাদেনে বনানা হরকত এবং মধ্যপ্রাচ্যের অঢেল টাকা এবং সারা পৃথিবীব্যাপী ইসলামি দুনিয়া প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছে এখন জোর কদমে। সংখ্যালঘুদের মৌলবাদিতার কারণেই এতদিন উদাসীন এবং ঔদার্যর গর্বে গর্বিত সংখ্যাগুরুরা নেহাতই নিজেদের ভবিষতের কথা ভেবেই অন্যরকম ভাবনাচিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

হিন্দুরা আবারও উদ্বাস্তু হয়ে যাবেটা কোথায়? বঙ্গোপসাগরে আর আরব সাগরে ইঁদুরের মতো ডুবে মরা ছাড়া তাদের আর তো কোনো গতি নেই। ভারতের চতুর্দিক ঘেরা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মায়ানমার, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকার অনেকখানি এ সবই তো তাদের কাছে আউট অফ বাউন্ডস।

একদিন হিটলারের অভ্যুত্থান দেখে উইনস্টন চার্চিল যেমন অনেকই দিন আগে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে, ওই একনায়ক সারা পৃথিবীকে গ্রাস করার মতলবে আছে। এখন থেকেই সাবধান না হলে, পরে আর উপায় থাকবে না। তেমনই ওসামা বিন লাদেনের স্বপ্নকে এখনই চূর্ণ না করতে পারলে, সংখ্যালঘুদের মধ্যে সুবুদ্ধি না জাগাতে পারলে, তাদের ভারতীয়ত্বে সংস্পৃক্ত করতে না পারলে হিন্দুদের সত্যি সত্যিই ডুবে মরতে হবে বঙ্গোপসাগরে আর আরব সাগরে। এই আশঙ্কা অমূলক আদৌ নয়।

যাই হোক, আমরা আমাদের যৌবনে ভারতের সব জায়গাতেই সমস্ত ধর্মালম্বীদের মধ্যে যে সম্প্রীতি দেখেছি, যে ভাব-ভালবাসার আদানপ্রদান, তাতেই আমাদের বুক ভরে আছে। ওই পরিবেশ-প্রতিবেশ যারা নষ্ট করতে বসেছে, তারা যে-ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন, ভারতের শত্রু যে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। সেই শত্রুদের উৎপাটন করাটা প্রত্যেক দেশপ্রেমী ভারতীয়রই কর্তব্য। যারা ধর্মভিত্তিক দেশ চেয়েছিল তারাই পাকিস্তান গড়েছিল। ভারতে থেকে যে-কেউ ওইসব খোয়াব দেখবেন তা আদৌ সহ্য করা উচিত হবে না কারোই। মহাপুরুষ আমরা নাই বা হলাম, পরম কাপুরুষ যেন না হই।

ফিরে যাবার সময়ে নাজিম সাহেব আবার মাহাতোকে জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতার গাড়িওয়ালা শিকারিরা অমন করে পালিয়ে গেল কেন এখান থেকে? কী হয়েছিল তো বললে না।

মাহাতো হেসে বলল, সে বলব'খন পরে। এখন তাড়া করুন। মাইলটাক হেঁটে গিয়ে তারপরে তো রিকশা পাবেন।

আমরা এগোলাম। আমরা তখন নওজওয়ান তার উপরে ওইরকম 'ড্যাডি অফ অল ড্যাডিজ' বাঘ মারার সুযোগ নাকের সামনে। আমরা হাঁটা তো লাগালাম না, রীতিমতো উড়েই যেতে লাগলাম।

চারটের মধ্যে সীতাগড়া বস্তিতে গিয়ে পৌঁছোনোর কথা ছিল। কিন্তু হল না।

সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান সাহেব এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে 'ইন্ডিয়া ওজ অলওয়েজ ডিফিটেড ফ্রম উইদিন, নট ফ্রম আউটসাইড'। আমাদের অবস্থাও সেইরকম।

অশেষ গুণসম্পন্ন ওরিজিনাল গোপালের তখন একটা দোষ ছিল। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে পাজামার দড়িটি ঢিলে করে কিছুক্ষণ দিবানিদ্রা না দিলে তার চলত না। কলকাতায় যখন অফিস যেতে হতো তখন অবশ্য এই নিয়ম চালু থাকত না; কিন্তু ছুটির দিনে এবং বাইরে এলে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হবার জো-টি ছিল না।

সেদিন দুপুরের খাওয়ার পরে গোপালকে হাতজোড় করে বললাম যে আজকে দয়া করে 'ক্ষ্যামা' দাও। আজকে তুমি শুয়ে পড়লে চারটের মধ্যে সীতাগড়াতে পৌঁছোনো অসম্ভব। গোপাল তার বাঁ হাতের কালো কোলো পাঁচখানি আঙুল দেখিয়ে ডান হাতের আঙুলে-ধরা সিগারেটে একটি সুখটান দিয়ে বলল, মাথা খারাপ! আমি কি অতই ইবেস্‌পনসিবল?

ফলে, যা হবার তাই হল। ইন্ডিয়া ওজ ওয়ান্স এগেইন ডিফিটেড ফ্রম উইদিন। ঘুম যখন ভাঙল গোপালের, তখন তিনটে বেজে দশ। ওদিকে এই বিপদের সময়ে যে গোপালের সাঙাতদের সিঁএয় গাড়িখানা ধার নেব তারও কোনো উপায় নেই। তারা সারা রাত কলকাতা থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে—তদুপরি সকালের সীতাগড়া অ্যাডভেঞ্চার। ঘটনাটা সীতাগড়ার তিন্তিড়ী বৃক্ষের তলাতে ঠিক কী ঘটেছিল তাও আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু তুতুল সেন, গাড়ির মালিক একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে তার এবং অন্য সাঙাতদের মনোভাব ব্যক্ত করেছিল। বলেছিল : ওই মাহাতো পার্টি খচ্চর-শ্রেষ্ঠ।

যে গ্রামে কোনো ঘোড়াই নেই, সে গ্রামের মাহাতো খচ্চর-শ্রেষ্ঠ কী করে হতে পারে তা নিয়ে গবেষণা করা যেত। করা অবশ্যই হবে। তবে, পরে। কিন্তু সেই রাতজাগা পাখিরা তখন পেটপুরে বিরিয়ানি খেয়ে শুয়েছে এবং কার পকেটে গাড়ির চাবি আছে তাও অজানা। অতএব মনে মনে গোপালের মুণ্ডুপাত করতে করতে 'দুগাছা' বন্দুক হাতে আমরা দুই মূর্তিমান নাজিম মিঞার দোকানে গিয়ে পৌঁছোলাম। দূর থেকেই দেখলাম যে, মিঞা সাহেব ভীষণই উত্তেজিত হয়ে দোকানের সামনে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করছেন। আমরা গিয়ে পৌঁছোতেই গাড়ির হেডলাইটের মতো চোখ দুখানি ক্রমাগত ডিমার-ডিপার হতে লাগল। হাতের সিগারেটটা রাগের সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, "লান্ রে।"

কে আনবে? কী আনবে? কিছু বোঝার আগেই নাজিম সাহেবের বারো নম্বর ছেলে মমতাজ একটি লম্বা দড়ি, যেমন দড়িতে বালতি-বেঁধে কুয়োতে নামানো হয় অথবা গোরুকে খোঁটায় বেঁধে চরতে

দেওয়া হয়, এনে দিল নাজিম সাহেবের হাতে। আমরা লজ্জিত এবং শঙ্কিত মুখে সেদিকে চেয়ে ভাবলাম, আমাদের একসঙ্গে ফাঁসিতে ঝুলোবেন বোধহয় নাজিম সাহেব সামনের শিমুল গাছটি থেকে। কিন্তু সে ভুল ভাঙল যখন পরক্ষণেই তাঁর খিদমতগার আকিল গোরু-মোষের গলায়- বাঁধার পেতলের একটি বড়ো ঘণ্টা নিয়ে এল।

তাঁর জন্যে একরাম রিকশাওয়ালা প্যাডেলে পা দিয়ে, রেডি-গেট-সেট হয়েই ছিল। নাজিম সাহেব বন্দুক, দড়ি-দড়া এবং ঘণ্টা নিয়ে উঠে ধপাস করে বসতেই সে ধড়াধ্বড় পা চালাতে শুরু করল। নাজিম সাহেব মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আর একটু পরে এলেই তো হত। মগরিবের নামাজটাও একেবারে সেরে নিয়েই যেতে পারতাম।

আমরা উত্তর দিলাম না কথার। এমন ভাব করলাম, যেন শুনিইনি।

বাঘের ভয়ে আমাদের রিকশাওয়ালা সীতাগড়া পাহাড়ে যাবার পথের মোড়ে এসে বলল, আর যাব না। সীতাগড়ার মানুষখেকো বাঘের কথা তখন অশিকারি এবং অস্বীকারিদেরও মধ্যে অনেকেই জেনে গেছিল। একজন যখন যাবে না তখন একরামকেও ছুটি করে দিয়ে আমরা প্রায় দৌড়োতে লাগলাম। এমন দৌড়, যাকে সাহেবরা বলেন "রান এগেইনস্ট টাইম"।

যেখানে মাচা বেঁধে রাখার কথা মাহাতোর, সেখানে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। নাজিম সাহেব চকিতে একবার পশ্চিমাকাশে চেয়ে নিয়েই সিদ্ধান্ত নিলেন, "অব ওয়াক্ত নেহি হ্যায় বস্তিমে যানেকা। চড় যাইয়ে মাচানমে।"

নীচে কাঁড়া না বেঁধে শুধুমুদু মাচানে চড়ে কী হবে ভাবছি, এমন সময়ে নাজিম সাহেব আমগাছটির গুঁড়িতে তাঁর বন্দুকটি হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দূরে চলে গেলেন ঘণ্টাটি দড়ির এক প্রান্তে বেঁধে নিয়ে। তারপর দড়িটি যতদূর যায়, ততদূর নিয়ে গিয়ে শালের একটি চারাগাছের ডালে আলগা করে ঘণ্টাটাকে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর দড়ির অন্য প্রান্ত হাতে ধরে ফিরে এসে মাচাতে উঠলেন বন্দুক নিয়ে।

আমরা দুজনেই নাজিম সাহেবের ক্রিয়াকাণ্ড দেখে থ হয়ে গিয়ে মাচাতে উবু হয়ে বসে ততক্ষণে নিজেরাই মগরিবের নামাজ পড়ব বলে তৈরি হয়ে গেলাম, ওজু না করেই। ব্যাপারটা কী যে ঘটতে যাচ্ছে তা ভেবে পেলাম না। একে প্রকাণ্ড মানুষখেকো বাঘ, তায় পড়েছি এক আক্কেলখেকো যবনের হাতে। কী যে ঘটবে আজ জানা নেই। মোচলমানের হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে দুগগা নাম জপতে লাগলাম।

গোপাল বলল ফিশফিশ করে, দ্যাখো, দ্যাখো, বহুরূপে সম্মুখে তোমার। সি.এ পরীক্ষার দুটো গ্রুপে একসঙ্গে বসিয়ে দিলে যদি ওঁর তেল কিছু কমে! উফ্ফ্। একেবারে জাম্পিং-বিন।

সূর্য ডুবতে বসেছে। আজ মনে হচ্ছে সে নিজেই ডুববে না, আমাদেরও ডোবাবে। আকাশে আস্তে আস্তে মেঘ জমছে। সীতাগড়া পাহাড়ের উঁচু শিরদাঁড়াটার জঙ্গলময় শিল্যুয়েট দারুণ দেখাচ্ছে। বারেবারেই বাঘের থাবার দাগটার কথা মনে হচ্ছে। যাঁর 'ছি-চরণই' অমন তাঁর বদনকমলটি কেমন এবং তিনি মুখব্যাদান করলে কেমন দেখাবে সে কথা অনুমান করেই দাঁতকপাটি লেগে যাচ্ছে।

চারদিকে নানা পাখি ডাকছে, সূর্যাস্ত-বেলাতে যেমন ডাকে। তার মধ্যে বনমুরগি আর ময়ূরের ডাক শোনা যাচ্ছে সবচেয়ে জোরে। দূরের সীতাগড়া বস্তিতে কে যেন খুব জোরে কুয়োর লাটাখাম্বাটা ফেলল, তার আওয়াজ এবং কুয়োতলির পাথর-বাঁধানো ঘাটে পেতলের ঘড়া আছড়ে পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। বাঘে কি ধরল কাউকে কুয়োতলিতে? ধরতেও পারে। একদল টিয়া এক স্কোয়ার্ডন মিনিয়েচার মিগ-ফাইটারের মতো তীব্র গতিতে পশ্চিম থেকে পুবে উড়ে গেল। তারপরেই অন্ধকার নেমে এল। প্রথমে ফিকে অন্ধকার। তারপরে ঘোলাটে অন্ধকার। তারপরে প্রায় জমাট বাঁধা অন্ধকার। মনে হল অন্ধকার এতই জমাট বাঁধা যে, চোখ খুলতে গিয়ে চোখের পাতাতে লাগছে, বাধা পাচ্ছে পাতা। আমরা স্থাণুর মতো উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি। শুধুমাত্র উৎকর্ণ বললে সব বলা হয় না। উৎকর্ণ, উন্মুখ, উৎসুক এবং যাবতীয় উঃ।

মাচাটা বেঁধেছে তড়িঘড়ি করে। একে তো তিনজনের বসার পক্ষে বেশ ছোটো তার ওপর মাঝে মাঝে গাছের ডাল সরে যাচ্ছে। তার সঙ্গে আমরাও। সরতে সরতে বেশি ফাঁকা হয়ে গেলে পপাতধরণীতলে হতে হবে বাঘ বাবাজির খাদ্য হয়ে। দুটি মোটা ডালের মাঝখানে আড়াআড়ি করে অন্য গাছের ডাল কেটে এনে সাজিয়ে লতা এবং কাঠের ছাল দিয়ে বাঁধা। ভালোভাবে বাঁধা না-হলে ডাল সরে যেতেই পারে।

নাজিম সাহেব যে কেন গোরুর গলার ঘণ্টা দড়ির অন্য প্রান্তে বেঁধে শালের চারাতে ঝুলিয়ে এলেন তা বোঝা গেল একটু পরে। দড়ি ধরে মাঝে মাঝে টান লাগাতে লাগলেন তিনি। আমরা দুই বোকা তখন বুঝতে পারলাম যে আমাদের দেরি দেখে কেন নাজিম সাহেব ঘণ্টা আর দড়ির ইন্তেজাম করেছিলেন।

এমন সময়ে বৃষ্টি নামল। ঘনান্ধকার অন্ধকারতর হল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থেমে গেল। এবং হাওয়া বইতে লাগল গাছপালা ফুলপাতার ফুলেল গন্ধ এবং মাটির সোঁদা গন্ধ নিয়ে। আবার শুরু হল নাজিম সাহেবের হরকত।

বাঘ যে আমাদের মাচার কাছে আসবে এমন সম্ভাবনা ছিল না যে, তা আমরা জানতাম। যদি বাঘ হয়েও গাধার মতো ওই ঘণ্টার আওয়াজকে, কোনো হারানো গোরু বা মোষের আওয়াজ ভেবে ভুল করে এদিকে চলে আসে, তবেই আমরা গুলি করার সুযোগ পাব। বাঘকে তো আন্দাজে বা ঝুঁকি নিয়ে গুলি করা যায় না। বাঘের দূরত্ব, তার অবস্থান, নিজের নিশানা সব কিছু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে তারপরেই বাঘের উপর গুলি চালান ভালো শিকারিরা। আমরা তো তখন ভালো শিকারি ছিলাম না। পরেও অবশ্য কখনো যে হয়ে উঠেছিলাম এমন দাবিও করি না। তাই আমাদের পক্ষে আরো অনেক সাবধানতা অবলম্বন করার কথা ছিল।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিশফিশ করে নাজিম সাহেব বললেন, জরা বাত্তি ফেঁকিয়ে তো উস তরফ।

মানে, যেদিকে ঘণ্টা বাজছে, সেদিকে টর্চের আলো ফেলতে বললেন।

গোপাল ওর আমেরিকান 'বন্ড'-এর পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো ফেলল ওদিকে। এবং আমাদের স্তম্ভিত করে সেই আলোর ঝরনার মধ্যে সীতাগড়ার মানুষখেকো স্বমহিমায় দেখা দিলেন। তবে দেখা দিলেন যেখানে ঘণ্টা বাঁধা ছিল সেখানে নয়, তা থেকে অনেকই পেছনে, পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো যতদূর যেতে পারে, তারই শেষ প্রান্তে।

কতগুলো খুব বড়ো বড়ো কালো পাথর ছিল সেখানে। যেন কেউ একটার পর একটা সাজিয়ে দিয়েছে। তারই উপরের শিলাসনে বাঘ হাঁটু মুড়ে বসে আমাদের দিকে চেয়ে যেন মৃদু মৃদু হাসছিল। অতদূর থেকে তাকে মহাবলিপুরমের নন্দীর মতো দেখাচ্ছিল—সাদা নন্দী।

গোপালের টর্চের আলো সেই বাঘের মধ্যে কোনো রকম তাপ-উত্তাপের সৃষ্টি করল না। নির্বিকার বসে রইল সে। ভাবলাম, সত্যিই বাঘ তো! পাথরের বাঘ নয় তো! কিন্তু সে নির্বিকার হলে কী হয়, তাকে দেখেই আমাদের বিকার উপস্থিত হল। এত বড়ো বাঘকে আমরা মারবার স্পর্ধা যে দেখিয়েছি মনে মনে, একথা মনে করেই তার দুই গোদা পায়ে হাত ঠেকিয়ে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করল।

নাজিম সাহেবের ঘণ্টা মাঝে মাঝেই টুং টুং করে বাজতে লাগল কিন্তু বাঘ নট-নড়নচড়ন-নট-কিচ্ছু। ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পরে আমাদের মন বলতে লাগল যে, হে বাঘ! তুমি অন্তত ওখান থেকে সরে যাও, যাতে আমরা আমাদের মান-ইজ্জত অটুট রেখে গাছ থেকে নেমে হাজারিবাগে ফিরে চমনলালের খিচুড়ি খেয়ে চাদর মুড়ে এমন বাদলা রাতে আরামে ঘুম লাগাতে পারি। কিন্তু আমাদের বেইজ্জত করার জন্যেই সে যেখানে বসে ছিল সেখানেই বসে রইল। মুখে সেই গোঁফে 'তা' না-দেওয়া মিটিমিটি হাসি।

একাধিক শিকারি একসঙ্গে থাকলে এই বিপদ। একা থাকলে নিজের বেইজ্জতির সাক্ষী শুধু একা নিজেই থাকা যায়!

বাঘ যতদূরে বসে ছিল ততদূরে আমাদের সঙ্গে রাইফেল থাকলেও মারা উচিত হত না। বন্দুকের পাল্লায় মধ্যে তো সে আদৌ ছিল না! রাত যখন প্রায় নটা তখন আমরা ফিশফিশ করে পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে মাচা থেকে নেমে আমরা ফিরে যাব। তারপর দু-একদিন বাদে কাঁড়া বা বলদ মাচার নীচে বাঁধার বন্দোবস্ত করে এই মাচাতেই বসব। তখন হয়তো একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

নাজিম সাহেব বললেন, উতারিয়ে লালাবাবু।

এক হাতে বন্দুক নিয়ে আরেক হাতে গাছের কাণ্ড ধরে নামতে নামতে ভাবছিলাম ভাল্লুকেরা যেমন 'পেছন-প্রথম, মাথা-পরে' করে গাছে ওঠে-নামে তেমন করে নামতে পারলে ভালো হত। আমি প্রথমে নামব আর বাঘমশায় আমাকেই যদি আগে পায়ে ধরেন তাহলে বলার কিছুই আর থাকবে না। তবু ভয় পাওয়া এক কথা আর ভয় পেয়েছি তা স্বীকার করা আরেক। নেমে যখন মাটিতে পা দিয়ে বন্দুক আড়াআড়ি করে ধরে ট্রিগারে আঙুল ছুঁইয়ে দাঁড়ালাম তখন মনে বল এল। ওই গ্রিনার বন্দুকটি দিয়ে আমি মারিনি এমন জানোয়ার নেই। চিতাবাঘ, সম্বর, চিতল, নেকড়ে, বার্কিং-ডিয়ার এবং আরও অগণ্য প্রজাতির পশু। পাখিদের কথা ছেড়েই দিলাম। ওই বন্দুকের কোনো গুলি কোনোদিন ফসকায়নি। বাঘ, তা সে যত বড়োই হোক না কেন, যদি বন্দুকের পাল্লার মধ্যে চেহারা দেখায় তবে এসপার কী ওসপার হয়ে যাবে।

আমরা তিনজনে পরপর নামার পরে তিনজনেই টর্চ জ্বেলে, বন্দুক রেডি-পজিশনে রেখে এগিয়ে গেলাম পাশাপাশি গোরুর ঘণ্টা শালের-চারা থেকে খুলে নিয়ে আসার জন্যে। সেখান থেকে বাঘের শিলাসনটি বন্দুকের পাল্লার মধ্যেই হয়তো ছিল, কিন্তু আমরা গাছ থেকে নামার পরমুহূর্তেই বাঘ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় গেল, তা কে জানে!

কোথায় গেল তা জেনেছিলাম পরদিন সকালে যখন আমরা সীতাগড়াতে মাহাতোর কাছে ক্ষমা চাইতে যাই।

বাঘটা আমাদের পেছনে পেছনে প্রায় বড়ো রাস্তার মোড় অবধি এসেছিল। ঘাড় মটকাবার অভিপ্রায় ছিল কিনা তা সেই বলতে পারে। আমরা যখন ভাবছিলাম যে বাঘ বাবাজি কালো পাথরে গালে হাত দিয়ে বসে কোনো বাঘিনির ধ্যান করছে, ততক্ষণ মাচার উপরে আমাদের হরকত দেখে সেও হয়তো ভাবছিল যে আমরা তিন মক্কেল কোনো উকিলের খোঁজে বৃক্ষারূঢ় হয়ে টর্চ জ্বালছি আব টর্চ নিবোচ্ছি আর কোনো অদৃশ্য গোঁরু বা গরুড়ের লেজ মুলে মুলে তার গলার ঘণ্টায় নিক্কণ তুলছি। তাই, বড়ো দারোগার মতো ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে এসেছিল সে হয়তো। আমরা মাচা থেকে নেমে পাছে তাকে আরও ভালো করে এবং কাছের থেকে দেখতে পাই, সে কারণেই অন্য দশটি বাঘের মতো সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছিল।

রাতের বেলা, তায় দুর্যোগের রাতে, মোড়ে রিকশা পাইনি। পথে আবারও বৃষ্টি নেমেছিল। কাকভেজা হয়ে গয়া রোডে গোপালদের বাড়ি 'পূর্বাচল'-এ ফিরতে কম করে রাত একটা হয়ে যেত যদি না নাজিম সাহেবের ক্যাসাব্লাঙ্কা একরাম আলি বুদ্ধি করে আরেকজন রিকশাওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের 'দিখনেকো লিয়ে' না আসত।

'পূর্বাচল'-এ রাত এগারোটাতে ফিরে দেখি কলকাতার সিঁএর পার্টিরা সব বারান্দাতে বসে আছে। আমরা গিয়ে পৌঁছোতেই উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলল, বাঘ কই? তোমরা একা একা এলে যে বড়ো।

আমরা কিছু বলার আগেই এক একক কণ্ঠ বলল, ভালো হয়েছে। আমরা ইনএক্সপিরিয়েন্সড বলে আমরা মানুষই নই! খুব ভালো হয়েছে। বাঘের পেটে গেলে আরও খুশি হতাম।

আরেকজন বলল, সীতাগড়ার ওই মাহাতোকে তুলে নিয়ে যাব কলকাতাতে যাবার সময়ে।

অন্য একজন বলল, কী করবি?

কিচ্ছু করব না। চৌরঙ্গির মোড়ে নিয়ে গিয়ে একদিকের ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে নিজে অন্য পারে দাঁড়িয়ে বলব, রাস্তা পেরিয়ে আমার কাছে এসো, তোমাকে হাজার টাকা দেব।

হা-জা-র-টা-কা!

সমস্বরে রব উঠল।

আরে সে রাস্তা পেরুতে পারলে তো। সারাদিন দাঁড়িয়েই থাকবে। চৌবঙ্গির মোড়ের ট্রাফিক পেরোতে পারবে! ও আমাদের একটা বাঘ দেখিয়ে বেইজ্জত করেছিল, ওকে হাজার হাজার বাঘের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখব। টাইগার-পাওয়ার দেখাচ্ছে শালা! আমরা হর্স-পাওয়ার দেখাব।

বলেই বলল, একটা দোতলা বাসের ইঞ্জিন কত হর্স-পাওয়ারের রে?

অন্যজন বলল, জানি না।

আমরা আর কথা না বাড়িয়ে বন্দুকের জল মুছে, নিজেদের গা-মাথা মুছে খিচুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ওরা গোপালের উপরে অভিমান করে খায়নি। বরহির মোড়ে গিয়ে জি টি রোডের ধাবাতে রুটি আর আন্ডা তড়কা খেয়ে এসেছিল।

শোবার আগে গোপাল বলল, তোরা শুয়ে পড। পরশু তোদের নিয়ে কোসমাতে তিতির মারতে যাব। নাজিম সাহেবকে বলে সব বন্দোবস্ত পাকা কবে ফেলব। নাজিম সাহেবের নিজের হাতে রাঁধা কাঁচা মুগ ডালের খিচুড়ি, গাওয়া ঘি, আলুকা ভাত্তা আর ডিম সেদ্ধ—আঃ একেবারে অমৃত।

ওরা বলল, ঠিক আছে!

শোবার ঘরে গিয়ে গোপালকে বললাম, আমি কালই রাতে বাস ধরে হাজারিবাগ রোড হয়ে বম্বে মেলে চেপে কলকাতা ফিরে যাচ্ছি।

গোপাল বলল, কেন? কেন?

তুমি যদি পায়জামা ঢিলে করে আজও ঘুমটা না লাগাতে, যদি মোষ বেঁধে বসা যেত আজই, তো বাঘ মারা যেতে পারত। তুমি কোনোদিনও সময়ে যেতে পারবে না, বাঘও কোনোদিনও মারা যাবে না।

বিদ্রূপ-মেশানো গলাতে গোপাল বলল, অ, এই কতা। যাবেই যদি তাহলে কাল সকালের লাল মোটর কোম্পানির বাস ধরেই চলে যাও না। পাঠানকোট-শিয়ালদা পেয়ে যাবে। রাতের বম্বে মেইলে কেন?

আমি বললাম, না, মাহাতোর সঙ্গে কাল দেখা না করে আমি যাব না। কাল তোমার সাঙাতদের কী এমন দাওয়াই মাহাতো দিল তা আমার জেনে যেতেই হবে। একেবারে কেঁচোর মুখে নুন পড়ার অবস্থা করে ছেড়ে দিয়েছে ছেলেগুলোকে! এই রহস্য ভেদ না করে এ যাত্রা হাজারিবাগ ছাড়ছি না।

আর বাঘ! বাঘ যে তোমার জন্যে কাঁদবে।

তুমি আর সুরবোতোবাবু আর গুরু মহম্মদ নাজিম তো রইলেন। তোমরা গিয়ে বাঘের চোখের জল মুছিয়ে এসো টিসু-পেপার দিয়ে।

গোপাল সিগারেটটা শেষ করে চাদরটা টেনে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, কাল কিন্তু নাস্তা করেই বেরিয়ে পড়ব।

বিরক্ত নাজিম সাহেব কাল আমাদের বয়কট যে করবেন সে কথা রাতে যখন ছাড়াছাড়ি হয় দুই রিকশার তখনই বলে দিয়েছিলেন। এই দুই 'হুঁওড়াপুত্তানের' অনিয়মানুবর্তিতাতে তিনি সত্যিই বিরক্ত হয়েছিলেন।

তবে সবরকম নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গেই যে গোপালের সাপে-নেউলের সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে জন্যে আমার সঙ্গে বহুবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে যেতেও হয়নি। হয়নি যে, তা হাজারিবাগেরই মাহাত্ম্য। হাজারিবাগের মতো স্থান-মাহাত্ম্য খুব কম জায়গারই আছে। অমিয় চক্রবর্তী যখন খুবই অসুস্থ হয়ে হাজারিবাগে আসেন হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "তুমি ঠিক জায়গাতেই গেছ—প্রকৃতি জীবনের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধাবাঁধি করে না; সে মন্ত্র পড়ে চুম্বন করে দেয়। তার আদরের অ্যান্টিসেপটিকে না আছে জ্বালা, না আছে কড়া গন্ধ।"

হাজারিবাগ আমার যৌবনের এক বড়ো দুর্বল স্থান। এর জন্যে গোপালের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ ছিলাম এবং আজও আছি, যদিও সে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে প্রায় দশ বছর হতে চলল।

মুখে যাই বলুন না কেন আমাদের প্রতি স্নেহটা অপরিসীমই ছিল মহম্মদ নাজিমের।

পরদিন নাস্তাপানি করে আমরা দুই মক্কেল যখন তাঁর দোকানে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন তিনি আর রাগ করে থাকতে পারলেন না। একরকম তৈরিই ছিলেন। দুটি রিকশা নিয়ে আমরা একরাম আর তার এক দোস্তকে সঙ্গে করে সীতাগড়ার মোড়ের দিকে এগোলাম।

আগেই বলেছি, হাজারিবাগ শহরের তিন দিকে তিন পাহাড়ের পাহারা। তার মধ্যে গোপালদের বাড়ি 'পূর্বাচল' থেকে কানহারিই সবচেয়ে কাছে ছিল তাই কানহারিতেই আমাদের যাতায়াত বেশি ছিল। তাছাড়া সুব্রতদের বাড়ি (ইউক্যালিপটাস গাছের সরণির জন্যে যার নাম ছিল 'দি ইউক্যালিপটা') কানহারি পাহাড়ের পথের কানহারি (ইংরেজি ক্যানারি) রোডের উপরেই পড়ত। ইউক্যালিপটাস সিঙ্গুলার শব্দ। প্লুরেল করলে ইউক্যালিপটা হয়, যেমন ডেটাম থেকে ডাটা। এই 'জ্ঞান'টা আজকালকার ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া কিন্ডারগার্টেনের ছেলেমেয়েদেরও হয়তো আছে কিন্তু মিত্র ইনস্টিট্যুশন আর তীর্থপতি ইনস্টিট্যুশনে পড়া আমাদের ছিল না। পূর্বাচলের পাশের বাড়িতে মি. স্মিথ থাকতেন। তিনিই আমাদের শিখিয়েছিলেন। শেখার কোনো বয়েস নেই—বাবা সবসময়ে বলতেন—চিতায় ওঠার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শেখা যায়, শেখা উচিতও। এই কথাটা আমিও বিশ্বাস করি।

এই স্মিথ সাহেব উচ্চবর্ণের অ্যাংলো- ইন্ডিয়ান ছিলেন। যেমন অনেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরবর্তী সময়ে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে দেখেছি। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকেও স্বাবলম্বন, ভদ্রতা, সহবত আমাদের শেখার ছিল। স্বাধীনতার আগে তাদের মধ্যে অনেকেই যেমন কালো-চামড়া আমাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করেনি, স্বাধীনতার পরে আমাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহাব করিনি। করিনি যে, তার প্রমাণ তাদের দলে দলে ভারত ছেড়ে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যত্র চলে যাওয়া। তবে নানা পশ্চিমি গুণের সঙ্গে তাদের দোষও অনেক ছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল স্বার্থপরতা, বাবা-মায়ের প্রতি অকর্তব্য ইত্যাদি।

আমরা যা-ই শিকার করি না কেন, স্মিথ সাহেবের জন্যে তার থেকে একটু মাংস পাঠাতাম। উনি বৃদ্ধ এবং একা ছিলেন, সে জন্যে ছাল-চামড়া ছাড়িয়েই পাঠাতাম। বিগ গেম এবং স্মল গেম দুইই উনি সমান ভালবেসে খেতেন। হরিণের মাংসের ইংরেজি নাম যে ভেনিসন, ময়ূর-মুরগি যে হোয়াইট-মিট, বাছুরের মাংসর নাম যে ভিল ইত্যাদি স্মিথ সাহেবের সঙ্গে কথায় কথায়ই আমরা শিখি। পরে দুর্গাকাকুর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের নানা চা-বাগানের সাহেবদের সঙ্গে শিকারে গিয়েও অনেক কিছু শিখি যা আগে জানতাম না। তবে তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন স্কটম্যান। তাঁদের ব্যবহৃত অনেক শব্দ ইংল্যান্ডের ইংরেজিতে চলে না, যেমন Wee শব্দটি। স্কটসম্যানরা Wee বলতে ছোটো বোঝায়। ডনাল্ড আর রনাল্ড দুই ম্যাকেঞ্জি ছিলেন তখন বাগরাকোট আর শামসিং বাগানের ম্যানেজার। ডনাল্ড ছিলেন ছ'ফিট দু'ইঞ্চি লম্বা—দৈত্যসমান, আর রনাল্ড ছিলেন পাঁচ ছয়-সাত। তাই দুই ম্যাকেঞ্জির মধ্যে পৃথকীকরণের জন্যে চা-বাগানের ম্যানেজাররা রনাল্ড ম্যাকেঞ্জিকে ডাকতেন Wee Mac বলে।

স্মিথ সাহেবকে আমরা হরিণের কী তিতিরের কী সজারুর কী খরগোশের মাংস পাঠাই বলে উনিও ভদ্রতা করে আমাদের জন্যে নিজে হাতে কেক বেক করে পাঠাতেন। কখনো বা পুডিং, প্লেইন বা ক্যারামেল কাস্টার্ড, চমনলাল যাকে আখ্যা দিয়েছিল 'হাওয়াই পুটিন' বলে।

রিফর্মেটরিতে যাবার পথের মোড়ে একটি নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল—পাটনার এক বিহারী ভদ্রলোকের। বিহার তখনও ঘুষঘাষের এমন স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠেনি। সবে দু'-একজন অসীমসাহসী পুরুষ ঘুষ খেতে আরম্ভ করেছিলেন বলে মনে হয়। পাটনার সেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীর

বাড়িতে যে পরিমাণ খরচ হচ্ছিল তাতে তিনি যে নম্বরি ঘুষখোর সে বিষয়েই কারোর কোনো সন্দেহ থাকার কথা ছিল না। তবে আমরা সে মহাপুরুষকে কখনো চর্মচক্ষে দেখিনি। তাঁর এক দুঃসম্পর্কের মাঝবয়সি আত্মীয় বাড়ি তৈরির দেখভাল করতেন এবং সেই নির্মীয়মান বাড়ির আউট-হাউসেই থাকতেন। ভদ্রলোকের নাম ছিল কণ্ঠেবাবু। ভদ্রলোকের মধ্যে যে মাত্রায় কৌতূহল ছিল তেমন দ্বিতীয় কোনো মানুষ অথবা বন্যজন্তুর মধ্যে দেখিনি। আমরা এলেই, মানে, শোবার ঘরে কী বাইরের বারান্দায় বা ড্রয়িং রুমে আলো জ্বলতে দেখলেই তিনি পরদিন সকালে এসে হাজির হতেন এবং আমাদের জামা, কাপড়, ঘড়ি, টর্চ, বন্দুক, টুপি, জুতো, চটি যাই দেখতে নতুন, প্রশ্ন করতেন, "কিতনামে লায়া?" মানে, কত দিয়ে কিনেছি?

গোপাল সে কারণেই কণ্ঠেবাবুর নাম দিয়েছিল, "মিস্টার কিতনামে লায়া?"

গোপাল বলত, কোনোদিন যদি বা একগাছা বউ জোটেও কপালে, এই 'মিস্টার কিতনামে লায়ার' জন্যে তাকে নিয়ে কোনোদিনও হাজারিবাগে আসা যাবে না। এলেই উনি প্রশ্ন করবেন, কিতনামে লায়া?

এবার আবার সীতাগড়াতে ফিবে আসি।

মোড়ে রিকশাওয়ালাদের থাকতে বলে কাঁচা লালমাটির পথে ঢোকার একটু পরেই পথের উপর দেখতে পেলাম সীতাগড়ার মানুষখেকোর 'ছি চরণের' দাগ। মানে, থাবার দাগ। প্রায় মোড় অবধি সে একবার জঙ্গলের বাঁদিকে আর একবার ডানদিক করতে করতে আমাদের পিছু পিছু এসে আপদেরা সত্যি-সত্যিই বিদায় হল কিনা তা দেখে তারপরই ফিরে গেছে।

আমরা যখন সীতাগড়ার গ্রামে সেই তিন্তিড়ী বৃক্ষর নীচে গিয়ে পৌছোলাম তার একটু পরেই মাহাতো হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে যেন ফিরল, তার পিছু পিছু কয়েকজনকে নিয়ে। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করতেই মাহাতো বিরক্তির সঙ্গে বলল, আপনারা তো ওই বাঘ মারতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে না নাজিমবাবু। যদি না-ই মারতে পারেন তো বলে দিন আমি লোক পাঠিয়ে টুটু ইমাম সাহেবকে খবর পাঠাচ্ছি।

টুটু ইমাম হাজারিবাগের রহিস আদমি। কলকাতাতে তাঁর ঘোড়া রেস খেলে। দিশি-বিদেশি বড়ো বড়ো শিকারিরাও তাঁর কাছে আসেন। একসময়ে একটা শিকার কোম্পানিও খুলেছিলেন। স্বাভাবিক কারণে অমন বিত্তবান, ইংরেজি-শিক্ষিত, হাইলি কানেক্টেড মানুষ মহম্মদ নাজিমের মতো জুতোর দোকানিকে পাত্তা দিতেন না এবং সে কারণেই নাজিম সাহেবের জাতক্রোধ ছিল টুটু ইমামের উপরে। টুটু ইমামের ছেলে বুলু ইমামের সঙ্গে গোপালেরও পরবর্তী জীবনে শিকার-সক্রান্ত নানা ব্যাপারে খটাখটি লেগেছিল। তখন অবশ্য আমি পেশার কাজে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে হাজারিবাগে আসতেই পারতাম না গোপাল নেমন্তন্ন করলেও। তাছাড়া, ওর নেমন্তন্নের রকমটাও ছিল পায়জামার দড়ি ঢিলে করে শুয়ে পড়ারই মতো। রাতে ফোন করে হয়তো বলল, কাল যাচ্ছি হাজারিবাগ, যাবে নাকি? অন্তত দিন পনেরো আগে না-জানালে কোথাওই যাবার উপায় ছিল না আমার। ডায়ারি-ভর্তি কেস, অ্যাপিল, ট্রাইবুনাল থাকত কলকাতাতে এবং বাইরেও নানা জায়গাতে।

গোপাল শেষ 'তিড়ি' মেরেছিল আমাকে সত্তরের দশকের গোড়াতে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে। ফোন করে বলল, ম্যানইটিং লেপার্ড বেরিয়েছে। আমি গাড়িতে রওনা হচ্ছি কাল সকালে। তোমাকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের নোটিশ দিলাম, চলে এসো।

তিড়ি খেয়ে, সারাদিন অফিস করার পরে গাড়ি নিয়ে সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মসের অন্তত বিশ্বাসকে নিয়ে সন্ধে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ে সারারাত গাড়ি চালিয়ে, শেষরাতে আসানসোলের এক হোটেলে ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম নিয়ে যখন হাজারিবাগে পৌছোলাম তখন গোপাল এবং তার কলকাতার শিকারি বন্ধুর দল ছুলোয়া করে ফিরে এল। জানা গেল, লেপার্ড নয়, নেকড়ে বাঘ। এবং

একটা নয়, অনেক। নেকড়ে বাঘেরা একটা সময় হাজারিবাগ আর বড়হির মাঝের নানা গ্রাম থেকে অনেক শিশুকেতুলে নিয়ে যাচ্ছিল। এ সেই সময়কার কথা। পরদিন ডিভিশনাল কমিশনার তরুণ এবং সুন্দর অনুপ মুখার্জি এবং তাঁর সুন্দরী স্ত্রী আমাদের চা খেতে নিমন্ত্রণ করে কী করে এই বিপদ থেকে হাজারিবাগকে উদ্ধার করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করলেন। কলকাতা এবং পাটনার সমস্ত খবরের কাগজে ওই নেকড়ে মানুষ খেকোর খবর তখন প্রকাশিত হয়েছিল অনেকদিন ধরে।

দুদিন থেকেই আমি ফিরে আসি। রাতে অনেক ঘোরাঘুরিও করেছিলাম। লুমরি অথবা খ্যাঁকশিয়াল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি।

যাই হোক, টুটু ইমামের নাম শোনামাত্র নাজিম সাহেব বিড়বিড় করে আরবি-ফারসি মিলিয়ে তার মুণ্ডপাত করতে লাগলেন—গরিব এবং দুর্বলের সবলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রকাশ আর কী!

এই টুটু ইমামেরই মাধ্যমে যাটের দশকের মাঝামাঝি আইভ্যান সুরিটা আমার একটা মস্ত উপকার করেছিলেন। টুটু ইমামের আমেরিকান মক্কেলদের মাধ্যমে পয়েন্ট ফোর সেভেন্টি ফাইভ রাইফেলের অনেক নতুন ঝকঝকে গুলি আমাকে আনিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নিজের ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা আমাকে দেবার পরে।

সে অন্য গল্প। বললে, পরে বলা যাবে।

আমরা, মানে আমি আর গোপাল মাহাতোকে বললাম, আজ বাদ দিয়ে আগামী কাল আমরা আবার আসব তিনটে সাড়ে তিনটেতে। আপনি কাঁড়ার বন্দোবস্ত করে রাখুন।

মাহাতো বলল, এ বাঘোয়া বাঁধা-কাঁড়া খেলে তো। মহা শয়তান। আজই তো সকালে গ্রামের তিন তিনটি দুধেল গোরু মেরেছে। অথচ খায়নি একটিকেও। হয়তো বিকেলেই পিঁজরাপোলের কোনো গোরু-মোষ আবারও মেরে দেবে। ইচ্ছে হলে খাবে, না হলে খাবে না। এইভাবে চলতে থাকলে আমরা তো সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।

নাজিম সাহেব দুহাত তুলে আল্লার কাছে দোয়া মাঙার মতো করে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন বললেন। তারপর মাহাতোকে বললেন, এই বাঘের জিম্মাদারি আমাকে দাও মাহাতো। তোমাব আর কারোকেই ভাবতে হবে না। খোদা কসম।

মাহাতো বলল, ঠিকে হ্যায়। জয় রামজিকি!

মাহাতো ততক্ষণে চৌপাই বের করিয়ে আমাদের বসতে দিয়েছে। গুড় আর জলও খাইয়েছে।

নাজিম সাহেব বললেন, আর তিন-চার দিনের মধ্যে ওই বাঘকে আমার চ্যালারা অবশ্যই পটকে দেবে। বে-ফিক্কর রহো তুম। না মারতে পারলে যত গোরু-মোষ লোকসান হল সবের মূল্য ধরে দেবে।

বলেন কী নাজিম সাহেব! আমাদের নিজস্ব সামর্থ্য তখন কতটুকু? আমরা আঁতকে উঠে নাজিম সাহেবের মুখে চেয়ে রইলাম কিন্তু তবুও চুপ করেই রইলাম।

নাজিম সাহেব চৌপাইতে বসে বললেন, এবারে বলুন তো, গতকাল কী ওষুধ দিলেন আপনি কলকাতার বাঘ-শিকারিদের?

মাহাতো মুচকি হেসে বলল, কী আবার ওষুধ!

আহা! বলোই না বাবা খোলসা করে।

নাজিম সাহেব চেপে ধরলেন।

মাহাতো বলল, ওষুধ-ফষুধ কিছু নয়। ঘটনা যা ঘটেছিল তাই বললাম তাদের।

কোন্ ঘটনা?

মাহাতো বলল, ওরা আমাকে বলল এ বুড়ুয়া, হিঁয়া বাঘোয়া হ্যায় ক্যা? আমি বললাম, বাঘোয়া তো হ্যায় হুজৌর। তারপর আমার কাঁধের কাছে হাত দেখিয়ে বললাম, ইতনা ডাবল-বাঘোয়া। দিখকর দিমাগ খারাব হো যায়েগা।

তারপর বললাম, পইলে কভি বাঘোয়া পিটায়া হ্যায় আপলোঁগোনে?

আরে হাঁ হাঁ। বহত বাঘোয়া মারা সুন্দরবনমে।

তব তো ঠিকেই হ্যায়। বাঘোয়া দিখা দেগা। মগর ইক চিজ পুছনা থা?

কী চিজ?

আপনাদের কি কন্টিপেটাং আছে?

কন্টিপেটাং মানে কী?

তাহলে বলি শুনুন।

মাহাতো বলল, বাঁ হাতের তালুতে খইনি নিয়ে চুন দিয়ে জম্পেস করে ডলতে ডলতে।

নাজিম সাহেব বললেন, উস বাদ? বোলো তো মাহাতো?

হাঁ।

বলে, নীচের ঠোঁটটি উলটে তার নীচে খইনি পুরে দিয়ে বলল, আমি বললাম, কলকাতা থেকে চুনীবাবু নামের এক মস্ত শিকারি এসেছিলেন অনেক বছর আগে। গোলগাল, মোটা সোটা, প্রচণ্ড পয়সাওয়ালা বাবু। তিনিও বলেছিলেন যে সুন্দরবনে অনেক বাঘ মেরেছেন আগে।

তারপর? ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন।

অউর ক্যা। বহত সারা তাম্বু লাগা ইস জঙ্গলমে। নাচনা-গানা ফালানা-ঢামকানা চলতে থে। বাঘোয়াকা লিয়ে বহত বড়কা কাঁড়া বান্ধা গ্যয়া। মাচামে চুনীবাবু বৈঠলবা। অউর সাথমে হাম। চুনীবাবুকি বাঁয়া বন্দুকোয়া, ডাইনে রাইফেলোয়া। সুরজ বুডা নেহি বাবু, ধূপ রহতে রহতেই বাঘোয়া আ গৈলন।

তারপর?

তারপর কী? বাঘোয়া ইম্মে-উম্মে গামাতা, ইম্মে-উম্মে গামাতা। ম্যায় বলিন, মারিয়ে চুনীবাবু, মারিয়ে।

উস বাদ?

উস বাদ ক্যা? না চুনীবাবু বন্দুকোয়া উঠাইস, নাহি রাইফেলোয়া।

উস বাদ?

উস বাদ অচানক অ্যাযসি আওয়াজ হুয়া।

কোথায় আওয়াজ? আমি আর গোপাল সমস্বরে বললাম। কিসের আওয়াজ?

অউর কাঁহা। মাচানকি উপরমে।

কী করে?

আরে সাহাব ব্রিফ আওয়াজহি নেহি সাথমে বদবু ভি। হায়। হায় রামজিকি। ম্যায় তো রোনে লাগা। হ্যায়! হ্যায়! উপরমে চুনীবাবু, নিচু বাঘোয়া, ক্যা করে ম্যায় ছঁওড়াপুত্তানিয়া। খায়ের ওহি আওয়াজ শুন-কর তো বাঘোয়া জবরদস্ত কুদকর ভাগিস অউর সাথহি সাথ ম্যায় ভি তুরন্ত মাচানসে উতার পড়া।

উস বাদ?

উস বাদ ক্যা কহে সাহাব, ক্যা বদবু, ক্যা বদবু। ম্যায় হামারা নাক দাবকর বোলিন, আপ ক্যা কর দিহিস চুনীবাবু-উঁ-উঁ-উঁ। বাঘোয়া আয়া মগর আপন নেহি মারা।

উস বাদ?

চুনীবাবু বোলিন, চুপ রহো হারামজাদে। হামারা ইক মাহিনাসে কন্টিপেটাংকি তকলিফ থা। বাঘোয়া দিখকর হামারা কন্টিপেটাং কিলিয়ার হো গ্যয়ে। ব্যাহেস মত করো, জলদি যাও, পাইজামা লাও।

তারপর মাহাতো বলল, অব কহিয়ে সাহাব আপলোগোঁকি কন্টিপেটাং হ্যায় ক্যা?

প্রথমে নাকি কলকাতার পার্টিরা কন্টিপেটাং জিনিসটা কী তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু সুপার-ইনটেলিজেন্ট ভুতোই প্রথমে কথাটা ক্যাচ করে নিয়ে বলল, চুনীবাবুর কনস্টিপেশান ছেল।

বলামাত্রই অন্য সকলের মুখ চুন। সমস্বরে তারা বলল, ঠিক হ্যায়, হামলোগোনে অব যা রহা হ্যায়। বাদমে আয়েগা।

মাহাতো বলল, বাঘোয়া নেহি মারিয়েগা ক্যা? বোলিনভি তো নেহি আপলোগোঁকি কন্টিপেটাং হ্যায় কি নেহি?

কোনো উত্তর না-দিয়ে দমাদ্দম করে গাড়ির দরজা বন্ধ করে গাড়িতে উঠে তারা পত্রপাঠ বিদেয় নিয়েছিল।

বলাই বাহুল্য, হাজারিবাগে বাঘ মারার আশ তাদের বহুদিনের জন্যে অথবা চিরদিনেরই জন্যে মিটে গেছিল।

সুব্রত পরদিন কোডারমা থেকে ফিরল। 'পূর্বাচল'-এ এসে আমাদের গোরুর দড়িতে ঘণ্টা বেঁধে বসে বাঘ নিধনের অভূতপূর্ব প্রচেষ্টার কথা সহাস্যে শুনল এবং আগামীকাল যে আমগাছে আমরা বসেছিলাম সেই আমগাছেই যে আমরা বসব সে কথা নাজিম সাহেবের নিজমুখে শুনে সে বেলা আড়াইটেতে আগামীকাল 'পূর্বাচল'-এ তাদের ঢাউস কালো মার্কারি ফোর্ড নিয়ে এসে পৌঁছোবে এমন কথাও দিয়ে গেল।

সুব্রত চলে গেলে নাজিম সাহেব বললেন, লাগতা হ্যায় কী উও বাঘ সুরবোতোবাবুনেই পিটায় গা।

আমরা বললাম, কেন?

আপনারা তো আর এখানে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসে থাকতে পারবেন না। সুরবোতোবাবু এখানেরই বাসিন্দা। তায় এস পি সাহেবের ছেলে, তার পক্ষে 'বাকায়দা' এই বাঘ ধড়কে দিতে অসুবিধে হবে না। তার উপরে সুরবোতোবাবুর সঙ্গে টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল হক সাহেবেরও পরিচয় আছে। এস পি সাহেবের ছেলেকে বাঘ মারতে সহায়তা না-করবে এমন বুদ্ধু কে আছে।

গোপাল বলল, সেটা ঠিক।

দেশ তখন সদ্য দশ বছর স্বাধীন হয়েছে। তখনও জনসংখ্যা আজকের মতো এমন বাড়েনি। এমন সার্বিক নৈরাজ্যও আসেনি সর্বত্র। তখনও যে-কোনো জেলার পুলিশ সাহেবের খাতির-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, বিস্তরই ছিল। তাই নাজিম সাহেবের কথা না-মানাব কিছু ছিল না আমাদের।

আমি বললাম, কালই যে আমরা বাঘ মেরে দেব না তা কে বলতে পারে? যদি কাঁড়া বেঁধে বসাই হয় সত্যি সত্যি। এ বাঘের কী আঠা আছে জানি না, তবে মনে হচ্ছে সে আমাদের হাতে মরেই স্বর্গে যেতে চায়।

নাজিম সাহেব বললেন, বাঘ শিকার বলে কথা। শিকারই মরে কি শিকারি তা কী আগে থাকতে বলা যায়! আপনাদের দুজনের কিছু একটা হয়ে গেলে আপনাদের বাবা-মা'র কাছে মুখ দেখাতে পারবে না এই মিঞা। আর সুরবোতোবাবুর কিছু হলে তো কথাই নেই। এস পি সাহেব বেচারি নাজিম মিঞাকেই ধরবেন। বলবেন, খাপ খোলবার জায়গা পাওনি আর। তাছাড়া, এস পি সাহেব কিছু বলার আগে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরাই থানায় ঢুকিয়ে দেবে।

গোপাল বলল, বাঃ। থানায় ঢোকালেই হল? আইন-কানুন বলে কোনো কথা নেই!

নেহি গোপালবাবু। ইয়ে বিহার হ্যায়। থানেদার ছোটা-দারোগা তো পহিলে থানেমে ঘুষাকে, মারেগা গাঁড়পর দো ঠান্ডা, পিছলে বাত।

আমরা হেসে উঠলাম।

নাজিম সাহেব বললেন, কালকে আপনারা বাঘকে মারেন কী বাঘ আপনাদের মারে তার তো ঠিক নেই। তাই আজ বিবিকে বলে এসেছি রাতের খানা আমারই ওখানে। আজ রাতমে ডাটকর খানা খাকে মুতকর, শো যাইয়ে ইতমিনানসে।

কাল কী বাত কালহি সোচা যায়গা।

ইতিমধ্যে হাজারিবাগ পোস্ট অফিস থেকে লাল সাইকেল নিয়ে খাকি উর্দিপরা টেলিগ্রাফের পিয়োন এসে পূর্বাচলের গেট খুলে নুড়ি পাথরে কুরর-কুরর শব্দ তুলে ভিতরে এল।

উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে গোপাল টেলিগ্রামটা নিল হাত বাড়িয়ে। তারপরই আমার দিকে ফিরে বলল, তোমার।

আমি খামটা ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি করে পড়লাম। "Grand mother seriously ill, come sharp"।

তার অনেকই দিন পরে, প্রায় বছর কুড়ি পরে গোপালদের পূর্বাচলে টেলিফোন এসেছিল। আমাদের যৌবনকালে যদিও ইন্টারনেট এবং ই-মেইল ছিল না তবুও আমরা বেঁচেবর্তে ছিলাম। আজকের দিনের চেয়ে অনেক বেশি শান্তিতে ছিলাম। টেলিগ্রামও কেউ কারোকে করলে তা বেশ তাড়াতাড়িই আসত।

টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। ঠাকুমার অসুস্থতার খবরে তো বটেই, এ যাত্রা বাঘ মারা হল না বলেও। যদিও তিন শিকারিতে মিলে শিকার করলে বাঘ তো আমার একার হত না, নাম উঠত He also ran বলে।

যে সময়ে টেলিগ্রামটি এল সেই সময়ে গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড পেরিয়ে সারিয়া হয়ে হাজারিবাগ রোড স্টেশনে ট্যাক্সিতে করে গেলেও পাঠানকোট-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস ধরা যেত না। বাস তো চলে গেছিলই। অতএব ইলাহাবাদ হয়ে আসা রাতের বম্বে মেলই ধরতে হবে বিকেলের বাসে গিয়ে। রাতের নাজিম সাহেবের বাড়ির উমদা দাওয়াতটাও মাঠে মারা যাবে। তবে ঠাকুমা আমাকে ভীষণই ভালোবাসতেন। আমি তাঁর চোখের মণি ছিলাম। কী হঠাৎ হল ঠাকুমার তা ভেবে মনও বড়ো উতলা হল। এদিকে নাজিম সাহেবও আমার মন বুঝে দাওয়াত ক্যানসেল করে দিলেন। বললেন, আপ যব আগলাবার আইয়েগা তব হোগা।

আমি কলকাতাতে ফিরে এলেও গোপাল, সুব্রত এবং নাজিম সাহেব তিনজনে যথাসময়ে আমগাছেরই নীচে মাঝারি সাইজের একটি মোষ বেঁধে তিনজন তিনদিকে মুখ করে বসে রইলেন, আমারই মতো উদগ্রীব, উৎকর্ণ, উন্মুখ এবং যাবতীয় উঃ সহকারে। যাতে বাঘের আগমন তাঁদের নজর না এড়িয়ে যায় এবং মোষের ক্ষতি করার আগেই যেন বাঘকে গুলি করা যায়।

সপ্তাহখানেক বাদে গোপাল কলকাতায় ফেরার পরে গোপালের মুখে যা শুনেছিলাম তা এইরকম।

তিনজনে সজাগ দৃষ্টিতে পাহারা দেওয়া সত্ত্বেও অতবড় বাঘ ওদের চোখে ধুলো দিয়ে নিঃশব্দে এসেছিল এবং এসে মোষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার টুঁটি কামড়ে মাটিতে পটকে দিয়ে টুঁটি মাটিতে ঠেসে ধরে রইল। মোষটা অধঃপতিত অবস্থা থেকে যেই হড়বড়িয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গেল অমনি তার ঘাড়ের কাছের কশেরুকা ছিন্ন হয়ে মেরুদণ্ড ভেঙে গেল।

বাঘ মোষকে পটকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপালবাবু ও সুরবোতোবাবুর সেল্ফ-অ্যাপয়েন্টেড লোকাল গার্জেন মহম্মদ নাজিম পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো ফেলেছিলেন বাঘের ওপরে। মাচা থেকে বাঘ বড়জোর হাত পনেরো দূরে ছিল। গোপাল তড়িঘড়ি বন্দুক তুলে গুলি করল। স্ফেরিক্যাল বল ছিল। এমনই বরাত বেচারির যে, বাঘ আর তার বন্দুকের নলের মুখের মধ্যে আমগাছের একটি সরু ডাল ছিল। বুলেটটি সেই ডালের গায়ে লেগে পিছলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে মোষের গায়ের কাছে মাটিতে গিয়ে পড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মোষকে ছেড়ে বাঘ এক মস্ত লাফে পগার পার। সেই রাতে গোরুর গলার ঘণ্টা নিয়ে টানাটানি-করা ছুঁওড়াপুত্তানেরা যে এমন বদ-রসিকতা করতে পারে তার সঙ্গে তা বোধহয় বাঘ ভাবতেও পারেনি।

তারপর সারারাত পাহাড়তলির গাছে বসে থেকে মশার কামড় খেতে খেতে, বাঘ তার মারা মোষ খেতে আসতেও পারে ওই বদ রসিকতার পরেও, এমন প্রত্যাশাতে থেকে পুবাকাশে আলো ফুটলে তারা ঘটনাটার তদন্ত করল সরেজমিনে।

সুব্রতর তখনও নিজের কোনো বন্দুক রাইফেল ছিল না। সবে বি এসসি পাশ করেছে, চাকরির খোঁজে আছে, বয়সও তো গোপালেরই মতো। আমার চেয়ে ওরা বছর দুয়েকের বড়ো ছিল। নিজের

নামে রাইফেল বন্দুক না থাকলেও সে তো এস পি সাহেবের ছেলে, তাকে ঠেকায় কেডা? মেসোমশাইয়ের পয়েন্ট ফোর-নট-ফাইভ সিংগল ব্যারেল অ্যামেরিকান উইনচেস্টার রাইফেলটি নিয়ে এসেছিল। ওই রাইফেল আমার পিতৃদেবেরও একটা ছিল। ঠিক ওইরকমই। আন্ডার-লিভার। ম্যাগাজিনের বোল্ট ছিল না। ব্যারেলের নীচে একটি লিভার ছিল যেটি টেনে এবং বন্ধ করে গুলি ইজেক্ট করতে এবং রি-লোড করতে হত। কিন্তু তাতে ঘটা-ঘং ঘটা-ঘং করে শব্দ হত বিকট। বোল্ট খুললে বন্ধ করলে শব্দ হয় সব রাইফেলেই কিন্তু বোল্টে ভালো করে তেল দেওয়া থাকলে সেই শব্দ অনেকটাই নরম হয়ে আসে। কিন্তু আন্ডার-লিভার রাইফেলের আওয়াজটা উৎকট। বাঘ বা অন্য বিপজ্জনক প্রাণী শিকার করতে এসে ওই রাইফেল ব্যবহার না করাই ভালো। জানোয়ার যদি প্রথম গুলিতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত না হয় তবে গুলি রিচার্জ করার সময়ে ওই আন্ডার-লিভারের শব্দে শিকারির অবস্থান অবশ্যই সেই আহত প্রাণী জেনে যাবে। শিকারি যদি মাটিতে থাকে তবে সেই আওয়াজে তার প্রাণসংশয়ও হতে পারে।

আমার ঠাকুমা দু দিনেই ভালো হয়ে গেলেন। তাঁর পিত্তথলিতে পাথর ছিল, মাঝে মাঝেই ব্যথা বাড়ত। কিন্তু তখনকার দিনে সার্জিকাল অপারেশানেও নানা বিপত্তি ছিল তাই অপারেশান করানো হয়নি। কিন্তু তখন ঠাকুমার উপরে খুব অভিমান হয়েছিল কারণ ঠাকুমার জন্যেই কলকাতাতে ফিরে আসতে হল।

গোপাল বলল, দেখো, টাইগার-লাক বলে কথা! সুব্রতর তো নিজের বন্দুক পর্যন্ত নেই। ও তো অন্য মিস্টার কন্টিপেটাং। কিন্তু দেখো, অত বড়ো বাঘ হয়তো ওর কপালেই নাচছে। আমরা তো আর বাঘের জন্যে হাজারিবাগে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে পারব না।

যা ভবিতব্য তাই হয়েছিল। কয়েকদিন পরে টুটিলাওয়ার ইজাহারুল হককে সঙ্গে করে একটি নালার পাশের তরুণ শালবনে তড়িঘড়ি বানানো মাচাতে ঘণ্টা দুয়েক আগে মারা একটি সাদা গোরুর মড়ির উপরে দিনে দিনেই ওরা বসেছিল জিপে করে হাজারিবাগ থেকে পৌঁছেই।

মেসোমশাই বলে দিয়েছিলেন মাহাতোকে যে, বাঘের কোনো খবর থাকলেই এস পি সাহেবের বাংলোতে খবর যে আনবে সে সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকা ইনাম পাবে। অতএব খবর পড়তে পেত না। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এস পি সাহেবের কাছে খবব পৌঁছে যেত।

সে বাঘ মারার গল্প পরে। তার বেশ কয়েকবছর পরে, সুব্রত যখন ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভসের গোমিয়ার কারখানাতে সুপারভিসরি পদে আছে তখন একটি বাঘ ম্যাজিক দেখিয়ে ডিনামাইট তৈরির কারখানার দু মানুষ উঁচু কাঁটাতার দেওয়া পাঁচিল টপকে কারখানার ভিতরে যে সুব্রতর হাতে গুলি খেয়ে নরকবাসে যাবে বলে কী করে ঢুকে এল, তা ঈশ্বরই জানেন।

পুরো অঞ্চলে সেই বাঘ মহাত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। কারখানার অতবড়ো কম্পাউন্ড। এক-একটি পাহাড়ের পাশে এক একটি ব্যাটারি। যাতে, দুর্ঘটনা ঘটলে একটি ব্যাটারির উপর দিয়েই যায়, পুরো কারখানা না উড়ে যায়। কারখানার মস্ত বড়ো এলাকা। মধ্যে পিটিসের ঝোপ-ঝাড়, ঝাঁটি জঙ্গল, তাতে মেলাই তিতির, বটের ও খরগোশ। বিস্ফোরকের কারখানার মধ্যে গুলি চালানোর প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গুলি না চালালে বাঘকে মারাই বা যাবে কী করে! এদিকে নাইট-ডিউটিতে কেউই যেতে রাজি ছিল না। তখন বড়োসাহেব, তখনও ইংরেজ বড়ো সাহেব ছিলেন, সুব্রতকে কারখানার কাজ থেকে ছুটি দিয়ে বাঘ মারার জন্যে লাগালেন। তার আগে সুব্রত গোমিয়াতে রাইফেল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে সাহেবদের কাছে সুনাম কিনেছিল। শিকারি হিসেবেও পরিচিতি হয়েছিল তার।

সুব্রত হাজারিবাগ থেকে নাজিম সাহেবকে আনিয়ে নিল। সারাদিন ঘুমিয়ে, গরমের শেষ বিকেলে জিপ নিয়ে, জিপে স্পট-লাইট ফিট করে, সঙ্গে ড্রাইভার এবং নাজিম সাহেবকে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে কারখানার মধ্যে আলো ফেলে ফেলে ঘুরতে লাগল। প্রথম দু রাতে বাঘকে দেখা গেল না। অতবড় এলাকা। বাঘ কারখানার মধ্যে কী করে ঢুকেছিল সেই জানে, (সে নিশ্চয়ই কার্ড পাঞ্চ করিয়ে মেইন-গেট দিয়ে ঢোকেনি কারখানাতে) কে তাকে মই জুগিয়েছিল বা টুল জুগিয়েছিল তাও অজানা। কিন্তু

ভিতরে ঢুকে আসার পরে খাদ্যাভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায়, হয়তো জলাভাবেও, সে আর অত উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে বেরোতে পারেনি। খরগোশ বা তিতির তো বড়ো বাঘের খাদ্য নয়। তাই সে খুবই দুর্বলও হয়ে গেছিল।

যাই হোক সত্যিই সুব্রত টাইগার-লাক আমাদের ঈর্ষা উদ্রেক করত। শিকারের অভিজ্ঞতা তার অবশ্যই আমার এবং গোপালের চেয়ে কম ছিল কিন্তু সীতাগড়ের দশ ফিট ছ ইঞ্চি বাঘটি (Between Pegs) এবং গোমিয়ার আত্মহত্যাকারী বাঘটি সেই তো 'ইতমিনানসে' মেরেছিল।

সীতাগড়ের বাঘকে ওই গুলি করেছিল প্রথমে। মেসোমশাইয়ের সেই ঘটা-ঘং ·৪৫ উইনচেস্টার রাইফেল দিয়ে। বাঘটি গুলি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এসে সেই নড়বড়ে মাচা লক্ষ্য করে সগর্জনে লাফের পর লাফ মারতে থাকে। মাচার যা অবস্থা ছিল তাতে ও কিংবা ইজাহার নীচেও পড়ে যেতে পারত। তবে সেই পুনঃপুন আক্রমণোদ্যত বাঘকে দু জনের রাইফেলের ম্যাগাজিনের সব গুলির নৈবেদ্য সসম্মানে নিবেদন করার পরে বাঘ আবারও অদৃশ্য হয়ে গেছিল।

ঘণ্টা দুয়েক দেখে, মাচা থেকে নেমে জিপে করে তারা হাজারিবাগে ফিরে আসে। পরদিন মাহাতো অনেক লোকজন নিয়ে ছুলোয়ার বন্দোবস্ত করে। পুবে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত আর ইজাহার গিয়ে পৌঁছোয় অকুস্থলে। তবে ছুলোয়ার দরকার হয়নি। বাঘ নালাটির মধ্যেই পড়েছিল শরীরের আধখানা নালার জলে ভিজিয়ে।

অনেকেরই ধারণা, মাচায় বসে বাঘ মারা আর কী বাহাদুরি! বাহাদুরি না হলেও বাঘ মারা কখনোই সহজ নয়। যিনি নিজে বনের বাঘ না দেখেছেন, তার গর্জন না শুনেছেন, তার শক্তির পরিচয় না পেয়েছেন তাঁর পক্ষে বাঘের স্বরূপ জানা অসম্ভব। কত প্রচণ্ড সাহসীরই যে মাচাতে বসেই বাঘের চেহারা দেখেই 'কন্টিপেটাং কিলিয়ার' হয়ে যায় তা যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই জানেন।

আজকে সুব্রত নেই, গোপালও নেই, নাজিম সাহেব তো নেইই। তাই এইসব পুরোনো প্রসঙ্গ, আমাদের যৌবনকালের প্রসঙ্গ এসে পড়লে মন মেদুর হয়ে ওঠে। জঙ্গলে আর শিকারে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তেমন বন্ধুত্ব শহরে কখনোই গড়ে উঠতে পারে না। আমি নিজে জংলি তাই বোধহয় বন-জঙ্গল আর বন-জঙ্গলের বন্ধুদের কোনো বিকল্প আজও খুঁজে পেলাম না।

গতবারে অ্যাকাউন্টস গ্রুপে ফেল করার পরে ধীরে ধীরে একধরনের অবসাদ আমাকে গ্রাস করছিল। তবুও সাতসকালে উঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের সকালের ক্লাসে যোগ দিতে যেতাম। কিছুদিন সকালে ক্লাস করেছি আর কিছুদিন বিকেলে। বিকেল বদলে সকাল করেছিলাম যাতে বিকেলে টেনিসটা খেলতে পারি দক্ষিণ কলকাতা সংসদে। সকালে অফিস করে বাবার উপহার দেওয়া চার হাজার আটশো টাকা দিয়ে কেনা আর্মি-ডিসপোজালের জিপ চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম, তারপর সেখান থেকে অফিসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনেই খেয়ে নিতাম। এখনও সেই ক্যান্টিন আছে কি না জানি না। সামনের অতবড় হেরিটেজ বিল্ডিংটাই যখন ভেঙে ফেলা হয়েছে তখন আরো অনেক কিছু রদবদল হওয়াই সম্ভব। ইচ্ছা থাকলেও সময়াভাবে তারপর আর ওদিকে যেতে পারিনি—মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে। চল্লিশ বছর সময়ও তো পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

আইন কলেজের কোনো কোনো ক্লাস ছিল গ্যালারি দেওয়া। ক্রমশ উঁচু হয়ে যাওয়া বেঞ্চের সারিতে ছাত্ররা বসত—তখন ছাত্রী ছিল নামমাত্র—আর অধ্যাপক, যাঁদের মধ্যে অনেকেই নামী উকিল-ব্যারিস্টার ছিলেন, নীচে প্লাটফর্মের উপরের চেয়ারে বসে পড়াতেন টেবল সামনে নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারটিকে খুব ভালো লাগত। গেলেই ইচ্ছে করত খুব পড়াশুনো করে মস্ত বড়ো পণ্ডিত হই। কিন্তু পণ্ডিত হতে হলে যে সব উপাদান থাকা প্রয়োজন তা আমার ছিল না। তাই এই ঘাসফড়িং মন নিয়ে সারাজীবন 'এতা খাব, ওতা খাব, থব খাব' মানসিকতা নিয়ে এলোমেলো দৌড়োদৌড়ি করে জীবন নষ্ট করলাম। জীবনের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কেউ হওয়া আর হল না। হবে যে তেমন সম্ভাবনাও আর নেই। লালাবাবুর বেলা তো যায় যায়।

পণ্ডিত হওয়ার পথে আরো একটা বাধা ছিল। রবীন্দ্রনাথ কোথায় যেন লিখেছিলেন, "যাঁহারা সমস্ত কিছুই পণ্ড করেন তাঁহারাই পণ্ডিত।" পাছে অনেক কিছু পণ্ড করি সেই ভয়েও পণ্ডিত হবার বাসনা ত্যাগ করেছিলাম। তবে এ কথা ঠিক, বই আমার অন্যতম প্রিয় জিনিস ছিল শিশুকাল থেকেই। বই আর কলম।

পরবর্তী জীবনে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যখন যেতাম তখন কী ভালো যে লাগত তা কী বলব। 'কোয়েলের কাছে', 'পারিধী' (একটি খন্দ শব্দ, যার মানে, মৃগয়া) এবং তার পরেও আরো অনেক বই লেখার সময়ে যখন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বিভিন্ন আদিবাসীদের সম্বন্ধে পড়াশুনো করতে যেতাম, নোটস নিতে, তখন সেই নিস্তব্ধ, বইয়ের গন্ধ-ভরা আবহ আমাকে মুগ্ধ করত। তখন কলকাতাতে এত ভিড় ছিল না বলেই অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরির ক্যান্টিনে শিঙাড়া খেয়ে আবার অফিসে ফিরে আসতাম পাঁচটার মধ্যে। এবং রাত নটা অবধি কাজ করতাম।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির ক্যান্টিনের শিঙাড়া অত্যন্ত প্রিয় ছিল আমার। একটা চাটনি দিতেন ওঁরা সেটিও চমৎকার ছিল। অনেকটা পঞ্চাশের দশকের গোড়ার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ক্যান্টিনের চাটনির মতো।

কোথা থেকে কোথাতে চলে এলাম।

এই ফাঁকে কলমের কথা একটু বলে নিই। ছেলেবেলায় রথে বা বিশ্বকর্মা পুজোতে ঠাকুমা বা অন্য গুরুজনেরা রথ এবং ঘুড়ি কেনার জন্যে টাকা দিতেন। তখন তা দিয়ে ওসব না কিনে পছন্দসই বই, কলম ও খাতা কিনতাম। আগেই বলেছি তখন ঝরনা কলম ছোটোদের ব্যবহার্য ছিল না।

কিন্তু কলমের শখ তখন থেকেই গড়ে উঠেছিল। শখ না বলে বলা ভালো নেশা এবং নেশাও ঠিক নয়, নাশা। নাশা শীর্ষক একটা গল্পও লিখেছিলাম কোনো পুজো সংখ্যাতে এই কলমের নেশা নিয়ে।

জীবনের প্রথম ঝরনা কলম, টেনিস র‍্যাকেটের সঙ্গে বাবাই আমাকে উপহার দেন বরিশালে, উনিশশো ছেচল্লিশে, প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে। তারপর থেকে কলম উপহার পেয়েছি যেমন অজস্র, বিশেষ করে সাম্প্রতিক অতীতে, সারা পৃথিবী থেকে, তেমন নিজেও যখন যেমন পেরেছি সংগ্রহ করেছি। নিজের সাধ্য যথেষ্ট না থাকাতে লন্ডন, নু-ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস, টরেন্টো, মনট্রিল, টোকিয়ো, হনলুলু, দার-এস-সালাম, নাইরোবি, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট ইত্যাদি জায়গার কলমের দোকানের সামনে শো-কেসে লোলুপ দৃষ্টি হেনে দাঁড়িয়ে থেকেছি। ফ্র্যাঙ্কফুর্টে মঁ ব্লাঁ কোম্পানির দোকানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বন্ধু দিলীপ রায়চৌধুরী। ঢুকে এমনই মন খারাপ হয়ে গেছিল যে মনে হয়েছিল একদিন ডাকাতি করে নিয়ে যাব সমস্ত কলম।

যাঁরা সাহিত্য ভালবাসেন, যাঁরা লেখেন, তাঁদের কলমের শখ থাকবে না এ অভাবনীয়। আশ্চর্য! সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কারো কলমের শখ আছে বলে জানি না আমি। তবে অগ্রজদের মধ্যে রমাপদ চৌধুরী এবং বিমল করের আছে। রমাপদবাবু তো প্রতিটি পুজোর উপন্যাস (উনি বছরে একটি উপন্যাসই লেখেন) একটি নতুন ভালো কলমে লেখেন। যখন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেশি ছিল, হাতে সময় অনেক বেশি ছিল, তখন রমাপদবাবুকে পুজোর লেখা শুরু করার আগে সেই নতুন কলমটি আমিই সানন্দে উপহার দিতাম।

ভালো কলম বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ধারণা সীমিত। ভালো কলম বলতে শেফার্স, পার্কার, এভারশার্প, ওয়াটারম্যান এবং খুব বেশি হলে পেলিকান পর্যন্ত বোঝায়। কিন্তু পৃথিবীর রসিক মহলে এসব 'কমনার্স পেন'। কলম বলে মান্যই নয়। পার্কারের মধ্যে তাও লাল, হলুদ এবং কালো মোটা ডুয়োটোন্ড-এর কদর আছে। এখন তারা অ্যান্টিক হয়ে গেলেও পার্কার কোম্পানি ওই ধাঁচেই নতুন মডেল বের করেছেন—যেগুলি আগের থেকে বড়ো এবং ভারী। দামি তো বটেই। আমার ওই কলম একটিও নেই।

ভালো কলম বলতে জার্মানির Mont Blanc। তাদের দশ-বারো হাজারি কলমই সবচেয়ে সস্তা। সবচেয়ে দামি বলতে তিন লাখি কলমও আছে। তবে তা দিয়ে শিক্ষিত মানুষ বা কবি-সাহিত্যিক বিশেষ

লেখেন না। বড়োলোকেরা দলিল-দস্তাবেজ বা চেক সই করে থাকেন অথবা কিছুই না করে শুধু Pride of possession হিসেবেই পকেটে গুঁজে মানুষকে দেখান।

একটি সুইস কলম আছে তার নাম Charandash। চরণদাস চোর এ কলম চেনে না বলে এই কলম যার কাছে আছে তার পকেটমারের ভয় নেই। কিন্তু কলকাতার পকেটমারদের পেন সম্বন্ধে ধারণা আমাকে স্তম্ভিত করে। ওয়াটার্লু স্ট্রিটের মোড় থেকে আয়কর ভবনে আসতে-যেতে এ পর্যন্ত বারো থেকে পনেরো বার আমার পেন পকেট থেকে তুলে নিয়েছে পকেটমার, কিন্তু গর্ব করে বলতে পারি, একবারও পালাতে পারেনি। তখন নিয়মিত খেলাধুলো কবতাম, মাঝে মধ্যেই জঙ্গলে যেতাম—আমার রিফ্লেক্স তখন অত্যন্তই সজাগ ছিল। কোনো পকেটমার পেন নিয়ে পালাতে তো পারেইনি উলটে আমার নিজের হাতে এবং জনগণের হাতে প্রচণ্ড মারও যে খেয়েছে এটাই আনন্দের কথা। কিন্তু পকেটমারদের যারা মারতে মারতে সরিয়ে নিয়ে যায় তারাই তাদের শাগরেদ এ কথা মনে হয়েছে বারবার।

তবে এখন পকেটমারি হলে আর ধরতে পারব না পকেটমারকে। শরীর এত ভারী হয়ে গেছে এবং গতি ও রিফ্লেক্স এত শ্লথ যে তা আর সম্ভব নয়। মনও আর আগের মতন তীক্ষ্ণ ও সজাগ নেই।

ফরাসি দেশীয় একটি বিখ্যাত কলম আছে তার নাম Cartier। 'কলম' বলতে আজকল নানারকম বল পেনও বোঝায়। সমস্ত নামী কোম্পানিরই বিভিন্ন মডেলের বলপেন আছে। রোলার। সাইন-পেন। পেনসিলও করেন অনেকে।

সুইজারল্যান্ডে একটি কলম তৈরি হয়, বিশ্বজোড়া তার নাম—Charandash—একটু আগেই বলেছি। এদের স্টিল, সিলভার এবং গোল্ড তিনটি মডেলে পেন ও বল পেন হয়।

আরো নিশ্চয়ই অনেকরকম ভালো কলম আছে। আমি আর কী জানি, মানে কতটুকু।

অ্যামেরিকান Cross কলমও বিখ্যাত এবং আমেরিকানদের কাছে জনপ্রিয়ও। এরও স্টিল, সিলভার এবং গোল্ড মডেল হয়।

আমার কলমের শখ সম্বন্ধে এখন অনেকেই অবহিত। স্টার টিভি বছর দেড়েক আগে আমার কলমগুলির উপরে একটি স্টোরি করেছিল। মাস দুয়েক আগে বি বি সি-র রাতে 'Money wise" অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিং এবং আমাকে আমাদের কলম সম্বন্ধে ইন্টারভিউ করেছিল।

বাবার সম্পত্তি বলতে বাবার কাছ থেকে একটিই সম্পত্তি আমি নিজমুখে চেয়ে নিয়েছিলাম। বাবার একটি মঁ ব্লাঁ কলম। একদিন অফিস যাওয়ার পথে গাড়িতে বাবা কলমটি তাঁর ব্যাগ থেকে বের করতেই চেয়েছিলাম। এবং বাবাও সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছিলেন। কলমটি হাত থেকে পড়ে ফেটে গেছিল। সযত্নে তাকে রুপোর পাত দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছি। এখনও ব্যবহাব করি।

তবে ভালো কলম কিনলেই বা উপহার পেলেই হয় না, তার যত্ন করতে হয়। প্রতিবার কালি ভরার সময়ে ঠাণ্ডা জলে কলম ধুয়ে নিতে দেখেছি বাবাকে। বাবার অফিসের টেবলে একটি জল ভরা কালিব শিশি থাকত। এসব কাজ অন্যকে দিয়ে কখনও কবাতেন না তিনি। যখন কোনো কলম ব্যবহার না-করতেন তখন তাতে মোটর গাড়ির জন্যে ব্যবহৃত ডিসটিল্ড ওয়াটার ভরে রাখতেন।

বাবারও কলমের খুব শখ ছিল। যদিও লেখালেখি উনি করতেন না তবে গড়ে দিনে দশ-পনেরোটি চিঠি লিখতেন, সবই অবশ্য ইংরেজিতে। বাংলায় বাবা খুবই কাঁচা ছিলেন এবং ইংরেজি প্রায় না-জানা আমার ঠাকুমাকেও ইংরেজিতেই চিঠি লিখতেন। অন্য কেউ পড়ে দিতেন।

এ কথা সবিনয়ে বলতে পারি যে বাবার কাছ থেকে সম্পত্তি বলতে থ্রি সিক্সটি সিক্স Manlicker Schooner রাইফেল, অস্ট্রিয়া থেকে আনানো, ইংল্যান্ড থেকে আনানো রাজা বন্দুক W W Greener-এর DBBL, double choke, double ejector, বত্রিশ ইঞ্চি দোনলা বন্দুক আর জার্মানির Mont Blanc কলমখানি বাবার জীবদ্দশাতেই পেয়েছি। বাবা গত হবার পরে বাবার আলমারি খুলে ভাইয়েরা বাবার সব কলম আমাকে পাঠিয়ে দেয়। আমার Most Prized Possession।

এদিকে বাড়িতে খুবই অশান্তি শুরু হয়ে গেছিল। একজন গায়িকার প্রতি আমার দুর্বলতার কথা মায়ের কানে পৌঁছে দেবার মানুষের অভাব ছিল না। বাবা নিজের কাজ নিয়ে এবং আমাকে জবরদস্তি করে অ্যাকাউন্ট্যান্ট করার জেদ নিয়ে এতই ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকতেন যে এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাঁর ছিল না। মা, বাবাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলতেন না। বাবা যা রাগি মানুষ, শুনলে কুরুক্ষেত্র বাধাবেন এই ভয়েই আমার ভীরু মা সব অশান্তি নিজের বুকেই বয়ে বেড়াতেন।

কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলতে পারি যে আমি অনেকই চেষ্টা করেছিলাম সেই মেয়েকে ভুলে যাবার। কিন্তু যখনই তার গান কানে আসত তখনই আমার যম এসে দাঁড়াত যেন সামনে।

রাসবিহারী অ্যাভিন্যু দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি হয়তো, হঠাৎই পানের দোকানের সস্তা রেডিয়োতে তার গান শুনে দোকানের সামনে পান বা সিগারেট কেনার অছিলাতে দাঁড়িয়ে পড়তাম। পরবর্তী জীবনেও দেখেছি যে শুধু সেই বিশেষ গায়িকার গানই নয়, যে কেউই পুরোপুরি সুরে গান করেন তাঁর গান শুনে আমি চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ি। গানই আমার "Achilese's heel", গান শুনিয়ে, সে গান যদি যথার্থই সুরে গাওয়া হয়, আমাকে বধ করা খুবই সোজা। তবে সুখের বিষয় এই যে, আজকের নানারকম গান, বিশেষ করে ক্যাসেট-বাহী গানের বেনোজলের বন্যায় যখন আমাদের কচুরিপানার মতো ভেসে যাবার অবস্থা হয়েছে তখনও কতজন গায়ক-গায়িকার গলা পুরো সুরে বলে সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। তাই আওয়াজ এবং নানারকম যন্ত্রসংগীতের হুক্কা-হুয়া বন্দিত আওয়াজে কর্ণপটাহ প্রায় বিদীর্ণ হবার জোগাড়; কিন্তু তার মধ্যে যথার্থ গান পদবাচ্য খুব বেশি শুনতে পাই না। তাছাড়া, আমাদের সময়ে, উচ্চাঙ্গ সংগীতের কথা ছেড়েই দিলাম, নিতান্ত লঘুসংগীত এমনকী রবীন্দ্রসংগীতের বেলাতেও শিক্ষানবিশি করাটা রেওয়াজ ছিল। কোনো গুরুই তাঁর ছাত্র-ছাত্রীকে যতদিন না তিনি যথার্থ 'তৈরি' হয়েছে বলে মনে করতেন ততদিন জনসমক্ষে গাইতে দিতেন না। কিন্তু আজকাল হাঁসের বাচ্চা যেমন ডিম ফেটে বেরিয়েই সাঁতার কাটতে শুরু করে, গাইয়েরা গুরুর কাছে একদিন গান শিখেই 'উস্তাদ' হয়ে যায়। অধিকাংশ গুরুদের সঙ্গে গোরুদের তফাতও ক্রমশ কমে আসছে। গান, আগে নিভৃত গভীর এবং রসিক হৃদয়ের শ্রোতার জন্য নিভৃত, লাজুক এবং গম্ভীর গায়কের শ্রবণ এবং হৃদয়ের লেনদেনের ব্যাপার ছিল, এখন বাণিজ্যের সস্তা পসরা হয়ে গেছে। কতজন গুরু এবং গাইয়ের মধ্যে আভিজাত্য আছে এখন তাও প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার। গুরুশিষ্য সকলেই টাকা রোজগারের জন্যে কুস্তিতে নেমে পড়েছেন কাছা গুঁজে। এক-একজন অধুনা রবীন্দ্রসংগীত বা আধুনিক বা জীবনমুখী গানের শিল্পী তিন বছরে যা রোজগার করেছেন তা উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেব বা আমির খাঁ সাহেব বা গিরিজা দেবীরা বা মোহরদি, নীলিমাদি, জর্জদা-রা সারা জীবনে রোজগার করেননি হয়তো। তবে তাঁদের সঙ্গে আধুনিক-আধুনিকাদের তফাত এই যে, তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা এবং রুচি এবং তাঁদের শ্রোতাদের ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা এবং রুচির মধ্যে বিস্তর তফাত হয়ে গেছে। এই তফাতের প্রকৃতি সকলে হয়তো বোঝেন না। তবে যাঁরা বোঝার ক্ষমতা রাখেন তাঁরা বুঝে কষ্ট পান। অগভীরতাই, জুতো জামা শ্যাম্পু লিপস্টিকের সংস্কৃতিই এখন মানুষের কাছে সব হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞাপনের বহর এবং বাহার দেখে মনে হয় এদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি সবই আমাদের করতলগত হয়ে গেছে, যা-কিছু ঘাটতি আছে তা শুধু জামা-জুতো আর প্রসাধন সামগ্রীরই। জাতি হিসেবে আমরা বাঙালিরা যে কী দারুণ উন্নতি করেছি গত পঞ্চাশ বছরে, তা সহজেই অনুমেয়।

থাক এইসব জনহিতৈষী দেশহিতৈষী বড়ো বড়ো ভাবনা, নগণ্য একজন ব্যক্তি আমি, ব্যক্তিগত কথাতেই ফিরে আসি।

আমাদের পরিবারে আমার আগে একজনও ভালবেসে বিয়ে করেননি। না পিতৃপরিবারে, না মাতৃপরিবারে। লাভ ম্যারেজ জলাতঙ্ক রোগেরই মতো আতঙ্কের ব্যাপার ছিল। ট্যাবু। আমার ছোটোকাকা আমার মায়ের এক সুন্দরী মামাতো বোনের প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু গুহঠাকুরতার সঙ্গে

গুহর বিয়ে হতে পারে না এই ফরমানে তাঁদের বিয়ে বাবা-মা এবং ঠাকুমা মিলে নাকচ করে দিয়েছিলেন। আমার সেই দুর্দান্ত কাকা—যিনি কথায় কথায় তাঁকে "জবান সামহালকে বাত কিজিয়ে" বলা কোনো মূঢ় মানুষকে "জবান দিখেগা?" বলেই, জবাব না-দেখিয়ে ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিতেন যখন তখন, সেই তাঁকেই হাউহাউ করে শিশুর মতো কাঁদতে দেখেছিলাম। স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র আমার তখনই বোঝা উচিত ছিল যে ভালবাসাব মতো হাইলি ডেঞ্জারাস ব্যাপারে জড়িয়ে পড়াটা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

কিন্তু করা কী যেত! বুদ্ধিই যদি থাকত তবে আমার বন্ধু দীপকের মা আমাকে চিরদিনই 'বুদ্ধু' বলে ডাকবেন কেন! বুদ্ধদেব হয়তো পোশাকি নাম ছিল। আসলে বুদ্ধু বলেই হয়তো বাবা-মা বুদ্ধদেব হবার সাধনাতে নিয়োজিত করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই তখন বুদ্ধু নামকরণ।

মা হয়তো সে কারণেও বেশি পীড়িত ছিলেন। আদরের ছোটো দেওর যে-কারণে আজীবন অবিবাহিত রয়ে গেল, নিজের ছেলেব বেলাতে সেই কারণেরই ব্যতিক্রম ঘটালে তাঁর মুখ থাকবে কী করে!

মা আরো আশ্চর্য সব কথা বলতেন আমাকে নিবৃত্ত করতে। বলতেন, দ্যাখ খোকন তোর বাবা নতুন বাড়ির শোবার ঘরের মেঝে লালরঙের করেছেন। আমার ফরসা নাতি লাল মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে এ আমার কতদিনের ইচ্ছে।

খারাপ উকিল যেমন প্রায় হেরে-যাওয়া কেস বাঁচাতে অদ্ভুতুড়ে সওয়াল করেন, যা মক্কেলকে যতখানি ইমপ্রেস করার জন্যে বেঞ্চকে ততখানি নয়, তা জেনেও, মায়েব সওয়াল সেরকমই ছিল। কে বা কারা মা'র কানে দিয়েছিল যে, সেই গায়িকা কুরূপা। ভাংচি দেবার মানুষের অভাব তো ছিল না। অনেকেই অনূঢ়া কন্যার পিতৃদেবদের চোখ ছিল আমার উপরে।

মা বলতেন, গান ভালোবাসিস ভালো কথা, তার গাদা-গাদা রেকর্ড কিনে এনে বাড়িতে রেকর্ড শুনবি (তখনও ক্যাসেট বেরোয়নি এদেশে) তার জন্যে গায়িকাকে বিয়ে কবার দরকার কী?

সেভেন্টি এইট আর পি এম রেকর্ডে গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে তখন ঋতুর মাত্র একটি রেকর্ড বেরিয়েছে। একপাশে 'আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে' অন্যদিকে 'আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া'—শুভ গুহঠাকুরতার নির্দেশনায়। সে গান দুটি শুনলে কেয়াগন্ধবতী শ্রাবণ যেন তার উড়াল চুল খুলে গাঢ় বেগনি আর সফেদা-রঙা সম্বলপুরী শাড়ি পরে এসে ঘরের মধ্যে বৃষ্টি নামাত।

মা বলতেন, তুই অফিস থেকে খেটেখুটে রাত আটটা-নটাতে বাড়ি ফিরে দেখলি তোর বউ গান গাইতে গেছে—তোর কি তখন ভাল লাগবে?

আমি চুপ করে রইতাম। বাবা মাত্র একবারই একরাতে বাড়ি ফিরে মাকে দেখতে না পেয়ে তুলকালাম কাণ্ড করেছিলেন—মা সামনের বাড়ির ঘোষ মাসিমার কাছে গেছিলেন। মায়েরা বাবাদের সেবিকা ছিলেন—সঙ্গিনী ছিলেন না যে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের পরিবারের সেই প্রজন্মে তেমন উচ্চশিক্ষা ও আধুনিক মানসিকতা যে ছিল না, সেটা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া ভালো।

ডাক্তার উকিল অ্যাকাউন্ট্যান্ট পুরুষেরা সহজেই হতে পারেন, কৃতবিদ্য ও পরম সফলও তাঁরা হতে পারেন। কিন্তু যে ধরনের শিক্ষা ও মানসিকতা থাকলে তা বাড়ির অন্দরমহলেও চুঁইয়ে যায় তেমন শিক্ষা ও মানসিকতা আমাদের পরিবারে ছিল না। শুধু অর্থ ও ব্যবহারিক জীবনের সাফল্যই কোনো মানুষ বা পরিবারের সার্বিক উন্নতি ঘটাতে পারে না যে, সে কথাটা আজ বুঝি। মা যেমন দেখে এসেছিলেন তেমনই বুঝতেন এবং আমার ভালো চেয়েই আমাকে হেনস্তার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'চোরা না শুনে'ধর্মের কাহিনি'।

মা ঋতুকে না-দেখেই, না-জেনেই অন্য মানুষের কথাতে তাকে বাতিল করে দিলেন বলেই ১৯৫৭-তে যখন আমার প্রথম বই বেরুল, কবিতার বই, নাম 'যখন বৃষ্টি নামল', তাতে একটি কবিতা ছিল ·

"যাচাই করার যন্ত্রণা নেই আর
বাতিল করাই তোমার সহজ হয়
খোকন তোমার নিখাদ সোনায় মোড়া
বোবা মেয়ের একটু সোনা নয়।
ঝড় উঠলেই দৌড়ে যেতাম মাগো
তোমার বুকে, যখন পেতাম ভয়
আজকে খোকন ঝড়ের বুকে একা
ভুল করোনি, জানো কি নিশ্চয়?"

তবে একথা আজ স্বীকার করব যে যে মানুষকে তার পেশা এবং অন্য নানা কাজ (যেমন লেখা) নিয়ে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের প্রত্যেকটি দিনই চোদ্দো থেকে ষোলো ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হয়, তার পক্ষে একজন সামান্য গুণবতী স্বামীগতপ্রাণা রমণীই স্ত্রী হিসেবে শ্রেয়। তার সঙ্গে একথাও বলব যে একজন অশেষ গুণী, সুগায়িকা, সুগৃহিণী, সুমাতা রমণীর পক্ষে আমার চেয়ে অনেকই কম ব্যস্ত একজন পুরুষকে বিয়ে করা তার পক্ষেও অনেকই সুখবহ হত।

জীবন এরকমই। এ এক আশ্চর্য নাটক। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এ নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র আঁচ করা সম্ভব নয়। চলতিকা নাম গাড্ডি। চলতে-চলতে, বুঝতে-বুঝতে, হাসতে-হাসতে, কাঁদতে-কাঁদতে এই নাটকের শেষে এসে পৌঁছোতে হয়। আর সে জন্যেই তো জীবন এত অভিনব, এত ইন্টারেস্টিং। এক জীবনে অনেকই আঁটে। অনেক স্বর, অনেক সুর, অনেক গন্ধ, অনেক রং, অনেক আশা ও হতাশা। অনেক স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গর স্বাদমাখা এ জীবন।

তবে, আজ পঁয়ষট্টি পেরিয়ে এসে বুঝি যে বয়স যত বাড়ে, দাম্পত্য তত মধুর হয়। চলে যাওয়াটা যখন পরম সত্য হয়ে এসে দরজাতে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ে ঠিক তখনই বড়ো ইচ্ছে করে— আহা! আরও কিছুদিন দুজনে মিলে থেকে যেতে পারলে কী ভালোই না হত!

এক রবিবার সকালবেলাতে বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। দোতলাতে উঠে বাবার ঘরে ঢুকতেই বাবা আচমকা কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই বোমা ফাটানোর মতো দড়াম করে বললেন, পাশ করলেই বিয়ে হবে। এইবারে পাশটা করে ফ্যাল। সমস্তই তোর মায়েরই দোষ। তুই যে প্রেমে পড়েছিস, এসবের কিছুই আমাকে জানাননি উনি। আমি তাই ভাবি যে আমার ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ফেল করে কেন। তুই যে প্রেম করছিস সেকথা তো তোর মা আমাকে জানাননি।

সব বাবার কাছেই তাঁর ছেলে ব্রিলিয়ান্ট, তা সে আমার মতো হাবা-গবা হলেও। 'ব্রিলিয়ান্ট' শব্দটি উচ্চারিত হতেই আমি হেঁচকি তুললাম।

মা খাওয়ার ঘরে ছিলেন। বাবার ঘর থেকে বেরোতেই সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে উনি আমাকে ধরলেন। দেখলাম, মায়ের চোখে জল। মা চোখ নামিয়ে বললেন, 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।'

কী বলব আমি। আমার নিজের কারণে, মানে বাবার পুরুষালি ও উদার সিদ্ধান্তর জন্যে গভীর আনন্দ এবং আমার বড়ো স্নেহময়ী মায়ের জন্যে দুঃখ মিলেমিশে গিয়ে আমার দু'চোখ জলে ভরে এল।

সংসারে অনেক ঘটনাই ঘটে যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মানে স্বর্গত তুষারকান্তি ঘোষের কথাতে বলতে গেলে বলতে হয় "বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না"। সেই নভেম্বরেই পরীক্ষা পাশ করলাম। অথচ পরীক্ষা অন্যান্যবারের চেয়ে অনেকই খারাপ দিয়েছিলাম। তার পেছনেও আমার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী পুরুষসিংহ বাবার কোনো নেপথ্য ভূমিকা থাকতে পারে। আমার পরীক্ষার পর বাবা একবার দিল্লি গেছিলেন। সেখানে কোনো স্ট্রিং-পুলিং করেছিলেন কি না জানি না।

অ্যাকাডেমি পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার এবং অন্য তাবৎ পুরস্কারের পেছনে যদি string-pulling থাকে তবে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পরীক্ষার পেছনেও থাকতে পারে। "সত্যই সেলুকাস বিচিত্র এই

দ্যাশ''। আমার ছোটোভাইয়ের প্রথমবার সি এ পরীক্ষার পরও বাবা ওই একইরকম ভাবে দিল্লি ঘুরে আসতে গেছিলেন। আমার ভ্রাতা ফেল করেনি বরং দারুণ নম্বর পেয়ে পাশ করেছিল। এই কৃতিত্ব তার নিজস্বই মনে হয়, তবে আমার পাশ করাটা আমার কাছে অবশ্যই রহস্যময়।

বাবা, রেজাল্ট বেরোনোর পরে ডেকে বললেন, তোর মাকে বলেছি, পুরুত-ঠাকুরকে ডেকে মেয়েদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে বিয়ের তারিখ ঠিক করতে। আর্লিয়েস্ট অ্যাজ পসিবল। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা চলবে না। পার্কের বেঞ্চে বসে অথবা রেস্টোরেন্টে বাংলা সিনেমার নায়ক-নায়িকার মতো নেকু-নেকু প্রেম আমি অ্যালাও করব না।

এখন ভাবি, বিয়ের আগে একটু বেশি মেলামেশা করলে এ বিয়ে হয়তো হতই না। আমাদেব দুজনেরই চণ্ডালের রাগ। রাশিচক্রের পরম অমিল। বিয়েটা শেষমেশ না হলে হয়তো এক আশ্চর্য প্রেমকে আমৃত্যু লালন-পালন করতে পারতাম, আদব করতে পারতাম প্রেয়সীর স্তন অথবা নিজের পুরুষাঙ্গেরই মতো, গভীর, গোপন আনন্দে। বিয়েতে যে প্রেম চরিতার্থ হয় তার প্রকৃতি এক রকমের, আর যে প্রেমে প্রেমিকাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়া হয় না সেই প্রেমের প্রকৃতি একেবারেই অন্যরকম।

পরীক্ষা পাশেব পরে এবং বিয়ের আগে শুধুমাত্র দুদিন দেখা হযেছিল আমাদের। তবে ফোনে কথা হত দিনে-রাতে অগণ্যবার। আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান, ধন্বন্তবি ডাক্তার, ডাক্তার আর এন গুহ একবার আমাকেই শুধিয়েছিলেন, তোমাদের বাড়িতে কেউ প্রেম করে নাকি? ফোন সবসময়েই এনগেজড থাকে দেখি।

আমি বলেছিলাম, খোঁজ নেব।

সেই দু দিনের মধ্যে একদিন ছিল আমার জন্মদিন। ঋতুই বলেছিল, দেখা কবার কথা।

আমাদের পরিবার প্রকৃতার্থেই সাধারণ ছিল এবং বলব, কিছুটা অশিক্ষিত। এই 'শিক্ষা' বলতে আমি অক্ষর পরিচয়ের শিক্ষার কথা বলছি না।

বলছিলাম যে, তেমন কোনো শখ বা সুরুচিকব ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে আমরা বেড়ে উঠিনি। গোগ্রাসে খেয়েছি ভারতের তাবৎ পশুপাখি—যা পয়সা দিয়ে কিনতে পারা যায় এবং যা-কিছু শিকার করে খাওয়া যায়। হাতি ও গন্ডার ছাড়া সব পশুর মাংসই খেয়েছি। আজ পিছন ফিরে মনে করলে গা-ঘিনঘিন করে। এমনকী, বাঘেরও। তবে বাঘের মাংস চিবিয়ে দেখলেও প্রচণ্ড দুর্গন্ধেব কারণে গলাধঃকরণ করতে পারিনি। নেহাত 'খেতে কেমন?' এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়েব জন্যেই খেয়েছি।

আমাদের বাড়িতে জন্মদিন পালনের কোনো বেওয়াজ ছিল না। জন্মদিনে কেউই কোনো উপহার দেননি আমাদের কোনোদিনই। 'ঋভু'র প্রথম খণ্ডে সম্ভবত লিখেছিলাম যে ছোটো পিসিমার হঠাৎ-দেওয়া একটা টাকা দিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনুর ভাড়া বাড়িতে থাকাকালীন প্রায় শৈশবাবস্থাতে আমার এক জন্মদিনে একটি বই কিনে সেই বইয়ের উপরে নিজেই পরম অভিমানভরে লিখেছিলাম ''আমার জন্মদিনে আমাকে দিলাম।' বই ছিল আমার প্রিয়তম জিনিস। তারপরই ছিল কলম।

সময়ের জিনিস সময়ে না হলে, তার দাম থাকে না কোনো। প্রচণ্ড খিদেব সময়ে খেতে না দিয়ে, বেলাশেষে পাঁচপদ সাজিয়ে কাউকে মহা আড়ম্বরে খেতে দিলেও তখন তার পক্ষে কিছুই খাওয়া আর সম্ভব হয় না। রুচিও হয় না। পিত্তি পড়ে যায়। তাই পবিণত বয়সে আমার জন্মদিন নিয়ে কখনো সামান্যতম ঘটা হলেও বড়োই বিব্রত বোধ করেছি এবং আজও করি। 'জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা মরণে তারে কেন দিতে এলে ফুল' এই গানটির কথা মনে পড়ে যায়।

তবে ঠাকুরমার বা মায়ের আমার বা অন্য ভাই-বোনদের জন্মদিনের কথা মনে থাকলে, পায়েস রান্না করতেন আমাদের জন্যে।

আমার সি এ পরীক্ষা পাশের অল্প আগেই আমার দ্বিতীয় বোন ইলার বিয়ে হয়। পাশ করার পরই বাবার ফার্মের অংশীদার হই আমি। যতদূর মনে পড়ে ফেব্রুয়ারির প্রথমে। আর বিয়ের তারিখ ঠিক হয় ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬২। আমার পছন্দমতো একটা ফিয়াট গাড়ি বুক করি অনেকদিন আগে। তখন ফিয়াটের দাম ছিল চোদ্দো হাজার দু টাকা। অ্যাম্বাসাডর আরও সস্তা ছিল। কিন্তু ভগ্নিপতিকে

বাবা একটি গাড়ি দেবেন ইচ্ছে করাতে এবং তারও ফিয়াটই পছন্দ বলে আমার বুকিংটি তাকে দিয়ে দিই। আমার ইচ্ছে ছিল কচিকলাপাতা-রঙা গাড়ি নেব। কিন্তু তখন ফিয়াটের খুবই চাহিদা। দু-তিন বছর অপেক্ষা করতে হত বুক করার পরে। আমার গাড়ির বুকিং প্রায় পেকে এসেছিল। অন্যের নামে নেওয়া যেত, যার বুকিং ছিল, কিন্তু তাতে নাকি দু-তিন হাজার টাকা লাগত। গাড়ির দামই যখন চোদ্দো হাজার টাকা ছিল তখন আরও দু-তিন হাজার টাকা বাজে খরচ করে অন্যের নামে গাড়ি নেওয়ার মতো মানসিকতা এবং প্রয়োজন আমার ছিল না। তাছাড়া, যারা কালো টাকাতে গাড়ি কেনে তাদের কথা আলাদা। তারা ডিপ্রিসিয়েশানও পায় না। তাই ওইভাবে গাড়ি নেওয়ার কথাই ওঠেনি।

বাড়িতে তো চারখানা গাড়ি ছিলই। তাই আমাদের মক্কেল (পরে যিনি 'বিক্কেল' হয়েছিলেন, তাঁর নিজের ভাষ্য অনুসারেই) শিলিগুড়ির দুর্গা রায় মশাই কলকাতার ফ্রেঞ্চ মোটরের ম্যানেজার অ্যারাটুন সাহেবকে ধরে শিলিগুড়ির কোটা থেকেই নতুন-বেরোনো স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি জোগাড় করে দিলেন। গাড়ির নাম্বার হলো WGU 2024. আজও মনে আছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। নীল আর সাদা কম্বিনেশনের হেরাল্ড নিয়েছিলাম। বিয়ের আগের দিন ডেলিভারি পেয়েছিলাম গাড়িটি। ইনডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশনওয়ালা গাড়ি।

জীবনের ব্যক্তিগত মালিকানার প্রথম যন্ত্রযান ছিল আমার পরের বোন মালার জন্যে বাবার কিনে দেওয়া একটি বেঁটে লেডিস সাইকেল। সেই সাইকেল চালিয়েই তাবৎ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি, বাজার করা, যাদবপুরে চাল আনতে যাওয়া, সবই করতাম স্কুলে পড়াকালীন। তারপরেই উনপঞ্চাশ সনে চার হাজার আটশো টাকাতে বাবারই কিনে দেওয়া জীবনের প্রথম ট্রাইব্যুনাল করার পুরস্কার হিসেবে আমেরিকান আর্মির ডিসপোজালের সেই চার চাকার জিপ গাড়ি। তারপরই এই স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড।

গাড়ির কথা হঠাৎ মনে হল এই জন্যে যে আমার জন্মদিনে বাবার সাদা-রঙা লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভ ওপেল ক্যাপিতান নিয়ে কাপ্তানি করে ঋতুকে তুলে নিয়ে মোল্লার দৌড় মসজিদ—গড়ের মাঠে গেছিলাম।

কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। পুরো গড়ের মাঠই ভেজা। বসাবও জায়গা নেই। কোনো ভালো রেস্তোরাঁতে গিয়ে খেতে হয় জন্মদিনে তাও জানা ছিল না। বাড়িতেও কোনো উৎসব হত না যে, তা আগেই বলেছি। তাছাড়া, সেটাকে অপচয় বলেও গণ্য করতাম বাবাবই শিক্ষাতে। বাবা বলতেন, A rupee saved is a rupee earned. অথচ নিজস্ব শখে, যেমন বাড়িতে খাওয়াদাওয়া, অগণ্য মানুষকে বাড়িতে বা জমিতে খাওয়ানো, শিকার এবং আনুষঙ্গিক বাবদ astronomical টাকা খরচ করার সময় কোনো হিসেবের ধার ধারতেন না। এইসব যে করতে হয়, মানে জন্মদিনে ভালো জায়গাতে খাওয়া বা উপহারের আদান-প্রদান করা, এসব জানাই ছিল না আমাদের।

ঋতু আমার ছাব্বিশ বছরের জন্মদিনে উনিশশো একষট্টির উনত্রিশে জুন এক জোড়া মোজা আমাকে উপহার দিয়েছিল আর একটি আটচল্লিশ আর পি এম-এর রেকর্ড।

এর চেয়ে দামি জিনিস দেবেই বা কোথা থেকে! ওর নিজস্ব কোনো রোজগার ছিল না। তাছাড়া বাবার মৃত্যুর পরে ওদের আর্থিক অবস্থা আদৌ ভালো ছিল না।

ওই রেকর্ডে ওর নিজের গাওয়া গান, 'আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া' একদিকে ছিল, আর অন্যদিকে, 'আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে'। ওর কাকাই ওর ট্রেনার ছিলেন। কাকাই ছিলেন বাবার মৃত্যুর পরে ওর গার্জেন।

ও জানত না যে, ওই রেকর্ড আমার কাছে বেরোনো মাত্র পৌঁছেছিল। তখন রেকর্ডের বাজারে এমন বেনো জলের বন্যাও ছিল না। যারই পয়সা আছে সেই ক্যাসেট ও সিডি বের করছে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, হোর্ডিং দিচ্ছে নির্লজ্জের মতো। মাশরুমের মতো গজিয়ে-ওঠা বিভিন্ন ক্যাসেট কোম্পানির দৌলতে সিসিসিএন চ্যানেলের বা অন্য চ্যানেলেও গাছ জড়িয়ে ধরে উৎকট পোশাক পরে ঘুরে ঘুরে সেইসব অশ্রাব্য গান গাইছে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার শিল্পীরা। এসব তখন ভাবা পর্যন্ত যেত না। সুর এবং সুরুচির যথার্থই সহাবস্থান ছিল তখন।

কিছুক্ষণ ময়দানে দাঁড়িয়ে এবং গাড়িতে বসে এবং গল্প করে, আমরা ফিরে আসছিলাম পিজি হাসপাতালের সামনের পথ দিয়ে। আমার জন্মদিন এবং পিজি হাসপাতালের সামনের পথ ছেড়ে এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই।

তখন কলকাতাতে এত গাড়ি ছিল না। আমার আর ঋতুর আলাপ তখনও বেশিটাই মনে মনে। যদিও বহুবার ফোনে কথা হয় এবং পাঁচ-ছটি চিঠি লিখতাম ওকে, যদিও জবাব দিত না একটিবও। সেইসব চিঠি ও অত্যন্ত যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের তিন মাস পরেই চণ্ডাল আমি কোনো তুচ্ছ কারণে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সব কটি চিঠি ওর আলমারি থেকে বের করে বাথরুমে পাইপের লাইটার জ্বেলে পুড়িয়ে দিই এবং ওর বড়ো দাদার উপহার দেওয়া, নিউ মার্কেটের ন্যু ইয়র্ক থেকে বানানো স্যুটটি কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলি।

আমার সেই সব প্রলয়ংকরী রাগের মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে ও আমার দিকে চেয়ে থাকত।

শিশুকাল থেকে বনে মনে ঘুরে ব্যাধের মতো স্বভাবের আমি কিছু কিছু ব্যাপারে পুরোপুরিই বন্য ও ভয়াবহ ছিলাম। হয়তো আজও আছি। তবে মধ্যের সেই দ্বিপদ শ্বাপদ হয়তো কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো তার উদ্‌গিরণ মাঝে মাঝে ঘটে। তবে অনেকই দিন পরে পরে।

আমার সেই বন্য রূপ যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই শুধু সেই রূপের কথা জানেন।

তখন আমার অনিয়ন্ত্রিত রাগ এমনই ছিল, সর্দারজিদের মতো, যখন-তখন যাকে-তাকে গুলি করে মেরে দিতে পারতাম। বাবা যে বন্দুক-রাইফেল সব দোকানের জিম্মাতেই রাখতেন, সেটাও তার একটা কারণ। ওই রাগই পরে, ভিতরমুখী হয়ে আত্মহত্যাপ্রবণতাতে রূপান্তরিত হয়েছিল। নিজেকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করত। কিছুদিন বাদে বাদেই সেই স্পেল আসত। পরিণত জীবনেও আমি এ পর্যন্ত তিনবার আত্মহত্যা করতে গেছি। এ শ্লাঘার কথা নয়, লজ্জার কথা। দুবার পিস্তল দিয়ে আর একবার ঘুমের ওষুধ খেয়ে। ঋতু বড়োই হয়রানি পুইয়েছিল যেবারে ঘুমের ওষুধ খাই। মেয়ে দুটো নীল নীল মুখে চেয়ে থাকত আমার মুখে। সাতদিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতে এবং ঘোরে বাড়িতে ডাক্তারের সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণে থাকার পর আমি ভালো হয়ে ওঠায় ঋতু বলেছিল : আবারও যদি মরতে যাও কখনো তবে এমন ক্লামজি ক্রিয়াকাণ্ড কোরো না।

আমার পিস্তলও দোকানেই থাকে এ কারণেই। আমার দুই ভ্রাতার বলা আছে ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস-এ যে আমি বাইরে গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাওয়ার সময় ছাড়া, পিস্তল দোকান থেকে নিলেই তাদের জানাবেন বন্দুকের দোকান।

এসব কোনো ব্যাপার নয়। মরতে তো বাইরে গিয়েও পারি। মরতে যদি সত্যিই কেউ চায় তাহলে অন্য কেউই কি তাকে বাঁচাতে পারে? জীবনী লিখতে বসে এসব কথা গোপন রাখলেও পারতাম কিন্তু জীবনী যে সিকি জীবনী বা অর্ধেক জীবনী বা পূর্ণ জীবনীই হোক, তাকে যদি সত্যি ও সম্পূর্ণ হতে হয় তবে ভণ্ডামির কোনো জায়গা থাকার কথা নয়।

একজন লেখক তো সাধারণ মানুষ নন। তাঁর জীবন তো অন্যরকম হবেই। আর তাঁর জীবন যেরকমই হোক না কেন তাঁর যদি সত্যিই অগণিত পাঠক-পাঠিকা থেকে থাকে, শুধু প্রাইজ ও বেস্ট সেলার লিস্টের তকমাধন্যই যদি তিনি না হন, প্রকৃত এবং জনপ্রিয় লেখক হন তবে জীবনী লিখতে বসে ভণ্ডামি করলে তাঁর পাঠকদের ঠকানোই হয়। তবে যে মানুষ সর্বার্থেই ভণ্ড তিনি জীবনী লিখতে বসেও ভণ্ডামি করেন কিন্তু পাঠক-পাঠিকারা কি তা বুঝতে পারেন না? আমার মনে হয়, অবশ্যই পারেন, কারণ লেখকের মা ছাড়া একজন লেখককে তাঁর পাঠক-পাঠিকার মতো ভালো আর কেউই জানেন না।

আমি সত্যিই বন্য। আমার স্বভাব আমি নিজেই বুঝি না। অন্যে বুঝবে কী করে। নানা উৎস থেকে আমাকে যত বঞ্চনা, যত অত্যাচারের, অসম্মানের শিকার হতে হয়েছে তার সবটুকুই আমি নিজে একাই সইনি, আমার স্ত্রী-কন্যাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তার ভার হালকা করেছি।

আমার মধ্যে গভীরে প্রোথিত অনেকই সংস্কার ছিল। মনে-প্রাণে আমি পিতৃ-মাতৃভক্ত, পরিবারবদ্ধ জীব ছিলাম। আমি চিরদিনই সরল এবং বোকা। আমার সঙ্গে অনেকেই সরল ব্যবহার করেনি। আমার সারল্যের সুযোগ নিয়েছে। নিয়েছে আমার বোকামির। গভীর সংস্কারবশে এবং ভালোত্বর কারণে তাদের প্রত্যাঘাত করিনি আমি। করলে, তাদের মধ্যে অনেকেই ধ্বংস হয়ে যেত। না করে, সব আঘাত নিজেই সহ্য করেছি। আর আমার স্ত্রী ও মেয়েদের তার ভাগীদার করেছি। এ জন্যে অনুশোচনার আমার শেষ নেই। ঈশ্বরের অশেষ দয়া আমার উপরে না থাকলে আজ আমি অনাহারে থাকতাম। ঈশ্বর পরম দয়ালু। এবং তিনি আমার প্রতি দয়ালু বলেই আমি সব অন্যায়কারীদের ক্ষমা করতে পেরেছি। ঈশ্বর যদি সত্যিই থেকে থাকেন তবে তিনি আমার প্রতি যারা পরম অন্যায় ও তঞ্চকতা করেছে এবং আজকেও করছে তাদের অনুশোচনাতে ভরে দেবেন। কারোরই ক্ষতি আমি চাইনি কোনোদিন। আমি চাই না আমার কারণে ঈশ্বর কারোরই ক্ষতি করুন। তাই তারা তাদের অন্যায় কখনো স্বীকার করে নিলেই জীবদ্দশাতে আমি এবং মৃত্যুর পরে আমার আত্মা শান্তি পাবে।

আমার স্বভাব-চরিত্র এতই গোলমেলে, তাতে এতরকম বৈপরীত্য যে আমার সঙ্গে প্রায় চল্লিশ বছর ঘর করেছে বলে ঋতুকে শুধুমাত্র এই কারণেই প্রেসিডেন্টস মেডাল দেওয়া উচিত। আমার মতো মানুষের বিয়ে করাই উচিত ছিল না। আমার মা বলতেন, 'তুই কোনো মেয়েকেই সুখী করতে পারবি না। অদ্ভুত তোর স্বভাব। আমি তোর জন্মদাত্রী মা হয়ে যদি তোকে না বুঝতে পারি তবে পরের বাড়ির মেয়ে কী করে বুঝবে।' এই 'সুখ' বাইরের শারীরিক আনন্দের সুখ নয়, সাচ্ছল্যের সুখ নয়, তার চেয়ে অনেক বড়ো সুখ। যে সুখ প্রত্যেক মেয়েরই প্রার্থনার এবং সেই প্রার্থনা ন্যায্যতও।

মায়ের এই সাবধানবাণী সত্ত্বেও বলব, সুখী হয়তো আমি করতে পারিনি আমার স্ত্রীকে, যৌবনের সবচেয়ে সুন্দর সব দিনে তাকে সময়, সহানুভূতি, সঙ্গ কিছুই দিতে পারিনি তেমন করে, তবু সে অত্যন্তই মহীয়সী ও বুদ্ধিমতী বলে আমার ঘর ভাঙেনি, মেয়েদের চমৎকার করে মানুষ করেছে। এর চেয়ে বড়ো পাওয়া আর কী হতে পারে আমার জীবনে।

টাকা, পয়সা, যশ, ক্ষমতা এসবের কোনোই দাম নেই। যদি একটি ছোট্ট পরিবারকে সুন্দর, সার্থক, সফল করে গড়ে তুলতে পারে কোনো স্ত্রী, তাকেই বলা উচিত লক্ষ্মী। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঋতুর এক বাতিক। কিন্তু মাদার টেরিজা যেমন বলতেন 'cleanliness is Godliness', আমিও তাই মনে করি।

আমার মধ্যে অনেকই দোষ ছিল। যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। এই জীবনে কোনো কিছু বা কোনো নারীকে চেয়ে না পাওয়াটাকে আমি হার স্বীকার করে নেওয়া বলে জানতাম। আজও জানি। আমি কিছু চেয়ে তা পাব না, সেই পাওয়ার জন্যে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, তা আমার ব্যক্তিগত দর্শনের বাইরে ছিল। আমার স্ত্রী আমার চলে-যাওয়া মায়েরই মতো অসীম প্রশ্রয়ে এবং ঔদার্যে এবং হয়তো কিছুটা কৌতুকেরও সঙ্গে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে আমার নানাবিধ স্খলন সহ্য করেছেন। তাঁর তেমন উত্তেজনাও দেখিনি। ভাবটা, মা যশোদার মতন, 'হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়', ও ননীচোর যাই করুক ঘরে ফিরে তো আসবেই।

তবে স্বপক্ষে এটুকুই বলব যে, যা কিছুই করে থাকি না কেন সংকীর্ণতার সঙ্গে করিনি, কাউকে কিছুমাত্র বঞ্চনা করে কিছু করিনি। বরং যাদের প্রতি আমার কৃপা বর্ষিত হয়েছিল তারা প্রায় সকলেই আমাকে নানাভাবে বঞ্চনা করেছে। এই কারণেই সাধারণভাবে মেয়েদের প্রতি আমি খুব একটা উচ্চ ধারণা জীবনের এই সন্ধেবেলাতে এসে, পোষণ করতে পারি না। তবে শ্রীকান্তের অন্নদা দিদির মতো ভালোবাসাও অথবা রাজলক্ষ্মীর মতো, কোনো নারীই যে আমাকে বাসেননি এমন কথা বলে পাতকের কাজ করব না।

সাধারণভাবে নারীদের প্রতি আমার যে মনোভাবই আজ বেলাশেষে গড়ে উঠুক না কেন, অনেক নারীকেই, শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণেই আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। তাদের অনেকের কাছ থেকেই যা পেয়েছি তার ঋণ দশ জীবনেও শোধ করতে পারব না।

দাম্পত্য হল মন্দিরের মতো। মন্দিরেরই মতো তার শুচিতা। বাইরে বেরিয়ে আমরা কত নোংরা অলিগলি দিয়ে হাঁটি, ময়লা মাড়াই, কিন্তু মন্দিরে ঢোকার আগে সেই ধূলি-ধূসরিত জুতো জোড়াকে তো আমরা খুলেই মন্দিরের ভিতর যাই। যে পুরুষ দাম্পত্যকে এই চোখে দেখে এবং যে নারী চিরকালীন পুরুষের এই স্বভাবদোষ ক্ষমা করে হাসিমুখে তাঁর স্বামীকে গ্রহণ করেন তাঁরাই আদর্শ দম্পতি।

আধুনিককালের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন মেয়েরা সফল দাম্পত্যের শর্ত হিসেবে যে সব শর্তকে চিহ্নিত করেন তা কোনোদিনও কোনো সৎ এবং পুরুষসুলভ পুরুষের পক্ষে মাননীয় নয়। সেই সব শর্ত আধুনিকা স্ত্রীর পক্ষেও পালনীয় নয়। উইশফুল থিংকিং এক কথা আর রিয়ালিটি অন্য। যারা রিয়ালিটি-কে স্বীকার করে নিতে পারেন তাঁরাই সার্থক দম্পতি—কী পুরাকালে কী একালে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

ঋতু যে মোজাজোড়াটি আমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল তার জমি ছিল ফিকে লাইলাক রঙের। উপরে ধূসরের চেক। অমন সুরুচিসম্পন্ন মোজা তার আগে আমার একজোড়াও ছিল না। আগেই বলেছি যে, আমার জন্মদিন উনত্রিশে জুন। তাই সেদিন বৃষ্টিস্নাত গড়ের মাঠের অবস্থা বসার মতো ছিল না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে একটুখানি পায়চারি করে আমরা গাড়িতেই ফিরে এলাম। গাড়ি স্টার্ট করে বাড়ির দিকে এগোলাম। তখনও ঋতুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা পুরোপুরি পোশাকিই ছিল। বিয়ের আগে, মনে পড়ে না, তাকে কোনোদিন একটি চুমুও খেয়েছি। ঈশ্বরই জানেন যে, এ কথা সত্যি, বিয়ের আগে আমি কোনো জীবন্ত নারীকে পোশাকহীন অবস্থাতেও দেখিনি। সিনেমাতে দেখেছি, ছবিতেই দেখেছি শুধু।

আমরা আজকালকার অনেকের মতো, অথবা তখনকার কৃত্তিবাস গোষ্ঠী বা তারও আগের কোনো কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের মতো সোনাগাছি + খালাসিটোলাকেই সৃষ্টিশীলতার উৎস বলে জানিনি। এমনকী কফি-হাউসকেও নয়। বরং অন্য অনেকেরই মতো আমাদের ধারণা ছিল সৃষ্টিশীলতা যতখানি নিভৃতে এবং একাকিত্বের মধ্যে শিকড় পায় ততখানি দলে-বলে পায় না। দলে-বলে কলকাতার রাতকে শাসন করার নামে সেই রাতকে নানাভাবে পীড়িত করা চলে, নিজেদের নানাভাবে দূষিত করাও চলে, তা করার ব্যক্তিস্বাধীনতা অবশ্য থাকতেই পারে কিন্তু তা করলেই যে ভালো কবিতা লেখা বা গান গাওয়া বা ছবি আঁকা যাবে তেমন বিশ্বাস আমাদের ছিল না।

দল পাকিয়ে রাজনীতি করা যায়, নিজেদের কোনো বিশেষ গোষ্ঠী তৈরি করে নিয়ে পশ্চিমি মার্কিন মুলুকের গোরু-ঘোড়ার মালিকদের, rancher-দের মতো সেই সাম্রাজ্য রিভলভার-পিস্তলের নল, সংবাদপত্রের কলাম বা নানা প্রাইজ ও প্রাপ্তির ক্ষমতা প্রয়োগ করে সুরক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করে রাখা যায় সহজেই; কিন্তু প্রকৃত বড়ো কবি বা সাহিত্যিক বা গায়ক সেভাবে হওয়া যায় না। পরবর্তী জীবনেও একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। শঙ্খ ঘোষ বা জয় গোস্বামীরাও তো সোনাগাছি-খালাসিটোলার 'তীর্থে' না গিয়েও বড়ো কবি হয়েছেন।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এক জায়গাতে লিখেছিলেন যে, লেখকদের মধ্যে বেশি মেলামেশা আদৌ স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ 'That leads to inbreeding of thoughts and to jealousy.'

নিজেকে একাকিত্বের সবরকম কষ্টের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে হাত ধরে নিয়ে যেতে না পারলে মা সরস্বতী সদয় হন না। রবীন্দ্রনাথের সেই গান আছে না? 'তুই কেবল থাকিস সরে সরে, তাই পাসনে কিছুই হৃদয় ভরে/আনন্দ-ভাণ্ডারের থেকে দূত যে তোরে গেল ডেকে। তুই ঘরে বসে সব খোয়ালি এমনি করে।'

এই 'খোয়ানো' আসলে প্রাপ্তিরই আরেক রূপ।

মিডিয়ার হাত ধরে প্রচণ্ড নামীদামি হওয়া যায় সহজেই কিছু সময়ের জন্যে। কিন্তু মিডিয়ার আলো নির্বাপিত হলেই অথবা তেমন 'মহৎ ও সৃষ্টিশীল' ব্যক্তির জীবনদীপ নির্বাপিত হলেই সেই নাম-দাম অচিরে নির্বাপিত হয়। হয় যে, তার ভূরিভূরি প্রমাণ আমাদের চোখের সামনেই আছে।

রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো মতো অগণ্য সৃষ্টিশীল মানুষ কোনোদিন গুন্ডাদের বা রাজনীতিকদের মতো দল 'পোষেননি'। 'চামচেগিরি'তে বিশ্বাস করেননি। তাঁরা সকলেই 'নির্জন এককের' সাধনাই করেছিলেন। তাই যাঁরা আমার অনুজ, যাঁরা অন্তর্মুখী, যাঁরা সৃষ্টিশীল তাঁদের কাছে এইটুকুই বলার যে, নিজেদের অন্তর্মুখীনতার জন্যে গর্বিত থাকুন। দলবদ্ধ নখদন্তসম্পন্ন জানোয়ার না হতে পারার জন্যে দুঃখিত বা অনুতপ্ত কখনোই হবেন না। যশঃপ্রার্থী হওয়া আর প্রকৃত যশস্বী হওয়ার মধ্যে আসমান-জমিনের ফারাক আছে এবং এই রৌরবের মধ্যেও থাকবে। দলের 'দাদা' বা 'গোদা'দের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত না হয়ে কোনো কবি-সাহিত্যিকদের 'দলেরই' সদস্য না হয়ে নিজের নির্জন এককের সাধনা চালিয়ে যান। যশস্বী হতেও পারেন, না-ও হতে পারেন—কিন্তু তেমন করলে সৃষ্টিশীলতার ব্যথা-বেদনার গভীর নিক্কণ থেকে কখনোই বঞ্চিত হবেন না। কোনো বড়ো কিছুই সস্তা কোনো পথ দিয়ে গিয়ে পাওয়া যায় না। তার জন্যে নির্জনে সাধনা করতেই হয়। হ্যাঁ, করতে হয়ই এই বিজ্ঞাপন-সর্বস্বতার দিনেও। যা শাশ্বত তা চিরদিনই সম্মানিত, এই 'কওন বনেগা ক্রোড়পতি'র আর 'ছে ছে আনা'র যুগেও। এই বিশ্বাস তরুণদের বুকের গভীরে প্রোথিত থাকলে ওইসব দল ও দলবদ্ধ মনুষ্যেতর মানুষদের তরুণরা পায়ে মাড়িয়ে গিয়ে নিজের গন্তব্যে অবশ্যই এগোতে পারবেন।

মানুষ দলবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দলের পোস্টারই লিখেছেন, গণসংগীত গেয়েছেন, শিল্প ও সংগীতের এবং সাহিত্যেরও সর্বনাশই করেছেন শুধু। সংবাদপত্র মালিকদের অশিক্ষা আর খেয়ালখুশির দায় মেটাতে পাতার পর পাতা ভরিয়েছেন। কিন্তু পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের হৃদয়ের স্থায়ী এবং উষ্ণ আসন তাঁরা কখনোই পেয়েছেন বা পাবেন বলে মনে হয় না। জানি না, আমি হয়তো ভুল। কিন্তু এই আমার বিশ্বাস।

প্রায় চল্লিশ বছরেরও আগেকার কথা। তখন কলকাতাতে এত ভিড়ও ছিল না। রাত নটাতেই ওইসব অঞ্চলের পথঘাট ফাঁকা হয়ে যেত, তখন রাম-শ্যাম, যদু-মধুর গাড়িও ছিল না। গাড়ি চালাচ্ছি আর ঋভু সামনের সিটে আমার পাশে বসে আছে। সুনসান রাস্তা। পি জি হসপিটালের সামনে হঠাৎই একজন টলায়মান মানুষ চুম্বকে যেমন ধাতু দৌড়ে আসে তেমন করেই এসে গাড়ির সামনে পৌঁছোলেন। গাড়ির গতি বেশ শ্লথই ছিল। প্রাণপণে ব্রেক কষা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে গাড়ির যোগাযোগ পুরোপুরি এড়ানো গেল না। তবে তখন গাড়ি প্রায় থেমেই গেছিল। মানুষটি মাটিতেও পড়ে যাননি গাড়ির সংস্পর্শে এসে। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে কুৎসিত গালাগালি করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেতপুরীর মতো পথেও যেন ভোজবাজিতে চারদিক থেকে মানুষ দৌড়ে আসতে লাগল। মানুষটিকে দেখে মনে হল ডকের শ্রমিক হলেও হতে পারেন।

চিরদিনই আমি এক্সাইটেবল। সহজেই উত্তেজিত হয়ে যাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থান-কাল-পাত্রর বা নিজের হিতাহিতের কোনো বিবেচনাই আমার থাকে না। দরজা খুলে নামতেই সেই 'জনগণ' আমাকে মারতে উদ্যত হলো। আর সেই মানুষটির মুখ-নিঃসৃত খেউড় চলতে লাগল অনর্গল। কী হত তারপরে জানি না, হঠাৎই দেখলাম ঋভু বাঁদিকের দরজা খুলে নেমে এসে আমাকে জনগণ থেকে আড়াল করে দাঁড়াল। তখনও জনগণ আজকালকার মতো বিবেক-বিবেচনাহীন দুষ্কৃতিপরায়ণ হয়ে ওঠেনি। আরও বড়ো কথা এই যে, ঠিক সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তেই একটি পুলিশ ভ্যান পেছন থেকে এসে বাঁদিকে থামল এবং তা থেকে একজন সার্জেন্ট নেমে জনগণকে ধমক লাগালেন এবং সেই মানুষটিকে বললেন, পি কর চলতা হ্যায় আউর খতরা বননেসে গালি ভি দেতা হ্যায়। উঠো গাড়িমে। পইলে হসপিটাল লে যাহা রহা হ্যায় দিখানেকে লিয়ে, বাদমে তুমকো শিখলায়েগা।

আসলে মাতালকে আবার শিখাবেন কী? সেই সময়ে মদ খাওয়াটা একটি দোষের মধ্যেই গণ্য হত ও প্রকাশ্যে মদ খাওয়া সমাজের চোখে নিন্দনীয় ছিল। আজকে অবশ্য দেখতে পাই যে মদ খাওয়া, সামর্থ্য থাক আর নাই থাক, এক গুণেই উন্নীত হয়ে গেছে। এর পেছনে কিছু কবি-সাহিত্যিকের অবদানও কম নয়। তরুণ সমাজের নানা চারিত্রিক স্খলনের জন্য ইতিহাস তাঁদের অবশ্যই দায়ী করবেন। এর পেছনে সি আই এ, কে জি বি বা চাইনিজ এজেন্সির হাত থাকাও আশ্চর্য নয়।

তারপর আমাকে বললেন, আপনি চলে যান। আমরা কিছুটা পেছনেই ছিলাম। আপনার যে কোনো দোষ নেই তা আমরা জানি।

আমি অভিভূত হয়ে বললাম, থ্যাঙ্ক উ্য।

ঋতু আগে আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে তারপর নিজে উঠে বলল, উত্তেজিত হয়ে যাও কেন অত সহজে! মাথা সবসময়ে ঠাণ্ডা রাখবে।

ঋতুর নিজের মাথা যদিও আদৌ ঠাণ্ডা নয়, কারণ শিশুকালে ও কৈশোরে ওর দু-দুবার মেনিনজাইটিস হয়েছিল। তার গরম-মাথার কথা বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির সকলেই কাছেই সুবিদিত। কিন্তু এও ঠিক যে, বিপদের সময়ে সেই মাথাই অসম্ভব ঠাণ্ডা যে হয়ে যায় তা বারবার দেখেছি এবং দেখে চমৎকৃত হয়েছি।

সাম্প্রতিক অতীতে উত্তরাখণ্ডের আন্দোলন চলাকালীন আমরা দুজনে গাড়োয়াল হিমালয়ে গেছিলাম স্বল্পদিনের জন্যে। দুই মেয়ের কেউই তখন দেশে ছিল না। রুদ্রপ্রয়াগের একটি হোটেলে রাত কাটিয়ে আমরা পাউরির দিকে আসছিলাম গাড়িতে। সমতলের শ্রীনগরে নেমে দেখলাম কেমন যেন ঠাণ্ডা ভাব। সকাল আটটাতেও শহর জাগেনি। দোকানপাট বন্ধ। পথে লোকজনও কম। আসলে দুজন ছাত্র পুলিশের গুলিতে আগের দিন মারা যাওয়াতে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্‌ধ ডেকেছিল পুরো উত্তরাঞ্চলে। সর্দারজি ড্রাইভারটি একটু গোঁয়ার মতো ছিল। তার বয়সও অল্প, তাছাড়া বুদ্ধি-বিবেচনাও কম। পাউরির পথটা শ্রীনগর থেকে বলতে গেলে চির-পাইনের ছায়ায় ছায়ায় আগাগোড়াই চড়াই। একটা চুলের কাঁটার মতো বাঁক নিতেই ডানদিকে ঝকঝক করে উঠল সারি সারি পর্বতচুড়ো। সকালের রোদে তাদের বরফ-মোড়া চুড়োগুলো রুপোয় মোড়া বলে মনে হচ্ছিল। ঋতু সেই দৃশ্য দেখে বাঃ বাঃ করে উঠল। সামনেই পাউরির 'ম্যাল'। গাড়ি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেখানে গিয়ে পৌঁছোতেই একদল ছেলে রে! রে! রে! করে আমাদের উপরে চড়াও হয়ে গাড়ির বনেটে দমাদ্দম লাঠি মারতে লাগল। ড্রাইভারকে সোয়েটার আর কলার ধরে মারতে লাগল সে কিছু বোঝার আগেই। তারা বলতে লাগল, বন্‌ধের মধ্যে গাড়ি নিয়ে এসেছ কেন?

আমি ভাবছিলাম এবার আমার পালা। জনরোষের সামনে 'আর্মির ট্যাঙ্কও অসহায় আর আমি তো ছার—যদিও চেহারাটা প্রায় ট্যাংকের মতোই হয়ে উঠেছে। আমি ভীষণই ঘাবড়ে গেলাম। আমার ব্রিফকেসটা পাশে ছিল। তাতে দিল্লি থেকে কলকাতা ফেরার প্লেনের টিকিট, দিল্লিতে মৌর্য-শেরাটন হোটেলে তিনদিন থাকার এবং খাওয়াদাওয়ার ভাউচার, ভাড়াগাড়ির ভাউচার, মক্কেলের দেওয়া বেশ কিছু ক্যাশ টাকা, পথের আপদ-বিপদের জন্যে। ভাবছিলাম ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে গেলেই তো চিত্তির। প্রাণ যাওয়ার চেয়েও বেশি হবে। উৎকণ্ঠাতে আমার জিভ শুকিয়ে টাগরাতে আটকে গেল। আমার অবস্থা যখন এমন তখন ঋতু বলল, একবার নেমে দ্যাখো, কী সুন্দর দেখাচ্ছে পিকগুলোকে। কোন্‌টার কী নাম একটু বলে দাও না।

আমি যেহেতু আগেও ওইসব অঞ্চলে গেছি তাই এই অনুরোধ। কিন্তু ওকে দেখে আমার যেমন বাকরোধ হয়ে গেল, মারমুখি ছেলেদেরও তাই। ইতিমধ্যে দুজন মহিলা উপর থেকে নেমে এসে বললেন, মৎ ডরো বহিনজি। দোনো স্টুডেন্টকো গোলি মারা পুলিশনে উসিকে লিয়ে ছোকরা লোগাকি শরমে খুন চড় গ্যায়া।

পাউরি ট্যুরিস্ট লজেও ওরা থাকতে না-দেওয়াতে আমরা পাউরি হয়ে ল্যান্সডাউন হয়ে সমতলে নেমে এসে গভীর রাতে হরিদ্বারে পৌঁছোই—যদিও দুদিন আগে রওয়ানা হয়েছিলাম হৃষীকেশ থেকে।

ঋতুকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে উত্তাল ছেলেদের অন্যমনস্ক করার জন্যে ও অমন করেনি, করেছিল স্বাভাবিকভাবেই। ড্রাইভারকে তো মারছিলই, আমাদেরও মারতে পারে, জিনিসপত্র ছিনতাই হতে পারে, গাড়ি জ্বালিয়ে দিতে পারে এসব নিয়ে ওর কোনোই মাথাব্যথা ছিল না। ও প্রকৃতই প্রকৃতির প্রেমে বিহ্বল হয়ে গেছিল এবং ভয়ডরের বিন্দুমাত্র ওর মনে আসেনি।

সত্যিই বিপদে এমন ঠাণ্ডা-মাথার মানুষ বেশি দেখিনি আমি। যদিও সম্পদে তার মাথা ভীষণই গরম যখন-তখনই এবং সম্পূর্ণ বিনা নোটিশে।

বিয়ের আগে মাত্র আরেকদিনই আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম। এক রবিবারে দুপুরে। ওকে বারোটা নাগাদ তুলে নিয়েছিলাম বাড়ি থেকে। একটা জামরঙা শাড়ি পরেছিল ও, সঙ্গে অ্যামিথিস্টের গয়নার সেট। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। তখন অবশ্য সবসময়েই সুন্দর দেখতাম। কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে সুন্দর না দেখে।

আমাদের বাড়িতে তখন অন্য দশটা মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির মতো সকাল সকালই দুপুরের খাওয়া শেষ হত। ভাত খেয়েই সকলে অফিসে-কাছারিতে, স্কুলে-কলেজে যেতেন। এখনকার মতো সাহেবি-কেতা সর্বত্র ঢুকে পড়েনি।

ঋতুকে যখন তুললাম ৩৮ নাম্বার বালিগঞ্জ প্লেসের 'ঠাকুরতা বাড়ি' থেকে তখন বেলা বারোটা। কথা ছিল লং-ড্রাইভে যাব। মনে আছে, সেদিন সাদা-রঙা অ্যাম্বাসাডর টুওরার ভ্যানটি নিয়েছিলাম।

গল্প করতে করতে শ্যামবাজারের মোড় ছাড়িয়ে যখন ব্যারাকপুব ট্রাংক রোডের দিকে এগিয়ে গিয়ে ব্রিজের ওপরে উঠেছি ও বলল, আমরা বুঝি খাব না?

তুমি খেয়ে আসোনি?

না তো। আমি ভেবেছিলাম, জন্মদিনে বেরোচ্ছি, এমন সময়ে, আমরা নিশ্চয়ই খাব কোথাও।

আমি বললাম, কাল রাতে বললে না কেন?

আমি কী......।

রেগেমেগে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম। আমার গুণের মধ্যে ছিল শুধু রাগ। আজও ভাবি কী দেখে যে ঋতু আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল, সেই জানে।

পাঠক। আপনাদের মনে হতে পারে যেহেতু তাদেব বাড়ির অবস্থা তখন ভালো ছিল না এবং আমাদের বাড়ির অবস্থা খুবই ভালো ছিল তাই সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল আমার উচ্চ প্রস্তাবে। কিন্তু সে কথা সত্যি নয়। ওর ভাই ও দাদাদের সবার ক্ষেত্রে বলতে না পারলেও ওদের দুবোনের ক্ষেত্রে বলব যে আত্মসম্মান জ্ঞান তাদের টনটনে ছিল। হয়তো সে আমার মতো নির্গুণ নীরূপের মধ্যেও, পাগলের মধ্যেও, ভালোলাগার মতো কিছু দেখেছিল। নইলে ওই বিয়েতে সে মত দিত না। বিবাহোত্তর জীবনে সে কোনোদিনও আমার কাছে কিছুমাত্রই চায়নি। এমনকী একটি পারফ্যুম বা কোনো কসমেটিকসও নয়। চোখে কাজল দিয়ে হালকা করে পাউডারের পাফ বুলিয়ে এবং সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত সুরুচি-সম্পন্ন শাড়ির রঙের সঙ্গে ম্যাচ করে বড়ো রঙিন টিপ পরলেও তাকে অত্যন্ত সুন্দরী দেখাত। কোমর-ছাপানো চুল ছিল। ওই রকম সুন্দর ফিগার সেই সময়ে দক্ষিণ কলকাতাতে কম তরুণীরই ছিল। অনেক বুড়ো বুড়ো পাকা রুই-কাতলাও এই ফাতনা সানন্দে গিলতে চেয়ে তার গড়ন ও সৌন্দর্যর দ্যুতি এবং গানের চারের মধ্যে বিস্তর ঘোরাঘুরি করে হয়রান হয়ে গেছিল। কিসের জোরে যে আমি তাদের হারিয়ে দিতে পেরেছিলাম তা আজও জানি না। হয়তো আমার জেদেরই জোরে, আমার চাওয়ারই আন্তরিকতার জোরে।

একটা ব্যাপারেই তার দুর্বলতা ছিল জীবনের একটা সময় পর্যন্ত, তা হলো শাড়ি। দামি গয়না শিক্ষিত মানুষেরা পরে না একথা প্রথম দিন থেকে তাকে বলে বলে এ ব্যাপারে তার মধ্যে গয়না সম্বন্ধে এক বিরূপতা সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম। কিন্তু সুন্দর শাড়ি (সস্তা অথবা দামি) দেখলে সে এখনও পঞ্চদশী হয়ে ওঠে। এ বাবদে তার সঙ্গে মোহরদি অথবা তার কাকিমা মঞ্জুলা গুহঠাকুরতার

খুবই মিল ছিল। সেই সব শাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা সে যেমন ভাবে করত তাও ছিল দেখার মতো। তার আলমারি যে কেমন ভাবে গোছানো থাকত তা দেখতে আসত তার আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা।

আমাদের দুই মেয়েই এখন বিদেশে। দেশে থাকলেও ঋতুর শাড়িতে তারা আদৌ মনোযোগী নয়। তারা হয় জিনস, নয় সালোয়ার-কামিজই পরে সাধারণত। এ কথা ভেবে অবশ্যই দুঃখ হয় যে আমাদের যৌবনকালে যা-কিছু নিয়েই আমাদের গর্ব ছিল, রুচি, সাজ-পোশাক, বাংলা গান, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি, রবীন্দ্র-মনস্কতা—তার সব থেকেই ক্রমশ আমরা দূরে সরে আসছি।

'বুড়ো হওয়া' যাকে বলে, যুগযুগান্ত ধরে যাকে 'বুড়ো হওয়া' বলে এসেছে মানুষে, আমরা কি তাই হয়ে উঠছি? সমাজ-সংস্কার, ছেলেমেয়েদের জীবনের গন্তব্য, তাদের চাওয়া-পাওয়া, তাদের রুচি, তাদের সমাজ-মনস্কতা সবই অতি দ্রুত বদলে গেছে। এই অন্য গন্তব্যে তাদের উর্ধ্বশ্বাস দৌড় আমরা অসহায়ের মতো দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি, হয়তো নিরুচ্চারে কখনও গাইছিও বাহির পথে বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে গেলি/আয়, আয় রে ফিরে আয়/পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি বসিবি নিরালায়/আয়, আয় রে ফিবে আয়'

কিন্তু সে গান তাদের কানে পৌঁছোয়নি।

খুব চেঁচিয়ে কিছু বললেও যে তা শোনা যাবেই এ কথা ভাবাটাই ভুল। আসল কথাটা হল ওয়েভ লেন্থ। তিমি মাছের সঙ্গে যদি শিম্পাঞ্জি অথবা গোরিলা কথা বলে, অথবা উলটোটাই হয় তবে তা দুপক্ষের কোনো পক্ষের কানেই পৌঁছোবে না। কারণ তাদের স্বরগ্রামের ওয়েভ লেন্থ আলাদা আলাদা। মরমে পৌঁছোনো তো দূরস্থান। তাই আমাদের কিছু না-বলাই ভালো। নীরব থাকাই ভালো।

জাগতিকার্থে 'উন্নতি' বলতে এখন সকলেই যা বোঝে, তা আদপে মানুষের উন্নতি কিনা তা নিয়ে গবেষণার সময় এসেছে। গবেষণার ফল জেনে যাওয়ার সময় আমাদের আর হাতে নেই, আমাদের বেলা শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু যাঁদের আছে সেই সময়, তাঁদের বলি যে 'জনগণায়ন' বা 'বিশ্বায়ন'-এর খারাপ দিক অনেকই আছে। সেই সব সম্বন্ধে নিজেদের এবং নিজের ছেলেমেয়েদের সজাগ করার সময় কিন্তু এখনও চলে যায়নি।

বলতে চাইছিলাম যে আমেরিকানরা যা কিছুকেই উন্নতি বলে জেনেছে তাকেই আমরাও উন্নতি বলে জেনে হয়তো ভালো করিনি। মানুষ যে শরীর-সর্বস্ব, যেনতেনপ্রকারেণ অর্জিত জাগতিক সাফল্যই যে তাদের একমাত্র প্রার্থিত বস্তু নয়, বিল গেটসই তাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা নয়, 'কওন বনেগা ক্রোড়পতি'ই যাদের চর্চার একমাত্র বিষয় নয়—এ কথা একদিন ভারতীয় তো বটেই বাঙালিরাও জানলে এখনও আমাদের উপকার হত। রবীন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করে, তাঁর গানকে অপমান করে, তাঁর সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বাঙালি আদৌ ভালো কাজ যে করেনি সে কথা ভবিষ্যতে তারা হৃদয়ঙ্গম করবে, যদিও তখন অনেকই দেরি হয়ে যাবে।

কী কথা থেকে কী কথাতে চলে এলাম। আমার এমনই স্বভাব। জীবনের পথে চলতে চলতেও কোন্ পথ ছেড়ে যে কোন্ পথে এসে পড়েছি চিরদিন তা নিজেও জানি না।

চৌরঙ্গিতে ফিরে এসে quick-bite-এর জন্যে চাংওয়া-তে ঢুকে একটি কেবিনে বসলাম আমরা। দেখি ঋতুর চোখে জল।

ও সেদিন চুনি আর পান্না মেশানো গয়না পরেছিল একটি, জামরঙা শাড়ির সঙ্গে।

কাঁদছ কেন? জিজ্ঞেস করাতে সে আরও প্রবলবেগে কিন্তু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। তাতে আমার রাগ আরও বেড়ে গেল। অনাত্মীয়, সামান্য-পরিচিত সেই মেয়ের উপর রাগ দেখাবার কোনো অধিকার আমার যে নেই সে কথা ভুলে গেলাম আমি। তার কান্না দেখে অর্ডার নিতে ঢুকে বেয়ারা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে তো হলোই। কিন্তু মাথামোটা আনরোম্যান্টিক আমি, সূক্ষ্ম-রুচি শৌখিন সেই মেয়ের জন্মদিনে তার মনে যে আঘাত দিয়েছি তা তখনও পুরো বুঝতে পারলাম না। অনেক ব্যাপারেই

আমার রুচি যথেষ্ট সূক্ষ্ম কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে আমার রুচি বেশ স্থূলই ছিল। জানি না, হয়তো আজও আছে। কোনো মানুষই কি নিজেকে পুরোপুরি জানতে পারে? চিতায় গিয়ে শোওয়ার সময় পর্যন্তও জানতে পারে না। যাঁরা ভাবেন যে তাঁরা সর্বজ্ঞ এবং নিজেকে তাঁরা গুলে খেয়েছেন তাঁরা বোধহয় ঠিক করেন না।

সেই দুপুরের দুঃখস্মৃতি এখনও আমার মনে দুর্মর হয়ে আছে। তাকে, জন্মদিনে, সে যাকে দুদিন বাদে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার কাছ থেকে এমন ব্যবহার যে কতখানি দুঃখ দিয়েছিল তা আজ পেছন ফিরে চেয়ে বুঝতে পারি এবং বুঝতে পেরে মরমে মরে যাই। তবে আজও আশ্চর্য হই এ কথা ভেবে যে তারপরেও সে কেন আমাকে বিয়ে করতে রাজি হল।

সেদিন চাংওয়া তে খাওয়ার পর বি টি রোড ধরে আমরা ডানলপ ব্রিজ অবধি গিয়েছিলাম যদিও—কিন্তু যাব বলে বেরিয়েছিলাম সেজন্যেই। তেমন কথা বিশেষ হয়নি। আমার অনেক দোষের মধ্যে এটিও একটা। মুড একবার অফ হয়ে গেলে, মন একবার সরে গেলে, মন আর মনে কিছুতেই বসতে চায় না। আমার কথাটাই আমি বলতে পারি শুধু, মনে হয়, অমন বাজে জন্মদিন ঋতুর আর বেশি কাটেনি।

ওইসব ব্যাপারে আমি এখনও ওরকমই আছি। সারাটা জীবনই দিনে চোদ্দো ঘণ্টা কাজই করে গেলাম। 'In a man's life work comes first' এই মন্ত্রে প্রথম যৌবনেই দীক্ষিত হয়েছিলাম বলেই অন্য দশজন সুখী, গৃহী, সাংসারিক মানুষের মতো জীবন কাটানো হল না আমার। আজ পঁয়ষট্টি পেরিয়ে এসেছি কিন্তু আজও আমার কাজের দিন চোদ্দো ঘণ্টারই। কাজই আমার জীবন। গল্প করে, আড্ডা মেরে নষ্ট করার মতো সময় বের করতে পারিনি বিশেষ, তাই আমার বন্ধু বলতে তেমন কেউই নেই। এবং আমাকে তেমন ভাবে জানেন খুব কম মানুষই। সে কারণে কোনো ক্ষোভও নেই। কারণ মেশার যোগ্য বা বন্ধুত্বের যোগ্য খুব কম মানুষই দেখলাম জীবনে। বন্ধু বলতে ছিল আমার বন-জঙ্গলের বন্ধুরাই। তারা ছিল সন্ধ্যাতারার মতো। আপাত-রুক্ষ, বন্দুক-রাইফেল কাঁধে সেই সব বন্ধুরাই ছিল আমার সব মানসিক দুঃখ-কষ্টর বিশল্যকরণী। সেই সব তারাও একে একে হারিয়ে যাচ্ছে, প্রায় সকলেই নক্ষত্রপতনের মতো আমার হৃদয়ে উল্কার আঁচ তুলে মিলিয়ে গেছে অন্ধকার রাতের দিগন্তে। মাঝে মাঝে বড় একা লাগে এখন। সুখ-দুঃখের, প্রাপ্তি-বঞ্চনার কথা, মন খুলে বলার মতো একজন মানুষও যার নেই এই সংসারে, সে বড়োই অভাগা।

ঋতুর জন্মদিন প্রসঙ্গে মনে পড়ে, একদিন ট্রাইব্যুনাল থেকে লাঞ্চে বাড়িতে এসেছি, খেয়ে আবার অফিসে যাব। দেখি ঋতু একটি নতুন তাঁতের শাড়ি পরে আছে।

বললাম, কী ব্যাপার? আজ কী?

ও দুষ্টুমি-ভরা হাসি হেসে বলল, আজ আমার জন্মদিন, মা এই শাড়িটি দিয়েছেন। সত্যি-সত্যিই অভিমান যদি তার হয়েও থাকে তবেও তার কোনো প্রকাশ ছিল না। আমি লজ্জাতে মরে গেছি, বলেছি চলো, রাতে কোথাও খেতে যাই সকলে। ও বলেছে, আমার ওই সব বাহ্যিক ব্যাপার ভালো লাগে না।

আমি এরকমই। অত্যন্তই অগোছালো আমি নানা ব্যাপারে। আমার নিজের জন্মদিন যে কবে তাও আমার মনে থাকে না। সে সব মনে রাখে ঋতু এবং আমার মেয়েরা এবং সাম্প্রতিক অতীত থেকে আমার অগণ্য পাঠক-পাঠিকারা। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে যায় আবারও। তিনি বলেছিলেন না যে, যে আত্মীয়তা আমরা রক্তসূত্রে পাই, সেই পাওয়ার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। রক্তসূত্রের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও সেই মানুষের সঙ্গে কোনোরকম আত্মিক যোগ আমাদের নাও থাকতে পারে। কিন্তু যে আত্মীয়তা আমরা ব্যবহারিক সূত্রে অর্জন করি, সেই সব আত্মীয়তাই আত্মার আত্মীয়তা। যে বা যারা আত্মার কাছে থাকে সে বা তারাই তো আমাদের পরমাত্মীয়। সেই অর্থে আমার পাঠক-পাঠিকারাই আমার পরমাত্মীয়।

বিয়েও হয়ে গেল। ভাগ্যবানে বিয়ে করে শ্বশুরমশায়ের কাছ থেকে গাড়ি পায়, আমি পেলাম বাবার কাছ থেকে, তবে যৌতুক হিসেবে নয়, অফিসের পার্টনার হিসেবে, কাজের কড়ারে। সে গাড়ি, সত্যি কথা বলতে কী, অফিসের কাজ ছাড়া ব্যক্তিগত কাজে খুব কমই ব্যবহার করেছি। ছুটি বলতে ছিল রবিবার ছাড়া মাসের দ্বিতীয় শনিবার। অন্য কদিন সকাল আটটা-সাড়ে আটটা থেকে রাত আটটা-সাড়ে আটটা অবধি কাজ করেছি। তারপরে লেখাপড়ার কাজ। ঋতুকে বা মেয়েদের আমি অত্যন্তই কম সময় দিতে পেরেছি। যতটুকু উদবৃত্ত সময় পেয়েছি তা গান শুনে বা সাহিত্য পড়ে কাটিয়েছি। আনন্দ বলতে ছিল জঙ্গলে যাওয়া। যখন পর্যন্ত শিকার আইনি ছিল ততদিন শিকারও করেছি। জঙ্গলে গেলেই সব ক্লান্তি অপনোদিত হয়ে গেছে। নিজেকে নবীকৃত করে ফিরে এসেছি, সে যে-জঙ্গলেই যাই না কেন। জঙ্গলে মাঝে মাঝেই এবং আজও না যেতে পারলে আমি হয়তো অনেকদিন আগেই মরে যেতাম।

অনেক মানুষ দেখলাম জীবনে। ব্যবসাদার, শিল্পপতি, আমলা, কবি, সাহিত্যিক, গাইয়ে, চিত্রকর, অনেকই দেখলাম। কিন্তু মানুষের মতো মানুষ, ভালোবাসার বা সখ্যতার মতো মানুষ বড়ো কমই দেখলাম। জীবনের শেষে পৌঁছে অন্য কথা বলতে পারলে সুখী হতাম কিন্তু পারলাম না বলে দুঃখিত। একজন অন্তর্মুখী, গভীর এবং ব্যস্ত মানুষের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে আরেকজন ওই রকম মানুষই, অন্য কেউ নন। আর হতে পারে সাহিত্য, সংগীত, ভালো ছবি। সমমনস্ক মানুষের সঙ্গে ছাড়া বন্ধুত্ব করা যায় না, বন্ধুত্ব করা সম্ভব নয়।

পাঠক! আপনি যদি নিজে ব্যতিক্রমী মানুষ হন তবে আপনাকে একা একাই জীবন কাটাতে হবে। একে অভিশাপ ভাবলে ভাবুন, আশীর্বাদ ভাবলে তাই। জীবনকে যা কিছু দেওয়া যায়, সমুদ্রেরই মতো, জীবন তাই ফিরিয়ে দেয়। কমও নয়, বেশিও নয়। জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রকে, অত্যন্তই সুখের কথা এই যে, এখনও দলবাজি, ক্ষমতালিপ্সা, ঈর্ষা, হিংসাপরায়ণতা আবিল করতে পারেনি। এ সব আবিলতা অন্তঃসারশূন্যতারই লক্ষণ। যার বাস গভীরে সে নিস্তরঙ্গ জীবনই কাটায়।

আজকাল 'জনপ্রিয়তা' বলতে যা বোঝায়, যা মিডিয়ারই দান—তাতে সেই সব মানুষের কোনো লোভ নেই। তাঁদের বাস অন্যের হৃদয়ের গভীরে। রাম-শ্যাম যদু-মধুর জনপ্রিয়তা তাঁদের কখনো কাম্য ছিল না। এখন "গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে, আর কোলাহল নাই/রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি শুনিবারে পাই।। সকল বাসনা চিত্তে এল ফিরে, নিবিড় আঁধার ঘনাল বাহিরে—/প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে জ্বলিতেছে এক ঠাঁই।"

একাকিত্ব অভিশাপের নয়, গভীরতাগুণ সম্পন্ন মানুষের কাছে তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় একজনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "নির্জনতা কখনও কারোকে খালি হাতে ফেরায় না।" এর চেয়ে বড়ো অনুভব বেশি নেই।

বহরমপুরে বাবার অফিসের একটি ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছিল পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়াতে। বাবার বন্ধু শ্রীপরেশনাথ রায়ের অকৃপণ সাহায্য ছাড়া এ ব্রাঞ্চ খোলা সম্ভব ছিল না। আর সম্ভব হয়েছিল বাবার অক্লান্ত ও অমানুষিক পরিশ্রমে। ষাটের দশকের একেবারে গোড়ায় আমি বাবার অংশীদার হই। তারও বছর চারেক আগে আমার মামাতো দাদা, আশিসকুমার বসু অংশীদার হন। তিনি বাবার জুনিয়র হিসেবে অনেকদিন কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, যে সুযোগ আমি পাইনি—কারণ প্রথমেই, সি এ পাশ করার অনেক আগে থেকেই ট্রাইব্যুনালে অ্যাপিয়ার করছিলাম বলে পেশার প্রথম দিন থেকেই একা একাই কাজ করতে শিখি। তাছাড়া যে কথা না স্বীকার করলে অন্যায় হবে, তা, কাজের ব্যাপারেও আমি অত্যন্তই স্বাধীনচেতা ছিলাম। সেই চরিত্রদোষেই নিজের বাবার জুনিয়র হওয়াও আমার হয়ে ওঠেনি।

আসানসোলে একটি ব্রাঞ্চ খোলার জন্যে একবার যাওয়া হল। আপকার গার্ডেনসে একটি বাড়িও নেওয়া হল। গরমের সময়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই গরমে গাড়িতে করে গিয়ে বাবা দারুণ গরম-জ্বরে

আক্রান্ত হয়ে অটওয়াল হোটেলে শুয়ে থাকলেন। তখন অটওয়াল হোটেলই একমাত্র ভালো হোটেল ছিল আসানসোলে। বার্নপুরে ছিল বার্নপুর হোটেল এবং কুলটিতে কুলটি হোটেল। দুটিই ছিল পারসিদের মালিকানাতে এবং আমাদের মক্কেল। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লাখনিতে আমাদের বহু মক্কেল ছিলেন। আর চালকল মক্কেলও ছিলেন অনেক বর্ধমানে। বর্ধমান থেকে ধানবাদ পর্যন্ত নিত্য যাতায়াত ছিল আমাদের অডিট করতে এবং আয়কর সংক্রান্ত মামলায় সওয়াল করতে।

আসানসোলের অফিস ভালো স্টাফের অভাবে অচিরেই বন্ধ করে দিলেন বাবা। যাঁর উপরে ওই অফিসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি কথাতে যতখানি দড় ছিলেন, কাজে ছিলেন না।

তারপরে বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যে কৃষ্ণনগরে একটি অফিস চালু করবেন। আগে বহরমপুরেই মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার আয়কর দপ্তর ছিল। নদিয়া জেলার আলাদা অফিস খুলল আয়কর বিভাগ পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি বা ষাটের দশকের গোড়াতে। সেই অফিস দেখার ভার দেওয়া হল আমাকে।

তখনকার দিনে এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্যে বাইপাস ছিল না। যশোর রোড ছিল সরু একটি ছায়া-সুনিবিড় পথ। কৃষ্ণনগরের দূরত্ব ছিল পঁচাত্তর মাইল গাড়ি চালিয়ে গেলে। ট্রেন বলতে ছিল লালগোলা প্যাসেঞ্জার, এখন যার নাম ভাগীরথী এক্সপ্রেস। সকালের প্রথম গাড়ি ছিল আটটা পাঁচ কী দশে। সে গাড়িতে গিয়ে কৃষ্ণনগর শহরে (প্লাটফর্মে তখন লেখা থাকত 'কেষ্টনগর সিটি') পৌঁছোতে পৌঁছোতে পৌনে এগারোটা হয়ে যেত। ওই অসময়ে পৌঁছে কাজ সমাধান করা অসম্ভব ছিল। তাই বাধ্য হয়েই ভোর পাঁচটাতে বেরিয়ে গাড়ি চালিয়েই কৃষ্ণনগরে পৌঁছোতে হত। ন'টার আগেই পৌঁছোনো যেত।

তখনও পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্কৃতি আজকের মতো হয়ে ওঠেনি। সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে কাজ সকাল দশটার আগে থেকেই আরম্ভ হত। তাছাড়া, ইনকামট্যাক্স অফিসে আমার দশটাতে পৌঁছোলেই হত না। তার আগে মক্কেলদের কাগজপত্র দেখতে হত। তাঁদের খাতাপত্র, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট, জাবেদা-খতেন সব দেখে নিয়ে তৈরি হয়ে তারপরই হাকিমদের সামনে পৌঁছোনোর রেওয়াজ ছিল। তৈরি হয়ে না গেলে হাকিমেরা যে মাথা কেটে ফেলতেন তা নয়, কিন্তু নিজের আত্মসম্মানেরই কারণে তৈরি না হয়ে হাকিমদের সামনে উপস্থিত হওয়ার সংস্কৃতিতে জীবনের প্রথমদিন থেকেই শামিল হইনি। আজকাল পূর্ণ অবসরের প্রাক্কালে আইন তেমন পড়ি না, কারণ সময় সত্যিই করে উঠতে পারি না এত কিছু করার পরে। তবে ফ্যাক্ট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হয়ে আজও কোনো হাকিমের কাছেই যাই না, তিনি কমিশনারই হোন বা ট্রাইব্যুনালের মেম্বার। অধস্তন অফিসারদের কাছে আজকাল যাই-ই না বলতে গেলে। না, তাঁদের প্রতি সম্মানের কোনো ঘাটতি আছে বলে নয়, সময়ের অভাবেই যাই না। তাছাড়া লেখক, চানঘরের গায়ক, শখের চিত্রকর ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি পরিচয়ের সুবাদে পথে-ঘাটে ট্রেনে-প্লেনে যে রকম অযাচিত সম্মানে গত বেশ কয়েকবছর ধরে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি সেই সম্মানবোধে স্ফীত-মস্তিষ্ক নিয়ে যার-তার কাছে 'হুজৌর মাই বাপ' মানসিকতা বজায় রাখা অসুবিধারই হয়। তা না রাখতে পারলে আমার নিজস্ব কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু মক্কেলের অসুবিধে অবশ্যই হতে পারে। মক্কেলের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজই কোনো ব্যবহারজীবীর কখনোই করা উচিত নয়। তেমন অবস্থার উদ্ভব হলেই তাঁর পসার চিরদিনের মতোই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এখন পেছন ফিরে দেখলে, বহুবছরের পেশার জীবনের অনেক ব্যথা, অনেক ঘটনাই মনে পড়ে হাসি পায়।

ষাটের দশকের মাঝামাঝির কথা। তখন আমি ঘোর অ্যাকাউন্ট্যান্ট। কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, আসানসোল, রাঁচি, পাটনা, ধানবাদ, শিলং ইত্যাদি জায়গায় তো বটেই দিল্লিতেও প্রায়ই যেতে হয়।

আসাম থেকে আসামের তৎকালীন ইনকামট্যাক্স কমিশনার মিস্টার কে ই জনসন (কেনেথ এডওয়ার্ড জনসন) বদলি হয়ে কলকাতাতে এলেন। কলকাতার সিনিয়রমোস্ট কমিশনার। তখন সেই পদকে বলত সি আই টি ডাব্লু বি ওয়ান। মিস্টার এফ এইচ ভল্লিভয় (তিনি গুজরাতি ভোরা

সম্প্রদায়ের মুসলমান ছিলেন) দিল্লির সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেসের মেম্বার হয়ে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটে চলে গেছেন, নর্থ ব্লকের অফিসে, এই ঘটনার কয়েকমাস আগে আসামের যমদুয়ারে (নাম শুনেই অনুমান করতে পারছেন জায়গার ভয়াবহতা) ভল্লিভয় সাহেব কলকাতা থেকে আর দিল্লির কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের কোদন্ডরমন সাহেব দিল্লি থেকে শিলঙে এসেছিলেন ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস Scaling down কমিটির মিটিঙে। সেখান থেকে কাজ শেষ করে মিস্টার ডি ওয়াংদির সঙ্গে তাঁর গাড়িতে করেই শিলং থেকে ধুবড়ি হয়ে যমদুয়ারে এসেছিলেন বাঘ শিকারের অভিপ্রায়ে জনসন সাহেব। সঙ্গে কুতূহলী ভল্লিভয় সাহেব। জনসন সাহেবের বাবা ছিলেন উত্তর প্রদেশের চিফ-কনজার্ভেটর অফ ফরেস্টস। তাই বাঘের প্রতি আকর্ষণ তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। কিন্তু তখনও বাঘ মারা তাঁর হয়ে ওঠেনি। তাই যমদুয়ারে গমন। আমিও গেছিলাম অকুস্থলে কলকাতা থেকে জ্যাম এয়ার কোম্পানির প্লেনে রূপসি এয়ারপোর্টে (ধুবড়ির কাছে) নেমে যমদুয়ারে। এইসব ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বলা আছে আমার আত্মজৈবনিক শিকারের নামচা 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'তে। তাই এখানে বিস্তার করছি না আর।

পরে জনসন সাহেব যখন কলকাতাতে আসেন এবং বেশ কয়েকবছর দিল্লিতে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেসেব মেম্বার হয়ে চলে যাবার আগে পর্যন্ত সি আই টি ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়ান হয়ে কলকাতাতেই থাকেন। শিকারের সূত্রেই তার সঙ্গে আমার এক গভীব অসমবয়সি সখ্য হয় ; সে সখ্য তাঁব মৃত্যু পর্যন্ত থিতু ছিল। তাঁব স্ত্রী জেন-ও আমার বন্ধু ছিলেন। ব্যাঙ্গালোরের কাছে হোয়াইটফিল্ডে থাকতেন তাঁরা। তাঁর সঙ্গে দুবছর আগে পর্যন্তও যোগাযোগ ছিল। জানি না, তার পরে কী হয়েছে। কেন জনসনের মতো ভালো বন্ধু আমি এ জীবনে খুব বেশি পাইনি। বিশেষ করে আয়কর দপ্তরে। আমার তাঁর কাছে চাইবার কিছুই ছিল না। যদিও ওই বন্ধুত্বব সুযোগ ইচ্ছে করলে নানাভাবে নিতে পারতাম। অবশ্য সুযোগ-সন্ধানীরা বন্ধু কখনোই পান না। কেন-ও যেমন ছিলেন বড়ো মনের, সৎ এবং উদার অতি-উচ্চপদস্থ একজন সরকারি অফিসার, আমিও হয়তো সততা এবং মানসিকতার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার যোগ্য ছিলাম। দুদিন কথা না হলেই কেন আমাকে ফোন করে বলতেন, কী হে। মস্ত বড়ো উকিল হয়েছ মনে হচ্ছে। লাঞ্চের আগেই চলে এসো অবশ্যই। কথা আছে। আসলে কথা তেমন কিছুই হত না, কবে কোথায় বাঘ বা চিতার খোঁজে যাওয়া যায়, কোন্ নদীর চরে বা বিলে গিজ বা নাকটা বা বাহমনি ডাকস অর্থাৎ চখাচখি দেখা গেছে এইসব খোঁজখবরের লেনদেন আর অন্য নানা গল্প। কেন-ও তখন পাইপ খেতেন, আমি তো খেতামই। দার্জিলিঙের তৎকালীন ইনকামট্যাক্স অফিসার সর্দার মানজিৎ সিং মান জনসন সাহেবের জন্যে অরেঞ্জ-পিকো চা পাঠাতেন। আমরা দুজনে আধঘণ্টাটাক ধরে কাপের পর কাপ চা খেতাম আর পাইপ খেতাম।

একজন ইনকামট্যাক্স অফিসার ছিলেন বাঙালি, নাম উল্লেখ করার দরকার নেই কোনো, তাঁর একটু মাত্রাতিরিক্ত হাকিম হাকিম ভাব ছিল। তিনি ক্লাস টু ডাইরেক্ট রিক্রুট ছিলেন। চাকরি জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেও দুর্ভাগ্যবশত তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারও (এখনকার জয়েন্ট কমিশনার) হতে পারেননি। সরকারি দপ্তরেই নানা লীলাখেলা, মরাসোঁতা, চোরাস্রোত থাকে, যার বলি হতে হয় অনেককেই।

তিনি যেহেতু 'হাকিমি' পছন্দ করতেন আমিও তাঁকে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সম্মান দেখাতাম হাকিম হিসেবে। কারণ ওকালতি শুধু আইন বা ফ্যাক্ট জানলেই হয় না, ভালো উকিল যিনি হতে চান তাঁকে মনস্তত্ত্ববিদও হতে হয়। একদিন তাঁর কাছে কেস করতে গেছি, তিনি বেজায় চটে উঠে বললেন, আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক গুহ সাহেব।

আমি তাঁর রোষের কারণ না বুঝতে পেরে বললাম, কেন বলুন তো?

কেন আর কী! সেদিন বড়ো সাহেবের ঘরে তাঁর পিএ-র তলব পেয়ে আমি আর আই এ সি সাহেব যেতেই বেয়ারা বলল, জারা ঘুমকে আইয়ে সাহাব। গুহা সাব অন্দর হ্যায়।

কোন গুহা সাহাব?

গুহা সাহাব, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

সেই সময়ে ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা অ্যাডভোকেটদের মধ্যে গুহ পদবির আর কেউই ছিলেন না। যদিও হাকিম ছিলেন দু-তিনজন। আমার উল্লিখিত হাকিম জনসন সাহেবের ঘরের দরজার মধ্যে যে চতুষ্কোণ কাচ ছিল তা দিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করে ফিরে গেলেন। তাঁর আগমন এবং নিষ্ক্রমণ সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্রও অবহিত ছিলাম না।

দিন কয় পরে তাঁরই ঘরে কেস পড়েছিল। সকালেই গেছিলাম। তখন কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে 'সকাল' মানে দশটা ছিল। সকাল দশটাতে কাঁটায় কাঁটায় অ্যাপেলেট অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনাররা অ্যাপিল আরম্ভ করতেন। অফিসার ও কমিশনাররাও দশটার মধ্যেই অফিসে আসতেন। ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তখন আজকের মতো 'পূর্ণ স্বাধীনতা' কায়েম হয়নি, যেমন স্বাধীনতার কথা সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেব তাঁর 'দেশে বিদেশে' বইয়ে বলেছিলেন।

স্লিপ দিতেই হাকিম ঘরে ডাকলেন। ফাইল খোলার আগেই বললেন, আপনি জনসন সাহেবকে চেনেন?

চিনি।

আমি বললাম।

তা আগে আমাকে বলেননি কেন?

বলার তো কোনো প্রয়োজন হয়নি।

আপনি পাইপ খান?

খাই।

আমাকে আগে বলেননি কেন?

আপনি তো আমার মরাল গার্জেন নন।

বলেই, আমি হেসে ফেললাম।

উনি কিন্তু হাসলেন না একটুও। বললেন, খান তো আমার সামনে কোনোদিনও খাননি কেন?

আমি পাইপ অফিসেই রেখে আসি। অনেক হাকিম তাঁদের সামনে পাইপ খাওয়াকে বেয়াদপি বলে মনে করেন। আমার কারণে মক্কেলের ক্ষতি হয়ে যেতে পাবে। এই ভয়ে হাকিমদের কারো সামনেই খাই না।

তবে জনসন সাহেবের সামনে খাচ্ছিলেন যে বড়ো!

আমি বললাম, কেন জনসন যদিও পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো হাকিম, আমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা পুরোপুরিই বন্ধুত্বের। শিকারের বন্ধুত্বের। ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে যা করা যায় তা কি হাকিমের সামনে করা যায়?

আপনি কি রেসের মাঠে যান? মাছও ধরেন?

না। বলেছি তো। আমি শুধু ওঁর শিকারের বন্ধু। তবে হ্যাঁ, হুইস্কি খাই জঙ্গলে গেলে একসঙ্গে অথবা উনি যখন ওঁর বাড়িতে আমাকে নেমন্তন্ন করেন।

আপনার সঙ্গে বড়ো সাহেবের এমন বন্ধুত্ব এ কথাটা আপনার আমার কাছে লুকিয়ে রাখাটা আদৌ উচিত হয়নি। আমি যদি ওঁর সম্বন্ধে কোনো খারাপ কথা বলে ফেলতাম।

আমি হেসে বললাম, খারাপ কথা বলার মতো কিছু তো নেই ওঁর সম্বন্ধে। ওঁর মতো সৎ, ভদ্রলোক এবং কড়া অফিসার আমি তো বেশি দেখিনি। আর্মি থেকে এসেছেন, আয়কর আইন সম্বন্ধে জ্ঞান হয়তো তেমন গভীর নয়, কিন্তু অমন ফেয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কমই দেখা যায়।

হ্যাঁ। ফেয়ার না থোরি! সেদিন আমাকে ডেকে বললেন, "হ্যাড উ্য বিন সিটিং অন ইয়োর ব্লাডি আঁস অল দিজ ইয়ারস?"

আমার হাসি পেল কিন্তু চেপে বললাম, কেন অমন কথা বললেন?

ওই।

ওই মানে?

মানে, একটা বড়ো রিফান্ড পড়ে ছিল বহুদিন। বললেন, ট্যাক্স-পেয়ারদের টাকাতে সরকার চলে। তাঁদের কাছে ট্যাক্স বাকি থাকলে যেমন আদায় করতে হবে, তাঁদের রিফান্ড পাওনা থাকলেও তা সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিতে হবে। একদিনও ফেলে রাখা চলবে না।

আমি চুপ করে রইলাম।

হাকিম বললেন, আপনারা মতো sneaky মানুষ বেশি দেখিনি।

চুপ করেই রইলাম। মক্কেলের গ্রস প্রফিটের রেট সেই অ্যাসেসমেন্ট ইয়াবে অনেক পড়ে গেছিল, কয়েক কোটি টাকা টার্নওভার। এক্সপ্ল্যানেশান ভালো করেই লিখে এনে ছিলাম তবুও যোগ করে দিলে কয়েক লাখ যোগ হয়ে যাবে, ট্রাইব্যুনাল অবধি দৌড়োতে হবে। হাকিমদের সামনে কেন যে পাইপ খাই না, তাঁরা যে কী বিচিত্রমতি বিচিত্রগতি তা তাঁরা নিজেরা যদি বুঝতেন একটুও!

হাকিম আবারও বললেন, জনসন সাহেবের জিগরি-দোস্ত আপনি আর সেই কথাটা চেপে গিয়ে এতদিন...।

আমার মনে হল হাকিম যেন সুন্দরী বমণী এবং আমি গনোবিয়া বা সিফিলিসের রোগী। এতদিন রোগের কথা গোপন করে রেখে তাঁর কাছে বড়োই অন্যায় করেছি।

উকিলেরাই শুধু জানেন উকিলদের নানারকম কষ্টের কথা। তা তিনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টই হন কি সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট। হাকিমদের মধ্যে যে কত রকমের চরিত্র থাকে তা উকিলদেব চেয়ে ভালো আর কেউই জানেন না।

বলছিলাম কৃষ্ণনগরের কথা। প্রথম অফিস ছিল গাছগাছালিতে ঘেবা নেদেরপাড়াতে। তারপরে অফিস আনা হয় পাত্র মার্কেটের কাছে একটি বাড়িতে। সকালে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে মক্কেলদের খাতাপত্র দেখে, তাদের নানা প্রশ্নের উত্তব দিয়ে, তাদেব নানা প্রশ্ন করে জ্ঞাতব্য জেনে ইনকামট্যাক্স অফিসের উদ্দেশে রওনা হতাম। খাওয়া হত না অধিকাংশ দিনই। অফিসারদেব ঘরে হয়তো চা-শিঙাড়া খেতাম। কোনো কোনোদিন তাও নয়। সব কেস যখন শেষ হত তখন তিনটে বা চাবটে বাজে। বাসন্ত্রী হোটেলে খেতে যেতাম। অধিকাংশ দিনই তখন আব খাবাব পাওযা যেত না। অফিসে ফিরে চা-টা খেয়ে আবার বড়ো বড়ো মশার লাগাতার কামড়ের মধ্যে বসে বসে মক্কেলদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর। জাবেদা-খতেনেব মধ্যে থেকে নানা তথ্য এবং নতুন শব্দ উঠে আসত যা কোনো সাহিত্যর বইয়ে পাওয়া যায় না। যেমন 'রাখন্তি'। নদিয়া জেলাতে রক্ষিতাকে বলে 'রাখন্তি'। কোনো মক্কেলের খাতাতে একজন মহিলার নামে দশ হাজাব টাকা জমা ছিল—তার উপরে মক্কেল সুদ জমা করতেন। টাকাটা কার? সেই প্রশ্নর উত্তরে মক্কেলের মুহুরি বললেন, বাবুর রাখন্তির টাকা। রাখন্তিটা কী ব্যাপার? জিজ্ঞেস করতে ওই তথ্যটি জানা গেল। ষাটের দশকের গোড়াতে দশ হাজার টাকা কম টাকা ছিল না। তাছাড়া, মক্কেলের বুকের পাটা ছিল বলতে হবে নইলে রক্ষিতার নিজের নামে টাকা রাখেন নিজের ব্যবসার খাতাতে!

কৃষ্ণনগরের মক্কেলরা ও তাঁদের মুহুরিরা আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, ভালোও বাসতেন। অত্যন্ত অবস্থাপন্ন মক্কেল বেশি ছিলেন না যদিও তবে বিচিত্র ছিল তাঁদের ব্যবসা ও পেশা। পাইকারি তেজারতি কারবার ছিল অনেকের, কেউ বা ছিলেন পাটের ব্যবসায়ী, কেউ বা স্বর্ণকার, কেউ পেতল কাঁসার বাসন তৈরি করতেন অথবা কারবারি, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।

ইনকামট্যাক্স অফিসের সঙ্গে শ্মশানের খুবই মিল আছে। এমন 'লেভেলার' বড়ো একটা দেখা যায় না। বড়ো ছোটো, ভদ্র অভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই এখানে সমান।

আগেই বলেছি, ষাটের দশকের মাঝামাঝি কৃষ্ণনগর ইনকামট্যাক্স অফিসের পত্তন হয়। যতদূর মনে পড়ে পি এন ব্যানার্জি সাহেব ছিলেন বড়ো হাকিম, যাঁদের বলে চার্জ আই টি ও আর সি আর ঘোষাল সাহেব ছিলেন ছোটো হাকিম। তিনি সবে তখন অফিসারের পদে উন্নীত হয়েছেন। কৃষ্ণনগরের মতো ক্ষুদ্র-রাজস্বের চার্জে ডাইরেক্ট রিক্রুট বা ক্লাস ওয়ান অফিসারদের পোস্টিং হত না।

ক্লাস ওয়ান ডাইরেক্ট রিক্রুট অফিসারদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য বা দর্শন বা বিজ্ঞান বা অঙ্কের বা অর্থনীতির ভালো ছাত্র ছিলেন। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে বসে তাঁরা পরীক্ষা পাশ করে সরাসরি চাকরিতে আসতেন। পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো যাঁরা ফল করতেন তাঁরা পেতেন ফরেন সার্ভিস, তারপরের দল পেতেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, তারও পরে যাঁরা থাকতেন তাঁরা পেতেন রেভিন্যু সার্ভিস, যার মধ্যে পড়ত কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসেস। আরও ছিল। পুলিশ এবং ফরেস্ট সার্ভিসেসও পড়ত। অনেকে আবার খুব ভালো ফল করা সত্ত্বেও নিজের পছন্দানুযায়ী রেভিন্যু বা পুলিশ বা ফরেস্ট সার্ভিসে জয়েন করতেন।

যাঁরা ডাইরেক্ট রিক্রুট অফিসার নন, করণিক বা ইন্সপেকটরের পদ থেকে যাঁরা আয়কর বিভাগে ধাপে ধাপে উন্নতি করে হাকিম হতেন, তাঁরা অনেক সময়েই কাজ ভালো জানতেন, খাতাপত্রের ঘোঁতঘাঁত সম্বন্ধে তাঁদের অনেকেরই ভালো ধারণা ছিল ডাইরেক্ট রিক্রুট অফিসারদের থেকে। তবে ডাইরেক্ট রিক্রুটদের সাহস ও তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রমোটিদের চেয়ে বেশি।

হাকিমদের মাড়োয়ারি খাতা পড়তে শিখতে হত—শুধু শেখাই নয়, রীতিমতো পরীক্ষাতে বসে পাশ করতে হত। বাংলা খাতা, মাড়োয়ারি ও গুজরাতি খাতা এবং ইংরেজি হিসেবের খাতা পড়া এক আর্ট বিশেষ ছিল। আর অ্যাকাউন্টস পড়তে না পারলে তার ভুল-ভ্রান্তি এবং চুরি-জোচ্চুরি ধরাই বা যাবে কেমন করে!

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। নানা ভাষাভাষীর দেশ। নানা সম্প্রদায়ের দেশ। 'ফিনান্সিয়াল ইয়ার' বা 'ব্যবসায়িক বছর' যে কতরকমের হত তা বলার নয়। বাংলা সন মানে পয়লা বৈশাখে আরম্ভ হয়ে ৩১শে চৈত্রে শেষ। অনেক বাঙালি আবার অক্ষয় তৃতীয়া থেকেও ব্যবসার বছর শুরু করতেন। অনেকে আবার রথযাত্রার দিনে। মাড়োয়ারি দেওয়ালি, সম্বৎ, রামনবমী, গুজরাতি দেওয়ালি, ইংরেজি ক্যালেন্ডার ইয়ার অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ৩১শে ডিসেম্বরে শেষ, ইংরেজি ফিনান্সিয়াল ইয়ার অর্থাৎ ১লা এপ্রিলে শুরু ৩১শে মার্চে শেষ ইত্যাদি। এরকম বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোনো দেশেই হয়তো দেখা যেত না। ইনকামট্যাক্সের অ্যাসেসমেন্ট হয় 'অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার' হিসেবে। সাধারণত ফিনান্সিয়াল ইয়ারের পরের বছরটি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার হিসেবে গণ্য হয়। যেমন, সেদিন বাজেট পেশ হলো ২০০১-২০০২ বছরের জন্যে। সেই বছরের ইনকামট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট যখন হবে তখন সেই বছরকে বলা হবে ২০০২-২০০৩ অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার। আগে অগণ্য ফিনান্সিয়াল ইয়ার চালু থাকাতে নানা ঝামেলা হত। ফিনান্সিয়াল ইয়ারকে আয়করের পরিভাষাতে বলে 'প্রিভিয়াস ইয়ার'। এই প্রিভিয়াস ইয়ারের কত মাসে এক অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার হবে তাও আইনেই নির্ধারিত ছিল। এসব ঝামেলা অবশ্য আজকাল মিটে গেছে। সারা দেশে ফিনান্সিয়াল ইয়ারই একমাত্র মান্য আর্থিক বছর, অর্থাৎ ১লা এপ্রিল থেকে ৩১ শে মার্চ বলে মান্য করার আইন বহুদিন হল আমাদের দেশে চালু হয়েছে।

কৃষ্ণনগরে ইনকামট্যাক্স অফিস চালু হবার পরে বহরমপুরের অনেক উকিল কৃষ্ণনগরে এসে প্র্যাকটিস করতেন। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, আদিতে সেইসব ফাইল তো বহরমপুরের এক্তিয়ারেই ছিল।

বর্মন সাহেব নামের একজন সর্বদা পান খাওয়া হাসিমুখের উকিল আসতেন। তিনি আইন পাশ করা উকিল ছিলেন কিনা তা আমি জানি না। ভালো মানুষ। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য দপ্তরে কাজ করতেন আগে। তখন বি কম-রাও প্র্যাকটিস করতে পারতেন। বর্মন সাহেবের 'সেট ফেজ' ছিল "মাইরোন না স্যার।" ওঁর সওয়ালে এটিই ছিল অকাট্য যুক্তি।

পাঠক! আপনারা জানলে হয়তো অবাক হবেন যে মনীশ জেঠু (ঘটক, কবি যুবনাশ্ব) মহাশ্বেতাদির বাবা, বহরমপুর থেকে কৃষ্ণনগর আসতেন কেস করতে। উনি আয়কর বিভাগের হাকিম ছিলেন। হাকিম থাকাকালীন কোনো মফঃস্বল শহরে 'ক্যাম্প' করতে গেছিলেন। ঘটক পরিবারের সুরাসক্তি ও

ক্ষুরধার মেধা সর্বজনবিদিত। ডাকবাংলোতে একটু অধিক পরিমাণে মদ্যপান করায় অথবা মন্দলোকে জবরদস্তি করে পান করিয়ে দেওয়ায় তিনি দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েন এবং এক বা একাধিক অসৎ ব্যবসায়ীর ফাইল সেই রাতেই চুরি হয়ে যায়। তখন ইংরেজ আমল। মনীশ জেঠুকে সঙ্গে সঙ্গে সাসপেন্ড করেন ইংরেজ আয়কর কমিশনার।

মনীশ জেঠুর কণ্ঠস্বরটি ছিল উদাত্ত। ছ'ফিটের উপর লম্বা ছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সিলমোহর ছিল তাঁর চেহারায়। প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা। মহাশ্বেতাদির চেহারার সঙ্গে তাঁর বাবার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখতেন তখন। রাজার মতো দেখাত তাঁকে। তবে দুষ্টু মক্কেলরা বলত, ঘটক সাহেব নাকি ফিস নিয়ে হাকিমের সঙ্গে দেখা করে, 'যা। তারিখ পড়ে গেছে' বলে মক্কেলকে বিদায় করে শুঁড়িখানাতে চলে যেতেন।

যিনি পটলডাঙ্গার পাঁচালি লিখতে পারেন, যিনি যুবনাশ্বর মতো কবিতা লিখতে পারেন, "বন্ধনমুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয় সহসা উদ্বেল হল শুভ্র বক্ষময়"-এর মতো পংক্তি লিখতে পারেন, "একই অস্ত্রে হত হল মৃগী ও নিষাদ"-এর মতো পংক্তি লিখতে পারেন তাঁর পক্ষে সত্যিই তো সায়ান্ধকার ঘরে নড়বড়ে চেয়ারে বসে অতি সাধারণ সব সাহিত্য-সংগীত-অসম্পৃক্ত হাকিমদের সামনে বসে খেরোখাতা খুলে গ্রস-প্রফিট নেট-প্রফিটের পার্সেন্টেজ, তাদের ওঠা-নামাব জবাবদিহি, ক্যাশ-ক্রেডিটের এক্সপ্লনেশান দেওয়া কী পোষাত। ইংরেজিতেও খুব ভালো দখল ছিল মনীশ জেঠুর।

আমার নেহাত কোনো উপায ছিল না তাই আমাকে করতেই হত। ভালোবেসে বিয়ে করে পিতৃ পরিবারে ব্রাত্য হয়েছি, একাধিকবার সি এ পরীক্ষাতে ফেল করেছি, আমার তখন কিছু একটা করে আমি যে সত্যিই অপদার্থ নই, ভালোবাসলে বা সি এ পরীক্ষাতে তিন ঘণ্টাতে ছটা ব্যালান্সশিট মেলাতে না পারলেই যে একজন মানুষের মনুষ্যত্বই বববাদ হয়ে যায় না, তা অপ্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লাগতে হয়েছিল।

এ ছাড়াও আরও একটা কথা ছিল। জীবনে কোনো কিছুই 'খারাপ' করে বা দায়সারাভাবে করা আমার চরিত্রে ছিল না। পড়াশুনো কবিনি, যখন তখন ফেল করেছি, গান শুনে একটি মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করে বেরসিক পরিবারে ব্রাত্য বলে বিবেচিত হয়েছি কিন্তু তাই বলে আমি ফালতু তো নই। ফুরিয়েও যাইনি। আমাকে দাঁতে-দাঁত চেপে দিনে-রাতে আঠারো ঘণ্টা পরিশ্রম করে প্রমাণ করতে হবেই যে আমিও পারি। পারি। পারি এবং যাই করি না কেন অন্য অনেকের চেয়ে ভালো করেই তা করতে পারি।

নানারকম স্ববিরোধী কাজে ব্যাপৃত থাকতে হলে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। ওই কাজে অমনভাবে লেগে থাকাব পরেও আমার মনের গভীরে যে সাহিত্য ও গান-বাজনা ও ছবি আঁকার প্রতি ভালোবাসা, তা কিন্তু উবে যায়নি। উবে তো যায়ইনি, উলটে একটা দারুণ জেদের জন্ম দিয়েছিল ভিতরে। এসব করেও আমি একদিন লেখক হব বা চিত্রী বা গায়ক—এই বিশ্বাস আমার মধ্যে যে-করেই হোক জন্মেছিল।

শেষ পর্যন্ত এই জেদই আমাকে জিতিয়ে দিয়েছিল। তবে দাম বড়ো কম দিইনি।

তিন-তিনটি ফিল্ম সোসাইটির সভ্য হয়েছিলাম কিন্তু সপ্তাহে ছদিনই রাত নটার আগে অফিস থেকে উঠতে পারিনি বা কলকাতার বাইরে থেকে ফিরতে পারিনি। সরলা মেমোরিয়াল হলে সন্ধে সাড়ে ছটার সময়ে সেইসব ভালো ভালো বিদেশি ছবি দেখানো হত। মাসের একটি সেকেন্ড স্যাটারডে, রবিবার এবং রাত নটার পরে ছাড়া এক লাইনও লিখতে পারিনি অথচ বলেইছি যে, লেখক হবার অদম্য সাধ ছিল আমার।

এখন পেছন ফিরে চেয়ে, নির্লজ্জর মতোই বলছি, নিজের কৃতিত্বে নিজেই অবাক হয়ে যাই। কী করে যে পেরেছিলাম জানি না। সত্যিই জানি না। আমার স্ত্রী এবং শিশুকন্যাকে আমি সব রকম আনন্দ-আহ্লাদ থেকে, আমার সঙ্গ থেকে কীভাবে যে বঞ্চিত করেছি, তা ভাবলে নিজেকে জঘন্য অপরাধী বলে মনে হয়। এও মনে হয় যে, আমার পিতৃ পরিবার আমার ওপরে এই অত্যাচার করে তাঁদের অমতে

বিয়ে করার শাস্তি পুরোপুরি দিয়ে মনে মনে হয়তো শ্লাঘা বোধ করেছেন। স্ত্রী ও বড়োকন্যার প্রেক্ষিতে নিজেকে বড়ো স্বার্থপর বলেও আজকাল মনে হয়। কী করব। আমার কোনো উপায় ছিল না।

বাবা, মাকে বলতেন যে, 'কাজ কী আর এমনি করে ছেলে! সিলভার টনিকে করায়।'

ঈশ্বরের দিব্যি, আমার সন্তানের দিব্যি দিয়ে বলতে পারি যে, টাকার জন্য কাজ করিনি তখন। তিন-চার বছর আগে অবধিও করিনি। হয়তো এখন করি। কারণ, এই কাজ করতে আমার আর ভালো লাগে না। তবুও যাঁরা আমাকেই ব্রিফ দেন তাঁরা জেনেই দেন যে, শুধুমাত্র টাকার প্রয়োজন আছে বলেই আমি কাজ করছি।

সেই সময়ে বাবার কর্মচারীই ছিলাম মাত্র। টাকা যা উপার্জিত হত তা সব অফিসের কোষাগারেই জমা হয়েছে। বাবা যার নিয়ন্তা ছিলেন। নিজস্ব রোজগার বলতে বাবা যা ড্রয়িংস ধার্য করেছিলেন তাই। লেখার রোজগারও কিছু ছিল না। জীবনের সেই শখ-আহ্লাদের সময়ে যথেষ্ট টাকাও যদি পেতাম তা হলেও স্ত্রী-কন্যার কিছু অভাব মেটাতে পারতাম। খাওয়া-থাকা বিনি পয়সাতে অবশ্যই পেতাম, তাছাড়া আর কিছুই নয়। ঈশ্বর জানেন আর আমি এবং আমার স্ত্রী জানে সেসব কেমন বড়ো কষ্টের দিন ছিল। বড়ো গর্বের দিনও ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমার মজ্জাতে। আজও তাই আছেন। তাঁর লেখা পড়েই শিখেছিলাম যে, 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।' জীবনে সত্যিই কিছু ফেলা যায় না। কোনো কোনো বীজ ফলতে অনেক সময় নেয় হয়তো, কিন্তু ফলে। যখন ফলে, তখন চাষির রৌদ্র-জলের সব পরিশ্রমজনিত কষ্ট বহুগুণ করে, তা ফিরিয়ে দেয়। 'Nothing comes of nothing, nothing ever could, I must have done something good in my youth or in my childhood.'

যে কোনো কাজ ভালো করে শিখলে, ভালো করে করলে, যে তা করে, একদিন সে নিজেই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় তা থেকে। দক্ষতার, নিয়মানুবর্তিতার, পরিশ্রমের কোনোই বিকল্প নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক আত্মীয়কে একসময়ে লিখেছিলেন, "তুমি সাধারণ লোকের মতো কেবল খেয়ে দেয়ে টাকা রোজগার করে সংসার প্রতিপালন করে কাটিয়ে যেতে পারবে না। তোমাকে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর বিশেষ কাজ আদায় করে নেবেন এ কথা স্থির হয়েই আছে, সেইজন্যেই তোমাকে এত কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। তোমাকে নিয়ে তিনি তাঁর ইস্পাতের অস্ত্র তৈরি করবেন, সেইজন্যেই তোমার এই অল্পবয়সে তোমাকে তিনি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নিচ্ছেন....।

তুমি তোমার স্বার্থের, কেবল তোমার পরিবারের নও—ঈশ্বর তোমাকে পৃথিবীর জন্যে দান করে যাবেন।....তিনি তোমাকে আপিসে, হাটে, খাজাঞ্চিখানার দূষিত জনতা ও বদ্ধতার মধ্যে ঘুরতে দেবেন না—তোমার প্রকৃতি সেসব জায়গায় তার খাদ্য পাবে না। অতএব এখন থেকেই সর্বদাই তুমি নিজের ভিতরকার মাহাত্ম্যকে অনুভব করতে থাকো, নিজেকে একমুহূর্তের জন্যেও শক্তিহীন বলে কল্পনাও কোরো না।"

এই চিঠিটি আমার ডায়ারিতে আমি লিখে রেখেছিলাম। মাঝে মাঝেই ওই চিঠিটি পড়তাম আর দুচোখ জলে ভেসে যেত। নিজের মধ্যে এক বিশেষ জোর অনুভব করতাম। তেমনটিই অবশ্য হবার কথা ছিল। কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতো বড়ো মানুষেরা বটগাছের মতো। তাঁদের ছায়াতে এলে আমার মতো সাধারণেরা চিরদিনই শান্তি পেয়েছে, পেয়েছে নানাধরনের অনুপ্রেরণা, নিজের চারদিকের দেওয়ালকে ভাঙবার জোর পেয়েছে।

ভাগ্যিস আমাদের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন।

মনীশ জেঠু আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার ডাকনামেই ডাকতেন আমাকে 'লালা' বলে, মহাশ্বেতাদিও যেমন ডাকেন। মহাশ্বেতাদি তাঁর বাবাকে নিয়ে একটি অসাধারণ লেখা লিখেছিলেন। বইটির নাম এখুনি মনে পড়ছে না, ওঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে একটু পরেই বলব। সেই বইয়ের

কোনোই তুলনা নেই বাংলাসাহিত্যে। ওই ধরনের সেন্স অফ হিউমার বাংলাসাহিত্যে খুব কমই সৃষ্ট হয়েছে। সেই গল্পতে 'ন্যাদস' নামের একটা গোরু আছে। সে চরিত্র একেবারেই অন্যরকম হলেও শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'-এর মতোই ইম্পর্ট্যান্স দাবি করতে পারে সহজেই। ন্যাদসকে নিয়ে একাধিক লেখা লিখেছেন উনি। একদিন হয়তো লেখাগুলি একত্রিত করে 'ন্যাদস' নামের একটি বইও প্রকাশিত হবে।

মহাশ্বেতাদি শবর ও খেড়িয়া মুণ্ডাদের নিয়ে অনেক ভালো কাজ করেছেন, এখন পরিবেশ নিয়েও করছেন। যখন জিম করবেট ওমনিবাস লিখছিলেন তখন আমি আমার পৈত্রিক নিবাসে থাকতাম। মহাশ্বেতাদি তাঁর বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের 'ঠেক' থেকে মাঝে মাঝেই ইস্ত্রিবিহীন শাড়ি পরে সিগারেট খেতে খেতে চলে এসে বনজঙ্গল বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতেন আমাকে। বলতেন, জিন খাওয়াতে পারিস? বাড়িতে ওসব থাকত না। তাছাড়া সকাল সাড়ে আটটাতে বেরোতে হত আমাকে। তাই ওসব হত না। কিছুক্ষণ বাদেই উনি চলে যেতেন। বেশ কিছুদিন হল মদ্যপান একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন উনি।

ঋত্বিকবাবুকে আমি জানতাম না ব্যক্তিগতভাবে। মহাশ্বেতাদির সহোদর অনীশদাও (গীতা ঘটকের স্বামী) একদিন মহাশ্বেতাদির বালিগঞ্জের ফ্ল্যাট থেকেই বেরোতে গিয়ে মত্ত অবস্থায় দুর্ঘটনায় পড়ে চলে যান। মহাশ্বেতাদি ওই সব ছেড়ে দেওয়াতে খুব খুশি আমি। আমি মাঝে মধ্যে খাই যদিও আমার উর্ধ্বতন চোদ্দোপুরুষে কেউই খাননি। আমিই প্রথম কুলাঙ্গার। খেয়ে যে আনন্দ পাই না, তা বলব না। সবকিছুই হয়তো ভালো যদি আধিক্য দোষ না ঘটে। অশেষ গুণসম্পন্ন ঘটক পরিবারে মদ ব্যাপারটা অভিশাপ হয়েই এসেছিল। মহাশ্বেতাদি যে ট্রাডিশান ভেঙেছেন এটা জেনে খুবই ভালো লাগে।

যে কথা বলছিলাম। সিরিয়াস মহাশ্বেতাদি আমাদের গর্ব কিন্তু রসিক মহাশ্বেতাদি আমাদের দিকে একটু চাইলে বাংলাসাহিত্য ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকত। যখন মদ্যপান করতেন তখন হুইস্কি পানের পরে ওঁর মুখনিঃসৃত 'শালা!' শব্দটা এখনও কানে লেগে আছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের বইমেলাতে গিয়ে সেই মহাশ্বেতাদিকে দেখেছিলাম। তাঁকে মাঝে মাঝে অমন খোলামেলা রূপে পেলে তাতেও এক আলাদা আনন্দের স্বাদ পাওয়া যেত। তবে উনি কী করবেন না করবেন তা ওঁরই ব্যাপার।

যেদিন ম্যাগসাইসাই পেলেন, সেদিনের পরদিন কাগজে খবরটা দেখেই আমি সকাল নটা নাগাদ ফোন করলাম। বললাম, লাইন পাচ্ছিলাম না।

পাবি কী করে! ফোনের কথা তো ছেড়েই দে। টিভিওয়ালাদের জন্যেও প্রাণ বিপন্ন।

বললাম, কনগ্র্যাচুলেট করাব জন্যে ফোন করিনি কিন্তু আমি।

তবে কী জন্যে করেছিস?

এত মিডিয়ার ভিড়। শাড়িটা চেঞ্জ করেছেন তো? নাকি রাতের ইস্ত্রিবিহীন শাড়িই পরে আছেন?

দেখেছিস! সত্যি! তুই না বললে...। আচ্ছা! এত ফোন পেলাম সকাল থেকে অথচ একজনও...।

আমি হাসছিলাম। বললাম, ভাই হো তো অ্যায়সা। কী বলেন?

বছর কয়েক আগে রামকৃষ্ণ মিশনে একটি সেমিনারে দেখা হয়েছিল। মহাশ্বেতাদি বললেন, কীরে! তুইও কোনো প্রাইজ পাসনি, আমিও পাইনি। দিদি-ভাইয়ের একই অবস্থা।

তারপরেই মহাশ্বেতাদি ভেলকি দেখালেন। সম্মান, পুরস্কারের বন্যা বয়ে গেল। এখনও তা বইছে। আমাদের দেশে পুরস্কার দেনেওয়ালাদের অকালকুষ্মাণ্ডই বলতে হয়। নইলে, তাঁদের আক্কেল নামের বস্তুটি যথাসময়ে প্রস্ফুটিত হত। তাঁদের কুম্ভকর্ণর ঘুম বা দুর্যোধনের শয়তানি সব সময়েই ছড়িয়ে থাকে। যখন অনেক বিলম্বে ঘুম ভাঙে, তখন তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখে মনে হয় 'উঠল বাই তো কটক যাই।' এই জন্যেই হয়তো বলে, 'খোদা যব দেতা ছপ্পর ফাড়কে দেতা।'

প্রার্থনা করি, মহাশ্বেতাদি যেন আরো অনেক পুরস্কার পান।

আজ মণীশ জেঠুর কথা মনে পড়াতে কত কথাই না মনে এসে গেল ভিড় করে। মানুষের মন এমনই!

মনীশ জেঠুর সঙ্গে কিছু কিছু ব্যাপারে শক্তির মানে শক্তি চ্যাটার্জির মিল ছিল। আমার শিক্ষানবিশির সময়ে কালেভদ্রে মনীশ জেঠু বেশ তুরীয় অবস্থাতে দুপুরবেলাতে আমাদের কলকাতার অফিসে এসে হাঁক-ডাক করতেন। বাবার ডাক-নামে ডেকে সকলকে চমকে দিতেন। বলতেন, মনা কোথায় রে?

বলাই বাহুল্য, বাবা দিনের ওই সময়ে আয়কর দপ্তরের আট-নটা বাড়ির কোথাও না কোথাও থাকতেন। নিজের অফিসে ফিরতেন বিকেল চারটে-পাঁচটাতে, তাই মনীশ জেঠুর সঙ্গে দেখা হত না।

জেঠু বলতেন, মনাকে বলিস যে, সে একটা হারামজাদা।

বলতাম, বলব।

বাবা ফিরলে, তাঁকে বললে, বাবা হাসতেন।

পরবর্তী সময়ে শক্তিও মাঝে মধ্যে ওরকম করত। আনন্দবাজারের অফিস আমাদের অফিসের খুব কাছে বলেই হয়তো আসত। তবে মত্ত থাকলেও কখনো কোনো অসভ্যতা, অভদ্রতা এঁদের দুজনের কেউই কখনো করেননি। তবে এঁদের সঙ্গে শাহেনশা পিপেদের তফাত ছিল ও থাকবে। আকণ্ঠ মদ খেয়েও যে পিপেরা নির্বাক এবং অবিচলিত থাকেন তাঁদের নিয়েই বিপদ। তাঁদের মতো খল ও কুটিল জন কমই হয়। 'জাতে মাতাল কিন্তু তালে ঠিক!' যাঁরা, তাঁদের থেকে দূরে থাকাই ভালো। তাঁদের ধাষ্টামো প্রকৃতই ক্ষতিকারক। সেইসব মানুষগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ইতর। মনীশ জেঠু অথবা শক্তির মতো সম্ভ্রান্ত ও প্রকৃতই ভদ্র মাতাল কমই দেখেছি। মাতাল তো পেশা এবং কাব্য-সাহিত্যের জগতে কম দেখলাম না।

কৃষ্ণনগরে গাড়ি চালিয়ে যেতে-আসতে বাংলার গ্রাম-প্রকৃতির মধ্যে ঋতু বদলের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে আসত আমার কাছে। শিশুকাল থেকে একমাত্র রংপুর ও বরিশালের অসংলগ্ন কিছু সময় ছাড়া গ্রাম ও বনজঙ্গল বলতে বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ এবং পরে মধ্যপ্রদেশের নানা জায়গা দেখেছি খুবই নিবিড়ভাবে। সেই তুলনায় গ্রাম-বাংলা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কমই ছিল। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলকে চলন্ত গাড়ি থেকে দেখেও যে ভালোলাগা জন্মেছিল তারও বিশেষ দাম ছিল আমার কাছে। একা একা সকালে ও রাতে মাসে কমপক্ষে চার-পাঁচদিন দেড়শো মাইল গাড়ি চালিয়ে যাওয়া-আসাব সময়ে কত লেখার প্লট যে মাথাতে আসত, কত জায়গাকেই যে গল্প বা উপন্যাসের পটভূমি করব বলে ঠিক করতাম মনে মনে তার শেষ নেই। বসন্তে পথের দুপাশের আমবাগানে (যেখানে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে আমাদের সেনাবাহিনী ক্যাম্প করে থাকত, acclamatisation-এর জন্যে তারা ঘোর বর্ষার মধ্যেও ক্যাম্প করত) যখন আমের বোল আসত, কাঁঠাল বনে কাঁঠালের মুচি, আর চৈত্রপবনে তাদের গন্ধ উড়ত ফিনফিনে ডানার হলুদ-রঙা প্রজাপতির নাচনের সঙ্গে, কোকিল ডাকত মুহুর্মুহু বুকের মধ্যে চমক তুলে তখন বড়ই বিদ্রোহ করতে চাইত আমার মধ্যের কবিসত্তা এই জাবদা-খতেন-টাকা-আনা-পাইয়ের জগতের বিরুদ্ধে। সজনে গাছে যখন ফুল আসত, মধুচুষির ঝোপে ঝোপে মউমাছিরা গুঞ্জন তুলত, নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যেত আকাশের নীলকে চারিয়ে দিতে তখন মনে হতো দূর ছাই। এ কী করছি আমি। আমি কবি, আমাকে কী এই মুহুরিগিরি মানায়! তখন আমার তরুণ বুকের মধ্যে থেকে এক জেদি অভিমানী মানুষ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে উঠত, "স্বপ্ন দেখা বন্ধ করুক কবি, মরে বাঁচুক, মরেও মানুষ হোক।"

বাবা বলতেন, 'কাব্যি করেই মামারা তো প্রায় না-খেয়েই জীবন কাটালেন। নিজের পায়ে দাঁড়াও। অর্থেরও প্রয়োজন আছে পৃথিবীতে। প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনের, জাগতিক ইম্পর্ট্যান্সের। পেটে ভাত থাকলে তবেই ওসব সহজে আসে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'Art is born of superfluity'। জমিদারি না থাকলে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে না জন্মালে, রবীন্দ্রনাথ হয়তো কাকদ্বীপের কবিয়াল হতেন বড়ো জোর। রবীন্দ্রনাথ হওয়া হতো না তাঁর।'

এসব কথার সত্য হয়তো ছিল আংশিক কিন্তু শুনে আমার বুক ভেঙে যেত। চোখের জলে ভেসে আমি প্রতিজ্ঞা করতাম যে, আমার জাগতিক জীবন আমাকে যে রৌরবের মধ্যে দিয়েই নিয়ে যাক না

কেন, যে সাধারণ্যেই আমার দিনাতিপাত করতে হোক না কেন আমাকে সর্বার্থেই অসাধারণ হয়ে উঠতেই হবে। সাধারণ্যের অভিশাপ যেন আমাকে না ছুঁতে পারে কোনোদিনও। সে জন্যে দাম যাই দিতে হোক তা আমি দিতে প্রস্তুত।

সামনের জুন মাসের উনত্রিশে আমি সাতষট্টি বছরে পড়ব। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে শরীরটা ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। জীবনেব বেলা পড়ে এসেছে। ছায়ারা দীর্ঘ হল। আমার বনজঙ্গলের বন্ধুরা, বিহারের, ওড়িশার এবং অন্যান্য জায়গার সবাই একে একে চলে যাচ্ছে। বিকেলের নরম রোদে মোড়া এই সুন্দর পৃথিবীর দিকে চেয়ে চোখে জল ভরে আসে। একে ছেড়ে যেতে তো হবেই! কিন্তু যাব কোথায়? যেখানে যাব, সেখানে কি এমন গাছগাছালি পাখপাখালি থাকবে? যুবক রাশিদ খাঁ অথবা তরুণী কৌশিকী চক্রবর্তীর গান কি শুনতে পাব সেখানে? মোহরদির 'দুরে কোথায় দুরে', বাচ্চুদির 'তুমি কিছু দিয়ে যাও', সুচিত্রাদির 'চলিয়াছি গৃহপানে খেলাধূলা অবসান' বা জর্জদার গলার 'কোলাহল তো বারণ হলো এবার কথা কানে কানে' শুনতে পাব? ঋতুর গলার 'একী লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ'? মৃত্যুভয় নয়, কী এক অনিশ্চিতির ভয় মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে বারেবারেই আজকাল।

ঋতু বলে, তোমার কীই বা বয়স!

ওকে কী করে বোঝাব যে আমাব ক্যালেন্ডারের বয়স যাই হোক, আমার মনের বয়স অনেকই হল। অনেক আঘাত, প্রতিঘাত, অনেক কষ্ট, শঠতা, বঞ্চনা, তঞ্চকতা, আবার অনেক ভালোবাসা, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, কৃতজ্ঞতায় আমাব মন ভাবী হয়ে আছে। এবার সেই ভার নামানে'র সময় এসেছে। 'এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও/ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি, এ যাত্রা তুমি থামাও।'

শরৎকালে এই গ্রাম বাংলাবই আবাব অন্য রূপ। শিশিরস্নিগ্ধ। শিউলি ফুলে ছেয়ে থাকা গ্রামের পথ। ডোবাতে নালাতে পচা পাটের মিষ্টি গন্ধ। পাট কাচার ধপাধপ শব্দ। বহুবর্ণ মাছরাঙার চমকে উঠে রোদের আয়না চুরমার করে দিয়ে তার পাগল চিৎকারে শারদ সকালের সব শান্তিকে তছনছ করে দেওয়া। 'আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়।'

গ্রীষ্ম দিনে বা বর্ষাতে আবার ভিন্ন রূপ। এখনও দেখতে পাই সদ্যসমাপ্ত হওয়া রানাঘাটের ব্রিজের এপারে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে আমার কোনো মক্কেলের মুহুরি জোড়া ইলিশ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন কখন আমার গাড়ি ব্রিজে উঠবে সেই অপেক্ষাতে। চৈত্র মাসে 'বগারি পাখি'র গোছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অন্যত্র কেউ। কেউ এঁচোড়, সিঁদুরে আম, পাকা লাল রুই, গলদা চিংড়ি, বড়ো বড়ো কই, সজনে ডাঁটা আর কুমড়ো বেলড'ঙা থেকে আনানো। ঋতু সরভাজা খেতে ভালোবাসত— কৃষ্ণনগরের এক মক্কেল মাঝে মাঝেই স্পেশাল সরভাজা দিতেন।

আমি বাবার কর্মচারী ছিলাম বটে, রোজগার যা কিছু সবই ছিল বাবার, পরিশ্রমটুকু আমার, লিটার‍্যাল পরিশ্রম, দেড়শো মাইল দিনে-রাতে রোদে-জলে গাড়ি চালানো থেকে খতেন-জাবদা, ট্রায়াল ব্যালান্স, ব্যালান্সশিটের জঞ্জালের ভাবের মধ্যে সাঁতার কাটা। জড়বুদ্ধি, স্থূলবুদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধির অনেক মানুষের সঙ্গে দিনের আট-দশ ঘণ্টা কাটানো—পাঁকের মধ্যে থাকা! কিন্তু সেই পাঁকের উপরের ফুটে ওঠা পদ্মফুলে শুধু আমারই অধিকার ছিল শুধুই আমার।

সমাজের বিভিন্ন তলাব অগণ্য মক্কেল এবং তাঁদের অ্যাকাউন্ট্যান্টদের কাছ থেকে যে সম্মান পেয়েছি, যে সুনাম, তার পরিমাপ হিরে-জহরত দিয়েও হয় না। জীবনের শেষে এসে ক্রমশ স্থিরপ্রত্যয় হচ্ছি যে, সংসারে সবকিছু একই সঙ্গে পাওয়া ভারি কঠিন। কোনো কোনো ভাগ্যবানে যে তাও পায়, না এমন নয়, কিন্তু সম্মান এবং অর্থ একই সঙ্গে পাওয়া সত্যিই দেবদুর্লভ ব্যাপার।

রাতে যখন ফিরতাম, তখন নির্জনতার মধ্যে শান্তিপুরের তাঁতিদের তাঁতের খটাখট আওয়াজ শোনা যেত। দূর থেকে শব্দ শুনেই বোঝা যেত যে শান্তিপুরে এলাম। তখন, মানে আজ থেকে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে শান্তি অনেক জায়গাতেই ছিল। এখনও কোনো কোনো দিন রাতে শুয়ে সেই তাঁতের খটখটানি শুনতে পাই। আমার হারিয়ে-যাওয়া পৃথিবীর আরো অনেক কিছুর সঙ্গে সেই তাঁতিরাও আজ হারিয়ে গেছে। তরুণী আর যুবতীরা আর শান্তিপুরী ডুরে পরে না। তারা সালোয়ার

কামিজ আর ম্যাক্সি পরে। সেই সবের সঙ্গেই অনেকদিন আগে হারিয়ে গেছেন আমার মা-ও, যিনি, আমি বাড়ি ফেরা না-পর্যন্ত দোতলার বারান্দাতে মোড়া পেতে বসে আমার গাড়ির পথ চেয়ে থাকতেন, যত রাতই হোক। গারাজের সামনে গাড়ির হর্ন শুনতে পেলে দোতলার সিড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে খোকন এসেছিস? বলে আমার খাবার গরম করিয়ে নীচে পাঠিয়ে তবেই তিনি শুতে যেতেন।

ভারতীয় মায়েদের মতো মা পৃথিবীর আর কোথাওই বোধহয় পাওয়া যায় না।

পাটনাতে ট্রাইব্যুনালে অ্যাপিয়ার করে পেশায় জীবন শুরু করেছিলাম উনিশশো সাতান্নর মার্চ মাসে। আজ দুহাজার একের এপ্রিল মাস। পেশার জীবনে চুয়াল্লিশ বছর পেরিয়ে এসেছি। কলকাতা, শিলং, পাটনা, বম্বে, দিল্লি, গুয়াহাটি, কানপুর ইত্যাদি কত জায়গার ট্রাইব্যুনালের সামনেই হাজির হয়ে সওয়াল করেছি, ষাটের দশকের গোড়া থেকেই। দিল্লির কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের লালপাথরের নর্থ ব্লকে রাজস্ব বোর্ডের কত মেম্বার এবং কত চেয়ারম্যানের ঘরেই যে কাজে গেছি। আজ কখনো বিরল অবকাশে চুপ করে বসে ভাবলে মনে হয়, শুধু পেশা নিয়েই লিখলে, মানে পেশার নামচা লিখলেই বহু খণ্ড বই লেখা হয়ে যেত। সেটা না হয় থাক। কিছু বাকি থাক। নিজস্ব থাক কিছু।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যবাসী কত কমিশনার, বোর্ডের মেম্বার, চেয়ারম্যান দেখলাম, কত ট্রাইব্যুনালের মেম্বার, তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে কুড়ি-পঁচিশ জন পরে ভারতের বিভিন্ন হাইকোর্টের ইনকামট্যাক্স বেঞ্চের জজ হয়ে গেছিলেন। কত রকমের অভিজ্ঞতা, কত বিচিত্র ও মজাব, কত করুণও।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, খারাপ অভিজ্ঞতাও যে হয়নি তা নয়। তবে তা খুব, খুবই সামান্য। এবং এই লেখার মধ্যে সেসব আনব না।

আমার বাবা তাঁর পুত্রদের মধ্যে আমাকে তাঁর জাগতিক সম্পত্তি বিশেষ কিছু দেননি বটে কিন্তু দু-চারটি উপদেশ যা দিয়ে গিয়েছিলেন তা মর্মে মর্মে পালন করে কম লাভবান হইনি। সেই সব উপদেশ বহুমূল্য সম্পত্তিরই সমান। ওঁর তেমনই একটি উপদেশ 'কালটিভেট দি সানি সাইড' উনি বলতেন, পৃথিবীতে একজনও 'খারাপ' মানুষ নেই। তুমি তার মধ্যে অবশ্যই অনেকই ভালো জিনিস পাবেই খুঁজে, যদি দেখার চোখ থাকে তোমার। আর সেইটি খুঁজে পেলেই তিনি আর তোমার কাছে খারাপ থাকবেন না। বাবার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করে আমি আমার পেশার এই দীর্ঘ জীবনে পেশার জগতে একজনও 'খারাপ' মানুষের সম্মুখীন হইনি। যে মানুষকে সকলেই খারাপ বলেছেন, যিনি সকলের সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করেছেন, তিনিও আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছেন। তাঁকে আমার ভালোই মনে হয়েছে। প্রত্যেক কঠিন মানুষের মধ্যেই কিছু দুর্বল ও কোমল জায়গা থাকে। সেগুলিকে আবিষ্কার করতে হয়। আর তা করতে পারলেই সেই মানুষই একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যান।

ওকালতিতে আইনের, অ্যাকাউন্টসের জ্ঞান যতটা লাগে তার সমান সমান অথবা বেশিই জ্ঞান লাগে মনস্তত্ত্বের। প্রথম দর্শনেই একজন মানুষ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করে নিতে পারেন প্রত্যেক সফল উকিলই। আইন বা তথ্য যাঁর কাছে পেশ করতে হবে সেই আধারটির রকম সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান না থাকলে চলবে কী করে!

ছেলেবেলা থেকেই ফেস-রিডিং আমার নেশা ছিল। পথে-ঘাটে, রেস্তোঁরাতে, ট্রেনে, প্লেনে মানুষের মুখ দেখে আন্দাজ করতাম কোন সামাজিক পটভূমি থেকে এসেছেন তিনি, শিক্ষিত না অশিক্ষিত, সৎ না অসৎ, দাম্ভিক না বিনয়ী, বাচাল না গম্ভীর, ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ। এবং খুবই মজা পেতাম দেখে যে, অনেক ক্ষেত্রেই আমার আন্দাজ মিলে যেত এবং মিলে যেত বলে দেশে-বিদেশে বড়ো কম মানুষ কাছের মানুষ হয়ে ওঠেননি।

কলেজে পড়ার সময়ই হয়তো বসুশ্রী কফিহাউসে কফি খেতে গেছি, (আগেই বলেছি আমি আঁতেলদের পীঠস্থান কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে যাবার সময় ও সুযোগ বেশি পাইনি)। মনে করুন, আমি

সেখানে থাকাকালীন দুজন পুরুষের সঙ্গে একজন মহিলা ঢুকলেন। তাঁদের দেখামাত্রই মনে মনে নানা অঙ্ক কষতে থাকতাম। অনুমানের অঙ্ক। এঁরা কি দুই বন্ধু এবং এক বান্ধবী? এঁরা কি স্বামী-স্ত্রী এবং ভাসুর অথবা দেওর? এঁরা তিন বন্ধুই কি? এঁরা কি ভাইবোন? আরও একটা শখ ছিল আমার আগে থাকতে আন্দাজ করা, এঁদের খাদ্য-পানীয়র বিলটা কে মেটাবেন? একশোর মধ্যে আশিবারই আমার আন্দাজই সত্যি হত। এই করে করে মানুষকে জানা ব্যাপারে একটা আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল যা পরবর্তী পেশার জীবনে তো বটেই, সাধারণভাবেও জীবনে খুবই কাজে লেগেছিল।

এই মনস্তত্ত্ব-জ্ঞান শুধু উকিলই নন, একজন লেখকেরও খুবই কাজে লাগে। অন্য মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে পড়তে না পারলে তার আনন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার হতাশা, অভিমান, অপ্রাপ্তির দুঃখের ভাগ দূরে থেকেও, তাকে কাছ থেকে না জেনেও, নিংড়ে নিতে পারলে সেই লেখক হয়তো প্রকৃত লেখক হয়ে উঠতে পারেন। অন্যেরা অবশ্যই অন্য মত পোষণ কবতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয়, একজন লেখকের সবচেয়ে বড়ো গুণ সহমর্মিতা। এই সহমর্মিতা আবার একজন ভালো উকিলেরও বড়ো গুণ। অন্য মানুষের মর্মের মধ্যে না ঢুকে পড়তে পাবলে তাঁকে বোঝা এবং তাঁকে বাইরে টেনে আনা ভারি কঠিন। আর আস্ত মানুষটাকে বোঝার চেষ্টা না করলে বা বুঝতে না পারলে তাঁকে নিখুঁত করে আঁকা তার তাঁর কাছ থেকে সবটুকু পাওয়া ভারি কঠিন।

কলকাতার আযকর বিভাগের উকিল মহলেব হাড় কাঁপিয়ে একজন অবাঙালি মহিলা কমিশনার এলেন। তখনকাব দিনে মহিলা কমিশনার দেখাই যেত না। উনি পাঞ্জাব-তনয়া, অবিবাহিতা। শুনলাম মেজাজ খুবই কড়া। উকিল আব মক্কেল মহলে কান্নাকাটি পড়ে গেল। তদুপরি তাঁর দোষের অন্ত নেই ; বিশেষ করে মক্কেলদের চোখে। কারণ, তিনি প্রচণ্ড 'রেভিন্যু-মাইন্ডেড'। রিলিফ মোটে দেনই না। তাছাড়া তরুণী 'হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনেস্টও'। এত বড়ো দোষ তো স্বাধীন ভারতে আর দ্বিতীয় নেই।

একজন বর্ষীয়ান উকিল ফুলের তোড়া নিয়ে গেছিলেন, তাও ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। আরেকজন বর্ষীয়ান এবং বদমেজাজি উকিল পরামর্শ দিলেন যে, ওঁর কাছে অ্যাপিয়ার না করে একদিন আগে রিটন সাবমিশান ফাইল করে দাও। ও তো কনফার্ম করবেই, ট্রাইব্যুনালে গিয়ে দেখা যাবে। তখনও ট্রাইব্যুনালই ছিল অগতিব গতি।

আমার একটি দুর্বল কেস পড়ল তাঁরই সামনে। কেসটি তেমন দুর্বল নয় কিন্তু অমন রেভিন্যু-মাইন্ডেড অফিসারের কাছে ওরকম মার্জিনাল ইস্যুতে রিলিফ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে ভরসা ছিল যে, ওখানে হারলেও ট্রাইব্যুনালে নিয়ে গিয়ে মক্কেলকে রিলিফ দিতে পারব। তখন আমার একজন বিপুলায়তন মাড়োয়ারি জুনিয়র ছিল। সেই জুনিয়র খুবই পরিশ্রমী ছিল। কিন্তু ইংবেজিতে কমজোরি ছিল। তাছাড়া, হি ইনডালজড ইন মোর ল দ্যান হি কুড কনটেন। তবে মানুষ হিসেবে একটু দুর্বোধ্য হলেও উকিল মোটামুটি ভালোই ছিল। তাকেই পাঠালাম আরগু করতে। যা ভেবেছিলাম, পনেরো দিনের মধ্যেই অর্ডার এল। অ্যাসেসমেন্ট কনফার্মড।

কিন্তু ট্রাইব্যুনালের গ্রাউন্ডস এবং স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টস ড্রাফট করতে গিয়ে অর্ডার পড়ে একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এমন চমৎকার আইনি-ইংরেজি বহুদিন পড়িনি। আজকালকার হাইকোর্টের জজদের ইংরেজিও ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। বারের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চেরও অধঃপতন হয়েছে যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো।

গ্রাউন্ডস-ট্রাউন্ডস ড্রাফট করে চালান আনতে দিয়ে ট্রাইব্যুনালে আপিল ফাইলের বন্দোবস্ত করতে বলে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে একদিন সেই মহিলা কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। উনি বললেন, আপিল তো কনফার্ম করেই দিয়েছি, আপনার জুনিয়র তো এসেছিলেন।

আমি বললাম, তা তো আমি জানিই। আপনি যা ভালো মনে করেছেন তা করেছেন। আপনার অর্ডার সম্বন্ধে আমি কোনো অভিযোগ জানাতে আসিনি, এসেছি সম্পূর্ণ অন্য এক কথা বলতে।

কী কথা?

উনি একটু অধৈর্য গলাতে বললেন। তবে বিরক্তি প্রকাশ করলেন না কোনো। কারণ আমার জুনিয়র কাজে যেরকম দড়ই হন না কেন নিজের এবং নিজের সিনিয়রের পাবলিসিটিতে অত্যন্তই দড় ছিলেন। আমি অ্যাকাউন্ট্যান্টস লাইব্রেরির প্রেসিডেন্ট ছিলাম এবং ওই সময়ে কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড দিল্লি থেকে যে এলাকা-ভিত্তিক উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করেন, পশ্চিমবঙ্গের সেই বোর্ডেরও সদস্য ছিলাম। সেইসব তথ্য, বুঝলাম, তাঁকে পরিবেশন করা হয়ে গেছে। যদিও তাতে চিঁড়ে ভেজেনি। আপিলে হারই হয়েছে।

উনি নরম গলাতেই বললেন, আবার কী কথা?

আপনার মতো ইংরেজি, সাম্প্রতিককালের খুব কম কমিশনারকেই লিখতে দেখেছি। শুধু, শুধুমাত্র এই কারণেই আপনাকে অভিনন্দন জানাতেই আমার আসা।

উনি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে চেয়ে থেকে বুঝতে চেষ্টা করলেন আমি ওঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছি কিনা। তারপর যখন বুঝলেন যে ঠাট্টা করছি না, চেয়ারে হেলান দিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, মি. গুহ, আপনি তো অদ্ভুত লোক।

তারপরই বললেন, নো ওয়ান্ডার ড্যু আর সো সাকসেসফুল।

আমি হেসে বললাম, কোনো বিশেষ কারণে আমি সাকসেসফুল নই ম্যাডাম।

তবে?

হেসে বললাম, 'নাথিং সাকসিড্‌স লাইক সাকসেস। অ্যাজ দি সেইং গোজ!'

উনি বললেন, ড্যা আর ভেরি মডেস্ট।

আই অ্যাম নট। তুমি হারিয়ে দিয়েছ কেসটা তাতে তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হতে যাবে কেন? কোনো মক্কেলের কেস ভালো হয়, কারো খারাপ। আমাদের কাজ মক্কেলের হয়ে সওয়াল করা আর তোমাদের কাজ সেই সওয়াল শুনে রায় দেওয়া। আমরা দুজনে দুজনের কর্তব্যই করি মাত্র। কেসের হারা-জেতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আদৌ নির্ভরশীল নয়।

উনি বললেন, তোমাদের মতো আরও অনেক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং অ্যাডভোকেটস যদি দেশে থাকতেন তবে কতই না ভালো হত।

আমি বললাম, তোমার মতো হাকিমও যদি অনেক থাকতেন তবেও তো কত ভালো হত।

সেই পাঞ্জাবদুহিতা এখন ট্রাইব্যুনালের সিনিয়র মেম্বার। সম্ভবত চণ্ডিগড় অথবা দিল্লিতে পোস্টেড। তাঁর কাছে দিল্লিতে অ্যাপিয়ারও করেছি কয়েক বছর আগে। সেই যে ইংরেজির প্রশংসা করেছিলাম প্রথম আলাপে সেই থেকে মহিলা আমার মস্ত অনুরাগী। আমার কোনো কেস খারাপ থাকলেও কেস কোনোদিনও হারাননি, নিজেই গায়ের জোরে জিতিয়ে দিয়েছেন। একেই ওকালতির জগতে বলে Impression about a counsel.

আসলে আমরা প্রত্যেক মানুষই একটু প্রশংসার কাঙাল, ভালোবাসার কাঙাল। প্রশংসা যেখানে ন্যায্য প্রাপ্য সেখানেও আমরা অধিকাংশ মানুষই এতই কৃপণ যে তাও মুখে উচ্চারণ করি না। প্রশংসা করতে করতে যে নিজের হৃদয়ের মাপটাও মস্ত বড়ো হয়ে যায় ধীরে ধীরে নিজের অজানিতেই, এই সাধারণ কথাটা আমরা অনেকেই জানি না।

অনেক উকিল ব্যারিস্টারের, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের ধারণা আছে এক গাদা case law cite করতে পারলেই উকিলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আইন এবং প্রতিটি কেস ল-ই যে দাঁড়িয়ে আছে বিশেষ ফ্যাক্টের উপরে এই কথাটাই আমরা মনে রাখি না। ফ্যাক্টই বললাম, কারণ ফ্যাক্টই প্লুরাল। ফ্যাক্টের সিঙ্গুলার হল ফ্যাক্টাম। ফ্যাক্টকে অনেকে অভ্যেস বশে ফ্যাক্টস লেখেন দেখতে পাই।

এন এ পালকিওয়ালা সাহেব, আয়কর জগতে কিংবদন্তি এবং ভারতের নামি সংবিধান বিশেষজ্ঞ, একবার আমাকে বলেছিলেন, "You are lucky that you are an accountant. You should know your fact. well supported by accounts and then place the fact before the tribunal with a smiling face. And you are bound to win."

কেস ল'জ সম্বন্ধে উনি বলেছিলেন (বুঝুন, অফ অল পার্সনস এনএ পালকিওয়ালা!), "Avoid law as much as you can. If you have one case-law in you favour then there may be ten against you. Therefore avoid entering the jungle of Law. But at the same time don't allow the grass to grow under your feet. You should trample such grass so that your opponent knows that you are knowledgable."

এই উপদেশ উনি দিয়েছিলেন দিল্লি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আজ থেকে বহু বহু বছর আগে—যা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে খুবই লাভবান হয়েছি। অবশ্য ওঁর উপদেশ পাবার আগে থেকেই আমার নিজের মতটাও ওইরকমই ছিল।

কলকাতাতে ইনকামট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের প্রথম অফিস ছিল ৪৪ চৌরঙ্গি রোডে। এখন সেখানে প্রকাণ্ড বহুতল। একটিই বেঞ্চ ছিল, মানে দুজন মেম্বারের। একজন জুডিশিয়াল মেম্বার, অন্যজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট মেম্বার। তারপর ট্রাইব্যুনালের অফিস উঠে আসে গুরুসদয় রোডে, যেখানে এখন বিএসএফ-এর অফিসারস ইনস্টিট্যুট। ওটি ছিল এক নবাবের বাড়ি। ট্যাক্সের দায়ে আয়কর বিভাগের কাছে বিক্রি হয়ে যায়।

তারপর উঠে আসে গড়িয়াহাট রোডে, গরচা রোডের মোড়ে স্টেট ব্যাঙ্ক যে বাড়িতে আছে তার উপরে। তারও পরে আসে, তাও প্রায় পঁচিশ বছর হবে, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড আর আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোডের মোড়ে স্টেট ব্যাঙ্কের উপরের তিনটি তলাতে।

তখন পূর্বভারতে ওই একটিই বেঞ্চ ছিল। এখন তো কলকাতা, পাটনা, গুয়াহাটিতে কতগুলি করে বেঞ্চ। তাছাড়া মেম্বারেরা ট্যুরেও যান আপিল শুনতে। যেখানে বেঞ্চ নেই সেখানে গিয়ে আপিল শুনে আসেন, যেমন রাঁচি, শিলং, আইজল ইত্যাদি। রাঁচি রাজধানী হবার পর থেকে অবশ্য তখন বেঞ্চ হয়ে গেছে।

ওকালতি করতে গিয়ে যে আমাদের মতো সাধারণ উকিল অ্যাকাউন্ট্যান্টদের কতো কী-ই করতে হয় তা জানলে পাঠকবর্গের আমাদের যেমন অনুকম্পা হবে তেমন মজাও লাগবে। একটি ঘটনার কথা বলি। এমন ঘটনা বলতে পারি হাজার হাজার।

একদিন আমাদের কৃষ্ণনগর অফিসের এক পুরোনো মক্কেল তাঁর বেয়াইকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, আমার বেয়াই এঁকে বাঁচাতেই হবে।

সব শুনে মনে হল ওই বেয়াইকে বাঁচানো দশটা খুন-করে আসা খুনিকে বাঁচানোর চেয়েও কঠিন, যদিও আমি উকিল নই, ফৌজদারি উকিল তো নই-ই!

মক্কেলের বেয়াই কোনোদিনও এক পয়সাও ইনকামট্যাক্স ঠেকাননি অথচ কলকাতায় তাঁর মস্ত বড়ো ব্যবসা এবং একাধিক বাড়ি আছে। তদুপরি শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের উপর স্ত্রীর নামে বিঘেখানেক জমি কিনে সেখানেও ফ্যাক্টরি বসিয়েছেন ইঞ্জিন-রিপেয়ারিংয়ের। সেই কারখানাতে উত্তরবঙ্গের যত চা-বাগান, আলিপুরদুয়ার, ভুটানঘাট, জয়ন্তী থেকে শুরু করে দার্জিলিং, কালিম্পং, গ্যাংটক, ফুন্টসোলিং ইত্যাদি জায়গা থেকেও ট্রাক ও ট্রাক্টরের ইঞ্জিন মেরামতিতে আসে। কলকাতার ব্যবসা গলির মধ্যে, নজর পড়েনি আয়কর দপ্তরের। কিন্তু শিলিগুড়ির কারখানা আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। কলকাতা সম্বন্ধে আমার করার কিছুই ছিল না। তাঁর বন্ধু উকিল বলেছিলেন, এতদিন চেপে গেছ, এখন দেখাতে গেলে ধনে-প্রাণে মরবে।

ইনকামট্যাক্সের প্রথম আইন প্রণীত হয় ১৯৩৩-এ। তার আগে ইনকামট্যাক্স কেউই দিতেন না। পরে আইন নতুন করে করা হয় ১৯৬১-তে—সে আইন এখন অনেক বিস্তৃত, অনেক জটিল। তারপরে নানা সংশোধনী বিল, ফিনান্স বিলে তার কলেবর অনেকই বেড়েছে।

এদেশের শিক্ষা বড়ো আশ্চর্য! অনেক শিক্ষিত মানুষও স্বীকার করেন না যে ওয়েলফেয়ার স্টেটে তাঁদের কিছু কর্তব্য আছে। ট্যাক্স না দিলে সরকার চলবে কী করে, সেনাবাহিনী, পথঘাট, হাসপাতাল এসবের খরচ আসবে কোত্থেকে—এসব ভাবনা তাঁদের নেই। অনেক উকিল অ্যাকাউন্ট্যান্টও এই

'শিক্ষিত মানুষদের' মধ্যেই পড়েন—যাঁরা ট্যাক্স না-দেওয়া, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোটাই চরম সপ্রতিভতা বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে সমাজের সব শ্রেণির মানুষই আছেন। নামি সাহিত্যিক, অভিনেতা, গায়ক, চলচ্চিত্রকার, যাঁরা সমাজের চোখে অত্যন্ত সম্মানিত, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই মানসিকতা ঘৃণ্য খুনিদেরই মতো। তবে সচরাচর তাঁরা ধরা পড়েন না। কিন্তু ধরা পড়লেও সেটলমেন্ট কমিশনে যান ঘানি-ঘোরানোর হাত থেকে বাঁচতে। এসব কথা তাঁদের অনুরাগীরা জানতে পেলে মুখে থুতু দেবেন। যা রোজগার হয় তাঁদের কারও কারও রয়্যালটি থেকে, তার সবই ট্রাভেলিং এক্সপেন্স দেখিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দেন। ওঁরা তো আয়কর অধিকর্তা না মানলে সেইসব মহান বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের 'বাবুরা' ট্রাইব্যুনালে মাসে দুনম্বরে বিশহাজারি মাইনে দেওয়া উকিলকে দিয়ে আরগুমেন্ট করিয়ে তা ছাড়িয়ে আনেন।

কবি-সাহিত্যিক হলেই সবাই কিছু ভদ্রলোক হন না। তাঁদের বাবুদেরই মতো, ভদ্রতা তাঁদের একটি মুখোশ মাত্র। তাঁরাও ক্রিমিনালদেরই সমগোত্রীয়। অনেক অনেক বাবু এবং তাঁদের চাকরদের হাঁড়ির খবর জানি বলেই এ কথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি। বলি না, বড়ো লজ্জা করে, তাই। তাছাড়া কারো ক্ষতি করার শিক্ষা বাবা-মা দেননি, সে জন্যেও। এটা শিক্ষা- সহবতের ব্যাপার। সকলের বোঝার নয়। এঁরাই কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আস্ফালন করে বেড়ান পবন-নন্দনের মতো। এঁদের মধ্যেই কেউ কেউ আবার নোবেল প্রাইজ পাবারও স্বপ্ন দেখেন। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আধুনিক সমাজে অনেক মানুষই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের অধম হয়ে গেছে। সমাজ সংসারের যারা মাথা, তারাই তাদের লজ্জাস্থানটুকুও ঢাকতে ভুলে গেছে সারা শরীরে বহুমূল্য পোশাক চাপিয়েও। এ এক রৌরবের মধ্যে বাস করছি আমরা। যেমন বাবুদের ছিরি, তেমনই তাদের 'রক্ষিত' চাকর-বাকরদের।

যাকগে, যে গল্প বলছিলাম, সেই গল্পেই ফিরি। মক্কেলেব বেয়াইকে এখন বাঁচাই কী করে! তিনি বিশেষ শিক্ষিত নন।—দোষ তাঁরও নয়। দোষ তাঁর সেই বন্ধু উকিলেরই। তিনিই এত বছর স্তোকবাক্য দিয়ে গেছেন। আরে,'কিস্‌সু' হবে না, আমি আছি। আর 'ট্যাক্সো দিবিই বা কি কত্তে? সরকার তোর জন্যে করেটা কী?'

কথাটা যে পুরোপুরি মিথ্যে তা বলব না। অন্যত্র অগ্রণী দেশে ট্যাক্সের বদলে ট্যাক্সদাতা যে সব সুযোগ-সুবিধা পান তার কিছুই প্রায় পাওয়া যায় না এদেশে, এখনও নয়। তবুও যেহেতু আমার দেশের মানুষ অধিকাংশই গরিব, অর্ধভুক্ত, অভুক্ত, নিরক্ষরের সংখ্যা এখনও অনেক, যেহেতু ভাগ্যবান যারা তাদের কর্তব্য ভাগ্যহীনদের বোঝাটা কিছুটা লাঘব করার তাই শিক্ষিত মানুষ (কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-বাদকদের মতো 'ভগবানদের' কথা ভুলেই গেলাম।) যাঁরা ট্যাক্স একেবারেই দেবেন না বলেন এবং তাঁদের যাঁরা 'মদত' দেন, তাঁদের সমর্থন করা যায় না কোনোমতেই।

যাই হোক, মক্কেলের বেয়াইয়ের নামে তো ইনকামট্যাক্সের ফাইল ছিলই না, তাঁর পরিবারের কারো নামেই ছিল না। বেয়ানের নামে, যাঁর নামে শিলিগুড়িতে জমি কেনা হয়েছিল, হুগলি জেলাতে বেশ কিছু ধানজমি ছিল। তারও আবার খাতাপত্র ছিল না। কৃষির আয় খুব বেশি না হলে তার উপর আয়কর ধার্যও হয় না। প্রায় পঁচিশ বছরের খাতা লিখিয়ে লাখ তিনেক ক্যাপিটাল হল এবং তারপর বেয়ানের সঙ্গে (মক্কেলের জামাই) অর্থাৎ বেয়াইয়ের ছেলে এবং দেওরদের একটা পার্টনারশিপ করে দেওয়া হল। ম্যাডাম জমি দিলেন (জমিটা যে ম্যাডামের নামেই কেনা ছিল) আর ছেলেরা দুজন ওয়ার্কিং-পার্টনার।

ইনকামট্যাক্সে রেজিস্ট্রেশনের জন্যে অ্যাপ্লাই করে, হিসাবপত্র ভাউচার যা ছিল, অনেকই ছিল, কারণ ব্যবসার হিসাব তো ছিলই, অ্যাকাউন্ট্যান্টও ছিলেন একজন জুনিয়র উকিল। অ্যাকাউন্টস করে, স্থানীয় অডিটরকে দিয়ে খাতা অডিট করিয়ে রিটার্ন দাখিল করে দেওয়া হল। তার আগে আমাকে বেশ কয়েকবার শিলিগুড়িতে এসব তদারক করতে যেতে হয়েছিল।

এগ্রিকালচারাল ইনকামের খাতা যিনি বানিয়েছিলেন তিনি ঝানু মুহুরি। ধুতির সঙ্গে টুইলের সাদা ফুল হাতা শার্ট পরতেন। হাতের বোতাম আটকাতেন না। জামার কলার তোলা থাকত। অনবরত নস্যি

নিতেন। এবং তাঁর হাতের লেখাটি এমনই প্রাচীন শিলালিপির মতো ছিল যে, তিনি নিজে ছাড়া অন্য কারো বাবার সাধ্য ছিল না সে লিপি উদ্ধার করে।

বছর দুয়েকের মাথাতে অ্যাসেসমেন্টের নোটিশ এল। ইতিমধ্যে অন্যান্য বছরের অ্যাকউন্টসও রিটার্নও জমা পড়ে গেছে। যথাসময়ে মুহুরিবাবু ট্রেনে এবং আমার মক্কেলের বেয়াইয়ের সঙ্গে আমি প্লেনে বাগডোগরাতে এসে নামলাম। ডিসেম্বর মাস। প্রায় তিন দশক আগের কথা। তখনও শিলিগুড়িতে এত মানুষ ছিল না। ঠাণ্ডা অনেক বেশি পড়ত।

বেয়াই তো নিয়ে গেলেন আপ্যায়ন করে তাঁদের বাড়িতে। তার আগে সিনক্লেয়ার হোটেলে উঠেছি, যতবার গেছি। কারখানার সামনেই হিলকার্ট রোডের উপরে নবনির্মিত বাড়ি। রাস্তা থেকে কারখানা দেখা পর্যন্ত যায় না। তাঁর বড়ো ছেলে, যার সঙ্গে আমার মক্কেলের মেয়ের বিয়ে হয়েছে, এয়ারপোর্টে এসেছিল। বয়স প্রায় তিরিশ। বি এসসি পাস। বুদ্ধিমান। মিষ্টি করে হাসে। তারও শিকারের শখ ছিল। চারদিন আগে জিপ অ্যাকসিডেন্ট করে ডান হাতখানি ভেঙেছে, ড্রাইভারও ছুটিতে তাই ভাড়াগাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে এসেছিল। সেই জুনিয়র উকিল চক্রবর্তীও এসেছিল। ভারি উৎসাহী হাসিখুশি এক তরুণ। এখন সে শিলিগুড়ির একজন প্রতিষ্ঠিত আয়কর-উকিল।

পরদিন সকালে হিয়ারিং। পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল শহরগুলিতে সিনিয়র অফিসার সব কলকাতা থেকেই যেতেন আর তখন আমার সব জায়গাতেই কাজ ছিল বলে প্রায় সকলকেই চিনতাম। সকলের সঙ্গে ভালো পরিচয় ছিল। এবং সকলেই এক বিশেষ চোখে দেখতেন—সেটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

হাকিম কে?

জানি না। তবে বাঙালি নয়।

চক্রবর্তী বলল।

বাঙালি নয়? শিলিগুড়ি 'এ' ওয়ার্ডে কোন্ অবাঙালি অফিসার এলেন? ভাবছিলাম। তখন আয়কর বিভাগে এত অবাঙালি হাকিম ছিলেন না। একটু অবাকই হলাম। তারপর ভাবলাম, বাঘ-ভাল্লুক তো আর নন। মানুষই হবেন। কোনো 'মানুষ' সম্বন্ধেই কোনো অসূয়া বা ভীতি আমার ছিল না, এবং আজও নেই। দু-একজন কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক ছাড়া।

কেস ভালো করে বেঁধেছি। তারিণীবাবু মুহুরিও অনেক ঘাটের জল খাওয়া মানুষ। ধমক-ধামক দিয়ে তাঁকে কাবু করা যাবে না। তাছাড়া অ্যাকাউন্টসে তো কোনো কারচুপিও নেই। শুধু খাতা সময়মতো লেখা হয়নি আগে এই যা। চাষবাসও হত, তা থেকে আয়ও হত। হাকিমকে সব মেনে নিতেই হবে। আর একান্ত যদি না মানেন, তবে আমি ট্রাইব্যুনালে যাব। কেস আমি জিতবই। হারাতে বিশ্বাস করিনি আমি, জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই। প্রতিপক্ষ যতই ক্ষমতাবান হোন না কেন।

খুব ভালো খাওয়া-দাওয়া হল। তারিণীবাবুকে ভালো হোটেলে ওঠালেন ওঁরা। শিলিগুড়ির সেবক রোডের বিখ্যাত হোটেলে নিয়ে গিয়ে আধহাত চওড়া চেতলের পেটি খাইয়ে আনলেন। যে হোটেলে উঠেছেন সেখানের খাওয়াও খেলেন পরে। তারিণীবাবু খুবই খুশি। বললেন, এমন চিতল ছুটোবেলায় দ্যাশে খাইছিলাম।

আমার খাতিরের কমতি হল না। কলকাতা থেকে স্কচ-হুইস্কি নিয়ে গেছিলেন বিকাশের বাবা।

নানা পদ দিয়ে খেয়ে রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, একদিন বড়ো মুখ করে কৃষ্ণনগরের মক্কেল আমার কাছে এনেছিলেন তাঁর বেয়াইকে, আমি ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না বলে। আর আজ তাঁকে যদি বাঁচাতে না পারি তাহলে বেয়াইয়ের কাছে মক্কেলের মুখ আর থাকবে না। আমার মুখ তো থাকবেই না। কাল আমার অগ্নিপরীক্ষা।

'যো হোগা সো হোগা কাল' এই বলে মনস্থির করে শয়নে পদ্মনাভ হলাম।

সকালে উঠে কাগজপত্র একটু দেখে নিয়ে ঠিক দশটার সময়ে ইনকামট্যাক্স অফিসের দিকে বেরোব এমন সময়ে বেয়াই মশায়ের বড়ো ছেলে, যার নাম ছিল বিকাশ, বলল, অজিত ড্রাইভার কাজে

আসেনি। সম্ভবত ম্যালেরিয়ায় কাত হয়েছে। আমারও হাত-ভাঙা, সাইকেল রিকশাতে যাবেন? না নিজেই চালিয়ে যাবেন?

কেন? গাড়ি কী হল?

বেয়াই মশাই উকিল সাহেবের এহেন হেনস্তা দেখে লজ্জিত হয়ে বললেন।

কাল এয়ারপোর্ট থেকে ফিরেই গাড়িও বেগড়বাই করছে। তাকে শায়েস্তা করতে করতে বিকেল হবে। জিপটা আছে। আমারও হাত ভাঙা, আপনি কি কিছু মনে করবেন স্যার নিজে চালিয়ে যেতে?

ফালতু সম্মানজ্ঞান আমার কোনোদিনই ছিল না। তাছাড়া জিপের স্টিয়ারিং হাতে পাওয়ার সুযোগ পেলে আমার মতো খুশি আজও কেউ হয় না, সে যে-জিপই হোক।

বললাম, ঠিক আছে।

বিকাশ বলল, নন্টে, গুরুংকে বলো জিপটাকে নিয়ে আসতে। তারপর বলল, গুরুংও চালাতে পারত কিন্তু লাইসেন্স করেনি এখনও। ও হেল্পার।

বললাম, ঠিক আছে। আমিই চালাব।

আমি ড্রাইভিং সিটে, পাশে কৃষ্ণনগরের মক্কেলের বেয়াই এবং বিকাশ। পেছনে পাহাড় প্রমাণ খাতাপত্র লাল শালুর বান্ডিলে বদ্ধ করে, তারিণীবাবু এবং নৃপতি চক্রবর্তী, স্থানীয় উকিল কাম অ্যাকাউন্ট্যান্ট উঠে বসলেন।

তখন ইনকামট্যাক্স অফিসটা ছিল হিল কার্ট রোডেই। সেবক রোডের মোড় ছাড়িয়ে জলপাইগুড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে একটি দোলামতো জায়গাতে। দোতলা অথবা তিনতলা বাড়ি। ঠিক মনে নেই। এখনও সেখানেই আছে কিনা জানি না। প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। অফিসে পৌঁছে দেখি 'এ ওয়ার্ড'-এর হাকিম কে একজন প্রসাদ সাহেব। এতদিন পরে তাঁর ইনিশিয়ালস মনে করতে পারছি না।

নৃপতি স্লিপ পাঠাল মক্কেলের এবং নিজের নাম লিখে। সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পড়ল। আমি ঘরে ঢুকতেই হাকিম চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, ক্যা খুশনসিবি হামারা, গুহা সাব আপ?

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম, কিন্তু চিনতে পারলাম না।

প্রসাদ সাহেব বললেন, পহচানে নেহি শকা? আরে! আপনি পাটনার ট্রাইব্যুনালে রামগড়ের রাজার কেস তিনদিন আরগু করেছিলেন, আমি ছিলাম ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, মনে নেই?

তখন মনে পড়ল। কিন্তু পাটনার ট্রাইব্যুনালের ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভ শিলিগুড়িতে এসে পড়লেন কেমন করে তা বোধগম্য হচ্ছিল না। পাটনার ট্রাইব্যানালের আপিলটা রামগড়ের রাজার ছিল না, ছিল প্রভুদয়াল আগরওয়ালা নামে একজন কয়লাখনির মালিকের। রামগড়ের রাজার কাছ থেকে লিজে নেওয়া ছিল তাঁর বেশ কয়েকটা কয়লাখনি।

বললাম, হ্যাঁ। আভ্‌ভি ইয়াদ আয়া। কেস তো সেট অ্যাসাইট হো গ্যয়ে থা, না?

জি হাঁ।

বলেই প্রসাদ সাহেব বললেন, গুহা সাব, আপ আহি গ্যয়ে তো মেরা কাম ভি বন গয়ে।

ক্যা কাম জি?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

টাইগার দিখা দিজিয়ে গা না সাহাব। আপ ছোড়কর কিসকো বঁলু।

আমি তো হতবাক।

ধানবাদের প্রভুদয়াল আগরওয়ালার অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিয়োগীবাবুর কাছ থেকে হয়তো প্রসাদ সাহেব শুনেছিলেন যে, আমি শিকার করি।

প্রসাদ সাহেব আবার বললেন, বৈঠিয়ে। চায়ে পিজিয়ে, মগর কেসফেস আভ্‌ভি কুছ না হোগা। পহেলে বাঘ দেখাইয়ে, পিছে বাত। আমি এখানে এসেছি তিনমাস হল কিন্তু জলদাপাড়া হলংয়ে যেতে পারিনি একদিনও যোগ্য সঙ্গীর অভাবে। আপনি যখন এসেই পড়েছেন তখন বাঘ দেখা আমার কপালে নাচছেই। আগে বাঘ দেখান তারপর কেস হবে।

মহা বিপদেই পড়লাম। আমার আগে পৃথিবীতে আর কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কেস রিপ্রেজেন্ট করতে এসে এমন বিপদে পড়েছেন কিনা জানি না।

হেসে বললাম, বাঘ কি আর বাঁধা আছে প্রসাদ সাহেব? না বাঁধা থাকে কখনও? জঙ্গলের গভীরে বাস-করা কত জঙ্গুলে মানুষ সারা জীবন বাঘের রাজত্বে বাস করেও নিজ চোখে বাঘ দেখতে পায় না।

সো ম্যায় নেহি জানতা। বাঘ তো দেখাইয়ে সাহি। আজ কেস অ্যাডজোর্ন কর দেতা ম্যায়। কাল শনিচ্চর, পরশু ইতোয়ার। জাঙ্গলমে লে চালিয়ে সাহাব, লওটকে আকর সোমবার একদম সুবেহি আপকি কেস কর দুংগা। আপ সোমবারই দোপহরকে প্লেনসে লওটকে যাইয়েগা কলকাত্তা। অ্যাইসা মওকা মুঝে অউর থোড়ি মিলেগা, না আপ রোজ আইবে কিজিয়েগা হিঁয়া।

আমি, বিকাশ এবং তার বাবাকে বললাম, দেখুন, বাঘ যদি দেখাতে পারেন তো প্রাণ বাঁচল আপনাদের।

তাঁদের মুখ দেখেও মনে হল এমন বিপদে বাপ-ব্যাটাতে জীবনে পড়েননি।

এমন সময়ে প্রসাদ সাহেব বললেন, কেস মে হ্যায় ক্যা গুহা সাব?

বললাম, কেস যেভাবে আমি তৈরি করেছি, আপনার করতে কোনোই অসুবিধা হবে না। পার্টনারশিপের রেজিস্ট্রেশান গ্রান্ট করতেও অসুবিধে হবে না। তবে আপনি যদি না মানেন তবে অ্যাপিলে গিয়ে সব ছাড়িয়ে আনব।

প্রসাদ সাহেব বললেন, ম্যায় থোড়ি বোলা নেহি মানুঙ্গা। ঝুঠ্‌ঠো কাহে অ্যাপিল-উপিল কি বাঁতে কর রহা হ্যায় আপ? ম্যায় সব কুছ মান লুঙ্গা সিরিফ বাঘ মুঝে দিখা দিজিয়ে। অব চায়ে পিকর যাইয়ে সাহাব। বোল দিজিয়ে ইন লোগোঁকো সব বন্দবস্ত কর দিজিয়েগা।

এরকম বিপদে সত্যিই জীবনে পড়িনি। যেমন বিপজ্জনক মক্কেল, তেমনই বিপজ্জনক হাকিম। উকিলের কাজ ওকালতি করা, তাকে যদি বাঘ দেখানোর ভার নিতে হয় তবে একটু বে-এক্তিয়ারের ব্যাপার হয়ে যা না কি? বললাম, দেখি, এঁরা কী বন্দোবস্ত করতে পারেন। না পারলে, কাল শনিবার সকালে আসব, আপনি যা করবার করবেন। কালই ফিরে যাব তাহলে কলকাতা।

তখন মাসের মধ্যে মাত্র একটি শনিবার কেন্দ্রীয় দপ্তরে ছুটি থাকত। মাসের দ্বিতীয় শনিবার। সেই শনিবারটি ছিল প্রথম শনিবার, তাই অফিস খোলা ছিল। কিন্তু বুঝলাম যে, বাঘ দেখার আশাতে উনি নিজেও অফিস ছুটি নেবেন। আমাকে আবারও বললেন টিকিট চেঞ্জ করিয়ে সোমবারের করে নিতে। ওঁর জানার কথা ছিল না, টিকিট সোমবারেরই ছিল। এখানে এলে কোনো না কোনো জঙ্গলে বা পাহাড়ে ঢুঁ মারার শখ ছিল আমার।

বাইরে বেরিয়ে বললাম। কী করবে বিকাশ?

চক্রবর্তী ছেলেমানুষ এবং অত্যুৎসাহী। সে হাসতে হাসতে বলল, এই কেস নিয়ে এতদিন ধরে খাটছি, শেষে তীরে এসে তরী ডুববে লালাদা? যা হোক একটা বন্দোবস্ত করেন। দরকার হলে সার্কাস কোম্পানি থেকে বাঘের বন্দোবস্ত করেন বিকাশবাবু।

ফিরে গিয়ে বিকাশদের অফিসে এসে হলংয়ের বাংলোর তিনটি ঘর তো বুক করা হল। ছুটির দিন নয় বলেই ঘর পাওয়া গেল। কিন্তু বিকাশদের ড্রাইভার অজিত তো ম্যালেরিয়ার কোপে অসুস্থ, জিপ চালাবে কে?

বিকাশ অম্লানবদনে বলল, আমার হাত না ভাঙা হলে তো আমিই নিয়ে যেতাম। ভাড়া করা জিপগুলোর যা কন্ডিশন, ভরসা করা যায় না। আমার জিপ তো ব্র্যান্ড নিউ। গেলে, এই জিপ নিয়েই যান। আপনিই জিপ চালিয়ে চলে যান লালাদা প্রসাদ সাহেবকে নিয়ে, সঙ্গে চক্রবর্তীবাবু এবং একজন খালাসি-কাম-হেল্পারকে দিয়ে দেব, খাদ্য-পানীয় সব সঙ্গে দিয়ে।

বেয়াই মশাই বললেন, এই বিপদ থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করুন স্যার—পুরো পরিবার চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

বাকরুদ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম ওঁদের মুখে। মুখে কথা জোগাল না। ভাবছিলাম, ওঁদের বিপদটা তো এখন আমার উপরেই বর্তাল। বিকাশ এবং তার বাবা এবং চক্রবর্তীও এমন স্বাভাবিকভাবে আমার উপরে এই উদ্ভট কর্তব্যটি চাপালেন ও চাপাল যে মনে হল তাঁরা তাতে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতাই দেখলেন না। অবশ্য দোষ তো ওঁদের নয়, আমারই। হাকিম আমাকে বাঘ-বিশারদ না ঠাউরালে তো এমনটি হত না।

বললাম, কিন্তু বাঘ কী করে দেখাব? তুমিও তো শিকার করেছ একসময়ে বিকাশ। তুমিও তো জানো, গেলেই তো আর হল না। কত মানুষ প্রতি হপ্তাতে হলংয়ে যাচ্ছে। তারা কজন বাঘ দেখতে পায়? আর উনি এক সন্ধেতে গিয়েই বাঘ দেখে ফেলবেন? বাঘ তো আর ওঁর অ্যাসেসি নয় যে উনি গিয়ে পৌঁছোলেই 'হুজৌর মাই-বাপ' বলে সেলাম ঠুকতে আসবে।

বেয়াই মশাই বললেন, রোজ সকালে এক ঘণ্টা ঠাকুরঘরে কাটাই গুহ সাহেব, আমার কালীমা আমাকে ঠিক তরিয়ে দেবেন। এ পর্যন্ত সব পরীক্ষাতেই যখন তরিয়েছেন, আপনাকে যখন পাইয়ে দিয়েছেন তখন একটা বাঘ কি আর ঝোলা থেকে বের করবেন না দয়া করে?

বললাম, মা কালী নন, মা দুর্গাকে স্মরণ করুন। মা কালীর সঙ্গে বাঘ-সিংহের কোনো সম্পর্ক নেই।

ডিসেম্বর মাস। উত্তরবঙ্গের ভিজে ঠাণ্ডা। সেবক রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে কালিম্পং যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে ঘুরে করোনেশান ব্রিজের উপর দিয়ে যখন তিস্তা পেরিয়ে ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গলাবৃত সমতলভূমিতে পড়লাম তখন হাতঘড়িতে দেখলাম বেলা দশটা বাজে। এই ব্রিজ তার আগে বার-পঞ্চাশ পেরিয়েছি ১৯৫৯-এর পর থেকে, কিন্তু সব সময়েই 'পরচালিত' হয়ে। প্রথমবার গেছিলাম দুর্গাকাকুর (দুর্গা রায়ের) জিপে বসে।

বিকাশের মাহিন্দ্র জিপটার কন্ডিশন সত্যিই ভালো। আশা করি পথে কোনো গোলমাল করবে না। পাশে প্রসাদ সাহেব, পিছনে নৃপতিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং হেল্পার-কাম-মেকানিক গুরুং। তারিণীবাবু চলে গেছেন জলপাইগুড়িতে। সেখানে তাঁর বড়ো জামাইয়ের মেজদাদা খাঁদা রায়দের চা বাগানে স্টোরস কিপারের কাজ করেন। তাঁরই আতিথ্য গ্রহণ করবেন তিনি। তাই ভালো। বনের বাঘ দেখা না গেলে, যাবে না যে তা জানাই, তারিণীবাবুই বাঘ হবেন প্রসাদ সাহেবের কাছে। দুনাকে নস্যি গুঁজে তিনি যখন ইংরেজিতে তাঁর বাংলা অ্যাকাউন্টস বোঝাবেন হাকিমকে তখন তাঁতে আর বাঘে কোনো তফাতই থাকবে না।

মালবাজারে দুপুরে খাওয়া সেরে নিলাম। একটু তাড়াতাড়িই হল। হলংয়ের গেটে গিয়ে যখন পৌঁছোলাম তখন শীতের বেলা পড়ে এসেছে। গেট থেকে হলং বাংলো মাত্র সাত কিমি পথ। অন্ধকার হয়ে গেলে বনবিভাগের জিপ ছাড়া অন্য জিপ বা গাড়ির ঢোকা মানা। দিনান্তের শেষ আলোতে পথের উপর ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলাম। অধিকাংশ বাঘের জঙ্গলেই ময়ূর থাকে। কেঁয়া-কেঁয়া করে ডাকতে ডাকতে তাদের মস্ত মস্ত ডানা মেলে গাছের নিচু ডালে উড়ে গিয়ে বসল তারা।

হলং বনবাংলোর কেয়ারটেকার তখন ছিলেন বিবেক রায় নামক একজন ছিপছিপে যুবক। বনবিভাগের হায়ারার্কিতে তাঁর কী পদ ছিল তা বলতে পারব না। তিনি তো লেখক বুদ্ধদেব গুহ এসেছেন জেনে খুবই খাতির করলেন। যদিও তখন লেখক হিসেবে আমার সামান্যই খ্যাতি হয়েছে। হায়রে! তিনি যদি জানতেন, লেখক নন, এ এক হতভাগ্য উকিল, আরও হতভাগ্য এক মক্কেলকে বাঁচাতে বাঘ সন্দর্শনে এসেছেন বনে।

বাবুর্চিকে ডেকে এনে বিবেক আলাপ করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে, বললেন, এই কুক আগে কুচবিহারের মহারাজার বাড়িতে কাজ করতেন। বললেন, এর আগে সমরেশ বসু এসেছিলেন একবার আর তার পরে এই আপনি। বাবুর্চিকে বললেন, তোমার যা বেস্ট তাই রেঁধে খাওয়াও বুদ্ধদেববাবুকে। নইলে আমাদের মান থাকবে না।

বললাম, খাওয়া-দাওয়া না হলেও চলবে, একটা বাঘ দেখাতে পারেন? বাঘ না দেখাতে পারলে আমার মান-ইজ্জত সব যাবে।

বিবেকবাবু বললেন, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন দাদা? জঙ্গলের পোকা হয়ে আপনিই বাঘ দেখাতে বলছেন, যেন বাঘ বাঁধা আছে খোঁটাতে!

তারপর বললেন, ভোরে উঠে হাতির পিঠে ঘুরে আসুন—কপালে থাকলে দেখবেন।

বললাম; অনেকবারই গেছি। আজ পর্যন্ত মাত্র একবার বাংলোর পেছনেই নদী পেরোবার সময়ে, তখনও আলো ফোটেনি, বাঘের গুড়গুড়ানি আওয়াজ শুনেছিলাম দূরে। হাতি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ব্যস ওই পর্যন্তই। গণ্ডার এবং গাউর এখানে দেখা যায়ই কিন্তু হলংয়ে বাঘ দেখেছেন এমন বেশি মানুষকে জানি না আমি তাছাড়া, হাতির পিঠে চড়ে যা গা-হাত-পা ব্যথা হয়। শখ করে ওই কষ্ট কে করতে যাবে!

বিবেক বললেন, তাহলে?

অন্ধকার হয়ে গেছে তখন আধঘণ্টার উপর। চা-টা খেয়ে বিবেকবাবুকে বললাম, চলুন মাদারিহাট থেকে জিপে তেল ভরে নিয়ে আসি। সন্ধে নেমে আসার পরে তো জিপ চালানো বারণ। আপনি সঙ্গে থাকলে কেউ কিছু বলবে না। বাঘ যে দেখা যাবে না, তা তো জানিই তাই কাল আমার এই সঙ্গীকে নিয়ে ভুটান সীমান্তের ফুন্টসোলিংয়ে ঘুরিয়ে আনব ভাবছি।

বিবেকবাবু বললেন, চলুন।

নীচে নামার আগে প্রসাদ সাহেবকেও ডেকে নিলাম। বললাম, রাতের বনে যদি কিছু দেখা যায় সাত কিমি পথ যাওয়া আর সাত কিমি আসার পথে। চলুন প্রসাদ সাহেব।

উনি মাথায় বাঁদুরে টুপি গলিয়ে নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক গলাতে বললেন, চালিয়ে। যো আপনে ফরমাইয়েগা গুহা সাব।

চক্রবর্তীও 'আম্মো যাব' বলে পেছনে উঠে বসল। গুরুং তো থাকবেই। সে তো জিপেরই অঙ্গ।

হলং বাংলো থেকে মোটে দেড়-দু কিমি এসেছি এমন সময়ে পথের বাঁদিকের ঝাড়ের মধ্যে কী যেন চকচক করে উঠল। সেখানে, পথের বাদিকে জঙ্গল ঘন নয়, সম্ভবত কিছুদিন আগে clear-felling বা coppice-felling হয়েছে। শিকারিদের চোখের দৃষ্টি ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অল্প বয়স থেকে পরিশীলন করতে করতেই এটা হওয়া সম্ভব। করবেট সাহেবও এ ব্যাপারে লিখে গেছেন। ১৮০ ডিগ্রির মধ্যে সামান্য নড়াচড়া এবং রাতের বেলায় সামান্যতম আলোর চমকানিও চোখে পড়ে।

মনে হল, কোনো জানোয়ারের চোখ দেখলাম জিপের হেড লাইটের প্রান্তিক আলোতে বাঁদিকে পঁচিশ-তিরিশ মিটার দূরে। অথচ সঙ্গে কোনো টর্চলাইট বা স্পট লাইট কিছুই নেই। রাতে বনে ঘোরার কথা তো আমাদেরও ছিলও না। জিপটা একটু ব্যাক করে স্টিয়ারিং বাঁদিকে ঘুরিয়ে জিপটার হেডলাইটের আলো বাঁদিকে ফেলে, ডিমার-ডিপার, ডিপার-ডিমার করতে করতেই আলোটা স্পষ্ট হল। বাঘের চোখ। অঙ্গারের মতো।

আমি ফিশফিশ করে বললাম, প্রায় প্রসাদ সাহেবের কান কামড়ে দিয়ে, দেখিয়ে বাঘ, বাঘ দেখিয়ে প্রসাদ সাহাব।

বিবেকবাবু তাঁর বাঁ পা-টি জিপের বাইরের পাদানিতে দিয়ে বসেছিলেন। লক্ষ করলাম, বাঘের নাম শুনেই সড়াক করে পৈত্রিক পা-খানি ভিতরে করে নিলেন। আর জিপের পেছনে তখন মৃত্যুর নিস্তব্ধতা।

চোখ দেখা যাচ্ছে, তাও পুরো নয়। ঝোপের আড়ালে আছে। কিন্তু বিকাশদের বাঁচাবার জন্যে আমার যে পুরো বাঘ বাবাজিকেই দেখা দরকার। 'পিস মিল' বাঘ নয়, 'দ্যা হোল অ্যান্ড নাথিং বাট দ্যা হোল টাইগার।'

গিয়ার নিউট্রাল করে, জিপের অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগলাম এবং তাতেই ফল হল। বিরাট এক রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ বাবাজি উঠে দাঁড়ালেন। দুটি হেডলাইটের আলোতে তিনি স্বমহিমাতে ভাস্বর হলেন।

ফিশফিশ করে বললাম, দিখা না প্রসাদ সাহাব?

হাঁ জি, হাঁ। দিখা।

ইতিমধ্যে বাঘ এক-দুপা করে জিপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

প্রসাদ সাহেব বললেন, ঘুমাইয়ে গুহা সাহাব, জিপ ঘুমাইয়ে, খত্‌রা বন যায়েগা।

বললাম, আরে সাহাব, জি খোলকর্‌ দেখ লিজিয়ে। অ্যায়সা মওকা অউর নেহি মিলেগা।

উনি বললেন, দিখ লিয়া, দিখ লিয়া, জিপ ঘুমাইয়ে।

জিপ গিয়ারে ফেলে ঘুবিয়ে নিয়ে পথের উপরে সোজা করলাম এবং করেই সামনে এগোলাম।

কিছুক্ষণ সকলেই নির্বাক। তারপরেই সবাই একসঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। প্রসাদ সাহেব, চক্রবর্তী এমনকী গুরুংও। তাঁদের মধ্যে কেউই তাব আগে চিড়িয়াখানা ছাড়া বাঘ দেখেননি। প্রসাদ সাহেব তো খুবই খুশি। আমি তাঁর চেয়েও খুশি তা ওঁকে কী করে বোঝাব। গুরুং বলল, ওর দাদু সুকনার জঙ্গলে একবার একটা বড়ো বাঘের মুখোমুখি পড়ে গেছিল। ওদের পরিবারে ওর দাদুরই একমাত্র বাঘ দেখার রেকর্ড ছিল। ও দুনম্বর।

প্রসাদ সাহেব বললেন, ম্যায় বোলা নেহি থা? কহিয়ে না গুহা সাব?

জি হাঁ।

আমি বললাম।

ম্যায় জানতা থা যো আপ শিলিগুড়িমে আয়া তো এহি হ্যায় বাঘসে ভেট করনে কা চান্স হামাবা।

আমি চুপ করেই রইলাম। ভাবছিলাম, 'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।'

আরও দু-তিন কিলোমিটার এগিয়ে গেছি এমন সময়ে আবারও বাঁদিকে অমন চোখ। আবারও সেই একই প্রক্রিয়াতে জিপ বাঁদিকে ঘুরিয়ে হেড লাইট পুরো ফেলে ডিপার-ডিমার ডিমার-ডিপার করতে করতে বাঘ চেহারা দেখায় কিনা তার অপেক্ষাতে থাকলাম। রাস্তাটা তো পুরোটাই কাঁচা এবং কোথাওই তেমন একটা চওড়াও নয়। বাঘ হঠাৎ তেড়ে এলে ঝটিতে জিপের মুখ ঘুরোনো যে খুবই মুশকিল হবে এই কথাই বোধহয় প্রসাদ সাহেবের মনে হয়ে থাকবে। বললেন ইক দফে তো দেখই লিয়া,....অউর কা জরুরত.....

ইতিমধ্যে সেই দ্বিতীয় বাঘও উঠে দাঁড়াল। 'খোদা যব দেতা ছপ্পর ফাড়কে দেতা।' সেটা বিরাট বাঘ। প্রথমটার থেকেও বড়ো। অ্যাক্সিলারেটরের গোঁ গোঁ আওয়াজে সে গরর-র-গরর-র-র করে বিরক্তি প্রকাশ করে এক ঝাঁকিতে এগিয়ে এল বেশ কিছুটা, তার বিরক্তিটা যাতে আমাদের প্রাঞ্জলভাবে বোধগম্য হয় সেজন্যে। এমন সময় প্রসাদ সাহেব আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বললেন, ক্যা কর রহা হ্যায় আপ? তারপরই প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, হামারা তিন গো লেড়কিঁয়া হ্যায়, এক গো ভি কি শাদি নেহি হুয়া। ভাগিয়ে, জলদি ভাগিয়ে হিঁয়াসে।

জিপ ব্যাক করে মুখ সোজা করে চাকা গড়িয়ে দিয়ে বললাম, জি খোলকর দেখ তো লিয়া না বাঘ, প্রসাদ সাহাব?

জি হাঁ। জি হাঁ। বহত সুক্রিয়া আপকি। মগর ওউর নেহি দিখেগা।

মাদারিহাটের পেট্রোল পাম্পে আমাদের কথা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইল না। ভাগ্যিস বনবিভাগের কর্মী বিবেকবাবু সঙ্গে ছিলেন। পেট্রোল নিয়ে উত্তেজনার বশে আরেক কাপ করে চা খেয়ে আমরা যখন আবার হলংয়ের গেট পেরিয়ে বনে ঢুকলাম তখন আরো এক কাণ্ড অপেক্ষা করে ছিল আমাদের জন্যে।

সম্ভবত গেট থেকে দুশো মিটারও যাইনি, পথের বাঁদিকে সরু অগভীর হলং নদীপথের সমান্তরালে বয়ে চলেছে, সেই নদীর পাশে পাশে পথ ধরে একটি বাঘ কোমরে দুলুনি তুলে হেঁটে চলেছে আমাদের আগে আগে। বেশ অনেকক্ষণ তারও পিছু পিছু আমাদের জিপকে নিয়ে চললাম।

প্রসাদ সাহেব একবার অস্ফুটে বলেছিলেন, ফিন? কাহেলা...?

তারপরই তাঁর বাকরোধ হয়ে গেছিল। আমারও।

'টাইগার-লাক' বলে একটা কথা আছে। আমার হাজারিবাগের বন্ধু সুব্রতর যেমন ছিল। সুব্রত চ্যাটার্জি। সে দু-দুটো বড়ো টাইগাব প্রায় অবিশ্বাস্যভাবেই শিকাব কবেছিল, প্রথমটি হাজারিবাগ শহরের কাছের সীতাগড়া পাহাড়ের নীচে। অন্যটি গোমিযাব ইন্ডিযান এক্সপ্লোসিভ্স লিমিটেডের কারখানার কমপাউন্ডেব মধ্যে। সে অন্য গল্প। 'বনজ্যোৎস্নায, সবুজ অন্ধকারে'তে আছে বিস্তারিত। কিন্তু একই সন্ধ্যাতে আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ব্যবধানে তিন-তিনটি বাঘ দেখার সৌভাগ্য পৃথিবীতে আর কজনের হয়েছে আজ অবধি তা আমার জানা নেই এবং এই 'টাইগার-লাক' অবশ্যই প্রসাদ সাহেবেবই। ওঁব জন্য আমাদের সকলেরই দেখা হল।

ভাবছি এইবাবে 'ঋভু'র চতুর্থ খণ্ড গুটিযে আনব। পঞ্চম খণ্ড লিখব কি আদৌ তারও ঠিক নেই। না-লেখার সম্ভাবনাই বেশি।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার 'বোঝাপড়া' কবিতাতে আছে না, ''সব কিছুরই একটা কোথাও করতে হয় রে শেষ/গান থামিলে তাইত কানে থাকে গানেব বেশ/জীবন অস্তে যায় চলি তার রঙটি থাকে লেগে/প্রিয়জনের মনেব কোণে শরৎসন্ধ্যা মেঘে।''

ভেবেছিলাম, ঋভুর আবম্ভরই মতো, থামাটাও সুন্দব হবে। থামতে জানাটাও চলতে জানার চেয়েও অনেকই কষ্ট ও সংযমের সঙ্গেই শিখতে হয়।

আজকাল বড়ো ক্লান্ত বোধ করি। লেখালেখি করতে আর ভালোও লাগে না। লিখলে, কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে এবং ইচ্ছে করে ছবি আঁকতে। ভালো গান শুনতে।

লেখা যে বন্ধ করার কথা ভাবছি তাব আরও অনেক কাবণ আছে।

জীবনী, কারওই জীবনী যদি একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক হয় তাহলে হয়তো তাকে আর জীবনী বলা চলে না। আবার ব্যক্তিক হলে তাতে অন্য নানা ব্যক্তির কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়তে বাধ্য। তাঁরা, মানে, কাছের মানুষেরা এসে পড়লে তাঁদেরও এক প্রচ্ছন্ন 'হক' জন্মে যায় সেই জীবনীকারের ব্যক্তিক জীবনীর উপরে, যদিও তা সেই সব ব্যক্তির নিজেদের জীবনের কথা বলার জন্যে আদৌ লেখা নয়, জীবনীকার যদি কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি হন তবে তাঁর জীবনীর মাধ্যমে সেই সব ব্যক্তি কম-বেশি পরিচিতি পানই। তাঁর প্রতিফলিত গৌরবে অন্যদের আনন্দিতই হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ঠিক উলটোটিই ঘটেছে। জীবনীকারের জীবনীতে স্থান না-পাওয়া অনেকেই প্রবলভাবে চান যে তাঁরা অবশ্যই স্থান পান সেই জীবনীতে। কিন্তু স্থান পাওয়া বা না-পাওয়া সকলেই চান যে জীবনীতে তাঁদের

প্রত্যেকেরই সম্বন্ধেই যেন খুব ভালো ভালো কথাই লেখেন জীবনীকার যাতে তাঁদের নিজ নিজ পরিবারে, শ্বশুরবাড়িতে অথবা চেনাজানার পরিমণ্ডলে তাঁদের প্রত্যেকেরই মুখোজ্জ্বল হয়। এটা যদি না ঘটে তবেই তাঁরা জীবনীকারের মুণ্ডুপাত করতে থাকেন। অথচ সত্যর খাতিরেই এমন দুর্ঘটনা, মানে, তাঁব বা তাঁদের সম্বন্ধে নিন্দাসূচক না হলেও প্রশংসাসূচক কিছু বলতে না পারা অনেকক্ষেত্রেই ঘটে যায়। জীবনীকারের নিজের জীবনীতে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির প্রতিই কোনো গাজোয়ারি প্রীতি বা বিরূপতা থাকে না। থাকা উচিত কখনোই নয়। তবুও অপ্রসন্নতা তো বটেই অসূয়া, এমনকী শত্রুতাও ঘটে।

গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, জীবনীকার যদি সৎ হন, যদি তাঁর জীবনীর মাধ্যমে মিথ্যাচার না করেন কোনোরকম, তাঁর নিজের শৈশব-কৈশোরের অনেক কথাই যদি অকপটে বলেন তবে তাঁর অনেকই আত্মীয়-বন্ধুর সম্বন্ধে প্রিয় সত্যর সঙ্গে সঙ্গে অপ্রিয় সত্য কথাও বলতে হয়। সত্যর নিজস্ব কোনো প্রিয়তা বা অপ্রিয়তা থাকে না, জলের যেমন নিজস্ব রং থাকে না কোনো। সেই সত্যকে যে যেমন চোখে দেখেন তেমন রঙেই সে রঙিন হয়ে ওঠে। যে জীবনীকার তাঁর জীবনীতে এই সততা বজায় না রাখেন তিনি ভণ্ড ও খল বলেই বিবেচ্য। তিনি যদি প্রকৃতই লেখক হন তবে তাঁর কলমটি দিয়ে তো তিনি কত কিছুই লিখতে পারেন। মিথ্যাচার করার জন্যে, নিজেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অতিকায় করার জন্যে জীবনী যে কেন আদৌ লিখতে হবেই তা আমার মতো সাধারণের অন্তত বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না। জীবনী লিখতে বসে লেখকের দায়বদ্ধতা, নিজের প্রতি, সত্যর প্রতি এবং পাঠকদের প্রতি অনেকই বেড়ে যায়। অন্য লেখার সঙ্গে জীবনীর অনেকই তফাত আছে, এবং অনেকবকম তফাত।

নিজের জীবনী লিখতে বসে আমাকে এতরকম এবং এত প্রতিবন্ধকতা, যুক্তিঅগ্রাহ্য অভিমান, অসূয়া, অপমান এমনকী শত্রুতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে যে সত্যি সত্যিই মরমে মরে আছি।

আমার ছেলেবেলাতে আমরা গরিব অথবা মধ্যবিত্ত ছিলাম, এই কথা ঋভুর প্রথম খণ্ডে লেখাতে এখন অতীব বড়লোক বলে মান্য কোনো কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা তাঁদের শ্বশুরকুলের কাছে আমি তাঁদের 'হেয় করেছি' এমন অভিযোগও করেছেন। যাঁরা মুখে করেননি, তাঁরা সেই পুষে-রাখা রাগ নানাভাবে প্রকাশ করেছেন, নানা অসম্মানের মধ্যে দিয়ে।

চিরদিনই আমি বিশ্বাস করেছি যে দারিদ্র্যে কোনো লজ্জা নেই, লজ্জা আছে তা লুকিয়ে রাখায়। বিশ্বাস করেছি যে, অর্থ কোনোদিনই মানুষের গর্বের ধন হওয়া উচিত নয়। পরম অশিক্ষিতরাই অর্থ নিয়ে গর্বিত বোধ করেন।

আমায় আত্মীয় বা কাছের মানুষদের কথা বলছি না, সাধারণ ভাবে অগণ্য ধনী পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়েছি বলেই এ কথা বলছি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা-সমস্যা' প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে। অগণ্য ধনী ও ধনীপুত্রদের দেখেছি বলেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক।

ওই প্রবন্ধে উনি লিখেছিলেন, "ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

এমন অবস্থায় বাপ-মায়ের উচিত ছিল গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করিয়া পরে আবশ্যকমতো ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না, স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই সে ধনীর সন্তান হইয়া উঠে। ইহাতে দুর্লভ মানজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়, জীবন ধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়"...।

"পাছে তাহাকে কেহ ধনী না মনে করে এইটুকু লজ্জা সে সহিতে পারে না, ইহার জন্য পর্বতপ্রমাণ ভার তাহাকে বহন করিতে হয় এবং এইভাবে পৃথিবীতে সে পদে পদে আবদ্ধ হইয়া থাকে।"

জানি না, আর্থিক সাচ্ছল্য হয়তো মানুষের মধ্যে নানারকম কমপ্লেক্সেরও জন্ম দেয়। কোথাও বা হীনম্মন্যতা হয়ে তা দেখা দেয়, কোথাও উচ্চমন্যতা। কোথাও হাতে মাথা কাটার প্রবণতা।

টাকা হজম করা ভারী কঠিন। টাকার সঙ্গেই নানা দুরারোগ্য রোগও আসে। সারাজীবন টাকাওয়ালা মানুদের চরিয়েছি বলেই হয়তো এই সিদ্ধান্ত এসে পৌছেছি।

আরনেস্ট হেমিংওয়ে লিখেছিলেন, Fear of life increases in direct proportion with the money one possesses....খুবই সত্যি কথা। তবে শুধু প্রাণের ভয়ই নয়, মনের ভয়ের বেলাও এ কথা প্রযোজ্য। অর্থোপার্জনের মতো সহজ কাজ আর নেই। তবে যোগ্যতার বিনিময়ে তা অর্জন করা ভারী কঠিন। সহজে যে অর্থ উপার্জিত হয় এবং যোগ্যতার অ-বিনিময়ে, সে-অর্থ মানুষকে সত্যিই নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত করে। এ কথা যে কত বড়ো সত্য তা অভিজ্ঞ মানুষ মাত্রেই জানেন।

জীবনের হাতে, পরিবারের হাতে, যে রকম পরিকল্পিতভাবে এবং নীরবে নিগৃহীত হয়েছি, বঞ্চিত হয়েছি নানা দিক দিয়ে, কোনো প্রতিবাদ না করেই সব যে ভাবে মেনে নিয়েছি, সচ্ছল বাঙালি পরিবারে একটি ব্যাতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যেই, তার সব সত্যি বিবরণ লোকসমক্ষে আনলে পাঠকেরা হয়তো স্তম্ভিত হয়ে যেতেন।

'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' এই বিশ্বাসে ভর করেই প্রায় সব সচ্ছল বাঙালি পরিবারই ছারেখারে গেছে। নিজেরা তো কিছু করেনইনি করার মতো, উলটে পিতৃপুরুষের যা কিছু অর্জিত তার সবকিছুই সলিসিটর আর উকিল-ব্যরিস্টারদের পেটে গেছে। এই হল সচ্ছল বাঙালির ইতিহাস। হাজারো বড়ো বাঙালি মক্কেল দেখে দেখে এই বিশ্বাসই জন্মেছে।

অনেক কিছু লেখা থেকেই নিজেকে নিবৃত্ত করেছি। রুচিতেও বেধেছিল। সে কারণেই সেই সব প্রসঙ্গ আর উপস্থাপনও করতে চাই না। চাইনি এই জীবনীর চার খণ্ডের কোথাওই, যদিও বাস্তবে তা করার হয়তো যথেষ্ট জ্বলন্ত প্ররোচনা ছিল। সত্যের সামান্যতম উদ্ভাসেই উষ্মার সৃষ্টি হয়েছে। এবং তার নিরসন না হয়ে তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সে কারণে আমি সত্যিই আহত এবং দুঃখিত।

জীবনীতে মিথ্যাচার করার চেয়ে জীবনী না লেখাই ভালো। তাছাড়া, মিথ্যাচার ধরাও পড়ে যায়। পাঠকেরা লেখকের চেয়েও বেশি বুদ্ধি ধরেন বলেই আমার ধারণা।

আমার অগণ্য পাঠক-পাঠিকার কাছে এইটুকুই বলার যে, একজন লেখক শুধুমাত্র তাঁর জীবনীর মধ্যেই উপস্থিত থাকেন না। বেঁচেও থাকেন না। তিনি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকেন তাঁর সব লেখালেখিরই মধ্যে। একজন লেখকের লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়লে, তাঁর মানসিকতা, তাঁর স্বভাব, তাঁর চরিত্র এমনকী তাঁর চেহারাও হয়তো একটু একটু করে ফুটে ওঠে পাঠক-পাঠিকার চোখের সামনে। যে পাঠক বা পাঠিকা আমার জীবন সম্বন্ধে সামান্য ঔৎসুক্যও রাখেন, তিনি বা তাঁরা যদি আমাকে একটুও খুঁজতে চান তবে তাঁরা আমার শতাধিক বইয়ের মধ্যেই অবশ্যই খুঁজে পাবেন। আমার জীবনী না পড়লেও তাঁদের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

শিলিগুড়ির প্রসঙ্গে যখন এসেই পড়লাম তখন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ির আরো কিছু কথা মনে এল।

একবার বেঙ্গল ল্যাম্পের তপন রায় ধরে পড়লেন, কালই জলপাইগুড়িতে গিয়ে ডোনাল্ড ম্যাকেঞ্জির (Donald Mc Kenzie) ইনকামট্যাক্স ক্লিয়ারেন্সটা বের করে দিতে। না পারলে বেচারার ইংল্যান্ডে যাওয়াই আটকে যাবে। বেঙ্গল ল্যাম্প বড়ো মক্কেল, তাছাড়া তপন রায়, তাপস রায় এবং তাঁদের বোন সতী চ্যাটার্জি ও তাঁর স্বামী আমার বন্ধুও ছিলেন। যেতেই হল।

জলপাইগুড়ি 'এ' ওয়ার্ড-এর অফিসার তখন সুদীপ রায়, আই আর এস। তরুণ, সুদর্শন, মাথাভরতি চুল, মেধাবী এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, ভদ্রলোক। ডোনাল্ড ও স্ত্রী বেটি কিছু কার্পেট এবং রুপোর বাসন বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা পেয়েছিলেন। তাঁরা এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বেটি আগেই চলে গেছিলেন। তাই নিয়েই গোলমাল। তখন সম্ভবত সত্তরের দশকের গোড়ার দিক।

এই ডোনাল্ডই আমাকে দুচোখ খোলা রেখে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে শেখান। কার মাস্টার আই কোন্‌টা তা শেখান। তিনি নিজে খুব ভালো শিকারি ছিলেন এবং মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারতেন।

ডোনাল্ডের যে রুপোর বাসন ছিল তার সাক্ষী আমি নিজে। পঞ্চাশের দশকের শেষে, ডোনাল্ড তখন বাগরাকোট চা-বাগানের ম্যানেজার, তাঁর বাংলোতে এক দুপুরে দুর্গাকাকুর সঙ্গে লাঞ্চ

খেয়েছিলাম শামসিং বাগানে যাওয়ার পথে। তাঁর রূপসি স্ত্রী বেটি রুপোর বাসনে নিজে লাঞ্চ সার্ভ করেছিলেন। যদিও বাবুর্চি-খানসামার অভাব ছিল না কোনো।

সুদীপ রায় আমার কথাতেই ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক পরে সুদীপের সঙ্গে আয়কর ভবনে দেখা হয়েছিল। দেখি মাথাভরতি টাক পড়ে গেছে। হয়তো বুদ্ধি আরও ক্ষুরধার হয়েছিল। এখন নিশ্চয়ই তিনি সিনিয়র কমিশনার, হয়তো চিফও হয়ে গেছেন। কোথায় পোস্টেড ঠিক জানি না। বহুদিন দেখা নেই। আজকাল ওই ট্রাইব্যুনাল ছাড়া তো বিশেষ কোথাওই যাইও না।

করলা নদীর ধারে জলপাইগুড়ির রায়কত রাজাদের প্রাসাদে উঠেছিলাম সেই বারে। বর্ষাকাল ছিল। রাজকুমারী প্রতিভা দেবী, যাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল জ্যোতি বসুর আমেরিকা ফেরত দাঁতের ডাক্তার বড়ো দাদা ড. কিরণ বসুর, তখন জলপাইগুড়িতেই ছিলেন এবং খুবই যত্ন করেছিলেন আমাকে।

বিরাট শোওয়ার ঘরে অত বড়ো ও অত উঁচু খাটে জীবনে শুইনি। অত বড়ো কোলবালিশও জীবনে দেখিনি। কোলবালিশের ওপাশে সঙ্গমে রত যুগল থাকলেও তাদের দেখতে পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। সেই কোলবালিশে পা রাখাও পর্বতাভিযানেরই মতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল।

একবার পাকেচক্রে পড়ে বম্বের তাজমহল হোটেলের ওল্ড-উইং-এর প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইটে ছিলাম। আমি যেহেতু অত্যন্ত ঘন ঘন যেতাম এবং কোনো বিশেষ কারণে সেই সময়ে কোনো ঘরই খালি ছিল না বলেই আমাকে আমার বিদেশি মক্কেলের দাপটে ওই স্যুইটে ওল্ড উইংয়ের সাধারণ ঘরের রেটেই থাকতে দিয়েছিলেন চার দিন-রাত তাজ কর্তৃপক্ষ। সেই স্যুইটের বেডরুমের খাটের সঙ্গে জলপাইগুড়ির রাজপ্রাসাদের খাটের মিল ছিল, সে জন্যেই এই প্রসঙ্গ ওঠানো।

কিরণকাকু নিজের হাতে ইলিশমাছ রান্না করে খাইয়েছিলেন। অতি সুস্বাদু সে রান্না। বেঙ্গল ল্যাম্পের মতো ওঁরাও আমাদের মক্কেল ছিলেন।

আরেকবার শিলিগুড়িতে গেছি, অন্য এক মক্কেলের কাজে। ফ্লাইট ডিলেড ছিল, বাগডোগরা থেকে মক্কেলের গাড়িতে তাদের অফিসে পৌঁছে সেখান থেকেই ফোন করলাম 'এ' ওয়ার্ডের অফিসারকে। তখন অফিসার ছিলেন এস কে ঘোষ। এতদিনে উনি নিশ্চয়ই রিটায়ার করে গেছেন। বললাম, প্লেন লেট করেছে। এইমাত্র এসে পৌঁছোলাম। এখুনি যাব, না, খেয়েদেয়ে যাব?

ঘোষ সাহেব বললেন, আমার কাছে আদৌ আসতে হবে না। আপনাকে গোরু-খোঁজা খুঁজছেন শরদিন্দু ব্যানার্জি। আই এ সি (এখনকার জয়েন্ট কমিশনার)

অবাক হয়ে বললাম, সে কী? কেন? তাঁর তো জলপাইগুড়িতে থাকার কথা, সেখানেই তো তাঁর অফিস।

তা ঠিকই। কিন্তু কলকাতা থেকে কমিশনার অব ইনকামট্যাক্স ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়ান (এখনকার দিনের চিফ কমিশনার ওয়ান) আর নর্থ বেঙ্গলের কমিশনার, দুজনেই এখানে এসেছেন। প্রথম জন সস্ত্রীক। তাঁরা এবং ব্যানার্জি সাহেব সিনক্লেয়ার হোটেলে আপনার অপেক্ষাতে রয়েছেন।

ব্যাপারটা কী?

গেলেই বুঝবেন। আপনাকে, আমার কাছে যে কেস আছে তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এখুনি ওখানে যান।

এক্সপার্টি করে দেবেন না তো কেস?

আপনার কেস এক্সপার্টি করব আমার ঘাড়ে কটা মাথা?

তখনও মক্কেলের গাড়ির বুট থেকে আমার স্যুটকেস নামানো হয়নি। ব্যাপার কী হতে পারে তাই ভাবতে ভাবতে সেই গাড়ি নিয়েই তখুনি চলে গেলাম সিনক্লেয়ার হোটেলে। যেতেই দেখি, দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। সি আই টি ডব্লু বি ওয়ান শ্রী টি ওয়াই সি রাও, তাঁর স্ত্রী এবং উত্তরবঙ্গের কমিশনার এস এন সেন সাহেব ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে লবিতে দাঁড়িয়ে।

রাও সাহেব বললেন, চলো বুদ্ধদেব, উঠে পড়ো। তোমার গাড়ি ছেড়ে দাও, ড্রাইভারকে বলো স্যুটকেস আমাদের গাড়িতে তুলে দেবে।

রাও সাহেব প্রথম জীবনে কলকাতাতেই থাকার সময়ে বাবাকে চিনতেন। তাই বহুবছর পরে এখানে ফিরে এসে আমার সঙ্গে আলাপিত হবার পরে ফার্স্ট নেমেই ডাকতেন।

কোথায় যাব?

জঙ্গলে। আবার কোথায়? আমরা গোরুমারাতে যাব কাল। রাতে জলপাইগুড়ির এক চা-বাগানে থাকব। সকালে জলপাইগুড়ির ইনকামট্যাক্স অফিসে 'অফিস ইনস্পেকশন' নামক একটি পুরাতনী অফিসিয়াল 'ছুতো' পূরণ করে জলপাইগুড়ি ক্লাবে সমস্ত অফিসার এবং তাঁদের স্ত্রীদের দেওয়া লাঞ্চ খেয়ে আমরা গোরুমারা রওয়ানা হয়ে যাব। তুমি যখন অকুস্থলে এসেই পড়েছ তখন তুমি ছাড়া জঙ্গলে যাই কী করে!

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। অগত্যা তাই করতে হল। মক্কেলের গাড়ি ফেরত পাঠালাম। গোরুমারার বাংলো থেকে দূরে অনেক উঁচুতে রাতের বেলার অন্ধকারে আঁকাবাঁকা পথের উপরে ট্রাক ও গাড়ির হেডলাইটগুলোকে দেখে মনে হয় যেন কেউ সার সার আকাশপ্রদীপ দিয়েছে—চলমান আকাশপ্রদীপ। দেখে, কোনো অলৌকিক দৃশ্য বলে মনে হয়।

ওই টি ওয়াই সি রাও সাহেব অনেকগুলি ভাষা জানতেন। ছিপছিপে, কালো, যোগব্যায়ামকারী, ছ ফিট এক ইঞ্চি লম্বা। কলকাতায় প্রথম যেদিন ওঁর কাছে কাজে অ্যাপিয়ার করেছিলাম, বলেছিলেন, তোমার একটা বই দিয়ো তো পড়ব। আমি শুনেছি যে তুমি লেখক।

আমি বলেছিলাম, I don't waste my books on those who can't read Bengali.

আমি বাংলা শিখছি।

উনি বললেন।

শেখো আগে। তারপর দেব।

উনি সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতে ছাপা ট্যাক্স ম্যানুয়াল সাইড টেবল থেকে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে পড়ে আমার কাছে প্রমাণ করলেন যে বাংলা সত্যিই তিনি পড়তে পারেন। এক কপি 'কোয়েলের কাছে' দিয়েছিলাম ওঁকে। উনি কয়েকদিন অন্তর অন্তরই ফোন করে জানাতেন, তখন উনি বইয়ের কোন জায়গায় আছেন এবং কেমন লাগছে। বলা বাহুল্য কথোপকথন ইংরেজিতেই হত।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ভদ্রলোক খুঁজে পাওয়া ভার ছিল। ওঁর হেডকোয়ার্টার্স তখন ছিল জলপাইগুড়িতেই। কমিশনারদের রিসিভ করতেই শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। উনি বললেন, বাঁচালেন মশাই আমাকে। আমি গিয়ে উয়ের সঙ্গে শুয়ে থাকব রাত্রে, আপনি সামলান হুজুরদের। কাল তো গোরুমারা যেতেই হবে।

নব্বইয়ের দশকের শেষ পর্যন্ত লাগাতার একুশ বছর আমাকে একটি সুইস কোম্পানির রিটেইনারশিপের কারণে প্রতি মাসেই কমপক্ষে তিন-চার বার যখন বম্বে যেতে হত তখন ইনকামট্যাক্সে অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের এক সময়ের মেম্বার ডি এ উপ্লোনি সাহেবের কাছে শুনতে পেতাম যে বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব আহমেদাবাদে আছেন এবং ওঁদের একে অপরের সঙ্গে দেখা হলেই আমাকে নিয়ে কথা হয়। শুনে খুবই ভালো লাগত। বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেবও এতদিনে অবশ্যই রিটায়ার করে গেছেন। জানি না, কোথায় থিতু হয়েছেন।

পেছনদিকে চাইলে কত মানুষের কথা যে মনে আসে ভিড় করে। কত মধুর স্মৃতি। ওকালতি করেছি বটে, কিন্তু ওকালতির ক্ষেত্রে কোনো হাকিম কিংবা পেশাদারের সঙ্গেই কখনো তিক্ততা হয়নি। সেই অতীত আমার বড়ই প্রশান্তি আনে মনে। কারো সঙ্গেই মিথ্যাচার করিনি। একথা আমার অগণ্য মক্কেল এবং আয়কর বিভাগের অগণ্য অফিসারেরা আশা করি স্বীকার করবেন। এই পেশাতে টাকা রোজগার করতে পারেন অনেকেই অতি সহজেই, এবং করেনও। কিন্তু দীর্ঘদিন সুনাম ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ খুব কম মানুষই করতে পারেন। এই বাবদে ঈশ্বরের কাছে আমি অশেষই কৃতজ্ঞ। অনেকই পেয়েছি সম্মানে, ভালবাসায়, স্নেহে।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে এস এন সেন সাহেব সম্বন্ধেও কিছু না বললে মহাপাতকের কাজ হবে। এমন মানুষ, দেবতুল্য মানুষ, জীবনে খুব বেশি দেখিনি। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ

সেনের বড়ো ছেলে। ডাক নাম ছিল সোনা। বরিশালের মাহিলাড়া গ্রামে দেশ ছিল। ওঁকে নিয়ে বা ওঁরই অনুপ্রেরণাতে দুটি লেখা লিখেছিলাম। একটি অন্যতম বিখ্যাত গল্প 'স্বামী হওয়া' আর অন্যটি হল পুরোপুরি ওঁকে নিয়েই লেখা 'The last of the Mohicans'। পাঠক! একটি উদাহরণ দিলেই এই মানুষটি সম্বন্ধে আপনারা সম্যক জানতে পারবেন। ওঁর মতো হতে পারলে কোনো জাগতিক দুঃখ-কষ্টই আপনাদের ছুঁতে পারবে না।

একদিন কলকাতার অফিসে বসে কাজ করছি, বিকেলের দিকে ওঁর কাছ থেকে একটি ফোন এল, খুবই ব্যস্ত আছ কি?

তখন উনি কমিশনার ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়ান।

ব্যস্ত থাকলেও উনি ডাকলে চিরদিনই দৌড়ে গেছি যেমন যেতাম জনসন সাহেব ডাকলেই। তাছাড়া, আমাদের অফিস থেকে আয়কর ভবনের দূরত্ব পায়ে হেঁটে গেলেও মাত্র দু মিনিটের, সেটাও মস্ত সুবিধা ছিল। এ সবই বাবার দূরদর্শিতার কারণেই সম্ভব হয়েছিল। বাবার সুবাদেই এঁদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তবে সেই পরিচয় আরো অনেকই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাতে আমার কোনো গুণ ছিল না, ওঁদেরই গুণ সেটা।

ওঁর কাছে পৌঁছেই বললাম, কী ব্যাপার?

আরে বোসো বোসো। একটা অভিজ্ঞতার মতো অভিজ্ঞতা হল, বুঝলে? কারোকে না বলতে পারলে মন উশখুশ করছে। সবাই এসব কথা বুঝবে না।

কী রকম?

এবারে উত্তরবঙ্গে গিয়ে নেপালের ধূলাবাড়িতে গেছিলাম। মানে, অফিসারেরা নিয়ে গিয়েছিলেন।

সে কী? এতদিনে গেলেন? আমাকে তো প্রতিবারই নিয়ে যায় মক্কেলরা যখনই যাই শিলিগুড়িতে। যদি শখের কিছু কেনাকাটা থাকে তো কিনি।

ধূলাবাড়ি ভারত ও নেপালের সীমান্তে পড়ে। একটি ছোটো জায়গা চোরাচালানোর মহাতীর্থ। নকশালবাড়ির পথ দিয়েই ধূলাবাড়ির পথ। ভাবলেও হাসি পায় কোথায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের উঁচু আদর্শ আর কোথায় ধূলাবাড়ির গহন ভোগবাদ।

তুমি গেছ?

বললাম যে!

সত্যি! একজন মানুষকে উলঙ্গ করে সেখানে ছেড়ে দিলেও তার যা কিছুই দরকার সবই সে ধূলাবাড়িতেই পেতে পারে। আন্ডারওয়্যার থেকে স্যুটলেম্থ, দাড়ি কামানোর জিনিস থেকে জুতো-মোজা, পারফ্যুম, হেয়ার ড্রায়ার, টাইপ-রাইটার (তখনও কম্প্যুটারের চল হয়নি দেশে), কত রকম মদ, সিগারেট, কনট্রাসেপটিভস, কত রকম শাড়ি, প্যান্টি, ব্রা আরও কত কত কী? মানে সবকিছুই আর কী?

কিনলেন কিছু?

সোনাকাকু বললেন, দুস। আমার টাকা কোথায়? অবশ্য কিছু পছন্দ করলেই হত, টাকা কি আর অফিসারেরা আমাকে দিতে দিতেন? তাঁরাই হামলে পড়ে দিতেন। হয়তো দোকানিও নিতেন না। তাঁরও তো ইন্ডিয়াতে বিজনেস কানেকশন আছে, না কী?

তবে আর কী? কাকিমার জন্যও অন্তত কিছু আনতে পারতেন। পারফ্যুম-টারফ্যুম।

আমি 'সোনাকাকু'ই বলতাম ওঁকে। বরিশালের মানুষ। কাকিমাও বরিশালের মেয়ে। কাকিমা একা হাতে রান্না করতেন, বাসন মাজতেন আর এদিকে ইংরেজি যখন বলতেন তখন লোরেটো লা-মার্টসের ফটফটিরা লজ্জায় মরে যেত। নানা বিষয়ে পড়াশুনো ছিল দুজনেরই। কাকিমার ছোটো ভাই অক্সফোর্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক আর এক বিখ্যাত 'বরিশালিয়া' তপন রায়চৌধুরী। সরকারি ফ্ল্যাট, ভর্তি শুধু বইয়ে। শোওয়ার ঘরে বই, বসার ঘরে বই, চানঘরে বই। দুই মেয়ে ও এক ছেলেও তাদের মা-বাবারই মতো পড়ুয়া ছিল। আমার দুঃখ ছিল এই এবং এখনও আছে যে সোনাকাকু বা কাকিমা কেউই আমাকে লেখক বলে মানতেন না। মানে আমাকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবেই মানতেন, কখনোই

লেখক হিসেবে সিরিয়াসলি নেননি। অবশ্য জানি না, ওঁরা আমার কী কী বই পড়েছিলেন। কিন্তু তাতে কী যায় আসে? ওঁরা আমাকে যে চোখেই দেখুন না কেন, আমি চিরদিনই ওঁদের দুজনকেই এক বিশেষ চোখে দেখেছি। আজও সোনাকাকুর স্মৃতিকে সেই চোখেই দেখি। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারে ওঁদের মতটাই যে একমাত্র প্রণিধানযোগ্য মত তাও মেনে নেবার কিছু ছিল না।

কাকিমা আছেন যতদূর জানি, যদিও বহুদিন যোগাযোগ নেই। তাঁর সম্বন্ধেও আমার আজও সেই উচ্চ ধারণাই আছে। এ কমপ্লিট লেডি।

আমার কথার উত্তরে সোনাকাকু বললেন, না, না, কাকিমার জন্য আবার কী আনব! তুমি তো জানো তাকে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, কথাটা কী জানো লালা?

কী?

আমার না ধূলাবাড়িতে গিয়ে নিজের জন্য ভারি দুঃখ হল। ভারি দুঃখ।

দুঃখ? কেন? দুঃখ কেন?

না, এই যে এত ফরেন জিনিস, ঘর-ভরা জিনিস, দোকান-ভরা জিনিস, এর কিছুমাত্রতেই আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এই কথাটা ধূলাবাড়িতে দাঁড়িয়ে মনে হতেই আমার বড়ো দুঃখ হল।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম কথাকটি শুনে। কলকাতার সব মানুষই যখন 'ফরেন' জিনিসের জন্য কাঙাল, 'ফরেন'-এ একবার যেতে পারলে যাদের লেজ গজায়, এই পরপ্রত্যাশী হীনম্মন্য মানসিকতার শহরে বাস করেও এই পরিবেশে প্রশ্বাস নিয়েও এমন থাকা কী করে সম্ভব?

মাথা নিচু করে বসে ভাবছিলাম, আমাদের সব দুঃখ তো আমাদের নিজেদেরই তৈরি করা। প্রয়োজন বাড়াতে বাড়াতে প্রয়োজনের ভারে আমরা নিজেরাই তলিয়ে যাই অজানিতে। যে 'দুঃখ' সোনাকাকুর মতো মানুষেরা পান সে তো আসলে দুঃখ নয়, সেই তো পরমানন্দ। সেই আনন্দই তো প্রত্যেকটি 'মানুষের মতো মানুষের'ই একমাত্র প্রার্থনার। আজকের ভোগবাদী পৃথিবীতে গ্লোবালাইজেশনের যুগে কনজ্যুমারিজমের আর বিজ্ঞাপনের বন্যাতে ভেসে যাওয়া একবিংশ শতাব্দীর আত্মবিস্মৃত মানুষের গড্ডালিকা কি এইসব মানুষের কাছ থেকে কিছুমাত্রই কিনতে পারবে? অনেক কিছু 'না হলেও' যে আমার চলে যেত, 'চলে যায়', আমার যা আছে তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আর কিছুতেই আমার প্রকৃত প্রয়োজন নেই, এই পরম সত্যটিকেই আমরা ভুলতে বসেছি বলেই আনন্দ উড়ে গেছে আমাদের কার্নিশ ছেড়ে অভিমানী পায়রার মতো। আনন্দের পায়রাদের তাড়িয়ে দিয়ে আমরা ভোগের চড়ুইদের মাথায় চড়িয়েছি।

আনন্দ আর সুখ যে সমার্থক নয় সেই প্রাচীন ও সরল সত্যটি যেন চিরদিনেরই মতো ভুলে গেছি।

ষাটের ও সত্তরের দশকে নিয়মিত বর্ধমান ও আসানসোলে যেতে হত। বর্ধমানে আমাদের বেশ কিছু চাল-কলের মক্কেল ছিলেন এবং আসানসোলে কয়লাখনির। ভোরের ট্রেনে যেতাম আবার বিকেলের ট্রেনে ফিরতাম। বর্ধমানে গেলে অবশ্য খুব ভোরের ট্রেনে যাওয়ার দরকার ছিল না। গাড়ি নিয়ে হাওড়া স্টেশানের ভিতরের পার্কিংলটে গাড়ি রেখে ট্রেনে চেপে চলে যেতাম। কারণ হাওড়া স্টেশান থেকে ট্যাক্সি পাওয়া তখনও আজকের দিনের মতোই বিরক্তিকর এবং সময় নষ্টকারী ব্যাপার ছিল। এই নৈরাজ্যর এখনও পুরোপুরি নিরসন হল না। যদিও এখন লাইনে দাঁড়ালে ট্যাক্সি পাওয়া যায়, তখন ওই ব্যবস্থাও ছিল না। তাড়া থাকত এই জন্যে যে, বর্ধমানে গেলে ফিরে অফিসেই যেতে হত সব ফাইলপত্র দেখে পরের দিনের কাজের ব্রিফ ঠিক করতে। অফিস থেকে সাড়ে আটটা-নটার আগে ওঠা প্রায় অসম্ভব ছিল। কোনো কোনো দিন এমনও হয়েছে যে, অল্পর জন্যে ট্রেন মিস করাতে গাড়ি চালিয়েই বর্ধমানে চলে গেছি। সেখানে পৌঁছে কেস বা আপিল যাই থাকত তা শেষ করে গাড়ি চালিয়েই ফিরে এসেছি। আড়াইটে-তিনটে নাগাদ জি টি রোডের কোনো ধাবাতে রুটি-তড়কা খেয়ে নিতাম। কখনো কখনো চারটেও বেজে যেত খেতে খেতে।

কৃষ্ণনগর এবং বর্ধমানের দূরত্ব গাড়ি চালিয়ে গেলে একই পড়ত। যদিও বর্ধমানে যেতে শ্রান্ত হতে হত অনেকই বেশি, কারণ জি টি রোডের যানবাহনের সংখ্যা এবং প্রকৃতির সঙ্গে কৃষ্ণনগরের পথের যানবাহনের সংখ্যা ও প্রকৃতির অনেকই তফাত ছিল।

বর্ধমানের ইনকামট্যাক্স অফিস তখন ছিল বর্ধমান রাজের প্রাসাদের তোরণের উলটোদিকে কাছারির পথে এগিয়ে। কাছারি পেরিয়ে গিয়ে ডানদিকের ছোটো হাতাওয়ালা একটা দোতলা বাড়িতে।

একদিনের কথা মনে আছে। বর্ধমানে আর্য ভৌমিক সাহেবের কাছে অ্যাপিল সেরে বর্ধমান থেকে বেরোতে বেরোতেই তিনটে বেজে গেল। কলকাতার দিকে বেশ অনেকদূর এসে যখন খাওয়ার জন্যে একটি ধাবাতে গাড়ি দাঁড় করালাম, তখন বেলা পড়ে গেছে। শীতের দিন ছিল। ধাবার একটি চৌপায়াতে শুয়ে আছি আন্ডা-তড়কা আর রুটির বরাত দিয়ে। ধাবার পাশেই একটি গাছ, সম্পূর্ণ পত্রহীন, আর তার গোড়াতে স্তূপীকৃত ছাই। ছাইয়ের গাদাই বলা চলে। পশ্চিমের আকাশের লাল পটভূমিতে সেই পত্রহীন গাছটির কালো শাখা-প্রশাখাগুলি যে কী এক আশ্চর্য সুন্দর ছবির সৃষ্টি করেছিল তা কী বলব। সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে ভাবছিলাম যে, পৃথিবীর কোনো তাবড় শিল্পীও হয়তো এমন সহজ সুন্দর ছিমছাম একটি একরঙা ছবি আঁকতে পারতেন না।

সেই গাছটির দিকে চেয়ে নানা জঙ্গলের কথা মনে আসছিল। ভাবছিলাম, খাজাঞ্চিখানার মুহুরিগিরি করেই দিন কাটাচ্ছি, নিজের নিজস্ব কাজ কিছুই করা হচ্ছে না।

বাড়ি ফিরে কী পড়ব, কী লিখব, কোন্ গান শুনব তাই ভাবতে ভাবতেই খাবার নিয়ে এল ধাবার 'ছোকরা'। স্বপ্নভঙ্গ হল।

যে-সময়ে আমার সমসাময়িক আঁতেল কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের সাহিত্যের পড়াশুনো শেষ করে কলেজ স্ট্রিট কফিহাউস বা খালাসিটোলা বা ছোটা ব্রিস্টল বা সোনাগাছির স্বর্গে সময় কাটিয়েছেন অথবা মধ্যরাত্রে কলকাতা শাসন করেছেন, সেই সময়ে আমার জীবন কেটেছে নানা ধরনের মক্কেল পরিবৃত হয়ে, অফিসে বসে, সকাল থেকে রাত, নানা হাকিমের কাছে সওয়াল করে, নয়তো দেশের নানা জায়গাতে দৌড়ে বেড়িয়ে। নিজের জন্যে মাঝে মাঝে খুবই দুঃখ হয়েছে। তবে অগ্রজ বা সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের আমি শুধু নামেই চিনতাম, তাঁদের প্রায় কারো সঙ্গেই আমার আলাপ ছিল না। 'আড্ডা' মারার অবকাশ ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত কম ছিল বলেই আলাপ যদি বা তাঁদের কারো কারো সঙ্গে সামান্য ছিল, লাগাতার প্রাত্যহিক আড্ডা মারা, বিশেষ করে পানের আড্ডা, আমার পক্ষে অসম্ভবই ছিল। সম্ভবত আশির দশকের মাঝামাঝি এবং পরবর্তী কয়েকবছর সুনীল গাঙ্গুলি, রঞ্জিৎ গুহ, ড. ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়দের 'বুধসন্ধ্যা'র বুধবারের আড্ডাতে গেছিলাম যদিও তবে তা চালিয়ে যাওয়া নানা কারণেই সম্ভব হয়নি।

ওই সুবাদে অনেক কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ অবশ্যই হয়েছিল। সেটাই ছিল আমার মতো অর্বাচীনের এবং অন্য জাঁতের মানুষের কাছে মস্ত বড়ো লাভ। সত্যিই মস্ত বড়ো লাভ। তাঁদের অনেককেই কাছ থেকে জানার সুযোগ ঘটেছিল। তাঁদের অধিকাংশকেই জেনে আহ্লাদিতও হয়েছিলাম। আবার দু-একজনকে কাছ থেকে জেনে আহতও হয়েছিলাম খুবই। সাহিত্য-জগৎ সম্বন্ধে ধারণা খারাপ হয়ে গেছিল। মনে হয়েছিল, কাছে না গেলেই যেন ভালো ছিল।

'দাদা-কাল্ট' কাকে বলে, 'গুরু-কাল্ট', নির্লজ্জ চামচাগিরি কাকে বলে, তা জেনেছিলাম। সাহিত্য-কাব্য জগতের যশ প্রার্থনা বিভিন্ন পেশার শিক্ষিত মানুষদেরও যে কত নীচে টেনে নামাতে পারে তা নিজচোখে দেখে কাব্য-সাহিত্য জগৎ সম্বন্ধে যে অলীক ধারণা ছিল তা ছিঁড়েখুঁড়ে গেছিল। 'বুধসন্ধ্যা'তে না গেলে হয়তো সেই অলীক কিন্তু সুন্দর ছবিটিকে মনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম। তবে ওখানে আমি নিজের ইচ্ছায় যাইনি। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে অভিনয় করার জন্যে সুনীল গাঙ্গুলি আমাকে অনুরোধ করেন। বলেন, গান গাইবার কেউ নেই। সেই সুবাদেই সুনীলবাবুর বাড়ি জীবনে প্রথমবার যাই এবং অন্যান্যদের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হই।

আগেই বলেছি যে, ও প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ। 'ঋভু'তে তা অপ্রাসঙ্গিকও বটে। অন্তত আমার নিজের মতে।

মহত্ত্বর মুখোশ, ঔদার্যর ছল, বন্ধু-বৎসলতার কাপট্য এমন নগ্নভাবে প্রকট হয়ে ওঠাতে বড়ই আহত হয়েছিলাম। তবে আবারও বলব যে, মোটের উপর আনন্দই পেয়েছিলাম বেশি। দুঃখ সে তুলনাতে সামান্যই। কিন্তু আবারও বলছি, সে সব অন্য গল্প। আমার জীবনীতে অতজন নামীদামি কবি-সাহিত্যিকের কথা হয়তো আঁটবে না। এঁদের কথা কখনো অন্য কোনো লেখাতে বিশদভাবে লিখতেও পারি। মনস্থির করিনি।

ধারণা ছিল, সাহিত্য রচনা একা-ঘরের সাধনা যতটা, ততটা দলবদ্ধ মানুষের বাজারি উদ্গীরণ নয়। কথাটা প্রাঞ্জল হল না বোধহয়। উদাহরণ হিসেবে আমি শঙ্খ ঘোষের কথা বলব। আমার মতে, শঙ্খ ঘোষ যতখানি কবি তাঁর স্বভাবে ও ব্যবহারে ততখানি হয়তো অন্য অনেকেই নন। শঙ্খ ঘোষের 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' বা 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' বা অন্য অনেক বইয়ে কবিতাই তাই আমার এত প্রিয়।

শক্তি ছিল ব্যতিক্রম। হয়তো সেই কারণেই শক্তিকে 'বুধসন্ধ্যা' সযত্নে পরিহার করেছে। কেন করেছে, তা এখন অল্প অল্প বুঝতে পারি। শক্তিও মধ্যরাত্রে শহর শাসন করেছিল কিন্তু সে ছিল অন্য মাপের, অন্য ধাতের, অন্য জাতের মানুষ। এই জমিতেই তার বিপরীত মেরুতে বাস করেও শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে খুবই মিল দেখি। এই দুজন কবি নিজেরা কারোকেই ব্যবহার করেননি কাব্য-সাহিত্য জগতের নানা প্রাপ্তির জন্যে। নিজেদেরও ব্যবহৃত হতে দেননি।

আনন্দবাজারের কর্তৃপক্ষদের ক্রিয়াকাণ্ডর সব ব্যাপারই যে আমার পছন্দর এমন নয় কিন্তু শক্তির প্রতি তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা এবং প্রশ্রয় অবশ্যই প্রশংসার্হ এবং গুণগ্রাহিতার চরম বলে মনে হয়েছে।

পাঠক! আমার মতো সাধারণের সমতল প্রসঙ্গ থেকে অনেক বিখ্যাত এবং প্রবল প্রতাপান্বিত মানুষদের উচ্চভূমির প্রসঙ্গ এনে ফেললাম বলে মার্জনা করবেন। 'ঋভু' আবার ঋভুতেই ফিরুক।

যা বলছিলাম। দিনগুলি রাতগুলি 'অকাজে' যখন নষ্ট করেছি তখনও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জোর পেয়েছি। বারেবারেই মনে করেছি :

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছিলেন। কিছুই ফেলা যায় না। যাবে না।

আর্নেস্ট হেমিংওয়েও তাই বিশ্বাস করতেন, বলতেন "nothing is wasted in a writer's life"। কেউ লাথিই মারুক আর কেউ চুমুই খাক, সবই লেখকের কাজে লেগে যায়। সব অভিজ্ঞতাই তার স্মৃতির মণিকোঠাতে, তার অবচেতনে সঞ্চিত হতে থাকে। কখন যে সেই অভিজ্ঞতার কোন্ অংশ, কতটুকু, তাঁর কলমের ডগাতে উৎসারিত হবে তা তিনি নিজেও জানেন না। লেখক কোনো বিশেষ শ্রেণির মানুষের ধ্বজাধারী নন, বুর্জোয়া বা প্রলেতারিয়েতের নিশান তাঁর হাতে থাকে না, কলকাতার কফিহাউস বা খালাসিটোলা বা পারি শহরের পথ-রেস্তোরাঁতে নিয়মিত তাঁর পা না পড়লেই যে তিনি ব্রাত্য এমন কোনো কথা নেই। কারণ, শুধুমাত্র বহিরঙ্গ কারোকেই কবি বা লেখক করে তুলতে পারে না। বহিরঙ্গকে অন্তরে এনে অন্তরঙ্গ করে তাকে লেখক বা কবি তাঁর নিজস্ব অনুভূতিতে জারিত করে নতুন করে উদ্গীরণ করেন। তা করাই কবি-সাহিত্যিকের কাজ। এই কাজ তাঁরা খুব যে একটা সচেতন ভাবেও করেন এমনও বিশ্বাস হয় না আমার। 'প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি'র মতো এও এক শিল্পবিশেষ। অন্য মানুষের চোখের আড়ালে তো বটেই তাঁর নিজেরও চোখের আড়ালে এই বিবর্তন, এই নবীকরণ ঘটে যায়। ঊষর মরুভূমিতেও ফুল ফোটে। পাখি গায়। প্রজাপতি ওড়ে।

আমেরিকান ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এক জায়গাতে বলেছিলেন, "Writing at its best is a lonely life. Organisations for writers palliate the writers loneliness but I doubt if they improve his writing.... .

For a true writer each book should be a new begining where he tries again for something that is beyond attainment. He should always try for something that has never been done or that others have tried and failed. Then, sometimes, with great luck, He will succeed."

লেখালেখি, সাহিত্য, ছবি আঁকা, গান-বাজনা এসব, আমার মতে, (আমার মতটিই যে অভ্রান্ত এমন ভাবার মতো মূর্খ আমি নই) নির্জন এককের সাধনা। দল বা গোষ্ঠীর এক্ষেত্রে কোনোই প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই কোনো আড়ম্বরের, বিপুল-সংখ্যক অগভীর, মন-রাখা স্তাবকদের। 'গণতান্ত্রিক লেখক সঙ্ঘ' বা ওরকম কিছুর সভ্য হবারও দরকার নেই। তার কারণ, তিনি মানে কবি বা লেখক একনায়ক যদিও নন, তিনি অবশ্যই একতান্ত্রিক। যে লেখকের সত্যিই কিছু বলার আছে, কলমের জোর আছে, তাঁকে পাঠক-পাঠিকারা গ্রহণই শুধু করবেন না, মাথায় করে রাখবেন। সঙ্ঘবদ্ধতায় দুর্বল ও অসম মানুষেরই প্রবণতা থাকে বলে লক্ষ করা যায়। শুধুমাত্র থাকেই না, চিরদিনই ছিল। আজও আছে। ভবিষ্যতেও চিরদিন থাকবে। লেখক যদি প্রকৃতই লেখক হয়ে উঠতে পারেন তবে সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণির কুক্ষিগত সম্পত্তি তিনি কখনোই হয়ে থাকবেন না, তিনি সমাজের সব শ্রেণির। কোনো বিশেষ সামাজিক বা রাজনৈতিক আগমার্কা, তাঁর কোনোদিনই প্রয়োজন হয়নি, হবে না। হ্যাঁ, তাঁকে পুরস্কার থেকে, আনুষ্ঠানিক সম্মান থেকে, সম্মানীর অর্থ ও খেতাব থেকে বঞ্চিত করে অবশ্যই রাখা যাবে। কিন্তু যে লেখক তাঁর পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে তাঁর চিহ্ন রেখে যেতে পারেন তাঁর ওইসব বাহ্য পুরস্কার ও সম্মানের প্রয়োজনই বা কী? যে লেখকের পাঠকই নেই, তাঁরই ওইসব খেতাব-সম্মানেব বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়।

বাবা যখন ১৯৪৯-এর ১৬ই আগস্ট তাঁর নিজের নামে তাঁর অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্মের প্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকেই আমার মামাতো দাদা শ্রীআশিসকুমার বসু (দুলুদাদা) বাবার অফিসে। তখন তিনি বি কম পাশ করেছেন এবং বাবারই আর্টিক্‌ল্ড ক্লার্ক হয়ে সি এ পড়ছেন। তিনি ছাড়া আরও দুজন ছিলেন প্রথম দিন থেকেই। একজন নির্মলচন্দ্র ঘোষ (নির্মলকাকু) যিনি রংপুরে আমাদের ধাপ-এর বাড়িতেই থাকতেন এবং যাঁর কথা 'ঋভু'র প্রথম খণ্ডেই বিস্তারিত বলেছি। আর ছিলেন শ্রীকীর্তেন্দুমোহন গুহ রায়। পূর্ববঙ্গের জমিদারি চলে যাওয়ার পরে বাবার অফিসে টাইপিস্ট হিসেবে যোগ দেন। বাবার মাসতুতো ভাই।

নির্মলকাকু ছিলেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ক্যাশিয়ার অ্যান্ড হোয়াট-নট। তাঁর হাতের লেখা এতই সুন্দর ছিল যে তিনি ইচ্ছে করলেই সাইনবোর্ডের দোকান দিতে পারতেন। ছিন্নমূল, হতাশাগ্রস্ত, চোখে অন্ধকার দেখা নানা মানুষের জন্যে বাবার স্থাপিত ওই ছোটো অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম একটু পা রাখার জায়গা করে দিয়েছিল। বহু পরিবার ভেসে যেতে যেতে কোনোক্রমে বেঁচে গেছিল।

আমার মামাবাড়ির মানুষেরা অবশ্য পূর্ববঙ্গে থাকতেন না দেশভাগের সময়ে। গিরিডি থেকে সচ্ছল দাদু চলে আসেন প্রথম মহাযুদ্ধে অভ্র ব্যবসাতে বিরাট ধস নামার পরে, ত্রিশের দশকেই। লাল মাটি, শালবন, উশ্রী নদী, খাড়ুলি পাহাড়, সিরসিয়া ঝিলের মায়াঞ্জন আমার মামা-মাসি-মায়ের চোখে আমৃত্যু লেগে ছিল। অমন মায়াঞ্জন, নস্টালজিয়াতে, খুব কম মানুষকেই আক্রান্ত দেখেছি আমি। তাঁরা তো আক্রান্ত ছিলেনই, তাঁদের মুখনিঃসৃত গল্পে আমরা, তার পরের প্রজন্মের মানুষেরাও প্রায় সকলেই সমান আক্রান্ত হয়েছিলাম। তাই অন্যভাবে হলেও তাঁরাও বলতে গেলে মানসিকভাবে উদ্বাস্তুই ছিলেন।

বাবার ফার্মে আমার মামাতো ভায়েদের মধ্যে অনেকেই কাজেরও সুযোগ পেয়েছিলেন। বড়োমামার বড়ো ছেলেরই মতো ছোটো ছেলে অভীকও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছে বাবার ফার্ম থেকেই।

আশিসদাই বাবার প্রথম পার্টনার-পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে। তারপর ১৯৬২ থেকে আমিও পার্টনার হই। ১৯৭২-এ আমার ছোটো ভাই বিশ্বজিৎ (বুলা) পার্টনার হয় সি এ পাশ করার পর। বাবা পরলোকে চলে যাবার পরে এখন এই ফার্মে আমরা তিনজন ছাড়াও বাইরের আরও চারজন পার্টনার আছেন। তাঁরা সকলেই মুখ্যত গভর্নমেন্ট ও ব্যাংক অডিটের কাজ দেখেন।

ফার্মের পত্তন যখন বাবা করেন তখন মুখ্য ছিল আয়কর সংক্রান্ত কাজ। কিন্তু আয়কর আইনে নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখন অডিটের কাজই ধীরে ধীরে মুখ্য হয়ে উঠেছে। বাবার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান অর্ধশতাব্দী ধরে চালনা করার পেছনে আমার নিজের ভূমিকা অতি নগণ্য। দুলুদাদা, বুলা এবং অন্যান্য সকলের অবদানই বেশি। বহরমপুরের বেণুকাকুর (প্রভাসচন্দ্র বোস) অবদানও কম নয়। আমার কনিষ্ঠতম ভ্রাতা বাবুয়া (ইন্দ্রজিৎ) যদিও অ্যাডভোকেট, সে আমাদের ফার্মকে নানাভাবে পর্যাপ্ত সাহায্য করেছে ও করছে।

আজকালকার দিনে নির্মলকাকু বা খোকাকাকুর (কীর্তেন্দুমোহন গুহ রায়) মতো কর্মীর কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না। কীই-বা বেতন পেতেন তাঁরা? কিন্তু বুকের রক্ত দিয়েছেন বাবার জন্যে। কোনো প্রতিষ্ঠানই, ছোটো কিংবা বড়ো কোনো একজন মানুষ কখনোই গড়ে তুলতে পারেন না, একা হাতে, তা তিনি যতই দক্ষ হোন না কেন! সেতুবন্ধনে সামান্যতমেরও ভূমিকা থাকেই। আর বাবা যে সময়ে তাঁর ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় তো সেতুবন্ধনের সময়ই ছিল। তাই এঁদের এবং নরেনকাকুরও (শ্রীনরেন্দ্রনাথ চন্দ্র, যিনি দেশভাগের আগে বরিশালের কালাভাইদের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ছিলেন) অবদান অনস্বীকার্য। এঁদের কথা সম্ভবত 'ঋভু'র অন্য পর্বে উল্লেখ করেছি। ভাগ্যের পরিহাসে নিজেদের সম্পূর্ণ বিনা দোষে রাতারাতি সব খুইয়ে কলকাতার মতো হৃদয়হীন শহরে এসে পায়ের তলাতে জমি খুঁজে পাওয়া বড়ো সহজ কাজ ছিল না। ভাগ্যের সহায়তা যেমন দরকার ছিল তেমনই ছিল ব্যক্তিবিশেষের দার্ঢ্য, মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

তবে একটা ব্যাপার ছিল, ডুবন্ত মানুষ যেমন কুটোকে অবলম্বন করেও ভেসে থাকার চেষ্টা করেন, এঁরাও তেমনই বাবার ফার্মকে আশ্রয় করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেইসব অসুবিধার, ঘামের, বিরক্তির, তিক্ততার এবং অমানুষিক পরিশ্রমের কথা পুব-পাকিস্তান থেকে মান ও প্রাণটুকু হাতে করে নিয়ে আসা মানুষমাত্রই জানেন। তবে সেই প্রজন্মের মানুষ আর বেশি নেই। নতুন প্রজন্ম অতীতের কথা জানেই না। তারা কম-বেশি আত্মবিস্মৃতও, তাই তাদের মধ্যে নিজেদের পরম্পরা সম্বন্ধে অজ্ঞ অনেককেই অনেক বড়ো বড়ো কথাও বলতে শুনি। তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বনাগরিক।

হিটলারের জার্মানিতে ইহুদিদের যেমন হত্যা করা হয়েছিল, যেমন অত্যাচার করে, অপমান করে, নিঃস্ব করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে, দেশভাগের কিছুদিন আগে থেকেই তেমনই নির্মম ব্যবহার করা হয়েছিল সংখ্যালঘু হিন্দুদের সঙ্গে। উদ্বাস্তু বাঙালি হিন্দুর বেঁচে থাকার ইতিহাস নিয়ে Leon uris-এর Exodus-এর মতো উপন্যাস বাংলাতে লেখা হয়নি। কিন্তু কারো অবশ্যই লেখা উচিত ছিল। গ্যাসচেম্বারে আর কতজন ইহুদিকে মারা হয়েছিল? নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জায়গাতে এবং ব্রিটিশ রাজের তৈরি করা দুর্ভিক্ষে যে কত মানুষ মারা গেছিল, অধিকাংশই বাঙালি, তার হিসাব কেউ রাখেনি। এই মহাপাপিষ্ঠদের বিচার হয়নি ওয়ার ক্রিমিনাল হিসাবে। সবচেয়ে লজ্জার কথা আমরা এসব কথা বেমালুম ভুলে গেছি।

ধিক আমাদের।

ইহুদিরা অবশ্য অন্য জাত। অন্য মেরুর জাত। তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করা বাতুলতা। তারা প্রত্যাঘাতে বিশ্বাস করে। আজকের ইজরায়েল তাই 'দাঁতের বদলে দাঁত'-এর নীতি গ্রহণ করেছে।

বাঙালি হিন্দুদের সহ্যশক্তির, অপমান অসম্মান অবলীলাতে গিলে ফেলার এমন লজ্জাকর দৃষ্টান্তর সম্ভবত কোনো তুলনা নেই পৃথিবীর ইতিহাসে। আমাদের প্রজন্মর অনেক দুর্বুদ্ধিজীবীকেও দেখি বাংলাদেশে 'নায়ক' হবার বাসনাতে তাঁদের অতীতকে পুরোপুরি অস্বীকারও করতে। এমনই ভাব, যেন কিছুই ঘটেনি। আমি যদিও নিজে উদ্বাস্তু হইনি, আমার অগণ্য আত্মীয়স্বজন হয়েছিলেন। চোখের

সামনে তাঁদের দেখেছি নিজেদের কিছুমাত্র দোষ ব্যতিরেকেই জিন্না সাহেব আর নেহরু সাহেবের 'খ্বায়িশ' পুরো করতে কী অচিন্ত্যনীয় দুর্দশা ও দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁদের। অক্ষমের সে কী নিষ্ফল ক্ষোভ! কী অপমান অসম্মান!

সেই সব দিনের কথা ভাবলে আমার এখন রাগে গা রি-রি করে ওঠে। আমি নিজে একজন হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তু বলে, আমার বড়ো লজ্জাও হয়। নিজের উপরে, আমাদের সকলের উপরেই এই গভীরে প্রোথিত কাপুরুষতার কারণে ঘেন্না হয়।

দেশভাগের কথাই যখন উঠল তখন আরও অনেক প্রাসঙ্গিক কথাও মনে এল। মনে যখন এল তখন বলেই ফেলি। তবে আমাদের দেশ এক বিচিত্র দেশ। এই দেশে সত্যকথনের জন্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে বিশ্বনাগরিক নেহরু সাহেবের মর্জিতে কাশ্মীরের জেলে পচে মরতে হল। আর আজকে কাশ্মীরের কী অবস্থা! এত বছর আমাদের ট্যাক্সের টাকাতে বাসমতি চাল জলের দরে খাইয়েও সব আবদার মিটিয়েও শেষ রক্ষা হল না।

এই সংসারে সকলেই সব ভাষা বোঝে না। মানে, অন্যের ভাষা। যাঁরা শারীরিক জোরকে, সন্ত্রাসবাদকে, অন্তর্ঘাতকে, অকৃতজ্ঞতাকেই একমাত্র ভাষা বলে জানেন, তাঁদের সঙ্গে শুধুমাত্র সেই ভাষাতেই কথা বলা উচিত। নইলে বক্তব্য তাঁদের কানে যায় না আর ক্রমে ক্রমে অপরপক্ষের মনে এই ভ্রান্ত ধারণাই গড়ে ওঠে যে, তাঁদের বিরুদ্ধে যে অন্যায়, অত্যাচার এবং ধান্দাবাজিই করা হোক না কেন তাঁরা সবই মুখ বুজে মেনে নেবেন।

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অবশ্যই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, একদল মানুষ তাঁদের যা খুশি তাই করবেন আর সেই যা-খুশি অপর একদল মানুষ অম্লানবদনে মেনে নেবেন। তারই সঙ্গে বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে একশ্রেণির অবাঙালি মানুষের জন্মহারও। তাদের জন্মহার, তাদের আপাত সূত্রহীন অঢেল টাকা, তাদের নানা ব্যাপারে 'গাজোয়ারি' মনোভাবও চোখে পড়ছে স্পষ্ট।

উর্দু ভাষার আমি একজন মস্ত বড়ো অনুরাগী কিন্তু এই সমস্ত আপাত-সামান্য ঘটনার পেছনে পুঞ্জীভূত কালোমেঘের বিপজ্জনক ছায়াও যে দেখি না, তাও নয়। ঘর-পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় যে পায়ই! তাই ভয় আমাদের হওয়া স্বাভাবিক। এই গগননিনাদী গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘুদের ভোট সহজে কুক্ষিগত করার জন্যে দেশের ও দশের স্বার্থ অনেকদিন ধরে যে ভাবে ক্রমান্বয়ে বিঘ্নিত করে চলেছেন তাতে ভয় হয় যে, এখান থেকেও উদ্বাস্তু হয়ে আমাদের বা আমাদের উত্তরসূরীদের অন্য কোথাও চলে যেতে না হয়।

কিন্তু যাব কোথায়? এমন একটি দেশও কি আছে পৃথিবীতে যেখানে উদ্বাস্তু হিন্দুদের ঠাঁই হবে?

আমরা কি আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সামান্যতম চিন্তাও করি? একজনও? আমরা যে-যার পকেট, যে-যার বর্তমান, যে-যার ভোটকেই দেখছি শুধু পরম মূর্খের মতো। আমাদের ভবিষ্যৎ যে কী ভয়ানক সে সম্বন্ধে দু দণ্ড ভাবার মতো সময় ও মানসিকতা সম্ভবত এই স্বার্থান্বেষী, অদূরদর্শী, অন্ধ আমাদের একজনেরও নেই। এই অন্ধত্ব ও নিশ্চেষ্টতার গুনাগার বড়ো মর্মান্তিক হবে যদি এখনও আমরা সাবধান না হই। সময় আর খুব বেশি নেই হাতে। সত্যিই নেই।

সৃষ্টিশীল মানুষ মাত্ররই জীবনে মাঝে মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা বা আত্মহত্যার মুহূর্ত আসে কিনা তা আমার জানার কথা নয়। আমি শুধু আমার নিজের কথাই বলতে পারি।

অনেকেই আত্মহত্যা প্রবণতাকে কাপুরুষতার লক্ষণ বলে মনে করেন। অনেকে আবার তা মনে করেনও না।

আমার মধ্যে আত্মহত্যা-প্রবণতা আছে যে, সেটা আমি অনুভব করেছি, কৈশোরকাল থেকে এ পর্যন্ত অনেকবার। শুধু তাই নয়, একবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলাম দিন সাতেক অসহ্য কষ্ট ভোগ করার পর। অবর্ণনীয় শারীরিক ও মানসিক কষ্ট।

সেই সব মুহূর্তের বা দিনের কাছে ফিরে যাবার আগে বলি যে, যাঁরা বেশি অনুভূতিপ্রবণ তাঁদের

অনেকের মধ্যেই হয়তো এই প্রবণতা থাকে। সৃষ্টিশীল মানুষ হলেই যে অনুভূতিপ্রবণ হবেন তার কোনো মানে নেই। আমি অন্তত আমার সমসাময়িকদের মধ্যে অনেক কবি ও লেখক দেখেছি যাঁরা মানসিকতাতে আদৌ সূক্ষ্ম নন। সূক্ষ্ম তো ননই বরং তাঁরা এমনই স্থূল যে মনে হয় মানসিকতাতে কসাই অথবা পাটের বা কঙ্কালের ব্যবসাদারদের থেকে একটুও অন্যরকম নন।

অনেকে বলেন যে, দুর্বল-চরিত্রের মানুষের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি লক্ষিত হয়। একথা আমার ঠিক বলে মনে হয় না। মনে হয়, আত্মহত্যার প্রবণতার সঙ্গে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এক বিশেষ সম্পর্ক আছে। আমার কাছে জীবনের পরিমাপ জীবনের দৈর্ঘ্য দিয়ে বিচার্য আদৌ নয়, তার পরিমাপ জীবনের ফসলটুকু দিয়েই।

জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও নানা জনের নানা মত থাকতে পারে। ভালো খাওয়া, ভালো পরা, প্রভুত নাম-যশ, অগণ্য স্তাবক, পুরস্কারের পাহাড় এ সবই কোনো কোনো 'সৃষ্টিশীল' মানুষের কাছে 'পূর্ণ জীবনের' সংজ্ঞা বলে বিবেচ্য। অন্য কারো কাছে বা আত্মার শুদ্ধি, নিভৃতে একাকী কাব্য-সাহিত্য চর্চা, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'পূর্ণ মানুষ' বলে অভিহিত করেছিলেন, তেমন হয়ে ওঠার সাধনার মধ্যেই তাঁদের সব আনন্দ লীন থাকে। নির্জনতাই তাঁদের প্রার্থিত। ভিড় তাঁদের কাছে অসহ্য। তাঁরা প্রকৃতই অন্তর্মুখী। আর সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে 'নির্জনতা কখনো কারোকে খালি হাতে ফেরায় না।'

মানুষে মানুষে অনেকই তফাত থাকে। সৃষ্টিশীল মানুষদের মধ্যে তো অবশ্যই থাকে। মনে হয়, প্রত্যেক সৃষ্টিশীল মানুষই পৃথিবীকে কিছু দেবার জন্যেই আসেন। যদি সেই দেওয়া শেষ হয় অথবা যদি সেই দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে সেই সৃষ্টিশীল মানুষের এমন মনে হতেই পারে 'এখানে থেকে আর কী দরকার'। জীবন শব্দটার সংজ্ঞা অনেকের কাছে এমন যে তাঁদের জীবন যদি সেই সংজ্ঞাকে প্রাণিত করে তুলে জীবনকে সার্থক করতে না পারে তবে তাঁদের হয়তো মনে হয় এ জীবন রেখে আর কী লাভ।

বিখ্যাত ইতালিয়ান চিত্র পরিচালক 'আন্তোনিওনি'র পরিচালিত অধিকাংশ ছবির নায়ক-নায়িকারাই আত্মহত্যাপ্রবণ ছিলেন। তাঁর সব ছবির চিত্রনাট্য তিনি নিজেই লিখতেন। সেগুলি অন্য কারো উপন্যাসনির্ভর নয়। তাঁরই মৌলিক রচনা। তিনি বিশ্বাস করতেন "If life was a gift of God then the right to take it away was a gift of God as well." তাই তাঁর চবিত্রদের আত্মহননে তিনি কোনোই দোষ দেখতেন না।

আমেরিকার ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে জীবনকে যতখানি ভালোবাসতেন, যতখানি ভোগবাদী ছিলেন, আমাদের দেশি কোনো কোনো কবি বা লেখক 'ভোগবাদী'র সচেতন ও প্রচুর শ্রমসাধ্য ইমেজ বিল্ডিংয়ের চেষ্টার চরম করেও তার ধারেকাছেও কোনোদিনও আসতে পারবেন না। হেমিংওয়ে প্যারিসের 'The Ritz' হোটেলে এবং ভেনিসের 'The Gritti' হোটেলে সারাবছর একটি স্যুইট বুক করে রাখতেন যাতে হঠাৎ যেতে ইচ্ছে করলে সেখানে জায়গা অবশ্যই পান। তাঁর একটি ট্রলার ছিল, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার। কিউবাতে একটি বাড়ি ছিল যার নাম 'Finca Vicia'। স্টেটসের আইডাহো স্টেটে, 'স-টুথ' পর্বতমালার বুকে গভীর জঙ্গল পরিবৃত 'দি স্নেক' নামের সর্পিল নদীর উপরে ছবির মতো একটি বাড়ি ছিল। তার নাম ছিল 'দি টপিং হাউস'।

এছাড়া প্রতি বছর শীতে অনেক সঙ্গিনী নিয়ে সুইটজারল্যান্ডে স্কিইং করতে যেতেন। প্রতি জুন-জুলাই-এ (যখন পূর্ব-আফ্রিকাতে শীতকাল) বিগ গেম শিকার করতে যেতেন। তাঁর জন্মদিনের পার্টিগুলি সন্ধেবেলা আরম্ভ হয়ে পরদিন সকাল দশটা-এগারোটাতে শেষ হত। সেই সব পার্টিতে এমন এমন সব অতিথি আসতেন সারা পৃথিবী থেকে যে নাম করলে অনেকে অবাক হবেন। একটি নাম করছি, যেমন ভারতের কুচবিহারের মহারাজা।

যতক্ষণ জেগে থাকতেন এবং কাজ না করতেন খেলাধুলা, আড্ডা, শিকার, মদ্যপান ইত্যাদি নিয়েই থাকতেন। এমন বহির্মুখী ভোগী মানুষ পৃথিবীতে দু-চারজনই হয়েছেন। অর্থ, যশ, শারীরিক ক্ষমতা কোনো কিছুরই খামতি ছিল না তাঁর। সবাই তাঁকে দুঃসাহসী 'হি-ম্যান' বলে জানত। তিন-তিনবার

উড়োজাহাজ ভেঙে পড়বার পরও বেঁচে ছিলেন। উড়োজাহাজ বলতে অবশ্য বেশির ভাগই এক-এঞ্জিনের ছোটো ছোটো প্লেন, বনাঞ্জা বা ওইরকম হালকা প্লেন, তিন-চার আসনের। গ্যারি কুপার এবং হলিউডের একাধিক নামি নায়িকাও তাঁর বান্ধবী ছিলেন—একসঙ্গে শিকারে যেতেন।

এই ভোগবাদী, বহির্মুখী 'হি-ম্যান' কেন আত্মহত্যা করতে গেলেন? তাঁর নিজের জবানিতে বললে বলতে হয় "But what the hell? What does a man care about? Staying healthy. Working good. Eating and drinking with his friends. Enjoying himself in bed. I have'nt any of them. Do you understand? God damm it! None of them."

তার চেয়েও বড়ো কথা তিনি আর লিখতে পারছিলেন না। একজন লেখকই শুধু জানেন লিখতে না-পারার কষ্ট কত বড়ো কষ্ট। সেই বুক-ফাটা কষ্ট কোনো লেখকের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়, যদি তিনি যথার্থই ক্রিয়েটিভ লেখক হন, ইতিহাস-দূষণকারী বা মালিকের অর্ডার নির্ভর লেখাই শুধু না লেখেন।

কখনও মনে হয়, জীবনে কত কীই তো করার ছিল, পাওয়ারও ছিল, যা যা করতে চেয়েছিলাম, তার কিছুই প্রায় করা হল না, যা যা চেয়েছিলাম, তার কিছুই প্রায় পাওয়া হল না। আর কতদিন মিছিমিছি বাঁচা? প্রশ্বাস নেওয়া ও নিশ্বাস ফেলা? প্রশ্বাস নেওয়া আর নিশ্বাস ফেলা আর বেঁচে থাকা তো সমার্থক নয়। প্রকৃত জীবনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা, তার বহুবর্ণ অনুভূতির সাতরঙা ছটাই যদি করায়ত্ত না হল তবে এই জীবন মিছিমিছি বয়ে বেড়িয়ে লাভ কী?

আমার জীবনে একথা বহুবার অনুভব করেছি যে, ব্যর্থতাই শুধু নয়, সাফল্যও মানুষকে বিমর্ষ করে, হতাশাগ্রস্ত করে। মনে হয় জীবনে যা-কিছুই চাওয়ার ছিল তার সবই তো পাওয়া হয়ে গেছে, তারপর আর মিছিমিছি বেঁচে থেকে লাভ কী?

প্রথমবার আত্মহত্যা করতে যাই পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে। সি এ পরীক্ষার অ্যাকাউন্টেন্সি গ্রুপে ফেল করেছি। ছ'টা ব্যালান্সশিটা মেলাতে হত তিন ঘন্টাতে। ব্যাংকিং কোম্পানি, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, ইলেকট্রিসিটি কোম্পানি, হোল্ডিং কোম্পানি (এখন সে আপদ সিলেবাসেই নেই), পার্টনারশিপ ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ব্যালান্সশিট। যা সব ছিল পুরোপুরিই মার্কামারা কেরানির কাজ এবং পাশ করার পরে নিজে হাতে যা করবার কোনো প্রয়োজনই হয় না বিশেষ। আজব দেশের আজব শিক্ষাব্যবস্থার বলি হয়েছিলাম। তদুপরি গোদের উপর বিষফোড়া, এক গায়িকার প্রেমে পড়েছিলাম। বাড়িতে অশেষ অশান্তি। আমার কারণে মা-বাবা এত অশান্তি পাচ্ছেন দেখে যেমন কষ্ট পাচ্ছিলাম তেমনই কষ্ট পাচ্ছিলাম আমাকে একটুও বোঝার চেষ্টা করছেন না বলে। যা হতে চেয়েছিলাম জীবনে, সাহিত্যিক, গায়ক, চিত্রকর এবং ব্যারিস্টার তা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই জেনে।

আজকাল 'প্রেম করা' বলতে যা বোঝায় আমাদের সময়ে প্রেম করা তেমন ছিল না। প্রেমিকার সঙ্গে তখনও একটি কথাও বলিনি। শুধু তার গান শুনেছি। তার সঙ্গে অবশ্য দূর থেকে দেখা হত প্রায়ই। সেটা মোহের এক তীব্রতর অভিব্যক্তি ছিল, প্রেম বোধহয় নয়।

সেই গভীর পরিণতিহীন মিশ্র যন্ত্রণার শেষ প্রহরে বন্দুক দিয়ে গুলি করতে চেয়েছিলাম নিজেকে। সেই সময় বাবা কলকাতাতে ছিলেন না। অফিসের কাজে দিল্লি গেছিলেন। মায়ের কাছ থেকে বন্দুক-রাইফেলের আলমারির চাবি কেড়ে নিতে গিয়ে রীতিমতো ধস্তাধ্বস্তি। মায়ের ছোট্টখাট্টো শরীরে নেহাৎ প্রিয় সন্তানকে বাঁচাতে ঐশ্বরিক বল এসেছিল সেই মুহূর্তে নইলে চাবি তাঁকে দিতেই হত। ছেলেকে বাঁচাবার জন্যেই সেই বল মুহূর্তের জন্যে এসেছিল। সেদিন হাতে চাবিটি পেলে আজকে এ লেখা আর লিখতে হত না।

তারপরে আরও একবার বিয়ের বারো-তেরো বছর পরে আমার ছোট মেয়ের জন্মের পরে একদিন আমার স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াতে পিস্তল দিয়ে মাথাতে গুলি করতে গেছিলাম। আমার স্টাডিতে ছিলাম আমি। সন্ধেরাতে পিস্তলের ম্যাগাজিন লক করে টেবলের উপর পিস্তলটি রেখে

স্টাডির দরজাটা বন্ধ করব বলে উঠেছি যখন চেয়ার ছেড়ে, তখনই আমার আড়াই বছর বয়সি ছোটো মেয়ে টালমাটাল পায়ে শোওয়ার ঘর থেকে এসে স্টাডির দরজায় দাঁড়াল। তার পরনে সাদা ভয়েলের হাতকাটা বাড়িতে পরার জামা আর সাদা জাঙিয়া। গরমের দিন ছিল। তার গায়ে বেবি জনসন পাউডারের গন্ধ, সে দুষ্টু দুষ্টু মুখে হেসে বলল, 'কী কলতো তুমি, বাবা? গল্প বলবে না?'

আমার সংবিৎ ফিরে এল। ছোটো মেয়ে বড়ো মেয়ের চেয়ে ন'বছরের ছোটো। ওকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বললাম, কিছু করছি না মা! কিছুই করছি না।

শক্তির ওই কবিতাটি, 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব'-র তাৎপর্য যে কী গভীর তা ওই মুহূর্তটি আমার জীবনে না এলে আমি কোনোদিনও জানতেও পেতাম না। মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে পিস্তলের চেম্বার থেকে গুলি বের করে ম্যাগাজিনটাও খুলে পিস্তল এবং ম্যাগাজিন ড্রয়ারে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে রাখলাম।

তৃতীয়বার, ঘটনাটি সত্যি সত্যিই ঘটে যেতে পারত বছর পনেবো-ষোলো আগে। সেবারেও স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য।

আসলে, আমি সংসারী কোনোদিনও ছিলাম না। অফিসের দশ ঘণ্টা পেশার কাজের পর সারা ভারতবর্ষ দৌড়ে বেড়াবার পরে, নিজের লেখার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম যতটুকু থাকতাম বাড়িতে। স্ত্রী-কন্যাদের দেবার মতো সময় আমার একটুও ছিল না এবং ছিল না বলেই ন্যায্য কারণেই স্ত্রী বিরক্ত হতেন। আমি ভাবতাম, আমি যে এতরকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও লিখছি, লেখক হিসেবে সামান্য হলেও একটু পরিচিতি পেয়েছি, তা কি কিছুই নয়? আমার এক শালার বাংলা-বিশারদ স্ত্রী এসে সেদিনই দুপুরে বলেছিলেন, 'যা-তা লিখছেন আপনি। ওটা কি লেখা হচ্ছে?'

'মাধুকরী' তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল।

এই ঘটনাটি জেনে আমাকে যাঁরা সাহিত্যিক বলে মানেন না সেই সব পণ্ডিত অধ্যাপক ও সমালোচকেরা যারপরনাই আনন্দিত হবেন যে একথা মনে করেও আমার আহ্লাদ হচ্ছে। হচ্ছে এই কারণে যে, তাঁদের সকলের মুখে ছাই দিয়েই আমি বেঁচে আছি লেখক হিসেবে।

স্বামী হিসেবেও ছিলাম একেবারেই অপদার্থ, নির্গুণ। সাংসারিক কোনো কর্তব্যই করিনি কোনোদিনই। যাবতীয় কর্তব্য সব ঋতুই করত। মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানো থেকে তাদের পড়াশুনো, জামা-কাপড় বানানো, পড়ানো, স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, তাদের সবহত শেখানো সবই একা হাতে সেই করেছে। কাজের লোকজন থাকলেও গ্যাস, বাজার, দোকান, রান্না-বান্না, কাপড়-চোপড় ধোওয়া সবকিছুরই খবরদারিও করতে হত তাকেই।

১৯৭৬ থেকে পিত্রালয় ছেড়ে অন্যত্র বাস করা শুরুর পর থেকে স্বাভাবিকভাবেই দায়-দায়িত্ব তার আরোই অনেক বেড়েছিল। আমারও দমবন্ধ কাজ ছিল পেশার। তার উপরে লেখালেখি। পেশার কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকার পরও সংবাদপত্র অফিসের সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকাতে আরামের চাকরি করা হোলটাইমার লেখকদের সঙ্গেই ছিল আমার প্রতিযোগিতা। যেহেতু হোলটাইম লেখক নই তাই অনেক হোলটাইম লেখকই আজ পর্যন্ত আমাকে লেখক বলেই স্বীকার করেন না। কিন্তু সেটা তাঁরা 'হোলটাইম' লেখক বলতে আসলে যে কী বোঝায়, তা জানেন না বলেই হয়তো করেন না। পাঠকদের অতসব জানার কথা ছিল না। মানে, আমার এবং কাগুজে-লেখকদের জীবনযাত্রার পার্থক্যের কথা। পত্র-পত্রিকার মালিকেরা বা সম্পাদকেরাও আমাকে গ্রেস নাম্বার বা হ্যান্ডিক্যাপ দিতেন না কোনো। সবরকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই লিখতে হত।

পাঠকেরা ফেলে দিলে সম্পাদক ও পত্রিকা মালিকেরাও ফেলে দেন সে লেখককে। বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষণা ছাড়া কোনো লেখক যে বেঁচে থাকতে পারেন না এমন নয়। অবশ্যই পারেন। কিন্তু তেমন করে বাঁচতে বুকের পাটা ও কলমের জোর লাগে। এবং আরো যা লাগে অবশ্যই, তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

যাই হোক, ঋতু আমাকে বলত অবুঝ, বলত স্বার্থপর। আমার বাবা বলতেন, ঋতুর মাথায় যদি দুটো পোকা থেকে থাকে তো তোর মাথায় চারটে পোকা আছে। আমরা দুজনেই আসলে ভালোমানুষ এবং অনেকানেক অমিল থাকা সত্ত্বেও দুজনই দুজনকে ভালোবাসি বলেই প্রায় চল্লিশ বছর একসঙ্গে সুখে-দুঃখে, হাসিকান্নার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দিলাম।

অগণ্য পাঠিকা এবং অগণ্য মহিলাদের ফোন ও চিঠি আসত। ঋতু মুখে কিছু বলত না। কিন্তু বুঝতাম মনে মনে প্রচণ্ড বিরক্ত হত।

বিয়ের পরদিন থেকেই আমাদের দাম্পত্য আদৌ মসৃণ ছিল না, দুজনের মধ্যে নানা ব্যাপারে নানারকম অমিল একে একে ধরা পড়ছিল, অধিকাংশ দাম্পত্যেই যেমন পড়ে। কিন্তু এই বিয়েটা আমাদের দুজনের কাছেই এত দামি ছিল যে বিয়ে ভাঙার কথা মনে হয়নি কারোরই। তাছাড়া সন্তান আসার পরে তাদের কথা ভেবে আলাদা হওয়ার কথা দুজনের কেউই ভাবতে পারতাম না। ডিভোর্স যাঁরা করেন, সন্তান আসার পরেও, তাঁরা হয়তো অন্য জাতের, অন্য ধাতের মানুষ। তাঁদের আমি সমীহ করি কিন্তু ভালোবাসি না। কাছের মানুষকে, নিজেদের রক্তজাত সন্তানদের সুখী দেখার মধ্যে যে গভীর সুখ, তার কাছে নিজের নিজস্ব সব সুখই মূল্যহীন। অন্তত আমার মতে। এই সংসারে নিজে সুখী হতে হলে পরকে অনেকই দুঃখ দিতে হয়। যাঁরা নিজেদের খুব বেশি ভালোবাসেন তাঁদের পক্ষেই ডিভোর্স চাওয়া সহজ হয়। ভালোবাসা অনেক রকম থাকে। অপরপক্ষকে সুখী করা বা সুখী করার চেষ্টা করার মধ্যে যে গভীর সুখ নিহিত থাকে, তা যাঁরা জানেন, শুধু তাঁরাই জানেন।

'রাম' নামের একজন কাজের লোক ছিল আমাদের। সেই ওষুধপত্র আনত। ওষুধের দোকানিও আমাকে নামে জানতেন। দোকানিও ওড়িশার মানুষ, রামও তাই। রামকে দিয়ে ওই দোকান থেকে এবং অন্যান্য দোকান থেকেও এক পাতা করে বিভিন্ন ঘুমের ওষুধ, সবসুদ্ধ প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা আনিয়ে এক রাতে খাবার পরে খেয়ে নিলাম। একটি কাগজে 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' লিখে শোওয়ার ঘরের সামনে রেখে নিজের স্টাডি কাম শোবার ঘরে শুয়ে পড়লাম। দরজা লক করিনি। কেন যে করিনি কে জানে। হয়তো সত্যি সত্যিই মরে যাবার ইচ্ছে ছিল না, হয়তো 'যাত্রা' করতেই চেয়েছিলাম, স্ত্রীকে ভয় পাওয়াতে। তাও হতে পারে। কারণ, জীবনের অনেকই সময় আমি অত্যন্ত অবিবেচক, অপ্রাপ্তবয়স্ক, দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো ব্যবহার করেছি কাছের মানুষদের সকলের সঙ্গেই। সেই দায় মুখ্যত আমারই। আমার ভাইরা, প্রবাসী বোনেরা, আমার স্ত্রী ও মেয়েরা কারোরই যোগ্য নই আমি। আমার সব অবুঝপনা তারা বারে বারেই ক্ষমা করেছে। তবে ভবিষ্যতে আর কতবার করবে তা জানা নেই।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তারপরে কিছুই মনে নেই। কিন্তু কতক্ষণ পরে তা জানি না প্রচণ্ড বমির বেগে ঘুম ভেঙে গেল আমার। মেঝেতেই বমি করে ফেললাম। রাত তখন কত কে জানে। আমার দুই মেয়ে ঘুম ভেঙে উঠে আমার ঘরে এসে বাবার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। হতবাক। কী লজ্জা কী ঘেন্না নিজের উপরে যে হচ্ছিল ওদের মুখে চেয়ে, তা কী বলব!

ঋতু এমনিতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার মহিলা। সে ডাক্তারকে ফোন করে, সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে রামকে ডাকিয়ে আনিয়েছিল। মেয়েদের বয়স্কা আয়া রেণুও ছিল তখন। সকলে মিলে আমাকে শুশ্রূষা করতে লাগল। রাম বালতি বালতি বমি বয়ে নিয়ে যেতে লাগল বাথরুমে। ডাক্তার স্বয়ম্ভু মুখার্জি কাছেই থাকতেন, ঢিল ছোড়া দূরত্বে, তিনি এসে কী বললেন না বললেন তা বোঝা বা জানার মতো অবস্থা আমার ছিল না। সাতদিন আমি অর্ধমৃত অবস্থাতে পড়ে ছিলাম। মাথা কোনো কাজ করছিল না। তবে হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করলেন না হয়তো পুলিশ কেস হবে বলেই।

কী সব হাস্যকর ব্যাপার! আমি আমার নিজের জীবন নিভিয়ে দেবার ইচ্ছা করেছি তাতে দারোগা আমাকে গ্রেপ্তার করবে। জানি না, কবে ওই সব আইন-কানুনের পরিবর্তন হবে।

পরে জেনেছিলাম, পুলিশ জানলে আমার চেয়ে বেশি হেনস্তা হত ঋতু এবং আমার ভাইদের, হয়তো মেয়েদেরও।

পরদিন সকালে ভাইরা এসে বলল, তুমি আত্মহত্যা করে মরে গেলে পুলিশে এসে আমাদের নিয়ে টানাটানি করত— । এমন কেউ করে!

ঋতু বলল, আবারও যদি মরতে যাও, প্লিজ, পরিচ্ছন্ন উপায়ে মোরো। এমন ঝঞ্ঝাট কোরো না, অসুবিধেয় ফেলো না সকলকে।

ওকে কথা দিয়েছিলাম, যে তাই করব ভবিষ্যতে। কারোকে কোনো ঝঞ্ঝাটে ফেলব না।

ভাবছিলাম, কী পোড়া দেশেই না জন্মেছিলাম। এখানে জীবনদায়িনী ওষুধেও যেমন ভেজাল, জীবনঘাতিনী ওষুধেও তেমনই ভেজাল। মানুষ তো শান্তিতে বাঁচতে পারেই না, শান্তিতে যে মরবে একটু তাও কী হবার জো আছে!

এই বিষাদ, অবসাদ, হতাশাগ্রস্ততা আমার ফিরে ফিরেই আসে কিছুদিন পরে পর। কেন এমন হয় তা বলতে পারব না। কিন্তু এই 'চক্র' সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণই সচেতন। ওই সময়টা যখন আসে তখনই আত্মহত্যার কথা ভাবি আমি। মনে হয়, দিই এক লহমাতে এই জীবনটাকে শেষ করে।

আমাদের বর্তমান বাসস্থানে আমার ঘরের একদিকে কংক্রিটের দেওয়াল নেই। কাচের দেওয়াল আছে মেঝে থেকে ছাদ অবধি।—ঠেললেই সেই কাচ সরে যায়। তারপরে একফালি বারান্দা মতো। সেখানে গাছ থাকে কিছু। গ্রিল নেই, নিচু রেলিং আছে। সহজেই লাফিয়ে পড়া যেতে পারে সেই বারান্দা থেকে। পিস্তলটা সেই ঘটনার পরে বাড়ি আর রাখিনি—বন্দুক রাইফেল তো নকশাল আন্দোলনের সময় থেকেই বন্দুকের দোকানেই জিম্মা করা আছে। তবে একজন মানুষ যদি সত্যিই মরতে চায় তবে পৃথিবীর কোনো শক্তিই কি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে!

এই প্রসঙ্গে অন্য কিছু কথাও মনে আসে। একজন লেখক বা গায়ক কি সারাজীবন ধরেই লিখে বা গেয়ে যাবেন? তাঁদের জীবনে কি অবসর বলে কিছু আছে? না থাকা উচিত?

একজন লেখকও কি অন্য দশজন চাকরি বা পেশাজীবীর মতো অবসর নিতে পারেন?

অবসরভোগী বা পেনশনারের জীবন হয়তো লেখকের নয়। লেখকের মতো লেখকের জীবনও যেমন, মরণও তেমনই হওয়া উচিত। 'লা ডলচে ভিতা' ইতালিয়ান ছবিতে সেই আছে না? 'To die with a bang and not with a whimper'—তেমন মরাই ভালো। ককিয়ে কেঁদে সহস্রজনের সহানুভূতি কুড়িয়ে মরার চেয়ে এক লহমায় বিরাট এক শব্দ করে মরে যাওয়াই তো ভালো।

হেমিংওয়ে আত্মহত্যা করে মরার কিছুদিন আগে তাঁর এক বন্ধু এই হচনারকে বলেছিলেন : "A champion cannot retire like anyone else" তাঁর স্প্যানিশ বুলফাইটার (মাতাদোর) বন্ধুদের, যেমন আন্তোনিওকে দেখে তাঁর এই বিশ্বাস আরও গভীরতা পেয়েছিল। একজন চ্যাম্পিয়ন আর সাধারণ মানুষের মধ্যে তফাতটা তিনি বুঝতেন। জীবনে যাঁরা অসাধারণ, মরণেও তাঁদের হয়তো অসাধারণই হওয়া উচিত।

হেমিংওয়ে চারবার বিয়ে করেছিলেন, অগণ্য মহিলার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। যা যা করতে চেয়েছিলেন জীবনে তাই তাই-ই করেছিলেন—উনি বলতেন, "Never confuse movement with action–Never do a thing you donot really want to do" বলতেন, "A man can be destroyed but cannot be defeated"

ওই একটি প্রার্থনা। শেষ নমস্কারে যেন ওই কথাকটি বলে যেতে পারি কাছে-দূরের নগ্ন মুখের ও মুখোশধারী শত্রুদের। যেন বলতে পারি যে, আমাকে ভেঙে ফেলতে পারো তোমরা, তার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছ অবিরত প্রথম দিন থেকেই, আমাকে চুরমার করে দিতে পারো কিন্তু হারাতে পারবে না। হেরে যাবার জন্যে আসিনি এখানে আমি।

লেখার জগতে আমি কেন আদৌ এলাম এ নিয়ে কমজনের উষ্মা নেই। অন্যভাবে ভাবলে বুঝতে পারি একজন লেখকই বা কেন অবসর নেবেন না? গায়কদের তো অবসর নেওয়া অবশ্যই উচিত। সাম্প্রতিক অতীতে মান্না দে এবং সুচিত্রা মিত্রকে কেন গান গেয়ে যেতেই হবে? যদি তাঁদের মতো সুরঋদ্ধ গলাতেও সুরের খামতি ঘটে। হেমন্তদা কেন অনেক আগে গান থামিয়ে দিলেন না? একজন

লেখকেরও যদি আর বলার মতো কিছু না থাকে, তিনি যদি নবীনতা হারিয়ে ফেলেন, নিজেকে বারবার নবীকৃত না করতে পারেন, পাঠকেরা যদি তাঁর লেখা পড়তে না চায় তবুও কি তাঁকে লিখে যেতেই হবে!

অনেকে বলবেন, প্রয়োজন? অর্থের প্রয়োজনেও তো লিখতে হয়ই নইলে লেখকেরই বা বৃদ্ধবয়সে চলে কী করে? সরকারি বা বেসরকারি স্তরে তাঁদের জন্যে কোনো প্রকল্প তো নেই। সরকার শুধু সরকারি কর্মীদের নিয়েই ভাবেন। লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই শুধুমাত্র লিখেই জীবিকা নির্বাহ করেন বলেই কি তাঁরা হাওয়া খেয়ে থাকবেন? লেখকদের তো কোনো পেনশান নেই।

অবশ্য যেসব লেখক বড়ো বড়ো সংবাদপত্রে কাজ করেন তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা অতি সামান্য কাজ করে অথবা না-করেও মোটা মাইনে পান এবং প্রতিটি লেখার বিনিময়ে মোটা টাকা পেয়ে, যদি তা মদে বা অন্য বাজে খরচে উড়িয়ে না দেন, তবে বেশ দুধে-ভাতেই কাটাতে পারেন শেষ জীবন। তাছাড়া, তাঁদের অনেক দায়-দায়িত্বই, যেমন মেয়ের বিয়ে, ইনকামট্যাক্সের দুর্যোগ, অসুখ-বিসুখে নামীদামি নার্সিংহোমের খরচ সবই সংবাদপত্রর মালিকেরা তাঁদের দুনম্বরি টাকার কুবেরের ভাণ্ডার থেকে খরচ করেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, তেমন ভাগ্যবান ক'জন?

আমার মনে যেটা এসেছে সেটা অন্য কথা। এ অর্থের প্রসঙ্গ নয়, কারণ আমি নিজে কখনোই অর্থোপার্জনের জন্যে লিখিনি। লেখা আমাকে পোকার মতো কামড়ে ধরেছিল, যাকে লোকে বলে 'রাইটিং বাগ', হান্টিং বাগেরই মতো। না লিখে উপায় ছিল না তাই লেখা শুরু করেছিলাম। ভিতরের এই তাগিদ যাঁরাই বোধ করেছেন লেখক জীবনের গোড়াতে তাঁরাই এই দংশনের জ্বালার বা আনন্দর কথা জানেন। কিন্তু সেই জ্বালা যখন নিভে আসে, ভিতর থেকেই তাগাদটা স্তিমিত হয়ে আসে, তখন, সম্পাদক বা প্রকাশক বইয়ের জন্যে বারবার তাগাদা করলেও কি তাঁকে লিখে যেতেই হবে? পাঠক যখন আমার লেখা আর পড়তে চাইবে না তখন লেখার আর কোনো যৌক্তিকতা থাকবে কি আদৌ? জীবনের একটা সময়ে পৌঁছে, অনেক শৃঙ্গ জয় করার পরে স্বেচ্ছায় অবরোহী হওয়াটাই কি বাঞ্ছনীয় নয়?